রবীন্দ্র রচনাবলী

একাদশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
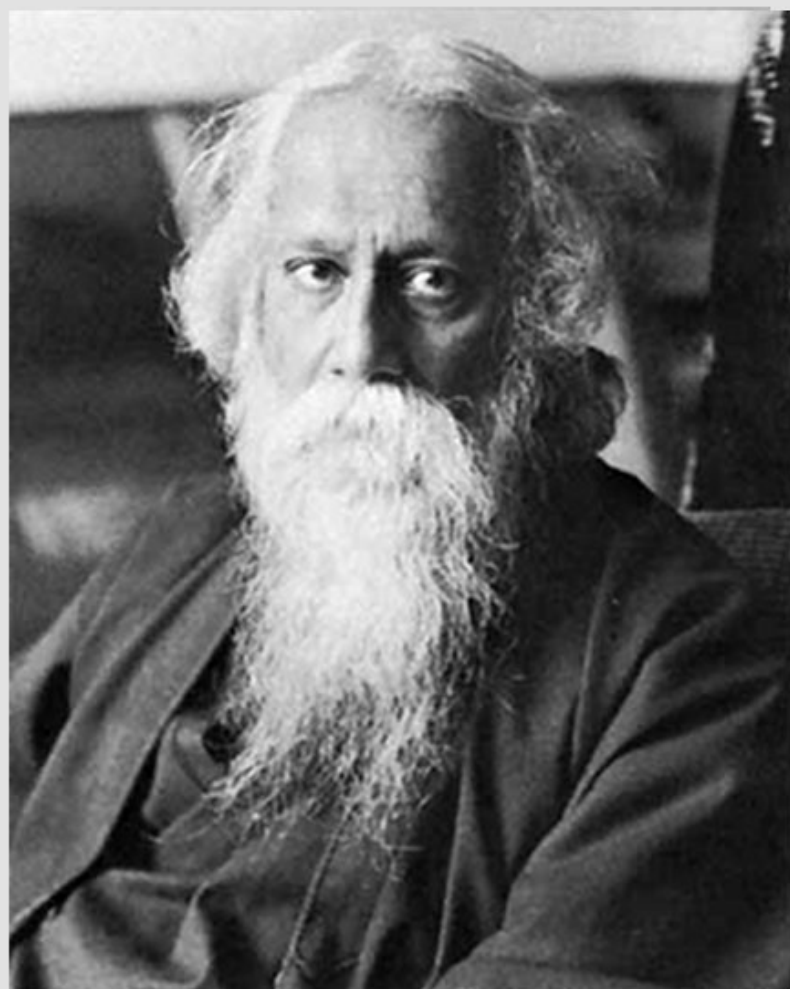
রবীন্দ্র রচনাবলী

একাদশ খণ্ড : প্রবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে
শিক্ষাসচিব শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন
কর্তৃক প্রকাশিত

২৫ বৈশাখ ১৩৬৮

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
কলিকাতা ৯ হইতে
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় কর্তৃক
মুদ্রিত

সূচীপত্র

পাঠকের সুবিধার জন্য, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্যকে (১) আত্মপরিচয় (২) বিশ্বযাত্রী (৩) পত্রাবলী (৪) চারিত্রপূজা (৫) শিক্ষা (৬) ধর্ম (৭) স্বদেশ ও সমাজ (৮) ভাষা ও সাহিত্য (৯) বিবিধ প্রসঙ্গ—এই কয়টি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক অংশের মধ্যে গ্রন্থপ্রকাশের কালানুক্রম অনুসৃত হয়েছে।

পত্রাবলী

ছিন্নপত্রাবলী

ইন্দিরাদেবীকে লিখিত পত্র। ৭ অক্টোবর ১৮৯৪

...তোকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয় নি।...তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিম্বা ভুল বুঝবি, কিম্বা বিশ্বাস করবি নে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেই জন্যে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি। যখন মনে জানি পাঠকরা আমাকে ভালো করে জানে না, আমার অনেক কথাই তারা ঠিকটি বুঝবে না এবং নম্রভাবে বোঝবার চেষ্টাও করবে না, এবং যেটুকু তাদের নিজের মানসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে না সেটুকু আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে গ্রহণ করবে না— তখন মনের ভাবগুলি তেমন সহজে ভাষায় প্রবাহিত হতে চায় না এবং যতটুকু প্রকাশ হয় তার মধ্যে অনেকখানি ছদ্মবেশ থেকে যায়। এর থেকেই বেশ বুঝতে পারি আমাদের সব চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে নিজের ইচ্ছা-অনুসারে দিতে পারি নে। আমাদের ভিতরে সব চেয়ে যা গভীরতম উচ্চতম অন্তরতম সে আমাদের আয়ত্তের অতীত; তা আমাদের দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা নেই ... ... আমরা দৈবক্রমে প্রকাশ হই, আমরা ইচ্ছা করলে চেষ্টা করলেও প্রকাশ হতে পারি নে—চব্বিশ ঘণ্টা যাদের সঙ্গে থাকি তাদের কাছেও আপনাকে ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যের অতীত। ... ... তোর এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে, সত্য আপনি তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ হয়। সে তোর নিজের গুণে। যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে ভালো লেখা তার চিঠিতেই দেখা দেয় তা হলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে। আমি তো আরও অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারে নি।... ... তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল স্বচ্ছতা আছে, সত্যের প্রতিবিম্ব তোর ভিতরে বেশ অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয়।...

—রবীন্দ্রনাথ

ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথ

১

দার্জিলিং
। সেপ্টেম্বর ১৮৮৭।

এই তো দার্জিলিং এসে পড়লুম। পথে বেলি খুব ভালো রকম behave করেছে। বড়ো একটা কাঁদে নি। খুব চেঁচামেচি গোলমালও করেছে, উলুও দিয়েছে, হাতও ঘুরিয়েছে এবং পাখিকে ডেকেছে যদিও পাখি কোথায় দেখতে পাওয়া গেল না। সারা-ঘাটে স্টিমারে ওঠবার সময় মহা হাঙ্গাম। রাত্রি দশটা—জিনিস-পত্র সহস্র, কুলি গোটাকতক, মেয়ে মানুষ পাঁচটা এবং পুরুষ মানুষ একটিমাত্র। নদী পেরিয়ে একটি ছোটো রেলগাড়িতে ওঠা গেল—তাতে চারটে করে শয্যা, আমরা (মাখন-সুদ্ধ) ছটা মনিষ্যি। মেয়েদের এবং অন্যান্য জিনিস-পত্র ladies' compartmentএ তোলা গেল—কথাটা শুনতে যত সংক্ষেপ হল কাজে ঠিক তেমনটা হয় নি। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয় নি—তবু নদিদি বলেন আমি কিছুই করি নি। অর্থাৎ, আমার মতো ডাগর পুরুষ মানুষের পক্ষে পাঁচজন মেয়ে নিয়ে এর চেয়ে ঢের বেশি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি এবং ছুটোছুটি করা উচিত ছিল, মাঝে মাঝে যেখানে সেখানে নেবে হিন্দুস্থানি বুলিতে platform-ময় দাপিয়ে বেড়ানো উচিত ছিল। অর্থাৎ, একখান আস্ত মানুষ একেবারে আস্ত রকম ক্ষেপলে যে রকমটা হয় সেইপ্রকার মূর্তি ধারণ করলে ঠিক পুরুষ মানুষের উপযুক্ত হত। আমার ঠান্ডা ভাব দেখে নদিদি নিতান্ত disappointed। কিন্তু এই দু দিনে আমি এত বাক্স খুলেছি এবং বন্ধ করেছি এবং বেঞ্চির নিচে ঠেলে গুঁজেছি এবং উক্ত স্থান থেকে টেনে বের করেছি, এত বাক্স এবং পুঁটুলির পিছনে আমি ফিরেছি এবং এত বাক্স এবং পুঁটুলি আমার পিছনে অভিশাপের মতো ফিরেছে, এত হারিয়েছে এবং এত ফের পাওয়া গেছে এবং এত পাওয়া যায় নি এবং পাবার জন্যে এত চেষ্টা করা গেছে এবং যাচ্ছে যে, কোনো ছাব্বিশ বৎসর বয়সের ভদ্র সন্তানের অদৃষ্টে এমনটা ঘটে নি। আমার ঠিক বাক্স-phobia হয়েছে, বাক্স দেখলে আমার দাঁতে দাঁতে লাগে। যখন চার দিকে চেয়ে দেখি বাক্স, কেবলই বাক্স, ছোটো বড়ো মাঝারি হাল্কা এবং ভারী, কাঠের এবং টিনের এবং পশুচর্মের এবং কাপড়ের—নিচে একটা, উপরে একটা, পাশে একটা, পিছনে একটা—তখন আমার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি এবং ছুটোছুটি করবার স্বাভাবিক শক্তি একেবারে চলে যায়—এবং তখন আমার শূন্যদৃষ্টি শুষ্কমুখ এবং দীনভাব দেখলে নিতান্ত কাপুরুষের মতো বোধ হয়—অতএব আমার সম্বন্ধে নদিদির যা মত দাঁড়িয়েছে তা ঠিক—আমি বিবিধ-বিচিত্র-মূর্তি বাক্সর মধ্যে পড়ে কী এক রকম হয়ে গিয়েছিলুম। সুরেনকে বলিস আমার এই অবস্থার একটা ছবি আঁকতে। যাক্। তার পরে আমি আর একটা গাড়িতে গিয়ে শুলুম। সে গাড়িতে আর দুটি বাঙালি ছিলেন। তাঁরা ঢাকা থেকে আসছেন, দেখেই কেমন ঢাকাই বলে মনে হয়—তাঁদের মধ্যে একজনের মাথা টাকে প্রায় পরিপূর্ণ এবং ভাষা অত্যন্ত বাঁকা—তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার পিতা দার্জিলিঙে ছিল?' লক্ষ্মী থাকলে এর

যথোচিত উত্তর দিতে পারত; সে হয়তো বলত, 'তিনি দার্জিলিং ছিল কিন্তু তখন দার্জিলিং বড়ো ঠান্ডা ছিলেন বলে তিনি বাড়ি ফিরে গেছে।' আমার উপস্থিতমত এ রকম বাংলা জোগালো না।

সিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত ক্রমাগত সরলার উচ্ছ্বাস-উক্তি—exclamations। 'ওমা কী চমৎকার' 'কী আশ্চর্য' 'কী সুন্দর'—কেবলই আমাকে ঠেলে আর বলে, 'রবিমামা, দেখো দেখো।' কী করি, যা দেখায় তা দেখতেই হয়—কখনো বা গাছ, কখনো বা মেঘ, কখনো বা একটা দুর্জয় খাঁদা-নাক-ওয়ালী পাহাড়ী মেয়ে, কখনো বা এমন কত কী যা দেখতে না দেখতেই গাড়ি চলে যাচ্ছে এবং সরলা দুঃখ করছে যে রবিমামা দেখতে পেলে না, কিন্তু তার জন্যে রবিমামা কিছুমাত্র দুঃখিত নয়। গাড়ি চলতে লাগল। বেলি ঘুমোতে লাগল, বন পাহাড় পর্বত ঝর্না মেঘ এবং বিস্তর খাঁদা নাক এবং বাঁকা চোখ দেখা দিতে লাগল। ক্রমে ঠান্ডা, তার পরে মেঘ, তার পরে নদিদির সর্দি, তার পরে বড়দিদির হাঁচি, তার পরে শাল কম্বল বালাপোশ, মোটা মোজা, পা কন্‌কন্, হাত ঠান্ডা, মুখ নীল, গলা ভার-ভার, এবং ঠিক তার পরেই দার্জিলিং। আবার সেই বাক্স, সেই ব্যাগ, সেই বিছানা, সেই পুঁটুলি। মোটের উপর মোট, মুটের উপর মুটে। ব্রেক থেকে জিনিস-পত্র দেখে নেওয়া, চিনে নেওয়া, মুটের মাথায় চাপানো, সাহেবকে রসিদ দেখানো, সাহেবের সঙ্গে তর্কবিতর্ক, জিনিস খুঁজে না পাওয়া, এবং সেই হারানো জিনিস পুনরুদ্ধারের জন্যে বিবিধ বন্দোবস্ত করা—এতে আমার ঘণ্টা দুয়েক লেগেছিল, ততক্ষণ নদিদিরা ডুলিতে চড়ে, বাড়িতে গিয়ে, শালটি মুড়ি দিয়ে, সোফায় শুয়ে, বিশ্রাম করছিলেন এবং কল্পনা করছিলেন যে রবি ঠিক পুরুষ মানুষের মতো নয়।

কলকাতা
১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭

২

দার্জিলিং
। ১৮৮৭।

আমার কোমরের সমস্ত খবর সুরির চিঠিতে পাবি। কোমরটা যে কেবলমাত্র কাছা এবং কোঁচা গুঁজে রাখবার জায়গা তা আর কক্‌খনো মনে করব না—মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এই কোমর আশ্রয় করে আছে। আজকের এই চিঠিটা যদি একঘেয়ে (dull) রকম হয়, অর্থাৎ যদি এর মধ্যে কোনো movement না থাকে—বিষয় হতে বিষয়ান্তরে, ভাব হতে ভাবান্তরে, খবর হতে খবরান্তরে আমার কলম যদি ভালো করে না সরে—তবে জানবি সে আমার এই ভাঙা কোমরের দোষ—তার জন্যে আর কারও দোষ দেওয়া যায় না। এর উপরে আবার মাঝে মাঝে এক একটা বিপর্যয় হাঁচি বেরোচ্ছে—মনে হচ্ছে যেন শরীরের ঊর্ধ্বভাগ ভাঙা কোমর থেকে ছিটকে পড়ে যাবে। কিন্তু এই পর্যন্ত। কোমরের কথা আর লিখব না। প্রতিজ্ঞা করে বলছি কোমরের কথা আর লিখব না! ভারী তো কোমর তার আবার কথা! একে তো aestheticsএর সমস্ত আইন অবহেলা করে তিনি হাতে বহরে ক্রমিক

উন্নতি লাভ করছিলেন, তার উপরে আবার থেকে থেকে তাঁর সহস্র রকম বাহানা। এই কোমরের কথা যাকে বলি সেই হাসে, কারও করুণা আকর্ষণ করে না; কোমর ভাঙা যেন হৃদয় ভাঙা অপেক্ষা কোনো অংশে কম! কিন্তু চাই নে কাউকে বলতে— চাই নে কারও করুণা—

আমার কোমর আমারই কোমর,
বেচি নি তো তাহা কাহারও কাছে!
ভাঙাচোরা হোক, যা হোক তা হোক,
আমার কোমর আমারই আছে!

কিন্তু কবিতায় যতই অহংকার করি না কেন— সত্যি কথা বলতে কী, আমার খুব ইচ্ছে করছে আমার কোমর যদি আর কারও কোমর হত! নিজের চরকায় তেল দেওয়া ভালো বরাবর শুনে আসছি এবং স্বীকার করেও আসছি— কিন্তু কোমরের কথা যদি বল তো মুক্তকণ্ঠে বলতে হয় যে, নিজের কোমরে গরম সর্ষের তেল মালিশ করার চেয়ে পরের কোমরে তেল দেওয়া আমি ঢের prefer করি। এ বিষয়ে আমার sentiments সম্পূর্ণ unselfish, এমন-কি almost Christian! কিন্তু থাক্, কোমরের কথা যখন বলব না প্রতিজ্ঞা করেছি তখন বলব না। কারণ, কোমর ছাড়াও মানুষের অন্যান্য অংশ আছে, তার মন আছে, তার হৃদয় আছে, তার আত্মা আছে— কিন্তু যাই বলো, তার কোমরও আছে— এবং খুবই আছে—

প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন,
তবু কোমর কেন টন্‌টন্ করে রে!
চারি দিকে চলা ফেরা,
আমার কোমর কেন টন্‌টন্ করে রে!

হৃদয় ভেঙে গেলে লোকে সান্ত্বনালাভের জন্যে পাহাড়ে বেড়াতে আসে, কিন্তু কোমর ভেঙে গেলে সমতল ক্ষেত্রই সকলের চেয়ে ভালো। এ সময়ে পার্ক্ স্ট্রীটের সেই তাকিয়াগুলো মনে পড়ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরও গোটাকতক পূর্বস্মৃতি মনে আসছে— কিন্তু থাক্— কোমরের কোনো প্রসঙ্গ আর পাড়ব না— পূর্বে কবে কোমরে ব্যথা হয়েছিল সে একেবারে ভুলে যাব, কিন্তু এখন যে কোমরে ব্যথা হয়েছে সেটা ভুলি কী করে?—

বীণা তবে রেখে দে, গান আর গাস নে,
কেমনে যাবে বেদনা!

নদিদি বলছেন, এক উপায় আছে— 'Rush Tox 6th dilution দু ঘণ্টা অন্তর খাও'। আমিও তাই মনে করেছি। সরলা দাঁড়িয়ে আছে আমার চিঠি পড়ে contradict করবে। কিন্তু সে বেচারা ভারী নিরাশ হবে— আমার কোমরের মধ্যে কী হচ্ছে তা তার দেখবার জো নেই, সেখেনে তার মেয়েলি prying instinct প্রবেশ করবার জো নেই, সেখেনে no admittance except for সর্ষের তেল ointment। কিন্তু তবু সরলা যে ছাড়বে এমন বোধ হয় না। বিদেশে তোদের কাছ থেকে যে একটু sympathy পাব তা তার সহ্য হবে না। কিন্তু এবার তোকে স্বীকার করতেই হবে যে, আমার কোমরের সম্বন্ধে আমিই সব চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য, এমন-কি সরলাও এ বিষয়ে আমার চেয়ে better authority নয়। কিন্তু বব, আমার কোমরের কথা তোরা কিছুই ভাবিস নে— আমার এই কোমরের কষ্ট আমিই নীরবে সমস্ত সহ্য করব। কিন্তু নীরবে ঠিক হয়ে উঠছে না, থেকে থেকে নড়তে

চড়তে এমন চীৎকার করছি যে তাকে ঠিক নীরব বলা যায় না। আর আজ তোকে যে চিঠি লিখলুম একেও ঠিক নীরব বলা যায় না। প্রথমে মনে করেছিলুম সুরেনের চিঠিতেই আমার কোমরের সমস্ত অবগত হবি— তোর কাছে আমার কোমরের কোনো কথা বলব না, তুলব না, পুরোনো তেল-মালিশের স্মৃতি আর জাগাব না— কিন্তু কী হতে কী হল! কিন্তু—

সেই সব সেই সব, সেই হাহাকার-রব,
সেই অশ্রুবারিধারা, কোমর-বেদনা।

কিন্তু আর কোমরের কথা বলব না— তার প্রধান কারণ হচ্ছে বলবার আর জায়গা নেই। যদি জায়গা থাকত তবে আমি আজ থেকে Doomsday পর্যন্ত বরাবর বলে যেতে পারতুম। কিন্তু Doomsdayর দিন কি এই কোমর নিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারতুম! ভেঁপু বাজত, সবাই উঠত, আর আমি কোমরে হাত দিয়ে আর্তনাদ করতুম। কিন্তু এটা বোধ হচ্ছে ঠাট্টার বিষয় নয়, তুই একটুখানি চটতেও পারিস। যা হোক, কোমরের কথা এবং আমার চিঠি এইখেনে ফুরোলো।

কলকাতা। ১৮৮৭

৩

শিলাইদহ
।১৮৮৮।

শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সামনে আমাদের বোট লাগানো আছে। প্রকাণ্ড চর— ধু ধু করছে— কোথাও শেষ দেখা যায় না— কেবল মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় নদীর রেখা দেখা যায়— আবার অনেক সময়ে বালি'কে নদী বলে ভ্রম হয়— গ্রাম নেই, লোক নেই, তরু নেই, তৃণ নেই— বৈচিত্র্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাটল-ধরা ভিজে কালো মাটি, জায়গায় জায়গায় শুক্‌নো সাদা বালি— পূর্ব দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে দেখা যায় উপরে অনন্ত নীলিমা আর নিচে অনন্ত পাণ্ডুরতা, আকাশ শূন্য এবং ধরণীও শূন্য, নিচে দরিদ্র শুষ্ক কঠিন শূন্যতা আর উপরে অশরীরী উদার শূন্যতা। এমনতর desolation কোথাও দেখা যায় না। হঠাৎ পশ্চিমে মুখ ফেরাবামাত্র দেখা যায় স্রোতোহীন ছোটো নদীর কোল, ও পারে উঁচু পাড়, গাছপালা, কুটির, সন্ধ্যাসূর্যালোকে আশ্চর্য স্বপ্নের মতো। ঠিক যেন এক পারে সৃষ্টি এবং আর এক পারে প্রলয়। সন্ধ্যাসূর্যালোক বলবার তাৎপর্য এই— সন্ধ্যার সময়ই আমরা বেড়াতে বেরোই এবং সেই ছবিটাই মনে অঙ্কিত হয়ে আছে। পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই-যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাতে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ সংসারে এ-যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়। সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্ব দিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যা পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে-এক প্রকাণ্ড পাতা উলটে দিচ্ছে সেই বা কী আশ্চর্য

লিখন—আর, এই ক্ষীণপরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর আর ওই ছবির মতন পরপারধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্তভাগ—এই বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা! যাক্। এ কথাগুলো রাজধানীতে অনেকটা 'পৈট্রি'র মতো শুনতে হবে, কিন্তু এখানকার পক্ষে কথাগুলো কিছুমাত্র বেখাপ নয়। যা হোক, সন্ধেবেলা এই বৃহৎ চরের মধ্যে ছাড়া পেয়ে আমরা সপরিবারে কিছুকাল বিচ্ছেদের পরম সুখ অনুভব করি—অনুচর-সমেত ছেলেরা এক দিকে যায়, বলু এক দিকে যায়, আমি এক দিকে যাই, দুটি রমণী আর-এক দিকে যায়।......ইতিমধ্যে সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যায়, আকাশের সুবর্ণ আভা মিলিয়ে যায়, অন্ধকারে চার দিক অস্পষ্ট হয়ে আসে, ক্রমে আপনার পাশের ক্ষীণ ছায়া দেখে বুঝতে পারি বাঁকা কৃশ চাঁদখানির আলো অল্প অল্প ফুটেছে—পাণ্ডুবর্ণ বালির উপরে এই পাণ্ডুবর্ণ জ্যোৎস্নায় চোখে আরও কেমন বিভ্রম জন্মিয়ে দেয়—কোথায় বালি কোথায় জল, কোথায় পৃথিবী কোথায় আকাশ, নিতান্ত অনুমান করে নিতে হয়। কাজেই সবটা জড়িয়ে ভারী একটা অবাস্তবিক মরীচিকাজগতের মতো বোধ হয়।......গতকল্য এই মায়া-উপকূলে অনেক ক্ষণ ধরে বিচরণ করে বোটে ফিরে গিয়ে দেখি—ছেলেরা ছাড়া আমাদের দলের আর কেউ ফেরেন নি। একবার ভাবলুম ডেকে পাঠাই, কিন্তু স্বার্থ এবং দয়া উভয়ে একত্রে মিলে আমাকে নিরস্ত করলে। অর্থাৎ, কতকটা নিজের সুখ এবং কতকটা তাঁদের সুখের প্রতি দৃষ্টি করে আমি একখানি easy chairএ স্থির হয়ে বসলুম—Animal Magnetism-নামক একখানা অত্যন্ত ঝাপসা subjectএর বই একখানি বাতির ঝাপসা আলোতে বসে পড়তে আরম্ভ করলুম। কিন্তু কেউ আর ফেরেন না।

...বইখানাকে খাটের উপরে উপুড় করে রেখে বেরোলুম। উপরে উঠে চার দিকে চেয়ে কালো মাথার কোনো চিহ্ন দেখতে পেলুম না—সমস্ত ফ্যাকাশে ধু ধু করছে। একবার বলু বলে পুরো জোরে চীৎকার করলুম—কণ্ঠস্বর হু হু করতে করতে দশ দিকে ছুটে গেল, কিন্তু কারও সাড়া পেলুম না, তখন বুকটা হঠাৎ চার দিক থেকে দমে গেল, একখানা বড়ো খোলা ছাতা হঠাৎ বন্ধ করে দিলে যেমনতর হয়। গফুর আলো নিয়ে বেরোল, প্রসন্ন বেরোল, বোটের মাঝিগুলো বেরোল, সবাই ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চললুম—আমি এক দিকে 'বলু' 'বলু' করে চীৎকার করছি—প্রসন্ন আর-এক দিকে ডাক দিচ্ছে 'ছোটো মা'—মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে মাঝিরা 'বাবু' 'বাবু' করে ফুকরে উঠছে। সেই মরুভূমির মধ্যে নিস্তব্ধ রাত্রে অনেকগুলো আর্তস্বর উঠতে লাগল। কারও সাড়াশব্দ নেই। গফুর দুই-এক বার অতি দূর থেকে হেঁকে বললে 'দেখতে পেয়েছি', তার পরেই আবার সংশোধন করে বললে 'না' 'না'—আমার মানসিক অবস্থাটা একবার কল্পনা করে দেখ্। কল্পনা করতে গেলে নিঃশব্দ রাত্রি, ক্ষীণ চন্দ্রালোক, নির্জন নিস্তব্ধ শূন্য চর, দূরে গফুরের চলনশীল একটি লণ্ঠনের আলো—মাঝে মাঝে এক এক দিক থেকে কাতর কণ্ঠের আহ্বান এবং চতুর্দিকে তার উদাস প্রতিধ্বনি—মাঝে মাঝে আশার উন্মেষ এবং পরমুহূর্তেই সুগভীর নৈরাশ্য—এই সমস্তটা মনে আনতে হবে। অসম্ভব রকমের আশঙ্কা সকল মনে জাগতে লাগল। কখনো মনে হল চোরা বালিতে পড়েছে, কখনো মনে হল বলুর হয়তো হঠাৎ মূর্ছা কিম্বা কিছু একটা হয়েছে, কখনো বা নানাবিধ শ্বাপদ জন্তুর বিভীষিকা কল্পনায় উদয় হতে লাগল। মনে মনে হতে লাগল—'আত্মরক্ষা-অসমর্থ যারা, নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ।' স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলুম—বেশ বুঝতে পারলুম বলু

বেচারা ভালোমানুষ, দুই বন্ধনমুক্ত রমণীর পাল্লায় পড়ে বিপদে পড়েছে। এমন সময়ে ঘণ্টাখানেক পরে রব উঠল এঁরা চড়া বেয়ে বেয়ে ও পারে গিয়ে পড়েছেন, আর ফিরতে পারছেন না। তখন ছুটে বোট-অভিমুখে চললুম— বোটে গিয়ে পৌঁছতে অনেক ক্ষণ লাগল। বোট ও পারে গেল, বোট-লক্ষ্মী বোটে ফিরলেন— বলু বলতে লাগল, 'তোমাদের নিয়ে আমি আর কখনো বেরোব না।' সকলেই অনুতপ্ত, শ্রান্ত, কাতর, সুতরাং আমার ভালো ভালো উপাদেয় ভর্ৎসনাবাক্য হৃদয়েই রয়ে গেল— পরদিন প্রাতঃকালে উঠেও কোনোমতেই রাগতে পারলুম না। সুতরাং এত বড়ো একটা ব্যাপার পরস্পরে হেসেই উড়িয়ে দিলে, যেন ভারী একটা তামাশা হচ্ছিল। যা হোক, তোকে তিন দিন ধরে এই বিষয়টা বিস্তৃত করে লিখে আমার মন অনেকটা খোলসা হয়ে গেল।

ঐ রে! মৌলবী সাহেব এক দঙ্গল প্রজা নিয়ে এসে সেলাম করছে— আমার বলতে ইচ্ছে করছে—

'ধিক্ তুমি, ধিক্ প্রজা, ধিক্ জমিদারি—
জমিদারি গোল্লায় যাক মৌলবী লয়ে সাথে!'

কলকাতা
২ ডিসেম্বর ?
১৮৮৮

৪

কলকাতা
। জুন ১৮৮৯ ।

গাড়ি ছাড়বার পর বেলি চার দিক চেয়ে গম্ভীর হয়ে বসে রইল, ভাবলে দিদিরা কোথায় গেল, আমি কোথায় যাচ্ছি— এ সংসারে কোথা থেকে আগমন, কোথায় গতি, জীবনের উদ্দেশ্য কী— ভাবতে ভাবতে ক্রমে দেখলুম ঘন ঘন হাই তুলতে লাগল, তার পরে খানিক বাদে আয়ার কোলে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে নিদ্রা আরম্ভ করে দিলে। আমার মনেও সংসারের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তার উদয় হয়েছিল, কিন্তু ঘুম এল না। সুতরাং আপন মনে ভৈরবী আলাপ করতে লাগলুম। ভৈরবী সুরের মোচড়গুলো কানে এলে জগতের প্রতি এক রকম বিচিত্র ভাবের উদয় হয় তা বোধ হয় জানিস— মনে হয় একটা নিয়মের হস্ত অবিশ্রাম আর্গিন যন্ত্রের হাতা ঘোরাচ্ছে এবং সেই ঘর্ষণবেদনায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মর্মস্থল হতে একটা গম্ভীর কাতর করুণ রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে— সকাল বেলাকার সূর্যের সমস্ত আলো ম্লান হয়ে এসেছে, গাছপালারা নিস্তব্ধ হয়ে কী যেন শুনছে, এবং আকাশ একটা বিশ্বব্যাপী অশ্রুর বাষ্পে যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে— অর্থাৎ, দূর আকাশের দিকে চাইলে মনে হয় যেন একটা অনিমেষ নীল চোখ কেবল ছল্ ছল্ করে চেয়ে আছে।... খিড়কি স্টেশনের কাছাকাছি আমাদের সেই আকের ক্ষেত, গাছের সার, টেনিস-ক্ষেত্র, কাঁচের-জানলা-মোড়া বাড়ি দেখতে পেলুম; দেখে মনটা হঠাৎ কেমন হু হু করে উঠল। এই এক আশ্চর্য! যখন এখানে বাস

করতুম তখন এ বাড়ির উপরে যে সবিশেষ স্নেহ ছিল তা নয়— যখন এ বাড়ি ছেড়ে তোদের সঙ্গে সোলাপুর গিয়েছিলুম তখনও যে বিশেষ কাতর হয়েছিলুম তাও বলতে পারি নে— অথচ দ্রুতগতি ট্রেনের বাতায়নে বসে যখন কেবল নিমেষের মতো দেখলুম সেই একলা বাড়ি তার খেলার জায়গা এবং ফাঁকা ঘরগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তখন সমস্ত হৃদয়টা বিদ্যুৎবেগে সেই বাড়ির উপরে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ল এবং মনে হতে লাগল তেমনি করে সকলে মিলে ঐ বাড়িটাতে গিয়ে জটলা করে বসলেই যেন আপাতত সংসারের সমস্ত অভাব দূর হয় এবং জীবনের উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হয়।...যেমনি বাড়িটা দেখলুম অমনি একটা ঘা পড়ল— বুকের ভিতর বাঁ দিক থেকে ডান দিক পর্যন্ত ধক্ করে একটা শব্দ হল, হুস্ করে গাড়ি চলে গেল— আকের ক্ষেত মিলিয়ে গেল— বাস্, সমস্ত ফুরোল— কেবল হঠাৎ ঘা খাওয়ার দরুন মনের বড়ো বড়ো দু চারটে তার প্রায় দেড় সুর আন্দাজ নেবে গেল। কিন্তু গাড়ির এঞ্জিন এ-সকল বিষয়ে বড়ো-একটা চিন্তা করে না, সে লোহার রাস্তার উপর দিয়ে এক রোখে চলে যায়, কোন্ লোক কোথায় কী ভাবে যাচ্ছে সে বিষয়ে তার খেয়াল করবার সময় নেই— সে কেবল গল্ গল্ করে জল খায়, হুস্ হুস্ করে ধোঁওয়া ছাড়ে, গাঁ গাঁ করে চীৎকার করে এবং গড়্ গড়্ করে চলে যায়। সংসারের গতির সঙ্গে এর সুন্দর তুলনা দেওয়া যেতে পারত, কিন্তু সেটা এত পুরোনো এবং অনাবশ্যক যে কেবল একবার নির্দেশ করে ক্ষান্ত থাকা গেল। খাণ্ডালার কাছাকাছি এসে মেঘ এবং বৃষ্টি। সেই-সব পাহাড়গুলোর উপরে মেঘ জমে ঝাপসা হয়ে গেছে— ঠিক যেন কে পাহাড় এঁকে তার পরে রবার দিয়ে ঘষে দিয়েছে— খানিক-খানিক outline দেখা যাচ্ছে এবং খানিকটা পেন্সিলের দাগ চার দিকে ধেবড়ে গেছে।...অবশেষে গাড়ির ঘণ্টা দিলে— দূর থেকে গাড়ির নিদ্রা-হীন লাল চক্ষু দেখা গেল; ধরণী থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল; স্টেশনের কর্তারা চটিজুতো, ঘুন্টি-দেওয়া চাপকান এবং টিকির উপরে তক্‌মা-দেওয়া গোল টুপি নিয়ে নানা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল— বিপুল হাতল্যাণ্ঠন চার দিকে আলো নিক্ষেপ করতে লাগল; খানসামাবর্গ সচকিত হয়ে যে যার জিনিস-পত্র আগলে দাঁড়ালে; বেলি ঘুমোতে লাগল; আমার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল।... আয়াকে বললুম, 'শীঘ্র বেলিকে কোলে করে নিয়ে এসো।' বেলি আসতে না আসতে দেখা গেল এক-জোড়া মেম-সাহেব দ্রুতগতিতে আমাকে উত্তীর্ণ হয়ে সেই খালি গাড়ির প্রতি লক্ষ্য করেছে— আমি মনে মনে বললুম 'যেমন করে হোক ও গাড়িতে আমি উঠবই'। মেমসাহেবও খালি গাড়ির সুমুখে দাঁড়ালেন আমিও দাঁড়ালুম, গার্ড্ এসে উপস্থিত— গার্ড্‌কে জিজ্ঞাসা 'এটা কি লেডিজাতীয় গাড়ি'। শুনে চট্ করে মেমটা তাকে বললে, 'অবিশ্যি আবশ্যক হলে এটা লেডিদের জন্যে reserve করা যেতে পারে।' গার্ড্‌টা সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে আমি কোথায় যাচ্ছি, আমি বললুম কলকাতায়। সে বললে : You may get in sir ! মেয়েটাও সে গাড়িতে ওঠবার উদ্যোগ করতে লাগল, তার স্বামীটা তাকে বারণ করলে। এমন সময়ে গার্ড্‌টা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমার লেডি কোথায়। আমি বললুম আমার লেডি নেই, একটা maid servant আছে— শুনে মেয়েটা কিছু দূরে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠল এবং সাহেবকে বললে : His maid servant! অর্থাৎ, ঐ কালো লোকটা যাকে maid servant বলছে সে might be his wife as well!...যা হোক, মনে মনে বললুম, হেসে নাও, আমিও খালি গাড়ি পেলুম। কিন্তু একটা মজা দেখলুম সাহেবটার ইচ্ছে নয়

আমার কোনোরকম অসুবিধে হয়। সে না থাকলে spite করে মেয়েটা গাড়িতে উঠে বসত— অথচ অন্য গাড়িতে জায়গা ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই-সব নাক-তোলা রূপসী ইংরেজ মেয়েগুলো যদি ভারতবর্ষে না আসত তা হলে ইংরেজরা আমাদের উপরে ঢের ভালো ব্যবহার করতে পারত; এরাই Anglo-Indian ভাবের মূল ভিত্তি। এরা নাকি বড্ড delicate, ভারী অল্পে মাথা ধরে এবং shocked হয়, তাই কালো জাতের উপরে এদের সহৃদয়তা জন্মাতে পারে না। হায় রে, এত সাবান মাখলুম, এত খানা খেলুম, এত *Cherry Blossom*এর শিশি খালি করলুম, তবু ঐ সাদা নাকগুলির ডগা কুঁচকেই রইল। অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করে, 'তোরা যেন পরজন্মে দাক্ষিণাত্যে নারী হয়ে জন্মাস এবং স্বামীরা যেন ঐ নাকের ডগাগুলি ছেদন করে দেয়।'... বেলিটা অকারণে খুঁত খুঁত আরম্ভ করলে। বেলা বাড়তে লাগল, যদিও রোদ্দুর নেই তবুও গরম বোধ হতে লাগল।... কিন্তু সময় আর কাটে না। প্রত্যেক মিনিটকে যেন স্পর্শ করে ঠেলে ঠেলে এগুতে হচ্ছে।... Anna Karenina পড়তে গেলুম, এমনি বিশ্রী লাগল যে পড়তে পারলুম না—এ রকম সব sickly বই পড়ে কী সুখ বুঝতে পারি নে। আমি চাই বেশ সরল সুন্দর মধুর উদার লেখা—কুটকচালে অদ্ভুত গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশিক্ষণ পোষায় না। সৌভাগ্যক্রমে খানিক দূর গিয়ে ঘোরতর বৃষ্টি আরম্ভ হল। চার দিক বন্ধ করে কাঁচের জানলার কাছে বসে মেঘ বৃষ্টি দেখতে বেশ লাগল। এক জায়গায় একটা বর্ষার নদীর কাণ্ড যে দেখলুম সে আর কী বলব। সে একেবারে ফুলে ফেঁপে, ফেনিয়ে, পাকিয়ে ঘুলিয়ে, ছুটে, মাথা খুঁড়ে, পাথরগুলোর উপরে পড়ে আছড়ে বিছড়ে, তাদের ডিঙিয়ে, তাদের চার দিকে ঘুরপাক খেয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড করতে লাগল। এ রকম উন্মত্ততা আর কোথাও দেখি নি। সোহাগপুরে বিকেলে এসে যখন ডিনার খেলুম তখন বৃষ্টি থেমেছে, যখন গাড়ি ছাড়লে তখন দেখলুম সূর্য অত্যন্ত রাঙা হয়ে মেঘের মধ্যে অস্ত যাচ্ছে। আমি প্রায় তোদের কথা মনে করছিলুম, ভাবছিলুম খাওয়াদাওয়া গল্পসল্প খেলা-ধুলো পড়াশুনোর মধ্যে তোদের সময় কেমন অলক্ষিতভাবে কেটে যাচ্ছে—সময় তোদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তার অস্তিত্বই তোরা টের পাচ্ছিস নে—আর আমি সময়ের উপরে সাঁতার কেটে চলেছি, সমস্ত অগাধ সময়টা আমার বুকে মুখে সর্বাঙ্গে লাগছে।...

যথাসময়ে গাড়ি হাওড়ায় গিয়ে পেঁছল। প্রথমে বাড়ির জমাদার, তার পরে যোগিনী, তার পরে সত্য, একে একে দৃষ্টিপথে পড়ল। তার পরে সেকেণ্ড্ ক্লাসের ছাতের উপর গুটানো বিছানা, আয়ার দোমড়ানো টিনের বাক্স এবং নাবার টব (তার মধ্যে দুধের বোতল, লোটা, হাঁড়ি, টিন্‌পট, পুঁটুলি ইত্যাদি) চাপিয়ে বাড়ি পেঁছন গেল। একটা কলরব, লোকের ভিড়, দরোয়ানদের সেলাম, চাকরদের প্রণাম, সরকারদের নমস্কার, আমাদের মধ্যে কে মোটা হয়েছি কে রোগা হয়েছি সে সম্বন্ধে সাধারণের সম্পূর্ণ মতভেদ, বেলাকে নিয়ে স্বয়ম্প্রভা এণ্ড্ কোম্পানির লুটোপুটি, চায়ের টেবিলে লোকসমাগম, স্নান, আহার ইত্যাদি—এ সমস্ত তুই বেশ কল্পনা করতে পারিস। হঠাৎ দাদা এসে সহজ জ্ঞান নিয়ে ঘোরতর বক্তৃতা দিতে লাগলেন— একটা ভারী গোলমাল বেধে গেল। খোকাকে দেখে ভারী নতুন রকম বোধ হল। মস্ত গোল মাথা, নিতান্ত হাঁদা, বেশ একটু কালো, মাথা নেড়া, ফুলো গাল, পরম নির্বুদ্ধির মতো চোখ মুখের ভাব সর্বদা টল্‌মল্, হাতগুলো ফুলো-ফুলো মোটা-মোটা মুঠো-করা—কোনো প্রকার অঙ্গভঙ্গী বা শব্দপ্রয়োগের দ্বারা

তার মনোযোগ আকর্ষণ করলে হাসে, চট্‌কে কিম্বা নেড়ে দিলে হো হোঃ শব্দে পরিতোষ প্রকাশ করে। এই তার general characteristics— কিন্তু এ সকল বিষয়ে তার সমবয়স্ক মানবসন্তানের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো প্রভেদ দেখি নে।...

বিজাপুর
১২ জুন ১৮৮৯

৫

সাজাদপুর
। জানুয়ারি ১৮৯০।

এখানকার এন্‌ট্রান্স্‌ স্কুলের ছাত্রেরা একটা সুনীতিসঞ্চারিণী সভা করেছে, তাতে তারা নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করে, সেই সভার মুখ উজ্জ্বল করবার জন্যে এখানকার মাস্টাররা আমাকে পাক্‌ড়াও করতে এসেছিলেন। আমার কবিত্ব এবং অন্যান্য বিবিধ সদ্‌গুণ সম্বন্ধে যখন তাঁরা সকলে মিলে লাগলেন— যখন সকল মাস্টার এবং সকল পণ্ডিতের মধ্যে আমার গুণব্যাখ্যা নিয়ে রীতিমত রোখ চেপে গেল, একজন যেখেনে থামেন আর-একজন সেখেন থেকে আরম্ভ করেন— একজন যদি বলেন কবি, আর-একজন বলেন শ্রেষ্ঠ কবি, আর-একজন বলেন যেমন ভাষা তেমনি ভাব, চতুর্থ বলেন সকলই নূতন, বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে এমন কিছু হয় নি— পঞ্চম যা বললেন তা লোকসমাজে প্রকাশযোগ্য নহে, ষষ্ঠের কথা শুনে আমার কর্ণাগ্রভাগ রক্তিমাবর্ণ ধারণ করলে— সপ্তম কিছু বলবার পূর্বেই আমি অগোণে তাঁদের সুনীতিসঞ্চারিণী সভায় উপস্থিত হতে সম্মতি দান করলুম। এখানকার স্কুলের সেকেণ্ড্‌ মাস্টার আমার হেঁয়ালি নাট্যের বিশেষ ভক্ত। তিনি বললেন, আমার 'হেঁইলি নাট্য' বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন— 'পড়্যা আমরা হেস্যা কুট্‌পাট্‌!' পরশুদিন সুনীতিসঞ্চারিণী সভায় যাওয়া গেল। ছেলেতে বুড়োতে মিলে শ' পাঁচ-ছয় লোক উপস্থিত— কেউ বা একরত্তি, পায়ে জুতো নেই, বেঞ্চির উপরে বসে পা দোলাচ্ছে আর খক্‌ খক্‌ করে কাশছে; কেউ বা মস্ত ডাগর, কালো আল্‌পাকার চাপকানের উপর ঘড়ির চেন, অর্থাৎ আমাদের মুন্সেফ উকিল ইত্যাদি। আমি নিতান্ত মুষড়ে বসে আছি, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মুখ লাল হয়ে উঠেছে— এমন সময়ে এক ব্যক্তি প্রস্তাব করলেন ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করুন্‌। মুন্সেফবাবু বললেন, 'আমি অনুমোদন করি।' বিনাবাক্যব্যয়ে সভাপতির আসন গ্রহণ করলুম। ছাত্রেরা আজ বিনয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন। সেই অপেক্ষা করে বসে আছি।... ... তার পরে ওরই মধ্যে একটি ডাগর-ডোগর ছেলে উঠে modesty সম্বন্ধে ইংরিজি ভাষায় একটি বক্তৃতা পাঠ করলে। বললে : Modesty is an ornament of mind. Modest men are praised and immodest men are blamed by all. Every man is pleased to see a modest man, but a proud man is very much disliked. Newton was a modest man. When his dog upset an ink bottle on his papers Newton said to his dog,

'My friend, you do not know what harm you did to me'—such was his modesty. Brethren, let us all be like Newton. One day Chaitanya was walking in the street—a dog was lying on his way—Chaitanya said, 'My friend, please move a little'—the dog moved away at once—such was the force of modesty. The dog required no beating. We should treat every man like this dog। এই রকম অনেক সদুপদেশ দিয়েছিল। দ্বিতীয় ছাত্র উঠে সুললিত বঙ্গভাষায় বলতে লাগল : একদা সঙ্গিগণ-সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছিলাম। নিদাঘমার্তণ্ডতাপে পরিতাপিত হইয়া এক বিহঙ্গকূজিত মনোরম উপবনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। (সুদীর্ঘ বর্ণনা।) এক স্থানে দেখিলাম একদল পুরুষ পরুষ বাক্য-উচ্চারণপূর্বক ঘোরতর কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। জানিতে পারিলাম না ইহারা কে—সঙ্গিগণ পশ্চাদ্‌বর্তী হইয়া পড়াতে তাহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এক কুমুদকহ্লারশোভিত হংস-সারসসেবিত সুশীতল সরোবরতীরে উপস্থিত হইলাম। (দীর্ঘ বর্ণনা।) সেখানে কতকগুলি অপূর্বসুন্দরী যুবতী জলক্রীড়া করিতেছে দেখিয়াই বোধ হইল তাহারা দেবকন্যা। পরে জানিতে পারিলাম পূর্বোক্ত পুরুষগণ ঔদ্ধত্য অহংকার এবং এই সুন্দরী যুবতীগণ বিনয়। বিনয়ের অশেষ গুণ। যতগুলি গুণে সৃষ্টিকর্তা জগদীশ্বর মানবকলেবর বিভূষিত করিয়াছেন তন্মধ্যে বিনয় সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। আহা! মানবের মধ্যে বিনয়গুণ সন্দর্শন করিলে নয়ন আনন্দাশ্রুজলে প্লাবিত ও অন্তঃকরণ হর্ষপারাবারে নিমগ্ন হয়। ইত্যাদি। তার পরে আর একটি ছেলে উঠেই আরম্ভ করে দিলে—

> বিনয়ের তুল্য গুণ আর কোথা নাই।
> বিনয়ীর বশ হয় সর্বলোকে ভাই।
> পিতামাতা সকলের বাধ্য হয়ে রবে—
> তবে তো তোমারে সবে বিনয়ী কহিবে।
>
> ইত্যাদি।

আর একটি ছেলে বিনয় থেকে আরম্ভ করলে, শেষ করলে প্রকৃত প্রেম কাকে বলে এবং ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা। প্রত্যেক বক্তৃতার পরে খানিকক্ষণ চটাপট্ হাততালি পড়তে লাগল। আমি তো নিতান্ত হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছি। এমন সময়ে Headmaster এসে বললেন, 'আরও অনেক রচনা আছে, কিন্তু আপনার বক্তৃতা শোনবার জন্যে সকলে উৎসুক হয়ে আছেন।' মুখটুক শুকিয়ে, হাত পা কালিয়ে, কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করতে লেগে, কেশে কুশে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করে দিলুম। বললুম, বিনয় সম্বন্ধে কিছু বলবার পূর্বেই একান্ত বিনীতভাবে বলা আবশ্যক, আমার বলবার শক্তি নেই—বিশেষতঃ বিনয় সম্বন্ধে আমি যে বেশি কথা বলতে পারব এমন সাধ্য আমি রাখি নে। বিনয় যে একটা সদ্‌গুণের মধ্যে সে সম্বন্ধে আমার পূর্ববক্তা ছাত্রবৃন্দের আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। নিউটন বিনয়ী ছিলেন বটে, তার আর কোন সন্দেহ নেই।—এইরকম তো ব্যাপার। ক্রমে ক্রমে বলতে বলতে দুটো চারটে কথা বেরিয়ে গেল। তার পরে আমি বসলে পর, পরে পরে দুজন উঠে আমার এবং আমার পিতৃপিতামহের গুণব্যাখ্যা করতে লাগল। প্রথমে উঠলেন হেড-পণ্ডিত। তিনি বললেন তাঁর বলবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু আমার বক্তৃতা শুনে এমনি মুগ্ধ হয়েছেন যে সামলাতে পারছেন না—কবিত্বশক্তি বক্তৃতাশক্তি এবং তার

উপরে সংগীতশক্তি আমি ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই বলে ধপ্ করে বসে পড়লেন। সেকেন্ড্-মাস্টার উঠে বললেন—'পণ্ডিত মহাশয় যা বললেন তাতে আমার মন তৃপ্ত হল না, যথেষ্ট বলা হয় নি। যিনি আজ আমাদের সভায় উপস্থিত আছেন তিনি বড়ো সাধারণ লোক নন—স্বর্গীয় মহাত্মা (এইখেনে প্রায় পাঁচ মিনিট-কাল তাঁর নাম মনে পড়ল না, পাশের থেকে কে বলে দিলে) দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম কে না জানে, সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর নাম রাষ্ট্র বললে অত্যুক্তি হয় না—তিনি এঁর পিতামহ—রাজর্ষি বললেও হয় মহর্ষি বললেও হয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁর পিতা!' তার পরে এল কবিত্বশক্তি এবং 'হেঁইলি নাট্য'। আমি শুনে অপ্রস্তুত। তার পরে বললেন বিনয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার দরকার কী—Example is better than precept—ইনিই বিনয়ের দৃষ্টান্তস্থল। ইত্যাদি। ইত্যাদি। সবাই হাততালি দিলে। তার পরে সভা ভঙ্গ হল।

জোড়াসাঁকো
২৩ জানুয়ারি ১৮৯০
১১ মাঘ বৃহস্পতিবার

৬

সাজাদপুর
। জানুয়ারী ১৮৯০।

কাজেই দুপুর বেলা পাগড়ি পরে কার্ডে নাম লিখে পাল্কি চড়ে জমিদার বাবু চললেন। সাহেব তাঁবুর বারান্দায় বসে বিচার করছেন, দক্ষিণ পার্শ্বে পুলিসের চর। বিচারপ্রার্থীর দল মাঠে ঘাটে গাছতলায় পড়ে অপেক্ষা করে আছে—একবারে তার নাকের সামনে পাল্কি নাবালে, সাহেব খাতির করে চৌকিতে বসালে। ছোকরা-হেন, গোঁফের রেখা উঠেছে, চুল খুব কটা, মাঝে মাঝে একটু একটু কালো চুলের তালি দেওয়া, সে ভারী অদ্ভুত দেখতে হয়েছে—হঠাৎ মনে হয় বুড়ো মানুষ, অথচ মুখ নিতান্ত কাঁচা। সাহেবের সঙ্গে বিস্তর আপ্যায়িত করা গেল; বললুম, 'কাল রাত্রে আমার সঙ্গে খেতে এসো।' সে বললে, 'আমি আজই আর-এক জায়গায় যাচ্ছি pig stickingএর জোগাড় করতে।' (আমি মনে মনে উৎফুল্ল) বললুম, নিতান্ত দুঃখের বিষয়। সাহেব বললেন, 'আবার সোমবারে ফিরে আসব।' (শুনে মন বড্ড দমে গেল) বললুম, 'তবে সোমবারেই খেয়ো।' সে তৎক্ষণাৎ রাজি। যা হোক, সোমবারটা একটু তফাতে আছে মনে করে নিশ্বেস ফেলে বাড়ি চলে এলুম। ভয়ানক মেঘ করে এল—ঘোরতর ঝড়, মুষলধারে বৃষ্টি। বই ছুঁতে ইচ্ছে করছে না, কিছু লেখা অসম্ভব, মনের মধ্যে ভারী একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত, যাকে কবিত্বের ভাষায় বলে—কী যেন নেই, কে যেন থাকলে বেশ হত, কিন্তু তাকে যেন কাছাকাছি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না ইত্যাদি। এ ঘর থেকে ও ঘরে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলুম—অন্ধকার হয়ে এসেছে, গড়্ গড়্ শব্দে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুৎ, হু হু করে এক-একটা বাতাসের দম্কা আসছে আর আমাদের বারান্দার সামনের বড়ো লিচুগাছটার ঘাড় ধরে যেন তার দাড়ি-সুদ্ধ মাথাটা নাড়িয়ে দিচ্ছে—

দেখতে দেখতে বৃষ্টির জলে আমাদের শুকনো খালটা প্রায় পুরে এল।......ঐ রকম আরেকটা লিখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বোধ হয় আর কিছু লেখবার নেই। যাই হোক এই রকম করে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ আমার মনে হল ম্যাজিস্ট্রেটকে এই বাদ্‌লায় আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিতে অনুরোধ করা আমার কর্তব্য। চিঠি লিখে দিলুম, 'সাহেব, এ বর্ষায় pig stickingএ বেরোনো তোমার কর্ম নয়—যদিও তুমি সাহেবের বাচ্চা, এবং তাঁবুতে বাস করাও স্থলচর-জাতীয় জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য, অতএব শুকনো ডাঙা যদি ভালো মনে কর তো আমার আশ্রয়ে এসো।' চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে ঘর তদারক করতে গিয়ে দেখি, সে ঘরে দুটো বাঁশের ঝোলার উপর তাকিয়া গদি ময়লা-লেপ টাঙানো—চাকরদের গুল টিকে তামাক, তাঁদেরই দুটো কাঠের সিন্দুক, তাঁদেরই মলিন লেপ, ওয়াড়হীন তৈলাক্ত বালিশ ও মসীবর্ণ মাদুর, এক টুক্‌রো ছেঁড়া চট ও তার উপরে বিচিত্রজাতীয় মলিনতা—কতকগুলো......বাক্সর মধ্যে নানাবিধ জিনিসের ভগ্নাবশিষ্ট—যথা মর্চেপড়া কাৎলির ঢাক্‌নি, তলাহীন ভাঙা লোহার উনুন, অত্যন্ত ময়লা একটা দস্তার চাদানি, কতকগুলো কাঁচের... ...গ্লাসের পায়া, ভাঙা সেজের কাঁচরাশি ও ময়লা শামাদান, দুটো ফিলটার, meat safe, একটা সুপ-প্লেটে খানিকটা পাতলা গুড়, ধুলো পড়ে পড়ে সেটা গাঢ় হয়ে এসেছে, অনেকগুলো ভাঙা এবং আস্ত প্লেট, গোটাকতক ময়লা কালীবর্ণ ভিজে ঝাড়ন—কোণে প্লেট ধোবার গামলা, গফুর মিয়ার একটা ময়লা কোর্তা এবং পুরোনো মক্‌মলের skull cap—একটা জীর্ণ পোকা-কাটা জলের দাগ- তেলের দাগ- দুধের দাগ- গুড়ের দাগ- কালো দাগ- brown দাগ- সাদা দাগ- এবং নানা মিশ্রিত দাগ-বিশিষ্ট আয়নাহীন dressing table—তার পারা-ওঠা ভাঙা আয়নাটা অন্যত্র দেয়ালে ঠেসান-দেওয়া—তার খোপের মধ্যে ধুলো, খড়কে, ন্যাপ্‌কিন, পুরোনো তালা, ভাঙা গেলাসের তলা এবং সোডা ওআটার বোতলের তার, কতকগুলো খাটের খুরো, ডান্ডা এবং চাল—একটা পায়া-ভাঙা washhand stand, একটা দুর্গন্ধ, দেয়ালময় অনেকগুলো দাগ এবং গোটাকতক পেরেক—ব্যাপার দেখে আমার চক্ষুস্থির।—'ডাক্ লোকজন, নিয়ে আয় নায়েব, ডেকে আন্ খাজাঞ্চি, জোগাড় কর্ কুলি—আন্ ঝাঁটা, আন্ জল, মই লাগা, দড়ি খোল্, বাঁশ খোল্, তাকিয়া লেপ কাঁথা টেনে ফেল্, ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলো খুঁটে খুঁটে তোল্, পেরেকগুলো একে একে উপড়ে ফেল্—ওরে তোরা সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন, নে-না—একটা একটা করে জিনিস নে-না—ওরে ভাঙলে রে সব ভাঙলে—ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ—তিনটে সেজ ভেঙে চুরমার—খুঁটে খুঁটে তোল্।' ভাঙা চুপড়িগুলো এবং ছেঁড়া চটটা বহুদিনসঞ্চিত ধুলোসমেত নিজের হাতে টেনে ফেলে দিলুম—নিচে থেকে পাঁচ-ছটা আর্সুলো সপরিবারে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁরা আমারই সঙ্গে একান্নবর্তী হয়ে বাস করছিলেন—আমার গুড়, আমার পাঁউরুটি এবং আমারই বার্নিশ-করা নতুন জুতোর বার্নিশ তাঁদের উপজীবিকা ছিল। সাহেব লিখলেন, 'আমি এখনি যাচ্ছি, বড়ো বিপদে পড়েছি।' 'ওরে এল রে এল—চট্‌পট্ কর্।' তার পরে—ঐ এসেছে সাহেব। তাড়াতাড়ি চুল দাড়ি সমস্ত ঝেড়ে ফেলে ভদ্রলোক হয়ে, যেন কোনো কাজ ছিল না, যেন সমস্তদিন আরামে বসেছিলুম, এই রকম ভাবে হলের ঘরে বসে রইলুম। সাহেবের সঙ্গে ঈষৎ হেসে হাত নাড়ানাড়ি করে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ভাবে গল্প করতে লাগলুম। সাহেবের শোবার ঘরের কী হল—এই চিন্তা ক্রমাগত মনের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল। গিয়ে দেখলুম এক রকম দাঁড়িয়ে গেছে। রাত্তিরটা ঘুমিয়ে কাটতেও পারে, যদি না সেই গৃহহীন আর্সুলাগুলো

রাত্তিরে তার পায়ের তেলোয় সুড়্‌সুড়ি দেয়। সাহেব বললে, 'কাল সকালেই শিকারে বেরোব।' আমি আর উচ্চবাচ্য করলুম না। সন্ধের সময় সাহেবের ভগ্ন পাইক এসে খবর দিলে ঝড়ে তাঁর তাঁবু ছিঁড়েখুঁড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তাঁর কাছারির তাঁবুও ভিজে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে—অতএব অন্য জন্তু শিকার স্থগিত রেখে জমিদার বাবুর এখেনেই স্থায়ী হতে হবে।...

কলকাতা
২৮ জানুয়ারি ১৮৯০

৭

লণ্ডন
৩ অক্টোবর। ১৮৯০।

এ দেশে এসে আমাদের সেই হতভাগ্য বেচারা ভারতভূমিকে সত্যি সত্যি আমার মা বলে মনে হয়। এ দেশের মতো তার এত ক্ষমতা নেই, এত ঐশ্বর্য নেই, কিন্তু আমাদের ভালোবাসে। আমার আজন্মকালের যা কিছু ভালোবাসা, যা কিছু সুখ, সমস্তই তার কোলের উপর আছে। এখানকার আকর্ষণ চাকচিক্য আমাকে কখনোই ভোলাতে পারবে না—আমি তার কাছে যেতে পারলে বাঁচি। সমস্ত সভ্যসমাজের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে আমি যদি তারই এক কোণে বসে মৌমাছির মতো আপনার মৌচাকটি ভরে ভালোবাসা সঞ্চয় করতে পারি তা হলেই আর কিছু চাই নে।

৮

লণ্ডন
১০ অক্টোবর। ১৮৯০।

মানুষ কি লোহার কল, যে, ঠিক নিয়ম-অনুসারে চলবে? মানুষের মনের এত বিচিত্র এবং বিস্তৃত কাণ্ড-কারখানা—তার এত দিকে গতি—এবং এত রকমের অধিকার যে, এ দিকে -ও দিকে হেলতেই হবে। সেই তার জীবনের লক্ষণ, তার মনুষ্যত্বের চিহ্ন, তার জড়ত্বের প্রতিবাদ। এই দ্বিধা, এই দুর্বলতা যার নেই তার মন নিতান্ত সংকীর্ণ এবং কঠিন এবং জীবনবিহীন। যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি এবং যার প্রতি আমরা সর্বদাই কটুভাষা প্রয়োগ করি সেই আমাদের জীবনের গতিশক্তি—সেই আমাদের নানা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের মধ্যে দিয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত করে তুলছে। নদী যদি প্রতি পদে বলে 'কই সমুদ্র কোথায়, এ যে মরুভূমি, ঐ যে অরণ্য, ঐ যে বালির চড়া, আমাকে যে শক্তি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সে বুঝি আমাকে ভুলিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে'—তা হলে তার যে রকম ভ্রম হয়, প্রবৃত্তির উপরে একান্ত অবিশ্বাস করলে আমাদেরও কতকটা সেই রকম ভ্রম হয়।

আমরাও প্রতিদিন বিচিত্র সংশয়ের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছি, আমাদের শেষ আমরা দেখতে পাচ্ছি নে, কিন্তু যিনি আমাদের অনন্ত জীবনের মধ্যে প্রবৃত্তি-নামক প্রচণ্ড গতিশক্তি দিয়েছেন তিনিই জানেন তার দ্বারা আমাদের কী রকম করে চালনা করবেন। আমাদের সর্বদা এই একটা মস্ত ভুল হয় যে, আমাদের প্রবৃত্তি আমাদের যেখেনে নিয়ে এসেছে সেইখানেই বুঝি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে— আমরা তখন জানতে পারি নে সে আমাদের তার মধ্যে থেকে টেনে তুলবে। নদীকে যে শক্তি মরুভূমির মধ্যে নিয়ে আসে সেই শক্তিই সমুদ্রের মধ্যে নিয়ে যায়। ভ্রমের মধ্যে যে ফেলে ভ্রম থেকে সেই টেনে নিয়ে যায়। এই রকম করেই আমরা চলেছি। যার এই প্রবৃত্তি অর্থাৎ জীবনী শক্তির প্রাবল্য নেই, যার মনের রহস্যময় বিচিত্র বিকাশ নেই, সে সুখী হতে পারে, সাধু হতে পারে এবং তার সেই সংকীর্ণতাকে লোকে মনের জোর বলতে পারে, কিন্তু অনন্ত জীবনের পাথেয় তার বেশি নেই। আমি এই যে...

কলকাতা। ১৮৯০

৯

কালীগ্রাম
৫ মাঘ ১৮৯১

বেশ কুঁড়েমি করবার মতো বেলাটা। কেউ তাড়া দেবার লোক নেই, তা ছাড়া প্রজা এবং কাজের ভিড় এখনো চতুর্দিকে ছেঁকে ধরে নি। সব-সুদ্ধ খুব ঢিলে-ঢিলে একলা-একলা কী-এক রকম মনে হচ্ছে। যেন পৃথিবীতে অত্যাবশ্যক কাজ বলে একটা কিছুই নেই, এমন-কি, নাইলেও চলে না-নাইলেও চলে, এবং ঠিক-সময়-মত খাওয়াটা কলকাতার লোকের মধ্যে প্রচলিত একটা বহুদিনের কুসংস্কার বলে মনে হয়। এখানকার চতুর্দিকের ভাবগতিকও সেই রকম। একটা ছোট্ট নদী আছে বটে, কিন্তু তাতে কানাকড়ির স্রোত নেই। সে যেন আপন শৈবালদামের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে অঙ্গ বিস্তার করে দিয়ে পড়ে পড়ে ভাবছে যে, যদি না চললেও চলে তবে আর চলবার দরকার কী? জলের মাঝে মাঝে যে লম্বা ঘাস এবং জলজ উদ্ভিদ জন্মেছে, জেলেরা জাল ফেলতে না এলে সেগুলো সমস্ত দিনের মধ্যে একটু নাড়া পায় না। পাঁচটা-ছটা বড়ো বড়ো নৌকো সারি সারি বাঁধা আছে, তার মধ্যে একটার ছাতের উপর একজন মাঝি আপাদমস্তক কাপড়ে মুড়ে রোদ্দুরে নিদ্রা দিচ্ছে— আর-একটার উপর একজন বসে বসে দড়ি পাকাচ্ছে এবং রোদ পোহাচ্ছে, দাঁড়ের কাছে একজন আধ-বৃদ্ধ লোক অনাবৃত গাত্রে বসে অকারণে আমাদের বোটের দিকে চেয়ে আছে। ডাঙার উপরে নানান রকমের নানান লোক অত্যন্ত মৃদুমন্দ অলস চালে কেন যে আসছে, কেন যে যাচ্ছে, কেন যে বুকের মধ্যে নিজের দুটো হাঁটুকে আলিঙ্গন করে ধরে উবু হয়ে বসে আছে, কেন যে অবাক হয়ে বিশেষ কোনো-কিছুর দিকে না তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার কোনো অর্থ পাওয়া যায় না। কেবল গোটাকতক পাতিহাঁসের ওরই মধ্যে একটু ব্যস্ত ভাব দেখা যাচ্ছে— তারা ভারী কলরব করছে এবং ক্রমাগতই উৎসাহ-সহকারে জলের মধ্যে মাথা ডুবোচ্ছে

এবং তৎক্ষণাৎ মাথা তুলে নিয়ে সবলে ঝাড়া দিচ্ছে। ঠিক মনে হচ্ছে যেন তারা জলের নিচেকার নিগূঢ় রহস্য আবিষ্কার করবার জন্যে প্রতিক্ষণেই গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং তার পরে সবেগে মাথা নেড়ে বলছে 'কিচ্ছুই না—কিচ্ছুই না!' এখানকার দিনগুলো এই রকম বারো ঘণ্টা পড়ে পড়ে কেবল রোদ পোহায়, এবং অবশিষ্ট বারো ঘণ্টা খুব গভীর অন্ধকার মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নিদ্রা দেয়। এখেনে সমস্ত ক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে কেবল নিজের মনের ভাবগুলোকে বসে বসে দোলা দিতে ইচ্ছে করে, তার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু গুন্ গুন্ করে গান গাওয়া যায়, মাঝে মাঝে বা ঘুমে চোখ একটু অলস হয়ে আসে। মা যেমন করে শীত-কালের সারাবেলা রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ছেলে কোলে করে গুন্ গুন্ স্বরে দোলা দেয়, সেই রকম।...

কলকাতা। ১৮৯১

১০

Patisahr Katchari
via Atrai
৬ মাঘ, রবিবার

আমার বোট কাছারির কাছ থেকে অনেক দূরে এনে একটি নিরিবিলি জায়গায় বেঁধেছি। এ দেশে গোলমাল কোথাও নেই, ইচ্ছে করলে পাওয়া যায় না, কেবল হয়তো অন্যান্য বিবিধ জিনিসের সঙ্গে হাটে পাওয়া যেতে পারে। আমি এখন যেখানে এসেছি এ জায়গায় অধিকন্তু মানুষের মুখ দেখা যায় না। চারি দিকে কেবল মাঠ ধু ধু করছে—মাঠের শস্য কেটে নিয়ে গেছে, কেবল কাটা ধানের অবশিষ্ট হলদে বিচালিতে সমস্ত মাঠ আচ্ছন্ন। সমস্ত দিনের পর সূর্যাস্তের সময় এই মাঠে কাল একবার বেড়াতে বেরিয়েছিলুম।...সূর্য ক্রমেই রক্তবর্ণ হয়ে একেবারে পৃথিবীর শেষ রেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গেল। চারি দিক কী যে সুন্দর হয়ে উঠল সে আর কী বলব! বহু দূরে একেবারে দিগন্তের শেষ প্রান্তে একটু গাছপালার ঘের দেওয়া ছিল, সেখানটা এমন মায়াময় হয়ে উঠল—নীলেতে লালেতে মিশে এমন আবছায়া হয়ে এল—মনে হল ঐখেনে যেন সন্ধ্যার বাড়ি, ঐখেনে গিয়ে সে আপনার রাঙা আঁচলটি শিথিল ভাবে এলিয়ে দেয়, আপনার সন্ধ্যাতারাটি যত্ন করে জ্বালিয়ে তোলে, আপন নিভৃত নির্জনতার মধ্যে সিঁদুর পরে বধূর মতো কার প্রতীক্ষায় বসে থাকে, এবং বসে বসে পা দুটি মেলে তারার মালা গাঁথে এবং গুন্ গুন্ স্বরে স্বপ্ন রচনা করে। সমস্ত অপার মাঠের উপর একটি ছায়া পড়েছে—একটি কোমল বিষাদ—ঠিক অশ্রুজল নয়—একটি নির্নিমেষ চোখের বড়ো বড়ো পল্লবের নিচে গভীর ছল্‌ছলে ভাবের মতো। এমন মনে করা যেতে পারে—মা পৃথিবী লোকালয়ের মধ্যে আপন ছেলেপিলে এবং কোলাহল এবং ঘরকন্নার কাজ নিয়ে থাকে—যেখানে একটু ফাঁকা, একটু নিস্তব্ধতা, একটু খোলা আকাশ, সেই-খানেই তার বিশাল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ঔদাস্য এবং বিষাদ ফুটে ওঠে; সেইখানেই তার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যায়। ভারতবর্ষের যেমন বাধাহীন পরিষ্কার

আকাশ, বহুদূরবিস্তৃত সমতলভূমি আছে, এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এইজন্যে আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম ঔদাস্য আবিষ্কার করতে পেরেছে। এইজন্যে আমাদের পূরবীতে কিম্বা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হাহাধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারও ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর একটা অংশ আছে যেটা কর্মপটু, স্নেহশীল, সীমাবদ্ধ, তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায় নি। পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মিড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে একটা টান পড়ে। কাল সন্ধের সময় নির্জন মাঠের মধ্যে পূরবী বাজছিল, পাঁচ ছ ক্রোশের মধ্যে কেবল আমি একটি প্রাণী বেড়াচ্ছিলুম, এবং আর একটি প্রাণী বোটের কাছে পাগড়ি বেঁধে লাঠি হাতে অত্যন্ত সংযত ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার বাঁ পাশে ছোট্ট নদীটি দুই ধারের উঁচু পাড়ের মধ্যে এঁকে বেঁকে খুব অল্প দূরেই দৃষ্টিপথের বার হয়ে গেছে, জলে ঢেউয়ের রেখামাত্র ছিল না, কেবল সন্ধ্যার আভা অত্যন্ত মুমূর্ষু হাসির মতো খানিক ক্ষণের জন্যে লেগে ছিল। যেমন প্রকাণ্ড মাঠ তেমনি প্রকাণ্ড নিস্তব্ধতা। কেবল এক রকম পাখি আছে, তারা মাটিতে বাসা করে থাকে---সেই পাখি যত অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল তত আমাকে তার নিরালা বাসার কাছে ক্রমিক আনাগোনা করতে দেখে ব্যাকুল সন্দেহের স্বরে টী টী করে ডাকতে লাগল। ক্রমে এখনকার কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলো ঈষৎ ফুটে উঠল---বরাবর নদীর ধারে ধারে মাঠের প্রান্ত দিয়ে একটা সংকীর্ণ পথচিহ্ন চলে গেছে, সেইখানে নতশিরে চলতে চলতে ভাবছিলুম।

কলকাতা। ১৮৯১

১১

Patisahr Katchari
via Atrai
৭ মাঘ, সোমবার

ছোটো নদীটি ঈষৎ বেঁকে এইখানে একটুখানি কোণের মতো, একটু কোলের মতো তৈরি করেছে— দুই ধারের উঁচু পাড়ের মধ্যে সেই কোলের কোণটুকুতে বেশ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকি, একটু দূর থেকে আমাদের আর দেখা যায় না— নৌকাওয়ালারা উত্তর দিক থেকে গুণ টেনে টেনে আসে, হঠাৎ একটা বাঁক ফিরেই এই জনহীন মাঠের ধারে অকারণে একটা মস্ত বোট বাঁধা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়।— 'হাঁ গা, কাদের বজরা গা?' 'জমিদার বাবুর।' 'এখানে কেন? কাছারির সামনে কেন বাঁধ নি?' 'হাওয়া খেতে এসেছেন।'—এসেছি হাওয়ার চেয়ে আরও ঢের বেশি কঠিন জিনিসের জন্যে। যা হোক, এ রকম প্রশ্নোত্তর প্রায় মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়। এইমাত্র খাওয়া শেষ করে বসেছি— এখন বেলা দেড়টা। বোট খুলে দিয়েছে, আস্তে আস্তে কাছারির দিকে চলেছে। বেশ একটু বাতাস দিচ্ছে। তেমন ঠাণ্ডা নয়— দুপুরবেলার তাতে অল্প গরম হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ঘন শৈবালের মধ্যে দিয়ে যেতে খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে। সেই শৈবালের উপরে অনেকগুলো ছোটো ছোটো

কচ্ছপ আকাশের দিকে সমস্ত গলা বাড়িয়ে দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে। অনেক দূরে দূরে একটা-একটা ছোটো-ছোটো গ্রাম আসছে। গুটিকতক খোড়ো ঘর, কতকগুলি চাল-শূন্য মাটির দেয়াল, দুটো-একটা খড়ের স্তূপ, কুলগাছ আমগাছ বটগাছ এবং বাঁশের ঝাড়, গোটা-তিনেক ছাগল চরছে, গোটা-কতক উলঙ্গ ছেলে মেয়ে— নদী পর্যন্ত একটি গড়ানে কাঁচা ঘাট, সেখানে কেউ কাপড় কাচছে, কেউ নাইছে, কেউ বাসন মাজছে; কোনো কোনো লজ্জাশীলা বধূ দুই আঙুলে ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করে ধরে কলসী কাঁখে জমিদার বাবুকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করছে, তার হাঁটুর কাছে আঁচল ধরে একটি সদ্যস্নাত তৈলচিক্কণ বিবস্ত্র শিশুও একদৃষ্টে বর্তমান পত্রলেখক সম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্তি করছে— তীরে কতকগুলো নৌকো বাঁধা এবং একটা পরিত্যক্ত প্রাচীন জেলেডিঙি অর্ধনিমগ্ন অবস্থায় পুনরুদ্ধারের প্রতীক্ষা করছে। তার পরে আবার অনেকটা দূর শস্যশূন্য মাঠ— মাঝে মাঝে কেবল দুই-একজন রাখালশিশুকে দেখতে পাওয়া যায়, এবং দুটো-একটা গোরু নদীর ঢালু তটের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এসে সরস তৃণ অন্বেষণ করছে দেখা যায়। এখানকার দুপুর-বেলার মতো এমন নির্জনতা নিস্তব্ধতা আর কোথাও নেই।

কলকাতা। ১৮৯১

১২

কালীগ্রাম
। জানুয়ারি ১৮৯১।

আমি যখন তোকে চিঠি লিখতে শুরু করেছি তখন এখানকার একজন আমলা তার দারিদ্র্যদুঃখ বেতনবৃদ্ধি এবং দারপরিগ্রহের আবশ্যকতা নিয়ে ভারী বক্‌ বক্‌ করছিল— সে বকে যাচ্ছিল আর আমি লিখে যাচ্ছিলুম, শেষে এক জায়গায় থেমে তাকে সংক্ষেপে এইটুকু বুঝিয়ে দিলুম যে, বুদ্ধিমান লোক যখন কোনো-একটা প্রার্থনা পূরণ করে তখন সেটা সংগত বলেই করে, একবারের জায়গায় পাঁচবার বলা হল বলে করে না। ভাবলুম এমন একটা সুন্দর জ্ঞানগর্ভ কথার পর সে লোকটা একেবারে নিরুত্তর হয়ে থাকবে, কিন্তু দেখলুম ফলে তার বিপরীত হয়ে দাঁড়ালো। উল্টে সে আমাকে প্রশ্ন করলে, বাপমায়ের কাছে ছেলে যদি সকল কথা না বলবে তবে কার কাছে গিয়ে বলবে? আমি উপস্থিতমত তার কোনো সদুত্তর দিতে পারলুম না। পুনশ্চ সেও বকে যেতে লাগল, আমিও লিখে যেতে লাগলুম। কোথাও কিছু নেই, খামকা বাপ-মা হয়ে বসার বিষম ল্যাঠা।— কাল যখন কাছারি করছি, গুটি পাঁচ ছেলে হঠাৎ অত্যন্ত সংযতভাবে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে— কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে না করতে একেবারে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় আরম্ভ করে দিলে, 'পিতঃ, অভাগ্য সন্তানগণের সৌভাগ্যবশতঃ জগদীশ্বরের কৃপায় হুজুরের পুনর্বার এতদ্দেশে শুভাগমন হইয়াছে।' এমনি করে আধ-ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করে গেল; মাঝে মাঝে মুখস্থ বক্তৃতা ভুলে যাচ্ছিল, আবার আকাশের দিকে চেয়ে সংশোধন করে নিচ্ছিল। বিষয়টা হচ্ছে তাদের স্কুলে টুল এবং বেঞ্চির অপ্রতুল হয়েছে— সেই কাষ্ঠাসন-অভাবে 'আমরাই বা কোথায় উপবেশন করি,

আমাদের পূজনীয় শিক্ষক মহাশয়ই বা কোথায় উপবেশন করেন, এবং পরিদর্শক মহাশয় উপস্থিত হইলে তাঁহাকেই বা কোথায় আসন দান করা যায়!' ছোট্ট ছেলের মুখে হঠাৎ এই অনর্গল বক্তৃতা শুনে আমার এমনি হাসি পাচ্ছিল! বিশেষতঃ এই জমিদারি কাছারিতে, যেখানে অশিক্ষিত চাষারা নিতান্ত গ্রাম্যভাষায় আপনাদের যথার্থ দারিদ্র্যদুঃখ জানায়— যেখানে অতিবৃষ্টি দুর্ভিক্ষে গোরু বাছুর হাল লাঙল বিক্রি করেও উদরান্নের অনটনের কথা শোনা যাচ্ছে, যেখানে 'অহরহ' শব্দের পরিবর্তে 'রহরহ', 'অতিক্রমের' স্থলে 'অতিক্রয়' ব্যবহার, সেখানে টুল বেঞ্চির অভাবে সংস্কৃত বক্তৃতা কানে এমনি অদ্ভুত শোনায়। অন্যান্য আমলা এবং প্রজারা এই ছোকরার ভাষার প্রতি এতাদৃশ দখল দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল— তারা মনে মনে আক্ষেপ করছিল, 'বাপ-মা'রা আমাদের যত্ন করে লেখাপড়া শেখায় নি, নইলে আমরাও জমিদারের সামনে দাঁড়িয়ে এই রকম শুদ্ধ ভাষায় নিবেদন করতে পারতুম।' আমি শুনতে পেলুম একজন আর-একজনকে ঠেলে ঈষৎ বিদ্বেষের ভাবে বলছে, 'একে কে শিখিয়ে দিয়েছে।' আমি তার বক্তৃতা শেষ না হতেই তাকে থামিয়ে বললুম, 'আচ্ছা, তোমাদের টুল-বেঞ্চির বন্দোবস্ত করে দেব।' তাতেও সে ছোকরাটি দমল না। সে যেখানে বক্তৃতা ভঙ্গ করেছিল সেইখান থেকে আবার আরম্ভ করলে— যদিও আর আবশ্যক ছিল না, কিন্তু শেষ কথাটি পর্যন্ত চুকিয়ে প্রণাম করে বাড়ি ফিরে গেল। বেচারা অনেক কষ্টে মুখস্থ করে এসেছিল; আমি তার টুল বেঞ্চি না দিলে সে ক্ষুণ্ণ হত না, কিন্তু তার বক্তৃতা কেড়ে নিলে বোধ হয় অসহ্য হত। সেই জন্যে যদিও আমার অনেক গুরুতর কাজ ছিল, তবু খুব গম্ভীর ভাবে আদ্যোপান্ত শুনে গেলুম। সমঝদার লোক যদি আর একটি কেউ উপস্থিত থাকত তা হলে বোধ হয় আমি ছুটে অন্য ঘরে গিয়ে হেসে আসতুম, কিন্তু জমিদারিটা আসলেই হাস্যরসপ্রিয়তা প্রকাশের জায়গাই নয়— এখানে কেবল গাম্ভীর্য এবং বিজ্ঞতা।

কলকাতা। ২২ জানুয়ারি ১৮৯১

১৩

কালীগ্রাম
। জানুয়ারি ১৮৯১।

...ঐ-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি— ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা-সুদ্ধ দু হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম? স্বর্গ আর কী দিত জানি নে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতা -ময়, এমন সকরুণ আশঙ্কা -ভরা, অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আদরের ধন কোথা থেকে দিত! আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই-সমস্ত দরিদ্র মর্ত্য হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা

তাদের রাখতে পারি নে, বাঁচাতে পারি নে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য তা সে করেছে। আমি এই পৃথিবীকে ভারী ভালোবাসি। এর মুখে ভারী একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে— যেন এর মনে মনে আছে, আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে। আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারি নে। জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি নে। এই জন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি— এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর বলেই।...

কলকাতা
২৪ জানুয়ারি ১৮৯১

১৪

সাজাদপুরের অনতিদূরে
১২ মাঘ। শনিবার

এখনো পথে আছি। ভোর থেকে আরম্ভ করে সন্ধে সাত-আটটা পর্যন্ত ক্রমাগতই ভেসে চলেছি। কেবলমাত্র গতির কেমন একটা আকর্ষণ আছে— দু ধারের তটভূমি অবিশ্রাম চোখের উপর দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে, সমস্ত দিন তাই চেয়ে আছি, কিছুতে তার থেকে চোখ ফেরাতে পারছি নে— পড়তে মন যায় না, লিখতে মন যায় না, কোনো-কিছু কাজ নেই, কেবল চুপ করে চেয়ে বসে আছি। কেবল যে দৃশ্যের বৈচিত্র্যের জন্যে তা নয়— হয়তো দু ধারে কিছুই নেই, কেবল তরুহীন তটের রেখামাত্র চলে গেছে— কিন্তু ক্রমাগতই চলছে এই হচ্ছে তার প্রধান আকর্ষণ। আমার নিজের কোনো চেষ্টা নেই, পরিশ্রম নেই, অথচ বাইরের একটা অশ্রান্ত গতি মনটাকে বেশ মৃদু প্রশান্ত ভাবে ব্যাপৃত করে রাখে। মনের পরিশ্রমও নেই, বিশ্রামও নেই, এই রকমের একটা ভাব। চৌকিতে বসে বসে অলস অন্যমনস্ক ভাবে পা-দোলানো যে রকম এও সেই রকম; শরীরটা মোটের উপর বিশ্রাম করছে, অথচ শরীরের যে অতিরিক্ত উদ্যমটুকু কোনো কালে স্থির থাকতে চায় না তাকেও একটা একঘেয়ে রকম কাজ দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হয়েছে।...আমাদের কালীগ্রামের সেই মুমূর্ষুর নাড়ীর মতো অতিক্ষীণস্রোত নদী কাল কোন্ কালে ছাড়িয়ে এসেছি। আমি মনে করতুম সে নদীর একেবারে স্রোত নেই, কিন্তু সেখানকার বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি, অত্যন্ত মৃদু একটুখানি স্রোত আছে— আজন্মকাল যারা তীরে বাস করে আসছে কেবল তারাই জানতে পারে। সেই নদী থেকে ক্রমে একটা স্রোতস্বিনী নদীতে এসে পড়া গেল। সেটা বেয়ে ক্রমে এমন এক জায়গায় এসে পড়লুম যেখানে ডাঙায় জলে একাকার হয়ে গেছে। নদী এবং তীর উভয়ের আকার প্রকারের ভেদ ক্রমশই ঘুচে গেছে, দুটি অল্প বয়সের ভাই বোনের মতো। তীর এবং জল মাথায় মাথায় সমান— একটুও পাড় নেই। ক্রমে নদীর সেই ছিপ্‌ছিপে আকারটুকু আর থাকে না— নানা দিকে নানা রকমে ভাগ হয়ে ক্রমে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই খানিকটা সবুজ ঘাস এই খানিকটা স্বচ্ছ জল, চতুর্দিকে যত দূর চেয়ে দেখি খানিকটা জল

খানিকটা ডাঙা। দেখে পৃথিবীর শিশুকাল মনে পড়ে— অসীম জলরাশির মধ্যে যখন স্থল সবে একটুখানি মাথা তুলেছে— জলস্থলের অধিকার নির্দিষ্ট হয়ে যায় নি। চার দিকে জেলেদের বাঁশ পোঁতা— জেলেদের জাল থেকে মাছ ছোঁ মেরে নেবার জন্যে চিল উড়ছে, পাঁকের উপরে নিরীহ বক দাঁড়িয়ে আছে— নানা রকমের জলচর পাখি— জলে শেওলা ভাসছে এবং তার এক রকম গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে— মাঝে মাঝে পাঁকের ক্ষেতের মধ্যে অযত্নসম্ভূত ধানের গাছ, স্থির জলের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে মশা উড়ছে।...ভোরের বেলা বোট ছেড়ে দিয়ে কাঁচিকাঠায় গিয়ে পড়া গেল। কাঁচিকাঠা ব্যাপারটা হচ্ছে একটি বারো-তেরো হাত সংকীর্ণ খালের মতো, ক্রমাগত এঁকে বেঁকে গেছে— সমস্ত বিলের জল তারই ভিতর দিয়ে প্রবল বেগে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে— এর মধ্যে আমাদের এই প্রকাণ্ড বোট নিয়ে বিষম বিপদ— জলের স্রোত বিদ্যুতের মতো বোটটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, দাঁড়িরা লাগি হাতে করে সামলাবার চেষ্টা করছে, পাছে ডাঙার উপর বোটটাকে আছড়ে ভেঙে ফেলে। এ দিকে হুহু করে বাদলার বাতাস দিচ্ছে— ঘন মেঘ করে রয়েছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে, শীতে সবাই কাঁপছে— এক-একবার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও বোটটা ডাঙায় ঠেকে মড়্‌মড়্‌ শব্দে একেবারে কাত হবার উপক্রম করছে— এমনিতর 'গেল গেল' শব্দ করতে করতে খোলা নদীতে এসে পড়লুম। শীতকালে মেঘাচ্ছন্ন ভিজে দিন ভারী বিশ্রী লাগে। সকালবেলাটা তাই নিতান্ত নির্জীবের মতো ছিলুম। বেলা দুটোর সময় রোদ উঠল। তার পর থেকে চমৎকার। খুব উঁচু পাড়— বরাবর দুই ধারে গাছপালা লোকালয়— এমন শান্তিময়, এমন সুন্দর, এমন নিভৃত— দুই ধারে স্নেহ সৌন্দর্য বিতরণ করে নদীটি বেঁকে বেঁকে চলে গেছে— আমাদের বাংলাদেশের একটি অপরিচিত অন্তঃপুরচারিণী নদী। কেবল স্নেহ এবং কোমলতা এবং মাধুর্যে পরিপূর্ণ। চাঞ্চল্য নেই, অথচ অবসরও নেই। গ্রামের যে মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসে, এবং জলের ধারে বসে বসে অতি যত্নে গামছা দিয়ে আপনার শরীরখানি মেজে তুলতে চায়— তাদের সঙ্গে এর যেন প্রতিদিন মনের কথা এবং ঘরকন্নার গল্প চলে।...

আজ সন্ধেবেলায় নদীর বাঁকের মুখে ভারী একটি নিরালা জায়গায় বোট লাগিয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, জলে একটিও নৌকো নেই— জ্যোৎস্না জলের উপর ঝিক্‌ ঝিক্‌ করছে— পরিষ্কার রাত্রি— নির্জন তীর— বহুদূরে ঘনবৃক্ষ-বেষ্টিত গ্রামটি সুষুপ্ত— কেবল ঝিঁঝি ডাকছে— আর কোনো শব্দ নেই।

কলকাতা
১৮৯১

১৫

সাজাদপুর
রবিবার, ২০ মাঘ। ১২৯৭।

সকালে উঠে অনেক ক্ষণ ধরে বসে বসে বিস্তর গড়িমসি করতে করতে সেই ডায়ারিটা লিখছিলুম— ঘণ্টা দুয়েক হল দেড়পাতা-খানেক লিখেছিলুম— এমতকালে বেলা দশটার সময় হঠাৎ রাজকার্য উপস্থিত হল— প্রধানমন্ত্রী এসে মৃদুস্বরে বললেন,

একবার রাজসভায় আসতে হচ্ছে। কী করা যায়— লক্ষ্মীর তলব শুনে সরস্বতীকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠতে হল। সেখানে ঘণ্টাখানেক দুরূহ রাজকার্য সম্পন্ন করে এইমাত্র আসছি। আমার মনে মনে হাসি পায়— আমার নিজের অপার গাম্ভীর্য এবং অতলস্পর্শ বুদ্ধিমানের চেহারা কল্পনা করে সমস্তটা একটা প্রহসন বলে মনে হয়। প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করে, এবং আমলারা বিনীত করযোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কী মস্ত লোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবনরক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আমি যে এই চৌকিটার উপরে বসে বসে ভান করছি যেন এই-সমস্ত মানুষের থেকে আমি একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্তাকর্তাবিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কী হতে পারে! অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখদুঃখকাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোটো ছোটো বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! এই-সমস্ত ছেলে-পিলে গোরুলাঙল-ঘরকন্না-ওয়ালা সরল-হৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কী ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না। সেই ভুলটি রক্ষে করবার জন্যে কত সরঞ্জাম রাখতে এবং কত আড়ম্বর করতে হয়। বোট থেকে কাছারি পর্যন্ত আমি হেঁটে আসবার প্রস্তাব করেছিলুম, নায়েব বিজ্ঞভাবে বললেন— কাজ নেই! কী জানি যদি ঐ ভুলে আঘাত লাগে! prestige মানে হচ্ছে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ভুল বিশ্বাস! আমাকে এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জানত, তা হলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত, সেই ভয়ে সর্বদা মুখোশ পরে থাকতে হয়। সাধারণ ইতর মানুষের মতো পদযুগল চালনা করে এই ইতর পৃথিবীর উপর দিয়ে চলি নে, বন্দুক ঘাড়ে বরকন্দাজ হুহুংকারে সম্মুখ থেকে সকলকে হাঁকিয়ে দিয়ে চলেছে— যেন আমার চেয়ে অগ্রবর্তী হওয়া লোকের পক্ষে একটা বেআদাব। কিন্তু ছদ্মবেশ করলেও মন থেকে বিশ্বাস দূর হয় না যে, আমাকে আমারই মতো দেখাচ্ছে— এবং আমি যেমন অভিনয় করছি ওরা তেমনি অভিনয়মাত্র করছে। ওরা বলছে, 'আঃ কাজ কী গোলমালে! নাহয় রাজাই সাজালে!' কেবল আমিই আমার আপনাকে বলছি, 'আছে তোমার বিদ্যেসাধ্যি জানা!'—

কলকাতা
৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১

১৬

সাজাদপুর
। ফেব্রুয়ারি ১৮৯১।

আমার সামনে নানা রকম গ্রাম্য দৃশ্য দেখতে পাই, সেগুলো আমার দেখতে বেশ লাগে। ঠিক আমার জানলার সম্মুখে, খালের ও পারে, একদল বেদে বাখারির উপর খানকতক দর্মা এবং কাপড় টাঙিয়ে দিয়ে তারই মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। গুটিতিনেক খুব ছোট্ট ছোট্ট ছাউনি মাত্র— তার মধ্যে মানুষের দাঁড়াবার জো নেই।

ঘরের বাইরেই তাদের সমস্ত গৃহকর্ম চলে— কেবল রাত্তিরে সকলে মিলে কোনো-প্রকারে জড়পুঁটুলি হয়ে সেই ঘরের মধ্যে ঘুমোতে যায়। বেদে জাতটাই এই রকম। কতকটা gipsyদের মতো। কোথাও বাড়ি ঘর নেই, কোনো জমিদারকে খাজনা দেয় না। একদল শুয়োর, গোটা দুয়েক কুকুর এবং কতকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। পুলিস সর্বদা এদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। আমাদের এখানে যারা আছে, আমি জানলায় দাঁড়িয়ে প্রায় তাদের কাজ-কর্ম দেখি। এদের দেখতে মন্দ নয়, হিন্দুস্থানি ধরনের। কালো বটে, কিন্তু বেশ শ্রী আছে; বেশ জোরালো সুডোল শরীর। মেয়েদেরও বেশ দেখতে। বেশ ছিপ্‌ছিপে লম্বা— আঁটসাঁট, অনেকটা ইংরেজ মেয়েদের মতো শরীরের স্বাধীন ভঙ্গী। অর্থাৎ, বেশ অসংকোচ চাল-চলন, নড়াচড়ার মধ্যে সহজ সরল দ্রুত তাল আছে— আমার তো ঠিক মনে হয় কালো ইংরেজের মেয়ে। পুরুষটা রান্না চড়িয়ে দিয়ে বসে বসে বাঁশ চিরে চিরে ধামা চাঙারি কুলো প্রভৃতি তৈরি করছে— মেয়েটা কোলের উপর একটি ছোট্ট আয়না নিয়ে অত্যন্ত সাবধানে যত্নে সিঁথেটি কেটে চুল আঁচড়াচ্ছে। কেশবিন্যাস সমাধা হলে পরে একটি গামছা ভিজিয়ে মুখটি বিশেষ যত্নের সঙ্গে দু-তিনবার করে মোছা হল, তার পরে আঁচল-টাঁচলগুলো একটু ইতস্তত টেনেটুনে সেরেসুরে নিয়ে বেশ ফিট্‌ফাট হয়ে পুরুষটার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসল; তার পরে একটু-আধটু কাজে হাত দিতে লাগল। দেখে আমার বেশ মজা মনে হয়। এই এরা, যারা নিতান্তই মাটির সন্তান, যারা নিতান্তই পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে লেগে আছে, এদের মধ্যেও সৌন্দর্যের আকর্ষণ এবং পরস্পরের মনোরঞ্জনের চেষ্টা আছে। যেখানে-সেখানে জন্মাচ্ছে, পথে পথেই বেড়ে উঠছে, এবং যেখানে-সেখানে মরছে— এদের ঠিক অবস্থাটা, ঠিক মনের ভাবটা ভারী জানতে ইচ্ছে করে। দিনরাত খোলা আকাশে, খোলা বাতাসে, অনাবৃত মৃত্তিকার উপরে এ এক-রকম নতুন রকমের জীবন; অথচ এরই মধ্যে কাজকর্ম ভালোবাসা ছেলেপিলে ঘরকর্না সমস্তই আছে। কেউ যে এক দণ্ড কুঁড়ে হয়ে বসে আছে তা দেখলুম না— একটা-না-একটা কাজে আছেই। যখন হাতের কাজ ফুরলো তখন থপ্‌ করে একজন মেয়ে আর একজন মেয়ের পিঠের কাছে বসে তার ঝুঁটি খুলে দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে উকুন বাছতে আরম্ভ করে দিলে এবং বোধ করি সেই সঙ্গে ঐ ছোটো তিনটে দর্মা-ছাউনির ঘরকন্না সম্বন্ধে বক্‌ বক্‌ করে গল্প জুড়ে দিলে, সেটা আমি এত দূর থেকে ঠিক নিশ্চিত বলতে পারি নে, তবে অনেকটা অনুমান করা যেতে পারে। আজ সকালবেলায় এই নিশ্চিন্ত বেদের পরিবারের মধ্যে একটা বিষম অশান্তি এসে জুটেছিল। তখন বেলা সাড়ে-আটটা নটা হবে— রাত্রে শোবার কাঁথা এবং ছেঁড়া নেকড়াগুলো বের করে এনে দর্মার চালের উপর রোদ্দুরে মেলে দিয়েছে। শুয়োরগুলো বাচ্ছাকাচ্ছা-সমেত সকলে গায়ে গায়ে লাগাও হয়ে একটা গর্তর মতো করে তার মধ্যে মস্ত এক তাল কাদার মতো পড়ে ছিল— সমস্ত রাত শীতের পর সকাল বেলাকার রোদ্দুরে বেশ একটু আরাম বোধ করছিল— তাদেরই এক পরিবারভুক্ত কুকুর দুটো এসে ঘাড়ের উপর পড়ে ঘেউ ঘেউ করে তাদের উঠিয়ে দিলে। বিরক্তির স্বর প্রকাশ করে তারা প্রাতঃকালের ছোটো-হাজরি -অন্বেষণে চতুর্দিকে চলে গেল। আমি আমার ডায়ারি লিখছি এবং মাঝে মাঝে সম্মুখের পথের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে দেখছি— এমন সময় বিষম একটা হাঁক-ডাক শোনা গেল। আমি উঠে জানলার কাছে গিয়ে দেখলুম— বেদে-আশ্রমের সম্মুখে লোক জড়ো হয়েছে এবং ওরই মধ্যে একটু

ভদ্রগোছের একজন লাঠি আস্ফালন করে বিষম গালমন্দ দিচ্ছে—কর্তা বেদে দাঁড়িয়ে নিতান্ত ভীত কম্পিত ভাবে কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করছে। বুঝতে পারলুম কী-একটা সন্দেহের কারণ হয়েছে, তাই পুলিসের দারোগা এসে উপদ্রব বাধিয়ে দিয়েছে। মেয়েটা বসে বসে আপন-মনে বাখারি ছুলে যাচ্ছে, যেন সে একলা বসে আছে—এবং কোথাও কিছু গোলমাল নেই। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে পরমনির্ভীক চিত্তে দারোগার মুখের সামনে বারবার বাহু আন্দোলন করে উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলে। দেখতে দেখতে দারোগার তেজ প্রায় বারো আনা পরিমাণ কমে গেল—অত্যন্ত মৃদুভাবে দুটো একটা কথা বলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু একটুও অবসর পেলে না। যে ভাবে এসেছিল সে ভাব অনেকটা পরিবর্তন করে ধীরে ধীরে চলে যেতে হল—অনেকটা দূরে গিয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'আমি এই বলে গেলাম, তোমাদের এখান হৎকে যাবার লাগবে।' আমি ভাবলুম আমার বেদে-প্রতিবেশীরা এখনি বুঝি খুঁটি দর্মা তুলে পুঁটুলি বেঁধে ছানাপোনা নিয়ে শুয়োর তাড়িয়ে এখান থেকে প্রস্থান করবে। কিন্তু তার কোনো লক্ষণ নেই—এখনো তারা নিশ্চিন্ত ভাবে বসে বসে বাখারি চিরছে, রাঁধছে-বাড়ছে, উকুন বাচছে।

আমার দরবারেও দেখেছি যখন কোনো মেয়ের নালিশ থাকে, সে ঘোমটায় আচ্ছন্ন হয়ে আসে বটে, কিন্তু তারই ভিতর থেকে কাঁশির মতো যে গলাটি বের করে তার মধ্যে ভয় সংকোচ কিম্বা কাকুতি-মিনতির ভাব লেশমাত্র নেই। একেবারে পুরো আবদার এবং পরিষ্কার তর্ক। পষ্ট করে বলে, 'নায়েবমশায় আমার সুক্ষ্ম বেচার করে না!' তাকে উচিত-অনুচিত ন্যায়-অন্যায় কিছুই বুঝিয়ে উঠতে পারা যায় না; সে কেবলই বলে, 'আমি ব্যাধবা, আমার নাবালক ছাওয়াল।' তার আর কোনো উত্তর নেই। তার সঙ্গে তর্ক করব কি আমার হাসি পায়। সে আবার আধখানা মুখ ফিরিয়ে ঘোমটার মধ্যে থেকে আড়চোখে আড়চোখে আমার মুখের ভাব দেখে। দরবারের মধ্যে যেদিন একটা মেয়ে আসে সেদিন আসর সরগরম হয়ে ওঠে, পেয়াদার হাঁক-ডাক কমে যায়, অন্যান্য পুরুষ প্রার্থীদের নিজ নিজ নিবেদন জানাবার অবসর থাকে না।

যা হোক, আমার এই খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে নানা দৃশ্য দেখতে পাই। সবসুদ্ধ বেশ লাগে। কিন্তু এক-একটা দেখে ভারী মন বিগড়ে যায়। গাড়ির উপর অসম্ভব ভার চাপিয়ে যখন গোরুকে কাঠির বাড়ি খোঁচা দিতে থাকে তখন আমার নিতান্ত অসহ্য বোধ হয়। আজ সকালে দেখছিলুম একজন মেয়ে তার একটি ছোটো উলঙ্গ শীর্ণ কালো ছেলেকে এই খালের জলে নাওয়াতে এনেছে। আজ ভয়ংকর শীত পড়েছে—জলে দাঁড় করিয়ে যখন ছেলেটার গায়ে জল দিচ্ছে তখন সে করুণ স্বরে কাঁদছে আর কাঁপছে, ভয়ানক কাশিতে তার গলা খন্ খন্ করছে। মেয়েটা হঠাৎ তার গালে এমন একটা চড় মারলে যে আমি আমার ঘর থেকে তার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলুম।...ছেলেটা বেঁকে পড়ে হাঁটুর উপর হাত দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল, কাশিতে তার কান্না বেধে যাচ্ছিল। তার পরে ভিজে গায়ে সেই উলঙ্গ কম্পান্বিত ছেলের নড়া ধরে টেনে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে গেল। এই ঘটনাটা এমন নিদারুণ পৈশাচিক বলে বোধ হল! ছেলেটা নিতান্ত ছোটো, আমার খোকার বয়সী। এ রকম একটা দৃশ্য দেখলে হঠাৎ মানুষের যেন একটা idealএর উপর আঘাত লাগে, বিশ্বস্ত চিত্তে চলতে চলতে খুব একটা হুঁচোট লাগার মতো। ছোটো ছেলেরা কী ভয়ানক অসহায়! তাদের প্রতি অবিচার করলে তারা নিরুপায় কাতরতার সঙ্গে কেঁদে নিষ্ঠুর হৃদয়কে আরও বিরক্ত করে তোলে, ভালো করে

আপনার নালিশ জানাতেও পারে না। মেয়েটা শীতে সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে এসেছে আর ছেলেটার গায়ে এক টুকরো কাপড়ও নেই— তার উপরে কাশি, তার উপরে এই ডাকিনীর হাতের মার!

কলকাতা
৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১

১৭

সাদাজপুর

এখানকার পোস্ট্মাস্টার এক-একদিন সন্ধের সময় এসে আমার সঙ্গে এই রকম ডাকের চিঠি -যাতায়াত সম্বন্ধে নানা গল্প জুড়ে দেয়। আমাদের এই কুঠিবাড়ির এক তলাতেই পোস্ট্ আপিস— বেশ সুবিধে, চিঠি আসবামাত্রই পাওয়া যায়। পোস্ট্মাস্টারের গল্প শুনতে আমার বেশ লাগে। বিস্তর অসম্ভব কথা বেশ গম্ভীর ভাবে বলে যায়। কাল বলছিল, এ দেশের লোকের গঙ্গার উপর এমনি ভক্তি যে, এদের কোনো আত্মীয় মরে গেলে তার হাড় গুঁড়ো করে রেখে দেয়, কোনো কালে গঙ্গার জল খেয়েছে এমন লোকের যদি সাক্ষাৎ পায় তা হলে তাকে পানের সঙ্গে সেই হাড় গুঁড়ো খাইয়ে দেয় আর মনে করে তার আত্মীয়ের একটা অংশের গঙ্গা লাভ হল। আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'এটা বোধ হয় গল্প?' সে খুব গম্ভীর ভাবে চিন্তা করে স্বীকার করলে, 'হুজুর, তা হতে পারে।'

কলকাতা
১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১

১৮

শিলাইদহ
। ফেব্রুয়ারি ১৮৯১।

মৌলবী এবং আমলাগুলো গিয়ে, কাছারির পরপারের নির্জন চরে বোট লাগিয়ে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। দিনটা এবং চারিদিকটা এমনি সুন্দর ঠেকছে তোকে সে আর কী বলব। অনেক দিন পরে আবার এই বড়ো পৃথিবীটার সঙ্গে যেন দেখা-সাক্ষাৎ হল। সেও বললে, 'এই-যে!' আমিও বললুম, 'এই-যে!' তার পরে দুজনে পাশাপাশি বসে আছি— আর কোনো কথাবার্তা নেই, জল ছল্ ছল্ করছে এবং তার উপরে রোদ্দুর চিক্চিক্ করছে, বালির চর ধু ধু করছে, তার উপরে ছোটো ছোটো বনঝাউ উঠেছে। জলের শব্দ, দুপুর বেলাকার নিস্তব্ধতার ঝাঁ-ঝাঁ, এবং ঝাউঝোপ থেকে দুটো-একটা পাখির চিক্ চিক্ শব্দ, সবসুদ্ধ মিলে খুব একটা স্বপ্নময় ভাব।...খুব লিখে যেতে ইচ্ছে করছে— কিন্তু আর কিছু নয়, এই

জলের শব্দ, এই রোদ্‌দুরের দিন, এই বালির চর। মনে হচ্ছে তোকে রোজই ঘুরে ফিরে এই কথাই লিখতে হবে—কেননা, আমার যখন নেশার মতন হয় তখন আমি বারবার এক কথা নিয়েই বকি।...বড়ো বড়ো নদী কাটিয়ে আমাদের বোটটা একটা ছোটো নদীর মুখে প্রবেশ করেছে। দুই ধারে মেয়েরা স্নান করছে, কাপড় কাচছে, এবং ভিজে কাপড়ে এক-মাথা ঘোমটা দিয়ে জলের কলসী নিয়ে বাঁ হাত দুলিয়ে ঘরে চলেছে—ছেলেরা কাদা মেখে জল ছুঁড়ে মাতামাতি করছে, এবং একটা ছেলে বিনা সুরে গান গাচ্ছে 'একবার দাদা বলে ডাক্ রে লক্ষ্মণ!' উঁচু পাড়ের উপর দিয়ে অদূরবর্তী গ্রামের খড়ের চাল এবং বাঁশবনের ডগা দেখা যাচ্ছে। আজ মেঘ কেটে গিয়ে রোদ্‌দুর দেখা দিয়েছে। যে মেঘগুলো আকাশের প্রান্তভাগে অবশিষ্ট আছে সেগুলো সাদা তুলোর রাশের মতো দেখাচ্ছে। বাতাস ঈষৎ গরম হয়ে বচ্ছে। ছোটো নদীতে বড়ো বেশি নৌকো নেই—দুটো একটা ছোটো ডিঙি, শুকনো গাছের ডাল এবং কাঠকুটো বোঝাই নিয়ে শ্রান্তভাবে ছপ্ ছপ্ দাঁড় ফেলে চলেছে —ডাঙায় বাঁশের উপর জেলেদের জাল শুকোচ্ছে—পৃথিবীর সকালবেলাকার কাজকর্ম খানিক ক্ষণের জন্যে বন্ধ হয়ে আছে—

কলকাতা
১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১

১৯

চুহালি। জলপথে
১৬ জুন ১৮৯১

এখন পাল তুলে দিয়ে যমুনার মধ্যে দিয়ে চলেছি। আমার বাঁ ধারে মাঠে গোরু চরছে, দক্ষিণ ধারে একেবারে কূল দেখা যাচ্ছে না। নদীর তীব্র স্রোতে তীর থেকে ক্রমাগতই ঝুপ্ ঝুপ্ করে মাটি খসে পড়ছে। আশ্চর্য এই, এত বড়ো প্রকাণ্ড এই নদীটার মধ্যে আমাদের বোট ছাড়া আর দ্বিতীয় একটি নৌকো দেখা যাচ্ছে না—চারি দিকে জলরাশি ক্রমাগতই ছল্ ছল্ খল্ খল্ শব্দ করছে, আর বাতাসের হুহু শব্দ শোনা যাচ্ছে।...কাল সন্ধের সময় একটা চরের উপর বোট লাগিয়েছিলুম —নদীটি ছোট্ট, যমুনার একটি শাখা, এক পারে বহু দূর পর্যন্ত সাদা বালি ধু ধু করছে, জনমানবের সম্পর্ক নেই—আর এক পারে সবুজ শস্যক্ষেত্র এবং বহু দূরে একটি গ্রাম। তোকে আর কতবার বলব—এই নদীর উপরে, মাঠের উপরে, গ্রামের উপরে সন্ধেটা কী চমৎকার, কী প্রকাণ্ড, কী প্রশান্ত, কী অগাধ সে কেবল স্তব্ধ হয়ে অনুভব করা যায়, কিন্তু ব্যক্ত করতে গেলেই চঞ্চল হয়ে উঠতে হয়। ক্রমে যখন অন্ধকারে সমস্ত অস্পষ্ট হয়ে এল, কেবল জলের রেখা এবং তটের রেখায় একটা প্রভেদ দেখা যাচ্ছিল, এবং গাছপালা কুটির সমস্ত একাকার হয়ে একটা ঝাপসা জগৎ চোখের সামনে বিস্তৃত পড়ে ছিল তখন ঠিক মনে হচ্ছিল এ-সমস্ত যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার জগৎ—যখন এই বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্পূর্ণ গঠিত হয়ে ওঠে নি, অল্পদিন হল সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, প্রদোষের অন্ধকারে এবং একটি ভীতি-বিস্ময়পূর্ণ ছম্-ছম্-নিস্তব্ধতায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন—যখন সাত সমুদ্র তেরো নদীর

পারে মায়াপুরে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, যখন রাজপুত্র এবং পাত্তরের পুত্র তেপান্তরের মাঠে একটা অসম্ভব উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ যেন তখনকার সেই অতি সুদূরবর্তী অর্ধ-অচেতনায় মোহাচ্ছন্ন মায়ামিশ্রিত বিস্মৃত জগতের একটি নিস্তব্ধ নদীতীর—এমন মনে করা যেতেও পারে আমি সেই রাজপুত্র একটা অসম্ভবের প্রত্যাশায় সন্ধ্যারাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি—এই ছোটো নদীটি সেই তেরো নদীর মধ্যে একটা নদী, এখনো সাত সমুদ্র বাকি আছে—এখনো অনেক দূর, অনেক ঘটনা, অনেক অন্বেষণ বাকি—এখনো কত অজ্ঞাত নদীতীরে কত অপরিচিত সমুদ্রসীমায় কত ক্ষীণ চন্দ্রালোকিত অনাগত রাত্রি অপেক্ষা করে আছে—তার পরে হয়তো অনেক ভ্রমণ, অনেক রোদন, অনেক বেদনের পর হঠাৎ একদিন আমার কথাটি ফুরোলো, নটে শাকটি মুড়োলো—হঠাৎ মনে হবে এতক্ষণ একটা গল্প চলছিল, সেই রূপকথার সুখ দুঃখ নিয়ে কখনো হাসছিলুম কখনো কাঁদছিলুম, এখন গল্প ফুরিয়েছে, এখন অনেক রাত্রি, এখন ছোটো ছেলের ঘুমোবার সময়।

কলকাতা
১৮৯১

২০

চুহালি
১৯ জুন ১৮৯১

কাল পনেরো মিনিট বাইরে বসতে না বসতে পশ্চিমে ভয়ানক মেঘ করে এল—খুব কালো গাঢ় আলুথালু রকমের মেঘ, তারই মাঝে মাঝে চোরা আলো পড়ে রাঙা হয়ে উঠেছে—এক-একটা ঝড়ের ছবিতে যেমন দেখা যায় ঠিক সেই রকমের। দুটো একটা নৌকো তাড়াতাড়ি যমুনা থেকে এই ছোটো নদীর মধ্যে প্রবেশ করে দাঁড়িদড়া নোঙর দিয়ে মাটি আঁকড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল—যারা মাঠে শস্য কাটতে এসেছিল তারা মাথায় এক-এক বোঝা শস্য নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে—গোরুও ছুটেছে, তার পিছনে পিছনে বাছুর লেজ নেড়ে নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়োবার চেষ্টা করছে। খানিক বাদে একটা আক্রোশের গর্জন শোনা গেল—কতকগুলো ছিন্নভিন্ন মেঘ ভগ্নদূতের মতো সুদূর পশ্চিম থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল—তার পরে বিদ্যুৎবজ্র ঝড়বৃষ্টি সমস্ত এক সঙ্গে এসে পড়ে খুব একটা তুর্কিনাচন নাচতে আরম্ভ করে দিলে। বাঁশগাছগুলো হাউ হাউ শব্দে একবার পূর্বে একবার পশ্চিমে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল, ঝড় যেন সোঁ সোঁ করে সাপুড়েদের মতো বাঁশি বাজাতে লাগল। আর জলের ঢেউগুলো তিন লক্ষ সাপের মতো ফণা তুলে তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করে দিলে। কালকের সে যে কান্ড সে আর কী বলব। বজ্রের যে শব্দ সে আর থামে না—আকাশের কোন্‌খানে যেন একটা আস্ত জগৎ ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। বোটের খোলা জানলার উপর মুখ রেখে প্রকৃতির সেই রুদ্রতালে আমিও বসে বসে মনটাকে দোলা দিচ্ছিলুম। সমস্ত ভিতরটা যেন ছুটি-পাওয়া স্কুলের ছেলের মতো ঝাঁপিয়ে উঠেছিল। শেষকালে বৃষ্টির ছাঁটে যখন বেশ

একটু আর্দ্র হয়ে ওঠা গেল তখন জানলা এবং কবিত্ব বন্ধ করে খাঁচার পাখির মতো অন্ধকারে চুপচাপ বসে রইলুম।

কলকাতা

২১

জলপথে। সাজাদপুর
২০ জুন ১৮৯১

কাল তোদের টেলিগ্রামের উত্তর পেয়ে আমাদের সমস্ত কাজ সেরে সন্ধের সময় নৌকো ছেড়ে দিলুম। আকাশে মেঘ ছিল না, চাঁদ উঠেছিল, অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছিল— ঝুপ্ ঝুপ্ দাঁড় ফেলে স্রোতের মুখে ছোটো নদীটির মধ্যে ভেসে যাওয়া যাচ্ছিল। চারি দিক পরীস্থান বলে মনে হচ্ছিল। সে সময়ে অন্যান্য সমস্ত নৌকো ডাঙায় কাছি বেঁধে পাল গুটিয়ে চন্দ্রালোকে স্তব্ধ হয়ে নিদ্রা দিচ্ছিল। অবশেষে ছোটো নদীটা যেখানে যমুনার মধ্যে গিয়ে পড়েছে তারই কাছে একটা খুব নিরাপদ স্থানে গিয়ে নৌকো বাঁধলে। কিন্তু নিরাপদ স্থানের অনেক দোষ— হাওয়া পাওয়া যায় না, ঝুপ্সির ভিতরে, অন্যান্য নৌকোর কাছে, জঙ্গলের গন্ধ ইত্যাদি। আমি মাঝিকে বললুম, 'এ পারে হাওয়া পাওয়া যাবে না, ও পারে চল্।' ও পারে উঁচু পাড় নেই— জলে স্থলে সমান, এমন-কি ধানের ক্ষেতের উপর এক-হাঁটু জল উঠেছে। রাজাজ্ঞায় মাঝি সেইখানেই নৌকো নিয়ে বাঁধলে। তখন আমাদের পিছন দিকের আকাশে একটু বিদ্যুৎ চিক্‌মিক্ করতে আরম্ভ করেছে। আমি বিছানায় ঢুকে জানলার কাছে মুখ রেখে ক্ষেতের দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় রব উঠল— ঝড় আসছে। 'কাছি ফেল্' 'নোঙর ফেল্' 'এ কর্' 'সে কর্' করতে করতে এক প্রলয় ঝড় ছুটে এল। মাঝি থেকে থেকে বলতে লাগল, 'ভয় কোরো না ভাই, আল্লার নাম করো— আল্লা মালেক।' থেকে থেকে সকলে 'আল্লা' 'আল্লা' করতে লাগল। আমাদের বোটের দুই পাশের পর্দা বাতাসে আছাড় খেয়ে খেয়ে শব্দ করতে লাগল, আমাদের বোটটা যেন একটা শিকলি-বাঁধা পাখির মতো পাখা ঝাপটে ঝট্‌পট্ ঝট্‌পট্ করছিল— ঝড়টা থেকে থেকে চীঁহি চীঁহি শব্দ করে একটা বিপর্যয় চিলের মতো হঠাৎ এসে পড়ে বোটের ঝুঁটি ধরে ছোঁ মেরে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়, বোটটা অমনি সশব্দে ধড়্‌ফড়্ করে ওঠে। অনেক ক্ষণ বাদে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে ঝড় থেমে গেল। আমি হাওয়া খেতে চেয়েছিলুম— হাওয়াটা কিছু বেশি খাইয়ে দিলে, একেবারে আশাতিরিক্ত। যেন কে ঠাট্টা করে বলে যাচ্ছিল, 'এইবার পেট ভরে হাওয়া খেয়ে নাও, তার পরে সাধ মিটলে কিঞ্চিৎ জল খাওয়াব— তাতে এমনি পেট ভরবে যে ভবিষ্যতে আর কিছু খেতে হবে না।' আমরা কিনা প্রকৃতির নাতি-সম্পর্ক, তাই তিনি মধ্যে মধ্যে এই রকম একটু-আধটু তামাশা করে থাকেন। আমি তো পূর্বেই বলেছি জীবনটা একটা গম্ভীর বিদ্রূপ, এর মজাটা বোঝা একটু শক্ত— কারণ, যাকে নিয়ে মজা করা হয়, মজার রসটা সে তেমন গ্রহণ করতে পারে না। এই মনে কর্, দুপুর রাত্রে খাটে শুয়ে আছি, হঠাৎ পৃথিবীটা ধরে এমনি নাড়া দিলে যে কে কোথায় পালাবে পথ পায় না। মতলবটা

খুব নতুন রকমের এবং মজায় তার আর সন্দেহ নেই— খুব একটা বড়ো-গোছ পয়লা এপ্রেলের রহস্যের উপযোগী। বড়ো বড়ো সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের অর্ধেক রাত্রে ঊর্ধ্বশ্বাসে অসম্বৃত অবস্থায় বিছানার বাইরে দৌড় করানো কি কম মজা! এবং দুটো-একটা সদ্যোনিদ্রোত্থিত হতবুদ্ধি নিরীহ লোকের মাথার উপরে বাড়ির আস্ত ছাদটা ভেঙে আনা কি কম ঠাট্টা! হতভাগ্য লোকটা যেদিন ব্যাঙ্কে চেক লিখে রাজমিস্ত্রির বিল শোধ করছিল, রহস্যপ্রিয়া প্রকৃতি সেই দিন বসে বসে কত হেসেছিল!

কলকাতা
১৮৯১

২২

সাজাদপুর
২২ জুন ১৮৯১

আজকাল আমার এখানে এমন চমৎকার জ্যোৎস্নারাত্রি হয় সে আর কী বলব। অবিশ্যি, তোদের ওখানেও যে জ্যোৎস্নারাত্রি হয় না তা বলা আমার অভিপ্রায় নয়— স্বীকার করতেই হবে তোদের সেখানে সেই ময়দানের উপর, সেই গির্জের চূড়ার উপর, সম্মুখের নিস্তব্ধ গাছপালার উপর, ধীরে ধীরে জ্যোৎস্না আপনার নীরব অধিকার বিস্তার করে। কিন্তু তোদের জ্যোৎস্না ছাড়াও অন্য পাঁচটা বস্তু আছে— তোদের হার্মনি এবং ডিস্‌কর্ড্ আছে, টেনিস আছে, মার্বলের টেবিল আছে, ড্রয়িংরুমে গান-বাজনার আড্ডা আছে— কিন্তু আমার এই নিস্তব্ধ রাত্রি ছাড়া আর কিছুই নেই। একলা বসে বসে আমি যে এর ভিতরে কী অনন্ত শান্তি এবং সৌন্দর্য দেখতে পাই সে আর ব্যক্ত করতে পারি নে। এক দল আছে তারা ছট্‌ফট্ করে 'জগতের সকল কথা জানতে পারছি নে কেন', আর এক দল ছট্‌ফটিয়ে মরে 'মনের সকল ভাব প্রকাশ করতে পারছি নে কেন'— মাঝের থেকে জগতের কথা জগতেই থেকে যায় এবং অন্তরের কথা অন্তরেই থাকে।...মাথাটা জানলার উপর রেখে দিই— বাতাস প্রকৃতির স্নেহহস্তের মতো আস্তে আস্তে আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জল ছল্ ছল্ শব্দ করে বয়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝিক্ ঝিক্ করতে থাকে এবং অনেক সময় 'জলে নয়ন আপনি ভেসে যায়'। অনেক সময় মনের আন্তরিক অভিমান, একটু স্নেহের স্বর শুনলেই অমনি অশ্রুজলে ফেটে পড়ে। এই অপরিতৃপ্ত জীবনের জন্যে প্রকৃতির উপর আমাদের যে আজন্মকালের অভিমান আছে, যখনি প্রকৃতি স্নেহমধুর হয়ে ওঠে তখনি সেই অভিমান অশ্রুজল হয়ে নিঃশব্দে ঝরে পড়তে থাকে। তখন প্রকৃতি আরো বেশি করে আদর করে এবং তার বুকের মধ্যে অধিকতর আবেগের সহিত মুখ লুকোই, এক প্রকার 'বিরাগ-ভরা বিবেকের' বিষণ্ণ শান্তি লাভ করা যায়। এই তো আমার সন্ধে।

কলকাতা
১৮৯১

২৩

সাজাদপুর
২৩ জুন ১৮৯১

আজকাল দুপুর বেলাটা বেশ লাগে বব্। রৌদ্রে চারি দিক বেশ নিঃঝুম হয়ে থাকে—মনটা ভারী উড়ু-উড়ু করে, বই হাতে নিয়ে আর পড়তে ইচ্ছে করে না। তীরে যেখানে নৌকো বাঁধা আছে সেইখান থেকে এক রকম ঘাসের গন্ধ এবং থেকে থেকে পৃথিবীর একটা গরম ভাপ গায়ের উপরে এসে লাগতে থাকে—মনে হয় এই জীবন্ত উত্তপ্ত ধরণী আমার খুব নিকটে থেকে নিশ্বাস ফেলছে, বোধ করি আমারও নিশ্বাস তার গায়ে গিয়ে লাগছে। ছোটো ছোটো ধানের গাছগুলো বাতাসে ক্রমাগত কাঁপছে—পাতিহাঁস জলের মধ্যে নেবে ক্রমাগত মাথা ডুবোচ্ছে এবং চঞ্চু দিয়ে পিঠের পালক সাফ করছে। আর কোনো শব্দ নেই, কেবল জলের বেগে বোটটা যখন ধীরে ধীরে বেঁকতে থাকে তখন কাছিটা এবং বোটের সিঁড়িটা এক রকম সকরুণ মৃদু শব্দ করতে থাকে। অনতিদূরে একটা খেয়াঘাট আছে। বটগাছের তলায় নানাবিধ লোক জড়ো হয়ে নৌকোর জন্যে অপেক্ষা করছে, নৌকো আসবামাত্রই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ছে—অনেক ক্ষণ ধরে এই নৌকো-পারাপার দেখতে বেশ লাগে। ও পারে হাট, তাই খেয়ানৌকোয় এত ভিড়। কেউ বা ঘাসের বোঝা, কেউ বা একটা চুপড়ি, কেউ বা একটা বস্তা কাঁধে করে হাটে যাচ্ছে এবং হাট থেকে ফিরে আসছে, ছোটো নদীটি এবং দুই পারের দুই ছোটো গ্রামের মধ্যে নিস্তব্ধ দুপুর বেলায় এই একটুখানি কাজকর্ম, মনুষ্যজীবনের এই একটুখানি স্রোত অতি ধীরে ধীরে চলছে। আমি বসে বসে ভাবছিলুম, আমাদের দেশের মাঠ ঘাট আকাশ রোদ্দুরের মধ্যে এমন একটা সুগভীর বিষাদের ভাব কেন লেগে আছে? তার কারণ এই মনে হল, আমাদের দেশে প্রকৃতিটা সব চেয়ে বেশি চোখে পড়ে—আকাশ মেঘমুক্ত, মাঠের সীমা নেই, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে, এর মধ্যে মানুষকে অতি সামান্য মনে হয়—মানুষ আসছে এবং যাচ্ছে, এই খেয়া নৌকোর মতো পারাপার হচ্ছে, তাদের অল্প অল্প কলরব শোনা যাচ্ছে, এই সংসারের হাটে ছোটো-খাটো সুখ দুঃখের চেষ্টায় একটুখানি আনাগোনা দেখা যায়—কিন্তু এই অনন্ত-প্রসারিত প্রকাণ্ড উদাসীন প্রকৃতির মধ্যে সেই মৃদুগুঞ্জন, সেই একটু-আধটু গীতধ্বনি, সেই নিশিদিন কাজকর্ম কী সামান্য, কী ক্ষণস্থায়ী, কী নিষ্ফল কাতরতা-পূর্ণ মনে হয়। এই নিশ্চেষ্ট, নিস্তব্ধ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্দেশ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বৃহৎসৌন্দর্যপূর্ণ নির্বিকার উদার শান্তি দেখতে পাওয়া যায় এবং তারই তুলনায় আপনার মধ্যে এমন একটা সততসচেষ্ট পীড়িত জর্জরিত ক্ষুদ্র নিত্যনৈমিত্তিক অশান্তি দেখতে পাওয়া যায় যে, ঐ অতিদূর নদীতীরের ছায়াময় নীল বনরেখার দিকে চেয়ে নিতান্ত উন্মনা হয়ে যেতে হয়। 'ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান তরুমর্মর পবনে' ইত্যাদি। যেখানে মেঘে কুয়াশায় বরফে অন্ধকারে প্রকৃতি আচ্ছন্ন, সংকুচিত, সেখানে মানুষের খুব কর্তৃত্ব—মানুষ সেখানে আপনার সকল ইচ্ছা সকল চেষ্টাকে চিরস্থায়ী মনে করে; আপনার সকল কাজকে চিহ্নিত করে রেখে দেয়—পস্টারিটির দিকে তাকায়, কীর্তিস্তম্ভ তৈরি করে, জীবন-চরিত লেখে, এবং মৃতদেহের উপরেও পাষাণের চিরস্মরণগৃহ নির্মাণ করে—তার

পরে অনেক চিহ্ন ভেঙে যায় এবং অনেক নাম বিস্মৃত হয়, কিন্তু সময়াভাবে সেটা কারও খেয়ালে আসে না।—

কলকাতা
১৮৯১

২৪

সাজাদপুর
। জুন ১৮৯১।

বিকেল বেলায় আমি এখানকার গ্রামের ঘাটের উপরে বোট লাগাই। অনেকগুলো ছেলেয় মিলে খেলা করে, বসে বসে দেখি। কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে নিশিদিন যে পদাতিক সৈন্য লেগে থাকে তাদের জ্বালায় আর আমার মনে সুখ নেই। ছেলেদের খেলা তারা বেয়াদবি মনে করে; মাঝিরা যদি আপনাদের মধ্যে মন খুলে হাসি গল্প করে সেটা তারা রাজার প্রতি অসম্মান জ্ঞান করে; চাষারা যদি ঘাটে গোরুকে জল খাওয়াতে নিয়ে আসে তারা তৎক্ষণাৎ লাঠি হাতে করে রাজমর্যাদা রক্ষা করতে ধাবিত হয়। অর্থাৎ, রাজার চতুর্দিকটা হাসিহীন খেলাহীন শব্দহীন জনহীন ভীষণ মরুভূমি করতে পারলে তাদের মনের মতো রাজসম্ভ্রম রক্ষে হয়—ইদিকে হতভাগ্য রাজার প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকে। কালও তারা ছেলেদের তাড়া করতে উদ্যত হয়েছিল, আমি আমার রাজমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের নিবারণ করলুম। ঘটনাটা হচ্ছে এই—

ডাঙার উপর একটা মস্ত নৌকোর মাস্তুল পড়ে ছিল—গোটাকতক বিবস্ত্র ক্ষুদে ছেলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাওরালে যে, যদি যথোচিত কলরব-সহকারে সেইটেকে ঠেলে ঠেলে গড়ানো যেতে পারে তা হলে খুব একটা নতুন এবং আমোদ-জনক খেলার সৃষ্টি হয়। যেমন মনে আসা অমনি কার্যারম্ভ। 'শাবাশ জোয়ান হেঁইয়ো! মারো ঠেলা হেঁইয়ো!' সব কটায় মিলে চীৎকার এবং ঠেলা। মাস্তুল যেমনি এক পাক ঘুরছে অমনি সকলের আনন্দের উচ্চহাস্য। কিন্তু এই ছেলেদের মধ্যে যে দুটি-একটি মেয়ে আছে, তাদের ভাব আর-এক রকম। সঙ্গী-অভাবে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু এইসকল শ্রমসাধ্য উৎকট খেলায় তাদের মনের যোগ নেই। একটি ছোটো মেয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে গম্ভীর প্রশান্ত ভাবে সেই মাস্তুলটার উপর গিয়ে চেপে বসল। ছেলেদের এমন সাধের খেলা মাটি। দু-একজন ভাবলে এমন স্থলে হার মানাই ভালো। তফাতে গিয়ে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে সেই মেয়েটির অটল গাম্ভীর্য নিরীক্ষণ করতে লাগল। ওদের মধ্যে একজন এসে পরীক্ষাচ্ছলে মেয়েটাকে একটু একটু ঠেলতে লাগল। কিন্তু সে নীরবে নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করতে লাগল। সর্বজ্যেষ্ঠ ছেলেটি এসে তাকে বিশ্রামের জন্যে অন্যস্থান নির্দেশ করে দিলে, সে তাতে সতেজে মাথা নেড়ে কোলের উপর দুটি হাত জড়ো করে নড়ে চড়ে আবার বেশ গুছিয়ে বসল। তখন সেই ছেলেটা শারীরিক যুক্তি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলে এবং অবিলম্বে কৃতকার্য হল। আবার অভ্রভেদী আনন্দধ্বনি উঠল, পুনর্বার মাস্তুল গড়াতে লাগলো—এমন-কি

খানিকক্ষণ বাদে মেয়েটাও তার নারীগৌরব এবং সমুহৎ নিশ্চেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করে কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে ছেলেদের এই অর্থহীন চপলতায় যোগ দিলে। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল সে মনে মনে বলছিল, ছেলেরা খেলা করতে জানে না, কেবল যত রাজ্যের ছেলেমানুষি। হাতের কাছে যদি একটা খোঁপাওয়ালা হলদে রঙের মাটির বেনে পুতুল থাকত তা হলে কি সে আর এই অপরিণতবুদ্ধি নিতান্ত শিশুদের সঙ্গে মাস্তুল ঠেলার মতো এমন একটা বাজে খেলায় যোগ দিত! এমন সময় আর-এক রকমের খেলা তাদের মনে এল, সেটাও খুব মজার। দুজন ছেলেতে মিলে একটা ছেলের হাত পা ধরে ঝুলিয়ে তাকে দোলা দেবে। এর ভিতরে খুব একটা রহস্য আছে সন্দেহ নেই; কারণ, ছেলেরা বেজায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু মেয়েটার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। সে অবজ্ঞাভরে ক্রীড়াক্ষেত্র ত্যাগ করে ঘরে চলে গেল। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটল। যাকে দোলাচ্ছিল সে পড়ে গেল। সেই অভিমানে সে সঙ্গীদের ত্যাগ করে বহুদূরে গিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে তৃণশয্যায় শুয়ে পড়ল। এই রকম ভাব জানালে—এই পাষাণহৃদয় জগৎ-সংসারের সঙ্গে সে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না, কেবল একলা চীৎ হয়ে শুয়ে আকাশের তারা গণনা করবে, মেঘের খেলা দেখে হাতে মাথা রেখে জীবন কাটিয়ে দেবে এবং 'যাবৎ জীবন রবে কারো সঙ্গে খেলিব না'। তার এই রকম অকালে পরম বৈরাগ্য দেখে বড়ো ছেলেটা তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে, কোলের উপর তার মাথাটা নিয়ে, সানুনয় স্বরে অনুতাপ প্রকাশ করে বলতে লাগল—'আয়-না ভাই, ওঠ্-না ভাই! লেগেছে ভাই!' অনতিকাল পরেই দুই কুকুরশাবকের মতো দুজনের হাত-কাড়াকাড়ি খেলা বেধে গেল এবং দু মিনিট না যেতে যেতে দেখি সেই ছেলে ফের দুলতে আরম্ভ করেছে! এমনি মানুষের প্রতিজ্ঞা! এমনি তার মনের বল! এমনি তার বুদ্ধির স্থিরতা! খেলা ছেড়ে একবার দূরে গিয়ে চীৎ হয়ে শোয়, আবার ধরা দিয়ে হেসে হেসে মোহদোলায় দুলতে থাকে! এ মানুষের মুক্তি কী করে হবে! এমন কজন ছেলে আছে যে খেলাঘর ছেড়ে মাথায় হাত দিয়ে কেবল চীৎ হয়ে পড়ে থাকে—সেই সব ভালো ছেলেদের জন্যে গোলোকধামে বাসা তৈরি হচ্ছে।

কলকাতা
২৬ জুন ১৮৯১

২৫

সাজাদপুর
।জুন ১৮৯১।

কাল রাত্তিরে ভারী একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলুম। সমস্ত কলকাতা শহরটা যেন মহা একটা ভীষণ অথচ আশ্চর্য ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে—বাড়ি ঘর সমস্তই একটা অন্ধকার কালো কুয়াশার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে—এবং তার ভিতর তুমুল কী একটা কাণ্ড চলছে। আমি একটা ভাড়াটে গাড়ি করে পার্ক্ স্ট্রীটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি—যেতে যেতে দেখলুম সেণ্ট্‌জেভিয়ার কলেজটা দেখতে দেখতে হু হু করে বেড়ে উঠছে—সেই অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে অসম্ভব উঁচু হয়ে উঠছে। তার

পরে ক্রমে জানতে পারলুম এক দল অদ্ভুত লোক এসেছে, তারা টাকা পেলে কী এক কৌশলে এই রকম অপূর্ব ব্যাপার করতে পারে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি এসে দেখি সেখানেও তারা এসেছে— বদ দেখতে, কতকটা মোঙ্গোলিয়ান ধাঁচের চেহারা— সরু গোঁফ, গোটা দশ বারো দাড়ি মুখের এ দিকে ও দিকে খোঁচা খোঁচা রকম বেরিয়েছে। তারা মানুষকেও বড়ো করে দিতে পারে। তাই আমাদের দেউড়িতে আমাদের বাড়ির সব মেয়েরা লম্বা হবার জন্যে উমেদার হয়েছেন— তারা এঁদের মাথায় কী একটা গুঁড়ো দিচ্ছে আর এঁরা হুশ করে লম্বা হয়ে উঠছেন। আমি কেবলই বলছি, কী আশ্চর্য, এ যেন ঠিক স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। তার পরে, কে একজন প্রস্তাব করলে আমাদের বাড়িটা উঁচু করে দিতে। তারা রাজি হয়ে কতকটা ভাঙতে আরম্ভ করলে। খানিকটা ভেঙে চুরে বললে, এইবার এত টাকা চাই, নইলে বাড়িতে হাত দেব না। কুঞ্জ সরকার বললে, সে কি হয়, কাজ না হলে কী করে টাকা দেওয়া যায়! বলতেই তারা চটে উঠল— বাড়িটা সমস্তই এক রকম বেঁকে চুরে বিশ্রী হয়ে গেল এবং মাঝে মাঝে দেখা গেল, আধখানা মানুষ দেয়ালের মধ্যে গাঁথা রয়েছে, আধখানা বেরিয়ে। সমস্ত দেখে শুনে মনে হল এ সব শয়তানী কাণ্ড। বড়োদাদাকে বললুম, 'বড়দা, দেখছেন ব্যাপারটা! আসুন একবার উপাসনা করা যাক।' দালানে গিয়ে খুব একাগ্রমনে উপাসনা করা গেল। বেরিয়ে এসে মনে করলুম ঈশ্বরের নাম করে তাদের ভর্ৎসনা করব— কিন্তু বুক ফেটে যেতে লাগল, কিন্তু কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরোল না। তার পর কখন জেগে উঠলুম ঠিক মনে পড়ছে না। ভারী অদ্ভুত স্বপ্ন, না? সমস্ত কলকাতা শহরে শয়তানের প্রাদুর্ভাব— সবাই তার সাহায্যে বেড়ে ওঠবার চেষ্টা করছে, একটা অন্ধকার নারকী কুজ্ঝটিকার মধ্যে সমস্ত শহরের ভয়ংকর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু ওর মধ্যে একটু পরিহাসও ছিল— এত দেশ থাকতে জেসুইটদের ইস্কুলটার উপরেই শয়তানের এত অনুগ্রহ কেন?...

তার পরে এখানকার সাজাদপুরের ইংরিজি স্কুলের মাস্টারেরা হুজুরের দর্শনাভিলাষী হয়ে এসে উপস্থিত। তারা কিছুতেই উঠতে চায় না, অথচ আমার আবার তেমন কথা জোগায় না— পাঁচ মিনিট অন্তর দুই-এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তার এক-আধটা উত্তর পাই, তার পরে বোকার মতো বসে থাকি, কলম নাড়ি, মাথা চুলকোই— জিজ্ঞাসা করি এবার এখানে শস্য কিরকম হয়েছে। স্কুল-মাস্টাররা শস্য সম্বন্ধে কিছুই জানে না— ছাত্র সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় তা আরম্ভেই হয়ে গেছে। ফের আবার গোড়ার কথা পাড়লুম; জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনাদের স্কুলে কজন ছাত্র?' এক জন বললে আশি জন। আর এক জন বললে, না, এক শো পঁচাত্তর জন। মনে করলুম দুজনের মধ্যে খুব একটা তর্ক বেধে যাবে। কিন্তু দেখলুম, তৎক্ষণাৎ মতের ঐক্য হয়ে গেল। তার পরে, দেড় ঘণ্টা পরে কেন যে তাদের মনে পড়ল 'আজ তবে আসি' তা ঠিক বোঝা শক্ত। আর এক ঘণ্টা পূর্বেও মনে হতে পারত, আর বারো ঘণ্টা পরেও মনে হতে পারত, দেখা যাচ্ছে এর ভিতরে কোনো একটা নিয়ম নেই— অন্ধ দৈবঘটনা মাত্র।

কলকাতা
৩০ জুন ১৮৯১

২৬

সাজাদপুর
শনিবার, ৪ জুলাই ১৮৯১

আমাদের ঘাটে একটি নৌকো লেগে আছে, এবং এখানকার অনেকগুলি 'জনপদবধূ' তার সম্মুখে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।... বোধ হয় একজন কে কোথায় যাচ্ছে এবং তাকে বিদায় দিতে সবাই এসেছে। অনেকগুলি কচি ছেলে, অনেকগুলি ঘোমটা এবং অনেকগুলি পাকাচুল একত্র হয়েছে। কিন্তু ওদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে, তার প্রতিই আমার মনোযোগটা সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হচ্ছে। বোধ হয় বয়েস বারো-তেরো হবে, কিন্তু একটু হৃষ্টপুষ্ট হওয়াতে চোদ্দ-পনেরো দেখাচ্ছে। মুখখানি বেড়ে। বেশ কালো অথচ বেশ দেখতে। ছেলেদের মতো চুল ছাঁটা, তাতে মুখটি বেশ দেখাচ্ছে। এমন বুদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ এবং পরিষ্কার সরল ভাব। একটা ছেলে কোলে করে এমন নিঃসংকোচ কৌতূহলের সঙ্গে আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।...বাস্তবিক, তার মুখখানি এবং সমস্ত শরীর দেখতে বেশ, কিছু যেন নির্বুদ্ধিতা কিম্বা অসরলতা কিম্বা অসম্পূর্ণতা নেই। বিশেষতঃ আধা ছেলে আধা মেয়ের মতো হয়ে আরও একটু বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ছেলেদের মতো আত্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ভাব এবং তার সঙ্গে মাধুরী মিশে ভারী নতুন রকমের একটি মেয়ে তৈরি হয়েছে। বাংলা দেশে যে এ রকম ছাঁদের 'জনপদবধূ' দেখা যাবে এমন প্রত্যাশা করি নি। দেখছি এদের বংশটাই তেমন বেশি লাজুক নয়। একজন মেয়ে ডাঙায় দাঁড়িয়ে রৌদ্রে চুল এলিয়ে দশাঙ্গুলি-দ্বারা জটা ছাড়াচ্ছে এবং নৌকোর আর-একটি রমণীর সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে ঘরকর্নার আলাপ হচ্ছে। শোনা গেল তার একটিমাত্র 'মায়্যা', অন্য 'ছাওয়াল নাই'— কিন্তু সে মেয়েটির বুদ্ধিসুদ্ধি নেই— 'কারে কী কয় কারে কী হয় আপন পর গুয়ান নেই'... আরও অবগত হওয়া গেল গোপাল সা'র জামাইটি তেমন ভালো হয় নি, মেয়ে তার কাছে যেতে চায় না। অবশেষে যখন যাত্রার সময় হল তখন দেখলুম আমার সেই চুল-ছাঁটা, গোলগাল হাতে-বালা-পরা উজ্জ্বল-সরল-মুখশ্রী মেয়েটিকে নৌকোয় তোলবার অনেক চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু সে কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না— অবশেষে বহুকষ্টে তাকে টেনেটুনে নৌকোয় তুললে। বুঝলুম, বেচারা বোধ হয় বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি যাচ্ছে— নৌকো যখন ছেড়ে দিলে মেয়েরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, দুই একজন আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে নাক চোখ মুছতে লাগল। একটি ছোটো মেয়ে, খুব এঁটে চুল বাঁধা, একটি বর্ষীয়সীর কোলে চড়ে তার গলা জড়িয়ে তার কাঁধের উপর মাথাটি রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। যে গেল সে বোধ হয় এ বেচারির দিদিমণি, এর পুতুল খেলায় বোধ হয় মাঝে মাঝে যোগ দিত, বোধ হয় দুষ্টুমি করলে মাঝে মাঝে টিপিয়েও দিত। সকাল বেলাকার রৌদ্র এবং নদীতীর এবং সমস্ত এমন গভীর বিষাদে পূর্ণ বোধ হতে লাগল। সকাল বেলাকার একটা অত্যন্ত হতাশ্বাস করুণ রাগিণীর মতো মনে হল সমস্ত পৃথিবীটা এমন সুন্দর অথচ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ! ... এই অজ্ঞাত ছোটো মেয়েটির ইতিহাস আমার যেন অনেকটা পরিচিত হয়ে গেল। বিদায়কালে এই নৌকো করে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার মধ্যে যেন আরও একটু বেশি করুণা আছে। অনেকটা যেন মৃত্যুর মতো— তীর থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া— যারা

দাঁড়িয়ে থাকে তারা আবার চোখ মুছে ফিরে যায়, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হয়ে গেল। জানি, এই গভীর বেদনাটুকু, যারা রইল এবং যে গেল উভয়েই ভুলে যাবে, হয়তো এতক্ষণে অনেকটা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বেদনাটুকু ক্ষণিক এবং বিস্মৃতিই চিরস্থায়ী। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে— এই বেদনাটুকুই বাস্তবিক সত্যি, বিস্মৃতি সত্যি নয়। এক-একটা বিচ্ছেদ এবং এক-একটা মৃত্যুর সময় মানুষ সহসা জানতে পারে এই ব্যথাটা কী ভয়ংকর সত্যি। জানতে পারে যে, মানুষ কেবল ভ্রমক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকে, আশঙ্কা এবং শোকই জগতের ভিতরকার সত্য। কেউ থাকে না, কিছুই থাকে না, সেটা এমনি সত্য যে স্মরণও থাকে না, শোকও থাকে না— এবং সেইটে মনে করলে মানুষ আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠে যে, কেবল যে থাকব না তা নয়, কারও মনেও থাকব না। একেবারে জগতের অন্তর বাহির থেকে লোপ। বাস্তবিক, আমাদের দেশের করুণ রাগিণী ছাড়া সমস্ত মানুষের পক্ষে, চিরকালের মানুষের পক্ষে, আর কোনো গান সম্ভবে না।

কলকাতা
৭ জুলাই ১৮৯১

২৭

কটকাভিমুখ জলপথে
। অগস্ট ১৮৯১।

পরিধেয় বস্ত্র প্রতিদিন মলিন এবং অসহ্য হয়ে আসছে অথচ কাপড়ের ব্যাগটি নেই, এ কথা চিত্তের মধ্যে অহর্নিশি জাগরূক থাকলে ভদ্রলোকের আত্মসম্ভ্রম দূর হয়ে যায়। সেই ব্যাগটি থাকলে যে রকম উন্নত মস্তকে সতেজে জনসমাজে বিচরণ করতে পারতুম, এখন আর তা পারছি নে। কোনোমতে নিজেকে প্রচ্ছন্ন এবং সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে রাখতে ইচ্ছে করছে। এই কাপড় পরেই রাত্রে শয়ন করছি, এবং প্রাতঃকালে প্রকাশিত হচ্ছি। স্টীমারে আবার সর্বত্রই কয়লার গুঁড়ো এবং মলিনতা, এবং মধ্যাহ্নের অসহ্য উত্তাপে সর্বশরীর বাষ্পাকুল হয়ে উঠছে। এই-সমস্ত অবস্থা এবং আমার একান্ত নিরীহ স্বভাব স্মরণ করে তোরা কথঞ্চিৎ হাস্য সম্বরণ করবার চেষ্টা করিস। তা ছাড়া স্টীমারে যে সুখে আছি সে কথা তোদের লিখে আর কী করব! কত রকমের যে সঙ্গী জুটেছে তার আর সংখ্যা নেই। অঘোর বাবু বলে একটি কে এসেছে, সে পৃথিবীর সমস্ত জড় এবং চেতন পদার্থকে মামাশ্বশুরের ভাগনে বলে উল্লেখ করছে। আর একটি সংগীতকুশল লোক অর্ধেক রাত্রে ভৈঁরো আলাপ করতে লাগল। বিবিধ কারণে সেটা নিতান্ত অসাময়িক বলে বোধ হতে লাগল। একটা সুঁড়ি খালের মধ্যে জাহাজ আটকে কাল বিকেল থেকে আজ নটা পর্যন্ত যাপন করা গেছে। সমস্ত যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে ডেকের এক ধারে নির্জীব এবং বিমর্ষভাবে শুয়ে ছিলুম। খানসামাজিকে বলেছিলুম রাত্রে লুচি তৈরি করতে— সে কতকগুলি আকারপ্রকারহীন ভাজা ময়দা তৈরি করে এনেছিল, তার সঙ্গে ছোকা কিম্বা ভাজাভুজির উপলক্ষ মাত্র ছিল না। দেখে আমি কিঞ্চিৎ বিস্ময় এবং আক্ষেপ প্রকাশ করলুম। সে ব্যক্তি তটস্থ হয়ে বললে, 'হম অাবি বনা দেতা।'

রাত্রের আধিক্য দেখে আমি তাতে অসম্মত হয়ে যথাসাধ্য শুষ্ক লুচি খেয়ে পেণ্টলুন পরে আলো এবং লোকজনের মধ্যে শুয়ে পড়লুম—শূন্যে মশা এবং চতুষ্পার্শ্বে আর্সোলা সঞ্চরণ করছে—ঠিক পায়ের কাছেই আর-এক ব্যক্তি শয়ন করেছে, তার গায়ে মাঝে মাঝে আমার পা ঠেকছে, চারটে-পাঁচটা নাক অবিশ্রাম ডাকছে, মশকদষ্ট বীতনিদ্র হতভাগ্যগণ তামাক টানছে এবং এরই মধ্যে ভৈঁরো রাগিণী। রাত যখন সাড়ে তিনটে তখন কতকগুলি ব্যস্তবাগীশ লোক পরস্পরকে জাগ্রত এবং প্রাতঃকৃত্যে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহিত করতে লাগল। আমি নিতান্ত কাতরভাবে শয্যা ত্যাগ করে আমার চৌকিটাতে ঠেস দিয়ে প্রভাতের প্রতীক্ষায় বসে রইলুম। একটা বিচিত্র অভিশাপের মতো রাতটা কেটে গেল। একজন খালাসীর কাছে সংবাদ পেলুম, স্টীমার এমনি আটকে গেছে আজ সমস্ত দিন নড়বে না। একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলুম, কলকাতামুখী কি কোনো জাহাজ ইতিমধ্যে পাওয়া যাবে। সে হেসে বললে, এই জাহাজই গম্য স্থানে পৌঁছে পুনশ্চ কলকাতায় ফিরবে, অতএব ইচ্ছে করলে এই জাহাজে করেই ফিরতে পারি। সৌভাগ্যক্রমে অনেক টানাটানির পর প্রায় দশটার কাছাকাছি জাহাজ চলতে আরম্ভ করলে।

কলকাতা
৩১ অগাস্ট ১৮৯১

২৮

চাঁদনি চক। কটক
৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

আমাদের উকিল হরিবল্লভবাবু খুব মোটাসোটা বর্ধিষ্ণু চেহারার লোক—তাঁর ভাবখানা খুব একজন লম্বাচৌড়া কৃষ্ণবিষ্ণুর মতো। বয়স যথেষ্ট হয়েছে। একখানি কোঁচানো চাদর কাঁধে, ফিট্‌ফাট সাজ, গায়ে এসেন্সের গন্ধ, দু-থাক চিবুক, প্রমাণসই গোঁফ, কপাল গড়ানে, বড়ো বড়ো ড্যাবা চোখ আভ্যন্তরিতায় অর্ধনিমীলিত, কথা কবার সময় চোখের তারা আকাশের দিকে ওঠে—জলদগম্ভীর স্বরে অতি মৃদুমন্দ সুস্থ সহাস্যভাবে কথা কয়—সময় যেন অনুগত ভৃত্যের মতো তাঁর অবসর-অপেক্ষায় এক পাশে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে—কোনো বিষয়ে তিলমাত্র তাড়া নেই। চোখ দুটো উল্টে আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করলে, 'জ্যোতি এখন কোথায় আছে?' প্রশ্নকর্তার অবিচলিত গাম্ভীর্যে আমার অন্তঃকরণ সসম্ভ্রমে শশব্যস্ত হয়ে উঠল—আমি মৃদু বিনীতভাবে আমার দাদার রাজধানীতে অবস্থান জ্ঞাপন করলুম। তিনি বললেন 'বীরেন্দ্রের সঙ্গে আমি একসঙ্গে পড়েছি।' শুনে আমার চিত্ত আরও অভিভূত হয়ে পড়ল। এর উপরে যখন তিনি—কারও পরামর্শের অপেক্ষা না রেখে অকস্মাৎ অসময়ে এখানে আসা সম্বন্ধে আমার বালকোচিত অবিবেচনার উল্লেখ করলেন তখন আমি কী রকম ম্লান অপ্রতিভ হয়ে গেলুম তুই কতকটা অনুমান করতে পারবি। আমি কেবলই নতমুখে বারবার করে বলতে লাগলুম—আমি প্রকৃত অবস্থা কিছুই জানতুম না, আর কখনো আসি নি, এই প্রথম আসছি। তার থেকে তর্ক উঠল 'জ্যোতি কখন এসেছিল'। সময় নির্ণয় সম্বন্ধে বরদার সঙ্গে তাঁর ঘোর অনৈক্য হল। তিনি 74|75 বলেন, বরদা বলে

তার পূর্বে। এর থেকে বুঝতে পারবি ইতিহাস লেখা কত শক্ত। তাই মনে করছি এইবার থেকে আমার চিঠিতে তারিখ দিতে হবে।

কলকাতা। ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

২৯

তিরন
৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

বালিয়ার ঘাটটি বেশ দেখতে। দুই ধারে বেশ বড়ো বড়ো গাছ— সব-সুদ্ধ খালটা দেখে সেই পুনার ছোটো নদীটি মনে পড়ে।... আমি ভালো করে ভেবে দেখলুম এই খালটাকে যদি নদী বলে জানতুম তা হলে ঢের বেশি ভালো লাগত। দুই তীরে বড়ো বড়ো নারকেলগাছ, আমগাছ এবং নানাজাতীয় ছায়াতরু, ঢালু পরিষ্কার তট সুন্দর সবুজ ঘাস এবং অসংখ্য নীল পুষ্পিত লজ্জাবতীলতায় আচ্ছন্ন; কোথাও বা কেয়াবন; যেখানে গাছগুলি একটু বিরল সেইখান থেকে দেখা যায় খালের উঁচু পাড়ের নিচে একটা অপার মাঠ ধু ধু করছে, বর্ষাকালে শস্যক্ষেত্র এমনি গাঢ় সবুজ হয়েছে যে, দুটি চোখ যেন একেবারে ডুবে যায়; মাঝে মাঝে খেজুর এবং নারকেল গাছের মণ্ডলীর মধ্যে ছোটো ছোটো গ্রাম; এবং এই-সমস্ত দৃশ্য বর্ষাকালের স্নিগ্ধ মেঘাচ্ছন্ন আনত আকাশের নিচে শ্যামচ্ছায়াময় হয়ে আছে। খালটি তার দুই পরিষ্কার সবুজ শষ্পতটের মাঝখান দিয়ে সুন্দর ভঙ্গীতে বেঁকে বেঁকে চলে গেছে। মৃদু মৃদু স্রোত; যেখানে খুব সংকীর্ণ হয়ে এসেছে সেখানে জলের কিনারার কাছে কাছে কুমুদবন এবং বড়ো বড়ো ঘাস দেখা দিয়েছে। সবসুদ্ধ ... একটা ইংরিজি streamএর মতো। কিন্তু তবু মনের মধ্যে একটা আক্ষেপ থেকে যায় এটা একটা কাটা খাল বৈ নয়— এর জলকলধ্বনির মধ্যে অনাদি প্রাচীনত্ব নেই, এ কোনো দূর দুর্গম জনহীন পর্বতগুহার রহস্য জানে না— কোনো-একটি প্রাচীন স্ত্রীনাম ধারণ করে অতি অজ্ঞাতকাল থেকে দুই তীরের গ্রামগুলিকে স্তন্য দান করে আসে নি— এ কখনো কুলুকুলু করে বলতে পারে না—

মেন মে কাম অ্যান্ড্ মেন মে গো
বাট আই গো অন ফর এভার।

প্রাচীনকালের বড়ো বড়ো দিঘিও এর চেয়ে ঢের বেশি গৌরব লাভ করেছে। এর থেকেই বেশ বোঝা যায় একটা প্রাচীন বড়ো বংশ অনেক বিষয়ে হীন হলেও কেন এত সমাদর লাভ করে। তাদের উপরে যেন বহুকালের একটা সম্পদশ্রীর আভা থাকে। একজন সোনার ব্যাপারী হঠাৎ বড়ো মানুষ হয়ে উঠলে অনেক সোনা পায়, কিন্তু সেই সোনার লাবণ্যটুকু শীঘ্র পায় না। যা হোক, আর একশো বৎসর পরে যখন এই তীরের গাছগুলো আরও অনেক বড়ো হয়ে উঠবে, তক্‌তোকে সাদা মাইলস্টোনগুলো অনেকটা ক্ষয়ে গিয়ে শৈবালাচ্ছন্ন ম্লান হয়ে আসবে, লকের উপরে ক্ষোদিত 1871 তারিখ যখন অনেক দূরবর্তী বলে মনে হবে, তখন যদি আমি আমার প্রপৌত্র-জন্ম লাভ করে এই খালের মধ্যে বোট নিয়ে আমাদের পাণ্ডুয়া জমিদারি তদন্ত করতে যেতে পারি তখন আমার মনের মধ্যে অনেকটা ভিন্ন রকম ভাবোদয় হতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু, হায় আমার প্রপৌত্র! তার

ভাগ্যে কী আছে কে জানে! হয়তো একটা অজ্ঞাত অখ্যাত কেরানিগিরি। ঠাকুর-বংশের একটা ছিন্ন টুকরো, বহুদূরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে একটা মৃত উল্কাখণ্ডের মতো হয়তো জ্যোতিহীন নির্বাপিত। কিন্তু আমার উপস্থিত দুর্দশা এত আছে যে আমার প্রপৌত্রের জন্যে বিলাপ করবার কোনো আবশ্যক নেই।...চারটের সময়ে তারপুরে পৌঁছনো গেল। এইখানে আমাদের পাল্কিযাত্রা আরম্ভ হল। মনে করলুম ছ ক্রোশ পথ, সন্ধে আটটার মধ্যেই আমাদের কুঠিতে পৌঁছতে পারব। মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম, মাইলের পর মাইল কেটে যাচ্ছে—ছ ক্রোশ পথ আর ফুরোয় না। সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় বেহারাদের জিজ্ঞাসা করলুম আর কতদূর, ওরা বললে—আর বেশি নেই, তিন ক্রোশের কিছু উপর বাকি আছে। শুনে পাল্কির মধ্যে একটু নড়েচড়ে বসলুম। পাল্কিতে আমার আধখানা বৈ ধরে না—কোমর টন্ টন্ করছে, পা ঝিন্ ঝিন্ করছে, মাথা ঠক্ ঠক্ করছে—যদি নিজেকে তিন চার ভাঁজ করে মুড়ে রাখবার কোনো উপায় থাকত তা হলেই এই পাল্কিতে কিছু সুবিধে হতে পারত। রাস্তা অতি ভয়ানক। সর্বত্রই এক-হাঁটু কাদা—এক এক জায়গায় পিছলের ভয়ে বেহারারা অতি সাবধানে এক-এক পা করে পা ফেলছে। তিন-চার বার তাদের পা হড়কে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি সামলে নিলে। মাঝে মাঝে রাস্তা নেই— ধানের ক্ষেতে অনেকখানি করে জল দাঁড়িয়েছে—তারই উপর দিয়ে ছপ্ ছপ্ শব্দ করে এগোচ্ছি। মেঘে রাত খুব অন্ধকার হয়ে এসেছে, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, তৈলাভাবে মশালটা মাঝে মাঝে নিভে যাচ্ছে—আবার অনেক ফুঁ দিয়ে দিয়ে জ্বালাতে হচ্ছে, বেহারারা সেই আলোকের অভাব নিয়ে ভারী বকাবকি বাধিয়ে দিয়েছে। এমনি করে খানিক দূরে এলে পর বরকন্দাজ জোড় হস্তে নিবেদন করলে—একটা নদী এসেছে, এইখানে পাল্কি নৌকো করে পার করতে হবে, কিন্তু এখনো নৌকো এসে পৌঁছোয় নি, অবিলম্বে এল বলে— অতএব খানিক ক্ষণ এইখানে পাল্কি রাখতে হবে। পাল্কি তো রাখলে। তার পরে নৌকো আর কিছুতে এসে পৌঁছয় না। আস্তে আস্তে মশালটা নিভে গেল। সেই অন্ধকার নদীতীরে বরকন্দাজগুলো ভাঙা গলায় ঊর্ধ্বশ্বাসে নৌকোওয়ালাকে ডাকতে লাগল—নদীর পরপার থেকে তার প্রতিধ্বনি ফিরে আসতে লাগল, কিন্তু কোনো নৌকোওয়ালা সাড়া দিলে না। 'মুকুন্দো-ও-ও-ও'! 'বালকৃষ্ণ-অ-অ-অ-অ'! 'নীলকণ্ঠ-অ-অ-অ-অ'! অমন কাতর-স্বরে আহ্বান করলে গোলোকধাম থেকে মুকুন্দ এবং কৈলাসশিখর থেকে নীলকণ্ঠ নেমে আসতেন—কিন্তু আমাদের কর্ণধার কর্ণ রোধ করে অবিচলিত ভাবে নিজ নিকেতনে বিশ্রাম করতে লাগল। নির্জন নদীতীরে একটি কুঁড়েঘর মাত্রও নেই, কেবল পথপার্শ্বে চালক এবং বাহন -হীন একটি শূন্য গোরুর গাড়ি পড়ে রয়েছে—আমাদের বেহারাগুলো তারই উপর চেপে বসে বিজাতীয় ভাষায় কলরব করতে লাগল। মক্ মক্ শব্দে ব্যাঙ ডাকছে এবং ঝিঁঝির ডাকে সমস্ত রাত্রি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমি মনে করলুম এইখানেই পাল্কির মধ্যে বেঁকেচুরে দুমড়ে আজ রাতটা কাটাতে হবে—মুকুন্দ এবং নীলকণ্ঠ বোধ হয় কাল প্রভাতে এসে উপস্থিত হতেও পারে। মনে মনে গাইতে লাগলুম—

ওগো, যদি নিশিশেষে আসে হেসে হেসে
মোর হাসি আর রবে কি!
এই জাগরণে ক্ষীণ বদনমলিন
আমারে হেরিয়া কবে কী!

যাই হোক-না কেন উড়ে অন্যায় করবে, আমি কিছুই বুঝতে পারব না। কিন্তু অদৃষ্টে যে আমার হাসি থাকবে না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অনেক ক্ষণ এই ভাবে কেটে গেল। এমন সময় হুঁই-হাঁই হুঁই-হাঁই শব্দে বরদার পাল্কি এসে উপস্থিত হল। বরদা নৌকো আসার কোনো সম্ভাবনা না দেখে হুকুম দিলেন, পাল্কি মাথায় করে নদী পার করতে হবে। শুনে বেহারারা অনেক ইতস্ততঃ করতে লাগল এবং আমার মনেও দয়া এবং কিঞ্চিৎ দ্বিধা উপস্থিত হতে লাগল। যা হোক, অনেক বাক্-বিতণ্ডার পর তারা হরিনাম উচ্চারণ করতে করতে পাল্কি মাথায় করে নদীর মধ্যে নাবলো। বহু কষ্টে নদী পার হল। তখন রাত সাড়ে দশটা। আমি কোনো রকম গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লুম। বেশ খানিকটা নিদ্রাকর্ষণ হয়েছে এমন সময়ে হঠাৎ একটা বেহারার পা পিছলে গিয়ে পাল্কিটা খুব একটা নাড়া পেলে— অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে বুকের ভিতর ভারী ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। তার পর থেকে অর্ধ-ঘুম অর্ধ-জাগরণে রাত্তির দুপুরের সময় আমাদের পাণ্ডুয়ার কুঠিতে এসে উত্তীর্ণ হলুম।

কলকাতা
১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

৩০

তিরন
৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

অনেক দিন পরে কাল মেঘবৃষ্টি কেটে গিয়ে শরতের সোনার রোদ্দুর উঠেছিল। পৃথিবীতে যে রোদ্দুর আছে সে কথা যেন একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম; হঠাৎ যখন কাল দশটা এগারোটার পর রোদ্দুর ভেঙে পড়ল তখন যেন একটা নতুন জিনিস দেখে মনে অপূর্ব বিস্ময়ের উদয় হল। দিনটি বড়ো চমৎকার হয়েছিল। আমি দুপুর বেলায় স্নানাহারের পর বারান্দার সামনে একটি আরাম-কেদারার উপরে পা ছড়িয়ে দিয়ে অর্ধশয়ান অবস্থায় জাগ্রত স্বপ্নে নিযুক্ত ছিলুম। আমার চোখের সামনে আমাদের বাড়ির কম্পাউন্ডের কতকগুলি নারকোল গাছ— তার ওদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলই শস্যক্ষেত্র, শস্যক্ষেত্রের একেবারে প্রান্তভাগে গাছপালার একটুখানি ঝাপসা নীল আভাস মাত্র। ঘুঘু ডাকছে এবং মাঝে মাঝে গোরুর গলার নূপুর শোনা যাচ্ছে। কাঠবিড়ালি একবার ল্যাজের উপর ভর দিয়ে বসে মাথা তুলে চকিতের মধ্যে এ দিক ও দিক নিরীক্ষণ করে আবার চট্ করে পিঠের উপর ল্যাজ তুলে দিয়ে গাছের গুঁড়ি বেয়ে ডালপালার মধ্যে অদৃশ্য হচ্ছে। খুব একটা নিঃঝুম নিস্তব্ধ নিরালা ভাব। বাতাস অবাধে হু হু করে বয়ে আসছে —নারকোল গাছের পাতা ঝরঝর শব্দ করে কাঁপছে। দু-চার জন চাষা মাঠের এক জায়গায় জটলা করে ধানের ছোটো ছোটো চারা উপড়ে নিয়ে আঁটি করে বাঁধছে। কাজকর্মের মধ্যে এইটুকু কেবল দেখা যাচ্ছে।

কলকাতা
১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

৩১

শিলাইদহ
১ অক্টোবর ১৮৯১

বেলায় উঠে দেখলুম চমৎকার রোদ্দুর উঠেছে এবং শরতের পরিপূর্ণ নদীর জল তল্-তল্ থৈ-থৈ করছে। নদীর জল এবং তীর প্রায় সমতল—ধানের ক্ষেত সুন্দর সবুজ এবং গ্রামের গাছপালাগুলি বর্ষার স্নানে সতেজ এবং নিবিড় হয়ে উঠেছে। এমন সুন্দর লাগল সে আর কী বলব। দুপুর বেলা খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তার পরে বিকেলে পদ্মার ধারে আমাদের নারকোল-বনের মধ্যে সূর্যাস্ত হল। আমি নদীর ধারে উঠে আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছিলুম। আমার সামনের দিকে দূরে আমবাগানে সন্ধের ছায়া পড়ে আসছে এবং আমার ফেরবার মুখে নারকোল গাছগুলির পিছনে আকাশ সোনায় সোনালি হয়ে উঠেছে। পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণ এবং গভীর ভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না। যখন সন্ধেবেলা বোটের উপর চুপ করে বসে থাকি, জল স্তব্ধ থাকে, তীর আবছায়া হয়ে আসে, এবং আকাশের প্রান্তে সূর্যাস্তের দীপ্তি ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, তখন আমার সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কী-একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করি। কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব, কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ! এই লোকনিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জন নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি—কেবল মৌলবিটা পাশে দাঁড়িয়ে অবিশ্রাম বক্ বক্ করে আমাকে ব্যথিত করে তোলে।

কলকাতা
২ অক্টোবর ১৮৯১

৩২

শিলাইদহ
মঙ্গলবার, ২০ আশ্বিন। ১২৯৮।

আজ দিনটি বেশ হয়েছে ববু। ঘাটে দুটি একটি করে নৌকো লাগছে—বিদেশ থেকে প্রবাসীরা পুজোর ছুটিতে পোঁটলা পুঁটলি বাক্স ধামা বোঝাই করে নানা উপহার সামগ্রী নিয়ে সম্বৎসর পরে বাড়ি ফিরে আসছে। দেখলুম একটি বাবু ঘাটের কাছাকাছি নৌকো আসতেই পুরোনো কাপড় বদলে একটি নতুন কোঁচানো ধুতি পরলে, জামার উপর সাদা রেশমের একখানি চায়না কোট গায়ে দিলে, আর একখানি পাকানো চাদর বহু যত্নে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে ছাতা ঘাড়ে করে গ্রামের অভিমুখে চলল। ধানের ক্ষেত মর্ মর্ করে কাঁপছে—আকাশে সাদা সাদা মেঘের স্তূপ—তারই উপর আম এবং নারকোল গাছের মাথা উঠেছে—নারকোলের পাতা বাতাসে ঝুরু ঝুরু করছে—চরের উপর দুটো একটা করে কাশ ফুটে ওঠবার উপক্রম করেছে—সব-সুদ্ধ বেশ একটা সুখের দৃশ্য। বিদেশ থেকে যে লোকটি এইমাত্র

গ্রামে ফিরে এল তার মনের ভাব, তার ঘরের লোকদের মিলনের আগ্রহ, এবং শরৎকালের এই আকাশ, এই পৃথিবী, সকাল বেলাকার এই ঝির্‌ঝিরে বাতাস এবং গাছপালা তৃণগুল্ম নদীর তরঙ্গ সকলের ভিতরকার একটি অবিশ্রাম সঘন কম্পন, সমস্ত মিশিয়ে বাতায়নবর্তী এই একক যুবকটিকে সুখে দুঃখে এক রকম অভিভূত করে ফেলছিল। পৃথিবীতে জানলার ধারে একলা বসে চোখ মেলে দেখলেই মনে নতুন নতুন সাধ জন্মায়— নতুন সাধ ঠিক নয়— পুরোনো সাধ নানা নতুন মূর্তি ধারণ করতে আরম্ভ করে। পরশুদিন অমনি বোটের জানলার কাছে চুপ করে বসে আছি, একটা জেলেডিঙিতে একজন মাঝি গান গাইতে গাইতে চলে গেল— খুব যে সুস্বর তা নয়— হঠাৎ মনে পড়ে গেল বহুকাল হল ছেলেবেলায় বাবামশায়ের সঙ্গে বোটে করে পদ্মায় আসছিলুম— একদিন রাত্তির প্রায় দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যেতেই বোটের জানলাটা তুলে ধরে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না হয়েছে, একটি ছোট্ট ডিঙিতে একজন ছোকরা একলা দাঁড় বেয়ে চলেছে, এমনি মিষ্টি গলায় গান ধরেছে— গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি কখনো শুনি নি। হঠাৎ মনে হল, আবার যদি জীবনটা ঠিক সেইদিন থেকে ফিরে পাই! আর একবার পরীক্ষা করে দেখা যায়— এবার তাকে আর তৃষিত শুষ্ক অপরিতৃপ্ত করে ফেলে রেখে দিই নে— কবির গান গলায় নিয়ে একটি ছিপ্‌ছিপে ডিঙিতে জোয়ারের বেলায় পৃথিবীতে ভেসে পড়ি, গান গাই এবং বশ করি এবং দেখে আসি পৃথিবীতে কোথায় কী আছে; আপনাকেও একবার জানান দিই, অন্যকেও একবার জানি; জীবনে যৌবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাতাসের মতো একবার হু হু করে বেড়িয়ে আসি, তার পরে ঘরে ফিরে এসে পরিপূর্ণ প্রফুল্ল বার্ধক্য কবির মতো কাটাই। খুব যে একটা উঁচু আইডিয়াল তা নয়। জগতের হিত করা এবং যিশুখৃস্টের মতো মরা এর চেয়ে ঢের বেশি বড়ো আইডিয়াল হতে পারে— কিন্তু আমি সব-সুদ্ধ যে রকম লোক আমার ওটা মনেও উদয় হয় না, এবং ও রকম করে শুকিয়ে মরতে ইচ্ছেও করে না।... উপবাস করে, আকাশের দিকে তাকিয়ে, অনিদ্র থেকে, সর্বদা মনে মনে বিতর্ক করে, পৃথিবীকে এবং মনুষ্যত্বকে কথায় কথায় বঞ্চিত করে, স্বেচ্ছারচিত দুর্ভিক্ষে এই দুর্লভ জীবন ত্যাগ করতে চাই নে। পৃথিবী যে সৃষ্টিকর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ তা না মনে করে একে বিশ্বাস করে, ভালোবেসে এবং যদি অদৃষ্টে থাকে তো ভালোবাসা পেয়ে, মানুষের মতো বেঁচে এবং মানুষের মতো মরে গেলেই যথেষ্ট— দেবতার মতো হাওয়া হয়ে যাবার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়।

মানিকগঞ্জ
৮ অক্টোবর ১৮৯১

৩৩

শিলাইদহ
২৯ আশ্বিন। ১২৯৮।

কাজ সন্ধের সময় নদীর ধারে একবার পশ্চিম দিকের সোনার সূর্যাস্ত এবং একবার পূব দিকের রুপোর চন্দ্রোদয়ের দিকে ফিরে গোঁফে তা দিতে দিতে পায়চারি করে

বেড়াচ্ছিলুম—রুগ্ন ছেলের দিকে মা যেমন করে তাকায় প্রকৃতি সেই রকম সুগভীর স্তব্ধ এবং স্নিগ্ধ বিষাদের সঙ্গে আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল—নদীর জল আকাশের মতো স্থির, এবং আমাদের দুটি বাঁধা নৌকো জলচর পাখির মতো মুখের উপর পাখা ঝেঁপে স্থির ভাবে ঘুমিয়ে আছে। এমন সময় মৌলবি এসে আমাকে ভীতকণ্ঠে চুপিচুপি খবর দিলে 'কলকাতার ভজিয়া আয়ছে'।...এক মুহূর্তের মধ্যে কত রকম অসম্ভব আশঙ্কা যে মনে উদয় হল তা আর বলতে পারি নে।...যা হোক, মনের চাঞ্চল্য দমন করে গম্ভীর স্থির ভাবে আমার রাজচৌকিতে এসে বসে ভজিয়াকে ডেকে পাঠালুম—ভজিয়া যখন ঘরে প্রবেশ করেই কাঁদুনির সুর ধরে আমার পা জড়িয়ে ধরলে তখনি বুঝলুম দুর্ঘটনা যদি কারও হয়ে থাকে তো সে ভজিয়ার। তার পরে তার সেই ফাঁকা বাংলার সঙ্গে নাকের সুর এবং চোখের জল মিশিয়ে বিস্তর অসংলগ্ন ঘটনা বলে যেতে লাগল। বহু কষ্টে তার যা সার সংগ্রহ করা গেল সেটি হচ্ছে এই—ভজিয়া এবং ভজিয়ার মায়ে প্রায়ই ঝগড়া বেধে থাকে—কিছুই আশ্চর্য নয়—কারণ, দুজনেই আমাদের পশ্চিম আর্যাবর্তের বীরাঙ্গনা, কেউ হৃদয়ের কোমলতার জন্যে প্রসিদ্ধ নয়। এর মধ্যে একদিন সন্ধেবেলায় মায়ে-ঝিয়ে মুখোমুখি থেকে হাতাহাতি বেধে গিয়েছিল—স্নেহালাপ থেকে যে আলিঙ্গন তা নয়, গালাগালি থেকে মারামারি। সেই বাহুযুদ্ধে তার মায়েরই পতন হয়—এবং সে কিছু গুরুতর আহতও হয়েছিল। ভজিয়া বলে, তার মা তাকে একটা কাঁসার বাটি নিয়ে মস্তক লক্ষ্য করে তাড়া করে, সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করাতে দৈবাৎ তার বালাটা তার মায়ের মাথায় না কোথায় লেগে রক্তপাত হয়। যা হোক, এই-সব ব্যাপারে ছোটোবউ সেই মুহূর্তেই তাকে তেতালা থেকে নিম্নলোকে নির্বাসিত করে দেন। তার পরে কিছুতেই আর ক্ষমা করছেন না। দেখ্ দেখি বব্, এখানকার সিকস্তি পয়স্তি খোদ্কস্ত পাইকস্ত ওজরি বেওজরির মধ্যে কলকাতার তেতালা থেকে এক নাকী সুরের গৃহবিপ্লব এসে উপস্থিত। ব্যাপারটা তিন-চার দিন হয়েছে, কিন্তু আমি কোনো খবরই পাই নি—মাথার উপরে একেবারে হঠাৎ বিনা নোটিশে ভজিয়াঘাত।

মানিকগঞ্জ
১৮ অক্টোবর ১৮৯১

৩৪

শিলাইদহ
২ কার্তিক। ১২৯৮।

আমার বোধ হয় কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে এলেই মানুষের নিজের স্থায়িত্ব এবং মহত্ত্বের উপর বিশ্বাস অনেকটা হ্রাস হয়ে আসে। এখানে মানুষ কম এবং পৃথিবীটাই বেশি—চারি দিকে এমন সব জিনিস দেখা যায় যা আজ তৈরি করে কাল মেরামত করে পরশু দিন বিক্রি করে ফেলবার নয়, যা মানুষের জন্মমৃত্যু ক্রিয়াকলাপের মধ্যে চিরদিন অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে—প্রতিদিন সমানভাবে যাতায়াত করছে এবং চিরকাল অবিশ্রান্ত ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। পাড়াগাঁয়ে এলে

আমি মানুষকে স্বতন্ত্রমানুষ-ভাবে দেখি নে— যেমন নানা দেশ দিয়ে নদী চলেছে, মানুষের স্রোতও তেমনি কলরব-সহকারে গাছপালা গ্রাম নগরের মধ্যে দিয়ে এ'কে বে'কে চিরকাল ধরে চলেছে— এ আর ফুরোর না। মেন যে কাম অ্যান্ড মেন মে গো বাট আই গো অন ফর এভার— কথাটা ঠিক সংগত নয়। মানুষও নানা শাখা প্রশাখা নিয়ে নদীর মতোই চলেছে— তার এক প্রান্ত জন্মশিখরে আর-এক প্রান্ত মরণসাগরে, দুই দিকে দুই অন্ধকার রহস্য, মাঝখানে বিচিত্র লীলা এবং কর্ম এবং কলধ্বনি— কোনোকালে এর আর শেষ নেই। ওই শোন্ মাঠে চাষা গান গাচ্ছে, জেলেডিঙি ভেসে চলেছে, বেলা যাচ্ছে, রৌদ্র ক্রমেই বেড়ে উঠছে— ঘাটে কেউ স্নান করছে কেউ জল নিয়ে যাচ্ছে— এমনি করে এই শান্তিময়ী নদীর দুই তীরে গ্রামের মধ্যে গাছের ছায়ায় শত শত বৎসর গুন্ গুন্ শব্দ করতে করতে ছুটে চলেছে— এবং সকলের মধ্যে থেকে একটা করুণ ধ্বনি জেগে উঠছে, আই গো অন ফর এভার! দুপুরে বেলার নিস্তব্ধতার মধ্যে যখন কোনো রাখাল দূর থেকে ঊর্ধ্বকণ্ঠে তার সঙ্গীকে ডাক দেয়, এবং একটা নৌকো ছপ্ ছপ্ শব্দ করে ঘরের দিকে ফিরে যায়, এবং মেয়েরা ঘড়া দিয়ে জল ঠেলে দেয় তারই ছল্‌ছল্ শব্দ ওঠে, তার সঙ্গে মধ্যাহ্নপ্রকৃতির নানা রকম অনির্দিষ্ট ধ্বনি— দুই-একটা পাখির ডাক, মৌমাছির গুন্ গুন্, বাতাসে বোটটা আস্তে আস্তে বেঁকে যেতে থাকে তারই এক রকম কাতর সুর— সব-সুদ্ধ এমন একটা করুণ ঘুমপাড়ানি গান— যেন মা সমস্ত বেলা বসে বসে তার ব্যথিত ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে— বলছে, আর ভাবিস নে, আর কাঁদিস নে, আর কাড়াকাড়ি মারামারি করিস নে, আর তর্ক বিতর্ক রাখ্— একটুখানি ভুলে থাক্, একটুখানি ঘুমো! বলে তপ্ত কপালে আস্তে আস্তে করাঘাত করছে।

মানিকগঞ্জ
২০ অক্টোবর ১৮৯১

৩৫

শিলাইদহ
সোমবার, ৩ কার্তিক। ১২৯৮।

কোজাগর পূর্ণিমার দিন...নদীর ধারে ধারে আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছিলুম— আর মনের মধ্যে স্বগত কথোপকথন চলছিল— ঠিক 'কথোপকথন' বলা যায় না— বোধ হয় আমি একলাই বকে যাচ্ছিলুম আর আমার সেই কাল্পনিক সঙ্গীটি অগত্যা চুপ্‌চাপ করে শুনে যাচ্ছিল; নিজের হয়ে একটা জবাব দেওয়াও সে বেচারার জো ছিল না — আমি তার মুখে যদি একটা নিতান্ত অসংগত কথাও বসিয়ে দিতুম তা হলেও তার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু কী চমৎকার হয়েছিল! কী আর বলব! কতবার বলেছি, কিন্তু সম্পূর্ণ কিছুতেই বলা যায় না। নদীতে একটি রেখামাত্র ছিল না— ও—ই সেই চরের পরপারে যেখানে পদ্মার জলের শেষ প্রান্ত দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে আর এ পর্যন্ত একটি প্রশস্ত জ্যোৎস্নারেখা ঝিক্ ঝিক্ করছে— একটি লোক নেই, একটি নৌকো নেই— ও পারের নতুন চরে একটি গাছ নেই,

একটি তৃণ নেই—মনে হয় যেন একটি উজাড় পৃথিবীর উপরে একটি উদাসীন চাঁদের উদয় হচ্ছে—জনশূন্য জগতের মাঝখান দিয়ে একটি লক্ষ্যহীন নদী বহে চলেছে, মস্ত একটা পুরাতন গল্প এই পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে শেষ হয়ে গেছে, আজ সেই-সব রাজা রাজকন্যা পাত্র মিত্র স্বর্ণপুরী কিছুই নেই, কেবল সেই গল্পের 'তেপান্তরের মাঠ' এবং 'সাত সমুদ্র তেরো নদী' ম্লান জ্যোৎস্নায় ধূ ধূ করছে।... আমি যেন এই মুমূর্ষু পৃথিবীর একটিমাত্র নাড়ীর মতো আস্তে আস্তে চলছিলুম। আর তোরা ছিলি আর-এক পারে, জীবনের পারে—সেখানে এই বৃটিশ গবর্মেন্ট, এবং উনবিংশ শতাব্দী এবং চা এবং চুরোট। সেখান থেকে একটি ছোটো নৌকো করে কাউকে যদি তাতে তুলে নিয়ে এই বসতিহীন জ্যোৎস্নালোকে উপস্থিত করতে পারতুম, এই উঁচু পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে এই প্রান্তহীন জল এবং বালুকারাশির দিকে চেয়ে দেখতুম এবং চারি দিকে অগাধ রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করত। কতদিন থেকে কত লোক আমার মতো এই রকম একলা দাঁড়িয়ে অনুভব করেছে এবং কত কবি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু হে অনির্বচনীয়, এ কী, এ কিসের জন্যে, এ কিসের উদ্‌বেগ, এই নিরুদ্দেশ নিরাকুলতার নাম কী, অর্থ কী—হৃদয়ের ঠিক মাঝখানটা বিদীর্ণ করে কবে সেই সুর বেরোবে যার দ্বারা এর সংগীত ঠিক ব্যক্ত হবে!

মানিকগঞ্জ
২১ অক্টোবর ১৮৯১

৩৬

শিলাইদহ
শনিবার, ৬ অগ্রহায়ণ। ১২৯৮।

সরিৎর একখানা চিঠি পেয়েছি। সে আমার ভগ্নহৃদয় এবং রুদ্রচণ্ড সমালোচনা করে লিখেছে। পূর্বে ভগ্নহৃদয়ের পক্ষ অবলম্বন করে সে আমার সঙ্গে অনেক তর্ক করত—এবার আমার সঙ্গে তার মতের ঐক্য হয়েছে। অর্থাৎ ভগ্নহৃদয়ের অনেক নিন্দে করেছে। বলেছে ওর কবি মুরলা চপলা প্রভৃতিরা একটা কল্পনা-কাননের লোক...

কলকাতা
২২ নভেম্বর ১৮৯১

৩৭

শিলাইদহ
রবিবার, ৩ জানুয়ারি। ১৮৯২।

কিছু আগেই পাবনা থেকে এঞ্জিনিয়ার তার মেম এবং কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে এসে উপস্থিত। জানিস তো বব্, আতিথ্য করাটা আমার তেমন সহজে আসে না—

মাথা একেবারে ঘুলিয়ে যায়— তা ছাড়া গোটা দুয়েক বাচ্চা সঙ্গে করে নিয়ে আসবে তা আমি জানতুম না। এবারে আমি একলা থাকব বলে খাদ্যদ্রব্যও বিশেষ কিছু সঙ্গে নেই। যা হোক, চোখ কান বুজে যেমন-তেমন করে চালাবার চেষ্টায় আছি। মেম আবার চা খায়, আমার চা নেই— মেম ছেলেবেলা থেকে ডাল দুচক্ষে দেখতে পারে না, আমি অন্য খাদ্যের অভাবে ডাল তৈরি করতে দিয়েছি; মেম ইয়ার্‌স্‌ এন্‌ড্‌ টু ইয়ার্‌স্‌ এন্‌ড্‌ মাছ ছোঁয় না, আমি মাগুর মাছের ঝোল রাঁধিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। কী ভাগ্যি কার্‌ন্টি সুইট্‌স্‌ ভালোবাসে, তাই একটা বহু-কালের শক্ত শুকনো সন্দেশ বহুকষ্টে কাঁটা দিয়ে ভেঙে খেলে। এক বাক্স বিস্কুট গতবারের রসদের অবশেষস্বরূপে ছিল, সেটা কাজে লাগবে। আমি আবার একটা মস্ত গলদ করেছি— আমি সাহেবকে বলেছি, তোমার মেম চা খায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার চা নেই, কোকো আছে। সে বললে, 'আমার মেম চায়ের চেয়ে কোকো বেশি ভালোবাসে।' আমি আলমারি ঘেঁটে দেখি কোকো নেই— সবগুলোই কলকাতায় ফিরে গেছে। আবার তাকে বলতে হবে, চা'ও নেই কোকোও নেই, পদ্মার জল আর চায়ের কাংলি আছে— দেখি কিরকম মুখের ভাব হয়। সাহেবের ছেলে দুটো এমন দুরন্ত এবং দুষ্টু দেখতে সে আর কী বলব? মেমটাকে যত বদ দেখতে এবং ছাঁটা-চুল মনে করেছিলুম ততটা নয়— মাঝারি রকম চেহারা। মাঝে মাঝে সাহেবে মেমেতে খুব গুরুতর ঝগড়া হয়ে যাচ্ছে আমি এ বোট থেকে শুনতে পাচ্ছি। ছেলেদের কান্না, চাকর-বাকরদের চেঁচামেচি, এবং দম্পতির তর্ক বিতর্কের জ্বালায় অস্থির হয়ে আছি। আজ আর কোনো কাজকর্ম লেখাপড়ার সুবিধে দেখছি নে। (মেমটা তার ছেলেকে ধমকাচ্ছে : What a little শুয়ার you are!) দেখ্‌ তো আমার ঘাড়ে এসব উপদ্রব কেন? মেমটা আবার আজ বিকেলে উপরে উঠে বেড়াতে যাবে, আমাকে সঙ্গে যেতে বলছে— এমনি ঝালাফালা হয়ে বসে আছি, আমাকে দেখলে তুই বোধ হয় হেসে অস্থির হয়ে যেতিস— আমি নিজেই এক-একবার আপনার কথা ভেবে বড়ো দুঃখের হাসি হাসছি। একটা মেম বগলে করে জমিদারিতে বেড়ানো কখনো কল্পনা করি নি। প্রজারা খুব আশ্চর্য হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। কাল সকালে এদের কোনোমতে বিদায় করতে পারলে বাঁচা যায়, যদি বলে আর একটা দিন থেকে যাব তা হলে মরে যাব বব্‌।

কলকাতা
৫ জানুয়ারি ১৮৯২

৩৮

শিলাইদহ
সোমবার, ৬ জানুয়ারি। ১৮৯২।

সন্ধে হয়ে গেছে। গরমের সময় যখন বোটে ছিলুম, এই সময়টা বোটের জানলার কাছে বসে আলো নিবিয়ে দিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকতুম; নদীর শব্দে, সন্ধ্যার বাতাসে, নক্ষত্র-ভরা আকাশের নিস্তব্ধতায় মনের সমস্ত কল্পনা মধুর আকার ধরে আমাকে ঘিরে বসত; অনেক রাত পর্যন্ত এক প্রকার নিবিড় নির্জন দুঃখ এবং আনন্দে কেটে

যেত। শীতকালের সন্ধেবেলায় সমস্ত প্রকৃতিকে বাইরে ফেলে জানলা দরজা বন্ধ করে বোটের এই ক্ষুদ্র কাষ্ঠময় গহ্বরের মধ্যে একটি বাতি জেলে মনটাকে তেমন দৌড় দিতে পারি নে—যেন নিজের সঙ্গে নিজেকে বড়ো বেশি ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসা-ঠাসি করে থাকতে হয়। এ রকম অবস্থায় আপনার মনটিকে নিয়ে থাকা বড়ো শক্ত। ... সাহিত্যের মধ্যে দুটি মাত্র গল্পের বই এনেছিলুম, কিন্তু এমনি আমার পোড়া কপাল, আজ বিদায় নেবার সময় এঞ্জিনিয়ার সাহেবের মেম সেই দুটি বই ধার নিয়ে গেছেন, কবে শোধ করবেন তার কোনো ঠিকানা নেই। বই দুটো হাতে তুলে নিয়ে সলজ্জ কাকুতির ভাবে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন 'মিস্টার টাগোর বুড্ ইয়ু'—কথাটা শেষ করতে না করতে আমি খুব সজোরে ঘাড় নেড়ে বললুম 'সার্টেন্‌লি'। এতে কতটা দূর কী বোঝায় ঠিক বলতে পারি নে। আসলে, তাঁরা তখন বিদায় নিচ্ছিলেন, সেই উৎসাহে আমি আমার আর্ধেক রাজত্ব দিয়ে ফেলতে পারতুম (যে পেত তার যে খুব বেশি লাভ হত তা নয়।) যা হোক, তারা আজ গেছে বব্, আমার এই দুটো দিন একেবারে ঘুলিয়ে দিয়ে গেছে— আবার থিতিয়ে নিতে দুদিন যাবে— মেজাজটা এমনি খারাপ হয়ে আছে যে ভয়ে ভয়ে আছি পাছে কাউকে অন্যায় অকারণে তাড়না করে উঠি—এত বেশি সাবধানে আছি যে সহজ অবস্থায় যখন একজনকে ধমক দিতুম এখন তাকে খুব নরম নরম করে বলছি— মেজাজ বিগড়ে গেলে অনেক সময় আমার এই রকম উল্টো রকম ব্যাপার হয় যে, সে সময়ে ছেলেরা কাছে থাকলে ভয় হয়...পাছে তাদের লঘু দোষে গুরু দণ্ড দিই এই জন্য তাদের দণ্ডই দিই নে, খুব দৃঢ় করে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে থাকি।

কলকাতা
৭ জানুয়ারি ১৮৯২

৩৯

শিলাইদহ
বৃহস্পতিবার, ৯ জানুয়ারি। ১৮৯২।

দুই-এক দিন থেকে এখানকার প্রকৃতি শীত এবং বসন্তের মধ্যে ইতস্ততঃ করছে— সকালে হয়তো উত্তুরে বাতাসে জলে স্থলে হী হী ধরিয়ে দিয়ে গেল— সন্ধেবেলায় শুক্ল পক্ষের জ্যোৎস্নায় দক্ষিনে বাতাসে চারিদিক হু হু করে উঠল। বসন্ত অনেকটা কাছে এসে পৌঁচেছে বেশ বোঝা যাচ্ছে। অনেক দিন পরে আজকাল ও পারের বাগান থেকে একটা পাপিয়া ডাকতে আরম্ভ করেছে। মানুষের মনটাও কতকটা বিচলিত হয়ে উঠছে। আজকাল সন্ধে হলে, ও পারের গ্রাম থেকে গান-বাজনার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়—এর থেকে বোঝা যাচ্ছে লোকে দরজা জানলা বন্ধ করে মুড়িসুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বার জন্যে তেমন উৎসুক নয়। আজ পূর্ণিমা রাত— ঠিক আমার বাঁ দিকের খোলা জানলার উপরেই একটা মস্ত চাঁদ উঠে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে— বোধ হয় দেখছে আমি চিঠিতে তার সম্বন্ধে কোনো নিন্দে করছি কি না। সে হয়তো মনে করে তার জ্যোৎস্নার চেয়ে তার কলঙ্কের কথা নিয়েই পৃথিবীর লোকে বেশি কানাকানি করে। নিস্তব্ধ চরে

একটা টিটি পাখি ডাকছে—নদী স্থির—নৌকো নেই—জলের উপর স্থির ছায়া ফেলে ও পারের ঘনীভূত বন স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে—ঘুমন্ত চোখ খোলা থাকলে যেমন দেখতে হয়, এই প্রকাণ্ড পূর্ণিমার আকাশ সেই রকম ঈষৎ ঝাপসা দেখাচ্ছে। কাল সন্ধ্যা থেকে আবার ক্রমে ক্রমে অন্ধকারের সূত্রপাত হবে—কাল কাছারি সেরে এই ছোটো নদীটি পার হবার সময় দেখতে পাব আমার সঙ্গে আমার এই প্রবাসের প্রণয়িনীর একটুখানি বিচ্ছেদ হয়েছে—কাল যে আমার কাছে আপনার রহস্যময় অপার হৃদয় উদ্ঘাটন করে দিয়েছিল আজ তার মনে যেন একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে, যেন তার মনে হচ্ছে একেবারে অতখানি আত্মপ্রকাশ কি ভালো হয়েছিল, তাই হৃদয় আবার একটু একটু করে বন্ধ করছে। বাস্তবিক, বিদেশে বিজন অবস্থায় প্রকৃতি বড়ো কাছাকাছির জিনিস—আমি সত্যি সত্যি দু-তিন দিন ধরে মাঝে মাঝে ভেবেছি, পূর্ণিমার পরদিন থেকে আমি আর এ জ্যোৎস্না পাব না—আমি যেন বিদেশ থেকে আরো একটু বিদেশে চলে যাব, কাজকর্মের পরে প্রতিদিন সন্ধেবেলায় যে-একটি শান্তিময় পরিচিত সৌন্দর্য আমার জন্যে নদীর তীরে অপেক্ষা করে থাকত সে আর থাকবে না—অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বোটে ফিরে আসতে হবে। ... কিন্তু আজ পূর্ণিমা, এ বৎসরকার বসন্তের এই প্রথম পূর্ণিমা, এর কথাটা লিখে রেখে দিলুম—হয়তো অনেক দিন পরে এই নিস্তব্ধ রাত্রিটি মনে পড়বে—ঐ টিটি পাখির ডাক -সুদ্ধ এবং ও পারের ঐ বাঁধা নৌকোয় যে আলোটি জ্বলছে সেটি-সুদ্ধ—এই একটুখানি উজ্জ্বল নদীর রেখা, ঐ একটুখানি অন্ধকার বনের একটা পোঁচ—এবং ঐ নির্লিপ্ত উদাসীন পাণ্ডুবর্ণ আকাশ—

কলকাতা
১২ জানুয়ারি ১৮৯২

৪০

শিলাইদহ
বুধবার, ১২ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯২।

সেদিন একটা কাগজে কালিদাসের একটা শ্লোক তুলে দিয়েছে, পড়ে একটু আশ্চর্য বোধ হল—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি ন নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥

অস্যার্থ। রম্য বস্তু দেখে এবং মধুর শব্দ শুনে সুখী লোকের প্রাণও এমন পর্যুৎসুক হয় কেন? নিশ্চয়ই মনের অজ্ঞাতসারে পূর্বজন্মের কোনো বন্ধুর কথা মনে পড়ে। কালিদাসের মনটা যে মাঝে মাঝে অকারণে বিকল হয়ে উঠত তা বেশ বোঝা যায়। মেঘদূতেও কবি বলেছেন 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ'—মেঘ দেখলে সুখী লোকেরাও কেমন আনমনা হয়ে যায়। সৌন্দর্য যে মনের মধ্যে একটা নিগূঢ় রহস্যময় অসীম আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, যা মনকে জন্ম

থেকে জন্মান্তর পর্যন্ত আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, কালিদাসের কবিতার মধ্যে এই ভাবটা পড়ে আমার ভারী আনন্দ হল।...

কলকাতা
১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২

৪১

শিলাইদহ
শুক্রবার, ৭ এপ্রিল। ১৮৯২।

সকাল থেকে সুন্দর বাতাস দিচ্ছে। কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। বোধ হয় এগারোটা কিম্বা সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত লেখাপড়া কিম্বা কোনো কাজে হাত দিই নি। সকাল থেকে একটি চৌকিতে স্থির হয়ে বসে আছি। মাথার মধ্যে কত টুকরো টুকরো লাইন এবং কত অসমাপ্ত ভাব যাতায়াত করছে, কিন্তু সেগুলোকে একত্র করে বাঁধি কিম্বা পরিস্ফুট করে তুলি এমন শক্তি অনুভব করছি নে। তোর সেই গানটা মনে পড়ছে পায়েরিয়া বাজে ঝনক ঝনক ঝন ঝন-নন নন নন—সুন্দর সকাল বেলায় মধুর বাতাসে নদীর মাঝখানে মাথার মধ্যে সেই রকম ঝননন নূপুর বাজছে, কিন্তু সে কেবল এ দিক ও দিক থেকে, অন্তরালে—কেউ ধরা দিচ্ছে না, দেখা দিচ্ছে না। তাই চুপচাপ করে বসে আছি। কিরকম জায়গায় আছি জানিস? নদীর জল অনেকটা শুকিয়ে এসেছে, কোথাও এক কোমরের বেশি জল আর প্রায় নেই, তাই বোটটাকে নদীর প্রায় মাঝখানে বেঁধে রাখা কিছুই শক্ত হয় নি। আমার ডান দিকের পারে চরের উপর চাষারা চাষ করছে এবং মাঝে মাঝে গোরুকে জল খাইয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমার বাম পারে শিলাইদহের নারকেল এবং আম -বাগান, ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাচছে, জল তুলছে, স্নান করছে, এবং উচ্চৈঃস্বরে বাঙাল ভাষায় হাস্যালাপ করছে—যারা অল্পবয়সী মেয়ে তাদের জলক্রীড়া আর শেষ হয় না—একবার স্নান সেরে উপরে উঠছে আবার ঝুপ্ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে—তাদের নিশ্চিন্ত উচ্চহাস্য শুনতে বেশ লাগে। পুরুষরা গম্ভীর ভাবে এসে গোটাকতক ডুব মেরে তাদের নিত্যকর্ম সমাপ্ত করে চলে যায়—কিন্তু মেয়েদের যেন জলের সঙ্গে বেশি ভাব। পরস্পরের যেন একটা সাদৃশ্য এবং সখিত্ব আছে—জল এবং মেয়ে উভয়েই বেশ সহজে ছল্‌ছল্ জ্বল্‌-জ্বল্ করতে থাকে, একটা বেশ সহজ গতি ছন্দ তরঙ্গ এবং সংগীত আছে—সকল পাত্রেই আপনাকে স্থাপন করতে পারে—দুঃখতাপে অল্পে অল্পে শুকিয়ে যেতে পারে কিন্তু আঘাতে একেবারে জন্মের মতো দুখানা হয়ে ভেঙে যায় না। সমস্ত কঠিন পৃথিবীকে সে বাহুবন্ধনে আলিঙ্গন করে আছে, পৃথিবী তার অন্তরের গভীর রহস্য বুঝতে পারে না; সে নিজে শস্য উৎপাদন করে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে না থাকলে পৃথিবীতে একটি ঘাসও গজাতে পারত না। মেয়েকে পুরুষের সঙ্গে তুলনা করে টেনিসন বলেছেন : water unto wine। আমার আজকের মনে হচ্ছে : জল unto স্থল। তাই জন্যে মেয়েতে জলেতে বেশ মিশ খায়—অন্য অনেক রকম ভার বহন মেয়েকে শোভা পায় না, কিন্তু উৎস থেকে, কুয়ো থেকে, ঘাট থেকে জল তুলে নিয়ে যাওয়া কোনো কালেই মেয়েদের পক্ষে অসংগত মনে হয় না। গা

ধোওয়া, স্নান করা, পুকুরের ঘাটে এক-কোমর জলে বসে পরস্পর গল্প করা, এ সমস্ত মেয়েদের পক্ষে কেমন শোভনীয়। আমি দেখেছি মেয়েরা জল ভালোবাসে, কেননা উভয়ে স্বজাত। অবিশ্রাম সহজ প্রবাহ এবং কলধ্বনি জল এবং মেয়ে ছাড়া আর কারও নেই। ইচ্ছে করলে আরও অনেক সাদৃশ্য দেখানো যেতে পারত, কিন্তু বেলাও বোধ করি অনেক হয়েছে, এবং একটা কথাকে নিয়ে বেশি নেংড়ানো কিছু নয়।

কলকাতা
৮ এপ্রিল ১৮৯২

৪২

শিলাইদহ
শনিবার, ৮ এপ্রিল। ১৮৯২।

এখানে এসে আমি এত এলিমেন্‌ট্‌স্‌ অফ পলিটিক্স্‌ এবং প্রব্লেম্‌স্‌ অফ দি ফ্যুচার পড়ছি শুনে বোধ হয় তোর খুব আশ্চর্য ঠেকতে পারে। আসল কথা, ঠিক এখানকার উপযুক্ত কোনো কাব্য নভেল খুঁজে পাই নে। যেটা খুলে দেখি সেই ইংরিজি নাম, ইংরিজি সমাজ, লন্‌ডনের রাস্তা এবং ড্রয়িংরুম, এবং যতরকম হিজিবিজি হাঙ্গাম। বেশ সাদাসিধে সহজ সুন্দর উন্মুক্ত দরাজ এবং অশ্রুবিন্দুর মতো উজ্জ্বল কোমল সুগোল করুণ কিছুই খুঁজে পাই নে। কেবল প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস— কেবল মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে-মুচকে তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে তার থেকে নতুন নতুন থিয়োরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা। সেগুলো পড়তে গেলে আমার এখানকার এই গ্রীষ্মশীর্ণ ছোটো নদীর শান্ত স্রোত, উদাস বাতাসের প্রবাহ, আকাশের অখণ্ড প্রসারতা, দুই কূলের অবিরল শান্তি, এবং চারি দিকের নিস্তব্ধতাকে একেবারে ঘুলিয়ে দেবে। এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাই নে, এক বৈষ্ণব কবিদের ছোটো ছোটো পদ ছাড়া। বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলাকার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম তা হলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হত। বেশ ছোটো নদীর কলরবের মতো, ঘাটের মেয়েদের উচ্চহাসি মিষ্টকণ্ঠস্বর এবং ছোটোখাটো কথাবার্তার মতো, বেশ নারকেলপাতার ঝুরুঝুরু কাঁপুনি আম-বাগানের ঘন ছায়া এবং প্রস্ফুটিত সর্ষেক্ষেতের গন্ধের মতো— বেশ সাদাসিধে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময়— অনেকখানি আকাশ আলো নিস্তব্ধতা এবং সকরুণতায় পরিপূর্ণ! মারামারি হানাহানি যোঝাযুঝি কান্নাকাটি সে-সমস্ত এই ছায়াময় নদীস্নেহবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন বাংলাদেশের নয়। যাই হোক, এলিমেন্‌ট্‌স্‌ অফ পলিটিক্স্‌ জলের উপরে তেলের মতো এখানকার নিস্তব্ধ শান্তির উপর দিয়ে অবাধে ভেসে চলে যায়, একে কোনো রকমে নাড়া দিয়ে ভেঙে দেয় না। ... নদীর মাঝখানে বসে আছি, দিনরাত্রি হু হু করে বাতাস দিচ্ছে, দুই দিকের দুই পার পৃথিবীর দুটি আরম্ভ-রেখার মতো বোধ হচ্ছে, ওখানে জীবনের কেবল আভাস মাত্র দেখা দিয়েছে, জীবন সুতীব্র ভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি— যারা জল

তুলছে, স্নান করছে, নৌকো বাচ্ছে, গোরু চরাচ্ছে, মেঠো পথ দিয়ে আসছে যাচ্ছে, তারা যেন যথেষ্ট জীবন্ত সত্য নয়। অন্য জায়গায় মানুষরা ভিড় করে, তারা সামনে উপস্থিত হলে চিন্তার ব্যাঘাত করে, তাদের অস্তিত্বই যেন কুনুই দিয়ে ঠেলা দেয়, তারা প্রত্যেকে এক-একটি পজিটিভ মানুষ; এখানকার এরা সম্মুখে আনাগোনা চলাবলা কাজকর্ম করছে— কিন্তু মনকে ঠেলা দিয়ে যাচ্ছে না। কৌতূহলে সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে, কিন্তু সেই সরল কৌতূহল ভিড় করে গায়ের উপর এসে পড়ছে না। যা হোক, বেশ লাগছে।

কলকাতা
৯ এপ্রিল ১৮৯২

৪৩

বোলপুর
শনিবার, ২ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

জগৎসংসারে অনেকগুলো প্যারাডক্স্ আছে, তার মধ্যে এও একটি যে, যেখানে বৃহৎ দৃশ্য, অসীম আকাশ, নিবিড় মেঘ, গভীর ভাব, অর্থাৎ যেখানে অনন্তের আবির্ভাব সেখানে তার উপযুক্ত সঙ্গী এক জন মানুষ— অনেকগুলো মানুষ ভারী ক্ষুদ্র এবং খিজিবিজি। অসীমতা এবং একটি মানুষ উভয়ে পরস্পরের সমকক্ষ— আপন আপন সিংহাসনে পরস্পর মুখোমুখি বসে থাকবার যোগ্য। আর, কতকগুলো মানুষে একত্রে থাকলে তারা পরস্পরকে ছেঁটে ছুঁটে অত্যন্ত খাটো করে রেখে দেয়— একজন মানুষ যদি আপনার সমস্ত অন্তরাত্মাকে বিস্তৃত করতে চায় তা হলে এত বেশি জায়গার আবশ্যক করে যে কাছাকাছি পাঁচ ছ জনের স্থান থাকে না। আমার বিবেচনায়, যদি বেশ ভালো করে ধরাতে চাও, তা হলে বিশ্বসংসারে খুব অন্তরঙ্গ দুটি মাত্রকে ধরে— তার বেশি জায়গা নেই— তার অধিক লোক জোটাতে গেলেই পরস্পরের অনুরোধে আপনাকে সংক্ষেপ করতে হয়— যেখানে যতটুকু ফাঁক সেইখানে ততটুকু মাথা গলাতে হয়। মাঝের থেকে, দুই বাহু প্রসারিত ক'রে দুই অঞ্জলি পূর্ণ করে প্রকৃতির এই অগাধ অনন্ত বিস্তীর্ণতাকে গ্রহণ করতে পারছি নে।

কলকাতা
১৬ মে ১৮৯২

৪৪

বোলপুর
১৫ মে ১৮৯২

বেলি স্পষ্টই বলছে সে বিলেতের নিচেই বোলপুর ভালোবাসে, খোকাও সেই মতে ডিটো দিয়ে যাচ্ছে— রেণুকা কোনোপ্রকার ব্যক্ত শব্দে আপন মনের ভাব প্রকাশ

করতে পারছে না। দিবানিশি নানা প্রকার অব্যক্ত ধ্বনি উচ্চারণ করছে, এবং তাকে সামলে রাখা দায় হয়েছে।—সে কেবল চতুর্দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করছে এবং অঙ্গুলির অনুগামী হবার চেষ্টা করছে—আমার সঙ্গে যে এক রেজিমেন্ট্ ভৃত্য এসেছে সকলেই প্রায় সেই ক্ষুদ্র মহাপ্রভুকে নিয়েই নিযুক্ত আছে—এই ভৃত্যদের কর্তৃক তার দুরন্ত বেগবান ইচ্ছাসকল ক্রমাগত প্রতিহত হয়ে প্রতি মুহূর্তে তীব্র আর্তনাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে।—আমার পুত্রসন্তানটি নিস্তব্ধ নীরব স্থিরভাবে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে—কী ভাবছে তা কারও বোঝবার জো নাই।...

কলকাতা
১৬ মে ১৮৯২

৪৫

বোলপুর
মঙ্গলবার, ৫ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

'জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর'—ও একটা বয়সের একটা বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সব-প্রথম জাগ্রত হয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায়। যেমন নবদন্তোদ্‌গতা রেণুকা মনে করছেন সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে দিতে পারেন—ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা যায় মনটা যথার্থ কী চায় এবং কী চায় না। তখন সেই পরিব্যাপ্ত হৃদয়বাষ্প সংকীর্ণ সীমা অবলম্বন করে, জ্বলতে এবং জ্বালাতে আরম্ভ করে। একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবি করে বসলে কিছুই পাওয়া যায় না—অবশেষে একটা কোনো-কিছুর ভিতরে সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশ লাভ করা যায়। প্রভাতসংগীতে আমার অন্তর্‌প্রকৃতির প্রথম বহির্মুখী উচ্ছ্বাস, সেই জন্যে ওটাতে আর কিছুমাত্র বাচবিচার বাধাব্যবধান নেই। এখনো আমি সমস্ত পৃথিবীকে এক রকম ভালোবাসি—কিন্তু সে এ রকম উদ্দামভাবে নয়—আমার ভালোবাসার জ্যোতিষ্কলোক থেকে একটা দীপ্তি প্রতিফলিত হয়ে সমস্ত মানবের উপর পড়ে—সেই দীপ্তিতে এক-এক সময় পৃথিবীটা ভারী সুন্দর এবং ভারী আপনার বোধ হয়। যাদের খুব ভালোবাসা যায় তারা সীমাবদ্ধভাবে আমাদের মনের গতিরোধ করে না, তাদের মধ্যে আমাদের হৃদয় চিরকাল সঞ্চরণ করতে পারে—যাদের আমরা ততটা ভালোবাসি নে, তারা আমাদের কাছে অসীম নয়। তাদের আমরা আংশিকভাবে দেখি, তারা যতটুকু প্রতীয়মান কেবল ততটুকু, এই জন্যে তারা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকলে অস্বচ্ছ দেয়ালের মতো আমাদের চার দিক থেকে রুদ্ধ করে রাখে, মনকে কোনো-একটা চিন্তার প্রসারতার মধ্যে ব্যাপ্ত করতে গেলে পদে পদে তাদের উপরে গিয়ে ঠেকে যায়, এবং আপনার মধ্যে সে বিরক্তভাবে ফিরে আসে। এই জন্যে সকল সময়ে সাধারণের সঙ্গ ভালো লাগে না। যখন ঘরে আছি তখন দেয়াল বেশ লাগে, এমন-কি, তখন দেয়াল না হলে চলে না। যখন বাইরে গেছি তখন সঙ্গে সঙ্গে দেয়াল চললে আদবে ভালো লাগে না। অতএব লোকারণ্যের উপর বিরক্তি প্রকাশ করছি বলে মনে করিস নে আমি একেবারে

মিস্যান্‌থ্রোপ্‌ হয়ে গেছি—আমি কেবল এইটুকু বলতে চাই, এক-একটা সময় আসে যখন এতগুলো লোক না থাকলে বেশ চলে যায়।...আমার যে কিছুমাত্র ধৈর্য নেই বব্‌। সেটা বোধ হয় পুরুষ-মানুষের একটা লক্ষণ—তারা একেবারে হুড়মুড় করে সমস্তটা নিকেশ করে ফেলতে চায়, বেশ ধীরে নিঃশব্দে সুচারু সুনিপুণ সুন্দররূপে কিছু করে উঠতে পারে না—পৃথিবীতে চিরকাল মজুরের কাজ করে করে তাদের এই দশা হয়েছে। মেয়েরা আজকাল পুরুষদের এই-সকল মজুরি কার্যভার লাঘব করবার চেষ্টায় আছে, তা হলে আমাদের পরুষ নীরস স্বজাতীয়ের পক্ষে মন্দ হয় না—একটুখানি চারুতা চর্চা করবার অবকাশ পাওয়া যায়—কিন্তু এই প্রকাণ্ডকায় হতভাগারা সে দিকে যে বেশি মন দেবে তা মনে হয় না—বোধ হয় অধিক সময় পেলে অজগরের মতো আহার করবে এবং অজগরের মতো নিদ্রা দেবে। অদূর ভবিষ্যতে পুরুষ-জাতির ভারী একটা লাঞ্ছনার সময় আসছে বলে মনে হয়। সভ্যতা ক্রমেই এমন সুকুমার সূক্ষ্মতার দিকে যাচ্ছে যে, এই মোটা জন্তুগুলো ভারী ফাঁপরে পড়বে। পৃথিবীর আদিম অবস্থাতেই ম্যামথ্‌ ম্যাস্টডন প্রভৃতি বিপুলকায় প্রাণীর প্রাদুর্ভাব ছিল—তাদের জোরই বা কত—চামড়াই বা কী শক্ত—তারা তো সব উচ্ছন্ন গেল। এখন কাঁচ-চামড়া সাড়েতিন-হাত মনুষ্য পৃথিবীর রাজা। কিন্তু আমাদের সময় প্রায় হয়ে এসেছে—এখন আরও কাঁচির আবশ্যক।...

কলকাতা
১৮ মে ১৮৯২

৪৬

বোলপুর
বুধবার, ৬ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

সেদিন সন্ধেবেলায় খোকাতে বেলাতে একটা বিষয় নিয়ে তর্ক হয়ে গেছে, সেটা উদ্‌ধৃত করবার যোগ্য। খোকা বললে—'বেলা, আমার জল ক্ষিধে পেয়েছে।' বেলা বললেন—'দূর ফোক্‌লা, জল ক্ষিধে বুঝি বলে! জল তেষ্টা।' খোকা অত্যন্ত দৃঢ়স্বরে—'না, জল ক্ষিধে।' বেলা—'অ্যাঁ খোকা! আমি তোর চেয়ে তিন বছরের বড়ো, তুই আমার চেয়ে দু বছরের ছোটো, তা জানিস! আমি তোর চেয়ে কত বেশি জানি!' খোকা সন্দিগ্ধভাবে—'তুমি এত বড়ো!' বেলা—'আচ্ছা, বাবাকে জিজ্ঞাসা কর্‌।' খোকা অকস্মাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠে—'তেমনি আমি যে দুধ খাই, তুমি যে দুধ খাও না।' বেলা অবজ্ঞাভরে—'তাতে কী! মা তো দুধ খায় না, তাই বলে কি মা তোর চেয়ে বড় নয়!' খোকা সম্পূর্ণ নিরুত্তর, এবং বালিশে মাথা রেখে চিন্তান্বিত। তখন বেলা বকতে আরম্ভ করলে, 'O father, একজনের সঙ্গে আমার ভয়ানক ভয়ানক friendship। সে পাগলি, সে এমন মিষ্টি! Oh I can eat her up!' বলে ছুটে রেণুকে গিয়ে এক পত্তন চট্‌কে চুমো খেয়ে কাঁদিয়ে দিয়ে এল।

কালকের বেলা বড়ো ব্যথিত হয়ে এসেছিল। ঘটনাটা হচ্ছে, কাল স্বয়ম্প্রভারা

ছোটো বাংলাতে মাছের তরকারি রাঁধতে গিয়েছিল। সেখানে একটা পাগল কতকগুলো আম নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল— ছোটোবউ স্বয়ম্প্রভারা ভয় পেয়ে তাকে বিদায় করে দেয়। আমি দোতলার ঘরে চুপ্‌চাপ্‌ শুয়েছিলুম। বেলা ছোটো বাংলা থেকে ফিরে এসে আমাকে কাতরভাবে বলতে লাগল, 'বাবা, একজন ভারী গরিব লোক, বেচারার ক্ষিধে পেয়েছে, তাই আম নিয়ে নিচের বাংলায় বসেছিল, তাকে লাঠি নিয়ে তাড়িয়ে দিলে।' বারবার করে বলতে লাগল, 'বেচারা ভারী গরিব, তার কিচ্ছু নেই, এতটুকু একটু কাপড় পরা, বোধ হয় শীতকালে কিচ্ছু পরতে পায় না, তার শীত করে। সে তো কিচ্ছু দোষ করে নি। তার নাম জিজ্ঞাসা করলে, সে নাম বললে। বললে সে স্বর্গে থাকে। তাকে তাড়িয়ে দিলে, সে বেচারা কিচ্ছু বললে না। অমনি চলে গেল।'— আমার এমনি মিষ্টি লাগল! বেলিটার বাস্তবিক ভারী দয়া। কাল সে এমন সত্যিকার কাতরতার সঙ্গে বললে— এই অনর্থক নিষ্ঠুরতা তার কাছে এমনি অকারণ বোধ হয়েছিল! শুনে আমার মনটা ভারী আর্দ্র হয়েছিল। বেলিটা বড়ো হলে খুব স্নেহময়ী সরলস্বভাব লক্ষ্মী মেয়ে হবে। খোকাটারও ভারী স্নেহশীল ভাব। রেণুকে সে এমনি ভালোবাসে। এমনি মিষ্টি মিষ্টি করে আদর করে, তার সমস্ত উপদ্রব এমন সহিষ্ণুভাবে সহ্য করে যায় যে, অনেক মাও এমন পারে না।

কলকাতা
১৯ মে ১৮৯২

৪৭

বোলপুর
শুক্রবার, ৮ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

রসিকতা জিনিসটা বড়ো বিপদের জিনিস— ও যদি প্রসন্ন সহাস্য মুখে আপনি ধরা দিলে তো অতি উত্তম, আর ওকে নিয়ে যদি টানাটানি করা যায় তবে বড়োই 'ব্যাভ্রম' হবার সম্ভাবনা। হাস্যরস প্রাচীন কালের ব্রহ্মাস্ত্রের মতো, যে ওর প্রয়োগ জানে সে ওকে নিয়ে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিতে পারে— আর যে হতভাগ্য ছুঁড়তে জানে না অথচ নাড়তে যায়, তার বেলায় 'বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই বধে', হাস্যরস তাকেই হাস্যজনক করে তোলে।... মেয়েরা রসিকতা করতে গিয়ে যদি মুখরা হয়ে পড়ে তবে সেটা ভারী অশোভন দেখতে হয়। আমার তো মনে হয় 'কমিক' হতে চেষ্টা করে সফল হলেও মেয়েদের সাজে না— নিষ্ফল হলেও মেয়েদের সাজে না। কারণ 'কমিক' জিনিসটা ভারী গাব্‌দা এবং প্রকাণ্ড। 'সাব্লিমিটি'র সঙ্গে 'কমিক্যালিটি'র একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে— সেই জন্যে হাতি কমিক, উট কমিক, জিরাফ কমিক, স্থূলতা কমিক। সৌন্দর্যের সঙ্গে বরঞ্চ প্রখরতা শোভা পায়, যেমন ফুলের সঙ্গে কাঁটা— তেমনি শাণিত কথা মেয়েদের মুখে বস্তু বাজে বটে তেমনি সাজেও বটে। কিন্তু যে-সকল বিদ্রূপে কোনো রকম স্থূলত্বের আভাসমাত্র দেয় তার দিক দিয়েও মেয়েদের যাওয়া উচিত হয় না; সে হচ্ছে আমাদের সাব্লাইম (চন্দ্রনাথ বাবুর ভাষায়— 'বিরাট') স্বজাতীয়ের জন্যে।

পুরুষ ফল্‌স্টাফ আমাদের হাসিয়ে নাড়ী ছিঁড়ে দিতে পারে, কিন্তু মেয়ে ফল্‌স্টাফ আমাদের গা জ্বালিয়ে দিত।

কলকাতা
২১ মে ১৮৯২

৪৮

বোলপুর
শনিবার, ৯ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

কাল যে ঝড় সে আর কী বলব। আমার সাধনার নিত্যনৈমিত্তিক লেখা সেরে চা খাবার জন্যে উপরে যাচ্ছি, এমন সময়ে প্রচণ্ড ঝড় এসে উপস্থিত। ধুলোয় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং বাগানের যত শুকনো পাতা একত্র হয়ে লাটিমের মতো বাগান-ময় ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে বেড়াতে লাগল—যেন অরণ্যের যত প্রেতাত্মাগুলো হঠাৎ জেগে উঠে ভুতুড়ে নাচন নাচতে আরম্ভ করে দিলে। বাগানের সমস্ত গাছপালা পায়ে-শিকলি-বাঁধা প্রকাণ্ড জটায়ু পাখির মতো ডানা আছড়ে ঝট্‌পট্‌ ঝট্‌পট্‌ করতে লাগল। সে কী গর্জন, কী মাতামাতি, কী একটা হুটোপুটি ব্যাপার! ঝড়টা দেখে আমার মনে পড়ছিল, অ্যামেরিকার ranch সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে রকম বর্ণনা পড়া যায়—হঠাৎ কোনো-একটা বেড়া ভেঙে ফেলে ছ-সাত শো বুনো ঘোড়া ধুলো উড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে, আর তার পিছনে পিছনে তাদের তাড়িয়ে ফিরিয়ে আনবার জন্যে বড়ো বড়ো ফাঁস হাতে অনেকগুলো অশ্বারোহী ছুটেছে—মাঝে মাঝে যেখানে যাকে পাচ্ছে সাঁই সাঁই শব্দে দিচ্ছে চাব্‌কে—বোলপুরের অবারিত আকাশ এবং মাঠের মধ্যে যেন সেই রকমের একটা উচ্ছৃঙ্খল পলায়ন এবং পশ্চাদ্ধাবন চলছে—দৌড় দৌড়, ধর্‌ ধর্‌, পালা পালা, হুড়্‌হুড়্‌ দুড়্‌দাড়্‌ ব্যাপার। এখানকার যত চাকর-বাকর সব মন্দির সামলাতে ব্যস্ত—পাছে সেই রঙিন কাঁচের বুদ্‌বুদটি ভেঙেচুরে ফেটে যায়। তাকে খুব মজবুত কাপড়ের বড়ো বড়ো পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে—কিন্তু ঝড়ের চোটে পর্দা কুটিকুটি হয়, দড়ি টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যায়, পর্দার কাষ্ঠদণ্ডগুলো ভেঙে খান্‌খান্‌ হয় এবং সেইগুলো আছড়ে আছড়ে মন্দিরের কাঁচ চুর্‌মার হয়ে যায়। ইতিপূর্বে একটা ঝড়ের সময় সেই পর্দার লাঠি খেয়ে মন্দিররক্ষকের মাথা ফেটে গিয়েছিল। উপরে গিয়ে দেখি এই ঘোরতর বিপ্লবের সময়ে আমার পুত্রটি উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রেলিঙের মধ্যে তাঁর ক্ষুদ্র অপরিণত নাসিকাটি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে নিস্তব্ধভাবে এই ঝড়ের আঘ্রাণ এবং আস্বাদ গ্রহণে নিযুক্ত আছেন। বেগে বৃষ্টি পড়তে লাগল, আমি খোকাকে বললুম, 'খোকা, তোর গায়ে জলের ছাট লাগবে, এইখানে এসে চৌকিতে বোস্‌'—খোকা তার মাকে ডেকে বললে, 'মা, তুমি চৌকিতে বোসো, আমি তোমার কোলে বসি।' বলে মায়ের কোল অধিকার করে নীরবে বর্ষাদৃশ্য সম্ভোগ করতে লাগল। খোকা যে চুপচাপ করে বসে বসে কী ভাবে এবং আপন মনে হাসে এবং মুখভঙ্গী করে এক-এক সময় তার আভাস পাওয়া যায়—বোঝা যায় সেও তার এই অতি ক্ষুদ্র জীবনের

যৎসামান্য গুটিকতক পূর্বস্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করে। দেখেছি এক-এক সময়ে কোনো কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে, 'বাবা, শিলাইদয়ে নদী ছিল—না?' অনেক চিন্তার অবসানে হঠাৎ মাকে বলে, 'মা, শিলাইদয়ে আমরা বেশ ছিলুম।' সেদিন ছোটোবউকে জিজ্ঞাসা করছিল, 'আজ কী বার?' ছোটো-বউ বললেন রবিবার। খোকা বললে, 'আজ তা হলে শিলাইদয়ে স্টীমার চলছে না।' সব চেয়ে, খোকাতে রেণুতে যে রকম কাণ্ড চলে দেখতে বেশ লাগে। রেণু যদি দেখলে খোকা কোথাও চুপচাপ করে শুয়ে আছে অমনি তার ঘাড়ের উপর পড়ে তার মুখের উপর মুখ রেখে তাকে চুমো খেয়ে তার চুল ধরে টেনে তাকে মেরে তার প্রতি ভয়ানক সোহাগের উৎপীড়ন আরম্ভ করে দেয়—খোকাটা এমনি স্নেহময় মিষ্টি করে তাকে 'রানী' 'রানী' বলে আদর করে এবং সমস্ত সহ্য করে! খোকাটাকে ঘুমোতে দেখলেই রেণুটা তাকে মারপিট টানাটানি ঠেলাঠেলি করতে থাকে—খোকা তাকে অনুনয় করে বলে, 'রানী, আমাকে একটু ঘুমোতে দে।' কিন্তু যখন দেখে রেণু কিছুতেই তাকে ছাড়ে না তখন উঠে বসে তার সঙ্গে খেলা করতে আরম্ভ করে, কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করে না। কিন্তু বেলির সঙ্গে ওদের দুজনের তেমন বিশেষ ভাব নেই—রেণু তো প্রায় সর্বদাই অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে বেলির প্রতি আপনার রাজকীয় অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকে। মনে হয় বেলির সঙ্গে যেন ওদের স্বভাবের মিল নেই—বেলিটা ওদের দল ছাড়া।

কলকাতা
২২ মে ১৮৯২

৪৯

বোলপুর
রবিবার, ১০ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

কাল বিকেলে ভয়ানক বৃষ্টি বাদল দুর্যোগ গেছে, সেটা আক্ষেপের বিষয় নয়। বরঞ্চ ভালোই; গাছপালাগুলো এবং পৃথিবীর তৃণ-আবরণ বেশ একটু সবুজ চিক্‌চিকে টস্‌টসে হয়ে উঠুক। দেখে চোখ জুড়োক। আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত স্নিগ্ধ সজল মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যাক—বনভূমি গাঢ় ছায়ায় অন্ধকার হয়ে আসুক, অবিরল বৃষ্টিধারা দিক্‌বধূদের অবগুণ্ঠন রচনা করে দিক, ঘন পল্লবের উপর ঝর্‌ঝর্‌ বৃষ্টিপতনের শব্দে অরণ্য মুখরিত হয়ে উঠুক, ছোটো বড়ো ক্ষণজীবন জলস্রোত বিচিত্র লীলা ও কলরবে নিশ্চল বিস্তীর্ণ ভূমিকে চারি দিক থেকে শৈশবচাঞ্চল্যে সজীব করে তুলুক। হয়েওছে সেই রকম। আজ সকালে সমস্ত আকাশ জলভারাক্রান্ত মেঘে যেন নত হয়ে পড়ছে, এবং দিগ্‌বিদিক্‌ বর্ষার ছায়ায় সুস্নিগ্ধ হয়ে রয়েছে।... ...খোকাটা ভালো করে কথা কইতে পারে না বলে ওর মনের যা কিছু মনেই থেকে যায়, এবং সমস্ত উদ্যম মনের ভিতরে ক্রমিক কাজ করে, এইজন্যে ওর মনে চিন্তার রেখাগুলো খুব গভীর হয়ে পড়ে। বেলা ক্রমিক কথা কয়ে কয়ে ভালো করে কিছু ভাববার এবং ধারণা করবার অবসর পায় না—ওর সমস্ত মানসিক শক্তি অবিরল বাক্য রচনা করতেই নিঃশেষিত হয়ে

যায়। কিন্তু ওর মনটি ভারী দয়ার্দ্র—খোকা সেদিন একটা পিঁপড়ে মারতে যাচ্ছিল দেখে ও নিষেধ করবার কত চেষ্টা করলে। দেখে আমার ভারী আশ্চর্য বোধ হল—আমার ছেলেবেলায় ঠিক ঐ রকম ভাব ছিল, কীটপতঙ্গকেও কষ্ট দেওয়া আমি সহ্য করতে পারতুম না। কিন্তু বড়ো হয়ে তার চেয়ে কত কঠিন হয়ে গেছি। মনে আছে তখন পরদুঃখে বড়ো মর্মান্তিক ক্লেশ পেতুম। এখন আর কৈ তেমন হয়? বেলা বড় হয়ে এলেও কি এই রকম ক্রমশঃ কঠিন হয়ে আসবে? তা না হতেও পারে—ও কিনা মেয়ে। এক তো ওকে নিজের হাতে কোনো নিষ্ঠুরতার কাজ করতে হবে না, তা ছাড়া মেয়েদের মনে চিরকালই একটা ইল্যাস্‌টিসিটি থাকে, একেবারে পেকে শক্ত হয়ে যায় না। আমি ছেলেবেলায় জীবের কষ্ট সম্বন্ধে যে রকম অতিসচেতন ছিলুম সে রকম ভাব এখনও থাকলে পৃথিবীতে পদক্ষেপ করা দায় হয়ে উঠত; বোধ হয় পিয়ের লটির মতো কেবলই বেদনা ও মৃত্যুর দ্বারা আহত হয়ে পদে পদে কেবল ঐ নিয়েই বিলাপ পরিতাপ করতুম। সে বড়ো উৎপাত! তা ছাড়া, যে-সকল বিষয়ে সাধারণতঃ লোকে কোনো ব্যথা অনুভব করে না সে সম্বন্ধে নিজের বেদনা প্রকাশ করলে অন্য লোকে অত্যন্ত চটে ওঠে; তারা মনে করে, এ লোকটা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। মনে আছে, আমার বড়োরা যখন দয়ার পাত্রকে দয়া করতেন না তখন আমার একটা কিছু যথাসাধ্য বলতে কিম্বা করতে ইচ্ছে করত, কিন্তু ঐ লজ্জায় করতে পারতুম না—পাছে তাঁরা মনে করতেন, 'ইস্‌, ইনি যে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে আমাদের সকলের উপরে টেক্কা দিতে এসেচেন!' মানসিক অনুভবশক্তি সম্বন্ধে নিজের চতুর্দিকের চেয়ে অধিক চেতনাসম্পন্ন হওয়া ভারী আপদের। প্রথমে সেটাকে গোপন করা এবং অবশেষে সেটাকে কমিয়ে আনাই হচ্ছে সুযুক্তিসংগত। মনে আছে, ছেলেবেলায় একদিন জ্যোতিদাদার সঙ্গে গাড়িতে যাচ্ছি, পথিমধ্যে একজন ব্রাহ্মণ পথিক আমাদের গাড়ি থামিয়ে বললে, 'আপনারা আমাকে গাড়িতে একটু স্থান দিতে পারেন? আমি পথের মধ্যে নেবে যাব।' জ্যোতিদাদা ভারী রাগ করে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। আমি সেই ঘটনায় ভয়ানক মর্মাহত হয়েছিলুম—একে তো বেচারা শ্রান্ত পথিক, তাতে সে অপমানিত লজ্জিত ও নিরাশ হয়ে চলে গেল। কিন্তু জ্যোতিদাদা যেখানে দয়া অনুভব করলেন না সেখানে দয়া প্রকাশ করতে আমার ভারী লজ্জা করল—আমি অত্যন্ত কষ্টেও কিছু বলতে পারলুম না, কিন্তু আমার ভ্রাতৃভক্তিতে খুব আঘাত লেগেছিল।

কলকাতা
২৩ মে ১৮৯২

৫০

বোলপুর
মঙ্গলবার, ১২ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

তোকে পূর্বেই লিখেছি, অপরাহ্নে আমি আপন মনে একাকী ছাতের উপর বেড়াই; কাল সন্ধেবেলায় আমার দুই বন্ধুকে দুই পার্শ্বে নিয়ে অঘোরকে আমার পথপ্রদর্শক

করে তাঁদের এখানকার প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করানো আমার কর্তব্যকর্ম মনে করে বেরিয়ে পড়া গেল। তখন সূর্য অস্ত গেছে কিন্তু অন্ধকার হয় নি। একেবারে দিগন্তের প্রান্তে যেখানে গাছের সার নীলবর্ণ হয়ে দেখা যাচ্ছে, তারই উপরেই ঠিক একটি রেখামাত্র খুব গাঢ় নীল মেঘ উঠে খুব চমৎকার দেখতে হয়েছে—আমি ওরই মধ্যে একটুখানি কবিত্ব করে বললুম, ঠিক যেন নীল চোখের পাতার উপরে নীল সুর্মা লাগিয়েছে। সঙ্গীরা কেউ কেউ শুনতে পেলে না, কেউ কেউ বুঝতে পারলে না—কেউ কেউ সংক্ষেপে বললে, 'হাঁ, দিব্যি দেখতে হয়েছে।' তার পর থেকে দ্বিতীয়বার আর কবিত্ব করতে আমার উৎসাহ হল না। প্রায় মাইলখানেক গিয়ে একটা বাঁধের ধারে এক সার তালবন, এবং তালবনের কাছে একটি মেঠো ঝর্নার মতো আছে, সেইটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি এমন সময়ে দেখি উত্তরে সেই নীল মেঘ অত্যন্ত প্রগাঢ় এবং স্ফীত হয়ে চলে আসছে এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্দন্ত বিকাশ করছে। আমাদের সকলেরই মত হল এ রকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘরের মধ্যে বসে দেখাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। বাড়িমুখে যেমন ফিরেছি অমনি প্রকাণ্ড মাঠের উপর দীর্ঘ পদক্ষেপ করতে করতে সরোষ গর্জনে একটা ঝড় আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। আমরা যখন প্রকৃতিসুন্দরীর চোখের সুর্মার বাহার নিয়ে তারিফ করছিলুম তখন তিলমাত্র আশঙ্কা করি নি যে তিনি রোষাবিষ্টা গৃহিণীর মতো এত বড়ো একটা প্রকাণ্ড চপেটাঘাত নিয়ে আমাদের উপর ছুটে আসবেন। ধুলোয় এমনি অন্ধকার হয়ে এল যে পাঁচ হাত দূরে কিছু দেখা যায় না। বাতাসের বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগল—কাঁকরগুলো বায়ুতাড়িত হয়ে ছিটে-গুলির মতো আমাদের বিঁধতে লাগল—মনে হল বাতাস পিছন থেকে ঘাড় ধরে আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে—ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পিট্ পিট্ করে মুখের উপর সবেগে আঘাত করতে লাগল। দৌড় দৌড়। মাঠ সমান নয়। এক-এক জায়গায় আবার খোয়াইয়ের ভিতর নাবতে হয়, সেখানে সহজ অবস্থাতেই চলা শক্ত, এই ঝড়ের বেগে চলা আরও মুশকিল। পথের মধ্যে আবার পায়ে কাঁটা-সুদ্ধ একটা শুকনো ডাল বিঁধে গেল—সেটা ছাড়াতে গিয়ে বাতাস আবার পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে মুখ থুবড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। বাড়ির যখন প্রায় কাছাকাছি এসেছি তখন দেখি, তিন-চারটে চাকর-বাকর মহা সোরগোল করে দ্বিতীয় আর-একটা ঝড়ের মতো আমাদের উপরে এসে পড়ল! কেউ হাত ধরে, কেউ আহা-উহু বলে, কেউ পথ দেখাতে চায়, কেউ আবার মনে করে বাবু বাতাসে উড়ে যাবেন—বলে পিঠের দিক থেকে জড়িয়ে ধরে। এই-সমস্ত অনুচরদের দৌরাত্ম্য কাটিয়ে-কুটিয়ে এলোথেলো চুলে, ধূলিমলিন দেহে, সিক্তবস্ত্রে, হাঁপিয়ে বাড়িতে এসে তো পড়লুম। যা হোক, একটা খুব শিক্ষা লাভ করেছি—হয়তো কোন্ দিন কোন্ কাব্যে কিম্বা উপন্যাসে বর্ণনা করতে বসতুম একজন নায়ক মাঠের মধ্যে দিয়ে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি ভেঙে নায়িকার মধুর মুখচ্ছবি স্মরণ করে অকাতরে চলে যাচ্ছে—কিন্তু এখন আর এ রকম মিথ্যে কথা লিখতে পারব না। ঝড়ের সময় কারও মধুর মুখ মনে রাখা অসম্ভব, কী করলে চোখে কাঁকর ঢুকবে না সেই চিন্তাই সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। আমার আবার চোখে eye glasses ছিল। সেটা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে, কিছুতেই রাখতে পারি নে। এক হাতে চশমা ধরে আর-এক হাতে ধুতির কোঁচা সামলে পথের কাঁটাগাছ এবং গর্ত বাঁচিয়ে চলছি। মনে কর্, যদি এখানকার কোপাই নদীর ধারে আমার কোনো প্রণয়িনীর বাড়ি থাকত, আমার চশমা এবং কোঁচা সামলাতুম, না, তার স্মৃতি সামলাতুম! বাড়িতে ফিরে এসে কাল অনেক

ক্ষণ ভাবলুম— বৈষ্ণব কবিরা গভীর রাত্রে ঝড়ের সময় রাধিকার অকাতর অভিসার সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো মিষ্টি কবিতা লিখেছেন, কিন্তু একটা কথা ভাবেন নি এ রকম ঝড়ে কৃষ্ণের কাছে তিনি কী মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হতেন। চুল-গুলোর অবস্থা যে কী রকম হত সে তো তোরা বেশ বুঝতে পারবি। বেশ-বিন্যাসেরই বা কিরকম দশা! ধুলোতে লিপ্ত হয়ে, তার উপর বৃষ্টির জলে কাদা জমিয়ে কুঞ্জবনে কিরকম অপরূপ মূর্তি করে গিয়েই দাঁড়াতেন! এসব কথা কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের লেখা পড়বার সময় মনে হয় না— কেবল মানস চক্ষে ছবির মতো দেখতে পাওয়া যায় একজন সুন্দরী রমণী শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রে বিকশিত কদম্ব-বনের ছায়া দিয়ে যমুনার তীরপথে প্রেমের আকর্ষণে ঝড়বৃষ্টির মাঝে আত্মবিহ্বল হয়ে স্বপ্নগতার মতো চলেছেন; পাছে শোনা যায় বলে পায়ের নূপুর বেঁধে রেখেছেন, পাছে দেখা যায় বলে নীলাম্বরী কাপড় পরেছেন, কিন্তু পাছে ভিজে যান বলে ছাতা নেন নি, পাছে পড়ে যান বলে বাতি আনা আবশ্যক বোধ করেন নি। হায়, আবশ্যকীয় জিনিসগুলো আবশ্যকের সময় এত বেশি দরকার, অথচ কবিত্বের বেলায় এত উপেক্ষিত। আবশ্যকের শতলক্ষ দাসত্ব-বন্ধন থেকে আমাদের মুক্তি দেবার জন্যে কবিতা মিথ্যে ভান করছে। ছাতা জুতো জামাজোড়া চিরকাল থাকবে। বরঞ্চ শোনা যায় সভ্যতার উন্নতি-সহকারে কাব্য ক্রমে লোপ পাবে, কিন্তু ছাতা জুতোর নতুন নতুন পেটেণ্ট্‌ বেরোতে থাকবে।

কলকাতা
২৫ মে ১৮৯২

৫১

বোলপুর
শনিবার, ১৬ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

কাল বিকেলে যে এক-পাত্র চা খেয়েছিলুম সেটা কিছু কড়া-গোছ হয়েছিল- তার উপরে কাল রাত্রে তোকে যে চিঠিটা লিখেছিলুম তারও বিষয়টা বেশি মানসিক উত্তাপ লেগে খুব টক্‌টকে কড়া গোছের হয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে অনেক ক্ষণ খুব ঝাঁ ঝাঁ করেছিল— তাই বিছানায় শুয়ে কাল আর্ধেক রাত্রের বেশি একেবারে বিশুদ্ধ অনিদ্রায় যাপন করেছিলুম। এখানে রাত্রে কোনো গির্জের ঘড়িতে ঘণ্টা বাজে না— এবং কাছাকাছি কোনো লোকালয় না থাকাতে পাখিরা গান বন্ধ করবামাত্রই সন্ধের পর থেকে একেবারে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা আরম্ভ হয়— প্রথম রাত্রি এবং অর্ধ রাত্রে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। কলকাতায় অনিদ্রার রাত্রি মস্ত একটা অন্ধকার নদীর মতো, খুব ধীরে ধীরে চলতে থাকে; বিছানায় চক্ষু মেলে চিত হয়ে পড়ে তার গতিশব্দ মনে মনে গণনা করা যেতে পারে— এখানকার রাত্রিটা যেন একটা প্রকাণ্ড নিস্তরঙ্গ হ্রদের মতো আগাগোড়া সমান থম্‌ থম্‌ করছে— কোথাও কিছু গতি নেই। যতই এপাশ ফিরি এবং যতই ওপাশ ফিরি একটা মস্ত যেন অনিদ্রার গুমোট করে ছিল, তার মধ্যে প্রবাহের লেশমাত্র পাওয়া যায় না। আজ সকালে কিছু বিলম্বে শয্যাত্যাগ করে আমার নিচেকার ঘরের তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বুকের

উপর স্লেট রেখে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে সকালের বাতাস এবং পাখির ডাকের মধ্যে একটি কবিতা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম। বেশ জমে এসেছিল— মুখ সহাস্য, চক্ষু ঈষৎ মুদ্রিত, মাথা ঘন ঘন আন্দোলিত এবং গুন্‌ গুন্‌ আবৃত্তি উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল— এমন সময় তোর একখানি চিঠি, একখানি সাধনা, একখানি সাধনার প্রুফ এবং একখানি Monist কাগজ পাওয়া গেল। তোর চিঠিখানি পড়লুম এবং সাধনার পাতাগুলোর মধ্যে চোখ দুটোকে একবার সবেগে ঘোড়দৌড় করিয়ে নিয়ে এলুম। তার পরে পুনশ্চ শিরশ্চালন করে অস্ফুট গুঞ্জনস্বরে কবিত্বে প্রবৃত্ত হলুম। শেষ করে ফেলে তবে অন্য কথা। একটি কবিতা লিখে ফেললে যেমন আনন্দ হয় হাজার গদ্য লিখলেও তেমন হয় না কেন তাই ভাবছি। কবিতায় মনের ভাব বেশ একটি সম্পূর্ণতা লাভ করে, বেশ যেন হাতে করে তুলে নেবার মতো। আর, গদ্য যেন এক বস্তা আলগা জিনিস— একটি জায়গায় ধরলে সমস্তটি অমনি স্বচ্ছন্দে উঠে আসে না— একেবারে একটা বোঝা-বিশেষ। রোজ রোজ যদি একটি করে কবিতা লিখে শেষ করতে পারি তা হলে জীবনটা বেশ এক রকম আনন্দে কেটে যায়। কিন্তু এতদিন ধরে সাধনা করে আসছি, ও জিনিসটা এখনো তেমন পোষ মানে নি, প্রতিদিন লাগাম পরাতে দেবে তেমন পক্ষীরাজ ঘোড়াটি নয়। আর্টের একটা প্রধান আনন্দ হচ্ছে স্বাধীনতার আনন্দ— বেশ আপনাকে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া যায়, তার পরে আবার এই ভবকারাগারের মধ্যে ফিরে এসেও অনেক ক্ষণ কানের মধ্যে একটা ঝংকার, মনের মধ্যে একটা স্ফূর্তি লেগে থাকে। এই ছোটো ছোটো কবিতাগুলো আপনা-আপনি এসে পড়ছে বলে আর নাটকে হাত দিতে পারছি নে। নইলে দুটো-তিনটে ভাবী নাটকের উমেদার মাঝে মাঝে দরজা ঠেলাঠেলি করছে। শীতকাল ছাড়া বোধ হয় সেগুলোতে হাত দেওয়া হয়ে উঠবে না। চিত্রাঙ্গদা ছাড়া আমার আর-সব নাটকই শীতকালে লেখা। সে সময়ে গীতিকাব্যের আবেগ অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে— অনেকটা ধীরে সুস্থে নাটক লেখা যায়।

কলকাতা
৩০ মে ১৮৯২

৫২

বোলপুর
৩১ মে। ১৮৯২।

এখনো পাঁচটা বাজে নি— কিন্তু আলো হয়েছে, বেশ বাতাস দিচ্ছে এবং বাগানের সমস্ত পাখিগুলো জেগে উঠে গান জুড়ে দিয়েছে। কোকিলটা তো সারা হয়ে গেল— সে কেন যে এত অবিশ্রাম ডাকে এ পর্যন্ত বোঝা গেল না— অবশ্য, আমাদের শ্রুতি-বিনোদনের জন্যে নয়, বিরহিণীকে পীড়ন করবার অভিপ্রায়েও নয়— তার নিজের একটা পার্সোনাল উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে— কিন্তু হতভাগার সে উদ্দেশ্য কি কিছুতেই সিদ্ধ হচ্ছে না! ছাড়েও না তো— কুউ কুউ চলছেই— আবার এক-একবার যেন দ্বিগুণ অস্থির হয়ে দ্রুতবেগে কুহুধ্বনি করছে। এর মানে কী?

আবার আর খানিকটা দূরে আর-একটা কী পাখি নিতান্ত মৃদুস্বরে কেবলই কুক্ কুক্ করছে—তাতে কিছুমাত্র উৎসাহ-আগ্রহের ঝাঁজ নেই—লোকটা যেন নেহাৎ মন-মরা হয়ে গেছে, সমস্ত আশা ভরসা ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু তবু ছায়ায় বসে সমস্ত দিন ওই একটুখানি কুক্-কুক্ কুক্-কুক্ ওটুকু ছাড়তে পারছে না। বাস্তবিক ঐ ডানাওয়ালা ছোটো ছোটো নিরীহ জীবগুলি, অতি কোমল গ্রীবাটুকু বুকটুকু এবং পাঁচমিশালি রঙ নিয়ে গাছের ছায়ায় বসে আপন-আপন ঘরকন্না করছে—ওদের আসল বৃত্তান্ত কিছুই জানি নে। বাস্তবিক, বুঝতে পারি নে ওদের এত ডাকবার কী আবশ্যক। কোনো কোনো প্রাণিতত্ত্ববিৎ বলেন প্রণয়িনীকে আহ্বান করবার জন্যে। ওদের প্রণয়িনীরাও মানুষের চেয়ে কম নয় দেখছি—ভদ্রলোকটাকে এই ভোরের বেলাতেও একেবারে ক্ষেপিয়ে তুলেছে—কোকিল-মহিলাটির যদি আসবার ইচ্ছে থাকে তা হলে দুই ডাকে এলেই হয়—অনুরক্ত ভক্তটিকে এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাক ছাড়াচ্ছে কেন?

কলকাতা। ৩১ মে ১৮৯২

৫৩

শিলাইদহ
রবিবার, ১২ জুন। ১৮৯২।

কালকের চিঠিতে জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে যা লিখেছিস তা ঠিক কথা। আমরা যে যেখানে এসে পড়েছি আমাদের যথাসাধ্যমত সেই জায়গাটুকু সুখে শান্তিতে উজ্জ্বল করে তোলাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। তোদের প্রসন্ন প্রফুল্ল সুন্দর মুখে, নিঃস্বার্থ সেবা স্নেহ ভালবাসায় তোরা তাই করিস—তার চেয়ে আর-কিছু করবার নেই। আমরা সবাই তা পারি নে। আমরা অভিশপ্ত জীব, এমন একটা দুর্দান্ত অশান্তি সাথের সাথি নিয়ে জন্মগ্রহণ করি যে, সহজভাবে সুন্দরভাবে পৃথিবীকে সুখী করা, স্নিগ্ধ করা আমাদের দ্বারা হয়ে ওঠে না; আমরা কেবল ধড়্ফড়্ করে যে জায়গাটাতে থাকি তার চতুর্দিক ঘুলিয়ে তুলি—জগৎকে মধুর করতে জানি নে—ঠিক তার বিপরীত। পুরুষ জাতটাকে আমি শতসহস্র ধিক্কার দিই, পৃথিবীতে এমন জঞ্জাল আর নেই।

কলকাতা
১৩ জুন ১৮৯২

৫৪

শিলাইদহ
সোমবার [৩২] জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

এ-সব শিষ্টাচার আর ভালো লাগে না—আজকাল প্রায় বসে বসে আওড়াই—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন!' বেশ একটা সুস্থ সবল উন্মুক্ত

অসভ্যতা! দিনরাত্রি বিচার আচার বিবেক বুদ্ধি নিয়ে কতকগুলো বহুকেলে জীর্ণতার মধ্যে শরীর মনকে অকালে জরাগ্রস্ত না করে একটা দ্বিধাহীন চিন্তাহীন প্রাণ নিয়ে খুব একটা প্রবল জীবনের আনন্দ লাভ করি। মনের সমস্ত বাসনা ভাবনা, ভালোই হোক মন্দই হোক, বেশ অসংশয় অসংকোচ এবং প্রশস্ত— প্রথার সঙ্গে বুদ্ধির, বুদ্ধির সঙ্গে ইচ্ছার, ইচ্ছার সঙ্গে কাজের কোনোরকম অহর্নিশি খিটিমিটি নেই। একবার যদি এই রুদ্ধ জীবনকে খুব উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ছাড়া দিতে পারতুম, একেবারে দিগ্‌বিদিকে ঢেউ খেলিয়ে ঝড় বাধিয়ে দিতুম, একটা বলিষ্ঠ বুনো ঘোড়ার মতো কেবল আপনার লঘুত্বের আনন্দ-আবেগে ছুটে যেতুম!

কিন্তু আমি বেদুইন নই, বাঙালি। আমি কোণে বসে বসে খুঁতখুঁত করব, বিচার করব, তর্ক করব, মনটাকে নিয়ে একবার ওল্টাব একবার পাল্টাব— যেমন করে মাছ ভাজে— ফুটন্ত তেলে একবার এপিঠ চিড়্‌বিড়্ করে উঠবে, একবার ওপিঠ চিড়্‌বিড়্ করবে। যাক গে! যখন রীতিমত অসভ্য হওয়া অসাধ্য তখন রীতিমত সভ্য হবার চেষ্টা করাই সংগত। সভ্যতা এবং বর্বরতার মধ্যে লড়াই বাধাবার দরকার নেই।...

এমনি আমি স্বভাবতঃ অসভ্য— মানুষের ঘনিষ্ঠতা আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ। অনেকখানি ফাঁকা চতুর্দিকে না পেলে আমি আমার মনটিকে সম্পূর্ণ unpack করে বেশ হাত পা ছড়িয়ে গুছিয়ে নিতে পারি নে। আশীর্বাদ করি মনুষ্যজাতির কল্যাণ হোক, কিন্তু আমাকে তাঁরা ঠেসে না ধরুন। ... বোধ হয় আমাকে সম্পূর্ণ বাদ দিলেও মনুষ্যসাধারণ ভালো ভালো সদ্‌বন্ধু খুঁজে পেতে পারবেন। তাঁদের সান্ত্বনার অভাব হবে না।

কলকাতা
১৪ জুন ১৮৯২

৫৫

শিলাইদহ
বুধবার, ২ আষাঢ়। ১২৯৯।

কাল আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বর্ষার নব রাজ্যাভিষেক বেশ রীতিমত আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে গেছে। দিনের বেলাটা খুব গরম হয়ে বিকেলের দিকে ভারী ঘনঘটা মেঘ করে এল।... কাল ভাবলুম, বর্ষার প্রথম দিনটা, আজ বরঞ্চ ভেজাও ভালো তবু অন্ধকূপের মধ্যে দিনযাপন করব না— জীবনে '৯৯ সাল আর দ্বিতীয়বার আসবে না— ভেবে দেখতে গেলে পরমায়ুর মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম দিন আর কবারই বা আসবে— সবগুলো কুড়িয়ে যদি ত্রিশটা দিন হয় তা হলেও খুব দীর্ঘ জীবন বলতে হবে। মেঘদূত লেখার পর থেকে আষাঢ়ের প্রথম দিনটা একটা বিশেষ চিহ্নিত দিন হয়ে গেছে— নিদেন আমার পক্ষে। আমি প্রায়ই এক-এক সময়ে ভাবি, এই-যে আমার জীবনে প্রত্যহ একটি একটি করে দিন আসছে, কোনোটি সূর্যোদয় সূর্যাস্তে রাঙা, কোনোটি ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধ নীল, কোনোটি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সাদা ফুলের মতো প্রফুল্ল, এগুলি কি আমার কম সৌভাগ্য! এবং এরা কি কম মূল্যবান! হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস সেই-যে আষাঢ়ের

প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং প্রকৃতির সেই রাজসভায় বসে অমর ছন্দে মানবের বিরহসংগীত গেয়েছিলেন, আমার জীবনেও প্রতি বৎসরে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ-জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়—সেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবির, সেই বহু-বহু-কালের শত শত সুখ দুঃখ বিরহ মিলন -ময় নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথম দিবস! সেই অতি পুরাতন আষাঢ়ের প্রথম মহাদিন আমার জীবনে প্রতি বৎসর একটি একটি করে কমে যাচ্ছে, অবশেষে এক সময় আসবে, যখন এই কালিদাসের দিন, এই মেঘদূতের দিন, এই ভারতবর্ষের বর্ষার চিরকালীন প্রথম দিন, আমার অদৃষ্টে আর একটিও অবশিষ্ট থাকবে না। এ কথা ভালো করে ভাবলে পৃথিবীর দিকে আবার ভালো করে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে—ইচ্ছে করে জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মতো বিদায় দিই। আমি যদি সাধু প্রকৃতির লোক হতুম তা হলে হয়তো মনে করতুম জীবন নশ্বর, অতএব প্রতিদিন বৃথা ব্যয় না করে সৎকার্যে এবং হরিনামে যাপন করি। আমার সে প্রকৃতি নয়—তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে—এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছি নে! এই সমস্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক ভূলোকের মাঝখানে সমস্ত-শূন্য-পরিপূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌন্দর্য, এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে! কত বড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা! এত বড়ো আশ্চর্য কাণ্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়া পাওয়াই যায় না! জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি! লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না, সে যেন আরও লক্ষযোজন দূরে! রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এক-একটি মানিকের মতো সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে। আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না! সেই বিলেত যাবার পথে লোহিতসমুদ্রের স্থির জলের উপরে যে-একটি অলৌকিক সূর্যাস্ত দেখেছিলুম, সে কোথায় গেছে! কিন্তু ভাগ্যিস্ আমি দেখেছিলুম, আমার জীবনে ভাগ্যিস্ সেই একটি সন্ধ্যা উপেক্ষিত হয়ে ব্যর্থ হয়ে যায় নি—অনন্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটি অত্যাশ্চর্য সূর্যাস্ত আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কবি দেখে নি। আমার জীবনে তার রঙ রয়ে গেছে। অমন এক-একটি দিন এক-একটি সম্পত্তির মতো। আমার সেই পেনেটির বাগানের গুটিকতক দিন, তেতালার ছাতের গুটিকতক রাত্রি, পশ্চিম ও দক্ষিণের বারান্দার গুটিকতক বর্ষা, চন্দননগরের গঙ্গার গুটিকতক সন্ধ্যা, দার্জিলিঙে সিঞ্চল শিখরের একটি সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়—এই রকম কতকগুলি উজ্জ্বল সুন্দর ক্ষণখণ্ড আমার যেন ফাইল করা রয়েছে। সৌন্দর্য আমার পক্ষে সত্যিকার নেশা! আমাকে সত্যি সত্যি ক্ষেপিয়ে তোলে। ছেলেবেলায় বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে যখন ছাদে পড়ে থাকতুম তখন জ্যোৎস্না যেন মদের শুভ্র ফেনার মতো একেবারে উপচে পড়ে নেশায় আমাকে ডুবিয়ে দিত।... যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি এখানকার মানুষগুলো সব অদ্ভুত জীব—এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথছে, পাছে দুটো চোখে কিছু দেখতে পায় এই জন্যে বহু যত্নে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে—বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারী অদ্ভুত! এরা যে ফুলের গাছে এক-একটি ঘ্যাটাটোপ পরিয়ে রাখে নি, চাঁদের নিচে চাঁদোয়া খাটায় নি, সেই আশ্চর্য। এই স্বেচ্ছা-অন্ধগুলো বন্ধ

পাল্কির মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কী দেখে চলে যাচ্ছে! যদি বাসনা এবং সাধনা -অনুরূপ পরকাল থাকে তা হলে এবার আমি এই ওয়াড়-পরানো পৃথিবী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেন এক উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্যের আনন্দলোকে গিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি। যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে— কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে— সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত; কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক্, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না। কী আমি ভদ্রলোক সেজে শহরের বড়ো রাস্তায় আনাগোনা করছি! পরিপাটি ভদ্রলোকদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথাবার্তা কয়ে জীবন মিথ্যে কাটিয়ে দিচ্ছি! আমি আন্তরিক অসভ্য, অভদ্র— আমার জন্যে কোথাও কি একটা ভারী সুন্দর অরাজকতা নেই! কতকগুলো ক্ষ্যাপা লোকের আনন্দমেলা নেই! কিন্তু আমি কী এ-সমস্ত কবিত্ব করছি— কাব্যের নায়কেরা এই রকম সব কথা বলে— কনভেন্‌শনালিটির উপরে তিন-চার-পাত-জোড়া স্বগত উক্তি প্রয়োগ করে, আপনাকে সমস্ত মানবসমাজের চেয়ে বড়ো মনে করে। বাস্তবিক, এসব কথা বলতে লজ্জা করে। এর মধ্যে যে সত্যটা আছে সে বহুকাল থেকে ক্রমাগত কথা চাপা পড়ে আসছে। পৃথিবীতে সবাই ভারী কথা কয়— তার মধ্যে আমি একজন অগ্রগণ্য— হঠাৎ এতক্ষণে সে বিষয়ে চেতনা হল।...

পুঃ— আসল যে কথাটা বলতে গিয়েছিলুম সেটা বলে নিই— ভয় পাস নে, আবার চার পাতা জুড়ব না— কথাটা হচ্ছে, পয়লা আষাঢ়ের দিন বিকেলে খুব মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাস্।

কলকাতা
১৬ জুন?
১৮৯২

৫৬

শিলাইদহ
[বৃহস্পতিবার] ১৬ জুন। ১৮৯২।

যতই একলা আপন মনে নদীর উপরে কিম্বা পাড়াগাঁয়ে কোনো খোলা জায়গায় থাকা যায় ততই প্রতিদিন পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, সহজ ভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর কিছু হতে পারে না! মাঠের তৃণ থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত তাই করছে; কেউ গায়ের জোরে আপনার সীমাকে অত্যন্ত বেশি অতিক্রম করবার জন্যে চেষ্টা করছে না বলেই প্রকৃতির মধ্যে এমন গভীর শান্তি এবং অপার সৌন্দর্য— অথচ প্রত্যেকে যেটুকু করছে সেটুকু বড়ো সামান্য নয়— ঘাস আপনার চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ করে তবে ঘাস-রূপে টিকে থাকতে পারে, তার শিকড়ের শেষ প্রান্তটুকু পর্যন্ত দিয়ে তাকে রসাকর্ষণ করতে হয়। সে যে নিজের শক্তি লঙ্ঘন করে নিজের কাজ অবহেলা করে বটগাছ হবার নিষ্ফল চেষ্টা করছে না, এই জন্যেই পৃথিবী এমন

সুন্দর শ্যামল হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক, বড়ো বড়ো উদ্যোগ এবং লম্বাচৌড়া কথার দ্বারা নয়, কিন্তু প্রাত্যহিক ছোটো ছোটো কর্তব্য-সমাধা-দ্বারাই মানুষের সমাজে যথাসম্ভব শোভা এবং শান্তি আছে। কবিত্বই বলো, বীরত্বই বলো, কোনোটাই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু একটি অতি ক্ষুদ্র কর্তব্যের মধ্যেও তৃপ্তি এবং সম্পূর্ণতা আছে। বসে বসে হাঁস্‌ফাঁস্‌ করা, কল্পনা করা, কোনো অবস্থাকেই আপনার যোগ্য মনে না করা, এবং ইতিমধ্যে সম্মুখ দিয়ে সময়কে চলে যেতে দেওয়া, ছোটো বড়ো সমস্ত কর্তব্যকে প্রতিদিন অলক্ষিতভাবে বয়ে যেতে দেওয়া, এর চেয়ে হেয় আর-কিছু হতে পারে না। যখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা যায় আপনার চারিদিককার সুখ এবং মঙ্গলের উদ্দেশে সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে নিজের সাধ্যায়ত্ত সমস্ত কর্তব্য সত্যের সঙ্গে, বলের সঙ্গে, হৃদয়ের সঙ্গে পালন করে যাব এবং যখন বিশ্বাস হয় তা করতে পারব, তখন সমস্ত জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, ছোটোখাটো দুঃখ বেদনা একেবারে দূর হয়ে যায়। অবশ্য, আমার জীবনের প্রতিদিন এবং প্রত্যেক মুহূর্ত আমার সম্মুখে এখন প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নেই, তাই হয়তো দূরে থেকে হঠাৎ একটা কাল্পনিক আশার উচ্ছ্বাসে স্ফীত হয়ে উঠছি, সমস্ত খুঁটিনাটি খিটিমিটি সংকট এবং সংঘর্ষ বাদ দিয়ে ভাবী জীবনের একটা মোটামুটি চিত্র অঙ্কিত করে এতটা ভরসা পাচ্ছি, কিন্তু তা ঠিক নয়।...

কলকাতা
১৭ জুন ১৮৯২

৫৭

শিলাইদহ
শুক্রবার, ৪ আষাঢ়। ১২৯৯।

আজকাল আমি বিকেলে সন্ধের দিকে ডাঙায় উঠে অনেকক্ষণ বেড়াতে থাকি—পূর্ব দিকে যখন ফিরি এক রকম দৃশ্য দেখতে পাই, পশ্চিমে যখন ফিরি আর-এক রকম দেখতে পাই—আকাশ থেকে আমার মাথার উপরে যেন সান্ত্বনা বৃষ্টি হতে থাকে, আমার দুই মুগ্ধ চোখের ভিতর দিয়ে যেন একটি স্বর্ণময় মঙ্গলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। এই বাতাসে আকাশে এবং আলোকে প্রতিক্ষণে আমার মন ছেয়ে যেন নতুন পাতা গজিয়ে উঠছে—আমি নতুন প্রাণ এবং বলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছি। সংসারের সমস্ত কাজ করা এবং লোকের সঙ্গে ব্যবহার করা আমার পক্ষে ভারী সহজ হয়ে পড়েছে। আসলে সবই সোজা—একটিমাত্র সিধে রাস্তা আছে, চোখ চেয়ে সেই রাস্তা ধরে গেলেই হল: নানা রকম বুদ্ধিপূর্বক short cut খোঁজবার দরকার দেখি নে—সুখ দুঃখ সকল রাস্তাতেই আছে, কোনো রাস্তা দিয়েই তাদের এড়িয়ে যাবার জো নেই—কিন্তু শান্তি কেবল এই বড়ো রাস্তাতেই আছে।

কলকাতা
১৮ জুন ১৮৯২

৫৮

গোয়ালন্দের পথে
২১ জুন ১৮৯২

আজ সমস্ত দিন নদীর উপরে ভেসে চলেছি। আশ্চর্য এই বোধ হচ্ছে যে, কতবার এই রাস্তা দিয়ে গেছি, এই বোটে চড়ে জলে জলে বেড়িয়েছি—এবং নদীর দুই তীরের মাঝখান দিয়ে ভেসে যাবার যে একটা বিশেষ আনন্দ আছে সে উপভোগ করেছি—কিন্তু দিন দুই ডাঙায় বসে থাকলে সেটা ঠিকটা আর মনে থাকে না। এই-যে একলাটি চুপ করে বসে চেয়ে থাকা—দুই ধারে গ্রাম ঘাট শস্যক্ষেত্র চর বিচিত্র ছবি দেখা দিচ্ছে এবং চলে যাচ্ছে, আকাশে মেঘ ভাসছে এবং সন্ধের সময় নানা রকম রঙ ফুটছে—নৌকো চলেছে, জেলেরা মাছ ধরছে, অহর্নিশি জলের এক প্রকার আদরপরিপূর্ণ তরল শব্দ শোনা যাচ্ছে—সন্ধেবেলায় বিস্তৃত জলরাশি শ্রান্ত নিদ্রিত শিশুর মতো একেবারে স্থির হয়ে যাচ্ছে এবং উন্মুক্ত আকাশের সমস্ত তারা মাথার উপরে জেগে চেয়ে আছে—গভীর রাত্রে যেদিন ঘুম নেই সেদিন উঠে বসে দেখি অন্ধকারাচ্ছন্ন দুই কূল নিদ্রিত—মাঝে মাঝে কেবল গ্রামের বনে শৃগাল ডাকছে এবং পদ্মার নীরব খরস্রোতে ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করে পাড় খসে খসে পড়ছে—এই-সমস্ত পরিবর্তমান ছবি যেমন যেমন চোখে পড়তে থাকে অমনি মনের ভিতরে একটা কল্পনার স্রোত বইতে থাকে এবং তার দুই পারে সুদূর তটদৃশ্যের মতো নব নব আকাঙ্ক্ষার চিত্র দেখা দিতে থাকে। হয়তো সম্মুখের দৃশ্যটা খুব একটা চমৎকার কিছু নয়—একটা হলদে রকমের তৃণতরুশূন্য বালির চর ধু ধু করছে, তারই গায়ে একটা জনশূন্য নৌকো বাঁধা রয়েছে এবং আকাশের ছায়ায় ফিকে-নীলবর্ণ নদী বয়ে চলে যাচ্ছে—দেখে মনের ভিতরে কী রকম করে বলতে পারি নে—বোধ হয় সেই ছেলেবেলায় যখন আরব্য-উপন্যাস পড়তুম, সিন্ধ্‌বাদ নানা নূতন দেশে বাণিজ্য করতে বাহির হত, ভৃত্য-শাসিত আমি তোষাখানার মধ্যে রুদ্ধ হয়ে বসে বসে দুপুর বেলায় সিন্ধ্‌বাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতুম, তখন যে আকাঙ্ক্ষাটা মনের মধ্যে জন্মেছিল সেটা যেন এখনো বেঁচে আছে—এই বালিচরে নৌকো বাঁধা দেখলে সেই যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ছেলেবেলায় যদি আরব্য-উপন্যাস রবিন্‌সন্‌ক্রুসো না পড়তুম, রূপকথা না শুনতুম, তা হলে নিশ্চয় বলতে পারি ঐ নদীতীর এবং মাঠের প্রান্তের দূর দৃশ্য দেখে ঠিক এমন ভাব মনে উদয় হত না সমস্ত পৃথিবীর চেহারা আমার পক্ষে আর-এক রকম হয়ে যেত। এইটুকু মানুষের মনের ভিতরে বাস্তবিকে কাল্পনিকে জড়িয়ে-জড়িয়ে কী-যে একটা জাল পাকিয়ে আছে! কিসের সঙ্গে যে কী গেঁথে গেছে—কত গল্পের সঙ্গে, ছবির সঙ্গে, ঘটনার সঙ্গে, সামান্যের সঙ্গে, বড়োর সঙ্গে, জড়িয়ে গিঁট পড়ে আছে—প্রতিদিন অজ্ঞাতে জড়িয়ে যাচ্ছে—একটা মানুষের একটা বৃহৎ জীবনের জাল খুলতে পারলে কত ছোটো এবং কত বড়োর মিশোল আলাদা করা যায়—কী-একটা হেটেরোজিনিয়াস স্তূপ হয়!

কলকাতা
২২ জুন ১৮৯২

৫৯

শিলাইদহ
সোমবার, ২২ জুন। ১৮৯২।

আজ খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনছিলুম ঘাটে মেয়েরা উলু দিচ্ছে—শুনে মনটা কেমন ঈষৎ বিকল হয়ে গেল, অথচ তার কারণ ভেবে পাওয়া শক্ত। বোধ হয় এই রকমের একটা আনন্দধ্বনিতে হঠাৎ অনুভব করা যায় পৃথিবীতে একটা বৃহৎ কর্মপ্রবাহ চলছে যার অধিকাংশের সঙ্গে আমার যোগ নেই—পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আমার কেউ নয়, অথচ তাদের কত কাজকর্ম সুখদুঃখ উৎসব-আনন্দ চলছে—কী বৃহৎ পৃথিবী! কী বিপুল মানবসংসার! কত সুদূর থেকে জীবনের ধ্বনি প্রবাহিত হয়ে আসে—সম্পূর্ণ অপরিচিত ঘরের একটুখানি বার্তা পাওয়া যায়। মানুষ যখন বুঝতে পারে 'আমার কাছে আমি যত বড়োই হই আমাকে দিয়ে সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ করতে পারি নে—অধিকাংশ জগৎই আমার অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়, অনাত্মীয়, আমা-হীন'—তখন এই প্রকাণ্ড ঢিলে জগতের মধ্যে আপনাকে অত্যন্ত খাটো এবং এক রকম পরিত্যক্ত এবং প্রান্তবর্তী বলে মনে হয়—তখনি মনের মধ্যে এই রকমের একটা ব্যাপ্ত বিষাদের উদয় হয়। তা ছাড়া এই উলুধ্বনিতে নিজের অতীত ভবিষ্যৎ সমস্ত জীবনটা একটি অতি সুদীর্ঘ পথের মতো চোখের সম্মুখে উদয় হল এবং তারই এক-একটি সুদূর ছায়াময় প্রান্ত থেকে এই উলুধ্বনি কানে এসে পৌঁছতে লাগল। এই রকম ভাবে তো আজ দিনটা আরম্ভ করেছি। এখনি সদর-নায়েব আমলাবর্গ এবং প্রজারা উপস্থিত হলে এই উলুধ্বনির প্রতিধ্বনিটুকু পাড়া ছেড়ে পালাবে, অতি ক্ষীণ ভূত ভবিষ্যৎকে দুই কনুই দিয়ে ঠেলে ফেলে জোয়ান বর্তমান নিজমূর্তি ধরে সেলাম ঠুকে এসে দাঁড়াবে—খাজনা আদায়ে মন দিতে হবে।......

কাল আমার নাটকটাকে শেষ পোঁচ দেওয়া সমাপ্ত করেছি। একটু-আধটু বদল-সদল হয়েছে—নাটকে আবার খুব বেশি হাত ছেড়ে দেওয়া যায় না—কাজটা অনেকটা চৌঘুড়ি হাঁকানোর মতো—অনেকগুলো ঘোড়াকে এক গাড়িতে জুতে, এক রাস্তা দিয়ে, এক উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া। সুতরাং ওর মধ্যে কোনো-একটা ঘোড়াকে বেশি লাগাম ছেড়ে দেওয়া যায় না, সব কটাকে সমান গতিতে ছোটানো চাই।... বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে চিঠিতে বন্ধুত্ব জাগিয়ে রাখা সম্বন্ধে তোর সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য নেই—দূর থেকে মাঝে মাঝে কেবল পত্রব্যজন করে বন্ধুত্ববহ্নিকে ভস্মগ্রাস থেকে রক্ষা করা বিষম বিরক্তির কাজ এবং প্রায় অসাধ্য বললেই হয়। পৃথিবীতে ছোটোখাটো আত্মীয়তা প্রতিদিন আসছে এবং যাচ্ছে—আমার সঙ্গে তাদের জীবনের প্রধান বন্ধন কিছুই নেই—তাদের যেখানে সংসারের কেন্দ্র, তাদের গুরুতর সুখ দুঃখ যার চার দিকে আবর্তিত হচ্ছে, আমার পক্ষে সে এক রকম সম্পূর্ণ অপরিচিত। এমন স্থলে সকল রকম বাধা অতিক্রম করে পরস্পরকে টানাটানি করে রাখবার কী এমন অত্যাবশ্যক পড়েছে!

কলকাতা
২৩ জুন ১৮৯২

৬০

সাজাদপুর
সোমবার, ২৭ জুন। ১৮৯২।

কাল বিকেলের দিকে এমনি করে এল, আমার ভয় হল। এমনতর রাগী চেহারার মেঘ আমি কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না—গাঢ় নীল মেঘ দিগন্তের কাছে একেবারে থাকে থাকে ফুলে উঠেছে, একটা প্রকাণ্ড হিংস্র দৈত্যের রোষস্ফীত গোঁফ-জোড়াটার মতো। এই ঘন নীলের ঠিক পাশেই দিগন্তের সব শেষে ছিন্ন মেঘের ভিতর থেকে একটা টক্‌টকে রক্তবর্ণ আভা বেরোচ্ছে—একটা আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড অলৌকিক 'বাইসন' মোষ যেন ক্ষেপে উঠে রাঙা চোখ দুটো পাকিয়ে ঘাড়ের নীল কেশরগুলো ফুলিয়ে বক্রভাবে মাথাটা নিচু করে দাঁড়িয়েছে, এখনি পৃথিবীকে শৃঙ্গাঘাত করতে আরম্ভ করে দেবে এবং এই আসন্ন সংকটের সময় পৃথিবীর সমস্ত শস্যক্ষেত এবং গাছের পাতা হী হী করছে, জলের উপরিভাগ শিউরে শিউরে উঠছে, কাকগুলো অশান্তভাবে উড়ে উড়ে কা কা করে ডাকছে।

কলকাতা
২৯ জুন ১৮৯২

৬১

সাজাদপুর
২৮ জুন। ১৮৯২।

তোর আজকের চিঠির মধ্যে এক জায়গায় অভির গানের একটুখানি উল্লেখ আছে—পড়ে মনটা কেমন হঠাৎ হুহু করে উঠল—জীবনের অনেকগুলি ছোটো ছোটো উপেক্ষিত সুখ, যারা শহরের গোলমালের মধ্যে কোনো আমল পায় না, বিদেশে এলে তারা সময় বুঝে হৃদয়ের কাছে আপন আপন দরখাস্ত পাঠিয়ে দেয়। আমি গান বাজনা এত ভালোবাসি, এবং শহরেও এত কণ্ঠ এবং বাদ্য আছে, কিন্তু দিনের পর দিন চলে যায় একদিনও প্রায় গান বাজনায় কর্ণপাত করি নে। যদিও সব সময়ে বুঝতে পারি নে কিন্তু মনের ভিতরটা কি তৃষিত হয়ে থাকে না! তোর চিঠি পড়বামাত্রই অভির মিষ্টি গান শোনবার জন্যে আমার এমনি ইচ্ছে করে উঠল যে তখনি বুঝতে পারলুম, আমার প্রকৃতির অনেকগুলি ক্রন্দনের মধ্যে এও একটা ক্রন্দন ভিতরে ভিতরে চাপা ছিল। বড়ো বড়ো দুরাশার মোহে জীবনের ছোটো ছোটো আনন্দগুলিকে উপেক্ষা করে আমাদের জীবনকে কী উপবাসী করেই রাখি! যখন বিলেতে যাচ্ছিলুম আমার একটা কল্পনার সুখের ছবি এই ছিল যে, তোরা কেউ পিয়ানো বাজাচ্ছিস, খোলা দরজা-জানলার ভিতর দিয়ে আলো এবং বাতাস আসছে এবং খানিকটা সুদূর আকাশ ও গাছপালা দেখা যাচ্ছে—আমি একটা খোলা জানলার কাছে কৌচের উপর পড়ে বাইরে চোখ রেখে শুনছি। এটা যে খুবই একটা দুর্লভ দুরাশা তা বলতে পারি নে, কিন্তু তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে কদিন অদৃষ্টে এ সুখ পাওয়া যায়! এই-সমস্ত সুলভ আনন্দের

অপরিতৃপ্ত জীবনের হিসাবে প্রতিদিন বেড়ে উঠছে, এর পরে এমন একটা দিন আসতেও পারে যখন মনে হবে যদি আবার জীবনটা সমস্তটা ফিরে পাই তা হলে আর কিছু অসাধ্য সাধন করতে চাই নে, কেবল জীবনের এই প্রতিদিনের অযাচিত ছোটো ছোটো আনন্দগুলি প্রতিদিন উপভোগ করে নিই। যা হোক, মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, এবারে যখন কলকাতায় ফিরব তখন মাঝে মাঝে অভির গান শুনব এবং তোরা যখন বাজনা বাজাতে ইচ্ছে করবি আমাকে শ্রোতার মধ্যে গণ্য করে নিস। এবারে কলকাতায় গিয়ে কত কী যে করব তার ঠিক নেই—কাজ করব, গান করব, হাসব, গল্প করব, ভালো বাসব, রাত্তিরে গভীর নিদ্রা দেব এবং সকালে উঠে নব নব সূর্যোদয়কে আনন্দে অভ্যর্থনা করে প্রতিদিনের কাজের মধ্যে প্রবেশ করব—বিক্ষিপ্ত জীবনকে সংহত করে এনে বেশ একটি ছায়াময় শান্তিময় সংগীতময় ছোটো স্রোতের মধ্যে প্রবাহিত করে দেব। লেখার চেয়ে করা কিঞ্চিৎ শক্ত হবে, কিন্তু সেই কঠিন হবে বলেই সুখ আছে।

কলকাতা
৩০ জুন?
১৮৯২

৬২

সাজাদপুর
২৯ জুন। ১৮৯২।

তোকে চিঠিতে লিখেছিলেম কাল 7 p. m.'এর সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজমেণ্ট্ করা যাবে। বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি, হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্ট্‌মাস্টার এসে উপস্থিত। মৃত কবির চেয়ে একজন জীবিত পোস্ট্‌মাস্টারের দাবি ঢের বেশি—আমি তাকে বলতে পারলুম না 'আপনি এখন যান, কালিদাসের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ আবশ্যক আছে'—বললেও সে লোকটা ভালো বুঝতে পারত না। অতএব পোস্ট্‌মাস্টারকে চৌকিটি ছেড়ে দিয়ে কালিদাসকে আস্তে আস্তে বিদায় নিতে হল। এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট্ আফিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখনি আমি একদিন দুপুর বেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্ট্‌মাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম, এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোল তখন আমাদের পোস্ট্‌মাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাই হোক, এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানারকম গল্প করে যায়, আমি চুপ করে বসে শুনি। ওর মধ্যে আবার বেশ একটুখানি হাস্যরসও আছে। তাই জন্যে খুব শীঘ্র জমিয়ে তুলতে পারে। সমস্ত দিন চুপচাপ একলা বসে থেকে মাঝে মাঝে এইরকম জীবন্ত মানুষের সংঘাতে আবার যেন সমস্ত জীবনটা তরঙ্গিত হয়ে ওঠে।... তিনি আমাদের মুন্সেফ বাবুর গল্প করছিলেন। ব্যাপারটা শুনে এবং তাঁর বলবার ভঙ্গী দেখে আমি হেসে হেসে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলুম। কথাটা হচ্ছে এই, মুন্সেফ বাবু হঠাৎ

একটা গাছের গুঁড়ির মধ্যে শিব দেখতে পেয়েছেন। প্রথম দিন দেখলেন শিব, তার পরদিন দেখলেন কালী, তার পরদিন রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি—সমস্ত বৈকুণ্ঠপুরী আমাদের সাজাদপুরের বটতলায় হঠাৎ নেবে এসেছে। তিনি সকলকেই ধরে ধরে বলছেন—'ঐ দেখুন, ঐ দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন না! ঐ চোখ! ঐ জিব!' যারা তাঁর আমলা এবং অনুগত লোক তারা কাজে-কাজেই দেখতে পাচ্ছে, আর যাদের তাঁর প্রতি কিছু নির্ভর নেই তারা কিছুতেই দেখতে পাচ্ছে না। আমাদের পোস্ট্‌মাস্টার সেই শ্রেণীর লোক। যেদিন ক্ষীর এবং কাঁঠাল দিয়ে ঠাকরুনের ভোগ হয় সেই দিন তিনি দেখতে পান—কিন্তু ক্ষীরটুকু নিঃশেষ হয়ে গেলেই তিনি মুন্সেফকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কোন্‌টাকে চোখ বলছিলেন মশায়?' মুন্সেফ বলেন, 'দেখতে পাচ্ছেন না? ঐ যে ঐ উপরে!' পোস্ট্‌-মাস্টার গম্ভীরভাবে বলেন, 'বটে! আমি ঠিক ঐটেকেই মাথা মনে করেছিলুম।' কোনোদিন বা মুন্সেফ তাঁকে বলেন, 'আচ্ছা মশায়, আপনি ওটা কি লক্ষ্য করে দেখছিলেন? আজ আরতির সময় কাঁসর ঘণ্টা বাজবামাত্র কী যেন একটা গাছের উপর এসে বসল আর উপর থেকে দু-চার ফোঁটা জল পড়ল!' পোস্ট্‌মাস্টার ভালোমানুষের মতো মুখ করে উত্তর দেন, 'আজ্ঞে হাঁ—গাছটা নড়েছিল বটে।' সে গাছটার চার দিক বাঁধিয়ে ফেলা হয়েছে—মুন্সেফ সেখানে দু বেলা পুজো দিচ্ছেন, শাঁখ ঘণ্টা বাজছে, একজন সন্ন্যাসী সেখানে বসে গাঁজা টানছে এবং চোখ বুজে বলছে 'ঐ কালী মায়ীকে দেখতে পাচ্ছি'। এক-একটা লোক আবার সেখানে গিয়ে মূর্ছা যায়, এবং মূর্ছিত অবস্থায় দৈববাণী বলতে থাকে। বিবিধপ্রকার বুজ্‌রুকি হতে আরম্ভ হয়েছে। পোস্ট্‌মাস্টার বলছিলেন, 'আপনাদের জমিদারিতে ম্যাজিস্ট্রেট এলে আপনারা দেখা করতে যান, আর এতগুলো দেবতা বটতলায় এসে আশ্রয় নিলেন—আপনার উচিত একবার ভিজিট পে করে আসা।' আমিও মনে করছি একবার মজাটা দেখে এলে হয়। যাই হোক, কিছুদিন এই হুজুকটা চললে সাজাদপুর একটা তীর্থস্থান হয়ে উঠতে পারে। তাতে আমাদের লাভ আছে। পোস্ট্‌মাস্টার চলে গেলে সেই রাত্রে আবার রঘুবংশ নিয়ে পড়লুম। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর পড়ছিলুম। সভায় সিংহাসনের উপর সারি সারি সুসজ্জিত সুন্দর-চেহারা রাজারা বসে গেছেন—এবং এক সময়ে শঙ্খ এবং তূরী -ধ্বনির মধ্যে বিবাহবেশ পরে সুনন্দার হাত ধরে ইন্দুমতী তাঁদের মাঝখানের সভাপথে এসে দাঁড়ালেন। ছবিটি মনে করতে এমনি সুন্দর লাগে! তার পরে সুনন্দা এক-এক জনের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আর ইন্দুমতী অনুরাগ-হীন এক-একটি প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। এই প্রণাম করাটি কেমন সুন্দর! যাকে ত্যাগ করছেন তাকে যে নম্রভাবে সম্মান করে যাচ্ছেন এতে কতটা মানিয়ে যাচ্ছে! ইংরাজ গর্বিণীর ঔদ্ধত্যের চেয়ে এ ঢের ভালো। সকলেই রাজা এবং সকলেই তার চেয়ে বয়সে বড়ো, ইন্দুমতী একটি বালিকা, সে যে তাঁদের একে একে অতিক্রম করে যাচ্ছে এই অবশ্য রূঢ়তাটুকু যদি একটি একটি সুন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেত তা হলে এই দৃশ্যের সৌন্দর্য থাকত না। কিন্তু অজের গলায় মালা দেবার পূর্বেই অনেক রাত হওয়াতে শুতে যেতে হল—তাই কাল প্রিয়র বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দুমতীর বিয়েটা সমাধা হয়ে উঠল না।

কলকাতা
১ জুলাই ১৮৯২

৬৩

সাজাদপুর
৩০ জুন। ১৮৯২।

মেয়েদের নূতন জীবনে প্রবেশ করার যে কী ভাব তা পুরুষের পক্ষে বোঝা একটু শক্ত—বিশেষতঃ আমাদের মতো হাড়পাকা বুড়ো লোকের। বোধ হয় ওর মধ্যে খুব একটা নেশা আছে—ঈষৎ আশঙ্কা মিশ্রিত থাকাতে ওর তীব্রতা আরও অনেকটা বাড়িয়ে তোলে।...সেই বন্ধনমুক্তির মধ্যে অনেকখানি উল্লাস এবং একটুখানি দুঃখও আছে বোধ হয়। আমার পক্ষে কল্পনা করা দুরূহ, একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে অপরিচিত স্থানে দিন রাত কেমন করে কাটে! মনে করলে অসহ্য শ্রান্তি বোধ হয়। তার কারণ আমি নিজে পুরুষমানুষ। মেয়েরা সৃষ্টিকাল পর্যন্ত ঐ কাজ করে আসছে। ওটা তাদের নিতান্ত স্বাভাবিক হয়ে গেছে। একটা নতুন স্বামীকে হাতে করে নিয়ে তার সুখ দুঃখ তার ইচ্ছা অনিচ্ছা বিচার করে একটা সুগম্ভীর পুতুলখেলা করতে বোধ হয় বেশ লাগে—বিশেষতঃ সেটাই যখন জীবনের একমাত্র কর্তব্য কার্য। আমরা বৃদ্ধবয়সে জীবনের অনেকগুলো বৈরাগ্যের মধ্যে রুদ্ধালোকে বসে বসে ফিলজফি করছি, আমরা কী করে ঠিক বুঝব একজন নবীনা তার সমস্ত প্রস্ফুটিত হৃদয়মন নিয়ে যখন একটা জীবন থেকে আর-একটা নূতন আশাপূর্ণ জীবনের উপরে গিয়ে পড়ে তখন সেই প্রথম মুহূর্তে তার সমস্ত অস্তিত্ব কিরকম একটা দীপ্তিতে উজ্জ্বল উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে! আর একজনের নবীন জীবনের নব আশার কথা আমার মতো লোকের কাছে একটা বহুদূরের দৃশ্যের মতো বোধ হয়—সে জায়গা থেকে আমরা যেন অনেক কাল হল চলে এসেছি। কিন্তু আমাদেরও একটা বৃহৎ নবজীবন আছে—সম্মুখে এক-একবার খুব একটা প্রশস্ত আশার সংগীত শুনতে পাই, যেন দূরে আকাশব্যাপী একটা অর্গান থেকে আসছে। আমাদের নবজীবন হচ্ছে যখন সুখ ছেড়ে সন্তোষের বৃহৎ-রাজ্যে প্রবেশ করি—বৃথা সন্ধান পরিত্যাগ করে সমস্ত কর্তব্যগুলিকে অকাতরে গ্রহণ করি। সেও একটা বৃহৎ স্বাতন্ত্র্য লাভ করা, আপনার সমস্ত বোঝা এবং পাথেয় স্কন্ধে করে রাজপথে বেরিয়ে পড়া। এখন আমাদের সামনের নহবৎখানা থেকে ঠিক সাহানা বাজছে না। কানাড়ার তান দিয়েছে—রাত্রি যতই গভীর হবে ততই সেটা মধুর শোনাবে। পিছন ফিরে পৃথিবীটাকে দেখতে এখন বেশ লাগে—তোরা সবাই এখনকার নতুন কালের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে জীবনের নানা দিকে নানা ভাবে প্রবাহিত হতে যাচ্ছিস, সব-সুদ্ধ মিলে তার একটা ভারী মধুর সংগীত আছে—তোদের ঐ নবজীবনের বিচিত্র আনন্দধ্বনি আমি যেন বেশ স্নিগ্ধশীতল শান্ত হৃদয়ে শুনতে পারি এবং আমার জীবনদিগন্ত থেকে একটি সুন্দর স্নেহ-আনন্দের আভা তোদের নবীন সংসারের উপরে যেন শান্তিবচনের মতো পড়ে। মঙ্গল আমার হৃদয় থেকে প্রতিফলিত হয়ে তোদের ললাটে গিয়ে পড়ুক।

কলকাতা
২ জুলাই ১৮৯২

৬৪

সাজাদপুর
৩ জুলাই। ১৮৯২।

কাল রাত্তিরে আমি বেশ একটা নতুন রকমের স্বপ্ন দেখেছি। যেন কোথায় এক জায়গায় লেপ্‌টেনেণ্ট্‌ গবর্নর এসেছে এবং তার অভ্যর্থনা-উপলক্ষ্যে উৎসব হচ্ছে। অন্যান্য নানারকম আমোদের মধ্যে একটা তাম্বুতে একজন বিখ্যাত বুড়ো গাইয়ে গান গাচ্ছে। আমি সে তাম্বুর ভিতরে বসে নেই, কিন্তু বাইরে থেকে সমস্ত শুনতে পাচ্ছি। গাইয়েটা একটা বড়োরকম ইমনকল্যাণ গান গাচ্ছিল। গাইতে গাইতে হঠাৎ এক জায়গায় সে ভুলে গেল। দুবার সেটা ফিরে ফিরে মনে করবার চেষ্টা করলে—তার পর তৃতীয় বারের বার নিরাশ হয়ে তার কথাগুলো ছেড়ে দিয়ে অমনি কেবল সুরটা ভেঁজে যেতে যেতে হঠাৎ তার সুরটা কেমন করে কান্নায় পরিবর্তিত হয়ে গেল—সবাই মনে করছিল সে গান গাচ্ছে, হঠাৎ দেখলে সে কান্না। তার কান্না শুনে বড়দাদা 'আহা আহা' করে উঠলেন, একজন প্রকৃত আর্টিস্টের মনে এরকম ঘটনায় কতখানি আঘাত লাগতে পারে তিনি যেন সেটা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন—বাইরে থেকে তার সেই আন্তরিক শোকের স্বর শুনে আমারও ভারী কণ্ঠ হতে লাগল—পাছে শ্রোতাদের মধ্যে এমন ঢের লোক থাকে যারা এই গায়কের হঠাৎ এই শোকোচ্ছ্বাস ভারী অদ্ভুত বলে মনে করে, এর যথার্থ মর্মটুকু না বুঝতে পেরে লোকটার উপর আধা বিরক্তি আধা পরিহাস প্রকাশ করে, আমার ইচ্ছে করছিল কোনো রকমে তাকে আড়াল করে রাখতে। তার পরে নানারকম অসংলগ্ন হিজিবিজি কী হল এবং বাংলা মুল্লুকের লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্নর যে কোথায় উড়ে গেল তার কিছুই মনে নেই। যা হোক, স্বপ্নের এই প্রথমাংশটুকু বেশ লাগল।

কলকাতা। ৫ জুলাই ১৮৯২

সাজাদপুর
৪ জুলাই। ১৮৯২।

আজ সাজাদপুর স্কুলের ছাত্রসভায় আমাকে যেতে হয়েছিল।...বেলা চারটের সময় সভাগৃহে গিয়ে উপস্থিত হলুম। আমাকে গিয়ে সভাপতির আসনে বসতে হল। যদিও আমার সভ্যেরা সমস্তই প্রায় অপ্রাপ্তবয়স্ক অজাতশ্মশ্রু পাড়াগেঁয়ে ছাত্র, তবু দাঁড়িয়ে উঠে বক্তৃতা করবার আসন্ন সম্ভাবনায় সমস্ত ক্ষণ আমার বুকে ব্যথা করতে লাগল—মনকে নানারকম ভরসা দিয়ে কিছুতেই সেটা নিবারণ করতে পারলুম না। প্রথম ছাত্রটি অতি অদ্ভুত ইংরিজিতে স্বাস্থ্যের উপকারিতা সম্বন্ধে বলতে লাগল; বললে : Used key is not dirty. Great men always take care of their health. Take for instance Pundit Vidyasagar & Keshab Chandra

Sen. They took great care of their health. If you do not take care of your health you get ill and you cannot study or do anything। এই রকম সব জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী ইংরাজিতে এবং বাংলাতে শোনা গেল। অবশেষে আমাকেও এক সময়ে উঠে দাঁড়াতে হল— আমি যথাসাধ্য সংক্ষেপে সেরে দিলুম। গম্ভীরস্বরে বললুম— ছাত্রগণ! আজ তোমরা যে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলে সেই জিনিসটা এবং মৌখিক আলোচনা করবার শক্তি উভয়েরই অভাব থাকাতে আমি আজ অধিক কিছু বলতে পারব না— তা ছাড়া বিষয়টা এমনি যে ও বিষয়ে নূতন কথা বলা ভারী শক্ত। কিন্তু শরীর অসুস্থ হলে কী কষ্ট এবং সুস্থ থাকলে কী সুখ, অনুমান করি, সে বিষয়ে তোমরা এমনি পরিষ্কার বুঝেছ যে আমি ও সম্বন্ধে কোনো নতুন কথা না বললেও তোমরা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে চেষ্টা করবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। বলতে বলতে আরও দুটো-চারটে কথা বেরিয়ে পড়ল, এবং বক্তৃতাটা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয় নি।

কলকাতা
৬ জুলাই ১৮৯২

সাজাদপুর
৫ জুলাই। ১৮৯২।

আজ আমাদের এখানে পুণ্যাহ। কাল রাত্তির থেকে বাজনা বাজছে। কাল সন্ধের সময় এখানে হঠাৎ কোথা থেকে একটা Brass Band এসে উপস্থিত—ইংরিজি ধাঁচের দিশি সুর বাজায় কতকটা থিয়েটারের কন্সর্টের মতো— ভ্যাঁপো ভ্যাঁপো করে এবং খুব প্রাণপণ জোরে ড্রাম পিটোয়, বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। কিন্তু আজ সকালে একটা সানাইয়েতে ভৈরবী বাজাচ্ছিল, এমনি অতিরিক্ত মিষ্টি লাগছিল যে সে আর কী বলব— আমার চোখের সামনেকার শূন্য আকাশ এবং বাতাস পর্যন্ত একটা অন্তর্নিরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে যেন স্ফীত হয়ে উঠছিল— বড়ো কাতর কিন্তু বড়ো সুন্দর— সেই সুরটাই গলায় কেন যে তেমন করে আসে না বুঝতে পারি নে। মানুষের গলার চেয়ে কাঁসার নলের ভিতরে কেন এত বেশি ভাব প্রকাশ করে! এখন আবার তারা মুলতান বাজাচ্ছে— মনটা বড়োই উদাস করে দিয়েছে— পৃথিবীর এই সমস্ত সবুজ দৃশ্যের উপরে একটি অশ্রুবাষ্পের আবরণ টেনে দিয়েছে— একপর্দা মুলতান রাগিণীর ভিতর দিয়ে সমস্ত জগৎ দেখা যাচ্ছে। যদি সব সময়েই এইরকম এক-একটা রাগিণীর ভিতর দিয়ে জগৎ দেখা যেত তা হলে বেশ হত। আমার আজকাল ভারী গান শিখতে ইচ্ছে করে— বেশ অনেক-গুলো ভূপালী ... এবং করুণ বর্ষার সুর— অনেক বেশ ভালো ভালো হিন্দুস্থানী গান— গান প্রায় কিচ্ছুই জানি নে বললে হয়।

কলকাতা
৭ জুলাই ১৮৯২

৬৭

শিলাইদহ
২০ জুলাই। ১৮৯২।

আজ এই মাত্র প্রাণটা যাবার জো হয়েছিল। কী করে যে বাঁচল ঠিক বুঝতে পারছি নে। যা হোক, বেঁচেছে সে জন্য দুঃখিত নই। পান্টি থেকে আজ শিলাইদহে যাচ্ছিলুম—বেশ পাল পেয়েছিলুম, খুব হুহুঃ শব্দে চলে আসছিলুম—বর্ষার নদী চার দিকে থৈ থৈ করছে এবং হৈ হৈ শব্দে ঢেউ উঠছে—আমি মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছি এবং মাঝে মাঝে লেখাপড়া করছি। বেলা সাড়ে দশটার সময় গড়ুই নদীর ব্রিজ দেখা গেল। বোটের মাস্তুল ব্রিজে বাধবে কি না তাই নিয়ে মাঝিদের মধ্যে তর্ক পড়ে গেল, ইতিমধ্যে বোট ব্রিজের অভিমুখে চলেছে। মাঝিদের আশা ছিল যে, আমরা স্রোতের বিপরীত মুখে যখন চলেছি তখন ভাবনা নেই, কারণ ব্রিজের কাছাকাছি এসেও যদি দেখা যায় যে মাস্তুল বাধবে তখনই পাল নাবিয়ে দিলে বোট স্রোতে পিছিয়ে যাবে। কিন্তু ব্রিজের কাছে এসে আবিষ্কার করা গেল মাস্তুল ব্রিজে ঠেকবে এবং সেখানে একটা আওড় (আবর্ত) আছে। সেই আওড় থাকাতে সেখানে স্রোতের গতি বিপরীত মুখে হয়েছে। তখন বোঝা গেল সামনে একটি সর্বনাশ উপস্থিত। কিন্তু বেশিক্ষণ চিন্তা করবার সময় ছিল না—দেখতে দেখতে বোটটা ব্রিজের উপর গিয়ে পড়ল। মাস্তুল মড় মড় করে ক্রমেই কাত হতে লাগল—আমি হতবুদ্ধি মাঝিদের ক্রমাগত বলছি, 'তোরা ওখান থেকে সর্, মাস্তুল ভেঙে তোদের মাথার উপর পড়বে।'—এমন সময় আর-একটা নৌকো তাড়াতাড়ি দাঁড় বেয়ে এসে আমাকে তুলে নিলে এবং রশি নিয়ে আমাদের বোটটাকে টানতে লাগল। তপ্‌সি এবং আর-একজন মাঝি রশি দাঁতে কামড়ে ধরে সাঁতরে ডাঙায় গিয়ে টানতে লাগল। ডাঙায় আরও অনেক লোক জমা হয়ে বোট টেনে তুললে। কিন্তু কারও কোনো আশা ছিল না। মাস্তুল যত কাত হচ্ছিল বোটও তত কাত হয়ে পড়ছিল—যদি সময়মত নৌকো না আসত আর বেশিক্ষণ টিকত না। সকলে ডাঙায় ভিড় করে এসে বললে, 'আল্লা বাঁচিয়ে দিয়েছেন, নইলে বাঁচবার কোনো কথা ছিল না।' সমস্ত জড় পদার্থের কাণ্ড কিনা! আমরা হাজার কাতর হই, চেঁচাই, লোহাতে যখন কাঠ ঠেকল এবং নিচের থেকে জল যখন ঠেলতে লাগল তখন যা হবার তা হবেই—জলও এক মুহূর্ত থামল না, মাস্তুলও এক চুল মাথা নিচু করলে না, লোহার ব্রিজও যেমন তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। আমি যখন অন্য নৌকোয় চড়ে ডাঙায় এসেছি তখনও বোটটা যায়-যায়—সৌভাগ্যক্রমে ডাঙার এতটা কাছাকাছি এসেছিল যে কারও ডোববার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু বোটটা যেত এবং সেই সঙ্গে আমার খাতাগুলো এবং অন্যান্য লেখাগুলো যেত। মাঝিরা বলছে এ যাত্রাটাই ভালো নয়—তিনবার এই রকম হল। কুষ্টিয়ার ঘাটে মাস্তুল তোলবার সময় দড়ি ছিঁড়ে মাস্তুল পড়ে যায়, আর একটু হলেই ফুলচাঁদ মাঝি মারা পড়ত। তার পরে সেই পান্টির খালের মধ্যে বটগাছে মাস্তুল বেধে গিয়েছিল, সেও যে নিতান্ত কম বিপদ হয়েছিল তা নয়। সেখানে স্রোতের খুব তীব্র বেগ ছিল। তার পরে এই ব্রিজ-বিভ্রাট। আমার একটা এই তৃপ্তি বোধ হচ্ছে, খুব সংকটের সময়েও আমি কেবল মাল্লাদের সাবধান করে দিয়েছি, নিজের জন্যে কিছুমাত্র হাঁউমাউ করি নি, বুদ্ধি স্থির ছিল। মাস্তুলটা যে কিরকম ভীষণভাবে ভেঙে

পড়বে তার জন্যে প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত ছিলুম— মাল্লাদের যা যা করতে প্রবৃত্ত করিয়েছিলুম তার কোনোটাই অসংগত হয় নি। উঃ! তোরা থাকলে এই বিপদে আমার প্রাণটা কিরকম হত!

কলকাতা
২১ জুলাই ?
১৮৯২

৬৮

শিলাইদহ
২১ জুলাই। ১৮৯২।

কাল বিকেলে শিলাইদহে পৌঁচেছিলুম, আজ সকালে আবার পাবনায় চলেছি। আজকাল নদীর আর সে মূর্তি নেই— তোরা যখন এসেছিলি তখন নদীতে প্রায় একতলা-সমান উঁচু পাড় দেখেছিলি, এখন সে সমস্ত ভরে গিয়ে হাত-খানেক দেড়েক বাকি আছে মাত্র। নদীর যে রোখ! যেন লেজ-দোলানো কেশর-ফোলানো ঘাড়-বাঁকানো তাজা বুনো ঘোড়ার মতো। গতিগর্বে ঢেউ তুলে ফুলে ফুলে চলেছে— এই ক্ষ্যাপা নদীর উপরে চড়ে আমরা দুলতে দুলতে চলেছি। এর মধ্যে ভারী একটা উল্লাস আছে। এই ভরা নদীর যে কলরব সে আর কী বলব! ছল্‌ছল্‌ খল্‌খল্‌ করে কিছুতে যেন আর ক্ষান্ত হতে পারছে না— ভারী একটা যৌবনের মত্ততার ভাব। এ তবু গড়ুই নদী। এখান থেকে আবার পদ্মায় গিয়ে পড়তে হবে— তার বোধ হয় আর কূল-কিনারা দেখবার জো নেই। সে মেয়ে বোধ হয় একেবারে উন্মাদ ক্ষেপে নেচে বেরিয়ে চলেছে, সে আর কিছুর মধ্যেই থাকতে চায় না। তাকে মনে করলে আমার কালীর মূর্তি মনে হয়— নৃত্য করছে, ভাঙছে, এবং চুল এলিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। মাঝিরা বলছিল, নতুন বর্ষায় পদ্মার খুব 'ধার' হয়েছে। ধার কথাটা কিন্তু ঠিক। তীব্র স্রোত যেন চক্‌চকে খড়্গের মতো, পাতলা ইস্পাতের মতো একেবারে কেটে চলে যায়। প্রাচীন ব্রিটনবাসীদের যুদ্ধরথের চাকায় যেমন কুঠার বাঁধা থাকত, পদ্মার দ্রুতগামী বিজয়রথের দুই চাকায় তেমনি তীব্র খরধার স্রোত শাণিত কুঠারের মতো বাঁধা— দুই ধারের তীর একেবারে অবহেলায় ছারখার করে দিয়ে চলেছে।... এ সময় না হলে নদীর আনন্দ দেখা যায় না! আমরা প্রায়ই শীতের শেষে কিম্বা গ্রীষ্মের আরম্ভে আসি, তখন শীর্ণ নদী নিস্তেজভাবে পোষ মেনে থাকে— দুরন্তপনা একেবারেই থাকে না। তাতেই তোর মা কত ভয় পেয়েছিলেন, এখনকার নদী দেখলে বোধ হয় ডাঙায় থাকতেও ভয় পেতেন। ভয়ের যে কোনো কারণ আছে তা নয়। কাল যে কাণ্ডটি হয়েছিল সে বরঞ্চ কিছু গুরুতর বটে। কাল যমরাজের সঙ্গে এক রকম হাউ-ড্যু-ড করে আসা গিয়েছে। মৃত্যু যে ঠিক আমাদের নেক্‌স্‌ট্‌-ডোর নেবার এ রকম ঘটনা না হলে সহজে মনে হয় না। হয়েও বড়ো মনে পড়ে না। কাল চকিতের মধ্যে যাঁর আভাস পাওয়া গিয়েছিল আজ তাঁর মূর্তিখানা কিছুই স্মরণ হচ্ছে না। অপ্রিয় অনাবশ্যক বন্ধুর মতো একেবারে অনাহূত ঘাড়ে এসে না পড়লে তাঁর বিষয়ে আমরা

বড়ো একটা ভাবি নে! যদিও তিনি আড়াল থেকে আমাদের সর্বদাই খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন। যা হোক, তাঁকে আমি বহুত বহুত সেলাম দিয়ে জানিয়ে রাখছি তাঁকে আমি এক কানাকড়ির কেয়ার করি নে— তা তিনি জলে ঢেউই তুলুন আর আকাশ থেকে ফুঁই দিন— আমি আমার পাল তুলে চললুম— তিনি যতদূর করতে পারেন তা পৃথিবীসুদ্ধ সকলেরই জানা আছে, তার বেশি আর কী করবেন! যেমনি হোক, হাঁউমাউ করব না।

কলকাতা
২২ জুলাই ১৮৯২

৬৯

শিলাইদহ
বৃহস্পতিবার
৩ ভাদ্র। ১২৯৯।

এমন সুন্দর শরতের সকাল বেলা! চোখের উপরে যে কী সুধা বর্ষণ করছে সে আর কী বলব। তেমনি সুন্দর বাতাস দিচ্ছে এবং পাখি ডাকছে। এই ভরা নদীর ধারে, বর্ষার জলে প্রফুল্ল নবীন পৃথিবীর উপর শরতের সোনালি আলো দেখে মনে হয় যেন আমাদের এই নবযৌবনা ধরণীসুন্দরীর সঙ্গে কোন্-এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসা-বাসি চলছে— তাই এই আলো এবং এই বাতাস, এই অর্ধ-উদাস অর্ধ-সুখের ভাব, গাছের পাতা এবং ধানের ক্ষেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম স্পন্দন— জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্মল নীলিমা। স্বর্গে মর্ত্যে একটা বৃহৎ গভীর অসীম প্রেমাভিনয়। প্রেমের যেমন একটা গুণ আছে তার কাছে জগতের মহা মহা ঘটনাকেও তুচ্ছ মনে হয়, এখানকার আকাশের মধ্যে তেমনি যে-একটি ভাব ব্যাপ্ত হয়ে আছে তার কাছে কলকাতার দৌড়ধাপ হাঁস্‌ফাঁস্‌ ধড়্‌ফড়ানি ঘড়্‌ঘড়ানি ভারী ছোটো এবং অত্যন্ত সুদূর মনে হয়। চার দিক থেকে আকাশ আলো বাতাস এবং গান এক রকম মিলিত ভাবে এসে আমাকে অত্যন্ত লঘু করে আপনাদের সঙ্গে যেন মিশিয়ে ফেলছে— আমার সমস্ত মনটাকে কে যেন তুলিতে করে তুলে নিয়ে এই রঙিন শরৎ-প্রকৃতির উপর আর-এক পোঁচ রঙের মতো মাখিয়ে দিচ্ছে, তাতে করে এই সমস্ত নীল সবুজ এবং সোনার উপরে আর-একটা যেন নেশার রঙ লেগে গেছে। বেশ লাগছে। 'কী জানি পরান কী যে চায়' বলতে লজ্জা বোধ হয় এবং শহরে থাকলে বলতুম না— কিন্তু ওটা ষোলো আনা কবিত্ব হলেও এখানে বলতে দোষ নেই। অনেক পুরোনো শুকনো কবিতা, কলকাতায় যাকে উপহাসানলে জ্বালিয়ে ফেলবার যোগ্য মনে হয় তারা এখানে আসবামাত্র দেখতে দেখতে মুকুলিত পল্লবিত হয়ে ওঠে।

কলকাতা
১৯ অগস্ট, ১৮৯২

৭০

শিলাইদহ
২০ অগস্ট। ১৮৯২।

রোজ সকালে চোখ চেয়েই আমার বাঁ দিকে জল এবং ডান দিকে নদীতীর সূর্যকিরণে প্লাবিত দেখতে পাই। অনেক সময়ে ছবি দেখলে যে মনে হয়, আহা, এইখানে যদি থাকতুম— ঠিক সেই ইচ্ছেটা এখানে পরিতৃপ্ত হয়। মনে হয় একটি জাজ্বল্যমান ছবির মধ্যে আমি বাস করছি, বাস্তব জগতের কোনো কঠিনতাই এখানে যেন নেই। ছেলেবেলায় রবিন্‌সন্‌ক্রুশো পোলভর্জিনি প্রভৃতি বইয়ে গাছপালা সমুদ্রের ছবি দেখে মন ভারী উদাসীন হয়ে যেত— এখানকার রৌদ্রে আমার সেই ছবি দেখার বাল্যস্মৃতি ভারী জেগে ওঠে। এর যে কী মানে আমি ঠিক ধরতে পারি নে, এর সঙ্গে যে কী একটা আকাঙ্ক্ষা জড়িত আছে আমি ঠিক বুঝতে পারি নে— এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান— এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর দূরান্তর কত দেশ দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে-একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎ ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে— আমার এই-যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে। এই পৃথিবীর উপর আমার যে-একটি আন্তরিক আত্মীয়-বৎসলতার ভাব আছে ইচ্ছে করে সেটা ভালো করে প্রকাশ করতে, কিন্তু ওটা বোধ হয় অনেকেই ঠিকটি বুঝতে পারবে না— কী-একটা কিম্ভূত রকমের মনে করবে। সেই জন্যে চেষ্টা করতে প্রবৃত্তি হয় না।

কলকাতা
২১ অগস্ট্‌ ১৮৯২

৭১

বোয়ালিয়া
১৮ নভেম্বর। ১৮৯২।

তুই কি এখন রেলগাড়িতে? সমস্ত রাত্তিরের কন্‌কনে শীত ভোগ করে তুই বোধ হয় এখন জেগে উঠে মুখ ধুয়ে এসে পায়ের উপর একখানি কম্বল চাপিয়ে বসেছিস। যদি জব্বলপুর লাইন দিয়ে যেতিস তা হলে আমি বেশ কল্পনা করতে

পারতুম এতক্ষণ তোরা কিরকম দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিস। এই সময়টা সকাল বেলায় নওয়াড়ির কাছে উঁচুনিচু প্রস্তরকঠিন তরুবিরল পৃথিবীর উপরে সূর্যোদয় হয়। তোদের নাগপুর লাইনেও বোধ হয় সেই রকম হওয়ার সম্ভব। বোধ হয় নবীন রৌদ্রে চারি দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে আকাশপটে নীল পর্বতের আভাস দেখা যাচ্ছে— শস্যক্ষেত্র বড়ো-একটা নেই— দৈবাৎ দুই-এক জায়গায় সেখানকার বুনো চাষারা মহিষ নিয়ে চাষ আরম্ভ করেছে— দুই ধারে বিদীর্ণ পৃথিবী, কালো কালো পাথর, শুকনো জলস্রোতের নুড়ি-ছড়ানো পথচিহ্ন, ছোটো ছোটো অসম্পূর্ণ শাল গাছ এবং টেলিগ্রাফের তারের উপর কালো-লেজ-ঝোলানো চঞ্চল ফিঙে পাখি। একটা যেন বৃহৎ বন্যপ্রকৃতি পোষ মেনে একটি জ্যোতির্ময় নবীন দেবশিশুর উজ্জ্বল কোমল করস্পর্শ সর্বাঙ্গে অনুভব করে শান্ত স্থির ভাবে শুয়ে পড়ে আছে। কিরকম ছবিটা আমার মনে আসে জানিস? কালিদাসের শকুন্তলায় পড়েছিস দুষ্মন্তের ছেলে শিশু ভরত একটা সিংহশাবক নিয়ে কিরকম খেলা করত। সে যেন একদিন পশুবৎসলভাবে সিংহশাবকের বড়ো বড়ো রোঁওয়ার মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে আপনার শুভ্রকোমল অঙ্গুলিগুলি চালনা করছে, আর বৃহৎ জন্তুটা স্থির হয়ে পড়ে আছে এবং মাঝে মাঝে সস্নেহে এবং একান্ত নির্ভরের ভাবে আপনার মানববন্ধুর প্রতি আড়চক্ষে চেয়ে দেখছে। আর ওই-যে শুকনো স্রোতের নুড়ি-ছড়ানো পথের কথা বললুম ওতে আমার কী মনে পড়ে জানিস? বিলিতি রূপকথায় পড়া যায় বিমাতা যখন তার সতিনের মেয়েকে এবং ছেলেকে ঘর থেকে তাড়িয়ে ছল করে একটা অচেনা অরণ্যের মধ্যে পাঠিয়ে দিলে তখন দুই ভাই বোনে বনের ভিতর চলতে চলতে বুদ্ধিপূর্বক একটা একটা করে নুড়ি ফেলে আপনাদের পথ চিহ্নিত করে রেখেছিল। ছোটো ছোটো স্রোতগুলি যেন সেই রকম ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ে, তারা খুব তরুণ শৈশবে এই অচেনা বৃহৎ পৃথিবীর মধ্যে বেরিয়ে পড়ে, তাই জন্যে চলতে চলতে আপনাদের পথের উপর ছোটো ছোটো নুড়ি ছড়িয়ে রেখে যায়— আবার যখন ফিরে আসবে আবার আপনার এই গৃহপথটি ফিরে পাবে। আজ সকালবেলায় উঠে অবধি আমি মনে মনে তোদের গাড়ির জানলার পাশে বসে তোদের সঙ্গে রেলের দুই পার্শ্বের রৌদ্রোজ্জ্বল চিত্রগুলি দেখে যাবার চেষ্টা করছি। আমার বহুদিনের রেলভ্রমণের নানা স্মৃতি নানা খণ্ড খণ্ড দৃশ্যগুলি আমার মনের দুই পাশে সাজাচ্ছি, বসাচ্ছি, তাদের উপরে হেমন্তের সকাল বেলাকার রোদ্দুর মেলিয়ে দিচ্ছি এবং মাঝে মাঝে তোর সঙ্গে তাই নিয়ে কথাবার্তা কচ্ছি।

সোলাপুর
২২ নভেম্বর ১৮৯২

৭২

নাটোর
১ ডিসেম্বর। ১৮৯২।

কাল তো লোকেনে আমাতে বেরিয়ে পড়া গেল। ঘোড়ার গাড়িতে দীর্ঘ পথ যেতে হয়। সম্মুখে আটাশ মাইল পথ এবং কেবল 'আমরা দুজনে যাত্রী'। লোকেন

একটা সিগারেট এবং একখানা বই আরম্ভ করে দিলে— আমি গুন্ গুন্ স্বরে 'সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি' গান ধরলুম— এইরকম করে যখন প্রায় মাইল দশেক অতিক্রম করেছি এবং সূর্য ক্ষীণজ্যোতি হয়ে অস্তাচলের খুব কাছে গিয়ে পৌঁচেছে এমন সময় লোকেন আমার ঐ গানটা উপলক্ষ্য করে বৈষ্ণব কবিদের বিরুদ্ধে তর্ক আরম্ভ করে দিল। সে তর্ক কোনো কালে শেষ হত কি না জানি নে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাদের তর্কের মাঝখানে একটি কৃশকায়া নদী এসে একটি লম্বা দাঁড়ি টেনে দিলে। সেই নদীতীরে গাড়ি থেকে নেবে একটি নৌসেতু পদব্রজে পার হয়ে ও পারে যেতে হল— ও পারে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল, আকাশে আধখানি চাঁদ উঠেছে এবং সুন্দর জ্যোৎস্না। দুজনে পরামর্শ করা গেল, হেঁটে যতটা দূর পারা যায় যাওয়া যাক। তখন তর্ক বন্ধ করে সেই জ্যোৎস্না এবং গাছের ছায়ায় খচিত নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়ে আমরা দুই পথিক নিঃশব্দে মন্দগমনে চলতে লাগলুম। কাল বুধবারে অদূরবর্তী গ্রামে একটা হাট ছিল, সেখানে হাট সেরে দুই-চারজন গ্রামবাসী এবং জনপদবধূ গল্প করতে করতে গৃহে ফিরে যাচ্ছিল। একখানি শূন্য-বোঝাই গোরুর গাড়িতে গাড়োয়ান র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে নিদ্রামগ্ন এবং গোরু দুটি আপন মনে আস্তে আস্তে বিশ্রামশালার দিকে চলেছে। মাঝে মাঝে এক-একটা ঘন গাছপালায় আচ্ছন্ন গ্রামের কাছাকাছি আসছি— সেখানে গোয়ালঘর থেকে খড়-জ্বালানো ধোঁওয়া বায়ুহীন শীতরাত্রে উপরে উঠতে না পেরে হিমভারাক্রান্ত হয়ে স্তরে স্তরে বাঁশঝাড়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এমন করে মাইল দুয়েক গিয়ে তার পরে আমরা আবার গাড়িতে উঠলুম।...ঘড়িতে প্রায় একটা বাজে। তার পরে অনেক কাকুতি মিনতি করে স্থির হল মহারাজ আমাদের একটা ড্রাইভ দিয়ে তার পরে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। সকলেই বললে : Such a night was not meant for sleep। বাস্তবিক সুন্দর রাতটি হয়েছিল। রাস্তায় লোক ছিল না এবং রাজবাড়ির প্রশান্ত সরোবরগুলির উপর জ্যোৎস্না এবং তার ধারে ধারে ঘন গাছের ছায়া চমৎকার দেখাচ্ছিল। বোধ হয় রাত্তির দেড়টার সময় বাড়িতে এসে শুয়েছিলুম।

সোলাপুর
৫ ডিসেম্বর ১৮৯২

৭৩

নাটোর
২ ডিসেম্বর। ১৮৯২।

কাল ব্রেকফাস্ট্ খেয়ে মহারাজার ওখানে গিয়েছিলুম, বিকেলে সকলে মিলে বেড়াতে গিয়েছিলুম। দুই ধারে মাঠের মাঝখান [দিয়ে] রাস্তাটা আমার বেশ লেগেছিল। বাংলা দেশের ধু ধু জনহীন মাঠ এবং তার প্রান্তবর্তী গাছপালার মধ্যে সূর্যাস্ত সে কী সুন্দর সে আমি কিছুতে [বলতে] পারি নে— কী একটি বিশাল শান্তি এবং কোমল করুণা— আমাদের এই আপনাদের পৃথিবীর সঙ্গে আর ঐ বহুদূরবর্তী আকাশের সঙ্গে কী-একটি [স্নেহভারবিনত] মৌন ম্লান মিলন!

অনন্তের মধ্যে যে-একটি প্রকাণ্ড অখণ্ড চিরবিরহবিষাদ আছে সে এই সন্ধেবেলাকার পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে কী-একটি [উদাস] আলোকে আপনাকে ঈষৎ প্রকাশ করে দেয়—সমস্ত জলে স্থলে আকাশে কী-একটি ভাষাপরিপূর্ণ নীরবতা—অনেকক্ষণ চুপ করে অনিমেষনেত্রে চেয়ে দেখতে [দেখতে] মনে হয় যদি এই চরাচরব্যাপ্ত পূর্ণনীরবতা আপনাকে আর ধারণ করতে না পারে, সহসা তার অনাদি ভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, [তা হলে] কী-একটা গভীর গম্ভীর শান্ত সুন্দর সকরুণ সংগীত পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত বেজে ওঠে! আসলে তাই হচ্ছে। কেননা, জগতের যে কম্পন আমাদের [চক্ষে] এসে আঘাত করছে তাই আলোক, আর যে কম্পন কানে এসে আঘাত করছে তাই শব্দ। আমরা একটু নিবিষ্টচিত্তে স্থির হয়ে চেষ্টা করলে জগতের সমস্ত [সম্মি]লিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সংগীতে খানিকটা তর্জমা করে নিতে পারি। এই জগৎব্যাপী দৃশ্যপ্রবাহের অবিশ্রাম [কম্পন] ধ্বনিকে কেবল একবার চোখ বুজে মনের কান দিয়ে শুনতে হয়। কিন্তু তোকে আমি এই সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের কথা কতবার লিখব! আমি নিত্য নূতন [করে] অনুভব করি কিন্তু নিত্য নূতন করে কি প্রকাশ করতে পারি!

সোলাপুর
৬ ডিসেম্বর ১৮৯২

খাতার কাগজে ধার ছিন্ন হওয়ায় কোনো কোনো শব্দ অবলুপ্ত; অনুমানে বা পূর্বমুদ্রিত 'ছিন্নপত্র' মিলাইয়া যে পাঠ স্থির হয় তাহাই বন্ধনীমধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

৭৪

শিলাইদহ
৯ ডিসেম্বর। ১৮৯২।

এখন একলাটি আমার সেই বোটের জানলার কাছে অধিষ্ঠিত হয়ে বহুদিন পরে একটু মনের শান্তি পেয়েছি। স্রোতের অনুকূলে বোট চলছে, তার উপর পাল পেয়েছে—দুপুরবেলাকার রোদ্দুরে শীতের দিনটা ঈষৎ তেতে উঠেছে, পদ্মায় নৌকো নেই—শূন্য বালির [চর] হলদে রঙ, এক দিকে নদীর নীল আর এক দিকে আকাশের নীলের মাঝে একটি রেখার মতো আঁকা রয়েছে—জল কেবল উত্তরে বাতাসে খুব অল্প অল্প চিক্ চিক্ করে কাঁপছে, ঢেউ নেই। আমি এই খোলা জানলার ধারে হেলান দিয়ে বসে আছি; আমার মাথায় অল্প অল্প বাতাস লাগছে, বেশ আরাম করছে। অনেক দিন তীব্র রোগভোগের পর শরীরটা শিথিল দুর্বল অবস্থায় আছে, এই রকম সময় প্রকৃতির এই ধীর স্নিগ্ধ শুশ্রূষা ভারী মধুর লাগছে—এই শীতশীর্ণ নদীর মতো আমার সমস্ত অস্তিত্ব যেন মৃদু রৌদ্রে পড়ে অলসভাবে ঝিক্ ঝিক্ করছে, এবং যেন আর্ধেক-আনমনে তোকে চিঠি লিখে যাচ্ছি। প্রতিবার এই পদ্মার উপর আসবার আগে ভয় হয় আমার পদ্মা বোধ হয়

পুরোনো হয়ে গেছে। কিন্তু, যখনই বোট ভাসিয়ে দিই, চার দিকে জল কুল্‌কুল্‌ করে ওঠে—চারি দিকে একটা স্পন্দন কম্পন আলোক আকাশ মৃদুকলধ্বনি, একটা সুকোমল নীল বিস্তার, একটি সুনবীন শ্যামল রেখা, বর্ণ এবং নৃত্য এবং সংগীত এবং সৌন্দর্যের একটি নিত্য উৎসব উদ্ঘাটিত হয়ে যায়, তখন আবার নতুন করে আমার হৃদয় যেন অভিভূত হয়ে যায়। এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নব-পল্লব উদ্‌গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন 'একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল' পরে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন, আমি তাঁর পায়ের কাছে কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছি—অনেক ছেলের মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না—তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুর বেলায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিমকালের কথা ভাবছেন, আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করছেন না: আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকে যাচ্ছি। এই ভাবে এক রকম কেটে যাচ্ছে। প্রায় বিকেল হয়ে এল। এখন শীতের বেলা কিনা, দেখতে দেখতে রোদ্‌দুর পড়ে যায়।

সোলাপুর। ১৪ ডিসেম্বর ?
১৮৯২

৭৫

শিলাইদহ
১৮ ডিসেম্বর। ১৮৯২।

যেমন বজ্র পড়ে গেলে তবে তার আওয়াজ পাওয়া যায়, তেমনি পরস্পর দূরে থাকলে যথাসময়ে কোনো আওয়াজ পাবার যো নেই; ঘটনা নিঃশেষ হয়ে গেলে

পর তখন চিঠিতে তার আলোচনা করতে হয়। আমার দাঁত-কানের ব্যথার খবর এত দিনে বুঝি তোদের কানে গিয়ে পেঁছল? যখন সুকোমল তুলোর স্তর দিয়ে আচ্ছন্ন করে নিজের কপোলদেশ বহুযত্নে লালন পালন করছিলুম— পীড়িত শিশু-সন্তানকে যেমন ঢেকে-ঢুকে ঘিরে-ঘেরে রাখে নিজের এই মুখমণ্ডলটিকে তেমনি করে রেখেছিলুম তখন পৃথিবীর লোক আমাকে সুখী এবং সুস্থ -জ্ঞানে দিব্যি নিশ্চিন্ত ছিল। আর, এখন যখন তার স্মৃতিমাত্র এবং কষের দাঁতের ফুলোর ঈষৎ মাত্র অবশিষ্ট আছে তখন ভয় ভাবনা ভর্ৎসনা নানারকম শোনা যাচ্ছে। এখন সেই হতভাগ্য কপোলে চপেটাঘাত করে বলতে ইচ্ছে করছে, 'তোর এমন দুর্লভ বেদনাটা যদুবাবুর উপর দিয়েই কাটালি! এমন একটা বৃহৎ উপসর্গ ন দেবায় ন ধর্মায় গেল!'... ব্যামো করে আজকাল কোনো ফল নেই, তাই আজকাল শরীর ভালো রাখবার প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি আছে। কিন্তু শরীরের রহস্য প্রায় মনের রহস্যেরই অনুরূপ। এই ত্রিশটা বৎসর ধরে পোড়া শরীরটার সঙ্গে এক প্রকারের পরিচয় হয়েছে— যা করলে যা হয়, না হয়, কতকটা বুঝে নিয়েছিলুম। এবং বহু অভিজ্ঞতার পর সেই ভাবে সবে চলতে আরম্ভ করেছি। এমন সময় একত্রিশ বৎসরের সময় দেখা গেল পূর্বে যা করলে যা না হত, এখন তা করলে তা হয়— আবার ফের নতুন শিক্ষা, নতুন পরিচয়। আবার ত্রিশটা-প'য়ত্রিশটা বৎসর ঠেকে ঠেকে নতুন নতুন আবিষ্কার করে যখন সবে শিখেছি কখন ফ্ল্যানেল পরতে হবে, কখন দরজা জানলা বন্ধ করতে হবে, কখন গরম জলে নাইতে হবে, কখন ভুষির তাপ কখন পুল্‌টিস্‌, কখন গলা ভাত কখন মৌরলা মাছের ঝোল— তখন সে বহুমূল্য বহুদিনলব্ধ অভিজ্ঞতা খাটাবার আর বড়ো বেশি দিন বাকি থাকবে না।... জিজ্ঞাসা করি, এই দাঁতে ব্যথা, কানে ব্যথা, গলায় ব্যথা, এগুলো এতকাল ছিল কোথায়? পূর্বাহ্নে যদি একটু নোটিশ পেতুম তা হলে পৃথিবীর মধ্যে এত দেশ থাকতে নাটোরে এ কুকীর্তি হবে কেন? মানুষের মনটা তো যথেষ্ট আন্‌-রীজ্‌নেব্‌ল্‌, বিবেচনা করে দেখতে গেলে শরীরটা তার নিচেই। আচ্ছা, বব, রীজ্‌ন্‌-নামক পদার্থটা তা হলে আছে কোথায়? কেবল সালির সাইকলজির মধ্যে? আজ তোর চিঠি পড়ে আমার মাথায় এই রকমের অনেকগুলো সুগভীর সমস্যার উদয় হচ্ছে।

সোলাপুর
২২ ডিসেম্বর ১৮৯২

৭৬

...আত্মপীড়নও আমরা সহ্য করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তবু মনের জড়ত্ব চাই নে। এর থেকেই বোঝা যায় মানুষ সুখ চায় না, উন্নতি চায়— দুঃখ তার তেমন অপ্রিয় নয় যেমন অবনতি।

৭৭

।ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩।

একে তো ভারতবর্ষীয় ইংরেজগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি নে। তারা স্বভাবতই আমাদের বড়ো অবজ্ঞার ভাবে দেখে, আমাদের উপর তাদের কানাকড়ির সিম্প্যাথি নেই, তার উপরে আবার তাদের কাছে নিজেকে exhibit করা আমার পক্ষে বড়োই কষ্টকর। এমন-কি, ওদের থিয়েটার প্রভৃতি আমোদের স্থলে এবং দোকানেও আমার পারতপক্ষে ঢুকতে ইচ্ছে করে না—(কেবল থ্যাকারের দোকান ছাড়া)। ইংরেজের ঘরে যত বড়ো গোরুই জন্মাক-না কেন সে যে আমাদের দেশের সকল লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে সেটা মনের ভিতর বড়ো আঘাত করে। আমাদের মধ্যে একটা কোনো পদার্থ আছে এটা যতক্ষণে ওরা স্বীকার না করবে ততক্ষণ ওদের কাছে যেতে গেলে হয় অবনতি স্বীকার করে যেতে হবে, নয় অপমান অনুভব করতে হবে। এক-এক সময় আমাদের দেশের লোকের উপর আমার এমন অসহ্য রাগ হয়! ইংরেজগুলোকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না বলে নয়, কিন্তু কোনো বিষয়ে কিছু করছে না বলে—এমন একটা কিছুই নেই যাতে আপনার মর্যাদা দেখাতে পারছে। মনের মধ্যে সে লক্ষ্যমাত্র নেই—কেবল ইংরেজের কুড়োনো পেখম লেজে গুঁজে অদ্ভুত ভঙ্গীতে নেচে নেচে বেড়াতে একটুখানি লজ্জা কিম্বা হীনতা অনুভব করে না। এরা দেশের লোককে কিছু শেখাতে চায় না, দেশের ভাষাকে অবজ্ঞা করে, যে-কোনো বিষয়ে ইংরেজের চোখ পড়ে না সে-সকল বিষয়ে উদাসীন—এরা মনে করে কন্‌গ্রেস করে সকলে মিলে দুই হাত তুলে গবর্নমেণ্টের দোহাই পেড়ে এরা বড়োলোক হবে। আমি তো বলি যতদিন না আমরা একটা কিছু করে তুলতে পারব ততদিন আমাদের অজ্ঞাত-বাস ভালো। কেননা, আমরা যখন সত্যই অবমাননার যোগ্য তখন কিসের দোহাই দিয়ে পরের কাছে আত্মসম্মান রক্ষা করব? তাদের মতো অবিকল পেখম নাড়তে শিখলেই কি হবে? পৃথিবীর মধ্যে যখন আমাদের একটা কোনো প্রতিষ্ঠাভূমি হবে, পৃথিবীর কাজে যখন আমাদের একটা কোনো হাত থাকবে, তখন আমরা ওদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা কইতে পারব। ততদিন লুকিয়ে থেকে চুপ মেরে আপনার কাজ করে যাওয়াই ভালো। দেশের লোকের ঠিক এর উল্টো ধারণা—যা-কিছু ভিতরকার কাজ, যা গোপনে থেকে করতে হবে, সে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে, যেটা নিতান্ত ক্ষণিক অস্থায়ী আস্ফালন এবং আড়ম্বর মাত্র, সেইটেতেই তাদের যত ঝোঁক। আমাদের এ বড়ো হতভাগা দেশ। এখানে মনের মধ্যে কাজ করবার বল রাখা বড়ো শক্ত। যথার্থ সাহায্য করবার লোক কেউ নেই। যার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে একটুখানি প্রাণ সঞ্চয় করা যায় এমন মানুষ দশ-বিশ ক্রোশের মধ্যে একটি পাওয়া যায় না—কেউ চিন্তা করে না, অনুভব করে না, কাজ করে না; বৃহৎ কার্যের যথার্থ জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা কারও নেই; বেশ একটি পরিণত মনুষ্যত্ব কোথাও পাওয়া যায় না। সমস্ত মানুষগুলো যেন উপছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাচ্ছে-দাচ্ছে, আপিস যাচ্ছে, ঘুমচ্ছে, তামাক টানছে, আর নিতান্ত নির্বোধের মত বক্ বক্ করে বকছে। যখন ভাবের কথা বলে তখন সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে পড়ে, আর যখন যুক্তির কথা পাড়ে তখন ছেলেমানুষি করে। যথার্থ মানুষের একটা সংস্রব

পাবার জন্যে মানুষের মনে ভারী একটা তৃষ্ণা থাকে, ইচ্ছা করে মানুষের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান দ্বন্দ্বপ্রতিদ্বন্দ্ব চলে। কিন্তু সত্যিকার রক্তমাংসের শক্তসমর্থ মানুষ তো নেই— সমস্ত উপছায়া, পৃথিবীর সঙ্গে অসংলগ্নভাবে বাষ্পের মতো ভাসছে। আমাদের দেশে যার মাথায় দুটো-চারটে আইডিয়া আছে তার মতো সঙ্গীহীন একক প্রাণী দুনিয়ায় আর নেই বোধ হয়। কী কথা থেকে কী কথা উঠল তার ঠিক নেই— কিন্তু এ আমার অন্তরের আক্ষেপ। জীবনের অনেকটা অবসাদ এই মানুষের অভাবে।

সোলাপুর
ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

৭৮

বালিয়া
মঙ্গলবার। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩।

আমার কিন্তু আর ভ্রমণ করতে ইচ্ছে করছে না— ভারী ইচ্ছে করছে একটি কোণের মধ্যে আড্ডা করে একটু নিরিবিলি হয়ে বসি। ভারতবর্ষের দুটি অংশ আছে— এক অংশ গৃহস্থ, আর-এক অংশ সন্ন্যাসী; কেউ বা ঘরের কোণ থেকে নড়ে না, কেউ বা একেবারে গৃহহীন। আমার মধ্যে ভারতবর্ষের সেই দুই ভাগই আছে। ঘরের কোণও আমাকে টানে, ঘরের বাহিরও আমাকে আহ্বান করে। খুব ভ্রমণ করে দেখে বেড়াব ইচ্ছে করে, আবার উদ্‌ভ্রান্ত শ্রান্ত মন একটি নীড়ের জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে। পাখির মতো ভাব আর-কি। থাকবার জন্যে যেমন ছোট্ট নীড়টি, ওড়বার জন্যে তেমনি মস্ত আকাশ। আমি যে কোণটি ভালোবাসি, সে কেবল মনকে শান্ত করবার জন্যে। আমার মনটা ভিতরে ভিতরে এমনি অশ্রান্ত ভাবে কাজ করতে চায়, লোকজনের ভিড়ের মধ্যে তার কর্মোদ্যম এমনি পদে পদে প্রতিহত হতে থাকে, যে, সে অস্থির হয়ে ওঠে— খাঁচার ভিতর থেকে আমাকে কেবলই যেন আঘাত করতে থাকে। একটু নিরালা পেলে সে বেশ সাধ মিটিয়ে ভাবতে পারে, চার দিকে চেয়ে দেখতে পারে, ভাবগুলিকে খুব মনের মতো ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রকাশ করতে পারে। এতদূর পর্যন্ত তার বাড়াবাড়ি যে, ... আমার সঙ্গে এসেছে তাও যেন সে সহ্য করতে পারছে না। দিবারাত্রি সে একেবারে অখণ্ড অবসর চায়। সমস্তদিন কারও সঙ্গে যদি আমার একটিমাত্র কথাও না হয় তা হলে সে সুখে থাকে। সৃষ্টিকর্তা আপনার সৃষ্টির মধ্যে যেমন একাকী সে আপনার ভাবরাজ্যের মধ্যখানে তেমনি একলা বিরাজ করতে চায়। নইলে যেন তার সমস্ত ক্ষমতা সমস্ত অস্তিত্ব ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ... একে কি মিস্যান্‌থ্রোপি বলে? তা ঠিক নয়। আমি লোক ভালোবাসি নে বলে যে আমি লোকের কাছ থেকে তফাত থাকতে চাই তা নয়, আমার মন নড়বার-চড়বার এবং কাজ করবার জন্যে অনেকখানি জায়গা চায়।

সোলাপুর
১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

৭৯

১০ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৩।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে। আমি একে অ্যাংলো ইন্‌ডিয়ান্‌গুলোকে দেখতে পারি নে, তার উপরে আবার কাল ডিনার-টেবিলে তাদের রূঢ় স্বভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। এখানকার কলেজের প্রিন্সিপাল একটা উৎকট ইংরেজ—প্রকাণ্ড নাক, ধূর্ত চোখ, দেড় হাত চিবুক, গোঁফ দাড়ি কামানো, মোটা গলা, র-অক্ষর-বিহীন জ্যাব্‌ড়ানো উচ্চারণ—সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটা পূর্ণপরিণত জন্‌বুষ। সে আমাদের দেশের লোকের উপর বড্ড লেগেছিল। জানিস বোধ হয় গবর্মেণ্ট্‌ আমাদের দেশের জুরি প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছিল বলে চার দিকে ভারী একটা আপত্তি উঠেছে। লোকটা জোর করে সেই বিষয়ে কথা তুলে বো—বাবুর সঙ্গে তর্ক করতে লাগল। বললে এ দেশের moral standard low, এখানকার লোকের lifeএর sacredness সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস নেই, এরা জুরি হবার যাগ্য নয়। আমার যে কী রকম করছিল সে তোকে কী বলব! আমার বুকের মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল, কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কত কথাই মনে এল, কিন্তু তখন যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিলুম। ভেবে দেখ্‌ দেখি [বব] একজন বাঙালির নিমন্ত্রণে এসে বাঙালির মধ্যে বসে যারা এ রকম করে বলতে কুণ্ঠিত হয় না তারা আমাদের কী চক্ষে দেখে! আর কেন! সিম্প্যাথি চুলোয় যাক্‌ গে, যারা আমাদের সঙ্গে ভদ্রতা করাও বাহুল্য বিবেচনা করে তাদের কাছে আমরা হেসে হেসে, ঘেঁষে ঘেঁষে, যেচে মান কেঁদে সোহাগ কেন নিতে যাই [বব] ? ওদের একটুখানি অনুগ্রহের করস্পর্শ পেলেই অমনি কেন আমাদের সর্বাঙ্গ সর্বান্তঃকরণ একতাল jelly-পিণ্ডের মতো আহ্লাদে আগাগোড়া টল্‌-টল্‌ থল্‌-থল্‌ করে দুলে ওঠে! উঃ, ওদের কী গর্ব, কী অবজ্ঞা! আর, আমাদের কী দৈন্য, কী হীনতা! অপমান চুপ করে সয়ে থাকাই যথেষ্ট হেয়, কিন্তু তার উপরে আবার ওদের কাছে গায়ে পড়ে আদর কাড়তে যাওয়া আমার বোধ হয় অবনতির একশেষ। আমাদের এই দরিদ্র উপেক্ষিত অপমানিত ভারতবর্ষকে আমরা বুকের কাছে টেনে নিই, এর যত দোষ যত দুর্বলতা যত মালিন্য আছে সমস্ত অন্তরের সঙ্গে মার্জনা করতে এবং একান্ত যত্নে মার্জন করতে চেষ্টা করি—এর সমস্ত ভাব সমস্ত ব্যবহার আমাদের মনের সঙ্গে ঠিক মিলছে না বলে একে যেন হৃদয় থেকে দূর না করি! আমাদের স্বদেশ যদি কোনো ভ্রান্তসংস্কার-বশতঃ আমাদের দূরে রাখতে চেষ্টা করে তা হলে অম্‌নি তখনি বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা কেন সরে যাই, আর সাহেবরা প্রকাশ্যভাবে আমাদের সহস্রবার করে লাথি ঝাঁটা মারে তবু তো এই নাছোড়বান্দার দলকে কিছুতেই তাদের চরণতল তাদের দ্বারপ্রান্ত থেকে নির্মুক্ত করে ফেলতে পারে না। যেখানে জুতো পরে যেতে দেয় না সেখানে জুতো খুলে যাই, যেখানে মাথা তুলে যেতে দেয় না সেখানে সেলাম করতে করতে ঢুকি, যেখানে আমাদের স্বজাতির প্রবেশ নিষেধ সেখানে সাহেবের ছদ্মবেশ পরে হাজির হই। ওরা চায় না ওদের সভায় গিয়ে আমরা বসি, ওদের আমোদে গিয়ে আমরা যোগ দিই, ওদের কাজের মধ্যে আমরা হস্তক্ষেপ করি—কিন্তু তবু আমরা চেষ্টা করে, ফিকির করে, সুযোগ বুঝে, খোষামোদ করে, আপনার

লোককে দূরে রেখে, স্বজাতির নিন্দায় যোগ দিয়ে, স্বদেশের সমস্ত অবমাননা পরিপাক করে, যে-কোনো প্রকারে হোক ওদের একটু সংস্রব পেলে বেঁচে যাই। আমি এক্‌সেপ্‌শন্‌ সাজতে চাই নে—যদি আমাদের জাতের প্রতি তোমাদের কোনো শ্রদ্ধা না থাকে, তা হলে আমি সভ্যমি করে তোমাদের পুষ্যি হতে যেতে চাই নে। আমি আমার হৃদয়ের সমস্ত প্রীতির সঙ্গে আমার সেই স্বজাতির মধ্যে থেকে আমার যা কর্তব্য তা করব—সে তোমাদের চোখেও পড়বে না, তোমাদের কানেও উঠবে না। তোমাদের উচ্ছিষ্ট তোমাদের আদরের টুক্‌রোর জন্যে আমার তিলমাত্র প্রত্যাশা নেই, আমি তাতে পদাঘাত করি। মুসলমানের শূকর যেমন, তোমাদের আদর আমার পক্ষে তেমনি। তাতে আমার জাত যায়, সত্যি জাত যায় —যাতে আত্মাবমাননা করা হয় তাতেই যথার্থ জাত যায়, নিজের কৌলীন্য এক মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যায়—তার পরে আর আমার কিসের গৌরব! যে আপনার অন্তরের যথার্থ সম্মান নষ্ট করে বাইরের জাঁকজমক কেনে তাকে যেন আমরা কিছুমাত্র সম্মান না করি। আমাদের ভারতবর্ষের সব চেয়ে জীর্ণতম কুটীরের মলিনতম চাষীকে আমি আমাদের আপনার লোক মনে করতে কুণ্ঠিত হব না, আর যারা ফিট্‌ফাট্‌ কাপড় পরে dogcart হাঁকায় আর আমাদের নিগার বলে, তারা যতই সভ্য যতই উন্নত হোক, আমি যদি কখনো তাদের সংস্রবের জন্যে লালায়িত হই তবে যেন আমার মাথার উপরে জুতো পড়ে। কাল আমার বুকের ভিতরে মাথার ভিতরে এমনি কষ্ট হচ্ছিল যে কিছুতেই সমস্ত রাত ঘুমতে পারি নি—কেবল এপাশ ওপাশ ছট্‌ফট্‌ করেছি। যখন ড্রয়িংরুমের এক কোণে এসে বসলুম আমার চোখে সমস্ত ছায়ার মতো ঠেকছিল—আমি যেন আমার চোখের সামনে সমস্ত বৃহৎ ভারতবর্ষ বিস্তৃত দেখতে পাচ্ছিলুম, আমাদের এই গৌরবহীন বিষণ্ন হতভাগ্য জন্মভূমির ঠিক শিয়রের কাছে আমি যেন বসে ছিলুম—এমন একটা বিপুল বিষাদ আমার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল সে আর কী বলব। অথচ চোখের সামনে ইভ্‌নিং-ড্রেস-পরা মেমসাহেব এবং কানের কাছে ইংরিজি হাস্যালাপের গুঞ্জনধ্বনি—সবসুদ্ধ এমনি অসংগত! আমাদের চিরকালের ভারতবর্ষ আমার কাছে কতখানি সত্যি আর এই ডিনার-টেবিলের বিলিতি মিষ্টিহাসি—ইংরিজি শিষ্টালাপ আমাদের পক্ষে কত ফাঁকা, কত ফাঁকি, কী সুগভীর মিথ্যে! মেয়েরা যখন মৃদুমিষ্টি সাধা গলায় কথা কচ্ছিল তখন আমার ভারতবর্ষের ধন তোদের আমি মনে করছিলুম। তোরা তো এই ভারতবর্ষের।

সোলাপুর
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

৮০

পুরীর পথে?
[১১] ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৩।

তার পরে তাঁর অন্যান্য দুটো-চারটে কবিতাও পড়া গেল। ভদ্রতার মিথ্যা প্রশংসা-বাক্য কিছুতেই আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না, আবার বিনা নোটিশে ফস্‌ করে

নিন্দার কণ্টকটুকু যথাসম্ভব মোচন করে গুছিয়ে কথা বলা ভারী শক্ত। ক্রমাগত মূঢ়ের মতো অ্যাঁ-ওঁ করতে হয়। আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন 'আমি কি তবে কবিতা লেখা চালাব', আমি বললুম, 'কেন চালাবেন না? কবিতা কি কেবল অন্য লোককে শোনাবার জন্যে? ওতে তো নিজের একটা খুব আনন্দ আছে। পরের প্রশংসা যদি না মেলে তো সেই নিজের আনন্দই তো আমার মনে হয় যথেষ্ট পুরস্কার।' আমার এই উৎসাহ-বাক্যে তিনি যে খুব বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, এমনতর আমার বোধ হয় না। তাঁর কবিতাগুলো যে খুব খারাপ তা নয়, কেবল চলনসই মাত্র। কেউ কেউ যেমন প্রথম শ্রেণীতে পাস করে, কেউ কেউ তেমনি প্রথম শ্রেণীতে ফেল করে। কিন্তু যারা পাস করে তাদেরই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী নির্দিষ্ট হয়, যারা ফেল করে তাদের মধ্যে শ্রেণীনির্দেশ করা কেউ আবশ্যক মনে করে না—তারা সবাই এক দলের মধ্যে পড়ে যায়। আমি যদি এঁকে বলতুম, কবিতা লেখায় যে-সমস্ত অপ্রকাশিত অজ্ঞাতনামারা ফেল করেছেন আপনি তাঁদের মধ্যে প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত, তাতে কি তিনি কিছুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করতেন? সার্টিফিকেট্‌টি না দিয়ে চুপ করে থাকাই ভালো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যেমন অনেক ভালো ছেলে অঙ্কে ফেল করে, তেমনি কাব্যে যারা ফেল তাদের অধিকাংশই সংগীতে ফেল। তাদের ভাব আছে, কথা আছে, রকম-সকম আছে, আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই, কেবল সেই সংগীতটি নেই যাতে মুহূর্তের মধ্যে সমস্তটি কবিতা হয়ে ওঠে। সেইটেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো ভারী শক্ত। কাঠও আছে ফুঁও আছে—কেবল সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গটুকু নেই যাতে সবটা ধরে উঠে আগুন হয়ে ওঠে। এর মধ্যে কাঠের বোঝাটা নানা স্থান থেকে পরিশ্রমপূর্বক সংগ্রহ করে আনা যায়, কিন্তু সেই অগ্নিকণাটুকু নিজের অন্তরের মধ্যে আছে—সেইটুকু না থাকলে পর্বতপ্রমাণ স্তূপ ব্যর্থ হয়ে যায়। কামিনী সেনের কবিতা সম্বন্ধেও আমি এই কথা বলেছিলুম। তাঁর লেখায় বড়ো ভাব এবং নতুন ভাব ঢের থাকতে পারে, কিন্তু তাতে আগুন ধরে ওঠে নি। যদি কেউ তর্ক করে, বলে যে 'না না, ওর মধ্যে ঢের কবিত্ব আছে', তা হলে কে তার প্রতিবাদ করতে পারে? এই জন্যে প্রশংসা করবার না থাকলে আমি কাব্যের সমালোচনা করতে চাই নে।—কিন্তু [বব], কালকের সেই ইংরেজটার স্পর্ধার কথাগুলো এখনো আমি ভুলি নি। অম্লান মুখে বললে কিনা sacredness of life সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নেই! যারা অ্যামেরিকার Red Indianদের উচ্ছিন্ন করে দিলে, যারা নিঃসহায় দুর্বল অস্ট্রেলিয়ান্‌দের মেয়েদের পর্যন্ত জন্তু-শিকারের মতো বিনা দোষে বিনা কারণে গুলি করে করে মারত, যারা আমাদের দেশী লোককে খুন করলে স্বজাতীয় বিচারকের কাছে দণ্ডযোগ্য হয় না, তারা নিরীহ করুণপ্রকৃতি হিন্দুদের কাছে sacredness of life এবং high standard of morals preach করতে আসে? যা হোক, সে কথা নিয়ে আক্ষেপ করে আর কী হবে?

সোলাপুর
২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

এ চিঠি সম্ভবতঃ ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে, পুরী পৌঁছিয়া, ডাকে ফেলা হয়।

৮১

পুরী
১৪ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৩।

কারও কারও মন ফোটোগ্রাফের wet plate-এর মতো; যে ছবিটা ওঠে সেটাকে তখনি ফুটিয়ে কাগজে না ছাপিয়ে নিলে নষ্ট হয়ে যায়। আমার মন সেই জাতের। যখন যে-কোনো ছবি দেখি অমনি মনে করি, এটাকে চিঠিতে ভালো করে লিখতে হবে। তার পরে কখন তার উপরে নতুন নতুন ছাপ পড়ে সেটা মিলিয়ে যায় টের পাই নে। কটক থেকে পুরী পর্যন্ত এলুম, এই ভ্রমণের কত-কী বর্ণনা করবার আছে তার ঠিক নেই। যেদিন যা দেখছি সেইদিনই সেগুলো লেখবার যদি সময় পেতুম তা হলে ছবি বেশ ফুটে উঠতে পারত—কিন্তু মাঝে দুই-এক দিন গোলেমালে কেটে গেল, ইতিমধ্যে ছবির খুঁটিনাটি রেখাগুলি অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তার একটা প্রধান কারণ, পুরীতে এসে পৌঁছে সামনে অহর্নিশি সমুদ্র দেখছি, সেই আমার সমস্ত মন হরণ করে রেখেছে—আমাদের দীর্ঘ ভ্রমণ-পথের দিকে পশ্চাৎ ফিরে চাইবার আর অবসর পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু সে ক'টা দিন তোর চিঠি থেকে একেবারে বাদ দিতে ইচ্ছে করছে না। আমার দৈনিক বিবরণের মাঝখানে হঠাৎ একটা বিচ্ছেদ না দিয়ে এ ক'দিনের সংক্ষেপ ইতিহাস-টুকু লিখে দিই।

শনিবার মধ্যাহ্নে আহারাদি করে বলু আমি বিহারীবাবু একটি ভাড়াটে ফিট্ন্ গাড়িতে আমাদের কম্বল বিছানা পেতে তিনটি পিঠের কাছে তিন বালিশ রেখে কোচ্‌বাক্সে একটি চাপরাশি চড়িয়ে যাত্রা আরম্ভ করে দিলুম।...এখানকার নদীগুলি বর্ষা চলে গেলেই প্রায় শুষ্কপ্রায় হয়ে যায়, কটক সেই রকমের দুই নদীর ধারে অবস্থিত। একটার নাম মহানদী, আর-একটার নাম কাঠযুড়ি। কাঠযুড়ি পেরিয়ে আমাদের পথ। সেখানে গাড়ি থেকে নেবে আমাদের পাল্কিতে উঠতে হল। ধূসর বালুকা ধু ধু করছে। ইংরিজিতে যে একে নদীর বিছানা বলে, বিছানাই বটে। সকালবেলাকার পরিত্যক্ত বিছানার মতো—নদীর স্রোত যেখানে যেমন পাশ ফিরেছিল, যেখানে যেমন ভার দিয়েছিল, তার বালুশয্যায় সেখানে তেমনি উঁচু-নিচু হয়ে আছে—সেই বিশৃঙ্খল শয়ন কেউ আর যত্ন করে হাত দিয়ে সমান করে বিছিয়ে রাখে নি, সমস্ত এলোমেলো বন্ধুর হয়ে আছে—এই বিস্তীর্ণ বালির ও পারে একটি প্রান্তে একটুখানি শীর্ণ স্ফটিকস্বচ্ছ জল ক্ষীণ স্রোতে বয়ে চলে যাচ্ছে। কালিদাসের মেঘদূতে বিরহিণীর বর্ণনায় আছে যে, যক্ষপত্নী বিরহশয়নের একটি প্রান্তে লীন হয়ে আছে, যেন পূর্বদিকের শেষ সীমায় কৃষ্ণপক্ষের কৃশতম চাঁদটুকুর মতো। বর্ষাশেষের এই নদীটুকু দেখে বিরহিণীর আর-একটি উপমা যেন দেখা যায়।...

কটক থেকে পুরী পর্যন্ত পথটি খুব ভালো। এমনি যত্ন করে রাখা হয়েছে যে কোথাও চাকার চিহ্ন পড়তে পায় না। পথটা উঁচু—তার দুই ধারে নিম্নক্ষেত্র। বড়ো বড়ো গাছে ছায়াময়। অধিকাংশ আম গাছ। এই সময়ে সমস্ত আম গাছে মুকুল ধরেছে, গন্ধে পথ আকুল হয়ে আছে। ঘন দীর্ঘ তরুশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে গাঢ় গেরুয়া রঙের দিব্যি তক্‌তকে পরিষ্কার পথটি চলে গেছে—দু ধারে চষা মাঠ নেবে গেছে। আম অশ্বত্থ বট নারিকেল এবং খেজুর গাছ-ঘেরা এক-একটি

গ্রাম দেখা যাচ্ছে। আমাদের বাংলাদেশের মতো জঙ্গল পানাপুকুর ডোবা এবং বাঁশঝাড় নেই—সমস্ত দেশটি যেন ব্রাহ্মণভোজনের জন্যে পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে, সবসুদ্ধ বেশ একটি তীর্থের ভাব আছে। মাঝে সর্দাইপুর বলে একটা জায়গায় ডাকবাংলাতে আমাদের থামবার কথা আছে। সেখানে যেতে পথে আমাদের আবার দুটো নদী পার হতে হল। একটার নাম বালুহন্তা, আর-একটার নাম ভার্গবী। তার মধ্যে নদীর অংশ বড়ো কিছু ছিল না—শুষ্ক বালির মাঝে-মাঝে এক-এক জায়গায় একটু-একটু স্বচ্ছ জল ঝিক্‌ঝিক্ করছে। তীরে বালির উপর অনেকগুলো ছাপরওয়ালা গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, গোলপাতার ছাউনির নিচে মেঠাইয়ের দোকান বসেছে—পথের ধারে গাছের তলায় এবং শ্রেণীবদ্ধ কুঁড়েঘরের মধ্যে যাত্রীরা খাওয়া-দাওয়া করছে, এবং ভিক্ষুকের দল নতুন যাত্রী ও গাড়ি পাল্কি দেখবামাত্র বিচিত্র কণ্ঠে ও ভাষায় আর্তনাদ করতে আরম্ভ করছে।

আমরা বিকেলে সর্দাইপুরের বাংলায় গিয়ে পৌঁছলুম। এখানকার বাংলা-গুলি বেশ। ছোটোখাটো, পরিষ্কার, গাছপালার মধ্যে ঢাকা, নিরালা—ইচ্ছে করে এই-সব বিশ্রামশালায় দিনকতক করে থেকে সত্যি-সত্যি বিশ্রাম করে যাই। চা খেয়ে আমরা সবাই বেড়াতে বেরলুম। তখন সূর্য সবে অস্ত গেছে—গোধূলির আলোতে সমস্ত আকাশ, বৃহৎ মাঠ, দূরের পাহাড় এবং পাহাড়ের উপরকার একটি ভাঙা মন্দির শান্তিময় সুন্দর মহিমায় অভিষিক্ত হয়ে গেছে। সে আর তোকে বেশি করে কী বলব, এই রকম সন্ধ্যার দৃশ্য আমার যে কী সুনিবিড় সুগভীর-ভাবে ভালো লাগে সে তোর চিঠিতে আমি বারবার প্রকাশ করেছি। গাছের সারির মাঝখানকার সেই দীর্ঘ স্তব্ধ পথ এবং দুই পার্শ্বের বিস্তৃত নিম্নভূমির মধ্যে একটি জনপ্রাণী দেখা যাচ্ছে না; আমার ইচ্ছে করছিল আমরাও চুপ করে মাথাটি নিচু করে এই নিস্তব্ধতার মাঝখান দিয়ে আস্তে আস্তে যাই—কিন্তু কথাবার্তার বিরাম ছিল না।...

রবিবার সকালে উঠে দেখি খুব মেঘ করেছে। আমরা চা রুটি খেয়ে প্রাতঃস্নান করে গাড়িতে উঠলুম। ফিট্‌নের ঘোমটা খুলে দেওয়া গেল, মেঘে সূর্য ঢাকা ছিল। যত পুরীর নিকটবর্তী হচ্ছি তত পথের মধ্যে যাত্রীর সংখ্যা বেশি দেখতে পাচ্ছি। ঢাকা গোরুর গাড়ি misfortuneএর ঝাঁকের মতো সারি সারি চলেছে। রাস্তার ধারে গাছের তলায় পুকুরের পাড়ে লোক শুয়ে আছে, রাঁধছে, জটলা করে রয়েছে। কিন্তু এর আগে সমস্ত পথে যাত্রী প্রায় দেখি নি। এক-এক সময় আসে যখন এই দীর্ঘ পথ লোকে একেবারে ভরে যায় এবং পূর্বকালে এই পথের দুই ধার মড়কে, উপবাসে, মৃত যাত্রীদের দেহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। এখনও ভিড়ের সময় বিস্তর লোক রোগে পথকষ্টে উপবাসে মারা যায়।...

পুরীর যত কাছাকাছি হচ্ছি পথের দুই ধারের গাছপালা ততই কমে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মন্দির আসছে এবং পান্থশালা ও বড়ো বড়ো পুষ্করিণী খুব ঘন ঘন পাওয়া যাচ্ছে। সন্ন্যাসী ভিক্ষুক এবং যাত্রীও ঢের দেখা দিচ্ছে। এক-এক জন ভিক্ষুক প্রায় আধঘণ্টাকাল আমাদের গাড়ির পিছন-পিছন অবিশ্রাম দৌড়ে জগন্নাথজি আমাদের মঙ্গলবিধান করবেন এই রকম আশ্বাস দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ভিক্ষে চেয়ে চলেছে। তারা প্রায় বেশ হৃষ্টপুষ্ট সুস্থ সবল ব্রাহ্মণ। পুরী সমুদ্রের ধারে বলে এর কাছাকাছি তেমন বেশি গাছপালা নেই। পথের ডান দিকে একটা খুব দীর্ঘ বিলের মতো আছে, তার ও পারে পশ্চিমে গাছের মাথার উপর

জগন্নাথের মন্দির-চূড়া দেখা যাচ্ছে। পথের ধারে ধারে ক্রমেই খুব ঘন ঘন মন্দিরের সার এবং পথিকের ভিড় দেখে বুঝতে পারলুম পুরী খুব কাছে এসেছে। আমরা সার্কিট হৌসে থাকব, সেটা শহরের বাইরে। হঠাৎ এক জায়গায় গাছপালার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েই সুবিস্তীর্ণ বালির তীর এবং ঘন নীল সমুদ্রের রেখা দেখতে পাওয়া গেল। তীরে দুটি-চারটি বিচ্ছিন্ন সাদা সাদা বাড়ি, একটি chapel এবং কতকগুলি বাঁধানো পাতকুয়ো। বালির মধ্যে মধ্যে শান-বাঁধানো রাস্তা এবং এক-একটি করে বসবার বেঞ্চি। পুরীর সমুদ্র যে আমার কত ভালো লাগছে সে আমি প্রকাশ করে বলতে পারব না—এই পর্যন্ত বললেই যথেষ্ট হবে আমার মতো দরিদ্র ব্যক্তি ধার করে এখানে সমুদ্রের ধারে একটি বাংলা তৈরি করবার উদ্যোগ করছে। উড়িষ্যার এই পথটা দেখে আমার ক্রমাগত কালিদাসের মেঘদূত মনে পড়ছিল। কেয়াগাছের-বেড়া-দেওয়া দশার্ণ গ্রামের কথা মেঘদূতে আছে, এখানেও অনেক গ্রাম কেয়ার বেড়া দেওয়া। বরাবর দিগন্তের ধারে ধারে নীলবর্ণ পাহাড় দেখা যাচ্ছে আর মেঘদূতে যাকে নগনদী বলে লেখা আছে, অর্থাৎ পাহাড়ে নদী, যে-সব নদীতে কেবল বর্ষাকালে পাহাড়ের জলস্রোত আসে, গ্রীষ্মকালে বালি এবং নুড়ি পড়ে থাকে, সেরকম নদী এখানে অনেক। তার উপরে আবার আমাদের এই পুরী-যাত্রার সমস্ত পথই প্রায় মেঘ করে ছিল, বড়ো বড়ো নারকোল-বন মন্দির এবং কৃষিক্ষেত্রের উপর মেঘের গাঢ় ছায়া পড়েছিল, দিগন্তের পাহাড়ের রেখা মেঘের রেখার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। আমরা আবার আজ রাত্রে কনারকে সূর্যমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখতে যাচ্ছি।

সোলাপুর
২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

৮২

কটক
২৫ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৩।

দেখিস আমার লেখা আজ হু হু করে এগিয়ে যাবে—চৈত্র মাসের সাধনার জন্যে যে ডায়ারিটা লিখতে আরম্ভ করেছিলুম এবং যা ভাঙা রাস্তায় বহুভারগ্রস্ত গোরুর গাড়ির মতো কিছুতে এগোতে পারছিল না, আজ সেটা নিশ্চয় শেষ করে ফেলব। যখন মন একটু খারাপ থাকে তখনই সাধনাটা অত্যন্ত ভারের মতো বোধ হয়। মন ভালো থাকলে মনে হয়, সমস্ত ভার আমি একলা বহন করতে পারি। তখন মনে হয়, আমি দেশের কাজ করব এবং কৃতকার্য হব। তখন লোকের উৎসাহ এবং অবস্থার অনুকূলতা কিছুই আবশ্যক মনে হয় না, মনে হয় আমার নিজের কাজের পক্ষে আমি নিজেই যথেষ্ট। তখন এক-এক সময়ে আমি নিজেই খুব দূর ভবিষ্যতের যেন ছবি দেখতে পাই—আমি দেখতে পাই, আমি বৃদ্ধ পক্বকেশ হয়ে গেছি, একটি বৃহৎ বিশৃঙ্খল অরণ্যের প্রায় শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁচেছি, অরণ্যের মাঝখান দিয়ে বরাবর সুদীর্ঘ একটি পথ কেটে দিয়ে গেছি এবং অরণ্যের অন্য প্রান্তে আমার পরবর্তী পথিকেরা সেই পথের মুখে কেউ কেউ প্রবেশ করতে

আরম্ভ করেছে, গোধূলির আলোকে দুই-এক জনকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। আমি নিশ্চয় জানি 'আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে'। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে আমি দেশের মন হরণ করে আনব— নিদেন আমার দু-চারটি কথা তার অন্তরে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকবে। এই কথা যখন মনে আসে তখন আবার সাধনার প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়ে ওঠে। তখন মনে হয় সাধনা আমার হাতের কুঠারের মতো, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করবার জন্যে এ'কে আমি ফেলে রেখে মরচে পড়তে দেব না— এ'কে আমি বরাবর হাতে রেখে দেব। যদি আমি আরও আমার সহায়কারী পাই তো ভালোই, না পাই তো কাজেই আমাকে একলা খাটতে হবে।

পুনা
৩ মার্চ ১৮৯৩

৮৩

কটক
২৭ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৩।

কিন্তু ... ... বলে যিনি বেদীতে বসেছিলেন তিনি এমন সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে, শ্রোতাদের কিছুমাত্র ধৈর্য ছিল না। ওরকম ক্রমাগত কথা শুনতে শুনতে মন একেবারে যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়— উপাসনার ঠিক বিপরীত ফল হয়। এর চেয়ে ঘরে বসে তাস পাশা খেললে মন ভালো থাকে। ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় এই জন্যেই যেতে ইচ্ছে করে না। সব জিনিসেরই ভালোমন্দ অধিকার-অনধিকার আছে। যে-কেউ ধর্ম সম্বন্ধে যেমন তেমন করে বলুক তাই যে প্রতি সপ্তাহে ধৈর্যসহকারে শুনে যাওয়া একটা কর্তব্যের মধ্যে, তা কিছুতেই বলা যায় না। বরং তাতে মনের ভিতরে একটা অশান্তি এবং বিদ্রোহের ভাব উপস্থিত হয়। যে ভালো করে বলতে পারে সেই বলবে এবং তারই কথা শুনব— এই হচ্ছে নিয়ম। বিষয় যত উচ্চ বলবার লোকের ক্ষমতাও তত বেশি হওয়া চাই। কিন্তু হয়ে পড়েছে এমনি যে প্রায় ধর্মবক্তৃতাই অযোগ্য বক্তার হাতে। তার কারণ, লোকে মনে করে ধর্মের কথা কানে উঠলেই যেন একটা পুণ্য আছে, এইজন্যে একটা উচ্চ প্রস্তর-খণ্ডের উপরে চড়ে যে যেমন করে বলুক লোকে নীরবে শুনে কর্তব্য পালন করে যায়। এইজন্যে ধর্মবক্তা সম্বন্ধে আর যোগ্যতা-বিচার হয় না। আমার তো মনে হয়, এ নিতান্ত অন্যায়। যার যে বিষয়ে রসবোধ বেশি আছে সেই বিষয়ে সে গোঁজামিলন সইতে পারে না। যাদের ধর্মবোধ এবং সাহিত্যবোধ কিছু আছে তারা যে ভাবহীন রসহীন অনর্গল পুরোনো বাজে কথা কী রকম করে সহ্য করে আমি তো ভেবে পাই নে। যাদের সে বোধ নেই তাদের যে এরকম বক্তৃতায় বোধ জন্মাবে তারও সম্ভাবনা দেখি নে। আসল, George Eliot যাকে other-worldliness বলেন ধর্ম সম্বন্ধে অনেকের অজ্ঞাতসারে সেই ভাবটা আছে— তারা মনে করে, যে সময়টা যে-কোনোরকম ধর্মসম্পর্কীয় ব্যাপারে ব্যয় করা গেল সেটা যেন একটা investmentএর মতো, কোনো-একটা খাতায় জমা হয়ে যেন তার সুদ

বাড়তে চলল। কিন্তু আমার মনে হয়, ভালো প্রসঙ্গ যদি কেউ ভালো করে ব্যক্ত না করে তবে সেটা শোনা একটা মহৎ লোকসান। তাতে কেবল মানসিক স্বাদ খারাপ হয়ে যায়— অন্তরের একটি স্বাভাবিক সচেতন বোধশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। নিয়মিত বেসুরো গান শোনা মানুষের পক্ষে যেমন অশিক্ষা, নিয়মিত অনুপযুক্ত ধর্মবক্তৃতা শোনা মানুষের পক্ষে তেমনি একটা ক্ষতিজনক কাজ। এইজন্যে আমি নিজেও বেদীতে উঠে বলতে চাই নে, জানি সে বিষয়ে আমার স্বাভাবিক ক্ষমতা নেই, মনের মধ্যে একটা অনিবার্য আহ্বান নেই— এবং প্রতি বুধবারে নিয়মিত ... ...র বক্তৃতা শুনে আসাও আমার কর্তব্য জ্ঞান করি নে— বড়দাদা যখন একটা কিছু বলেন তখন আমার সমস্ত চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং উপকার হয়। অক্ষম লোকে যখন বলতে আরম্ভ করে তখন মনের মধ্যে যে-একটা অসহ্য অধৈর্য এবং বিরক্তি উপস্থিত হয় তাতে কেবল অপকার হয়।

সোলাপুর
৫ মার্চ ১৮৯৩

৮৪

কটক
মঙ্গলবার
। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩।

তুই যা বলেছিস আমার সঙ্গে তার মতের কোনো অনৈক্য নেই। তোকে কী লিখেছিলুম কিচ্ছু মনে নেই, হয়তো মনের আক্ষেপে কিছু বেশি মাত্রায় বলে থাকব। কিন্তু আমার মত হচ্ছে এই যে, এখন বহুকাল আমাদের অজ্ঞাতবাস বিজনবাস আবশ্যক। এখন আমাদের প্রস্তুত হবার সময়, এই অসম্পূর্ণ অবস্থায় নিজেকে সকলের চোখের সামনে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবার কাল নয়। যে সময় গঠন হতে থাকে সেই সময়টা অত্যন্ত গোপনীয় সময়। নিতান্ত কিশোর বয়সের বালকবালিকাদের যেমন প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের আমোদপ্রমোদ এবং কার্যসভায় সর্বদা আত্মপ্রকাশ করতে দিলে তাদের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়; দুটো-একটা ক্লেভার কথা কয়ে, বয়োজ্যেষ্ঠদের কৌতুকজনক অনুকরণ করে, বাহবা এবং প্রশংসাহাস্য পেয়ে তারা মনে করে 'আমরা সম্পূর্ণতা লাভ করেছি, আমরা আমাদের জ্যেষ্ঠতাতদেরই সমকক্ষ'— তেমনি আমাদের জাতীয় কৈশোর বয়সে আমরাও যদি দুটো-একটা বাহ্য চাকচিক্য, দুটো-একটা ইংরিজি ধরনধারণ ভড়ং এবং চটুলতা দেখিয়ে ছোটোখাটো বাহবা এবং সভাপ্রান্তে একটু-আধটু স্থান লাভ করি তা হলে আমাদের ভ্রম হবে যে, আমাদের সব হয়ে গেছে। যে-সমস্ত আশু-পুরস্কার-হীন কঠিন কাজ, দুরূহ কর্তব্য, একান্ত প্রাণসমর্পণ-ব্যতীত জাতির চরিত্র গঠিত হয় না সেগুলোকে অনাবশ্যক এবং তুচ্ছতর মনে হবে। একটা উদাহরণ দেখ্-না, যে-সমস্ত পেট্রিয়ট ভালো ইংরিজি বক্তৃতা করে একবার বাহবা পেয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সে কত উপেক্ষা করে। তার ইংরিজি বক্তৃতায় যে ক্ষণিক উপকারটুকু হয় সেই উপেক্ষার তুলনায় তা কত সামান্য। ইন্‌ডিয়া অথবা বেঙ্গল কৌন্সিলে

আসন পাবার সম্মান যে একবার পেয়েছে সে তার তুলনায় সমাজের ভিতরকার কাজ করাকে কত তুচ্ছ জ্ঞান করে! ইংরেজ সেজে যে ইংরেজের টেবিলের ধারে একটুখানি বসতে পেয়েছে স্বজাতির হৃদয় পাবার জন্য তার ঔদাসীন্য কী সুগভীর! এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক বলেই আমাদের বেশি সতর্ক হওয়া উচিত। আমি জানি, গবর্নর-সাহেব যদি দুদিন আমার তেতালায় গিয়ে আমার সেই বড়ো কেদারায় হেলান দিয়ে আমাকে 'মাই ডিয়ার' বলে আধখানা চুরোট ফুঁকে আসে তা হলে আমি-যে এই এহেন রবি আজ মধ্যাহ্নমার্তণ্ডের মতো অগ্নিচক্র হয়ে উঠেছি আমাকেও সেই ল্যান্স্‌ডাউনের ম্লেচ্ছাধরোৎক্ষিপ্ত একটিমাত্র ধূম্র-কুণ্ডলীতে পূর্ণগ্রাস করে দিতে পারে। তখন আমার মুখমণ্ডল ব্যাপ্ত করে কী-একটি পরিতৃপ্ত হাস্য এবং আমার সমস্ত ভাষার উপর মধুরতার দ্রবধারা চিটে-গুড়ের মতো লিপ্ত হয়ে যায়! সেই তো প্রধান আশঙ্কা! সেইজন্যেই তো তেতালার ছাত বন্ধ করে রাখা আবশ্যক (পাছে আমাদের গবর্নর-সাহেব তাঁর পরমবন্ধু ট্যাগোরের টিনের ছাতের নিচে চুরোট খেতে আসেন!)! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হবার সময় পাণ্ডবরা এক বৎসর অজ্ঞাতবাস যাপন করেছিলেন —গুরুগোবিন্দ তাঁর গুরুপদ গ্রহণ করবার পূর্বে বহুকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আমাদের এখন সেই সময়। এখন যদি গা-ঢাকা দিয়ে নিজের কর্মশালার মধ্যে বসে গভীর গম্ভীর নিবিষ্ট ভাবে নিজের লোক ও নিজের সমাজের কাজ না করি—যদি একবার আপনার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত হতে দিই, সম্পূর্ণতা লাভ করবার পূর্বেই ক্রমাগত নিজের অসমাপ্ত কাজ দেখিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহবা নেবার ইচ্ছে করি—তা হলে কিছুই হবে না। গাছ যেমন রৌদ্রে পুষ্ট হয়, কিন্তু বীজ তাতে শুকিয়ে মৃতভাবে থাকে, সেই রকম কর্মের প্রথম আরম্ভ বাহিরের নিন্দাপ্রশংসা ও আঘাতব্যাঘাতের যোগ্য নয়—খানিকটা পরিণত হলে তবে সে মাটির বাহিরে আসে, রৌদ্র বৃষ্টি গ্রহণ করে এবং সেই উপায়েই শক্ত হয়ে ওঠে। ইংরেজ আমাদের নিন্দা করুক, প্রশংসা করুক, যাই করুক—আমাদের প্রতি বিমুখ হোক বা প্রসন্ন হোক, সে দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করে আমাদের উপেক্ষিত দেশ, আমাদের উপেক্ষিত ভাষা, আমাদের অপমানিত লোকদের কাজে জীবন সমর্পণ করতে হবে। যেখানে কেবল অপমান উপেক্ষা এবং অখ্যাতি সেই অন্ধকার নিম্নদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করা কি সহজ কথা! খ্যাতিসম্মানের বিলাসে একবার অভ্যস্ত হলে কি আর দৈন্যের মধ্যে টেকা যায়! তখন ক্রমাগত মনে হয় কিসে আমার বইটা ইংরেজে পড়বে। কিসে আমার পৃষ্ঠদেশে ইংরেজে চাপড় মারবে। কিসে আমার ঘৃণিত দেশের লোক আমাকে তার স্বাজাতীয় বলে সন্দেহ না করে, এবং কিসে ইংরেজ আমাকে আমাদের দেশের মহৎ এক্সেপ্‌শন্‌ বলে গ্রহণ করে। যারা ইংরেজ-সংসর্গ-সম্মানের স্বাদ একবার পেয়েছে তারা যে সেটাকে বহুমূল্য জ্ঞান করে সেজন্যে আমি তাদের দোষ দিই নে—এ আকর্ষণ এ প্রলোভন খুব গুরুতর সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই জন্যেই আমি নিজের কোটরে লুকোতে চাই। … …রের রাজা যে স্বদেশে বসে রাজত্ব করার চেয়ে সিমলায় গিয়ে সাহেবের সঙ্গে টেনিস খেলতে এবং মেমের সঙ্গে নাচতে ভালোবাসে—সাহেব-মেমেরা তাকে দ্বারভাঙ্গার রাজার চেয়ে ঢের বেশি প্রশংসা করে, বলে যে একজন ইংরেজের সঙ্গে এর কোনো প্রভেদ নেই—এখন তার পক্ষে …রে বসে রাজত্ব করা কি কম কঠিন! আমি হলেও হয়তো ঠিক ঐ রকম হতুম—আমিও বাঙালি, আমারও স্বাধীন তেজ নেই। সেই জন্যেই সেটা গোপনে সঞ্চয় এবং বহুযত্নে পালন করতে হবে—সেটা

যতক্ষণে না সবল ও আত্মরক্ষণক্ষম হয়ে উঠবে ততদিন তাকে অন্তরালে রেখে কাঠখড় যোগাতে হবে। তার পরে আর কাউকে ভয় করি নে, তার পরে আর নিজের জন্যে লজ্জা নেই— এখন নিজেকে বিশ্বাস নেই।

সোলাপুর
৬ মার্চ ১৮৯৩

৮৫

বালিয়া
শুক্রবার
।৩ মার্চ ১৮৯৩।

আমরা এখনো বোটেই আছি। ছোট্ট বোটখানি। একটি বড়ো জালিবোটের উপর ছাত তৈরি করে এই বোটটি হয়েছে— আমার মতো লম্বা লোকের দৈর্ঘ্যগর্ব খর্ব করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছি— ভ্রমক্রমে মাথা একটুখানি তুলতে গেলেই অমনি কাষ্ঠফলকের প্রচণ্ড চপেটাঘাত মাথার উপর এসে পড়ে, হঠাৎ একেবারে দমে যেতে হয়— সেই জন্যে কাল থেকে নতশিরে যাপন করছি। তোকে বলা বাহুল্য, মাথা ঠোকা, হুঁচট খাওয়া, হাত পা কাটা প্রভৃতি বেদনাজনক ব্যাপার খুব নিরাপদ স্থানেও আমার দ্বারা অত্যন্ত অবলীলাক্রমে সম্পন্ন হয়ে থাকে; সে অবস্থায় এই সাড়ে চার ফুট বোটের মধ্যে ছ ফুট অন্যমনস্ক লোকের অহরহ কিরকম দুর্গতি হচ্ছে তা কল্পনা করা শক্ত নয়। কপালে যত দুঃখ যত ব্যথা ছিল তার উপরে আবার প্রত্যেকবার দাঁড়াতে গিয়ে নতুন ব্যথা বাড়ছে। সেজন্যে আমি তত আপত্তি করি নে— কিন্তু কাল সমস্ত রাত্তির মশার জ্বালায় ঘুম হয় নি সেটা আমার ভারী অন্যায় মনে হচ্ছে। সকল রকম ঘা খাওয়া আমার অভ্যাস আছে, কিন্তু অনিদ্রাটা আমার তেমন সয়ে যায় নি। সেই জন্যে আজ সমস্ত শরীরগ্রন্থি যেন শিথিল হয়ে গেছে— বিছানার উপর কাত হয়ে পড়ে বাম কনুইয়ের উপর দেহভার রেখে একটা বালিশের উপর পোর্টফোলিয়ো বিছিয়ে নিতান্ত অলসভাবে তোকে লিখে যাচ্ছি। এ দিকে আবার শীত কেটে গিয়ে গরম পড়ে এসেছে— রৌদ্র উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এবং পাশের জানলা দিয়ে মন্দ মন্দ সজল শীতল বাতাস পিঠের উপর এসে লাগছে। আজ আর শীত কিম্বা সভ্যতার কোনো খাতির নেই— বনাতের চাপকান এবং চোগা হুকের উপর উদ্‌বন্ধনে ঝুলছে— নীল-লোহিত-রেখাঙ্কিত জিনের রাত্রিবস্ত্র পরে নিঃসংকোচে প্রভাতযাপন করছি, ঘণ্টাও বাজছে না, সসজ্জিত খানসামা এসেও সেলাম করছে না— অর্ধসভ্যতার অপরিচ্ছন্ন শৈথিল্য এবং আরাম উপভোগ করছি। পাখিগুলো ডাকছে এবং তীরে দুটো বড়ো বড়ো বট গাছের পাতা বাতাসে ঝর্‌ঝর্ করে শব্দ করছে, কম্পিত জলের উপরকার রৌদ্রালোক আমাদের বোটের ভিতরে এসে চিক্‌মিক্ করে উঠছে, বেলাটা এক রকম ঢিলে ভাবেই চলেছে। কটকে থাকতে ছেলেদের ইস্কুল এবং বিহারীবাবুর আদালতে যাবার তাড়া দেখে সময়ের দুর্মূল্যতা এবং সভ্য মানবসমাজের ব্যস্ততা খুব

অনুভব করা যেত। এখানে সময়ের ছোটো ছোটো নির্দিষ্ট সীমা নেই— কেবল দিন এবং রাত্রি এই দুটি বড়ো বড়ো বিভাগ।

সোলাপুর
১১ মার্চ ১৮৯৩

৮৬

তীরতল
শুক্রবার
।৩ মার্চ ১৮৯৩।

এই মেঘবৃষ্টি পাকা কোঠার মধ্যে অতি ভালো, কিন্তু ছোট্ট বোটটির মধ্যে দুটি রুদ্ধ প্রাণীর পক্ষে মনোরম নয়। একে তো উঠতে বসতে মাথা ঠোকে, তার উপরে আবার যদি মাথায় জল পড়তে থাকে, তা হলে বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম হতেও পারে, কিন্তু আমার 'দুর্দশার পেয়ালা' একেবারে পূর্ণ হয়ে ওঠে। মনে করেছিলুম বৃষ্টি বাদলা এক রকম ফুরোলো, এখন স্নাত পৃথিবীসুন্দরী কিছুদিন রৌদ্রে পিঠ দিয়ে আপনার ভিজে এলোচুল শুকোবে, আপনার সিক্ত সবুজ শাড়িখানি রৌদ্রে গাছের ডালে টাঙিয়ে দেবে, মাঠের মধ্যে মেলে দেবে— বসন্তী আঁচলখানি শুকিয়ে বেশ ফুর্‌ফুরে হয়ে বাতাসে উড়তে থাকবে। কিন্তু রকমটা এখনো সে ভাবের নয়— বাদলার পর বাদলা, এর আর বিরাম নেই। আমি তো দেখেশুনে এই ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগে কটকের এক ব্যক্তির কাছ থেকে একখানি মেঘদূত ধার করে নিয়ে এসেছি— আমাদের পাণ্ডুয়ার কুঠির সম্মুখবর্তী অবারিত শস্যক্ষেত্রের উপরে আকাশ যেদিন আর্দ্র স্নিগ্ধ সুনীলবর্ণ হয়ে উঠবে, ভালোবাসার ছলছল মুগ্ধ দৃষ্টির মতো, সেদিন বারান্দায় বসে আবৃত্তি করা যাবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার কিছুই মুখস্থ হয় না— কবিতা ঠিক উপযুক্ত সময়ে মুখস্থ আবৃত্তি করে যাওয়া একটা পরম সুখ, সেটা আমার অদৃষ্টে নেই। যখন আবশ্যক হয় তখন বই হাতড়ে সন্ধান করে পড়তে গিয়ে আবশ্যক ফুরিয়ে যায়। মনে কর্ মনে ব্যথা লেগে ভারী কাঁদতে ইচ্ছে হয়েছে, তখন যদি দরোয়ান পাঠিয়ে বাথ্‌গেটের বাড়ি থেকে শিশি করে চোখের জল আনতে হত তা হলে কী মুশকিলই হত। ঐ জন্যে মফস্বলে যখন যাই তখন অনেকগুলো বই সঙ্গে নিতে হয়— তার সবগুলোই যে প্রতিবার পড়ি তা নয়, কিন্তু কখন্ কোন্‌টা দরকার বোধ হবে আগে থাকতে জানবার জো নেই, তাই সমস্ত সরঞ্জাম হাতে রাখতে হয়। মানুষের মনের যদি নির্দিষ্ট ঋতুভেদ থাকত তা হলে অনেক সুবিধে হত— যেমন শীতের সময় কেবল শীতের কাপড় নিয়ে যাই এবং গরমের সময় আল্‌স্টার নেবার কোনো দরকার থাকে না, তেমনি যদি জানতুম মনে কখন শীত কখন বসন্ত আসবে তা হলে আগে থাকতে সেইরকম গদ্য কিম্বা পদ্যের জোগাড় করা যেতে পারত। কিন্তু মনের ঋতু আবার ছ'টা নয়, একেবারে বাহান্নটা— এক প্যাকেট তাসের মতো— কখন্ কোন্‌টা হাতে আসে তার কিচ্ছু ঠিক নেই— অন্তরে বসে বসে কোন্ খামখেয়ালি খেলোয়াড় যে এই তাস ডীল করে এই খামখেয়ালি খেলা খেলে তার পরিচয়

জানি নে। সেইজন্য মানুষের আয়োজনের শেষ নেই— তাকে যে কত রকমের কত-কী হাতে রাখতে হয় তার ঠিক নেই। সেই জন্যে আমার সঙ্গে 'নেপালীজ বুদ্ধিস্টিক লিটারেচর' থেকে আরম্ভ করে শেক্‌স্‌পীয়র পর্যন্ত কত রকমেরই যে বই আছে তার আর ঠিকানা নেই। এর মধ্যে অধিকাংশ বইই ছোঁব না, কিন্তু কখন্‌ কী আবশ্যক হবে বলা যায় না। অন্য বার বরাবর আমার বৈষ্ণবকবি এবং সংস্কৃত বই আনি; এবার আনি নি, সেই জন্যে ঐ দুটোরই আবশ্যক বেশি অনুভব হচ্ছে। যখন পুরী খণ্ডগিরি প্রভৃতি ভ্রমণ করছিলুম তখন যদি মেঘদূতটা হাতে থাকত ভারী সুখী হতুম। কিন্তু মেঘদূত ছিল না, তার বদলে Caird's Philosophical Essays ছিল, একেই বলে 'হেরফের'।

সোলাপুর
১১ মার্চ্‌ ১৮৯৩

৮৭

কটক
সোমবার। ৬ মার্চ্‌ ১৮৯৩।

পুরীর ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে প্রশংসালাভ করে আমি খুশি হয়েছি কি না তুই জিজ্ঞাসা করেছিস। তোকে সমস্ত কথা খুলে লিখি নি বলে তোর এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়েছে। তবে বিস্তারিত বিবরণটা দেওয়া যাক। প্রথমে যখন বিহারীবাবুরা পুরীর ম্যাজিস্ট্রেটের উপর call করতে আমাকে অনুরোধ করলেন তখন আমি অনেক ইতস্তত করেছিলেম, কিন্তু তাঁরা আশ্বাস দেওয়াতে এবং ইচ্ছা প্রকাশ করাতে আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলুম। দুখানি কার্ডে আমার নাম লিখে বিহারী-বাবুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। তাঁদের সঙ্গে কার্ড্‌ ছিল না— তাঁরা খবর পাঠিয়ে দিলেন এবং আমার কার্ড্‌ দুটোও সেই সঙ্গে পাঠালেন। মিনিট পাঁচেক পরে খবর এল— তার পরদিন সকালে এলে সাহেবের সঙ্গে মুলাকাৎ হবে। বিহারীবাবু মিসেস গুপ্ত অবাক হয়ে গেলেন। আমরা তো সুড়্‌ সুড়্‌ করে ম্যাজিস্ট্রেটের দরজা থেকে বেরিয়ে চলে গেলুম। বিহারীবাবুরা তো মহা বিরক্ত। হেনকালে সন্ধের সময় চিঠি এল যে মিসেস ওয়াল্‌স্‌ (ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ওয়াল্‌স্‌) ভারী দুঃখিত। জজসাহেব এবং তাঁর মেমসাহেব যে খবর পাঠিয়েছিলেন তাঁর চাপরাশি সে কথা তাঁকে জানায় নি। আমিও তাই মনে করেছিলুম। কিন্তু এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে এই যে, ম্যাজিস্ট্রেট যদিও জজসাহেবকে অমান্য করতে চায় না— কিন্তু কোনো 'নেটিভ' ভদ্রলোক গেলে তাকে তার পরদিন সকালবেলা মুলাকাৎ করতে আসতে বলে। বোধ হয় মিসেস ম্যাজিস্ট্রেটকে কার্ড্‌ পাঠানো স্পর্ধা মনে করে। অবিশ্যি বলতে পারে সেদিন তার সময় নেই, কিন্তু তার নির্দিষ্ট-সময়-মত সময় করে আমি যে সেলাম করতে আসব তিনি এমনি কী নবাবের পুত্র! অবিশ্যি, আমাদেরই দেশের লোকের দোষ— তারা পেটের দায়ে মানের দায়ে উমেদারি করতে, সেলাম করতে যায়, সাহেবের আদিষ্ট সময়ে দ্বারদেশে অপেক্ষা করে থাকে— সুতরাং আমি বঙ্গনামধারী এক ব্যক্তি যে আস্ফালন করে

ম্যাজিস্ট্রেট এবং মিসেস ম্যাজিস্ট্রেটের উপর সামাজিক কর্তব্যরক্ষাস্বরূপ 'কল' করতে যাব এ তাদের মনেও উদয় হয় নি। সুতরাং এ নিয়ে সাহেবের উপর অভিমান করতে বসা আমার পক্ষে নিতান্ত বাড়াবাড়ি হয়। কিন্তু এ কথা মনে স্বতই উদয় হয়, ওদের কাছে সোহাগ করে লৌকিকতা করতে যাওয়া ঝকমারির একশেষ। আমি যতই ভদ্রলোক এবং সম্ভ্রান্ত লোক হই-না কেন, ওদের কাছে তার কোনো মূল্য নেই। যতক্ষণ না আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব ঘুচিয়ে ফেলে ওদের প্রদত্ত একটা কৃত্রিম সম্মান পরিধান করব ততক্ষণ ওদের কাছে আমার কোনো আমল নেই। এই দেখ্-না কেন, আমাদের দেশের ব্যারিস্টারেরা যতই ইংরেজ-সোহাগ-প্রিয় বিলিতি-মেজাজী হোক-না কেন তাঁরা তো এ দেশে এসে সাহেবদের সঙ্গে তেমন কুটুম্বিতে করে উঠতে পারেন না। তাঁরা তো বার-লাইব্রেরিরও মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্করেখার মতো একটি স্বতন্ত্র কৃষ্ণসীমার মধ্যে স্বভাবতই বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করেন। কাজ কী বাপু, আমাদের এমনি কী দায় পড়েছে! আমাদের নিজের ঘরে এতই কি অতিষ্ঠ হয়েছি! আমাদের কৃষ্ণ-কুটুম্বরা যতই কৃষ্ণ হোন-না কেন, তাঁরা তো আর আমাদের চেয়ে কৃষ্ণতর নন। যতক্ষণ ইংরেজ আমাকে আমাদের জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্মান করে ততক্ষণ সে সম্মান আমার পক্ষে অপমান এবং অগ্রাহ্য।—পুরীর ম্যাজিস্ট্রেট পরদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করলে আমি কি তাতে ভারী খুশি হয়েছিলুম? তা মনেও করিস নে। নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলে বড়ো বেশি স্পষ্টরূপ অভিমান প্রকাশ করা হয় এবং তাতে যথার্থ অভিমানের খর্বতা হয়—তা ছাড়া বিহারীবাবুদের বিশেষ ক্ষুণ্ণ করা হয়। তাই খেতে গেলুম, ম্যাজিস্ট্রেটের শ্যালীর পাণিগ্রহণ করে সহাস্যমুখে টেবিলে বসলুম—সমুদ্রতীরদৃশ্যের সৌন্দর্য সম্বন্ধে পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে একমত হলুম এবং পুরীতে সমুদ্রবায়ুপ্রবাহ-জন্য গ্রীষ্মের অনাধিক্যবশত আনন্দ প্রকাশ করলুম। তার পরে গান শুনলুম, গান শোনালুম, তালি দিলুম এবং তালি পেলুম। এই-যে বাহবাটুকু পাওয়া যায় এ কি যথার্থ হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে? এ কি কতকটা কৌতূহলপরিতৃপ্তি নয়? আমাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি জীবের মুখে আমাদের কোন্ খাবারটি একটু রুচিজনক মনে হয় তাই কি পরীক্ষা করে দেখা নয়? সত্যি কি আমার যা ভালো লাগে ওদের তাই ভালো লাগে? এবং ওদের যা ভালো লাগে না তাই বাস্তবিক ভালো নয়? তাই যদি না হয় তবে শুভ্র করতলের তালিতে আমার এতই কি সুখ হবে? ইংরেজের তালিকে যদি আমরা অতিরিক্ত মূল্য দিতে আরম্ভ করি তা হলে আমাদের দেশের অনেক ভালোকে ত্যাগ করতে এবং ওদের দেশের অনেক মন্দকে গ্রহণ করত হয়। তা হলে পায়ের মোজাটি খুলে বেরতে আমাদের হয়তো লজ্জা হবে, কিন্তু ওদের নাচের কাপড় পরতে লজ্জা হবে না। আমাদের দেশের শিষ্টাচার সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করতে কিছুই সংকোচ হবে না এবং ওদের দেশের কোনো প্রচলিত অশিষ্টাচারও অম্লান-মুখে গ্রহণ করতে পারব। আমাদের দেশের আচ্‌কানকে সম্পূর্ণ মনের মতো ভালো দেখতে নয় বলে ত্যাগ করব, কিন্তু ওদের দেশের টুপিকে বদ দেখতে হলেও শিরোধার্য করব। শুভ্র হস্তের করস্পন্দন ও করতালি আমাদের পক্ষে বড়ো ভয়ানক—ওতে আমরা অতি সামান্য বাহ্য সম্মান পাই, কিন্তু আমাদের যথার্থ আত্মসম্মান তলে তলে নষ্ট করে ফেলে। আমরা জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে ঐ করতালির নির্দেশমত আপনার জীবনটা গঠিত করতে থাকি এবং তাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র করে ফেলি। আমি নিজেকে সম্বোধন করে বলি—'হে মৃৎপাত্র, ঐ কাংস্যপাত্রের কাছ থেকে দূরে

থেকো; ও যদি রাগ করে তোমাকে আঘাত করে তাতেও তুমি চূর্ণ হয়ে যাবে আর ও যদি সোহাগ করে তোমার পিঠে চাপড় মারে তাতেও তুমি ফুটো হয়ে অতলে মগ্ন হয়ে যাবে— অতএব বৃদ্ধ ঈশপের উপদেশ শোনো, তফাত থাকাই সার কথা। উনি থাকুন বড়ো ঘরে আর আমার সামান্য ঘরে সামান্য পাত্রের হয়তো ছোটোখাটো কাজ আছে, কিন্তু সে যদি আপনাকে ভেঙে ফেলে তবে তার বড়ো ঘরও নেই ছোটো ঘরও নেই— তবে সে মাটির সমান হয়ে যাবে। তখন হয়তো আমাদের বড়ো-ঘর-ওয়ালা ঐ খণ্ড জিনিসটিকে তাঁর ড্রয়িংরুমের ক্যাবিনেটের এক পার্শ্বে সাজিয়ে রাখতে পারেন, সে কিন্তু ক্যুরিয়সিটির স্বরূপে— তার চেয়ে ক্ষুদ্র গ্রামের কুলবধূর কক্ষে বিরাজ করেও গৌরব আছে।'

সোলাপুর
১৩ মার্চ ১৮৯৩

৮৮

কটক
মঙ্গলবার। ৭ মার্চ ১৮৯৩।

সুরি বেচারা এক্‌জামিন পাস করবার জন্যে সৃষ্ট হয় নি। ওর উচিত ছিল আমার মত পাশ-কাটানো 'লিটারেরি' হওয়া। কিন্তু তার পক্ষে একটা ব্যাঘাত হয়েছে এই যে, ও যেমন আপনার ইজিচেয়ারটির মধ্যে নিমগ্ন হয়ে দিব্যি আরামে আছে, ওর মনটিও তেমনি ওর অন্তঃকুহরটির মধ্যে দিব্যি গট্ হয়ে বসে আছে— তার অগাধ সন্তোষ কিছুতেই বিচলিত হয় না। আমরা কুনো অকর্মণ্য এবং সংসারের সকল বিষয়ে অকৃতকার্য বটে, কিন্তু আমাদের মনটা কুনো নয়, সে সর্বদাই উড়ু উড়ু করছে— তাকে এক মুহূর্ত বেঁধে রাখা দায়। ঐটেই হচ্ছে খ্যাপামির প্রধান লক্ষণ। সুরির কোনো খ্যাপামি নেই, ও ভারী স্নিগ্ধ। প্রকৃতির মুখশ্রীতে যেমন একটা গভীর নিশ্চিন্ত ত্বরাহীনতার ভাব আছে, ওর সেই রকম। আমার মতো নিত্য অস্থিরস্বভাবের লোকের পক্ষে নির্জন প্রকৃতি এবং সুরির মতো অচল সুস্থিরতার সংসর্গ ভারী আবশ্যক। ও যখন ওর স্বাভাবিক শান্ত স্নিগ্ধভাবে আমাকে ওর বাহুর দ্বারা বেষ্টন করে ধরে, আমার সমস্ত ছট্‌ফটানির চার দিকে যেন একটি বাঁধ তুলে দেয়। এক-একজন লোক আছে যারা কোনো কিছু না করলেও যেন আশাতীত ফল দান করে; সুরি সেই দলের লোক। ও যে খুব পাস করবে, প্রাইজ পাবে, লিখবে, বড়ো কাজ কিম্বা ভালো চাকরি করবে, তা যেন তেমন আবশ্যকই মনে হয় না— মনে হয় যেন কিছু না করলেও ওর মধ্যে একটা চরিতার্থতা আছে। অধিকাংশ লোককেই অকর্মণ্য হয়ে থাকা শোভা পায় না, তাতে তাদের অপদার্থতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু সুরি কিচ্ছুই না করলেও ওকে কেউ অযোগ্য বলে ঘৃণা করতে পারবে না। কাজকর্মের ব্যস্ততা মানুষের পক্ষে একটা আচ্ছাদনের মতো। সমস্ত কমন্‌প্লেস্ লোকের সেটা ভারী আবশ্যক, তাতে তাদের দৈন্য তাদের শীর্ণতা ঢাকা পড়ে। কিন্তু যারা স্বভাবতই পরিপূর্ণ প্রকৃতির লোক তারা সমস্ত কর্মাবরণমুক্ত হলেও একটি শোভা এবং সম্ভ্রম রক্ষা

করতে পারে। সুরির মতন অমন ষোলো-আনা শৈথিল্য আর কোনো ছেলের দেখলে নিশ্চয় অসহ্য বোধ হত, কিন্তু সুরির কুঁড়েমিতে একটি মাধুর্য আছে। সে আমি ওকে ভালোবাসি বলে নয়— তার প্রধান কারণ হচ্ছে চুপচাপ বসে থেকেও ওর মনটি বেশ পরিণত হয়ে উঠছে এবং ওর আত্মীয়স্বজনদের প্রতি ওর কিছুমাত্র ঔদাসীন্য নেই। যে কুঁড়েমিতে মূঢ়তা এবং অন্যের প্রতি অবহেলা ক্রমাগত স্ফীত হয়ে গোলগাল তেল-চুক্‌চুকে হয়ে উঠতে থাকে সেইটেই যথার্থ ঘৃণ্য। সুরি-সাহেব একটি সহৃদয় এবং সুবুদ্ধি আলস্যের দ্বারা যেন মধুররসসিক্ত হয়ে আছে। যে গাছে সুগন্ধ ফুল ফোটে সে গাছে আহার্য ফল না ধরলেও চলে। আমি প্রায়ই মাঝে মাঝে এ কথা ভাবি যে, আমার যদি কবিত্ব প্রভৃতি দুই-একটা স্বাভাবিক শক্তি না থাকত, তা হলে আমার মতো অসহ্য কণ্টকময় নিষ্ফলতা পৃথিবীতে অল্পই পাওয়া যেত। আমিও জন্ম-অকর্মণ্য, কিন্তু লেখবার শক্তি স্বাভাবিক থাকাতে আমি এ যাত্রা এক রকম করে তরে গেলুম। নইলে তোরা আমাকে কেউ কিচ্ছু ভালোবাসতে পারতিস্ নে [বব]। সে আমি নিশ্চয় জানি। সুরিকে যে সকলে ভালোবাসে সে ওর কোনো কাজের দরুন, ক্ষমতার দরুন, চেষ্টার দরুন নয়— ওর প্রকৃতির অন্তর্গত একটি সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্যের দরুন। কিন্তু সংসার পুরুষমাত্রেরই কাছে স্বভাবনির্বিচারে কাজ প্রত্যাশা করে— সেইজন্যে এক-একবার ইচ্ছে করে সুরি যদি কোনো-একটা নাড়া খেয়ে আর-একটু সচেতন সচেষ্ট হয়ে উঠতে পারে— আমাদের জন্যে নয়, বাইরের লোকের জন্যে। যখন বাইরের লোক জিজ্ঞাসা করবে 'আপনি কী করেন?' তখন সুরেন কেন উত্তর দেবে 'কিচ্ছু করি নে'! তারা তো ওর মর্যাদা বুঝতে পারবে না। ওর মধ্যে একটি সহজ সরল মহত্ত্ব আছে, যে জন্যে ও ওর সমস্ত আত্মীয় এবং বন্ধুর কাছে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, যে জন্যে পরিচিতদের কাছে ও একটি দৃষ্টান্তস্বরূপে কাজ করে। কিন্তু পুরুষ মানুষ যতক্ষণ না সর্বসাধারণের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে ততক্ষণ তার সম্পূর্ণ সার্থকতা নেই। তা বলে কী করা যাবে? সকলের তো সব হবার শক্তি নেই। সুরি যা আছে তাতেই আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তোদের যে আত্মীয়রূপে কাছে পেয়েছি এজন্যে আমি তোদের উপর যেন কৃতজ্ঞ আছি। তোরা যে আমার কত উপকার করেছিস তা আমিই জানি। যারা ভালো তাদের ভালোবাসার যে কত মূল্য তা তারা নিজে জানে না। তুই আর সুরি আমাকে যে ভালোবাসিস, এ আমি যদিও আশাও করি তবু আমার কাছে যেন ভারী আশ্চর্যের মতো মনে হয়। ভালো করে ভেবে দেখলে আপনাকে কোনো ভালো জিনিসেরই যোগ্য মনে হয় না, সবগুলিই বিশেষ অনুগ্রহ— এত অনায়াসে এত পাই যে তারা যে কী অপরিমেয় অপরিসীম তা বুঝতে পারি নে, তবু যদি একটু কিছু কম পড়ে তবে সেটাকে ভারী একটা অন্যায় বঞ্চনা মনে হয়! মানুষের অযোগ্যতার সেই একটা প্রধান লক্ষণ— অকৃতজ্ঞতা।

সোলাপুর
১৪ মার্চ ১৮৯৩

৮৯

কলকাতা
১৬ মার্চ্। ১৮৯৩।

অনেক দিন পরে আজ একটুখানি রোদ্দুর দেখা দিয়েছে— বাঁচা গেছে— এতদিন মেঘলা দিনগুলো যেন কালো ভিজে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে ছিল, আজ বেশ একখানি বসন্তী রঙের কাপড় পরে প্রফুল্ল সুস্থ মুখে বেরিয়ে এসেছে। মনে করু, চৈত্রমাস পড়েছে তবু এবার কিছু গরম পড়ে নি— দিনের বেলায় মোটা চাপকান জোব্বা পরে থাকি এবং রাত্রিকালে শালকম্বল মুড়ি দিই— খোলা ছাতে নক্ষত্রালোকে দক্ষিনে বাতাসে সতরঞ্চ পেতে জটলা করা কল্পনাতেও উদয় হয় না। সকলেই বলছে, এরকম অভূতপূর্ব ব্যাপার এ দেশে কখনো ঘটে নি। বর্ষার সময় বর্ষা হল না, শীতের সময় যথেষ্ট শীত নেই, এমন শোনা গেছে— কিন্তু বাঙলাদেশের গর্মিকে ফাঁকি দেওয়া বড়ো আশ্চর্য কথা।...

সু... বেশ রীতিমত পাকা স্টাইলে আলাপ চালাচ্ছিল। কাছে ঘেঁষে ঝুঁকে পড়ে খুব সমনোযোগ অথচ সপ্রতিভ ভাবে ঈষৎ-হাস্য-মুখে বক্রগ্রীবায় ইংরাজি ভাষায় কথোপকথন, অ্যাল্‌বম খুলে ছবি দেখানো ইত্যাদি ঠিক-দস্তুর-মত চাল চালছিল। বাঙালি ঘরের ছেলে এরকম অবস্থায় যেরকম লজ্জাভিভূত সংকুচিত ভাব ধারণ করে এতে তার তিলার্ধ মাত্র প্রকাশ পেল না।

আমার দেখে ভারী কৌতুক এবং বিস্ময় বোধ হচ্ছিল। আমি বোধ হয় আমার এই প্রায় বত্রিশ বৎসর বয়সেও অমন নিতান্ত সহজ মধুর সুনিশ্চিতভাবে অবলা-জাতির সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারি নে। চলতে গেলে হুঁচোট খাই, বলতে গেলে বেধে যায়, হাত দুটো কোথায় রাখি ভেবে পাই নে, লম্বা পা দুখানা সম্বন্ধে একটা কোনো ব্যবস্থা করা কর্তব্য বোধ করি অথচ কিছুই করে ওঠা হয় না— দুটোকে গুটিয়ে রাখব কি ছড়িয়ে রাখব কি আগুপিছু করে রাখব তার মীমাংসা করতে করতে ঠিক কথার ঠিক জবাবটা দিয়ে ওঠা হয় না। ঘরে তিনটে গ্যাসের শিখা এবং এক-ঘর লোক থাকতে যে সট্ করে চুম্বকাকৃষ্ট লৌহখণ্ড-বৎ বিনা দ্বিধায় কোনো কিশোরীর পার্শ্বসংলগ্ন হয়ে অটল প্রতিষ্ঠা লাভ করা সে আমাদের মতো সংশয়াতুর ভীরু প্রাণীদের দ্বারা হওয়া অসম্ভব। ... ... আমাদের ছেলেগুলি কার্তিকের মতো চেহারা নিয়ে সসম্ভ্রমে নেপথ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কেবল লজ্জায় রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠছে— কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে যে বেশ একটি নরম জায়গা বেছে গরম হয়ে বসবে সে যোগ্যতা তাদের আর রইল না। এর চেয়ে ধিক্কারের বিষয় আর কী হতে পারে!

সোলাপুর
১৯ মার্চ্ ১৮৯৩

৯০

কলকাতা
৬ এপ্রিল। ১৮৯৩।

মো...র সঙ্গে আজকাল আমার মাঝে মাঝে নানা বিষয়ে কথাবার্তা হয়, আমার বড়ো ভালো লাগে। এই রকম আলোচনা করবার জন্যে আমার মন অনুক্ষণ তৃষিত হয়ে থাকে। এই হতভাগা জনশূন্য দেশে মনটা যেন নিশিদিন উপবাসী হয়ে আছে—কেবল ভিতর থেকে আপনাকে আপনি আহার করছে। কে বা জীবন ধারণ করে, কে বা ভাবে, কে বা কথা কয়—কেই বা প্রতিবাদ করে, কেই বা উৎসাহ দেয়, কেই বা তোমার কথা শোনে, কেই বা তোমার ভাব বোঝে—কেই বা অন্তরের মধ্যে তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে। কেউ বা আমোদ করছে, কেউ বা আলস্য করছে, কেউ বা আপিসে যাচ্ছে, মানুষের মন বলে যে একটি প্রাণী আছে সেটা যে শুকিয়ে শুকিয়ে আধমরা হয়ে যাচ্ছে তার জন্যে কারও কানাকড়ির মাথাব্যথা নেই। আমি আজ সকালে প্রি... বাবুর ওখানে গিয়েছিলুম, অনেকটা যেন আহার পান করে আসা গেল।

বম্বে
৯ এপ্রিল ১৮৯৩

৯১

কলকাতা
১৬ এপ্রিল। ১৮৯৩।

তোদের ভ্রমণের গোলমালের মধ্যে হোটেলে বসে এটা পড়ে কিরকম লাগবে সন্দেহ আছে। কোথায় সেই পুরীর সমুদ্র আর কোথায় তোদের আগ্রার হোটেল! এই পৃথিবীর সঙ্গে, সমুদ্রের সঙ্গে, আমাদের যে-একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝানো যায়! পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত; সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়। আমার অন্তরসমুদ্রও আজ একলা বসে বসে সেইরকম তরঙ্গিত হচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে কী-একটা যেন সৃজিত হয়ে উঠছে—কত অনির্দিষ্ট আশা, অকারণ আশঙ্কা, কত রকমের সৃষ্টি, কত রকমের প্রলয়, কত স্বর্গ নরক, কত বিশ্বাস সন্দেহ, কত লোকাতীত প্রত্যক্ষাতীত প্রমাণাতীত অনুভব এবং অনুমান, সৌন্দর্যের অপার রহস্য, প্রেমের অতল অতৃপ্তি—মানবমনের জড়িত জটিল সহস্র রকমের অপূর্ব অপরিমেয় ব্যাপার। বৃহৎ সমুদ্রের তীরে কিম্বা মুক্ত আকাশের নিচে একলা না বসলে সেই আপনার অন্তরের গোপন মহারহস্য ঠিক অনুভব করা যায় না। কিন্তু তা নিয়ে আমার মাথা খুঁড়ে মরবার দরকার

নেই— আমার যা মনে উদয় হয়েছে আমি তাই বলে খালাস— তার পরে সমুদ্র সমভাবে তরঙ্গিত হতে থাকুক আর মানুষ হাঁস্ ফাঁস্ করে ঘুরে ঘুরে বেড়াক।

আগ্রা
১৮ এপ্রিল ১৮৯৩

৯২

কলকাতা
৩০ এপ্রিল। ১৮৯৩।

কাল তাই রাত্তির দশটা পর্যন্ত ছাতে পড়ে থাকতে পেরেছিলুম। চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছিল— চমৎকার হাওয়া দিচ্ছিল— ছাতে আর কেউ ছিল না। আমি একলা পড়ে পড়ে আমার সমস্ত জীবনের কথা ভাবছিলুম। এই তেতালার ছাত, এইরকম জ্যোৎস্না, এইরকম দক্ষিণের বাতাস জীবনের স্মৃতিতে কত রকমে মিশ্রিত হয়ে আছে। দক্ষিণের বাগানের শিশুগাছের পাতা ঝর্ ঝর্ শব্দ করছিল, আমি অর্ধেক চোখ বুজে আমার ছেলেবেলাকার মনের ভাবগুলিকে মনে আনবার চেষ্টা করছিলুম। পুরোনো স্মৃতিগুলো মদের মতো --যত বেশিদিন মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে, ততই তার বর্ণ এবং স্বাদ এবং নেশা যেন মধুর হয়ে আসে। আমাদের এই স্মৃতির বোতলগুলি বুড়ো বয়সের জন্যে 'in deep-delved earth' ঠাণ্ডা করে রেখে দেওয়া যাচ্ছে— তখন বোধ হয় ছাতের উপর জ্যোৎস্না-রাতে এক-এক ফোঁটা করে আস্বাদ করতে বেশ লাগবে। অল্প বয়সে মানুষ কেবলমাত্র কল্পনা এবং স্মৃতিতে সন্তুষ্ট থাকে না; কেননা তখন তার রক্তের জোর, তার শরীরের তেজ, তাকে কিছু-একটা কাজে প্রবৃত্ত করতে চায়। কিন্তু বুড়ো বয়সে যখন স্বভাবতই আমরা কাজে অক্ষম, শরীরের যৌবনের অতিরিক্ত তেজ আমাদের কোনোরকম তাড়না করছে না, তখন স্মৃতি বোধ হয় আমাদের পক্ষে যথেষ্ট— তখন জ্যোৎস্নারাত্রের স্থির জলাশয়ের মতো আমাদের অচঞ্চল মনে পূর্বস্মৃতির ছায়া এমনি পরিষ্কার স্পষ্টভাবে পড়ে যে বর্তমান ব্যাপারের সঙ্গে তার প্রভেদ বোঝা শক্ত।

সিমলা
৩ মে ১৮৯৩

৯৩

শিলাইদহ
মঙ্গলবার। ২ মে ১৮৯৩।

এখন আমি বোটে। এই যেন আমার নিজের বাড়ি। এখানে আমিই একমাত্র কর্তা— এখানে আমার উপরে, আমার সময়ের উপরে, আর-কারও কোনো অধিকার নেই। এই বোটটি আমার পুরোনো ড্রেসিং গাউনের মতো— এর মধ্যে প্রবেশ

করলে খুব একটি ঢিলে অবসরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়—যেমন ইচ্ছা ভাবি, যেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, যত খুশি পড়ি, যত খুশি লিখি, এবং যত খুশি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন-মনে এই আকাশপূর্ণ আলোকপূর্ণ আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি।...

এখন প্রথম দিনকতক আমার এই পূর্বপরিচিতের সঙ্গে পুনর্মিলনের নতুন বাধো-বাধো ভাবটা কাটাতেই যাবে। তার পরে নিয়মিত লিখতে পড়তে নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে আমাদের পুরাতন সখ্য আবার বেশ সহজ হয়ে আসবে। বাস্তবিক, পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা—আমার যথার্থ বাহন—খুব বেশি পোষ-মানা নয়, কিছু বুনো-রকম—কিন্তু ওর পিঠে এবং কাঁধে হাত বুলিয়ে ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে। এখন পদ্মার জল অনেক কমে গেছে—বেশ স্বচ্ছ কৃশকায় হয়ে এসেছে—একটি পাণ্ডুবর্ণ ছিপ্‌ছিপে মেয়ের মতো, নরম শাড়িটি গায়ের সঙ্গে বেশ সংলগ্ন। সুন্দর ভঙ্গীতে চলে যাচ্ছে আর শাড়িটি বেশ গায়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে যাচ্ছে। আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি, তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো। অতএব তার কথা যদি কিছু বাহুল্য করে লিখি তবে সে কথাগুলো চিঠিতে লেখবার অযোগ্য মনে করিস নে। সেগুলো হচ্ছে এখানকার পার্সোনাল খবরের মধ্যে।

এক দিনেই কলকাতার সঙ্গে ভাবের কত তফাত হয়ে যায়! কাল বিকেলে সেখানে ছাতে বসে ছিলুম সে এক-রকম, আর আজ এখানে দুপুর-বেলায় বোটে বসে আছি এ এক-রকম। কলকাতার পক্ষে যা সেণ্টিমেণ্টাল, পোয়েটিকাল, এখানকার পক্ষে তা কতখানি সত্যিকার সত্যি! পাব্লিক-নামক গ্যাসালোক-জ্বালা স্টেজের উপর আর নাচতে ইচ্ছে করে না—এখানকার এই স্বচ্ছ দিবালোক এবং নিভৃত অবসরের মধ্যে গোপনে আপনার কাজ করে যেতে ইচ্ছে করে। নেপথ্যে এসে রঙচঙগুলো ধুয়ে মুছে না ফেললে মনের শ্রান্তি আর যায় না। সাধনা চালানো, সাধারণের উপকার করা এবং হাঁস্‌ ফাঁস্‌ করে মরাটা অনেকটা অনাবশ্যক বলে মনে হয়—তার ভিতরে অনেক জিনিস থাকে যা খাঁটি সোনা নয়, যা খাদ—আর, এই প্রসারিত আকাশ আর সুবিস্তীর্ণ শান্তির মধ্যে যদি কারও প্রতি দৃক্‌পাত না করে আপনার গভীর আনন্দে আপনার কাজ করে যাই তা হলেই যথার্থ কাজ হয়।

সিমলা
৬ মে ১৮৯৩

৯৪

শিলাইদহ
৮ মে। ১৮৯৩।

কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী। বোধ হয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাক্‌দত্তা হয়েছিল—তখন থেকে আমাদের পুকুরের

ধার, বটের তলা, বাড়ি-ভিতরের বাগান, বাড়ি-ভিতরের এক তলার অনাবিষ্কৃত ঘরগুলো, এবং সমস্ত বাইরের জগৎ এবং দাসীদের মুখের সমস্ত রূপকথা এবং ছড়াগুলো, আমার মনের মধ্যে ভারী একটা মায়াজগৎ তৈরি করছিল, তখনকার সেই আবছায়া অপূর্ব মনের ভাব প্রকাশ করা ভারী শক্ত— কিন্তু এই পর্যন্ত বেশ বলতে পারি কল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালা-বদল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ও মেয়েটি পয়মন্ত নয় তা স্বীকার করতে হয়— আর যাই হোক, সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না। সুখ দেন না বলতে পারি নে, কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আনন্দ দেন, কিন্তু এক-এক-সময় কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎপিণ্ডটি নিংড়ে রক্ত বের করে নেন। যে লোককে তিনি নির্বাচন করেন, সংসারের মাঝখানে ভিত্তিস্থাপন করে গৃহস্থ হয়ে স্থির হয়ে আয়েস করে বসা সে লক্ষ্মীছাড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমার আসল জীবনটি তার কাছেই বন্ধক আছে। সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি-- আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে— সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।...

রবিবর্মার ছবি দেখতে দেখতে সমস্ত সকালবেলাটা গেল। আমার সত্যি বেশ লাগে। হাজারই হোক, আমাদের দিশি বিষয় এবং দিশি মূর্তি ও ভাব আমাদের কাছে যে কতখানি, এই ছবিগুলি দেখলে তা বেশ বোঝা যায়। অনেকগুলো ছবির হাত পা, দেহের পরিমাণ, খুব অসমান আছে, কিন্তু মোটের উপর সবসুদ্ধ জড়িয়ে খুব মনের ভিতরে প্রবেশ করে। তার প্রধান কারণ, আমাদের মনটা চিত্রকরের সহযোগিতা করতে থাকে। সে কী বলতে চাচ্ছে আমরা আগে থাকতে বুঝে নিই— তার চেষ্টাটুকু দেখলেই বাকিটুকু পূরণ করে নিতে পারি। এর ভিতর থেকে খুঁত বের করা খুব সহজ, তার জন্যে বেশি ক্ষমতার দরকার করে না, কিন্তু যখন ভেবে দেখা যায় কোনো বিষয়ে একটা স্পষ্ট কল্পনা করা কতই শক্ত— মনে আমাদের যে ছবিটা উদয় হয় তা প্রায়ই আধা-আধি, মোটামুটি গোঁজামিলন-দেওয়া— কিন্তু ছবি আঁকতে গেলে একটি সামান্যতম রেখা পর্যন্ত ছাড়বার জো নেই, প্রধান অপ্রধান সমস্তই একেবারে যথাযথ করে ভেবে নিতে হবে, কল্পনার মতো অমন একটা নিয়ত-পরিবর্তমান জিনিসকে প্রত্যক্ষের কঠিন ছাঁচে ঢেলে দিতে হবে— সে কি সামান্য ব্যাপার!

সিমলা
১২ মে ১৮৯৩

৯৫

শিলাইদহ
১০ মে। ১৮৯৩।

ইতিমধ্যে দেখছি খুব ফুলো ফুলো বড়ো বড়ো কতকগুলো মেঘ চতুর্দিক থেকে জমে এসেছে— আমার এই চারি দিকের দৃশ্যপট থেকে কাঁচা সোনালি রোদ্দুরটুকু

যেন মোটা মোটা ব্লটিং প্যাড দিয়ে একেবারে চুপসে তুলে নিয়েছে। আবার যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয় তা হলে ধিক্‌ ইন্দ্রদেবকে! মেঘগুলোর তেমন ফাঁকা দরিদ্র চেহারা দেখছি নে. ... ... বাবুদের মতো দিব্যি সজলশ্যামল টেবো-টোবো নধরনন্দন ভাব। এখনি বৃষ্টি আরম্ভ হল বলে—হাওয়াটাও সেই রকম কাঁদো-কাঁদো ভিজে-ভিজে ঠেকছে। এখানে এই মেঘরোদ্রের যাওয়া-আসা ব্যাপারটা যে কতটা গুরুতর, আকাশের দিকে যে কত লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে, তোদের সেই অভ্রভেদী পর্বতশৃঙ্গে বসে তোরা তা ঠিকটি কল্পনা করতে পারবি নে। আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে—এরা যেন বিধাতার শিশু-সন্তানের মতো—নিরুপায়—তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে; কোনোমতে একটুখানি খিদে ভাঙলেই আবার তখনি সমস্ত ভুলে যায়। সোসিয়ালিস্ট্‌রা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি নে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারী হতভাগ্য! কেননা, পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক্‌, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখমোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে। যারা বলে, কোনো কালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবন-ধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যকীয় জিনিসও বণ্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব অমূলক কল্পনা মাত্র, কখনোই সকল মানুষ খেতে পরতে পাবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই, এর কোনো পথ নেই—তারা ভারী কঠিন কথা বলে। কিন্তু এ-সমস্ত সামাজিক সমস্যা এমন কঠিন! বিধাতা আমাদের এমনি একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ দীন বস্ত্রখণ্ড দিয়েছেন, পৃথিবীর এক দিক ঢাকতে গিয়ে আর-এক দিক বেরিয়ে পড়ে—দারিদ্র্য দূর করতে গেলে ধন চলে যায় এবং ধন গেলে সমাজের কত-যে শ্রী সৌন্দর্য উন্নতির কারণ চলে যায় তার আর সীমা নেই।

কিন্তু আবার এক-একবার রোদ দুর উঠছে, পশ্চিমে মেঘও যথেষ্ট জমে আছে। পশ্চিমে মেঘ হলে বৃষ্টি হবেই এই তো প্রবাদে কয়।

সিমলা
১৪ মে ১৮৯৩

৯৬

শিলাইদহ
১১ মে। ১৮৯৩।

কাল বিকেলের দিকে খুব ঘনঘটা করে মেঘ করে খানিকটা বৃষ্টি হয়ে আবার পরিষ্কার হয়ে গেছে। আজ খানকত দলভ্রষ্ট বিচ্ছিন্ন মেঘ সূর্যালোকে শুভ্র হয়ে খুব নিরীহ নিরপরাধী ভাবে আকাশের ধারে ধারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখে তো মনে হয় এদের বর্ষণের অভিপ্রায় কিছুমাত্র নেই—কিন্তু চাণক্য তাঁর সুবিখ্যাত শ্লোকে যাদের যাদের বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছেন তার মধ্যে দেব্‌তাকেও ধরা

উচিত ছিল। কিন্তু আজ সকাল বেলাটি বড়ো সুন্দর হয়ে উঠেছে— আকাশ পরিষ্কার নীল, নদীর জলে রেখামাত্র নেই এবং ডাঙার কাছে গড়ানে জায়গায় যে ঘাসগুলি হয়েছে তাতে পূর্বদিনকার বৃষ্টির কণাগুলি লেগে আছে, সেগুলি ঝক্ ঝক্ করছে। এই-সমস্ত মিলে সূর্যালোকে আজকের প্রকৃতিকে ভারী একটি শুভ্রবসনা মহিমাময়ী মহেশ্বরীর মতো দেখাচ্ছে। সকাল বেলাটি এমনি নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে— কেন জানি নে নদীতে একটি নৌকো নেই, বোটের নিকটবর্তী ঘাটে কেউ জল নিতে স্নান করতে আসে নি; নায়েব সকাল-সকাল কাজ সেরে চলে গেছে— খানিকটা চুপ করে কান পেতে থাকলে কী-একটা ঝাঁ ঝাঁ শব্দ শোনা যায় এবং এই রৌদ্রালোক আর আকাশ আস্তে আস্তে প্রবেশ করে মাথার ভিতরটি একেবারে ভরে ওঠে, এবং সেখানকার সমুদয় ভাব এবং চিন্তাগুলিকে একটি নীল এবং সোনালি রঙে রাঙিয়ে দেয়। বোটের এক পাশে একটা বাঁকা কৌচ আনিয়ে রেখেছি; এই রকম সকাল বেলায় তার মধ্যে শরীরটা ছড়িয়ে দিয়ে সমস্ত কাজ ফেলে চুপচাপ করে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে; মনে হয়—

'নাই মোর পূর্বপর,
যেন আমি একদিনে উঠেছি ফুটিয়া
অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল।'

যেন আমি এই আকাশের, এই নদীর, এই পুরাতন শ্যামল পৃথিবীর। বোটে আমার এই রকম করে কাটে। পড়ে পড়ে পরিচিত প্রকৃতির কত রকমের যে ভাবের পরিবর্তন দেখি তার ঠিক নেই। এখানে আমার আর-একটি সুখ আছে। এক-এক সময় এক-একটি সরল ভক্ত বৃদ্ধ প্রজা আসে, তাদের ভক্তি এমনি অকৃত্রিম, তারা সত্যি সত্যি আমাদের এত ভালোবাসে যে আমার চোখ ছল ছল করে আসে। এই মাত্র কালীগ্রাম থেকে একটি বুড়ো প্রজা তার ছেলেকে সঙ্গে করে আমার কাছে এসেছিল— সে যেন তার সমস্ত সরল আর্দ্র হৃদয়খানি দিয়ে আমার পা-দুটো মুছিয়ে দিয়ে গেল। ভাগবতে কৃষ্ণ বলেছেন 'আমার চেয়ে আমার ভক্ত বড়ো', সে কথার মানে খানিকটা বোঝা যায়। বাস্তবিক এর সুন্দর সরলতা এবং আন্তরিক ভক্তিতে এ লোকটি আমার চেয়ে কত বড়ো! আমিই যেন এ ভক্তির অযোগ্য, কিন্তু এ ভক্তিটি তো বড়ো সামান্য জিনিস নয়। এদের চাষার ভাষা, এদের স্নেহের সম্বোধন এমন মিষ্টি লাগে! ছোটো ছেলেদের উপর যেরকম ভালোবাসা এই বৃদ্ধ ছেলেদের উপর অনেকটা সেইরকম— কিন্তু কিছু প্রভেদ আছে। এরা তাদের চেয়েও ছোটো! কেননা তারা বড়ো হবে, এরা আর কোনো কালেও বড়ো হবে না— এদের এই জীর্ণ শীর্ণ কুঞ্চিত বলিত বৃদ্ধ দেহখানির মধ্যে কী-একটি শুভ্র সরল কোমল মন রয়েছে! শিশুদের মনে কেবল সরলতা আছে মাত্র, কিন্তু এমন স্থিরবিশ্বাসপূর্ণ একাগ্র নিষ্ঠা নেই। আমি কি এই বৃদ্ধটির রাজা হবার যোগ্য! মানুষে মানুষে যদি সত্যি একটা আধ্যাত্মিক যোগ থাকে তা হলে আমার এই অন্তরের মঙ্গল-ইচ্ছা ওর হয়তো কিছু কাজে লাগতে পারে— তা ছাড়া জমিদার হয়ে যা করতে পারি তা তো করবই। কিন্তু সব প্রজা এরকম নয়, সেরকম প্রত্যাশা করাও যায় না। সব চেয়ে যা ভালো সব চেয়ে তা দুর্লভ— কিন্তু বিধাতার পৃথিবীতে সেরকমটি হওয়া উচিত ছিল না।

শিমলা
১৫ মে ১৮৯৩

৯৭

শিলাইদহ
শনিবার। ১৩ মে ১৮৯৩।

আজ তোর কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলুম যে : Missing gown lying Post Office। এর দুটো অর্থ হতে পারে। এক অর্থ হচ্ছে হারা গাত্রবস্ত্র ডাকঘরে শুয়ে আছেন। আর-এক অর্থ হচ্ছে— গাউনটা মিসিং এবং পোষ্ট অফিসটা লাইং। দুই অর্থই সম্ভব হতে পারে, কিন্তু যেপর্যন্ত প্রতিবাদ [না] শুনি সেপর্যন্ত প্রথম অর্থটাই গ্রহণ করা গেল। কিন্তু মজা হচ্ছে এই— সঙ্গে সঙ্গে যে চিঠিখানি এসেছে তাতে পরিষ্কার করে বলা আছে একটা গাউন যে পাওয়া যায় নি তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।...

বেচারা চিঠি! তার জিম্মায় যে-ক'টি কথা লেফাফায় পুরে দেওয়া হয়েছে সেই ক'টি কথা কাঁধে করে নিয়ে দীর্ঘ পথ টিকোতে টিকোতে চলে আসছে— ইতিমধ্যে যে পৃথিবীতে কত-কী হয়ে যাচ্ছে তা সে জানে না, এবং তার ছোটো ভাই যে এক লম্ফে তাকে ডিঙিয়ে তার সমস্ত কথার একটিমাত্র সংক্ষেপ রূঢ় প্রতিবাদ নিয়ে এসে হাজির হল তারও সে জবাব দিতে পারে না; সে ভালোমানুষের মতো বলে, 'আমি কিছু জানি নে বাপু, আমাকে সে যা বলে দিয়েছে আমি তাই বয়ে এনেছি।' বাস্তবিক এনেছে বটে। একটি কথার এদিক ওদিক হয় নি— সমস্ত পথটি মাড়িয়ে, দীর্ঘ পথের কত চিহ্ন আষ্টেপৃষ্ঠে কত ছাপ নিয়েই বেচারা ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। তা হোক তার খবর ভুল, আমি তাকে ভালোবাসি। আর তারে চড়ে চক্ষের পলকে টেলিগ্রাফ এলেন— কোথাও পথশ্রমের কোনো চিহ্ন নেই, লেফাফাখানি একেবারে রাঙা টক্‌টক্‌ করছে— হড়্‌বড়্‌ তড়্‌বড়্‌ করে যে-দুটো কথা বললেন তার ভিতর থেকে আটটা-দশটা কথা পড়ে গেছে— তার মধ্যে ব্যাকরণ নেই, ভদ্রতা নেই, কিছু নেই— একটা সম্বোধন নেই, একটা বিদায়ের শিষ্টতাও নেই, আমার প্রতি যেন তার কিছুমাত্র বন্ধুতার ভাব নেই, কেবল কোনোমতে তাড়াতাড়ি কথাটা যেমন-তেমন করে বলে ফেলে দায় কাটিয়ে চলে যেতে পারলে বাঁচে। যাই হোক, গাউনটা যে পোস্ট্‌-অফিসে এতকাল শীতযাপন করছেন এটা যদিচ বিস্তর বিলম্বে শোনা গেল তবু টেলিগ্রাফ না থাকলে আরও বিলম্বে শুনতে হত, অতএব তাকে ধন্যবাদ।

সিমলা
১৭ মে ১৮৯৩

৯৮

শিলাইদহ
১৬ মে। ১৮৯৩।

আমি বিকেলে, বেলা সাড়ে ছ'টার পর, স্নান করে ঠাণ্ডা এবং পরিষ্কার হয়ে চরের উপর নদীর ধারে ঘণ্টাখানেক বেড়াই, তার পর আমাদের নতুন জলিবোটটাকে নদীর

মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপরে বিছানাটি পেতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সন্ধ্যার অন্ধকারে চিত হয়ে চুপচাপ পড়ে থাকি। শৈ... [আমার] কাছে বসে নানা কথা বকে যায়। চোখের উপরে আকাশ তারায় একেবারে খচিত হয়ে যায়— আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নিচে আবার কি কখনও জন্মগ্রহণ করব? যদি করি, আর কি কখনও এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপর বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে জলিবোটের উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পাব? হয়তো আর-কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধেবেলা আর-কখনও ফিরে পাব না। তখন কোথায় দৃশ্য-পরিবর্তন হবে— আর, কিরকম মন নিয়েই বা জন্মাব! এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি, কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে এত সুগভীর ভালোবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না। আমি কি ঠিক এমনি মানুষটি তখন থাকব! আশ্চর্য এই আমার সবচেয়ে ভয় হয় পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি। কেননা সেখানে সমস্ত চিত্তটিকে এমন উপরের দিকে উদ্ঘাটিত রেখে পড়ে থাকবার জো নেই এবং পড়ে থাকাও সকলে ভারী দোষের বিবেচনা করে। হয়তো একটা কারখানায় নয়তো ব্যাঙ্কে নয়তো পার্ল্যামেণ্টে সমস্ত দেহ মন প্রাণ দিয়ে খাটতে হবে— শহরের রাস্তা যেমন ব্যাবসা-বাণিজ্য গাড়িঘোড়া চলবার জন্যে ইঁটে-বাঁধানো কঠিন, তেমনি মনটা স্বভাবটা বিজ্‌নেস্‌ চালাবার উপযোগী পাকা করে বাঁধানো— তাতে একটি কোমল তৃণ একটি অনাবশ্যক লতা গজাবার ছিদ্রটুকু নেই। ভারী ছাঁটাছোঁটা গড়াপেটা আইনে-বাঁধা মজবুত রকমের ভাব। কী জানি, তার চেয়ে আমার এই কল্পনাপ্রিয় অকর্মণ্য আত্মনিমগ্ন বিস্তৃত-আকাশ-পূর্ণ মনের ভাবটি কিছুমাত্র অগৌরবের বিষয় বলে মনে হয় না। জলিবোটে পড়ে পড়ে জগতের সেই কাজের লোকের কাছে আপনাকে কিছুমাত্র খাটো মনে হয় না। বরঞ্চ আমিও যদি কোমর বেঁধে কাজে লাগতুম তা হলে হয়তো সেই-সমস্ত বড়ো-বড়ো-ওক-গাছ-কাটা জোয়ান লোকদের কাছে আপনাকে ভারী যৎসামান্য মনে হত। কিন্তু তাই বলে কি সত্যিই এই জলিবোট-শায়ী বিমুগ্ধ যুবক রামমোহন রায়ের চেয়ে বড়লোক?

সিমলা
২০ মে ১৮৯৩

৯৯

কলকাতা
২১ জুন। ১৮৯৩।

এবারকার ডায়ারিটা তো ঠিক প্রকৃতির স্তব নয়— মন-নামক একটা সৃষ্টিছাড়া চঞ্চল পদার্থ কোনো গতিকে আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাতে যে কিরকম একটা উৎপাত হয়েছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা গেছে। আসলে, আমরা খাব, পরব, বেঁচে থাকব, এই রকম কথা ছিল— আমরা যে বিশ্বের আদিকারণ অনুসন্ধান করি, ইচ্ছেপূর্বক খুব শক্ত একটা ছন্দ বানিয়ে তারই মধ্যে খুব শক্ত একটা ভাব ব্যক্ত

করবার প্রয়াস করি, আবার তার মধ্যে পদে পদে মিল থাকা চাই, আপাদমস্তক ঋণে নিমগ্ন হয়েও মাসে মাসে ঘরের কড়ি খরচ করে সাধনা বের করি, এর কী আবশ্যক ছিল— ও দিকে নারায়ণ সিং দেখো ঘি দিয়ে আটা দিয়ে বেশ মোটা মোটা রুটি বানিয়ে তার সঙ্গে দধি সংযোগ করে আনন্দমনে ভোজন-পূর্বক দু-এক ছিলিম তামাক টেনে দুপুর বেলাটা কেমন স্বচ্ছন্দে নিদ্রা দিচ্ছে এবং সকালে বিকালে লো [কেনে] র সামান্য দু-চারটে কাজ করে রাত্রে অকাতরে বিশ্রাম লাভ করছে; জীবনটা যে ব্যর্থ হল, বিফল হল, এমন কখনো তার স্বপ্নেও মনে হয় না— পৃথিবীর যে যথেষ্ট দ্রুতবেগে উন্নতি হচ্ছে না সেজন্যে সে নিজেকে কখনও দায়িক করে না। জীবনের সফলতা কথাটার কোনো মানে নেই— প্রকৃতির একমাত্র আদেশ হচ্ছে 'বেঁচে থাকো'। নারায়ণ সিং সেই আদেশটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই নিশ্চিন্ত আছে— আর, যে হতভাগার বক্ষের মধ্যে মন-নামক একটা প্রাণী গর্ত খুঁড়ে বাসা করেছে তার আর বিশ্রাম নেই, কর্তব্যের শেষ নেই, মনের সন্তোষ নেই; তার পক্ষে কিছুই যথেষ্ট নয়, তার চতুর্দিক্‌বর্তী অবস্থার সঙ্গে সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে গেছে; সে যখন জলে থাকে তখন স্থলের জন্যে লালায়িত হয়, যখন স্থলে থাকে তখন জলে সাঁতার দেবার জন্যে তার 'অসীম আকাঙ্ক্ষা'র উদ্রেক হয়। এই দুরন্ত অসন্তুষ্ট মনটাকে প্রকৃতির অগাধ প্রশান্তির মধ্যে বিসর্জন করে একটুখানি স্থির হয়ে বসতে পারলে বাঁচা যায়— কথাটা হচ্ছে এই।

সিমলা
২৪ জুন ১৮৯৩

১০০

কলকাতা
২২ জুন। ১৮৯৩।

তুই আমাকে সেদিনকার চিঠিতে খোঁটা দিয়েছিস, বিয়ে প্রভৃতি বিষয় আমরা কিছু বেশি থিওরেটিক্যালি দেখি— তোর সে কথাটা আমি ইতিমধ্যে অনেকবার ভেবে দেখেছি, এবং সবিশেষ পর্যালোচনা করে তার সত্যতা সম্বন্ধে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ নেই। বাস্তবিক, আমার মতো লোক পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিস কিছু দূর থেকে দেখে— স্বভাবত প্রত্যেক বিষয়টাই চিন্তা করে দেখতে চায়। মন জিনিসটা বুল্‌স্‌-আই লণ্ঠনের মতো। যে সময়ে যে পদার্থের উপর চিন্তার আলোক নিক্ষেপ করে তার পাশের জিনিসটাকে দেখতে পায় না— এমন-কি সেটাকে আরও দ্বিগুণ অন্ধকার করে দিয়ে কেবল একটি জিনিসকেই অতিরিক্ত জাজ্বল্যমান করে তোলে। এরকম করে দেখার বিস্তর দোষ। আশপাশের সঙ্গে বেশ মিলিয়ে-জুলিয়ে দেখলে সব জিনিসই চোখে এবং মনে এক রকম সহ্য বোধ হয়— বৃহৎ সংসারের একটি অংশকে সমস্ত বৃহৎ সংসারের সঙ্গে যোগ করে দেখলে তাকে আর তেমন গুরুতর বলে বোধ হয় না। স্ব...র বিয়ের সম্বন্ধে আমি যে-সব ফিলজফাইজ করেছিলুম সেটা কোনো কাজেরই না। সুখ দুঃখ সকল অবস্থাতেই আছে, কোনোটা একেবারে অতিরিক্ত পরিমাণে নেই— মোটের উপরে দুটি

নরনারী পরস্পরের জীবনে গ্রন্থি বদ্ধ করে মিলে-মিশে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবারই কথা— পৃথিবীটা পৃথিবীর চেয়ে বেশি নয়, এই মনে রেখে সমস্ত মিলিয়ে দেখলে হিসেবে কিছু কমি দেখা যায় না। এই দেখ্-না স্ব...রা বেশ আনন্দেই আছে— অবশ্য এ উচ্ছ্বাস কিছুদিন বাদে কমে আসবে, তখন অভ্যাসবন্ধনে স্নেহবন্ধনে বদ্ধ হয়ে জীবনটি বিস্তৃত ব্যাপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে থাকবে। আমাদের মতো লক্ষ্মীছাড়া 'চিন্তাশীল' লোকেরা এইটে ঠিকটি বুঝতে পারে না। আমরা নিজের সম্বন্ধেও কেবল চিন্তা করে কল্পনা করে নিজেকে ব্যর্থ বিফল করে ফেলেছি— প্রত্যেক খন্ড অবস্থাই আমাদের কাছে বড়ো বেশি প্রাধান্য ধারণ করে। সুখ অত্যন্ত অধিক সুখ হয় এবং দুঃখ একান্ত তীব্র হয়ে ওঠে, কিন্তু জীবনের যে প্রধান সুখ প্রধান শান্তি আপনার আদ্যোপান্তের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য একটি ঐক্য সেটি নেই— তাই জন্যে অবিশ্রাম এই খন্ড খন্ড বিচ্ছিন্ন সুখদুঃখের উপর দিয়ে চলতে চলতে জীবন একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে— মনে হয় সুখ দুঃখ আর কিছুই চাই নে, এখন দীর্ঘকালের জন্যে যদি প্রশান্ত নিশ্চেষ্ট-ভাবে এই উদার উন্মুক্ত সুন্দর শান্ত প্রকৃতির উপরে পড়ে পড়ে রোদ পোহাতে পারি তা হলে বাঁচা যায়। কিন্তু যারা মন-পদার্থের দ্বারা অতিমাত্র উৎপীড়িত নয়, পৃথিবীতে কোনো অবস্থাতেই তাদের বিশেষ আশঙ্কা নেই— তারা সুখী হবেই, সুখী করবেই, এবং জীবনের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ। আমার এই জীর্ণ হৃদয়ের রুগ্ন চিন্তাগুলো প্রকাশ করে সংসারটা তোদের কাছে অমূলক-বিভীষিকা-পরিপূর্ণ করে তোলা ভয়ানক অন্যায়। তোদের জন্যে পৃথিবীতে অনেক সুখ, জীবনে অনেক নব নব দৃশ্য এবং নব নব পরিবর্তন আছে —সে-সমস্ত তোরা আনন্দমনে পূর্ণহৃদয়ে ভোগ করতে পারবি।

সিমলা
২৫ জুন ১৮৯৩

১০১

শিলাইদহ
রবিবার। ২ জুলাই ১৮৯৩।

কোনো জিনিস যথার্থ উপভোগ করতে গেলে তার চতুর্দিকে অবসরের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিতে হয়— তাকে বেশ অনেকখানি মেলিয়ে দিয়ে, ছড়িয়ে দিয়ে, চতুর্দিকে বিছিয়ে দিয়ে, তবে তাকে ষোলো-আনা আয়ত্ত করা যায়। মফস্বলে একলা থাকবার সময় যে চিঠিপত্র এত ভালো লাগে তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে— চিঠির প্রত্যেক অক্ষরটি পর্যন্ত একটি একটি ফোঁটার মতো করে নিঃশেষপূর্বক গ্রহণ করবার অবসর পাওয়া যায়, মনের কল্পনা ওর প্রত্যেক কথায় কথায় ইনিয়ে-বিনিয়ে লতিয়ে-লতিয়ে জড়িয়ে-জড়িয়ে ওঠে— বেশ অনেক ক্ষণ ধরে কল্পনার একটা গতি অনুভব করা যায়। অতি লোভে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সেই সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। সুখের ইচ্ছেটা এমনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এগিয়ে চলে যে, অনেক সময়ে সুখটাকেই ডিঙিয়ে চলে যায় এবং চক্ষের পলকে সমস্ত ফুরিয়ে ফেলে। এই রকম

জমি-জমা আমলা-মামলার মধ্যে কোনো চিঠিকেই যথেষ্ট মনে হয় না— মনে হয় যেন ক্ষুধার যোগ্য অন্ন পাওয়া গেল না। কিন্তু যত বয়স হচ্ছে তত এইটে দেখছি পাওয়াটা নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অন্যে কতটা দিতে পারে তা নিয়ে নালিশ-ফরিয়াদি করা ভুল, আমি কতটা নিতে পারি এইটেই হচ্ছে আসল কথা। যা হাতের কাছে আসে তাকেই পুরোপুরি হস্তগত করে নেওয়া, অনেক শিক্ষা সাধনা এবং সংযমের দ্বারা হয়। সে শিক্ষা লাভ করতে জীবনের প্রায় বারো আনা কাল চলে যায়, তার পরে সে শিক্ষার ফলভোগ করবার আর বড়ো সময় পাওয়া যায় না। ইতি সুখতত্ত্ব শাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়।

সিমলা
৬ জুলাই ১৮৯৩

১০২

শিলাইদহ
সোমবার। ৩ জুলাই ১৮৯৩।

কাল সমস্ত রাত তীব্র বাতাস পথের কুকুরের মতো হুহু করে কেঁদেছিল— আর, বৃষ্টিও অবিশ্রাম চলছে। মাঠের জল ছোটো ছোটো নির্ঝরের মতো নানা দিক থেকে কল্ কল্ করে নদীতে এসে পড়ছে। চাষারা ওপারের চর থেকে ধান কেটে আনবার জন্যে কেউ বা টোগা মাথায় কেউ বা একখানা কচুপাতা মাথার উপর ধরে ভিজতে ভিজতে খেয়া নৌকোয় পার হচ্ছে— বড়ো বড়ো বোঝাই নৌকোর মাথার উপর মাঝি হাল ধরে বসে বসে ভিজছে, আর মাল্লারা গুণ কাঁধে করে ডাঙার উপর ভিজতে ভিজতে চলেছে। এমন দুর্যোগ তবু পৃথিবীর কাজকর্ম বন্ধ থাকবার জো নেই; পাখিরা বিমর্ষ মনে তাদের নীড়ের মধ্যে বসে আছে, কিন্তু মানুষের ছেলেরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। আমার বোটের সামনে দুটি রাখাল-বালক এক পাল গোরু নিয়ে এসে চরাচ্ছে; গোরুগুলি কচর্-মচর্ শব্দ করে এই বর্ষা-সতেজ সরস শ্যামল সিক্ত ঘাসগুলির মধ্যে মুখ ভরে দিয়ে ল্যাজ নেড়ে পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে স্নিগ্ধ শান্ত নেত্রে আহার করে করে বেড়াচ্ছে— তাদের পিঠের উপর বৃষ্টি এবং রাখাল-বালকের যষ্টি অবিশ্রাম পড়ছে, দুইই তাদের পক্ষে সমান অকারণ অন্যায় এবং অনাবশ্যক, এবং দু'ই তারা সহিষ্ণুভাবে বিনা-সমালোচনায় সয়ে যাচ্ছে এবং কচর্-মচর্ করে ঘাস খাচ্ছে। এই গোরুগুলির চোখের দৃষ্টি কেমন বিষণ্ণ শান্ত সুগম্ভীর স্নেহময়— মাঝের থেকে মানুষের কর্মের বোঝা এই বড়ো বড়ো জন্তুগুলোর ঘাড়ের উপর কেন পড়ল? নদীর জল প্রতিদিনই বেড়ে উঠছে। পরশু দিন বোটের ছাতের উপর থেকে যতখানি দেখা যেত, আজ বোটের জানলায় বসে প্রায় ততটা দেখা যাচ্ছে— প্রতিদিন সকালে উঠে দেখি তটদৃশ্য অল্প অল্প করে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। এতদিন সামনে ঐ দূর গ্রামের গাছপালার মাথাটা সবুজ পল্লবের মেঘের মতো দেখা যেত, আজ সমস্ত বনটা আগাগোড়া আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে— ডাঙা এবং জল দুই লাজুক প্রণয়ীর মতো অল্প অল্প করে পরস্পরের কাছে অগ্রসর হচ্ছে— লজ্জার সীমা উপচে এল বলে,

প্রায় গলাগলি হয়ে এসেছে। এই ভরা বাদরে ভরা নদীর মধ্য দিয়ে নৌকো করে যেতে বেশ লাগবে—বাঁধা বোট ছেড়ে দেবার জন্যে মনটা অধীর হয়ে আছে।

সিমলা
৭ জুলাই ১৮৯৩

১০৩

শিলাইদহ
মঙ্গলবার। ৪ জুলাই ১৮৯৩।

আজ সকাল বেলায় অল্প অল্প রৌদ্রের আভাস দিচ্ছে। কাল বিকেল থেকে বৃষ্টি ধরে গেছে, কিন্তু আকাশের ধারে ধারে স্তরে স্তরে এত মেঘ জমে আছে যে বড়ো আশা নেই—ঠিক যেন মেঘের কালো কার্পেটটা সমস্ত আকাশ থেকে গুটিয়ে নিয়ে এক প্রান্তে পাকিয়ে জড়ো করেছে। এখনি একটা ব্যস্তবাগীশ বাতাস এসে আবার সমস্ত আকাশময় বিছিয়ে দিয়ে যাবে, তখন নীলাকাশ এবং সোনালি রৌদ্রের কোনো চিহ্নমাত্র দেখা যাবে না। এবারে এত জলও আকাশে ছিল! আমাদের চরের মধ্যে নদীর জল প্রবেশ করেছে। চাষারা নৌকো বোঝাই করে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আসছে—আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকো যাচ্ছে আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্ছি। যখন আর চার দিন থাকলে ধান পাকত তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে যে কী নিদারুণ তা বেশ বুঝতেই পারছিস। যদি ঐ শিষের মধ্যে দুটো-চারটে ধান একটু শক্ত হয়ে থাকে এই তাদের আশা। প্রকৃতির কার্যপ্রণালীর মধ্যে দয়া জিনিসটা কোনো এক জায়গায় আছে অবিশ্যি, নইলে আমরা পেলুম কোথা থেকে—কিন্তু সেটা যে ঠিক কোন্‌খানে আছে খুঁজে পাওয়া শক্ত। এই শত সহস্র নির্দোষী হতভাগ্যের নালিশ কোনো জায়গায় গিয়ে পৌঁচচ্ছে না—বৃষ্টি যেমন পড়বার তেমনি পড়ছে, নদী যেমন বাড়বার তেমনি বাড়ছে, বিশ্বসংসারে এ সম্বন্ধে কারও কাছে কোনো দরবার পাবার জো নেই। মনকে বোঝাতে হয় যে, কিছু বোঝবার জো নেই। কিন্তু এত বুদ্ধিই যদি মানুষকে দেওয়া হল তা হলে জগতে যে দয়া এবং ন্যায়বিচার আছে এটুকু বোঝবার বুদ্ধিও দেওয়া উচিত ছিল, কেননা ওটুকু বোঝা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু এ-সমস্ত মিথ্যে খুঁতখুঁত মাত্র—কেননা সৃষ্টি কখনোই সুখের হতে পারে না। যতক্ষণ অপূর্ণতা ততক্ষণ অভাব, ততক্ষণ দুঃখ থাকবেই। জগৎ যদি জগৎ না হয়ে ঈশ্বর হত তা হলেই কোথাও কোনো খুঁত থাকত না—কিন্তু ততটা দূর পর্যন্ত দরবার করতে সাহস হয় না। ভেবে দেখলে সকল কথাই গোড়ায় গিয়ে ঠেকে যে, সৃষ্টি হল কেন। কিন্তু সেটা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি যদি না করা যায়, তা হলে জগতে দুঃখ রইল কেন এ নালিশ উত্থাপন করা মিথ্যা। সেইজন্যে বৌদ্ধেরা একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ মারতে চায়; তারা বলে যতক্ষণ অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ দুঃখের সংশোধন হতে পারে না, একেবারে নির্বাণ চাই। খৃস্টানরা বলে দুঃখটা খুব উচ্চ জিনিস, ঈশ্বর স্বয়ং মানুষ হয়ে আমাদের জন্যে দুঃখ বহন করেছেন। তাতে যতটা সান্ত্বনা হয়। কিন্তু নৈতিক দুঃখ এক, আর পাকা ধান ডুবে যাওয়ার দুঃখ আর। আমি বলি যা হয়েছে বেশ হয়েছে;

এই-যে আমি হয়েছি এবং এই আশ্চর্য জগৎ হয়েছে, বড়ো তোফা হয়েছে— এমন জিনিসটা নষ্ট না হলেই ভালো। বুদ্ধদেব তদুত্তরে বলেন, এ জিনিসটা যদি রক্ষা করতে চাও তা হলে দুঃখ সইতে হবে। আমি নরাধম তদুত্তরে বলি, ভালো জিনিস এবং প্রিয় জিনিস রক্ষা করতে যদি দুঃখ সইতেই হয় তা হলে দুঃখ সব— তা, আমি থাকি আর আমার জগৎটি থাকুক। মাঝে মাঝে অন্নবস্ত্রের কষ্ট, মনঃক্ষোভ, নৈরাশ্য বহন করতে হবে; কিন্তু সে দুঃখের চেয়ে যখন অস্তিত্ব ভালোবাসি এবং অস্তিত্বের জন্যই সে দুঃখ বহন করি, তখন তো আর কোনো কথা বলা শোভা পায় না।

সিমলা
৮ জুলাই ১৮৯৩

১০৪

ইছামতী
বৃহস্পতিবার। ৬ জুলাই ১৮৯৩।

কাল সমস্ত দিন বেশ পরিষ্কার ছিল। অনেক দিন পরে মেঘ কেটে নতুন রৌদ্রে দশ দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল; প্রকৃতি যেন স্নানের পর নতুন-ধোওয়া বাসন্তী রঙের কাপড়টি পরে পরিচ্ছন্ন প্রসন্ন প্রফুল্ল মুখে ভিজে চুলটি মৃদুমন্দ বাতাসে শুকোচ্ছিলেন— [তবে] কেবল আমার মনটি ভারী উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছিল। ঠিক যেন একান্ত কারায় [বদ্ধ] ভাবটা। কিন্তু আজ দিনের কাজকর্মের ভিড়ে সে ভাবটাকে মনের মধ্যে লালন করবার বড়ো বেশি সময় পাওয়া যায় নি। কাজ সেরে বেলা সাড়ে চারটে-পাঁচটার সময় যখন বোট ছেড়ে দিলুম তখন পূর্ব দিকে খুব একটা গাঢ় মেঘ উঠল। ক্রমশ একটু বাতাস এবং বৃষ্টিও যে হয় নি তা নয়। সেই শাখা-নদীটার ভিতরে যখন ঢুকলুম বৃষ্টি ধরে গেল। জলে চর ভেসে গেছে— মানুষ-প্রমাণ লম্বা ঘাস এবং ঝাউবনের ভিতর দিয়ে সর্ সর্ শব্দে গুণ টেনে বোট চলতে লাগল। খানিক দূরে গিয়ে অনুকূল বাতাস পাওয়া গেল। পাল তুলে দিতে বললুম; পাল তুলে দিলে। দু দিকে ঢেউ কেটে কল্ কল্ শব্দ তুলে বোট সগর্বে চলে যেতে লাগল। আমি বাইরে চৌকি নিয়ে বসলুম। সেই নিবিড় নীলমেঘের অন্তরালে অর্ধনিমগ্ন জনশূন্য চর এবং পরিপূর্ণ দিগন্তপ্রসারিত নদীর মধ্যে সূর্যাস্ত যে কী চমৎকার সে আমি বর্ণনা করতে চেষ্টা করব না। বিশেষত আকাশের অতি দূর প্রান্তে পদ্মার জলরেখার ঠিক উপরেই মেঘের যেখানে ফাঁক পড়েছে সেখানটা এমনি অতিমাত্রায় সূক্ষ্মতম সোনালিতম সুদূরতম হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেই স্বর্ণপটের উপর সারি সারি লম্বা কৃশ গাছগুলির মাথা এমনি সুকোমল সুনীল রেখায় অঙ্কিত হয়েছিল— প্রকৃতি সেখানে যেন আপনার চরম পরিণতিতে পৌঁছে একটা কল্পলোকের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। মাঝি জিজ্ঞাসা করলে, 'চরের কাছারি-ঘাটে রাখব কি?' আমি বললুম, 'না, পদ্মা পেরিয়ে চল্।' মাঝি পাড়ি দিলে— বাতাস বেগে বইতে লাগল, পদ্মা নৃত্য করতে লাগল, পাল ফুলে উঠল, দিনের আলো মিলিয়ে এল, আকাশের ধারের মেঘগুলি ক্রমে আকাশের

মাঝখানে ঘনঘটা করে জমে গেল, চার দিকে পদ্মার উদ্দাম চঞ্চল জল করতালি দিচ্ছে— সম্মুখে দূরে নীল মেঘস্তূপের নিচে পদ্মাতটের নীল বনরেখা দেখা যাচ্ছে —নদীর মাঝখানে আমাদের বোট ছাড়া আর একটিও নৌকো নেই— তীরের কাছে দুই-একটা জেলেডিঙি ছোটো ছোটো পাল উড়িয়ে গৃহমুখে চলেছে— আমি যেন প্রকৃতির রাজার মতো বসে আছি আর আমাকে তার দুরন্ত ফেনিলমুখ রাজ-অশ্ব সনৃত্য গতিতে বহন করে নিয়ে চলেছে।

সিমলা
১১ জুলাই ১৮৯৩

১০৫

সাজাদপুর
৭ জুলাই। ১৮৯৩।

ছোটোখাটো গ্রাম, ভাঙাচোরা ঘাট, টিনের-ছাত-ওয়ালা বাজার, বাখারির-বেড়া-দেওয়া গোলাঘর, বাঁশঝাড়, আম কাঁঠাল কুল খেজুর শিমুল কলা আকন্দ ভেরেণ্ডা ওল কচু লতাগুল্ম তৃণের সমষ্টি-বদ্ধ ঝোপঝাড় জঙ্গল, ঘাটে-বাঁধা মাস্তুল-তোলা বৃহদাকার নৌকোর দল, নিমগ্নপ্রায় ধান এবং অর্ধমগ্ন পাটের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত এঁকে বেঁকে কাল সন্ধের সময় সাজাদপুরে এসে পোঁচেছি। এখন কিছুদিনের মতো এইখানেই স্থায়ী হওয়া গেল। অনেক দিন বোটে থাকার পর সাজাদপুরের বাড়িটা বেশ লাগে ভালো— একটা যেন নূতন স্বাধীনতা পাওয়া যায়— যতটা খুশি নড়বার চড়বার এবং শরীর প্রসারণ করবার জায়গা পাওয়া মানুষের মানসিক সুখের যে একটা প্রধান অঙ্গ সেটা হঠাৎ আবিষ্কার করা যায়। আজ প্রাতে মাঝে মাঝে বেশ একটুখানি রৌদ্র দেখা দিচ্ছে, বাতাসটি চঞ্চল বেগে বচ্ছে, ঝাউ এবং লিচু গাছ ক্রমাগত সর্‌সর্‌ মর্‌মর্‌ করে দুলছে, নানা জাতির পাখি নানা ভাষা নানা সুরে ডেকে ডেকে প্রাতঃকালের আরণ্য মজলিস সর্‌গরম্‌ করে তুলেছে— আমি আমাদের দোতলার এই সঙ্গীহীন প্রশস্ত নির্জন আলোকিত উন্মুক্ত ঘরের মধ্যে বসে জানলা থেকে খালের উপরকার নৌকাশ্রেণী, ও পারের তরুমধ্যগত গ্রাম, এবং এ পারের অনতিদূরবর্তী লোকালয়ের মৃদুকর্মপ্রবাহ নিরীক্ষণ করে বেশ একটুখানি মনের আনন্দে আছি। পাড়াগাঁয়ের কর্মস্রোত খুব বেশি তীব্রও নয়, অথচ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নির্জীবও নয়। কাজ এবং বিশ্রাম দুই যেন পাশাপাশি মিলিত হয়ে হাত ধরাধরি করে চলেছে। খেয়ানৌকো পারাপার করছে, পান্থরা ছাতা হাতে করে খালের ধারের রাস্তা দিয়ে চলেছে, মেয়েরা ধুচুনি ডুবিয়ে চাল ধুচ্ছে, চাষারা আঁটিবাঁধা পাট মাথায় করে হাটে আসছে— দুটো লোক একটা গাছের গুঁড়ি মাটিতে ফেলে কুড়ুল নিয়ে ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দে কাঠ চেলা করছে, একটা ছুতোর অশথ গাছের তলায় জেলেডিঙি উলটে ফেলে বাটালি হাতে মেরামত করছে, গ্রামের কুকুরটা খালের ধারে ধারে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুটি-কতক গোরু বর্ষার ঘাস অপর্যাপ্ত পরিমাণে আহার-পূর্বক অলসভাবে রৌদ্রে মাটির উপর পড়ে কান এবং লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে এবং কাক এসে তাদের মেরুদণ্ডের উপর বসে যখন বড়ো বেশি বিরক্ত করছে তখন একবার পিঠের দিকে

মাথাটা নেড়ে আপত্তি জানাচ্ছে। এখানকার এই দুই-একটা একঘেয়ে ঠক্‌ঠক্‌ ঠুক্‌ঠাক্‌ শব্দ, উলঙ্গ ছেলেমেয়েদের খেলার কল্লোল, রাখালের করুণ উচ্চস্বরে গান, দাঁড়ের ঝুপ্‌ঝাপ ধ্বনি, কলুর ঘানির তীক্ষ্ণকাতর নিখাদ স্বর, সমস্ত কর্ম-কোলাহল একত্র মিলে এই পাখির ডাক এবং পাতার শব্দের সঙ্গে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য হচ্ছে না—সমস্তটাই যেন একটা শান্তিময় স্বপ্নময় করুণা-মাখা একটা বড়ো সোনাটার অন্তর্গত, কতকটা সোপ্যাঁর ধাঁচায়, কিন্তু খুব একটা বিস্তৃত বৃহৎ অথচ সংযত মাত্রায় বাঁধা। আমার মাথার মধ্যে সূর্যের আলোক এবং এই-সমস্ত শব্দ একেবারে যেন কানায় কানায় ভরে এসেছে অতএব ... চিঠি বন্ধ করে খানিকক্ষণ পড়ে থাকা যাক।

সিমলা
১১ জুলাই ১৮৯৩

১০৬

সাজাদপুর
১০ জুলাই। ১৮৯৩।

আমার গানগুলো পেয়েছিস। 'বড়ো বেদনার মতো' গানের সুরটা ঠিক হয়তো মজলিসি বৈঠকি নয়। ... এ-সব গান যেন একটু নিরালায় গাবার মতো। সুরটা যে মন্দ হয়েছে এমন আমার বিশ্বাস নয়, এমন-কি ভালো হয়েছে বললে খুব বেশি অত্যুক্তি হয় না। ও গানটা আমি নাবার ঘরে অনেক দিন একটু একটু করে সুরের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করেছিলুম—নাবার ঘরে গান তৈরি করবার ভারী কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমত নিরালা, দ্বিতীয়ত অন্য কোনো কর্তব্যের কোনো দাবি থাকে না—মাথায় এক-টিন জল ঢেলে পাঁচ মিনিট গুন্‌ গুন্‌ করলে কর্তব্যজ্ঞানে বিশেষ আঘাত লাগে না—সব চেয়ে সুবিধা হচ্ছে কোনো দর্শক-সম্ভাবনা-মাত্র না থাকাতে সমস্ত মন খুলে মুখভঙ্গী করা যায়। মুখভঙ্গী না করলে গান তৈরি করবার পুরো অবস্থা কিছুতেই আসে না। ওটা কিনা ঠিক যুক্তি-তর্কের কাজ নয়, নিছক ক্ষিপ্তভাব। এ গানটা আমি এখনও সর্বদা গেয়ে থাকি—আজ প্রাতঃকালেও অনেক ক্ষণ গুন্‌গুন্‌ করেছি, গাইতে গাইতে গভীর একটা ভাবোন্মাদও জন্মায়। অতএব এটা যে আমার একটা প্রিয় গান সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ... এখানে আমি একলা খুব মুগ্ধ এবং তদ্গত চিত্তে অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে গেয়ে থাকি, এবং জীবন ও পৃথিবীটা একটি সূর্যকরোজ্জ্বল অতি সূক্ষ্ম অশ্রুবাষ্পে আবৃত হয়ে সাতরঙা ইন্দ্রধনুরেখায় রঞ্জিত হয়ে দেখা দেয়—প্রতিদিনের সত্যকে চিরদিনের সৌন্দর্যের মধ্যে তর্জমা করে দেওয়া যায়, দুঃখকষ্টও আভাময় হয়ে ওঠে। অনতিবিলম্বেই খাজাঞ্চি দুইটা আন্ডা, এক ছটাক মাখন, এক পোয়া ঘি ও ছয় পয়সার সর্ষপ তৈলের হিসাব এনে উপস্থিত করে। আমার এখানকার ইতিহাস এই রকম। ...

সিমলা
১৪ জুলাই ১৮৯৩

১০৭

সাজাদপুর
৩০ আষাঢ়। ১৩০০।

আজকাল কবিতা লেখাটা আমার পক্ষে যেন একটা গোপন নিষিদ্ধ সুখসম্ভোগের মতো হয়ে পড়েছে—এ দিকে আগামী মাসের সাধনার জন্যে একটি লাইন লেখা হয় নি, ও দিকে মধ্যে মধ্যে সম্পাদকের তাড়া আসছে, অনতিদূরে আশ্বিন-কার্তিকের যুগল সাধনা রিক্তহস্তে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনা করছে, আর আমি আমার কবিতার অন্তঃপুরে পালিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি। রোজ মনে করি আজ একটা দিন বৈ তো নয়—এমনি করে কত দিন কেটে গেল। আমি বাস্তবিক ভেবে পাই নে কোন্‌টা আমার আসল কাজ। এক-এক সময় মনে হয় আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে—লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়। এক-এক সময় মনে হয়—আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয়, সেগুলো ডায়ারি প্রভৃতি নানা আকারে প্রকাশ করে রেখে দেওয়া ভালো, বোধ হয় তাতে ফলও আছে আনন্দও আছে। এক-এক সময় সামাজিক বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা খুব দরকার, যখন আর কেউ করছে না তখন তো কাজেই আমাকে এই অপ্রিয় কর্তব্যটা গ্রহণ করতে হয়। আবার এক-এক সময় মনে হয়, দূর হোক গে ছাই, পৃথিবী আপনার চরকায় আপনি তেল দেবে এখন—মিল করে ছন্দ গেঁথে ছোটো ছোটো কবিতা লেখাটা আমার বেশ আসে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আপনার মনে আপনার কোণে সেই কাজই করা যাক। মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। মিউজদের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাই নে—কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং হয়তো 'দীর্ঘ দৌড়ে' কোনোটিই পরিপূর্ণভাবে আমার আয়ত্ত হয় না। সাহিত্য-বিভাগেও কর্তব্যবুদ্ধির অধিকার আছে, কিন্তু অন্য বিভাগের কর্তব্যবুদ্ধির সঙ্গে তার একটু প্রভেদ আছে। কোন্‌টাতে পৃথিবীর সব চেয়ে উপকার হবে সাহিত্য-কর্তব্যজ্ঞানে সে কথা ভাববার দরকার নেই, কিন্তু কোন্‌টা আমি সব চেয়ে ভালো করতে পারি সেইটেই হচ্ছে বিচার্য। বোধ হয় জীবনের সকল বিভাগেই তাই। আমার বুদ্ধিতে যতটা আসে তাতে তো বোধ হয় কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার। কিন্তু আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয় এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তা হলে তো মন্দ হয় না। আবার যখন একটা কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি নেশা চেপে যায় যে মনে হয় যে, চাই-কি, এটাতেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আবার যখন 'বাল্যবিবাহ' কিম্বা 'শিক্ষার হেরফের' নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয় এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ। কী মুশকিলেই পড়েছি [বব]! আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তো এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ-যে চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি—কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার

বয়স চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো তাঁকে তো সহজে পাবার জো নেই— তাঁর একেবারে ধনুক-ভাঙা পণ; তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। আমার অবস্থাটা দ্রৌপদীর মতো হয়েছে— তিনি মনে করেছিলেন যে, আহা, সেই যদি আমার পাঁচটি স্বামীই হল তবে ঐ কর্ণকে-সুদ্ধ নিয়ে ছটি হলেই দিব্যি হত। আমার বিশ্বাস যদি কর্ণকেও পেতেন তা হলে দুর্যোধন-দুঃশাসনকেও হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হত না। কারণ, হয় এক, নয় অসংখ্য— এর মাঝখানে আর কোথাও বেশ স্বাভাবিক বিরামের স্থান নেই। পাঁচ বললে ছয় আপনি এগিয়ে আসে এবং ছয়ের পরে সাত আট নয় দশ প্রভৃতি সমস্ত সংখ্যাগুলি সার বেঁধে অনিমেষ লোচনে মুখের দিকে [চেয়ে] অপেক্ষা করে থাকে। অতএব একলা কবিতাটিকে নিয়ে থাকাই আমার পক্ষে সব চেয়ে সুবিধে —বোধ হয় যেন উনিই আমাকে সব চেয়ে বেশি ধরা দিয়েছেন— আমার ছেলেবেলাকার ভালোবাসা, আমার বহুকালের অনুরাগিণী সঙ্গিনী।...

তুই যে নীরব কবি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিস সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সরব এবং নীরবের মধ্যে অনুভূতির পরিমাণ সমান থাকতে পারে, কিন্তু আসল কবিত্ব জিনিসটি স্বতন্ত্র। কেবল ভাষার ক্ষমতা বলে নয়, গঠন করবার শক্তি। একটা অলক্ষিত অচেতন নৈপুণ্যবলে ভাবগুলি কবির হাতে বিচিত্র আকার ধারণ করে। সেই সৃজনক্ষমতাই কবিত্বের মূল। ভাষা ভাব এবং অনুভাব তার সরঞ্জাম মাত্র। কারও বা ভাষা আছে, কারও বা অনুভাব আছে, কারও বা ভাষা এবং অনুভাব দুই আছে, কিন্তু আর-একটি ব্যক্তি আছে যার ভাষা অনুভাব এবং সৃজনী শক্তি আছে— এই শেষোক্ত লোকটিকে কবি নাম দেওয়া যেতে পারে। প্রথমোক্ত তিনটি লোক নীরবও হতে পারেন সরবও হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা কবি নন। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে ভাবুক বললেই ঠিক বিশেষণটা প্রয়োগ করা হয়। তাঁরাও জগতে অত্যন্ত দুর্লভ এবং কবির তৃষিত চিত্ত সর্বদাই তাঁদের জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে।

উপরের এই ভূমিকার পরে আমার সেই 'জাল ফেলা' কবিতাটার ব্যাখ্যা একটু সহজ হবে। সেটার মানে তুই জিজ্ঞাসা করেছিস। লেখাটা চোখের সামনে থাকলে তার মানে নিজে একটু ভালো করে বুঝে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারতুম— তবু একটা ঝাপসা রকমের ভাব মনে আছে। মনে কর্ একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রভাতকালে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছিল— সে সমুদ্রটা তার আপনার মন কিম্বা ঐ বাহিরের বিশ্ব কিম্বা উভয়ের সীমানা-মধ্যবর্তী একটি ভাবের পারাবার, সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। যাই হোক, সেই অপূর্ব সৌন্দর্যময় অগাধ সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে লোকটার মনে হল এই রহস্যপাথারের মধ্যে জাল ফেলে দেখা যাক-না কী পাওয়া যায়। এই বলে তো সে ঘুরিয়ে জাল ফেললে। নানা রকমের অপরূপ জিনিস উঠতে লাগল— কোনোটা বা হাসির মতো শুভ্র, কোনোটা বা অশ্রুর মতো উজ্জ্বল, কোনোটা বা লজ্জার মতো রাঙা। মনের উৎসাহে সে সমস্ত দিন ধরে ঐ কাজই কেবল করলে— গভীর তলদেশে যে-সকল সুন্দর রহস্য ছিল সেইগুলিকে তীরে এনে রাশীকৃত করে তুললে। এমনি করে জীবনের সমস্ত দিনটি যাপন করলে। সন্ধ্যার সময় মনে করলে এবারকার মতো তো যথেষ্ট হয়েছে, এখন এইগুলি নিয়ে তাকে দিয়ে আসা যাক্‌গে। কাকে যে, সে কথাটা স্পষ্ট করে বলা হয় নি— হয়তো তার প্রেয়সীকে, হয়তো তার স্বদেশকে। কিন্তু সে তো এ-সমস্ত অপূর্ব জিনিস কখনও দেখে নি। সে

ভাবলে এগুলো কী, এর আবশ্যকই বা কী, এতে কী অভাব দূর হবে, দোকানদারের কাছে যাচিয়ে দেখলে এর কতই বা মূল্য হতে পারবে? এক কথায়, এ বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নয়—এ কেবল কতকগুলো রঙিন ভাব মাত্র, তারও যে কোন্‌টার কী নাম কী বিবরণ তাও ভালো পরিচয় পাওয়া যায় না। ফলত সমস্ত দিনের জাল-ফেলা অগাধ সমুদ্রের এই রত্নগুলি যাকে দেওয়া গেল সে বললে, এ আবার কী? জেলেরও মনে তখন অনুতাপ হল, 'সত্যি বটে, এ তো বিশেষ কিছু নয়, আমি কেবল জাল ফেলেছি আর তুলেছি—আমি তো হাটেও যাই নি পয়সা কড়িও খরচ করি নি, এর জন্যে তো আমাকে কাউকে এক পয়সা খাজনা কিম্বা মাশুল্‌ দিতে হয় নি!' সে তখন কিঞ্চিৎ বিষণ্নমুখে লজ্জিতভাবে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের দ্বারে বসে বসে একে একে রাস্তায় ফেলে দিলে। তার পরদিন সকালবেলায় পথিকরা এসে সেই বহুমূল্য জিনিসগুলি দেশে বিদেশে আপন আপন ঘরে নিয়ে গেল। বোধ হচ্ছে এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন তিনি মনে করছেন, তাঁর গৃহকার্যনিরতা অন্তঃপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী, তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহণ করতে পারছে না—তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়—অতএব এখনকার মতো এ-সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে, 'তোমরাও অবহেলা করো আমিও অবহেলা করি', কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে তখন 'পস্টারিটি' এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে। কিন্তু তাতে ঐ জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে! যাই হোক, 'পস্টারিটি' যে অভিসারিণী রমণীর মতো দীর্ঘরাত্রি ধরে ধীরে ধীরে কবির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং হয়তো নিশিশেষে এসে উপস্থিত হতেও পারে এ সুখকল্পনাটুকু কবিকে ভোগ করতে দিতে কারও বোধ হয় আপত্তি না হতেও পারে।

সেই মন্দিরের কবিতার ঠিক অর্থটা কী ভালো মনে পড়ছে না। বোধ হয় সেটা সত্যিকার মন্দির সম্বন্ধে। অর্থাৎ, যখন কোণে বসে বসে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন করে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয়বজ্র পড়ে সেই-সমস্ত সুদীর্ঘকালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায়, তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা, সূর্যের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে আমার তন্ত্রমন্ত্র ধূপধুনার স্থান অধিকার করে এবং তখন দেখতে পাই সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি। বোধ হয় উড়িষ্যার মন্দিরগুলো দেখে দেখে আমার এই রকম একটা ভাব মনে এসে থাকবে। ভুবনেশ্বরের একটা মন্দিরের ভিতরে যেখানে দেবতা সেখানে ভয়ানক অন্ধকার, বদ্ধ, ধূপের গন্ধে নিশ্বাসরোধ হয়—ঠাকুরের অভিষেক-জলে মেজে স্যাঁতসেঁতে, বাদুড় চামচিকে উড়ছে, সেখান থেকে বাইরের সুন্দর আলোতে হঠাৎ আসবামাত্র দেবতা যে কোন্‌খানে আছেন টের পাওয়া যায়।

সিমলা
১৭ জুলাই ১৮৯৩

১০৮

পতিসর
১১ অগস্ট। ১৮৯৩।

অনেকগুলো বড়ো বড়ো বিলের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে। এই বিলগুলো ভারী অদ্ভুত—কোনো আকার আয়তন নেই, জলে স্থলে একাকার—পৃথিবী সমুদ্র-গর্ভ থেকে নতুন জেগে ওঠবার সময় যেমন ছিল। কোথাও কিছু কিনারা নেই—খানিকটা জল, খানিকটা মগ্নপ্রায় ধান-ক্ষেতের মাথা, খানিকটা শেওলা এবং জলজ উদ্ভিদ ভাসছে—পানকৌড়ি সাঁতার দিচ্ছে, জাল ফেলবার জন্যে বড়ো বড়ো বাঁশ পোঁতা, তারই উপর কটা রঙের বড়ো বড়ো চিল বসে আছে—ভারী একাকার একঘেয়ে রকমের দৃশ্য। দ্বীপের মতো অতি দূরে গ্রামের রেখা দেখা যাচ্ছে—যেতে যেতে হঠাৎ আবার খানিকটা নদী, দু ধারে গ্রাম, পাটের ক্ষেত এবং বাঁশের ঝাড়, আবার কখন্ যে সেটা বিস্তৃত বিলের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে বোঝবার জো নেই।...

ঠিক সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময় যখন একটি গ্রাম পেরিয়ে আসছিলুম, একটা লম্বা নৌকোয় অনেকগুলো ছোকরা ঝপ্ ঝপ্ করে দাঁড় ফেলছিল এবং সেই তালে গান গাচ্ছিল—

'যোবতী, ক্যান্ বা কর মন ভারী?
পাবনা থাক্যে আন্যে দেব ট্যাকা দামের মোটর্যি।'

স্থানীয় কবিটি যে ভাব অবলম্বন করে সংগীত রচনা করেছেন—আমরাও ও ভাবের ঢের লিখেছি, কিন্তু কিছু ইতর-বিশেষ আছে। আমাদের যুবতী মন ভারী করলে তৎক্ষণাৎ জীবনটা দিতে কিম্বা নন্দনকানন থেকে পারিজাত এনে দিতে প্রস্তুত হই, কিন্তু এ অঞ্চলের লোক খুব সুখে আছে বলতে হবে— অল্প ত্যাগস্বীকারেই যুবতীর মন পায়। মোটর্যি জিনিসটি কী তা বলা আমার সাধ্য নয়, কিন্তু তার দামটাও নাকি পার্শ্বেই উল্লেখ করা আছে—তাতেই বোঝা যাচ্ছে খুব বেশি দুর্মূল্য নয় এবং নিতান্ত অগম্য স্থান থেকেও আনতে হয় না। গানটা শুনে বেশ মজার লাগল। যুবতীর মন ভারী হলে জগতে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, এই বিলের প্রান্তেও তার একটা সংবাদ পাওয়া গেল। এ গানটি কেবল অস্থানেই হাস্যজনক, কিন্তু দেশকালপাত্র-বিশেষে এর যথেষ্ট সৌন্দর্য আছে। আমার অজ্ঞাতনামা গ্রাম্য কবিভ্রাতার রচনাগুলিও এই গ্রামের লোকের সুখদুঃখের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, আমার গানগুলি সেখানে কম হাস্যজনক নয়।

সিমলা
১৫ অগস্ট্ ১৮৯৩

১০৯

পতিসর
১৩ অগস্ট্। ১৮৯৩।

এবারে এই বিলের পথ দিয়ে কালীগ্রামে আসতে আসতে আমার মাথায় একটি ভাব বেশ পরিষ্কাররূপে ফুটে উঠেছে। কথাটা নতুন নয়, অনেক দিন থেকে জানি, কিন্তু তবু এক-একবার পুরোনো কথাও নতুন করে অনুভব করা যায়। দুই দিকে দুই তীর দিয়ে সীমাবদ্ধ না থাকলে জলস্রোতের তেমন শোভা থাকে না— অনির্দিষ্ট অনিয়ন্ত্রিত বিল একঘেয়ে শোভাশূন্য। ভাষার পক্ষে ছন্দের বাঁধন ঐ তীরের কাজ করে। ভাষাকে একটি বিশেষ আকার এবং বিশেষ শোভা দেয়; তার একটি সুন্দর চেহারা ফুটে ওঠে। তীরবদ্ধ নদীগুলির যেমন একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে, তাদের যেমন এক-একটি স্বতন্ত্র লোকের মতো মনে হয়, ছন্দের দ্বারা কবিতা সেইরূপ এক-একটি মূর্তিমান অস্তিত্বের মতো দাঁড়িয়ে যায়। গদ্যের সেইরকম সুন্দর সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্য নেই; সে একটা বৃহৎ বিশেষত্ববিহীন বিলের মতো। আবার তটের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতেই নদীর মধ্যে একটা বেগ আছে, একটা গতি আছে, কিন্তু প্রবাহহীন বিল কেবল বিস্তৃতভাবে দিগ্‌বিদিক গ্রাস করে পড়ে আছে। ভাষার মধ্যেও যদি একটা আবেগ একটা গতি দেবার আবশ্যক হয় তবে তাকে ছন্দের সংকীর্ণতার মধ্যে বেঁধে দিতে হয়; নইলে সে কেবল ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু সমস্ত বল নিয়ে এক দিকে ধাবিত হতে পারে না। বিলের জলকে পল্লিগ্রামের লোকেরা বলে বোবা জল— তার কোনো ভাষা নেই, আত্মপ্রকাশ নেই। তটবদ্ধ নদীর মধ্যে সর্বদা একটা কলধ্বনি শোনা যায়; ছন্দের মধ্যে বেঁধে দিলে কথাগুলোও সেইরকম পরস্পরের প্রতি আঘাত সংঘাত করে একটা সংগীতের সৃষ্টি করতে থাকে। সেইজন্যে ছন্দের ভাষা বোবা ভাষা নয়, তার মুখে সর্বদাই কলগান। বাঁধনের মধ্যে থাকাতেই গতির সৌন্দর্য, ধ্বনির সৌন্দর্য এবং আকারের সৌন্দর্য। বাঁধনের মধ্যে থাকাতে যেমন সৌন্দর্য তেমনি শক্তি। কবিতা যে স্বভাবতই ধীরে ধীরে একটি ছন্দের মধ্যে ধরা দিয়ে আপনাকে পরিস্ফুট করে তুলেছে, ওটা একটা কৃত্রিম-অভ্যাস-জাত সুখ দেবার জন্যে নয়— ওর একটি গভীর স্বাভাবিক সুখ আছে। অনেক মূর্খ মনে করে কবিতার ছন্দোবন্ধ কেবল একটা বাহাদুরি করা, ওতে কেবল সাধারণ লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে সুখ দেয়— ও কেবল ভাষার ব্যায়াম মাত্র। কিন্তু সে ভারী ভুল। কবিতার ছন্দ যে নিয়মে উৎপন্ন হয়েছে বিশ্বজগতের সমস্ত সৌন্দর্যই সেই নিয়মে সৃষ্ট হয়েছে। একটি সুনির্দিষ্ট বন্ধনের মধ্যে দিয়ে বেগে প্রবাহিত হয়ে মনের মধ্যে আঘাত করে বলেই সৌন্দর্যের এমন অনিবার্য শক্তি। আর, সুষমার বন্ধন ছাড়িয়ে গেলেই সব একাকার হয়ে যায়, তার আর আঘাত করবার শক্তি থাকে না। বিল ছাড়িয়ে যেমনি নদীতে এবং নদী ছাড়িয়ে যেমনি বিলে গিয়ে পড়ছিলুম অমনি আমার মনে এই তথ্যটি দেদীপ্যমান হয়ে জেগে উঠছিল।

সিমলা
১৭ অগস্ট্ ১৮৯৩

১১০

পতিসর
২৬ শ্রাবণ?
।১৩০০।

শ্রাবণ মাসের ডায়ারিটা তুই ভালো বুঝতে পারিস নি [বব]? বোঝাতে গেলে একখানা গ্রন্থবিশেষ লিখতে হয়।...আমি অনেক দিন থেকে ভেবে দেখেছি পুরুষরা কিছু খাপছাড়া আর মেয়েরা বেশ সুসম্পূর্ণ। মেয়েদের কথাবার্তা বেশভূষা চালচলন আচারব্যবহার এবং জীবনের কর্তব্যের মধ্যে একটি অখণ্ড সামঞ্জস্য আছে। সমস্তটি যেন একটি অর্গ্যানিক হোল। তার প্রধান কারণ হচ্ছে যুগ যুগান্তর থেকে প্রকৃতি তাদের কর্তব্য নিজে নির্দিষ্ট করে দিয়ে তাদের আগাগোড়া সেই ভাবে সেই উদ্দেশ্যে গঠিত করে দিয়েছে—এ পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন, কোনো রাষ্ট্রবিপ্লব, সভ্যতার কোনো ভাঙন-গড়নে তাদের সেই ঐক্য থেকে বিক্ষিপ্ত করে দেয় নি; তারা বরাবর সেবা করেছে, ভালোবেসেছে, আদর করেছে, আর কিছু করে নি। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভাষায়-ভঙ্গীতে সেই কাজের নৈপুণ্য এবং সৌন্দর্য যেন মিশে এক হয়ে গেছে। তাদের স্বভাব এবং তাদের কাজ যেন পুষ্প এবং পুষ্পের গন্ধের মতো সম্মিলিত হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে সেইজন্যে কোনো দ্বিধা কোনো ইতস্তত নেই। পুরুষের চরিত্রের মধ্যে বিস্তর উঁচুনিচু; তারা যে নানা কার্য নানা শক্তি নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে তৈরি হয়ে এসেছে, তার অঙ্গে এবং স্বভাবে তার যেন চিহ্ন রয়ে গেছে। কোথাও কিছু নেই কপালটা হয়তো বৃহৎ উঁচু হয়ে উঠল, মাঝের থেকে হয়তো নাকটা এমনি ঠেলে উঠল যে তাকে কার সাধ্য দাবিয়ে রাখে—চোয়াল দুটো হয়তো সৌষম্যের কোনো নিয়ম মানলে না। যদি চিরকাল পুরুষ এক ভাবে চালিত, এক কার্যে শিক্ষিত হয়ে আসত, তা হলে তাদেরও মুখে এবং স্বভাবে একটা সামঞ্জস্য দাঁড়িয়ে যেত—একটা ছাঁচ বহুকাল থেকে তৈরি হয়ে যেত—তা হলে তাদের আর বল প্রকাশ করে বহু চিন্তা করে কাজ করতে হত না। সকল কাজ সুন্দরভাবে সহজে সম্পন্ন হত—তা হলে তাদের একটা সহজ নীতিও দাঁড়িয়ে যেত। অর্থাৎ, বহু যুগ থেকে অবিচ্ছেদে যে কাজ করে আসছে সেই কাজের কাছে তার মন বশ মানত, সেই বহু যুগের অভ্যস্ত কর্তব্য থেকে কোনো সামান্য শক্তি তাদের বিক্ষিপ্ত করতে পারত না। স্ত্রীলোককে প্রকৃতি মা করে দিয়ে তাকে একেবারে ছাঁচে ঢালাই করে ফেলেছে। পুরুষের সে-রকম কোনো স্বাভাবিক আদিম বন্ধন নেই, সেইজন্যে একটি ধ্রুবকেন্দ্র-আশ্রয়ে পুরুষ সর্বতোভাবে তৈরি হয়ে যায় নি। সে চিরকাল ধরে কেবলই বিক্ষিপ্ত হয়ে হয়ে এসেছে, তার শতমুখী উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি তাকে একটি সুন্দর সমগ্রতা গড়ে তুলতে দেয় নি। আমি তোকে সেদিনকার চিঠিতে বন্ধনকে সৌন্দর্যের কারণ বলে অনেকখানি লিখেছিলুম মনে আছে—মেয়েরা সেইরকম একটি স্বাভাবিক ছন্দের বন্ধনে সম্পূর্ণ সুন্দর হয়ে তৈরি হয়ে এসেছে। আর, পুরুষরা গদ্যের মতো বন্ধনহীন এবং সৌন্দর্যহীন, তাদের আগাগোড়ার মধ্যে কোনো-একটি 'ছাঁদ নেই'। জানি নে আমি কিছু বোঝাতে পারলুম কি না, কিন্তু আমার মনে কথাটা খুব পরিস্ফুট। মেয়েদের সঙ্গে-যে লোকে চিরকাল সংগীতের, কবিতার, লতার, ফুলের, নদীর তুলনা দিয়ে এসেছে এবং কখনও

পুরুষের সঙ্গে দেবার কথা মনেও উদয় হয় নি তার কারণই এই। প্রকৃতির সমস্ত সুন্দর জিনিস যেমন সুসম্বদ্ধ সুসম্পূর্ণ সুসংহত সুসংযত, মেয়েরাও সেই রকম। তাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা কোনো চিন্তা কোনো মন এসে তাদের ছন্দোভঙ্গ করে দিচ্ছে না, কোনো তর্ক এসে তাদের মিল নষ্ট করে দিচ্ছে না— তারা এক-একটি ছিপ্‌ছিপে মিষ্টি কবিতার মতো। গোড়ায় গল্পদের চন্দ্র যে-রকম বর্ণনা করেছিল সেইরকম। ডায়ারির চেয়ে চিঠি যে বেশি স্পষ্ট হল এমন মনে হচ্ছে না, কিন্তু এতে তো কোনো প্রত্যক্ষ পরিষ্কার প্রমাণ প্রয়োগ করবার জো নেই।

সিমলা
২২ অগস্ট্‌ ১৮৯৩

১১১

কলকাতা
২১ অগস্ট্‌। ১৮৯৩।

আজ তোর কাছ থেকে কতকগুলো খবরের কাগজের কাঁচি-ছাঁটা টুকরো পাওয়া গেল। কোথায় প্যারিসের আর্টিস্ট্‌-সম্প্রদায়ের উদ্দাম উন্মত্ততা আর কোথায় আমার কালীগ্রামের সরল চাষী প্রজাদের দুঃখদৈন্য-নিবেদন! আহা, এমন প্রজা আমি দেখি নি— এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে। আমার কাছে এই-সমস্ত দুঃখপীড়িত অটলবিশ্বাস-পরায়ণ অনুরক্ত ভক্ত প্রজাদের মুখে এমন একটি কোমল মাধুর্য আছে, এদের দিকে চেয়ে এবং এদের কথা শুনে সত্যি সত্যি বাৎসল্যে আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। বাস্তবিক, এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই-সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্তনির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের আপনার লোক মনে করতে বড়ো একটা সুখ আছে। এদের ভাষা শুনতে আমার এমন মিষ্টি লাগে— তার ভিতর এমন স্নেহমিশ্রিত করুণা আছে! এরা যখন কোনো-একটা অবিচারের কথা বলে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে— অন্য নানা ছলে আমাকে সামলে নিতে হয়। এরা অনেক দুঃখ অনেক ধৈর্য-সহকারে সহ্য করেছে, তবু এদের ভালোবাসা কিছুতেই ম্লান হয় না। আজ একজন এসে বলছিল, 'সে বছর ভালো ধান হয় নি বলে চুঁচড়োয় বুড়ো বাপের কাছে এন্‌ছাপ নিতে গিয়েছিলুম। তা সে বললে, আমি তোদের কিছু ছেড়ে দিচ্ছি, তোরাও আমাকে কিছু খেতে দিস্‌। তার কাছে দরবার করতে গিয়েছিলুম বলে সেই মনোবাদে এখানকার আমিন আমাকে ফেরেবি মকদ্দমা করে তিন মাস জেল খাটিয়েছিল। আমি তখন তোমার মাটিকে সেলাম করে ভিন এলাকায় গিয়েছিলুম।' কিন্তু তবু তার এমনি ভক্তি যে সেই ভিন এলাকার জমিদার আমাদের কতক জমি চুরি করে ভোগ করছিল বলে সে এখানকার সেরেস্তায় জানিয়ে যায়, সেই রাগে তার নতুন জমিদার তার ধান-সুদ্ধ জমি কেড়ে নিয়েছে। সে বলে, 'আমি যার মাটিতে বুড়োকাল পর্যন্ত মানুষ হয়েছি তার হিতের কথা তাকে আমি বলতে পাব না!' এই বলে সে চোখ থেকে দুই-এক ফোঁটা জল মুছে ফেললে। তুই যদি তাকে দেখতিস, তার কথা শুনতিস, সে যে

কেমন সহজে কোনোরকম চাতুরি না করে যেন একটা খবর দিয়ে যাবার মতো সমস্তটা বলে গেল, তা দেখলে এই ব্যাপারটার যথার্থ গভীরতা বুঝতে পারতিস। এদের উপর যে আমার কতখানি শ্রদ্ধা হয়, আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভালো মনে হয়, তা এরা জানে না। কিন্তু তবু প্যারিসের সভ্যতা থেকে কত তফাত! সে এর চেয়ে কত কঠিন, কত উজ্জ্বল, কত সুগঠিত! তবু এখানকার মানুষের মধ্যে যে জিনিসটি আছে সে বড়ো অনাদরের নয়। যতক্ষণ না সভ্যতার মাঝখানে এই স্বচ্ছ সরলতার প্রতিষ্ঠা হয় ততক্ষণ সভ্যতা কখনোই সম্পূর্ণ এবং সুন্দর হবে না। য়ুরোপের সভ্যতা ক্রমে যেন মর্বিড হয়ে আসছে, সে কেবল এই জিনিষটির অভাবে। তার ভিতরে একটা অস্বাস্থ্য একটা কীট তাকে ক্রমাগত দংশন করে জীর্ণ করে ফেলছে। সরলতাই মানুষের স্বাস্থ্যের একমাত্র উপায়— সে যেন গঙ্গার মতো, তার মধ্যে স্নান করে সংসারের অনেক তাপ দূর হয়ে যায়। আর, য়ুরোপ সমস্ত তাপকে যেন লালন করে তুলছে এবং তার উপরে আবার সহস্রবিধ মাদকতার কৃত্রিম উত্তাপে আপনাকে রাত্রিদিন উত্তেজিত করে তুলছে। খবরের কাগজের যে-ক'টি টুকরো পাঠিয়েছিস প্রত্যেকটিতেই ঐ প্রমাণ দেয়।

সিমলা
২৪ অগস্ট্‌ ১৮৯৩

১১২

কর্মাঠার
শনিবার, ৯ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৩।

গোলাপ ফুলে বাগান একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। একটা শিরীষ ফুলের গাছ আগাগোড়া ফুলে ভরে আছে, গন্ধে ভুর্‌ভুর্‌ করছে। শিরীষ ফুল যেমন চমৎকার দেখতে তেমনি সুন্দর গন্ধ।... টেবিলে আমার সামনে গুটিকতক ফুল জড়ো হয়ে আছে, একেবারে যেন নরম মিষ্টি আদরের মতো, চোখের ঘুমের মতো।... শিরীষ ফুল কালিদাসের প্রিয় ফুল ছিল। কালিদাসের বইয়ে শিরীষ ফুল সৌকুমার্যের তুলনাস্থল ছিল।...

তুই আমাকে পূর্বের একটা চিঠিতে জিজ্ঞাসা করেছিস মানুষের সঙ্গ কেন আমার ভালো লাগে না। একটা কারণ এই বলতে পারি, মন যখন চিন্তা করে কিম্বা ভাব অনুভব করে তখন কিছুতে তার কোনো ব্যাঘাত করলে মনের সেই নিজের ভিতরে বাধাপ্রাপ্ত নিষ্ফল চেষ্টায় ভারী শ্রান্তি উপস্থিত হয়—মানুষের প্রতি মনোযোগ এবং আপনার ভাবনা ভাবা এই দুটো কাজই এক সঙ্গে করার চেষ্টা করতে গিয়ে মনটা যেন তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে। তবে মানুষটি যদি এমন হয় যে সে আর-সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টা দূর করে দিয়ে একমাত্র নিজের দিকেই সমগ্র মনটি আকর্ষণ করে নিতে পারে তা হলে বড়ো আরাম পাওয়া যায়। আসল কথা এই, আমি একাগ্রভাবে কিছুতে নিবিষ্ট না থাকলে কিছুতে সুস্থির হতে পারি নে; যে-সমস্ত জিনিস এ বয়সে আমার সমস্ত মনটা না নেয় তারা আমাকে বড়ো ক্লান্ত করে— যেন মনের সমস্ত ভার রাখবার জায়গা পাওয়া যায় না, মাঝখানে ঝুলতে হয়।... আমাকে চিঠি লিখেছিল— অনুরোধ করেছিল তার সঙ্গে আর-একটু জমিয়ে

বন্ধুত্ব এবং ঘনিয়ে চিঠি-লেখালেখি করতে। আমি তাকে পাকে-প্রকারে লিখেছি যে, আমার শৌখিনভাবের বন্ধুত্ব করবার সময় নেই। এ বয়সে কেবল কাজ করতে হবে, এবং পুরাতন যা-কিছু আছে তাকেই প্রাণের গভীর ভাবে উপভোগ ও আশ্রয় করতে হবে। এখন টুকিটাকির শখ মেটাতে আর প্রবৃত্তি হয় না।

সিমলা
১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩

১১৩

পতিসর
রবিবার ?
১১ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৪।

যে পারে বোট লাগিয়েছি এ পারে খুব নির্জন—গ্রাম নেই, বসতি নেই, চষা মাঠ ধু ধু করছে, নদীর ধারে ধারে খানিকটা করে শুকনো ঘাসের মতো আছে, সেই ঘাসগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে গোটাকতক মোষ চরে বেড়াচ্ছে। আর, আমাদের দুটো হাতি আছে তারাও এ পারে চরতে আসে। তাদের দেখতে বেশ মজা লাগে। একটা পা উঠিয়ে ঘাসের গোড়ায় দু-চারবার একটু একটু ঠোকর মারে, তার পরে শুঁড় দিয়ে টান মারতেই বড়ো বড়ো ঘাসের চাপড়া একেবারে মাটিসুদ্ধ উঠে আসে। সেই চাপড়াগুলো শুঁড়ে করে দুলিয়ে দুলিয়ে ঝাড়ে, তার মাটিগুলো ঝরে ঝরে পড়ে যায়, তার পরে মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে খেয়ে ফেলে। আবার এক-এক সময় খেয়াল যায়, খানিকটা ধুলো শুঁড়ে করে নিয়ে ফুঁ দিয়ে নিজের পেটে পিঠে সর্বাঙ্গে হুস করে ছড়িয়ে দেয়—এই রকম তো হাতির প্রসাধনক্রিয়া। বৃহৎ শরীর, বিপুল বল, শ্রীহীন আয়তন, অত্যন্ত নিরীহ—এই প্রকাণ্ড জন্তুটাকে দেখতে আমার বেশ লাগে। এর এই প্রকাণ্ডত্ব এবং বিশ্রীত্বর জন্যেই যেন এর প্রতি একটা কী বিশেষ স্নেহের উদ্রেক হয়—এর সর্বাঙ্গের অসৌষ্ঠব (awkwardness) থেকে একে একটা মস্ত শিশুর মতো মনে হয়—বেড়াল কুকুর ঘোড়ার চেয়ে যেন এদের প্রতি একটু বেশি মমতার সঞ্চার হয়। তা ছাড়া জন্তুটা বড়ো উদার প্রকৃতির, শিব ভোলানাথের মতো—যখন খ্যাপে তখন খুব খ্যাপে, যখন ঠান্ডা হয় তখন অগাধ শান্তি। আমি এক-একবার ভাবছিলুম হাতির প্রতি আমার মনের এই স্নেহরসার্দ্র ভাব, অনেকটা হয়তো পুরুষজাতির প্রতি মেয়েদের মনের ভাবের মতো। বড়োত্বর সঙ্গে সঙ্গে যে-এক-রকম শ্রীহীনত্ব আছে তাতে অন্তরকে বিমুখ করে না, বরঞ্চ আকর্ষণ করে আনে। আমার ঘরে যে বেঠোভেনের ছবি আছে, অনেক সুন্দর মুখের সঙ্গে তুলনা করলে তাকে দর্শনযোগ্য মনে না হতে পারে, কিন্তু আমি যখন তার দিকে চাই সে আমাকে খুব টেনে নিয়ে যায়—ঐ উস্কোখুস্কো মাথাটার ভিতরে কত বড়ো একটা শব্দহীন শব্দজগৎ! এবং কী একটা অপরিসীম বেদনা রুদ্ধ ঝড়ের মতো ঐ লোকটার ভিতরে ঘূর্ণ্যমান হত। ব...কে দেখলেও আমার ঐ রকমের একটা সসম্ভ্রম করুণার উদয় হয়—ওঁর সমস্ত অপরিচ্ছন্ন অনবধানের মধ্যে একটা অশান্ত অসম্পূর্ণ ক্লিষ্ট প্রতিভা প্রকাশ পায়। সব পুরুষ বেঠোভেন কিম্বা ব... নয়, এবং বেঠোভেন ও ব...কে যে মেয়েরা ভালোবাসে তাও নয়—কিন্তু

ওঁদের মধ্যে আমি খুব একটা সৌন্দর্য দেখতে পাই। সাধারণত পুরুষদের বলের সঙ্গে সঙ্গে একটা অকওয়ার্ড্ অসহায়তা এবং বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহুল পরিমাণে জড়বুদ্ধিত্ব মিশল আছে বলে তাদের প্রতি মেয়েদের মনে কিয়ৎপরিমাণে শ্রদ্ধার সহিত অনেকটা পরিমাণে মাতৃস্নেহের উদ্রেক হয়। আমার বোধ হয় ছেলেরা যত বেশি মাতৃস্নেহ জাগ্রত করতে পারে এমন মেয়েরা নয়। যা হোক্, এ সব কথা অনেকটা আনুমানিক— নিজের প্রকৃতির মধ্যে যে-একটা মেয়েলি অংশ আছে তারই কাছ থেকে যেটুকু আভাস পাওয়া যায়।

কলকাতা। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪

রবীন্দ্রনাথ ১১৩-সংখ্যক পত্রে এবং পরবর্তী বহু পত্রে যুগপৎ বার ও তারিখ লিখিয়াছিলেন; শতাব্দপঞ্জী মিলাইয়া দেখিলে উভয়ের সংগতি দেখা যায় না। রবিবার, শুক্রবার, মঙ্গলবার— যথাক্রমে শনি, বৃহস্পতি, সোম হইলে অমিল হইত না। ১৮৯৪ সনের পরিবর্তে ১৮৯৩ সনের ডায়ারি দেখিলে বারে ও তারিখে আশ্চর্য মিল দেখা যায়— ইহাও বিবেচনার বিষয়।

১১৪

পতিসর
রবিবার?
২৬ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৪।

মাঝে মাঝে মেঘ করছে, মাঝে মাঝে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে— থেকে থেকে হঠাৎ হুহু করে একটা হাওয়া এসে আমার বোটের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচিত্র ক্যাঁ-কোঁৎ শব্দে আর্তনাদ তুলছে— আজ দুপুর বেলাটা এমনি ভাবে চলছে।... এখন বেলা একটা বেজেছে— তোরা যথানিয়মে আহারাদি করে হিসেবপত্র দেখে এতক্ষণ বোধ হয় রুদ্ধদ্বার শয়নালয়ে নিদ্রা দিতে গেছিস। পাড়াগেঁয়ে মধ্যাহ্নের এই হাঁসের ডাক, পাখির ডাক, কাপড় কাচার শব্দ, নৌকো-চলা জলের ছল্ ছল্ ধ্বনি, দূরে গোরুর পাল পার করবার হৈ হৈ রব, এবং আপনার মনের ভিতরকার একটা উদাস আলস্যপূর্ণ স্বগত সংগীতস্বর কলকাতার চৌকি-টেবিল-সমাকীর্ণ বর্ণবৈচিত্র্য-বিহীন নিত্যনৈমিত্তিকতার মধ্যে কল্পনাও করতে পারি নে। কলকাতাটা বড়ো ভদ্র এবং বড়ো ভারী, গবর্মেণ্টের আপিসের মতো। জীবনের প্রত্যেক দিনটাই যেন একই আকারে একই ছাপ নিয়ে টাঁকশাল থেকে তক্‌তকে হয়ে কেটে কেটে বেরিয়ে আসছে— নীরস মৃত দিন, কিন্তু খুব ভদ্র এবং সমান ওজনের। এখানে আমি দলছাড়া, এবং এখানকার প্রত্যেক দিন আমার নিজের দিন— নিত্য-নিয়মিত-দম-দেওয়া কলের সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার আপনার মনের ভাবনাগুলি এবং অখন্ড অবসরটিকে হাতে করে নিয়ে মাঠের মধ্যে বেড়াতে যাই— সময় কিম্বা স্থানের মধ্যে কোনো বাধা নেই। সন্ধেটা জলে স্থলে আকাশে ঘনিয়ে আসতে থাকে, আমি মাথাটা নিচু করে আস্তে আস্তে বেড়াতে থাকি।

কলকাতা
২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪

১১৫

পতিসর
শুক্রবার রাত্রি?
[১৭ মার্চ্ ১৮৯৪]

জ্যোৎস্না প্রতি রাত্রেই অল্প অল্প করে ফুটে উঠছে। আমি তাই আজকাল সন্ধের পরেও অনেক ক্ষণ বাইরে বেড়াই। নদীর এ পারের মাঠে কোথাও কিছু সীমাচিহ্ন নেই, গাছপালা নেই— চষা মাঠে একটি ঘাসও নেই, কেবল নদীর ধারের ঘাসগুলো প্রখর রৌদ্রে শুকিয়ে হলদে হয়ে এসেছে। জ্যোৎস্নায় এই ধু ধু শূন্য মাঠ ভারী অপূর্ব দেখতে হয়— সমুদ্র এই রকম অসীম বলে মনে হয়, কিন্তু তার একটা অবিশ্রাম গতি এবং শব্দ আছে— এই মাটির সমুদ্রের কোথাও কিছু গতি নেই, শব্দ নেই, বৈচিত্র্য নেই, প্রাণ নেই— ভারী একটা উদাস মৃত শূন্যতা— চলবার মধ্যে কেবল এক প্রান্তে আমি একটি প্রাণী চলছি এবং আমার পায়ের কাছে একটি ছায়া চলে বেড়াচ্ছে। বহুদূরের মাঠে এক-এক জায়গায় যেখানে গত শস্যের শুকনো গোড়া কিছু অবশিষ্ট ছিল সেইখানে চাষারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, মাঝে মাঝে কেবল সেই আগুনের শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। এমন একটা প্রকাণ্ড বিস্তারিত প্রাণহীনতার উপর যখন অস্পষ্ট চাঁদের আলো এসে পড়ে তখন যেন একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদশোকের ভাব মনে আসে— যেন একটি মরুময় বৃহৎ গোরের উপরে একটি সাদা-কাপড়-পরা মেয়ে উপুড় হয়ে মুখ ঢেকে মূর্ছিতপ্রায় নিস্তব্ধ পড়ে রয়েছে।

কলকাতা
১৯ মার্চ ১৮৯৪

১১৬

পতিসর
২১ মার্চ্। ১৮৯৪।

এখানকার প্রজাদের উপর বাস্তবিক মনের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে— এদের কোনোরকম কষ্ট দিতে আদবে ইচ্ছে করে না— এদের সরল ছেলেমানুষের মতো অকৃত্রিম স্নেহের আবদার শুনলে বাস্তবিক মনটা আর্দ্র হয়ে ওঠে। যখন তুমি বলতে বলতে তুই বলে ওঠে, যখন আমাকে ধমকায় তখন ভারী মিষ্টি লাগে। এক-এক সময় আমি ওদের কথা শুনে হাসি, তাই দেখে ওরাও হাসে। সেদিন আমি সন্ধের সময় বেড়াচ্ছিলুম একজন প্রজা এসে বললে 'একটু খাড়া হও তুমি'— আমি কিছু আশ্চর্য হয়ে চুপ করে দাঁড়ালুম। সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বুকে মাথায় মেখে বললে, 'আমার জনম সার্থক হল'। সে বললে, তার কাশি এবং জ্বর হয়েছিল, তিন দিন লঙ্ঘন দিয়ে (অর্থাৎ উপবাস করে) ছিল, আজ অন্ন পথ্য করে আমার পদধূলি নিতে এসেছে। তার সরল ভক্তির গুণে আমার পায়ের

ধুলোর যদি কোনো ফল ফলে বলতে পারি নে। ভক্তি ভালোবাসা স্নেহ অযথা পরিমাণে এবং অযোগ্য পাত্রে পড়লেও তার এমন একটি আশ্চর্য সৌন্দর্য আছে— আমার এখানকার প্রজারা সেই পরিপূর্ণ ভক্তির সরলতায় সুন্দর। তাদের রেখাঙ্কিত বৃদ্ধমুখের মধ্যেও একটি শৈশবের সৌকুমার্য আছে। কিন্তু এসব কথা তোকে পূর্বের চিঠিতে অনেকবার বলেছি—অতএব দূর থেকে তোর কাছে এ-সমস্তই পুরাতন পুনরুক্তি মনে হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে প্রতিদিন প্রতিবার নতুন করে ঠেকে। এই প্রাচীন পৃথিবীতে কেবল সৌন্দর্য এবং মানুষের হৃদয়ের জিনিসগুলো কোনোকালেই কিছুতেই পুরোনো হয় না, তাই এই পৃথিবীটা তাজা রয়েছে এবং কবির কবিতা কোনোকালেই একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

কলকাতা। ২২ মার্চ ১৮৯৪

১১৭

পতিসর
বুধবার ?
২২ মার্চ। ১৮৯৪।

‘পশুপ্রীতি’ বলে ব [লু] একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছে, আজ সমস্ত সকাল বেলায় সেইটে নিয়ে পড়েছিলুম। কাল আমি বোটে বসে জানলার বাইরে নদীর দিকে চেয়ে আছি এমন সময় হঠাৎ দেখি—একটা কী পাখি সাঁতরে তাড়াতাড়ি ওপারের দিকে চলে যাচ্ছে আর তার পিছনে মহা ধর্-ধর্ মার্-মার্ রব উঠেছে। শেষকালে দেখি একটি মুরগি—তার আসন্ন মৃত্যুকালে আমার বাবুর্চিখানার নৌকো থেকে হঠাৎ কিরকম ছাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, ঠিক যেই তীরের কাছে গিয়ে পৌঁচেছে অমনি যমদূত মানুষ ক্যাঁক্ করে তার গলা টিপে ধরে আবার নৌকো করে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমি ফটিককে ডেকে বললুম আমার জন্যে আজ মাংস হবে না। এমন সময় ডাকে বলুর ‘পশুপ্রীতি’ লেখাটা এসে পৌঁছল, আমি পেয়ে কিছু আশ্চর্য হলুম। আমার তো আর মাংস খেতে রুচি হয় না [বব্]। আমরা যে কী অন্যায় এবং কী নিষ্ঠুর কাজ করি তা ভেবে দেখি নে বলে মাংস গলাধঃকরণ করতে পারি। পৃথিবীতে অনেক কাজ আছে যার দূষণীয়তা মানুষের স্বহস্তে গড়া—যার ভালোমন্দ অভ্যাসপ্রথা-দেশাচার-লোকাচার-সমাজনিয়মের উপর নির্ভর করে, কিন্তু নিষ্ঠুরতা সে রকম নয়। এটা একেবারে আদিম দোষ—এর মধ্যে কোনো তর্ক নেই, কোনো দ্বিধা নেই ; হৃদয় যদি আমাদের অসাড় না হয়, হৃদয়কে যদি চোখ বেঁধে অন্ধ করে না রেখে দিই তা হলে নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে নিষেধ একেবারে স্পষ্ট শুনতে পাই। অথচ ওটা আমরা হেসে খেলে সকলে মিলে খুব অনায়াসে আনন্দ-সহকারে করে থাকি ; এমন-কি, যে না করে তাকে কিছু অদ্ভুত বলে মনে হয়। পাপপুণ্য সম্বন্ধে মানুষের এমনি একটা কৃত্রিম অপূর্ব ধারণা। আমার বোধ হয় সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সর্ব জীবে দয়া। প্রেম হচ্ছে সমস্ত ধর্মের মূল ভিত্তি। জগতে আমা হতে যেন দুঃখের সৃজন না

হয়ে সুখের বিস্তার হতে থাকে। আমি যেন সকল প্রাণীর সুখ দুঃখ বেদনা বুঝে নিজের স্বার্থের জন্যে কাউকে আঘাত না করি—এই যথার্থ ধর্ম, এই যথার্থ ঈশ্বরচরিত্রের আদর্শে আপনাকে গঠিত করা। সেদিন একটা ইংরিজি কাগজে পড়লুম, পঞ্চাশ হাজার পৌন্‌ড্‌ মাংস ইংলন্‌ড্‌ থেকে আফ্রিকার কোনো-এক সেনানিবাসে পাঠানো হয়েছিল। মাংসটা খারাপ হওয়াতে তারা ফিরে পাঠিয়ে দেয়, তার পরে সেই মাংস পোর্‌ট্‌স্‌মাউথে পাঁচ-ছ শো টাকায় নিলেম হয়ে যায়—ভেবে দেখ্‌ দেখি [বব] জীবের জীবনের কী ভয়ানক অপব্যয় এবং কী অল্প মূল্য! আমরা যখন একটা খানা দিই তখন কত প্রাণী কেবলমাত্র ডিশ-পূরণের জন্যে আত্মবিসর্জন দেয়; হয়তো কেবল ফিরে ফিরে যায়, কেউ নেয় না। যতক্ষণ আমরা অচেতন ভাবে থাকি এবং অচেতন ভাবে হিংসা করি ততক্ষণ আমাদের কেউ দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যখন মনে দয়া উদ্রেক হয় তখন যদি সেই দয়াটাকে গলা টিপে মেরে দশজনের সঙ্গে মিশে হিংস্রভাবে কাজ করে যাই, তা হলেই যথার্থ আপনার সমস্ত সাধুপ্রকৃতিকে অপমান করা হয়। আমি তো মনে করেছি [বব] আরও একবার নিরামিষ খাওয়া ধরে দেখব।...

আমার একটি নির্জনের প্রিয়বন্ধু জুটেছে—আমি লো [কেনে] র ওখেন থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার করে এনেছি—যখনি সময় পাই সেই বইটা উল্টে-পাল্টে দেখি। ঠিক মনে হয় তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা কচ্ছি—এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি। অনেক বই এর চেয়ে ভালো লেখা আছে এবং এ বইয়ের অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু এ বইটি আমার মনের মতো বই। অনেক সময় আসে যখন সব বই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেলে দিতে হয়, কোনো বই ঠিক আরামের বোধ হয় না—যেমন রোগের সময় অনেক সময় বিছানায় ঠিক আরামের অবস্থাটি পাওয়া যায় না, নানা রকমে পাশ ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে, কখনো বালিশের উপর বালিশ চাপাই, কখনো বালিশ ফেলে দিই—সেই রকম মানসিক অবস্থায় আমিয়েলের যেখানেই খুলি সেখানেই মাথাটি ঠিক গিয়ে পড়ে, শরীরটা ঠিক বিশ্রাম পায়। আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু আমিয়েল পশুদের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছে—[বলুর] লেখায় আমি সেইটে সমস্তটা নোট বসিয়ে দিয়েছি। সব-সুদ্ধ [বলুর] এ লেখাটা আমার তেমন ভালো লাগে নি—অনেকটা যেন টেনেটুনে গড়ে পিটে লিখেছে। ঠিক যেন সমস্ত মনের সঙ্গে লেখে নি—ইনিয়ে-বিনিয়ে বানিয়ে-বানিয়ে লিখেছে—সহৃদয়তাপূর্ণ অত্যুক্তিশূন্য সত্যের সরলতার সুর দিচ্ছে না।... বানানো কথা অনেক স্থলে দূষণীয় নয়, কিন্তু এ রকম জিনিস ঠিক খাঁটি না হলে মনটা ভারী বিমুখ ও বিরক্ত হয়ে ওঠে। কাদম্বরীর সেই মৃগয়া-বর্ণনা থেকে অনেকটা আমি [বলুকে] তর্জমা করতে বলে দিয়েছি। পাখিরাও যে কতটা আমাদেরই মতো—একটা জায়গা আছে যেখানে তাতে আমাতে প্রভেদ নেই—পাখির সন্তান-বাৎসল্য প্রাণের মমতা ঠিক আমাদেরই মতো—এইটে বাণভট্ট আপন করুণ কল্পনাশক্তির দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করেছেন—সেই touch of nature makes the whole world kin!

কলকাতা
২৩ মার্চ, ১৮৯৪

১১৮

পতিসর
২৪ মার্চ্। ১৮৯৪।

আজকাল আমার সন্ধ্যাভ্রমণের একমাত্র সঙ্গীটির অভাব হয়েছে, সেটি আর কেউ নয়, আমাদের শুক্লপক্ষের চাঁদ। কাল থেকে আর তাঁর দেখা নেই। ভারী অসুবিধে হয়েছে, শীঘ্রই অন্ধকার হয়ে যায়, যথেষ্ট বেড়াবার পক্ষে একটু ব্যাঘাত জন্মায়।... ... আজকাল ভোরের বেলায় চোখ মেলেই ঠিক আমার খোলা জানলার সামনেই শুকতারা দেখতে পাই, তাকে আমার ভারী মিষ্টি লাগে—সেও আমার দিকে চেয়ে থাকে, ঠিক তোদের কারও একজনের মতো মনে হয়, যেন বহুকালের আমার আপনার লোক। মনে আছে যখন শিলাইদহে কাছারি করে সন্ধেবেলায় নৌকো করে নদী পার হতুম এবং রোজ আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখতে পেতুম, আমার ভারী একটা সান্ত্বনা বোধ হত—ঠিক মনে হত আমার নদীটি যেন আমার ঘর সংসার, এবং আমার সন্ধ্যাতারাটি আমার এই ঘরের গৃহলক্ষ্মী, আমি কখন্ কাছারি থেকে ফিরে আসব এই জন্যে সে উজ্জ্বল হয়ে সেজে বসে আছে। তার কাছ থেকে এমন একটি চোখের দৃষ্টি এমন একটি স্নেহস্পর্শ পেতুম! তখন নদীটি নিস্তব্ধ হয়ে থাকত, বাতাসটি ঠাণ্ডা, কোথাও কিছু শব্দ নেই, ভারী যেন একটা ঘনিষ্ঠতার ভাবে আমার সেই প্রশান্ত সংসারটি পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। আমার সেই শিলাইদহে প্রতি সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ অন্ধকারে নদী পার হওয়াটা খুব সুস্পষ্টরূপে প্রায়ই মনে পড়ে। ভোরের বেলায় প্রথম দৃষ্টিপাতেই শুকতারাটি দেখে, তাকে আমার একটি বহুপরিচিত সহাস্যসহচরী না মনে করে থাকতে পারি নে—সে যেন একটি চিরজাগ্রত কল্যাণকামনার মতো ঠিক আমার নিদ্রিত মুখের উপর প্রফুল্ল স্নেহ বিকিরণ করতে থাকে।...

আজ বেড়িয়ে বোটে ফিরে এসে দেখি বাতির কাছে এত বেশি পতঙ্গের ভিড় হয়েছে যে টেবিলে বসা অসাধ্য। আজ তাই বাতি নিবিয়ে দিয়ে বাইরে কেদারা নিয়ে অন্ধকারে বসেছিলুম—আকাশের সমস্ত জ্যোতির্জগৎ সমস্ত লোকলোকান্তর অনন্ত রহস্যের অন্তঃপুরবাসিনী মেয়ের দলের মতো উপরের তলার খড়্‌খড়ি থেকে আমাকে দেখছিল, আমি তাদের কিছুই জানি নে এবং কোনোকালেই জানতে পাব কিনা তাও জানি নে—অথচ ঐ জ্যোতির্মণ্ডলীর মধ্যে বিচিত্র জীবনের অনন্ত ইতিহাস প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। আজ সন্ধের সময় তোকে আর চিঠি লেখা হয়ে ওঠে নি, তাই এখন লিখছি। এখন কত রাত হবে বল্ দেখি? এগারোটা। এখন বোধ হয় তুই বিছানার মধ্যে অগাধ নিদ্রায় আচ্ছন্ন। যখন চিঠিটা পাবি তখন দিনের বেলাকার প্রখর আলোকে খুবই সজাগ সচঞ্চল, নানান কাজে ব্যস্ত—তখন কোথায় এই সুষুপ্ত নিস্তব্ধ রাত্রি, কোথায় ঐ অনন্ত বিশ্বলোকের জ্যোতির্ময় শব্দহীন বার্তা! এত সুতীব্র প্রভেদ! কিছুতে ঠিক ভাবটি মনে আনা যায় না। মানুষের মনের ক্ষমতা এত সামান্য। যে খুবই পরিচিত, চোখ বুজে তার আকৃতির প্রত্যেক রেখাটি মনে আনা যায় না—এক সময় যা সর্বপ্রধান আর-এক সময় তা যথার্থরূপে স্মৃতিগম্য করাও শক্ত হয়ে ওঠে। দিনের বেলায় রাতকে ভুলি, রাতের বেলায় দিনকে ভুলি। আমার এ চিঠি পড়ে বেশ বুঝতে পারবি এটা অর্ধরাত্রির চিঠি।... ...

চাঁদের খণ্ড অনেক ক্ষণ হল উঠেছে— চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ নিদ্রিত, কেবল গ্রামের গোটা-দুই কুকুর ওপার থেকে ডাকছে, আমার এই বোটে কেবল একটি বাতি জ্বলছে, আর সব জায়গায় আলো নিবেছে। নদীতে একটু গতি মাত্র নেই, তাতেই মনে হয় মাছগুলো রাত্তিরে ঘুমোয়। জলের ধারে সুপ্ত গ্রাম এবং জলের উপর গ্রামের সুপ্ত ছায়া।

কলকাতা
২৫ মার্চ্ ১৮৯৪

১১৯

পতিসর
মঙ্গলবার ?
২৮ মার্চ্। ১৮৯৪।

এ দিকে গরমটাও বেশ পড়েছে। কিন্তু রৌদ্রের উত্তাপটাকে আমি বড়ো একটা গ্রাহ্য করি নে, সে বোধ হয় তুই জানিস। তপ্ত বাতাস ধুলোবালি খড়কুটো উড়িয়ে নিয়ে হুহু শব্দ করে ছুটেছে— প্রায়ই হঠাৎ এক-এক জায়গায় একটা আজগবি ঘূর্ণি বাতাস দাঁড়িয়ে উঠে শুকনো পাতা এবং ধুলোর ওড়না ঘুরিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে নেচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে— সেটা দেখতে বেশ লাগে। নদীর ধারে বাগান থেকে পাখিগুলো ভারী মিষ্টি করে ডাকছে— মনে হচ্ছে ঠিক বসন্তই বটে, খোলা থেকে একেবারে গরম গরম নাবিয়ে এনেছে। কিন্তু গরমটা কিঞ্চিৎপরিমাণে বেশি, আর একটুখানি জুড়িয়ে আনলে বিশেষ ক্ষতি ছিল না। কিন্তু আজ সকাল বেলাটায় হঠাৎ দিব্যি ঠাণ্ডা পড়েছিল— এমন-কি প্রায় শীতকালেরই মতো, স্নান করবার সময় মনে খুব প্রবল উৎসাহ ছিল না। এই প্রকৃতি-নামক একটা বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কখন যে কী হচ্ছে তার হিসেব পাওয়া শক্ত— কোথায় তার কোন্ অজ্ঞাত কোণে কী-একটা কাণ্ড ঘটছে আর অকস্মাৎ চার দিকের সমস্ত ভাবখানা বদলে যাচ্ছে। আমি কাল ভাবছিলুম মানুষের মনখানাও ঠিক ঐ প্রকাণ্ড প্রকৃতির মতো রহস্যময়। চতুর্দিকে শিরা উপশিরা স্নায়ু মস্তিষ্ক মজ্জার ভিতর কী এক অবিশ্রাম ইন্দ্রজাল চলছে— হু হুঃ শব্দে রক্তস্রোত ছুটেছে, স্নায়ুগুলো কাঁপছে, হৃৎপিণ্ড উঠছে পড়ছে, আর এই রহস্যময়ী মানবপ্রকৃতির মধ্যে ঋতুপরিবর্তন হচ্ছে। কোথা থেকে কখন্ কী হাওয়া আসে আমরা কিছুই জানি নে। আজ মনে করলুম জীবনটা দিব্যি চালাতে পারব— বেশ বল আছে, সংসারের দুঃখযন্ত্রণাগুলোকে একেবারে ডিঙিয়ে চলে যাব। এই ভেবে সমস্ত জীবনের প্রোগ্রামটি ছাপিয়ে এনে শক্ত করে বাঁধিয়ে পকেটে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি— কাল দেখি কোন্ অজ্ঞাত রসাতল থেকে আর-একটা হাওয়া দিয়েছে, আকাশের ভাবগতিক সমস্ত বদলে গেছে, তখন আর কিছুতেই মনে হয় না এ দুর্যোগ কোনোকালে কাটিয়ে উঠতে পারব। এ-সব উৎপাত্ত কোন্খানে? কোন্ শিরার মধ্যে স্নায়ুর মধ্যে কী একটা নড়্চড়্ হয়ে গেছে, মাঝের থেকে আমি আমার সমস্ত বলবুদ্ধি নিয়ে আর কুলিয়ে উঠতে পারি নে। নিজের ভিতরকার এই অপার রহস্যের কথা মনে করলে ভারী ভয় হয়— কী করতে পারব না-পারব কিছুই জোর করে বলতে পারি

নে—মনে হয়, কিছুই না জেনে আমি এ কী একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড সর্বদাই স্কন্ধে বহন করে নিয়ে বেড়াই, আয়ত্তও করতে পারি নে, অথচ এর হাতও কিছুতেই এড়াতে পারি নে—জানি নে এ আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, আমিই বা একে কোথায় নিয়ে যাব—আমার স্কন্ধে এই ভয়ংকর রহস্যভারটা যোজনা করে দেবার কী আবশ্যক ছিল! বুকের ভিতর কী হয়, শিরার মধ্যে কী চলছে, মস্তিষ্কের মধ্যে কী নড়ছে, কত কী অসংখ্য কাণ্ড আমাকে অবিশ্রাম আচ্ছন্ন করে ঘটছে, আমি দেখতেও পাচ্ছি নে, আমার সঙ্গে পরামর্শও করছে না, অথচ সব-সুদ্ধ নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কর্তাব্যক্তির মতো মুখ করে মনে করছি আমি একজন আমি! তুমি তো ভারী তুমি—তোমার নিজের কতটুকুই বা জানো তার ঠিক নেই। আমি তো অনেক ভেবেচিন্তে এইটুকু ঠিক করেছি আমি নিজেকে কিছুই জানি নে। আমি একটা সজীব পিয়ানো যন্ত্রের মতো—ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে অনেকগুলো তার এবং কল-বল আছে; কখন কে এসে বাজায় কিছুই জানি নে, কেন বাজে তাও সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত, কেবল কী বাজে সেইটেই জানি—সুখ বাজে কি ব্যথা বাজে, কড়ি বাজে কি কোমল বাজে, তালে বাজে কি বেতালে বাজে এইটুকুই বুঝতে পারি। আর জানি আমার অক্টেভ নিচের দিকেই বা কতদূর উপরের দিকেই বা কতদূর। না, তা'ও কি ঠিক জানি? আমি সিম্‌প্যাথেটিক গ্র্যান্‌ড্‌ পিয়ানো কি কটেজ পিয়ানো সে সম্বন্ধেও ভ্রম হয়।

কলকাতা
২৯ মার্চ ১৮৯৪

১২০

পতিসর
বৃহস্পতিবার?
৩০ মার্চ। ১৮৯৪।

এত অকারণ আশঙ্কা এবং কষ্ট মানুষের অদৃষ্টে থাকে! ছোটো বড়ো এত সহস্র বিষয়ের উপর আমাদের মনের সুখ শান্তি নির্ভর করে! কাল অনর্থক অনেক ক্ষণ পর্যন্ত নিরুপায় ভাবে দুঃখ ভোগ করেছি। অনেক দুঃখ আছে যা আমার নিজকৃত এবং যা সবিনয়ে সহিষ্ণুভাবে বহন করা কর্তব্য মনে হয়; কিন্তু চিঠি না পেয়ে যখন আশঙ্কা হয় যে বুঝি একটা-কিছু বিপদ কিম্বা ব্যামো হয়েছে তখন কষ্টটাকে শান্ত করবার জন্যে হাতের কাছে কোনো ফিলজফিই পাওয়া যায় না। তখন বুদ্ধিটাও একেবারে কাজের বার হয়ে যায়। কাল সমস্ত ক্ষণ বেড়াতে বেড়াতে এমন-সকল অসম্ভব এবং অসংগত কল্পনা মনে উদয় হচ্ছিল এবং বুদ্ধি তার কোনো প্রতিবাদ করছিল না যে, আজ তা স্মরণ করে হাসিও পাচ্ছে লজ্জাও বোধ হচ্ছে। অথচ স্থির নিশ্চয় জানি যে, আসছে বারে যেদিন এই রকম ঘটনা হবে, ঠিক আবার এরই পুনরাবৃত্তি হবে। আমি তো তোকে অনেকবার বলেছি—বুদ্ধিটা মানুষের নিজস্ব জিনিস নয়, ওটা এখনও আমাদের মনের মধ্যে ন্যাচরলাইজ্‌ড্‌ হয়ে যায় নি।...

যখন মনে করি জীবনের পথ সুদীর্ঘ এবং দুঃখকষ্টের কারণ অসংখ্য এবং

অবশ্যম্ভাবী তখন এক-এক সময় মনের বল রক্ষা করা প্রাণপণ কঠিন হয়ে পড়ে। যখন দুদিন কোনো কারণে চিঠি না পেলে এতটা বেশি অধৈর্য উপস্থিত হয় তখন নিজের উপর বিশ্বাস চলে যায়। অনেক সময় সন্ধের সময় একলা বসে বসে টেবিলের বাতির আলোর দিকে দৃষ্টি নিবিষ্ট করে মনে করি জীবনটাকে বীরের মতো অবিচলিত ভাবে নীরবে এবং বিনা অভিযোগে বহন করব— সেই কল্পনায় মনটা উপস্থিতমত অনেকখানি স্ফীত হয়ে ওঠে এবং আপনাকে হাতে হাতে একজন মস্ত বীরপুরুষ বলে ভ্রম হয়। তার পরে পথ চলতে পায়ে যেই কুশের কাঁটাটি ফোটে অমনি যখন লাফিয়ে উঠি তখন ভবিষ্যতের পক্ষে ভারী সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন আবার জীবনটাকে সুদীর্ঘ এবং আপনাকে সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে হয়। কিন্তু সে যুক্তিটা বোধ হয় ঠিক নয়— বাস্তবিক, বোধ হয় কুশের কাঁটায় বেশি অস্থির করে। মনের ভিতরে একটি গোছালো গিন্নিপনা দেখা যায়— সে দরকার বুঝে ব্যয় করে, সামান্য কারণে বলের অপব্যয় করতে চায় না। সে যেন বড়ো বড়ো সংকট এবং আত্মত্যাগের জন্যে আপনার সমস্ত বল কৃপণের মতো সযত্নে সঞ্চয় করে রাখে। ছোটো ছোটো বেদনায় হাজার কান্নাকাটি করলেও তার রীতিমত সাহায্য পাওয়া যায় না। কিন্তু যেখানে দুঃখ গভীরতম সেখানে তার আলস্য নেই। এই জন্যে জীবনে একটা প্যারাডক্স্ প্রায়ই দেখা যায় যে, বড়ো দুঃখের চেয়ে ছোটো দুঃখ যেন বেশি দুঃখকর। তার কারণ, বড়ো দুঃখে হৃদয়ের যেখানটা বিদীর্ণ হয়ে যায় সেইখান থেকেই একটা সান্ত্বনার উৎস উঠতে থাকে, মনের সমস্ত দলবল সমস্ত ধৈর্য এক হয়ে আপনার কাজ করতে থাকে— তখন দুঃখের মাহাত্ম্যের দ্বারাই তার সহ্য করবার বল বেড়ে যায়। মানুষের হৃদয়ে এক দিকে যেমন সুখলাভের ইচ্ছা তেমনি আর-এক দিকে আত্মত্যাগের ইচ্ছাও আছে; সুখের ইচ্ছা যখন নিষ্ফল হয় তখন আত্মত্যাগের ইচ্ছা বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং সেই ইচ্ছার চরিতার্থতা সাধন করবার অবসর পেয়ে মনের ভিতরে একটা উদার উৎসাহ সঞ্চার হয়। ছোটো দুঃখের কাছে আমরা কাপুরুষ, কিন্তু বড়ো দুঃখ আমাদের বীর করে তোলে, আমাদের যথার্থ মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে দেয়। তার ভিতরে একটা সুখ আছে। দুঃখের সুখ বলে একটা কথা অনেক দিন থেকে প্রচলিত আছে, সেটা নিতান্ত বাক্‌চাতুরী নয়— এবং সুখের অসন্তোষ একটা আছে সেও সত্যি। তার মানে বেশি শক্ত নয়। যখন আমরা নিছক সুখভোগ করতে থাকি তখন আমাদের মনের একার্ধ অকৃতার্থ থাকে, তখন একটা কিছুর জন্যে দুঃখভোগ এবং ত্যাগ স্বীকার করতে ইচ্ছে করে, নইলে আপনাকে সুখ-লাভের অযোগ্য বলে মনে হয়— এই কারণেই যে সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত সেই সুখই স্থায়ী এবং সুগভীর, তাতেই যথার্থ আমাদের সমস্ত প্রকৃতির চরিতার্থতা-সাধন হয়।

কিন্তু সুখদুঃখের ফিলজফি ক্রমেই বেড়ে চলতে লাগল। সুন্দররূপে জীবন ধারণ করাটাকে যদি একটা আর্টের মধ্যে গণ্য করতে হয় তা হলে এ ফিলজফির বিশেষ আবশ্যক আছে, কিন্তু চিঠি লেখাটারও একটা আর্ট্ আছে— সেটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা উচিত হয় না। অনেক জিনিস আছে যা নিজের আবশ্যকীয়; সুখ দুঃখ সম্বন্ধে সমস্ত কথা বেশ পাকাপাকি করে বেঁধে নিতে পারলে আমার অনেক সাহায্যে লাগে, সেই জন্যে চিঠি লেখার উপলক্ষ্যে নিজের স্বগত উক্তিকে সুব্যক্ত পরিস্ফুট করে তোলবার ইচ্ছে হয়— কিন্তু সে কাজটা সব সময়ে ঠিক সংগত হয় না।...

কিন্তু এত ঠিকঠাক হিসেব মিলিয়ে আশা করতে গেলে কপালে দুঃখ ঘটবার সম্ভাবনা— অতএব আগামী কল্য চিঠি পাব না এইরকমই স্থির করলুম। কাল না পাই পরশু তো পাবই— কিন্তু ঐ 'পাবই' শব্দের 'ই' অক্ষরটা বড়ো ভালো নয়, ঐ 'ই' অক্ষরটাতেই কাল আমাকে বিশেষ নাকাল করেছে। জীবনের সমস্ত হিসাব থেকে যত্নপূর্বক সাবধানে ঐ 'ই' অক্ষরটা বাদ দেওয়া কর্তব্য— জীবনধারণ-রূপ আর্টের এই একটা প্রধান নিয়ম। ওর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ো শক্ত— একেবারে জোঁকের মতো লেগে থাকে, এবং রক্তও শুষে খায়।

কলকাতা। ৩১ মার্চ ১৮৯৪

১২১

শিলাইদহ
২৪ জুন। ১৮৯৪।

সবে দিন চারেক হল এখানে এসেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কতদিন আছি তার ঠিক নেই— মনে হচ্ছে আজই যদি কলকাতায় যাই তা হলে যেন অনেক বিষয়ে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাব... আমিই কেবল সময়স্রোতের বাইরে একটি জায়গায় স্থির হয়ে আছি, আর সমস্ত জগৎ আমার অজ্ঞাতে একটু একটু করে ঠাঁই বদল করছে। আসলে, কলকাতা থেকে এখানে এলে সময়টা চতুর্গুণ দীর্ঘ হয়ে আসে— কেবল আপনার মনোরাজ্যে বাস করতে হয়, সেখানে ঘড়ি ঠিক চলে না। ভাবের তীব্রতা -অনুসারে মানসিক সময়ের পরিমাপ হয়— কোনো কোনো ক্ষণিক সুখ দুঃখ মনে হয় যেন অনেক ক্ষণ ধরে ভোগ করছি। যেখানে বাইরের লোকপ্রবাহ এবং বাইরের ঘটনা এবং দৈনিক কার্যপরম্পরা আমাদের সর্বদা সময়-গণনায় নিযুক্ত না রাখে সেখানে, স্বপ্নের মতো, ছোটো মুহূর্ত দীর্ঘকালে এবং দীর্ঘকাল ছোটো মুহূর্তে সর্বদাই পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই আমার মনে হয় খণ্ড কাল এবং খণ্ড আকাশ আমাদের মনের ভ্রম। প্রত্যেক পরমাণু অসীম এবং প্রত্যেক মুহূর্তই অনন্ত। এ সম্বন্ধে পারস্য উপন্যাসে খুব ছেলেবেলায় একটা গল্প পড়েছিলুম, সেটা আমার ভারী ভালো লেগেছিল— এবং তখন যদিও খুব ছোটো ছিলুম তবু তার ভিতরকার ভাবটা এক রকম করে বুঝতে পেরেছিলুম। কালের পরিমাণটা যে কিছুই নয় সেইটে দেখাবার জন্যে একজন ফকির একটা টবের মধ্যে মন্ত্রঃপূত জল রেখে বাদশাকে বললে, 'তুমি এর মধ্যে ডুব দিয়ে স্নান করো।' বাদশা ডুব দেবা-মাত্র দেখলে সে এক সমুদ্রের ধারে নতুন দেশে গিয়ে উপস্থিত; সেখানে সে দীর্ঘ জীবন ধরে নানা ঘটনা নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে নানা সুখ দুঃখ অতিবাহন করলে। তার বিয়ে হল, তার একে একে অনেকগুলি ছেলে হল, ছেলেরা মরে গেল, স্ত্রী মরে গেল, টাকাকড়ি সব নষ্ট হয়ে গেল এবং সেই শোকে যখন সে একেবারে অধীর হয়ে পড়েছে এমন সময় হঠাৎ দেখলে সে আপন রাজসভায় জলের টবের মধ্যে। ফকিরের উপর খুব ক্রোধ প্রকাশ করাতে সভা-সদ্‌রা সকলেই বললে, 'মহারাজ, আপনি কেবলমাত্র জলে ডুব দিয়েই মাথা তুলেছেন।'

আমাদের সমস্ত জীবনটা এবং জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ এইরকম এক

মুহূর্তের মধ্যে বদ্ধ— আমরা সেটাকে যতই সুদীর্ঘ এবং যতই সুতীব্র মনে করি, যেমনি সংসারের টব থেকে মাথা তুলব অমনি সমস্তটা মুহূর্তকালের স্বপ্নের মতো ক্ষুদ্র হয়ে যাবে। কালের ছোটো বড়ো কিছুই নেই— আমরাই ছোটো বড়ো। কেবল তোর চিঠি পাওয়ার সময় নির্ণয় করতে গিয়ে যে আমার এত কথা মনে হল তা নয়— থেকে থেকে এই কথাটা আমার মনে হয়, এবং জীবনের তীব্রতম সুখ দুঃখ বাসনাও যে স্থায়ী নয় এ কথার কোনো উত্তর দিতে না পেরে ভারী কষ্ট হয়। এর একটা উত্তর এই যে, সুখ দুঃখ স্থায়ী না হোক তার ফল স্থায়ী হতে পারে। কিন্তু আমাকে ভুলিয়ে আমাকে মিথ্যা ফাঁকি দিয়ে ফলভোগ কেন করাচ্ছে? আমাকে কেন বলছে 'ভালোবাসার ধন চিরকালের'? মানুষকে এমন মিথ্যা আশ্বাস কে দিয়েছে যে প্রেম মৃত্যুর উপরেও জয়লাভ করে, যে মিথ্যা আশ্বাসের প্রলোভনে মানুষ নিজে সাবিত্রী সত্যবানের গল্প রচনা করে নিজে সান্ত্বনা লাভ করছে? ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাল দিনের বেলাটা বেশ ছিল। আমার এই নদীর জলরেখা, বালির চর, এবং ও পারের বনদৃশ্যের উপরে মেঘ এবং রৌদ্রের মুহুর্মুহু নতুন খেলা চলছিল— খোলা জানলার ভিতর দিয়ে যে দিকেই চোখ পড়ছিল এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল! স্বপ্নের মতো! সুন্দরকে কেন যে স্বপ্নের মতো বলে ঠিক জানি নে, বোধ হয় নিছক সৌন্দর্যটা প্রকাশ করবার জন্যে, অর্থাৎ ওর মধ্যে যেন realityর ভারটুকু মাত্র নেই— অর্থাৎ, এই শস্যক্ষেত্র থেকে যে আহার সংগ্রহ করতে হয়, এই নদী দিয়ে যে পাটের নৌকো যাবার রাস্তা, এই চর যে জমিদারের সঙ্গে খাজনা দিয়ে বন্দোবস্ত করে নিতে হয় ইত্যাদি শত সহস্র কথা মন থেকে দূর করে দিয়ে কেবলমাত্র হিসাবহীন আবশ্যকহীন বিশুদ্ধ আনন্দময় সৌন্দর্যের ছবি যখন আমরা উপভোগ করি তখন আমরা সেটাকে স্বপ্নের মতো বলি। অন্য সময়ে আমরা জগৎকে প্রধানত সত্য বলে দেখি, তার পরে তাকে আমরা সুন্দর অথবা অন্যরূপে জানি। কিন্তু যে সময়ে তাকে আমরা প্রধানত সুন্দর হিসাবে দেখি, তার পরে সত্য হোক না-হোক লক্ষ্য করি নে, তখন আমরা তাকে বলি 'স্বপ্নের মতো'।... সত্য এবং সুন্দরকে মানুষ মাঝে মাঝে পৃথক করে নেয়··· science সত্য থেকে সুন্দরকে বাদ দেয় এবং কাব্য সুন্দরকে সত্য-হিসাবে খাতির করে না। scienceএ যে সৌন্দর্য পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে সত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সৌন্দর্য, কাব্যে যে সত্য পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে সৌন্দর্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সত্য। স্থান অল্প বলে তুই এ যাত্রায় অনেক বকুনির হাত থেকে বেঁচে গেলি।

কলকাতা
২৫ জুন ১৮৯৪

১২২

শিলাইদহ
২৬ জুন। ১৮৯৪।

আজ সকালে বিছানা থেকে উঠেই দেখি পাংশুবর্ণ মেঘে আকাশ অন্ধকার এবং অবনত, বাদলার ভিজে হাওয়া দিচ্ছে, টিপ টিপ করে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়ছে,

নদীতে নৌকো বেশি নেই, ধান কাটবার জন্যে কাস্তে হাতে চাষারা মাথায় টোকা পরে গায়ে চট মুড়ি দিয়ে খেয়ানৌকোয় পার হচ্ছে, মাঠে গোরু চরছে না এবং ঘাটে স্নানার্থিনী জনপদবধূদের বাহুল্য নেই—অন্যদিন এতক্ষণ আমি তাদের উচ্চকণ্ঠের কলধ্বনি এ পার থেকে শুনতে পেতুম, আজ সে-সমস্ত কাকলি এবং পাখির গান নীরব। যে দিক থেকে বৃষ্টির ছাঁট আসবার সম্ভাবনা সে দিককার জানলা এবং পর্দা ফেলে দিয়ে অন্য দিককার জানলা খুলে আমি এতক্ষণ কাজের প্রত্যাশায় বসে ছিলুম। অবশেষে ক্রমেই আমার ধারণা হচ্ছে আজ এ বাদলায় আমলারা ঘরের বার হবে না—হায়, আমিও শ্যাম নই, তারাও রাধিকা নয়—বর্ষাভিসারের এমন সুযোগ মাঠে মারা গেল। তা ছাড়া বাঁশি যদি বাজাতুম এবং রাধিকার যদি কিছুমাত্র সুরবোধ থাকত তা হলে বৃকভানুনন্দিনী বিশেষ 'হর্ষিত' হত না। যাই হোক, অবস্থাগতিকে যখন রাধিকাও আসছেন না, আমলারাও আসছেন না এবং আমার 'Muse'ও সম্প্রতি আমাকে পরিত্যাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছেন, তখন বসে বসে একখণ্ড চিঠি লেখা যেতে পারে। আসল, হয়েছে কী, এতক্ষণ কোনো কাজ না থাকাতে নদীর দিকে চেয়ে গুন্ গুন্ স্বরে ভৈরবী টোড়ি রামকেলি মিশিয়ে একটা প্রভাতী রাগিণী সৃজন-পূর্বক আপন-মনে আলাপ করছিলুম, তাতে অকস্মাৎ মনের ভিতরে এমন একটা সুতীব্র অথচ সুমধুর চাঞ্চল্য জেগে উঠল, এমন একটা অনির্বচনীয় ভাবের এবং বাসনার আবেগ উপস্থিত হল, এক মুহূর্তের মধ্যেই আমার এই বাস্তবিক জীবন এবং বাস্তবিক জগৎ আগাগোড়া এমন একটা মূর্তিপরিবর্তন করে দেখা দিলে, অস্তিত্বের সমস্ত দুরূহ সমস্যার এমন একটা সংগীতময় ভাবময় অথচ ভাষাহীন অর্থহীন অনির্দেশ্য উত্তর কানে এসে বাজতে লাগল, এবং সেই সুরের ছিদ্র দিয়ে নদীর উপর জলের তরল পতনশব্দ অবিশ্রাম ধ্বনিত হয়ে এমন একটা পুলক সঞ্চার করতে লাগল—জগতের প্রান্তবর্তী এই সঙ্গীহীন একটিমাত্র প্রাণীকে ঘিরে আষাঢ়ের অশ্রুসজল ঘনঘোর শ্যামল মেঘের মতো 'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা' এমনি স্তরে স্তরে ঘনিয়ে এল যে, হঠাৎ এক সময়ে বলে উঠতে হল যে, 'থাক্, আর কাজ নেই, এইবার Criticisms on Contemporary Thought and Thinkers পড়তে বসা যাক।' কিন্তু বাদলার সকালে একেবারে অতটা-দূর পর্যন্ত বীরত্ব দেখানো আমার মতো দুর্বল লোকের কর্ম নয়। সেই জন্যে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দোয়াত কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসাই স্থির করেছি।

আজকাল আমার নিজের কতবার ইচ্ছে করে যে, কোনোমতে নির্জন নিঃশব্দ খ্যাতিহীনতার মধ্যে ফিরে যাই। নিদেন, আমি যতদিন বেঁচে থাকি আমার জীবনের সমস্ত খ্যাতিকীর্তি কেবল আপনার মধ্যে বদ্ধ থাকে। তা হলে বেশ আরামে থাকতে পারি। অবশ্য, তোদের মানসিক প্রকৃতি-অনুসারে আমার সব লেখা তোদের কাছে ভালো না লাগতে পারে, এমন-কি, অনেক ভালো লেখাও অনাদৃত হতে পারে—কিন্তু তবু আর বাইরে বেরতে ইচ্ছা করে না।

কলকাতা
২৭ জুন ১৮৯৪

১২৩

শিলাইদহ
মঙ্গলবার ?
২৭ জুন। ১৮৯৪।

কাল থেকে হঠাৎ আমার মাথায় একটা হ্যাপি থট এসেছে। আমি চিন্তা করে দেখলুম, পৃথিবীর উপকার করব ইচ্ছা থাকলেও কৃতকার্য হওয়া যায় না, কিন্তু তার বদলে যেটা করতে পারি সেইটে করে ফেললে অনেক সময় আপনি পৃথিবীর উপকার হয়, নিদেন একটা কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছু না করে ছোটো ছোটো গল্প লিখতে বসি তা হলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হলে বোধ হয় পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। সাধনায় উচ্চ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে বঙ্গদেশকে উন্নতিপথে লগি ঠেলে নিয়ে যাওয়া খুব মহৎ কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু সম্প্রতি তাতে আমি তেমন সুখ পাচ্ছি নে এবং পেরেও উঠছি নে। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের বিরহ দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকালবেলায় তাই গিরিবালা-নাম্নী উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানিনী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবেমাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি, এবং সে পাঁচটি লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে, কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ-অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে, হেনকালে পূর্বসঞ্চিত বিন্দু-বিন্দু বারিশীকর -বর্ষী তরুতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের আগমন হল-- তাতে করে সম্প্রতি গিরিবালাকে কিছুক্ষণের জন্যে অপেক্ষা করতে হল। তা হোক, তবু সে মনের মধ্যে আছে। দিনযাপনের আজ আর-এক রকম উপায় পরীক্ষা করে দেখা গেছে। আজ বসে বসে ছেলেবেলাকার স্মৃতি এবং তখনকার মনের ভাব খুব স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ মনে আনবার চেষ্টা করছিলুম। যখন পেনেটির বাগানে ছিলুম, যখন পৈতের নেড়া মাথা নিয়ে বাবামশায়ের সঙ্গে প্রথমবার বোল-পুরের বাগানে গিয়েছিলুম, যখন পশ্চিমের বারান্দার সব-শেষের ঘরে আমাদের ইস্কুল-ঘর ছিল এবং আমি একটা নীল কাগজের ছেঁড়া খাতায় বাঁকা লাইন কেটে বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে প্রকৃতির বর্ণনা লিখতুম--- যখন সেজদাদাদের ঘরে তোষাখানা ছিল এবং চিন্তা বলে একটা চাকর শীতকালের সকালে গুন্ গুন্ স্বরে গান করতে করতে কয়লার আগুনে জ্যোতিদাদার জন্যে মাখন দিয়ে রুটি তোষ করত--- তখন আমাদের গরম কাপড় ছিল না, একখানা কামিজ পরে সেই আগুনের কাছে বসে শীত নিবারণ করতুম এবং সেই সশব্দ-বিগলিত-নবনী-সুগন্ধি রুটিখণ্ডের উপরে লুব্ধদুরাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চুপ করে বসে চিন্তার গান শুনতুম (সে সুরটা এখনও মনে আছে, তাকে মধুকানের সুর বলে)--- সেই-সমস্ত দিনগুলিকে ঠিক বর্তমানের মতো করে দেখছিলুম এবং সেই-সমস্ত দিনগুলির সঙ্গে এই রৌদ্রালোকিত পদ্মা এবং পদ্মার চর ভারী এক রকম সুন্দর-ভাবে মিশ্রিত হচ্ছিল, ঠিক যেন আমার সেই ছেলেবেলাকার খোলা জানলার ধারে

বসে এই পদ্মার একটি দৃশ্যখণ্ড দেখছি বলে মনে হচ্ছিল। তার পরে ভাবলুম আমার হাতে কত ক্ষমতা আছে— আমি ইচ্ছা করলে গল্প লিখতে পারি, ইচ্ছা করলে আপনাকে বর্তমান থেকে অনেক দূর দেশে দূর কালে প্রত্যক্ষবৎ নিয়ে যেতে পারি, আমি কোনো বাস্তবিক সামগ্রী না নিয়েও আপনাকে অনেকটা সুখী করতে পারি। তার পরেই মনে পড়ল, প্রবাদ আছে : nothing succeeds like success। 'টাকায় টাকা আসে', তেমনি সুখে সুখ আনে। আমরা সুখের সময় মনে করি আমাদের সুখী হবার অসীম ক্ষমতা আছে— তার পরে দুঃখের সময় দেখি কোনো ক্ষমতাই কোনো কাজ করছে না, কিছুই হাতের কাছে পাওয়া যায় না, সব কল একেবারেই বিগড়ে গেছে। কাল বোধ হয় একটু কিছু সুখের জিনিস মনের ভিতরে রী রী করে উঠেছিল, তাই সমস্ত কলগুলো একেবারে চলতে আরম্ভ করেছিল— জীবনের অতীত স্মৃতি এবং প্রকৃতির বর্তমান শোভা এক-সঙ্গে সজীব হয়ে উঠেছিল, তাই সকালে আজ জেগে উঠেই মনে হল আমি কবি— আমার ক্ষমতার অন্ত নেই, আমি আমার রচনায় কল্পনায় আনন্দে পৃথিবী প্লাবিত করে দিতে পারি। যতই কবিত্ব থাক্‌, যতই ক্ষমতার গর্ব করি, মানুষ ভয়ানক পরাধীন। পৃথিবীর ভিতর থেকে এই কাঙাল জীবগুলো লম্বা হয়ে খাড়া হয়ে শীর্ণ হয়ে বেড়াচ্ছে— আস্ত স্বর্গ চায়, তার পরে টুকরো-টাকরা যা পায় তাতেই ক্ষুধানিবৃত্তির চেষ্টা করে, অবশেষে ভিক্ষাপ্রসারিত ঊর্ধ্বগামী দেহ ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুকে স্বর্গপ্রাপ্তি বলে রটনা করে। যেটুকু সুখে জীবনের সমস্ত কলগুলো চলে সেইটুকু সুখ যদি চিরকাল ধরে রাখা যায়, তা হলে সমস্ত শক্তি বিকশিত, সমস্ত কাজ সমাধা করে যাওয়া যেতে পারে। আজ গিরিবালা অনাহূত এসে উপস্থিত হয়েছেন, কাল বড়ো আবশ্যকের সময় বোধ হয় তাঁর দোদুল্যমান বেণীর সূচ্যগ্রভাগটুকুও দেখা যাবে না। কিন্তু সে কথা নিয়ে আজ আন্দোলনের আবশ্যক নেই। শ্রীমতী গিরিবালার তিরোধান-সম্ভাবনা থাকে তো থাক্‌— আজ যখন তাঁর শুভাগমন হয়েছে তখন সেটা আনন্দের বিষয় তার আর সন্দেহ নেই।...

তোর এবারকার পত্রে অবগত হওয়া গেল আমার ঘরের ক্ষুদ্রতমটি তাঁর ক্ষুদ্র ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করতে শিখেছেন। আমি সে চিত্র বেশ দেখতে পাচ্ছি: তার সেই নরম নরম মুঠোর আঁচড়ের জন্যে আমার মুখটা নাকটা চোখটা যেন তৃষার্ত হয়ে আছে। সে যেখানে-সেখানে আমাকে মুঠো করে ধরে টল্‌মলে মাথাটা নিয়ে হাম করে খেতে আসত, এবং ক্ষুদে ক্ষুদে আঙুলগুলোর মধ্যে আমার চশমার হারটা জড়িয়ে নিতান্ত নির্বোধ নিশ্চিন্ত গম্ভীর ভাবে গাল ফুলিয়ে চেয়ে থাকত। তার মোটা মোটা ফুলো হাতটা গায়ের উপর এমনি মিষ্টি লাগে!

কলকাতা
২৮ জুন ১৮৯৪

১২৪

শিলাইদহ
[২৮ জুন ১৮৯৪

তবু আমার চিঠির কোনোরকম গোলমাল হলে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়ি। বোধ হয় ওর ভিতরেও খানিকটা নিজের সুখ আছে...নিয়মিত সময়ে আমার বকুনিগুলো তোদের কাছে গিয়ে পৌঁচচ্ছে এইটে কল্পনা করার একটা সুখ আছে। হঠাৎ সেই প্রবাহটা ভেঙে গেলে মনটা ছট্‌ফট্‌ করে ওঠে। আমার বোধ হয় দুঃখ-মাত্রেই ঐ একই কারণে। জীবনের সমস্ত প্রবাহ যে অভিমুখে সহজে ধাবিত হচ্ছে সেখানে বাধা পেলেই আহত হয়ে ফেনিল হয়ে নিজের মধ্যে বিভক্ত হয়ে ক্রন্দন করে ওঠে। নদী যেমন চলতে চলতে আপনার রাস্তা সুগম এবং সুগভীর করে খনন করে ফেলে আমাদের জীবনের শত সহস্র অভ্যাস সেইরকম বারম্বার চলতে চলতে আপনার পথ প্রস্তুত করে রাখে, সেই পথে হঠাৎ বাধা পেলে সে পীড়িত হয়ে পড়ে। আমার বাড়ি, আমার বন্ধু, আমার প্রিয়জন— প্রত্যেকেই আমার জীবনপ্রবাহের চিরপরিচিত সহজ পথ। আমার ইচ্ছা, আমার কল্পনা, আমার কাজ তাদের উপর দিয়ে শত-সহস্র ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। জীবনপ্রবাহের প্রত্যেক পথই যে আমার অভ্যাসরচিত পথ তা না হতেও পারে, স্বাভাবিক পথও আছে। নির্ঝর যেমন উপত্যকার দিকে যায়— উপত্যকা তার নিজের রচিত নয়। তেমনি প্রত্যেক মানুষের জীবননির্ঝরের এক-একটা বিশেষ উপত্যকা আছে— তার সমস্ত শক্তি সমস্ত গতি সেই দিকে ধাবমান হয়— তা যদি না হতে পায়, কোথাও যদি রুদ্ধ হয়ে পড়ে, তা হলে তার সমস্ত গতি, তার শক্তি, তার প্রাণ ব্যর্থ হয়ে পড়ে। তোর গেল চিঠিতে সুখদুঃখের প্রশ্ন তুলেছিস, তাই প্রসঙ্গক্রমে কথাটা বেশি ফলাও হয়ে পড়ছে। জীবনের সমস্ত শক্তির বিকাশ সমস্ত অংশের গতিকেই বলে সুখ এবং চরিতার্থতা। ভালোবাসা বল্‌, ঈশ্বরে ভক্তি বল্‌, পৃথিবীর উপকার বল্‌, নানা লোকে নানা উপায়ে আপনার জীবনকে গতি দেয়; যার যেটা নিকটবর্তী, যার যেটা সহজসাধ্য, যার যেটাতে অধিকাংশ জীবনের পরিতৃপ্তি, সে সেইটেই অবলম্বন করতে চেষ্টা করে— এ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া বৃথা। সুখের উপায় পৃথিবীতে অনেক থাকতে পারে, কিন্তু সব উপায় সকলের কাছে নেই। যে দুর্ভাগ্য কোনো উপায়েই আপনার রুদ্ধ জীবনকে উন্মুক্ত করতে পারলে না তার কানের কাছে নীতিশাস্ত্র আউড়ে কী করব! হিমালয়ের শিখরে গঙ্গোত্রী আছে বলে আমাদের কালীগ্রামের রক্তদহর বিলকে গতি দিতে পারি নে। পৃথিবীতে চিরদুঃখী অনেক আছে, সে কথা অস্বীকার করবার জো নেই। কর্তব্যপালন করলেই সুখ হয় এ কথা নীতিশাস্ত্রের প্রতারণা, যেমন শিশুশিক্ষায় পড়তুম—

লেখাপড়া করে যেই
গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।

এখন জানি লেখাপড়া করেও ট্রাম-গাড়ি চড়বার পয়সা অনেককে চেয়ে চিন্তে নিতে হয়, তেমনি অনেক হতভাগ্যকে সুখ না পেয়েও, এমন-কি দুঃখ পেয়েও কর্তব্য কর্ম করে যেতে হয়। তার পরে অভ্যাসের দ্বারা পথ ক্ষয়ে আসে; দুঃখের পথেও

ক্রমশ অভ্যাসে কিয়ৎপরিমাণে জীবনের সুগম রাস্তা কেটে আসে—প্রতিকূলতার পথেও খানিকটা অভ্যাসের রেখা পড়ে আসে, তার পরে হয়তো সমুদ্রের মধ্যে চরিতার্থতা লাভ না করে সমস্ত জীবন অর্ধপথে মরুভূমির মধ্যে শোষিত হয়ে যেতে পারে। এমন ঢের হয়ে থাকে, এগুলো হচ্ছে fact, এর উপরে মাথা খুঁড়ে মলেও একে মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায় না এবং বেদ পুরাণ কোরান বাইবেল থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখালেও দুঃখ দুঃখই থেকে যাবে। পৃথিবীতে শত শত ফুল কুঁড়ি-অবস্থা থেকে আরম্ভ করে কীটের দংশনে জর্জরীভূত হয়ে কোনো ফল প্রসব না করেই ঝরে পড়ে মাটি হয়ে যায়—কৈফিয়ত জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেওয়া যায় না বলে ঘটনাটা অস্বীকার করবার দরকার দেখি নে। পৃথিবীতে শত শত অকৃতার্থ জীবন পরম দুঃখে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কোথায় তাদের কী সান্ত্বনা আছে জানি নে। মানুষরা আদিমকাল থেকে নানাবিধ সান্ত্বনা রচনা করে আসছে —কতরকম অনুমান কতকরকম কল্পনা স্তূপাকার করে তুলছে তার আর সংখ্যা নেই। আমি একদিন বোটে বসে ভাবছিলুম—মানুষ ভারাক্রান্ত জীব, তার সমস্ত আবশ্যকীয় জিনিসেরই ভার আছে, এমন-কি মনের ভাব প্রকাশ করে বই লিখেছে তাও পার্শেল পোস্টে পাঠাতে মাশুল দিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়—কাপড়চোপড় বাসস্থান আহার প্রভৃতি তার সমস্ত জিনিস শত শত মুটের বোঝা। এইজন্যে এই-সকল ভার রক্ষা করেও কী উপায়ে ভার লাঘব করা যেতে পারে মানুষের এই এক প্রধান চেষ্টা। গাড়ির চাকা একটা মস্ত উপায়; অনেক ভার চাকার উপরে ফেলে সহজে নিয়ে যেতে পারে। জলের উপরে নৌকো এক মস্ত উপায় বেরিয়েছে; বিস্তর ভার অনায়াসে স্রোতের উপর সমর্পণ করে দেশ-বিদেশে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে। আমাদের ধর্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র সমাজ সেইরকম ভারলাঘবের উপায়। অভাব বিচ্ছেদ মৃত্যু মানুষকে দুঃখভারে আক্রান্ত করবেই; এইজন্যে মানুষ আপনার ধর্মমত আপনার সমাজকে এমন করে গড়বার চেষ্টা করছে যাতে সেই ভারকে যথাসম্ভব হাল্কা করে ভাসিয়ে দেওয়া যায়। ভারগুলো যদি নিজের উপর স্থাপন করি তা হলে দুঃসহ হয়, যদি ধর্মের উপর সামাজিক কর্তব্যের উপর স্থাপন করি তা হলে অনেকটা আরাম পাওয়া যায়। কোনো একটা বৃহৎ ideaর গুণ হচ্ছে—বড়ো নদীর মতো তার একটা ভারবহনের এবং ভারচালনের শক্তি আছে; আমরা তার মধ্যে আপনাদের নিক্ষেপ করবামাত্র অনেকটা হাল্কা হয়ে যাই, আমাদের নিজের দুঃখকণ্টককে আর নিজের স্কন্ধে বহন করতে হয় না। যে বিষয়ের অবতারণা করা গেছে এর আর শেষ নাই। অথচ রাত্রি অনেক হয়ে আসছে এবং চিঠিও বাড়ছে। আর, আমার মনে হচ্ছে যে-সব কথার ভালো মীমাংসা নেই সে-সব কথা মানুষ চেপে রাখতেই ভালোবাসে—বেশি খোলসা করে বলতে গেলে শ্রোতার বিরক্তি বোধ হতে পারে।

কলকাতা
২৯ জুন ১৮৯৪

১২৫

শিলাইদহ
শনিবার, ৩০ জুন। ১৮৯৪।

আমি মনে করেছিলুম, সমস্ত গোলমাল একদিনে সেরে ফেলাই ভালো। নির্জনতার একটা প্রোগ্র্যাম ক্রমশই পাকাপাকি বাঁধা হয়ে যায়, তখন তার অখণ্ড সম্পূর্ণতাটুকু মাঝে মাঝে ভাঙতে কিছুতেই ইচ্ছা করে না—কেননা একবার এক দিনের মতোও ভেঙে গেলে আবার তার সূত্রগুলো জুড়ে নেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। বরঞ্চ প্রথম দিনকতক মনটা যখন নূতন নীড়ে আপনার স্থান করে নিতে পারে না বলে উড়ু-উড়ু করতে থাকে তখন বন্ধুসঙ্গ সহ্য হয়। এখন আমি আমার কাজের অবসরগুলি কল্পনা দিয়ে ভরাট করে নিয়েছি—সে জায়গায় হঠাৎ মানুষ এসে পড়লে ভারী একটা গোলোযোগ বেধে যায়। কল্পনা-জীবটি হরিণীর মতো ভীরুস্বভাব: প্রথমটা তাকে পোষ মানিয়ে আপনার করে নিতে কিছু সময় যায়, তার পরে আবার যদি তার বিচরণের স্থানে মানুষ এসে দাঁড়ায় তা হলে কিছুকালের মতো আবার তার দর্শন পাওয়া দুর্ঘট হয়ে ওঠে। সেই জন্যে আমার এই নির্জন রাজ্যে যেখানে আমার শরীরের চেয়ে মন ঢের বেশি জায়গা অধিকার করে থাকে, সেখানে হয় এমন লোক আসুক যে আমার কল্পনার চেয়ে প্রিয়, নয় এমন লোক আসুক যার প্রতি আমার মনোনিবেশ করবার তিলমাত্র আবশ্যক নেই। এর মাঝামাঝি হলেই মুশকিল। আমার এই ক্ষুদ্র নির্জনতাটি আমার মনের work-shopএর মতো, তার নানাবিধ অদৃশ্য যন্ত্রতন্ত্র এবং সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ চার দিকে ছড়ানো রয়েছে—বন্ধু যখন আসেন তখন সেগুলি তাঁর চোখে পড়ে না, কখন্ কোথায় পা ফেলেন তার ঠিক নেই, দিব্যি অজ্ঞানে হাস্যমুখে বিশ্বসংসারের খবর আলোচনা করতে করতে আমার অবসরের-তাঁতে-চড়ানো অনেক সাধনার সূক্ষ্ম সূত্রগুলি পট্ পট্ করে ছিঁড়তে থাকেন—যখন স্টেশনে তাঁকে পেঁাছে দিয়ে পুনর্বার একাকী আমার কর্মশালায় ফিরে আসি তখন দেখতে পাই আমার কত লোকসান হয়েছে। আমি ঠিক কিরকম ভাবে আমার জীবনটিকে রচনা করছি অন্য লোকে তা কী করে বুঝবে! যখন অন্য লোকের সঙ্গে একত্র বাস করা যায় তখন পরস্পর পরস্পরকে রচনা করে থাকি—তখন পরস্পরের জন্যে যথেষ্ট জায়গা রেখে দিই, এমন-কি নিজের জন্যে অতি অল্পই বাকি থাকে। কিন্তু যখন সম্পূর্ণ একলা থাকি—আমার সম্পূর্ণ 'আমি' কারও জন্যে কোনো মার্জিন না রেখে সম্পূর্ণ নিজের রচনা বিস্তার করতে থাকে, অনেকগুলি সূক্ষ্ম সুকুমার জিনিস নির্ভয়ে চারি দিকে বিছিয়ে দেয়—সেগুলি নিয়ে মহা বিপদ।...অনেক কথা, অনেক কাজ, অনেক আলোচনা আছে, যা অন্যের পক্ষে সামান্য এবং জনতার মধ্যে স্বাভাবিক—কিন্তু আমার নির্জন-জীবনের পক্ষে ভারী আঘাতজনক। তার কারণ, নির্জনে আমাদের সমস্ত গোপন অংশ, গভীর অংশ, বিচ্ছিন্ন অংশ সমগ্র হয়ে জেগে ওঠে—সে অনেকটা নিজের মতো, সুতরাং সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত হয়—সে অবস্থায় সে লোকসঙ্গের অনুপযোগী হয়ে ওঠে এবং তার সমস্ত প্রকৃতি একটা ঐক্য লাভ করাতে, যা-কিছু সেই ঐক্য ভেঙে দেয় তাই তাকে আঘাত করে।...বাহ্যপ্রকৃতির একটা মস্ত গুণ এই, সে অগ্রসর হয়ে মনের সঙ্গে কোনো বিরোধ করে না; তার নিজের মন বলে কোনো বালাই না থাকাতে আমার মনটিকে তার সমস্ত স্থান ছেড়ে

দিতে রাজি আছে— সঙ্গীর মতো নিয়ত সঙ্গ দান করে, অনন্ত স্থান অধিকার করে থাকে, অথচ আমার একতিল জায়গা জোড়ে না— নির্বোধের মতো বকে না, সুবুদ্ধির মতো তর্ক করে না, আমার মীরার মতো আকাশের কোলে শুয়ে থাকে, যখন শান্তভাবে থাকে সেও মিষ্টি লাগে, যখন গর্জন করে হাত পা ছুঁড়তে থাকে সেও মিষ্টি লাগে— বিশেষত যখন তার স্নান পান বেশপরিবর্তনের আশ্চর্য সুবন্দোবস্ত আছে, আমার উপরে তার কোনো ভার নেই, তখন সেই ভাষাহীন মনোহীন প্রকাণ্ড পরিপুষ্ট সুন্দর শিশুটি আমার নির্জনের পক্ষে বেশ। ভাষা-পরিপূর্ণ বুদ্ধিমান বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্য লোকালয়েই অত্যন্ত উপাদেয়। এ-সব অসামাজিক কথা প্রকাশ না করাই উচিত, কিন্তু যে ভাবে বলছি সে ভাবটি গ্রহণ করলে ব্যাপারটা তত বেশি দোষাবহ মনে হবে না।

সাতারা
৫ জুলাই ১৮৯৪

১২৬

শিলাইদহ
৫ জুলাই। ১৮৯৪।

নতুনের মতো এমন স্বল্পস্থায়ী জিনিস আর কিছুই নেই। মানুষের হৃদয়টা সৌভাগ্যক্রমে এমন তরল যে প্রায় প্রত্যেক পাত্রেই অল্পকালের মধ্যেই সে আপনাকে মাপে মিলিয়ে নিতে পারে— কেবল কখনো কখনো ছোটো পাত্রে তাকে ধরে না এবং বড়ো পাত্রে তার ঢিলে বোধ হয়। এবং দৈবাৎ দু-চারটে হৃদয় পাওয়া যায় যারা পুরাতনের মধ্যে জমে শক্ত হয়ে যায়— তাদের নূতন পাত্রে পুরতে গেলে ভেঙে ফেলতে হয়।

সাতারা
১০ জুলাই ?
১৮৯৪

১২৭

শিলাইদহ
বৃহস্পতিবার ?
৬ জুলাই। ১৮৯৪।

কাল দুপুরবেলা সবেমাত্র একটুখানি জমিয়ে লিখতে বসেছি, পাঁচ লাইন লিখেছি কি না, এমন সময় মৌলবী এসে উপস্থিত। সে আমাকে লিখতে দেখে প্রথমে আশ্বাস দিলে যে কেবল 'দোঠো কথা' বলে সে চলে যাবে— তার পরে সেই 'দোঠো

কথা' বলতে ঠিক দোঠো ঘণ্টা কাটিয়ে সে যেমন চলে যাচ্ছে অমনি ডাঙা থেকে এক চীৎকারধ্বনি শোনা গেল— 'মহারাজ, আজ এক-সপ্তাহ-কাল দর্শন-প্রার্থী হয়ে আছি, কিন্তু দৌবারিকগণ নিষেধ করছে।' ভাষা শুনেই বোঝা গেল লোকটি যে-সে নন। 'দৌবারিক'কে নিষেধ করতে নিষেধ করলুম। তখন একটি গেরুয়া-বসন ও তিলকধারী দীর্ঘশ্মশ্রু বিরলকেশ উচ্চললাট প্রসন্ন-প্রশান্ত-মূর্তি ব্রাহ্মণ আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে এক মস্ত কাগজ বের করলে। ভাবলুম দরখাস্ত। তার পরে দেখি স্বয়ং সেটি উচ্চস্বরে পড়তে আরম্ভ করে দিলে। প্রথম ছত্র পড়বা-মাত্রই বোঝা গেল সেটি কবিতা। তাতে ব্রাহ্মণ বৈকুণ্ঠনিবাসী হরির গুণগান করছেন। আমি গম্ভীর হয়ে বসে শুনতে লাগলুম। যতক্ষণ হরি বৈকুণ্ঠে ছিলেন ততক্ষণ কবিতা ত্রিপদীতে চলছিল, তার পরে দেখি হরি হঠাৎ 'জগৎসংসারে-খ্যাতা রাজধানী কলিকাতা'য় ঠাকুর উপাধি রক্ষাপূর্বক দ্বারকানাথ হয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন— কবিতাও ত্রিপদী থেকে ক্রমে পয়ারে নেমে এল। পয়ার ক্রমে দেবেন্দ্র-নাথের স্তব সমাধা করে যখন রবীন্দ্রনাথে এসে দাঁড়ালো তখন আমি মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলুম। আমার কবিত্ব আমার বদান্যতা যে বিশ্বজগতে রবিকিরণের মতো বিকীর্ণ হচ্ছে এবং তাতে করে অজ্ঞান এবং দারিদ্র্য-অন্ধকার দূরীভূত হচ্ছে, এ তুলনাটা যতই সুন্দর হোক, এ সংবাদটা আমার কাছে নূতন বলে ঠেকল। আর যাই হোক, বদান্যতার খ্যাতিটা প্রচার হওয়া কিছু না। আমি তাঁকে বলে দিলুম, 'কাছারিতে যাও, আমার অন্য কাজ আছে।' সে লোকটি বললে, 'আপনার কাজ আপনি করে যান আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ আপনার মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করি'— বলে বিস্ময়ের ভঙ্গী ধারণ করে আমার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে অত্যন্ত অবোধ জন্তুর মতো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল; আমার সংকুচিত অন্তরাত্মা সমস্ত শরীরের ভিতর যেন সুড়্‌সুড়্‌ করতে লাগল। তাকে বারম্বার যেতে বললুম। তখন সে বললে, 'কী দিতে ইচ্ছে করেন এই কাগজে লিখে দিন, আমি নায়েব মশায়ের কাছে নিয়ে যাই এবং তাঁকেও শুনিয়ে আসি।' আমি মনে মনে ভাবলুম, আমারও এই ব্যাবসা, আমি কবিতা শুনিয়ে পয়সা পেয়ে থাকি। কিন্তু আমাকেও অনেক দ্বার থেকে রিক্ত হস্তে ফিরে আসতে হয়— ব্রাহ্মণকেও ফিরতে হল। শ্রীহরির চারি হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আছে। শ্রীহরির এই অবতারটি, যে হস্তে গদা কেবল সেই হস্তটা ব্রাহ্মণকে দেখিয়ে বিদায় করে দিলেন। সে বোটের বার হতে না হতে দ্বারী মজুমদার বলে এই বিরাহিমপুরের একটি সুবিখ্যাত বক্তা এসে উপস্থিত। আমি বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করে চৌকিতে হেলান দিয়ে কঠিন প্রস্তরমূর্তির মতো আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম। সে প্রথমে আরম্ভ করে দিলে— 'মহারাজ, পুরাকালে যুধিষ্ঠিরের হিস্টিরিয়া (হিস্ট্রি) পাঠ করে অনেকেই অবিশ্বাস করে থাকেন; তাঁরা বলেন এতদূর কি কখনো সম্ভব হতে পারে, কিন্তু এতকাল পরে আপনাকে চাক্ষুষ দেখে যুধিষ্ঠিরের কীর্তিকলাপের প্রতি তাঁদের সন্দেহভঞ্জন হয়েছে।'— এই রকম ভাবে চলল। আমি যখন তাকে বললুম 'এইবার তুমি কাছারিতে বিশ্রাম করো গে' সে বললে, 'আজ আর আমার বিশ্রাম কিসের! আজ কতদিন পরে হুজুরের দর্শন পেয়েছি, আজ প্রায় সাত আট ন মাস অপেক্ষা করে অবশেষে শ্রীচরণ দেখতে পেলুম— দেখতে যে পাব সে কি আর আশা ছিল!' বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর কম্পিত এবং রুদ্ধ হয়ে এল, বার বার শুষ্ক চক্ষু চাদরে মুছতে লাগল; ক্রমে, তার প্রতি তার পূর্বপ্রভু জ্যোতি-দাদার যে অসীম স্নেহ এবং বিশ্বাস ছিল তাই মনে পড়ে তার চিত্ত উত্তরোত্তর

অধিকতর উদ্‌বেলিত হয়ে উঠতে লাগল।......সে কী কী কাজ করেছিল, কী কী ঘটনা ঘটেছিল, তার মনিবরা কী কী কথা বলেছিল এবং সে তার কী কী উত্তর দিয়েছিল তার কোনোটাই বাদ না দিয়ে সমস্তই আনুপূর্বিক বলে যেতে লাগল। সূর্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা হল; পাখিরা নীড়ে, গাভীরা গোষ্ঠে, চাষারা কুটীরে ফিরে গেল—দ্বারী মজুমদার বোট থেকে নড়ে না। এমন সময় কুস্টিয়া থেকে আর-একটি দর্শনপ্রার্থী যখন এল তখন সে 'কাল প্রাতঃকালে' বাকি কথাগুলো বলতে আসবে বলে আমাকে সান্ত্বনা করে চলে গেল। এখনো সে আসে নি, কিন্তু তারই সমান বক্তা একজন এসে আমার পার্শ্ববর্তী বেঞ্চিতে বসে বক্তৃতার অবসর-প্রতীক্ষায় আছেন।

সাতারা
১১ জুলাই ১৮৯৪

১২৮

সাহাজাদপুর-পথে
শুক্রবার?
[৭ জুলাই ১৮৯৪]

আমি এখন পথে। কাল যখন দুপুরবেলায় বোট ছাড়তে যাচ্ছি একজন আমলা এসে করযোড়ে বললে, 'ধর্মাবতার, আজকে বোট না ছেড়ে কাল সকালবেলায় ছাড়লে ভালো হয়।' আমি তার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বললে, ত্র্যহস্পর্শ পড়েছে, আজ বড়ো অযাত্রা। আমি বললুম, আমি প্রমাণ করে দেব আজ যাত্রা শুভ--আমি নির্বিঘ্নে সাজাদপুরে পৌঁছব। এই বলে গ্রহ তারা তিথির মুখের উপর তুড়ি মেরে বেরিয়ে পড়লুম। পথে স্থানে স্থানে পদ্মার ভয়ানক স্রোত—জল ঘুরে-ঘুরে ফুলে-ফুলে ডাঙার উপর গিয়ে ঠেসে পড়ছে; বোট কিছুতেই এগোতে চায় না, তার সমস্ত পাঁজরা থর্‌থর্ করে কাঁপে, যারা গুণ টানছে তারা সবলে মাটির উপর ঝুঁকে পড়েও প্রায় কিছুতেই পা রাখতে পারে না; আমি ভাবলুম গ্রহ তারা তিথি এইবার বুঝি আমার নাকের উপরে তুড়ি দিচ্ছে। খানিকটা দূর গিয়ে গড়ুই পেরিয়ে যখন আসল পদ্মায় পড়লুম তখন পাল পাওয়া গেল—তখন সগর্বে সবেগে প্রতিকূল স্রোতের বক্ষ বিদীর্ণ করে ঢেউয়ের উপর দিয়ে নাচতে নাচতে চলে যেতে লাগলুম। বিকেলে পাঁচটা-ছটা বেলায় ইছামতী নদীর মধ্যে প্রবেশ করা গেল।...

সন্ধেবেলায় পাবনা শহরের একটি খেয়া ঘাটের কাছে বোট বাঁধা গেল। ও পার থেকে জন-কতক লোক বাঁয়াতবলার সঙ্গে গান গাচ্ছে, একটা মিশ্রিত কলরব কানে এসে প্রবেশ করছে, রাস্তা দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ যারা চলেছে তাদের ব্যস্ত ভাব, গাছ-পালার ভিতর দিয়ে সব দীপালোকিত কোঠাবাড়ি দেখা যাচ্ছে, খেয়াঘাটে ভদ্র অভদ্র নানা শ্রেণীর লোকের ভিড়। আকাশে খুব নিবিড় একটা একরঙা মেঘ, সন্ধ্যাও অন্ধকার হয়ে এসেছে; ও পারে সার-বাঁধা মহাজনি নৌকোয় আলো জ্বলে উঠল, মন্দির থেকে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজতে লাগল—বাতি নিবিয়ে দিয়ে বোটের জানলায় বসে আমার মনে ভারী একটা অপূর্ব ভাবের আবেগ উপস্থিত হল।

অন্ধকারের আবরণের মধ্যে দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল। এই মেঘলা আকাশের নিচে নিবিড় সন্ধ্যার মধ্যে কত লোক, কত ইচ্ছা, কত কাজ, কত গৃহ, গৃহের মধ্যে জীবনের কত রহস্য—মানুষে মানুষে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি কত শত সহস্র প্রকারের ঘাত প্রতিঘাত! বৃহৎ জনতার সমস্ত ভালোমন্দ সমস্ত সুখদুঃখ এক হয়ে তরুলতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্ষানদীর দুই তীর থেকে একটি সকরুণ সুন্দর রাগিণীর মতো আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ করতে লাগল। আমার 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতাটায় বোধ হয় কতকটা এই ভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলুম। কথাটা সংক্ষেপে বোধ হয় এই যে, মানুষ ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী, অথচ ভালোমন্দ এবং সুখদুঃখ-পরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতন সুগভীর কলস্বরে চিরদিন চলছে এবং চলবে—নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই চিরন্তন কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। তখন মানুষের দৈনিক জীবনের ক্ষণিকতা এবং স্বাতন্ত্র্য সেই অবিচ্ছিন্ন সুরের সঙ্গে মিলিয়ে যায়—সব-সুদ্ধ খুব একটা বৃহৎ বিস্তৃত বিষাদপূর্ণ রহস্যময় আদি-অন্ত-শূন্য প্রশ্নোত্তরহীন নিরুদ্দেশ মহাসমুদ্রের একতান শব্দের মতো অন্তরের নিস্তব্ধতার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করতে থাকে। কাল সন্ধ্যাবেলায় আমার মনের ভিতরে যেরকম করছিল সে বোধ হয় বর্ণনাদ্বারা ঠিক বোঝাতে পারব না। এক-এক সময়ে কোথাকার কোন্ ছিদ্র দিয়ে জগতের বড়ো বড়ো প্রবাহ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, তার যে-একটা ধ্বনি হতে থাকে সেটাকে কথায় তর্জমা করা অসাধ্য। সেই জন্যে দেখেছি আমার মনের অনেক সুতীব্র সুগভীর ভাব কবিতায় লেখা হয় নি। হয়তো আমার লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে আভাসের মতো প্রকাশ পেয়ে থাকবে।

সাতারা
১৩ জুলাই ১৮৯৪

১২৯

সাহাজাদপুর-পথে
৭ জুলাই। ১৮৯৪।

The Jew বলে একটা Polish নভেল পড়ে দিন কাটাতে হল। অদৃষ্টক্রমে সে নভেলটা নিতান্তই অপাঠ্য—কেবলমাত্র আরম্ভ করেছিলুম বলে প্রাণপণে শেষ করে ফেললুম। আরম্ভ করেছি বলেই যে শেষ করতে হবে এ কর্তব্যবোধের অর্থ বোঝা শক্ত। ওটা ঠিক কর্তব্যবোধ নয়—লো[কেন] যে বলে আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তির একটা অহংকার আছে সেটা কতকটা ঠিক। তারা কেউ সহজে স্বীকার করতে চায় না আমরা সামান্য বা ক্ষণস্থায়ী বা অল্প বাধাতেই পরাভূত—এই জন্যে অনেক সময়ে তারা নিজেকে ধুইয়ে ধুইয়ে জাগিয়ে রাখে। আমাদের ইচ্ছাশক্তিরও একটা গর্ব আছে—সে একটা জিনিস নিজে আরম্ভ করেছে বলেই অবশেষে নিজের বিরুদ্ধেও সেটা শেষ করতে চায়। সেই একগুঁয়ে অনাবশ্যক অহংকার-বশত একটা বাজে-বকুনি-ভরা অসংলগ্ন প্রকাণ্ড অপাঠ্য গ্রন্থ একটি দীর্ঘ বর্ষাদিনে বদ্ধ ঘরে

বসে শেষ করলুম— শেষ করবার মহৎ সুখ ছাড়া আর কোনো সুখ পেলুম না। লেখবার বাসনা ছিল, কিন্তু অবরুদ্ধ স্যাঁতসেঁতে অবস্থায় লেখা হয় না। আমি ভাবছিলুম, এই সংকীর্ণ বাঁকা ইছামতীর ভিতর দিয়ে আমি যতবার গেছি তোকে রোজ চিঠি লিখেছি— এবারেও লিখছি। আমার মফস্বলের চিঠিগুলো ঠিক সেই একই স্থান, একই দৃশ্য, একই অবস্থার মধ্যে বারম্বার লেখা— সবগুলো মিলিয়ে দেখলে বোধ হয় কতই যে পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায় তার আর সংখ্যা নেই। বোধ হয় কতবার অবিকল একই ভাষা ব্যবহার করেছি। কলকাতায় থাকলে নিত্য নতুন কথা বলা সহজ— কিন্তু পাড়াগাঁয়ে কেবল দুটি মাত্র বিষয় আছে, প্রকৃতি এবং স্বয়ং আমি— এই দুটি বিষয়ই আমার পক্ষে যথেষ্ট আনন্দদায়ক— এবং এই দুটি বিষয়ের মধ্যে বৈচিত্র্যেরও অভাব নেই— কিন্তু মানুষের 'পএণ্ট্ অফ্ ভিয়ু' এবং প্রকাশ করবার ভাষা এবং ক্ষমতা সীমাবদ্ধ— কাজেই সহস্রবার পুনরুক্তি করা ছাড়া আর উপায় নেই। বারম্বার একই কথা শুনে শুনে তোর বোধ হয় আমার মফস্বলের মনের ভাব এবং দৈনিক জীবন এক রকম কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে— তুই বোধ হয় অনায়াসে আমার মফস্বলের চিঠি জাল করে লিখতে পারিস। এবারে যদি বৃষ্টি না হয়ে রৌদ্র হত এবং জানলার কাছে বসে সমস্তদিন নদীতীরের দৃশ্য দেখতে পেতুম, তা হলে নিশ্চয় এই বাঁকা নদী সম্বন্ধে এমন সব কথা লিখতুম যা পূর্বে নিদেন চারবার লিখেছি; এবং মনে করতুম যেন এ-সব কথা এই প্রথম লিখছি। কেবল তাই নয়, মনে হত— ইছামতীর নদীতীর দেখে আমার মনে অনির্বচনীয় ভাবোদ্রেক যেমন আমার কাছে তেমনি তোর কাছে একটা অসামান্য মস্ত খবর— সেটাকে ঠিক যথার্থ ভাবে এবং সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করা, সেটাকে দুর্গম মনোরাজ্য থেকে সমূলে সংগ্রহ করা এবং আদ্যোপান্ত তোর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া একটা প্রাণপণ আবশ্যকীয় কাজ। আজকাল প্রমাণ হয়েছে যারা জাত-লেখক তারা পাগলের রূপান্তর। আমার সেটা অনেকটা ঠিক বোধ হয়। মনের ভাব ব্যক্ত করতে না পারলে দুঃখ অনুভব করা, ওটা একটা পাগলামি মাত্র।

ব[ড়দাদা] তাঁর বক্সোমেট্রি না লিখে থাকতে পারেন না। বী[রেন্দ্র] দেয়ালে দেয়ালে এবং তেতালার প্রত্যেক টবে সূর্য এঁকে তার মাঝখানে লিখে রাখছেন 'সূর্য'— কত ধরে ধরে, কতবার মুছে, কত যত্ন করে যে আঁকেন তার ঠিক নেই। ঐ সূর্যটি ঠিক প্রকাশ করার উপরে তাঁর এবং পৃথিবীর কী সুখ নির্ভর করছে তা অন্তর্যামী জানেন। আমারও সেই একই পাগলামি, কেবল বিষয়ভেদ এবং প্রকারভেদ।

যারা সম্পূর্ণ অথবা বারো-আনা পাগল তারা নিজের পাগলামি বুঝতে পারে না। আমি জানি আমার এক অংশ পাগল— যতই ইচ্ছা করি, চেষ্টা করি, আমি ইহজীবনে কিছুতেই তাকে বাঁধতে পারব না; আমার সহজ অংশ যা প্রতিজ্ঞা করে আমার পাগল তা রক্ষা করে না, ভেঙে দেয়।

সাতারা
১৩ জুলাই ১৮৯৪

১৩০

সাহাজাদপুর
১০ জুলাই। ১৮৯৪।

যারা আমাদের কাছাকাছির লোক এবং যাদের চিরদিন কাছাকাছি রাখতে ভালোবাসি তাদের জীবনের কোনো অংশ দৃষ্টিপথাতীত করতে ইচ্ছে করে না— কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখলে হাসি পায় যে, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা থাকলেও ইহজীবনে দুটো মানুষে কতটুকু অংশ রেখায় রেখায় সংলগ্ন। যাকে দশ বৎসর জানি, সেই দশ বৎসরের কত সুদীর্ঘ অংশ তাকে জানি নে— বোধ হয় আজীবন সম্পর্কের জমা খরচ হিসাব করলে খুব একটা বড়ো রকম অঙ্ক হাতে থাকে না। এই তো কেবল চোখের জানা, তার পরে মনের জানার তো কথাই নেই। সে কথা ভেবে দেখলে সবাইকেই অপরিচিত বলে বোধ হয় এবং তখন বুঝতে পারি আমাদের মধ্যে খুব বেশি পরিচয় হবার কোনো কথা নেই— কেননা আমাদের দুদিন পরে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে হবে, এবং আমাদের পূর্বে কোটি কোটি লোক এই সূর্যালোকে নীলাকাশের নিচে জীবনের পান্থশালায় মিলেছে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে বিস্মৃত হয়ে অপসৃত হয়ে গেছে। এ রকম করে ভেবে দেখলে কোনো কোনো প্রকৃতিতে হয়তো বৈরাগ্যের উদয় হয়, মনে হয় 'তবে আর কেন'— কিন্তু আমার ঠিক উল্টো হয়। আমার আরও বেশি করে দেখতে, বেশি করে জানতে, বেশি করে পেতে ইচ্ছে করে। এক-এক সময় মনে হয়, এই-যে আমরা গুটিকতক সচেতন প্রাণী জড়মহাসমুদ্রের মধ্যে মাথা তুলে বুদ্‌বুদের মতো ভেসে উঠেছি এবং কাছাকাছি এসে ঠেকেছি এ একটা আকস্মিক সংযোগ— এই সংযোগটুকুর মধ্যে যত বিস্ময় যত প্রেম যত আনন্দ তা আবার অনন্তকালের মধ্যে গড়ে উঠবে কি না সন্দেহ। বসন্তরায়ের কবিতায় এক জায়গায় একটা লাইন আছে—

নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।

বাস্তবিক মানুষের এক নিমেষের মধ্যে শত যুগের সংযোগ বিয়োগ ঘটতে পারে। সেই জন্যে নিমেষগুলোকে দুর্মূল্য বলে বোধ হয়। কথাগুলো নতুন নয়, কিন্তু আমার কাছে এক-এক সময় এমন আশ্চর্য নতুন বলে ঠেকে। এবারে চলে আসবার আগে যেদিন একদিন দুপুরবেলায় স... পার্ক স্ট্রীটে এসেছিলেন, তুই পিয়ানোয় বসেছিলি, আমি গান গাবার উদ্যোগ করছিলুম, হঠাৎ তোদের দিকে চেয়ে আমার মনে হল, এই-যে তুই দুপুরবেলায় চুল বেঁধে কাপড় পরে একটি বিশেষ মেঘলা দিনে খোলা জানলার সামনে পিয়ানোর কাছে বসেছিস, আমি-নামক এক ব্যক্তি পিয়ানোর ডালার উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, স... গান শোনবার অপেক্ষা করে বসে আছেন— অনন্তকালের অসীম ঘটনাপরম্পরার মধ্যে এই একটুখানি আশ্চর্য ব্যাপার। মনে হল এর মধ্যে যেটুকু সৌন্দর্য আছে এবং আনন্দ আছে তার আর সীমা নেই, এই-যে মেঘলা আকাশের আলোটুকু আসছে এ এক অসাধারণ লাভ। প্রতিদিনের অভ্যাসের জড়ত্ব হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্যে এক-এক সময়ে কেন যে একটুখানি ছিঁড়ে যায় জানি নে; তখন যেন সদ্যোজাত হৃদয় দিয়ে আপনাকে, সম্মুখবর্তী দৃশ্যকে এবং বর্তমান ঘটনাকে অনন্তকালের চিত্রপটের উপর প্রতিফলিত দেখতে পাই। তখন তোরা যে তোরা এবং আমি যে আমি— এবং আমি যে তোদের চেয়ে দেখছি এবং তোদের কথা শুনছি এবং তোদের আপন

ভাবছি এবং তোরা আমাকে আপন ভাবছিস, অনন্তকালের মাঝখানে এই একটি আশ্চর্য ঘটনা নূতন করে বৃহৎ করে দেখতে পাই। এমন আশ্চর্য ঘটনা আবার কখনও হতে পারবে কি না কে জানে! আমি অনেক সময়েই এক রকম করে জীবনটাকে এবং পৃথিবীটাকে দেখি যাতে করে মনে অপরিসীম বিস্ময়ের উদ্রেক হয়—সে আমি হয়তো আর কাউকে ঠিক বোঝাতে পারব না। সেই জন্যে আমার কাছে অনেক জিনিস এমন বেশি হয়ে ওঠে যা অন্যের কাছে অস্বাভাবিক আতিশয্য বলে মনে হতে পারে। 'সকল-তাতেই বাড়াবাড়ি'। অভ্যাসের একটা গুণ আছে যে, অনেকগুলো জিনিসকে কমিয়ে এনে হাল্কা করে দিয়ে যায়, বর্মের মতো আচ্ছন্ন করে বাইরের অনেকগুলো সংস্পর্শ থেকে মনকে রক্ষা করে, কিন্তু সেই অভ্যাস আমার মনকে সম্পূর্ণ আবৃত করতে পারে না—আমার কাছে পুরাতন প্রতিদিন নূতন করে ঠেকে। সেইজন্যে অন্য লোকের সঙ্গে ক্রমশ আমার মনের perspective আলাদা হয়ে যায়; ভয়ে ভয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয় কে কোন্‌খানে আছি।

সাতারা
১৫ জুলাই ১৮৯৪

১৩১

কলকাতা-পথে
১৩ জুলাই?
১৮৯৪।

ইছামতীর ভিতরে ঢোকা গেল। কী সুন্দর উজ্জ্বল দিনটি হয়েছিল! ছোটো নদীটির দুই ধারের দৃশ্য দেখে চোখ ফেরানো যায় না। আকাশে মেঘ প্রায় নেই—নদীর ধারের বনগুলি এবং গাঢ়সবুজ শস্যক্ষেত্র রৌদ্রে প্রফুল্ল হয়ে রয়েছে, বাতাসটি বেশ মিষ্টি লাগছে—বিছানার উপরে জানলার কাছে গোটা পাঁচ-ছয় বালিশ উঁচু করে রাজার মতো আরামে বসে রইলুম, চোখের উপরে কে যেন স্বপ্ন মাখিয়ে দিয়েছে—জেলেরা মাছ ধরছে, মেয়েরা কাপড় কাচছে, ছেলেরা জলের মধ্যে পড়ে তোলপাড় করছে, গোরুগুলো চরছে, জলমগ্ন ধানের ক্ষেতে বক বসে রয়েছে, সমস্ত ছবির মতো দেখাচ্ছে। কেন যে এমন অত্যন্ত ভালো লাগছিল তা বর্ণনা করে বোঝাবার জো নেই। সুন্দর জিনিসকে যে কারণে স্বপ্নের মতো বলি ঠিক সেই কারণে তাকে ছবির মতো বলি। নইলে কথাটা আসলে একটু অদ্ভুত—জিনিসের মতো ছবি বললে অন্যায় হয় না, কিন্তু ছবির মতো জিনিস বললে এক হিসাবে কথাটা উল্টো হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থটা হচ্ছে এই যে, ছবিতে জিনিসের কেবল একটিমাত্র অংশ আমাদের চোখের সামনে ধরে দেওয়াতে শুদ্ধমাত্র দৃশ্য-সৌন্দর্যের উপভোগটাই আমাদের মনে তীব্র হয়ে ওঠে। আমার বোধ হয় আর্ট্‌মাত্রেরই কাজ হচ্ছে বিশ্বের যেটুকু আমাদের মনোহরণ করে সেইটুকুকে সযত্নে তার অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাদের কাছে অবিমিশ্র উজ্জ্বল করে ধরা। সত্যের উপরিভাগ থেকে সেইটুকু ছেঁকে নেওয়া—সাজিয়ে তোলা আর্টিস্টের

কাজ। সেইজন্যে আমার মনে হয় বিশুদ্ধ আর্ট্ হচ্ছে ছবি এবং গান—সাহিত্য নয়। মানুষের ভাষা, মানুষের তুলি এবং কণ্ঠের চেয়ে ঢের বেশি মুখর বলে সাহিত্যে আমরা অনেক জিনিস মিশিয়ে ফেলি—সৌন্দর্যপ্রকাশের উপলক্ষে খবর দিই, উপদেশ দিই, নানা কথা বলে নিই। যাই হোক, আমরা 'ছবির মতো' 'গানের মতো' 'স্বপ্নের মতো' কথা বার বার ব্যবহার করে থাকি—কিন্তু ওটা কথার কথা নয়। আমরা সত্যের চেয়ে সৌন্দর্য, জ্ঞানের চেয়ে আনন্দ বেশি স্বর্গীয় বলে বোধ করি।—

কিন্তু এ দিকে আমার বোট এগোচ্ছে না। যে বাতাস যমুনায় আমাদের বাধা দিচ্ছিল সেই বাতাস ইছামতীতে আমাদের অনুকূল হতে পারত, সেই ভরসায় এ পথে প্রবেশ করেছিলুম। কিন্তু বাতাসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা সুবুদ্ধির কাজ নয়। পাগলামি উনপঞ্চাশ শ্রেণীতে বিভক্ত করে লোকে তাকে উনপঞ্চাশ বায়ু নাম দিয়েছে। বাস্তবিক পঞ্চভূতের মধ্যে বায়ুতে যে পরিমাণে পাগলামি আছে এমন আর কোনোটাতে নেই।

সাতারা
১৮ জুলাই ?
১৮৯৪

১৩২

কলকাতা
১৫ জুলাই। ১৮৯৪।

স্টীমার যখন ইছামতী থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পদ্মার মধ্যে এসে পড়ল তখন যে কী সুন্দর শোভা দেখেছিলুম সে আর কী বলব। কোথাও কোনো কূল কিনারা দেখা যাচ্ছে না—ঢেউ নেই, সমস্ত প্রশান্ত গম্ভীর পরিপূর্ণ। ইচ্ছা করলে যে এখনই প্রলয় করে দিতে পারে সে যখন সুন্দর প্রসন্ন মূর্তি ধারণ করে, সে যখন তার প্রকাণ্ড প্রবল ক্ষমতাকে সৌম্য মাধুর্যে প্রচ্ছন্ন করে রেখে দেয়, তখন তার সৌন্দর্য এবং মহিমা একত্র মিশে একটি চমৎকার উদার সম্পূর্ণতা ধারণ করে। ক্রমে যখন গোধূলি ঘনীভূত হয়ে চন্দ্র উঠল তখন আমার মুগ্ধ হৃদয়ের মধ্যে সমস্ত তারগুলো যেন বেজে উঠতে লাগল।

সাতারা
১৯ জুলাই ১৮৯৪

১৩৩

কলকাতা
১৬ জুলাই। ১৮৯৪।

সদ্যোনিদ্রোত্থিত তেতালার ঘরে গিয়ে দেখি, আমার কনিষ্ঠ শাবকটি শয়নগৃহের মেজের মাদুরের উপরে পড়ে পড়ে কলরব করবার চেষ্টায় আছে। সেটা প্রায় ঠিক পূর্ব্ববৎই আছে, গাল-দুটো সেইরকম ফুলো-ফুলো, চোখ-দুটো সেইরকম অবুঝভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করছে—ঘাড়ের উপর মাথাটা সেইরকম সর্বদাই টল্‌টল্ ঢল্‌ঢল্ করছে। সব-সুদ্ধ ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি নলিনীদলগত শিশিরবিন্দুর মতো বৃহৎ পৃথিবীটার উপর টলমল করছে। তাকে কোলে তুলে নেওয়া গেল। প্রথমটা খানিক ক্ষণ যেন পূর্বপরিচয়ের স্মৃতি মনে আনবার চেষ্টা করছিল—অল্প একটুখানি থম্‌থমে ভাবে আমাকে কপোলনিমগ্ন দুই চক্ষুর দ্বারা পর্যালোচনা করতে লাগল। মাঝে মাঝে, কোনো বিশেষ কারণ না থাকা সত্ত্বেও, একটু একটু করে স্মিতহাস্য চলছিল। ক্রমে অনতিকাল মধ্যেই খরনখরসুদ্ধ মোটা মোটা নরম নরম করতল দিয়ে নাক মুখ চোখ চুল গোঁফ দাড়ি যা সম্মুখে পড়তে লাগল তাতেই হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে দিলে, কেবল তাই নয়, হুংকারশব্দ-পূর্বক আগ্রহসহকারে নাক চোখ ধরে মুখের মধ্যে পুরে দিতে চেষ্টা করতে লাগল। বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে টল্‌টলে মাথা এবং মোটা মোটা হাত পা দিয়ে খানিকক্ষণ সানন্দে সন্তরণও হল। পরিবর্তনের মধ্যে মনে হল যেন, প বর্গের দুটো-একটা অক্ষর বহুকষ্টে আজকাল উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং চক্ষুতারকায় একটুখানি বুদ্ধিজ্যোতি পরিস্ফুট হয়েছে। নিজের নামের শব্দটা চিনেছে এবং আত্মীয়স্বজনদেরও কতক কতক পরিচয় লাভ করতে পেরেছে। তার গায়ের গন্ধটিও সেইরকম কাঁচা-কাঁচা আছে। কলকাতায় এসে অবধি আমার অধিকাংশ সময় তারই সঙ্গে হাস্যালাপে কেটে যাচ্ছে।

সাতোরা
২০ জুলাই ১৮৯৪

১৩৪

কলকাতা
১৯ জুলাই। ১৮৯৪।

মীরার জন্যে আমার কোনো কাজ হবার জো নেই [বব]।... ... ...সেই ছোটো ব্যক্তিটি বিছানার উপরে চিত হয়ে পড়ে আপনার পা দুখানিকে দুর্লভ সামগ্রীর মতো একবার আকাশে তুলে দিয়ে তার পরে নিজের মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে যখন উচ্চকলস্বরে আঃ বাঃ বাঃ বাঃ শব্দে চীৎকার আরম্ভ করে দেন তখন আমার পক্ষে লেখাপড়া কিম্বা কোনো কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার পাশে এক জায়গায় উপুড় হয়ে পড়ি, সে বিবিধ চঞ্চল ভঙ্গীতে তার বাহু দুটি বিক্ষেপ করে

আমার গোঁফ দাড়ি চুল নাক কান চশমা ঘড়ির-চেন নিয়ে মহা উপদ্রব করতে থাকে, এবং ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে গর্জন করতে আরম্ভ করে। এমনি ভাবে আমার সময় চলে যায়। এক-একদিন রাত্রে শুনতে পাই, সে বিছানায় জেগে উঠে কলরব করতে আরম্ভ করেছে—কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেই একটুখানি হাসি হয়; ভাবটা এই যে, একজন খেলবার সঙ্গী পাওয়া গেল। তার পর অনেক ক্ষণ ধরে আর কিছুতেই ঘুম নেই, উপুড় হয়ে পড়ে বিছানাময় সাঁতরে বেড়াতে থাকে।

সাতারা
২৩ জুলাই ১৮৯৪

১৩৫

কলকাতা
২১ জুলাই। ১৮৯৪।

আমার ভারী ইচ্ছে—আমার ঘরের কাছে একজন কেউ গান বাজনা করবার লোক থাকে। বে [লি] যদি দিশী এবং ইংরাজি সংগীতে বেশ ওস্তাদ হয়ে ওঠে তা হলে আমার অনেকটা সাধ মিটবে। কিন্তু ওস্তাদও হয়ে উঠবে আর আমার ঘর থেকেও অমনি চলে যাবে। সেদিন অ [ভী] যখন গান করছিল আমি ভাবছিলুম মানুষের সুখের উপকরণগুলি যে খুব দুর্লভ তা নয়—পৃথিবীতে মিষ্টিগলার গান নিতান্ত অসম্ভব আইডিয়ালের মধ্যে নয়, অথচ ওতে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা অত্যন্ত গভীর। কিন্তু জিনিসটি যতই সুলভ হোক, ওর জন্যে যথোপযুক্ত অবকাশ করে নেওয়া ভারী শক্ত। যে ইচ্ছাপূর্বক গান গাবে এবং যে ইচ্ছাপূর্বক গান শুনবে পৃথিবীতে কেবল এই দুটি মাত্র লোক নেই, চতুর্দিকে অধিকাংশ লোক আছে যারা গান গাবেও না গান শুনবেও না। তাই সব-সুদ্ধ মিশিয়ে ও আর হয়েই ওঠে না; দিনের পর দিন চলে যায়, অন্তঃকরণটা তৃষিত হয়ে উঠতে থাকে, সংসারটা যেন জীর্ণ অস্থিচর্মসার হয়ে আসে। আমি অনেক সময় ভাবি যে, আমাদের বড়ো বড়ো ইচ্ছাগুলো সফল হয় না বলে আমরা দুঃখ পাই সত্য, কিন্তু আমাদের ছোটো ছোটো ক্ষুধাতৃষ্ণাগুলি দিনে দিনে মুহূর্তে মুহূর্তে অতৃপ্ত থেকে যায় বলে আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের প্রকৃতি ক্রমশ শীর্ণ শুষ্ক হয়ে আসতে থাকে—আমরা সেটাকে সব সময় গণ্য করি নে, কিন্তু পরিমাণে সে জিনিসটি সামান্য নয়। অন্তঃকরণ যখন তার নানা খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে উপবাসী হয়ে থাকে তখন দুঃখভার বহন করা তার পক্ষে বড়ো বেশি দুঃসহ হয়ে পড়ে। আমি জানি, আমার প্রকৃতি সংগীত চায়, শিল্প চায়, সৌন্দর্য চায়, ভাবুক মানুষের সঙ্গ চায়, সাহিত্যের আলোচনা চায়—কিন্তু এ দেশে আমার বৃথা আকাঙ্ক্ষা, বৃথা চেষ্টা। এখানকার লোকেরা বিশ্বাসও করতে পারে না যে, এ জিনিসগুলো কারও পক্ষে অত্যাবশ্যক। আমিও ক্রমে ভুলে যেতে আরম্ভ করি যে, আমার প্রকৃতির প্রায় কোনো শিকড়ই কোনো খাদ্য পাচ্ছে না। শেষকালে হঠাৎ যেদিন কোনো একটা খাদ্য কিছু পরিমাণে জোটে তখন হৃদয়ের তীব্র আগ্রহ

দেখে মনে পড়ে যে, এতদিন আমি উপবাস করে ছিলুম, এ জিনিসটা আমার প্রকৃতির জীবনধারণের পক্ষে আবশ্যক।

সাতারা
২৫ জুলাই ১৮৯৪

১৩৬

কলকাতা
১ অগস্ট্। ১৮৯৪।

শরৎচন্দ্র রায় বলে একজন কে দেখা করতে এসেছিল, আমি দেখা করলুম না। বাঙালির ছেলেকে একবার ঘরের মধ্যে ঢোকালে, বের করে দেওয়া দায় হয়ে ওঠে। কিন্তু বাঙালির মেয়ে মীরাটিও বড়ো কম নন—তিনিও একবার কলরব-সহকারে আমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে আর শীঘ্র বের হন না। আমাকে থাবড়ে থুবড়ে, আমার বুকের উপর নৃত্য করে— আমার দাড়ি গোঁফ, চুলের সিঁথে, লেখবার খাতা, গল্পের প্লট, ভাবের অনুবৃত্তি সমস্ত দুই ক্ষুদ্র হাতে ঘেঁটে নাস্তানাবুদ করে দিয়ে তবে তিনি আমার গৃহ হতে নিঃসৃত হন। আবার মুশকিল এই যে, সে না এলে আমাকে তার কাছে যেতে হয়—পাশের ঘর থেকে সে চেঁচাতে আরম্ভ করে, নিকটবর্তী যার কানে সেই চীৎকারধ্বনি প্রবেশ করতে থাকে সেই উতলা হয়ে কাজকর্ম সমস্ত ফেলে শব্দ-অভিমুখে ছুটতে থাকে—গিয়ে দেখে একটি মোটাসোটা গোলাকার উপুড়মূর্তি প্রকাণ্ড বিছানাটার মাঝখানে পড়ে বালিশ চাপড়াচ্ছে এবং অকারণ আনন্দভরে কল্লোল করছে। অভ্যাগতকে দেখবামাত্রই তৎক্ষণাৎ মুখখানি হাস্যবিকশিত হয়ে ওঠে, কখনো বা যথাসাধ্য হাঁ করে কী একটা অব্যক্ত ভাবকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করে নিরস্ত হয়। অবশেষে তার ক্ষুদ্র দেহটির পাশে আপনার বিপুল দেহটি প্রসারিত করে অনেক ক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গে নিতান্তই অর্থহীন অসম্বদ্ধ মিষ্টালাপ করে তবে আপনার কর্তব্যকার্যে মনোযোগ দিতে পারি। বড়োলোকের সঙ্গে আলাপ করতে গেলে ক্রমে আলাপের বিষয় ফুরিয়ে যায়, সুতরাং শীঘ্র ছুটি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু যে স্থলে কোনো বিষয়মাত্র নেই অথচ আলাপ আছে সেখানে কোথায় থামতে হবে কিছুই ভেবে ঠিক করা যায় না—মীরাতে আমাতে সদাসর্বদা যে-সকল টেট-আ-টেট হয়ে থাকে তার কোনো জায়গায় ভাবের বিরাম পাওয়া যায় না, সুতরাং থামতে গেলে নিতান্তই গায়ের জোরে থামতে হয়।

সাতারা
৫ অগস্ট্ ১৮৯৪

১০৭

কলকাতা
২ অগস্ট্‌। ১৮৯৪।

প্রি [য়] বাবুর সঙ্গে দেখা করে এলে আমার একটা মহৎ উপকার এই হয় যে, সাহিত্যটাকে পৃথিবীর মানব-ইতিহাসের একটা মস্ত জিনিস বলে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই এবং তার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনের যে অনেকখানি যোগ আছে তা অনুভব করতে পারি। তখন আপনার জীবনটাকে রক্ষা করবার এবং আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করবার যোগ্য বলে মনে হয়— তখন আমি কল্পনায় আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা অপূর্ব ছবি দেখতে পাই। দেখি যেন আমার দৈনিক জীবনের সমস্ত ঘটনা সমস্ত শোকদুঃখের মধ্যস্থলে একটি অত্যন্ত নির্জন নিস্তব্ধ জায়গা আছে, সেইখানে আমি নিমগ্নভাবে বসে সমস্ত বিস্মৃত হয়ে আপনার সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত আছি— সুখে আছি। সমস্ত বড়ো চিন্তার মধ্যেই একটি উদার বৈরাগ্য আছে। যখন অ্যাস্ট্রনমি পড়ে নক্ষত্রজগতের সৃষ্টির রহস্যশালার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ানো যায় তখন জীবনের ছোটো ছোটো ভারগুলো কতই লঘু হয়ে যায়! তেমনি আপনাকে যদি একটা বৃহৎ ত্যাগস্বীকার কিম্বা পৃথিবীর একটা বৃহৎ ব্যাপারের সঙ্গে আবদ্ধ করে দেওয়া যায় তা হলে তৎক্ষণাৎ আপনার অস্তিত্বভার অনায়াসে বহনযোগ্য বলে মনে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ভাবের সমীরণ চতুর্দিকে সঞ্চারিত সমীরিত নয়, জীবনের সঙ্গে ভাবের সংস্রব নিতান্তই অল্প, সাহিত্য যে মানবলোকে একটা প্রধান শক্তি তা আমাদের দেশের লোকের সংসর্গে কিছুতেই অনুভব করা যায় না— নিজের মনের আদর্শ অন্য লোকের মধ্যে উপলব্ধি করবার একটা ক্ষুধা চিরদিন থেকে যায়।

সাতারা
৬ অগস্ট্‌ ১৮৯৪

১০৮

শিলাইদহ
৪ অগস্ট্‌। ১৮৯৪।

দৃশ্য পরিবর্তন হয়েছে। কোথায় সেই কলকাতা, সেই তেতালার ছাত, সেই বিশৃঙ্খল খাট পালং চৌকির নিবিড়তার মধ্যে নিয়মিত জীবনযাত্রা, সেই পাশের ঘরে পিয়ানোর স্কেল-প্র্যাক্‌টিস— সেই মীরা, যিনি অতি ক্ষুদ্র হয়েও আমার পক্ষে জগতে অত্যন্ত বৃহৎ স্থান অধিকার করে আছেন! হঠাৎ স্বপ্নের মতো চার দিকের অভ্রভেদী অট্টালিকাগুলি বায়ুতরঙ্গিত শ্যামল ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, চিৎপুরের বড়ো রাস্তাটি প্রশস্ত প্রসারিত তরলকলগীতিময় তরঙ্গিণীরূপে প্রবাহিত, ধূলিপূর্ণ ঘন বাতাস নির্মল স্বচ্ছ হয়ে অবাধ মুক্ত আকাশময় প্রাণহিল্লোল সঞ্চার করে দিচ্ছে— একটি উন্মুক্তবাতায়ন তরণীর মধ্যে একটি ক্যাম্প্‌-টেবিলের

শীর্ষদেশে বেত্রাসনে প্রধান নায়ক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ প্রভাতে পত্রলিখনে নিযুক্ত এবং তাঁহার সম্মুখভাগে অপর বেত্রাসনে তদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত... সাধনার জন্যে গল্পরচনায় একাগ্রমনে প্রবৃত্ত। আজকের দিনের দৃশ্য তো এমনি ভাবে আরম্ভ হয়েছে। এখনি অনতিবিলম্বে নায়েব এবং পেশকারের খাতা এবং বান্ডিলবদ্ধ কাগজপত্র হস্তে প্রবেশ হবে, তার পরে যে ভাবে ডায়ালগ আরম্ভ হবে কোনো মানবনাট্যকারের হাতে ভার থাকলে এমন দৃশ্যে এমন কালে সেরকম ডায়ালগ রচিত হত না এবং হলেও সমালোচকবৃন্দের দ্বারা নিন্দিত হত। কিন্তু যে অদৃষ্ট কবি আমাদের জীবননাট্যকে প্রতিদিন নব নব গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করে পঞ্চম অঙ্কের পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি দেশকালপাত্রের সংগতি, রচনাকৌশল, ঘটনা-সংস্থানের প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র করেন না; তিনি পদ্মাতরঙ্গচঞ্চল সাধের তরণীর মধ্যে আমলার সমাবেশ করেন, নায়ক-নায়িকার আলাপের মধ্যে পদে পদে ব্যাকরণ এবং অলংকার-দোষ ঘটিয়ে থাকেন এবং যদি বা শুভাদৃষ্টক্রমে নায়কের ভাগ্যে অলংকারশাস্ত্রসম্মত কবিত্বপূর্ণ প্রেমপত্রিকা জোটে, তার লেখক পুরুষ হয়ে দাঁড়ায়।

আজ সুন্দর দৃশ্য, সুন্দর আলো এবং সুন্দর বাতাস। ইচ্ছা করছে বেশ মধুরভাবে মগ্ন হয়ে একটা কিছু লিখি বা গুন্ গুন্ করে গান তৈরি করি, কিম্বা বেশ একটি সরল সুন্দর অতিশয়বৈচিত্র্যবিহীন এবং বিশ্লেষণশূন্য গল্পের বই পড়ি—আরামে চৌকিতে হেলান দিয়ে জগৎসংসার বিস্মৃত হয়ে যাই, পড়তে পড়তে চোখের কোণে তীরের শ্যামল রেখা একটু একটু পড়বে এবং কানে জলের তরল কলশব্দ অবিরল প্রবেশ করতে থাকবে। কিন্তু এই-সমস্ত অপেক্ষাকৃত সুলভ সাধও আপাতত পূর্ণ হবার সম্ভাবনা দেখছি নে। কারণ, চিঠি লিখতে লিখতে ইতিমধ্যেই নায়েব ও মৌলবী এসে প্রবেশ করেছেন। নায়েব আমাদের জমিদারি-প্রচলিত হিসাবপত্রের পদ্ধতি শ্রী... বাবুকে বোঝাতে আরম্ভ করেছে; তাই নিয়ে যে জমিদারিক ভাষার আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তার কণামাত্র যদি এই পত্রপ্রান্তে নমুনাস্বরূপ উদ্‌ধৃত করে দিই তা হলে বোধ হয় ইহজন্মে তুই আর আমাকে মার্জনা করবি নে—সেই জন্যে বিরত হলুম।

সাতারা
৯ অগস্ট্‌ ১৮৯৪

১৩৯

শিলাইদহ
৫ অগস্ট্‌। ১৮৯৪।

কাল সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি খুব অজস্র ধারে হয়ে গেছে—আজ ভোরে যখন উঠলুম তখনও অশ্রান্ত বৃষ্টি চলছে এবং চতুর্দিক ম্লান হয়ে আছে। এই মাত্র স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি পশ্চিম দিকে আউশ ধানের ক্ষেতের উপর খুব সজল শ্যামল অবনত মেঘ স্তূপে স্তূপে স্তরে স্তরে জমে রয়েছে এবং পূর্বদক্ষিণ দিকে মেঘ খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে রোদ্দুর ওঠবার চেষ্টা হচ্ছে, রোদ্দুরে বৃষ্টিতে খানিক ক্ষণের জন্যে যেন সন্ধি হয়েছে। যে দিকে ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়ে সকাল

বেলাকার আলো বিচ্ছুরিত হয়ে বেরিয়ে আসছে সে দিকে অপার পদ্মা-দৃশ্যটি বড়ো চমৎকার হয়েছে—জলের রহস্যগর্ভ থেকে একটি ম্লানশুভ্র অলৌকিক জ্যোতিঃপ্রতিমা উদিত হয়ে নীরব মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে আর ডাঙার উপরে কালো মেঘ স্ফীতকেশর সিংহের মতো ভ্রূকুটি করে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে থাবা মেলে দিয়ে চুপ করে বসে আছে, সে যেন একটি সুন্দরী দিব্যশক্তির কাছে হার মেনেছে, কিন্তু এখনও পোষ মানে নি—দিগন্তের একটি কোণে আপনার সমস্ত রাগ এবং অভিমান গুটিয়ে নিয়ে বসে আছে। এখনি আবার বৃষ্টি হবে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, রীতিমত শ্রাবণের বর্ষণের উপক্রম হচ্ছে—সুপ্তোত্থিত সহাস্য জ্যোতীরশ্মি যে মুক্তদ্বারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই দ্বারটি আবার আস্তে আস্তে রুদ্ধ হয়ে আসছে—পদ্মার ঘোলা জলরাশি ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, নদীর এক তীর থেকে আর-এক তীর পর্যন্ত মেঘের সঙ্গে মেঘ আবদ্ধ হয়ে সমস্ত আকাশ অধিকার করে নিয়েছে—খুব নিবিড় রকমের আয়োজনটা হয়েছে।...

এতদিনে আউশধান এবং পাটের ক্ষেত শূন্যপ্রায় হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এবারে দেবতার গতিকে ক্ষেতের সমস্ত শস্য ক্ষেতেই আন্দোলিত হচ্ছে। দেখতে ভারী সুন্দর হয়েছে—বর্ষার আকাশ সজল মেঘে স্নিগ্ধ এবং সমস্ত পৃথিবী হিল্লোলিত সরস শ্যাম শস্যে কোমলা—উপরে একটি গাঢ় রঙ, নিচেও আর-একটি গাঢ় রঙের প্রলেপ—মাটি কোথাও অনাবৃত নয়, মাটির আসল রঙটি কেবল এই মাঝখানে প্রবাহিত ঘোলা নদীর জলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। নদী বিষম ঘোলা। পদ্মা এক-একটি দেশ প্রদেশ বহন করে নিয়ে চলেছে: ওর জলের মধ্যে কত জমিদারের জমিদারি গুলিয়ে রয়েছে। পদ্মা ভীষণ কৌতুকে এক রাজার রাজ্য হরণ করে আপন গেরুয়া আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে অন্য রাজার দরজায় রাতারাতি থুয়ে আসছে—শেষে প্রাতঃকালে রাজায় রাজায় মহা লাঠালাঠি বেধে যাচ্ছে।

সাতারা
১০ অগস্ট ১৮৯৪

১৪০

শিলাইদহ
৮ অগস্ট। ১৮৯৪।

আজ সমস্ত দিন ...বাবু নেই, আজ সমস্ত দিন নদীর কল্লোল শোনা গেছে। কোনো অসংলগ্ন প্রশ্নের অনাবশ্যক উত্তর দিতে হয় নি। একটিমাত্র মানুষ কেবলমাত্র সামনে উপস্থিত থাকলেই প্রকৃতির অর্ধেক কথা কানে আসে না। আমি দেখেছি থেকে থেকে টুকরো-টুকরো কথাবার্তা কওয়ার চেয়ে মানসিক শক্তির অপব্যয় আর কিছুতে হয় না। যদি কোনো একটা সৃজনে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে বুদ্ধিশক্তি কল্পনাশক্তি তাজা রাখা আবশ্যক হয় তা হলে অনেক ক্ষণ সম্পূর্ণ নীরব থাকা আবশ্যক। নিজের কথার দ্বারা মন নিজে ভারী উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। দিনের পর দিন কথা না কয়ে কাটছে এমন অভিজ্ঞতা তোদের বোধ হয় কখনও হয় নি। যদি হত তা হলে বুঝতে পারতিস সেই অবস্থায় আপনার চতুর্দিক্‌কে গ্রহণ করবার এবং উপভোগ করবার ক্ষমতা আশ্চর্য বেড়ে ওঠে—তখন হঠাৎ টের পাওয়া যায়

আমাদের চতুর্দিক্ই কথা কচ্ছে, কেবল যদি কিছু ক্ষণের জন্যে আমাদের অন্তহীন বক্‌বক্‌ থামে তা হলেই সেই-সমস্ত বিচিত্র ভাষা আমাদের কানে আসে। আজ নদীর কলধ্বনির প্রত্যেক তরল লকার আমার সর্বাঙ্গে যেন কোমল আদর বর্ষণ করছে— আমার মনটি আজ অত্যন্ত নির্জন এবং সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, মেঘমুক্ত আলোক-পূর্ণ শস্যহিল্লোলিত জলকল্লোলিত উদার চতুর্দিকের সঙ্গে মুখোমুখি বিশ্রব্ধ প্রীতিসম্মিলনের উপযুক্ত একটি নীরব গোপনতা আমার মধ্যে স্থিরভাবে বিরাজ করছে— আমি জানি আজ সন্ধের সময় যখন কেদারা টেনে বোটের ছাতের উপর একলাটি বসব তখন আমার আকাশে আমার সেই সন্ধ্যাতারাটি ঘরের লোকের মতো দেখা দেবে! আমার এই পদ্মার উপরকার সন্ধ্যাটি আমার অনেক দিনের পরিচিত —আমি শীতের সময় যখন এখানে আসতুম এবং কাছারি থেকে ফিরতে অনেক দেরি হত, আমার বোট ও পারে বালির চরের কাছে বাঁধা থাকত, ছোটো জেলেডিঙি চড়ে নিস্তব্ধ নদীটি পার হতুম, তখন এই সন্ধ্যাটি সুগম্ভীর অথচ সুপ্রসন্ন মুখে আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকত; আমার জন্যে একটি শান্তি, একটি কল্যাণ, একটি বিশ্রাম সমস্ত আকাশময় প্রস্তুত থাকত; সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তরঙ্গ পদ্মার উপরকার নিস্তব্ধতা এবং অন্ধকার ঠিক যেন নিতান্ত আমার অন্তঃপুরের ঘরের মতো বোধ হত। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সেই আমার একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক, সেই একটি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা আছে— যা ঠিক আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। সেটা যে কতখানি সত্য তা বললেও কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না। জীবনের যে গভীরতম অংশ সর্বদা মৌন এবং সর্বদা গোপন— সেই অংশটি আস্তে আস্তে বের হয়ে এসে এখানকার অনাবৃত সন্ধ্যা এবং অনাবৃত মধ্যাহ্নের মধ্যে নীরবে এবং নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে বেড়িয়েছে। এখানকার দিনগুলি তার সেই অনেক কালের পদচিহ্ন-দ্বারা যেন অঙ্কিত।

আমাদের দুটো জীবন আছে— একটা মনুষ্যলোকে আর-একটা ভাবলোকে। সেই ভাবলোকের জীবনবৃত্তান্তের অনেকগুলি পৃষ্ঠা আমি এই পদ্মার উপরকার আকাশে লিখে গেছি। যখনি আসি এবং যখনি একলা হতে পাই, তখনি সেগুলি চোখে পড়ে। এখানে যখন আসি তখন বেশ বুঝতে পারি— আমার কবিতায় আমি কিছুই লিখতে পারি নি। যা অনুভব করি তা ব্যক্ত করতে পারি নে। কারণ, ভাষা তো কেবল আমার একলার নয়— ভাষা সাধারণের ব্যবহারের জন্যে, আমি আমার সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে যা অনুভব করি সাধারণে তা করে না এবং সাধারণের ভাষাও সে সম্বন্ধে কোনো কথা স্পষ্ট করে বলতে চায় না।

সাতারা
১৩ অগস্ট্‌ ১৮৯৪

১৪১

শিলাইদহ
৯ অগস্ট্‌?। ১৮৯৪।

নদী একেবারে কানায় কানায় ভরে এসেছে। ও পারটা প্রায় দেখা যায় না। জল এক-এক জায়গায় টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে, আবার এক-এক জায়গায় কে যেন অস্থির

জলকে দুই হাত দিয়ে চেপে চেপে সমান করে মেলে দিয়ে যাচ্ছে। আজকাল প্রায়ই দেখতে পাই ছোটো ছোটো মৃত পাখি স্রোতে ভেসে আসছে— তাদের মৃত্যুর ইতিহাস বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। কোন্-এক গ্রামের ধারের আমবাগানের আম্রশাখায় তাদের বাসা ছিল। তারা সন্ধের সময় বাসায় ফিরে এসে পরস্পরের নরম নরম গরম ডানাগুলি একত্র করে শ্রান্ত দেহে ঘুমিয়ে ছিল; হঠাৎ রাত্রে পদ্মা একটুখানি পাশ ফিরেছেন, অমনি গাছের নিচেকার মাটি ধসে পড়ে গেছে, গাছ তার সমস্ত ব্যাকুল প্রসারিত শিকড়গুলো নিয়ে জলে পড়ে গেছে, নীড়চ্যুত পাখিগুলি হঠাৎ রাত্রে এক মুহূর্তের জন্যে জেগে উঠল— তার পরে আর জাগতে হল না। এই ভাসমান মৃত পাখিগুলিকে দেখলে হঠাৎ মনের মধ্যে ভারী একটা আঘাত লাগে। বুঝতে পারি আমরা যে প্রাণকে সব চেয়ে ভালোবাসি প্রকৃতির কাছে তার মূল্য যৎসামান্য। আমি দেখেছি আমি যখন মফস্বলে থাকি তখন পশুপক্ষী জীবজন্তু আমার ভারী নিকটবর্তী হয়ে আসে— আপনাকে তাদের চেয়ে খুব বেশি স্বতন্ত্র কিম্বা উঁচুদরের মনে হয় না। একটি বৃহৎ সর্বগ্রাসী রহস্যময়ী প্রকৃতির কাছে আমার সঙ্গে অন্য জীবের প্রভেদ অকিঞ্চিৎকর সামান্য বলে উপলব্ধি হয়। এই পাখিগুলি যে অবহেলায় মরেছে এবং অবহেলায় ভেসে চলেছে সে আমার মৃত্যুর চেয়ে কম শোচনীয় বলে মনে হয় না। শহরে মনুষ্যসমাজ এত জটিল এবং মনুষ্যকীর্তি এত জাজ্বল্যমান যে, মানুষ সেখানে অত্যন্ত প্রধান হয়ে ওঠে— সে সেখানে নিষ্ঠুর-ভাবে আপনার সুখদুঃখের কাছে অন্য কোনো প্রাণীর সুখদুঃখ গণনার মধ্যেই আনে না। য়ুরোপেও মানুষ এত জটিল এবং এত প্রধান যে তারা জন্তুদের বড়ো বেশি জন্তু মনে করে। ভারতবর্ষীয়েরা জন্মক্রমে মানুষ থেকে জন্তু এবং জন্তু থেকে মানুষ হওয়া কিছুই মনে করে না— কীটপতঙ্গ পর্যন্ত প্রাণী মাত্রেরই একটা সমশ্রেণিতা আছে, সেটা তারা খুব অনুভব করে— এই জন্যে আমাদের শাস্ত্রে সর্বভূতে দয়াটা একটা অসম্ভব আতিশয্য বলে পরিত্যক্ত হয় নি। মফস্বলের উদার প্রকৃতির মাঝখানে এলে, তার সঙ্গে দেহে দেহে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হলে আমার সেই ভারতবর্ষীয় স্বভাবটি জাগ্রত হয়ে ওঠে— আমি জীবজন্তুর সুখদুঃখের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি। সামান্য ক্ষুধানিবারণের জন্যে পাখির মাংস খেতে গেলে, আমার নিজের শাবকদের কথা মনে পড়ে। একটি পাখির সুকোমল পালকে আবৃত স্পন্দমান ক্ষুদ্র বক্ষটুকুর মধ্যে জীবনের আনন্দ যে কত প্রবল তা আর আমি অচেতন ভাবে ভুলে থাকতে পারি নে। সেইজন্যে প্রতিবারেই মফস্বলে এসে মাংস খাওয়ার প্রতি আমার আন্তরিক ধিক্কার জন্মে, আবার কলকাতায় জনসমাজের মধ্যে গিয়ে মাংসাশী হয়ে উঠি। সেখানে মানুষ ছাড়া সমস্ত সজীব প্রাণী জড়ের সমান হয়ে আসে। পাড়াগাঁয়ে আমি ভারতবাসী হই, আর কলকাতায় গিয়ে আমি য়ুরোপীয় হয়ে যাই। কোন্‌টা আমার যথার্থ প্রকৃতি কে জানে?

সাতারা
১৪ অগস্ট্ ১৮৯৪

১৪২

শিলাইদহ
১০ অগস্ট্। ১৮৯৪।

কাল খানিক রাত্রে জলের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। নদীর মধ্যে হঠাৎ একটা তুমুল কল্লোল এবং প্রবল চঞ্চলতা উপস্থিত হয়েছে। বোধ হয় অকস্মাৎ একটা নতুন জলের স্রোত এসে পড়েছে। রোজই প্রায় এই রকম ব্যাপার ঘটছে। বসে আছি আছি হঠাৎ দেখতে পাই নদী ছল্‌ছল্‌ কল্‌কল্‌ করে জেগে উঠেছে আর সব-সুদ্ধ খুব একটা ধুমধাম পড়ে গেছে। বোটের তক্তার উপর পা রাখলে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় তার নিচে দিয়ে কত রকমের বিচিত্র গতি অবিশ্রাম চলছে—খানিকটা কাঁপছে, খানিকটা টলছে, খানিকটা ফুলছে, খানিকটা আছাড় খেয়ে পড়ছে। ঠিক যেন আমি সমস্ত দেশের নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করছি। কাল অর্ধেক রাত্রে হঠাৎ একটা চঞ্চল উচ্ছ্বাস এসে নাড়ীর নৃত্য অত্যন্ত বেড়ে উঠেছিল। আমি অনেক ক্ষণ জানলার ধারে বেঞ্চের উপর বসে রইলুম। খুব এক রকম ঝাপসা আলো ছিল, তাতে করে সমস্ত উতলা নদীকে আরও যেন পাগলের মতো দেখাচ্ছিল। আকাশে মাঝে মাঝে মেঘ। একটা খুব জ্বল্‌জ্বলে মস্ত তারার ছায়া দীর্ঘতর হয়ে জলের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত একটা জ্বালাময় বিদ্ধ বেদনার মতো থরথর করে কাঁপছিল। নদীর দুই তীর অস্পষ্ট আলোকে এবং গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন অচেতন। মাঝখান দিয়ে একটা নিদ্রাহীন উন্মত্ত অধীরতা ভরপুর বেগে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে চলেছে। অর্ধেক রাত্রে ঐ রকম দৃশ্যের মধ্যে জেগে উঠে বসে থাকলে আপনাকে এবং জগৎকে কী-এক নতুন রকমের মনে হয়—দিনের বেলাকার লোকসংসর্গের জগৎটা সম্পূর্ণ মিথ্যা হয়ে যায়। আবার আজ সকালে উঠে, আমার সেই গভীর রাত্রের জগৎ স্বপ্নের মতো কত দূরবর্তী এবং লঘু হয়ে গেছে। মানুষের পক্ষে দুটোই সত্য, অথচ দুটোই বিষম স্বতন্ত্র। আমার মনে হয়, দিনের জগৎটা য়ুরোপীয় সংগীত, সুরে-বেসুরে খণ্ডে-অংশে মিলে একটা গতিশীল প্রকাণ্ড হার্মনির জটলা—আর রাত্রের জগৎটা আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত, একটি বিশুদ্ধ করুণ গম্ভীর অমিশ্র রাগিণী। দুটোই আমাদের বিচলিত করে, অথচ দুটোই পরস্পরবিরোধী। কী করা যাবে—প্রকৃতির গোড়ায় একটা দ্বিধা একটা মস্ত বিরোধ আছে, রাজা এবং রানীর মধ্যে সমস্ত বিভক্ত। দিন এবং রাত্রি, বিচিত্র এবং অখণ্ড, পরিব্যক্ত এবং অনাদি। আমরা ভারতবর্ষীয়েরা সেই রাত্রির রাজত্বে থাকি। আমরা অখণ্ড অনাদির দ্বারা অভিভূত। আমাদের নির্জন এককের গান, য়ুরোপের সজন লোকালয়ের গান। আমাদের গানে শ্রোতাকে মনুষ্যের প্রতিদিনের সুখদুঃখের সীমা থেকে বের করে নিয়ে নিখিলের মূলে যে-একটি সঙ্গীহীন বৈরাগ্যের দেশ আছে সেইখানে নিয়ে যায়, আর য়ুরোপের সংগীত মনুষ্যের সুখদুঃখের অনন্ত উত্থান-পতনের মধ্যে বিচিত্রভাবে নৃত্য করিয়ে নিয়ে চলে।

সাতারা
১৫ অগস্ট্ ১৮৯৪

১৪৩

শিলাইদহ
১২ অগস্ট্। ১৮৯৪।

গেটের জীবনীটা তোর ভাল লাগছে? একটা তুই লক্ষ্য করে দেখে থাকবি— গেটে যদিও এক হিসাবে খুব নির্লিপ্ত প্রকৃতির লোক ছিল, তবু সে মানুষের সংস্রব পেত, মানুষের মধ্যে মগ্ন ছিল। সে যে রাজসভায় থাকত সেখানে সাহিত্যের জীবন্ত আদর ছিল, জর্মনিতে তখন খুব একটা ভাবের মন্থন আরম্ভ হয়েছিল— হের্ডের শ্লেগেল হুম্বোল্‌ট্‌ শিলার কাণ্ট্‌ প্রভৃতি বড়ো বড়ো চিন্তাশীল এবং ভাবুকগণ দেশের চারি দিকে জেগে উঠছিল, তখনকার মানুষের সংসর্গ এবং দেশব্যাপী ভাবের আন্দোলন খুব প্রাণপরিপূর্ণ ছিল। আমরা হতভাগ্য বাঙালি লেখকেরা মানুষের ভিতরকার সেই প্রাণের অভাব একান্ত মনে অনুভব করি— আমরা আমাদের কল্পনাকে সর্বদাই সত্যের খোরাক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারি নে, নিজের মনের সঙ্গে বাইরের মনের একটা সংঘাত হয় না বলে আমাদের রচনাকার্য অনেকটা পরিমাণে আনন্দবিহীন হয়। আমাদের দেশের লোক এত যে ইংরাজি সাহিত্য পড়েছে, কিন্তু তাদের অস্থিমজ্জার মধ্যে ভাবের প্রভাব প্রবেশ করতে পারে নি— তাদের ভাবের ক্ষুধাই জন্মায় নি, তাদের জড়শরীরের ভিতরে একটা মানসশরীর এখনো গঠিত হয়ে ওঠে নি, সেইজন্যে তাদের মানসিক আবশ্যক বলে একটা আবশ্যকবোধ নিতান্তই কম— অথচ মুখের কথায় সেটা বোঝবার জো নেই, কেননা বোলচাল সমস্তই ইংরাজি থেকে শিখে নিয়েছে। এরা খুব অল্প অনুভব করে, অল্প চিন্তা করে এবং অল্পই কাজ করে— সেইজন্যে এদের সংসর্গে মনের কোনো সুখ নেই। গেটের পক্ষেও যদি শিলারের বন্ধুত্ব আবশ্যক ছিল তা হলে আমাদের মতো লোকের পক্ষে একজন যথার্থ খাঁটি ভাবুকের প্রাণসঞ্চারক সঙ্গ যে কত অত্যাবশ্যক তা আর কী করে বোঝাব! আমাদের সমস্ত জীবনের সফলতাটা যে জায়গায় সেইখানে একটা প্রেমের স্পর্শ, একটা মনুষ্যসঙ্গের উত্তাপ সর্বদা পাওয়া আবশ্যক— নইলে তার ফুলফলে যথেষ্ট বর্ণ গন্ধ এবং রস সঞ্চারিত হয় না।

সাতারা
১৭ অগস্ট্ ১৮৯৪

১৪৪

শিলাইদহ
১৩ অগস্ট্। ১৮৯৪।

যদিও আমার এমন অনেক লেখা বেরোয় যা তুচ্ছ, যা কেবলমাত্র সাধনার স্থান পোরাবার জন্যে লিখি, তবু তার মধ্যেও আমি যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব যত্ন প্রয়োগ করে থাকি। লেখার মধ্যে আমার ভিতরকার সত্য যথোচিত শ্রদ্ধা এবং অকৃত্রিমতার সঙ্গে প্রকাশ করবার চেষ্টা করি— আমার সরস্বতীকে আমি কোনো অবস্থাতেই অবহেলা করতে পারি নে। সম্প্রতি...ইংরাজি লেখা পড়েছিলুম— তার...লেখক...

খ্যাতিপ্রাপ্ত একজন আর্টিস্ট্‌। তার সঙ্গে আমার অনেক বিষয়ে অনেক অনৈক্য আছে, কিন্তু দুটি বিষয়ে আমাদের মিল দেখলুম। এক হচ্ছে এই চতুর্দিকের বাস্তবিক জগতের অসম্পূর্ণতার মধ্যেই আপনার সৌন্দর্যের আদর্শকে আপনার প্রতিভাকে চরিতার্থ করা, দ্বিতীয় হচ্ছে নিজেকে প্রকাশ করবার একটা প্রবল ইচ্ছা। অহমিকার প্রভাবে যে নিজের কথা বলতে চাই তা নয়; কিন্তু যেটা যথার্থ চিন্তা করব, যথার্থ অনুভব করব, যথার্থ প্রাপ্ত হব, যথার্থরূপে প্রকাশ করাই তার একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম—এটা একেবারে আমার প্রকৃতিসিদ্ধ—ভিতরকার একটা চঞ্চল শক্তি ক্রমাগতই সেই দিকে কাজ করছে। অথচ সে শক্তিটা যে আমারই তা ঠিক মনে হয় না, মনে হয় সে একটা জগৎব্যাপ্ত শক্তি আমার ভিতর দিয়ে কাজ করছে। প্রায় আমার সমস্ত রচনাই আমার নিজের ক্ষমতার অতীত বলে মনে হয়—এমন-কি, আমার অনেক সামান্য গদ্য লেখাও। যে-সমস্ত তর্কযুক্তি আমি আগে থাকতে ভেবে রাখি, তার মধ্যেও আমার আয়ত্তের বহির্ভূত আর-একটি পদার্থ এসে নিজের স্বভাব-মত কাজ করে এবং সমস্ত জিনিষটাকে মোটের উপরে আমার অচিন্ত্যপূর্ব করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায়। সেই শক্তির হাতে মুগ্ধভাবে আত্ম-সমর্পণ করাই আমার জীবনের প্রধান আনন্দ। সে আমাকে কেবল যে প্রকাশ করায় তা নয়, অনুভব করায়, ভালোবাসায়। সেই জন্যে আমার অনুভূতি আমার নিজের কাছেই প্রত্যেকবার নূতন এবং বিস্ময়জনক। প্রকৃতির মধ্যে এসে আমার নিজের মনে যে ভাবোদয় হয় সেটা মনে হয় যেন আমার স্বভাবের, আমার শক্তির অতিরিক্ত একটা ব্যাপার। সেইজন্যে মনে হয় আমি সেটা কাউকে বোঝাতে এবং বিশ্বাস করাতে পারব না। আমার সব অনুভূতির মধ্যে ঐ রকম আমার অতিরিক্ত একটা উপাদান আছে। মীরাটাকে যখন আমার ভালো লাগে তখন তার মধ্যে আমি এমন একটা অসীম রহস্য অনুভব করি যে, সে কেবল আর আমার কন্যা মীরা থাকে না—সে বিশ্বের সমস্ত মূলরহস্য মূলসৌন্দর্যের অঙ্গ হয়ে পড়ে, আমার স্নেহ-উচ্ছ্বাস একটা উপাসনার মতো হয়ে আসে। আমার বিশ্বাস আমাদের সব স্নেহ সব ভালোবাসাই রহস্যময়ের পূজো—কেবল সেটা আমরা অচেতন ভাবে করি। ভালোবাসা মাত্রই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বজগতের অন্তরস্থিত শক্তির সজাগ আবির্ভাব—যে নিত্য-আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি। নইলে ওর কোনোই অর্থ থাকে না। যে জগৎব্যাপী আকর্ষণশক্তিতে সমস্ত ভ্রাম্যমাণ বিশ্বজগৎ এক সূত্রে বাঁধা, সেই আকর্ষণেই আপেল ফল গাছ থেকে মাটিতে এসে পড়ে। বাহ্য জগতে যেমন এই আকর্ষণ, মনোজগতে সেই রকম একটা বিশ্বব্যাপী আনন্দের আকর্ষণ আছে—সেই আকর্ষণেই আমরা বিশ্বের মধ্যে সৌন্দর্য, হৃদয়ের মধ্যে প্রেম অনুভব করি—জগতের ভিতরকার একটা অনন্ত আনন্দের ক্রিয়া আমার মনের ভিতরেও কার্য করে। আমরা সেটাকে যদি বিচ্ছিন্ন-ভাবে দেখি তবে তার যথার্থ কোনো অর্থ থাকে না। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের মধ্যে আমরা আনন্দ কেন পাই (সে আনন্দ যতই ক্ষুদ্র যতই চঞ্চল হোক)—তার একটি মাত্র সদুত্তর হচ্ছে : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। এ কথা নিজে না বুঝলে কাউকে বোঝাবার জো নেই।

সাতারা
১৮ অগস্ট্‌ ১৮৯৪

১৪৫

শিলাইদহ
১৬ অগস্ট্‌। ১৮৯৪।

এখন শুক্লপক্ষ কিনা, বেড়াবার সময় চমৎকার জ্যোৎস্না পাই—তার পরে বোটে ফিরে এসে বাইরে কেদারায় পা ছড়িয়ে বসি। ঈষৎ শারীরিক শ্রান্তির পর সেই চৌকি, সেই জ্যোৎস্না, সেই জলের কল্লোল স্বর্গসুখ বহন করে আনে। নদী বেড়ে উঠে প্রায় ডাঙার সমান রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাই বোটের উপর বসে তীরের এবং জলের সমস্ত দৃশ্য একেবারে চোখের সম্মুখে প্রসারিত দেখতে পাই। আমার দক্ষিণে সুবিস্তীর্ণ মাঠ, মাঝে মাঝে আউশ ধান হয়েছে—অধিকাংশই সবুজ ঘাস, এক প্রান্ত দিয়ে একটি পদচিহ্নরচিত সংকীর্ণ মেঠো রাস্তা, সম্মুখে পূর্বদিকে হাটের গোলাঘর, সামনে স্তূপাকার খড় জমা হয়ে রয়েছে—জ্যোৎস্নায় সেই জীর্ণ কুটির এবং খড়ের স্তূপ ভারী সুন্দর ছবির মতো দেখতে হয়। সন্ধেবেলাটি আমার মাথার উপর, আমার চোখের সামনে, আমার পায়ের তলায়, আমার চতুর্দিকে এমন সুন্দর, এমন শান্তিময়, এমন নির্জন নিস্তব্ধ, অথচ এমন পরিপূর্ণ হয়ে উদয় হয়, মানুষের মতো এমন নিবিড়ভাবে আমার নিকটবর্তী হয়ে আসে যে, আকাশের নক্ষত্রলোক থেকে আর পদ্মার সুদূর ছায়াময় তীররেখা পর্যন্ত সমস্ত বৃহৎ দৃশ্যটি আমার চতুর্দিকে একটি নিভৃত আরামের গোপন গৃহের মতো ছোটো হয়ে ঘিরে দাঁড়ায়—আমার মধ্যে যে-দুটি প্রাণী আছে, আমি এবং আমার সেই অন্তঃপুরবাসী আত্মা, এই দুটিতে মিলে সমস্ত ঘরটি দখল করে বসে থাকি—এই দৃশ্যের মধ্যগত সমস্ত পশু পক্ষী প্রাণী আমাদের দুজনের অন্তর্গত হয়ে যায়—কানে জলের কলশব্দ আসতে থাকে, মুখের উপর মাথার উপর জ্যোৎস্নার শুভ্রহস্ত আদরের স্পর্শ করতে থাকে, আকাশে চকোর পাখি ডেকে চলে যায়, জেলের নৌকো পদ্মার মাঝখানে খরস্রোতের উপর দিয়ে বিনা চেষ্টায় অনায়াসে পিছলে বহে যেতে থাকে, আকাশব্যাপী স্নিগ্ধ রাত্রি আমার রোমে রোমে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে শরীরের উত্তাপ জুড়িয়ে দেয়—চোখ বুজে, কান পেতে, দেহ প্রসারিত করে প্রকৃতির একমাত্র যত্নের জিনিষের মতো পড়ে থাকি : তার সহস্র সহচরী আমার সেবা করে। মনের কল্পনারও কোনো বাধা থাকে না, সেও তার দুটি হস্তে থালা সাজিয়ে অনেকগুলি ছায়াময়ী মায়াসেবিকা-পরিবৃত হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়—মৃদুমন্দ বাতাসের সঙ্গে তার কোমল অঙ্গুলির স্পর্শ আমার চুলের মধ্যে অনুভব করি।

সাতারা
২১ অগস্ট্‌ ১৮৯৪

১৪৬

শিলাইদহ
১১ অগস্ট্‌। ১৮৯৪।

এবারে আমার সঙ্গে আমি রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলী এনেছি—তাতে গুটি-তিনেক সংস্কৃত বেদান্ত গ্রন্থ এবং তার অনুবাদ আছে; তার থেকে আমার অনেকটা সাহায্যলাভ হয়েছে। বেদান্তপাঠে বিশ্ব এবং বিশ্বের আদিকারণ সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসংশয় হয়ে থাকেন। রামমোহন রায়ের মতো অত বড়ো একজন প্রখরবুদ্ধিমান লোকও বৈদান্তিক ছিলেন, ডয়্‌সেন-সাহেবও আগাগোড়া বেদান্তের খুব প্রশংসা করে গেছেন, কিন্তু আমার মনের কোনো সংশয় দূর হয় নি। এক হিসাবে অন্য অনেক মতের অপেক্ষা বেদান্ত-মত সরল; কারণ, দুইয়ের চেয়ে এক সরল। সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তা কথাটা শুনতে খুব সংগত এবং সহজ, কিন্তু এমন জটিল সমস্যা মানুষের বুদ্ধির পক্ষে আর কিছু নেই। বেদান্ত গর্ডান গ্রন্থি ছেদন করে দুইয়ে মিলিয়ে এক করে বসে আছেন; আর কিছু না হোক, সমস্যাটাকে আধখানা ছেঁটে দিয়েছে। সৃষ্টি একেবারেই নেই, আমরা কেউ নেই —আছেন কেবল এক ব্রহ্ম, আর মনে হচ্ছে যেন আমরা আছি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ এ কথা মনে স্থান দিতে পারে—আরও আশ্চর্য এই কথাটা কানে শুনতে যতটা বেশি অদ্ভুত হয় আসলে তা নয়। বস্তুত, কিছু যে আছে এইটে প্রমাণ করাই ভারী শক্ত। ঐ বৈদান্তিক মতটা আজকাল য়ুরোপেও অনেকটা ব্যাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু সে দেশের জল-হাওয়ায় ওটা ঠিক টিকতে পারবে কি না সন্দেহ। কিম্বা হয়তো একটা নতুন মূর্তি পরিগ্রহ করে বসবে। যাই হোক, আজকাল সন্ধেবেলায় যখন জ্যোৎস্না ওঠে, এবং আমি যখন অর্ধনিমীলিত চোখে বোটের বাইরে লম্বা কেদারায় পা ছড়িয়ে বসি এবং স্নিগ্ধ সন্ধ্যাসমীরণ আমার চিন্তাক্লান্ত তপ্ত ললাট স্পর্শ করতে থাকে, তখন এই জল স্থল আকাশ, এই নদীকল্লোল, ডাঙার উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধজন পথিক এবং জলের উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধখানা জেলেডিঙির গতায়াত, জ্যোৎস্নালোকে অপরিস্ফুট মাঠের প্রান্ত এবং দূরে অন্ধকারমিশ্রিত বনশ্রেণীবেষ্টিত সুপ্তপ্রায় গ্রাম, সমস্তই ছায়ার মতো মায়ারই মতো বোধ হয়, অথচ সে মায়া সত্যের চেয়ে বেশি সত্য হয়ে জীবন মনকে জড়িয়ে ধরে—এবং এই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যে মানবাত্মার মুক্তি এ কথা কিছুতে মনে হয় না। দার্শনিক বলতে পারেন, সন্ধ্যাবেলায় জগৎকে যে পরিমাণে মায়া বলে উপলব্ধি করা হয় সেই পরিমাণে মুক্তি লাভ করা যায় এবং আমি যে আনন্দ পেতে থাকি সেটা যথার্থত মুক্তিরই আনন্দ—অর্থাৎ জগৎটাকে সত্য জ্ঞান করার দরুন দিনের বেলায় আমার যে একটা দৃঢ় বন্ধন থাকে, সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত ছায়াময় হয়ে আসাতে সেই বন্ধন অনেকটা পরিমাণে শিথিল হয়ে আসে; যখন জগৎটাকে একেবারে সম্পূর্ণই অসৎ বলে অন্তরের মধ্যে দৃঢ় উপলব্ধি জন্মাবে তখন যে-একটি পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করব সেই স্বাধীনতায় আমি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হব। এ কথাটা আমি অতি ঈষৎ অনুমান এবং অনুভব করতে পারি; হয়তো কোন্‌দিন দেখব বৃদ্ধ বয়সের পূর্বে আমি জীবন্মুক্ত হয়ে বসে আছি।

সাতারা
২৪ অগস্ট্‌ ১৮৯৪

১৪৭

কুষ্টিয়ার পথে
২৪ অগস্ট্। ১৮৯৪।

আমাদের এখানে নদীর জল যতদূর বাড়বার তার সীমা পর্যন্ত গেছে, বরঞ্চ আধ হাত আন্দাজ ছাড়িয়ে গেছে— জলে স্থলে প্রায় সমান হয়ে এসেছে। পদ্মাকে এখন খুব জাঁকালো দেখতে হয়েছে, একেবারে বুক ফুলিয়ে চলেছে— ও পারটা একটি মাত্র কাজলের নীল রেখার মতো দেখা যাচ্ছে। আমার ডান দিকের জানলা দিয়ে যতদূর চেয়ে দেখি নিবিড়সবুজ শস্যক্ষেত্র, বাম দিকের জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি অপার উদার জলরাশি। ডান দিকে শস্যের মৃদুমন্দ আন্দোলন আর বাম দিকে আগাগোড়া একটা প্রকাণ্ড প্রচণ্ড ধাবমান গতি। আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক সময় ভাবি— বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তা হলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মানুষ পশু এবং তরুলতার মধ্যে যে চলাচল তাতে খানিকটা গতি খানিকটা বিশ্রাম, একটা অংশের গতি আর-একটা অংশের নিশ্চলতা। কিন্তু নদীর আগাগোড়াই চলছে— সেইজন্যে আমাদের মনের সঙ্গে, আমাদের চেতনার সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আমাদের শরীর আংশিক ভাবে পদচালনা করে অঙ্গচালনা করে চলে— আমাদের মন স্বভাবতই সমগ্রতই চলছে। সেই জন্যে এই ভাদ্রমাসের পদ্মাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মতো বোধ হয়— সে মনের ইচ্ছার মতো ভাঙছে চুরছে এবং চলেছে, মনের ইচ্ছার মতো সে আপনাকে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে এবং অস্ফুট কলসংগীতে নানাপ্রকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। বেগবান একাগ্রগামিনী নদী আমাদের মনের ইচ্ছার মতো— আর স্থির শান্ত সুবিস্তীর্ণ বিচিত্রশস্যশালিনী ভূমি আমাদের ইচ্ছার সামগ্রীর মতো। আমি মাঝখানে বোট নিয়ে আমার বামে ইচ্ছার তীব্র বেগ ও ক্রন্দন এবং দক্ষিণে সফলতার শান্ত সৌন্দর্য এবং মৃদু মর্মর বিভক্ত করে বসে আছি। আমাদের বোট ছেড়ে দিয়েছে। স্রোতের মুখে বোট ছুটে চলেছে। তীরটা এখন বামে পড়েছে— এমন সুন্দর দেখতে হয়েছে সে আর কী বলব! খুব নিবিড় প্রচুর সরস সবুজের উপর খুব ঘননীল সজল মেঘরাশি মাতৃস্নেহের মতো অবনত হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে গুরু গুরু মেঘ ডাকছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষাকালের যমুনাবর্ণনা মনে পড়ে— প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণবকবির ছন্দোঝংকার এনে দেয়— তার প্রধান কারণ, এই-সমস্ত সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়— এর মধ্যে মানব-ইতিহাসের যেন সমস্ত পুরাকালীন প্রীতিসম্মিলনগাথা পূর্ণ হয়ে রয়েছে, এর মধ্যে যেন একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্ছে, এই সৌন্দর্যের মধ্যে বৈষ্ণবকবিদের সেই অনন্ত-বৃন্দাবন রয়ে গেছে। বৈষ্ণবকবিতার যথার্থ মর্মের ভিতরে যে প্রবেশ করেছে সে সমস্ত প্রকৃতির ভিতর সেই বৈষ্ণবকবিতার ধ্বনি শুনতে পায়। কিন্তু অধিকাংশ পাঠক সে রকম করে বৈষ্ণবপদ পড়ে না— বাইরে থেকে নিতান্ত সমালোচকভাবে দেখে তারা প্রত্যেক লাইন প্রত্যেক পদ স্বতন্ত্র করে দেখে, সেইজন্যে অনেক দোষ দেখতে পায়। সেগুলো চোখে পড়াই উচিত নয়— stranger অনেক জিনিস দেখতে পায় যা অন্তরঙ্গ আত্মীয় দেখতে

পায় না, তেমনি আত্মীয় যে জিনিসটি দেখতে পায় strangerএর তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তা পড়ে না।

সাতারা
২৯ অগস্ট্ ১৮৯৪

১৪৮

কলকাতা
২৯ অগস্ট্। ১৮৯৪।

আজ সকালে বসে বসে আমার একটা নতুন গানে সুর দিচ্ছিলুম—সুরটা যে খুব নতুন তা নয়, এক রকম কীর্তনের ধরনের ভৈরবী। কিন্তু তবু ছন্দে ছন্দে গাইতে গাইতে শরীরের সমস্ত রক্তের মধ্যে একটা সংগীতের মাদকতা প্রবেশ করতে থাকে—সমস্ত শরীর এবং সমস্ত মন আগাগোড়া একটা বাজনার যন্ত্রের মতো কম্পিত এবং গুঞ্জরিত হয়ে উঠতে থাকে এবং সেই সুরের স্পন্দন আমার শরীর মন থেকে সমস্ত বাইরের জগতে সঞ্চারিত এবং ব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার সঙ্গে একটা স্বরসম্মিলন স্থাপিত হয়ে যায়। বীণার তার যখন বাজতে থাকে তখন সেটা যেমন আবছায়া দেখতে হয়, গানের সুরে সমস্তজগৎটা সেইরকম বাষ্পময় এবং ঝংকারপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই রকম করে গাইতে গাইতে কাজকর্মের সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, প্রুফগুলো পড়ে রইল, দুপুর বেজে গেল, রৌদ্রের আলোক এবং তাপ ক্রমেই তীব্র হয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল—আজ আর কিছু হল না। ও দিকে রেণু এবং খোকা একটা শব্দওয়ালা খেলনা কিনে পশ্চিমের বারান্দায় চড়্‌বড়্ শব্দ করে খেলা করছে শুনতে পাচ্ছি, কাক চড়ুই প্রভৃতি অনেকগুলি পাখির শব্দ মিশ্রিত হয়ে আকাশে একটা অনির্দিষ্ট শব্দ হচ্ছে, মদনবাবুর গলি দিয়ে ফেরিওয়ালা করুণসুরে ডেকে যাচ্ছে—পিঠের দিক থেকে অল্প অল্প দক্ষিনে বাতাস এসে লাগছে—কলিকাতার বিচিত্র রকমের সুর এবং শব্দ মধ্যাহ্নের রৌদ্রে একটা গভীর ঔদাস্য এবং শ্রান্তি প্রকাশ করছে। এখনো আমার ভাত কেন এল না জানি নে, বামুনটাও সকালে ভাতের কাঠি ফেলে সুর বাঁধতে বসেছিল কিনা কে জানে, কিন্তু কারও কোনো সাড়াশব্দ শুনতে পাচ্ছি নে—মনে হচ্ছে যেন চাকর মনিব জগৎসংসার সমস্তই আজ ছুটি নিয়েছে।

সাতারা। ২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৪৯

সাজাদপুর
৫ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

অনেক কাল বোটের মধ্যে বাস করে হঠাৎ সাজাদপুরের বাড়িতে এসে উত্তীর্ণ হলে বড়ো ভালো লাগে। বড়ো বড়ো জানলা দরজা, চার দিক থেকে অবারিত ভাবে

আলো এবং বাতাস আসতে থাকে—যে দিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই গাছের সবুজ ডাল চোখে পড়ে এবং পাখির ডাক শুনতে পাই—দক্ষিণের বারান্দায় বেরোবা-মাত্র কামিনী ফুলের গন্ধে মস্তিষ্কের সমস্ত রন্ধ্রগুলি পূর্ণ হয়ে ওঠে। হঠাৎ বুঝতে পারি এতদিন বৃহৎ আকাশের জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষুধা ছিল, সেটা এখানে এসে পেট ভরে পূর্ণ করে নেওয়া গেল। আমি চারটি বৃহৎ ঘরের একলা মালিক—সমস্ত দরজাগুলি খুলে বসে থাকি। এখানে যেমন আমার মনে লেখবার ভাব এবং লেখবার ইচ্ছা আসে এমন আর কোথাও না। বাইরের জগতের একটা জীবন্ত প্রভাব আমার সমস্ত মুক্ত দ্বার দিয়ে অবাধে প্রবেশ করতে থাকে—আলোতে আকাশে বাতাসে শব্দে গন্ধে সবুজহিল্লোলে এবং আমার মনের নেশায় মিশিয়ে অনেক রকম গল্প তৈরি হয়ে উঠতে থাকে। বিশেষত এখানকার দুপুর বেলাকার মধ্যে বড়ো একটি নিবিড় মোহ আছে। রৌদ্রের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, নির্জনতা, পাখিদের বিশেষত কাকের ডাক, এবং সুদীর্ঘ সুন্দর অবসর—সব-সুদ্ধ জড়িয়ে আমাকে ভারী উদাস এবং আকুল করে। কেন জানি নে, মনে হয় এই রকম সোনালি-রৌদ্রে-ভরা দুপুর বেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে—অর্থাৎ সেই পারস্য এবং আরব্য দেশ, ডামাস্ক্‌ সমরকন্দ্‌ বুখারা—আঙুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান, শিরাজের মদ—মরুভূমির পথ, উটের সার, ঘোড়সওয়ার পথিক, ঘন খেজুরের ছায়ায় স্বচ্ছ জলের উৎস—নগর, মাঝে মাঝে চাঁদোয়া-খাটানো সংকীর্ণ রাজপথ, পথের প্রান্তে পাগড়ি এবং ঢিলে কাপড়-পরা দোকানি খরমুজ এবং মেওয়া বিক্রি করছে—পথের ধারে বৃহৎ রাজপ্রাসাদ, ভিতরে ধূপের গন্ধ, জানলার কাছে বৃহৎ তাকিয়া এবং কিংখাপ বিছানো—জরির চটি ফুলো পায়জামা এবং রঙিন কাঁচলি -পরা আমিনা জোবেদি সুফি, পাশে পায়ের কাছে কুণ্ডলায়িত গুড়গুড়ির নল গড়াচ্ছে, দরজার কাছে জমকালো-কাপড়-পরা কালো হাবসি পাহারা দিচ্ছে—এবং এই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে, এই ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময় অথচ ভয়ভীষণ বিচিত্র প্রাসাদে, মানুষের হাসিকান্না আশা-আশঙ্কা নিয়ে কত শত সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে। আমার এই সাজাদপুরের দুপুর বেলা গল্পের দুপুর বেলা—মনে আছে ঠিক এই সময়ে এই টেবিলে বসে আপনার মনে ভোর হয়ে পোস্ট্‌মাস্টার গল্পটা লিখেছিলুম। আমিও লিখছিলুম এবং আমার চার দিকের আলো এবং বাতাস এবং তরুশাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ করে দিচ্ছিল। এই রকম চতুর্দিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে নিজের মনের মতো একটা-কিছু রচনা করে যাওয়ার যে সুখ তেমন সুখ জগতে খুব অল্পই আছে। আজ সকালে বসে 'ছড়া' সম্বন্ধে একটা লেখা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম—সেটার ভিতরে বেশ সম্পূর্ণ নিমগ্ন হতে পেরেছিলুম, বড়ো ভালো লাগছিল। 'ছড়া'র একটা স্বতন্ত্র রাজ্য আছে, সেখানে কোনো আইন কানুন নেই—মেঘ-রাজ্যের মতো। দুর্ভাগ্যক্রমে, যে রাজ্যে আইন-কানুনের প্রাবল্য বেশি সেই বৈষয়িক রাজ্য সর্বত্রই পিছনে পিছনে অনুসরণ করেন। লিখতে লিখতে হঠাৎ মাঝখানে আমলাদের একটা উপপ্লব উপস্থিত হল, আমার মেঘরাজ্য ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল। সেই-সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আহারের সময় এল। দুপুর বেলায় পেট ভরে খাওয়ার মতো এমন জড়ত্বজনক জিনিস আর কিছু নেই, ওতে মানুষের কল্পনাশক্তি এবং উচ্চ অঙ্গের সমস্ত হৃদয়বৃত্তি একেবারে অভিভূত করে ফেলে। বাঙালিরা প্রচুর পরিমাণে মধ্যাহ্নভোজন করে বলেই মধ্যাহ্নের একটি নিবিড় ভাব-সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে না—দরজা বন্ধ করে তামাক খেতে খেতে পান

চিবোতে চিবোতে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত পরিপূর্ণভাবে নিদ্রার আয়োজন করতে থাকে। তাতে করেই দিব্যি চিক্‌চিকে গোলগাল হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলাদেশের বৈচিত্র্য-বিহীন অসীম সমতল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে জনহীন শ্রান্ত মধ্যাহ্ন যেমন বৃহৎভাবে নিস্তব্ধভাবে বিস্তীর্ণ হতে পারে এমন আর কোথাও না। আমাকে খুব ছেলেবেলা থেকে এই মধ্যাহ্নকাল ব্যাকুল করে আসছে। তখন বাইরের তেতালায় কেউ থাকত না, সেখানে খোলা দরজায় উত্তপ্ত বাতাসে বাঁকা কৌচে আমি একলাটি পড়ে থাকতুম —সমস্ত দীর্ঘ দিন কী কল্পনায়, কী অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষায়, কী রকম করে কাটত!

সাতারা
১০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৫০

সাজাদপুর
৭ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

আমি চিঠি পাই সন্ধের সময়, আর আমি চিঠি লিখি দুপুর বেলায়। রোজ একই কথা লিখতে ইচ্ছা করে—এখানকার এই দুপুর বেলাকার কথা। কেননা, আমি এর মোহ থেকে কিছুতেই আপনাকে ছাড়াতে পারি নে। এই আলো, এই বাতাস, এই স্তব্ধতা আমার রোমকূপের মধ্যে প্রবেশ করে আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে— এ আমার প্রতিদিনকার নতুন নেশা, এর ব্যাকুলতা আমি নিঃশেষ করে বলে উঠতে পারি নে। প্রতিদিনের শরৎকালের দুপুর বেলা আমার কাছে রোজ একই ভাবে উদয় হয়—পুরাতন প্রতিদিনই নূতন করে আসে, এবং আমার ঠিক সেই কালকের মনোভাব আজ আবার তেমনি করে জেগে ওঠে। প্রকৃতি প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করে না। আমাদেরই সংকোচ বোধ হয়, মনে হয় আমাদের ভাষার মধ্যে সেই অনন্ত উদারতা নেই যাতে রোজ এক ভাবকে নতুন করে দেখাতে পারে। অথচ সকল কবিই চিরকাল উল্টেপাল্টে প্রায় একই কথা বলে আসছে এবং সেই এক কথাই সহস্র আকার ধারণ করছে। কোনো কোনো ক্ষুদ্র কবি কিছু জবরদস্তি করে নূতনত্ব আনবার চেষ্টা করে—তাতে এই প্রমাণ হয় যে, পুরাতনের মধ্যে যে চিরনূতনত্ব আছে তার ক্ষুদ্র কল্পনায় সেটা আর অনুভব করতে পারে না, সেইজন্যে সৃষ্টিছাড়া নূতনত্বের জন্যে ঘুরে বেড়ায়। অনেক বোধশক্তি-বিহীন পাঠক আছে যারা নূতনকে কেবলমাত্র তার নূতনত্বের জন্যই পছন্দ করে। কিন্তু আসল ভাবুকরা এই-সকল নূতনত্বের ফাঁকিকে তুচ্ছ প্রবঞ্চনা বলে ঘৃণা করে। তারা এ নিশ্চয় জানে যে, যা আমরা যথার্থ অনুভব করি তা কোনো কালেই পুরোনো হতে পারে না। কিন্তু যখনি একটা জিনিস আমাদের অনুভব থেকে বিচ্যুত হয়ে কেবলমাত্র আমাদের জ্ঞানে এসে দাঁড়ায়, তখনি তার জরা উপস্থিত হয়। তখন তাকে মৃত্যুর হস্ত থেকে রক্ষা করা কারও সাধ্য নয়। সেই জন্যে যারা জ্ঞানের দ্বারা একটা জিনিসকে সুন্দর বলে জানে অথচ সম্পূর্ণ অনুভব করে না, তারা সে সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করে, খুব একটা প্রবল কিম্বা খুব একটা নতুন কথা বলবার চেষ্টা করে—কিন্তু যথার্থ প্রবল কথা এবং যথার্থ নতুন কথা তাদের মুখ দিয়ে বেরোয় না। আমি ছোটো কবি কি বড়ো কবি সে বিষয়ে

আলোচনা করবার কোনো দরকার দেখি নে— কিন্তু এটা আমি বারম্বার দেখেছি, পৃথিবীর কোনো জিনিসকেই যেন আমি শেষ করতে পারি নি। যা আমার একবার মনে লেগেছে তা আমার চিরকালই মনে লাগে, এবং প্রত্যেক দিনই তার নূতনত্বে আমাকে নিবিড় বিস্ময়ে পূর্ণ করতে থাকে। আমার পুনঃপুনঃ স্পর্শ লেগে কোনো জিনিস জীর্ণ হয় না; বরঞ্চ প্রতিবারেই তার উজ্জ্বলতা বেড়ে ওঠে, অথচ সে উজ্জ্বলতার মধ্যে অমূলক বা কাল্পনিক কিছু নেই— মিথ্যা কাল্পনিকতাকে আমি ভারী ঘৃণা করি। আমি সমস্ত জিনিসের বাস্তবিকতাটুকু স্পষ্ট দেখতে পাই; অথচ তারই ভিতরে, তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা এবং সমস্ত আত্মবিরোধের মধ্যেও আমি একটা অনির্বচনীয় স্বর্গীয় রহস্যের আভাস পাই। আমার বয়স এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সেই রহস্যের বিস্ময় এবং আনন্দ যেন বাড়ছে বৈ কমছে না— তার থেকেই আমি প্রতিদিন বুঝতে পারছি, যারা আমাকে আনন্দ দিচ্ছে তারা কোনো অংশে ফাঁকি নয়, তারা কিছুমাত্র সামান্য নয়, তাদের মধ্যে অনন্তসত্য অনন্ত-আনন্দ আছে। এ কথা পরিষ্কার করে বললে অধিকাংশ লোক অবাক হয়, কিন্তু যারা নিজের জীবন দিয়ে এ-সব কথা অনুভব করে নি তাদের শুধু মুখের কথায় আমি কী করে অনুভব করাব! তারা ছোটো ছোটো বাঁধি গতের বেড়া বেঁধে সেই বেড়ার মধ্যেকার জমিটুকুকেই জগৎসংসার মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে, অনন্তের আলোক তাদের সেই ক্ষুদ্র দম্ভের উপর কোনোদিন আঘাত করে নি। তারা সুখে আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যদি আত্মা বলে কিছু থাকে তবে নিশ্চয়ই সে সুখ প্রার্থনীয় নয় এবং যখন সেই সাংসারিক বাঁধি সুখকে ক্ষুদ্র বলে মনে হয় এবং দুঃখের মধ্যে একটা আন্তরিক বন্ধনমুক্তি দেখা যায় তখনি বুঝতে পারি— আত্মা বলে একটা জিনিস আছে, সে জিনিস এক জিনিসই স্বতন্ত্র।

সাতারা
১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৫১

সাজাদপুর
৭ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

যখন এইরকম লিখতে লিখতে লেখা বেড়ে যায়, এবং প্রতিদিন সকালে বিছানা থেকে উঠেই মনে হয় কাল সেই লেখাটা কোথায় ছেড়ে দিয়েছিলুম এবং আজ কোথা থেকে আরম্ভ করতে হবে, তখন ভারী ভালো লাগে— দিনগুলিকে বেশ লেখায় পরিপূর্ণ করে ভরা কলসীর মতো সন্ধেবেলায় ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলি, এবং সেই-সব লেখার ধ্বনি প্রতিধ্বনির রেশ সমস্ত শরীর মনের মধ্যে বাজতে থাকে। আজকাল এই ছড়ার রাজ্যে ভ্রমণ করতে করতে আমি কত রকমের ছবি এবং কত রকমের সুখ দুঃখ ও হৃদয়বৃত্তির ভিতর দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাচ্ছি তার আর ঠিকানা নেই। এমন-কি লিখতে লিখতে এক-এক সময় চোখ ছল্ ছল্ করে ওঠে, আবার এক-এক সময় মুখে হাসিও দেখা দেয়। আজ বেড়াতে বেড়াতে ভাবছিলুম এতে আমার এত আনন্দ কিসের? আসল কথা হচ্ছে, অনুভব করাতেই আমাদের হৃদয়ের ক্ষমতা প্রকাশ হয়— আমি যখন একটা প্রাচীন স্মৃতির জন্য হৃদয়ের মধ্যে

ব্যথা পাই তখন সেই ব্যথার মধ্যে আনন্দ এইটুকু যে, স্মৃতিটুকুকে আমি উপলব্ধি করতে পারছি, সেটা আমার কাছে আসছে— প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষ অবধি, বর্তমান থেকে অতীত পর্যন্ত আমার হৃদয়ের বোধশক্তি প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। বরঞ্চ সুখের চেয়ে দুঃখে সেই বোধশক্তি আমরা বেশি করে অনুভব করি, যে কল্পনা আমাদের ব্যথা দেয় সে আমাদের কাছে গভীরতর এবং স্পষ্টতররূপে প্রতীয়মান হয়— এইজন্যে আর্টের এলাকায় দুঃখের ব্যাপ্তিই কিছু বেশি। দয়া, সৌন্দর্যবোধ, ভালোবাসা, এ-সমস্ত হৃদয়বৃত্তিতে আমরা নিজের দ্বারা অন্যকে লাভ করি, এইজন্যে এদের ভিতরকার দুঃখকষ্টেও একটা আনন্দের অভাব নেই; কিন্তু বীভৎসকল্পনা-জনিত ঘৃণা কিম্বা নিষ্ঠুরকল্পনাজনিত পীড়ায় আমাদের বিমুখ করে দেয়, আমাদের হৃদয়ের স্বাধীনগতিকে বাধা দিতে থাকে, এইজন্যে সে-সকল বৃত্তিতে আমাদের কোনো আনন্দ নেই। ওথেলোর মধ্যে যেটুকু করুণা আছে সেটুকু আমাদের আকর্ষণ করে, কিন্তু ওর শেষ অংশে যেটা বর্বর নিষ্ঠুরতা সেটা আমাকে ওথেলো থেকে বিমুখ করে দেয়— মনে হয় যেন সেটা আর্টের সীমার বাইরে। কিন্তু বড়ো সংগীতের হার্মনিতে যেমন অনেক সময় সুরটাকে বিচিত্র এবং জাজ্বল্যমান করবার জন্যে বেসুরো মিশিয়ে দেয় তেমনি বড়ো বড়ো কাব্যে খানিকটা পরিমাণে অকাব্যও মেশানো থাকে; তাতে মোটের উপরে হয়তো কাব্যাংশটা বেশি স্ফূর্তি পায়—সেইজন্যে ওরকম একটা অংশ ধরে কিছু বলা যায় না। কিন্তু তবু আমি নিজের কথা বলতে পারি, উঁচুদরের সাহিত্যের মধ্যে ওথেলো এবং কেনিল্‌ওয়ার্থ্‌ আমার দ্বিতীয়বার পড়তে কিছুতেই মন ওঠে না। এর মধ্যে একটা প্রশ্ন আছে এই যে, বাস্তব জগতের সুখদুঃখ এবং কাব্যজগতের সুখদুঃখে আনন্দের অনেক প্রভেদ আছে, তার কারণ কী? তার কারণ হচ্ছে— বাস্তব জগতের সুখদুঃখ ভারী জটিল এবং মিশ্রিত। তার সঙ্গে আমাদের স্বার্থ আমাদের শরীরের চেষ্টা প্রভৃতি অনেক জিনিস জড়িত। কাব্যজগতের সুখদুঃখ বিশুদ্ধরূপে মানসিক, তার সঙ্গে আমাদের অন্য কোনো দায় নেই, স্বার্থ নেই, জড়জগতের বাধা নেই, শারীরিক তৃপ্তি বা শ্রান্তি নেই। আমাদের হৃদয় স্বাধীনভাবে সম্পূর্ণভাবে অমিশ্রভাবে অনুভব করবার অবসর পায়— কাব্যে আমাদের আনন্দ একেবারে অব্যবহিত; কোনো প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে, কোনো ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে তার সাক্ষাৎকার লাভ করতে হয় না— আমরা দেহবদ্ধ অধীন মানুষ হয়েও কেবলমাত্র আমাদের হৃদয় দিয়ে একটা মানসিক জগতে অবাধে বিচরণ করতে পারি। এই জন্যে কাব্যের আনন্দে আমাদের আনন্দের সীমায় নিয়ে গিয়ে ঠোকর খাইয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসে না, প্রত্যেক আনন্দের সঙ্গে একটা অশ্রান্তি অতৃপ্তি এবং অসীমতার আস্বাদ দেয়।... নিজের মনের কথাও আমাদের নিজের কাছে ভারী দুরূহ— আমরা ঠিক কী ভাবছি তা আমরা সম্পূর্ণ জানতে পারি নে, তার অর্ধেক কথা কেবলমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। আমি নিজের কথা প্রকাশ করে বলতে গিয়ে নিজের কাছ থেকে নিজে শিক্ষা লাভ করি— আমার অধিকাংশ শিক্ষাই এমনি করে হয়েছে, আমার মুখ বন্ধ করে দিলেই আমার বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। সেইজন্যে এবং নিজের মনের ঝোঁকে তোর কাছে বসে বসে আমার প্রতিদিনের বকুনি বকে যাই।

সাতারা
১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৫২

পতিসর
১০ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

কাল সকাল থেকে জলপথে রয়েছি। চারি দিকেই কেবল বিল, ধানের ডগাগুলি জেগে রয়েছে— গুটিকতক ঘনবদ্ধ কুটির নিয়ে গ্রামগুলি দূরে দূরে ভাসছে— মৃদু সুগন্ধবিশিষ্ট সবুজ শৈবাল অনেক দূর পর্যন্ত জমাট বেঁধে রয়েছে, হঠাৎ ডাঙা বলে বোধ হয়; তারই মধ্যে বিচিত্র জলচর পাখির আড্ডা। ভাদ্র মাসের দিন, বাতাস বেশি নেই, বোটের শিথিল পাল ঝুলে ঝুলে পড়ছে এবং নৌকোটি সমস্তদিন আলস্যমন্থর গমনে নিতান্ত উদাসীনের মতো চলেছে। এই শৈবালবিকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ জলরাজ্যের মধ্যে শরতের উজ্জ্বল রৌদ্র পড়েছে, আমি জানলার কাছে এক চৌকিতে বসে আর-এক চৌকিতে পা তুলে দিয়ে সমস্তদিন কেবল গুন্‌গুন্‌ করে গান করছি। রামকেলি প্রভৃতি সকাল বেলাকার যে-সমস্ত সুর কলকাতায় নিতান্ত অভ্যস্ত এবং প্রাণহীন বোধ হয়, এখানে তার একটু আভাসমাত্র দিলেই অমনি তার সমস্তটা সজীব হয়ে ওঠে। তার মধ্যে এমন একটা অপূর্ব সত্য এবং নবীন সৌন্দর্য দেখা দেয়, এমন একটা বিশ্বব্যাপী গভীর করুণা বিগলিত হয়ে চারি দিককে বাষ্পাকুল করে তোলে যে, এই রাগিণীকে সমস্ত আকাশ এবং সমস্ত পৃথিবীর গান বলে মনে হতে থাকে। এ একটা ইন্দ্রজাল, একটা মায়ামন্ত্রের মতো। আমার সুরের সঙ্গে কত টুকরো টুকরো কথা যে আমি জুড়ি তার আর সংখ্যা নেই— এমন এক লাইনের গান সমস্ত দিন কত জমছে এবং কত বিসর্জন দিচ্ছি। রীতিমত বসে সেগুলোকে পুরো গানে বাঁধতে ইচ্ছা করছে না। এই চৌকিটাতে বসে আকাশ থেকে সোনালি রোদ্‌দুরটুকু পান করতে করতে এবং জলের উপরকার সরস শৈবালের নবীন কোমলতার উপর চোখ দুটো স্নেহস্পর্শের মতো বুলোতে বুলোতে যতটুকু অনায়াস আলস্যভরে আপনিই মনে উদয় হয় তার বেশি চেষ্টা করা আপাতত আমার সাধ্যাতীত। আজ সমস্ত সকাল নিতান্ত সাদাসিধা ভৈরবী রাগিণীতে যে গোটা দুই-তিন ছত্র ক্রমাগত আবৃত্তি করছিলুম সেটুকু মনে আছে এবং নমুনাস্বরূপে নিম্নে উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে।—

ওগো তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে!
(আমার নিত্যনব!)
এসো গন্ধ বরন গানে!
আমি যে দিকে নিরখি তুমি এসো হে
আমার মুগ্ধ মুদিত নয়ানে!

সাতারা
১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৫৩

দিঘপতিয়া জলপথে
২০ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

পদ্মার ও দিকে এখন জল কমে যাচ্ছে, কিন্তু এ দিকে জল বাড়বার এই সময়। চতুর্দিকে তার পরিচয় পাচ্ছি। বড়ো বড়ো গাছ জলের মধ্যে তার সমস্ত গুঁড়িটি ডুবিয়ে দিয়ে শাখাপ্রশাখা জলের উপর অবনত করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে— আমগাছ বটগাছের অন্ধকার জঙ্গলের ভিতরে নৌকো বাঁধা এবং তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গ্রামের লোকেরা স্নান করছে। এক-একটি কুঁড়েঘর স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার চারি পার্শ্বের সমস্ত প্রাঙ্গণ জলমগ্ন। কোথাও মাঠের চিহ্ন দেখবার জো নেই, কেবল ধানের ডগা জলের উপরে একটুখানি মাথা তুলে রয়েছে। বিল-খাল নদী-নালা কত রকম জলপথের মধ্যে দিয়েই যে চলেছি তার ঠিক নেই। ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে বোট সর্‌সর্‌ শব্দে যেতে যেতে হঠাৎ একটা পুকুরের মধ্যে গিয়ে পড়ে—সেখানে আর ধান নেই—নালবনের মধ্যে সাদা সাদা নাল ফুল ফুটে রয়েছে এবং কালোবর্ণ পানকৌড়ি জলের ভিতরে ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরছে। আবার যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় ছোটো নদীর মধ্যে এসে পড়ে— সেখানে এক তীরে ধানের ক্ষেত, আর-এক তীরে ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে গ্রাম— মাঝখান দিয়ে একটি পরিপূর্ণ জলস্রোত এঁকে বেঁকে চলে গেছে। জল যেখানে সুবিধে পাচ্ছে সেইখানেই প্রবেশ করছে—স্থলের এমন পরাভব তোরা বোধ হয় কখনও দেখিস নি। বড়ো বড়ো গোল মাটির গামলার মধ্যে বসে একখণ্ড বাখারিকে দাঁড়ের মতো ব্যবহার করে গ্রামের লোকেরা ইতস্তত যাতায়াত করছে— ডাঙাপথ একেবারেই নেই। আর-একটু জল বাড়লেই ঘরের ভিতরে জল প্রবেশ করবে— তখন মাচা বেঁধে তার উপরে বাস করতে হবে, গোরুগুলো দিনরাত্রি এক হাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে, তাদের খাবার যোগ্য ঘাস ক্রমেই দুর্লভ হয়ে দাঁড়াবে, সাপগুলো তাদের জলমগ্ন গর্ত পরিত্যাগ করে কুঁড়েঘরের চালের মধ্যে এসে আশ্রয় নেবে এবং যত রাজ্যের গৃহহীন কীটপতঙ্গ সরীসৃপ মানুষের সহবাস গ্রহণ করবে। একে গ্রামের চতুর্দিক ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন এবং অন্ধকার— তাতে আবার তারই মধ্যে জল প্রবেশ করে সমস্ত পাতা লতা গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর এবং মানবগৃহের আবর্জনা সমস্ত চার দিকে ভাসতে থাকে, পাট-পচা দুর্গন্ধ জলের রঙ নীল হয়ে ওঠে, উলঙ্গ পেট-মোটা পা-সরু রুগ্ন ছেলেমেয়েগুলো যেখানে সেখানে জলে কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির পচা জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভন্‌ ভন্‌ করতে থাকে— এ অঞ্চলের বর্ষার গ্রামগুলি এমন অস্বাস্থ্যকর আরামহীন আকার ধারণ করে যে তার পাশ দিয়ে যেতে গা কেমন করে। যখন দেখতে পাই গৃহস্থের মেয়েরা একখানা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকর্‌নার নিত্যকর্ম করছে, তখন সে দৃশ্য কিছুতেই ভালো লাগে না। এত কষ্ট এত অনারাম মানুষের কী করে সয় আমি ভেবে পাই নে— এর উপরে প্রতি ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, পিলেওয়ালা ছেলেগুলো অবিশ্রাম ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করে কাঁদছে, কিছুতেই তাদের বাঁচাতে পারছে না— একটা একটা করে মরে যাচ্ছে। এত

অবহেলা অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য দারিদ্র্য বর্বরতা মানুষের আবাসস্থলে কিছুতেই শোভা পায় না। সকল রকম ক্ষমতার কাছেই আমরা পরাভূত হয়ে আছি— প্রকৃতি যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, এবং শাস্ত্র চিরকাল ধরে যে-সমস্ত দুঃসহ উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না। এরকম জাতের পৃথিবী ছেড়ে একেবারে পলাতকা হওয়া উচিত— এদের দ্বারা জগতের কোনো সুখও নেই, শোভাও নেই, এবং সুবিধেও নেই।

সাতারা
২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৫৪

বোয়ালিয়া-পথে
বৃহস্পতিবার?
২২ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

আজ চতুর্দিক নির্মল হয়ে ভারী সুন্দর রোদ উঠেছে [বব]। ছোটো নদী, সুতীব্র স্রোত, তারই প্রতিকূলে গুণ টেনে চলাতে ক্রমাগত কল্‌কল্‌ ছল্‌ছল্‌ শব্দ কানে আসছে। এতদিন বৃষ্টিতে ভেজার পর আজ শরতের নবীন রৌদ্রে নদীর দুই ধারের গাছপালা এবং গ্রামগুলি এমন একটি আরামপুলকের ভাব প্রকাশ করছে! আজ আকাশ এবং পৃথিবী থেকে দুর্দিনের স্মৃতি সমস্ত একেবারে মুছে গেছে। যেন জগতে কোনো কালেই আনন্দের অবসান ছিল না। এই আকাশ-ভরা সোনার রৌদ্রটি আজ আমারও মনের উপর সম্পূর্ণ বিস্তারিত হয়েছে—সেখানে আমার জীবনের সমস্ত সুখস্মৃতির দেশটি শরতের আলোতে এক অপরূপ মায়া-রাজ্যের মতো দেখাচ্ছে। যখন ভেবে দেখি এ জীবনে কেবলমাত্র বত্রিশটি শরৎকাল এসেছে এবং গেছে তখন ভারী আশ্চর্য বোধ হয়— অথচ মনে হয় আমার স্মৃতিপথ ক্রমেই অস্পষ্টতর হয়ে কুহেলিকাময় অনাদিকালের দিকে চলে গেছে, এবং এই-সমস্ত বৃহৎ মানস রাজ্যের উপর যখন মেঘমুক্ত সুন্দর প্রভাতের রৌদ্রটি এসে পড়ে তখন আমি যেন আমার এক মায়া-অট্টালিকার বাতায়নে বসে এক সুদূরবিস্তৃত মায়াময়ী মরীচিকা-রাজ্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি, এবং আমার কপালে যে বাতাসটি এসে লাগতে থাকে সে যেন অতীতের সমস্ত অস্পষ্ট মিশ্রিত মৃদু গন্ধ-প্রবাহ বহন করে আনতে থাকে। আমি আলো এবং আকাশ এত ভালোবাসি! বোধ হয় আমার নামের সার্থকতার জন্যে! গেটে মরবার সময় বলেছিলেন: More light!— আমার যদি সে সময় কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করবার থাকে তো আমি বলি: More light and more space! আমার একটা কবিতায় আমি ইচ্ছা প্রকাশ করেছি—

শূন্য ব্যোম অপরিমাণ,
মদ্যসম করিব পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্ধ্ব নীলাকাশে।

এই আকাশ পান করে আমার এ পর্যন্ত তৃপ্তি হয় নি। অনেকে বাংলাদেশকে সমতলভূমি বলে আপত্তি প্রকাশ করে, কিন্তু সেই জন্যেই বাংলাদেশের মাঠের দৃশ্য, নদীতীরের দৃশ্য, আমার এত বেশি ভালো লাগে। যখন সন্ধ্যার আলোক এবং সন্ধ্যার শান্তি উপর থেকে নামতে থাকে তখন সমস্ত অনবরুদ্ধ আকাশটি একটি নীলকান্ত মণির পেয়ালার মতো আগাগোড়া পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে, যখন স্তিমিত শান্ত নীরব মধ্যাহ্ন তার সমস্ত সোনার আঁচলটি বিছিয়ে দেয় তখন কোথাও সে বাধা পায় না— চেয়ে চেয়ে দেখবার এবং দেখে দেখে মনটা ভরে নেবার এমন জায়গা আর নেই। আমি সেই জন্যে পর্বতের চেয়ে সমুদ্রতীর ঢের বেশি ভালোবাসি। পুরীতে যে দিন সমুদ্রতীরে গিয়ে উপস্থিত হলুম— এক দিকে ধূসর বালি ধূ ধূ করছে, আর-এক দিকে গাঢ়নীল সমুদ্র এবং পাণ্ডুনীল আকাশ দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে— সেদিন সমস্ত অন্তঃকরণ যে কী রকম পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সে ঠিক বলা যায় না। তাই আমার ভারী ইচ্ছে হয়েছিল— পুরীতে সমুদ্রতীরে একটি ছোটো বাড়ি তৈরি করে পড়ে থাকি। এখনও সেই গৃহহারা তরঙ্গের গর্জনশব্দ দূরে স্বপ্নের মতো কানে এসে লাগে। সন্ন্যাসীরা যে রকম করে বেড়িয়ে বেড়ায় তেমনি করে ভ্রমণ করা যদি আমার পক্ষে সহজ হত তা হলে এই অবারিত পৃথিবীর হাতে আপনাকে সমর্পণ করে দিয়ে একবার দেশে দেশান্তরে ঘুরে আসতুম। কিন্তু আকাশও দুই হাত বাড়িয়ে ডাকে, এবং গৃহও দুই হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে। উভচর জীব হয়ে আমি ভারী মুশকিলে পড়েছি। সকল বিষয়েই আমি উভচর— মানসজগৎ এবং বস্তুজগৎ দুইয়ের মধ্যেই আমার সমান বন্ধন।

সাতারা
২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৫৫

বোয়ালিয়া
সোমবার, ২৪ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

তুই যে লিখেছিস যাদের অনুভাব বেশি প্রবল তারা জগতে বেশি দুঃখী হয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না— কারণ, দুঃখভোগ করবার ক্ষমতা অনুভব-শক্তির উপরেই নির্ভর করে। কিন্তু আমি অনেক সময়ে ভেবে দেখেছি সুখী হলুম কি দুঃখী হলুম সেইটে আমার পক্ষে শেষ কথা নয়। আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি সমস্ত সুখদুঃখের ভিতরে নিজের একটা বৃদ্ধি অনুভব করতে থাকে। আমাদের ক্ষণিক জীবন এবং চিরজীবন দুটো একত্র সংলগ্ন হয়ে আছে মাত্র, কিন্তু দুটো এক নয়, এ আমি মাঝে মাঝে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের ক্ষণিক জীবন যে সুখ দুঃখ ভোগ করে আমাদের চিরজীবন তার থেকে সারাংশ গ্রহণ করে। তুই বোধ হয় জানিস গাছের সবুজ পাতা সূর্যকিরণকে বিশ্লেষণ করে তার থেকে কার্বন-নামক অঙ্গারপদার্থ-সঞ্চয়ের সাহায্য করে, যে কার্বন থাকাতে গাছ পোড়ালে আগুন হয়। গাছের পাতা প্রতিদিন রৌদ্রে প্রসারিত হয়ে শুষ্ক হয়ে ঝরে যাচ্ছে, আবার নতুন নতুন পাতা গজাচ্ছে— গাছের ক্ষণিক জীবন কেবল

রৌদ্র ভোগ করছে এবং সেই উত্তাপেই শুকিয়ে পড়ে যাচ্ছে— আর গাছের চিরজীবন তার ভিতর থেকে দাহহীন চির-অগ্নি সঞ্চয় করছে। আমাদেরও প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের পল্লবরাশি চতুর্দিকে প্রসারিত হয়ে জগতের সমস্ত প্রবহমান সুখ দুঃখ ভোগ করছে এবং সেই সুখদুঃখের উত্তাপে শুষ্ক হয়ে দগ্ধ হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে, কিন্তু আমাদের চিরজীবনকে সেই প্রতি মুহূর্তের দাহ স্পর্শ করতে পারে না— অথচ তার তেজটুকু সে আপনার অন্তরে ক্রমাগতই অলক্ষিত অচেতন ভাবে সঞ্চয় করতে থাকে। যে গাছের পাতা সবুজ নয় সে গাছ উচ্চশ্রেণীর গাছ নয়, তার কার্বন-সঞ্চয়ও সামান্য। যে মানুষের প্রতি মুহূর্তের অনুভব-শক্তি সুখদুঃখ-ভোগ-শক্তি সামান্য, তার দাহও অল্প, তার চিরপ্রাণের সঞ্চয়ও অতি অকিঞ্চিৎকর। তার ক্ষণিক জীবনটা সুখদুঃখের তাপ থেকে সংরক্ষিত হয়ে অনেকদিন স্থায়ী হয়— অর্থাৎ প্রায় দেখা যায়, প্রতিদিনের ক্ষুদ্র সংসার, সংকীর্ণ জীবনযাত্রার অতি সংকীর্ণ সীমা, তাদের কাছে চিরকাল যথেষ্ট থাকে; সেটা তাদের শুষ্ক হয় না, ঝরে যায় না। তারা অচেতনতার আবরণে ক্ষণিককে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী করে রাখে; দুদিনকে এমন তাজা রেখে দেয় যে দেখে মনে হয় তা চিরদিনের; সংসারের সামান্য ব্যাপারকে এমন করে তোলে যেন তা অসামান্য। কিন্তু সংসারের সর্বত্রই ক্ষতি-পূরণের একটা নিয়ম আছে, যাকে বলে 'law of compensation'। প্রতিদিনকে সজীবভাবে সংরক্ষণ করতে চেষ্টা করলে চিরদিনকে নির্জীব করা হয়। যারা অনুভবশক্তির জড়ত্ব-বশত সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট সেই সংসারী বিষয়ী লোকেরা ক্ষণিকজীবনের সন্তোষসুখে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে, কিন্তু চিরজীবনের সুগভীর আনন্দ তাদের কল্পনার অতীত, ধারণার অগম্য— তারা সেটাকে কবিতার অলংকার বলে জ্ঞান করে, মনের সঙ্গে বিশ্বাস করে না। সেই জন্য, যে সুখ সাংসারিক সুখ নয় এবং যে দুঃখ সাংসারিক দুঃখ সেইটেকে পরিত্যাগ করে চলাই জীবনযাত্রার আদর্শ বলে জ্ঞান করে এবং কারও সাধ্য নেই তাদের মনে এর চেয়ে উচ্চতর আদর্শের যথার্থ উপলব্ধি জন্মিয়ে দেওয়া— তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, যারা অত্যন্ত বৃহৎ দুঃখের দ্বারা দুঃখ পাচ্ছে তারাও তোমার মতো কৃপাপাত্র নয়। আমি আমার ভাবটা ঠিক পরিষ্কার করতে পেরেছি কিনা জানি নে [বব]। আমাদের মনের যেগুলো যথার্থ কথা সেগুলো এত অন্তরে বসতি করে যে অন্যের কাছে তাদের ঠিক পরিদৃশ্যমান করে তোলা, ঠিক সত্যরূপে প্রতীয়মান করে তোলা, ভারী কঠিন বলে মনে হয়— সেই জন্যে গোড়ায় চেষ্টা করতেই ভয় হয়। যা আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা গভীরতম সত্য— যা আমাদের জীবনের মর্মস্থানে বিরাজ করে— তাকে আমরা নানা আকারে, নানা কথায়, নানা কাজে, অজ্ঞাতসারে খণ্ড খণ্ড করে প্রকাশ করি। কিন্তু একেবারে সমগ্রভাবে তাকে অন্যের কাছে, এমন-কি নিজের কাছে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য করা বড়ো শক্ত— ভয় হয় পাছে, যে জিনিসটা অন্তঃকরণের পক্ষে একান্ত সত্য সেইটেই বাইরে বেরোতে গেলে কাল্পনিক বেশ ধারণ করে আসে।

সাতারা
২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৫৬

বোয়ালিয়া
২৪ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

আমার স্বীকার করতে লজ্জা করে এবং ভেবে দেখতে দুঃখ বোধ হয়—সাধারণত মানুষের সংসর্গ আমাকে বড়ো বেশি উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়, আমাকে ভিতরে ভিতরে পীড়ন করতে থাকে—সকলের মতো হয়ে, সকল মানুষের সঙ্গে বেশ সহজভাবে মিলেমিশে, সহজ আমোদপ্রমোদে আনন্দ লাভ করবার জন্যে আমার মনকে আমি প্রতিদিন দীর্ঘ উপদেশ দিয়ে থাকি, কিন্তু আমার চারি দিকেই এমন একটি গণ্ডি আছে আমি কিছুতেই সে লঙ্ঘন করতে পারি নে। লোকের মধ্যে আমি নতুন প্রাণী, কিছুতেই তাদের সঙ্গে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না—আমার যারা বহুকালের বন্ধু তাদের কাছ থেকেও আমি বহু দূরে। যখন আমি স্বভাবতই দূরে তখন সামাজিকতার খাতিরে জোর করে নিকটে থাকা মনের পক্ষে বড়োই শ্রান্তিজনক। অথচ মানুষের সঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাও যে আমার পক্ষে স্বাভাবিক তাও নয়; থেকে থেকে সকলের মাঝখানে গিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে—কোথায় কী কাজকর্ম হচ্ছে, কী আন্দোলন চলছে, তাতে আমারও যোগ দিতে, সাহায্য করতে ইচ্ছে হয়—মানুষের সঙ্গের যে জীবনোত্তাপ সেও যেন মনের প্রাণধারণের পক্ষে আবশ্যক। এই দুই বিরোধের সামঞ্জস্য হচ্ছে—এমন নিতান্ত আত্মীয় লোকের সহবাস যারা সংঘর্ষের দ্বারা মনকে শ্রান্ত করে দেয় না, এমন-কি, যারা আনন্দদান করে মনের সমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলিকে সহজে এবং উৎসাহের সহিত পরিচালিত করবার সহায়তা করে।

সাতারা
২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৫৭

বোয়ালিয়া
২৫ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

ভেবে দেখ্, আমরা যখন খুব বড়ো রকমের আত্মবিসর্জন করি সেটা কেন করি। একটা মহৎ আবেগে আমাদের তুচ্ছ ক্ষণিক জীবনটা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার সুখ দুঃখ আমাদের স্পর্শই করতে পারে না। আমরা হঠাৎ দেখতে পাই আমরা সুখদুঃখের চেয়েও বড়ো, আমরা নিত্যনৈমিত্তিক তুচ্ছ বন্ধন থেকে মুক্ত। সুখের চেষ্টা এবং দুঃখের পরিহার এই আমাদের ক্ষণিক জীবনের প্রধান নিয়ম; কিন্তু এক-একটা সময় আসে যখন আমরা আবিষ্কার করতে পারি যে, আমাদের ভিতরে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে সে নিয়ম খাটে না—যেখানে দুঃখ দুঃখই নয় এবং সুখ একটা উদ্দেশ্যের মধ্যেই গণ্য হয় না—যেখানে আমরা সমস্ত ক্ষুদ্র নিয়মের অতীত, স্বাধীন। তখন আমরা আমাদের ক্ষণিক জীবনটাকে পরাভূত করেই একটা আনন্দ পাই, দুঃখকে গলার হার করে নিয়ে পরেই একটা উল্লাস পাই—তখন মনে হয় আমার ভিতরকার সেই স্বাধীন পুরুষের বলেই আমি চিরকাল সমস্ত সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে আনন্দে আমার প্রকৃতির সফলতা সাধন

করব। কিন্তু আবার চারি দিকের সংসার, লোকের সংসর্গ, প্রতিদিনের কথাবার্তা ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রবল হয়ে বেড়ে উঠে আমাদের সেই অন্তরতম স্বাধীনতার ক্ষেত্র আমাদের চোখ থেকে ঢেকে ফেলে— তখন আবার আত্মবিসর্জন সুকঠিন হয়ে ওঠে, স্বার্থসুখ প্রবল হয়ে দেখা দেয়। মহৎ লোকের সঙ্গে ইতর লোকের প্রধান প্রভেদ এই যে, মহৎ লোকেরা অধিকাংশ সময়ে আপনার ভিতরকার সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সেই চিরজীবনের ভিতরে বাস করতে পারে, ইতর লোকের পক্ষে সে জায়গাটা অধিকাংশ সময়ে দুর্গম এবং অজ্ঞাত। [বব], আমি যখন একলা মফস্বলে থাকি তখন প্রকৃতির ভিতরকার সৌন্দর্য আনন্দ আমার অন্তরের সেই নিগূঢ় আনন্দনিকেতনের দ্বার খুলে দিয়ে ভিতরে বাইরে এক করে দেয়, তখন সংসারের ক্ষণিক মূর্তি আমার কাছ থেকে দূরে চলে যায়— গানের সুরের দ্বারা গানের তুচ্ছ কথাগুলো যেমন অমরতা প্রাপ্ত হয় তেমনি প্রতিদিনের সংসারের বাহ্য আকারটা আমার মনের ভিতরকার চিরানন্দরাগিণীর দ্বারা একটা চিরমহিমা লাভ করে। আমাদের সমস্ত স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধ একটা বিনম্র আত্মবিস্মৃত ধর্মোপাসনার ভাবে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে— দুঃখের দুঃখত্বটা যে চলে যায় তা নয়, কিন্তু সে আমার স্বার্থের সীমা অতিক্রম করে এমন সুবৃহৎ আকাশে ব্যাপ্ত হয়ে যায় যে, সেখানে সে একটা সৌন্দর্য বিকিরণ করতে থাকে— যেমন সূর্যাস্তের আলোক সমস্ত জলে স্থলে আকাশে একটা বিষাদের ছায়া ফেলে বটে, কিন্তু তার মধ্যে একটি উত্তাপবিহীন সুকোমল সৌন্দর্যের আনন্দ মিশ্রিত থাকে। এবার বোটে থাকতে আমি অন্তর্যামী-নামক একটি কবিতা লিখেছি, তাতে আমি আমার এই অন্তরজীবনের কথা অনেকটা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি। কৃতকার্য হয়েছি কি না জানি নে— কারণ, প্রকাশ হওয়া লেখকের ক্ষমতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, পাঠকের অভিজ্ঞতার উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। কিছুদিন হল তোর একখানি চিঠিতে এই অন্তরজীবনের প্রকাশ দেখে আমি ভারী খুশি হয়েছিলুম— নিশ্চয় তুই অনেক সময় তোর নিজের ভিতরকার এই যথার্থ স্বরূপ অনুভব করিস, কিন্তু নিজের প্রতি অবিশ্বাস করে প্রকাশ করতে চাস নে। তোর সন্দেহ হয় যে, এক-এক দিনের সেই ভাবটাই সত্য, না, প্রতিদিনের তুচ্ছতাই সত্য। সে রকম সন্দেহ করিস নে [বব]। কারণ, সত্যকে সন্দেহ করলে অনেক সময় সত্যকে নষ্ট করা হয়। যে-সমস্ত শুভমুহূর্তে আমরা নিজেকে খুব বড়ো বলে অনুভব করি সেই মুহূর্তগুলিকে চিহ্নিত করে রেখে দিলে তারা স্মৃতির সাহায্য করে ভবিষ্যতে পথপ্রদর্শনের উপায় হয়। আমি আমার সৌন্দর্য-উজ্জ্বল আনন্দের মুহূর্তগুলিকে ভাষার দ্বারা বারম্বার স্থায়ীভাবে মূর্তিমান করাতেই ক্রমশই আমার অন্তর্জীবনের পথ সুগম হয়ে এসেছে— সেই মুহূর্তগুলি যদি ক্ষণিক সম্ভোগেই ব্যয় হয়ে যেত তা হলে তারা চিরকালই অস্পষ্ট সুদূর মরীচিকার মতো থাকত, ক্রমশ এমন দৃঢ় বিশ্বাস এবং সুস্পষ্ট অনুভবের মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠত না। অনেক দিন থেকে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ভাষার দ্বারা চিহ্নিত করে এসে জগতের অন্তর্জগৎ, জীবনের অন্তর্জীবন, স্নেহপ্রীতির দিব্যত্ব আমার কাছে আজ আকার ধারণ করে উঠছে— নিজের কথা আমার নিজেকে সহায়তা করেছে— অন্যের কথা থেকে আমি এ জিনিস কিছুতে পেতুম না।

সাতারা
৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৫৮

কলকাতা
২৯ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

আশ্চর্য এই যে, আজকাল আমার কবিতার প্রশংসা শুনলে আমার মনে সেরকম একটা পুলকসঞ্চার হয় না। আসল, তার কারণ, যে আমাকে লোকে প্রশংসা করছে সেই আমিই যে কবিতা লিখে থাকে এ আমার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমি জানি, যে-সমস্ত ভালো কবিতা আমি লিখেছি সে আমি ইচ্ছে করলেই লিখতে পারি নে— তার একটা লাইন হারিয়ে গেলেও বহু চেষ্টায় সে লাইন গড়তে পারি কিনা সন্দেহ। প্রশংসা শুনলেই মনে হয় এ প্রশংসার যোগ্য আমি হতে পারব কিনা— ভালো লেখা যা-কিছু লিখেছি হয়তো সেরকম আর কখনো লিখতে পারব না। কারণ, যে শক্তি আমাকে লেখায় সে আমার ক্ষমতার বাইরে। তোকে একখানা কাগজ থেকে আমার একটা সমালোচনা পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ লোকটা কিছু ওরিজিনাল চাল চেলেছে। এ আমার কবিতাগুলোকে গাল দিয়ে আমার গল্প-গুলোকে আকাশে তুলে দিয়েছে। আবার এক সম্প্রদায়ের লোক আছে যারা ঠিক এর উল্টো দিক দিয়ে যায়। মধ্যখানে আমি বিস্ময়ান্বিত হয়ে সকৌতুকভাবে বসে থাকি। লেখকজীবন যতদিন থাকবে ততদিন কত রকম-বেরকম কথাই যে শুনতে হবে তার আর ঠিক নেই। আবার, একদল লোক আছে যারা বলে আমার অন্য সব রচনা ক্ষণস্থায়ী, কেবল একমাত্র গানই আমাকে লোকসমাজে অমর করে রেখে দেবে। আমি ভাবি, যদি খ্যাতিলাভ মানুষের দুরাকাঙ্ক্ষার শেষ লক্ষ্য হয় তবে আমার আর ভাবনা নেই— অন্ধকার অমরতাকে লক্ষ্য করে আমি অনেকগুলো ঢিল ছুঁড়তে বসেছি, যেটা হোক একটা লেগে যেতেও পারে। কিন্তু একবার দৈবাৎ লাগা এক, আর চিরকাল লেগে থাকা এক। চিরকাল কোন্ জিনিসটা থাকবে না-থাকবে তা কেউ বলতে পারে না এবং আমিও সে সম্বন্ধে কোনোরকম তর্ক-বিতর্ক করতে চাই নে— নিজের মনের ভিতর যখন একটা সফলতার আনন্দ অনুভব করা যায় সেইটেই লেখকের পক্ষে যথার্থ অমরতা। দুর্ভাগ্যক্রমে সে আনন্দ খুব ভালো লেখক থেকে খুব খারাপ লেখক পর্যন্ত প্রায় সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে অনুভব করে থাকে।

সাতারা
৩ অক্টোবর ১৮৯৪

১৫৯

কলকাতা
৫ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল সমস্ত বৃষ্টি বাদলা শেষ হয়ে গেছে। আজ সকালে সুন্দর রোদ্দুর উঠেছে। আজ সকালের বাতাসের মধ্যে অতি ঈষৎ শীতের সঞ্চার হয়েছে, একটুখানি যেন শিউরে ওঠার মতো। কাল দুর্গাপুজো আরম্ভ হবে, আজ তার সুন্দর সূচনা

হয়েছে। ঘরে ঘরে সমস্ত দেশের লোকের মনে যখন একটা আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হচ্ছে তখন তাদের সঙ্গে সামাজিক বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে। পরশু দিন সকালে [সুরেশ সমাজপতির] বাড়ি যাবার সময় দেখছিলুম রাস্তার দু ধারে প্রায় বড়ো বড়ো বাড়ির দালান মাত্রেই দুর্গার দশ-হাত-তোলা প্রতিমা তৈরি হচ্ছে—এবং আশে পাশে সমস্ত বাড়ির ছেলের দল ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দেখে আমার মনে হল দেশের ছেলেবুড়ো সকলেই হঠাৎ দিনকতকের মতো ছেলেমানুষ হয়ে উঠে সবাই মিলে একটা বড়ো গোছের পুতুল-খেলায় প্রবৃত্ত হয়েছে। ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে সমস্ত উচ্চ-অঙ্গের আনন্দ মাত্রই পুতুল-খেলা, অর্থাৎ তাতে কোনো উদ্দেশ্য নেই, লাভ নেই—বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বৃথা সময় নষ্ট। কিন্তু, সমস্ত দেশের লোকের মনে যাতে করে একটা ভাবের আন্দোলন, একটা বৃহৎ উচ্ছ্বাস এনে দেয়, সে জিনিসটি কখনোই নিষ্ফল এবং সামান্য নয়। সমাজের মধ্যে কত লোক আছে যারা কঠিন নীরস বিষয়ী লোক, যাদের কাছে কবিতা সংগীত প্রভৃতি সমস্তই তুচ্ছ, তারাও এই উৎসব-উপলক্ষে একটা সর্বব্যাপী ভাবের দ্বারা বিচলিত হয়ে সকলের সঙ্গে এক হয়ে যায়। প্রতি বৎসরের এই ভাবের প্লাবনে নিশ্চয়ই মানুষকে অনেকটা পরিমাণে humanize করে দেয়; কিছুকালের জন্যে মনের এমন একটি অনুকূল আর্দ্র অবস্থা এনে দেয় যাতে স্নেহ প্রীতি দয়া সহজে অঙ্কুরিত হতে পারে—আগমনী বিজয়ার গান, প্রিয়সম্মিলন, নহবতের সুর, শরতের রৌদ্র এবং আকাশের স্বচ্ছতা, সমস্তটা মিলে মনের ভিতরে একটি আনন্দময় সৌন্দর্যকাব্য রচনা করে দেয়। আমার এবারকার 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধটাতে কতকটা বলেছি যে, ছেলেদের যে আনন্দ সেইটেই বিশুদ্ধ আনন্দের আদর্শ। তারা একটা তুচ্ছ উপলক্ষ্য নিয়ে সেইটেকে নিজের মনের ভাবে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে—তারা সামান্য একটা কদাকার অসম্পূর্ণ পুতুলকে নিজের প্রাণ এবং নিজের সুখ দুঃখে জীবন্ত করে তোলে। সে ক্ষমতাটা যে লোক বড়ো বয়স পর্যন্ত রাখতে পারে তাকেই আমরা ভাবুক বলি। তার কাছে চতুর্দিক্‌বর্তী সমস্ত জিনিস নিতান্ত কেবল জিনিস নয়, কেবল দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর নয়, কিন্তু ভাবগোচর—তার সমস্ত সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা সে একটি সংগীতের দ্বারা পূর্ণ করে নেয়। সেই ভাবুকতা দেশের সমস্ত লোকের কাছে কখনোই আশা করা যায় না, কিন্তু এই রকম উৎসবের সময় ভাবস্রোত দেশের অধিকাংশ লোকের মন অধিকার করে নেয়। তখন, যেটাকে আমরা দূর থেকে শুষ্ক হৃদয়ে সামান্য পুতুলমাত্র দেখছি সেইটে কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে পুতুল-আকার ত্যাগ করে; তখন তার মধ্যে এমন একটি বৃহৎ ভাবের এবং প্রাণের সঞ্চার হয় যে, দেশের রসিক-অরসিক সকল লোকই তার সেই অমৃতধারায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। তার পরে আবার পুতুল যখন পুতুল হয়ে আসে তখন সেটাকে জলে ফেলে দেয়। পৃথিবীর সকল জিনিসই এই পুতুল। আমরা যাকে ভালোবাসি, অন্য লোকের কাছে সে একটি দৃশ্যমান আকারবিশিষ্ট মানুষ মাত্র—কিন্তু আমার কাছে সে একটি অপরূপ ভাবের জ্যোতিতে দীপ্যমান, আমার কাছে সে অসীম অনন্ত। যার কান নেই তার কাছে গান শব্দমাত্র, আমার কাছে সেই শব্দ সংগীত। পৃথিবীর সৌন্দর্য যে দেখতে পায় না পৃথিবী তার কাছে: মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ। কিন্তু সেই জলরেখাবলয়িত মৃৎপিণ্ডই আমার কাছে পৃথিবী। অতএব এক রকম করে দেখতে গেলে সব জিনিসই পুতুল, কিন্তু হৃদয়ের ভিতর দিয়ে, কল্পনার ভিতর

দিয়ে দেখতে গেলে তাদের দেবতা বলে চেনা যায়— তাদের সীমা পাওয়া যায় না। এই কারণে, সমস্ত বাংলাদেশের লোক যাকে উপলক্ষ্য করে আনন্দে ভক্তিতে প্লাবিত হয়ে উঠেছে, তাকে আমি মাটির পুতুল বলে যদি দেখি তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের অভাব প্রকাশ পায়।

সাতারা
৯ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬০

কলকাতা
৭ অক্টোবর। ১৮৯৪।

আমিও জানি [বব] তোকে আমি যে সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয় নি। আমার প্রকাশিত লেখা আমি যাদের দিই, ইচ্ছা করলেও আমি তাদের এ-সমস্ত দিতে পারি নে। সে আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিম্বা ভুল বুঝবি, কিম্বা বিশ্বাস করবি নে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেই জন্যে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি। যখন মনে জানি পাঠকরা আমাকে ভালো করে জানে না, আমার অনেক কথাই তারা ঠিকটি বুঝবে না এবং নম্রভাবে বোঝবার চেষ্টাও করবে না, এবং যেটুকু তাদের নিজের মানসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে না সেটুকু আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে গ্রহণ করবে না— তখন মনের ভাবগুলি তেমন সহজে ভাষায় প্রবাহিত হতে চায় না এবং যতটুকু প্রকাশ হয় তার মধ্যে অনেকখানি ছদ্মবেশ থেকে যায়। এর থেকেই বেশ বুঝতে পারি আমাদের সব চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে নিজের ইচ্ছা-অনুসারে দিতে পারি নে। আমাদের ভিতরে সব চেয়ে যা গভীরতম উচ্চতম অন্তরতম সে আমাদের আয়ত্তের অতীত; তা আমাদের দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা নেই; মূল্য নিয়ে বিক্রি করতে চেষ্টা করলেই তার উপরকার আবরণটি কেবল পাওয়া যায়, আসল জিনিসটি হাত থেকে সরে যায়। নিজের যা সর্বোৎকৃষ্ট তা ক'জন লোক পৃথিবীতে রেখে যেতে পেরেছে? ক'জনই বা তাকে নিজে ধরতে পেরেছে? সেই জন্যেই তো আমি জীবন-চরিতে বিশ্বাস করি নে। আমরা দৈবক্রমে প্রকাশ হই, আমরা ইচ্ছা করলে চেষ্টা করলেও প্রকাশ হতে পারি নে— চব্বিশ ঘণ্টা যাদের সঙ্গে থাকি তাদের কাছেও আপনাকে ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যের অতীত। তুই আমাকে অনেক দিন থেকে জেনে আসছিস বলেই যে তোর কাছে আমার মনের ভাব ভালো করে ব্যক্ত হয় তা নয়; তোর এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে, সত্য আপনি তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ হয়। সে তোর নিজের গুণে। যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে ভালো লেখা তার চিঠিতেই দেখা দেয় তা হলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে

চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে। আমি তো আরও অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারে নি। তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, নানান লোকের নানান ধরন, নানান রকম-সকম, সেই রকম-সকম-গুলোকে বাঁচিয়ে চলতে হয়। ধরন-ধারণ-ওয়ালা মানুষের কাছে কথাবার্তাগুলো সহজেই বেঁকেচুরে প্রকাশ পায়— তারা নিজেও সমস্ত জিনিস নিজের ধরনে দেখে এবং তাদের নিকটবর্তী সকলেও তাদের কাছে কেবল তাদেরই মাপে আপনাকে প্রকাশ করে। তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল স্বচ্ছতা আছে, সত্যের প্রতিবিম্ব তোর ভিতরে বেশ অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয়। সেই জর্মন মেয়েটি যে তোর কাছে তার মনের সমস্ত গভীর ভাব ব্যক্ত করে সুখী হয়, তোর স্বাভাবিক প্রশান্ত স্বচ্ছতাই তার কারণ। সহজে সত্য আকর্ষণ করে নেবার ক্ষমতাটি তোর আছে। সত্য মানে হচ্ছে অকৃত্রিম ভিতরের কথাটি, যে কথাটি সব সময়ে আমরা নিজেও জানতে পারি নে— কেবল গল্প-গুজব আলাপ-পরিচয় হাসি-তামাশা নয়। বায়রন মুর'কে যে-সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছিল তাতে কেবল বায়রনের স্বভাব প্রকাশ পায় নি, মুরের স্বভাবও প্রকাশ পেয়েছে— সে-সব চিঠি যত ভালোই হোক তাতে বায়রনের আন্তরিক স্বভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় নি, মুরের স্বভাবের উপর প্রতিহত হয়ে সে এক বিশেষ মূর্তি ধারণ করেছে। যে শোনে এবং যে বলে এই দুজনে মিলে তবে রচনা হয়—

> 'তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ,
>   তবে সে কলতান উঠে।
> বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে,
>   তবে সে মর্মর ফুটে।'

সাতারা
১১ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬১

কলকাতা
৯ অক্টোবর। ১৮৯৪।

শাস্ত্রে আছে অনেকগুলি আবরণের দ্বারা আমরা নির্মিত। যথা, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ। আমি যখন কলকাতায় থাকি তখন অন্নময় প্রাণময় কোষটাই প্রবল হয়ে উঠে অন্য সমস্ত সূক্ষ্ম কোষগুলিকে অভিভূত করে ফেলে। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকের মতো খাইদাই, ঘুমোই বেড়াই, গল্প করি, নিত্যনিয়মিত জড় অভ্যাসের জালে প্রতিদিন জড়ীভূত হয়ে পড়ি— ভাববার, অনুভব করবার, কল্পনা করবার, মনের ভাব প্রকাশ করবার অবসর এবং উত্তেজনা অল্পে অল্পে চলে যায়— সমস্ত যেন ভাত-চাপা পড়ে যায়। অবশ্য ভিতরে ভিতরে দিনরাত্তির একটা অবিশ্রাম খুঁতখুঁত চলতে থাকে— জড়ত্বের ভার প্রতি মুহূর্তেই দুর্বহ হয়ে ওঠে। সাদাসিধা রকমের খাওয়া পরা

এবং উচ্চ রকমের ভাবাচিন্তা এইটেই বাস্তবিক আমার মনের আদর্শ। আরাম এবং সাজসরঞ্জাম এবং ছোটোখাটো নিয়মিত অভ্যাস আমাকে যেন গরম রাত্রে পালক-ভরা লেপের মতো হাঁপ ধরিয়ে দিতে থাকে। চতুর্দিকটা বেশ সাদাসিধা ফাঁকা হলে মনের জন্যে অনেকখানি জায়গা পাওয়া যায়, নইলে যতই জিনিস-পত্র চাকর-বাকর উদ্যোগ-আয়োজন বাড়তে থাকে ততই মানসিক দৃষ্টির পার্স্পেক্টিভ অবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং আনন্দের চেয়ে আরামটাই প্রচুর হয়ে ওঠে। জাপানিদের গৃহসজ্জা যেরকম শোনা যায়— ধব্‌ধবে পরিষ্কার একটিমাত্র মাদুর, দেয়ালের একটি ফুলদানিতে একটিমাত্র পুষ্পমঞ্জরী, আর কোনো-কিছু আসবাবের ভিড় নেই—সে আমার মনে করতে বেশ লাগে। যদি চোখের সুখ দিতে চাও তবে এমন বন্দোবস্ত করো যাতে জানলাটি খুলে আকাশটি অবারিত এবং চারি দিকটি গাছপালায় মনোরম দেখতে পাওয়া যায়। নিজের শরীরের চারি দিকেই অর্থহীন জিনিসপত্রের ঘেঁষাঘেঁষিটা বড়ো শ্রান্তিজনক— কারণ, জিনিসপত্র কর্তা হয়ে উঠলে মনের পক্ষে সেটা বড়োই অসহ্য। আমি তো এখান থেকে পালাই-পালাই করছি। শীঘ্রই বোলপুরে যাব সংকল্প করেছি। আমি বেশ বুঝতে পারছি সেখানে যখন সেই গাড়িবারান্দার ছাতের উপর বড়ো কেদারা পেতে একলাটি শরতের সন্ধ্যালোকে বোলপুরের দিগন্তপ্রসারিত সবুজ মাঠের উপর আমার অন্তঃকরণের সমস্ত ভাঁজগুলি খুলে দিয়ে তাকে বিস্তৃত করে দিতে পারব তখন অগাধ শান্তিরসে আমার সমস্ত জীবন অভিষিক্ত হয়ে উঠবে।

সাতারা
১৩ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬২

কলকাতা
বুধবার ?
১১ অক্টোবর। ১৮৯৪।

আজ শরৎকালের সুন্দর সকাল বেলাটা চুপচাপ করে কৌচে পড়ে কাটিয়েছি—আমার টবের গাছপালাগুলোকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সুন্দর বাতাস এসে গায়ে লাগছিল। আমার ভারী ইচ্ছা করছিল আমি এই রকম করে শুয়ে থাকি আর পাশের ঘর থেকে কেউ আপন ইচ্ছামত পিয়ানোতে একটার পর একটা বাজনা বাজিয়ে যায়। তার মধ্যে আমার সেই Chopinটাও থাকে। মনের ভিতর এই রকম যে-একটা ইচ্ছা জন্মায়, সেই ইচ্ছাটা অপরিতৃপ্ত থাকলেও তার ভিতরে এক রকম সুখ আছে। সব চেয়ে কষ্টের অবস্থা— যখন মনেতে ইচ্ছাও জন্মায় না। মনটা যখন অসাড় জড়বৎ হয়ে যায়। প্রকৃতির মধ্যে সর্বদা যে-একটি বাজনা বাজছে আমাদের মনের ভিতরে সেইটেই বিচিত্র ব্যাকুল ইচ্ছা-আকারে সংগীত রচনা করে—সেই ইচ্ছাগুলির একটি সুন্দর রাগিণী আছে, খুব কোমল-সুর-ওয়ালা সকাল বেলাকার গানের মতো—সেই রাগিণীর দ্বারা সেই অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলির বিষাদটিও সান্ত্বনাময় লাবণ্যময় হয়ে ওঠে। যখন বিশ্বপ্রকৃতির সেই বীণাধ্বনি

মনের অত্যন্ত ছায়াময় দূর দূরান্তর পর্যন্ত সকরুণ হা হা স্বরে প্রতিধ্বনিত হয়ে না ওঠে তখনি মনটা যথার্থ নিরানন্দ নিশ্চেষ্ট নির্জীব হয়ে পড়ে। তখন মনের বিশেষ কোনো বেদনা না থাকতে পারে, কিন্তু তার ভারটা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকে।......

বীণটা ভারী চমৎকার বাজিয়েছিল। অনেকটা সেই বদ্রির মতো—মুচড়ে-মুচড়ে নিংড়ে-নিংড়ে কাঁদিয়ে-কাঁদিয়ে সুর বের করতে লাগল—এক-একবার সরু মোটা সব ক'টা তারের প্রবল ঝংকারে মনের এক দিক থেকে আর-একটা দিক পর্যন্ত দ্রুতপদে অনেকগুলো ঢেউ তুলে দিয়ে চলে গেল, আবার খানিক বাদে অত্যন্ত মৃদু করুণ মিলিতপ্রায় মর্মরধ্বনিতে দুখানি সুকোমল করতল দিয়ে মনের সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত ঢেউগুলিকে যেন সমান মসৃণ করে দিয়ে গেল। যন্ত্রটা যে কত রকমের কথা কইতে লাগল তার সব কথা কে বুঝতে পারবে—একেবারে যেন বুকের ভিতরে মুখ দিয়ে তার যা-কিছু বলবার ছিল সমস্ত বলে গেল—এক-একবার যখন মোটা তারটার পুরুষকণ্ঠোচিত গাম্ভীর্যের ভিতর থেকে একটা উদার করুণা ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল তখন মনে হতে লাগল সংসারের সমস্তই সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং মিথ্যা বলেই এমন অনন্তবেদনাময় এবং এমন অসীম-সুন্দর, তাই তার মধ্যে এত রাগিণী এবং এত মূর্ছনা।... ... ...

কাল রাত জেগে আজ সকাল বেলায় সর্বাঙ্গে একটি ক্লান্তি নিয়ে কৌচে পড়ে ছিলুম—তাই অর্ধনিমীলিত চোখে রোদ্দুর এবং গাছের কম্পন এবং শ্রান্ত শরীরে বাতাসটি খুব মিষ্টি লাগছিল। আজ শরতের সকালটি প্রতিমাবিসর্জন এবং উৎসবের স্মৃতি -দ্বারা পূর্ণ হয়ে যেন ছল্ ছল্ করছিল; যেন যে-সমস্ত নহবতের বাজনা থেমে গেছে তারা আজ নীরবভাবে সমস্ত নির্মল আকাশে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে এবং উৎসব-আনন্দের অবসানে যে-একটি দীর্ঘনিশ্বাসজড়িত কর্ম-বিহীন ক্লান্তি এবং অবসাদ উপস্থিত হয় তাই আজ শরতের রৌদ্রে মিশ্রিত বিস্তৃত হয়ে সমস্ত জল স্থল আকাশকে একটি নিস্তব্ধ বিষাদে মণ্ডিত করে রেখেছে।

সাতারা
১৫ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬৩

কলকাতা
১৭ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল 'ব...র' সঙ্গে 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধ নিয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন, অমন একটা তুচ্ছ উদ্দেশ্যবিহীন বিষয় নিয়ে আমি কেন সাধারণের কাছে বক্তৃতা দিতে গেলুম তিনি বুঝতে পারেন নি। আমি বললুম, কালিদাস শকুন্তলা কেন লিখেছিলেন এবং সেটা আজ পর্যন্ত কেন টিকে আছে? আমাদের চার দিকে যে-সমস্ত ছোটো বড়ো জিনিস আছে এবং প্রতি মুহূর্তে এসে পড়ছে তাদের কত রকম ভাবে দেখা যেতে পারে, তাদের ভিতর থেকে কত রকম সুখ আবিষ্কার করা যেতে পারে —এইটেই হচ্ছে মানুষের সব-প্রধান চর্চার বিষয়। যে শিক্ষায়

মানুষের মনকে সচেতন করে দেয়, বিশ্বসংসারকে নানাভাবে অনুভব করবার শক্তি সঞ্চার করে, সেইটেই হচ্ছে মানুষের পক্ষে খুব একটা মূল্যবান শিক্ষা। সাহিত্যে আর কোনো প্রত্যক্ষ ফল নেই, কিন্তু সে মানুষের প্রকৃতিকে সব দিকে সচেতন করে তোলে—তার অর্থ, সে মানুষের প্রকৃতিকে বৃহৎ করে দেয়, পূর্বে যেখানে তার কোনো অধিকার ছিল না সেখানেও তার অধিকার বিস্তার হতে থাকে। প্রাপ্ত ফলের অপেক্ষা পাবার শক্তিটা ঢের বড়ো—সেই জন্যে সাহিত্যে অবলম্ব্য বিষয়ের দিকে ততটা বেশি মনোযোগ দেয় না যেমন তার রচনার দিকে, কল্পনার দিকে, প্রকাশের দিকে। কিন্তু এ সমস্ত কথা ব... ঠিক বুঝতে পারলেন কি না ঠিক বলতে পারি নে।

সাতারা
২১ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬৪

বোলপুর
১৮ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল সন্ধের সময় বোলপুরে এসে উপস্থিত হয়েছি। আজ ভোরে উঠে স্নান করে দক্ষিণের ঘরে এসে বসেছি, আমার মনের সমস্ত গ্লানি যেন দূর হয়ে গেছে। সকাল বেলাটি এমনি গভীর নিস্তব্ধ এবং সুন্দর এবং উজ্জ্বল যে, আমার মনে হচ্ছে আমার মনটা যেন একটি স্বচ্ছ এবং শীতল আলোকের মধ্যে সুগভীর ভাবে অবগাহন করে নির্মল নিরাময় হয়ে উঠছে। আমার পাশে একটি প্লেটের উপর শৈশবের মতো নবীন এবং যৌবনের মতো পরিস্ফুট রাশীকৃত শিউলিফুল রেখে দিয়েছে—বারান্দার উপর শরতের রৌদ্র এসে পড়েছে, বিছানার চাদরটি সাদা ধব্‌ধব্‌ করছে, সমস্ত পরিষ্কার এবং ফাঁকা, লোকজনের ভিড় নেই, নিত্যনৈমিত্তিক কাজ নেই, পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে, সামনে তরুশ্রেণীর অবকাশপথে অনেকখানি সবুজ মাঠ চোখে পড়ছে। সিমলের সেই রৌদ্রোত্তপ্ত বারান্দাটিতে গিয়ে দাঁড়ালে পল্লবভূষণা নীলাম্বরী প্রকৃতি ঠিক যেমন একেবারে চোখের বুকের কোলের সামনে এসে দেখা দিত, এখানকার এই দক্ষিণের ঘরটিতে বসেও ঠিক সেইরকমটি মনে হচ্ছে। সমস্তটা ঠিক সেই রকমটি নয়, কিন্তু মনের মধ্যে সেই শান্তি এবং সৌন্দর্যের ভাবটি অবতীর্ণ হচ্ছে। মনে হচ্ছে তোরা যেন সেই রকম পাশের ঘরে রয়েছিস, তোদের স্নেহ এবং তোদের সেবা আমার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। আমার পক্ষে তোদের সেই স্নেহ এখন প্রকৃতির মধ্যে মিশে গেছে—এই শরৎপ্রভাতের মৃদুশীতল বাতাসের মধ্যে তোদের সেই সেবাপূর্ণ স্নেহকরস্পর্শ রয়ে গেছে।—চারি দিকে কী গভীর নিস্তব্ধতা [বব]! অনন্ত নির্মল স্নিগ্ধ নীলাকাশ যেন কেবল একলা আমার অন্তরাত্মাকে নীরবে আলিঙ্গন করে রয়েছে। আর এই শিউলি ফুলগুলির সুকোমল সরস শুভ্রতা আমার দুই চোখের উপর স্নেহ বর্ষণ করছে। আমাকে যদি আমার দেবতা আমার সমস্ত কর্মশৃঙ্খল থেকে বিচ্ছিন্ন করে এইখানে নির্বাসিত করে দেন, তা হলে বেশ ধীর শান্তভাবে বাহিরের আকাশ এবং আপন অন্তরের

মধ্যে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে আপনার কাজ করে যেতে পারি। ... ... ঘরের জাজিমের উপর লুটিয়ে পড়ে একটা পেন্সিল এবং খাতা হাতে একটা কোনো রচনার মধ্যে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করছে। সকাল বেলাটি বেশ স্নিগ্ধ এবং নবীন আছে, এই বেলা আরম্ভ করে দেওয়াই ভালো। ... ... মন এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে তাকে যেন স্পর্শ-দ্বারা অনুভব করতে পারছি, তার ধ্বনি খুব নিকটে শোনা যাচ্ছে।

সাতারা
২২ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬৫

বোলপুর
শুক্রবার, ১৯ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল কেবল বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে একখানি ছোটো কবিতা লিখেছি এবং একটি তিব্বত-ভ্রমণের বই পড়েছি। এই রকম নির্জন জায়গায় একলা বসে ভ্রমণের বই পড়তে আমার ভারী ভালো লাগে। এ রকম জায়গায় নভেল আমি ছুঁতে পারি নে। এই জনশূন্য মাঠের মধ্যে, শালবনের ভিতর, সমস্ত-দরজা-খোলা জাজিম-পাতা দোতলার একলা ঘরে, পাখিদের করুণকলধ্বনিপূর্ণ স্বপ্নাবেশময় শরৎ-মধ্যাহ্নে বিলিতি নভেল কোনোমতেই খাপ খায় না। ভ্রমণবৃত্তান্তের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, তার মধ্যে অবিশ্রাম গতি আছে, অথচ প্লটের বন্ধন নেই— মনের একটি অবারিত স্বাধীনতা পাওয়া যায়। এখানকার জনহীন মাঠের মাঝখান দিয়ে একটি রাঙা রাস্তা চলে গেছে— সেই রাস্তা দিয়ে যখন দুই-চার জন লোক অথবা দুটো-একটা গোরুর গাড়ি অত্যন্ত মন্থর গমনে চলতে থাকে তার একটা ভারী আকর্ষণ আছে, বোধ করি তাতে করে চারি দিকের গতিহীন লোক-হীনতা আরও বেশি করে ফুটিয়ে দেয়— মাঠ আরও ধু ধু করে ওঠে এবং মনে হয় এই মানুষগুলো যে কোথায় যাচ্ছে তার যেন আর ঠিকানা নেই। ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বইও আমার এই মানসিক নিরালার মধ্যে সেই রকম একটি গতিপ্রবাহের ক্ষীণ রেখা অঙ্কিত করে দিয়ে চলে যেতে থাকে— তাতে করে আমার মনের সুবিস্তীর্ণ নিস্তব্ধ নির্জন আকাশটি আরও যেন বেশি করে অনুভব করতে পারি। ভ্রমণকারী একটি ফরাসী, সেই জন্যে সে ভ্রমণ করতেও জানে এবং লিখতেও জানে। এক জায়গায় পাহাড় থেকে হঠাৎ মরুভূমির মধ্যে এসে পড়ে লোকটার মনে 'sensation of the desert' বলে একটা ভাবের উদয় হয়েছিল— সেইখানে সে বলেছে পাহাড়-পর্বতের চেয়ে এই রকম প্রশস্ত মরুভূমি তার লাগে ভালো : Solitude is a true balm, which heals up the many wounds that the chances of life have inflicted; its monotony has a calming effect upon nerves made over-sensitive from having vibrated too much; its pure air acts as a douche which drives petty ideas out of the head. In the desert too the mind sees more clearly, and mental processes are carried on more easily।—মন যখন সংসারক্ষেত্রে

কর্মক্ষেত্রে থাকে তখন সে আপনার সমস্ত শক্তি সংহত করে অনেকটা ক্ষুদ্র মূর্তি ধারণ করে। কিন্তু সে যখন বিশ্রাম করতে চায় তখন তাকে শয়ন করাবার জন্যে দিক হতে দিগন্ত পর্যন্ত প্রকাণ্ড একটি শয্যা বিছিয়ে দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে— তখন সে একা একটি দেশ জুড়ে পড়ে থাকতে চায়; তখন সমস্ত শহর ঘুরে সে আর জায়গা খুঁজে পায় না, অবারিত আকাশ এবং প্রান্তর এবং সমুদ্র না হলে তার আর চলে না। কোনো ইংরাজ ভ্রমণকারী এই sensation of the desertকে ঠিক সুখকর বলে মনে করত কিনা আমি সন্দেহ করি। ইংরাজ ভ্রমণকারীদের যতগুলো বই পড়েছি প্রায় সবগুলোতেই তাদের উদ্ধত পাশব প্রকৃতির এবং আত্মাভিমানের পরিচয় পাওয়া যায়। তারা অন্য জাতের প্রতি সুবিচার করতে এবং ভালোবাসা দিতে পারে না। অথচ বিধাতা এদের উপরে যত ভিন্ন জাতের ভার সমর্পণ করেছেন এমন আর কারও উপর করেন নি।

সাতারা
২৩ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬৬

বোলপুর
শনিবার, ২০ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল রাত্তির থেকে অল্প অল্প মেঘ করে আসছে। কিন্তু রোদ্দুরও আছে। আকাশের ধারে ধারে স্তূপাকার কালো মেঘ জমেছে এবং সূর্যালোকে তাদের পাড়গুলো শুভ্র জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। মাঠের চারি দিক নতুন আমন ধানের গাঢ় এবং সরস সবুজবর্ণ ধারণ করেছে, তার উপরে স্নিগ্ধ মেঘের আভা দেখাচ্ছে ভালো। মনে পড়ছে, আমি যখন প্রথম বাবামশায়ের সঙ্গে বোলপুরে আসি তখন আমার বয়স ন-দশ বৎসর হবে— তখন মাঠে ধান কিরকম দেখতে হয় কখনো চক্ষে দেখি নি, সেটা দেখবার জন্যে ভারী একটা কৌতূহল ছিল। রাত্তিরে বোলপুরে এসে পৌঁছলুম; পাল্কি করে আসবার সময় দু দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলুম না, পাছে সেই অস্পষ্ট আলোতেই কৌতূহলের খানিকটা নিবৃত্তি হয়। ভোরের বেলা উঠেই বাইরে এসে দেখলুম— চারি দিকেই মাঠ, কোথাও ধানের চিহ্ন নেই। জায়গায় জায়গায় মাটি খোঁড়া, শুনলুম সেই-সব জায়গায় চাষ হয়েছে। তখন মনের মধ্যে রাশীকৃত কৌতূহল ছিপি-আঁটা শ্যাম্পেনের মতো চাপা ছিল— এখন তো পৃথিবীর মোটামুটি সবই এক রকম দেখে নিয়েছি, কিন্তু তবু আনন্দের হ্রাস হয় নি, বরঞ্চ তার গাঢ়তা ঢের বেশি বেড়েছে। সেই প্রথম বোলপুর-দর্শনের কত কথাই মনে পড়ে। তখনো কবিতা লিখতুম। মনে ধারণা ছিল— খোলা আকাশে গাছের তলায় বসে কবিতা লিখলে ঠিক দস্তুরমত কবিত্ব করা হয়। তাই ভোরে উঠেই একখানা পুরোনো Letts' Diary এবং পেন্সিল হাতে বাগানের প্রান্তে একটি ছোটো নারকোল গাছের তলায় বসে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' বলে একটা বীররসাত্মক কবিতা লিখেছিলুম। সেটা লিখতে দিন সাতেক লেগেছিল। কোথায় সে খাতা এবং সে কবিতা! তার একটা লাইনও মনে নেই। কেবল মনে আছে

বড়দাদা সেই কবিতাটা পছন্দ করেছিলেন। কবির যেরকমটি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তখন আমার বিশেষ দৃষ্টি ছিল— দুপুর বেলায় মাঠের ভিতর খোয়াইয়ের মধ্যে একটা গুহার ছায়ায় পা ছড়িয়ে দিয়ে বসতুম, সামনে দিয়ে ক্ষীণ জলস্রোত বালির উপর দিয়ে বয়ে যেত, আপনাকে রীতিমত কবি বলে মনে হত। বুনো খেজুর গাছে ছোটো ছোটো খেজুর ফলে থাকত, সেগুলো খেতে আদবেই ভালো লাগত না, কিন্তু তবু মরুপ্রান্তরের মধ্যে বুনো গাছ থেকে বুনো ফল স্বহস্তে পেড়ে খাচ্ছি এই মনে করে একটা বিশেষ গর্ব অনুভব করতুম। এই খোয়াইয়ের মধ্যে আমানিডোবা বলে একটি ছোট্ট ডোবা ছিল, তার মধ্যে খুব ছোট্ট মাছ থাকত, কাপড়-চোপড় খুলে সেই ডোবার মধ্যে গিয়ে পড়তুম— মনে হত নির্ঝরের জলে স্নান করছি। কোনো লোকজন কেউ কোথাও নেই, কোনো বন্ধন নেই, শাসন নেই, মাঠের ভিতরকার সেই গুহাগুলোর মধ্যে সমস্ত দিন একলা আপন মনে কবিত্ব-খেলা করতুম— এক-একদিন ডাকাতের ভয় হত, কিন্তু সেই ভয়ের মধ্যেও কবিত্ব ছিল। এখনো কবিতা লিখি বটে, কিন্তু নিজেকে উপন্যাসে ইতিহাসে বর্ণনযোগ্য কবি বলে আর অনুভব করি নে— বরঞ্চ নিজের কবিতা পড়ে মনে হয় যেন সে কবিতা আমি নিজে লিখি নি; যেন আমি দৈবাৎ ভালো কবিতা লিখি, কিন্তু ইচ্ছা করলে ভালো কবিতা লিখতে পারি নে। আর কিছু না হোক, এখন গাছের তলায় বসে কবিতা লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব; মন চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

যাই হোক, সেই Letts' Diaryটা যদি খুঁজে পাই তা হলে আবার একবার ভোরের বেলায় সেই নারকেল-তলায় বসে সেই 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়'টা পড়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

সাতারা
২৫ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬৭

শান্তিনিকেতন
মঙ্গলবার, ২৩ অক্টোবর। ১৮৯৪।

পরশু থেকে খুব অল্প অল্প শীত পড়ে চারি দিক আরও যেন প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। বাতাসের ভিতর থেকে সেই ক্লান্তির ভাবটা চলে গেছে। সকাল বেলায় স্নান করে সাফ কাপড়টি পরে এসে বসে যখন গায়ে এই প্রভাতের ঠাণ্ডা বাতাসটি লাগতে থাকে তখন সর্বাঙ্গে আরও যেন খানিকটা নির্মলতার সঞ্চার হয়— চোখের উপরে যে আলোটি এসে পড়ে মনে হয় স্নিগ্ধ শিশিরে অভিষিক্ত এবং শিউলি ফুলের সুশীতল গন্ধে পরিপূর্ণ। আকাশ নীল, গাছপালাগুলি ঝল্‌মল্‌ করছে, মাঠের মাঝে মাঝে সবুজ ধানের ক্ষেত রৌদ্রে কোমল পাণ্ডু আভায় মণ্ডিত হয়েছে, বাতাস কতদূর থেকে অবারিত বেগে শিশিরসিক্ত তৃণাগ্রভাগ চুম্বন করে চলে আসছে তার সন্ধান নেই— শূন্য মাঠের মাঝখানে জনহীন রাঙা বাঁকা রাস্তাখানি কোথা দিয়ে কোথায় চলে গেছে তার শেষ দেখা যাচ্ছে না— আমি এরই মাঝখানে হেমন্তের তুষারনির্মল আলোকপ্লাবনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে, শিশিরস্নিগ্ধ বাতাসের

দ্বারা সর্বাঙ্গমনে অভিনন্দিত হয়ে, সম্মুখে একটি-প্লেট স্তূপাকার শিউলি ফুল নিয়ে পুলকিত হয়ে বসে আছি— আমাকে কেউ বিরক্ত করবার নেই, দোতলার তিনটি ঘর সম্পূর্ণ আমার এবং দিবসের অষ্টপ্রহর আমার স্বাধীন অধিকারের মধ্যে। মাঝের বড়ো ঘরের বিস্তীর্ণ ধব্‌ধবে বিছানাটি তাকিয়া বালিশ নিয়ে আমার আরামের জন্যে অপেক্ষা করে আছে— আমার নিজেকে নবাব বলে বোধ হচ্ছে। মনে আছে স... আমাকে বলেছিল, 'মুসলমান নবাবদের মতো তোমার মধ্যে একটা বিলাসের ভাব আছে।' কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়; অর্থাৎ আমার নবাবি মানসিক নবাবি— সেখানে আমি আপনার রাজত্বে কোনো রকম বাধা রাখতে চাই নে, সেখানে আমার অপ্রতিহত অধিকার চাই। কিন্তু নবাবরা যেরকম নবাবি করত তাতে সেই মানসিক নবাবির ব্যাঘাত হত; তাতে এত জিনিস-পত্র লোক-লস্কর সাজ-সরঞ্জামের আবশ্যক হত যে বস্তুরাশিতে মনকে নিশ্বাস রোধ করে বিনাশ করে ফেলত। আমি বস্তুর উপদ্রব এড়াবার জন্যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই— প্রমোদের উত্তেজনার মধ্যে থাকলে আমার অন্তঃকরণ ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; আমার মনের অন্তঃপুরের ভিতরে যেন কে একজন আছে, যে আমাকে বাইরের সংস্রবে আসতে দেখলে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে।

সাতারা
২৭ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬৮

শান্তিনিকেতন
বুধবার, ২৪ অক্টোবর। ১৮৯৪।

সত্যি কথা বলতে কী, যখন একবার বিষয়কার্যের মধ্যে ভালো করে মনোনিবেশ করা যায় তখন তার একটা নেশা ক্রমে মনটাকে অধিকার করে নেয়। বহুবিধ পরামর্শ উপায়চিন্তা এবং ভবিষ্যৎ-ভাবনায় বেশ এক রকম ভোর হয়ে যেতে হয়। যখন নারকেল-কুঞ্জে বসে ছেঁড়া Letts' Diary নিয়ে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' লিখতুম তখন বোধ হয় এমন একটা অকবিজনোচিত কথা স্বীকার করতে লজ্জা বোধ হত। কিন্তু ভাবপ্রকাশই কী আর বিষয়কর্মই কী, দুয়ের ভিতরে একটা ঐক্য আছে এবং সেইখানেই আনন্দটা পাওয়া যায়। অব্যক্ত থেকে ব্যক্তি, অসমাপ্ত থেকে সমাপ্তি, chaos থেকে সৃষ্টি শৃঙ্খলা উদ্ভাবনা করার একটা মস্ত সুখ আছে। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে মনের ভাবকে সুসমাপ্ত ভাষায় বিন্যাস করতে পারলে একটা সৃষ্টিসুখ পাওয়া যায়; সুবৃহৎ জমিদারি কার্যটাকেও ক্রমশ নিয়মে বদ্ধ এবং শৃঙ্খলায় পরিণত করতে পারলে সেইরকম সৃষ্টিসুখ লাভ করা যায়। আয় বাড়ছে বলে তো একটা সুখ থাকতেই পারে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি সুখ একটা কার্য সম্পন্ন হচ্ছে বলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যদি ব্যারিস্টার কিম্বা সিভিলিয়ান হয়ে আসতুম তা হলে আমি আমার নির্দিষ্ট কাজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যেতুম— সাহিত্যচর্চায় মন দেবার কোনো আবশ্যক অনুভব করতুম না। আইনের কূটমর্ম-উদ্ভাবন, বিপক্ষ পক্ষের যুক্তি-খণ্ডন, বিশৃঙ্খল সাক্ষ্যের মধ্যে থেকে একটা

সুসংগত ইতিহাস এবং মত রচনা করে তোলা, এতেই আমার সমস্ত মন অহর্নিশি নিবিষ্ট থেকে একটা বিশেষ আনন্দ এবং আত্মবিস্মৃতি লাভ করত। ভাগ্যি আমি ব্যারিস্টার হয়ে আসি নি!

সাতারা
২৮ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬৯

বোলপুর
২৫ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল রাত্তির থেকে খুব ঘন বর্ষা করে এসেছে। কাল সমস্ত রাত্তির সবেগে বাতাস দিয়ে সশব্দে বৃষ্টি হয়ে গেছে— আজ সকাল বেলায় বাতাস নেই, কিন্তু সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে বৃষ্টি হচ্ছে। একে তো বোলপুর নির্জন, তাতে চতুর্দিকের আকাশমণ্ডপে কালো মেঘের পর্দা টেনে দিয়ে আরও গভীর নিভৃত বলে বোধ হচ্ছে। গাছের পাতার উপর বৃষ্টির ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে। এমন দিনে কি হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা নিয়ে পোলিটিকাল প্রবন্ধ লিখতে ইচ্ছা করে! মনের ভিতরে একটা উতলা উন্মনা ভাব নিয়ে আজ প্রাতঃকাল থেকে পদরত্নাবলীর পাত ওল্টাচ্ছি— বৃন্দাবন-নামক বিরহমিলনের একটা মানসরাজ্যে দেখতে পাচ্ছি—

গগনহি নিমগন দিনমণিকাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিনরাতি॥
চৌদিকে অথির পবন তরুদোল।
জগভরি শীকরনিকরহিলোল॥
চলইতে গোরি নগরপুরবাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট॥

বর্ষার দিনে ঘরে ঘরে দ্বার বন্ধ, মেঘছায়াচ্ছন্ন বৃন্দাবনের জনশূন্য পথ দিয়ে গৌরী চলেছেন— অস্থির পবনে গাছপালা দুলছে এবং সমস্ত জগৎ ভরে বৃষ্টির ছাঁট উড়ে চলেছে— সূর্য কোথায় ডুবে আছে তার সন্ধান নেই, দিনে রাত্রে যেন একাকার হয়ে আছে। এই বৈষ্ণবপদগুলির মোহমন্ত্রটি যে কী সেইটি ব্যাখ্যা করে একটি প্রবন্ধ লেখবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু সে আজ থাক্‌— আজ একটি অর্ধসমাপ্ত পোলিটিকাল্‌ প্রবন্ধ শেষ করতে হবে।...লিখে যে কী ফল হবে তা অন্তর্যামীই জানেন। ভগবদ্গীতায় আছে কর্মেই আমাদের অধিকার আছে, ফলে অধিকার নেই— অর্থাৎ, ফল পাব কি না পাব সে কথা না ভেবে কাজ করতে হবে। ফল পাব না মনে করেই আমাদের দেশে কাজ করতে হয়।

বেলা যত বাড়ছে বৃষ্টিও তত চেপে আসছে— বাদলার অন্ধকারে বেলা এগচ্ছে কি না ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, সময় যেন আজ সমস্ত দিনের মতো ছুটি নিয়েছে। ছেলেবেলায় যখন নর্মাল ইস্কুলে পড়তুম এই রকম বাদলার দিনে ঘর অন্ধকার হয়ে যেত বলে পণ্ডিতমশায় পড়া বন্ধ করতেন— যদিও ক্লাসের বাইরে যেতে পারতুম না, তবু বই বন্ধ করে বৃষ্টির শব্দ এবং মেঘের অন্ধকার পুলকিতমনে

উপভোগ করতুম। বোধ হয় তখনকার সেই অভ্যাস-বশত আজও এমন বাদলার দিনে কর্তব্য-নামক কঠিন ইস্কুল-মাস্টারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সমস্ত পুঁথিপত্র বন্ধ করে দিয়ে আপনার মনে আপনার খেয়ালে থাকতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সাধনা ছাপাখানায় দেবার সময় হয়ে এসেছে, এবং পোলিটিকাল প্রবন্ধটা আজ যেমন করেই হোক শেষ করতেই হবে।

সাতারা
২৯ অক্টোবর ১৮৯৪

১৭০

বোলপুর
শুক্রবার [২৬ অক্টোবর ১৮৯৪]

তুই দূর থেকে যে মনে করেছিস, আমি আজকাল সাধারণের সঙ্গে মিলে মিশে, আলাপ আতিথ্য করে খুব একজন দিগ্‌গজ পাব্লিক-ম্যান হয়ে উঠেছি সেটা অত্যন্ত ভুল। হাঁস এবং মাছ দুই ভিন্নজাতীয় জীব—যদিও হাঁস মাঝে মাঝে জলে ডুব মারে এবং মাছ মাঝে মাঝে আকাশে লাফিয়ে উঠে এক গ্রাস হাওয়া খেয়ে নেয়। দূর থেকে অনেক সময় মনে করি এবার আমি খুব লোকজনের সঙ্গে মিশে তাদের সমস্ত কাজের এবং আন্দোলনের মধ্যে আন্দোলিত হয়ে বেড়াব, কিন্তু সে কেবল কল্পনাতেই থেকে যায়। অনেক সময় যেমন কল্পনা করতে বেশ লাগে যে, খুব তরঙ্গিত সমুদ্রের বক্ষ বিদীর্ণ করে আমি পালের জাহাজে বায়ুভরে চলেছি—অথচ তরঙ্গিত সমুদ্রে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে—তেমনি লোকসমুদ্রের আন্দোলনে মুহূর্তকাল থাকলেই আমার অন্তরাত্মা পীড়িত হয়ে ওঠে, তার পরে আবার দ্বিগুণ আগ্রহের সঙ্গে আপন নির্জনতার মধ্যে ফিরে আসতে হয়।...তুই লিখেছিস লোকের সঙ্গে মিশলে আমার পার্সোনাল্‌ ইনফ্লুয়েন্সের দ্বারা অনেকটা উপকার সাধন করতে পারি। কিন্তু পার্সোনাল্‌ ইন্‌ফ্লুয়েন্স ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন উপায়ে বিকিরিত হয়ে থাকে—কেউ বা সম্মুখে বর্তমান থেকে মুখের কথায় এবং চরিত্রের বলে লোককে অভিপ্রেত পথে নিয়ে যেতে পারে, কেউ বা অপ্রত্যক্ষ থেকে কেবল আপনার প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ অংশকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করে লোকের হৃদয় গ্রহণ করতে পারে। যাদের মনের উপরে সকল রকম শক্তিই কার্য করে, যাদের স্নায়ুতন্ত্রী ছোটো বড়ো সকল-প্রকার আঘাতেই ঝন্‌ ঝন্‌ করে বেজে ওঠে, তারা লোকসমাজের মাঝখানে থেকে কখনোই আপনার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, বরঞ্চ তারা অনেক ক্ষতি করে এবং আপনার প্রভাব নষ্ট করতে থাকে—লোকসমাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে তাদের নিজের সুখ দুঃখ বেদনা নিজের ভিতরে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন করে রেখে নিরাপদে নির্জনে প্রশান্ত-ভাবে ইহজীবন কাজ করে গেলে তবে তাদের কাজের গৌরব রক্ষিত হতে পারে। নইলে তাদের জীবনের সহস্রবিরোধপূর্ণ সমস্যার সমন্বয় করে তাদের প্রকৃতির যথার্থ অর্থটুকু বুঝে নেবার জন্যে কার এত মাথাব্যথা! যারা অনেকটা পরিমাণে

নির্লিপ্ত নিশ্চেতন হয়ে লোকের মাঝখানে থাকে তারাই লোকের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করতে পারে। 'মায়ার খেলা'র সে গানটা এ স্থলেও খাটে—

তারে কেমনে ধরিবে, সখি, যদি ধরা দিলে!

সাতারা
৩০ অক্টোবর ১৮৯৪

খাতায় লেখা বা রবীন্দ্রনাথের লিখিত '২৬ কার্তিক ১৩০১' (১১ নবেম্বর ১৮৯৪, রবিবার) লেখার ভুল সন্দেহ নাই; অপর পক্ষে ২৬ অক্টোবর (শুক্রবার) হইলে সাতারায় চিঠি পাওয়ার তারিখের সহিতও সংগতি হয়।

১৭১

বোলপুর
শনিবার
২৬ অক্টোবর?। ১৮৯৪।

একে আমরা ভারতবর্ষীয় হিন্দু, তাতে আবার যদি মোটা হয়ে উঠি তা হলে একেবারে সশরীরে নির্বাণমুক্তি। আমি দেখেছি মনের ভিতর থেকে বৈরাগ্য এবং ঔদাসীন্যকে খেদিয়ে রাখতে সর্বদাই চেষ্টা করতে হয়। প্রায়ই এক-একবার ধ্যানের অবস্থা এসে কর্মের উৎসাহকে ম্লান করে দিয়ে যায়। আবার মুশকিল হয়েছে এই যে, জগৎসংসারে বৈরাগ্যটা খুব যুক্তিসংগত। সত্যই সমস্ত অনিত্য, মৃত্যু মানুষের জীবনের চেষ্টাকে প্রশান্ত হাস্যে পরিহাস করছে—একটা জাতি নিজের বংশপরম্পরাগত প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কোনো-একটা বৃহৎ দুঃসাধ্য চেষ্টাকে সফল করে তুলতে পারে কি না সন্দেহ। এই-সমস্ত ফিলজফি মনের মধ্যে আপনি উদয় হয়।

সাতারা
৩১ অক্টোবর ১৮৯৪

২৬ অক্টোবর শুক্রবার ছিল; বর্তমান পত্র শনিবারে লেখা হইয়া থাকিলে তারিখ ২৭ অক্টোবর হওয়াই সম্ভব।

১৭২

বোলপুর
২৮ অক্টোবর। ১৮৯৪।

এখনও আটটা বাজে নি, তবু মনে হচ্ছে যেন অর্ধরাত্রি, সমস্ত গভীর নিস্তব্ধ এবং নিষুপ্ত— কেবল ঝিল্লিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তোরা এখন কী করছিস আমি কিছুই

জানি নে এবং কিছু কল্পনাও করতে পারি নে। পৃথিবীতে আমরা যাদের জানি সবাইকেই ফুটকি-লাইনে জানি; অর্থাৎ মাঝে মাঝে অনেকখানি করে ফাঁক—সেই ফাঁকগুলো নিজের মনে যেমন তেমন করে পূরিয়ে নিতে হয়। যাদের মনে করি সব চেয়ে ভালো জানি তাদেরও সঙ্গে বহুল পরিমাণে নিজের কল্পনা মিশিয়ে নিতে হয়। কত জায়গায় ভাঙা পড়ে যায়, পথচিহ্ন লুপ্ত হয়ে যায়, অনিশ্চিত অস্পষ্ট এবং অন্ধকার থেকে যায়, তবু সৃজন-শক্তি-বিশিষ্ট মন সমস্ত ভাঙাচোরা জোড়া দিয়ে সমগ্র করে তুলে নিজের আয়ত্ত করে রাখতে চায়। খুব সুপরিচিত লোকেরাও যদি আমাদের কল্পনাসূত্রে গাঁথা ছিন্ন অংশ মাত্র হয় তা হলে কার সঙ্গে, কিসের সঙ্গেই বা আমার পরিচয় আছে—আমাকেই বা কে সম্পূর্ণভাবে অবিচ্ছিন্ন রেখায় জানে? প্রত্যেক মানুষ কেবল তার ঈশ্বরের কাছেই সম্পূর্ণ, আর-সকলের কাছেই বিচ্ছিন্ন। কিন্তু হয়তো বিচ্ছিন্ন বলেই, হয়তো তাদের মধ্যে আমাদের নিজের কল্পনা যোজনা করবার স্থান আছে বলেই, তারা এক হিসাবে আমাদের বেশি অন্তরঙ্গ—সেই জন্যেই পরস্পর হয়তো অনেকটা মিশিয়ে নিতে পারি। নইলে অপরিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসাবে বোধ হয় সকলেই অন্তর্যামী ছাড়া আর সকলের কাছেই দুষ্প্রবেশ্য। আমরা নিজেকেও অংশ অংশ করে জানি, কল্পনা দিয়ে পূরিয়ে নিয়ে একটা স্বরচিত গল্পের নায়ক করে নিই মাত্র—খণ্ড উপকরণ নিয়ে আমরা নিজেকে নিজে সৃষ্টি করে তুলব বলে বিধাতা এই বিচ্ছেদগুলি রেখে দিয়েছেন।

সাতারা। ১ নবেম্বর ১৮৯৪

১৭৩

বোলপুর
৩০ অক্টোবর। ১৮৯৪।

বোলপুরের মতো এমন সুগভীর শান্তি এবং বিরাম আর কোথাও পাওয়া যেত না। দার্জিলিঙের স্যানিটেরিয়মে বিপরীত ভিড়, পরগনাতেও কাজ এবং লোক এসে পড়ে, বোলপুরে কোনো কর্তব্যও নেই লোকের উপদ্রবও নেই—অবিশ্রাম পাখির গান ছাড়া শব্দটি নেই এবং কাঠবিড়ালি ছাড়া আমার দোতলায় আর কোনো প্রাণীই আসে না। দুপুরবেলায় ভ্রমরগুঞ্জনের মতো একটি গুঞ্জনধ্বনি শুনতে পাই—মনে হয় আমার জীবনের সমস্ত সুখস্মৃতি অত্যন্ত দূর থেকে তাদের বিচিত্র মিশ্রিত মর্মরধ্বনি বহন করে নিয়ে আসছে। দুপুর বেলাটি এমন সুগভীর নিস্তব্ধ নির্জন এবং পরিপূর্ণ যে, আমার সমস্ত অন্তঃকরণটিকে একেবারে আবিষ্ট করে রেখে দেয়—লিখি, পড়ি, ভাবি, যাই করি, এই সুবিস্তীর্ণ সুবৃহৎ সকরুণ মধ্যাহ্ন আমাকে নীরবে সস্নেহে বেষ্টন করে থাকে। আজকাল শীত পড়াতে হাত পা একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসলেই দক্ষিণের বারান্দাটিতে গিয়ে বসি এবং মাতৃক্রোড়ের মতো প্রকৃতির একটি আতপ্ত স্পর্শে আমাকে আবৃত করে ফেলে; পায়ের কাছে রোদ্দুরটি এসে পড়ে, সবুজ মাঠের অতি দূর নীলাভ প্রান্তটি পর্যন্ত দেখা যায়, চারি দিকের গাছপালা থেকে পতঙ্গদের একটি অশ্রান্ত গুন্ গুন্ শব্দ আসতে

থাকে, মনে হয় যেন সকলের স্নেহ এবং সেবা চার দিক থেকে এসে আমার শরীরের মধ্যে জীবন সঞ্চার করে দিচ্ছে।

সাতারা
৩ নবেম্বর ১৮৯৪

১৭৪

বোলপুর
মঙ্গলবার ?
৩১ অক্টোবর। ১৮৯৪।

প্রথম শীতের আরম্ভে সমস্ত দিন ধরে যে-একটা উত্তুরে বাতাস দিতে থাকে সেইটে আজ সকাল থেকে আরম্ভ হয়েছে— বাতাসটা হূ হূ করতে করতে আসছে আর শ্রেণীবদ্ধ আমলকী গাছের পাতাগুলি হলদে হয়ে উঠে কাঁপতে কাঁপতে ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে এবং গাছের তলা একেবারে ছেয়ে ফেলছে— এই বাতাসে মুখের চামড়া শুকিয়ে যাচ্ছে এবং হাতের চামড়া থেকে খড়ি উঠছে। এখানকার বনরাজ্যের মধ্যে যেন জমিদারের পেয়াদা এসেছে— সমস্ত কাঁপছে এবং ঝরছে এবং দীর্ঘনিশ্বাসে আকুলিত হয়ে উঠছে। দুপুর বেলাকার রোদ্দুরটি বেশ লাগছে, এক-রকম বিশ্রামপূর্ণ ঔদাসীন্যে নিমগ্ন করে দিয়েছে, এবং ঘন আম্রবনের ভিতরে ঘুঘুর অবিশ্রাম কূজনে সমস্ত মাঠ এবং আকাশ এবং বাতাস এবং মধ্যাহ্নের স্বপ্নাতুর ছায়া-রৌদ্রময় সুদীর্ঘ প্রহরগুলোকে যেন বিরহবিধুর করে তুলছে— আমার টেবিলের উপরকার ঘড়ির শব্দটাও মধ্যাহ্ন-প্রকৃতির সমস্ত মর্মরধ্বনির সকরুণ ঔদাস্যের সঙ্গে মিশে গেছে। আমার ঘরের ভিতরে সমস্ত দুপুর বেলাটা কেবল কাঠবিড়ালির ছুটোছুটি চলে। খাওয়া-দাওয়ার পর অনেক ক্ষণ পর্যন্ত অলসভাবে বসে বসে এই জন্তুগুলির বিচিত্র ভঙ্গি নিরীক্ষণ করে দেখা আমার প্রতিদিনের একটা নিয়মিত কাজের মধ্যে হয়ে গেছে। ফুলো ন্যাজ, কালো এবং ধূসর রেখায় অঙ্কিত রোমশ নরম গা, ছোট্ট দুটি কালো ফোঁটার মতো দুটি চঞ্চল চোখ, নিতান্ত নিরীহ অথচ অত্যন্ত ব্যস্তভাব— দেখে মনের মধ্যে ভারী একটা স্নেহের উদয় হয়। এই ঘরের কোণে লোহার-জাল-দেওয়া আল্‌মারির মধ্যে ডাল চাল পাঁউরুটি প্রভৃতি আহার্য দ্রব্যগুলি এই-সকল লুব্ধস্বভাব চপল প্রাণীদের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হয়— কৌতূহলপূর্ণ নাসিকাটি নিয়ে তারা সমস্তদিন এই আল্‌মারিটার চতুর্দিকে ছিদ্র অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। যে-সব ডাল এবং চালের কণা আল্‌মারির বাইরে ছড়ানো থাকে সেইগুলি সন্ধান করে বের করে সামনের গুটিচারেক ছোটো তীক্ষ্ণ দন্ত দিয়ে কুট্‌কুট্‌ করে পরম তৃপ্তি-সহকারে আহার করা হয়— মাঝে মাঝে লাঙুলের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে বসে সামনের দুটি ক্ষুদ্র হাত যোড় করে সেই ক্ষুদ্র শস্যকণাগুলিকে মুখের মধ্যে গুছিয়ে-গাছিয়ে জুত করে নেওয়া হয়— এমন সময় আমি একটু নড়েছি কি অমনি চকিতের মধ্যে ন্যাজটি পিঠের উপর তুলে দিয়ে দে-দৌড়— যেতে যেতে হঠাৎ একবার অর্ধপথে পাপোষটার উপর থেমে একটা পা তুলে ফস্‌ করে একটা কান চুলকে নিয়ে আবার এসে উপস্থিত— এমনি সমস্ত

বেলাই কুট্‌কাট্‌ দুড়্‌দুড়্‌ এবং প্লেট কাঁটা চামচের মধ্যে টুংটাং ঝুন্‌ ঝুন্‌ চলছেই।...

এখান থেকে যেতে আমার মন-কেমন করছে— কলকাতায় ফিরে গিয়ে এখানকার প্রফুল্ল সকাল বেলা এবং নির্জন দুপুর বেলা আমার সর্বদাই মনে পড়বে— এখানকার শান্তি এবং সৌন্দর্যস্মৃতি আমাকে আকর্ষণ করতে থাকবে। কিন্তু কী করা যাবে! স্বার্থপরতাকে দমন করে প্রফুল্লচিত্তে কর্তব্যক্ষেত্রে যাওয়া যাক। ছেড়ে যাবার সময় সৌন্দর্যগুলো আরও যেন মনোহর হয়ে ওঠে। আজকের দিনটা এমনি একটি করুণাপূর্ণ রাগিণীতে আপ্লুত হয়ে উঠেছে।

সাতারা
৪ নবেম্বর ১৮৯৪

১৭৫

কলকাতা
১৯ নবেম্বর। ১৮৯৪।

ছেলেবেলা থেকে দেখেছি ঐ ফেরিওয়ালার হাঁকগুলো আমাকে কেমন একটু বিচলিত করে— নির্জন নিস্তব্ধ দুপুর বেলায় চিলের তীক্ষ্ম ডাকটাও আমাকে ভারী আঘাত করত, অনেক দিন আর সেই ডাকটা কানে আসে নি। আজকালকার চিল যে ডাকে না তা বোধ হয় না, আমারই বোধ করি এখন অনেক চিন্তা এবং অনেক কাজ— প্রকৃতির সঙ্গে আর আমার সে রকম ঘনিষ্ঠ যোগ নেই। এক সময় ছিল একলা সমস্ত দুপুর বেলা চুপ করে তেতালার ঘরের দক্ষিণের দরজার কাছে কৌচে পড়ে কাটিয়ে দিয়েছি— তখন দীর্ঘ দুপুর বেলাকার প্রত্যেক শব্দটি কম্পনটি এবং ওর ভিতরকার সমস্ত করুণরসটুকু নিঃশেষে অনুভব করতুম। এখন অতখানি সময় ফেলে রাখা অসম্ভব; মনে হয় একটা কিছু পড়ি কিম্বা লিখি। যদি বা মনের গতিকে কোনো বিশেষ কাজ করতে প্রবৃত্তি না হয় তবু একটা কাজের চেষ্টা করতে হয়, নিদেন অন্যমনস্কভাবেও একটা বই পড়বার চেষ্টা করা দরকার হয়। এটা কিন্তু কলকাতায়। মফস্বলে গেলে চুপ করে চেয়ে বসে থাকলেও হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে আসে, কাজের অন্ধ দাসত্ব করতে হয় না। এক রকম কাজ আছে যা কর্তব্যবোধে কাজ, তার বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই, কিন্তু যখন উপস্থিত কোনো কাজ হাতে নেই কিম্বা কোনো কারণে ভালো করে কাজ সম্পন্ন করবার শক্তি নেই তখনও যদি কেবল অভ্যাসবশত কেবল সময়-যাপনের জন্যে একটা কাজ খুঁজে বেড়াতে হয়— তখনও যদি কেবলমাত্র আপনাকে নিয়ে আপনি শান্তি না পাওয়া যায়, আপনার চতুর্দিক থেকে একটি সঙ্গ আকর্ষণ করতে না পারা যায়— তা হলে অবস্থাটা খারাপ হয়েছে বলতে হবে। কাজ একটা উদ্দেশ্যসাধনের উপায় মাত্র। মানুষ তো আর কাজের যন্ত্র নয়। পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে বিরাম লাভ করবার যে শক্তি সেটুকু হারানো কিছু নয়— কারণ, সেটুকুর মধ্যে অনেকখানি উচ্চ-অঙ্গের মনুষ্যত্ব আছে। কাজ খুব ভালো জিনিস সন্দেহ নেই— কিন্তু কাজের একটা সংকীর্ণতা আছে— তাতে মানুষকে আচ্ছাদন করে রাখে। দিন এবং রাত্রি

কাজ এবং বিরামের ঠিক উপমা। দিনের বেলা পৃথিবী ছাড়া আমাদের কাছে আর কিছুই নেই—রাত্রে গ্রহনক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে অনন্ত জগতের সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপন হয়। কাজের সময় আমরা পৃথিবীর মানুষ, বিশ্রামের সময় আমরা জগতের লোক। যখন কাজ করব তখন যুক্তি তর্ক বিজ্ঞানের আলোকে পৃথিবীটাকে পরিষ্কার করে দেখে নেওয়া দরকার, যখন বিশ্রাম করব তখন পৃথিবীটাকে হ্রাস করে দেওয়াই দরকার—তখন অনন্তের সঙ্গে আমাদের যে অনন্ত যোগ আছে সেইটাকেই বড়ো করে দেখা চাই। তখন সমস্ত কাজের চেষ্টাকে বহুদূরে রেখে দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত শব্দ গন্ধ বর্ণ স্পর্শের মধ্যে যে-একটি নিত্য সৌন্দর্য যে-একটি অসীমতার আভাস আছে সেইটেকেই কায়মনে অনুভব করা চাই। এই দুটো ভাবের মধ্যে কোনোটাকেই বাদ দেওয়া উচিত হয় না। সকাল বেলা উঠে জানা চাই আমরা পৃথিবীর লোক এবং দিন অবসান হয়ে গেলে অনুভব করা চাই যে আমরা জগৎবাসী। যারা বড়ো বেশি কাজের লোক তাদের কাছে বৃহৎ জগৎটা চিরকাল গোপন থেকে যায়।

সাতারা
২৩ নবেম্বর ১৮৯৪

১৭৬

কলকাতা
মঙ্গলবার, ২০ নবেম্বর। ১৮৯৪।

কাল তোর চিঠিতে যে কথাটা উত্থাপন করেছিলুম তারই অনুবৃত্তিস্বরূপে মনে হচ্ছে যে, দিনে এবং রাত্রে যেমন কাজ এবং বিরামকে ভাগ করে নিয়েছে, সাহিত্যে গদ্যে এবং পদ্যেও সেই রকম মানুষের ঐ দুটি অংশকে ভাগ করেছে। গদ্য পরিষ্কার কাজের এবং পদ্য সুবৃহৎ বিশ্রামের। সেই জন্যে পদ্যে আবশ্যক কথার কোনো আবশ্যক নেই। পদ্যে আমাদের জন্যে যে জগৎ সৃজন করে সে জগতের কাছে আমাদের দৈনিক সংসার অত্যন্ত লুপ্তপ্রায় দেখায়। তাই যদি না দেখাত তা হলে নিত্যসৌন্দর্যের জগৎ, ভাবজগৎ, আমাদের কাছে দৃষ্টিগোচর হত না। মানুষের জীবনে এই দুটো জিনিসই যখন সত্য, এবং দুটো সত্য যখন দিন এবং রাত্রির ন্যায় একসঙ্গে দেখবার উপায় নেই, তখন গদ্য পদ্য দুয়েরই আবশ্যক আছে। সেইজন্যে ছন্দে বন্ধে ভাষায় পদ্য প্রাত্যহিক সংসারের সমস্ত সংস্রব দূর করে দিয়েছে, আবশ্যকের স্থানে সৌন্দর্যের অবতারণা করেছে—আমাদের আবশ্যক-ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ বাইরেও-যে একটি অনন্ত আনন্দসমুদ্র অকূলের দিকে প্রসারিত রয়েছে সেই বার্তাটা নানা ভাবে এবং নানা ভঙ্গীতে দেবার চেষ্টা করেছে। এই গদ্য-পদ্যর ভেদ ও সেই প্রভেদের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অল্পকাল হল [ঠাকুরদাস] মুখুজ্জের সঙ্গে আমার আলোচনা চলছিল। তাঁর মতে ভবিষ্যতে গদ্য এতদূর পর্যন্ত সুন্দর হয়ে উঠবে যে, পদ্যর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দূর হয়ে যাবে। কথাটা যদি বিশুদ্ধ তর্কের হত তা হলে অনেকটা সহজ হত, কিন্তু এর মধ্যে ভাবের কথা বহুল পরিমাণে আছে বলে মুখে মুখে বোঝানো বড়ো শক্ত হয়। আমি সংক্ষেপে

কেবল বললুম— সমতল পৃথিবী সাধারণ সমস্ত কাজের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু অভিনয় করতে গেলে একটা স্বতন্ত্র স্টেজের আবশ্যক করে; দর্শকদের মাঝখানে নেবে এসে অভিনয় করলে তাদের মনে সেই বিভ্রমটা উৎপন্ন হয় না। অভিনয়ের বিষয়টাকে চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটু উপরের দিকে উঠিয়ে দিয়ে আলোক এবং দৃশ্যপট এবং সংগীতের দ্বারা বেশ জাজ্বল্যমান করে সম্মুখে ধরা চাই, তবে সেটা সমগ্রভাবে এবং স্বতন্ত্র-ভাবে কল্পনাপটে মুদ্রিত হয়ে যায়। কবিতার ভাষা ও ছন্দ সেই স্টেজ এবং সংগীতের মতো— বিষয়টি সেই-সমস্ত সুন্দর বেষ্টনের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়াতেই আমাদের মনে এমন সমগ্রভাবে এবং প্রবলভাবে আঘাত করতে পারে, চারি দিকের দরিদ্র সংসার থেকে সৌন্দর্যলোকে আমাদের আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে পারে, প্রথম দৃষ্টিতেই আমরা বুঝতে পারি যে এখন আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে নেই— এক মুহূর্তেই প্রস্তুত হয়ে নিতে পারি। কিন্তু এ-সমস্ত কথা ঠিকটি বোঝানো শক্ত। ঠা [কুরদাস] বাবুও বোধ হয় আমার কথা মানলেন না। ভাবে বোধ হল তাঁর বিশ্বাস, আমার গদ্যে আমার পদ্যের চেয়ে ঢের বেশি কবিত্ব পরিস্ফুট-ভাবে প্রকাশ পায় এবং সেইটেই তাঁর মতে স্বাভাবিক। তিনি আমার শেষ দিককার লেখা কতকগুলি কবিতার বই চেয়েছেন— বোধ হয় কোনো প্রবন্ধে প্রমাণ করবেন যে আমার পদ্যই গদ্য এবং গদ্যই পদ্য।

সাতারা
২৪ নবেম্বর ১৮৯৪

১৭৭

কলকাতা
২১ নবেম্বর। ১৮৯৪।

অ [ভিজ্ঞা ?] ও বাড়িতে তাদের এক তলার ঘরে বসে এস্‌রাজে ভৈরবী আলাপ করছে, আমি আমার তেতলার কোণের ঘরে বসে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। তোর চিঠিতেও তুই মাটাঙ্গের ভৈরবী আলাপের কথা লিখেছিস। আজকাল সকালে দেখতে দেখতে বেলা দশটা-এগারোটা দুপুর হয়ে যায়— দিনটা যতই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে মনটাও ততই এক রকম উদাসীন হয়ে আসে; তার উপর কানে যখন বারম্বার ভৈরবীর অত্যন্ত করুণ মিনতির খোঁচ লাগতে থাকে তখন আকাশের মধ্যে, রৌদ্রের মধ্যে, একটা প্রকাণ্ড বৈরাগ্য ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কর্মক্লিষ্ট সন্দেহপীড়িত বিয়োগশোককাতর সংসারের ভিতরকার যে চিরস্থায়ী সুগভীর দুঃখটি— ভৈরবী রাগিণীতে সেইটিকে একেবারে বিগলিত করে বের করে নিয়ে আসে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যে-একটি নিত্যশোক নিত্যভয় নিত্যমিনতির ভাব আছে, আমাদের হৃদয় উদ্‌ঘাটন করে ভৈরবী সেই কান্নাটিকে মুক্ত করে দেয়, আমাদের বেদনার সঙ্গে জগদ্‌ব্যাপী বেদনার সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়। সত্যিই তো আমাদের কিছুই স্থায়ী নয়; কিন্তু প্রকৃতি কী এক অদ্ভুত মন্ত্রবলে সেই কথাটিই আমাদের সর্বদা ভুলিয়ে রেখেছে, সেইজন্যেই আমরা উৎসাহের সহিত সংসারের কাজ করতে

পারি। ভৈরবীতে সেই চিরসত্য, সেই মৃত্যুবেদনা প্রকাশ হয়ে পড়ে; আমাদের এই কথা বলে দেয় যে, আমরা যা-কিছু জানি তার কিছুই থাকবে না এবং যা চিরকাল থাকবে তার আমরা কিছুই জানি নে।

সাতারা
২৫ নবেম্বর ১৮৯৪

১৭৮

শিলাইদহ
শনিবার ?
২৫ নবেম্বর। ১৮৯৪।

গো... এ যাত্রায় বেঁচে গেল। পরশু প্রায় সমস্ত রাত আমার ঘুম হয় নি। আমার বোটের পিছনেই তার নৌকো ছিল— মাঝে মাঝে তার কাতর শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম আর তার আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে মনটা উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠছিল। তখন নিস্তব্ধ রাত্রি, আমার ঘর সমস্ত অন্ধকার। বিছানার মধ্যে পড়ে পড়ে মানুষের জীবনমৃত্যুটাকে ভীষণ একটা রহস্যে আচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছিল— আমাদের চতুর্দিকে একটি নিস্তব্ধ নির্বাক্‌ অনন্তকাল দাঁড়িয়ে রয়েছে, এক-এক সময় তাকে বড়ো নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। তার তুলনায় আমাদের প্রাণটুকু, আমাদের বৃহত্তম সুখদুঃখ, আমাদের মহত্তম আশা-আকাঙ্ক্ষা কত তুচ্ছ— আমি আজ মরি আর কাল মরি সে তার কাছে কিছুই নয়। আমি একলা মরি আর লক্ষ প্রাণী বন্যায় ভেসে যাক্‌ সেও তার কাছে কিছুই নয়। সূর্য একদিন তার সমস্ত সৌরজগৎ-সুদ্ধ নিবে গিয়ে, বরফে জমে গিয়ে, একেবারে মরে যাবে, সেও তার কাছে কিছুই নয়— এমন কত জগৎ আপন লক্ষকোটি বৎসরের জীবজননলীলা সম্বরণ করে আজ নির্বাপিত মৃত অবস্থায় আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীর স্তরে স্তরে কত লুপ্ত জীববংশের কঙ্কাল পড়ে আছে, আজ তাদের একটি বংশধরও বর্তমান নেই। তাই আমি বিছানার ভিতর পড়ে পড়ে ভাবছিলুম এই অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে এই মুমূর্ষু মানুষটার হয়ে কার কাছে বলব 'আহা, বেচারা বড়ো কষ্ট পাচ্ছে'? আমরা অক্ষম মানুষরা ছাড়া তার জীবনের মূল্য কে বোঝে! তার বেদনা কার কাছে সত্য! মৃত্যু যখন প্রত্যেক জীবের পক্ষে অনিবার্য অবশ্যসম্ভব ঘটনা তখন এমন অসহ্য কষ্ট পাবার কী আবশ্যক ছিল! আমাদের যেগুলো নিতান্ত ব্যক্তিগত মর্মগত সুখ দুঃখ বাসনা, এক জায়গায় কোথাও তার একটা অনন্ত অবলম্বন আছে, একটা চিরন্তন সমবেদনার আধার আছে, এ কথা মনে না করলে সমস্তই এমন একটা নিষ্ঠুর প্রহসন বলে মনে হয়! মার কাছে তার ছেলের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃসহ দুঃখের আকর, কিন্তু অনন্তের কাছে তার যদি কোনো অর্থই না থাকে তবে এ মায়া কেন! আমার কাছে আমার ভালোবাসা কতই নিরতিশয়, কিন্তু অনন্তের মধ্যে তার যদি কোনো স্থান না থাকে তবে তো সে স্বপ্নমাত্র! আমরা দেশের জন্যে প্রাণপণ করছি, মানুষের উন্নতির জন্যে প্রাণ দিচ্ছি। কিন্তু দেশ আমাদেরই কাছে দেশ, অর্থাৎ সমস্ত জগতের চেয়ে বড়ো— মানুষ আমাদেরই কাছে মানুষ, অর্থাৎ বিশ্বের

সমস্ত জীবের চেয়ে বেশি— আমাদের বাইরে থেকে দেখতে গেলে এই ভাবগুলো এবং তার সঙ্গে আমাদের সমস্ত প্রাণপণ চেষ্টাগুলো নিতান্তই উপহাসের বিষয়। গো...র আসন্ন মৃত্যুটা আমার কাছে অত্যন্ত গম্ভীর অত্যন্ত গুরুতর বলে মনে হচ্ছিল; কিন্তু সে কেবলমাত্র আমি মানুষ বলে, আমি তার পরিচিত এবং নিকটবর্তী বলে— ওর ভিতরে কি সত্যকার কোনো গাম্ভীর্য এবং গৌরব আছে? এই তো পিঁপড়ে মরছে, মশা মরছে, তাকে আমরা এত তুচ্ছ মনে করি কেন? একটা পাতা শুকিয়ে পড়ে গেলে, একটা প্রদীপ বাতাসে নিবে গেলে, সেই বা শোকের কারণ কেন না হয়! সেও তো কম পরিবর্তন নয়। অনন্তের কাছে, একটা সৌরজগৎ নিবে যাওয়া, পাতা ঝরে যাওয়া, মানুষ মরে যাওয়া, সব সমান— অতএব আমাদের শোক এবং সুখদুঃখ সব আমাদেরই। আমার এক-এক সময় মনে হয় জগৎটা দুই বিরোধী শক্তির রঙ্গভূমি— একজন আমাদের মধ্যে থেকে নিত্য বাঁচবার চেষ্টা করছে, আর একজন তাকে নিত্য বধ করবার উদ্যম করছে— তা যদি না হত তা হলে মৃত্যু আমাদের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক মনে হত, কিছুমাত্র শোচনীয় বোধ হত না— এক সময় এক রকম ছিলুম আর-এক সময় আর-এক রকম হয়ে গেলুম এটার সঙ্গে কোনো রকম দুঃখশোক বিস্ময় জড়িত থাকত না। কিন্তু আমাদের প্রকৃতির ভিতর থেকে বলছে 'বেঁচে থাকব', বলছে 'মৃত্যু আমার বিরোধী পক্ষ— তাকে জয় করতেই হবে'— অথচ কোনোকালে কেউ তাকে জয় করতে পারে নি। কিন্তু তবুও চেষ্টার ত্রুটি নেই। সেইজন্যেই মৃত্যুযন্ত্রণা, মৃত্যুশোক— বেঁচে থাকবার একটা চিরসম্ভাবনা আছে, মৃত্যু তাকে বারম্বার পরাভূত করছে।

সাতারা
৩০ নবেম্বর ১৮৯৪

১৭৯

শিলাইদহ
বুধবার, ২৮ নবেম্বর। ১৮৯৪।

প্রথম বৎসর যখন শিলাইদহ বোটে এসেছিলুম তখন যে রকম এ পারে বালির চরের সীমা দেখা যেত না, এবারে ঠিক সেইরকম চর পড়েছে। দিগন্তের শেষ সীমা পর্যন্ত সাদা বালির চর ধু ধু করছে; তাতে না আছে ঘাস, না আছে গাছ, না আছে বাড়ি ঘর, না আছে কিছু— সেবারকার চরে মাঝে মাঝে বনঝাউ ছিল, এবার তাও নেই। এত বড়ো প্রকাণ্ড শূন্যতার ভাব চোখে না দেখলে ঠিক কল্পনা করতে পারবি নে। আকাশের শূন্যতা, সমুদ্রের শূন্যতা আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সেখানে আর-কিছু প্রত্যাশা করি নে; কিন্তু ভূমির শূন্যতাকে সব চেয়ে বেশি শূন্য বলে মনে হয়— কোথাও গতি নেই, জীবন নেই, বর্ণের বৈচিত্র্য নেই, কোমলতার আভাসটুকু মাত্র নেই— যেখানে শস্যে তৃণে তরুলতায় পশুপক্ষীতে ভরে যেতে পারত সেখানে একটি কুশের অঙ্কুর পর্যন্ত নেই— কেবল একটা উদাস কঠিন অসীম বৈধব্যের বন্ধ্যাদশা— পাশ দিয়ে পদ্মা নদী চলে যাচ্ছে, ও পারে ঘাট, বাঁধা নৌকো, স্নানরত লোকজন, নারকেল এবং আমের বাগান— সন্ধ্যাবেলায় নদীর ধারের হাট থেকে কলধ্বনি শোনা যায়, বহুদূরে পাবনার পারের তরুশ্রেণী ঘননীল

রেখার মতো দেখা যায়— কোথাও গাঢ়নীল কোথাও পাণ্ডুনীল, কোথাও সবুজ, আর মাঝখানে ঐ রক্তহীন মৃত্যুর মতো ফ্যাকাশে সাদা— নিস্তব্ধ, নিশ্চেষ্ট, জনহীন। সন্ধ্যাবেলা সূর্যাস্তের সময় যখন আমি এই চরের উপর উঠে বেড়াই, সমস্ত অন্তঃকরণের একটা পরম প্রসারতা এবং অবাধ স্বাধীনতা অনুভব করি। কিছু নেই, কেউ নেই, কেবল আমি একলা। আমার যত কথা আছে সমস্ত আমি এই চিহ্নশূন্য বাধাশূন্য ধরণীর উপর ছড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলতে পারি; আমি আমার সঙ্গী, আমার সুখ, সমস্তই সৃজন করে নিতে পারি। কাল আমি ভাবছিলুম, যখন আমাদের ইন্দ্রিয় কিছুই অনুভব করতে পারে না, আমাদের মনই সমস্ত অনুভব করে, ইন্দ্রিয় কেবল মনের কাছে উপস্থিত হবার দ্বার মাত্র, তখন ইন্দ্রিয়-সাহায্য-ব্যতিরেকেও আমাদের মনের সম্মুখে যা-কিছু উপস্থিত হয় তাকেই বা সত্য না মনে করি কেন? কিম্বা তার থেকেই বা সত্যের মতো সমান সুখ না পাই কেন? আমার বোধ হয় ওটা কেবল অভ্যাস মাত্র। আমরা প্রথম থেকেই ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়েই সমস্ত অনুভূতিগুলি প্রাপ্ত হয়ে এসেছি। এখন যদিচ কল্পনার সাহায্যে মন স্বাধীনভাবে অনেক জিনিস গড়তে পারে, তবু সমস্ত সুখদুঃখ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ভোগ না করলে স্পষ্টরূপে ভোগ করতে পারে না। যেমন, যদিও মন লেখে, কলম লেখে না, তবু যাদের বরাবর কলমে লেখা অভ্যাস তারা কলম হাতে নিয়ে যেমন ভাবগুলো গুছিয়ে নিতে পারে এমন মুখে মুখে পারে না। আমার স্পষ্ট মনে হয় আমরা যদি একটু মনঃসংযোগ করে সাধন করি, অভ্যাস করি, তা হলে কল্পনার সামগ্রীকে ইন্দ্রিয়গোচর সামগ্রীর মতো অত্যন্ত নিকট অত্যন্ত অধিগম্যরূপে উপলব্ধি করতে পারি। দুর্ভাগ্যক্রমে সকল সময়ে কল্পনা-শক্তির সেই স্বচ্ছতা, সেই সূক্ষ্মতা, সেই স্পষ্টতা থাকে না। মফস্বলে আমার সেই শক্তি খুব বিকশিত হয়, আমি দেশকালের ব্যবধানকে আমার কল্পনার দ্বারা পরিপূর্ণ করে তুলতে পারি: কিন্তু কলকাতার আবিলতার মধ্যে সেই মায়াশক্তি কোথায় অন্তর্ধান করে, তখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারে শরণাপন্ন হয়ে ক্রন্দন করে মরতে হয়।

সাতারা
৩ ডিসেম্বর ১৮৯৪

১৮০

শিলাইদহ
বুধবার?
৬ ডিসেম্বর। ১৮৯৪।

সাধারণত অন্যদিন এই সময়টা কিছু গরম হয়ে ওঠে, জোব্বাটা খুলে ফেলতে হয়— আজ ঠিক উল্টো দেখছি। বাইরে বাতাসটা সোঁ সোঁ শব্দে শিস লাগিয়েছে, নদীর জল কলকল ছলছল শব্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে— অথচ মেঘের কোনো লক্ষণ নেই, রৌদ্র চমৎকার উজ্জ্বল, জলের ধারে কাদা-চরের উপর কাদাখোঁচা পাখিগুলো ল্যাজ নাচিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে এবং শুশুকগুলো থেকে থেকে থামকা জলের উপরে গুব্‌ করে ডিগ্‌বাজি খেলে যাচ্ছে। যদি সন্ধের সময়ও এইরকম বাতাসটা থাকে তা হলে আমার আজ আর বেড়ানোটা হবে না। আমি আজকাল

একটু স্থানপরিবর্তন করেছি। নদীর ঠিক মাঝখানে একটা চরের মতো জেগে উঠেছে, সেই চরে আমি বোট নিয়ে এসে বেঁধেছি। সেই ছড়াটা মনে আছে?—

এপার গঙ্গা, ও পার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।
তারই মধ্যে বসে আছে শিব-সদাগর।

আমি ঠিক সেই শিব-সদাগর হয়ে বসে আছি। বিকেলে যখন ডাঙায় বেড়াতে যাই তখন জলিবোটে খানিকটা দাঁড় টেনে বেয়ে যেতে হয়; এই সূত্রে আমার দাঁড় টানাও হয় বেড়ানোও হয়। আজকাল শুক্লপক্ষ— খানিকটা বেড়াতে বেড়াতেই চাঁদের আলো ফুটে ওঠে, তখন চরের সীমাহীন ধূসর বালি চাঁদের আলোতে এমন একটা ছায়ারচিত কাল্পনিক আকার ধারণ করে, মনে হয়, এ যেন বাস্তবিক পৃথিবী নয়— আমারই মনের একটা অপরূপ ভাব। কোন্ কালে ছেলেবেলায় তিনকড়িদাসীর কাছে রাত্রে মশারির মধ্যে শুয়ে রূপকথার প্রসঙ্গে একটা বর্ণনা শুনেছিলেম, 'তেপান্তর মাঠ— জোচ্ছনায় ফুল ফুটে রয়েছে'— যখনি জ্যোৎস্নারাত্রে চরে বেড়াই তিনকড়িদাসীর এই কথাটি মনে পড়ে। ছেলেবেলায় সেই রাত্রে তিনকড়ির এই একটি কথায় আমার মনটা ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছিল— প্রকাণ্ড মাঠ ধু ধু করছে, তারই মধ্যে ধব্‌ধবে জ্যোৎস্না হয়েছে, আর রাজপুত্র অনির্দেশ্য কারণে ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণে বেরিয়েছে—শুনে মনটা এমনি উতলা হয়েছিল! তা ছাড়া, রাজপুত্রের ভাগ্যে প্রায়ই পরমাসুন্দরী রাজকন্যা জুটত কিনা, সেটাতে মনটা আরও ক্ষুব্ধ হত। মনের ভিতরে কেমন একটা দুরাশা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, বড়ো হলে এই ধরনের একটা কোনো অদ্ভুত ঘটনা আমার দ্বারাও সম্ভব এবং নানা বিঘ্নবিপদের পারে কোনো-এক জায়গায় কোনো-একটি পরমাসুন্দরীও নিতান্ত দুর্লভ না হতে পারে। জ্যোৎস্নারাত্রে চরে বেড়াতে বেড়াতে ছেলেবেলাকার সেই মশারির ভিতরকার পুলকিত হৃদয়ের মোহ জেগে ওঠে; চারি দিকের সমস্তই এমন অবাস্তব দেখতে হয় যে যা-কিছু অসম্ভব সেইগুলোই আকার ধারণ করে ওঠে; নিজের কল্পনার মরীচিকার মধ্যে নিজে মুগ্ধভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াই— তার আর কোথাও সীমা নেই, বাধা নেই।

সাতারা
১১ ডিসেম্বর ১৮৯৪

১৮১

শিলাইদহ
৭ ডিসেম্বর। ১৮৯৪।

চরের উপর সন্ধেবেলাটা আজকাল এমন চমৎকার হয় সে আমার বর্ণনার অতীত। আমি যখন একলা বেড়াই, খানিক বাদে শৈ... প্রায়ই আমার সঙ্গ নিতে আসে এবং কাজকর্মের আলোচনা করে। কালও সে এসেছিল। খানিক ক্ষণ ধরে খারিজ দাখিল বন্দোবস্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা কওয়ার পরে যেই একটু চুপ করেছি— অমনি হঠাৎ দেখতে পেলুম অনন্ত জগৎ সেই সন্ধ্যার আকাশে নীরবে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। তখন আমার আশ্চর্য বোধ হল, কানের কাছে একটা মানুষের সামান্য কণ্ঠস্বরে এই অনন্ত-আকাশ-ভরা নিঃশব্দতা ডুবে গিয়েছিল— ঐ উদ্ঘাটিত

নিস্তব্ধ জগৎ-চরাচরের মধ্যে খারিজ দাখিল এবং বিরাহিম্‌পুরের জমিদারি সেরেস্তা কোন্‌খানে! আমি শৈ…র কথার কোনো উত্তর দিলুম না, সে মনে করলে আমি বুঝি শুনতে পাই নি। ফের আবার প্রশ্ন করলে, আমি ফের নিরুত্তরে সে কথা কাটিয়ে দিলুম। তখন সে ভারী আশ্চর্য হয়ে চুপ করে গেল। যেই চুপ করলে, অমনি দেখতে দেখতে সমস্ত নিস্তব্ধ নক্ষত্রলোক থেকে শান্তি নেমে এসে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করে তুললে। যে সভার মধ্যে অনন্তকোটি জ্যোতিষ্ক নীরবে সমাগত হয়েছে আমিও সেই সভার এক প্রান্তে স্থান পেলুম। ঐ অসীম শূন্যের মধ্যে তারাও যেমন এক-একটি, এই পদ্মার ধারে দিগন্তবিস্তীর্ণ নির্জন বালির চরের মধ্যে আমিও তেমনি একটি; অস্তিত্ব-নামক এক মহাশ্চর্য ব্যাপারের মধ্যে ওরা এবং আমি স্থান পেয়েছি। অনেক রাত্রি পর্যন্ত জ্যোৎস্নায় চরের মধ্যে বেড়িয়ে শেষকালে বোটের মধ্যে ফিরে এসে বাতি জ্বালিয়ে দরজা বন্ধ করে লম্বা কেদারায় পা ছড়িয়ে বসে ফের আবার বিরাহিমপুরের খারিজ দাখিলের সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপিত হল। নতুন খেজুরেগুড়-সহযোগে চারি খন্ড লুচি এবং এক গ্লাস দুগ্ধও খাওয়া গেল। তার পরে খানিকটা সাহিত্যসমালোচনা করে শয্যাশায়ী হয়ে পড়া গেল।

সাতারা
১২ ডিসেম্বর ১৮৯৪

১৮২

শিলাইদহ
১১ ডিসেম্বর। ১৮৯৪।

আজকাল …র ভয়ে খুব সকাল-সকাল বেড়াতে বেরই; অনেক ক্ষণ একলা বেড়াবার পরে শৈ… এসে হাজির হয়। ততক্ষণ আমি মনটিকে শান্ত এবং শীতল করে নিই এবং দিনের সমস্ত চিন্তা ও কাজের ছিন্ন আবর্জনাগুলো একেবারে ঝেঁটিয়ে সুদূরে ফেলে দিই। তখন নিদেন খানিক ক্ষণের জন্যে মনে হয় সংসারের সমস্ত লাভক্ষতি এবং সুখদুঃখ কিছুই কিছু নয়। তার পরে হঠাৎ শৈ… এসে যখনি জিজ্ঞাসা করে 'আজ দুধ খেয়ে আপনার কোনো অসুখ করে নি তো' কিম্বা 'নায়েব-মশায় ঠাকুরবাড়ির সমস্ত হিসেব পেশ করেছিলেন কি'— সেগুলো এমনি অদ্ভুত খাপছাড়া শুনতে হয়! আমরা নিত্য এবং অনিত্য-নামক এমন দুটি অসীম বিরোধের ঠিক মাঝখানে বাস করি! যদিও তারা চিরসংলগ্ন চিরপ্রতিবেশী তবু পরস্পরের কাছে পরস্পর এমনি হাস্যজনক! যখন আধ্যাত্মিক কথা হচ্ছে তখন গায়ের কাপড় এবং পেটের ক্ষিধের কথা আনলে ভারী অসংগত মনে হয়, অথচ আত্মা এবং পেটের ক্ষিধে চিরকাল একত্রে যাপন করে আসছে। যেখানে চন্দ্রালোক পড়ছে সেইখানেই আমার জমিদারি; অথচ জ্যোৎস্না বলছে 'তোমার জমিদারি মিথ্যে', জমিদারি বলছে জ্যোৎস্না সমস্তই ফাঁকি! আমি ব্যক্তি ঠিক মাঝখানে।

সাতারা
১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৪

১৮৩

শিলাইদহ
মঙ্গলবার ?
১২ ডিসেম্বর। ১৮৯৪।

তুই যে লিখেছিস [বব] 'ভবের সাথে ভাবের মিলন হবে কবে ?'—সম্পূর্ণ মিলন কোনোকালেই হবে না। কারণ, ভবও যতটা ভাবের কাছে অগ্রসর হতে থাকবে আবার ভাবও ততটা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে চলবে। ঠিক যেন ভাবটা ভবের বড়ো ভাই, উভয়ের সমান বয়স হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। অতএব উপস্থিতমত যেটা মন্দের ভালো পৃথিবীতে কোনো গতিকে সেইটেই আধা-খেঁচড়া করে করে যেতে পারলেই লোকে জীবনকে সার্থক জ্ঞান করে। বিশেষত যখন সব সময় বুঝতেই পারি নে highest ideal কোন্‌টা—হয়তো যেটা nighest সেইটেই highest, হয়তো নিজের ideal sacrifice করাই অনেক সময় higher ideal, হয়তো জীবনকে যেখানে তুলে রেখে দিতে চাই সেখানে থাকলে জীবনটা নিষ্ফল হবে, হয়তো আর-একটু নেবে এলে আমার নিজের সাধ্যমত এই সংসারে খানিকটা সফলতা লাভ করতে পারি। এ-সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা প্রত্যেকের নিজের কাছে [বব]। সবসুদ্ধ জগৎটা এমনি জটিল যে, কোনো দিকে কাউকে পথ নির্দেশ করে দিতে সাহস হয় না, কেননা প্রকৃতিভেদে প্রত্যেকের চলবার প্রণালী এত তফাত! হয়তো খুব বেশি না ভেবে যেটা সব চেয়ে নিকটবর্তী সেই পথটা অবলম্বন করে তার পরে প্রতিদিন যে প্রশ্ন সম্মুখে উপস্থিত হবে সেইটের ভালোরকম মীমাংসা করে চলাই সব চেয়ে সুবিধা। আমাদের এই জীবনটাকে যিনি একটা বিষম সমস্যা করে তুলেছেন অবশেষে তিনি হয়তো এর খুব একটা সহজ মীমাংসা করে দেবেন, তখন হয়তো আমরা এত বেশি ভেবেছিলুম বলে হাসি পাবে।

সাতারা। ১৭ ডিসেম্বর ১৮৯৪

১৮৪

শিলাইদহ
১৪ ডিসেম্বর। ১৮৯৪।

আজ মনে করলুম সকাল বেলায় চরের উপর খানিকটা বেড়িয়ে আসি, কিন্তু কুয়াশা দেখে পিছিয়ে আসা গেল। আকাশেও কালপরশুকার মতো অল্প অল্প মেঘের টুকরো ভাসছে। কাল কিন্তু সূর্যাস্তের সময় এই মেঘের টুকরোগুলোতে সন্ধ্যার আভা লেগে কী-যে চমৎকার দেখতে হয়েছিল সে আমি বলতে পারি নে। পশ্চিম দিকের এক জায়গায় ছোটো ছোটো কোঁচানো কোঁক্‌ড়ানো মেঘ সোনালি হয়ে উঠে এক নতুন রকম শোভা ধারণ করেছিল। কত রকমেরই যে রঙ চতুর্দিকে ফুটে উঠেছিল সে আমার মতো সুবিখ্যাত রঙকানা লোকের পক্ষে বর্ণনা করতে বসা

ধৃষ্টতা মাত্র। কেবল আকাশে নয়, পদ্মার জলে এবং বালির চরেও কাল হঠাৎ রঙের ইন্দ্রজাল লেগে গিয়েছিল। আবার নীল পদ্মার জল উত্তরে বাতাসে আগাগোড়া অল্প অল্প কম্পিত শিহরিত হচ্ছিল— সেই জন্যে সমস্ত নদীতে সূর্যরশ্মির সমস্ত বর্ণের এবং আভার এমন একটি আশ্চর্য স্পন্দন হচ্ছিল যে আমার মনের মধ্যে বিস্ময়ের সীমা ছিল না। আবার পদ্মার মাঝে মাঝে যে-সকল জায়গায় জলের নিচে চর পড়েছে সে জায়গায় জল শান্ত ছিল; সেই-সব স্থির জলে পরিষ্কার সোনার লাবণ্য একেবারে মসৃণ তরল উজ্জ্বল কোমল নির্মল হয়ে পড়েছিল— চারি দিকে বিচিত্র রঙের বিচিত্র নৃত্যের মাঝে মাঝে সেই স্থির বিষণ্ন সূর্যাস্তের নিশ্চল আভা অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠেছিল। তার পরে আবার বালির চরের উপরেও সূর্যাস্তের বিচিত্র তুলি পড়েছিল। এই চরগুলো এক সময় জলের নিচে ছিল কিনা, সেই জন্যে এক-এক জায়গায় অনেক দূর পর্যন্ত বালির উপর জলের সেই ঢেউ-খেলানো পদচিহ্ন পড়ে আছে— আবার অনেক জায়গায় সমতল ধূ ধূ করছে। সেই-সমস্ত ঢেউ-খেলানো স্তরে-স্তরে-কোঁচানো বালির উপর নানা রঙের চিকন আভা পড়ে ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড সাপের নানা-রঙা খোলসের মতো দেখাচ্ছিল। আমি মনে করলুম— পদ্মা তো একটা প্রকাণ্ড নাগিনীই বটে, সে এক সময় এই বৃহৎ চরের উপর বাস করত, এখন কেবল তার একটা বৃহদাকার খোলস বালির উপর পড়ে চিক্ চিক্ করছে— বর্ষার সময় সে আপনার সহস্র ফণা তুলে ডাঙার উপর ছোবল মারতে মারতে গর্জন করতে করতে কেমন করে আপনার প্রকাণ্ড বাঁকা লেজ আছড়াতে আছড়াতে ফুলতে ফুলতে চলত সে দৃশ্যটাও মনে পড়ল— এখন সে শীতকালের সাপের মতো বিবরের মধ্যে অর্ধপ্রবিষ্ট হয়ে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় প্রতিদিন ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে। বেড়াতে বেড়াতে ক্রমে এত বিচিত্র রঙ কখন আস্তে আস্তে মিলিয়ে এল, কেবল জ্যোৎস্নার একরঙা শুভ্রতায় জলস্থল আকাশ সমস্ত মণ্ডিত হয়ে গেল— এক সময় যে পূর্বদিকে দিনের উদয় হয়েছিল জগতের কোনো জায়গায় তার তিলমাত্র চিহ্ন রইল না।

সাতারা
১৯ ডিসেম্বর ১৮৯৪

১৮৫

কলকাতা
১৪ জানুয়ারি। ১৮৯৫।

অল্প অল্প করে বসন্ত পড়বার উপক্রম করছে। কাল সমস্ত দিন বেশ গরম পড়েছিল— কাজকর্মে মন লাগছিল না, সমস্ত দিনটা একরকম উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দেওয়া গেছে। কাল অ... এসেছিল, তার সঙ্গে শিষ্টালাপ করাটাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছিল। এতদিন শীত ছিল, কাজের উৎসাহ ছিল— মনে করতুম চিরজীবন সাধনার এডিটরি করে কাটিয়ে দেব। এখন একটু গরম হাওয়া পড়বা মাত্রই মনে হচ্ছে, এডিটরি করার চেয়ে আমি সেই-যে কবি ছিলুম সে ছিলুম ভাল। ইচ্ছে করছে একটা খোলা জানলার কাছে পড়ে পড়ে একটা স্লেট হাতে করে ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে গুন্ গুন্ করে করে

কবিতা লিখে যাই—চোখের সামনে উজ্জ্বল আকাশের গায়ে খানিকটা সবুজ ডালপালা দেখা যায় এবং বাতাসটি এসে সর্বাঙ্গে লাগতে থাকে। কবিতা যদি বা না লিখি গান তৈরি করা একটা কাজ আছে, সেটাও এরকম অবস্থায় বেশ লাগে ভালো। গানের সুরের দ্বারা জগতের সমস্ত চেহারা একেবারে বদলে যায় এবং মাথার ভিতরে একটা অপরূপ নেশা জমে ওঠে। কিন্তু সেরকম নেশাতুর ব্যাকুল এবং আত্মবিস্মৃত পাগলের মতো তৃষার্ত উন্মনা আনন্দচঞ্চল হয়ে থাকার চেয়ে গম্ভীর শান্তভাবে সাবধানে সাধনার এডিটরি করাই আমার পক্ষে ভালো। গানের এবং কাব্যের জগতে একটা চিরযৌবন আছে, জীবনের সঙ্গে সেটার সব সময় সামঞ্জস্য হয় না। এক-এক দিন বেলাটা যখন গরম হয়ে আসে হঠাৎ দরজার বাইরে রোদ্দুরের দিকে চাইবা মাত্র মনের ভিতরটা পুলকিত অথচ পীড়িত হয়ে ওঠে—তখন আমার ভয় হয় এবং নৈরাশ্য আসে, বুঝতে পারি এ কবিত্ব আমার হাড়ের মজ্জার মধ্যে—এ আমার সঙ্গের সঙ্গী, প্রতি বৎসরে নিদেন একবার করেও আমার হাড়ের ভিতর থেকে পল্লবিত বিকশিত হয়ে উঠবে—এবং আমাকে ভুলিয়ে দেবে যে, আমার অন্তর্জগতের সঙ্গে আমার বহির্জগতের পরস্পর আনুকূল্য নেই।

সাতারা
১৮ জানুয়ারি ১৮৯৫

১৮৬

শিলাইদহ
৪ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

এখানে ভারী শীত পড়েছে [বব]—ইচ্ছা করছে এই জবড়জঙ্গ শীতটা ঘুচে গিয়ে একবার প্রাণ খুলে বসন্তের বাতাস দেয়, এই আচ্‌কানের বোতামগুলো খুলে একবার খোলা জলিবোটের উপর বিছানা পেতে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসি এবং কর্তব্যের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে দিন-কতক সম্পূর্ণ অকেজো কাজে মন দিই। বছরের মধ্যে ছ মাস আমি এবং ছ মাস আর-কেউ যদি সাধনার সম্পাদক থাকে তা হলে ঠিক সুবিধামত বন্দোবস্ত হয়—কারণ, সম্বৎসর পাগলামি করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই এবং সম্বৎসর sanity বজায় রেখে চলাও আমার মতো লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য। এত বড়ো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, দু মাস অন্তর তার ঋতু-পরিবর্তন হচ্ছে, আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্য বারো মাস সমভাবে ভদ্রতা রক্ষা করে চলি কী করে! মানুষের মহা মুশকিল এই, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সমাজের আইন-অনুসারে তাকে তিনশো প্যঁয়ষট্টি দিন ঠিক এক ভাবে চলতে হয়—আসলে তার ভিতরে যে-একটা চিরনূতন চিররহস্য আছে সেটাকে সলজ্জে সভয়ে গোপন করে নিজেকে সর্ব-সাধারণের কাছে নিতান্ত চিরাভ্যস্ত-রুটিন-চালিত যন্ত্রনির্মিতবৎ দেখাতে হবে। সেই জন্যে থেকে থেকে মানুষ এমন বিগড়ে যায়, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; সেই জন্যে মানুষ যথার্থ আপনাকে উপলব্ধি করতে সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে চায়; কর্মক্ষেত্রে আপনাকে বদ্ধ করে রাখে এবং ভাবরাজ্যে আপনাকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করে। সেই জন্যে সাহিত্য conventional হলে সাহিত্যের একটা মহৎ উদ্দেশ্য সংকীর্ণ হয়ে আসে; সেই জন্যে ড্রইংরুম-শিষ্টালাপে যে-সকল কথা উত্থাপন করা

যায় না, সাহিত্যে সেগুলি গভীরতা এবং উদারতা লাভ করে অসংকোচে এবং সুন্দর ভাবে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে। এমন-কি, ড্রইংরুম-চা-পান-সভার সুসভ্য সীমার মধ্যে সাহিত্যকে বদ্ধ করতে গেলে উদার বিশ্বপ্রকৃতিকে ছিটের গাউন পরানোর মতো হয়।

সাতারা
৯ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫

১৮৭

শিলাইদহ
১ ফাল্গুন?
[১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫]

এ পারে সন্ধের সময় আমার একটি বেড়াবার সঙ্গী পাওয়া গেছে। লোকটির নাম ঠা...; বেশ বুদ্ধিমান, প্রৌঢ়বয়স্ক, সাহিত্যানুরাগী, চিন্তাশীল, স্পষ্টবক্তা এবং জমিদারি কাজকর্মে বহুদর্শী।... রোজ বেড়াবার সময় এঁর সঙ্গে আমার নানা ভাবের আলোচনা হয়ে থাকে। আমি যে কী ভাবে জগৎসংসারকে দেখে থাকি, সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে আমার যে খুব একটা নিগূঢ় অন্তরঙ্গ সত্যিকার সজীব সম্পর্ক আছে, এবং সেই প্রীতি সেই আত্মীয়তাকেই যে আমি যথার্থ এবং সর্বোচ্চ ধর্ম বলে জ্ঞান এবং অনুভব করি এবং আমার এই অন্তরপ্রকৃতিটি না বুঝলে যে আমার অধিকাংশ কবিতার রসাস্বাদন, এমন-কি, অর্থগ্রহণ করা যায় না— এই কথাটা আমি তাঁকে বোঝাচ্ছিলুম। দেখলুম তিনি বেশ বুঝলেন— কেবল বোঝা নয়, বেশ মশ্‌গুল্‌ হয়ে গেলেন। জগৎসংসার থেকে আমার নেশাটিকে যে আমি কোন্‌খান থেকে আদায় করে থাকি সেটা তিনি ঠিক উপলব্ধি করতে পারলেন। আমার যে ধর্ম এটা নিত্যধর্ম, এর উপাসনা নিত্য-উপাসনা। কাল রাস্তার ধারে একটা ছাগ-মাতা গম্ভীর অলস স্নিগ্ধভাবে ঘাসের উপরে বসে ছিল এবং তার ছানাটা তার গায়ের উপরে ঘেঁষে পরম নির্ভরে গভীর আরামে পড়ে ছিল— সেটা দেখে আমার মনে যে-একটা সুগভীর রসপরিপূর্ণ প্রীতি এবং বিস্ময়ের সঞ্চার হল আমি সেইটেকেই আমার ধর্মালোচনা বলি। এই-সমস্ত ছবিতে চোখ পড়বা মাত্রই সমস্ত জগতের ভিতরকার আনন্দ এবং প্রেমকে আমি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎভাবে আমার অন্তরে অনুভব করি। এ ছাড়া অন্যান্য যা-কিছু dogma আছে, যা আমি কিছুই জানি নে এবং বুঝি নে এবং বোঝবার সম্ভাবনা দেখি নে, তা নিয়ে আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত হই নে। যেটুকু আমি positively জানতে পারছি সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট, তাতেই আমাকে পরিপূর্ণ সুখ দেয়। তার সঙ্গে মিথ্যা অনুমান বিচার মিশিয়ে তাকে একটা systemএ পরিণত করতে গিয়ে তার ভিতরকার প্রত্যক্ষ সত্যটিকেও সংশয়াপন্ন করে তোলা হয়। আমি এইটুকু জানি যে, জগতে একটা আনন্দ এবং প্রেম আছে— তার বেশি জানবার কোনো দরকার নেই।

সাতারা
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

১৪৮

শিলাইদহ
১৬ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

এবারে পৃথিবীর হঠাৎ কেমন তাপক্ষয় হয়েছে। খবরের কাগজে শোনা যাচ্ছে য়ুরোপ বরফে আদ্যোপান্ত মণ্ডিত হয়েছে, ইংলন্‌ডে মেরুপ্রদেশের মতো শীত পড়েছে, বোধ করি সেই ধাক্কার কিয়দংশ বঙ্গোপসাগরের কূলে এসেও পৌঁচেছে। ফাল্গুন মাসে এরকম অসংগত শীত বাংলাদেশে তো কখনো মনে পড়ে না। মনে আছে ছেলেবেলায় বাবামশায়ের সঙ্গে যখন অমৃতসরে গিয়েছিলুম তখন এই ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এইরকম শীত বোধ হত, এবং রোজ সকালে স্নানের সময় বড়ো আক্ষেপ উপস্থিত হত। শীতের চোটে সেই বহুদিনকার পূর্বস্মৃতি মনে পড়ছে এবং সেইসঙ্গে মনে পড়ছে—সেখানে দীর্ঘ দুপুর বেলায় একলা বসে অদূরে ইঁদারা থেকে যন্ত্রযোগে গোরুদের জল তোলবার সকরুণ ক্যাঁ-কোঁ শব্দ শুনতে পেতুম, চাষীরা অত্যন্ত উচ্চ সপ্তম সুরে একটা একঘেয়ে তান ছাড়ত, ইঁদারার উপরে একটা তুঁতের গাছ ঝুঁকে পড়েছিল, সেইটে থেকে পাকা তুঁত পেড়ে এনে খেতুম এবং বাড়ির জন্য মন কেমন করতে থাকত। তার থেকে ক্রমে মনে পড়ে সেই ড্যালহৌসিতে ওঠবার সময় প্রথম হিমালয়ের দৃশ্য। তখন আমার মনটা ছোটো ছিল কিনা, বিস্ময়ের পরিমাণ তার মধ্যে কিছুতেই যেন কুলোত না। সেখানকার একটা অন্ধকার নির্জন নিস্তব্ধ গম্ভীর ঠাণ্ডা ছায়াময় প্রকাণ্ড পাইনের বন এখনো মনে পড়ে। আমার সেই ড্যালহৌসিতে আর-একবার যেতে ইচ্ছে করে; দেখতে ইচ্ছে করে আমার সেই বাল্যকালের প্রথম বিস্ময়ের সঙ্গে এখনকার কিছু মিল পাওয়া যায় কি না। তখন একটা মস্ত সুবিধে ছিল যে, নিজের জন্যে নিজেকে কিছুই ভাবতে হত না।

সাতারা
২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

১৪৯

শিলাইদহ
১৭ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

আজ সকালবেলায় যদিও শীত যথেষ্ট আছে তবু অন্য দিনের মতো প্রবল উত্তুরে বাতাস নেই—নদীর জলে তরঙ্গের রেখাটি মাত্র দেখা যাচ্ছে না, একেবারে আয়নাটির মতো স্থির হয়ে আছে। ঐ ওপারে একটি নৌকো ধীরে ধীরে চলেছে, তিনটি মানুষ ধূসর বালির চরের উপরে তিনটি কালো রেখাপাত করে গুণ টেনে নিয়ে যাচ্ছে—বাস্, আর কোথাও কর্মস্রোতের কোনো চাঞ্চল্য নেই, কোনো শব্দ নেই, গতি নেই—জলের উপরে এবং বালির চরের উপর সকালবেলাকার রৌদ্র এসে স্থিরভাবে পড়ে রয়েছে, বেলা যেন এগোচ্ছে না, এক রকম শ্রান্ত শান্ত-ভাবে নিস্তব্ধ

বিশ্রাম করছে। আমার এতক্ষণে অনেক কাজ সেরে ফেলা উচিত ছিল, কিন্তু আমিও আজকের এই প্রভাতের অলস সৌন্দর্য অলসভাবে উপভোগ করছিলুম— এবং এক-একবার ভাবছিলুম ঐ যে গুটি-দুই-তিন লোক ও পারে জনশূন্য বালির চরের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে গুণ টেনে নিয়ে চলেছে, ওটা আমার চোখে এমন বিশেষ সুন্দর ঠেকছে কেন। যারা টানছে তারা পেটের দায়ে রীতিমত কাজ করছে; আমার চোখে যে তারা একটি শান্তি এবং সন্তোষের ছবি এঁকে দিয়ে যাচ্ছে তাদের মনে ঠিক সেই শান্তি সন্তোষ এবং সৌন্দর্যটুকু নেই। যাই হোক, এ-সমস্ত চিন্তার কোনো মীমাংসা হোক বা না হোক সেজন্যে আমার কোনো মাথাব্যথা ছিল না— প্রভাতের এই সর্বব্যাপী নিস্তব্ধতার একটি প্রান্তভাগে ঐ ধীরগতিতে গুণ টানা যেমন একটুখানি ভঙ্গ, তেমনি আমার মনেরও শান্ত উপভোগের একটি দূর তীরভাগে ঐ একটুখানি মৃদু অলস চিন্তা একটু ভঙ্গমাত্র, তাতে শান্তিটিকে ঈষৎ বৈচিত্র্য দান করছে। আজকাল প্রতিদিন 'সাধনা' লেখার চিন্তায় মনটিকে সেরকম নিশ্চেষ্ট করে তুলে সর্বতোভাবে এই প্রকাণ্ড প্রকৃতির মুখোমুখি করে দাঁড় করাবার অবসর পাই নে— নিজের ভিতরে অহরহ একটা-না-একটা-কিছু প্রক্রিয়া চলছে, বাইরে যে কিছু আছে এ কথা ভুলে থাকতে হয়। সৌন্দর্য জিনিসটাও কিছু jealous, সম্পূর্ণ মনটিকে না পেলে সে সম্পূর্ণভাবে ধরা দেয় না। আমি তো সেইজন্যেই বলি কবিতা কিম্বা সাহিত্যের কোনো সুন্দর সৃষ্টি যথার্থ বোঝবার এবং উপভোগ করবার জন্যে যথেষ্ট নির্জনতা এবং শান্তির আবশ্যক— তাড়াতাড়ির কর্ম নয়, দুটো কাজের মাঝখানকার অল্প অবসরের মধ্যে তাকে চট্ করে একটুখানি চেখে নেবার জো নেই। সেই জন্যেই এত অল্প লোকের যথার্থ কবিতা ভালো লাগে। তাদের মনের মধ্যে অপর্যাপ্ত স্থান এবং অবসর নেই— অল্প জায়গাটুকুর মধ্যে বড্ড বেশি ভিড়। মফস্বলে না এলে কলকাতায় কোনো কবিতার বই খুলতে আমার ভয় হয়। মনে হয় সে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে, হয়তো উপযুক্ত সময়েও আর ভালো লাগবে না। কলকাতায় কবিতার মতো জিনিস বড়ো সংকুচিত হয়ে যায়— সেখানে তাকে বড়ো সামান্য মনে হয়। এখানে নির্জনে তার অতলস্পর্শ গভীরতা এবং সত্যতা ঠিক মনের সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারি। বুঝতে পারি আমাদের প্রকৃতির পক্ষে ওটা কত একান্ত আবশ্যক এবং এতদিন শহরের মধ্যে মনটা কিরকম উপবাসী হয়েই ছিল।

সাতারা
২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

১৯০

শিলাইদহ
১৮ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

আজকের দিনটি এমনি নিস্তব্ধ এবং সুন্দর যে, পরিপূর্ণ আলস্যরসে নিমগ্ন হবার জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে আছে। কিন্তু সাধনার জন্যে 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' এখনো বাকি আছে। দুখানা অপাঠ্য বই পড়ে তার উপরে অপ্রিয় কথা লিখতে হবে।

নিতান্ত বাজে কাজ—এ রকম কাজ এমন দিনে করা অন্যায়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস-বশত ফাল্গুনের এই প্রশান্ত মধ্যাহ্নে এই নির্জন অবসরে এই নিস্তরঙ্গ পদ্মার উপরে এই নিভৃত বোটের মধ্যে বসে, সম্মুখে সোনার রৌদ্র সুনীল আকাশ এবং ধূসর বালুর চর নিয়ে, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু-কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ান-গোবিন্দরামের সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে। সে বইও কেউ পড়বে না, সে সমালোচনাও কেউ পড়বে না, মাঝের থেকে আজকের এই দুর্লভ দিনটা নষ্ট হবে। ভেবে দেখতে গেলে জীবনে এরকম দিন ক'টাই বা আসে! অধিকাংশ দিনগুলোই ভাঙাচোরা, জোড়াতাড়া—আজকের দিনটি এই স্তব্ধ নদীর উপরে একটি পরিস্ফুট পদ্মের মতো প্রশান্ত-সম্পূর্ণ-ভাবে ফুটে উঠেছে, আমার মনটিকে তার নিভৃত মর্মকোষের মধ্যে আকর্ষণ করে নিচ্ছে। আবার হয়েছে কী, একটা হলদে-কোমরবন্ধ-পরা স্নিগ্ধ নীল রঙের মস্ত ভ্রমর আমার বোটের চার দিকে গুঞ্জনধ্বনি-সহকারে চঞ্চলভাবে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বসন্তকালে ভ্রমরগুঞ্জনে বিরহিণীদের বিরহবেদনা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এ কথাটাকে আমি চিরকাল মনে মনে পরিহাস করে এসেছি। কিন্তু ভ্রমরগুঞ্জনের যথার্থ মাধুর্য এবং মর্ম আমি একদিন দুপুরবেলায় বোলপুরে প্রথম আবিষ্কার করেছিলুম। সেদিন এক রকম খ্যাপাটে ভাবে সেখানকার দক্ষিণের বারান্দাটায় নিষ্কর্মার মতো বেড়াচ্ছিলুম—মধ্যাহ্নটা মাঠের উপর প্রসারিত হয়ে পড়েছিল এবং গাছের নিবিড় নিভৃত পল্লবরাশির মধ্যে একটি শ্রান্ত নিস্তব্ধতা ছায়া বিস্তার করে বিরাজ করছিল—বুকের ভিতরে একটা ব্যথা বোধ হচ্ছিল, আর সেই সময়ে বারান্দার নিকটবর্তী একটা নিম গাছের কাছে ভ্রমরের অলস গুঞ্জনধ্বনি সমস্ত উদাস উদার মধ্যাহ্নের একটা সুর বেঁধে দিচ্ছিল। সেইদিন বেশ বুঝতে পারলুম, মধ্যাহ্নের সমস্ত অনির্দিষ্ট শ্রান্ত সুরের মূল সুরটা হচ্ছে ঐ ভ্রমরের গুঞ্জন। বেশ বুঝতে পারা গেল—ওতে করে বিরহিণীদের বিরহব্যথা বেড়ে ওঠা কিছুই অসম্ভব নয়। আসল কথাটা হচ্ছে, ঘরের মধ্যে যদি একটা ভ্রমর এসে পড়েই ভোঁ ভোঁ করতে আরম্ভ করে তাতে কারও ব্যথা বা সুখের বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু গাছপালার মধ্যে খোলা আকাশে সে যে সুরটি লাগায় সেটি ঠিক লাগে। আজকের আমার এই সোনার-মেখলা-পরা ভ্রমরীটিও ঠিক সুর দিচ্ছে—নিশ্চয় বোধ হচ্ছে কোনো গ্রন্থের সমালোচনা করছে না, কিন্তু কেন যে আমার বোটের চার পাশে ঘুর ঘুর করে মরছে আমি তো বুঝতে পারছি নে। আমি যদি শকুন্তলা হতুম তা হলেও একটা মানে বোঝা যেত, কিন্তু অপক্ষপাতী ব্যক্তি মাত্রেই বলবে আমি শকুন্তলা নই। এইমাত্র আমার বোটের পাশ দিয়ে একটা নৌকো চলে গেল। তার একজন মুসলমান দাঁড়ি বুকের উপর এক বই নিয়ে চিত হয়ে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে সুর করে করে একটি কাব্য পাঠ করছে। ও লোকটারও বেশ রসবোধ আছে—ওকে বোধ হয় ধরে পিটলেও দেওয়ান গোবিন্দরামের সমালোচনা করতে বসতে পারে না।

সাতারা
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

১৯১

শিলাইদহ
২২ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

এই-সকল কারণে খানিকটা বিষয়কর্ম করে, খানিকটা চিঠি লিখে, খানিকটা খবরের কাগজ পড়ে, খানিকটা প্রবন্ধ সংশোধন করে আজকের দিনটা কেটে গেছে। এখন চারটে বেজে গেছে, রোদ্দুরটা পড়ে গেলেই বেড়াতে বেরব। যে-সব দিনে পুরোপুরি কাজ কিম্বা পুরোপুরি বিশ্রাম দুয়ের কোনোটাই হয় না, সে-সব দিন নিতান্তই ফেলা যায়। আমাদের মুলতান রাগিণীটা এই চারটে-পাঁচটা বেলাকার রাগিণী, তার ঠিক ভাবখানা হচ্ছে— 'আজকের দিনটা কিচ্ছুই করা হয়নি'। বোধ হয় দুপুরবেলায় ঘুমিয়ে উঠে কোনো ওস্তাদ ঐ রাগিণীর সৃষ্টি করেছিল। আজ আমি এই অপরাহ্নের ঝিক্‌মিকি আলোতে জলে স্থলে শূন্যে সব জায়গাতেই সেই মুলতান রাগিণীটাকে তার করুণ চড়া অন্তরা-সুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি— না সুখ, না দুঃখ, কেবল আলস্যের অবসাদ এবং তার ভিতরকার একটা মর্মগত বেদনা। দুঃখের এক রকম ব্যথা আছে, কিন্তু তার ভিতরেও একটু রস থাকে। আর, এক রকম দুঃখহীন অনুভূতিহীন অসাড়তার অন্তঃশীলা ব্যথা আছে— সেটা ভারী নীরস, তার ভিতরে একটা উদারতা এবং কল্পনার সৌন্দর্য নেই। আর-একটা বড়ো বিপদ্ হয়েছে— ভারী মশা হয়েছে। তাতে করে মনটাকে নিতান্ত বিক্ষিপ্ত করে দেয়। সর্বদাই গা হাত পা চাপড়াতে গেলে চিন্তার গভীরতা কিম্বা ভাবের মাধুর্য কিছুতেই রক্ষা করা যায় না; একটা হিংস্র প্রবৃত্তি মনের মধ্যে জেগে থাকে, অথচ সেটা উপযুক্ত পরিমাণে চরিতার্থ হতে পারে না। এই রকমের সামান্য পীড়নে, মশার কামড়ে, সহযোগীসাহিত্যসমালোচনে, মোহনভোগের মধ্যে বালিতে, মানুষকে কোনোরকম বীরত্ব শিক্ষা দেয় না সে আমি বলতে পারি। এই জন্যে আরও পারি যে, আজই আমার মোহনভোগে বালি ছিল— আমার মনের ভাব কী রকম হয়েছিল স্পষ্ট মনে আছে, সে মনের ভাব খৃস্টান কিম্বা ব্রাহ্মের উপযুক্ত নয়, ... ভালো মুসলমানেরও অযোগ্য।

সাতারা
২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

১৯২

শিলাইদহ
২৩ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

এইবার বসন্ত কালটা পড়ল। এই সময়টা যদি আমার কোনো দায়ে-পড়া কাজ ঘাড়ে না থাকত, যদি বন্ধনমুক্ত থাকতুম, তা হলে বেশ হত। তা হলে কল্পনার রাশ ঢিলে করে দিয়ে পূর্ণ অবসরের মধ্যে দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে চলে যেতে পারতুম। বড়ো আরামে জানলাটির কাছে গিয়ে বসতুম এবং লেখা পড়া ভাবনা সবই বেশ

ভরপুর ভাবে হতে পারত। এখন সাধনার জন্যে লিখতে লিখতে কিরকম অন্যমনস্ক হয়ে যাই, বাইরে যা-কিছু ঘটে তাতেই মনকে আকর্ষণ করে নেয়— নৌকো চলে যায় মুখ তুলে দেখি— খেয়া পারাপার করে তাই দেখেও অনেকটা সময় চলে যায়— ডাঙায় আমার বোটের খুব কাছে মন্থরগতি মোষগুলো তাদের বড়ো বড়ো মুখ তৃণগুল্মের মধ্যে পুরে দিয়ে সেগুলো নেড়েচেড়ে নিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ নিশ্বেস ফেলে কচ্ কচ্ শব্দ করতে করতে খেতে খেতে লেজের ঝাপটায় পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে চলতে থাকে, তার পরে একটা অতি ক্ষুদ্র শীর্ণ দুর্বল উলঙ্গপ্রায় ছেলে এসে এই প্রশান্তপ্রকৃতি বৃহৎ জন্তুটার পিঠে একটা ছোটো লাঠির গুঁতো মেরে হঠ্ হঠ্ শব্দ করতে থাকে। জন্তুটা তার বড়ো বড়ো চোখে এক-একবার এই ক্ষীণ মনুষ্যশাবকের প্রতি কটাক্ষপাত করে পথের মধ্যে দুই-এক গ্রাস ঘাস পাতা ছিঁড়ে নিয়ে অব্যাকুলচিত্তে মৃদুমন্দগমনে খানিকটা দূরে সরে যায়— এবং ছেলেটা মনে করে তার রাখালের কর্তব্যকর্ম করা হল। আমি রাখাল ছেলেদের এই সাইকলজির রহস্য এ পর্যন্ত ভেদ করে উঠতে পারলুম না— গোরু কিম্বা মোষ যেখানে নিজে ইচ্ছাপূর্বক পরিতৃপ্ত সন্তুষ্ট-ভাবে আহার করছে, অকারণে মার-ধোর করে সেখান থেকে তাড়িয়ে আর খানিক দূরে নিয়ে গিয়ে তাদের কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় আমি তো বুঝতে পারি নে। বোধ হয় জন্তুদের উপরে প্রভুত্ব করা। পোষমানা সবল প্রাণীদের উপর অনাবশ্যক উৎপীড়ন করে নিজের ক্ষমতাগর্ব অনুভব করা বোধ হয় মানুষের একটা স্বভাব। আমার কিন্তু এই রাখাল ছেলেগুলোর উপর ভারী রাগ ধরে। খুব ঘন সরস তৃণগুল্মের মধ্যে গোরু-মোষের খাওয়া দেখতে আমার বেশ লাগে। যাদের মধ্যে উন্নততর প্রকৃতি বলে একটা কোনো উপসর্গ নেই, তাদের খাওয়া শোওয়া বসা প্রভৃতি সামান্য ব্যাপারগুলোও বেশ দেখবার যোগ্য বলে বোধ হয়। গরিব ছোটোলোকেরা যখন সামান্য ডাল ভাত নিয়ে উবু হয়ে বসে খেতে থাকে তখন সেটা দেখে বেশ একটু সুখ অনুভব করা যায়। কিন্তু বড়োমানুষ বড়োলোকের ছত্রিশ ব্যঞ্জনের সুদীর্ঘ ভোজন ব্যাপার ভারী বিরক্তিজনক। কী কথা বলতে কী কথা উঠল দেখ্। আমি বলতে যাচ্ছিলুম যে, সাধনার পাঠকদের জন্যে যখন আমি উচ্চ অঙ্গের খোরাক-সংগ্রহে নিযুক্ত তখন নদীর ধারে তৃণগুল্মরাশির উপরে গোরু মোষ চরার সামান্য দৃশ্য আমার সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। তোকে পূর্বপত্রে বলেছি বোধ হয়— কদিন ধরে গোটা-দুয়েক ভ্রমর প্রায়ই মাঝে মাঝে আমার বোটের চার দিকে এবং আমার বোটের মধ্যে এসে অত্যন্ত চঞ্চল ভাবে ব্যর্থ গুঞ্জনে এবং বৃথা অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রোজই বেলা নটা-দশটার সময় তাদের দেখা যায়— তাড়াতাড়ি একবার আমার টেবিলের কাছে, ডেস্কের নিচে, রঙিন সার্শির উপরে, আমার মাথার ধারে ঘুরে আবার হুস্ করে বেরিয়ে চলে যায়। আমি অনায়াসে মনে করতে পারি লোকান্তর থেকে কোনো অতৃপ্ত প্রেতাত্মা রোজ সেই একই সময়ে ভ্রমর-আকারে একবার করে আমাকে দেখেশুনে প্রদক্ষিণ করে চলে যায়। কিন্তু আমি তা মনে করি নে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওটা সত্যিকার ভ্রমর, মধুপ, সংস্কৃতে যাকে কখনো কখনো বলে দ্বিরেফ।

সাতারা। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

১৯৩

শিলাইদহ
বুধবার, ১৬ ফাল্গুন ১৩০১

কাল বিকেলে সাধনার জন্যে একটা গল্প লেখা শেষ করে আজ কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছি। দুপুরবেলাটিও খুব নিস্তব্ধ এবং গরম এবং শান্ত এবং স্থির হয়ে আছে— খুব ছেলেবেলায় ইস্কুলে একটার সময় ছুটি হলে নির্জন ক্লাসে জানলার কাছে বসে কলকাতার বাড়িগুলোর শূন্য নিস্তব্ধ ছাদশ্রেণীর দিকে চেয়ে এবং বহুদূরে আকাশের চিলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনে যে রকম মন-কেমন করতে থাকত, আজও ঠিক সেই রকম ভাবটা মনে উদয় হয়েছে। নিজের সেই সুগভীর স্বপ্নাবিষ্ট বাল্যকালের উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনাগুলির কথা মনে পড়ছে— খুব বেশিদিনের কথা বলে মনে হচ্ছে না। অথচ এবারকার মানবজন্মের অর্ধেক দিন তো চলে গেছেই। আমরা প্রত্যেক মুহূর্তে প্রত্যেক দিন মাড়িয়ে মাড়িয়ে জীবনটা সম্পূর্ণ করি, কিন্তু মোটের উপরে সবটা খুবই ছোটো। দুটি ঘণ্টা কালের নির্জন চিন্তার মধ্যে সমস্তটাকে ধারণ করা যেতে পারে। শেলি ত্রিশটা বৎসর প্রতিদিন সহস্র কাজে সহস্র প্রয়াসে জীবন ধারণ করে দুটি ভল্যুম জীবনচরিত গড়েছেন মাত্র, তার মধ্যেও ডাউডেন সাহেবের বাজে কথা বাজে তর্ক ঢের আছে— দুখানা বই এক হপ্তার মধ্যে অনায়াসেই শেষ করে ফেলা যায়। আমাদের এই ত্রিশটা বৎসরে বোধ করি দুখানা ভল্যুমও হয় না। এই তো ব্যাপার— এইটুকুমাত্র কাণ্ড, কিন্তু এর কতই আয়োজন— কত দ্বন্দ্ব, কত সংগ্রাম, কত দুশ্চেষ্টা! এইটুকুর রসদ জোগাবার জন্যে কত ব্যাবসা, কত জমিদারি, কত লোকজন! আছি এই দেড়হাত চৌকিতে চুপচাপ করে বসে— কিন্তু কত রকমে পৃথিবীর কত স্থানের কত জায়গাই জুড়ে আছি! সেই সমস্ত বাদ-সাদ পড়ে বাকি থাকে কেবল দুটি ঘণ্টার চিন্তা— তাও বেশি দিনের জন্যে নয়। আজ আমার সেই ছেলেবেলাকার পুকুরের ধারের দক্ষিণ দিকের তোষাখানাটা মনে পড়ছে। তখন ই [রু] খুব ছোটো ছিল, সেও আমাদের দলের একটি ছিল। তোষাখানার সেই ক্ষুদ্র কেন্দ্রটি থেকে সেই ই [রু] কোথায় কতদূরে চলে গেছে, আমিও আর-এক লাইনে বহুদূরে এসেছি। তার পরে এমনি করে লাইন যদি বরাবর সোজা টেনে চলা যায় তা হলে সেই দক্ষিণদ্বারী জোড়াসাঁকোর তোষাখানার ঘর থেকে কোন্‌ রহস্যান্ধকারের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করতে হয় তার ঠিকানা নেই। আজকের আমার এই একলা বোটের দুপুর বেলাকার মনের ভাব, এই চিন্তা, এই একটা দিনের কুঁড়েমি এবং কল্পনা সেই বৃহৎ লাইনের মধ্যে কোন্‌খানে পড়ে— কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। এই নিস্তরঙ্গ পদ্মার ধারের নিস্তব্ধ বালির চরের উপরকার নির্জন পরিপূর্ণ মধ্যাহ্নটি আমার অনন্ত অতীত এবং অনন্ত ভবিষ্যতের মধ্যে কি কোথাও একটি অতি ক্ষুদ্র সোনালি রেখার চিহ্ন রেখে দেবে? ভারতবর্ষের রোদ্‌দুরটার মধ্যে কী-যে একটা বৈরাগ্য আছে সে কারও সাধ্য নেই এড়াতে পারে।

সাতারা
৫ মার্চ্‌ ১৮৯৫

বুধবার ১৬ ফাল্গুন— ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫ তারিখ। পরবর্তী চিঠিতে এই চিঠিরই উল্লেখ আছে মনে করিলে, সম্ভবতঃ উভয়েরই রচনা ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫ তারিখে।

১১৪

শিলাইদহ
বুধবার?
২৮ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

আজ আমি এক অনামিকা চিঠি পেয়েছি। তার আরম্ভই হচ্ছে—

পরের পায়ে ধরে প্রাণ দান করা
সকল দানের সার!

তার পরে অনেক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। আমাকে সে কখনো দেখে নি, কিন্তু আজকাল আমার 'সাধনা'র মধ্যে সে আমাকে দেখতে পায়। তাই লিখেছে—'তোমার সাধনায় রবিকর পড়িয়াছে, তাই রবি-উপাসক যত ক্ষুদ্র যত দূরে থাকুক তবুও তার জন্যেও আজি রবিকর বিকীর্ণ হইতেছে। তুমি জগতের কবি, তবুও সে ভাবিতেছে আজি তুমি তাহারও কবি।' ইত্যাদি ইত্যাদি। মানুষ ভালোবাসার জন্যে এতই ব্যাকুল যে, শেষকালে নিজের আইডিয়াকে নিয়ে ভালোবাসতে থাকে। আইডিয়াকে রিয়ালিটির চেয়ে কম সত্য মনে করা আমাদের একটা মোহ মাত্র। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যা পাচ্ছি, বিজ্ঞান এবং দর্শন বলছে, সেটা আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৈরি; প্রকৃত সেটা কী কেউ জানে না—আমরা আইডিয়ার দ্বারা যা পাই সেটা আমাদের মনের সৃষ্টি, তারও প্রকৃত সত্তা কেউ বলতে পারে না। তবু মনের সৃষ্টির চেয়ে ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টিকে লোকে বেশি বিশ্বাস করে। যারা আমাকে ইন্দ্রিয়-দ্বারা, সঙ্গসাক্ষাৎ-দ্বারা জানে, তারাও আমার প্রকৃত সত্য থেকে অসীম দূরে আছে—আর এই আমার অনামক ভক্তটি তার আইডিয়ার দ্বারা আমাকে যে রকম করে অনুভব করছে সেটা হয়তো অপেক্ষাকৃত সত্য। প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই একটি আইডিয়াল মানুষ আছে; সেটা কেবল ভক্তি প্রীতি স্নেহের দ্বারা খানিকটা নাগাল পাওয়া যায়, প্রত্যেক ছেলের মধ্যে যে-একটি অসীম আইডিয়াল আছে সে কেবল ছেলের মা তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করে—অন্যের ছেলের মধ্যে সে সেই আইডিয়াল সত্তাটি সেই অনির্বচনীয় সত্যটি দেখতে পায় না। রিয়ালিটিতে সেই আইডিয়াল সত্যকে অনেক সময় আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমরা হয়তো কল্পনাবলে শিশুজাতিকে মনে মনে স্নেহ করতে পারি, কিন্তু একটা সত্যিকার ছেলের মলিনতা কুশ্রীতা কাঁদুনিতা দেখে আমরা কিছুতেই কল্পনা করতে পারি নে তার মধ্যে এমন কী আছে যে জন্যে তার মা তার জন্যে প্রাণ সমর্পণ করতে পারে—পৃথিবীর সব চেয়ে তাকে প্রিয়তম সুন্দরতম মনে করতে পারে! মা তার ছেলেকে যা মনে করে প্রাণ দেয় সেইটেই কি মিথ্যা আর আমি তার ছেলেকে যা মনে করে তার জন্যে প্রাণ দিতে পারি নে সেইটেই কি বেশি সত্য? আমি এই কথা বলি, প্রত্যেক ছেলে এবং প্রত্যেক বুড়োর মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যার জন্যে প্রাণ সমর্পণ করতে পারা যায়। আমাদের স্বভাবে যথেষ্ট প্রেম নেই বলে আমরা সেই আইডিয়ালকে আবিষ্কার করতে পারি নে। সমস্ত মানুষ এবং প্রত্যেক মানুষের জন্যে যিশুখৃস্টের প্রাণসমর্পণের মধ্যে সেই সত্যটা গোপন আছে। প্রত্যেক জীবই অনন্ত কালের অনন্ত যত্নের ধন, তার মধ্যে একটি অনন্ত সৌন্দর্য আছে। কী কথা থেকে কী কথা উঠল দেখ্‌। আসল কথাটা হচ্ছে—এক হিসাবে আমি আমার এই ভক্তটির প্রীতি-উপহার গ্রহণ করবার যোগ্য নই, হয়তো সে যদি আমাকে প্রতিদিন

ঘনিষ্ঠভাবে জানত তা হলে এ রকম প্রীতি করতে সক্ষম হত না; আর-এক হিসাবে আমিও এই রকম, এমন-কি, এর চেয়ে ঢের বেশি প্রীতি পাবার অধিকারী। এই কথাটাই হচ্ছে খৃস্টানধর্মের এবং বৈষ্ণবধর্মের মর্মের কথা। আজ দুপুরবেলায় একখানা চিঠিতে অনেক বৈরাগ্যের কথা লিখেছি, আবার সন্ধ্যার সময় আর-একখানা চিঠি লিখতে গিয়ে অনুরাগের কথা এসে পড়ল!

সাতারা
৫ মার্চ ১৮৯৫

১৯৫

শিলাইদহ
১ মার্চ। ১৮৯৫।

এক-একদিন চিঠি না পেয়ে তার পরদিন পেলে একটা বিশেষ নতুন আনন্দ পাওয়া যায়— হঠাৎ মনের এবং সেই সঙ্গে দৈনিক কাজের কলটা যে বিগড়ে ছিল সেইটে আবার যখন হঠাৎ উৎসাহের সঙ্গে চলতে আরম্ভ করে তখন বেশ একটা উল্লাস অনুভব করা যায়। পৃথিবীটা ঠিক আমার মনের মতো নয় এইটে মনে করে অনেক সময় বিষণ্ণ হয়ে থাকা যায়, কিন্তু এক-এক দিন আসে যখন পৃথিবীটা ঠিক পূর্বের মতোই আছে এইটে মনে করে বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুতবেগে বইতে আরম্ভ করে। ক্রিস্টিনা রসেটির যে কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছিস সেটা বেশ লাগল। কিন্তু তার প্রথম চার লাইনই ভালো এবং ঐ চার লাইনেই সমস্ত কথাটা সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেছে। তার পরে যেটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে তাতে করে ভাবটা অগ্রসর হয় নি, বরঞ্চ কিছু দুর্বল হয়ে পড়েছে। এক-একটা গান যেমন আছে যার আস্থায়ীটা বেশ, কিন্তু অন্তরাটা ফাঁকি— আস্থায়ীতেই সুরের সমস্ত বক্তব্যটা সম্পূর্ণরূপে শেষ হওয়াতে কেবল নিয়মের বশ হয়ে একটা অনাবশ্যক অন্তরা জুড়ে দিতে হয়। যেমন আমার সেই 'বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে' গানটা— তাতে সুরের কথাটা গোড়াতেই শেষ হয়ে গেছে, অথচ কবির মনের কথাটা শেষ না হওয়াতে গান যেখানে থামতে চাচ্ছে কথাকে তার চেয়ে বেশি দূর টেনে নিয়ে যাওয়া গেছে। কবিতাতেও একটা সুর আছে, ক্রিস্টিনা রসেটির এই কবিতায় সেই আসল সুরটুকু প্রথম চার লাইনেই শেষ হয়ে গেছে। তুই লিখেছিস, 'আমি এপর্যন্ত বুঝতে পারলুম না যে, আসল, ভালো ভাব ভালো প্রকাশ করেছে বলে আমার কোনো কবিতা ভালো লাগে— না শুধু একটু 'ধরণে'র জন্যে, শুধু একটু ঘুরিয়ে চুট্ করে বলা একটু ভাষার চালাকির জন্যে।' আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ ভাবই আমাদের কাছে পুরাতন; এবং আমাদের মনের ধর্মই এই যে, পুরাতন অভ্যস্ত জিনিসগুলির সম্পূর্ণ সৌন্দর্য এবং রস আমাদের অনুভব করবার ক্ষমতা নেই— সেই জন্যে কোনো কবি যখন পুরাতন ভাবের মধ্যে ভাষা ছন্দ এবং বলবার নতুন ধরনের দ্বারা আমাদের মনকে আকর্ষণ করে আনে তখন আবার আমরা নতুন করে সেই জিনিসটির আসল রসটুকু আস্বাদন করতে পারি— তখন চিরকেলে শোনা কথাটা নতুন সংগীতে কানের মধ্যে মনের মধ্যে বাজতে থাকে। কবিদের একটা প্রধান কাজ,

পৃথিবীটাকে সর্বদা তাজা রেখে দেওয়া—গাছের সবুজ, আকাশের নীল, সন্ধ্যাবেলাকার সোনালি, সমস্ত এতদিনে ধুলো পড়ে অনেকটা ম্যাড়্‌মেড়ে হয়ে আসত, যদি না কবিরা সর্বদাই তার উপরে আপনাদের কল্পনাপাত করে আসত। মানুষের মনটা চিন্তার তাপে শীঘ্র শীঘ্র পেকে যায় বলে কবিত্বের কাজ হচ্ছে কল্পনার অমৃত সিঞ্চন করে তাকে অনন্তকাল সজীব সরস করে রাখা। সে নতুন জিনিস কিছুই দেয় না, সে কেবল মনটাকে নতুন করে রাখতে চেষ্টা করে।

সাতারা
৬ মার্চ্‌ ১৮৯৫

১৯৬

শিলাইদহ
৬ মার্চ্‌। ১৮৯৫।

সৌন্দর্যের চর্চা কিম্বা সুবিধার চর্চা এর মধ্যে কোন্‌টাকে প্রাধান্য দিতে হবে এই নিয়ে তোর আজকের চিঠিতে একটুখানি তর্ক আছে—ওটা অনেকটা অবস্থা এবং অসুবিধার পরিমাণের উপরে নির্ভর করে। ফর ইন্‌স্‌টান্‌স্‌, ছাতা মাথায় দিয়ে ঘোড়ায় চড়ার তুই যে উদাহরণ দিয়েছিস সেটার মধ্যে প্রকৃত পক্ষে সৌন্দর্যের কোনো তর্ক নেই। কেননা, হয়তো ঘোড়ায় চড়ে ছাতা মাথায় দিলে অসুন্দর না হতেও পারে, এ দিকে আবার ঘোড়া চালাবারও অসুবিধে হতে পারে। কিন্তু আমার মতে ওটা অসংগত। ঘোড়ায় চড়ার সঙ্গে পৌরুষের একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে; সেই জন্যে লোকের সহজেই মনে হয়, যদি ঘোড়ায় চড়তেই বসলে তবে আবার ছাতা মাথায় কেন? অসুবিধা অসুন্দর এবং অসংগত এই তিনটেকেই এড়িয়ে চলা আবশ্যক; কিন্তু বোধ হয় শেষটাকে সব চেয়ে বেশি। মেয়েদের মতো শাড়ি পরলে যদি কোনো পুরুষকে সুন্দর দেখতেও হয় এবং অসুবিধাও না হয়, তবু সে অদ্ভুত কাজে না যাওয়াই সংগত। সে সম্বন্ধে লজ্জাটা একটা স্বাভাবিক লজ্জা। আসলে, নিজেকে বেশি করে কারও চোখে ফেলতে একটা স্বভাবতই সংকোচ হয়—ইংরাজিতে যে-সমস্ত আচরণকে 'লাউড' বলে সেটা ঐ কারণেই নিন্দনীয় এবং যথার্থ ভদ্রতার স্বভাবই হচ্ছে অপ্রগল্‌ভ। অসংগত অদ্ভুত ব্যবহারে লোকের দৃষ্টি যে রকম অধিক করে আকর্ষণ করে তাতে লোকের লজ্জা অনুভব করাই উচিত—যেমন নিজের সম্বন্ধে খুব বেশি করে সচেতন থাকাটা কিছু নয় তেমনি পরের চেতনার উপর প্রবল আঘাতে নিজেকে আছড়ে ফেলতে বিশেষ একটা অপ্রবৃত্তি থাকা উচিত। আমি যদি রাত-কাপড় পরে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি তা হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না এবং হয়তো সুন্দর দেখতে হতেও পারে, কিন্তু অসংগত ব্যবহারের দ্বারা খামকা লোককে আঘাত দেওয়া ঠিক শিষ্টাচার নয়। এর একটা সীমা আছে, কিন্তু সে সীমা অনেক দূরে। যখন কোনো প্রচলিত নিয়ম —কোনো দেশব্যাপী অভ্যাস—আমি অন্যায় এবং সাধারণের অনিষ্টজনক মনে করি, কিম্বা কোনো নূতন প্রথা যদি হিতকর বলে মনে হয়, তখন সে বিষয়ে সাধারণকে গুরুতর আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত হয় না; তখন সংগত

অসংগতর তর্কটা ভারী ছোটো। কিন্তু মনের সেই স্থির লক্ষ্য এবং উচ্চ অভিপ্রায়টা থাকা চাই। আমাদের দেশের মেয়েরা ছাতা মাথায় এবং জুতো পায়ে দেয় না, অতএব যে মেয়ে এ কাজ প্রথমে করবে তাকে সকলের বিদ্রূপ-চোখে পড়তেই হবে —কিন্তু তাই বলে সে লোকব্যবহারকে খাতির করে চললে চলে না। কিন্তু সাধারণত সাধারণ মানুষের মতো চলার সুবিধে এই যে, তাতে অন্য লোকেরও চলার বাধা হয় না, নিজেরও চলার সুবিধে হয়—নইলে অন্য লোককেও ব্যাঘাত করা হয় নিজেরও অনর্থক ব্যাঘাতের কারণ হয়। ছোটোখাটো সুবিধা অসুবিধার জন্যেও যদি সাধারণের অভ্যাস এবং সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ করে চলতে হয়, তা হলে সেটা ঠিক মশা মারতে কামান পাতার মতো একটা অদ্ভুত অসংগত কাণ্ড হয়। সেই অসংগতির মধ্যে যে-একটা হাস্য অথবা বিরক্তি-জনকতা আছে, সেটা অতিক্রম করবার উপযুক্ত কোনো উচ্চ অভিপ্রায় তার মধ্যে পাওয়া যায় না। তা হলে তো ভদ্রবেশে ভদ্রসমাজে গিয়ে গরম বোধ করবামাত্র চাপকান এবং কামিজ খুলে ফেলে দিব্যি গা'টি অনাবৃত করে বসা যায়—ফিলজফাইজ করতে গেলে, তাতেই বা দোষ কী! লোকে কী মনে করবে বলে আমি গরমে শরীরকে অসুস্থ করব কেন? আমি বক্তৃতা দিচ্ছি বটে, কিন্তু লোকব্যবহারবিরুদ্ধ আচরণ আমি নিজে অনেক করেছি। কিন্তু তার স্বপক্ষে আমি কোনো কথা বলতে চাই নে—আমি জানি সে আমার খেয়াল, আমার পাগলামি। ব[ড়দা]রও উল্টো জোব্বা এবং ট্রাইসিক্‌লের বেশটাও যে খুব সর্বসম্মত তা কেউ বলবে না, কিন্তু যখন প্রিন্সিপ্‌ল্‌ নিয়ে তর্ক হচ্ছে তখন ব্যক্তিগত আচরণের কথা তোলবার দরকার নেই। যেখানে কেবলমাত্র নিজেকে নিয়ে কথা সেখানে সুবিধা এবং সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য করবার চেষ্টা করা আবশ্যক, যেখানে সমাজকে নিয়ে কথা সেখানে সুবিধা সৌন্দর্য এবং সুসংগতি এই তিনটেরই সামঞ্জস্য করা আবশ্যক—এইটে হচ্ছে স্থূল কথা। তর্কেই চিঠি পুরে এল—চিঠির কাগজ ছোটো হওয়ার সুবিধা এই যে তর্ককেও ছোটো করতে হয়, নইলে বড়ো প্রবন্ধ হয়ে উঠত।

সাতারা
১১ মার্চ্‌ ১৮৯৫

১৯৭

শিলাইদহ
৭ মার্চ্‌। ১৮৯৫।

তোর কালকের সেই চিঠিটা পড়ে আমি ভাবছিলুম যে, এটা সত্যি বটে মেয়েরা আপনার চতুর্দিকে সৌন্দর্যরক্ষার প্রতি পুরুষদের চেয়ে ঢের বেশি যত্ন করে, কিন্তু সত্যি-সত্যি পুরুষদের চেয়ে কি তাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা বেশি আছে? এ-সব বিষয়ে সাধারণভাবে কোনো মীমাংসা করা যায় না; কারণ, মেয়ে পুরুষ উভয় জাতির মধ্যেই লোকবিশেষে সকল গুণের ইতরবিশেষ আছে—এরকম বিষয়ে যখন আমরা কোনো কথা বলি তখন প্রায় নিজেকেই নিজের জাতের প্রতিনিধি-স্বরূপে ধরে নেওয়া যায়। আমি যদিচ নিজের চারি দিককে সুন্দর করে রাখতে

ইচ্ছে করি, কিন্তু অনেক সময়েই নানা কারণে তাতে অবহেলা প্রকাশ করে থাকি— অনেক সময় সব অগোছালো হয়ে যায় এবং সর্বদা নিজেকেও যে পরিপাটী করে রাখি তা নয়। কিন্তু সৌন্দর্য যে আমাকে পাগল করে দেয় সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই—সৌন্দর্য এবং ভালোবাসার মধ্যে আমি যতটা অনন্ত গভীরতা হৃদয়ের সঙ্গে অনুভব করি এমন আর কিছুতে না, এবং যখন যথার্থ সেই ভাবাবেশে নিমগ্ন থাকা যায় তখন নিজের ব্যক্তিগত সাজসজ্জা এবং পারিপাট্যকে তেমন বেশি কিছু মনে হয় না—যখন মনটা সৌন্দর্যরসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন সেইটেই যথেষ্ট হয়। আমার বি[হারীলাল]কে মনে পড়ে; লোকটি নেহাত অসজ্জিত ঢিলেঢালা অপরিপাটী—কিন্তু তার লেখা পড়লে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে, সে একটি সৌন্দর্যের মাতাল ছিল। ব[ড়দাদা] যে এক সময়ে যথার্থ কবির মতো সমুদয় সৌন্দর্য উপভোগ করতেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি যে কোনোকালে তাঁর চারি দিক সুন্দর করে রাখতেন না এবং সুন্দর হয়ে থাকতেন না সেও নিশ্চয়। নিজের সম্বন্ধীয় সমস্ত জিনিস এবং সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে একটা সৌন্দর্যের অ্যাসোসিয়েশন থাকে এ ইচ্ছাটা মেয়েদের স্বাভাবিক। যখনই তাকে মনে পড়বে অমনি তার সঙ্গে সুগন্ধ সুদৃশ্য সুপারিপাট্য মনে উদয় হবে, লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সোনার পদ্মটিও চোখে পড়বে এটা খুব আবশ্যক। নিজেকে সৌন্দর্যের আদর্শ করতে হলে চারি দিককে সুন্দর করে তোলা চাই। ফুল প্রভৃতি সমস্ত সুন্দর জিনিসের প্রতি মেয়েদের একটি মমতাপূর্ণ স্নেহ আছে —সে-সমস্ত যেন তাদের নিজের বিশেষ জিনিস, তারা তাদের সঙ্গে সম্বন্ধে বদ্ধ। কিন্তু সৌন্দর্যের প্রতি পুরুষের মনের ভাব কিছু যেন স্বতন্ত্র প্রকৃতির—আমাদের কাছে সৌন্দর্যের আকর্ষণ ঢের বেশি প্রবল, সৌন্দর্যের অর্থ ঢের বেশি গভীর। আমি হয়তো ঠিক প্রকাশ করতে পারব না এবং প্রকাশ করতে গেলে হয়তো অলীক কবিত্বের মতো শোনাতে পারে—সৌন্দর্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা—যখন মনটা বিক্ষিপ্ত না থাকে এবং যখন ভালো করে চেয়ে দেখি তখন এক-প্লেট গোলাপ-ফুল আমার কাছে সেই ভূমানন্দের মাত্রা যার সম্বন্ধে উপনিষদে আছে : এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। সৌন্দর্যের ভিতরকার এই অনন্ত গভীর আধ্যাত্মিকতা এটা কেবল পুরুষরা উপলব্ধি করতে পেরেছে। এই জন্যে পুরুষের কাছে মেয়ের সৌন্দর্যের একটা বিশ্বব্যাপকতা আছে। সেদিন শঙ্করাচার্যর আনন্দলহরী বলে একটা কাব্যগ্রন্থ পড়ছিলুম, তাতে সে সমস্ত জগৎসংসারকে স্ত্রীমূর্তিতে দেখছে—চন্দ্র সূর্য আকাশ পৃথিবী সমস্তই স্ত্রীসৌন্দর্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে —অবশেষে সমস্ত বর্ণনা সমস্ত কবিতাকে একটা স্তবে একটা ধর্মোচ্ছ্বাসে পরিণত করে তুলেছে। বিহারী চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল সংগীতটাও ঐ শ্রেণীর। শেলির এপিসিকিডিয়নেরও ঐ অর্থ। কীট্সের অধিকাংশ কবিতা পড়লে মনে ঐ ভাবটার উদ্রেক হয়। কেবল চক্ষুকে কিম্বা কল্পনাকে নয়—সৌন্দর্য যখন একেবারে সাক্ষাৎভাবে আত্মাকে স্পর্শ করতে থাকে তখনই তার ঠিক মানেটি বোঝা যায়। আমি যখন একলা থাকি তখন প্রতিদিনই তার সুস্পষ্ট স্পর্শ অনুভব করি, সে যে অনন্ত দেশকালে কতখানি জাগ্রত সত্য তা বেশ বুঝতে পারি—এবং যা বুঝতে পারি তার অর্ধেকের অর্ধেকও বোঝাতে পারি নে।

সাতারা
১২ মার্চ ১৮৯৫

১১৮

শিলাইদহ
৮ মার্চ্। ১৮৯৫।

সাজাদপুরে গিয়ে একেবারে অনেক চিঠি জমে আছে দেখতে পাব। পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, কিন্তু সামান্য চিঠিখানি কম জিনিস নয়। পোস্ট্ আফিস হয়ে মানুষের এই একটা নতুন সুখবৃদ্ধি হয়েছে। এ একটা নতুন জাতের সুখ। আমি সুবিধার কথা বলছি নে, সে তো আছেই। কিন্তু চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নতুন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের আর-একটা বন্ধন যোগ করে দিয়েছে। আমরা মানুষকে দেখে যতটা লাভ করি, তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে যতটা লাভ করি, আবার চিঠিপত্র পেয়ে আর-এক দিক থেকে তাকে আর-এক রকম করে পাই। চিঠিপত্র-দ্বারা যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি, অসাক্ষাতে থেকেও কথাবার্তা কই, তা নয়, তার মধ্যে আরও একটু রস আছে— ঠিক সেটা প্রতিদিনের দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তার মধ্যে নেই। মানুষ মুখের কথায় আপনাকে যতখানি এবং যে রকম করে প্রকাশ করে লেখার কথায় ঠিক ততখানি করে না, আবার লেখায় যতখানি করে মুখের কথায় ততখানি করে না। উভয়ের মধ্যেই খানিকটা অসম্পূর্ণতা আছে যা কেবল উভয়ে মিলে পূরণ করতে পারে। এই জন্যে মানুষের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে চিঠিপত্র একটা নতুন-জাতীয় সুখ এবং বার্তা বহন করছে, যা পূর্বে ছিল না। এ যেন মানুষকে দেখবার জন্যে এবং পাবার জন্যে একটা নতুন ইন্দ্রিয়বৃদ্ধি হয়েছে। সামান্য কথাবার্তা এবং আলোচনা চিঠির মধ্যে বাঁধা পড়ে একটা নতুন চেহারা বার করে— কথায় যে জিনিসটা এড়িয়ে যায় এবং প্রবন্ধে যে জিনিসটা কৃত্রিম হয়ে ওঠে, চিঠিতে সেইটে অতি সহজে আপনাকে ধরা দেয়। আমার মনে হয়, যারা চিরকাল অবিচ্ছেদে চব্বিশ ঘণ্টা পরস্পর কাছাকাছি যাপন করেছে, যাদের মধ্যে কখনো চিঠিপত্র লেখালেখির অবসর হয় নি, তারা পরস্পরকে অসম্পূর্ণভাবে জানে, পরস্পরের চরিত্রের অনেক ডেলিকেট অনেক সত্য এবং সুগভীর জিনিস তাদের জানবার কোনো উপায়ই হয় না। যেমন বাছুর কাছে এলে গোরুর বাঁটে আপনি দুধ জুগিয়ে আসে, তেমনি মনের বিশেষ বিশেষ রস কেবল বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় আপনি সঞ্চারিত হয়, অন্য উপায়ে হবার জো নেই— এই চার পৃষ্ঠার চিঠি মনের ঠিক যে জায়গাটি দোহন করতে পারে, কথা কিম্বা প্রবন্ধের প্রভাব ঠিক সে জায়গায় কখনো পেঁৗছতে পারে না। আমার বোধ হয় ঐ লেফাফার মধ্যে একটি মোহ আছে, লেফাফাটি চিঠির একটি প্রধান অঙ্গ— ওটা একটা মস্ত আবিষ্কার। বোধ হয় ফরাসী জাতিকে এ জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয়।

সাতারা
১৩ মার্চ্ ১৮৯৫

১১৯

শিলাইদহ
১০ মার্চ্। ১৮৯৫।

এবারে মনে মনে স্থির করেছি কলকাতায় গিয়ে কোনো গোলমালের মধ্যে প্রবেশ করব না, চুপচাপ করে স্থির শান্ত চিত্তে লেখাপড়া করব। তার চেয়ে সুখের অবস্থা আর কিছু নেই। আজ বোধ হচ্ছে ত্রয়োদশী—খুব জ্যোৎস্না হবে—এই দু-চার দিন জ্যোৎস্নালোকে আমার পদ্মাপারের চরটাকে যতটা পারি অন্তরের মধ্যে বোঝাই করে নিয়ে যেতে হবে। খুব সম্ভব আসছে বারে যখন এখানে আসব তখন এই বিস্তীর্ণ শুভ্র চরখানি আর থাকবে না। তখন হয় ওখানে পদ্মার জল নয় চষা মাটি। আজকাল আর আমার একলা বেড়ানো হয় না। সঙ্গে প্রায়ই শৈ...এবং ঠা...বাবু থাকেন। তাঁদের কথাবার্তার মাঝে হঠাৎ এক-একবার অল্পক্ষণের মতো সমস্ত জ্যোৎস্নামণ্ডিত শান্তিপূর্ণ দৃশ্যটি এবং অনন্ত-আকাশ-পূর্ণ নিস্তব্ধতা আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়—আমার সেই চিরপরিচিতটি পর্দা সরিয়ে দিয়ে এক-একবার আমাকে দেখা দিয়ে যায়। তখন সমস্ত মনের মধ্যে এক আশ্চর্য পরিপূর্ণতা এসে উপস্থিত হয়—একটা যেন সুবৃহৎ সুকোমল সুগভীর আলিঙ্গনে আমার মনের আকণ্ঠ প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়, একটা নিঃশব্দ নিস্তব্ধ একান্ত প্রেম আমাকে নক্ষত্র-লোক থেকে এসে আবৃত করে দেয়। হঠাৎ সেই-সব কাজের কথা এবং শুকনো কথার মাঝখানে ক্ষণকালের জন্যে এই একটা সুগম্ভীর সুবিশাল আবির্ভাব আমার নিজের কাছেই আশ্চর্য বোধ হয়, আমার দুই পাশের দুই সঙ্গীকে তখন ভারী অসংগত মনে হয়। আমরা তিনজনে একত্রে বেড়াচ্ছি অথচ, কিছুক্ষণের জন্যে, তারা যেখানে বেড়াচ্ছে আমি সেখানে নেই। আমাকে আমার জ্যোৎস্নামগ্ন গম্ভীর মৌন জগৎ কথাবার্তার ক্ষণিক অবসরে হঠাৎ জানিয়ে দেয়, মনে কোরো না তোমার সঙ্গী কেবল দুজন আছে, আমরাও যেমন সেই চিরদিন দাঁড়িয়ে থাকি তেমনি আজও দাঁড়িয়ে আছি—

আমি নিশিদিন হেথা বসে আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো।

আমি কৌতুকহাস্যের কথা সাধনায় লিখেছি। আমি যখন জ্যোৎস্নারাত্রে পদ্মার ধারের নির্জন চরে ঠা...বাবুর মুখ থেকে এখানকার সেরেস্তার রিপোর্ট্ শুনতে থাকি এবং সেই রিপোর্টের ফাঁকে ফাঁকে নক্ষত্রভরা আকাশ উঁকি মারতে থাকে, তখন তার কৌতুকটা আমি এক-একবার অনুভব করতে পারি—ওর মধ্যে কোনো-একজন লোকের একটা মিষ্টি দুষ্টুমির হাসি আছে।

সাতারা
১৫ মার্চ্ ১৮৯৫

২০০

শিলাইদহ
১১ মার্চ। ১৮৯৫।

আমার কাছে অনেকগুলো জিনিস কোনোকালে পুরোনো হয় না—হয়তো যখন তফাতে থাকি তখন অন্যান্য জড় জিনিসের চাপে সেগুলোর উজ্জ্বলতা হ্রাস হয়ে যায়, কিন্তু যেই আবার তাদের সম্মুখবর্তী হই অমনি সমস্ত পুরোনো ভাব একেবারে নতুন হয়ে মনে জেগে ওঠে। আমার এই মফস্বলের প্রবাসটি কলকাতায় অনেকসময় ম্লান স্মৃতিরূপে মনে থাকে, তখন মনে হয় আমার সেই পদ্মাতীর হয়তো পুরোনো হয়ে গেছে—কিন্তু আশ্চর্য এই, যেই এখানে পা ফেলি অমনি দেখতে পাই সবই সেই প্রথম শুভদৃষ্টির সময়টির মতোই উজ্জ্বল বিস্ময়পূর্ণ হয়ে আছে। রোজই সন্ধ্যার সময় চরে বেড়াবার সময় আমার এই কথাটা মনে উদয় হয় যে, অন্যদিন যেটা আমার কাছে নতুন বলে ঠেকেছিল আজও ঠিক সেইটে আমার কাছে নতুন ঠেকছে—ঠিক সেই ভাবটা সেই রকম করে বুকের মধ্যে পুরে আসছে, যেন আজ এখানে এই প্রথম এলুম। এইটেই আমার কাছে ভারী পুলকের এবং বিস্ময়ের কারণ। আমার বোধ হয় বহুকাল থেকে তোকে আমি এ-সব জায়গা থেকে যে-সকল চিঠি লিখেছি সকলেরই ভাবখানা এক। বারম্বার আমি একই কথা একই আগ্রহকে প্রায় একই ভাষায় প্রকাশ করেছি। আমার আর অন্য উপায় নেই—কারণ, আমি ঠিক একই ভাব প্রতিবারেই নতুন করে অনুভব করি। আমার অনেক সময় ইচ্ছা করে তোকে যে-সমস্ত চিঠি লিখেছি সেইগুলো নিয়ে পড়তে পড়তে আমার অনেক দিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে আমার চিঠির সরু রাস্তা বেয়ে আমার পুরাতন পরিচিত দৃশ্যগুলির মাঝখান দিয়ে চলে যাই। কত দিন কত মুহূর্তকে আমি ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি, সেগুলো বোধ হয় তোর চিঠির বাক্সর মধ্যে ধরা আছে—আমার চোখে পড়লেই আবার সেই-সমস্ত দিন আমাকে ঘিরে দাঁড়াবে। ওর মধ্যে যা-কিছু আমার ব্যক্তিগত জীবন-সংক্রান্ত সেটা তেমন বহুমূল্য নয়—কিন্তু যেটাকে আমি বাইরের থেকে সঞ্চয় করে এনেছি, যেটা এক-একটা দুর্লভ সৌন্দর্য, দুর্মূল্য সম্ভোগের সামগ্রী, যেগুলো আমার জীবনের অসামান্য উপার্জন—যা হয়তো আমি ছাড়া আর কেউ দেখে নি, যা কেবল আমার সেই চিঠির পাতার মধ্যে রয়েছে, জগতের আর কোথাও নেই—তার মর্যাদা আমি যেমন বুঝব এমন বোধ হয় আর কেউ বুঝবে না। আমাকে একবার তোর চিঠিগুলো দিস [বব], আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্য-সম্ভোগগুলো একটা খাতায় টুকে নেব। কেননা, যদি দীর্ঘকাল বাঁচি তা হলে এক সময় নিশ্চয় বুড়ো হয়ে যাব; তখন এই-সমস্ত দিনগুলো স্মরণের এবং সান্ত্বনার সামগ্রী হয়ে থাকবে। তখন পূর্বজীবনের সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছে করবে। তখন আজকেকার এই পদ্মার চর এবং স্নিগ্ধ শান্ত বসন্তজ্যোৎস্না ঠিক এমনি টাটকা-ভাবে ফিরে পাব। আমার গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখদুঃখের দিনরাত্রিগুলি এরকম করে গাঁথা নেই।

সাতারা
১৬ মার্চ ১৮৯৫

২০১

কলকাতা
১৫ মার্চ্। ১৮৯৫।

আজ সকালবেলাটা যে কী করে কাটিয়েছি তা বলতে পারি নে। কোনো কাজই করি নি, বোধ হয় বিশেষ কিছু ভাবিও নি। বেশ দক্ষিণের বাতাস দিচ্ছিল এবং গরমে শরীরের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হয়ে এসেছিল, চুপচাপ করে একলাটি পড়ে ছিলুম, গড়াচ্ছিলুম, খবরের কাগজের পাত ওল্টাচ্ছিলুম— মনে জানি যে, চিঠি-পত্র লেখা আছে, প্রুফ্শিট্-সংশোধন আছে, সাধনার লেখা আছে, কাছারির কাজ আছে, বাবামশায়ের কাছে হিসেব শোনাতে যাবার কথা আছে, কিন্তু তবু আলস্যের জন্যে মনে অনুতাপ-মাত্র নেই— বোধ হয় অনুতাপ করবার মতো উদ্যম শরীরমনে ছিল না। কিন্তু এই বসন্ত-প্রভাতের বাতাসে আমাকে বড়ো মাটি করে দেয়। কেবল এই উদার উত্তপ্ত বাতাসটিকে সর্বশরীরে লাগানোই একটা যথেষ্ট কর্তব্য কাজ বলে মনে হয়— মনে হয়, এই মিষ্টি বাতাসের প্রবাহটি যেন আমার প্রতি বাইরের প্রকৃতির একটা প্রত্যক্ষ আলাপচারি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম, বসন্তের বাতাসটি গায়ে লেগেছিল, কনকচাঁপার গন্ধে মস্তিষ্ক ভরে গিয়েছিল, মাঝে মাঝে এক-একটা সকালবেলা এক-একটা দৈববাণীর মতো আমার কাছে এসে উপনীত হয়েছিল— একজন স্বল্পজীবী মানুষের পক্ষে এই বা কম কথা কী! কেবল কবিতা লেখা এবং সাধনার এডিটারি করা নয়, এই-সমস্ত আত্মবিস্মৃত অচেতন ক্ষণগুলিও জীবনের সার্থকতার একটা প্রধান অঙ্গ। সেই জন্যে মাঝে মাঝে এরকম ভরপুর অকর্মণ্যতায় মনে কিছুমাত্র পরিতাপ জন্মায় না। এতক্ষণ একটা ভালো গান শুনলেও তো পরিতাপ হত না। আমার পক্ষে এক-একদিন বাইরের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে গানের কাজ করে। এই হাওয়া এবং আলো এবং ছোটোখাটো নানা প্রকার শব্দ আমাকে সর্বপ্রকারে নিশ্চেষ্ট করে ফেলে। তখন বেশ বুঝতে পারি কেবলমাত্র 'হওয়া'তেই একটা আনন্দ আছে— 'আছি' এই কাণ্ডটাই একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার, সমস্ত প্রকৃতির এইটেই আদিম এবং সর্বব্যাপী আনন্দ। এই রকম সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট মনের অবস্থায় বাইরের সঙ্গে নিজের যোগটা সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতম হয়।

সাতারা
১৯ মার্চ্ ১৮৯৫

২০২

কলকাতা
১৬ মার্চ্। ১৮৯৫।

ভালো-মন্দর তর্ক কোনোকালে শেষ হবার না [বব]। মনের গঠন, কিম্বা কাজের ফলাফল, কোন্টা থেকে মানুষের ভালোমন্দ বিচার করতে হবে? শুদ্ধমাত্র কাজের ফল থেকে আমরা যদি বিচার করতুম তা হলে যে মানুষ দৈবাৎ একজনকে আঘাত করেছে আর যে ইচ্ছাপূর্বক করেছে, উভয়কে আমরা সমান দোষী করতুম— যে

লোক রাগের মাথায় একটা কঠোর কাজ করেছে আর যে লোক শান্তচিত্তে করেছে, উভয়কে আমরা একই দণ্ড দিতুম। অবশ্য, কোন্‌ কাজটা ভালো অথবা মন্দ সে একটা কথা, আর কোন্‌ মানুষটা ভালো অথবা মন্দ সে আর-এক কথা। আমরা অন্তর্যামী নই, আমরা অনেক সময় বাধ্য হয়ে কাজের থেকে মানুষকে বিচার করি সে কথা সত্যি। কিন্তু সেই জন্যেই অনেক সময় আমরা ঠিক বিচার করি নে। কিন্তু শেলির জীবন থেকে তুই যে উদাহরণ দিয়েছিস সেটা স্বতন্ত্রজাতীয়— তাতে এই প্রমাণ হয় যে, একজন মানুষ অনেক বিষয়ে খুব ভালো হলেও হয়তো কোনো কোনো বিষয়ে তার ধর্মবুদ্ধির অসাড়তা থাকে, সে হয়তো বিশেষ স্থলে নিজের সুখে অন্ধ হয়ে পরকে কষ্ট দেয়— সেটা তার পক্ষে কোনো কারণেই প্রশংসার বিষয় নয়। শেলির স্বভাবে যা দোষ ছিল সে দোষকে গুণ বলে প্রমাণ করতে বসবার কোনো ন্যায্য কারণ নেই। এখন কথা এই যে, দোষ ছিল বলে যে তার কোনো গুণ ছিল না তাও নয়। তার চেয়ে অনেক কম গুণবান লোকও তার মতন অমন লোককে কষ্ট দেয় নি। শেলির জীবন থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে, লোকবিশেষে দোষও গুণ হয়। কিন্তু এই প্রমাণ হয় যে, কোনো লোকই সম্পূর্ণ ভালো নয়। প্রত্যেক লোকেরই দোষগুণের ওজন করে যেটা বেশি হয় সেইটার অনুসারেই তাকে ভালো কিম্বা মন্দ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। নিজের নিজের প্রকৃতি-অনুসারে শেলিকে কেউ বা খুব প্রশংসা করে, কেউ বা গাল দেয়— কিন্তু আসল শেলিকে কেবল অন্তর্যামীই জানেন। মানুষদের সঙ্গে যখন মানুষের ক্ষণিক সম্বন্ধ তখন কেবল সেই ক্ষণিক জীবনের ফলাফল থেকেই মানুষেরা মানুষকে বিচার করবে এইটেই স্বাভাবিক, যাঁর সঙ্গে মানুষের অনন্তকালের সম্বন্ধ তাঁর বিচারের পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। খুব সম্ভব, অনেক সাধুর চেয়ে অনেক অসাধু উচ্চতম বিচারালয়ে উচ্চাসন পাবে। সেণ্ট্‌ পল, সেণ্ট্‌ অগস্টিন, যদি অল্প বয়সে মারা যেতেন তা হলে তাঁদের যথার্থ মহত্ত্ব কে জানতে পেত? কিন্তু তাই বলে সেই কথা বলে নিজেকে ভোলাবার কোনো দরকার নেই। দোষ-মাত্রেই দোষ— পৃথিবীতে যখন অল্প দিনের জন্যে এসেছি তখন যথাসাধ্য পরস্পরকে সুখী করে এবং সংসারে স্থায়ী সুখের সৃষ্টি করে যেতে পারলেই ভালো। আমরা কেবল এক সন্ধ্যার জন্যে একটি পান্থশালায় একত্র হয়েছি, এইটুকু সময় যদি সুখে সান্ত্বনায় সাহায্যে সকলকে পরিতৃপ্ত করে যেতে পারি তা হলেই আমি ভালো লোক। নিজের সুখের জন্যে যাকে আমি অন্যায় কষ্ট দেব সেই আমাকে মন্দ লোক বলবে, এবং কোনো কূটতর্কের দ্বারা সেটা অপ্রমাণ করতে বসা সংগত বোধ করি না।

সাতারা
২০ মার্চ্‌ ১৮৯৫

২০৩

কলকাতা
সোমবার, ১৮ মার্চ্‌। ১৮৯৫।

মাঘ মাসের সাধনার সেই গল্পটা সাধারণত অধিকাংশ পাঠকের বিশেষ ভালো লেগে গিয়েছিল— সেই কারণে সাহিত্যের সমালোচনা পড়ে অনেকে চটে গেছে। অন্যের

ভালো-লাগা মন্দ-লাগা সম্বন্ধে কিছু বোঝবার জো নেই— বুঝলেও সে অনুসারে নিজের ক্ষমতাকে গড়ে তোলা যায় না। সেই জন্যে বাইরের লোকের সমালোচনা আমার কাছে সম্পূর্ণ নিষ্ফল এবং অনেক সময়েই হানিজনক মনে হয়। নিজের ভিতরে যে-একটা আদর্শ আছে সেইটেই মানুষের ধ্রুব আশ্রয়। পড়ে শুনে ভেবে, সাহিত্যচর্চা করে, সেই আদর্শটিকে যথাসাধ্য উন্নত করে তোলা আবশ্যক। আমাদের দেশে যে ভাবে সমালোচনা হয় তাতে কোনো শিক্ষা নেই। 'ভালো লাগিল' বা 'ভালো লাগিল না' সে কথা শুনে কোনো ফল নেই। তাতে কেবল লোকবিশেষের একটা মত পাওয়া গেল, কিন্তু মতবিশেষের সত্যতা পাওয়া গেল না। সে মতও যদি যথার্থ রসজ্ঞ বা সাহিত্যব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তা হলেও খানিকটা ভাবিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যে-কোনো লোকের মত মাত্রের কোনো মূল্য নেই। আমাদের দেশে ভালো সমালোচনা নেই— তার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের লোকের সাহিত্যের সঙ্গে যথার্থ ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। তারা সাহিত্যের সৃজনকার্যের মাঝখানে বাস করছে না। তারা যথার্থ অভিজ্ঞতাদ্বারা জানে না কোন্‌টা সহজ কোন্‌টা কঠিন, কোন্‌টা খাঁটি কোন্‌টা মেকি, কোন্‌টা অনিত্য কোন্‌টা নিত্য, কোন্‌টা সেণ্টিমেণ্ট্‌ এবং কোন্‌টা সেণ্টি-মেণ্টালিজ্‌ম্‌। আমাদের সাহিত্যে অনেকগুলো এবং অনেক রকমের ভালো লেখা না বেরোলে সমালোচনার সময় উপস্থিত হবে না। প্রথমে একটা আদর্শ দাঁড় করানো চাই, তার পরে সেই আদর্শ থেকে সমালোচকের শিক্ষা আরম্ভ হবে। যেমন জল না থাকলে সাঁতার শেখা যায় না, তেমনি ভালো সাহিত্য না থাকলে সমালোচনা অসম্ভব। আমি দেখছি, যতই বয়স বাড়ছে অন্য লোকের মতামতের মুখাপেক্ষা ততই কমে যাচ্ছে— প্রশংসা এবং নিন্দা তেমন গভীর ভাবে আঘাত করে না— বোধ হয় দুটোই অনেকটা পরিমাণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নিজের বিচারের উপর নিজের বিশ্বাসও ক্রমে বোধ হয় দৃঢ় বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে।

সাতারা
২২ মার্চ্‌ ১৮৯৫

২০৪

কলকাতা
২০ মার্চ। ১৮৯৫।

শেলিকে অন্যান্য অনেক বড়োলোকের চেয়ে বিশেষরূপে কেন ভালো লাগে জানিস? ওর চরিত্রে কোনোরকম দ্বিধা ছিল না, ও কখনো আপনাকে কিম্বা আর কাউকে বিশ্লেষণ করে দেখে নি— ওর একরকম অখণ্ড প্রকৃতি। শিশুদের, এবং অনেক স্থলে মেয়েদের, এই জন্যে বিশেষরূপে ভালো লাগে— তারা সহজ স্বাভাবিক, তারা নিজের মনের বিতর্ক কিম্বা থিয়োরি-দ্বারা নিজেকে ভেঙেচুরে গড়ে নি। শেলির স্বভাবের যে সৌন্দর্য তার মধ্যে তর্ক বিতর্ক আলোচনার লেশ নেই। সে যা হয়েছে, সে কেবল নিজের ভিতরকার এক অনিবার্য সৃজনশক্তির প্রভাবেই হয়েছে। সে নিজের জন্যে নিজে কিছুমাত্র দায়ী নয়— সে জানেও না সে

কাকে কখন্ আঘাত দিচ্ছে, কাকে কখন্ সুখী করছে—তাকেও কোনো বিষয়ে নিশ্চয়রূপে কারও জানবার জো নেই। কেবল এইটুকু স্থির যে, ও যা ও তাই, তা ছাড়া ওর আর-কিছু হবার জো ছিল না। ও বাইরের প্রকৃতির মতো স্বভাবতই উদার এবং সুন্দর এবং স্বভাবতই নিজের এবং পরের সম্বন্ধে চিন্তা ও দ্বিধা-মাত্র-হীন। এই রকম অখণ্ড প্রকৃতির লোকের ভারী একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এদের সকলেই মাপ করে এবং মায়া করে—কোনো দোষ এদের স্বভাবে যেন স্থায়ীভাবে লিপ্ত হতে পারে না। এদের স্বভাব প্রথম যুগের আদম ইভের মতো আবরণহীন এবং সেই জন্যেই এক হিসাবে পরমরহস্যময়। এরা এখনো জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খায় নি বলে একটি নিত্য সত্যযুগে বাস করছে। যারা চিন্তা করে, আলোচনা করে, যারা বিবেচনা করে কাজ করে, যারা জানে ভালোমন্দ কাকে বলে, তাদের সহজে ভালোবাসা ভারী শক্ত। তারা শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস পেতে পারে, কিন্তু তারা অনায়াস ভালোবাসা পায় না। তারা আত্মবিসর্জন করতে পারে, কিন্তু তারা আত্মবিসর্জন আকর্ষণ করতে পারে না। আমি তো আমার অনেক প্রবন্ধে লিখেছি মানুষের মন-নামক পদার্থটি শ্রদ্ধার যোগ্য, কিন্তু ভালোবাসার পাত্র নয়—আসল খাঁটি বড়ো লোকেরা মনোবিহীন, তারা স্বতঃস্ফূর্তিবিশিষ্ট, তারা বিনা চেষ্টায় বিনা যুক্তিতে অনিবার্য বলে লোককে আকর্ষণ করে নেয়।

সাতারা
২৪ মার্চ্ ১৮৯৫

২০৫

কলকাতা
২ এপ্রিল। ১৮৯৫।

আজও সমস্ত দিন সেই বক্তৃতাটা নিয়ে পড়েছিলুম। বাংলায় নিজের মনের ভাবটি ঠিক মনের মতো করে প্রকাশ করা এমনি শক্ত যে, লেখাটা একটা লড়াই-বিশেষ। শক্ত হবার কারণ কেবল ভাষার অক্ষমতা নয়—যারা লেখাটা শুনবে তাদের সাধারণত কোনো বিষয়ে কোনো কথা ভালো করে ভাবা অভ্যাস নেই, সেই জন্যে সব কথাই ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে বিস্তারিত করে লেখা দরকার হয়ে পড়ে। যে কথাটাকে সংহত সংক্ষিপ্ত করে লিখলে তার ওরিজিন্যালিটি, তার উজ্জ্বলতা পরিস্ফুট হত সে কথাটাকে জল মিশিয়ে ব্যাখ্যা করে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর করে তুলতে হয়—তার পরে নিজের মনে ভারী একটা অসন্তোষের উদয় হয়। আমি বারম্বার দেখেছি বাঙালিরা একটা কোনো ভাবের সূত্র মনে মনে সহজে অনুসরণ করতে পারে না, তারা এক-দম ফীলিঙ্গে মেতে উঠতে চায়—একটা বক্তৃতা এবং প্রবন্ধের মধ্যে যে কত শত জিনিস ব্যর্থ হয়ে যায় তার ঠিকানা নেই।

সাতারা
৬ এপ্রিল ১৮৯৫

২০৬

কলকাতা
৪ এপ্রিল। ১৮৯৫।

আমি আজকাল কাজের তাড়ায় দোতলায় নেবে এসেছি। দক্ষিণের বারান্দার কোণে আমি যে একটি অলিন্দবেষ্টিত কাষ্ঠনীড় রচনা করে নিয়েছিলেম, সেইখানে আড্ডা করে নিয়েছি। ঘরে আর কোনো আস্‌বাব নেই, কেবল মাঝখানে তোদের প্রদত্ত সেই চীনে ডেস্ক এবং একটি মাত্র চৌকি। এ আমার পক্ষে একটি নতুন আবিষ্কার বললেই হয়—আমার তেতালার ঘরে কিছুতেই মন বসিয়ে লিখতে পারতুম না, মনে করতুম কলকাতার দোষ, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি এ ঘরে এসে লেখার কোনো ব্যাঘাত হচ্ছে না, বেশ মন দিতে পারছি।...ঘরে কোনো আসবাব না থাকাও একটা মস্ত সহায়। আমি দেখছি plain living, high thinkingএর পক্ষে নিতান্তই দরকার—জড় পদার্থের বন্ধন যতটা পারা যায় ছেদন করে ফেলা আবশ্যক। জড় জিনিসগুলো মনের সঙ্গে কোনো মানসিক সম্বন্ধ স্থাপন করে না, তারা মনের মধ্যে কোনো নিত্যনূতন সংবাদ আনয়ন করে না—আসবাবগুলো চিরকালই একরূপ আকার ধারণ করে থাকে, কেবল উত্তরোত্তর মলিনতা সঞ্চয় করে, ওরা অলক্ষিতভাবে মনের পক্ষে ভার এবং বাধার স্বরূপ কাজ করে। আস্‌বাবের মধ্যে চারি দিকে যতটা সম্ভব আলোক এবং আকাশ সংগ্রহ করে রাখলে মনটা বেশ স্ফূর্তির সঙ্গে অবাধে আপন কাজ করতে থাকে। সামনে গ[গন]দের বাগানটিও আমার পক্ষে বড়ো সুবিধে হয়েছে। গঙ্গার ধারে আমার একটি বাগান থাকে—এবং নদীর ধারেই এক কোণে একটি পাথরে বাঁধানো পরিষ্কার তক্‌তকে নির্মল স্নিগ্ধ ঘর থাকে, ঠেসান দিয়ে বসবার মতো একটি কৌচ এবং লেখবার মতো একটি ডেস্ক থাকে, এবং বাকি সমস্তই কেবল বাগান এবং জল এবং আকাশ—ফুটন্ত ফুলের গন্ধ এবং পাখির ডাক—তা হলে চুপচাপ করে আপন কবির কর্তব্য করে যেতে পারি। এর চেয়ে ঢের কমেও পৃথিবীতে বেশ চলে যায়, এবং ঢের বেশিতেও অনেকে তিলমাত্র সুখ পায় না।

সাতারা
৮ এপ্রিল?
১৮৯৫

২০৭

কলকাতা
৬ এপ্রিল। ১৮৯৫।

আমি যে মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের হাওয়ার দোহাই দিয়ে কর্তব্য-পালনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তাব করে থাকি, তার মধ্যে একটু গভীর অর্থ আছে [বব]। এক শ্রেণীর কাজ আছে আলস্য যার অঙ্গ, বহুল পরিমাণে আলস্যের থেকে রসাকর্ষণ

না করলে সে বাড়তে পারে না। আমার সমস্ত শিক্ষা এবং প্রকৃতি থেকে মনে হয় আমি সেই-জাতীয় কাজের জন্যে জন্মেছিলুম— ঘন ঘন কাজে অনুক্ষণ লিপ্ত থাকলে আমার জীবনের যা স্বাভাবিক এবং যথার্থ কর্তব্য তার ব্যাঘাত হতে পারে। কাজকে কর্তব্যকে গজে মেপে বিচার করা উচিত হয় না— যদি সেই রকম বিচার করতে হত তা হলে মাটি চষার কাজ সকলের চেয়ে ফার্স্ট ক্লাস প্রাইজ পেত। সাধনার জন্যে, সংসারের জন্যে, সমাজের হিতের জন্যে কাজ করতে করতে এক-এক সময় আমার স্বাভাবিক অন্তরপ্রকৃতি নিজের দাবি উত্থাপন করে; সে বলে, 'তোমার কাজকর্ম পরে হবে, আপাতত এই আকাশ এবং বাতাস এবং পৃথিবী থেকে অত্যন্ত অলসভাবে কেবল পরিপূর্ণরূপে রসাকর্ষণ করে নেও।' সেটাকে বাইরে থেকে আলস্য এবং কর্তব্যের অবহেলা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যার মন সে জানে এই আলস্যসম্ভোগ তার প্রকৃতির খাদ্য— এটুকু না হলে তার সমস্ত পত্র পুষ্প ফল বিকশিত হয়ে উঠতে পারবে না। শুষ্ক কাষ্ঠস্বরূপ হয়েও গাছ উনুন জ্বালাবার কাজে লাগে, কিন্তু সজীবভাবে থেকে আপনার ফুল ফলকে জন্ম দেওয়াই তার প্রধান কাজ এবং সে কাজ করতে গেলে তার অনেকটা অবকাশ আকাশ এবং আলোকের আবশ্যক। এখন কথাটা কেবল এই যে, যদি মজুরি করার চেয়ে কোনো শ্রেষ্ঠতর কাজ আমার দ্বারা হওয়া সম্ভব হয় তবে সেই আমার প্রধান কর্তব্য কি না। শ্রেষ্ঠ কাজ মাত্রই খুব বড়ো বনস্পতির ন্যায় অনেকখানি স্থান এবং সময় চায়— তাকেই আমি আলস্য বলি, বৈরাগ্য বলি, ধ্যান বলি।

সাতারা
১০ এপ্রিল?
১৮৯৫

২০৮

কলকাতা
৯ এপ্রিল। ১৮৯৫।

ঢং ঢং শব্দে দশটা বাজল। চৈত্র মাসের দশটা নিতান্ত কম বেলা নয়— রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে, কাকগুলো কেন যে এত ডাকাডাকি করছে জানি নে, লকেট কমলালেবু এবং কাঁচামিঠে আম-ওয়ালা চুপড়ি মাথায় উচ্চস্বরে সুর করে আমাদের দেউড়ির কাছ দিয়ে ডেকে যাচ্ছে, মুখ একটু শুকিয়ে এসেছে— ইচ্ছে করছে খানিকটে বরফ দিয়ে এক-গ্লাস ঠাণ্ডা দইয়ের সরবৎ খাই।...ইচ্ছা করছে কোনো-একটা বিদেশে যেতে। বেশ একটা ছবির মতো দেশ— পাহাড় আছে, ঝর্না আছে, পাথরের গায়ে খুব ঘন শৈবাল হয়েছে, দূরে পাহাড়ের ঢালুর উপরে গোরু চরছে, আকাশের নীল রঙটি খুব স্নিগ্ধ এবং সুগভীর, পাখি পতঙ্গ পল্লব এবং জলধারার একটা বিচিত্র মৃদু শব্দমিশ্র উঠে মস্তিষ্কের উপর ধীরে ধীরে তরঙ্গাভিঘাত করছে। দূর হোক গে ছাই, আজ আর কিছুতে হাত না দিয়ে দ্বি[পু]দের দক্ষিণের ঘরে একলাটি হাত পা ছড়িয়ে একটা কোনো ভ্রমণবৃত্তান্তের বই নিয়ে পড়ব মনে করছি, বেশ অনেকগুলো ছবিওয়ালা নতুন-পাত-কাটা বই। একটা চীনদেশের ভ্রমণ হাতে

আছে, কিন্তু চীনটা অনেক বইয়েতে পড়েছি। একটা মেয়ের লেখা পারস্য আছে, কিন্তু মেয়েরা ভালো ভ্রমণকারী নয় এবং তাতে যথেষ্ট ছবি নেই। তিব্বত পড়া হয়ে গেছে, আফ্রিকা পড়েছি। যদি দক্ষিণ-আমেরিকার খুব-ছবি-ওয়ালা ভালো বই থাকত তো পড়তুম। কিন্তু থ্যাকারের দোকানে মনের মতো বই খুঁজে পাই নি। আলোচনা করবার মতো, মনের উন্নতিসাধন করবার মতো, শিক্ষা করবার মতো বই পৃথিবীতে অসংখ্য আছে। কিন্তু কুঁড়েমি করবার মতো বই ভারী কম। সে রকম বই লিখতে বিশেষ ক্ষমতার আবশ্যক এবং সে ক্ষমতা ভারী বিরল। অবকাশের অবকাশত্ব নষ্ট করবে না, বরং তাকে একটু রঙিন এবং রসালো করে তুলবে অথচ পড়ার খোরাক দেবে, এই দুই দিক বাঁচিয়ে লেখা ভারী শক্ত। স্টীল পেনে লিখে মনের উপরে দাগ করে দেবে না, পালকের কলমে লিখে লেখাটা মনের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে— মনের চার দিকে একটা সুবিস্তীর্ণ দেশ কাল বর্ণ এবং রসের সৃষ্টি করে দেবে। ভালো ভ্রমণবৃত্তান্ত জিনিসটা সব চেয়ে ভারহীন এবং অবকাশের সময় পড়বার সব চেয়ে উপযোগী। কিন্তু কলকাতায় ও-সব বই হাতে করতে ইচ্ছে করে না— কারণ, কলকাতায় সে রকম সুন্দর অবিচ্ছিন্ন অবসর নেই। ও-সব বই আমি মফস্বলের জন্যে জমিয়ে রেখে দিই। সম্পূর্ণ নিরিবিলি মধ্যাহ্নে কিম্বা সন্ধ্যায় ঐ রকম মোটা বই হাতে নিয়ে বসা ভারী আরামের— এমন নবাবিয়ানা পৃথিবীতে অতি অল্প আছে। স[ত্য] বলত আমার স্বভাবের মধ্যে নবাবি আছে— তা, আছে বটে।

সাতারা
১৩ এপ্রিল?
১৮৯৫

২০৯

কলকাতা
১৪ এপ্রিল। ১৮৯৫।

কাল সমস্ত দিন খুব ঘুরে বেড়াতে হয়েছে।... অন্য কোনো দিন হলে আধমরা হয়ে পড়তুম কিন্তু কাল খুব ঠাণ্ডা ছিল— আকাশ ঘন-মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, বেশ লাগছিল। যদিও নিমন্ত্রণ সেরে এবং সভাপতিত্ব করে বেড়ানোর মধ্যে কিছুমাত্র কবিত্ব নেই, তবু কাল একটা জায়গা থেকে আর-একটা জায়গায় যাবার মধ্যবর্তী সময়টুকুতে মনের মধ্যে ভারী একটা অপরূপ কবিত্ব-বেদনার সঞ্চার হচ্ছিল— ঠিক যেন একটা গান শুনছিলুম এবং মনের মধ্যে যে-একটা অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হচ্ছিল তার কোনো অর্থ বুঝতে পারছিলুম না। যতদিন যত কবিতা পড়েছি এবং গান শুনেছি এবং আপন মনে কল্পনা করেছি, তার সমস্ত রস মনের কোন্-এক জায়গায় সঞ্চিত আছে। মাঝে মাঝে এক-একদিন কেন তার মদিরতাপূর্ণ সমস্ত লোভনীয় সৌরভ বেরিয়ে পড়ে কিছুই বুঝতে পারি নে এবং এ রস নিয়ে কী করব, কোথায় কার কী কাজে লাগবে কিছুই জানি নে— এর কোনো আধ্যাত্মিক তাৎপর্য, কোনো আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি আছে কি না তাও

বুঝি নে। কিন্তু এর এক অসীমতা গভীরতা এবং রহস্যপূর্ণ পরম ব্যাকুলতায় মনকে উতলা করে দেয় এবং এ জিনিসটাকে কিছুতেই অসত্য এবং অস্থায়ী বলে মনে হয় না—এর মধ্যে যে-একটা আকাঙ্ক্ষার অধীরতা আছে সেও ভালো। কলকাতা শহরের জড় আরাম এবং সন্তোষ এর তুলনায় খুব নিকৃষ্ট মনে হয়। কাল রাত্রে জ্যো [তিদাদা] দের ওখানে অ [ভি] একটা এস্‌রাজ হাতে করে বসল—বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এবং বাতাসে গাছের পাতার শব্দ হচ্ছে। আমি প্রথমে 'ভরা বাদর' গাইলুম। তার পরে গাইলুম 'আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে'—গলাটাও বেশ ছিল, মনটাও বেশ পরিপূর্ণ ছিল, নববর্ষাটিও বেশ অনুকূল ছিল, বেশ জমে উঠেছিল—ভাবছিলুম এই-যে সুরের এবং ভাবের একটা অপূর্ব রাজ্য এ কি কেবলই আমার মনের? এর অনুরূপ আর কোথাও কিছুই নেই? এ কি কেবলই মরীচিকা?

সাতারা
১৮ এপ্রিল?
১৮৯৫

২১০

কলকাতা
২৪ এপ্রিল। ১৮৯৫।

আজ সকাল বেলা থেকে সুগভীর আলস্যে আমাকে আক্রমণ করেছে।...আমাদের জোড়াসাঁকোর দোতলার নির্জন ঘর এবং বারান্দায় অকর্মণ্যভাবে কেবলই ঘুর ঘুর করে বেড়িয়েছি। শরীরের সমস্ত সন্ধিগুলো যেন শিথিল হয়ে পড়েছিল, কোনো লেখা অথবা পড়ায় হাত দেবার কিছুমাত্র শক্তি ছিল না। এ দিকে দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এসে গুর্ গুর্ করে মেঘ ডাকতে লাগল এবং মাঝে মাঝে প্রবল বাতাসে দক্ষিণের বাগানের ছোটো বড়ো সমস্ত গাছগুলো হুস্ হাস্ করে নিশ্বাস ফেলতে লাগল। মধ্যাহ্নটি স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন হয়ে চারি দিকে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। মনের ভিতরটা একটা অকারণ চঞ্চলতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল—তার হাতে যে কাজই দেওয়া যায় সে সমস্তই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল।...মনের গতিক আকাশের গতিকের মতো—কিচ্ছুই বলা যায় না। মাসের মধ্যে ঊনত্রিশ দিন সে ছোটোখাটো উপস্থিত কাজ নিয়ে বেশ চালিয়ে দেয়, কোনো গোল করে না—হঠাৎ ত্রিশ দিনের দিন সে-সমস্ত কাজে সে পদাঘাত করতে থাকে। বলে, 'আমাকে এমন একটা-কিছু দাও যা খুব মস্ত—যাতে আমার সমস্ত দিনরাত্রি, সমস্ত ছোটো বড়ো, সমস্ত ভূত ভবিষ্যৎ একেবারে গ্রাস করে ফেলতে পারে।' তখন হাতের কাছে কোথায় বা কী পাওয়া যায়—কেবল ঘরে ঘরে বারান্দায় বারান্দায় ঘুর ঘুর করে বেড়ানো যায়। কতকগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন খণ্ড-বিখণ্ড সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে মনটা যখন লাফ দিয়ে দিয়ে বেড়ায় তখনি তার সুস্থ অবস্থা বলি, আর যখন সে একটা প্রবল আবেগ একটা বৃহৎ কর্মের মধ্যে একটা আত্মবিস্মৃত ঐক্য লাভ করবার জন্যে অধীর হয়ে ওঠে তখন তাকে অসুস্থ মনে করি! কিন্তু আমি মনে

করি মানুষের যথার্থ স্বাভাবিক অবস্থাই হচ্ছে সেই একটি প্রবল নিষ্ঠার মধ্যে আপনার সমস্ত জীবনকে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ করবার ইচ্ছা— সকলের সেই ঐক্যলাভের ক্ষমতা নেই, সেই জন্যে সমাজের বিচ্ছিন্ন যন্ত্রবৎ কাজগুলো তাদের পক্ষে উপযোগী —কিন্তু মনের সুগভীর আকাঙ্ক্ষা সেই সুবিশাল ঐক্যের দিকে। সেই জন্যেই প্রতিদিন সমাজের মধ্যে থেকে, এক-একদিন মনে হয়—

আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!

পুনা
৩০ এপ্রিল ১৮৯৫

২১১

কলকাতা
২ মে। ১৮৯৫।

আজ কোথা থেকে একটা নহবত শোনা যাচ্ছে। সকাল বেলাকার নহবতে মনটা বড়োই ব্যাকুল করে তোলে। আমি এ পর্যন্ত কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারলুম না, সংগীত শুনলে মনের ভিতরে যে অনির্বচনীয় ভাবের উদ্রেক করে তার ঠিক তাৎপর্যটা কী। অথচ প্রত্যেক বারেই মন আপনার এই ভাবটাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করে। আমি দেখেছি গানের সুর ভালো করে বেজে উঠলেই নেশাটি ঠিক ব্রহ্মরন্ধ্রের কাছে ধরে ওঠবা মাত্রই, এই জন্মমৃত্যুর সংসার, এই আনাগোনার দেশ, এই কাজকর্মের আলো-আঁধারের পৃথিবীটি বহুদূরে— যেন একটি প্রকাণ্ড পদ্মানদীর পরপারে গিয়ে দাঁড়ায়— সেখান থেকে সমস্তই যেন ছবির মতো বোধ হতে থাকে। আমাদের কাছে আমাদের প্রতিদিনের সংসারটা ঠিক সামঞ্জস্যময় নয়— তার কোনো তুচ্ছ অংশ হয়তো অপরিমিত বড়ো, ক্ষুধাতৃষ্ণা ঝগড়াঝাঁটি আরামব্যারাম টুকিটাকি খুঁটিনাটি খিটিমিটি এইগুলিই প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তকে কণ্টকিত করে তুলছে, কিন্তু সংগীত তার নিজের ভিতরকার সুন্দর সামঞ্জস্যের দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে যেন কী-এক মোহমন্ত্রে সমস্ত সংসারটিকে এমন একটি পার্‌স্‌পেক্‌টিভের মধ্যে দাঁড় করায় যেখানে ওর ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী অসামঞ্জস্যগুলো আর চোখে পড়ে না— একটা সমগ্র একটা বৃহৎ একটা নিত্য সামঞ্জস্য-দ্বারা সমস্ত পৃথিবী ছবির মতো হয়ে আসে এবং মানুষের জন্মমৃত্যু হাসিকান্না ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের পর্যায় একটি কবিতার সকরুণ ছন্দের মতো কানে বাজে। সেই সঙ্গে আমাদেরও নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রবলতা তীব্রতার হ্রাস হয়ে আমরা অনেকটা লঘু হয়ে যাই এবং একটি সংগীতময়ী বিস্তীর্ণতার মধ্যে অতি সহজে আত্মবিসর্জন করে দিই। ক্ষুদ্র এবং কৃত্রিম সমাজবন্ধনগুলি সমাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, অথচ সংগীত এবং উচ্চ অঙ্গের আর্ট্‌ মাত্রেই সেইগুলির অকিঞ্চিৎকরতা মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করিয়ে দেয়— সেই জন্যে আর্ট্‌ মাত্রেরই ভিতর খানিকটা সমাজনাশকতা আছে— সেই জন্যে ভালো গান কিম্বা কবিতা শুনলে আমাদের মধ্যে একটা চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে, সমাজের লৌকিকতার বন্ধন ছেদন

করে নিত্যসৌন্দর্যের স্বাধীনতার জন্যে মনের ভিতরে একটা নিষ্ফল সংগ্রামের সৃষ্টি হতে থাকে— সৌন্দর্য মাত্রেই আমাদের মনে অনিত্যের সঙ্গে নিত্যের একটা বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে অকারণ বেদনার সৃষ্টি করে।

পুনা
৬ মে ১৮৯৫

২১২

পতিসর-পথে
১ জুন। ১৮৯৫।

অনেক দিনের পরে আমার নির্জন বোটটির মধ্যে এসে আমার ভারী আরাম বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরে এসেছি এবং কে একজন থেকে থেকে বলছে— 'তুমি এসেছ, তোমাকে দেখে আমি বড়ো খুশি হয়েছি।' নির্জনতা যেন আমার গায়ে মাথায় সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আজ দিনের বেলাটা তেমন গরম ছিল না— রোদ্দুর উঠেছিল, কিন্তু ঠান্ডা বাতাসটি বেশ মধুর লাগছিল। নদীটি ছোটো— দুই তীর ঘাসে সবুজ হয়ে গড়িয়ে এসেছে, গোরু চরছে, মেয়েরা জল তুলছে, গা ধুচ্ছে, উলঙ্গ ছেলেগুলো বোট দেখে চীৎকারস্বরে দূরস্থ সঙ্গীদের ডাকাডাকি করছে। ছোটোবড়ো নানাবিধ গ্রাম, তার নানা রকমের নাম— দেখতে দেখতে যাই আর ভাবি যে, আমার কাছে এই গ্রামগুলি এক মুহূর্তের ছবিমাত্র কিন্তু কত লোকের কাছে এইই সমস্ত পৃথিবী। যারা ঐ জলে নেমে স্নান করছে এবং ডাঙায় বসে বাখারি ছুলছে তারা যথাসময়ে ঐ ঘন গাছগুলোর আড়ালে কোন্-একটা জায়গায় তাদের বাড়িতে যাবে। সেইখানেই তাদের নিত্যকর্ম এবং চিরজীবনের রঙ্গভূমি। সেখানকার অখ্যাতনামা অকৃতকীর্তি লোকরা তাদের সর্বাপেক্ষা পরিচিত এবং প্রভাবসম্পন্ন প্রতিবেশী। এই চিন্তাগুলি খুব যে অপূর্ব এবং অসামান্য তা বলতে পারি নে, কিন্তু তবু এরকম করে ভেবে দেখতে গেলে একটু নতুন রকমের ঠেকে— আমরা সকলে নিজেদের পক্ষে কত বৃহৎ অথচ সাধারণের পক্ষে কত ছোটো সেইটে ভালো করে মনে উদয় হয়। এখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে— দুই ধারের গ্রাম আপন-আপন ঘরে প্রদীপ জেবলে নিভৃত নিষ্কর্মা হয়ে বসেছে, গল্প করছে, তামাক খাচ্ছে, ঘুমচ্ছে— কেবল আমার একটিমাত্র বোট মাঝখানে দাঁড় ফেলে ঝুপ্‌ঝুপ্ শব্দ করে চলেছে, দু ধারের লোকালয়ের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই।

খড়কি
৬ জুন ১৮৯৫

২১৩

পতিসর
৩ জুন। ১৮৯৫।

এমন সময় 'গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া'—যেমন ঝড় তেমনি বৃষ্টি। বাতাস কখনো পূব দিক থেকে কখনো পশ্চিম দিক থেকে আসছে—বৃষ্টি যেন একেবারে ছিটেগুলির মতো বিষম জোরে ছট্‌ছট্‌ শব্দে বোটের একটা পাশে আঘাত করছে... বাতাস ক্ষিপ্ত জন্তুর মতো সমস্ত আকাশ জুড়ে রাগে গোঙ্‌রাচ্ছে। ... বিদ্যুৎ এবং বজ্রেরও বিরাম নেই। আমার জানলা সার্শি সমস্ত বন্ধ—কেবল যে দিকে বাতাস নেই সেই দিককার একটি খড়খড়ি খুলে মেঘাবৃত ক্ষীণ আলোকে লিখছি। বর্ষাটা এমনি জমে এসেছে যে, ইচ্ছে করছে গদ্যে না লিখে পদ্যে চিঠি লিখে যাই—কিন্তু পদ্যে লিখতে বসলে বোধ হয় লেখা শেষ হবার পূর্বেই ঝড় শেষ হয়ে যাবে। ঝড়কে তো আর অক্ষর মিলিয়ে চলতে হয় না। এই সময়ে বেশ ফেঁদে বসে একটা গল্প লিখতেও বেশ। তাই লিখতুম, কিন্তু পাশে শৈ... বসে আছে—কেউ কাছে বসে থাকলে লেখা হয় না। কিন্তু মনের ভিতর ভারী একটা উল্লাস হচ্ছে—এই ঝড়ের আঘাতে, মেঘের ছায়ায়, বৃষ্টির ঝর্ঝর শব্দে, বজ্রের গর্জনে আমার বুকের ভিতর একটা তুফান উঠছে—একটা-কিছু করতে ইচ্ছে করছে, নিদেন খুব সুখের ভাবনা খুব অসম্ভব কল্পনা ভাবতে ইচ্ছে করছে, নিদেন খুব গলা ছেড়ে দিয়ে একটা কানাড়া কিম্বা মল্লার গেয়ে দিলেও সময়টা বেশ কাটে—কত মেঘলার দিন, কত তেতালার ছাতের উপরকার আকাশ, কত পূর্বস্মৃতি মনের ভিতর দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন মেঘের মতো হু হু করে উড়ে যাচ্ছে!

সাতারা
৮ জুন ১৮৯৫

২১৪

পতিসর
৬ জুন। ১৮৯৫।

তার পরে সকলকে বিদায় করে দিয়ে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখতে বসেছিলুম—মাস তো প্রায় শেষ হয়ে এল। তাই দৃঢ় সংকল্প করে খুব নিবিড় ভাবে মনঃসংযোগপূর্বক এইমাত্র লেখা শেষ করে ফেললুম। এখন সাতটা বেজে গেছে। কিন্তু এখন গ্রীষ্মের বেলা খুব দীর্ঘ, তাই এখনো সূর্যালোক বেশ স্পষ্ট আছে। যতক্ষণ একটা লেখা চলতে থাকে ততক্ষণ মনটা বেশ শান্তিতে থাকে—সেটা শেষ হয়ে যাবা-মাত্রই আবার একটা নতুন বিষয়ের অন্বেষণে নিতান্ত দিশে-হারার মতো, লক্ষ্মীছাড়ার মতো, চারি দিকে ঘুরে বেড়াতে হয়। ... এত চিন্তা করে চেষ্টা করে কষ্ট সয়ে একজনকে লিখতে হয়, অথচ পাঠকেরা কতই অবহেলার সঙ্গে মূঢ়তার সঙ্গে সেগুলো পড়ে এবং অধিকাংশ স্থলেই পড়ে না। সেজন্যে

আক্ষেপ করা কাপুরুষতা, অনেক সময়েই করি নে। কিন্তু যখন সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর একলা সন্ধ্যাবেলায় শরীর মনকে ক্লান্তি এসে আক্রমণ করে তখন একটা ক্ষণিক ঔদাস্যের হাত কিছুতেই এড়ানো যায় না। রণে ভঙ্গ দিয়ে খ্যাতিহীন নির্জনে আপন মনের মতো কাজ এবং মনের মতো বিশ্রামের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ গোপন করে রাখতে ইচ্ছে করে। মানুষের পক্ষে মানুষের জনতার মতো এমন শ্রান্তিজনক আর কিছুই নেই। প্রকৃতির উদারতা এবং প্রেমের গভীরতা তার একমাত্র বিশ্রামের স্থান— আর-সমস্তই ক্লান্তি বহন করে আনে।

সাতারা
১১ জুন ১৮৯৫

২১৫

কলকাতা
সোমবার, ১১ আষাঢ়। ১৩০২।

ক'দিন খুব রীতিমত বৃষ্টি বাদল হয়ে আজ মেঘ কেটে রৌদ্র দেখা দিয়েছে। মনে আছে এক সময় এই রকম দিনগুলো আমাকে ভারী অভিভূত করত। ভিতরে ভিতরে এমন একটা কম্পান্বিত রকমের আনন্দ উপস্থিত হত সে আমি ঠিক ব্যক্ত করতে পারব না। আজ সেইটে মনে পড়ে গেল। আজ সকালে বাবামশায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পার্ক্ স্ট্রীটে গিয়েছিলুম। যাবার সময় বরাবর এক অমৃতবাজার পড়তে পড়তে যাচ্ছিলুম, ফেরবার সময় হঠাৎ গড়ের মাঠের দিকে দৃষ্টি পড়ল— এবং পৃথিবীটা অনেকটা সেই আগেকার মতোই আছে, কেবল আমার আজকাল অবসর নেই— মাঠের উপর সকালবেলাকার সুকুমার রোদ্দুরটি বিষাদ শান্তি এবং সৌন্দর্যে স্নিগ্ধ সরস নির্মল নবীন শ্যামলশ্রীকে মণ্ডিত করে রেখেছে। মনের ভিতরটাতে সেই আগেকার মতো খানিক ক্ষণের জন্যে একটি অনির্বচনীয় কোমল সুন্দর রাগিণী কম্পিত হয়ে বেজে উঠতে লাগল। এখন এত রকমের বিষয় আমার চার দিকে ব্যূহ বেঁধে রয়েছে যে, জগৎটাকে সম্মুখে দেখতে পাই নে— একেবারে সচেতন মনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে— বিশ্ববীণার যে যন্ত্রী নদীতে তরঙ্গ জাগিয়ে তোলে, দেখতে দেখতে বসন্তের ফুল ফুটিয়ে দেয় এবং জলে স্থলে শূন্যে গানে গুঞ্জনে কাকলীতে কুহরিত মুখরিত করে তোলে, সেই যন্ত্রীর সজীব সচেতন কম্পিত অঙ্গুলিগুলি আমার মনের তারকে স্বয়ং স্পর্শ করে আঘাত করছে না। ভয় হয় পাছে এইরকম অনেক দিন হতে হতে মনের যে তারগুলো সর্বদাই বেজে বেজে উঠত সেগুলোতে ধুলো পড়ে মরচে পড়ে যায়, মনের ভিতরটা ক্রমে বুড়ো হয়ে অসাড় হয়ে আসে। অবিশ্রাম কাজকর্মে মানুষকে শক্ত এবং প্রবীণ করে দেয়। সেটুকু শক্ত হওয়া দরকার জানি— সংসারক্ষেত্রের উপযোগী হতে গেলে সে পরিমাণে প্রবীণতা অত্যাবশ্যক, কিন্তু তবু সেটা আমার কাছে ভারী অপ্রিয় বোধ হয়। কিন্তু 'সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং যদি বাপ্রিয়ং' ইত্যাদি শ্লোক স্মরণ করে অবশ্যসম্ভাবনার বিরুদ্ধে বৃথা পরিতাপ পরিত্যাগ করে আপনাকে চারি

দিকের সমস্ত অবস্থা এবং উপস্থিত সমস্ত কার্যের জন্যে প্রস্তুত করে নিতে হবে। এখন অনেকটা তাই হয়েছে—কর্তব্যচক্রের ঘানিগাছের [সঙ্গে] মনটাকে শক্ত দড়িতে বেঁধে দেওয়া গেছে—এবং তার চোখেও ঠুলি পড়েছে, কেবল অন্ধ হয়ে প্রতিদিন নিয়মিত ঘুরপাকে যথাসাধ্য তেল বের করে দিয়ে পৃথিবীতে একজন দরকারী জীব হয়ে উঠেছি। সংগীতের চেয়ে তেলে অনেক কাজ দেয়—তাতে আহার চলে, সন্ধ্যার সময় আলোও জ্বলে। অতএব এক্ষণে চিঠি সমাপ্ত করে দিয়ে পুনশ্চ আমার ঘানিগাছে লাগি [বব]—কাছারির চিঠিগুলি সম্মুখে পেশ হয়েছে, সাধনার প্রুফও স্তূপাকার জমেছে।

সাতারা
২৮ জুন ১৮৯৫

২১৬

সাজাদপুর
২৮ জুন। ১৮৯৫।

বসে বসে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখছি, একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। লেখাটা প্রথম আরম্ভ করতে যতটা প্রবল অনিচ্ছা ও বিরক্তি বোধ হচ্ছিল এখন আর সেটা নেই। এখন তারই কল্পনাস্রোতের মাঝখানে গিয়ে পড়েছি—একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক এবং বর্ণ এবং শব্দ আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে-সকল দৃশ্য এবং লোক এবং ঘটনা কল্পনা করছি তারই চারি দিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি, নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারাপ্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে এবং সৌন্দর্যে সজীব করে তুলছে—আমার নিজের মনের কল্পনা আমার নিজের কাছে বেশ রমণীয় হয়ে উঠছে। কিন্তু পাঠকেরা এর অর্ধেক জিনিসও পাবে না। তারা কেবল কাটা শস্য পায়, কিন্তু শস্যক্ষেত্রের আকাশ এবং বাতাস, শিশির এবং শ্যামলতা, সবুজ এবং সোনালি এবং নীল সে-সমস্তই বাদ দিয়ে পায়। আমার গল্পের সঙ্গে সঙ্গে যদি এই মেঘমুক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধ রৌদ্ররঞ্জিত ছোটো নদীটি এবং নদীর তীরটি, এই গাছের ছায়া এবং গ্রামের শান্তিটি, এমনি অখণ্ডভাবে তুলে দিতে পারতুম তা হলে গল্পটি কেমন সুমিষ্ট সজীব হয়ে দেখা দিত! তা হলে সবাই তার মর্মের সত্যটুকু কেমন অতি সহজেই বুঝতে পারত! তা হলে কেউ তাকে সমালোচনা করতে সাহস করত না। অনেকটা রস মনের মধ্যেই থেকে যায়, সবটা কিছুতেই পাঠককে দেওয়া যায় না। যা নিজের আছে তাও পরকে দেবার ক্ষমতা বিধাতা মানুষকে সম্পূর্ণ দেন নি।

সাতারা
৩ জুলাই?
১৮৯৫

২১৭

সাজাদপুর
২ জুলাই। ১৮৯৫।

কাল থেকে সাহাজাদপুরের কুঠিবাড়িতে উঠে এসেছি। যা মনে করেছিলুম তাই। বেশ লাগছে। মাথার উপরে ছাদটা অনেক উঁচুতে এবং দুই পাশে দুই খোলা বারান্দা থাকাতে আকাশের অজস্র আলো আমার মাথার উপরে বর্ষণ হতে থাকে— এবং সেই আলোতে লিখতে পড়তে এবং বসে বসে ভাবতে ভারী মধুর লাগে। আর-একটি বেশ লাগে—কাজ করতে করতে কোনো-এক দিকে মুখ ফিরোলেই দেখতে পাই নীল আকাশের সঙ্গে মিশ্রিত সবুজ পৃথিবীর একটা অংশ একেবারে আমার ঘরের লাগাও হাজির। যেন প্রকৃতি কুতূহলী পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মতো সর্বদাই আমার জানলা-দরজার কাছে উঁকি মারছে। আমার ঘরের এবং মনের— আমার কাজের এবং অবসরের চারি দিক প্রসন্ন প্রফুল্ল, সরস এবং সজীব, নবীন এবং সুন্দর হয়ে আছে। এই বর্ষণমুক্ত আকাশের আলোকে এই গ্রাম এবং জলের রেখা, এ পার এবং ও পার, খোলা মাঠ এবং ভাঙা রাস্তা, একটা স্বর্গীয় কবিতায়— অ্যাপলোদেবের স্বর্ণবীণাধ্বনিতে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। আমি আকাশ এবং আলো এত অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসি! আকাশ আমার সাকী, নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা উপুড় করে ধরেছে, সোনার আলো মদের মতো আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাকে দেবতাদের সমান করে দিচ্ছে। যেখানে আমার এই সাকীর মুখ প্রসন্ন এবং উন্মুক্ত, যেখানে আমার এই সোনার মদ সব চেয়ে সোনালি এবং স্বচ্ছ, সেইখানে আমি কবি, সেইখানে আমি রাজা, সেইখানে আমার বত্রিশ-সিংহাসন। এই আকাশের মধ্যে আমি একটি সুগভীর নিস্তব্ধ অন্তরঙ্গ ভালোবাসা এবং অনন্ত শান্তিরসপূর্ণ সান্ত্বনা অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে সর্বাঙ্গে এবং সর্বমনে অনুভব করি। এই আকাশের ভাণ্ডার, এই আলোক, এই শান্তি কখনো ফুরোবে না— আমার সঙ্গে বরাবর যদি ঐ সুনীল নির্মল জ্যোতির্ময় অসীমতার এই রকম অব্যবহিত প্রত্যক্ষ যোগ থাকে তা হলে আমার জীবন কখনোই সম্পূর্ণ নীরস হবে না।

সাতারা
৭ জুলাই?
১৮৯৫

২১৮

সাহাজাদপুর
৫ জুলাই। ১৮৯৫।

কাল অনেক রাত পর্যন্ত নহবতে কীর্তনের সুর বাজিয়েছিল সে বড়ো চমৎকার লাগছিল, আর ঠিক এই পাড়াগাঁয়ের উপযুক্ত হয়েছিল—যেমন সাদাসিধে তেমনি

সকরুণ। কাল রাত্রে বেশ মৃদুমন্দ বাতাস এবং পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না ছিল, আর নহবতটি খুব ইনিয়ে-বিনিয়ে বাজছিল। কাল জানলা খুলে সেই বাজনা শুনতে শুনতে নিদ্রা দিয়েছি। আজ ভোরের বেলায় সেই বাজনার শব্দে জেগে উঠেছি। সেকালের রাজাদের বৈতালিক ছিল—তারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গান গেয়ে প্রহর জানিয়ে দিত, এই নবাবিটা আমার লোভনীয় মনে হয়। ছেলেবেলায় পেনেটির বাগানে থাকতুম, পাশে দক্ষিণেশ্বর শিবমন্দির থেকে দিনরাত্রির মধ্যে তিন-চার বার করে নহবত বাজত—আমার তখন মনে হত আমি বড়ো হয়ে স্বাধীন হবা মাত্রই একটা এইরকম নহবত রাখব। যে পাষাণদেবতা কাঁসর ঘণ্টার অসহ্য কোলাহল সম্পূর্ণ বধির ভাবে শুনতে পারে, তার পক্ষে চার বেলা নহবতের রাগিণী-আলাপ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তার চেয়ে আমাদের মতো ঠাকুরের জন্যে যদি কোনো পুণ্যবান্ সদাশয় এই রকম নহবতের ব্যবস্থা করে দেন তা হলে সংগীতটা ব্যর্থ হয় না। তা হলে দৈনিক তুচ্ছ জীবনটা এখনকার চেয়ে ঢের বেশি রমণীয় হয়ে ওঠে এবং দিনের কাজকর্মগুলোতে এমন দুঃসহ ক্লান্তি এবং বৈরাগ্য আনয়ন করে না। গান বাজনা শুনলেই তখনি বুঝতে পারি এতদিন আমি সংগীতের জন্যে তৃষিত হয়ে ছিলুম—সেই জন্যে আমার ভারী ইচ্ছে করে আমার খুব একজন কাছের লোক বেশ ভালোরকম বাজনা শিখে নেয়।

সাতারা
১০ জুলাই?
১৮৯৫

২১৯

সাহাজাদপুর
৬ জুলাই। ১৮৯৫।

কাল আমাদের এখানকার পুণ্যাহ শেষ হয়ে গেল। বিস্তর প্রজা এসেছিল। আমি বসে বসে লিখছিলুম, এমন সময় প্রজারা দলে দলে রাজদর্শন করতে এল—ঘর বারান্দা সমস্ত পূর্ণ হয়ে গেল। আমার একটি বুড়ো ভক্ত আছে তার নাম রূপচাঁদ মৃধা—সে একটি ডাকাত-বিশেষ, লম্বা জোয়ান সত্যবাদী অত্যাচারী রাজভক্ত প্রজা। আমাকে যেন সে পরমাত্মীয়ের মতো ভালোবাসে—সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমার চাঁদমুখ দেখতে এসেছি।' চাঁদমুখ এ কথায় বোধ করি কিঞ্চিৎ রক্তিমবর্ণ হবার উপক্রম করলে। রূপচাঁদ বললে, 'কতদিন পরে দেখা—এক বৎসর তোমায় দেখি নি!' মেয়েদের ভালোবাসা অবশ্য খুব মধুর লাগতে পারে, কিন্তু এই রকম সরল সবল পুরুষমানুষের অকৃত্রিম অটল নিষ্ঠা এরও একটি অপূর্ব সৌন্দর্য আছে—এর মধ্যে মানবপ্রকৃতির একেবারে অমিশ্রিত আদিম সহৃদয়তাটুকু প্রকাশ পায়—এর সঙ্গে সঙ্গে যে-একটা বল এবং কাঠিন্য আছে, যে-একটা ঋজুতা এবং directness প্রকাশ পায়, সেইটের জন্যেই এই সরস সুন্দর অনুরক্তি আরও এমন বহুমূল্য বোধ হয়। শিশুর মতো সরল এবং মনের-ভাব-প্রকাশে-অক্ষম সব দাড়ি-ওয়ালা পুরুষমানুষ একে একে এসে

আমার পায়ের ধুলো নিয়ে চুমো খেতে লাগল— কখনো কখনো এরা কেউ কেউ একেবারে পায়ে চুমো খায়। একদিন কালীগ্রামে মাঠে চৌকি নিয়ে বসে আছি, সেখানে হঠাৎ এক মেয়ে এসে আমার দুই পায়ে মাথা রেখে চুমো খেলে— বলা আবশ্যক সে অল্পবয়স্কা নয়। পুরুষ প্রজারাও অনেকে পদচুম্বন করে। আমি যদি আমার প্রজাদের একমাত্র জমিদার হতুম তা হলে আমি এদের বড়ো সুখে রাখতুম— এবং এদের ভালোবাসায় আমিও সুখে থাকতুম।

সাতারা। ১২ জুলাই ১৮৯৫

২২০

পাবনা-পথে
৯ জুলাই। ১৮৯৫।

এই আঁকাবাঁকা ইছামতী নদীর মধ্যে দিয়ে চলেছি। এই নদীর ভিতর দিয়ে যাবার পথে এবং আসবার পথে তোকে অনেকবার অনেক চিঠি লিখেছি। এই ছোটো খামখেয়ালি নদী, দুই ধারে সবুজ ঢালু ঘাট, দীর্ঘ ঘন কাশবন, পাটের ক্ষেত আর আখের ক্ষেত, আর সারি সারি গ্রাম— এ যেন একই কবিতার লাইন আমি বারম্বার আবৃত্তি করে যাচ্ছি এবং প্রতিবারেই নতুন বোধ হচ্ছে। পদ্মা প্রভৃতি বড়ো বড়ো নদীগুলি এত বড়ো যে, সে যেন ঠিক কণ্ঠস্থ করে নেওয়া যায় না। আর, এই বর্ষাকালের ছোটো বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ করে আমার হয়ে যাচ্ছে— এ নদীতে স্টীমার নেই, নৌকোর ভিড় নেই, আমারই বোট এই পাড়াগেঁয়ে নদীটির উপরে যেন রাজত্ব বিস্তার করে চলে যায়। কাল থেকে আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে। সমস্ত স্নিগ্ধ এবং শ্যামল, দুই তীর শান্তিপূর্ণ। পদ্মানদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ, কিন্তু ইছামতী মানুষ-ঘেঁষা নদী— তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের দৈনিক কর্মপ্রবাহগুলি বেশ সুন্দরভাবে এসে মিশছে। সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের স্নান করবার নদী— স্নানের সময় মেয়েরা যে-সমস্ত গল্পগুজব নিয়ে আসে সেগুলি এই নদীর হাস্যময় কলস্বরের সঙ্গে বেশ মিশে যায়। আশ্বিন মাসে মেনকার ঘরের মেয়ে পার্বতী যেমন কৈলাসশিখর ছেড়ে একবার তার বাপের বাড়ি দেখেশুনে যায়, ইছামতী তেমনি সম্বৎসর অদর্শন থেকে বর্ষার কয়েক মাস আনন্দহাস্য করতে করতে তার আত্মীয় লোকালয়গুলির তত্ত্ব নিতে আসে— তার পরে ঘাটে ঘাটে মেয়েদের কাছে প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত নতুন খবরগুলি শুনে নিয়ে তাদের সঙ্গে মাথামাখি সখিত্ব করে আবার চলে যায়।

সাতারা
১৪ জুলাই ১৮৯৫

২২১

শিলাইদহ
১০ জুলাই। ১৮৯৫।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে—আকাশ মেঘে অন্ধকার। গুরুগুরু মেঘ ডাকছে এবং ঝোড়ো বাতাসে তীরের বনঝাউগুলো আন্দোলিত হচ্ছে। বনের মধ্যে শেয়াল ডাকছে, নদীতে নৌকো নেই—মেয়েরা ঘাট পরিত্যাগ করেছে, ডাঙায় জনমানব নেই—গুটি দুই-তিন গোরু বাবলা-বনের ভিতর দিয়ে গৃহমুখে চলেছে। ডাঙায় বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঘন কালীর মতো অন্ধকার এবং জলের উপর গোধূলির একটা বিবর্ণ ধূসর আলো পড়ে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার মতো দেখতে হয়েছে। আমি সেই ক্ষীণালোকে কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে চিঠি লিখছি—উচ্ছৃঙ্খল বাতাসে টেবিলের সমস্ত কাগজপত্র উড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলবার উপক্রম করছে। এ দিকে নদীর চাঞ্চল্যে যে-একটু দোলা দিচ্ছে তাতেও লাইন ঠিক রেখে লেখা একটু কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই ছোটো নদীর উপরে ঘনবর্ষার সমারোহ বড়ো ভালো লাগছে—এই সময়ে বসে বসে চিঠি লিখতে ইচ্ছা করছে। এই গোধূলির মেঘলা অন্ধকারে নির্জন ছোটো ঘরের মধ্যে বসে মৃদুমন্দস্বরে গল্প করে যাবার মতো চিঠি। কিন্তু সেটা একটা ইচ্ছা মাত্র—কী করলে সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা যায় তা ঠিক জানি নে। অর্থাৎ, চিঠিকে ঠিক সেই নির্জন ঘরের গল্পে পরিণত করার মতো ক্ষমতা নেই। আমাদের মনের খুব সহজ ইচ্ছাগুলিই বাস্তবিক দুঃসাধ্য। সেগুলি হয় আপনি পূর্ণ হয়, নয় কিছুতে পূর্ণ হয় না। অনেক সময় যুদ্ধ জমানো সহজ, কিন্তু গল্প জমানো সহজ নয়।

সাতারা
১৫ জুলাই ১৮৯৫

২২২

কলকাতা
২০ জুলাই। ১৮৯৫।

এবারে আমার পাঞ্চভৌতিকে নিদেন একটা চিন্তা করবার যোগ্য নূতন ভাব আছে, সেটা আমি দেখলুম কোনো পাঠকেই ঠিক গ্রহণ করতে পারে নি। আমি বলি যে, মৃত্যু যদি না থাকত তা হলে বস্তুজগতের মধ্যেই আমাদের কল্পনার অবসান হত, জগতের মধ্যে অনন্তের suggestion থাকত না। বস্তুজগৎটা হচ্ছে অটল reality —তার মধ্যে আমাদের কল্পনা এবং আমাদের ধর্মবুদ্ধির পরিতৃপ্তি হয় না। তার পরিতৃপ্তিসাধন করতে হলেই একটা ideal জগতের সৃজন করতে হয়, সেই ideal জগৎ স্থাপন করব কোথায়? মৃত্যু যেখানে এই বস্তুজগতের মধ্যে ফাঁক করে দিয়েছে। সেই মৃত্যুর পারেই আমাদের স্বর্গ, আমাদের দেবতাসম্মিলন, আমাদের সম্পূর্ণতা, আমাদের অমরতা। বস্তুজগৎ যদি অটল কঠিন প্রাচীরে আমাদের ঘিরে রেখে দিত,

এবং মৃত্যু যদি তার মধ্যে মধ্যে বাতায়ন খুলে না রেখে দিত তা হলে আমরা যা আছে তারই দ্বারা সম্পূর্ণ বেষ্টিত হয়ে থাকতুম। এ ছাড়া আর যে কিছু হতে পারে তা আমরা কল্পনাও করতে পারতুম না। মৃত্যু আমাদের কাছে অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার খুলে রেখে দিয়েছে। মৃত্যুর পরে কী হতে পারি তার আর সীমা নেই, এবং মৃত্যু পুরাতনকে অপসারিত করে দেয় বলেই অনাগত অসীম নূতন আমাদের ideal আশাকে পোষণ করতে থাকে। ভালো কবিতার প্রধান কবিত্ব হচ্ছে তার suggestiveness। জগৎরচনার মধ্যে সেই suggestiveness মৃত্যুর মধ্যে— সেইখানেই আমরা অনুভব করে থাকি যে, আরও ঢের আছে এবং আরও ঢের হতে পারে। যেমন অন্ধকার রাত্রেই আকাশে অসীম জগতের আভাস দেখা যায়, দিনের আলোকে কেবল এই পৃথিবীই জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে—তেমনি মৃত্যুতে অনন্তের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আমরা অনুভব এবং অনুমান করি; যদি মৃত্যু না থাকত তা হলে আপনার দীনহীন অস্তিত্বের মধ্যেই সংকীর্ণ ভাবে বদ্ধ হয়ে থাকতুম; মানবাত্মার সর্বাপেক্ষা মহৎ কবিত্বের স্থান, পরলোক এবং দেবলোক, যা আমাদের ধর্মবুদ্ধি এবং সৌন্দর্যবোধের প্রধান পরিতৃপ্তির স্থান, তার আমরা আভাস বা উদ্দেশ পেতুম না। তা ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব, মাঝে মাঝে যদি ছেদ না পেত তা হলে বিপর্যয় কুৎসিত হয়ে উঠত। এক দিকে পরিষ্কার definiteness আর-এক দিকে অসীম suggestiveness—এই দুইয়ে মিলে যথার্থ সৌন্দর্য গঠিত হয়— মৃত্যুতেই যেমন আমাদের জীবনকে এক দিকে সীমাবদ্ধ করে তেমনি সেই মৃত্যুতেই আমাদের জীবনকে আর-এক দিকে সীমামুক্ত করে দেয়। ব্যক্তিগত হিসাবে দেখতে গেলে মৃত্যুটা উৎকট এবং তার মধ্যে কোনো সান্ত্বনা নেই। কিন্তু বিশ্বজগতের হিসাবে দেখতে গেলে মৃত্যুটা অতি সুন্দর এবং মানবাত্মার যথার্থ সান্ত্বনাস্থল।

কিন্তু আমি বারম্বার দেখেছি পাঞ্চভৌতিকে আমি যে-সকল চিন্তার অবতারণ করি তার ঠিক মর্মটি প্রায় কেউ গ্রহণ করে না। আসলে বোধ হয় আমি ভালো করে বোঝাতে পারি নে—বোঝানোও বিষম শক্ত।

সাতারা
২৪ জুলাই ১৮৯৫

২২৩

কলকাতা
৩ অগস্ট্। ১৮৯৫।

লোকের খ্যাতির মধ্যে খুব একটা মাদকতা আছে সে কথা স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু সর্ববিধ মাদকতার মতো খ্যাতির মাদকতায়ও ভারী একটা অবসাদ এবং শ্রান্তি আছে। প্রথম উচ্ছ্বাসের পরেই সমস্ত শূন্য এবং মিথ্যা মনে হয়—মনে হয় এই আত্মাবমাননাজনক আত্মাবর্নাতিকর মোহ থেকে সর্বপ্রযত্নে দূরে থাকা উচিত, এই জিনিসটা যাতে অন্তরাত্মার একটা অত্যাবশ্যক নেশার মতো না দাঁড়িয়ে যায় সে জন্যে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। প্রথমত লোকের খ্যাতি পেলেই নিজের

যোগ্যতা সম্বন্ধে একটা অবিশ্বাস জন্মে, তার পরে সেই অনেকখানি মিথ্যা জিনিস ফাঁকি দিয়ে পাচ্ছি বলে ভারী একটা অসন্তোষের উদয় হয়— অথচ আমি যে বাংলার পাঠক-সাধারণের অনাদরের যোগ্য তাও আমার আন্তরিক বিশ্বাস নয় এই এক আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু দিন-দিন যতই আমার খ্যাতি বাড়ছে ততই এক দিকে আমি খুশি হচ্ছি অন্য দিকে সব ছেড়েছুড়ে লোকের ভিড় ঠেলেঠুলে নিজের যথার্থ প্রাইভেট বাসস্থানের নিভৃত কোণে ঢোকবার প্রবল ইচ্ছা বোধ হচ্ছে। সাধনায় প্রতি মাসে লোকচক্ষে নিজের নামটার পুনরাবৃত্তি করতে একেবারে বিরক্ত ধরে গেছে। এটা আমি বেশ বুঝতে পারছি খ্যাতি জিনিসটা ভালো নয়— ওতে অন্তরাত্মার কিছুমাত্র ক্ষুধানিবৃত্তি হয় না, কেবল তৃষ্ণা বেড়ে ওঠে।

সাতারা
৭ অগস্ট্ ১৮৯৫

২২৪

শিলাইদহ
১৪ অগস্ট্। ১৮৯৫।

যত বিচিত্র রকমের কাজ আমি হাতে নিচ্ছি, কাজ জিনিসটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা মোটের উপর ততই বাড়ছে। অবশ্য, সাধারণভাবে জানতুম যে, কর্ম অতি উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ পদার্থ। কিন্তু সে-সমস্ত পুঁথিগত বিদ্যা। এখন বেশ স্পষ্টরূপে বুঝতে পারছি কাজের মধ্যে পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা। কর্মের মধ্যে পুরুষের অনেকগুলি বৃত্তিকে সর্বদাই নিয়োগ করে রাখতে হয়— জিনিস চিনতে হয়, মানুষ চিনতে হয়, বৃহৎ কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচয় রাখতে হয়। এখন আমার কাছে একটা নূতন রাজ্য খুলে গেছে। দেশ দেশান্তরের লক্ষ লক্ষ লোক যে-এক বৃহৎ বাণিজ্যক্ষেত্রের মধ্যে অহর্নিশি প্রাণপণ প্রয়াসে প্রবৃত্ত আমি তারই মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছি— মানুষের পরস্পরের শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্বন্ধ এবং কর্মের সুদূরবিস্তৃত উদারতা আমার প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে। সমস্ত চিনতে এবং শিখতে, খাটতে এবং চিন্তা করতে, বেশ একটি গৌরব অনুভব করা যায়। পুরুষের কাজের একটা এই মাহাত্ম্য যে, কাজের খাতিরে তাকে নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখকে অবজ্ঞা করে সংক্ষেপ করে নিয়ে চলতে হয়। মনে আছে, সাজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা একদিন সকালে দেরি করে আসাতে আমি ভারী রাগ করেছিলুম; সে এসে তার নিত্যনিয়মিত সেলামটি করে ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'কাল রাত্রে আমার আট বছরের মেয়েটি মারা গেছে।' এই বলে সে ঝাড়নটি কাঁধে করে আমার বিছানাপত্র ঝাড়পোঁচ করতে গেল। আমার ভারী কষ্ট হল— কঠিন কর্মক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ শোকেরও অবসর নেই। কিন্তু সে অবসরটা নিয়ে ফল কী? কর্ম যদি মানুষকে বৃথা অনুশোচনার বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্মুখে প্রবাহিত করে নিয়ে যেতে পারে তবে তার চেয়ে ভালো শিক্ষা আর কী আছে! যা হবার নয় সে তো আয়ত্তের অতীত, যা হতে পারে তা সংসারে যথেষ্ট এবং তা এখনি হাতের কাছে প্রস্তুত। যে মেয়ে মরে গেছে তার জন্যে শোক ছাড়া আর কিছুই করতে

পারি নে, কিন্তু যে ছেলে বেঁচে আছে তার জন্যে রীতিমত খাটতে হবে। কল্পনা-নেত্রে এই পৃথিবীব্যাপী পুরুষের কর্মক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি—সংসারের রাজপথের দুই ধারে সকলে কঠিন পরিশ্রমে কাজ করছে—কেউ চাকরি করছে, কেউ ব্যাবসা করছে, কেউ চাষ করছে, কেউ মজুরি করছে—অথচ এই কর্মক্ষেত্রের নিচে দিয়ে প্রত্যহই কত মৃত্যু কত শোক দুঃখ নৈরাশ্য গোপনে অন্তঃশীলা বহে যাচ্ছে, যদি তারা জয়ী হতে পারত তা হলে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কর্মচক্র বন্ধ হয়ে যেত। ব্যক্তিগত শোক দুঃখ নিচে দিয়ে চলে যায় এবং তার উপরে কঠিন পাথরের ব্রিজ বেঁধে লক্ষলোকপূর্ণ কর্মের রেলগাড়ি আপন লৌহপথে হুহুঃ শব্দে চলে যায়—নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া কারও খাতিরে কোথাও থামে না। কর্মের এই নিষ্ঠুরতার মধ্যে একটা কঠোর সান্ত্বনা আছে।

সাতারা
১৯ অগস্ট্‌ ১৮৯৫

২২৫

শিলাইদহ
১৮ অগস্ট্‌। ১৮৯৫।

কুটীরবাসের একটা অভিজ্ঞতা আমার মন্দ লাগল না—যদিও টেবিল চৌকি ক্যাম্প্‌খাট নিয়ে ঠিক রীতিমত কুটীরবাস হয় না। তবু ডাঙার উপরে উঠে বর্ষার সবুজ পৃথিবীটা একবার দেখে আসা গেল, সেটা বেশ লাগল। বসে বসে অনেক ক্ষণ প্রচুর ভিজে ঘাসের মধ্যে গোরু এবং ছাগলের চরাটা এবং তার সঙ্গে রাখাল বালিকাদের পর্যবেক্ষণ করে অনেকটা সময় কাটত। মানুষের যে অবস্থাটা গাছপালা শস্য গোরু বাছুর এবং একতলা মেটে ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন—এবং ধান কাটা, নৌকোয় খেয়া দেওয়া, জল তোলা, কাপড় কাচার সঙ্গে জড়িত—সেইটে নিকট থেকে দেখলে বেশ একটি মাধুর্য অনুভব করা যায়। অনেকে বলে, ওদের মধ্যে যে সুখ আমরা কল্পনা করি সেটা ঠিক সমূলক নয়। কিন্তু সে কথা মিথ্যা। ওরা অনেকটা ছেলেমানুষের মতো, সেই জন্যে ওরা সমগ্র হৃদয় দিয়ে সুখ সন্তোষ উপভোগ করতে পারে। আমাদের সুখ বড়ো জটিল এবং দুর্লভ এবং বহুল পরিমাণে কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। আমাদের মনে সহজে মোহ উৎপন্ন হয় না, আমরা আত্মবিস্মৃত হতে পারি নে, স্বল্পটুকুকে সরল কল্পনার দ্বারা বাড়িয়ে নিতে পারি নে—বরং অনেক-খানিকে অসন্তুষ্ট বিশ্লেষণের দ্বারা কমিয়ে নিই। তাই বলে আবার চাষা হতেও চাই নে—কেবল ওদের সন্তোষ এবং সরলতাটুকু চাই আর সমস্ত বুদ্ধিবিদ্যা নিজের যা পুঁজি আছে তাও ছাড়তে চাই নে।

সাতারা
২৩ অগস্ট্‌ ১৮৯৫

২২৬

শিলাইদহ
২০ অগস্ট্। ১৮৯৫।

মেঘবৃষ্টি কেটে গিয়ে কাল থেকে নির্মল উজ্জ্বল সুন্দর শরৎকালের ভাব দেখা দিয়েছে। এ ক'দিন নদীর জল কমে গিয়ে নদী হঠাৎ খুব প্রশান্ত নিস্তরঙ্গ ভাব ধারণ করেছে, ও পারে চরের কাছে জেলেরা এক-কোমর জলে নেবে মাছ ধরছে, এ পারে নদীর ধারে গোরু চরছে—একটি সুবিস্তীর্ণ সুন্দর সমুজ্জ্বল শান্তি জলে স্থলে শূন্যে আপন উদার মাতৃক্রোড় প্রসারিত করে বসে আছে, অত্যন্ত নিকটে এসে আমার মস্তক চুম্বন করছে। এইরকম সকালবেলায় অতীতকালের সমুদয় সুমধুর দিনগুলিকে আজকের দিনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে অখণ্ডসমগ্রভাবে দেখতে পাওয়া যায়। তোকে পূর্বে একবার বলেছিলুম, [বব], আমার ইচ্ছে করে আমার সমুদয় চিঠিগুলো থেকে সমস্ত তুচ্ছ ব্যক্তিগত কথা বাদ দিয়ে, কেবল মতামত বর্ণনা এবং সৌন্দর্যসম্ভোগ, কেবল চিন্তা এবং কল্পনাগুলিকে বেছে নিয়ে একত্র গেঁথে গেলে আমার অধিকাংশ জীবিতকালের সমস্ত মাধুর্য একেবারে ঘনীভূতভাবে পাওয়া যেতে পারে—আমার পক্ষে সে একটা বৃহৎ বিস্তীর্ণ উপবনের মতো বেড়াবার জায়গা হয়—যদি এক সময়ে মনের সূক্ষ্ম সম্ভোগশক্তি হ্রাস হয়ে আসে, যদি নূতন জগৎ তার দ্বারগুলি একে একে আমার কাছে রুদ্ধ করতে থাকে, তা হলে আমার সেই অমূল্য পুরাতন জগৎটি আমার কাছে পরম আশ্রয়ের মতো থাকে। বিশ্ব-জগতের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার কথা আমার অন্য কোনো লেখায় তেমন যথার্থ সত্যভাবে নেই যেমন আমার চিঠির মধ্যে আছে—সেই অংশগুলি যদি পাই তা হলে আমার জীবন অনেকটা বৃহত্তর হয়ে ওঠে।

সাতারা
২৫ অগস্ট্ ১৮৯৫

২২৭

শিলাইদহ
২৩ অগস্ট্। ১৮৯৫।

এই বর্ষার বিপুল নদীস্রোত তার অবিশ্রাম কলশব্দ নিয়ে আমাকে এমন পরিপূর্ণ সঙ্গদান করে কেন তাই ভাবছিলুম। তার কারণ আমি বেশ বুঝতে পারছি, কিন্তু প্রকাশ করে বলা শক্ত। নদীটা যেন একটা সুবৃহৎ প্রাণপদার্থের মতো—একটা প্রবল উদ্যমরাশি বহুদূর হতে গর্বভরে কলস্বরে অবহেলে চলে আসছে। তাই দেখে আমাদের প্রাণের মধ্যে একটা আত্মীয়তার স্পন্দন অনুভূত হতে থাকে। একটা দুর্ধর্ষ বন্য ঘোড়াকে যদি প্রান্তরের মধ্যে স্বাধীনতার উদ্দাম আনন্দে ছুটতে দেখা যায় তা হলে সেই দেখে আমাদের ভিতরকার প্রাণের উদ্যম আন্দোলিত হয়ে ওঠে। আমি অনেকবার ভেবে দেখেছি, প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গূঢ় গভীর

আনন্দ পাওয়া যায় সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা সুবৃহৎ আত্মীয়তার সাদৃশ্য অনুভব করে—এই নিত্যসঞ্জীবিত সবুজ সরস তৃণলতা-তরুগুল্ম, এই জলধারা, এই বায়ুপ্রবাহ, এই সতত ছায়ালোকের আবর্তন, এই ঋতুচক্র, এই অনন্ত-আকাশ-পূর্ণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রবহমান স্রোত, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণিপর্যায়, এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ীর রক্তচলাচলের যোগ রয়েছে—সমস্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো—এই ছন্দের যেখানে যতি পড়ছে, যেখানে ঝংকার উঠছে, সেইখানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে—প্রকৃতির সমস্ত অণুপরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হত, যদি প্রাণে সৌন্দর্যে এবং নিগূঢ় একটা আনন্দে অনন্তকাল স্পন্দমান হয়ে না থাকত, তা হলে কখনোই এই বাহ্য জগতের সংসর্গে আমাদের এমন একটা আন্তরিক আনন্দ ঘটত না। যাকে আমরা অন্যায়পূর্বক জড় বলে থাকি সেই জগতের সঙ্গে আমাদের চেতনার একটা যোগাযোগের গোপন পথ আছে; নইলে কখনোই নির্জীবের প্রতি জীবনের, জড়ের প্রতি মনের, বাইরের প্রতি অন্তরের এমন একটা অনিবার্য ভালোবাসার বন্ধন থাকতেই পারে না। আমার সঙ্গে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর বাস্তবিক কোনো জাতিভেদ নেই, সেই জন্যেই এই জগতে আমরা একত্রে স্থান পেয়েছি—নইলে আমাদের উভয়ের জন্যে দুই ভিন্ন জগৎ সৃজিত হয়ে উঠত। আমি যখন মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যাব, তখনও আমার অনন্ত প্রাণময় বিশ্বাত্মীয়ের সঙ্গে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হবে না—আমি আমার নিজের ভিতরকার সহজ আনন্দ থেকে এইটে অনুভব করি। আমার আর-কোনো যুক্তি নেই।

সাতারা
২৮ অগস্ট্ ১৮৯৫

২২৮

শিলাইদহ
২৪ অগস্ট্। ১৮৯৫।

এই-যে অনাদি অনন্ত আকাশ-পূর্ণ নিত্য স্পন্দমান ঘূর্ণ্যমান অণুপরমাণুর সঙ্গে আমাদের একটা নিগূঢ় আনন্দময় আত্মীয়তার বন্ধন আছে এ সত্যটা মাঝে মাঝে আমার মন থেকে ম্লান হয়ে অদৃশ্যপ্রায় হয়ে যায়—হয়তো অনেক দিনের অভ্যাস-বশত কথাটা আমার স্মৃতিপটে লেখা থাকে, কিন্তু সেটাকে প্রত্যক্ষ দীপ্যমান-ভাবে অন্তরাত্মার মধ্যে অনুভব করতে পারি নে। তখন ওটাকে কবিকল্পনা বলে ভ্রম হয়। নিজের মধ্যে নিজে অনুভব করার মতো সত্যের এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কী আছে? কিন্তু অনেক সময় মন নানা কাজে নানা চিন্তায় বিক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়, কল্পনার সূক্ষ্ম অনুভবশক্তি রসাভাবে শুষ্ক হয়ে আসে, তখন অন্তঃকরণের সেই প্রশান্তগভীর পরিপূর্ণ প্রসারতা থাকে না যার অপার নিস্তব্ধতার মধ্যে সত্যের সমস্ত দূরাগত ধ্বনিগুলি নিজেরই ভিতরকার কথাগুলির মতো অত্যন্ত স্পষ্টরূপে শোনা যায়। তখন সমস্তই জড়িয়ে মিশিয়ে ঘুলিয়ে যায়, তখন কেবল বাইরের গোলমালগুলোকেই সত্য বলে মনে হয় এবং অন্তরের চিরন্তন কথাগুলিকেই

স্বপ্নদর্শীর কাল্পনিকতা বলে ভ্রম হতে থাকে। তা যদি না হত, যদি এই অনন্ত বিশ্বের সজীব আকর্ষণ চিরকাল স্পষ্ট এবং একান্ত সত্যভাবে অনুভব করতে পারতুম, তা হলে এমন চিরশান্তি এমন চিরসান্ত্বনা আর কিসে থাকত? তা হলে পৃথিবীর প্রাণময়ী মাটিকে বুকের মধ্যে আলিঙ্গন করে ধরে হৃদয়কে এই জগদ্‌-ব্যাপী সৌন্দর্যের মধ্যে প্রসারিত করে দিতে পারতুম। দুঃখের বিষয় এই যে, ভিতরে খানিকটা শান্তি না থাকলে এই অখণ্ড শান্তিকে আপনার মধ্যে প্রতিফলিত দেখা যায় না, নিজের খানিকটা আনন্দ না থাকলে এই অখণ্ড আনন্দের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে পারা যায় না। সেই জন্যেই মাঝে মাঝে মফস্বলে এলে হঠাৎ এই বৃহৎ সত্য আমার সম্মুখে এক মুহূর্তে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি কালক্রমে আমার কল্পনার এই সজীবতা চলে যায়, বাহ্যপ্রকৃতি আমার মনেরই জড়ত্ব-বশত জড়বৎ প্রতিভাত হয়, তা হলে আজ যে কথাটাকে এমন অন্তরঙ্গ সত্য বলে জানছি সেইটেকে যৌবনকালের এক সময়ের একটা খেয়াল বলে মনে হবে— মনে হবে, বেশ একটি সুন্দর থিয়োরি— হয়তো প্রবীণ বয়সের শুষ্ক হাস্য উদ্রেক করবে। কিন্তু আমার এই প্রত্যক্ষ-অনুভূত গভীর আনন্দ তোর অনেক চিঠিতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, সেইগুলো দেখলে বোধ হয় শুষ্ক চিত্তের মধ্যে সরসতার সঞ্চার হতে পারবে — আমার প্রকৃতিনিহিত ধর্মটি (religion) ফিরে পাব।

কলকাতা
২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

২২৯

শিলাইদহ
২০ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৫।

আজ সেই ঝড়ের ভাবটা থেমে গিয়ে সকালে অল্প অল্প রোদ্দুর ওঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ কৃতকার্য হতে পারে নি। মেঘ আকাশময় ছড়ানো, পুবে হাওয়া খুব বেগে বইছে। ও পারে বিকশিত কাশবন আগুনের শিখার মতো ক্রমাগত কাঁপছে। এখান থেকে দূরের পদ্মার গর্জন শোনা যাচ্ছে। কাল পরশু দুদিন ঠিক আমার সেই নতুন গানের মতো দৃশ্যটা হয়েছিল—

ঝরঝর বরষে বারিধারা—
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে জনহীন অসীম প্রান্তরে—
অধীরা পদ্মা তরঙ্গ-আকুলা—
নিবিড় নীরদ গগনে—

ইত্যাদি।

তার মধ্যে এই হতভাগ্য গৃহহারা ব্যক্তিটি স্টীমারের ছাতের উপরে আপাদমস্তক ভিজে একেবারে কাদা হয়ে গিয়েছিল। গায়ে সেই আমার মস্ত রেশমের আলখাল্লা পরা ছিল, সেটা ঝোড়ো বাতাসে চতুর্দিকে অত্যন্ত হাস্যকরভাবে উড়ে বেড়াতে লাগল— চোখের চশমা জল লেগে ঝাপসা হয়ে এল— হাতে যে বই ছিল তার মলাটটা আমার করকমলে অবিরল রঙিন অশ্রুপাত করতে লাগল। আমি কাল

পরশু প্রায় মাঝে মাঝে সেই গানটা গাচ্ছিলুম। গাওয়ার দরুন বৃষ্টির ঝরঝর, বাতাসের হাহাকার, গোরাই নদীর তরঙ্গধ্বনি একটা নূতন জীবন পেয়ে উঠতে লাগল— চারি দিকে তাদের একটা ভাষা পরিস্ফুট হয়ে উঠল এবং আমিও এই ঝড়-বৃষ্টি-বাদলের সুবিশাল গীতিনাট্যের একজন প্রধান অভিনেতার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলুম। সংগীতের মতো এমন আশ্চর্য ইন্দ্রজালবিদ্যা জগতে আর কিছুই নেই— এ এক নূতন সৃষ্টিকর্তা। আমি তো ভেবে পাই নে, সংগীত একটা নতুন মায়াজগৎ সৃষ্টি করে না এই পুরাতন জগতের অন্তরতম অপরূপ নিত্যরাজ্য উদ্ঘাটিত করে দেয়। গান প্রভৃতি কতকগুলি জিনিস আছে যা মানুষকে এই কথা বলে যে, 'তোমরা জগতের সকল জিনিসকে যতই পরিষ্কার বুদ্ধিগম্য করতে চেষ্টা করো-না কেন এর আসল জিনিসটাই অনির্বচনীয় এবং তারই সঙ্গে আমাদের মর্মের মর্মান্তিক যোগ— তারই জন্যে আমাদের এত দুঃখ, এত সুখ, এত ব্যাকুলতা।'

কলকাতা
২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

২৩০

শিলাইদহ
২১ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৫।

আমি নিশ্চয় জানি যে, একবার যদি আমি নিজেকে ঘাড় ধরে কোনো একটা রচনা-কার্যে নিযুক্ত করাতে পারি তা হলে লেখা বেশ হু হু করে এগোতে থাকে, এবং যতই সে লেখার মধ্যে মন নিবিষ্ট হতে থাকে ততই মনটা একটা বিশুদ্ধ আনন্দের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রথম লিখতে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে কিছুতেই মনকে লওয়াতে পারি নে। মন বলে, 'আমার লেখা-ফেখা সব ফুরিয়ে গেছে, আর আমার লেখবার বিষয়ও কিছু নেই, আমার লেখবার ক্ষমতাও প্রায় শেষ হয়ে এল— এ অবস্থায় তুমি আমাকে খোঁচা দিয়ে লিখিয়ে সাধারণের সামনে অপদস্থ কোরো না।' আমি তাকে বলি, 'ঐ কথা তো তুমি বরাবর বলছ, কিন্তু লিখতেও তো কসুর করো না।' আমার মন একশ্রেণীয় ঘোড়ার মতো যারা প্রথম গাড়িতে জোৎবামাত্র লাথি ছুঁড়ে পিছন হঠতে থাকে, কিন্তু একবার যদি মেরে-কেটে বাপুবাছা বলে দুই পা এগিয়ে দেওয়া যায় তা হলে বাকি রাস্তাটা একেবারে চার পা তুলে ছুটতে থাকে। এখন সে কেবলই তার কলকাতার আস্তাবলটার দিকে ঝুঁকছে— আবার একবার যখন সে আপনার রচনার এবং কল্পনার মধ্যে আপনার পূর্ণ অধিকার ফিরে পাবে, খানিকটা দূর এগিয়ে যাবে, তখন মনে করবে এই কল্পনালোকের মধ্যে আমার বাস্তবলোক প্রকৃতভাবে আছে। লিখতে গিয়ে আপনার নিগূঢ় মানসরাজ্যের মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশলাভ হতে থাকে এবং সেখানে গিয়ে দেখি, জীবনে আমার বাঞ্ছিত পুষ্প থেকে যত মধু আহরণ করেছিলুম তার অধিকাংশই সেখানে সঞ্চিত হয়ে আছে। মনের সেই নিত্যরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করবার দ্বার সব সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না।

(কাল থেকে মেঘ কেটে গিয়ে নবীন শরৎকাল আমার চতুর্দিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, তাই আমাকে এক রকম স্মৃতিশিশিরসিক্ত করে তুলেছে।)

কলকাতা
২২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

২৩১

শিলাইদহ
২৫ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৫।

মানুষ আপনাদের সমাজটাকে নিজের হাতে এমনি জড়িয়ে প্যাকিয়ে তুলেছে যে, এ সমাজে সুখী হওয়া এবং সুখী করা বিষম একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দুঃখটা হয়তো মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দরকারী জিনিস। যুদ্ধ করা, চেষ্টা করা, সহ্য করা, ত্যাগ করা—হয়তো সুখী হওয়ার চেয়ে বেশি আবশ্যক। কষ্টে মানুষকে মানুষ করে তুলতে থাকে, এবং সে মনুষ্যত্বের মূল্য কোথাও না কোথাও আছে। ধর্মব্যবসায়ীরা বলে, ঈশ্বর যাকে ভালোবাসেন তাকে পীড়া দেন। কথাটা অনেক সময় কপট 'ক্যাণ্ট্'এর মতো শুনতে হয়, কিন্তু তাই বলে ওটা একেবারে অমূলক নয়। কষ্টই আমাদের আত্মার আমাদের প্রেমের আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের একমাত্র মূল্য।...দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের এমন সংগতি নেই যে কারও দুঃখ দূর করতে পারি। সেই জন্যে টাকা করা কাজটাকে ছোটো মনে হয় না। যদি আমাদের এই ব্যবসায়ে কিছু টাকা সংগ্রহ করে উঠতে পারি তা হলে অনেক মনের আক্ষেপ মেটাতে পারব—এই মেটিরিয়ল পৃথিবীতে কেবলমাত্র কামনার দ্বারা ভালোবাসার দ্বারা কারও দুঃখ দূর করা যায় না।

কলকাতা
২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

২৩২

শিলাইদহ
২৬ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৫।

যদিও ঝড় হবার কোনো লক্ষণ দেখছি নে—আকাশে মেঘ অতি অল্প, নদী অতি প্রশান্ত, দিবালোক নির্মল এবং উজ্জ্বল—স্রোতের মুখে বোট হুহুঃশব্দে ভেসে চলেছে, মৃদুমন্দ বাতাস দিচ্ছে, শরীর এবং মনের মধ্যে একটি পুলকমিশ্রিত জড়িমার সঞ্চার হচ্ছে।) আজ আমার নির্জনবাসের শেষ দিন; কাল থেকে অন্যান্য কাজের মধ্যে আতিথ্যে মন দিতে হবে...আমার সাধনা লেখার কাজে এখনও হাত দিই নি। কেবল সংগীত-আলোচনায় সরস্বতীর সঙ্গে খানিকটা সম্বন্ধ রেখেছি।

এখানে প্রকৃতি এত নিকটবর্তিনী, তার হৃৎকম্প এবং তার নিশ্বাস-হিল্লোল এত কাছে অনুভব করা যায় যে, সংগীত ছাড়া আর কোনোরকম চেষ্টাসাধ্য উপায়ে ভাবপ্রকাশ করতে ইচ্ছা হয় না। প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক এমন আর কিছু না— আমি নিশ্চয় জানি এখনি যদি আমি জানলার বাইরে দৃষ্টি রেখে রামকেলি ভাঁজতে আরম্ভ করি তা হলে এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদূরবিস্তৃত শ্যামলনীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো আমার মর্মের কাছে এসে আমাকে অবলেহন করতে থাকবে। যতবার পদ্মার উপর বর্ষা হয় ততবারই মনে করি মেঘমল্লারে একটা নতুন বর্ষার গান রচনা করি, কিন্তু ক্ষমতা কৈ? এবং শ্রোতাদের সম্মুখে তো এই বর্ষার নিত্যমোহ নেই, তাদের কাছে একঘেয়ে ঠেকবে। কারণ, কথা তো ঐ একই—বৃষ্টি পড়ছে, মেঘ করেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু তার ভিতরকার নিত্য-নূতন আবেগ, অনাদি-অনন্ত বিরহবেদনা, সেটা কেবল গানের সুরে খানিকটা প্রকাশ পায়।

কলকাতা
২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

২৩৩

শিলাইদহ
৩০ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৫।

তুই 'আমরা ও তোমরা' -লেখকের উপর ভয়ানক চটেছিস দেখলুম। লোকটা কিন্তু 'খুব মজা করেছি' মনে করে বসে আছে। মুশকিল এই-যে, রস যে বোঝে না তাকে বোঝানো যায় না; কারণ, রসবোধ ইন্দ্রিয়বোধের মতো প্রত্যক্ষবোধ। এমন-কি, ভালোমন্দ বিচারের সময় রসজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যেই মতভেদ হয়। এই জন্যে সমালোচনার কাজটাকে ঝকমারি মনে হয় এবং রচনার কাজটাও প্রায় তথৈবচ। কিন্তু তবুও তো সংসারে মোটের উপরে ভালোমন্দের বিচার এক রকম চলে যাচ্ছে এবং নিতান্ত মন্দ চলছে না—যদিচ ব্যক্তিগত মতবৈষম্যের অপ্রতুল নেই, তবুও তো কালক্রমে সাধারণ মতের অনেকটা ঐক্য দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কতকটা natural selectionএর মতো— বৈষম্য (variation) প্রতিদিন নানা আকারে দেখা দিচ্ছে, কিন্তু যেগুলো টেকবার নয় সেগুলো নানা উপায়ে নষ্ট হচ্ছে এবং যেগুলো টেকসই সেগুলোর মধ্যে একটা ঐক্য দেখা যায়। আমরা লেখকরা যে-সমস্ত বীজ বপন করে যাচ্ছি যদি মানুষের মনের পক্ষে তার যথার্থ স্থায়ী উপযোগিতা থাকে তা হলে যে সমালোচক যেমনি নিন্দা করুন বীজ ব্যর্থ হবে না। আসল কথাটা এই যে, মানুষের মন জিনিসটা তেমন সুপরিচিত নয়— আমার মনে আপাতত কোন্‌টা ভালো লাগল বা না লাগল তা আমি বলতে পারি এবং মোটামুটি অন্য লোকের কী ভালো লাগবে বা না লাগবে তাও বলতে পারি, কিন্তু ব্যাপারটা একটু সূক্ষ্ম বা জটিল হলেই খুব নিপুণ সমঝদার ব্যতীত কেউ হিসাব করে বলতে পারে না। এবং নিপুণ সমঝদারের হিসাবেও মাঝে মাঝে ভুল থেকে যায়। সমঝদার লোকের লক্ষণ এই যে, তার বোধশক্তি যেমন সূক্ষ্ম সমবেদনাশক্তি তেমনি ব্যাপক, এবং সাহিত্য-অভিজ্ঞতাও খুব বিস্তৃত। নিজের ব্যক্তিগত ভালোমন্দ লাগাকে অতিক্রম

করে সমবেদনাশক্তি-প্রভাবে ভিন্ন রুচি এবং ভিন্ন অবস্থার মধ্যে প্রবেশ থাকা চাই। সে রকম লোক বড়ো দুর্লভ। বরঞ্চ লেখক অনেক ভালো পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত সমঝদার দুর্লভ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, তবুও উপযুক্ত-শিক্ষা-প্রাপ্ত সাধারণ পাঠকের কাছে সাধারণত ভালো জিনিসেরই আদর দাঁড়িয়ে যায়। অতএব রুচির কোনো প্রকৃত আদর্শ আছে কি না তা নিয়ে তর্কের দ্বারা কোনো সূক্ষ্ম মীমাংসা করা যায় না, অথচ ব্যবহারত মানুষের সমাজে একটা রুচির আদর্শ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং সম্পূর্ণ কদর্যতা কখনোই সৌন্দর্যরূপে টিকে যাচ্ছে না—ভ্রম হচ্ছে এবং তা সংশোধনও হয়ে যাচ্ছে। তাই যদি না হত, তা হলে সৌন্দর্য-সৃষ্টির সম্পূর্ণতাসাধনের জন্যে চিরকাল থেকে গুণিবর্গের এত প্রাণপণ চেষ্টা থাকত না—রুচির অমোঘ আদর্শ তারা প্রমাণ করতে পারে না, অথচ তার সত্যতার প্রতি তাদের অটল নিষ্ঠা।

কলকাতা
১ অক্টোবর ১৮৯৫

২৩৪

শিলাইদহ
৪ অক্টোবর। ১৮৯৫।

মেঘ বৃষ্টি কেটে গিয়ে আজ অতি সুন্দর দিন হয়েছে। আজ থেকে বোধ হয় শরৎকালটা ঠিক রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হল। সুন্দর কথাটা অনেকবার অনেক জিনিসে ব্যবহার হয়—সেই জন্যে ও কথাটা অব্যবহার্য হয়ে এসেছে; অথচ ওর প্রতিশব্দও বড়ো বেশি নেই। যাই হোক, আজকের দিনটি দুর্লভ দিন—আমার মনটা এই আলোকে, স্তব্ধতায়, এই নির্মল শুভ্র স্বচ্ছ আকাশে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কে একজন জাদুকরী তার কোমল হস্তে আমার দুই চক্ষে একটি অমৃতময় মোহ মাখিয়ে দিয়ে গেছে, এই মধ্যাহ্নের নিস্তরঙ্গ নদী এবং ও পারের প্রফুল্ল-কাশবন-শোভিত বালির চর আমার কাছে একটি সুদূর পূর্বস্মৃতির মতো মনোহর লাগছে। বোটে লোকজন এলে আমার এই শরতের সুগভীর দিনগুলি আর এমন অখণ্ডভাবে পাব না বলে মনের ভিতরে ভারী একটা স্বার্থপর পরিতাপ উপস্থিত হচ্ছে। বোধ হয় সেই ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আসন্ন হওয়াতেই আজকের এই নিস্তব্ধ নিভৃত উপভোগটি মনের মধ্যে এমন নিবিড়তর হয়ে এসেছে। যেন আমার কাছে আমার এই অভিমানিনী প্রবাসসঙ্গিনী করুণ-অনিমেষ-নেত্রে বিদায় নিতে এসেছে। আমাকে যেন বলছে, 'কিসের তোমার ঘরকন্না এবং আত্মীয়তাবন্ধন—আমি তোমার অনন্তকালের সাধনা, তোমার সহস্রজন্মপূর্বের প্রিয়তমা, অনন্ত জীবনের অসংখ্য খণ্ডপরিচয়ের মধ্যে তোমার একমাত্র চিরপরিচিতা—কোনো কারণেই আমার দুর্লভ সঙ্গ তুমি অবহেলা কোরো না, তোমার অন্তরাত্মা আমি ছাড়া আর কারও হাত থেকে সুখ দুঃখ সৌন্দর্যের চরমতম ফল গ্রহণ করে না।' কিন্তু বর্তমানের কর্মক্ষেত্রে এবং প্রত্যক্ষ সংসারে এ-সমস্ত কথা অলীক অমূলক শোনাবে—যদিও একটু দূর থেকে এবং একটু গভীর ভাবে পর্যালোচনা করে

দেখলে কথাটাকে তেমন লঘু মনে হয় না। এই শরতের অপর্যাপ্ত শান্তির মধ্যে আমার আত্মাকে স্তরে স্তরে সিক্ত করে নেওয়া আমার পক্ষে সামান্য ব্যাপার নয়। আমি যদি পাটের ব্যবসায়-উপলক্ষে কোনো দুর্গম স্থানে গিয়ে একলা পড়ে থাকি তা হলে লোকে আমার প্রশংসা করবে এবং আমারও কর্তব্যবুদ্ধি শান্ত থাকবে, কিন্তু যদি বিনা কার্যে কিছুদিন নিরুদ্দেশ থাকি তা হলে আপনাকে এবং পরকে ভুলিয়ে রাখা শক্ত হয়। এ জীবনে আমার যা-কিছু গভীরতম তৃপ্তি এবং প্রীতি, সে কেবল এই রকম নির্জনে সুন্দর মুহূর্তে পুঞ্জীভূতভাবে আমার কাছে ধরা দেয় —খণ্ডভাবে মিশ্রিতভাবে সংসার থেকে সেগুলো সংগ্রহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়েছে। আমার জীবনের অন্তস্তলে ক্রমশই একটা নূতন সত্যের উন্মেষ হচ্ছে—কেবল তার আভাস পাই। আমার পক্ষে সে একটা স্থায়ী নিত্য সম্বল, আমার সমস্ত জীবনখনিজ-গলানো খাঁটি সোনাটুকু—আমার সমস্ত দুঃখ কষ্ট বেদনার ভিতরকার অমৃতশস্য—সেটাকে যদি স্পষ্ট পরিস্ফুট নির্ভরযোগ্য দৃঢ় আকারে পাই তা হলে সে আমার টাকাকড়ি খ্যাতি-প্রতিপত্তি সুখ-সম্পদ সব চেয়ে বেশি জিনিস হয়—যদি সম্পূর্ণ নাও পাই তবু সেই দিকে চিত্তের স্বাভাবিক অনিবার্য প্রবাহ এও একটা পরম লাভ। যদি চিরকাল সুখে থাকতুম, মনের আশা মিটিয়ে নিয়ে দিনের সমস্ত কাজগুলি সেরে সহজেই দিন কাটত, তা হলে এই মানবজন্মে কতটুকুই বা পেতুম—কী বা জানতুম!

কলকাতা
৫ অক্টোবর ১৮৯৫

২৩৫

শিলাইদহ
৪ অক্টোবর। ১৮৯৫।

(দিনগুলি আজকাল অত্যন্ত সুমধুর হয়ে এসেছে—বাতাস সুশীতল, আকাশ সমুজ্জ্বল, তটরেখা শ্যামল, নদী সুপ্রশান্ত, মন স্বপ্নাতুর, কাজকর্ম স্বল্প, লেখা-টেখা বন্ধ, চারি দিকে ছুটি, এবং অন্তরে বাহিরে সৌন্দর্যপ্রবাহ। জলের কলস্বরে যেন কার অত্যন্ত সুকোমল আদরের কণ্ঠ মাখা রয়েছে; স্বচ্ছ নীলাকাশও স্নেহভারে আবিষ্ট এবং স্নিগ্ধ সমীরণও প্রীতিসুধায় পরিপূর্ণ; এইসব রঙগুলি—এই জলের গেরুয়া, এ পারের সাদা, ও পারের সবুজ, আকাশের নীল, রৌদ্রের সোনা, এ-সমস্ত কতই বেশভূষা দৃষ্টিহাসির অজস্রতারূপে আমার চতুর্দিকে শরৎকিরণে ঝলকিত হচ্ছে।) সমস্ত আকাশ যেন হৃদয়পুঞ্জের মতো আমাকে বেষ্টন করে ধরেছে। আশ্চর্য এই যে, পরশু আমার এখানে যখন জনসমাগম হবে তখন এরা যেন আর এখানে থাকবে না—মানুষ এলে যেন প্রকৃতির মধ্যে আর প্রকৃতির স্থান থাকবে না। মানুষ এত বেশি জায়গা জোড়ে, চতুর্দিকে এতটা জিনিসের অপব্যয় করে!

কলকাতা
৫ অক্টোবর ১৮৯৫

২৩৬

কুস্টিয়া
৫ অক্টোবর। ১৮৯৫।

কে আমাকে গভীর গম্ভীর ভাবে সমস্ত জিনিস দেখতে বলছে, কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থিরকর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সংগীত শুনতে প্রবৃত্ত করছে, কে আমার উপরে একটি উদার বিষাদমন্ত্র পাঠ করে আমার সমস্ত চাপল্য প্রতিদিন মিলিয়ে নিয়ে আসছে এবং বাইরের সঙ্গে আমার সমস্ত সূক্ষ্ম ও প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে নিভৃত নিস্তব্ধ সজাগ সচেতন ভাবে অনুভব করতে দিচ্ছে! জীবনে অনেকবার অনেকদিন উপবাসী থেকে অনেক দুঃখব্রত উদ্‌যাপন করেছি— সেই তপস্যার ফলেই বিশ্বজগতের অনন্ত রহস্যময় গভীরতা আমার সম্মুখে প্রায় সর্বদাই সমুদ্রের মতো প্রসারিত হয়ে রয়েছে। হৃদয়ের প্রাত্যহিক পরিতৃপ্তিতে মানুষের কোনো ভালো হয় না, তাতে প্রচুর উপকরণের অপব্যয় হয়ে কেবল অল্প সুখ উৎপন্ন করে, এবং কেবল আয়োজনেই সময় চলে যায়— উপভোগের অবসর থাকে না। কিন্তু ব্রতযাপনের মতো জীবনযাপন করলে দেখা যায় অল্প সুখও প্রচুর সুখ এবং সুখই একমাত্র সুখকর জিনিস নয়। চিত্তের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ মনন-শক্তিকে যদি সচেতন রাখতে হয়, যা-কিছু পাওয়া যায় তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করবার শক্তিকে যদি উজ্জ্বল রাখতে হয়, তা হলে হৃদয়টাকে সর্বদা আধ-পেটা খাইয়ে রাখতে হয়— নিজেকে প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত করতে হয়। Goetheর একটি কথা আমি মনে করে রেখে দিয়েছি— সেটা শুনতে খুব সাদাসিধে, কিন্তু আমার কাছে বড়ো গভীর বলে মনে হয়—

Entbehren sollst du, sollst entbehren.
Thou must do without, must do without.

কেবল হৃদয়ের আহার নয়, বাইরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিসপত্রও আমাদের অসাড় করে দেয়— বাইরের সমস্ত যখন বিরল তখনি নিজেকে ভালোরকমে পাওয়া যায়। সেই জন্যে কলকাতার অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য আমাকে অল্পকালের মধ্যেই পীড়ন করতে থাকে, সেখানকার ছোটোখাটো সুখসম্ভোগের মধ্যে আমার যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

কিন্তু তপস্যা আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়, সুখ আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়, তবু বিধাতা যখন বলপূর্বক আমাকে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত করিয়েছেন তখন বোধ হয় আমার দ্বারা তিনি একটা বিশেষ কিছু ফল পেতে চান— শুকিয়ে গুঁড়িয়ে পুড়ে ঝুড়ে সব-শেষে বোধ হয় এ জীবনের থেকে একটা কিছু কঠিন জিনিস থেকে যাবে। মাঝে মাঝে তার আবছায়া-রকম অনুভব পাই। আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনো আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না, তার সঙ্গে কেবল একটা অভ্যাসের যোগ দৃঢ় হয়ে আসে— যে ধর্ম আমার জীবনের ভিতরে সংসারের দুঃসহতাপে ক্রিস্টলাইজ্‌ড্‌ হয়ে ওঠে সেই আমার যথার্থ। আর-কাউকে তা ঠিক বোঝানো যাবে না, এবং বোঝাবার দরকারও নেই— তারা তার ঠিক মর্ম গ্রহণ করতে পারবে না এবং গ্রহণ করলেও বিকৃত করে ফেলবে— কিন্তু সেই জিনিসটাকে নিজের মধ্যে উদ্‌ভূত করে তোলাই মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্বের চরম ফল। চরম বেদনায় তাকে

জন্মদান করতে হয়, নিজের শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে হয়—তার পরে জীবনে সর্বতোভাবে সুখী না হয়েও চরিতার্থ হয়ে মরা যেতে পারে।—

Entbehren sollst du, sollst entbehren.

কলকাতা
৬ অক্টোবর ১৮৯৫

২৩৭

কুষ্টিয়া
৬ অক্টোবর। ১৮৯৫।

আমার দিনগুলি রথীর কাগজের নৌকোর মতো আলস্যস্রোতে একটি একটি করে ভাসিয়ে দিচ্ছি। কেবল মাঝে মাঝে একটি আধটি করে গান তৈরি করছি এবং চৌকিটাতে অকর্মণ্যভাবে বসে সুর গুন্‌গুন্‌ করা যাচ্ছে; সুর ভুলছি এবং তৈরি করছি এবং সুখস্মৃতিময় বিষাদ-কোমল প্রশান্ত শরৎকালের মধ্যে কুণ্ডলায়িত হয়ে পড়ে রয়েছি। কবে থেকে যে কোমর বেঁধে রীতিমত কাজ আরম্ভ করতে পারব তা তো বুঝতে পারছি নে। এই বিস্তীর্ণ জল এবং নদীতীর থেকে একটি নিশ্বাস আমার গায়ের উপর এসে পড়ছে—একটি অত্যন্ত নিকটবর্তী প্রাণময় প্রীতিময় ভাবময় সঙ্গ আমার অন্তরে বাহিরে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে, তাকে আমি কিছুতেই যেতে বলতে পারছি নে। এই অপর্যাপ্ত জ্যোতির্ময় নীলাকাশ আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন অবনত হয়ে পড়েছে, এই আলোক আমার রক্তের মধ্যে প্রবেশ করছে, সর্বব্যাপী নিস্তব্ধতা আমার বক্ষকে দুই হাতে বেষ্টন করে ধরেছে, একটি সকরুণ অশ্রুসজল শান্তি আমার চোখের উপরে ললাটের উপরে চুম্বন করছে—আমি একটি পরিব্যাপ্ত অথচ নিভৃত সৌন্দর্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছি। পুজোর ছুটিতে সবাই কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে এসেছে, আমারও এই বাড়ি—আমার বাড়ির লোকটি আমার সমস্ত খাতাপত্র কেড়েকুড়ে নিয়ে বলছে, 'তুমি কাজ ঢের করেছ, এখন একটুখানি থামো।' আমিও নিরাপত্তিতে থেমে আছি, এর পরে কর্ম যখন আবার আমাকে একবার হাতে পাবেন তখন টুঁটি চেপে ধরবেন—তখন আমার এই ঘরের লোকটি, আমার এই ছুটির কর্ত্রী যে কোথায় থাকবেন, তাঁর আর কোনো উদ্দেশ পাওয়া যাবে না। এখন প্রায় মাঝে মাঝে মনে করি সাধনা, ত্রৈমাসিক এবং মাসিক, এই পদ্মার জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাব। কিন্তু জানি, ভাসিয়ে দিলেও তিনি আমাকে পিছন-পিছন টেনে নিয়ে যাবেন।

কলকাতা
৭ অক্টোবর ১৮৯৫

২৩৮

শিলাইদহ
১০ অক্টোবর। ১৮৯৫।

ঠিক যাকে সাধারণত ধর্ম বলে সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি তা বলতে পারি নে, কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে-একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠছে তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো-একটা নির্দিষ্ট মত নয়—একটা নিগূঢ় চেতনা, একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব, আমার সুখ-দুঃখ অন্তর-বাহির বিশ্বাস-আচরণ সমস্তটা মিলে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। শাস্ত্রে যা লেখে তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারি নে, কিন্তু সে-সমস্ত সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী—বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নাই বললেই হয়। আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে জিনিসটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তুলতে পারব সেই আমার চরম সত্য। জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে অনুভব করি তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারি নে—প্রত্যেক কথাটা বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত পদটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না। কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজনশক্তির অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি; বুঝতে পারি, যেমন গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠছে, আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা সৃজন চলছে—আমার সুখ-দুঃখ বাসনা-বেদনা তার মধ্যে আপনার স্থান গ্রহণ করছে—এর থেকে কী হয়ে উঠবে জানি নে, কারণ আমরা একটি ধূলিকণাকেও জানি নে, কিন্তু নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দ-সূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই—আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি, এইটেকেই একটা বিরাট বৃহৎ ব্যাপার বলে বুঝতে পারি। আমি আছি এবং আমার সঙ্গে আর-সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণু পরমাণুও থাকতে পারে না; আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুস্নিগ্ধ সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছু কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়, সেই জন্যে এই জ্যোতির্ময় শূন্যে আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত করে নেয়—নইলে সে কি আমার মনকে তিলমাত্র স্পর্শ করতে পারত? নইলে তাকে কি আমি সুন্দর বলে অনুভব করতুম? আমার সমস্ত বাসনাস্বপ্নকে তার মধ্যে পরিপূর্ণ আকারে প্রতিফলিত করতে পারতুম? আমার সঙ্গে আর অনন্ত জগৎপ্রাণের সঙ্গে যে চির-কালের নিগূঢ় সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্ছে বর্ণ গন্ধ গীত—চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য অলক্ষ্যভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে—কথাবার্তা দিনরাত্রিই চলছে।

কলকাতা
১১ অক্টোবর ১৮৯৫

২৩৯

শিলাইদহ
১৫ অক্টোবর। ১৮৯৫।

রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে, জল ঝিক্‌মিক্‌ করছে, একটু একটু শীতের বাতাস দিচ্ছে, নদীর জল আয়নার মতো স্থির, মাঝে মাঝে এক-আধটা নৌকো পাশ দিয়ে ছল্‌ ছল্‌ শব্দে চলে যাচ্ছে। যদি একলা থাকতুম তা হলে এই সময়টাতে জানলার কাছে লম্বা কেদারায় আবিষ্টচিত্তে পড়ে থাকতুম— দিবাস্বপ্ন দেখতুম, এই রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের ভিতরকার একটি গভীর বেলাবলী রাগিণী শুনতে পেতুম এবং নিজের অস্তিত্বকে এই রৌদ্র জল বায়ুর ভিতরে সম্মিশ্রিত পরিব্যাপ্ত হিল্লোলিত অনুভব করতুম— নিজেকে অখণ্ড অনন্তকালের শয্যাতলে শয়ান উপলব্ধি করতুম— সমস্ত পৃথিবী জুড়ে তৃণগুল্মে তরুলতা পশুপক্ষী-রূপে যে জীবনরাশি উচ্ছ্বসিত হচ্ছে নিজেকে সেই কলধ্বনিমুখরিত চির-নির্ঝরের মধ্যে প্রবাহিত বোধ করতুম— আমার নিজের ব্যক্তিগত নিজস্ব-আবরণ এই শরতের রৌদ্রে বিগলিত হয়ে এই স্বচ্ছ আকাশের সঙ্গে মিশে যেত এবং আমি দেশকালের অতীত হয়ে যেতুম। কিন্তু এখন এ অবস্থায় ঠিক সেই আত্মবিস্মৃত ভাবের মধ্যে নিমগ্ন হওয়া শক্ত। আমি যে আমি, অর্থাৎ অমুকের বাপ, অমুকের স্বামী, অমুকের বন্ধু, শ্রীযুক্ত অমুক, সে সম্বন্ধে বিচিত্র প্রমাণ চতুর্দিকেই বর্তমান।

কলকাতা
১৬ অক্টোবর ১৮৯৫

২৪০

শিলাইদহ
১৬ অক্টোবর। ১৮৯৫।

কাল অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম হয় নি, অনেক ক্ষণ জলিবোটে পড়েছিলুম— তার পরে বোটে আমার শোবার ঘরে এসে জানলার ধারে বেঞ্চিতে বসে অনেক দিন পরে একাকী যাপন করেছিলুম। নদীর জল স্থির আয়নার মতো ছিল— তারার আলোতে রাত্রের অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এসেছিল, যেন একটা কালো কাঁচের ভিতর দিয়ে বিশ্ব-জগৎ দেখা যাচ্ছিল। রাত্রি যদিও গভীর ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ছিল না, কারণ, আমার পাশের বোট থেকে আমার দুই প্রতিবেশিনী বিছানায় পড়ে পড়ে হাস্যালাপ করছিলেন এবং তখনো দুই-একটা নৌকো এসে গোলমাল করছিল— ও পারটা বেশ একটি স্নিগ্ধ অন্ধকারে আবৃত শান্তিময় দেখাচ্ছিল— আমাদের কুঠিবাড়ির বাগানের দীর্ঘ নারকেল গাছগুলি প্রহরীর মতো স্থির দাঁড়িয়ে ছিল এবং খুব দূর থেকে একটা কীর্তনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। একটুও বাতাস ছিল না। আমাদের জন-প্রাণীহীন বালির চরের উপর কাশবন তাদের শুভ্র পুষ্পস্তবকগুলি নম্র করে যেন ঘুমে ঢুলে পড়েছিল— অবশেষে অনেক ক্ষণ বসে বসে যখন আমার মাথাটাও নিদ্রা-

ভারে সেই রকম অবনত হয়ে এল তখন আমি বিছানার মধ্যে শুয়ে পড়লুম। আজ সকালে স্নানের পর মনে হচ্ছে যথেষ্ট ঘুম হয় নি। শরীরে যে-একটা ক্লান্তি বোধ হচ্ছে সেটা বেশ লাগছে— বেশ বুঝতে পারছি, এখনি যদি বিছানার উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে পড়ি, হাতে একখানা ভ্রমণের বই তুলে নিই, গায়ে এই অল্প-অল্প শীতের বাতাসটি লাগতে থাকে, তা হলে ভারী আরাম করবে। সেই জন্যে সকালবেলাকার এই রকম ক্লান্তি আমার বড়ো ভালো লাগে— বেশ বিনা পরিতাপে হাতের সমস্ত কাজ ফেলে দিয়ে এক বেলার মতো ছুটি নেওয়া যায়। আজকাল আমার ছুটি বাঁধা— কিন্তু এরকম অকর্মণ্য দশা ভালো লাগে না। শরীরটা যখন সম্পূর্ণ সক্ষম থাকে তখন সে আপনিই কর্ম অন্বেষণ করে, মানুষকে অস্থির করে তোলে। কিন্তু আজ সে বেশ শান্ত আছে, নিজের পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডটাই তার ভার বোধ হচ্ছে, সেটাকে শয্যার উপর বিস্তার করে দিতে পারলে সে নিশ্চিন্ত হয়।

কলকাতা
১৭ অক্টোবর ১৮৯৫

২৪১

পতিসর-পথে
২২ নবেম্বর। ১৮৯৫।

ছোট্ট নদীটির মধ্যে দিয়ে আমার বোট চলেছে— সমস্ত দিন একলা রয়েছি, কারও সঙ্গে একটিমাত্র কথাও কইতে হয় নি। এখানকার নদীতে স্রোত প্রায় নেই, শৈবাল ভাসছে, তার থেকে এক রকম নতুন ধরনের সুগন্ধ আসছে। পালে অত্যন্ত মৃদুমন্দ বাতাস লেগেছে— বোট খুব আস্তে আস্তে চলেছে, জলের উপর যে-একটি সুকোমল আলো পড়েছে এবং অদূরবর্তী তীরের উপর যে বিচিত্র সজীব সবুজ রঙের পর্যায় এবং নিভৃত গ্রামদৃশ্য শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দেখা দিচ্ছে তাতে আমাকে আমার অহমিকা থেকে ক্রমশই বাইরে আকর্ষণ করে আনছে, জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলি যেন একে একে উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে এবং আত্মগত হৃদয়ের তীব্রতা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে। কলকাতার নানান কঠিন করস্পর্শের অনুরণন এখনো সমস্ত স্নায়ুর মধ্যে রীরী করছে— কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি, ক্রমে ক্রমে সে সমস্তই থেমে যাবে, জগৎকে অনন্তবৃহৎ বলে জানব এবং জগতের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্বন্ধ সহজ ও সরল হয়ে আসবে। এই সুস্নিগ্ধ অগাধ জনহীনতার মধ্যে প্রথম ঝাঁপ দিয়ে পড়বার সময় অনেকগুলি বন্ধনে টান পড়ে এবং কিছু ক্ষণের জন্যে বেদনা বোধ হয়— তার পরে অতল সান্ত্বনার মধ্যে যখন একটি অসীম স্নেহের আলিঙ্গন অনুভব করি, অত্যন্ত নিবিড় নিভৃত অন্তরতম আত্মীয়তার উদার বক্ষের মধ্যে নিজেকে ঘনিষ্ঠরূপে আবদ্ধ বোধ করি, তখন অন্তঃকরণের চিরসঞ্চিত উত্তাপ গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মুক্তি লাভ করে; বুঝতে পারি 'সুখ অতি সহজ সরল', যথার্থ পরিতৃপ্তি নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে এবং তার থেকে কোনো বিমুখ অদৃষ্ট আমাকে বঞ্চিত করতে পারে না। অহমিকার বাইরে একবার পদক্ষেপ করবা মাত্রই দেখা যায় সম্মুখে আনন্দময় প্রকাণ্ড জগৎ জীবনে যৌবনে সৌন্দর্যে সুবিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে— তখন মনে হয়

আমি এ জগতে জন্মগ্রহণ করেছি বলে ধন্য, এ জগতে অনন্তকাল থাকব বলে আমি ধন্য—আমি যা জেনেছি, যা পেয়েছি, যা অনুভব করেছি, তা একটিমাত্র হৃদয়ের পক্ষে আশ্চর্য বৃহৎ।

কলকাতা
২৩ নবেম্বর ১৮৯৫

২৪২

পতিসর
২৫ নবেম্বর। ১৮৯৫।

আমরা এমনি গৃহপালিত প্রাণী যে, কলকাতা থেকে দুই পা বাড়িয়ে এই কালীগ্রামটিতে এসে মনে করছি একটা কী বিরাট ব্যাপার করে বসেছি। বাড়ির খুঁটির সঙ্গে এমনি ছোটো দড়িতে আমাদের পা বাঁধা যে একটুখানি নড়লে-চড়লেই অমনি টান পড়ে—কেনই বা এত চিঠিপত্র লেখা এবং চিঠিপত্রের প্রত্যাশা! আমি সরে আসবামাত্রই আমার আত্মীয়সংসার একেবারে অগাধ সমুদ্রের মধ্যে পড়ে নি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বৃহৎ পৃথিবীর মধ্যে মুক্তভাবে আনন্দে সঞ্চরণ করে বেড়াবার অধিকার বিধাতা বাঙালির ছেলেদের দেন নি—আমরা সব গোয়ালের গোরু, বড়ো জোর গ্রামের মাঠ পর্যন্ত আমাদের চরে বেড়াবার সীমা—তাও সর্বদাই রাখাল বালক লাঠি হাতে পিছন-পিছন লেগেই থাকে। কাল সন্ধেবেলায় গেটের উপর ডাউডেনের একটি প্রবন্ধ পড়ছিলুম—তাতে দেখছিলুম গেটে দুই বৎসরের জন্যে সমস্ত ছেড়েছুড়ে দিয়ে ইটালিতে গিয়ে নিবিষ্টমনে শিল্পালোচনা এবং সৌন্দর্যসম্ভোগ করে কী-এক নূতন প্রাণ এবং নূতন সম্পদ লাভ করেছিলেন, তাতে করে তাঁর প্রতিভা সহসা কী-এক অপূর্ব পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছিল, তাঁর সমস্ত প্রকৃতি কী-একটা বিস্তীর্ণ শান্তি এবং বৃহৎ মর্যাদা অর্জন করেছিল। পড়লে আমাদের মতো কারাবাসীর চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—মনে হয়, যা হতে পারা যেত তার অর্ধেকও হওয়া যায় নি, শিক্ষা এবং সাধনার অনেক বাকি আছে। মনে হয়, যদি গেটের মতো শুভাদৃষ্ট আমার হত, যদি এই বাংলাদেশে আমি জন্মগ্রহণ না করতুম, যদি এ দেশে মানবপ্রকৃতিবিকাশের উপযোগী সমস্ত খাদ্য থাকত, তা হলে আমি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অমরতা লাভ করতে পারতুম—এখন আমি অনেকটা পরিমাণে কৃপাপাত্র দীন। যদি পারি তো আমিও এক সময়ে জগতে বেরিয়ে পড়ব—এই আমার নিতান্ত ইচ্ছা।

কলকাতা
২৬ নবেম্বর ১৮৯৫

২৪৩

পতিসর
২৮ নবেম্বর?। ১৮৯৫।

একটা কোনো লেখায় হাত দেব দেব করছি, কিন্তু এখনও কিছুতেই মনটাকে কাজে নিবিষ্ট করতে পারছি নে—এই সুগভীর ঔদাসীন্য দূর করতে কতদিন যাবে জানি নে, আবার ততদিনে হয়তো কলকাতায় ফেরবার সময় এসে পড়বে। মনে হচ্ছে যেন অনেক দিন হল মফস্বলে এসেছি এবং এতদিন অবিচ্ছেদে অকর্মণ্য-ভাবে কাটিয়েছি—যদি গান তৈরি করবার সেই ঝোঁকটা থাকত তা হলে অবিশ্রাম গুন্ গুন্ শব্দে দিনগুলো উন্মত্তভাবে চলে যেত, সংগীতের নেশায় অচেতনভাবে বেলা কাটিয়ে দিতুম। সম্প্রতি জমিদারি কাজ দেখছি, খবরের কাগজ পড়ছি, বই পড়ছি এবং আহার করছি। কোনোমতে ঘাড় ধরে নিজেকে একবার লেখার স্রোতের মাঝখানে টেনে এনে ফেলতে পারলে আমি আর জগৎসংসারকে কেয়ার করি নে—তখন আমার জগৎ আমার নিজেরই জগৎ, সেখানে আমি একমাত্র রাজা, সেখানে আমি সমস্ত সুখ দুঃখ সৌন্দর্যের বিধাতাপুরুষ। আমি কত দিনেরই বা, আমার সুখ দুঃখ কত ক্ষণই বা থাকবে—কিন্তু আইডিয়ার প্রবাহ অনাদি উৎস থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে শত সহস্র মনের মধ্যে দিয়ে অনন্তকালের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেই সূত্রে আমার সঙ্গে সমস্ত অতীতকালের এবং অনাগতকালের যোগ—সেই ভাবরাজ্যে আমি সমস্ত মনুষ্য, আমি রবি-নামক ব্যক্তিবিশেষ নই—সেখানে আমার আনন্দ এবং বেদনা বিশ্বব্যাপী। দুঃখের বিষয় এই যে, সেই ভাবরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী, চঞ্চলা লক্ষ্মীর চেয়ে ঢের বেশি চঞ্চলা—আমি যখন তাঁকে চাই তখন তিনি সব সময়ে দেখা দেন না, কিন্তু তিনি যখন আমাকে চান তখন আর আমার এক মুহূর্ত বিলম্ব করবার জো নেই। তখন দুনিয়ার সমস্ত জরুরি কাজ ফেলে দিয়ে তাঁর পদপ্রান্তে গিয়ে হাজির হতে হয়। কলকাতায় যখন নানাপ্রকার সংঘাত-সংঘর্ষে উদ্‌ভ্রান্ত ক্লিষ্ট হয়ে পড়ি তখন মনে মনে কল্পনা করি, সুদূর নির্জনে আমার জন্যে আমার ভাবলক্ষ্মী সুধাপাত্র নিয়ে বসে আছেন—যখন সেখানে এসে উপস্থিত হই তখন দেখি পাষাণী কলকাতাও আমার পিছনে পিছনে এসেছে এবং আমার ভাবলক্ষ্মী সুদূরতর নির্জনে গিয়ে লুকিয়েছেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় হয়তো নক্ষত্রালোকে বোটের ছাতের উপর আমার পিছনে নিঃশব্দপদে এসে দাঁড়াবেন এবং আমার কাঁধের উপর তাঁর কোমল হস্তখানি ধীরে ধীরে স্থাপিত করবেন, এবং আমি আস্তে আস্তে মুখ তুলে অনন্ত মৌন আকাশের মধ্যে তাঁর সেই মৌনমুখখানি দেখতে পাব—এবং তার পরে আমার আর কোনো অসম্পূর্ণতা থাকবে না।

কলকাতা
২৯ নবেম্বর?
১৮৯৫

২৪৪

পতিসর
২৯ নবেম্বর। ১৮৯৫।

কালীগ্রাম জায়গাটির কথা অবশ্য আমার অনেক চিঠিতে অনেক বার পেয়েছিস তার আর সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু পুনরুক্তি না করলে চিঠিপত্র লেখা চলে না এবং হয়তো ঠিক পুনরুক্তি হবে না— কারণ, পুরাতন জিনিসও আমাকে নূতন করে আঘাত করে; আমার চিরপরিচিত প্রিয়পদার্থগুলির সঙ্গে প্রত্যেক পুনর্মিলনের মধ্যে একটা অংশ থাকে যেটা প্রথম মিলন, প্রত্যেক বারেই একটা নূতন বিস্ময় কোথা থেকে আবির্ভূত হয়। কালীগ্রাম স্থানটি ঠিক আমার প্রিয়পদার্থের মধ্যে নয়, কিন্তু তবু এখানে একবার এসে উপস্থিত হলে এর পুরাতন মুখশ্রী আমার কাছে একটি নবীন মনোহারিতা আনয়ন করে। এই অতি ছোটো নদী এবং নিতান্ত ঘোরো রকমের বহিঃপ্রকৃতি আমার কাছে বেশ লাগছে। ঐ অদূরেই নদী বেঁকে গিয়েছে— ওখানটিতে একটি ছোটোগ্রাম এবং গুটিকতক গাছ, এক তীরে পরিপকপ্রায় ধানের ক্ষেত, নদীর উঁচু পাড়ের উপর পাঁচ-ছটি গোরু ল্যাজ দিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে কচ্‌মচ্‌ শব্দে ঘাস খাচ্ছে, অন্য তীরে শূন্য মাঠ ধু ধু করছে— নদীর জলে শ্যাওলা ভাসছে, মাঝে মাঝে জেলেদের বাঁশ পোঁতা, বাঁশের উপর মাছরাঙা পাখি ছবির মতো স্থির হয়ে বসে রয়েছে, আকাশে উজ্জ্বল রৌদ্রে এক পাল চিল উড়ছে। দুপুর বেলা, সামনে গয়লাদের বাড়ির কাছে এক-খণ্ড সর্ষের ক্ষেতে বিকশিত সর্ষে ফুল একেবারে যেন আগুন করে রয়েছে— তাদের বাড়ির মেয়েরা জল তুলে নিয়ে গোরুর জাবনা দিচ্ছে, মাটি দিয়ে নিকোনো আঙিনায় বাঁধা গোরু গামলার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে জাব খাচ্ছে, খড় স্তূপাকার করা রয়েছে, গয়লাদের বাড়ির কাছে আমাদের কাছারির একটা পুষ্করিণী-খনন হচ্ছে, রঙিন-কাপড়-পরা হিন্দুস্থানি মেয়েরা মাথায় ঝুড়ি করে মাটি নিয়ে একটা ডোবার মধ্যে ফেলে যাচ্ছে। এখানে সমস্তই খুব কাছাকাছি। নদীটির এ দিকে, ও দিকে, দু দিকেই ব্যাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে একটি অনতিদীর্ঘ ঝিলের মতো দেখতে— এই ঝিলের দুই প্রান্তে দুটিমাত্র গ্রাম। আমি এই ঝিলটির মাঝখানে বসে দুটি গ্রামের সমস্ত দৈনন্দিন কার্যকলাপের দ্বারা বেষ্টিত। এই আমার সমস্ত জগৎ। এরা দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে, স্নান করছে, কাপড় কাচছে, ছোটো ডোঙায় চড়ে হাত দিয়ে জল কেটে ছোটো নদী পার হচ্ছে, অপরাহ্নে গৃহভিত্তির যে দিকটাতে ছায়া পড়ে সেই দিকে দীর্ঘকাল স্থিরভাবে বসে দুই-একটি কর্মহীন মেয়ে সম্মুখজগতের চলাচল দেখে বেলা কাটিয়ে দিচ্ছে, গ্রাম্য পাঠশালার ছেলেরা মলিন খাতাপত্রের পুঁটুলি হাতে বাড়ি ফিরছে— সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আলো জ্বলছে, গোয়ালে ধোঁওয়া দিচ্ছে, দুটি গ্রাম দুটি নীড়ের মতো নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে— আমি খড়্‌খড়েগুলো তুলে দিয়ে ভাইমার রাজসভায় গেটের কীর্তিকাহিনী অধ্যয়ন করছি। কোথায় নদীতীরে পতিসর, বোটের মধ্যে আমি, আর কোথায় বিচিত্র-কর্মসংকুল ভাইমার রাজসভার রাজকবি গেটে!

কলকাতা
৩০ নবেম্বর ১৮৯৫

২৪৫

সাহাজাদপুর
১৯ অগ্রহায়ণ। ১৩০২।

সকাল থেকে অত্যন্ত একটা পুরাতন কথা ক্রমাগতই মনে উদয় হচ্ছে যে, সংসারটা অনিত্য। কিন্তু তবু শোক দুঃখ মৃত্যু এমনভাবে আমাদের আঘাত করে, যেন সংসারটা নিত্য। সমস্ত মরীচিকা হোক, মায়া হোক, যাই হোক, তবু তো বিধবা স্ত্রীকে আপন শিশুসন্তানগুলিকে মানুষ করে তুলতে হবে—বেদান্তদর্শনে তো মায়ের মন থেকে স্নেহকে উড়িয়ে দিতে পারে না! মৃত্যু যতই অপ্রতিহত ক্ষমতাবান হোক, ভালোবাসার বন্ধন তো কম প্রবল নয়। অনাদিকাল থেকে পদে পদে পরাজয়ের পরেও স্থিরনিশ্চয়ের সঙ্গে বিফল বাসনার এই অনন্ত বিরোধ লেশমাত্র শিথিল হয় না কেন? আমি বসে বসে কল্পনাকে আর এক-শো-বৎসর-পরবর্তী ভবিষ্যতের মধ্যে প্রেরণ করছিলুম। ভাবছিলুম এক-শো বৎসরের আগের দিন, ১৭৯৫ খৃস্টাব্দের অগ্রহায়ণের সকাল বেলাটা ঠিক আমাদের আজকের দিনের মতো এই রকম প্রত্যক্ষ বর্তমান ছিল— এই রকম শীত, এই রকম রৌদ্র, এই রকম জনকোলাহল— কিন্তু আজকের সকালে সেই সকালের ছায়ামাত্রও নেই। তখনকার দিনেও কত উৎসব, কত শোক, কত জন্মমৃত্যু, কত হাসিকান্না জাজ্বল্যমান সত্য-রূপে দেখা দিয়েছিল। আবার ১৯৯৫ খৃস্টাব্দে একদিন ১৯শে অগ্রহায়ণের সকাল বেলাটি ঠিক যথাসময়ে জগৎসংসারের উপর প্রকাশিত হবে। এইরকম শিশিরসিক্ত ঘাস, এইরকম শীতের হাওয়া, এইরকম মৃদু রৌদ্র— কিন্তু সেদিন জ্ঞা...র মৃত্যু, তার অনাথা বিধবা এবং পিতৃহীন সন্তানদের কঠোরতম শোকদুঃখের ছায়ামাত্র স্মৃতিমাত্র থাকবে না— এবং আমিও এক-শো বৎসর আগের দিনে সকালে সম্পূর্ণ সজীব সত্য আকারে নিজেকে অসীম জগৎ ও অনাদিকালের কেন্দ্রবর্তী জ্ঞান করে আমার আত্মীয় বান্ধব ও প্রিয়পরিজনদের মধ্যে নিজেকে চিরপ্রতিষ্ঠিত অনুভব করছিলুম, সেদিন সকালের সমস্ত জাগ্রত মানবহৃদয়ের স্মৃতির মধ্যে আমার রেখামাত্র কোথায় থাকবে! আমার সেদিন শোক নেই, বাসনা নেই, পরিতাপ নেই— অথচ এই পৃথিবী এবং এই আকাশ আছে।

কলকাতা
৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫

২৪৬

কালীগ্রাম
[৬ ডিসেম্বর ১৮৯৫]

তোকে লিখেছিলুম কালীগ্রামের সমস্ত ছোটোখাটো এবং কাছাকাছি। কিন্তু সে কেবল যখন এই নদীর উপর বোটের মধ্যে থাকি। নদীটি ছোটো, দুই পাড় উঁচু, বোটটিও সংকীর্ণ, সেই জন্যে চারি দিকে বেশি দূর দেখা যায় না—কেবল একটি

ক্ষুদ্রায়তন গ্রাম্য ছবি চোখে পড়ে। কাল অনেক দিন পরে সূর্যাস্তের পর ওপারে পাড়ের উপর উঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম— সেখানে উঠেই হঠাৎ দেখলুম আকাশের আদি অন্ত নেই, জনহীন মাঠ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হা হা করছে— কোথায় আমার সেই দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম! কোথায় এক প্রান্তে সংকীর্ণ একটু জলের রেখা! শিলাই-দহের মাঠে গাছপালা গ্রাম বনের দর্শন পাওয়া যায়— এখানে কোথাও কিছু নেই, কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী, এবং তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা— মনে হয় যেন একটি সোনার-চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে। ধীরে ধীরে কত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত সাগর নগর বনের উপর দিয়ে যুগ যুগান্তর কাল সমস্ত গোল পৃথিবীটি, একাকিনী, স্তম্ভিত অশ্রুপূর্ণ ম্লান দৃষ্টিতে, মৌন মুখে, শ্রান্ত পদে, প্রদক্ষিণ করে আসছে— তার বর যদি নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন্ অনন্ত পশ্চিমের পারে তার পতিগৃহ! কাল হঠাৎ সেই মাঠের উপরে উঠে মাথার মধ্যে যেন একটা ছন্দ এবং সংগীত এবং কবিতা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কিন্তু তাকে আকারবদ্ধ করা হল না এবং করাও বোধ হয় অসম্ভব। সন্ধ্যার সমস্ত ঝিকিমিকি'কে গলিয়ে নিয়ে একটি সোনার প্রতিমা তৈরি করা যেমন অসাধ্য এও তেমনি অসাধ্য। আমার সেই অন্তরের উচ্ছ্বাস, পতিসরের প্রান্তরের উপর কালকের সেই নিঃশব্দ নিস্তব্ধ নির্জন সন্ধ্যার মধ্যে বিকীর্ণ হয়ে তারই সঙ্গে অস্তমিত হয়েছে। সেই সন্ধ্যাকাশের অসীম চিত্র-পটের উপরে আমার মন যদি তার নিজের দুই-একটা সোনালি রেখা এঁকে থাকে, সে কি আর দেখা যাবে? আবার আজ যখন সেই মাঠের মধ্যে সেই সন্ধ্যা দেখা দেবে তখন কালকের চিহ্ন সঙ্গে আনবে না।

কলকাতা
৭ ডিসেম্বর ১৮৯৫

২৪৭

জলপথে
শনিবার
[৭ ডিসেম্বর ১৮৯৫]

বোট আজ ভোরের বেলায় ছেড়ে দেওয়া গেছে— সংকীর্ণ নদী ছাড়িয়ে এখন বিস্তীর্ণ বিলের মধ্যে এসে পড়েছি। উজ্জ্বল রৌদ্র এবং কন্‌কনে শীতের হাওয়াটা বেশ লাগছে। সকাল বেলাকার ফুলের মতো শিশিরোজ্জ্বল জগৎটি আকাশের মধ্যে নববিকশিত দেখাচ্ছে। অনেক দিন পরে পতিসরের সেই ছোটো নদীগহ্বরটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে আমার মন আজকে তার সমস্ত ডানা আকাশে মেলে দিয়েছে, আমার বোট ভেসে চলেছে, আমি যেন এই স্নিগ্ধ নির্মল রৌদ্রের মধ্যে দিয়ে উড়ে চলেছি। এ জায়গাটাও অপূর্ব রকমের। স্থলে জলে সংলগ্ন যমজ ভাই-বোনের মতন— উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নেই, জলস্থল সমতল, খানিকটা ইস্পাতের মতো রৌদ্রে ঝিক্ ঝিক্ করছে আবার খানিকটা

নানাপ্রকার শ্যাওলায় ঘাসে উদ্ভিদ্‌মিশ্র মাটির স্তরে সবুজ হয়ে আছে। সাদা থেকে পাট্‌কিলে পর্যন্ত নানা জাতের বক ও চিল উড়ে বেড়াচ্ছে, পানকৌড়ি তার চিক্‌চিকে কালো লম্বা গ্রীবাটি নিয়ে একবার করে জলে ডুব মারছে এবং তার পরে বুক ফুলিয়ে অবলীলাগতিতে ভেসে বেড়াচ্ছে, বাঁশের উপরে জেলেদের জাল খাটানো রয়েছে—তারই উপর যত লম্বচঞ্চু মাছরাঙার আড্ডা। দেখতে দেখতে কোথায় এক জায়গায় দুই ধারের ডাঙা উঁচু হয়ে উঠল—জলে স্থলে ভাগ হয়ে গেল—মাঝখানে নদী, দুইধারে তীর, তীরে অঘ্রান মাসের হলদে ধানের ক্ষেত, উঁচু পাড়ের উপর একমনে ঘাড় হেঁট করে গোরু চরছে এবং তাদেরই মুখের গ্রাসের কাছাকাছি শালিখ পাখি নৃত্য করতে করতে কীটশিকারে প্রবৃত্ত—দ্বীপের মতো এক-এক খণ্ড উচ্চভূমির উপর গুটিকতক কলাগাছ এবং কুলগাছের মধ্যে কুষ্মাণ্ড-লতায় সমাকীর্ণ গুটি দুই-তিন খোড়ো ঘর, তারই অঙ্গনে দাঁড়িয়ে উলঙ্গ শিশু এবং কৌতূহলী বধূগণ বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার বোট নিরীক্ষণ করছে—সাদা-কালো রঙের পাতিহাঁস জলের ধারে দল বেঁধে ঠোঁটের খোঁচা দিয়ে শশব্যস্তে পিঠের পালকগুলি পরিষ্কার করছে, দূরে বাঁশঝাড় এবং ঘনতরুশ্রেণী দিগন্ত অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে—খানিকটা দূর দুই ধারে শূন্য মাঠ—আবার হঠাৎ এক জায়গায় ছেলেদের চেঁচামেচি, স্নানার্থিনী মেয়েদের কলহাস্যালাপ, শোকাতুরা প্রৌঢ়ার বিলাপধ্বনি, কাপড় কাচার ছপ্‌ছপ্‌—স্নানাভিহত জলের ছল্‌ছল্‌ শব্দ শুনে মুখ তুলে দেখি ঘনচ্ছায়া গ্রামের ধারে একটি ঘাট এসেছে, গোটা দুয়েক নৌকো বাঁধা আছে এবং অনিচ্ছুক রোরুদ্যমান ছেলের নড়া ধরে তার মা জোর করে স্নান করাচ্ছে।

কলকাতা
৮ ডিসেম্বর ১৮৯৫

২৪৮

শিলাইদহ-জলপথে
[রবিবার, ৮ ডিসেম্বর ১৮৯৫]

কাল থেকে জলপথেই আছি। আশা ছিল আজ শিলাইদহে পৌঁছব, কিন্তু তার কোনো লক্ষণ দেখছি নে। সেজন্যে দুঃখ করতে চাই নে—পথের মধ্যে যে ক'টা দিন পাওয়া যায় সেই ক'দিন আমার পক্ষে অবিমিশ্র ছুটি—স্বেচ্ছাকৃত চিন্তা এবং কাজ ছাড়া কোনো কর্তব্যই নেই। দুই জানলা দিয়ে চেয়ে দেখছি, পড়ছি এবং লিখছি—চারি দিকে ধূসর চর এবং ঈষৎ নীল জল, দূরে সবুজ গ্রাম এবং ঊর্ধ্বে নীল আকাশ। মাঝে মাঝে দু-চার জায়গায় আশঙ্কার স্পর্শও পাওয়া গিয়েছিল—শীতে পদ্মার জল কমে আসছে কিনা, সেই জন্যে সংকীর্ণ প্রবাহ স্থানে স্থানে প্রচণ্ড বেগ ধারণ করেছে। জল যেন ইস্পাতের করাতের মতো বোটের তলাটা খর্‌খর্‌ শব্দে কাটতে কাটতে চলেছে। সেই তীব্রগতি জলের দিকে চেয়ে দেখলে চোখের ত্বকে যেন আঘাত লাগতে থাকে। সমস্ত দিন আমার খসড়া কবিতার খাতাটা খুলে পেন্সিল হাতে যখন-তখন দু-চার লাইন করে লিখছি, এবং তার

পরে অলসভাবে কোনো একটা দিকে চেয়ে আছি। আজ ভোর চারটের সময় ঘুম ভেঙে গেল— উঠে কতকগুলো গরম কাপড় জড়িয়ে বাতি জেবলে উর্বশী-নামক একটা কবিতা শেষ করে ফেললুম, যখন সাড়ে সাতটা তখন স্নান করতে গেলুম— এমনি করে এই দু দিনে দুটি বেশ বড়োসড়ো রকমের কবিতা শেষ করে ফেলেছি। সমস্ত দিন খোলা আকাশ এবং অজস্র আলোকের মধ্যে এই রকম অবিশ্রাম অখণ্ড অবসর পেলে তবে প্রকৃতি যে রকম করে তার ফুল ফোটায় এবং ফল পাকায় সেই রকম করে সমস্ত রঙ ফলিয়ে এবং রস রসিয়ে কবিতার পরিণতি সাধন করা যায়। নইলে ভিতরে ভিতরে সর্বদা একটা তাড়া থাকে— ইচ্ছাক্রমে এবং অনিচ্ছাক্রমে মন এমন-সকল পথ এবং বিপথে ধাবিত ও তাড়িত হয় যেখানে কল্পনার সহায়কারী কিছুই নেই। তাই এক-একবার মনে করি, বোটে করে যদি মাসখানেক মাস-দেড়েকের মতো একেবারে পশ্চিমে চলে যাই— বাড়ির সমস্ত খবর এবং কাজকর্মের সমস্ত আলোচনা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিই— বিস্মৃতি এবং বিরামের মধ্যে, সুদূরে উড্ডীয়মান পাখির মতো একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাই— তা হলে প্রভূত অবসরের মধ্যে কতকগুলো লেখা শেষ করে আসতে পারি। লেখার চেয়ে প্রবলতর কর্তব্য আমার আর কিছুই নেই। আমার অন্তঃকরণের ভিতরে এই অনুশাসনটি গ্রহণ করে আমি সংসারক্ষেত্রে এসেছি— যখন সেটা পালন করি তখন সুখদুঃখ সমস্তই লঘু হয়ে আসে, যখন না করি তখন সুখদুঃখের দল এক-পাল ভালকুত্তার মতো একেবারে কণ্ঠ চেপে ধরতে আসে— মানুষের উপর এ এক বিষম জুলুম!

কলকাতা
১৪ ডিসেম্বর [?]
১৮৯৫

২৪৯

সাহাজাদপুর-পথে
[১১ ডিসেম্বর ১৮৯৫]

ওরে বাস্ রে! কী তুমুল ব্যাপার! এইমাত্র কাঁচিকাটা পার হওয়া গেল— একটা মস্ত ফাঁড়া কেটে গেল। এ জায়গাটা একটা সংকীর্ণ খালের মতো, আঁকাবাঁকা— এইটুকুর ভিতর দিয়ে বিপুল জলস্রোত ফেনিয়ে ফুলে একেবারে যেন ঝর্নার মতো ঝরে পড়ছে— ক্রুদ্ধ জল সমস্ত বোটটাকে একেবারে কেড়ে-ছিঁড়ে ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে চলে— বিদ্যুতের মতো ছুটে যায়, কী হল কী হচ্ছে কিছু বোঝবার অবসর পাওয়া যায় না— মাঝিমাল্লার মধ্যে একটা কেবল হৈ-হৈ হাঁ-হাঁ রব ওঠে— জল কল্‌কল্ গল্‌গল্ করতে থাকে, বুকের মধ্যে প্রাণটা নিশ্বাস রুদ্ধ করে স্তম্ভিত হয়ে থাকে, তার পরে মিনিট দশেকের মধ্যে সংকটের জায়গা উত্তীর্ণ হয়ে নিরাপদের ক্রোড়ের মধ্যে একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে পড়তে হয়। কালীগ্রামের বিলগুলো ছাড়িয়ে এবারে নদীর মধ্যে এসেছি। এখন আঁকাবাঁকা উঁচু পাড়ের মাঝখান দিয়ে দুই তীরে পাকা ধান এবং বিকশিত সর্ষেক্ষেতের প্রান্ত দিয়ে অনুকূল স্রোতে

হুহুঃশব্দে চলে যাব। এই সর্ষেক্ষেতের গন্ধটি আমাকে ভারী মুগ্ধ করে, আমার মনে কী-একটা ছবি এবং সৌন্দর্যের আবেশ আনয়ন করে— যেন অনেক দিনের দেখা একটা রৌদ্ররঞ্জিত মাঠ, শীতল স্নিগ্ধ বাতাস, পুষ্করিণীর ধার দিয়ে বাঁকা গ্রামের পথ, ঘটকক্ষ অবগুণ্ঠিত বধূ এবং সেই সঙ্গে ঐ সর্ষেক্ষেতের মৃদু সুগন্ধে অনুপ্রবিষ্ট একটি উদার নির্মল আকাশ মনে পড়ে— যেন কোন্‌-এক সময়ের পরিতৃপ্ত প্রেম এবং পরিপূর্ণ শান্তির সুগভীর সুখস্মৃতি ঐ সর্ষেফুলের গন্ধের সঙ্গে জড়িত আছে।

কলকাতা
১২ ডিসেম্বর ১৮৯৫

২৫০

শিলাইদহ
১২ ডিসেম্বর। ১৮৯৫।

সেদিন একটা অতি সামান্য এবং ছোটো ঘটনায় আমার হঠাৎ ভারী চমক লেগে গিয়েছিল। আমি তোকে পূর্বেই লিখেছি আজকাল আমি সন্ধ্যার সময় বোটের মধ্যে বাতি জেবলে, যতক্ষণ না ঘুম পায়, বসে বসে পড়ি— কারণ, নিজের বিজন সঙ্গ সকল সময়, বিশেষত সন্ধ্যার সময়, সকল অবস্থায় প্রার্থনীয় নয়। প্রবাদ আছে, কাজ না থাকলে লোকে জ্যাঠাইমার গঙ্গাযাত্রা করে— সুবিধামত অনাবশ্যক জ্যাঠাইমা প্রায়ই হাতের কাছে পাওয়া যায় না, তখন নিজের মনটাকেই নিয়ে পড়তে হয়— আমি তার চেয়ে বই নিয়ে পড়াই শ্রেয়স্কর মনে করি। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় একখানা ইংরাজি সমালোচনার বই নিয়ে কবিতা সৌন্দর্য আর্ট্‌ প্রভৃতি মাথামুণ্ডু নানা কথার নানা তর্ক পড়া যাচ্ছিল— এক-এক সময় এই সমস্ত মর্মগত কথার বাজে আন্দোলন পড়তে পড়তে শ্রান্তচিত্তে সমস্তই মরীচিকাবৎ শূন্য বোধ হয়— মনে হয় এর বারো-আনা কথা বানানো, শুধু কথার উপরে কথা। সেদিনও পড়তে পড়তে মনটার ভিতরে একটা নীরস শ্রান্তির উদ্রেক হয়ে একটা বিদ্রূপপরায়ণ সন্দেহ-শয়তানের আবির্ভাব হয়েছিল। এ দিকে রাত্রিও অনেক হওয়াতে বইটা ধাঁ করে মুড়ে ধপ্‌ করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে শুতে যাবার উদ্দেশে এক ফুৎকারে বাতি নিবিয়ে দিলুম। নিবিয়ে দেবা মাত্রই হঠাৎ চারি দিকের সমস্ত খোলা জানলা থেকে বোটের মধ্যে জ্যোৎস্না একেবারে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠল। এমন অপূর্ব আশ্চর্য বোধ হল! আমার ক্ষুদ্র একরত্তি বাতির শিখা শয়তানের মতো নীরস হাসি হাসছিল, অথচ সেই অতিক্ষুদ্র বিদ্রূপহাসিতে এই বিশ্বব্যাপী গভীর প্রেমের অসীম হাসি একেবারে আড়াল করে রেখেছিল! নীরস গ্রন্থের বাক্যরাশির মধ্যে কী খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম— যাকে খুঁজছিলুম সে কতক্ষণ থেকে বাইরে সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। যদি দৈবাৎ না দেখে অন্ধকারের মধ্যে শুতে যেতুম, তা হলেও সে আমার সেই ক্ষুদ্র বর্তিকাশিখার কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করে নীরবেই অস্ত যেত। যদি ইহজীবন নিমেষের জন্যও তাকে না দেখতে পেতুম এবং শেষ দিনের অন্ধকারের মধ্যে শেষ বারের মতো শুতে যেতুম তা হলেও সেই বাতির

আলোরই ভিত থেকে যেত, অথচ সে সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত করে সেই রকম নীরবে সেই রকম মধুর মুখেই হাস্য করত— আপনাকে গোপনও করত না, আপনাকে প্রকাশও করত না।

তার পর থেকে আজকাল সন্ধ্যাবেলায় বাতির আলো নিবোতে আরম্ভ করেছি।

কলকাতা
১৩ ডিসেম্বর ১৮৯৫

২৫১

শিলাইদহ
১৪ ডিসেম্বর। ১৮৯৫।

আজকাল আমি আমার লেখা এবং আলস্যের মাঝে মাঝে কবি কীট্‌সের একটি ক্ষুদ্র জীবনচরিত অল্প অল্প করে পাঠ করি। পাছে এক দমে একেবারে শেষ হয়ে যায় সেই জন্যে রেখে রেখে রয়ে রয়ে পড়ি— পড়তে বেশ লাগে। আমি যত ইংরাজ কবি জানি সব চেয়ে কীট্‌সের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আমি বেশি করে অনুভব করি। তার চেয়ে অনেক বড়ো কবি থাকতে পারে, অমন মনের মতো কবি আর নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে বেচারা অল্প দিন বেঁচে ছিল, এবং অল্পই লিখতে সময় পেয়েছিল।...কীট্‌সের ভাষার মধ্যে যথার্থ আনন্দসম্ভোগের একটি আন্তরিকতা আছে। ওর আর্টের সঙ্গে আর হৃদয়ের সঙ্গে বেশ সমতানে মিশেছে— যেটি তৈরি করে তুলেছে সেটির সঙ্গে বরাবর তার হৃদয়ের একটি নাড়ীর যোগ আছে। টেনিসন সুইন্‌বর্ন্‌ প্রভৃতি অধিকাংশ আধুনিক কবির অধিকাংশ কবিতার মধ্যে একটা পাথরে-খোদা ভাব আছে— তারা কবিত্ব করে লেখে এবং সে লেখার প্রচুর সৌন্দর্য আছে, কিন্তু কবির অন্তর্যামী সে লেখার মধ্যে নিজের স্বাক্ষর-করা সত্যপাঠ লিখে দেয় না। টেনিসনের 'মড' কবিতায় যে-সমস্ত লিরিকের উচ্ছ্বাস আছে সেগুলি বিচিত্র এবং সুতীব্র হৃদয়বৃত্তি-দ্বারা উচ্ছলরূপে পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু তবু মিসেস ব্রাউনিঙের সনেটগুলি তার চেয়ে ঢের বেশি অন্তরঙ্গরূপে সত্য। টেনিসনের অচেতন কবি যে-সমস্ত ছত্র লেখে টেনিসনের সচেতন আর্টিস্ট্‌ তার উপর নিজের রঙিন তুলি বুলিয়ে সেটাকে ক্রমাগতই আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে। কীট্‌সের লেখায় কবিহৃদয়ের স্বাভাবিক সুগভীর আনন্দ তার রচনার কলা-নৈপুণ্যের ভিতর থেকে একটা সজীব উজ্জ্বলতার সঙ্গে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। সেইটে আমাকে ভারী আকর্ষণ করে। কীট্‌সের লেখা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নয় এবং তার প্রায় কোনো কবিতারই প্রথম ছত্র থেকে শেষ ছত্র পর্যন্ত চরমতা প্রাপ্ত হয় নি, কিন্তু একটি অকৃত্রিম সুন্দর সজীবতার গুণে আমাদের সজীব হৃদয়কে এমন ঘনিষ্ঠ সঙ্গদান করতে পারে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে কীট্‌সের জীবনচরিতটি তোকে পড়তে দেব। ওর অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র জীবনটি বড়ো সকরুণ।

কলকাতা
১৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫

২৫২

শিলাইদহ
১৫ ডিসেম্বর। ১৮৯৫।

ঐ

দিনটা এই রকম কাটে। তার পরে সন্ধ্যাবেলায় দাঁড় টেনে ও পারে চরে গিয়ে বেড়িয়ে ফিরে আসতে আসতে রাত হয়ে যায়। ও পার থেকে নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধ নদী এবং পরপারের গাছপালার উপর সন্ধ্যাবেলাটি যে কী অপরূপ সুন্দর তা অনেকবার বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে বর্ণনার অতীত— সেই সৌন্দর্য এবং শান্তি দূরে থেকে কল্পনা করাই যায় না। কলকাতায় গিয়ে আমিই হয়তো ঠিক মনে আনতে পারব না। কাল সন্ধ্যাবেলায় যখন এই সান্ধ্যপ্রকৃতির মধ্যে সমস্ত অন্তঃকরণ পরিপ্লুত হয়ে জলিবোটে করে সোনালি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে ফিরে আসছি এমন সময়ে হঠাৎ দূরের এক অদৃশ্য নৌকো থেকে বেহালা যন্ত্রে প্রথমে পূরবী ও পরে ইমনকল্যাণে আলাপ শোনা গেল— সমস্ত স্থির নদী এবং স্তব্ধ আকাশ মানুষের হৃদয়ে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ইতিপূর্বে আমার মনে হচ্ছিল মানুষের জগতে এই সন্ধ্যাপ্রকৃতির তুলনা বুঝি কোথাও নেই— যেই পূরবীর তান বেজে উঠল অমনি অনুভব করলুম এও এক আশ্চর্য গভীর এবং অসীম সুন্দর ব্যাপার, এও এক পরম সৃষ্টি— সন্ধ্যার সমস্ত ইন্দ্রজালের সঙ্গে এই রাগিণী এমনি সহজে বিস্তীর্ণ হয়ে গেল, কোথাও কিছুই ভঙ্গ হল না— আমার সমস্ত বক্ষস্থল ভরে উঠল। বোটে ফিরে এসে অনেক দিন পরে আবার একবার হার্মোনিয়মটা নিয়ে বসলুম। একে একে নতুন-তৈরি-করা অনেকগুলো গান নিচু সুরে আস্তে আস্তে গেয়ে গেলুম— ইচ্ছে হল আবার কতকগুলো গান তৈরি করে ফেলি, কিন্তু সে আর হয়ে উঠছে না।

কলকাতা
১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৫

ভানুসিংহের পত্রাবলী

ভূমিকা

পত্রধারার দ্বিতীয় পর্যায়ের চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল একটি বালিকাকে। সে চিঠির বেশির ভাগ লেখা শান্তিনিকেতন থেকে। তাই সেগুলির মধ্যে দিয়ে স্বতই বয়ে চলেছে শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার চলচ্ছবি। এগুলিতে মোটা সংবাদ বেশি কিছু নেই, হাসিতামাশায় মিশিয়ে আছে সেখানকার আবহাওয়া, জড়িয়ে আছে সাংসারিক ব্যাপারে আনাড়ি মেয়েটির ছেলেমানুষির আভাস; আর তারই সঙ্গে লেখকের সকৌতুক স্নেহ। বিশেষ কিছু বলতে হবে না মনে করে হালকা মনে আটপৌরে রীতিতে যা বলা যেতে পারে তাকে কোনো শান-বাঁধানো পাকা সাহিত্যিক রাস্তায় প্রকাশ করবার উপায় নেই।

১৩৪৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎসর্গ

এই পত্রগুলি দিয়ে যে পত্রপুট গাঁথা হয়েছে
তার মধ্যে রানুর প্রতি ভানুদাদার
আশীর্বাদ পূর্ণ রইল

১

শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠির জবাব দেব বলে চিঠিখানি যত্নসহকারে রেখেছিলুম, কিন্তু কোথায় রেখেছিলুম সে কথা ভুলে যাওয়াতে এতদিন দেরি হয়ে গেল। আজ হঠাৎ খুঁজতেই ডেস্কের ভিতর হতে আপনিই বেরিয়ে পড়ল।

কবি-শেখরের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেচ। রাজকন্যার সঙ্গে নিশ্চয় তার বিয়ে হত, কিন্তু তার পূর্বেই সে মরে গিয়েছিল। মরাটা তার অত্যন্ত ভুল হয়েছিল, কিন্তু সে আর এখন শোধরাবার উপায় নেই। যে-খরচে রাজা তার বিয়ে দিত সেই খরচে খুব ধুম করে তার অন্ত্যেষ্টি সৎকার হয়েছিল।

ক্ষুধিত পাষাণে ইরাণী বাঁদির কথা জানবার জন্যে আমারও খুব ইচ্ছে আছে কিন্তু যে-লোকটা বলতে পারত আজ পর্যন্ত তার ঠিকানা পাওয়া গেল না।

তোমার নিমন্ত্রণ আমি ভুলব না—হয়তো তোমাদের বাড়িতে একদিন যাব, কিন্তু তার আগে তুমি যদি আর-কোনো বাড়িতে চলে যাও? সংসারে এই রকম করেই গল্প ঠিক জায়গায় সম্পূর্ণ হয় না।

এই দেখ না কেন, খুব শীঘ্রই তোমার চিঠির জবাব দেব বলে ইচ্ছা করেছিলুম, কিন্তু এমন হতে পারত তোমার চিঠি আমার ডেস্কের কোণেই লুকিয়ে থাকত, এবং কোনোদিনই তোমার ঠিকানা খুঁজে পেতুম না।

যেদিন বড়ো হয়ে তুমি আমার সব বই পড়ে বুঝতে পারবে তার আগেই তোমার নিমন্ত্রণ সেরে আসতে চাই। কেননা যখন সব বুঝবে তখন হয়তো সব ভালো লাগবে না—তখন যে-ঘরে তোমার ভাঙা পুতুল থাকে সেই ঘরে রবিবাবুকে স্থান দেবে।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ৩রা ভাদ্র ১৩২৪।

২

কলিকাতা

আমার একদিন ছিল যখন আমি ছোটো ছিলুম—তখন আমি ঘন ঘন এবং বড়ো বড়ো চিঠি লিখতুম। তুমি যদি তার আগে জন্মাতে, যদি অনর্থক এত দেরি না করতে, তাহলে আমার চিঠির উত্তরের জন্য একদিনও সবুর করতে হত না। আজ আর চিঠি লেখবার সময় পাইনে। তোমার বয়স আমার যখন ছিল তখন নিজের ইচ্ছেয় চিঠি লিখতুম, এখন অন্যের ইচ্ছেয় এত বেশি লিখতে হয় যে, নিজের ইচ্ছেটা মারাই গেল। তারপরে আবার ভয়ানক কুঁড়ে হয়ে গেছি। যত বেশি কাজ করতে হচ্চে ততই কুঁড়েমি আরো বেড়ে যাচ্চে। এখন লিখে যাওয়ার চেয়ে বকে যাওয়া ঢের বেশি সহজ মনে হয়। যদি তেমন সুবিধে হত

দেখিয়ে দিতুম বকুনিতে তুমি কখনো আমার সঙ্গে পেরে উঠতে না। সেটা তোমার ভালো লাগত কিনা বলতে পারিনে। কেননা তোমার যতগুলি পুতুল আছে তারা কেউ তোমার কথার জবাব করে না। তুমি যা বল তাই তারা চুপ করে শুনে যায়। আমার দ্বারা কিন্তু সেটা হবার জো নেই—অন্যের কথা শোনার চেয়ে অন্যকে কথা শোনানো আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। আমার বড়ো মেয়ে যখন ছোটো ছিল তখন বকুনিতে তার সঙ্গে পারতুম না, কিন্তু এখন সে বড়ো হয়ে শ্বশুর-বাড়ি চলে গেছে। তারপর থেকে আমার সমকক্ষ কাউকে পাইনি। তোমাকে পরীক্ষা করে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে রইল। একদিন হয়তো তোমাদের শহরে যাব। তুমি লিখেচ আমাকে গাড়িতে করে নিয়ে যাবে। কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখি আমাকে দেখতে নারদ মুনির মতো—মস্ত বড়ো পাকা দাড়ি। ভয় কোরো না, আমি তার মতোই ঝগড়াটেও বটে, কিন্তু ছোটো মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করা আমার স্বভাব নয়। তোমার কাছে খুব ভালো মানুষটির মতো থাকবার আমি খুব চেষ্টা করব—এমন কি কবিশেখরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়েতে যদি তোমার মত থাকে আমি স্বয়ং তার ঘটকালি করে দিতে রাজি আছি। ইতি ২১শে ভাদ্র, ১৩২৪।

৩

কলিকাতা

তোমার সঙ্গে চিঠি লিখে জিততে পারব না এ আমি আগে থাকতে বলে রাখ্‌চি। তোমার মতো বাসন্তী রঙের কাগজ আমি খুঁজে পেলুম না। সামান্য সাদা কাগজই সব সময় খুঁজে পাইনে। তোমাকে তো আগেই বলেচি, আমি কুঁড়ে। তারপরে, আমি ভারি এলোমেলো,—কোথায় কী রাখি তার কোনো ঠিকানা পাইনে। এমন আমার আরো অনেক দোষ আছে। এই তো চিঠির কাগজের কথা। তারপরে ভেবেছিলুম ছবি এঁকে তোমার সচিত্র চিঠির উপযুক্ত জবাব দেব—চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলুম অহংকার বজায় থাকবে না। এ বয়সে নতুন করে হাঁস আঁকতে বসা আমার পক্ষে চলবে না। গ—অক্ষরের পেটের নিচে খণ্ডত জুড়েও সুবিধে করতে পারলুম না—সেটা এই রকম বিশ্রী দেখতে হল। অনেক সময় পদ্মার চরে কাটিয়েচি; সেখানে হাঁসের দল ছাড়া আমার আর সঙ্গী ছিল না। তাদের প্রতি আমার মনের কৃতজ্ঞতা থাকাতেই আমাকে আজ থেমে যেতে হল—এবারকার মতো তোমার হাঁসেরই জিত রইল। এই ত গেল ছবি, তারপরে সময়। তাতেও তোমার সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না। তাই ভয় হচ্চে শেষকালে তুমি রাগ করে আর-কোনো গল্প-লিখিয়ে গ্রন্থকারের সঙ্গে ভাব করবে —কিন্তু নিমন্ত্রণ আমার পাকা রইল।

৪

কলিকাতা

তুমি দেরি করে আমার চিঠির উত্তর দিয়েছিলে এতে আমার রাগ করাই উচিত ছিল, কিন্তু রাগ করতে সাহস হয় না—কেননা আমার স্বভাবে অনেক দোষ আছে—দেরি করে উত্তর দেওয়া তার মধ্যে একটি। আমি জানি তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি অনেক সহ্য করতে পার; আমার কুঁড়েমি, আমার ভোলা-স্বভাব, আমার এই সাতান্ন বছর বয়সের যত রকম শৈথিল্য সব তোমাকে সহ্য করতে হবে। আমার মতো অন্যমনস্ক অকেজো মানুষের সঙ্গে ভাব রাখতে হলে খুব সহিষ্ণুতা থাকা চাই—চিঠির উত্তর যত পাবে তার চেয়ে বেশি চিঠি লেখবার মতো শক্তি যদি তোমার না থাকে, দেনাপাওনা সম্বন্ধে তোমার হিসাব যদি খুব বেশি কড়াক্কড় হয় তাহলে একদিন আমার সঙ্গে হয়তো ঝগড়া হতেও পারে, এই কথা মনে করে ভয়ে ভয়ে আছি। কিন্তু এ কথা আমি জোর করে বলচি যে, ঝগড়া যদি কোনোদিন বাধে তার অপরাধটা আমার দিকে ঘটতে পারে, কিন্তু রাগটা তোমার দিকেই হবে। আর যা হোক আমি রাগী নই। তার কারণ এ নয় যে, আমি খুব ভালোমানুষ, তার কারণ এই যে, আমার স্মরণশক্তি ভারি কম। রাগ করবার কারণ কী ঘটেচে সে আমি কিছুতেই মনে রাখতে পারি নে। তুমি মনে করো না কেবল পরের সম্বন্ধেই আমার এই দশা, নিজের দোষের কথা আমি আরো বেশি ভুলি। চিঠির জবাব দিতে যখন ভুলে যাই তখন মনেও থাকে না যে ভুলে গেছি; কর্তব্য করতে ভুলি, ভুল সংশোধন করতেও ভুলি, সংশোধন করতে ভুলেচি তাও ভুলি। এমন অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব কর এবং সে বন্ধুত্ব যদি স্থায়ী রাখতে চাও তাহলে তোমাকেও অনেক ভুলতে হবে, বিশেষত চিঠির হিসাবটা।

পদ্মার ধারের হাঁসেদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হল কী করে জিজ্ঞাসা করেচ। বোধ হয় তার কারণ এই যে, বোবার শত্রু নেই। ওরা যখন খুব দল বেঁধে চেঁচামেচি করে আমি চুপ করে শুনি, একটিও জবাব দিইনে। আমি এত বেশি শান্ত হয়ে থাকি যে, ওরা আমাকে মানুষ বলেই গণ্যই করে না—আমাকে বোধ হয় পাখির অধম বলেই জানে—কেননা আমার দুই পা আছে বটে কিন্তু ডানা নেই। আর যাই হোক ওদের সঙ্গে আমার চিঠিপত্র চলে না—যদি চলত তাহলে আমাকেই হার মানতে হত—কেননা ওদের ডানাভরা কলম আছে, আর ওদের সময়ের টানাটানি খুব কম।

তোমাকে-যে এত বড়ো চিঠি লিখলুম আমার ভয় হচ্ছে পাছে বিশ্বাস না কর যে আমার সময় কম। অনেক কাজ পড়ে আছে—কাজ ফাঁকি দিয়েই তোমাকে চিঠি লিখচি—কাজ যদি না থাকত তাহলে কাজ ফাঁকি দেওয়াও চলত না।

বেলা অনেক হয়ে গেছে—অনেক আগে স্নান করতে যাওয়া উচিত ছিল—হাঁসেদের কথায় হঠাৎ স্নানের কথাটা মনে পড়ে গেল—তাহলে আজ চললুম। আজ রাত্রে বোলপুর যেতে হবে। ইতি ৬ই কার্তিক, ১৩২৪।

৫

শান্তিনিকেতন

তোমাদের বইয়ে বোধ হয় পড়ে থাকবে, পাখিরা মাঝে মাঝে বাসা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের ওপারে চলে যায়। আমি হচ্চি সেই-জাতের পাখি। মাঝে মাঝে দূর পার থেকে ডাক আসে, আমার পাখা ধড়ফড় করে ওঠে। আমি এই বৈশাখ মাসের শেষ দিকে জাহাজে চড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেব বলে আয়োজন করচি। যদি কোনো বাধা না ঘটে তাহলে বেরিয়ে পড়ব। পশ্চিম দিকের সমুদ্রপথ আজ-কাল যুদ্ধের দিনে সকল সময়ে পারের দিকে পৌঁছিয়ে দেয় না, তলার দিকেই টানে। পূর্ব দিকের সমুদ্রপথ এখনো খোলা আছে—কোন্‌দিন হয়তো দেখব সেখানেও যুদ্ধের ঝড় এসে পৌঁছেচে। যাই হোক তোমার কাশীর নিমন্ত্রণ-যে ভুলেচি তা মনে কোরো না; তুমি আয়োজন ঠিক করে রেখো, আমি কেবল এক-বার পথের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দুটো চারটে জায়গায় নিমন্ত্রণ চট্‌ করে সেরে নিয়ে তারপরে তোমার ওখানে গিয়ে বেশ আরাম করে বসব—আমার জন্যে কিন্তু ছাতু কিংবা রুটি, অড়রের ডাল এবং চাটনির বন্দোবস্ত করলে চলবে না; তোমাদের মহারাজ নিশ্চয়ই খুব ভালো রাঁধে, কিন্তু তুমি যদি নিজে স্বহস্তে শুকতানি থেকে আরম্ভ করে পায়স পর্যন্ত রেঁধে না খাওয়াও তাহলে সেই মুহূর্তেই আমি—কী করব এখনো তা ঠিক করিনি—ভাবছিলুম না খেয়েই সেই মুহূর্তেই আবার অস্ট্রেলিয়া চলে যাব—কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখতে পারব কিনা একটু সন্দেহ আছে সেইজন্যেই এখন কিছু বললুম না। কিন্তু রান্না অভ্যাস হয়নি বুঝি? তাই বল। কেবলি পড়া মুখস্থ করচ? আচ্ছা, অন্তত এক বছর সময় দিলুম—এর মধ্যেই মার কাছে শিখে নিয়ো। তাহলে সেই কথা রইল, আপাতত আমাকে কলকাতায় যেতে হবে, বাক্সগুলো গুছিয়ে ফেলা চাই। আমি খুব ভালো গোছাতে পারি। কেবল আমার একটু যৎসামান্য দোষ আছে—প্রধান-প্রধান দরকারী জিনিসগুলো প্যাক করতে প্রায়ই ভুলে যাই—যখন তাদের দরকার হয় ঠিক সেই সময় দেখি তাদের আনা হয়নি। এতে বিষম অসুবিধা হয় বটে কিন্তু গোছাবার ভারি সুবিধে—কেননা বাক্সের মধ্যে যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায়, আর বোঝা কম হওয়াতে রেলভাড়া জাহাজভাড়া অনেক কম লাগে। দরকারী জিনিস না নিয়ে অদরকারী জিনিস সঙ্গে নেবার আর-একটা মস্ত সুবিধে হচ্চে এই যে—সেগুলো বারবার বের-করাকরির দরকার হয় না, বেশ গোছানোই থেকে যায়; আর যদি হারিয়ে যায় কিংবা চুরি যায় তাহলেও কাজের বিশেষ ব্যাঘাত কিংবা মনের অশান্তি ঘটে না। আজ আর বেশি লেখবার সময় নেই, কেননা আজ তিনটের গাড়িতেই রওনা হতে হবে। গাড়ি ফেল করবার আশ্চর্য ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু সে ক্ষমতাটা আজকে আমার পক্ষে সুবিধার হবে না; অতএব তোমাকে নববর্ষের আশীর্বাদ জানিয়ে আমি টিকিট কিনতে দৌড়লুম। ইতি ২রা বৈশাখ, ১৩২৫।

৬

শান্তিনিকেতন

কাল সন্ধ্যাবেলায় স্তরে স্তরে গাঢ় নীল মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল— তখন নিচের সেই পূর্বদিকের বারান্দায় সাহেবে আমাতে মিলে খাচ্ছিলুম—আমার আর-সব খাওয়া হয়ে গিয়ে যখন চিঁড়েভাজা খেতে আরম্ভ করেচি এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে সোঁ সোঁ করে হাওয়া এসে সমস্ত কালো মেঘ আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিছিয়ে দিলে। কতদিন পরে ঐ সজল মেঘ দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। যদি আমি তোমাদের কাশীর হিন্দুস্থানী মেয়ে হতুম তাহলে কাজ্‌রি গাইতে গাইতে শিরীষগাছের দোলাটাতে দুলতে যেতুম। কিন্তু এণ্ডরুজ্‌ কিংবা আমি, আমাদের দুজনের কারো হিন্দুস্থানী মেয়ের মতো আকৃতি প্রকৃতি কিংবা চালচলন নয়, তা ছাড়া সে কাজ্‌রি গান জানে না, আমিও যা জানতুম ভুলে গেচি। তাই দু-জনে মিলে উপরে আমার ছাদের সামনেকার বারান্দায় এসে বসলুম। দেখতে দেখতে ঘনবৃষ্টি নেমে এল—জলে বাতাসে মিলে আকাশময় তোলপাড় করে বেড়াতে লাগল। আমার ছাদের সামনেকার পেঁপে গাছটার লম্বা পাতাগুলোকে ধরে ঠিক যেন কানমলা দিতে লাগল। শেষকালে বৃষ্টি প্রবল হয়ে গায়ে যখন ছাঁট লাগতে আরম্ভ হল, তখন আমার সেই কোণটাতে এসে আশ্রয় নিলুম। এমন সময় চোখ ধাঁদিয়ে কড়কড় শব্দে প্রকাণ্ড একটা বাজ পড়ল। আমাদের মনে হল বাগানের মধ্যেই কোথাও পড়েচে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে দেখি হরিচরণ পণ্ডিতের বাসার দিকে ছেলেরা ছুটচে। সেই বাড়িতেই বাজ পড়েছিল। তখন তাঁর বড়ো মেয়ে উনানে দুধ জ্বাল দিচ্ছিলেন, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ছেলেরা দূর থেকে দেখতে পেলে চালের উপর থেকে ধোঁয়া উঠতে আরম্ভ হয়েচে। তারা তো সব চালের উপর চড়ে 'জল জল' করে চীৎকার করতে লাগল। ছেলেরা কুয়ো থেকে জল ভরে এনে চালের উপর আগুন নিবিয়ে ফেললে। ভাগ্যে, হরিচরণের বাড়ির কাউকে আঘাত লাগেনি। কেবল হরিচরণের মেয়ের হাত একটু পুড়ে ফোসকা পড়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে ভালো লেগেছিল আমার ছেলেদের উদ্‌যোগ দেখে। তাদের না আছে ভয়, না আছে ক্লান্তি। নির্ভয়ে হাতে করে করে চালের খড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিতে লাগল। আর দূরের কুয়ো থেকে দৌড়ে দৌড়ে সার বেঁধে জলভরা ঘড়া এনে উপস্থিত করতে লাগল। ওরা যদি না দেখত এবং না এসে জুটত তাহলে মস্ত একটা অগ্নি-কাণ্ড হত। এমনি করে কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঝড়-বাদল হয়ে আজ অনেকটা ঠাণ্ডা আছে। আকাশ এখনো মেঘে লেপে আছে, হয়তো আজও বিকেলে একচোট বৃষ্টি শুরু হবে। ইতি ৫ই শ্রাবণ, ১৩২৫।

৭

শান্তিনিকেতন

তুমি আজকাল খুব পড়ায় লেগে গেছ, কিন্তু আমি-যে চুপচাপ করে বসে থাকি তা মনে কোরো না। আমার কাজ চলচে। সকালে তুমি তো জান সেই আমার তিন

ক্লাসের পড়ান আছে। তারপরে স্নান করে খেয়ে, যেদিন চিঠি লেখবার থাকে চিঠি লিখি। তারপরে বিকেলে খাবার খবর দেবার আগে পর্যন্ত ছেলেদের যা পড়াতে হয় তাই তৈরি করে রাখি। তারপরে সন্ধ্যার সময় ছাতে চুপচাপ বসে থাকি— কিন্তু এক-একদিন ছেলেরা আমার কাছে কবিতা শুনতে আসে। তারপরে অন্ধকার হয়ে আসে—তারাগুলিতে আকাশ ছেয়ে যায়—দিনুর ঘর থেকে ছেলে-দের গলা শুনতে পাই—তারা গান শেখে—তারপরে গান বন্ধ হয়ে যায়। তখন আদ্যবিভাগের ছেলেদের ঘর থেকে হারমোনিয়ম্ এবং বাঁশির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গানের ধ্বনি উঠতে থাকে। ক্রমে রাত্রি আরো গভীর হয়, তখন ছেলেদের ঘরের গানও বন্ধ হয়ে যায়, আর দূরে গ্রামের রাস্তার ভিতর দিয়ে দুই একটা আলো চলচে দেখতে পাই। তারপরে সে আলোও থাকে না, কেবলমাত্র আকাশজোড়া তারার আলো। তারপরে বসে থাকতে থাকতে ঘুম পেয়ে আসে, তখন আস্তে আস্তে উঠে শুতে যাই। তারপরে কখন এক সময়ে আমার পূর্বদিকের দরজার সম্মুখে আকাশের অন্ধকার অল্প অল্প ফিকে হয়ে আসে দুটো একটা শালিক-পাখি উসখুস করে ওঠে, মেঘের গায়ে গায়ে সোনালি আভা ফোটে, খানিক বাদেই সাড়ে চারটার সময় আদ্যবিভাগে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে থাকে, অমনি আমি উঠে পড়ি। মুখ ধুয়ে এসে আমার সেই পূর্বদিকের বারান্দায় পাথরের চৌকির উপর আসন পেতে উপাসনায় বসি। সূর্য ধীরে ধীরে উঠে তার আলোকের স্পর্শে আমাকে আশীর্বাদ করে। আজকাল সকাল সকাল খেতে যেতে হয়, কেননা সাড়ে ছটার সময় আশ্রমের সকল বালকবৃদ্ধ আমরা বিদ্যালয়ের সামনের মাঠে একত্র হই, একটি কোনো গান হয়ে তার পরে আমাদের স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়। ঠিক প্রথম ঘণ্টায় আমার ক্লাস নেই। কিন্তু সেই সময়ে আমি আমার কোণটাতে এসে একবার আমার পড়াবার বই ও খাতাপত্র দেখে শুনে ঠিক করে নিই—তারপরে আমার কাজ। এই আমার দিনরাতের হিসাব তোমার কাছে দিলুম। কেমন শান্তিতে দিন চলে যায়। ঐ ছেলেদের কাজ করতে আমার খুব ভালো লাগে। কেননা ওরা জানে না যে, আমরা ওদের জন্য যে-কাজ করি তার কোনো মূল্য আছে। ওরা যেমন অনায়াসে সূর্যের কাছ থেকে তার আলো নেয় আমাদের হাত থেকে তেমনি অনায়াসে সেবা নেয়। হাটে দোকানদারদের কাছ থেকে যেমন দরদস্তুর করে জিনিস কিনতে হয় তেমন করে নয়। এরা যখন বড়ো হবে, যখন সংসারের কাজে প্রবেশ করবে, তখন হয়তো মনে পড়বে—এই আশ্রমের প্রান্তর, এখানকার শালের বীথিকা, এখানকার আকাশের উদার আলো এবং উন্মুক্ত সমীরণ এবং প্রতিদিন সকালে বিকালে এখানে আকাশতলে নীরবে বসে ঠাকুরকে প্রণাম। ইতি ১২ই শ্রাবণ, ১৩২৫।

৮

শান্তিনিকেতন

দিনগুলো আজকাল শরৎকালের মতো সুন্দর হয়ে উঠেচে। আকাশের ছিন্ন মেঘগুলো উদাসীন সন্ন্যাসীর মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। আমলকীগাছের পাতাগুলিকে ঝরঝরিয়ে দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্চে, তার মধ্যে একটা আলস্যের

সুর বাজচে আর বৃষ্টিতে-ধোওয়া রোদ্দুরটি যেন সরস্বতীর বীণার তারগুলো থেকে বেজে-ওঠা গানের মতো সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেচে। আমার ঠিক চোখের উপরেই সন্তোষবাবুর বাড়ির সামনেকার সবুজ খেত রৌদ্রে ঝলমল করে উঠেচে; আর তারই একপাশ দিয়ে বোলপুর যাবার রাঙা রাস্তাটা চলে গেচে—ঠিক যেন একটি সোনালি সবুজ শাড়ির রাঙা পাড়ের মতো। খুব ছেলেবেলা থেকেই এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার গলাগলি ভাব—তাই আমার জীবনের কত কালই নদীর নির্জন চরে কাটিয়েচি। তারপরে কতদিন গেচে এখানকার নির্জন প্রান্তরে। তখন এখানে বিদ্যালয় ছিল না, তখন শান্তিনিকেতনের বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় বসে খুব বৃহৎ একটি নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে যেতে পারতুম;—রাত্রে ঐ বারান্দায় যখন শুয়ে থাকতুম তখন আকাশের সমস্ত তারা যেন আমার পাড়াপড়শির মতো তাদের জানলা থেকে আমার মুখের দিকে চেয়ে কী বলত, তাদের কথা শোনা যেত না, কিন্তু তাদের মুখ-চোখের হাসি আমাকে এসে স্পর্শ করত। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ভাব করার একটা মস্ত সুবিধা এই যে, সে আনন্দ দেয়, কিন্তু কিছু দাবি করে না; সে তার বন্ধুত্বকে ফাঁসের মতো বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করে না, সে মানুষকে মুক্তি দেয়, তাকে দখল করে নিতে চায় না। ১৮ই শ্রাবণ, ১৩২৫।

৯

শান্তিনিকেতন

আজ সকাল থেকে ঘন ঘোর মেঘ করে প্রবল বেগে বর্ষণ চলচে, সকালে কোনো মাস্টার তাই ক্লাস নেননি। কিন্তু থার্ড ক্লাসের ছেলেদের আমি ছুটি দিতে পারলুম না—তাদের পড়া খুব শক্ত, মাঝে মাঝে ফাঁক পড়লে সমস্ত আলগা হয়ে যাবে, তাই সেই বৃষ্টির মধ্যেও তাদের সংগ্রহ করে আনা গেল। পড়াতে পড়াতে বৃষ্টির বেগ বেড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়। আমার শোবার ঘরে ক্লাস হয়—ঘরে ছাঁট আসতে লাগল। শার্সি বন্ধ করে দিলুম—পাঠ্য শেষ হয়ে গেল, কিন্তু বৃষ্টি শেষ হয় না—এই বৃষ্টিতে তাদের তো ছেড়ে দিতে পারিনে। শেষকালে ওরা আমাকে ধরে পড়ল, মুখে মুখে একটা গল্প বানিয়ে ওদের শোনাতে। কিন্তু ভেবে দেখো আমার বয়স এখন সাতান্ন বছর হয়েচে, এখন কি ইচ্ছা করলেই অনর্গল গল্প বলতে পারি? শেষকালে আমি করলুম কী, একটা গল্পের কেবল গোড়া ধরিয়ে দিয়ে ওদের বললুম সেইটে এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ করে লিখে আনতে। ওরা তো উৎসাহের সঙ্গে রাজি হল, কিন্তু ওদের গল্প যে কী রকম হবে তা কল্পনা করে আমার মনে কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ হচ্চে না। যাকগে ওরা তো সেই গল্প মাথায় নিয়ে ভিজতে ভিজতে চেঁচাতে চেঁচাতে ওদের ঘরে চলে গেল—আমি গেলুম স্নান করতে। স্নান করে খেয়ে এসে আজ তাকিয়ায় একটু হেলান দিয়ে পড়েছিলুম। কিন্তু সমস্ত দিন তো কুঁড়েমি করে কাটাতে পারিনে। অন্য দিন হলে উঠে আমার তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ক্লাসের জন্য পড়ার বই লিখতে বসতুম, কিন্তু আজ বাদলার দিনে সেটা ভালো লাগল না, তাই "বিদায়-অভিশাপ"টা ইংরেজিতে তর্জমা করতে বসে গিয়েছিলুম। বেশ ভালোই লাগছিল; পাতা দুয়েক যখন শেষ হয়ে গেচে, এমন সময় চিঠি হাতে করে এক হরকরার প্রবেশ। কাজেই এখন

কিছুক্ষণের জন্য দেবযানীকে অপেক্ষা করতে হচ্চে। বৃষ্টি থেমে গেচে কিন্তু জলভারাবনত মেঘে আকাশ ভরা। এতদিন শ্রাবণের দেখা ছিল না, যেই বিশে একুশে হয়েচে অমনি যেন কোনোমতে ছুটতে ছুটতে শেষ ট্রেনটা ধরে হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির। কম হাঁপাচ্চে না,— তার হাঁপানির বেগে আমাদের শালবন বিচলিত, আমলকীবন কম্পান্বিত, তালবন মর্মরিত, বাঁধের জল কল্লোলিত, কচি ধানের খেত হিল্লোলিত, আর আমার এই জানলার খড়খড়িগুলো ক্ষণে ক্ষণে খড়খড়ায়িত। ইতি ২১শে শ্রাবণ, ১৩২৫।

১০

শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠি আজ এইমাত্র পেলুম। এইমাত্র বলতে কী বোঝায় বলি। দুপুর বেলাকার খাওয়া হয়ে গেছে। সেই কোণটাতে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসেছিলুম। আকাশ ঘন মেঘে অন্ধকার হয়ে গেছে— পশ্চিম দিক থেকে মাঝে মাঝে সোঁ সোঁ করে ঝোড়ো বাতাস বইচে। ইন্দ্রের ঐরাবতের বাচ্চাগুলোর মতো মোটা মোটা কালো মেঘ আকাশময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। মাঝে মাঝে গুরু গুরু গর্জন শোনা যায়। সামনে সবুজ মাঠের উপরে মেঘলা দিনের ছায়া, নিবিড় স্নিগ্ধতার মধ্যে চোখ ডুবে গেচে। তোমাকে লিখতে লিখতে বৃষ্টি নেমে এল— বৃষ্টি একটুমাত্র দেখা দিলেই আমার এই বারান্দায় তার পায়ের শব্দ তখনি শোনা যায়। দূরে ভুবনডাঙার দিকে বাঁধের কাছে যে ঘন বনশ্রেণী দেখা যায়, বৃষ্টির ধারায় সেটা একটু ঝাপসা হয়ে এসেচে— বনলক্ষ্মী যেন তার পাতলা ওড়্‌নাটাকে মুখের উপর ঘোমটা টেনে দিয়েচে। ক-টা বেজেচে, ঠিক বলতে পারিনে। আমার সামনের দেয়ালে যে-ঘড়িটা ছিল তাকে নির্বাসিত করে দিয়েচি। ইদানীং তার ব্যবহারে এমন হয়ে এসেছিল-যে, তাকে বিশ্বাস করার জো ছিল না— সে চলতও ভুল বলতও ভুল, তার পরামর্শমতো খেতে শুতে গিয়ে আমি অনেকবার ঠকেচি। তবু উপযুক্ত উপায়ে তাকে-যে সংশোধন করা যেত না তা বলতে পারিনে— কিন্তু সময়ের জন্যই ঘড়ি, ঘড়ির জন্য সময় নষ্ট করা আমার পোষায় না। যাই হোক আন্দাজে মনে হচ্ছে একটা দেড়টা হয়ে গেচে। আর একটু বাদেই আমাকে একটা ক্লাস পড়াতে হবে। আজকাল প্রায় জন পনেরো গুজরাটি ছেলে এসেছে, কী করে তাদের বাংলা পড়াতে হবে সেইটে আজ আমি দেখিয়ে দেব— বৌমা আর শৈল ওদের দুপুর বেলায় একঘণ্টা করে বাংলা পড়াতে রাজি হয়েচেন।

ইতিমধ্যে এন্ডরুজ্ সাহেবের খুব অসুখ করেছিল। আমাদের ভাবনা হয়েছিল। একদিন তো রাত্রে তাঁর নিজের মনে হল তাঁর ওলাউঠা হয়েছে। সেই রাত্রি একটার সময় বর্ধমানে ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠিয়ে দিলুম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ওষুধ খেয়ে এতটা ভালো হয়ে উঠলেন যে, ভোরের বেলায় আবার টেলিগ্রাফ করে ডাক্তার আনা বন্ধ করে দিলুম। তুমি তো জানই আমার হাতের রেখায় লেখা আছে— আমি ডাক্তারি করতে পারি। যাই হোক, এখন সাহেব আবার সেরে উঠে পূর্বের মতোই চারিদিকে দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্চেন। কিন্তু তিনি সেই-যে জাপানি ঝোলা কাপড়টা পরতেন সেটা আজকাল আর দেখতে পাইনে।

বৃষ্টি একটুখানি হয়েই থেমে গেল। বাতাসটাও বন্ধ হয়েচে। কিন্তু পূবের দিকে খুব একটা ঘন নীল মেঘ ভ্রূকুটি করে থমকে দাঁড়িয়ে রয়েচে—এখনি বোধ হয় বরুণ-বাণ বর্ষণ করতে লেগে যাবে। আমরা আশ্রমে অনেক নতুন গাছ লাগিয়েছি, ভালো করে বৃষ্টি হলে ভালোই হয়। কিন্তু আজকাল শরৎকালের মতো হয়েচে—রৌদ্রে বৃষ্টিতে মিলে ক্ষণে ক্ষণে খেলা শুরু হয়ে গেচে। তোমরা গান-বাজনা শিখতে শুরু করেচ শুনে খুব সুখী হলুম। আজ আমার আর সময়ও নেই, কাগজও ফুরল, পাড়া জুড়োল বর্গি এল ক্লাসে।

১১

শান্তিনিকেতন

আজ বুধবার। কদিন খুব বৃষ্টি-বাদলের পর আজ সকালের আকাশে সূর্যের আলো নির্মল হয়ে ফুটে উঠেচে। শিশু যেমন দোলায় শুয়ে শুয়ে অকারণ আনন্দে হাত-পা ছুঁড়ে চিত হয়ে শুয়ে কলহাস্য করতে থাকে, তেমনি করে আশ্রমের গাছপালাগুলি আজ তাদের ডালপালা দুলিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবলি ঝিলমিল করে উঠচে। এখন সকাল বেলা—স্নিগ্ধ বাতাস বইচে, পাখির ডাকে এখানকার শালবন এবং আমবাগান মুখরিত। আমাদের মন্দিরের উপাসনা হয়ে গেচে। তারপরে এতক্ষণ আমার জানালার ধারে সেই কোণটিতে শুয়েছিলুম। প্রতি বুধবারে উপাসনার পরে এণ্ডরুজ একবার এসে, আমি কী বলেচি, আমার কাছে ইংরেজিতে তাই বুঝিয়ে নেন। বুঝিয়ে নিয়ে খুশি হয়ে তিনি চলে গেচেন। আমি কী বলেছিলুম জানো? এই সৃষ্টির দিকে প্রথম তাকালে কী দেখতে পাই? এর আগাগোড়া সমস্ত নিয়মে বাঁধা, এর সমস্ত অণু-পরমাণুর মধ্যে নিয়মের ফাঁক এতটুকুও নেই। কেমন জান। যেমন একটি সহস্র-তারবাঁধা বীণা যন্ত্র। এই বীণার প্রত্যেক তারটি খুব খাঁটি হিসাব করে বাঁধা অর্থাৎ এই বীণাটির তুম্বী থেকে আরম্ভ করে এর সূক্ষ্মতম তারটি পর্যন্ত সমস্তই সত্য। কিন্তু না-হয় সত্যই হল, তাতে আমার কী। বীণার তার বাঁধার খাঁটি নিয়ম নিয়ে আমি কী করব। তেমনি এই জগতে সূর্যচন্দ্রগ্রহ অণু-পরমাণু সমস্তই ঠিক সময় রেখে ঠিক নিয়ম রেখে চলচে—এই কথাটা যত বড়ো কথাই হোক না, কেবল তাতে আমাদের মন ভরে না। আমরা এই কথা বলি, শুধু বীণার নিয়ম চাইনে, বীণার সংগীত চাই। সংগীতটি যখন শুনতে পাই, তখনি ঐ বীণাযন্ত্রের শেষ অর্থটি পাই—তা নইলে ও কেবল খানিকটা কাঠ এবং পিতল। জগতের এই বীণাযন্ত্রে আমরা সংগীতও শুনেচি; শুধু কেবল নিয়ম নয়। সকাল বেলার আলোতে আমরা শুধু কেবল মাটিজল, শুধু কেবল কতকগুলো জিনিস দেখতে পাই, তা নয়। সকাল বেলার শান্তি, স্নিগ্ধতা, সৌন্দর্য, পবিত্রতা সে তো কেবল বস্তু নয় সেই হচ্চে সকালের বীণাযন্ত্রের সংগীত। তারই সুরে আমাদের হৃদয় পাখির সঙ্গে মিলে গান গাইতে চায়। যেখানে বীণা শুধু বীণা সেখানে সে বস্তুমাত্র—কিন্তু যেখানে বীণায় সংগীত ওঠে, সেখানে বীণার পিছনে আমাদের ওস্তাদজি আছেন। সেই ওস্তাদজির আনন্দই গানের ভিতর দিয়ে আমাদের আনন্দ দেয়। সৃষ্টির বীণা তো ওস্তাদজি বাজিয়ে চলেচেন, কিন্তু আমাদের নিজের চিত্তের বীণাও যদি সুরে না বাজে তাহলে

আমাদের হৃদয়বীণার ওস্তাদজিকে চিনব কী করে। তাঁর আনন্দরূপ দেখব কী করে। না যদি দেখি তাহলে কেবল বেসুর, কেবল ঝগড়া-বিবাদ, কেবল ঈর্ষা-বিদ্বেষ, কেবল কৃপণতা, স্বার্থপরতা, কেবল লোভ এবং ভোগের লালসা। আমাদের জীবনের মধ্যে যখন সংগীত বাজে তখন নিজেকে ভুলে যাই। আমাদের জীবন-যন্ত্রের ওস্তাদজিকেই দেখতে পাই। তখন দুঃখ আমাদের অভিভূত করে না, ক্ষতি আমাদের দরিদ্র করে দেয় না, তখন ওস্তাদজির আনন্দের মধ্যে আমাদের জীবনের শেষ অর্থটি দেখতে পাই। সেইটি দেখতে পাওয়াই মুক্তি। সেইজন্যই তো চিত্ত-বীণায় সত্যসুরে তার বাঁধতে চাই, সেইজন্যে কঠিন চেষ্টায় মনকে বশ করতে চাই, চৈতন্যকে নির্মল করে তুলতে চাই—সেইজন্যে নিজের স্বার্থ নিজের ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা ভুলে হৃদয়কে শুদ্ধ করতে চাই—তা হলেই আমার সুরবাঁধা যন্ত্র ওস্তাদের হাতে বেজে উঠবে; আমাদের প্রার্থনা হচ্চে এই :—"তব অমল পরশ রস অন্তরে দাও।" তাঁর সেই স্পর্শের রসই হচ্চে আমাদের অন্তরের সংগীত। তুমিও জান, আমি সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই গান করি—

বীণা বাজাও হে, মম অন্তরে।
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে
আনন্দিত তান শুনাও হে, মম অন্তরে।

দুপুর বেলা খেতে গিয়ে দেখি, খাবার টেবিলে তোমার চিঠি আর সেই হিন্দি খবরের কাগজ রয়েচে। তোমরা আলমোড়ায় যাচ্চ। ওখানে আমি অনেকদিন ছিলুম। তোমাদের ঠিকানা পেলে সেই ঠিকানায় লিখব। আমি ভেবেছিলুম, তোমাদের স্কুলের ছুটির আগে তোমরা কোথাও যাবে না। কিন্তু দেখচি আমার ছেলেবেলাকার হাওয়া তোমাদের লেগেচে—তখন আমি কেবলি ইস্কুল পালিয়েচি। কিন্তু সাবধান আমার মতো মূর্খ হলে চলবে না—নামতা মনে থাকা চাই, আর সাইবীরিয়ার রাস্তা ভুললে কষ্ট পাবে।

১২

শান্তিনিকেতন

তুমি বোধ হয় এই প্রথম হিমালয়ে যাচ্চ। আমিও প্রায় তোমার বয়সে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয়ে গিয়েছিলুম। তার আগে ভূগোলে পড়েছিলুম, পৃথিবীতে হিমালয়ের চেয়ে উঁচু জিনিস আর কিছু নেই, তাই হিমালয় সম্বন্ধে মনে মনে কত কী-যে কল্পনা করেছিলুম তার ঠিক নেই। বাড়ি থেকে বেরবার সময় মনটা একেবারে তোলপাড় করেছিল। অমৃতসর হয়ে ডাকের গাড়ি চড়ে প্রথমে পাঠানকোটে গিয়ে পড়লুম। সেখানে পাহাড়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ। তুমি কাঠগোদাম দিয়ে উপরে উঠেচ,—পাঠানকোট সেই রকম কাঠগোদামের মতো। সেখানকার ছোটো ছোটো পাহাড়গুলো, "কর, খল" "জল পড়ে, পাতা নড়ে",—এর বেশি আর নয়। তারপরে ক্রমে ক্রমে যখন উপরে উঠতে লাগলুম, তখন কেবল এই কথাই মনে হতে লাগল, হিমালয় যত বড়োই হোক না, আমার কল্পনা তার চেয়ে তাকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গিয়েচে; মানুষের প্রত্যাশার কাছে হিমালয় পাহাড়ই বা লাগে কোথায়। আসল কথা, পাহাড়টা থাকে-থাকে উপরে উঠেচে

বলে, ডাণ্ডি করে চড়তে চড়তে, পর্বতরাজের রাজমহিমা ক্রমে ক্রমে মনের মধ্যে সয়ে আসে। যে-জিনিসটা খুব বড়ো, আমরা একেবারে তার সমস্তটা তো দেখতে পাইনে—পর্বত ক্রমে ক্রমে দেখি, সমুদ্র ক্রমে ক্রমে দেখি—এমন কি, যে-মানুষ আমার চেয়ে বয়সে অনেক বেশি তার সেই বড়ো বয়সের সুদীর্ঘ বিস্তারটা এক সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় না। এই জন্যে অজ্ঞাত জিনিসটা কল্পনায় যত বড়ো, প্রত্যক্ষে তত বড়ো নয়। অর্থাৎ বড়ো হলেও বড়ো দেখা যায় না। আমাদের যে-ঠাকুরকে আমরা প্রণাম করি, তিনি যত বড়ো তার সমস্তটা যদি সম্পূর্ণ আমাদের সামনে আসত, তাহলে সে আমরা সইতেই পারতুম না। কিন্তু হিমালয় পাহাড়ের মতো আমরা তাঁর বুকের উপর দিয়ে ক্রমে ক্রমে উঠি। যতই উঠি না কেন, তিনি আমাদের একেবারে ছাড়িয়ে যান না,—বরাবর আমাদের সঙ্গী হয়ে তিনি আমাদের আপনি উঠিয়ে নিতে থাকেন; বুদ্ধিতে বুঝতে পারি তিনি আমাদের ছাড়িয়ে আছেন, কিন্তু ব্যবহারে বরাবর তাঁর সঙ্গে আমাদের সহজ আনাগোনা চলতে থাকে। তাই তো তাঁকে বন্ধু বলতে আমাদের কিছু ঠেকে না—তিনিও তাঁর উপরের থেকে হেসে আমাদের বন্ধু বলেন। এত উপরে চড়ে যান না-যে, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া দায় হয়ে ওঠে। তুমি যত জোরের সঙ্গে আমাকে সাতাশ বছরের করে নিয়েচ, আমরা তার চেয়ে ঢের বেশি জোরে তাঁকে সাতও করতে পারি সাতাশও করতে পারি—আবার সাতাশ কোটি করলেও চলে; তিনি যে আমাদের জন্য সবই হতে পারেন, তা নইলে তাঁকে দিয়ে আমাদের চলতই না। তোমার পাহাড় কেমন লাগল, আমাকে লিখো। হিমালয়ে আলমোড়া-পাহাড়ের চেয়ে ভালো পাহাড় ঢের আছে, আলমোড়া ভারি নেড়া পাহাড়; ওর গাছপালা নেই আর ওখানে থেকে হিমালয়ের তুষার-দৃশ্য তেমন ভালো করে দেখা যায় না। ইতি ১লা ভাদ্র, ১৩২৫।

১৩

শান্তিনিকেতন

আজ সকালে তোমার চিঠি পেলুম। তখন তো আমার সময় থাকে না, তাই এখন খাওয়ার পরে লিখতে বসেচি। আর খানিক পরে ম্যাট্রিক-ক্লাসের ছেলেরা দল বেঁধে খাতাপত্র নিয়ে হাজির হবে। তুমি যে-নিয়ম করে দিয়ে গিয়েছিলে, আজকাল সে আর পালন করা হয়ে ওঠে না; খাওয়ার পরে দুপুর-বেলায় শোওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েচি—সেই ডেস্কের সামনে সেই চৌকি নিয়ে আমার দিন কাটে। সেজন্যে আমার নালিশ নেই, কাজের দরকার পড়লেই কাজ করতে হবে। পৃথিবীতে ঢের লোক আমার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করে—সেও আবার অফিসের কাজ—অর্থাৎ সে-কাজ পেটের দায়ে, মনের আনন্দে নয়। আমি-যে ছেলেদের পড়াই, সে তো দায়ে পড়ে নয়, সে নিজের ইচ্ছায়—অতএব এ রকম কাজ করতে পারা তো সৌভাগ্য। কিন্তু তবু এক-একবার দরজার ফাঁকের ভিতর দিয়ে এই সবুজ পৃথিবীর একটা আভাস যখন দেখতে পাই তখন মনটা উতলা হয়ে ওঠে। আমি-যে জন্মকুঁড়ে। যেমন বাঁশির ফাঁকের ভিতর দিয়ে সুর বেরয়, তেমনি আমার কুঁড়েমির ভিতর থেকেই আমার যেটি আসল কাজ সেইটি জেগে ওঠে। আমার সেই আসল কাজই হচ্চে বাণীর কাজ। সময়টাকে কর্তব্য দিয়ে ভরাট করে

একেবারে নিরেট করে দিলে বাণী চাপা পড়ে যায়। সেইজন্যই আমাকে কেবল কাজ থেকে নয়, সংসারের নানা জটিল বন্ধন থেকে যথাসম্ভব মুক্ত থাকতে হয়। কাজই হোক, আর মানুষই হোক, আমাকে একেবারে চাপা দিলে বা বেঁধে ফেললে আমার জীবন ব্যর্থ হতে থাকে। আমার মন ওড়বার জন্যে শূন্যকে চায়। তাকে খাঁচায় বাঁধবার আয়োজন যতবার হয়েচে, সেই আয়োজনের শিকল ছিন্ন হয়ে পড়ে গেচে। হঠাৎ একদিন দেখতে পাবে আমার কাজকর্মের দাঁড়খানা তার শিকল নিয়ে কোথায় পড়ে আছে, আর আমি অত্যুচ্চ অবকাশের আগডালের উপর অসীম ফাঁকার মধ্যে একলা বসে গান জুড়ে দিয়েচি। তাই বলচি—দরজা-জানলার আড়াল থেকে ঐ নীলে-সবুজে-সোনালিতে মেশানো ফাঁকার একটা অংশ যেমনি দেখতে পাই, অমনি আমার মন ডেস্কের ধার থেকে বলে ওঠে—ঐখানেই তো আমার জায়গা, ঐ ফাঁকাটাকে যে আমার আনন্দ দিয়ে, গান দিয়ে ভরে তুলতে হবে। পুকুর আছে মাটির বাঁধ দিয়ে ঘেরা—সেইখানেই তার কাজ, কেউবা স্নান করচে, কেউবা জল তুলচে, কেউবা বাসন মাজচে। কিন্তু আমি হচ্চি মেঘের মতো; আমাকে তো তটের ঘের দিলে চলবে না, আমাকে বাঁধতে গেলে তো বাঁধা পড়ব না—আমাকে যে ঐ শূন্যের ভিতর দিয়ে বর্ষণ করতে হবে। সব সময়েই যে বৃষ্টি ভরে আসে তা নয়, অনেক সময়ে অলস-স্বপ্নের মতো সূর্যের আলোতে রঙিয়ে উঠে কিছুই না করে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু এই কুঁড়েমিটুকু উপর থেকে আমার জন্যে বরাদ্দ হয়ে গেচে, এজন্যে আমি কারো কাছে দায়িক নই। সবই তো বুঝলুম, কিন্তু কুঁড়েমি করি কখন বল তো? তুমি তো দেখেই গেচ কাজের আর অন্ত নেই। ঘোড়াকে বিধাতা বাতাসের মতো দ্রুতগামী এবং মুক্ত করে সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু সেই ঘোড়াকেই মানুষ জিনে লাগামে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। আমারও সেই দশা। বিধাতার ইচ্ছা ছিল—আমি ভরপুর কুঁড়েমি করে কাটাই, কিন্তু যে-গ্রহের হাতে পড়েচি, সে আমাকে কষে খাটিয়ে নিচ্চে। বয়স যখন অল্প ছিল, তখন খাটুনি এড়িয়ে, ইস্কুল পালিয়ে পদ্মার নির্জন চরে বোটের মধ্যে লুকিয়ে বেশ চালাচ্ছিলুম—কিন্তু যখন থেকে তোমার পঞ্জিকা অনুসারে আমার 'সাতাশ' বছর হয়েচে, তখন থেকেই কাজের টানে আপনি ধরা দিয়ে কেটে বেরবার আর পথ পাইনে। নইলে আগেকার মতো হলে আমার পক্ষে আলমোড়ায় যেতে কতক্ষণ লাগত বলো? তবু তোমরা সেই পাহাড়ের উপরে মুক্ত হাওয়ায় স্বাস্থ্য এবং আনন্দ ভোগ করচ এ কথা মনে করে ভালো লাগচে; তোমার চিঠি সেখানকার লাল ফুলের পাপড়িতে রাগ-রক্ত হয়ে আমার হাতে এসে পৌঁচচ্চে। সেখানকার ফুলে যে-রক্তিমা দেখতে পাচ্চি, তোমার গালে সেই রক্তিমা সংগ্রহ করে আনবে—এই আশা করে আছি। আজ আর সময় নেই—অতএব ইতি। ১১ই ভাদ্র, ১৩২৫।

১৪

শান্তিনিকেতন

আমাদের এখানে প্রায়ই খুব বৃষ্টি হচ্চে। এক-একদিন বিষম জোরে বাতাস দেয় আর বৃষ্টির ধারাগুলো বেঁকে একেবারে তীরের মতো সিধে ঘরের মধ্যে চলে আসে। এখানে গরম নেই বললেই হয়—আর চারিদিকের মাঠ একেবারে ঘন সবুজ

হয়ে উঠেচে। বোলপুরকে এত সবুজ আমি আর কখনোই দেখিনি। গাছগুলো নিবিড় পাতার ভারে থাকে-থাকে ফুলে উঠেচে—ঠিক যেন সবুজ মেঘের ঘটার মতো। আমাদের বিদ্যালয়ের কুয়োগুলো প্রায় কানায় কানায় ভরা। এবারে চারিদিকে অনেক গাছ পুঁতে দিয়েচি। সেগুলো যখন বড়ো হয়ে উঠবে, তখন আমাদের আশ্রম আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। কিন্তু এখানকার শুকনো বেলেমাটিতে গাছপালা ভারি দেরিতে বেড়ে ওঠে—আমি আটাশ বছরে পড়বার আগে এ সব গাছে ফুলধরা দেখতে পাব না। তুমি যদি নবেম্বরে আমাদের আশ্রমে আস, তাহলে ততদিনে এখানে অনেক বদল দেখতে পাবে। এ বৎসরটা আমাদের আশ্রমের পক্ষে খুব তেজের বৎসর;—যেমন ঘন ঘন বৃষ্টিতে গাছপালা দেখতে দেখতে পূর্ণ হয়ে উঠচে, তেমনি এখানকার কাজের দিকেও খুব একটা উৎসাহ পড়ে গেচে। পড়াশুনো কাজকর্ম যেন নতুন জোর পেয়েচে; সেইজন্যে ছেলেদের মধ্যেও খুব একটা আনন্দ জেগে উঠেচে। আমি-যে আমেরিকায় যাবার টিকিট কিনেও গেলুম না, এখানে থেকে গেলুম, তার পুরস্কার পেয়েচি। আমাদের আশ্রম-লক্ষ্মী বোধ হয় আমার অদৃষ্টের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমার বিদেশে-যাওয়া কাটিয়ে দিয়েচেন। খুব ভালোই হয়েচে। আমি "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" ইংরেজিতে তর্জমা করেচি, তা জানো; এন্ডরুজ সে-টা পড়ে খুব হেসেচেন, আর খুব লাফালাফি করেচেন। ইতি ১৬ই ভাদ্র, ১৩২৫।

১৫

শান্তিনিকেতন

কাল রাত্রি থেকে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন—মাঝে মাঝে প্রবল জোরে বর্ষণ নেমে আসচে—অমনি দেখতে দেখতে সমস্ত মাঠ জলে ছল ছল করে উঠচে—থেকে থেকে অশান্ত বাতাস সোঁ সোঁ করে হুহু করে আমাদের শালবনের ডালপালাগুলোর মধ্যে আছড়ে আছড়ে লুটিয়ে পড়চে—ঠিক যেন আকাশের অনেক দিনের একটা চাপা বেদনা কিছুতেই আর চাপা থাকচে না। ওদিকে দিগন্তের কোণে কোণে রাগী-রকমের ভ্রূকুটি দেখা দিয়েচে—আর তার মধ্য দিয়ে একটা ফ্যাকাশে আলো দারুণ হাসির মতো। সবসুদ্ধ জলে-স্থলে একটা খ্যাপাটে রকমের ভাব। মনে হচ্ছে যেন ছুটন্ত উচ্চৈঃশ্রবার উপরে চড়ে ইন্দ্রদেব একটা ঘূর্ণাঝড়ের চক্র পৃথিবীর দিকে ছুঁড়ে মেরেচেন। বাতাসের আর্তনাদ আর তার বেগ ক্রমেই বেড়ে উঠচে—একটা রীতি-মতো ঝড়ের আয়োজন বলেই বোধ হচ্চে। আমার এই দোতালার কোণটি ঝড়ের পক্ষে খুব-যে ভালো আশ্রয়—তা নয়। আধুনিক কালের যুদ্ধক্ষেত্রের trench-এর মতো যথেষ্ট প্রকাশ্যও নয়, যথেষ্ট প্রচ্ছন্নও নয়—ভালো করে ঝড়টা দেখতে পাচ্চিনে, অথচ ঝড়ের ঝাপট থেকে ভালো করে রক্ষাও পাচ্চিনে। সিঁড়ির সামনের দরজাটা বন্ধ করতে হয়েচে, ঘরের দরজাও সব বন্ধ—অন্ধকার, কোথা থেকে বেঁকে-চুরে একটু বৃষ্টির ঝাপটও আসচে। রুদ্রদেবের তাণ্ডবনৃত্যের এই ডমরু-ধ্বনির মধ্যে বসে তোমাকে চিঠি লিখচি।

সেদিন তুমি আমাকে লিখেছিলে-যে, তুমি আমার অনেক নতুন নতুন নাম ঠিক করে রেখেচ। ক্রমে একে একে বোধ হয় শুনতে পাব, কিন্তু আমার আসল নামটা

যেন একেবারে চাপা না পড়ে যায়,— কেননা, ঐ নামটা নিয়ে এতদিন একরকম কাজ চালিয়ে এসেচি। তা ছাড়া ওর একটা মস্ত সুবিধা এই-যে, কবির সঙ্গে রবির একটা মিল আছে;—এর পরে যারা আমার নামে কবিতা লিখবে, তাদের অনেকটা কষ্ট বাঁচবে। ইতি ২০শে ভাদ্র, ১৩২৫।

১৬

শান্তিনিকেতন

আজ সকালে তোমার চিঠি এইমাত্র পেলুম। আজ আমার চতুর্থ এবং পঞ্চম বর্গের পুরাতন পড়ার দিন, আজ সন্তোষের হাতে তাদের ভার; এইজন্যে আমার সকালের কাজের প্রথম দুই ভাগ আমার ছুটি, তাই এখনি তোমার চিঠির জবাব দিতে বসবার সময় পেলুম। সেদিন যখন তোমাকে লিখছিলুম, তখন আকাশ জুড়ে মেঘের হাঁকডাক এবং মাঠে-বনে পাগলা হাওয়ার দৌরাত্ম্য চলছিল; আজ সকালে তার আর কোনো চিহ্ন নেই, আজ শরৎকালের প্রসন্ন মূর্তি প্রকাশ পেয়েচে —শিবের জটা ছাপিয়ে যেন গঙ্গা ঝরে পড়চে,—আকাশে তেমনি আজ আলোকের নির্মল ধারা ঢেলে দিয়েচে, পৃথিবী আজ মাথা নত করে তার অশ্রু-আর্দ্র হৃদয়খানি মেলে দিয়েচে, আর আকাশের কোন্ তরুণ দেবতা হাসিমুখে তার উপরে এসে দাঁড়িয়েচে। জলস্থল শূন্যতল আজ একটি জ্যোতির্ময় মহিমায় পূর্ণ হয়ে উঠেচে। সেই পরিপূর্ণতায় চারিদিক শান্ত স্তব্ধ, অথচ গোলমাল-যে কিছু নেই, তা নয়। জাগ্রত প্রভাতের কাজকর্মের কলধ্বনি উঠেচে। আমার ঠিক সামনেই 'দিনুবাবুর' ঘরের দোতালায় রাজমিস্ত্রী ও মজুরের দল নানারকম ডাকহাঁক এবং ঠুকঠাক লাগিয়ে দিয়েচে। দূরে থেকে ছেলেদের কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্চে, পূর্বদিকের সদর রাস্তা দিয়ে সার-বাঁধা গোরুর গাড়ি ইটের বোঝা নিয়ে আসচে, তারই অনিচ্ছুক চাকার আর্তনাদ এবং গাড়োয়ানের তর্জন-ধ্বনির বিরাম নেই, তার উপরে ঠিক আমার পিছনের জানালার বাইরে সুধাকান্তর ঘরের চালের উপরে বসে একদল চড়ুইপাখি কিচিমিচি করে কী-যে বিষম তর্ক বাধিয়ে দিয়েচে, তার একবর্ণ বোঝবার জো নেই,— প্রায় ন্যায়শাস্ত্রেরই তর্কের মতো। কিন্তু তবু আজ আলোকে অভিষিক্ত আকাশের এই অন্তরতর স্তব্ধতা কিছুতেই যেন ভাঙতে পারচে না। গায়ের উপর দিয়ে হাজার হাজার যেসব ঝরনা ঝরে পড়চে, তাতে যেমন হিমালয়ের অভ্রভেদী স্তব্ধতাকে বিচলিত করে না, এও ঠিক সেই রকম। একটি তপঃ-প্রদীপ্ত অপরিমেয় মৌনকে বেষ্টন করে এই সমস্ত ছোটো ছোটো শব্দের দল খেলা করে চলেচে— তাতে তপস্যার গভীরতা আরো বড়ো হয়ে প্রকাশ পাচ্চে, নষ্ট হচ্চে না। শরতের বনতল যেমন নিঃশব্দে-ঝরে-পড়া শিউলিফুলে আকীর্ণ হয়ে ওঠে, তেমনি করেই আমার মনের মধ্যে আজ শরৎ-আকাশের এই আলো শুভ্র শান্তি বর্ষণ করচে। ইতি ২৪শে ভাদ্র, ১৩২৫।

১৭

শান্তিনিকেতন

গেল বুধবারে সকালে আমি মন্দিরে কী বলেছিলুম, শুনবে? আমি বলেছিলুম, মানুষের ছোটো আর বড়ো— দুই-ই আছে। সেই ছোটো মানুষটি জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে কয়দিনের জন্যে আপনার একটি ছোটো সংসার পেতেচে— সেইখানে তার যত খেলার পুতুল সাজানো— সেইখানে তার প্রতিদিনের আহরণ জমা হচ্চে আর ক্ষয় হচ্চে। কিন্তু মানুষের ভিতরকার বড়োটি জন্ম-মৃত্যুর বেড়া ডিঙিয়ে চিরদিনের পথে চলেচে, এই চলবার পথে তার কত সুখ-দুঃখ, কত লাভ-ক্ষতি ঝরে পড়ে মিলিয়ে যাচ্চে। পৃথিবীর দুটি আবর্তন আছে,— একটি আহ্নিক, একটি বার্ষিক। একটি আবর্তনে সে আপনাকেই ঘুরচে, আর একটিতে সে নিজের চিরপথের কেন্দ্রস্থিত আলোকের উৎসকে প্রদক্ষিণ করচে। নিজেকে ঘোরবার সময় সূর্যের দিকে পিঠ ফেরাতেই দেখতে পায়-যে, তার নিজের কোনো আলো নেই, তার নিজের দিকে অন্ধতা, ভয়, জড়তা,— কিন্তু নিজের সেই অন্ধকারটুকুকে না জানলে সূর্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধের পূর্ণ পরিচয় সে পেত না। আমরাও আমাদের ছোটো আবর্তনে নিজেকে ঘুরি; এ ঘোরাতেই জানতে পারি, আমার দিকে অন্ধকার, বিভীষিকা, মোহ, আমার দিকে ক্ষুদ্রতা; কিন্তু সেই জানার সঙ্গে সঙ্গেই যখন সেই অমৃতের উৎসকে জানি, তখন অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে আমরা যেতে থাকি। এইজন্যে আপনাকে আর তাঁকে দুইকেই একসঙ্গে জানতে থাকলে তবেই আমরা আমাদের বন্ধনকে নিয়ত অতিক্রম করতে করতে, মুক্তির স্বাদ পেতে পেতে, অমৃতের পাথেয় সংগ্রহ করতে করতে চিরদিনের পথে চলতে পারি। আমাদের ক্ষুদ্র-প্রতিদিন আমাদের বৃহৎ-চিরদিনকে প্রণাম করতে করতে চলতে থাকবে, আমাদের ক্ষুদ্র-প্রতিদিন তার সমস্ত আহরণগুলিকে বৃহৎ-চিরদিনের চরণে সমর্পণ করতে করতে চলবে। কিন্তু ক্ষুদ্র প্রতিদিন যদি এমন কথা বলে বসে-যে, আমি যা পাই, যা আনি, সব আমি নিজে জমাব, তাহলেই বিপদ বাধে— কেননা, তার জমাবার জায়গা কোথায়? তার মধ্যে এত ধরে কোথায়? তার এমন অক্ষয় পাত্র আছে কোন্‌খানে? পৃথিবী যেমন তার সোনায়-ভরা সকালটিকে এবং সোনায়-ভরা সন্ধ্যাটিকে নিজে জমিয়ে রেখে দেয় না, পূজার স্বর্ণকমলের মতো আপন সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে প্রত্যহ প্রণাম করে উৎসর্গ করতে করতে চলেচে, আমাদেরও তেমনি এই ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ ভালোবাসাকে চিরদিনের চলবার পথে চিরদিনের দেবতাকে উৎসর্গ করতে করতে যেতে হবে :— তাহলেই ছোটো-আমির সঙ্গে বড়ো-আমির মিল হবে, তাহলেই আমাদের ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হবে; আপনার দিকে সমস্ত টানতে গেলেই সে-টান টেকে না, সেই বিদ্রোহে ছোটো-আমিকে একদিন পরাস্ত হতেই হয়। এইজন্য ছোটো-আমি জোড়হাতে প্রার্থনা করচে নমস্তেঽস্তু,— বড়োকে আমার নমস্কার সত্য হোক্, নিজের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পাই। ইতি ২৯শে ভাদ্র, ১৩২৫।

১৮

শান্তিনিকেতন

আজ সকালে তোমার চিঠি পেয়েছিলুম, কিন্তু তখনি তার জবাব দেবার সময় পাইনি। দুপুর বেলাতেও খাবার পরে কিছু কাজ ছিল, তাই এখন বিকেলে তোমাকে তাড়াতাড়ি লিখতে বসেচি—ডাক যাবার আগে শেষ করে ফেলতে হবে। আজকাল আর বৃষ্টির কোনো লক্ষণ নেই—আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেচে। আমার সেই লেখবার কোণটা তো তুমি জানো—সেটা হচ্চে পশ্চিমের বারান্দা; সেখানে বিকেলের দিকে হেলে-পড়া সূর্যের সমস্ত কিরণ বন্ধ-দরজার উপরে ঘা দিতে থাকে—সশরীরে ঢুকতে পায় না বটে, কিন্তু তার প্রতাপ অনুভব করতে পারি। তুমি এখন যেখানে আছ, সেখান থেকে আমার পিঠের দিকের বর্তমান অবস্থা ঠিক আন্দাজ করতে পারবে না। কিন্তু আমার আকাশের মিতাটি আমার সঙ্গে যেমনি ব্যবহার করুন, তাঁর সঙ্গে আমার কখনই বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ হয়নি। আমি চিরদিন আলো ভালোবাসি। গাজিপুরে, পশ্চিমের গরমেও, আমি দুপুর বেলায় আমার ঘরের দরজা বন্ধ করিনি। অনেক দিন বর্ষার আচ্ছাদনের পর সেই আলো পেয়েচি,—সেই আলো আজ আমার দেহের মধ্যে, মগজের মধ্যে, মনের মধ্যে প্রবেশ করচে। আমার সামনে পূর্বদিকের ঐ খোলা দরজা দিয়ে ঐ আলো নীল আকাশ থেকে আমার ললাটে এসে পড়েচে, আর সবুজ খেতের উপর দিয়ে এসে আমার দুই চোখের সঙ্গে সঙ্গে যেন কানে-কানে কথা বলচে। পৃথিবীর ইতিহাসে কত হানা-হানি কাটাকাটি হয়ে গেল, মানুষের ঘরে-ঘরে কত সুখ-দুঃখ, কত মিলন-বিচ্ছেদ, কত যাওয়া-আসার বিচিত্র লীলা প্রতিদিন বিস্মৃতির মধ্যে মিলিয়ে গেল, কিন্তু এই শরতের সবুজটি পৃথিবীর প্রসারিত অঞ্চলের উপরে যুগে-যুগে বর্ষে-বর্ষে আপন আসন অধিকার করেচে,—কিছুতেই এই সুগভীর শান্তি সৌন্দর্যের 'পরে, এই রসপরিপূর্ণ নির্মলতার উপরে, কোনো আঘাত করতে পারেনি। সেই কথা যখন মনে করি, তখন সামনের ঐ আকাশের দিকে চেয়ে যুগযুগান্তরের সেই শান্তি আমার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত ক্ষোভকে আপন অসীমতার মধ্যে মিশিয়ে নেয়।

আমি বুধবারে কী বলি তাই তুমি শুনতে চেয়েচ। যা বলি তা আমার ভালো মনে থাকে না। এন্ডরুজ উপাসনার পরেই আমার কাছে এসে একবার ইংরেজিতে তার ভাবখানা শুনে নেন, তাই খানিকটা মনে পড়ে। এবারে বলেছিলুম, জগতে একটা খুব বড়ো শক্তি হচ্চে প্রাণ, অথচ সেই শক্তি বাইরের দিক থেকে কত ছোটো, কত সুকুমার, একটু আঘাতেই ম্লান হয়ে যায়। এমন জিনিসটা প্রতি মুহূর্তে বিপুল জড়-বিশ্বের ভারাকর্ষণের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করে দাঁড়িয়ে আছে, বেড়িয়ে বেড়াচ্চে।

বালক অভিমন্যু যেমন সপ্তরথীর ব্যূহে ঢুকে লড়াই করেছিল, আমাদের সুকুমার প্রাণ তেমনি অসংখ্য মৃত্যুর সৈন্যদলের মধ্যে দিয়ে অহর্নিশি লড়াই করে চলেচে। বস্তুর দিক থেকে দেখলে দেখা যায়, এই প্রাণের উপকরণ অতি তুচ্ছ,—খানিকটা জল, খানিকটা কয়লা, খানিকটা ছাই, খানিকটা ঐ রকম সামান্য কিছু, অথচ প্রাণ আপনার ঐ বস্তুর পরিমাণকে বহু পরিমাণে অতিক্রম করে আছে। মৃত-দেহে সজীব-দেহে বস্তুপিণ্ডের পরিমাণের তফাত নেই, অথচ উভয়ের মধ্যকার তফাত অপরিসীম। শুধু তাই নয়, সজীব বীজের বর্তমান আবরণের মধ্যে

মহারণ্য লুকিয়ে আছে। ছোটোর মধ্যে এই-যে বড়োর প্রকাশ, এই হচ্ছে আশ্চর্য। আরেক শক্তি হচ্চে, মনের শক্তি। এই মনটি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় নিয়ে এই অসীম জগতের রহস্য আবিষ্কার করতে বেরিয়েচে। সেই ইন্দ্রিয়গুলি নিতান্ত দুর্বল। চোখ কতটুকুই দেখে, কান কতটুকুই শোনে, স্পর্শ কতটুকুই বোধ করে! কিন্তু মন এই আপন ক্ষুদ্রতাকে কেবলি ছাড়িয়ে যাচ্চে— অর্থাৎ সে যা, সে তার চেয়ে অনেক বড়ো। তার উপকরণ সামান্য হলেও সে অতি ক্ষুদ্র এবং অতি-বৃহৎ অতি-নিকট এবং অতি-দূরকে কেবলি অধিকার করচে। তা ছাড়া, তার মধ্যে যে-ভবিষ্যৎ প্রচ্ছন্ন, সেও অপরিমেয়। একটি ছোটো শিশুর মনের মধ্যেই নিউটনের, সেক্‌স্‌পীয়ারের মন লুকিয়ে ছিল। বর্বরতার যে-মন পাঁচের বেশি গণনা করতে পারত না, তারি মধ্যে আজকের সভ্যতার মন জ্ঞানের সাধনায় অভাবনীয় সিদ্ধিলাভ করেচে। শুধু তাই নয়, আরো ভবিষ্যতে সে-যে আরো কী আশ্চর্য চরিতার্থতা লাভ করবে, আজ আমরা তা কোনোমতেই কল্পনা করতে পারিনে। তা-হলেই দেখা যাচ্চে আমাদের এই-যে মন, যা এক দিকে খুব ছোটো, খুব দুর্বল দেখতে, আর-একদিকে তার মধ্যে যে-ভূমা আছে, হিমালয়-পর্বতের প্রকাণ্ড আয়তনের মধ্যে তা নেই। তেমনি আমাদের আত্মা ছোটো-দেহ, ছোটো-মন, ছোটো-সব প্রবৃত্তি দিয়ে ঘেরা, অনেক সময় তাকে যেন দেখতেই পাওয়া যায় না। কিন্তু তবু তার মধ্যেই সেই ভূমা আছেন। সেইজন্যেই তো এক দিকে আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আমাদের রাগ-বিরাগ যখন আমাদের কাছে অন্ন-বস্ত্র ও অন্য হাজার-রকম বাসনার জিনিসের জন্যে দরবার করচে, সেই মুহূর্তেই এই প্রবৃত্তির দাস, এই বাসনার বন্দী, বিশ্বের সমস্ত সম্পদ পায়ের নিচে ফেলে, উঠে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেচে,—অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, যা অসীম একেবারে তাকেই চাই। এত বড়ো চাওয়ার জোর এতটুকুর মধ্যে আছে কোথায়? সে-জোর যদি না থাকত, তবে এত বড়ো কথা তার মুখ দিয়ে বেরোত কেমন করে। এ-কথার কোনো মানে সে বুঝত কী করে। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্চে এই যে, মানবের আত্মা যা নিয়ে দেখচে, শুনচে, ছুঁচ্চে, খাওয়া-পরা করচে, তাকেই চরম সত্য বলতে চাচ্চে না;—যাকে চোখে দেখল না, হাতে পেল না, তাকেই বলচে সত্য। তার একটি মাত্র কারণ, ছোটোর মধ্যেই বড়ো আছেন, সেই বড়োই ছোটোর ভিতর থেকে মানুষের আত্মাকে কেবলি মুক্তির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্চেন—তাই মানুষের আশার অন্ত নেই। এখন প্রত্যেক মানুষের কাজ হচ্ছে কী। নিজের কথায়, চিন্তায়, ব্যবহারে এইটেই যেন প্রকাশ করি যে, আমাদের মধ্যে সেই বড়োই সত্য। তা না করে যদি মানুষের ছোটোটার উপরেই ঝোঁক দিই,—যে-সব বাসনা তার শিকল, তার গণ্ডি, যাতে তাকে খর্ব করে, আচ্ছন্ন করে, তাকেই যদি কেবল প্রশ্রয় দিই,—তাহলে মানুষকে তার সত্য পরিচয় থেকে ভোলাই। আত্মা-যে অমর, আত্মা-যে অভয়, আত্মা-যে সমস্ত সুখ-দুঃখ, ক্ষতি-লাভের চেয়ে বড়ো, অসীমের মধ্যেই-যে আত্মার আনন্দনিকেতন, এই কথাটি প্রকাশ করাই হচ্ছে মানুষের সমস্ত জীবনের অর্থ; এইজন্যেই আমরা এত শক্তি নিয়ে এত বড়ো জগতে জন্মেচি,—আমরা ছোটোখাটো এটা-ওটা-সেটা নিয়ে ভেবে কেঁদে মরতে আসিনি। ইতি ৪ঠা আশ্বিন, ১৩২৫।

১৯

শান্তিনিকেতন

তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেচ, "রবিদাদা" না বলে আমাকে আর একটা কোনো নামে সম্ভাষণ করতে পার কিনা। মহাভারতের সময়ে মানুষের এক-একজনের দশ-বিশটা করে নাম থাকত, যার যেটা পছন্দ বেছে নিতে পারত। কিম্বা যে-ছন্দে যেটা মেলাবার সুবিধে, লাগিয়ে দিত। অর্জুনের কত নাম-যে ছিল, তা অর্জুনকে রোজ বোধ হয় নামতা মুখস্থ করার মত মুখস্থ করতে হত। আমার যে আকাশের মিতাটি আছেন, তাঁরও নামের অভাব নেই। যদি তাঁর দুটো-একটা নাম ধার করে নিতে চাও, তাহলে বোধ হয় তাঁর বিশেষ কিছু লোকসান হবে না। কিন্তু যখন নাম-করণ করবে, তখন আমার সম্মতি নিলে ভালো হয়। প্রথম যখন আমার নামকরণ হয়, তখন কেউ আমার সম্মতি নেয়নি, তবু দেখতে পাচ্চি নামটা মন্দ হয়নি,— কিন্তু হঠাৎ যদি তোমার মার্তণ্ড নামটাই পছন্দ হয়, তাহলে কিন্তু আমি আপত্তি করব। 'ভানু' নামটা যদিচ খুব সুশ্রাব্য নয়, তবু ওটা আমি একবার নিজেই গ্রহণ করেছিলুম। আর এক হতে পারে, যদি "কবিদাদা" বলো। নামটা ঠিক সংগত হোক বা না হোক, ওটা আমার নিজের কাজের সঙ্গে মেলে—

এক-যে ছিল রবি,
সে গুণের মধ্যে কবি।

কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, "প্রিয় কবিদাদা" বললে চলবে না। প্রথম কারণ হচ্ছে এই—যে, তোমার প্রিয় কবি-যে কে, তা আমি ঠিক জানিনে। খুব সম্ভব যে-লোকটা সেই আশ্চর্য হিন্দী দোঁহা লিখেছিল সেই হবে। তার সঙ্গে ছ-অক্ষরের অনুপ্রাসে আমি-যে কোনোদিন পাল্লা দিতে পারব, এমন শক্তি বা আশা আমার নেই। দ্বিতীয় কারণ হচ্চে এই-যে, ইংরেজিতে 'প্রিয়' বলে না এমন মানুষই নেই—সে অমানুষ হলেও তাকে বলে,—এমন কি সে যদি দোঁহা না লিখতে পারে তবুও। আমার মত হচ্চে এই-যে, রাস্তা-ঘাটের সবাইকেই যদি 'প্রিয়' বলতে হবে এমন নিয়ম থাকে, তবে দুই-এক জায়গায় সে-নিয়মটা বাদ দেওয়া দরকার। অতএব আমাকে যদি শুধু "রবিদাদা" বল, তাহলে আমি বারণ করব না। এমন কি, যদি তোমার মার্তণ্ড নামটাই পছন্দ হয়, তাহলে "প্রিয় মার্তণ্ড দাদা" লিখো না। তাহলে বরঞ্চ লিখো, "মার্তণ্ডদাদা, প্রচণ্ড প্রতাপেষু।" যদি কোনোদিন তোমার সঙ্গে রাগারাগি করি, তাহলে ঐ নামে ডাকলেই হবে।

আমাদের আশ্রমের আকাশে শারদোৎসব আরম্ভ হয়েচে—শিউলিবন সাড়া দিয়েছে, মালতীলতার পাতায় পাতায় শুভ্রফুলের অসংখ্য অনুপ্রাস, কিন্তু রাত্রে চাঁদের আলোয় আকাশ-জোড়া একখানি মাত্র শুভ্রতা। আমাদের লাল রাস্তার দুইধারে কাশের গুচ্ছ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বাতাসে মাথা নত করে করে পথিকদের শারদ-সংগীত শুনিয়ে দিচ্চে। সমস্ত সবুজ মাঠে, সমস্ত শিশির-সিক্ত বাতাসে উৎসবের আনন্দ-হিল্লোল বয়ে যাচ্চে। অন্তরে বাইরে ছুটি, ছুটি, ছুটি—এই রব উঠেচে। ছুটিরও আর কেবল দুই সপ্তাহ বাকি আছে। আমাদের যখন ছুটি আরম্ভ, তখন তোমাদের শৈলপ্রবাস বোধ হয় সাঙ্গ হবে। পার্বতী যখন হিমালয়ে তাঁর পিতৃভবনে যাবেন, তখন তোমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সেখানে থাকবে না। হিমালয়ের খবর আমরা রাখিনে, কৈলাসের তো নয়ই; আমরা তো

এই স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি, স্বর্ণকিরণচ্ছটায় শারদা আমাদেরই ঘর উজ্জ্বল করে দাঁড়িয়েচেন। গোটাকতক মেঘ দিগন্তের কোণে মাঝে মাঝে জটলা করে; কিন্তু তাদের নন্দী-ভৃঙ্গীর মতো কালো চেহারা নয়, তারাও শ্বেতকিরণের মালা পরেচে, শ্বেত চন্দনের ছাপ লাগিয়েচে—ললাটে ভ্রূকুটির লেশ নেই। ইতি ৬ই আশ্বিন, ১৩২৫।

২০

শান্তিনিকেতন

প্রথম যখন তোমার চিঠি পেয়েছিলুম, তোমার চিঠিতে "প্রিয় রবিবাবু" পড়ে ভারি মজা লেগেছিল। ভাবলুম রবিবাবু আবার "প্রিয়" হবে কেমন করে? যদি হত "প্রিয় মিস্টার ট্যাগোর", তাহলে তেমন বেমানান হত না; কেননা রবিবাবু প্রিয়ও হতে পারে, অপ্রিয়ও হতে পারে। এবং প্রিয় অপ্রিয় দুইয়ের বাহিরও হতে পারে। তুমি যখন চিঠি লিখেছিলে, তখন রবিবাবু প্রিয়ও ছিল না, অপ্রিয়ও ছিল না, নিতান্ত কেবলমাত্র রবিবাবুই ছিল। কিন্তু চিঠির ভাষায় মিস্টার ট্যাগোরের 'প্রিয়' ছাড়া আর কিছু হবার জো নেই, তা আমার সঙ্গে তোমার ঝগড়াই থাক্ আর ভাবই থাক্। আজকাল রবিবাবু পরীক্ষায় একেবারে দু-তিন ক্লাস উঠে "রবিদাদা" হয়েছে কিন্তু যদি "প্রিয় রবিদাদা" লেখো, তবে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে। আর যদি বিশুদ্ধ বাংলামতে 'প্রিয়' লেখা হয়, তাহলে আপত্তি নেই বটে, তবু যখন আমি "রবিদাদা" তখন ওটা বাদ দিলেও চলে—ও যেন সকালবেলায় বাতি জ্বালানো, যেন, যার ফাঁসি হয়েচে, তাকে কুড়ি বৎসর দ্বীপান্তর দেওয়া। অতএব আমি যেন থানধুতি-পরা ঠাকুরদাদা, আমার কোনো পাড় নেই, আমি নিতান্তই যেন সাদা "রবিদাদা," কী বলো।

তোমরা মুক্তেশ্বরে গেচ শুনে সুখী হলুম। আমি ভ্রমণ করতে ভালোবাসি, কিন্তু ভ্রমণের কল্পনা করতে আমার আরো ভালো লাগে। কেননা, কল্পনার বেলায় রেলগাড়ি ঘটর ঘটর করে না, বেরেলিতে তিন চার ঘণ্টা বসে থাকতে হয় না, ডান্ডি অতি অনায়াসে এবং ঠিক সময়েই মেলে। তুমি তোমার নবীন দৃষ্টি নিয়ে নতুন নতুন দৃশ্য দেখচ, তোমার সেই আনন্দ আমি মনে মনে অনুভব করচি। আমি আমার এই খোলা ছাদে লম্বা কেদারায় শুয়ে শুয়ে, গিরিতটে তোমার দেবদারুবনে ভ্রমণের সুখ মনে মনে সঞ্চয় করি। আমিও প্রায় তোমার বয়সেই হিমালয়ে গিয়েছিলুম,—ড্যাল্‌হৌসীতে বক্রোটা শিখরের উপরে থাকতুম। এক একদিন আমাদের বাড়ির খানিক নিচে এক দেবদারুবনে সকালে একলা বেড়াতে যেতুম। আমি ছিলুম ছোট্ট (তখন লম্বায় ছ-ফুট ছিলাম না), তাই গাছগুলোকে এত প্রকাণ্ড বড়ো মনে হত—সে আর কী বলব। সেই সব গাছের সুদীর্ঘ ছায়ার মধ্যে নিজেকে দৈত্যলোকের অতি ক্ষুদ্র এক অতিথি বলে মনে হোত। কিন্তু সেই আমার ছেলেবেলাকার পর্বত, ছেলেবেলাকার বন এখন আর পাবো কোথায়? এখন আমার মনটা এই জগতের পথে এত নিজের সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে চলে-যে, নিজের চলার ধুলোয় এবং নিজের রথের ছায়ায় জগৎটা বারো আনা ঢাকা পড়ে যায়—বাজে ভাবনার ঝোঁকের মধ্য দিয়ে জগৎটাকে আর তেমন করে দেখা যায় না। তাই আজ

তুমি যে-পাহাড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, মনে হচ্ছে সে আমার সেই অল্প বয়সের পৃথিবীর পাহাড়, আমার সেই ৪৫।৪৬ বৎসরের আগেকার। আমরা পুরানো হয়ে উঠে নিজের হাজার রকম চিন্তায় এই পৃথিবীটাকে যতই জীর্ণ করে দিই না কেন, মানুষ আবার ছেলেমানুষ হয়ে, নূতন হয়ে, চির নূতন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। শুধু একদল মানুষ যদি চিরকাল বৃদ্ধ হতে হতে পৃথিবীতে বাস করত, তাহলে বিধাতার এই পৃথিবী তাদের নস্যে, তামাকের ধোঁয়ায়, তাদের পাকা বুদ্ধির আওতায়, একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেত, স্বয়ং বিধাতা তাঁর নিজের সৃষ্টি ঐ পৃথিবীকে চিনতে পারতেন না। কিন্তু জগতে শিশুর ধারা কেবলি আসচে। নবীন চোখ, নবীন স্পর্শ, নবীন আনন্দ ফিরে ফিরে মানুষের ঘরে অবতীর্ণ হচ্ছে। তাই প্রাচীনদের অসাড়তার আবর্জনা দিনে-দিনে, বারে-বারে, ধুয়ে-মুছে পৃথিবীর চিররহস্যময় নবীন রূপকে উজ্জ্বল করে রাখছে। অন্য মানুষের সঙ্গে কবিদের তফাত কী, জানো? বিধাতার নিজের হাতে তৈরী শৈশব কবিদের মন থেকে কিছুতে ঘোচে না। কোনোদিন তাদের চোখ বুড়ো হয় না, মন বুড়ো হয় না। তাই চিরনবীন এই পৃথিবীর সঙ্গে তাদের চিরদিনের বন্ধুত্ব থেকে যায়, তাই চিরদিনই তারা ছোটোদের সমবয়সী হয়ে থাকে। সংসারে বিষয়ের মধ্যে যারা বুড়ো হয়ে গেছে, তারা চন্দ্রসূর্য গ্রহ-তারার চেয়ে বয়সে বড়ো হয়ে ওঠে, তারা হিমালয়ের চেয়ে বড়োবয়সের। কিন্তু কবিরা সূর্য, চন্দ্র, তারার ন্যায় চিরদিনই কাঁচাবয়সী—হিমালয়ের মতোই তারা সবুজ থাকে, ছেলেমানুষীর ঝরনাধারা কোনোদিনই তাদের শুকোয় না; লোকালয়ে বিশ্বজগতের নবীনতার বার্তা এবং সংগীত চিরদিন তাজা রাখবার জন্যেই কবিদের দরকার—নইলে তারা আর সকল বিষয়েই অদরকারী।

উচ্চ-হাসে সকৌতুকে চির-প্রাচীন গিরির বুকে
ঝরে পড়ে চির-নূতন ঝরনা;
নৃত্য করে তালে তালে প্রাচীন বটের ডালে ডালে
নবীন পাতা ঘন-শ্যামল-বর্ণা।
পুরানো সেই শিবের প্রেমে নূতন হয়ে এল নেমে
দক্ষসুতা ধরি উমার অঙ্গ,
এম্নি করে সারাবেলা চলছে লুকোচুরি খেলা
নূতন পুরাতনের চিররঙ্গ।

ইতি ১৪ই আশ্বিন, ১৩২৫।

২৯

শান্তিনিকেতন

আচ্ছা বেশ, রাজি। ভানুদাদা নামই বহাল হল। এ নামে আজ পর্যন্ত আমাকে কেউ ডাকেনি, আর কেউ যদি ডাকে তবে তার উত্তর দেব না। সিণ্ডারেলার গল্প জান তো? তার একপাটি জুতো নিয়ে রাজার ছেলে পা মেপে বেড়াতে লাগল।

আমার ভানু নামটা সেই রকম একপাটি; যদি কেউ ব্যবহার করতে যায়, আমি তখন বলতে পারব—আচ্ছা আগে নিজের নামের পাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। যার নাম সুরবালা, সে বলবে সুরো সুরু সুরি—কিছুতেই ভানুর সঙ্গে মিলবে না, যার নাম মাতঙ্গিনী সে বলবে মাতু, মাতি, মাত্রো—কিছুতেই মিলবে না, তিনকড়িরও সেই দশা, কাত্যায়নীরও তাই; জগদম্বা, পীতাম্বরী, গুরুদাসী, শঙ্খেশ্বরী, নগেন্দ্রমোহিনী, কারোই কাছে ঘেঁষবার জো নেই। ভারি সুবিধে হয়েছে। কেবল আমার মনে ভারি ভয় রয়ে গেল, পাছে কারো নাম থাকে "কানু বিলাসিনী।" তবে তাকে কী বলে ঠেকাব? তুমি ভেবে রেখে দিয়ো।

ছুটির দিন এল—পরশু ছুটি, তারপরে কী করব? তখন কেবল শিউলিবন, শিশির-ভেজা ঘাস, আর দিগন্ত-প্রসারিত মাঠ আমার মুখ তাকিয়ে থাকবে। তারা তো আমার কাছে ইংরেজি শিখতে চায় না—তারা চায় আমার মনের মধ্যে যে আনন্দের সোনার কাঠি আছে সেইটে ছুঁইয়ে দিয়ে তাদের জাগিয়ে তুলব এবং আমার চেতনার সঙ্গে তাদের সৌন্দর্যকে মিলিয়ে দেব। আমার জাগরণের ছোঁয়াচ না লাগলে পরে প্রকৃতি জাগবে কী করে? নীলাকাশের কিরণকমলের উপরে শারদলক্ষ্মী আসন গ্রহণ করেন, কিন্তু আমার আনন্দ-দৃষ্টি না পড়লে পরে সে-পদ্মই ফোটে না।

আজ বুধবার। আজ মন্দিরে ছুটির ঠাকুরের কথা বলেচি। যখন আমরা কাজ করতে থাকি, তখন শক্তির সমুদ্র থেকে আমাদের মধ্যে জোয়ার আসে, তখন আমরা মনে করি এ শক্তি আমারই এবং এই শক্তির জোরেই আমরা বিশ্বজয় করব। কিন্তু শক্তিকে বরাবর খাটাতে তো পারিনে—সন্ধ্যা যখন আসে তখন তো কাজ বন্ধ হয়, তখন তো আর গাণ্ডীব তুলতে পারিনে। তাই জোয়ার ভাঁটার ছন্দকে জীবের মেনে চলা চাই। একবার আমি, একবার তুমি। সেই তুমিকে বাদ দিয়ে যখন মনে করি আমিই কর্তা, তখনই জগতে মারামারি বেধে যায়—রক্তে ধরণী পঙ্কিল হয়ে ওঠে। মা তাঁর মেয়েকে ডেকে বলেন, সংসারের কাজে তুমি আমার সঙ্গে লেগে যাও, মেয়ে তখন কোমর বেঁধে লাগে, কিন্তু সে যখন ভুলে যায়-যে, এই কাজ তার মায়ের সংসারেরই কাজ, যখন অহংকার করে ভাবে 'আমি যেমন ইচ্ছা তাই করব,' তখন সে সংসারের ব্যবস্থাকে উলট পালট্ করে জঞ্জাল জমিয়ে তোলে—অবশেষে এমন হয়-যে, মা ঝাঁটা হাতে নিয়ে সমস্ত আবর্জনা ঝেঁটিয়ে ফেলেন। মেয়ের সেই কাজটুকুর উপরে ঝাঁটা পড়ে না—যখন সে-কাজ মায়ের সংসার-ব্যবস্থার সঙ্গে মেলে। সংসার-স্থিতির সঙ্গে এই-যে মিলিয়ে কাজ করা, এতে আমাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে—অর্থাৎ মিল রেখেও আমরা তার মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য রাখতে পারি—তাতেই সৃষ্টির বৈচিত্র্য। মেয়ের হাতের কাজটুকু মায়ের অভিপ্রায়কে প্রকাশ করেও নিজেকে বিশিষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারে। যখন তাই সে করে তখন তার সেই সৃষ্টি মায়ের সৃষ্টির সঙ্গে মিলে স্থিতি লাভ করে। বিশ্বকর্মার কাজে আমরা যখন যোগ দিই তখন যে-পরিমাণে তাঁর সঙ্গে মিল রেখে, ছন্দ রেখে চলি সেই পরিমাণে আমাদের কাজ অক্ষয়কীর্তি হয়ে ওঠে,—যে-পরিমাণে বাধা দিই সেই পরিমাণে আমরা প্রলয়কে ডেকে আনি। নিজের জীবনকে এই প্রলয় থেকে যদি বাঁচাতে চাই তাহলে প্রতিদিনই আমি-তুমির ছন্দ মিলিয়ে চলতে হবে—সেই ছন্দেই মানুষের সৃষ্টি, মানুষের ইতিহাস অমরতা লাভ করে। দেখচ তো, মা আজ পশ্চিমের ঘরে কী রকম প্রলয়ের সম্মার্জনী নিয়ে বেরিয়েচেন। পশ্চিমের সভ্যতা মনে করছিল, তার শক্তি তার নিজেরই ভোগ নিজেরই সমৃদ্ধির জন্যে।

সে আমি-তুমির ছন্দকে একেবারে মানেনি। কিছুদূর পর্যন্ত সে বেড়ে উঠল। মনে করল সে বেড়েই চলবে— এমন সময়ে ছন্দের অমিল ঘোচাবার জন্যে হঠাৎ এক মুহূর্তেই মায়ের প্রলয় অনুচর এসে হাজির। এখন কান্না, আর বক্ষে করাঘাত। ইতি ১৬ই আশ্বিন, ১৩২৫।

২২

শান্তিনিকেতন

মাদ্রাজের দিকে যে-দিন যাত্রা করেছিলুম সে-দিন শনিবার এবং সপ্তমী, অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্যারই মতো দিনক্ষণের বিদ্যা আমার জানা নেই। বলতে পারিনে আমার যাত্রার সময় লক্ষকোটি যোজন দূরে গ্রহনক্ষত্রের বিরাট সভায় আমার এই ক্ষুদ্র মাদ্রাজ ভ্রমণ সম্বন্ধে কী রকম আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু তার ফলের থেকে বোঝা যাচ্চে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে ঘোরতর মতভেদ হয়েছিল। সেইজন্যে আমার ভ্রমণপথের হাজার মাইলের মধ্যে ছ-শো মাইল পর্যন্ত আমি সবেগে সগর্বে এগোতে পেরেছিলুম। কিন্তু বিরুদ্ধ জ্যোতিষ্কের দল কোমর বেঁধে এমনি অ্যাজিটেশন করতে লাগল যে, বাকি চারশো মাইলটুকু আর পেরোতে পারা গেল না। জ্যোতিষ্ক-সভায় কেবলমাত্র আমারই যাত্রা সম্বন্ধেই-যে বিচার হয়েছিল তা নয়— বেঙ্গল-নাগপুর রেলোয়ে লাইনের যে এঞ্জিনটা আমার গাড়ি টেনে নিয়ে যাবে, মঙ্গল, শনি এবং অন্যান্য ঝগড়াটে গ্রহেরা তার সম্বন্ধেও প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করেছিল— যদি বল সে-সভায় তো আমাদের খবরের কাগজের কোনো রিপোর্টার উপস্থিত ছিল না তবে আমি খবর পেলুম কোথা থেকে, তবে তার উত্তর হচ্চে এই যে আইনকর্তারা তাঁদের মন্ত্রণা-সভায় কী আইন পাশ করেচেন তা তাঁদের পেয়াদার গুঁতো খেলেই সবচেয়ে পরিষ্কার বোঝা যায়। যে মুহূর্তে হাওড়া স্টেশনে আমার রেলের এঞ্জিন বাঁশি বাজালে, সে-বাঁশির আওয়াজে কত তেজ, কত দর্প। আর রবীন্দ্রনাথ ওরফে ভানুদাদা নামক যে-ব্যক্তি তোরঙ্গ বাক্স ব্যাগ বিছানা গাড়িতে বোঝাই করে তার তক্তর উপরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইলেকট্রিক পাখার চলচ্চক্র-গুঞ্জন-মুখর রথকক্ষে একাধিপত্য বিস্তার করলেন, তারই বা কত আশ্বস্ততা। তার পরে কত গড় গড়, খড় খড়, ঝর ঝর, ভোঁ ভোঁ, ঢং ঢং, স্টেশনে স্টেশনে কত হাঁকডাক, হাঁসফাঁস, হন্‌ হন্‌, হট্‌ হট্‌, আমাদের গাড়ির দক্ষিণে বামে কত মাঠ বাট বন জঙ্গল নদী নালা গ্রাম শহর মন্দির মসজিদ কুটীর ইমারত— যেন বাঘে তাড়া করা গোরুর পালের মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাদের বিপরীত দিকে ছুটে পালাতে লাগল। এমনি ভাবে চলতে চলতে যখন পিঠাপুরমে পৌঁছতে মাঝে কেবল একটা স্টেশন মাত্র আছে, এমন সময় এঞ্জিনটার উপরে নক্ষত্র-সভার অদৃশ্য পেয়াদা তার অদৃশ্য পরোয়ানা হাতে নিয়ে নেবে পড়ল, আর অমনি কোথায় গেল তার চাকার ঘুরনি, তার বাঁশির ডাক, তার ধুমোদ্গার, তার পাথুরে কয়লার ভোজ! পাঁচ মিনিট যায়, দশ মিনিট যায়, বিশ মিনিট যায়, এক ঘণ্টা যায়, স্টেশন থেকে গাড়ি আর নড়েই না। সাড়ে পাঁচটায় পিঠাপুরমে পৌঁছবার কথা কিন্তু সাড়ে ছটা, সাড়ে সাতটা বাজে তবু এমনি সমস্ত স্থির হয়ে রইল যে, "চরাচরমিদং সর্বং" যে চঞ্চল, এ কথাটা মিথ্যা বলে বোধ হল। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ধক্‌ ধক্‌ ধুক্‌ ধুক্‌

করতে করতে আর একটা এঞ্জিন এসে হাজির। তার পরে রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আমি যখন পিঠাপুরমে রাজবাড়িতে গিয়ে উঠলুম তখন আমার মনের অবস্থাটা দেখি ঠিক সেই এঞ্জিনেরই মতো। মনকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কেমন হে, মাদ্রাজে যাচ্ছ তো? সেখান থেকে কাঞ্চি মদ্র অন্ধ্র পৌণ্ড্র প্রভৃতি কত দেশ দেশান্তর দেখবার আছে, কত মন্দির কত গুহা, কত তীর্থ ইত্যাদি ইত্যাদি",—আমার মন সেই এঞ্জিনটার মতো চুপ করে গম্ভীর হয়ে রইল, সাড়াই দেয় না। স্পষ্ট বোঝা গেল, দক্ষিণের দিকে সে আর এক পাও বাড়াবে না। মনের সঙ্গে বেঙ্গল-নাগপুরের এঞ্জিনের একটা মস্ত প্রভেদ এই যে, এঞ্জিন বিগড়ে গেলে আর একটা এঞ্জিন টেলিফোন করে আনিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু মন বিগড়োলে সুবিধামতো আর একটা মন পাই কোথা থেকে। সুতরাং মাদ্রাজ চারশো মাইল দূরে পড়ে রইল আর আমি গতকল্য শনিবার মধ্যাহ্নে সেই হাবড়ায় ফিরে এলুম। যে শনিবার একদা তার কৌতুকহাস্য গোপন করে মাদ্রাজের গাড়িতে চড়িয়ে দিয়েছিল সেই শনিবারই আর একদিন আমাকে হাওড়ায় নামিয়ে দিয়ে তার নিঃশব্দ অট্টহাস্যে মধ্যাহ্ন আকাশ প্রতপ্ত করে তুললে। এই তো গেল আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। কিন্তু তুমি যখন হিমালয় যাত্রায় বেরিয়েছিলে তখন নক্ষত্র-সভায় তোমার সম্বন্ধেও তো ভালো রেজোল্যুশন্ পাস হয়নি। আমরা সবাই স্থির করলুম, গিরিরাজের শুশ্রূষায় তুমি সেরে আসবে। কিন্তু তারাগুলো কেন কুমন্ত্রণা করতে লাগল। আমার বিশ্বাস কী জানো, অনেকগুলো ঈর্ষাপরায়ণ তারা আছে, তারা তোমার ভানুদাদাকে একেবারেই পছন্দ করে না। প্রথমত, আমার নামটাই তাদের অসহ্য বোধ হয় এইজন্যে বদনাম করবার সুবিধা পেলে ছাড়ে না। তারপরে দেখেছে আমার সঙ্গে আকাশের মিতার খুব ভাব আছে সেইজন্যে নক্ষত্রগুলো আমাকে তাদের শত্রুপক্ষ বলে ঠিক করেছে। যাই হোক, আমি ওদের কাছে হার মানবার ছেলে নই। ওরা যা করবার করুক, আমি দিনের আলোর দলে রইলুম। তোমাকে কিন্তু কুচক্রী নক্ষত্রগুলোর উপরে টেক্কা দিতে হবে। বেশ শরীরটাকে সেরে নিয়ে, মনটাকে প্রফুল্ল করে হৃদয়টাকে শান্ত করো, জীবনটাকে পূর্ণ করো। তারপরে লক্ষ্যকে ঊর্ধ্বে রেখে অপরাজিত চিত্তে সংসারের সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে চলে যাও—কল্যাণ লাভ করো এবং কল্যাণ দান করো। নিজের বাসনাকে উদ্দাম করে না তুলে মঙ্গলময়ের শুভ ইচ্ছাকে নিজের অন্তরে বাহিরে সার্থক করো। ইতি ২০ অক্টোবর, ১৯১৮।

২৩

শান্তিনিকেতন

আমার ভ্রমণ শেষ হল। যেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করেছিলুম সেইখানেই আবার এসে ফিরেছি। সকলেই পরামর্শ দিয়ে থাকে, ছুটি পেলেই স্থান এবং বায়ু পরিবর্তন করা দরকার কিন্তু দেখা গেল, সেটা যে অনাবশ্যক এবং ক্লেশকর—সেইটে ভালো করে বুঝে দেখবার জন্যেই কেবল পরিবর্তনের দরকার। আসল দরকার, যেখানে আছি সেইখানেই মনটাকে সম্পূর্ণ এবং সচেতন ভাবে ঢেলে দেওয়া। এই-যে মাঠ আমার চোখে পড়ছে এর কি দেখবার যোগ্য রস ফুরিয়ে গেছে। আর এই যে শিশিরার্দ্র সকালবেলাটি তার কিরণ দলের মাঝখানে আমার মনকে মধুপান-

রত স্তব্ধ ভ্রমরের মতো স্থান দিয়েছে, এ কি কোনোকালে এর বৃন্ত থেকে ঝরে পড়বে। আসল কথা, মনটা অসাড় হলেই তাকে সাড়া দেবার জন্যে নাড়া দিতে হয়। তাই আমাদের সাধনা হওয়া উচিত, কী করলে আমাদের মন অসাড় না হয় তাহলেই নিজের মধ্যে নিজের সম্পদ লাভ করতে পারি, কেবলি বাইরের জন্যে ছটফট করতে হয় না। আমাদের যা-কিছু সবচেয়ে বড়ো সম্পদ, সবচেয়ে বড়ো আনন্দ—তার ভাণ্ডার যদি বাইরে থাকে তাহলে আমাদের ভারি মুশকিল, কেননা, বাইরের পথে বাধা ঘটবেই, বাইরের দরজা মাঝে মাঝে বন্ধ হবেই। বাইরের কাছে থেকে ভিক্ষা চাওয়ার অভ্যাস আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের ইচ্ছা বাইরের দিকে বাধা পেলেও আমরা যেন অন্তরের মধ্যে পূর্ণতা অনুভব করে শান্তি পেতে পারি। নইলে, নিজেও অশান্ত হই—চারিদিককেও অশান্ত করে তুলি। এই সংসার থেকে যে-প্রীতি, যে-কল্যাণ আমরা অন্তরের মধ্যে পেয়েচি সেই আমাদের অন্তরতম লাভের জন্যে যেন আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ হই। বাইরের দিকে যে-কিছু জিনিস পাইনি, সে-দিক থেকে যা-কিছু বাধা আসচে, তারই ফর্দটাকে লম্বা করে তুলে যদি খুঁতখুঁত করি, ছটফট করতে থাকি তাহলে অকৃতজ্ঞতা হয় এবং সেই চঞ্চলতা নিতান্তই বৃথা নিজের অন্তর-বাহিরকে আবৃত করে মাত্র। স্থির হব, প্রশান্ত হব, মনকে প্রসন্ন রাখব তাহলেই আমাদের মন এমন একটি স্বচ্ছ আকাশে বাস করবে যাতে করে অমৃতলোক থেকে আনন্দ-জ্যোতি আমাদের মনকে স্পর্শ করতে বাধা পাবে না। তোমার প্রতি তোমার ভানুদাদার এই আশীর্বাদ যে, তুমি আপনার ইচ্ছাকে একান্ত তীব্র করে চিত্তকে কাঙালবৃত্তিতে দীক্ষিত কোরো না—বিধাতার কাছ থেকে যা-কিছু দান পেয়েচ তাকে অন্তরের মধ্যে নম্রভাবে গ্রহণ এবং অবিচলিতভাবে রক্ষা কোরো। শান্তি হচ্ছে সত্য উপলব্ধি করবার সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা—সংসারের অনিবার্য আঘাতে ব্যাঘাতে, ইচ্ছার অনিবার্য নিষ্ফলতায় সেই সুস্নিগ্ধ শান্তি যেন তোমার মধ্যে বিক্ষুব্ধ না হয়। ইতি ১০ই কার্তিক, ১৩২৫।

২৪

শান্তিনিকেতন

এতক্ষণ তুমি রেলগাড়িতে ধক্ ধক্ করতে করতে চলেচ, কত স্টেশন পার হয়ে চলে গিয়েচ—আমাদের এই লাল মাটির, এই তালগাছের দেশ হয়তো ছাড়িয়ে গেছ বা। আমার পূর্বদিকের দরজার সামনে সেই মাঠে রৌদ্র ধু ধু করচে এবং সেই রৌদ্রে নানা রঙের গোরুর পাল চরে বেড়াচ্ছে। এক-একটা তালগাছ তাদের ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে পাগলার মতো দাঁড়িয়ে আছে। আজ দিনে আমার সেই বড়ো চৌকিতে বসা হল না—খাওয়ার পর এণ্ডরুজ্ সাহেব এসে আমার সঙ্গে বিদ্যালয়ের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা করলেন তাতে অনেকটা সময় চলে গেল। তারপরে নগেনবাবু নামক এখানকার একজন মাস্টার তাঁর এক মস্ত তর্জমা নিয়ে আমার কাছে সংশোধন করবার জন্যে আনলেন, তাতেও অনেকটা সময় চলে গেল। সুতরাং বেলা তিনটে বেজে গেচে তবু আমি আমার সেই ডেস্কে বসে আছি। বই, কাগজ, খাতা, দোয়াত, কলম, ওষুধের শিশি এবং

অন্য হাজার রকম জবড়জঙ্গ্ জিনিসে আমার ডেস্ক পরিপূর্ণ। তার মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা আছে, যা এখনি টেনে ফেলে দিলেই চলে; কিন্তু কুঁড়ে মানুষের মুশকিল এই-যে, আবশ্যকের জিনিস সে খুঁজে পায় না আর অনাবশ্যক জিনিস না খুঁজলেও তার সঙ্গে লেগেই থাকে। এমন অনেক ছেঁড়া লেফাফা কাগজ চাপা দিয়ে জমানো রয়েচে যার ভিতরকার চিঠিরই কোনো উদ্দেশ পাওয়া যায় না। মনে আছে, আমাকে তোমার রূপকথা পাঠিয়ে দিতে হবে সেই অলাবু-নন্দিনীর "কাহিনী" আর সেই "চম্‌কিলা" "সোনেকিতরহ" চুলওয়ালী রাজকুমারীর কথা। তা ছাড়া, আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, মন খারাপ কোরো না—লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে ঘর উজ্জ্বল করে থাকবে। সকলেই বলবে, তুমি এমন সোনেকিতরহ হাসি পেয়েচ কোন্ পারিজাতের গন্ধ থেকে, কোন্ নন্দন-বীণার ঝংকার থেকে, কোন্ প্রভাত-তারার আলোক থেকে, কোন্ সুর-সুন্দরীর সুখস্বপ্ন থেকে, কোন্ মন্দাকিনীর চলোর্মি কল্লোল থেকে, কোন্—কিন্তু আর দরকার নেই, এখনকার মতো এই ক-টাতেই চলে যাবে—কেননা কাগজ ফুরিয়ে এসেচে, দিনও অবসন্ন-প্রায়, অপরাহ্ণের ক্লান্ত রবির আলোক ম্লান হয়ে এসেচে।
২ অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

২৫

শান্তিনিকেতন

কাল তোমার চিঠি পেয়েচি, আমার চিঠিও নিশ্চয় তুমি পেয়েচ। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বেশ হাসিমুখে সেই বাংলা মহাভারত এবং চারুপাঠ পড়চ। যে তোমাকে দেখচে, সেই মনে করচে—চারুপাঠের মধ্যে খুব মনোহর গল্প এবং তোমার শিশু-মহাভারতের মধ্যে খুব মজার কথা কিছু বুঝি আছে। কিন্তু তারা জানে না, প্রায় দু-শো ক্রোশ তফাত থেকে ভানুদাদা তোমাকে খুশি পাঠিয়ে দিচ্চে—এত খুশি-যে, কার সাধ্য তোমাকে বিরক্ত করে, বা রাগায়, বা দুঃখ দেয়। আমি প্রায় সন্ধ্যাবেলায় সেই-যে গান গাই,—"বীণা বাজাও মম অন্তরে" সেই গানটি তোমার মনের মধ্যে বরাবরকার মতো স্বরলিপি করে লিখে রেখে দেবার ইচ্ছা আছে—মনটি গানের সুরে এমনি বোঝাই হয়ে থাকবে যে, বাহিরের তুফানে তোমাকে নাড়া দিতে পারবে না। শুধু তোমাকে বলচিনে, আমারও ভারি ইচ্ছে, নিজের ভরা মনটির মাঝখানে বেশ নিবিষ্ট হয়ে বসে বাইরের সমস্ত যাওয়া-আসা কাঁদা-হাসার অনেক উপরে স্থির হয়ে থাকতে পারি। আপনার ভিতরে আপনার চেয়ে বড়ো কাউকে যদি ধরে রাখা যায় তাহলেই সেই ভিতরের গৌরবে বাহিরের ধাক্কাকে একটুও কেয়ার না করবার শক্তি আপনিই আসে। সেই ভিতরের ধনকে ভিতরে পেয়ে ভিতরে ধরে রাখবার জন্যেই আকাঙ্ক্ষা করচি। বাইরের কাছে যখনই কাঙালপনা করতে যাই তখনই সে পেয়ে বসে, তার আর দৌরাত্ম্যের অন্ত থাকে না—সে যতটুকু দেয় তার চেয়ে দাবি ঢের বেশি করে—সে এমন মহাজন-যে, শতকরা পাঁচশো টাকা সুদ আদায় করতে চায়। সে শাইলক্, সামান্য টাকা দেয় কিন্তু ছুরি বসিয়ে রক্তে মাংসে তার শোধ নেবার দাবি করে। তাই ইচ্ছে করি, বাহিরটাকে ধার দেব কিন্তু ওর কাছ থেকে সিকি পয়সা ধার নেব না। এই আমার মতলবের কথাটা তোমার কাছে বলে

রাখলুম। তোমার গণনামতে আমার যখন আটাশ বৎসর বয়স হবে ততদিনে যদি মতলব সিদ্ধি হয় তাহলে বেশ মজা হবে। এখানকার খবর সব ভালো, সাহেব গেচে বাঁকিপুরে, দিনু, কমল এসেচে আমার ঘরের একতলায়, আমি সেই অনুবাদের কাজে ভূতের মতো খাটচি। কিন্তু ভূত-যে খুব বেশি খাটে—এ অখ্যাতি তার কেন হল বল দেখি। কথাটা সত্য হলে তো মরেও শান্তি নেই।

২৬

শান্তিনিকেতন

এখনও আমার কাজের ভিড় কিছুই কমেনি। সবাই মনে করে—আমি কবি মানুষ, দিনরাত্রি আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের খেলা দেখি, হাওয়ার গান শুনি, চাঁদের আলোয় ডুব দিই, ফুলের গন্ধে মাতাল হই, পল্লব-মর্মরে থর থর করে কাঁপি, ভ্রমর-গুঞ্জনে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে যাই ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব হল হিংসের কথা। তারা জাঁক করে বলতে চায়-যে তারা কবিতা লেখে না বটে কিন্তু হপ্তায় সাতদিন করে আফিসে যায়, আদালত করে, খবরের কাগজ চালায়, বক্তৃতা দেয়, ব্যাবসা করে, তারা এত বড়ো ভয়ংকর কাজের লোক। আফিসের ছুটি নিয়ে তারা একবার এসে দেখে যাক— আমি কাজ করি কিনা। আচ্ছা, তারা খুব কাজ করতে পারে—আমি না হয় মেনে নিলুম, কিন্তু খুব কাজ না করতে পারে এমন শক্তি কি তাদের আছে। যেই তাদের হাতে কাজ না থাকে অমনি তারা হয় ঘুমোয়, নয় তাস খেলে, নয় মদ খায়, নয় পরের নিন্দে করে, কী করে যে সময় কাটাবে, ভেবেই পায় না। আমার সুবিধা এই-যে, যখন কাজ থাকে তখন রীতিমতো কাজ করি, আবার, যখন কাজ না থাকে তখন খুব কষে কাজ না করতে পারি— তার কাছে কোথায় লাগে তোমার বাবার কমিটি-মীটিং। যখন কাজ না-করার ভিড় পড়ে তখন তার চাপে আমাকে একেবারে রোগা করে দেয়। সম্প্রতি কিন্তু কাজ করাটাই আমার ঘাড়ে চেপেচে, তাই সেই নাটকটা আর এক অক্ষরও লিখতে পারিনি। এই গোলমালের মধ্যে যদি লিখতে যাই আর যদি তাতে গান বসাই তবে তার ছন্দ আর মিল অনেকটা তোমার শিশু-মহাভারতেরই মতো হয়ে উঠবে। চিঠিতে যে-ছবি এঁকেচ—খুব ভালো হয়েচে। মেয়েটিকে দেখে বোধ হচ্চে—ওর ইস্কুলে যাবার তাড়া নেই, ঘরকন্নার কাজের ভিড়ও বেশি আছে বলে মনে হচ্চে না; ওর চুলের সমস্ত কাঁটা রাস্তায় পড়ে গেচে, আর "গহনা ওয়ছনা" "চুনারি উনারি"র কোনোও ঠিকানা নেই। "কদু"র ভিতর থেকে-যে "দুলহীন" বেরিয়ে এসেছিল এ মেয়ে বোধ হয় সে নয়, এর নাম কী লিখে পাঠিয়ো। ইতি ৯ অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

২৭

শান্তিনিকেতন

আজকের তোমাকে সব খবরগুলি দেওয়া যাক্। অনেক দিন পরে আজ আমার ইস্কুল খুলেচে, আজ থেকে ইস্কুল-মাস্টারি ফের শুরু হল। আজ সকালে তিনটে ক্লাস নিয়েচি। কিন্তু ছেলেরা সব আসেনি, খুব কম এসেচে। বোধ হয়, ব্যামোর ভয়ে আসচে না। আমার বৌমা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেছেন, জিজ্ঞাসা করেচ। তিনি পাড়াতেই আছেন। আমি যে ঘরে থাকি—তার সামনে এক লাল রাস্তা আছে, তার ঠিক ওধারেই এক দোতলা ইমারত তৈরি হচ্চে—তারই একতলা ঘরে তিনি বাস করেন। শ্রীমতী তুলসীমঞ্জরী তাঁকে অচ্ছী অচ্ছী কাহিনী শুনাতী হৈ, কিন্তু আমি সেটা আন্দাজে বলচি। কিছুকাল থেকে তার কণ্ঠস্বরও শুনিনি, তাকে দেখতেও পাইনি—তাই আশঙ্কা হচ্চে সে হয়তো তার সেই রূপকথার "কদু"র মধ্যে ঢুকে পড়েচে। যাই হোক, পাড়ার সমস্ত খবর রাখবার সময় আমি পাইনে, আমি কখনও বা আমার সেই কোণের ডেস্কে কখনও বা সেই লাইব্রেরি ঘরের টেবিলে ঘাড় হেঁট করে কলম চালিয়ে দিনযাপন করচি। সামনেকার খাতা-পত্রের বাইরে যে-একটি প্রকাণ্ড জগৎ আছে, তার প্রতি ভালো করে চোখ তুলে-যে দেখা, সে আর দিনের আলো থাকতে ঘটে উঠচে না। সন্ধ্যার পরে সেই নিচের বারান্দায় খাবার টেবিলটা ঘিরেই বৈঠক হয়, সেখানে তর্ক হয় বিতর্ক হয় এবং মাঝে মাঝে গানও হয়ে থাকে। কারণ—আজকাল ফের আবার দুটি একটি করে গান জমচে। সন্ধ্যার পরে সেই আমার কোণের বিছানায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে কেরোসিনের আলোয় মৃদুমন্দস্বরে খাতা পেনসিল হাতে গান করি আর পশ্চিমের উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে—তুমি ভাবচ সেই বাতায়ন থেকে স্বর্গের অপ্সরীরা আমার গান শুনতে আসেন—ঠিক তা নয়—সেই উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে কীট-পতঙ্গ আসতে থাকে,—তাও যদি তারা আমার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে আসত তাহলেও আমি মনে মনে একটু অহংকার করতে পারতুম,—তারা আসে ঐ ডীটজ লণ্ঠনের কেরোসিন আলোটা লক্ষ্য করে। উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে হঠাৎ এক-একবার—আন্দাজ করে বল দেখি কী শুনতে পাই। তুমি ভাবচ, নক্ষত্র-লোক থেকে অনাহত বীণার অশ্রুত গীত-ধ্বনি? তা নয়:—এক সঙ্গে ভোঁদা, দানু, টম, রঞ্জু এবং এ মুল্লুকের যত দিশি কুকুরের তুমুল চীৎকার-শব্দ। যদি এরা আমার গান শুনে বাহবা দেবার জন্যে এই আওয়াজ করত তাহলেও বুঝতুম—কবির গানে চতুষ্পদ জন্তুরা পর্যন্ত মুগ্ধ—কিন্তু তা নয়, তারা স্বজাতি আগন্তুকের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে স্বর্গ-মর্ত্যকে চঞ্চল করে তোলে—কবির গানে তারা কর্ণপাতও করে না। যাই হোক, ভূতলের কুকুর থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত সবাই যদিচ উদাসীন তবুও দুটো একটা করে গান জমচে। ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

২৮

শান্তিনিকেতন

আজ দুপুরবেলায় যখন খেতে বসেচি, এমন সময়—রোসো, আগে বলেনি কী খাচ্ছিলুম—খুব প্রকাণ্ড মোটা একটা রুটি—কিন্তু মনে কোরো না তার সবটাই আমি খাচ্ছিলুম। রুটিটাকে যদি পূর্ণিমার চাঁদ বলে ধরে নেও তাহলে আমার টুকরোটি দ্বিতীয়ার চাঁদের চেয়ে বড়ো হবে না। সেই রুটির সঙ্গে কিছু ডাল ছিল, আর ছিল চাটনি আর একটা তরকারিও ছিল। যা হোক, বসে বসে রুটি চিবোচ্চি, এমন সময়—রোসো, আগে বলে নিই রুটি, ডাল, চাটনি এল কোথা থেকে।—তুমি বোধ হয় জান, আমার এখানে প্রায় পঁচিশজন গুজরাটি ছেলে আছে—আমাকে খাওয়াবে বলে তাদের হঠাৎ ইচ্ছা হয়েছিল। তাই আজ সকালে আমার লেখা সেরে স্নানের ঘরের দিকে যখন চলেচি, এমন সময় দেখি, একটি গুজরাটি ছেলে থালা হাতে করে আমার দ্বারে এসে হাজির। যা হোক, নিচের ঘরে টেবিলে বসে বসে রুটির টুকরো ভাঙচি আর খাচ্চি, আর তার সঙ্গে একটু একটু চাটনিও মুখে দিচ্চি, এমন সময়—রোসো, আগে বলে নিই, খাবার কী রকম হয়েছিল। রুটিটা বেশ শক্ত-গোছের ছিল; যদি আমাকে সম্পূর্ণ চিবিয়ে সবটা খেতে হত তাহলে আমার একলার শক্তিতে কুলিয়ে উঠত না, মজুর ডাকতে হত। কিন্তু ছিঁড়তে যত শক্ত মুখের মধ্যে ততটা নয়। আবার রুটিটা মিষ্টি ছিল; ডাল তরকারি দিয়ে মিষ্টি রুটি খাওয়া আমাদের আইনে লেখে না, কিন্তু খেয়ে দেখা গেল-যে, খেলে-যে বিশেষ অপরাধ হয় তা নয়। সেই রুটি খাচ্চি, এমন সময়—রোসো, ওর মধ্যে একটা কথা বলতে একেবারেই ভুলে গেচি, দুটো পাঁপর-ভাজাও ছিল; সে-দুটো, আমি যাকে বলে থাকি সুশ্রাব্য—অর্থাৎ খেতে বেশ ভালো লাগে। শুনে তুমি হয়তো আশ্চর্য হবে এবং আমাকে হয়তো মনে মনে পেটুক ঠাউরে রেখে দেবে—এবং যখন আমি কাশীতে যাব তখন হয়তো সকালে বিকালে আমাকে চাটনি দিয়ে কেবলি পাঁপর-ভাজা খাওয়াবে। তবু সত্য গোপন করব না, দুখানা পাঁপর-ভাজা সম্পূর্ণই খেয়েছিলুম। যা হোক সেই পাঁপর মচ মচ শব্দে খাচ্চি, এমন সময়—রোসো, মনে করে দেখি সে-সময়ে কে উপস্থিত ছিল। তুমি ভাবচ, তোমার বউমা তোমার ভানুদাদার পাঁপর-ভাজা খাওয়া দেখে অবাক হয়ে হতবুদ্ধি হয়ে টেবিলের এক কোণে বসে মনে মনে ঠাকুর-দেবতার নাম করছিলেন, তা নয়—তিনি তখন কোথায় আমি জানিনে। আর কমল? সেও-যে তখন কোথায় বসে রোদ পোয়াচ্ছিল তা আমি জানিনে। তাহলে দেখচি টেবিলে আমি একলা ছাড়া কেউই ছিল না। যাই হোক দুখানা পাঁপর-ভাজার পরে প্রায় সিকিটুকরো রুটির পোনে চার আনা যখন শেষ করেচি, এমন সময়—হাঁ, হাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেচি—আমি লিখেচি খাবার সময়ে কেউ ছিল না, কথাটা সত্য নয়। ভোঁদা কুকুরটা একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে লালায়িত জিহ্বায় চিন্তা করছিল-যে, আমি যদি মানুষ হতুম তাহলে সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত ঐ রকম মুচ মুচ মুচ মুচ মুচ মুচ করে কেবলি পাঁপর-ভাজা খেতুম; ইতিহাসও পড়তুম না, ভূগোলও পড়তুম না—শিশু-মহাভারত, চারুপাঠের কোনো ধার ধারতুম না। যা হোক যখন দুখানা পাঁপর-ভাজা এবং কিছু রুটি ও চাটনি খেয়েচি, এমন সময়—কিন্তু ডালটা খাইনি, সেটা নারকোল দিয়ে এবং অনেকখানি কুয়োর জল

দিয়ে তৈরি করেছিল তাতে ডালের চেয়ে কুয়োর জলের স্বাদটাই বেশি ছিল, আর তরকারিটাও খাইনি—কেননা, আমি মোটের উপর তরকারি প্রভৃতি বড়ো বেশি খাইনে। যাই হোক, যখন রুটি এবং পাঁপর-ভাজা খাওয়া প্রায় শেষ হয়েচে, এমন সময়ে ডাক-হরকরা আমার হাতে কাশীর ছাপমারা একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

২৯

শান্তিনিকেতন

দেরি করে তোমার চিঠির উত্তর দিয়েচি—তুমি আমাকে এত বড়ো অপবাদ দেবে আর আমি তাই যে নীরবে সহ্য করে যাব, এতবড়ো কাপুরুষ আমাকে পাওনি। কখখনো দেরি করিনি,—এ আমি তোমার মুখের সামনে বলচি। এতে তুমি রাগই কর আর যাই কর। দেরি করিনি, দেরি করিনি, দেরি করিনি,—এই তিনবার খুব চেঁচিয়েই বলে রাখলুম—দেখি, তুমি এর জবাব কী দাও। যত দোষ সব আমার, আর তোমার অগস্ত্যকুণ্ডের পোস্টমাস্টারটি বুঝি আটত্রিশটি গুনের আধার? ভালো কথা মনে পড়ল, তোমাকে শেষবারে চিঠি লেখার পর আমি খোঁজ নিয়ে শুনলুম—শ্রীমতী তুলসীমঞ্জরীকে বৌমা বিদায় করে দিয়েচেন। কী অন্যায় দেখো দেখি। তার অপরাধটা কী?—না, সে যতটা কাজ করে তার চেয়ে কথা কয় বেশি। তাই যদি হয়, তাহলে তোমার ভানুদাদার কী হবে বলো তো। আমি তো জন্মকাল থেকে কেবল কথাই কয়ে আসচি, তুলসীমঞ্জরী যেটুকু কাজ করেচে—আমি তাও করিনি। বৌমা তাই রেগেমেগে হঠাৎ যদি আমার খোরাকি বন্ধ করে দেন তাহলে আমার কী দশা হবে? যাই হোক এই কথাটা নিয়ে এখন থেকে ভাবনা করে কোনও লাভ নেই—সময় যখন উপস্থিত হবে তখন তোমাকে খবর দেওয়া যাবে, আমার যা কপালে থাকে তাই হবে। কিন্তু তোমার গুরুমা তোমাকে যে-ছাঁদে বাংলা-চিঠি লেখাতে চান, আমাকে সেই ছাঁদে লিখলে চলবে না—তা আমার নামের আগে শুধু না-হয় একটা মাত্র "শ্রী"-ই দেবে কিংবা "শ্রী" নাই বা দিলে। আমার বিলেত যাবার একটা কথা উঠচে কিন্তু শুধু কথায় যদি বিলেত যাওয়া যেত তাহলে আমার ভাবনা ছিল না; কথা একলা যদি না জোটাতে পারতুম তাহলে তুলসীমঞ্জরীকে ডেকে পাঠাতুম। কিন্তু মুশকিল হচ্চে এই-যে, বিলেত যেতে জাহাজের দরকার করে, যুদ্ধের উৎপাতে সেই জাহাজের সংখ্যা কমে গেচে অথচ যাবার লোকের সংখ্যা বেড়ে গেচে—তাই এখন—

ঘাটে বসে আছি আনমনা,
যেতেচে বহিয়া সুসময়।

এদিকে রোজ আমার একটা করে নতুন গান বেড়েই চলেচে। গানের সুবিধা এই-যে তার জন্যে জাহাজের দরকার হয় না, কথাতেই অনেকটা কাজ হয়। প্রায় পনেরোটা গান শেষ হয়ে গেল। তুমি দেরি করে যদি আস তাহলে ততদিনে এত গান জমে উঠবে-যে, শুনতে শুনতে তোমার চারুপাঠ তৃতীয়ভাগ আর পড়া হবে না—তোমার শিশু-মহাভারত বৃদ্ধ-মহাভারত হয়ে উঠবে। তুমি হয়তো এম এ পাস করার সময় পাবে না। ইতি ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

৩০

শান্তিনিকেতন

তুমি ভাবচ—মজা কেবল তোমাদেরই হয়েচে তাই তোমাদের ইস্কুলের প্রাইজের মজার ফর্দ আমাকে লিখে পাঠিয়েচ, কিন্তু এত সহজে আমাকে হার মানাতে পারচ না। মজা আমাদের এখানেও হয় এবং যথেষ্ট বেশি করেই হয়। আচ্ছা, তোমাদের প্রাইজে কত লোক জমেছিল?—পঞ্চাশ জন? কিন্তু আমাদের এখানে মেলায় অন্ততঃ দশ হাজার লোক তো হয়েইছিল। তুমি লিখেচ, একটি ছোটো মেয়ে তার দিদির কাছে গিয়ে খুব চীৎকার করে তোমাদের সভা খুব জমিয়ে তুলেছিল—আমাদের এখানকার মাঠে যা-চীৎকার হয়েছিল তাতে কত রকমেরই আওয়াজ মিলেছিল, তার কি সংখ্যা ছিল। ছোটো ছেলের কান্না, বড়োদের হাঁকডাক, ডুগডুগির বাদ্য, গোরুর গাড়ির ক্যাঁচকোঁচ, যাত্রার দলের চীৎকার, তুবড়িবাজির সোঁ সোঁ, পটকার ফুটফাট, পুলিস-চৌকিদারের হৈ হৈ,—হাসি, কান্না, গান, চেঁচামেচি, ঝগড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। ৭ই পৌষে মাঠে খুব বড়ো হাট বসেছিল—তাতে গালার খেলনা, ফলের মোরব্বা, মাটির পুতুল, তেলে-ভাজা ফুলুরি, চিনেবাদাম ভাজা প্রভৃতি আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস বিক্রি হল। এক-এক পয়সা দিয়ে ছেলেমেয়েরা সব নাগরদোলায় দুলল; চাঁদোয়ার নিচে নীলকণ্ঠ মুখুজ্যের কংসবধ যাত্রার পালা গান হচ্ছিল—সেইখানে একেবারে ঠেলাঠেলি ভিড়। তারপরে ৯ই পৌষে আমাদের মেয়েরা আবার এক মেলা করেছিলেন—তাতে সিঙাড়া, আলুর-দমের দোকান বসিয়েছিলেন—এক-একটা আলুর দম এক-এক পয়সায় বিক্রি হল। সুকেশী বউমা চিনে-বাদামের পুতুল গড়েছিলেন, তার এক-একটা ছ-আনা দামে বিক্রি হয়ে গেল। কমল কাদা দিয়ে একটা ঘর বানিয়েছিল—তার খড়ের চাল, চারিদিকে মাটির পাঁচিল, আঙিনায় শিব-স্থাপন করা আছে—সেটা কেউ কিনতে চায় না, তাই কমল আমাকে সেটা জোর করে তিন টাকায় বিক্রি করেচে। ভেবে দেখো—কী রকম ভয়ানক মজা। ছোটো মেয়েরা একটুকরো নেকড়া ছিঁড়ে তার চারিদিকে পাড় সেলাই করে আমার কাছে এনে বললে, "এটা রুমাল, এর দাম আট আনা, আপনাকে নিতেই হবে"—বলে সেটা আমার পকেটে পুরে দিলে—এমন ভয়ানক মজা। ওঁদের বাজারে এইরকম শ্রেণীর সব ভয়ানক মজা হয়ে গেচে—তোমরা যে-সব প্রাইজ পেয়েচ, সে এর কাছে কোথায় লাগে। তারপরে মজা,—মেলা যখন ভেঙে গেল, সমস্ত রাত ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে বেসুরো গান গাইতে গাইতে দলে দলে লোক ঠিক আমার শোবার ঘরের সামনের রাস্তা দিয়েই যেতে লাগল—মজায় একটুও ঘুম হল না—নিচে যতগুলো কুকুর ছিল, সবাই মিলে ঊর্ধ্বশ্বাসে চেঁচাতে লাগল, এমন মজা। তারপরে কলকাতার অনেক মেয়ে তাঁদের ছোটো ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছিলেন—তাঁদের কারো কাশি কারো জ্বর। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রাইজে এমন ধুমধাম, গোলমাল, কাশি-সর্দি, অসুখ-বিসুখ আট আনায় রুমাল বেচা প্রভৃতি হয়নি—অতএব আমারই জিত রইল।

৩১

শান্তিনিকেতন

নাঃ, তোমার সঙ্গে পারলুম না—হার মানলুম। তুমি-যে ইস্কুলে যেতে যেতে একেবারে রাস্তার মাঝখানে গাড়ি সুদ্ধ, একগাড়ি মেয়ে সুদ্ধ, তোমাদের মোটা দিদিমণি সুদ্ধ একেবারে উলটে কাত হয়ে পড়বে,—এত বড়ো ভয়ংকর মজা করবে, এ কী করে জানব বলো। তারপরে আর-এক ভদ্রলোককে বেচারার এক্কা-গাড়ি থেকে নামিয়ে তার গাড়িতে চড়ে বসবে, এত মজাতেও সন্তুষ্ট নও, আবার এক-পাটি জুতো রাস্তার মাঝখানে ফেলে আসবে আর সেই জুতোর পিছনে কাশীবাসী ভদ্রলোকটিকে দৌড় করাবে—তারো উপরে আবার ইস্কুলে পৌঁচে কান্না—কী মজা। যদি সেই জুতো-শিকারী বেচারা ভদ্রলোকটি কাঁদত তাহলেও বুঝতুম—কিন্তু তুমি! বিনা ভাড়ায় পরের এক্কাগাড়িতে চড়ে, বিনা আয়াসে পরকে দিয়ে হারানো চটিজুতো খুঁজিয়ে নিয়ে—তারপরে কিনা কান্না। একেই না বলে লঙ্কা-কাণ্ডের পরেও আবার উত্তরকাণ্ড। তুমি লিখেচ, আমিও যদি তোমাদের গাড়ির মধ্যে থাকতুম আর হাত, পা, মাথা, বুদ্ধি-সুদ্ধি সমস্ত একেবারে উলটে পালটে যেত তাহলে তোমাদের মতোই বাবারে মরলুমরে করে চীৎকার করতুম। এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করব না—নিশ্চয়ই পা দুটো উপরে আর মাথাটা নিচে করে আমি তানা-নানা শব্দে কানাড়া রাগিণীতে গান ধরতুম।

হায়রে হায়, সারে গামা পাধা নিসা।
আমার গাড়ির হলো উলটো মতি,
কোথায় হবে আমার গতি—
খুঁজে আমি না পাই দিশা।
সারে গামা পাধা নিসা।

যখন কাশীতে যাব আমার গাড়িটা উলটে দিয়ে বরঞ্চ পরীক্ষা করে দেখো। ইস্কুলে গিয়ে কাঁদব না, তোমার মাথার সামনে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে তান লাগিয়ে দেব—

যদিও আঘাত গায়ে লাগেনি।
তবুও করুণ সুরে,
দেব আমি গান জুড়ে
ঝাঁপতালে ভৈরবী রাগিণী।
শোনো সবে দিদিমণি, মামা,
সারে সারে সারে গারে গামা।

এই তো গেল মজার কথা। এইবার কাজের কথা। পরশু চললুম মৈসুরে, মাদ্রাজে, মাদুরায় এবং মদনা-পল্লীতে। ফিরতে বোধ হয় জানুয়ারি কাবার হয়ে ফেব্রুয়ারি শুরু হবে—ইতিমধ্যে ঐ দুটো গানের সুর বসিয়ে এসরাজে অভ্যাস করে নিয়ো। আবার যদি বিশ্বেশ্বরের গোরু, গাড়ি উলটে দিয়ে নন্দী-ভৃঙ্গীর গোয়ালের দিকে দৌড় মারে তাহলে পথের মাঝখানে কাজে লাগাতে পারবে। আর যে-ব্যক্তি তোমার একপাটি চটি জুতো নিয়ে আসবে তাকে উচ্চৈঃস্বরে তানে, মানে, লয়ে চমৎকৃত করে দিতে পারবে। ততদিন কিন্তু ডাকঘরের পালা বন্ধ। আমার চিঠি ফুরল, নটে শাকটি মুড়ল ইত্যাদি। ১৯শে পৌষ, ১৩২৫।

৩২

শান্তিনিকেতন

তোমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এইমাত্র পাওয়া গেল। আমি ভাবচি, তোমার এমন চিঠির বেশ সমান ওজনের জবাবটি দিই কী করে। তুমি চলিষ্ণু, আমি স্তব্ধ; তুমি আকাশের পাখি, আমি বনান্তের অশথগাছ; কাজেই তোমার গানে আর আমার মর্মরে ঠিক সমকক্ষ হতে পারে না। এক জায়গায় তোমার সঙ্গে আমার মিলেচে; তুমিও গেচ হাওয়া বদল করতে, আমিও এসেচি হাওয়া বদল করতে। তুমি গেচ কাশী থেকে সোলনে, আমি এসেচি আমার লেখবার ডেস্ক থেকে আমার জানলার ধারের লম্বা কেদারায়। খুব বদল,—তোমাদের বিশ্বেশ্বরের মন্দির থেকে আর তাঁর শ্বশুরবাড়ি যত বদল তার চেয়ে অনেক বেশি। আমি যে-হাওয়ায় ছিলুম, এ হাওয়া তার থেকে সম্পূর্ণ তফাত। তবে কিনা, তোমার ভ্রমণে আমার ভ্রমণে একটি মূলগত প্রভেদ আছে, তুমি নিজে চলে চলে ভ্রমণ করচ কিন্তু আমি নিজে থাকি স্থির আর আমার সামনে যা-কিছু চলচে, তাদের চলায় আমার চলা। এই হচ্চে রাজার উপযুক্ত ভ্রমণ—অর্থাৎ আমার হয়ে অন্যে ভ্রমণ করচে, চলবার জন্যে আমার নিজেকে চলতে হচ্চে না। ঐ দেখো না, আজ রবিবার হাটবার, সামনে দিয়ে গোরুর গাড়ি চলেচে—আমার দুই চক্ষু সেই গোরুর গাড়িতে সওয়ার হয়ে বসল। ঐ চলেচে সাঁওতালের মেয়েরা মাথায় খড়ের আঁটি, ঐ চলেচে মোষের দল তাড়িয়ে সন্তোষ বাবুর গোষ্ঠের রাখাল। ঐ চলেচে ইস্টেশনের দিক থেকে গোয়ালপাড়ার দিকে কারা এবং কিসের জন্যে—তা কিছুই জানিনে; একজনের হাতে ঝুলচে এক থেলোহুঁকো, একজনের মাথায় ছেঁড়া ছাতি, একজনের কাঁধে চড়ে বসেচে একটা উলঙ্গ ছেলে। ঐ আসচে ভুবনডাঙার গ্রাম থেকে কলসী-কাঁখে মেয়ের দল, তারা শান্তিনিকেতনের কুয়ো থেকে জল নিয়ে যাবে। ঐ সব চলার স্রোতের মধ্যে আমার মনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে আমি চুপ করে বসে আছি। আকাশ দিয়ে মেঘ চলেচে, কাল রাত্রিবেলাকার ঝড়-বৃষ্টির ভগ্ন-পাইকের দল--অত্যন্ত ছেঁড়া খোঁড়া রকমের চেহারা।

এরাই দেখব আজ সন্ধ্যাবেলায় নীল, লাল, সোনালি, বেগনি, উর্দি পরে কালবৈশাখীর নকিবের মতো গুরু গুরু দামামা বাজাতে বাজাতে উত্তর-পশ্চিম থেকে কুচ-কাওয়াজ করে আসতে থাকবে—তখন আর এমনতরো ভালোমানুষি চেহারা থাকবে না।

আমাদের বিদ্যালয় বন্ধ, এখন আশ্রমে যা-কিছু আসর জমিয়ে রেখেচে শালিখ-পাখির দল, আরো অনেক রকমের পাখি জুটেচে—বটের ফল পেকেচে তাই সব অনাহূতের দল জমেচে। বনলক্ষ্মী হাসিমুখে সবার জন্যেই পাত পেড়ে দিয়েচেন। ইতি ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬।

৩৩

শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠিতে যে-রকম ঠান্ডা এবং মেঘলা দিনের বর্ণনা করেচ তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে, তুমি তোমার ভানুদাদার এলাকার অনেক তফাতে চলে গেচ। বেশি না হোক, অন্তত দু-তিন ডিগ্রির মতোও ঠান্ডা যদি ডাকযোগে এখানে পাঠাতে পার তাহলে তোমাদেরও আরাম, আমাদেরও আরাম। বেয়ারিং পোস্টে পাঠালেও আপত্তি করব না, এমন কি ভ্যালুপেবলেও রাজি আছি। আসল কথা, ক-দিন থেকে এখানে রীতিমতো খোট্টাই ফেশানের গরম পড়েচে। সমস্ত আকাশটা যেন তৃষ্ণার্ত কুকুরের মতো জিব বের করে হাঃ হাঃ করে হাঁপাচ্চে। আর এই-যে দুপুর-বেলাকার হাওয়া, এ-যে কী রকম—সে তোমাকে বেশি বোঝাতে হবে না—এই বললেই বুঝবে যে, এ প্রায় বেনারসি হাওয়া, আগুনের লকলকে জরির সুতো দিয়ে আগাগোড়া ঠাস বুনোনি;—দিক-লক্ষ্মীরা পরেচেন, তাঁরা দেবতার মেয়ে বলেই সইতে পারেন, কিন্তু ওর আঁচলা যখন মাঝে মাঝে উড়ে আমাদের গায়ে এসে পড়ে তখন নিজেকে মর্ত্যের ছেলে বলেই খুব বুঝতে পারি। আমি কিন্তু আমার ঐ আকাশের ভানুদাদার দূতগুলিকে ভয় করিনে; এই দুপুরে দেখবে, ঘরে ঘরে দুয়োর বন্ধ কিন্তু আমার ঘরের সব দরজা-জানলা খোলা। তপ্ত হাওয়া হুহু করে ঘরে ঢুকে আমাকে আগাগোড়া ঘ্রাণ করে যাচ্চে,—এমনি তার ঘ্রাণ-যে, ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং। গরমের ঝাঁজে আকাশ ঝাপসা হয়ে আছে—কেমন যেন ঘোলা নীল—ঠিক যেন মূর্ছিত মানুষের ঘোলা চোখটার মতো। সকলেই থেকে থেকে বলে বলে উঠচে, "উঃ, আঃ,—কী গরম।" আমি তাতে আপত্তি করে বলচি, গরম তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তার সঙ্গে আবার ওই তোমার উঃ আঃ জুড়ে দিলে কেন। যাই হোক, আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম করে সইতে পারি কিন্তু মর্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পাঞ্জাবে আছ, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে। ভারতবর্ষে অনেক পাপ জমেছিল তাই অনেক মার খেতে হচ্চে। মানুষের অপমান ভারতবর্ষে অভ্রভেদী হয়ে উঠেচে। তাই কতশত বৎসর ধরে মানুষের কাছ থেকে ভারতবর্ষ এত অপমান সইচে কিন্তু আজও শিক্ষা শেষ হয়নি। ইতি ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬।

৩৪

কলিকাতা

মাঝে তোমার একটা চিঠির জবাব দিতে পারিনি, কলকাতায় এসেচি। কেন এসেচি, হয়তো খবরের কাগজ থেকে ইতিমধ্যে কতকটা জানতে পারবে। তবু একটু খোলসা করে বলি। তোমার লেফাফায় তুমি যখন আমার ঠিকানা লেখ, আমি ভাবলুম ঐ পদবীটা তোমার পছন্দ নয়। তাই কলকাতায় এসে বড়োলাটকে চিঠি লিখেচি—আমার ঐ ছার পদবীটা ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু চিঠিতে আসল কারণটা দিইনি—তোমার নামের একটুও উল্লেখ করিনি। বানিয়ে বানিয়ে অন্য নানা কথা

লিখেচি। আমি বলেচি, বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমে উঠেছিল, তারই ভার আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেচে— তাই ভারের উপরে আমার ঐ উপাধির ভার আর বহন করতে পারচিনে; তাই ওটা মাথার উপর থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করচি। যাক্, এ সব কথা আর বলতে ইচ্ছা করে না— আবার অন্য কথাও ভাবতে পারিনে। ১লা জুন, ১৯১৯।

৩৫

শান্তিনিকেতন

কাল ছিলুম কলকাতায়, আজ বোলপুরে। এসে দেখি, তোমার একখানি চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। আর দেখি, আকাশে ঘন ঘোর মেঘ,— বর্ষার আয়োজন সমস্তই রয়েচে কেবল আমি আসিনি বলেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়নি। বর্ষার মেঘের ইচ্ছা ছিল, আমাকে তার কাজরী গান শুনিয়ে দেবে— তারপরে আমিও তাকে আমার গানে জবাব দেব। তাই এতক্ষণ পরে আমি দুপুরবেলায় যখন খেয়ে এসে বসলুম তখন বৃষ্টি শুরু করে দিয়েছে এক মাঠ থেকে আর-এক মাঠে। আর তার কল-সংগীতে আকাশে কোথাও যেন ফাঁক রইল না। নববর্ষার জল-স্থলের আনন্দ-উৎসব দেখতে চাও তাহলে এসো আমাদের মাঠের ধারে, বসো এই জানলাটিতে চুপ করে। পাহাড়ে বর্ষার চেহারা স্পষ্ট দেখবার জো নেই, সেখানে পাহাড়েতে মেঘেতে ঘেঁষাঘেঁষি মেশামেশি একাকার কাণ্ড। সমস্ত আকাশটা বুজে যায়; সৃষ্টিটা যেন সর্দিতে, কাশিতে জবুস্থবু হয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে। পাহাড় আমার কেন ভালো লাগে না বলি— সেখানে গেলে মনে হয়, আকাশটাকে যেন আড়কোলা করে ধরে একদল পাহারাওয়ালার হাতে জিম্মা করে দেওয়া হয়েচে, সে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আমরা মর্ত্যবাসী মানুষ— সীমাহীন আকাশে আমরা মুক্তির রূপটি দেখতে পাই— সেই আকাশটাকেই যদি তোমার হিমালয় পাহাড় একপাল মহিষের মতো শিং গুঁতিয়ে মারতে চায় তাহলে সেটা আমি সইতে পারিনে। আমি খোলা আকাশের ভক্ত,— সেইজন্যে বাংলাদেশের বড়ো বড়ো দিল্-দরাজ নদীর ধারে অবারিত আকাশকে ওস্তাদ মেনে তার কাছে আমার গানের গলা সেধে এসেচি, এই কারণেই দূর হতে তোমাদের সোলন পর্বতকে নমস্কার করি। যা হোক, বর্ষা বিদায় হবার পূর্বেই তোমরা আমার প্রান্তরে আতিথ্য নেবে শুনে আমি খুশি হয়েচি। তোমাদের জন্যে কিছু গান সংগ্রহ করে রাখব,— আর পাকা জাম, আর কেয়াফুল, আর পদ্মবন থেকে শ্বেতপদ্ম, আর যদি পারি গোটাকতক আষাঢ়ে গল্প। অতএব খুব বেশি দেরি কোরো না, পর্বত থেকে ঝরনা যেমন নেমে আসে তেমনি দ্রুতপদে নেমে এসো। ইতি আষাঢ়স্য তৃতীয় দিবসে, ১৩২৬।

৩৬

শান্তিনিকেতন

তোমার আজকের চিঠি পেয়ে বড়ো লজ্জা পেলুম। কেন বলব? এর আগে তোমার একখানি চিঠি পেয়েছিলুম— তার জবাব দেব-দেব করচি, এমন সময় তোমার এই চিঠি, আজ তোমার কাছে আমার হার মানতে হল। আমি এত বড়ো লেখক, বড়ো বড়ো পাঁচ ভলুম কাব্যগ্রন্থ লিখেচি,—এহেন-যে আমি—যার উপাধিসমেত নাম হওয়া উচিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ শর্মা রচনা-লবণাম্বুধি কিংবা সাহিত্য-অজগর কিংবা বাগক্ষৌহিণীনায়ক কিংবা রচনা-মহামহোপদ্রব কিংবা কাব্যকলাকল্পদ্রুম কিংবা— ফস্ করে এখন মনে পড়চে না, পরে ভেবে বলব—একরত্তি মেয়ে, "সাতাশ" বছর বয়স লাভ করতে যাকে অন্ততঃ প'য়ত্রিশ বছর সাধনা করতে হবে, তারই কাছে পরাভব—Two goals to nil! তারপরে আবার তুমি যে-সব বিপজ্জনক ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখচ, আমার এই ডেস্কে বসে তার সঙ্গে পাল্লা দিই কী করে। আজ সকালে তাই ভাবছিলুম, পারুলবনের সামনে দিয়ে যে রেলের রাস্তা আছে সেখানে গিয়ে রাত্রে দাঁড়িয়ে থাকব—তারপরে বুকের উপর দিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা চলে গেলে পর যদি তখনো হাত চলে তাহলে সেই মুহূর্তে সেইখানে বসে তোমাকে যদি চিঠি লিখতে পারি তবে তোমাকে টেক্কা দিতে পারব। এ সম্বন্ধে এখনো বউমার সঙ্গে পরামর্শ করিনি, এণ্ডরুজ সাহেবকেও জানাইনি। আমার কেমন মনে মনে সন্দেহ হচ্চে, ওঁরা হয়তো কেউ সম্মতি দেবেন না, তাছাড়া আমার নিজের মনেও একটা কেমন ধোঁকা লাগচে; মনে হচ্চে যদি গাড়িটার চাপে বুড়ো আঙুলটা কিছু জখম করে তাহলে হয়তো লেখা ঘটেই উঠবে না। আর যদি না ঘটে তাহলে অনন্তকালের মতো ঐ দু-খানা চিঠির জিত তোমার রয়েই যাবে, অতএব থাক্।

অল্পদিনের মধ্যে আমাদের এখানে ভয়ংকর ব্যাপার একটাও ঘটেনি। ঝড়-বৃষ্টি অল্প-স্বল্প হয়েচে কিন্তু তাতে আমাদের বাড়ির ছাদ ভাঙেনি, আমাদের কারো মাথায়-যে সামান্য একটা বজ্র পড়বে তাও পড়ল না। বন্দুক নিয়ে ছোরাছুরি নিয়ে দেশের নানা জায়গায় ডাকাতি হচ্চে; কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট এমনি মন্দ-যে, আজ পর্যন্ত অবজ্ঞা করে আমাদের আশ্রমে তারা কিংবা তাদের দূর-সম্পর্কের কেউ পদার্পণ করলে না। না, না, ভুল বলচি। একটা রোমহর্ষণ ঘটনা অল্পদিন হল ঘটেচে। সেটা বলি। আমাদের আশ্রমের সামনে দিয়ে নির্জন প্রান্তরের প্রান্ত বেয়ে একটি দীর্ঘ পথ বোলপুর-স্টেশন পর্যন্ত চলে গেচে। সেই পথের পশ্চিমে একটি দোতলা ইমারত। সেই ইমারতের একতলায় একটি বঙ্গ-রমণী একাকিনী বাস করেন। সঙ্গে কেবল কয়েকটি দাসদাসী, বেহারা, গোয়ালা, পাচক-ব্রাহ্মণ এবং উপরের তলায় এণ্ডরুজ সাহেব নামক একটি ইংরেজ থাকেন। সমস্ত বাড়িটাতে এ-ছাড়া আর জন-প্রাণী নেই। সেদিন মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি, মেঘের আড়াল থেকে চন্দ্র ম্লান কিরণ বিকীর্ণ করচেন। এমন সময় রাত্রি যখন সাড়ে এগারটা, যখন কেবলমাত্র দশবারো জন লোক নিয়ে একাকিনী রমণী বিশ্রাম করচেন, এমন সময়ে ঘরের মধ্যে কে ঐ পুরুষ প্রবেশ করলে? কোন্ অপরিচিত যুবক? কোথায় ওর বাড়ি, কী ওর অভিসন্ধি? হঠাৎ সেই নিস্তব্ধ নিদ্রিত ঘরের নিঃশব্দতা সচকিত করে তুলে সে জিজ্ঞাসা করলে,—"ইস্কুল কোথায়?" অকস্মাৎ জাগরণে উক্ত রমণীর ঘন ঘন হৃৎকম্প হতে লাগল; রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বললেন, "ইস্কুল ঐ

পশ্চিম দিকে।” তখন যুবক জিজ্ঞাসা করলে, “হেডমাস্টারের ঘর কোথায়?” রমণী বললেন, “জানিনে।”

তারপরে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ঐ যুবক সেই ম্লান জ্যোৎস্নালোকে সেই ঝিল্লি-মুখরিত মধ্যরাত্রে আবার আশ্রমের কঙ্কর-বিকীর্ণ পথে আশ্রম কুক্কুরবৃন্দের তার-তিরস্কার শব্দ উপেক্ষা করে দ্বিতীয় একটি নিঃসহায়া অবলার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করলে। সেই ঘরে তৎকালে উক্ত রমণীর পূর্ণবয়স্ক একটি স্বামীমাত্র ছিল, আর জন-প্রাণীও না। সেখানেও পূর্ববৎ সেই দুটি মাত্র প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের শব্দে স্তিমিত-দীপালোকিত সেই নির্জনপ্রায় কক্ষটি আতঙ্কে নিস্তব্ধ হয়ে রইল। লোকটা বহুদূর দেশ থেকে হেডমাস্টারকে খুঁজতে খুঁজতে কেন এখানে এল। তার সঙ্গে কিসের শত্রুতা। সেই রাত্রে স্বামীসনাথা ঐ একটি রমণী এবং স্বামী-দূরগতা অন্য অবলা না জানি তাদের সরল কোমল হৃদয়ে কী আশঙ্কা বহন করে ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন প্রভাতে হেড-মাস্টারের মাস্টার বাদ দিয়ে বাকি ছিন্ন অংশ কি কোথাও পাওয়া যাবে—তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন?

তারপরে তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পরদিন প্রথমা নারীটি আমাকে বললেন, “তাত, মধ্যরাত্রে একটি যুবক—ইত্যাদি।” শুনে আমার পাঠিকা বিস্মিতা হবেন না-যে, আমি আশ্রম ছেড়ে পালাইনি; এমন কি, আমি তরবারিও কোষোন্মুক্ত করলুম না। করবার ইচ্ছে থাকলেও তরবারি ছিল না, থাকবার মধ্যে একটা কাগজ-কাটা ছুরি ছিল। সঙ্গে কোনো পদাতিক বা অশ্বারোহী না নিয়েই আমি সন্ধান করতে বেরলুম, কোন্ অপরিচিত যুবা কাল নিশীথে “হেডমাস্টার কোথায়” বলে অবলা রমণীর নিদ্রা ভঙ্গ করেচে?

তারপরে উপসংহার। যুবককে দেখা গেল, তাকে প্রশ্ন করা গেল। উত্তরে জানা গেল—এখানে তার কোনো একটি আত্মীয়-বালককে সে ভর্তি করে দিতে চায়। ইতি সমাপ্ত। ২৬ আষাঢ়, ১৩২৬।

৩৭

আমার জ্যোতিষ্ক-মিতাটি আকাশ নইলে বিচরণ করতে পারেন না—তাঁরি নামধারী আমি অবকাশ নইলে টিকতে পারিনে। আমার যদি কোনো আলো থাকে তবে সেই আলো প্রচুর অবকাশের মধ্যেই প্রকাশ পায়; সেইজন্যেই আমি ছুটির দরবার করি--কেননা, ছুটিতেই আমার যথার্থ কাজ। তাই লোক-সমাগম দেখে আমি আশ্রম ছেড়ে দৌড় দিয়েচি। অথচ এই সময়ই উজ্জ্বল সূর্যের আলোয়, রঙিন মেঘের ঘটায়, ঘাসে ঘাসে মেঠো ফুলের প্রাচুর্যে, হাওয়ায় হাওয়ায় দিকে দিকে কাশ-মঞ্জরির উল্লাস-হাস্য-হিল্লোলে আশ্রম খুব রমণীয় হয়ে উঠেছিল। স্টেশনের দিকে যখন গাড়ি চলেছিল তখন পিছনের দিকে মন টানছিল। কিন্তু স্টেশনে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল আর রেলগাড়িটা আমাদের আশ্রমকে যেন টিট্‌কারি দিয়ে পোঁ করে বাঁশি বাজিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে চলে এল। রাত এগারটায় হাওড়ায় উপস্থিত। এসে শুনি, হাওড়ার ব্রিজ খুলে দিয়েচে। নৌকায় গঙ্গা পার হতে হবে। মালপত্র ঘাড়ে নিয়ে ঘাটে গেলেম। সবে জোয়ার এসেচে—ডিঙ্গি নৌকো ঘাট থেকে একটু তফাতে। একটা মাল্লা এসে আমাকে আড়কোলা করে তুলে নিয়ে চলল। নৌকোর কাছাকাছি এসে আমাকে সুদ্ধ ঝপাস করে পড়ে গেল। আমার

সেই ঝোলা-কাপড় নিয়ে সেইখানে জলে কাদায় লুটোপুটি ব্যাপার। গঙ্গা-মৃত্তিকায় লিপ্ত এবং গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হয়ে নিশীথ রাত্রে বাড়ি এসে পৌঁচানো গেল। গঙ্গাতীরে বাস তবু ইচ্ছে করে বহুকাল গঙ্গাস্নান করিনি—ভীষ্ম-জননী ভাগীরথী সেই রাত্রে তার শোধ তুললেন। আজ বিকেলের গাড়িতে শিলং-পাহাড় যাত্রা করব; আশা করি এবারকার যাত্রাটা গতবারের গঙ্গাযাত্রার মতো হবে না। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আর ঘন মেঘের আবরণে দিগঙ্গনার মুখ অবগুণ্ঠিত। পূর্ণিমা, আশ্বিন, ১৩২৬।

৩৮

ব্রুকসাইড
শিলং

কাল এসে পৌঁচেচি শিলং-পর্বতে, পথে কত-যে বিঘ্ন ঘটল তার ঠিক নেই। মনে আছে—বোলপুর থেকে আসবার সময় মা-গঙ্গা আমাকে জল-কাদার মধ্যে হিঁচড়ে এনে সাবধান করে দিয়েছিলেন? কিন্তু মানলুম না, বৃহস্পতিবারের বার-বেলায় কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথিতে রেলে চড়ে বসলুম। দুদিন আগে রথী আমাদের একখানা মোটরগাড়ি গৌহাটি-স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ইচ্ছা ছিল—সেই গাড়িতে করে পাহাড়ে চড়ব। সঙ্গে আমাদের আছেন দিনুবাবু এবং কমলবোঠান, এবং আছেন সাধুচরণ, এবং আছে বাক্স তোরঙ্গ নানা আকার ও আয়তনের এবং সঙ্গে সঙ্গে চলেচেন আমাদের ভাগ্যদেবতা; তাঁকে টিকিট কিনতে হয়নি। সান্তাহার স্টেশনে আসাম মেলে চড়লুম, এমনি কসে ঝাঁকানি দিতে লাগল-যে, দেহের রস-রক্ত যদি হত দই, তাহলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রাণটা তার থেকে মাখন হয়ে ছেড়ে বেরিয়ে আসত। অর্ধেক রাত্রে বজ্রনাদ সহকারে মুষল-ধারে বৃষ্টি হতে লাগল। গৌহাটির নিকটবর্তী স্টেশনে যখন খেয়া-জাহাজে ব্রহ্মপুত্রে ওঠা গেল তখন আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন কিন্তু বৃষ্টি নেই। ওপারে গিয়েই মোটরগাড়িতে চড়ব বলে খেয়ে-দেয়ে সেজে-গুজে গুছিয়ে-গাছিয়ে বসে আছি—গিয়ে শুনি, ব্রহ্মপুত্রে বন্যা এসেচে বলে এখনো ঘাটে মোটর নামাতে পারেনি। এদিকে বলে, দুটোর পরে মোটর ছাড়তে দেয় না। অনেক বকাবকি দাপাদাপি ছুটোছুটি হাঁকডাক করে বেলা আড়াইটের সময় গাড়ি এল। কিন্তু সময় গেল। তীরের কাছে একটা শূন্য জাহাজ বাঁধা ছিল, সেইটেতে উঠে মুটের সাহায্যে কয়েক বালতি ব্রহ্মপুত্রের জল তুলিয়ে আনা গেল; -স্নান করবার ইচ্ছা। ভূগোলে পড়া গেচে—পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল, কিন্তু বন্যার ব্রহ্মপুত্রের ঘোলা স্রোতে সেদিন তিনভাগ স্থল একভাগ জল। তাতে দেহ স্নিগ্ধ হল বটে কিন্তু নির্মল হল বলতে পারিনে। বোলপুর থেকে রাত্রি এগারটার সময় হাওড়ার তীরে কাদার মধ্যে পড়ে যেমন গঙ্গাস্নান হয়েছিল, সেদিন ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নানটাও তেমনি পঙ্কিল। তা হোক, এবার আমার ভাগ্য আমাকে ঘাড়ে ধরে পুণ্যতীর্থোদকে স্নান করিয়ে দিলেন। কোথায় রাত্রি যাপন করতে হবে তারি সন্ধানে আমাদের মোটরে চড়ে গৌহাটি শহরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া গেল। কিছু দূরে গিয়ে দেখি, আমাদের গাড়িটা হঠাৎ ন যযৌ ন তস্থৌ। বোঝা গেল, আমাদের ভাগ্যদেবতা বিনা অনুমতিতে আমাদের এ গাড়িতেও চড়ে

বসেচেন, তিনিই আমাদের কলের প্রতি কটাক্ষ-পাত করতেই সে বিকল হয়েচে। অনেক যত্নে যখন তাকে একটা মোটরগাড়ির কারখানায় নিয়ে যাওয়া গেল তখন সূর্যদেব অস্তমিত। কারখানার লোকেরা বললে, "আজ কিছু করা অসম্ভব, কাল চেষ্টা দেখা যাবে।" আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, "রাত্রে আশ্রয় পাই কোথায়।" তারা বললে, "ডাকবাংলায়।"

ডাকবাংলায় গিয়ে দেখি, সেখানে লোকের ভিড়— একটিমাত্র ছোটো ঘর খালি, তাতে আমাদের পাঁচজনকে পুরলে পঞ্চত্ব সুনিশ্চিত। সেখান থেকে সন্ধান করে অবশেষে গোয়ালন্দগামী স্টীমার-ঘাটে একটা জাহাজে আশ্রয় নেওয়া গেল। সেখানে প্রায় সমস্ত রাত বৌমা এবং কমলের ঘোরতর কাশি আর হাঁপানি। রাতটা এই রকম দুঃখে কাটল। পরদিনে প্রভাতে আকাশে ঘন মেঘ করে বৃষ্টি হতে লাগল। কথা আছে সকাল সাড়ে সাতটার সময় মোটর-কোম্পানীর একটি মোটর-গাড়ি এসে আমাদের বহন করে পাহাড়ে নিয়ে যাবে; সে-গাড়িখানা আর-একজন আর-এক জায়গায় নিয়ে যাবে বলে ঠিক করে রেখেছিল। সেখানা না পেলে দুঃখ আরো নিবিড়তর হবে— তাই রথী গিয়ে নানা লোকের কাছে নানা কাকুতি মিনতি করে সেটা ঠিক করে এসেচেন। ভাড়া লাগবে একশো পঁচিশ টাকা— আমাদের সেই হাতী-কেনার চেয়ে বেশি। যা হোক, পৌনে আটটার সময় গাড়ি এল— তখন বৃষ্টি থেমেচে। গাড়ি তো বায়ু বেগে চলল, কিছুদূর গিয়ে দেখি, একখানা বড়ো মোটরের মালগাড়ি ভগ্ন অবস্থায় পথপার্শ্বে নিশ্চল হয়ে আছে। পূর্বদিনে আমাদের জিনিসপত্র এবং সাধুচরণকে নিয়ে এই গাড়ি রওনা হয়েছিল; এই পর্যন্ত এসে তিনি স্তব্ধ হয়েচেন। জিনিস তার মধ্যেই আছে, সাধু ভাগ্যক্রমে একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি পেয়ে চলে গেচে। জিনিস রইল পড়ে আমরা এগিয়ে চললুম। বিদেশে, বিশেষত শীতের দেশে, জিনিসে-মানুষে বিচ্ছেদ সুখকর নয়। সইতে হল। যা হোক, শিলং-পাহাড়ে এসে দেখি, পাহাড়টা ঠিক আছে; আমাদের গ্রহ-বৈগুণ্যে বাঁকেনি, চোরেনি, নড়ে যায়নি; আমাদের জিওগ্রাফিতে তার যেখানে স্থান ঠিক সেই জায়গাটিতে সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। দেখে আশ্চর্য বোধ হল, এখনো পাহাড়টা ঠিক আছে; তাই তোমাকে চিঠি লিখচি কিন্তু আর বেশি লিখলে ডাক পাওয়া যাবে না। অতএব ইতি— কৃষ্ণ তৃতীয়া, ১৩২৬।

৩৯

ব্রুকসাইড
শিলং

আমি যেদিন এখানে এসে পৌঁচলুম সেদিন থেকেই বৃষ্টিবাদলা কেটে গিয়েচে। আজ এই সকালে উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে চারিদিক প্রসন্ন; মোটা মোটা গোটাকতক মেঘ পাহাড়ের গা আঁকড়ে ধরে চুপচাপ রোদ পোয়াচ্চে; তাদের এমনি বেজায় কুঁড়ে রকমের চেহারা-যে, শীঘ্র তারা বৃষ্টি বর্ষণে লাগবে এমন মনেই হয় না।

আমার এখানকার লেখবার ঘরের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সেই কোণটার কোনো তুলনাই হয় না। বেশ বড়ো ঘর— নানা রকমের চৌকি, টেবিল, সোফা, আরাম-কেদারায় আকীর্ণ। জানলাগুলো সমস্তই শার্সির, তার ভিতর থেকে দেখতে পাচ্চি,

দেওদার গাছগুলো লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বাতাসে মাথা নেড়ে নেড়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে ইশারায় কথা বলবার চেষ্টা করচে। বাগানের ফুলগাছের চানকায় কত রঙ বেরঙের ফুল-যে ফুটেচে তার ঠিক নেই,—কত চামেলি কত চন্দ্রমল্লিকা, কত গোলাপ,—আরো কত অজ্ঞাত-কুলশীল ফুল। আমি ভোরে সূর্য ওঠবার আগেই রাস্তার দুইধারের সেই সব ফোটা ফুলের মাঝখান দিয়ে পায়চারি করে বেড়াই—তারা আমার পাকা দাড়ি আর লম্বা জোব্বা দেখে একটুও ভয় পায় না—হাসাহাসি করে।

এই পর্যন্ত লিখেচি, এমন সময়ে সাধু এসে খবর দিলে, স্নানের জল তৈরি। অমনি কলম রেখে চৌকি ছেড়ে রবিঠাকুর দ্রুতপদবিক্ষেপে স্নানযাত্রায় গমন করলেন। স্নান করে বেরিয়ে এসে খবর পাওয়া গেল—কী খবর বলো দেখি। আন্দাজ করে দেখো। খবর পাওয়া গেল-যে, রবিঠাকুরের ভোগ প্রস্তুত—শ্রীযুক্ত তুলসী নামক উৎকলবাসী পাচকের স্বহস্তে পাক-করা। আহার সমাধা করে এই আসচি—সুতরাং চিঠির ওভাগে পূর্বাহ্ণ ছিল, এ ভাগে অপরাহ্ণ পড়েচে—এখন ঘড়ির কাঁটা বেলা একটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করচে। সেই মোটা মেঘগুলো সাদা-কালো রঙের কাবুলি বেড়ালের মতো এখনো অলসভাবে স্তব্ধ হয়ে রৌদ্রে পিঠ লাগিয়ে পড়ে আছে। পাখি ডাকচে আর জানালার ভিতর দিয়ে চামেলি ফুলের গন্ধ আসচে।

ঐ মেঘগুলোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে একটা লম্বা কেদারা আশ্রয় করে নিস্তব্ধ-ভাবে জানালার কাছে যদি বসতে পারতুম তাহলে সুখী হতুম কিন্তু অনেক চিঠি লিখতে বাকি আছে। অতএব গিরি-শিখরে এই শরতের অপরাহ্ণ আমার চিঠি লিখেই কাটবে। তুমি ছবি আঁকচ কিনা লিখো; আর সেই এসরাজের উপর তোমার ছড়ি চলবে কিনা তাও জানতে চাই। ইতি ২৮শে আশ্বিন, ১৩২৬ (তারিখ ভুল করিনি—পাঁজি দেখে লিখেচি)।

৪০

শান্তিনিকেতন

তুমি এত দেরিতে কেন আমার চিঠি পেয়েচ, ঠিক বুঝতে পারলুম না। আজ তোমার চিঠি পেতে দেরি হল দেখে ভাবলুম হয়তো অমৃতসর কংগ্রেসে তোমাকে ডেলিগেট করেচে কিংবা হাওয়া-জাহাজে কাপ্তেন রসের সঙ্গে তুমি অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিয়েচ। কিংবা হিমালয়ের পর্বত-শৃঙ্গে কোনো পওহারী বাবার শিষ্য হয়ে মাটির নিচে বসে একমনে নিজের নাকের ডগা নিরীক্ষণ করচ কিংবা লয়েড জর্জের প্রাইভেট সেক্রেটারির সর্দি হয়েচে খবর পেয়েই তুমি সেই পদের জন্য দরখাস্ত করতে ইংলণ্ডে চলে গিয়েচ। আমি পার্লামেণ্টে লয়েড জর্জকে টেলিগ্রাফ করতে যাচ্চি ঠিক এমন সময়ে তোমার চিঠি পেলুম। পড়ে দেখি, তুমি ঝরনার ধারে কোথায় বেড়াতে গিয়ে আর একটু হলেই কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলে। আশ্চর্য—দেখো, কাল সন্ধ্যাবেলায় আমারো প্রায় সেই রকম দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তখন রাত্তির ন-টা। মুখ ধুয়ে বিছানায় শুতে যাচ্চি, এমন সময় কী বলো দেখি। কুয়ো? সেই রকমই বটে। এক কপি নৌকাডুবি বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা

এক গল্পের বই,—হঠাৎ তারি মধ্যে একবার হুঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম। একেবারে শেষ পাতা পর্যন্ত তলিয়ে গেলুম। এত বড়ো বিপদ ঘটবার কারণ হচ্চে, বিলাত থেকে একজন ইংরেজ ঐ বইটা তর্জমা করবার অনুমতি নিয়েছিলেন। আবার সেদিন আর-একজন ইংরেজ ঐটে তর্জমা করতে চেয়ে আমাকে চিঠি লিখেচেন। তাতেই আমার দেখবার ইচ্ছা হল, ওটার মধ্যে কী আছে। কিন্তু সেই ইচ্ছেটা রাত ন-টার সময় হঠাৎ উদয় হওয়া কোনো শুভগ্রহের প্রভাবে নয়। কারণ এই কুয়োটা থেকে উদ্ধার হতে রাত তিনটা বেজে গেল। তার মানে আমার পরমায়ু থেকে একটা রাতের বারো আনার ঘুম গেল অনন্তকালের মতো হারিয়ে। আজ সকাল-বেলা আমার মুখ-চোখ দেখে সি. আই. ডি পুলিস সন্দেহ করচে কাল রাত্রে আমি কোথায় সিঁধ কাটতে গিয়েছিলুম।

ঐ-যে ডাক-হরকরা আসচে। একরাশ চিঠি দিয়ে গেল। তোমার বাবার হাতের লেখা এক লেফাফা দেখতে পাচ্চি,—তার মধ্যে তোমাদের আধুনিক ইতিহাস কিছু পাওয়া যাবে। ওদিকে আবার কাল রাত্রে এক ইংরেজ অতিথি এসেচেন—আজ সমস্ত দিন তিনি বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ করবেন, সেই সঙ্গে আমাকেও পর্যবেক্ষণ করবেন বলে বোধ হচ্চে। যখন করবেন তখন হয়তো ঢুলব—আর তিনি তাঁর নোটবুকে লিখে নিয়ে যাবেন-যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমস্ত দিন ধরে কেবল ঢোলেন। এমনি করেই জীবন-চরিত লেখা হয়। সাহেব যখন আমার জীবন-চরিতে এই কথা লিখবেন তখন তুমি খুব জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ কোরো,—বোলো, আমার অনেক দোষ থাকতে পারে, দিনে ঢোলা অভ্যাস একেবারেই নেই। যাই হোক, তুমি লয়েড জর্জের প্রাইভেট সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করনি, এইটাতে আমার মন অনেকটা আশ্বস্ত হয়েচে। ইতি ২৮শে পৌষ, ১৩২৬।

৪১

সামনে তোমার পরীক্ষা—এখন দিনরাত তোমার মাথায় সেই ভাবনা লেগে আছে। অ্যালজেব্রা নিয়ে পড়ে থাকবে, তোমার ভয় হবে—আমার কাছে থাকলে পাছে তোমার নামতা ভুল হয়ে যায়, আর পাছে Animal বানান করতে গিয়ে Annie mull লিখে বস। এই কথা মনে করেই আমি উদাস হয়ে একেবারে অজন্তা-গুহার মধ্যে চলে যাচ্ছিলুম। তুমি যদি আমাকে আটকে রাখতে চাও, তাহলে কিন্তু অ্যালজেব্রার বইখানা তোমার ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হবে।

দেখো, এবারকার চিঠিতে তোমাকে একটুও ঠাট্টা করিনি—ভয়ংকর গম্ভীর ভাষায় তোমাকে লিখলুম। তুমি পরীক্ষা দিতে যাচ্চ, আমি কোনো দিন পরীক্ষা দিইনি—এইজন্যে ভয়ে, সম্ভ্রমে, ভক্তিতে, শ্রদ্ধায় আমার মুখ থেকে একটিও ঠাট্টার কথা বেরতে চাচ্চে না—আমি নতশিরে এই কথাই কেবল আবৃত্তি করচি—

যা দেবী পাঠ্যগ্রন্থেষু ছাত্রীরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

ইতি ১লা আশ্বিন, ১৩২৮।

৪২

একটা বিষয়ে আমার মনে বড়ো খটকা লেগেচে, তুমি চিঠিতে লিখেচ—আমি নিশ্চয়ই তোমার দিদির চেয়ে বেশি ইংরেজি জানি। এটা কি উচিত। তোমার জ্যেষ্ঠা সহোদরা, কলেজে পড়ে, তার ইংরেজি জ্ঞানের প্রতি এত বড়ো অবজ্ঞা প্রকাশ কি ভালো হয়েচে। সে যদি জানতে পারে তাহলে তার মনে কত বড়ো আঘাত লাগবে—একবার ভেবে দেখো দেখি। আমার চিঠি পেয়েই তার কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কোরো।

তার মতো আমি যদি ইংরেজিতে পরীক্ষা পাস করতে পারতুম তাহলে কি এমন বেকার বসে থাকতুম। তাহলে অন্ততঃ পুলিসের দারোগাগিরি জোগাড় করতে পারতুম। চিরদিন স্কুল পালিয়ে কাটালুম, কুঁড়েমি করেই এমন মানবজন্মের সাতাশটা বছর[১] বৃথা নষ্ট করলুম—এইজন্যে পাছে আমার কুদৃষ্টিতে তোমাদের হঠাৎ বানান-ভুলে পেয়ে বসে তাই তো শহর ছেড়ে তোমাদের কাছে দূরে দূরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। এবারকার মতো যা হবার তা হল, আর জন্মে ম্যাট্রিকুলেশন যদি বা না পারি তো অন্ততঃ মাইনর ইস্কুলের ছাত্রবৃত্তি নিয়ে তবে ছাড়ব। কিছু না হোক, অন্ততঃ ত্রৈরাশিক পর্যন্ত অঙ্ক কষবই, আর ফার্স্ট সেকেন্ড দুটো রীডার যদি শেষ করতে পারি তাহলে গাঁয়ের প্রাইমারি ইস্কুলের হেডমাস্টারি করতে পারব, আর তারি সঙ্গে সঙ্গে মাসিক সাড়ে আট টাকা বেতনে ব্রাঞ্চ পোস্ট-আফিসের পোস্টমাস্টারি-পদটাও জোগাড় করে নেবার চেষ্টা করব। নেহাত না পাই যদি, তবে জমিদারবাবুর কনিষ্ঠ ছেলেটির প্রাইভেট টিউটরের কাজটা নিশ্চয় জুটবে। ইতি ৭ই আশ্বিন, ১৩২৮।

৪৩

আজ বুধবার—আজ ছুটির দিনে আমার বারান্দার সেই কোণটায় বসে তোমাকে লিখচি। মাঘের দুপুরবেলাকার রৌদ্রে আমার ঐ আমলকী-বীথিকার মধ্যে দিনটি রমণীয় লাগচে। এইরকম দিনে কাজ করতে ইচ্ছে করে না—আমার সমস্ত মনটি ঐ ডালের উপরে বসা ফিঙে পাখিটির মতো চুপ করে রোদ পোহায়। আজ উত্তরে হাওয়া থেকে থেকে উতলা হয়ে উঠচে—শালবনের পাতায় পাতায় কাঁপুনি ধরেচে—একটা মস্ত কালো ভ্রমর মাঝে মাঝে অকারণ আমার কাছে এসে গুনগুনিয়ে আবার বেরিয়ে চলে যাচ্চে—একটা কাঠবিড়ালি এই বারান্দার কাঠের খুঁটি বেয়ে চালের কাছে উঠে কিসের ব্যর্থসন্ধানে চঞ্চল চক্ষে এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার তখনি পিঠের ওপর ল্যাজ তুলে দুড় দুড় করে নেমে যাচ্চে। এই শীতের মধ্যাহ্নে যেন আজ কারো কিছু কাজ নেই।

আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিলুম—শেষ হয়ে গেচে তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা "প্রায়শ্চিত্ত" নয়, এর নাম "পথ"। এতে কেবল

[১] ভানুসিংহের বয়স-যে সাতাশ বছরে এসে চিরকালের মতো ঠেকে গেচে, বালিকার এই একটি স্বরচিত বয়ঃপঞ্জীর বিধান ছিল।

প্রায়শ্চিত্ত-নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই— সে গল্পের কিছু এতে নেই, সুরমাকে এতে পাবে না।

তুমি পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছ— আমার এই কুঁড়েমির চিঠিতে পাছে তোমার জিওমেট্রির ধ্যান ভঙ্গ করে, এই ভয় আছে। ৪ঠা মাঘ, ১৩২৮।

৪৪

তুমি রোজ দুটো করে ডিম খেয়ে একটিমাত্র ক্লাসে পড়চ খবর পেয়েই খুশি হয়ে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেচি। আমিও ঠিক দুটি করে ডিম খাই আর একটি মাত্র ক্লাসেও পড়িনে। সেইটেতে আমার মুশকিল বেধেচে, কেননা, যদি আমার ক্লাস থাকত, যদি আমাকে নামতা মুখস্থ করতে হত তাহলে সব সময়ই আমার কাছে লোক আনাগোনা করতে পারত না; আমি বলতে পারতুম, আমার সময় নেই, আমাকে এক্‌জামিন দিতে হবে। তোমার ভারি সুবিধে— তোমার কাছে কইম্বাটুর থেকে ত্রিম্বাকটু থেকে কাঞ্জিভ্যারাম থেকে কামস্কাটা থেকে মক্কা থেকে মদিনা মস্কট থেকে যখন-তখন নানালোক মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে আসেন না— তাঁরা জানেন-যে, মার্চ মাসে তোমাকে ম্যাট্রিকুলেশন দিতে হবে। আমি তাই এক-একবার মনে করি— আমি ম্যাট্রিকুলেশন দেব— দিলে নিশ্চয়ই ফেল করব— ফেল করার সুবিধে এই-যে ফি-বৎসরেই ম্যাট্রিকুলেশন দেওয়া যায় আর তাহলে ত্রিম্বাকটু থেকে নিজ্‌নি-নবগরড থেকে বেচুয়ানাল্যান্ড থেকে সদাসর্বদা লোক-আসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

লেভি সাহেব আমার বন্ধু হয়েও তোমার কাছে হেমনলিনীর কথাটা ফাঁস করে দিয়েচেন, এতে আমি মনে বড়ো দুঃখ পেয়েচি— এ কথা সত্য-যে, আমি তারই সাধনায় প্রবৃত্ত আছি। কিন্তু সেই স্বর্ণ-শতদলের পাপড়িগুলি হচ্চে bank notes। সাধনায় বিশেষ-যে সিদ্ধিলাভ করতে পেরেচি— তা মনেও কোরো না, তোমরা কামনা কোরো এই হেমনলিনী যেন আমার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু কপালক্রমে আমার পঞ্জিকায় অকাল পড়েচে— শুভলগ্ন আর আসেই না, তাই গান গাচ্চি—

ওগো হেমনলিনী
আমার দুঃখের কথা কারো কাছে বলিনি।
লক্ষ্মীর চরণতলে ফুটে আছ শতদলে
সে-পথ করিয়া লক্ষ্য কেন আমি চলিনি।

ইতি ১০ ফাল্গুন, ১৩২৮।

৪৫

আমি নদী-পথে কয়েকদিন কাটিয়ে এলুম— কাল রাত্রে ফিরে এসেচি। আজ সকালে দেখি, এখানে তোমার চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তুমি জান— আমি নদী ভালোবাসি। কেন, বলব? আমরা যে-ডাঙার উপরে বাস করি, সে

ডাঙা তো নড়ে না, স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে, কিন্তু নদীর জল দিনরাত্রি চলে, তার একটা বাণী আছে। তার ছন্দের সঙ্গে আমাদের রক্ত-চলাচলের ছন্দ মেলে, আমাদের মনে নিরন্তর যে-চিন্তাস্রোত বয়ে যাচ্চে সেই স্রোতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে—এইজন্যে নদীর সঙ্গে আমার এত ভাব। বয়স যখন আরো কম ছিল, তখন কতকাল নৌকায় কাটিয়েচি, কোনো জনমানব আমার কাছেও থাকত না, পদ্মার চরের উপরকার আকাশে সন্ধ্যাতারা আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকত; প্রতিবেশী ছিল চক্রবাকের দল; তাদের কলালাপ থেকে আর কিছু বুঝি বা না বুঝি, এটুকু জানতুম আমার সম্বন্ধে কোনো জনরব তারা রটাত না—এমন কি, আমার জয়-পরাজয় নামক গল্পের নায়ক-নায়িকার পরিণাম সম্বন্ধে তারা লেশমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করত না।

যা হোক, "তে হি নো দিবসা গতাঃ,"—এখন বোলপুরের শুষ্ক ধূসর মাঠের মধ্যে বসে ইস্কুল-মাস্টারি করচি; ছেলেগুলোর কলরব চক্রবাকের কল-কোলাহলকে ছাড়িয়ে গেচে। তুমি মনে কোরো না, এখানে কোনো স্রোত নেই; এখানে অনেক-গুলি জীবনের ধারা মিলে একটি সৃষ্টির স্রোত চলেচে; তার ঢেউ প্রতি মুহূর্তে উঠচে, তার বাণীর অন্ত নেই। সেই স্রোতের দোলায় আমার জীবন আন্দোলিত হচ্চে, আপনার পথ সে কাটচে, দুইতটকে গড়ে তুলচে। সে কোন্‌ এক অলক্ষ্য মহাসমুদ্রের দিকে চলেচে, দূর থেকে আমরা তার বার্তার আভাস পাই মাত্র। ইতি ২২শে পৌষ, ১৩২৮।

৪৬

শিলাইদা

তুমি আমাকে চিঠি লিখেচ শান্তিনিকেতনে, আমি সেটি পেলুম এখানে অর্থাৎ শিলাইদহে।

তুমি কখনো এখানে আসনি, সুতরাং জানতে পারবে না—জায়গাটা কী রকম। বোলপুরের সঙ্গে এখানকার চেহারার কিছুমাত্র মিল নেই। সেখানকার রৌদ্র বিরহীর মতো, মাঠের মধ্যে একা বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলচে, সেই তপ্ত নিশ্বাসে সেখানকার ঘাসগুলো শুকিয়ে হলদে হয়ে উঠেচে। এখানে সেই রৌদ্র তার সহচরী ছায়ার সঙ্গে মিলেচে; তাই চারিদিকে এত সরসতা। আমাদের বাড়ির সামনে শিশু-বীথিকায় তাই দিনরাত মর্মরধ্বনি শুনচি, আর কনকচাঁপার গন্ধে বাতাস বিহ্বল, কয়েতবেলের শাখায় প্রশাখায় নতুন চিকন পাতাগুলি ঝিলমিল করচে, আর ঐ বেণুবনের মধ্যে চঞ্চলতার বিরাম নেই। সন্ধ্যার সময় টুকরো চাঁদ যখন ধীরে ধীরে আকাশে উঠতে থাকে তখন সুপুরিগাছের শাখাগুলি ঠিক যেন ছোটো ছেলের হাত নাড়ার মতো চাঁদমামাকে টী দিয়ে যাবার জন্যে ইশারা করে ডাকতে থাকে। এখন চৈত্রমাসের ফসল সমস্ত উঠে গিয়েচে, ছাদের থেকে দেখতে পাচ্চি, চষা মাঠ দিক-প্রান্ত ছড়িয়ে পড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কিছু বৃষ্টির জন্যে। মাঠের যে-অংশে বাবলাবনের নিচে চাষ পড়েনি সেখানে ঘাসে ঘাসে একটুখানি স্নিগ্ধ সবুজের প্রলেপ, আর সেইখানে গ্রামের গোরুগুলো চরচে। এই উদার-বিস্তৃত চষা মাঠের মাঝে মাঝে ছায়াবগুণ্ঠিত এক-একটি পল্লী—সেইখান থেকে আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথ বেয়ে গ্রামের মেয়েরা ঝকঝকে পিতলের কলসী

নিয়ে দুটি তিনটি করে সার বেঁধে প্রায় সমস্ত বেলাই জলাশয় থেকে জল নিতে চলেচে। আগে পদ্মা কাছে ছিল—এখন নদী বহুদূরে সরে গেচে—আমার তেতালা ঘরের জানালা দিয়ে তার একটুখানি আভাস যেন আন্দাজ করে বুঝতে পারি, অথচ একদিন এই নদীর সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল। শিলাইদহে যখনই আসতুম তখন দিনরাত্তির ঐ নদীর সঙ্গেই আমার আলাপ চলত; রাত্রে আমার স্বপ্নের সঙ্গে ঐ নদীর কলধ্বনি মিশে যেত আর নদীর কলস্বরে আমার জাগরণের প্রথম অভ্যর্থনা শুনতে পেতেম। তারপরে কত বৎসর বোলপুরের মাঠে মাঠে কাটল, কতকাল সমুদ্রের এপারে ওপারে পাড়ি দিলুম—এখন এসে দেখি সে-নদী যেন আমাকে চেনে না। ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে কত মাঠ, কত গ্রামের আড়াল, সবশেষে উত্তর-দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের নীলতর পাড়ের মতো একটি বনরেখা দেখা যায়। সেই নীল রেখাটির কাছে ঐ-যে একটি ঝাপসা বাষ্পলেখাটির মতো দেখতে পাচ্চি, জানি ঐ আমার সেই পদ্মা। আজ সে আমার কাছে অনুমানের বিষয় হয়েচে। এই তো মানুষের জীবন। ক্রমাগতই কাছের জিনিস দূরে চলে যায়, জানা জিনিস ঝাপসা হয়ে আসে, আর যে-স্রোত বন্যার মতো প্রাণমনকে প্লাবিত করেচে, সেই স্রোত একদিন অশ্রুবাষ্পের একটি রেখার মতো জীবনের একান্তে অবশিষ্ট থাকে।

এখন বেলা ফুরিয়ে এসেচে, অল্প একটুখানি মেঘেতে আকাশ ঢাকা, দিনাবসানেও বাগানে পাখির ডাকে একটুও ক্লান্তি দেখচিনে। দুই কোকিলের কেবলি জবাব চলেচে, কেউ হার মানতে চাচ্চে না—তা ছাড়া আরও অনেক পাখি ডাকচে, তাদের ডাক স্পষ্ট করে চেনা যায় না। সকলের ডাক মিশিয়ে জড়িয়ে গেচে, অন্য দিনের মতো বাতাস আজ দুরন্ত নয়, ঝাউগাছগুলি স্তব্ধ এবং নিঃশব্দ হয়ে গেচে। আজ অষ্টমীর চাঁদ দেখচি মেঘের পর্দার আড়ালে রাত্রি যাপন করবে।

আমার ঘরের দক্ষিণদিকে ঐ ছাদে একটি কেদারা পাতা আছে—ঐখানে সন্ধ্যার সময় আমি গিয়ে বসি। এ কয়দিন দ্বিতীয়ার চাঁদ থেকে আরম্ভ করে অষ্টমীর চাঁদ পর্যন্ত প্রত্যেকেই উদয়কালে এই কবির সঙ্গে মুকাবিলা করেচে। ঐ চাঁদ হচ্চে আমার জন্মদিনের অধিপতি। আমি যখন ছাদে বসি তখন আমার বামে পূর্ব আকাশ থেকে বৃহস্পতি আমার মুখের দিকে তাকায় আর পশ্চিম আকাশ থেকে চন্দ্রমা।—এইবার ক্রমে একটু অন্ধকার হয়ে আসচে—ঘরের মধ্যকার এই ঘোলা আলোয় আর দৃষ্টি চলচে না, বাইরে গিয়ে বসবার সময় হল।

তুমি আমার কাছে বড়ো চিঠি চেয়েছিলে, বড়ো চিঠিই লিখলুম। লিখতে পারলুম, তার কারণ এখানে অবকাশ আছে। কিন্তু এই চিঠি যখন ডাকে দেব, অর্থাৎ কাল বৃহস্পতিবারে,—কলকাতায় রওনা হব। সেখানে ট্রাম আছে, মোটর আছে, ইলেকট্রিক-পাখা আছে; সময় নেই। তারপরে বোলপুরে যাব,—সেখানে শালের বনে ফুল ফুটেচে, আমবাগানে ফল ধরেচে; সেখানে মাঠ আছে বিস্তীর্ণ, আকাশ আছে অবারিত, কিন্তু সেখানেও অবকাশ নেই।

চিঠি জিনিসটা ছোট্ট, মালতী-ফুলের মতো, কিন্তু সেই চিঠি যে-আকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে সেই আকাশ মালতী-লতারই মতো বড়ো। আমাদের যত কেজো লোকের অবকাশ টবের গাছ, তার থেকে যে-সব পত্রোদ্গম হয় সে তো পোস্টকার্ডের চেয়ে বড়ো হতে চায় না। ইতি ২২ চৈত্র, ১৩২৮।

৪৭

শান্তিনিকেতন

এতদিনে তুমি কাশী পোঁছেচ, পথের মধ্যে ভিড় পাওনি তো? এখন কেমন আছ—লিখো। তোমার যাবার পরদিন থেকেই বিদ্যালয়ের কাজ রীতিমতো আরম্ভ হয়ে গেচে, রোজই কমিটি, মিটিং এবং ক্লাসের কাজও চলচে। ছেলেরা অনাবৃষ্টির পরে আষাঢ়ের ধারার মতো কলরব করতে করতে এখানকার শূন্য ঘর সব পূর্ণ করে দিয়েচে। এখন আমার কাজের আর অন্ত নেই।

মেয়েরা সকলেই পরশুরাম হয়ে উঠেচে—কুড়ুল দিয়ে ঠকাঠক্ গাছ কাটতে লেগে গেচে। তারা আছে ভালো। এদিকে আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি শুরু হয়েচে, আর বৃষ্টিস্নাত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল রোদ্দুর তার পরশপাথর ঠেকিয়ে সমস্ত আকাশকে সোনা করে তুলেচে। আমি আমার সামনের খোলা জানলা দিয়ে ঐ শাল, তাল, শিরীষ, মহুয়া, ছাতিমের দল-বাঁধা বনের দিকে প্রায় তাকিয়ে থাকি। এখন আমার ঘড়িতে সাড়ে দুপুর, অর্থাৎ সাধারণ ঘড়িতে দুপুর। ছেলেরা তাদের মধ্যাহ্নভোজন শেষ করে দলে দলে কুয়োতলায় মুখ ধুতে আসচে—দীর্ঘ ছুটির দুঃখ-দিনের পরে কাকগুলো এঁটো শালপাতার উপর শ্রাদ্ধবাড়ির ভিখিরীর পালের মতো এসে পড়েচে। বাতাসটি মধুর হয়ে বইচে, জাম গাছের চিকন পাতার ঘনিমার উপর রৌদ্র ঝিলমিল করে উঠচে, পাটল রঙের দুটো গোরু ল্যাজ দিয়ে পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে ধীর মন্দ গমনে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্চে—আমি চেয়ে চেয়ে দেখচি আর ভাবচি। ইতি ১ জুলাই ১৩২৯।

৪৮

কলকাতা

কলকাতা শহরটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে—মনে হয় যেন ইঁট-কাঠের একটা মস্ত জন্তু আমাকে একেবারে গিলে ফেলেচে। তার উপরে আবার আকাশ মেঘে লেপা, রাত্তির থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়চে। শান্তিনিকেতনের মাঠে যখন বৃষ্টি নামে তখন তার ছায়ায় আকাশের আলো করুণ হয়ে আসে, ঘাসে ঘাসে পুলক লাগে, গাছগুলি যেন কথা কইতে চায়, আমার মনের মধ্যে গান জেগে ওঠে আর তার সুর গিয়ে পোঁছয় দিনুর ঘরে। আর এখানে নববর্ষা বাড়ির ছাদে ঠোকর খেতে খেতে খোঁড়া হয়ে পড়ে,—কোথায় তার নৃত্য, কোথায় তার গান, কোথায় তার সবুজ রঙের উত্তরীয়, কোথায় তার পুবে বাতাসে উড়ে-পড়া জটাজাল।

কথা হচ্চে, এবার শ্রাবণ মাসে আর বছরের মতো কলকাতায় বর্ষামঙ্গল গান হবে। কিন্তু যে-গান শান্তিনিকেতনের মাঠে তৈরি সে-গান কি কলকাতা শহরের হাটে জমবে। এখানে অনুরোধে পড়ে কখনো কখনো আমার নতুন বর্ষার গান গাইতে হয়েচে। কিন্তু এখানকার বৈঠকখানায় সেই গানের সুর ঠিক মতো বাজে না। তোমাদের ওখানে এতদিনে বোধ হয় বর্ষা নেমেচে, অতএব তোমার নতুন শেখা বর্ষার গান কখনো কখনো গুন্‌গুন্ স্বরে গাইতে পারবে, কখনো বা এসরাজে

বাজিয়ে তুলবে। তুমি যাওয়ার পর আরো কিছু কিছু নতুন গান আমার সেই খাতায় জমে উঠেচে, কলকাতায় না এলে আরো জমত। এদিকে দিনুবাবুও দাঁত তোলাবার জন্যে দু-তিন দিন হল কলকাতায় এসেচেন;—আষাঢ় মাসের বর্ষাকে এ শহরে যেমন মানায় না, দিনুবাবুকেও তেমনি। আজ সকালেই সে পালাবে স্থির করেচে। ইতি ২৯ আষাঢ়, ১৩২৯।

৪৯

আত্রাই নামক একটি নদীর উপর বোটে করে ভেসে চলেচি। বর্ষার মেঘ ঘন হয়ে আকাশ আচ্ছন্ন করেচে, একটু ঝোড়ো বাতাসের মতো বইচে, পাল তুলে দিয়েচে। নদী কূলে কূলে পরিপূর্ণ, স্রোত খরতর, দলে দলে শৈবাল ভেসে আসচে। পল্লীর আঙিনার কাছ পর্যন্ত জল উঠেচে; ঘন বাঁশের ঝাড়; আম কাঁঠাল তেঁতুল কুল শিমুল নিবিড় হয়ে উঠে গ্রামগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেচে; মাঝে মাঝে নদীর তীরে তীরে কাঁচা ধানের খেতে জল উঠেচে, কচি ধানের মাথা জলের উপর জেগে আছে। দুই তটে স্তরে স্তরে সবুজ রঙের ঘনিমা ফুলে ফুলে উঠেচে, তারি মাঝখান দিয়ে বর্ষার খোলা নদীটি তার গেরুয়া রঙের ধারা বহন করে ব্যস্ত হয়ে চলেচে, সমস্তটার উপর বাদল-সায়াহ্নের ছায়া। বৃষ্টি নেমে এল—দূরে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যাস্তের একটা ম্লান আভা এই বৃষ্টিধারার আবেগের উপর যেন সান্ত্বনার ক্ষীণ প্রয়াসের মতো এসে পড়েচে।

আমার এই বোট ছাড়া নদীতে আর নৌকো নেই। এই জলস্থল আকাশের ছায়াবিষ্ট নিভৃত শ্যামলতার সঙ্গে মিল করে একটি গান তৈরি করতে ইচ্ছে করচে, কিন্তু হয়তো হয়ে উঠবে না। আমার দুই চক্ষু এখন বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে চায়,—খাতার দিকে চোখ রাখবার এখন সময় নয়। অনেক দিন বোলপুরে শুকনো ডাঙায় কাটিয়ে এসেচি, এখন এই নদীর উপর এসে মনে হচ্চে,—পৃথিবীর যেন মনের কথাটি শুনতে পাওয়া যাচ্চে। নদী আমি ভারি ভালোবাসি; আর ভালোবাসি আকাশ। নদীতে আকাশে চমৎকার মিলন, রঙে রঙে, আলোয় ছায়ায়,—ঠিক যেন আকাশের প্রতিধ্বনির মতো। আকাশ পৃথিবীতে আর কোথাও আপনার সাড়া পায় না এই জলের উপর ছাড়া।

আজ রাত্রের গাড়িতেই কলকাতায় যাব মনে করে ভালো লাগছে না। ইতি ২ শ্রাবণ, ১৩২৯।

৫০

আজ বুধবারে সকালে মন্দিরের কাজ শেষ করে যেই আমার কুটীরের সামনে উত্তরদিকের বারান্দায় বসেচি অমনি নানাবিধ চিঠি ও খবরের কাগজের সঙ্গে তোমার চিঠি এসে পৌঁচল। এর আগে দু-এক দিন খুব ঘন বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, আজও স্তূপাকার কালো মেঘ আকাশক্ষেত্রের এদিকে ওদিকে ভ্রূকুটি করে বসে আছে; এখনি তারা বৃষ্টিবাণ বর্ষণ করবে বলে ভয় দেখাচ্চে। কিন্তু আজ প্রথম সকালের মেঘের ফাঁক দিয়ে অরুণোদয় খুব সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছিল।

আমি তখন পূর্বদিকের বারান্দায় বসেছিলুম, আমার মনের সঙ্গে যেন তার মুখোমুখি কথা চলছিল। মন যেদিন তার চোখ মেলে, সেদিন প্রত্যেক সকালবেলাটিই তার কাছে অপূর্ব হয়ে দেখা দেয়। বিশ্বলক্ষ্মী তাঁর অন্দরের দ্বারের কাছে রোজই দাঁড়িয়ে থাকেন, যেদিন আমরা প্রস্তুত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাত পাতি, সেদিন তাঁর দান মুঠো ভরে পেয়ে থাকি। পৃথিবী থেকে যাবার সময় আমি এই কথা বলে যেতে পারব যে, এমন দান আমি অনেক পেয়েচি।

সেপ্টেম্বরের আরম্ভে আমার বোম্বাই যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা, সেপ্টেম্বরের ১৫ই তারিখে কলকাতায় আমাদের শারদোৎসবের পালা বসবে— আমাকে সাজতে হবে সন্ন্যাসী। আমার এই সন্ন্যাসী সাজবার আর কোনো অর্থ নেই—অর্থ-সংগ্রহ ছাড়া। শুনে তোমরা বিস্মিত হোয়ো না, তোমাদের বারাণসীধামে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা সন্ন্যাসী সেজেচেন অর্থের প্রত্যাশায়, আর যাঁদের প্রত্যাশা নিরর্থক হয়নি।

এলম্‌হার্স্ট সাহেব এসেচেন। তাঁর কাছে শুনলুম তুমিও নাকি আসক্তি-বন্ধন ছেদন করে সন্ন্যাসিনী হবার চেষ্টায় আছ। সেইজন্যেই কি লজিক-পড়া শুরু করেচ। কিন্তু লজিক জিনিসটা হচ্চে কাঁটা-গাছের বেড়া, তাতে করে মানস-ক্ষেত্রের ফসলকে নির্বোধ গোরু-বাছুরের উৎপাত থেকে রক্ষা করা চলে; কিন্তু আকাশ থেকে যে-সব বর্ষণ হয়, রৌদ্রই বল, বৃষ্টিই বল, তার থেকে নিরাপদ হবার উপায় তোমার ঐ ন্যায়শাস্ত্রের বেড়া নয়। তুমি আমাকে ভয় দেখিয়েচ-যে, এবার আমার সঙ্গে দেখা হলে তুমি আমার লজিকের পরীক্ষা নেবে। আমি আগে থাকতেই হার মেনে রাখচি। পৃথিবীতে দুই জাতের মানুষ আছে। একদলকে লজিকের নিয়ম পদে পদে মিলিয়ে চলতে হয়, কেননা তারা পায়ে হেঁটে চলে,— আর একদল ন্যায়শাস্ত্রের উপর দিয়ে চলে যায়, ঊনপঞ্চাশ বায়ু তাদের বাহন, তারা এপক্ষ ওপক্ষের বিরোধ খণ্ডন করতে করতে নিজের পথ খুঁজে মরে না,—তারা এককালে নিজেরই দুই পক্ষ বিস্তার করে সেই পথ দিয়ে চলে যায়, যে-পথ হচ্চে রবি-কিরণের পথ।

এই প্রসঙ্গে, এই পত্র-লেখক কোন্‌ জাতের লোক তার একটু আভাসমাত্র যদি দিই তাহলে তুমি বলে বসবে—তিনি ভারি অহংকারী। যারা লজিকের অহংকার করে তাল ঠুকে বেড়ায় তারাই নন্‌লজিক্যাল্‌দের ব্যোমপথ-যাত্রার পক্ষবিধূননের মাহাত্ম্য খর্ব করবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে-মহিমা তো যুক্তির দ্বারা আত্মসমর্থনের অপেক্ষা করে না;—সে আপন অচিহ্নিত পথে আপন গতিবেগের দ্বারাই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

আজ এইখানেই ইতি। ১৩ই ভাদ্র, ১৩২৯।

৫১

তুমি যে তোমার লজিকের খাতার পাতা ছিঁড়ে আমাকে চিঠি লিখেচ তাতে বুঝতে পারচি, লজিক সম্বন্ধে আলোচনা পড়ে তোমার উপকার হয়েচে। লজিক যেমনি পড়া হয়ে যায় অমনি তার আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। যে-কলাপাতায় খাওয়া হয়ে যায়, সে-কলাপাতা ফেলে দিলে ক্ষতি হয় না; কিন্তু যে-তালপাতার উপর মেঘদূত লেখা হয়েচে সেটা ফেলবার জিনিস নয়।

আমরা এবার দু-তিন দিন ধরে বর্ষামঙ্গল করেচি। তার ফল কী হয়েচে, একবার দেখো। আজ ভাদ্রমাসের আঠারই তারিখ, অর্থাৎ শরৎকালের আরম্ভ, কিন্তু বর্ষার আয়োজন এখনো ভরপুরে রয়েচে। আকাশ ঘন মেঘে কালো হয়ে আছে,—থেকে থেকে ঝমাঝম বৃষ্টি হচ্চে। আমার কবিত্বের এই আশ্চর্য প্রভাব দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেচি। এমন কি, শুনতে পাই, আমার এই বর্ষামঙ্গলের জোর কাশী পর্যন্ত পোঁচেচে। সেখানেও বৃষ্টি চলচে। বোধ হচ্চে, আমরা যখন শারদোৎসব করব তারপর থেকেই শরতের আরম্ভ হবে। শারদোৎসবের রিহার্সালে আমাকে অস্থির করেচে। রোজ দুপুরবেলায় বিভূতি এসে একবার করে আমার কাছ থেকে আগাগোড়া পাঠ নিয়ে যায়; ছোটো ছেলেরা যে-রকম পড়া মুখস্থ করে আমাকে তাই করতে হয়। কিন্তু এমনি আমার বুদ্ধি, তবু রিহার্সালের সময় কেবল ভুলি—ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত হাসে—এত অপমান সে আর কী বলব।

যাই হোক, যদি তুমি আমার শারদোৎসব দেখতে আস তাহলে বোধ হয় দেখবে, ঠিক ঠিক মুখস্থ বলে যাচ্চি। তোমার বাবাকে শারদোৎসব দেখবার জন্যে আসতে বলে দিয়েচি। কিন্তু যে-রকম ব্যস্ত মানুষ, তাঁর মনে থাকলে হয়। ঐ বিভূতি এল—এইবার আমার পড়া দিইগে যাই। ১৮ই ভাদ্র, ১৩২৯।

৫২

কলকাতা

কলকাতায় সব দলবল নিয়ে উপস্থিত হয়েচি। আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ি একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত কলরবে মুখরিত হয়ে উঠেচে; পা ফেলতে সাবধান হতে হয়, পাছে একটা না একটা ছেলেকে মাড়িয়ে দিই, এমনি ভিড়। আমি অন্যমনস্ক মানুষ, কোন্ দিকে তাকিয়ে চলি তার ঠিক নেই। ওরা যখন-তখন কোনো খবর না দিয়ে আমার পায়ের কাছে এসে পড়ে প্রণাম করে। কখন তাদের মাটির সঙ্গে চ্যাপটা করে দিয়ে তাদের উপর দিয়ে চলে যাব এই ভয়ে এই ক-দিন ধুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে চলচি।

মেয়ের দলও এবার নেহাত কম নয়। নুটু থেকে আরম্ভ করে অতিসূক্ষ্ম অতি ক্ষুদ্র লতিকা পর্যন্ত। ননীবালা তাদের দিনরাত সামলাতে হয়রান হয়ে পড়েচে। কিন্তু আমাকে দেখবার লোক কেউ নেই; স্বয়ং এন্ডরুজ সাহেব পাঞ্জাবে আকালীদের নাকাল সম্বন্ধে তদন্ত করতে অমৃতসরে চলে গেছেন। লেডি সাহেবেরা গেছেন বোম্বাই; বৌমা আছেন শান্তিনিকেতনে। সুতরাং আমাকে ঠিকমতো শাসনে রাখতে পারে এমন অভিভাবক কেউ না থাকাতে আমি হয়তো উচ্ছৃংখল হয়ে যেতে পারি এমন আশংকা আছে। আপাতত যা-তা বই পড়তে আরম্ভ করেচি, কেউ নেই আমাকে ঠেকায়। তার মধ্যে লজিকের বই একখানাও নেই। এমনি করে পড়া ফাঁকি দিয়ে বাজে পড়া পড়ে সাতাশ বছর কেটে গেল, এখন চেতনা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তার কোনো লক্ষণ নেই।

আমি ভেবেছিলুম—সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তোমাদের ছুটি; তা যখন নেই তখন শারদোৎসব দেখা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব; কারণ ওটা হচ্চে ছুটির নাটক।

ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েচে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েচে পাঠশালা থেকে। তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই কেবল একমাত্র হচ্চে—"বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা।" ওর মধ্যে একটা উপনন্দ কাজ করচে, কিন্তু সেও তার ঋণ থেকে ছুটি পাবার কাজ।

তোমরা যখন ছুটি পাবে, আমরা তখন বোম্বাই অভিমুখে রেলপথে ছুটচি। কিন্তু সে-পথ মোগলসরাই দিয়ে যায় না, সে হচ্চে বেঙ্গল নাগপুর লাইন। তারপরে বোম্বাই হয়ে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ হয়ে মালাবার, মালাবার হয়ে সিংহল, সিংহল হয়ে পুনশ্চ বোম্বাই। এমনি বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরপাক খেতে খেতে অবশেষে একদিন নভেম্বর মাসের কোন্ তারিখে শান্তিনিকেতনে এসে একখানা লম্বা কেদারার উপর চিত হয়ে পড়ব। তারপরেই আবার শুরু হবে সাতই পৌষের পালা। তারপরে আরো কত কী আছে তার ঠিক নেই। ছুটির নাটক লিখলেই কি ছুটি পাওয়া যায়। আমি ইস্কুল পালিয়েও ছুটি পেলুম না, ইস্কুলের আবর্তের মধ্যে ল্যাটিমের মতো ঘুরতে লাগলুম। অঙ্ক কষতে ঢিলেমি করলুম, আজ চাঁদার অঙ্কের ধ্যান করতে করতে আহার নিদ্রা বন্ধ। ইংরেজি প্রবাদে এই রকম ব্যাপারকেই বলে থাকে ভাগ্যের বিদ্রূপ।

এতদিন পরে আমাদের এখানে রৌদ্রোজ্জ্বল চেহারা দেখা দিয়েচে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্চে কিন্তু সে শরতের ক্ষণিক বৃষ্টি। দিন সুন্দর, রাত্রি নির্মল, মেঘ রঙিন, বাতাস শিশির-স্নিগ্ধ। এ হেন কালে অতলস্পর্শ অকর্মণ্যতার মধ্যে ডুবে থাকাই ছিল বিধির বিধি, কিন্তু ভাগ্যের লিখন বিধির বিধিকেও অতিক্রম করে, এই কথা স্মরণ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এই পত্র সমাপন করি। ইতি ২৪ ভাদ্র, ১৩২৯।

৫৩

শান্তিনিকেতন

ইতিমধ্যে আমার দৈনিক কার্যকলাপের একটুখানি scene বদলে গেচে। সেই বড়ো ঘরটা ছেড়ে দিয়েচি, সেটা রাস্তার ধারে থাকাতে যখন-তখন যে-সে এসে উৎপাত করত। এখন এসেচি দক্ষিণের বারান্দার পূর্ব কোণে, না'বার ঘরটার ঠিক বিপরীত প্রান্তে, একটি ছোটো ঘরে। এ ঘরটার গোড়াপত্তন তুমি বোধ হয় দেখেছিলে। আমার সেই কালো স্লেট-বাঁধানো লেখবার টেবিলে ঘরের প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়ে গিয়েচে, কেবল আর-একটিমাত্র চৌকি আছে। ঘরের মধ্যে লোকের ভিড় হবার জায়গা রাখিনি।

এখন মধ্যাহ্ন, ক-টা বেজেচে ঠিক বলতে পারিনে, কারণ আমার ঘড়ি বন্ধ। বন্ধ না থাকলেও-যে ঠিক সময় পাওয়া যেত তা নয়; তুমি আমার সেই ঘড়ির পরিচয় জান। এইটুকু বলতে পারি, কিছু পূর্বেই একখানা পরোটা ডাল ও তরকারি সংযোগে আহার করে লিখতে বসেচি।

রৌদ্র প্রখর, শরতের সাদা মেঘ স্তরে স্তরে আকাশের যেখানে-সেখানে স্ফীত হয়ে পড়ে আছে, বাইরে থেকে শালিখ পাখির ডাক শুনতে পাচ্চি, বামের রাস্তা দিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করতে করতে মন্দগমনে গোরুর গাড়ি চলেচে, আমার ডানদিকের

দক্ষিণের জানালা দিয়ে কাঁচা ধানের খেতের প্রান্তে সুদূরে তালগাছের সার দেখা যাচ্ছে, তন্দ্রালস ধরণীর দীর্ঘনিশ্বাসটি নিয়ে আতপ্ত হাওয়া ধীরে ধীরে আমার পিঠে এসে লাগচে।

এ রকম দিনে কাজ করতে ইচ্ছে করে না, এই মেঘগুলোর মতোই অকেজো হাওয়ায় মনটা বিনা কারণে দিগন্ত পার হয়ে ভেসে যেতে চায়। জানলার বাইরে মাঝে মাঝে যখন চোখ ফেরাই তখন মনে হয় যেন সুর-বালকেরা স্বর্গের পাঠশালা থেকে গুরুমহাশয়কে না বলে পালিয়ে এসেচে। আকাশের এ-কোণ ও-কোণ থেকে সবুজ পৃথিবীর দিকে তা'রা উঁকি মারচে। হাওয়ায় হাওয়ায় তাদের কানাকানি শুনে আমার মনটাও উতলা হয়ে দৌড় মারবার চেষ্টা করচে।

কিন্তু আমরা-যে পৃথিবীর ভারাকর্ষণের টানে বাঁধা; মাটি আমাদের পা জড়িয়ে থাকে, কিছুতেই ছাড়তে চায় না। অতএব মনের একটা ভাগ জানলার বাইরে দিয়ে যতই উড়তে থাক্, আর-একটা ভাগ ডেস্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পত্ররচনায় ব্যস্ত। দূরে কোথাও যদি যাবার ব্যবস্থা হয়, মনটাকে রেলভাড়ার কথা ভাবতে হয়; দেবতার মতো শরতের মেঘের উপর চড়ে মালতী-সুগন্ধি হাওয়ার হিল্লোলে বেণুবনের পাতায় পাতায় দোল খেয়ে খেয়ে বিনা ব্যয়ে ভ্রমণ করে বেড়াতে পারে না। ইতি ৩১ ভাদ্র, ১৩৩০।

৫৪

মাদ্রাজ

এইমাত্র মাদ্রাজে এসে পৌঁচেচি। আজ রাত্রে কলম্বো রওয়ানা হব। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও নানা ঘূর্ণিপাকের আঘাতে দেহ মন ভেঙে ছিঁড়ে বেঁকে চুরে গিয়েছিল, ক্লান্তি ও অবসাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এসে বেরিয়েছিলুম।

গাড়ি যখন সবুজ প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে চলছিল তখন মনে হচ্ছিল যেন নিজের কাছ থেকে নিজে দৌড়ে ছুটে পালাচ্চি। একদিন আমার বয়স অল্প ছিল; আমি ছিলুম বিশ্বপ্রকৃতির বুকের মাঝখানে; নীল আকাশ আর শ্যামল পৃথিবী আমার জীবন-পাত্রে প্রতিদিন নানা রঙের অমৃত রস ঢেলে দিত; কল্পলোকের অমরাবতীতে আমি দেবশিশুর মতোই আমার বাঁশি হাতে বিহার করতুম।

সেই শিশু সেই কবি আজ ক্লিষ্ট হয়েচে, লোকালয়ের কোলাহলে তার মন উদ্‌ভ্রান্ত, তারই পথের ধুলায় তার চিত্ত ম্লান। সে আপন ক্লান্ত বিক্ষত চরণ নিয়ে তার সেই সৌন্দর্যের স্বপ্নরাজ্যে ফিরে যেতে চাচ্চে। তার জীবনের মধ্যাহ্নে কাজও সে অনেক করেচে, ভুলও কম করেনি; আজ তার কাজ করবার শক্তি নেই, ভুল করবার সাহস নেই। আজ জীবনের সন্ধ্যাবেলায় সে আর-একবার বিশ্বপ্রকৃতির আঙিনায় দাঁড়িয়ে আকাশের তারার সঙ্গে সুর মিলিয়ে শেষ বাঁশি বাজিয়ে যেতে চায়। যে-রহস্যলোক থেকে এই মর্ত্যলোকে একদিন সে এসেছিল সেখানে ফিরে যাবার আগে শান্তি-সরোবরে ডুব দিয়ে স্নান করতে চায়। তেমন করে ডুব দিতে যদি পারে তাহলে তার জীর্ণতা তার ম্লানতা সমস্ত ঘুচে যাবে; আবার তার মধ্য থেকে সেই চিরশিশু বাহির হয়ে আসবে।

সংসারের জটিলতায় ঘিরে ঘিরে আমাদের চিত্তের উপর যে জীর্ণতার আবরণ

সৃষ্টি করে সেটা তো ধ্রুব সত্য নয়, সেটা মায়া। সেটা যে-মুহূর্তে কুহেলিকার মতো মিলিয়ে যায় অমনি নবীন নির্মল প্রাণ আপনাকে ফিরে পায়। এমনি করে বারে বারে আমরা নূতন জীবনে নূতন শিশুর রূপ ধরি। সেই নূতন জীবনের সরল বাল্যমাধুর্যের জন্যে আমার সমস্ত মন আগ্রহে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেচে।

আজ আমি চলেচি সমুদ্র পারে কাজের ক্ষেত্রে; যখন সেই কাজের ভিড়ে থাকব তখন হয়তো আমার ভিতরকার কর্মী আর-সকল কথা ভুলিয়ে দেবে। কিন্তু তবু সেই সুদূর গানের ঝরনাতলায় বাঁশির বেদনা ভিতরে ভিতরে আমাকে নিশ্চয়ই ডাকবে;—ডাকবে সেই নির্জন নির্মল নিভৃত ঝরনাতলার দিকেই। সেই ডাক আমার সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদের ভিতর দিয়ে আমার বুকের মধ্যে আজ এসে কুহরিত হচ্চে। বলচে, সেখানে ফিরে যাবার পথ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, এখনো আমার সুরের পাথেয় সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়নি, এখনো সেই নব নব বিস্ময়ে দিশাহারা বালককে কোনো এক ভিতরমহলে খুঁজে পাওয়া যায়।

তাই, যদিও আজ চলেচি পশ্চিম-সমুদ্রের তীরে, আমার মন খুঁজে বেড়াচ্চে আর-এক তীরে সকল-কাজভোলা সেই বালকটাকে। পূরবী গানে সে আপন লীলা শেষ করতে না পারলে সন্ধ্যা ব্যর্থ হবে, এখন সে কোথায় ঘুরে মরচে। ফিরে আয়, ফিরে আয়, বলে ডাক পড়েচে। একজন কে তার গান শুনতে ভালোবাসে। আকাশের মাঝখানে তার আসন পাতা, সেই তো শিশুকালে তাকে বাঁশির দীক্ষা দিয়েছিল, নিশীথরাতের শেষ রাগিণী বাজানো হলে তারপরে তার বাঁশি ফিরে নেবে। আজ কেবলি সেই কথাই আমার মনে পড়চে। ইতি ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪।

৫৫

কলকাতা

আজ সন্ধ্যাবেলায় ঘন মেঘ করে খুব একচোট বৃষ্টি হয়ে গেচে। এখন বৃষ্টি নেই কিন্তু আকাশে মেঘ কালো হয়ে জমে আছে। প্রশান্ত আর রানী কোথায় চলে গেচে—বাড়িতে কেউ কোথাও নেই—আমি টেবিলের উপর ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে দিয়ে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেচি। সমস্ত দিন নানা কাজে, নানা লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতে, নানা লেখায় কেটে গিয়েচে। এক মুহূর্ত বিশ্রাম করতে পাইনি—লেখার মাঝে মাঝে খুব ঘুম পেয়েছিল, কিন্তু কষে ঝাঁকানি দিয়ে ঘুম তাড়িয়ে কাজ করে গেচি। নিজেকে একরকম করে খুঁচিয়ে কাজ করানো একেবারেই ভালো নয় জানি। তাতে কাজও-যে ভালো হয় তা নয় আর বিশ্রামও মাটি হয়ে যায়। কিন্তু আমার কুষ্ঠিতে কর্ম-স্থানে শনি আছে, সে আমাকে দয়ামায়া একটুও করে না—কষে খাটিয়ে নেয়, মজুরিও যথেষ্ট দেয় না। কাল দিনেরবেলায় আবার নানারকম কাজের পালা আরম্ভ হবে—তাই এখন চিঠি লিখতে বসেচি। এখন সন্ধে সাড়ে আটটা—তোমার ওখানে হয়তো তুমি এখন পড়ার বই নিয়ে বসে গেচ। আজকাল আমাকে যে-রকম দায়ে পড়ে খাটতে হয়, যদি তোমাদের বয়সে সেইরকম পরীক্ষার পড়ায় খাটতুম তাহলে এতদিনে হয়তো আই. এ. পরীক্ষা পাসের তকমা পরে কন্যাকর্তাদের মহলে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পারতুম। তাহলে

পণের টাকায় বিশ্বভারতীর ঝুলি ভর্তি করে দিনে-দুপুরে নাকে তেল দিয়ে নিদ্রা দিতে একটুও দ্বিধা বোধ হত না। আমার কলকাতার কাজ শেষ হয়ে এল, পরশু কিংবা শনিবার শান্তিনিকেতনে ফিরে যাব, সেখানে এতদিনে শরৎকালের রৌদ্দুরে আকাশে সোনার রং ধরেচে আর শিউলি ফুলের গন্ধে বাতাস ভোর হয়ে আছে। আজ বুধবার; আজ থেকে ছেলেরা সব হো হো করতে করতে বাড়িমুখো দৌড়েচে—কাল পর্শুর মধ্যে আশ্রম প্রায় শূন্য হয়ে যাবে। এদিকে শুক্লপক্ষ এসে পড়ল, দিনে দিনে সন্ধ্যার পেয়ালাটি চাঁদের আলোয় ভর্তি হয়ে উঠতে থাকবে। আমি বারান্দায় আরাম কেদারার উপর পা তুলে দিয়ে একলা চুপ করে বসব—চাঁদ আমার মনের ভাবনাগুলির 'পরে আপন রুপোর কাঠি ছুঁইয়ে তাদের স্বপ্নময় করে তুলবে,—ছাতিমতলায় ঝরে-পড়া মালতী ফুলের গন্ধ জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশে যাবে। সেই সুগন্ধি শুক্লরাত আমার মনের একোণ-ওকোণে উঁকি দিয়ে কোনো নতুন গানের সুর খুঁজে বেড়াবে—বেহাগ কিংবা সিন্ধু কিংবা কানাড়া। থাক্—সে-সব কথা পরে হবে, আপাতত চিঠি বন্ধ করে এখানকার বারান্দায় মেঘাবৃত রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে মনটাকে ডুবিয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম করতে যাই। যদি ক্লান্তির ঘুমে চোখ বুজে আসে তাহলে তাকে তাড়া দিয়ে দেশছাড়া করব না।

৫৬

বোম্বাই

তুমি লিখেচ, তোমার সব কথার জবাব দিতে; অতএব তোমার চিঠি সামনে রেখে জবাব দিতে বসেচি—এবারে বোধ হয় পুরো মার্ক পাব। তোমার প্রথম প্রশ্ন—আমি এখন কোথায় আছি। ছিলুম নানা জায়গায়, প্রধানত কাঠিয়াবাড়ে, তারপরে আমেদাবাদে, তারপরে বরোদায়, আজ সকালে এসেচি বোম্বাইয়ে। এতকাল ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বলে সমস্ত চিঠি এখানে জমা হচ্ছিল, তারমধ্যে তোমার দু-খানা চিঠি। লেফাফার সর্বাঙ্গে নানাপ্রদেশের নানা ডাকঘরের কালো কালো চাকা চাকা ছাপ। এখানে বেশিদিন থাকা হবে বলে বোধ হচ্চে না, কারণ ৭ই পৌষ নিকটবর্তী। অতএব দু-চার দিনের মধ্যে সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং বঙ্গ-ভূমিকে প্রণাম করতে যাত্রা করব। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েচি, যাই হোক খ্রীস্টমাসের পূর্বেই ফিরব। তোমার বাবাকে লিখে দিয়েচি, তোমাকে শান্তি-নিকেতনে নিয়ে আসতে। এই পর্যন্ত তোমায় উত্তর দিয়ে তোমার চিঠি খুঁজে দেখলুম, আর কোনো প্রশ্ন নেই।

এলম্‌হার্স্ট আমার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে বরোদায় এসে জ্বরে পড়েছিল। সেখানে তিন দিন বিছানায় পড়েছিল, এখানে এসে সেরে উঠেচে। আর আমার সঙ্গে আছে গোরা। এবারে সাধুচরণের সঙ্গ ও সেবা থেকে বঞ্চিত আছি। বনমালী নামধারী উৎকলবাসী সেবক বৌমার আদেশক্রমে এসেচে। সে সর্বদাই ভয়ে ভয়ে আছে। সবচেয়ে ভয় আমাকে, অথচ আমি বিশেষ ভয়ংকর নই। দ্বিতীয় ভয়, পাছে রাজবাড়ির অন্নপানে বিদেশে গঙ্গাতীর হতে দূরবর্তী দেশে অকালমৃত্যু ঘটে। তৃতীয় ভয়, রেলগাড়িতে বিদেশীয় জনতাকে,—তারা ওর সঙ্গে হিন্দী বলে, ও বলে বাংলা—তাতে কথোপকথন উভয় পক্ষেই দুর্বোধ হয়ে ওঠে। ওর বিশ্বাস,

এ জন্য বিদেশীরাই দায়িক। ওর আর একটা বিশেষ গুণ এই-যে, ওকে যদি কোনো কাপড় বের করে দিতে বলি তাহলে সিন্দুক থেকে একে একে সব কাপড় বের করে তবে সেটা নির্বাচন করতে পারে, আবার সবগুলো তাকে একে একে ফিরে গোচাতে হয়। মানুষের আয়ু যখন অল্প, সময় যখন সীমাবদ্ধ, তখন এরকম চাকর নিয়ে মর্ত্যলোকে অসুবিধায় পড়তে হয়। ওর একটা মস্ত গুণ এই-যে, ও ঠাট্টা করলে বুঝতে পারে, ঠিক সময়ে হাসতে জানে; আমার late lamented সাধুচরণের সে বালাই ছিল না। আমার আবার স্বভাব এমন-যে, ঠাট্টা না করে বাঁচিনে, তাই ও যতক্ষণ কাপড় বের করচে আর গোচাচ্চে, আমি ততক্ষণ সেই সুদীর্ঘ সময় ঠাট্টা করে অতিবাহন করি। যাই হোক, ওকে বিদেশী হাওয়া, বিদেশী খাওয়া, বিদেশী ভিড় থেকে ফিরে নিয়ে গিয়ে কোনোমতে বৌমার হাতে আস্তটি ফিরে দিতে পারলে নিরুদ্বিগ্ন হই। আমার-যে কতবড়ো দায়িত্ব, সে ওকে না দেখলে ভালো করে অনুধাবন করতেই পারবে না। একে আমার বিশ্বভারতী, তার উপর বনমালী। ভাবনার আর অন্ত নাই।

আমি বোধ হয় দুই তিন দিনের মধ্যেই রওনা হব, অতএব যদি চিঠি লেখ তো শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় লিখো। ইতি বোধ হচ্চে ১০ই ডিসেম্বর।

৫৭

জাহাজ প্রায় ন-টার সময় ছাড়ল। সেই আমাদের পুরোনো গঙ্গাতীর—এই তীর ছেলেবেলায় আমাকে কতদিন কী গভীর আনন্দ দিয়েচে। ধীরে ধীরে যখন সেই শান্ত সুন্দর নিভৃত শ্যামল শোভা দেখি আর এই উদার গঙ্গার কলধ্বনি শুনি তখন আমার সমস্ত মন একে আঁকড়ে ধরে;—ছোটো শিশু যেমন করে মাকে ধরে। আমি জীবনের কতকাল-যে এই নদীর বাণী থেকেই আমার বাণী পেয়েচি, মনে হয় সে যেন আমি আমার আগামী জন্মেও ভুলব না। বস্তুত এই জীবনেই আমার সেই জন্ম কেটে গিয়েচে।

ছেলেবেলায় যখন সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে এই জলস্থল আকাশের মহাপ্রাঙ্গণে আমার খেলা আরম্ভ করেছিলুম, সেই খেলার দিন আজ ফুরিয়ে গেচে। আজ এই বিপুল বিচিত্র মাতৃ-অঙ্গন থেকে বহুদূরে এসেচি। সকালবেলাকার ফুলের সব শিশির শুকিয়ে গেচে—আজ প্রখর মধ্যাহ্নের কর্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করচি। আমার কর্মের সঙ্গে পাখির গান, নদীর কল্লোল, পাতার মর্মর আপনার সুর যোগ করে দিতে পারচে না—অন্যমনস্ক হয়ে আছি। নীলাকাশের অনিমেষ দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে এসে তেমন অবারিত আত্মীয়তায় মিলচে না, কর্মশালার জানলা-দরজার ফাঁক দিয়ে এই বিশ্বের হৃদয় আগেকার মতো তেমন সম্পূর্ণ করে আমার বুকের উপর এসে পড়ে না, মাঝখানে কত রকমের চিন্তার, কত রকমের চেষ্টার ব্যবধান। এই তো দেখচি সেদিনকার লীলা-লোক থেকে আজকের দিনের কর্মলোকে জন্মান্তর গ্রহণ করেচি, তবু সেদিনকার ভোরবেলায় সানাইয়ের সুরে ভৈরবী আলাপ এখনো ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে মনকে উতলা করে দেয়।

কাল গঙ্গার উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলুম। তখন কেবলি জলের থেকে আকাশ থেকে তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি থেকে এই প্রশ্ন আমার কানে আসছিল, "মনে পড়ে

কি।” এবারকার এই দেহের ক্ষেত্র থেকে যখন বেরিয়ে চলে যাব, তখনো কি এই প্রশ্ন ক্ষণে ক্ষণে আমার হৃদয়ের উপর হাওয়ায় ভেসে আসবে। এবারকার এই জীবনের এই ধরণীর সমস্ত “জন্মান্তর-সৌহৃদানি”!

কাল দোল-পূর্ণিমা গঙ্গার উপরেই দেখা দিল। জাহাজ বালির চরে জোয়ারের অপেক্ষায় রাত্রি সাতটা পর্যন্ত আটকে পড়েছিল। সমুদ্রে যদি দোল-পূর্ণিমার আবির্ভাব হত তা হলেই তার নাম সার্থক হত—তাহলে দোলনও থাকত, আর নীলের সঙ্গে শুভ্রের, সাগরের সঙ্গে জ্যোৎস্নার মিলনও দেখতুম।

আজ ভোরে উঠে দেখলুম, জাহাজ কূলরেখাহীন জলরাশির উপরে ভেসে চলেচে—“মধুর বহিছে বায়ু।” আজ শনিবার; সোমবারে শুনচি রেঙ্গুনে পৌঁছব। সেখানে দিন-দুয়েক সভাসমিতি, অভ্যর্থনা, মাল্যচন্দন, বক্তৃতা, জনতার করতালিতে আমাকে চেপে মারবার চেষ্টা। তারপরে বোধ হয় বুধবারে কোনো এক সময়ে মুক্তি। ইতি চৈত্র ১৩৩০।

৫৮

কলম্বো

ভারতবর্ষ ছেড়ে এই খানিকক্ষণ হল সিংহলে এসেচি। কাল সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়বে। আকাশ অন্ধকার। ঘন বাদলার মেঘ সকালবেলার সোনার আলো গণ্ডূষ ভরে পান করেচে, কেবল তার তলানি ছায়াটুকু বাকি। দেশে থাকলে সকালবেলায় দিনের এই ছায়াবগুণ্ঠন ভালোই লাগত। ইচ্ছে করত, কাজকর্ম বন্ধ করে মাঠের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নরাজ্যে মনটাকে পথহারা করে ছেড়ে দিই, কিংবা হয়তো গুন-গুন সুরে নতুন একটা গান ধরে মেঘদূতের কবির সঙ্গে যথাসাধ্য পাল্লা দিতে বসতুম।

কিন্তু এখানে মনটা বিবাগী, তার একতারাটা কোথায় হারিয়ে গেচে। “গানহারা মোর হৃদয়তলে” এই অন্ধকার যেন একটা স্তূপাকার মূর্ছার মতো উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সুদূর এবং সুদীর্ঘ যাত্রার দিনের মুখে আকাশ থেকে সূর্যের আলো দেবতার অভিনন্দনের মতো বোধ হয়। আজ মনে হচ্চে যেন আমার সেই জয়-যাত্রার অধিদেবতা নীরব। গগন-বীণার থেকে যে-বাণী পাথেয় স্বরূপ সংগ্রহ করে সমুদ্রে পাড়ি দিতুম, সেই আকাশভরা বাণী আজ কোথায়।

কালস্রোতে যে-বাড়িতে এসে আছি, এ একজন লক্ষপতির বাড়ি। প্রকাণ্ড প্রাসাদ। আরামে বাস করবার পক্ষে অত্যন্ত বেশি ঢিলে, ঘরগুলোর প্রকাণ্ড হাঁ মানুষকে গিলে ফেলে। যে-ঘরে বসে আছি, তার জিনিসগুলো এত বেশি ফিটফাট-যে, মনে হয় সেগুলো ব্যবহার করবার জন্যে নয়, সাজিয়ে রাখবার জন্যে। বসবার শোবার আসবাবগুলো শুচিবায়ুগ্রস্ত গৃহিণীর মতো; সন্তর্পণে থাকে, কাছে গেলে যেন মনে মনে সরে যায়। এই ধনী-ঘরের অতিপারিপাট্য এও যেন একটা আবরণের মতো।

আমার সেই তেতালা ঘরের চেহারা মনে পড়ে তো? সমস্ত এলোমেলো। সেখানে শোবার বসবার জন্যে একটুও সাবধান হবার দরকার হয় না:—তার অপরিচ্ছন্নতাই যেন তার প্রসারিত বাহু, তার অভ্যর্থনা। সে-ঘর ছোটো, কিন্তু

সেখানে সবাইকেই ধরে। মানুষকে ঠিক মতো ধরবার পক্ষে হয় ছোট্ট একটি কোণ, নয় অসীম বিস্তৃত আকাশ। ছেলেবেলায় যখন আমি পদ্মার কোলে বাস করতুম, তখন পাশাপাশি আমার দুই রকম বাসাই ছিল। একদিকে ছিল আমার নৌকোর ছোটো ঘরটি, আর-একদিকে ছিল দিগন্ত প্রসারিত বালুর চর। ঘরের মধ্যে আমার অন্তরাত্মার নিশ্বাস, আর চরের মধ্যে তার প্রশ্বাস। একদিকে তার অন্দরের দরজা, আর একদিকে তার সদর দরজা।

৫৯

শান্তিনিকেতন

পৃথিবীতে অধিকাংশ বড়ো বড়ো জ্ঞানীলোকেরা এই গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করেচেন-যে, রাত্রিটা নিদ্রা দেবার জন্যে। নিজেদের এই মত সমর্থন করবার জন্যে তাঁরা স্বয়ং সূর্যের দোহাই দেন। তাঁরা আশ্চর্য গবেষণা এবং যুক্তি-নৈপুণ্য প্রয়োগ করে বলেচেন, রাত্রে নিদ্রাই যদি প্রকৃতির অভিপ্রায় না হবে তবে রাত্রে অন্ধকার হয় কেন, অন্ধকারে দর্শন মনন শক্তির হ্রাস হয় কেন, উক্ত শক্তির হ্রাস হলে কেনই বা আমাদের দেহ তন্দ্রালস হয়ে আসে।

গভীর অভিজ্ঞতা-প্রসূত এই সকল অকাট্য যুক্তির কোনো উত্তর দেওয়া যায় না, কাজেই পরাস্ত হয়ে ঘুমোতে হয়। তাঁরা সব শাস্ত্র ও তার সব ভাষ্য ঘেঁটে বলেচেন-যে, রাত্রে ঘুম না হওয়াকেই বলে অনিদ্রা, ঘুম হলে অনিদ্রা বলে জগতে কোনো পদার্থ থাকতই না। এতবড়ো কথার সমস্ত তাৎপর্য বুঝতেই পারি না, আমাদের তো দিব্যদৃষ্টি নেই, আমরা যথোচিত পরিমাণে ধ্যান-ধারণা-নিদিধ্যাসন করিনি, সেই জন্যে সংশয়-কলুষিত চিত্তে আমরা তর্ক করে থাকি-যে, রাত্রে কয়েক ঘণ্টা না ঘুমোলেই সেটাকে লোকে অনিদ্রা বলে নিন্দা করে, অথচ দিনে অন্তত বারো ঘণ্টাই-যে কেউ ঘুমোইনে সেটাকে ডাক্তারিশাস্ত্রে বা কোনো শাস্ত্রেই তো অনিদ্রা বলে না। শুনে প্রবীণ লোকেরা আমাদের অর্বাচীন বলে হাস্য করেন; বলেন আজকালকার ছেলেরা দু চার পাতা ইংরেজি পড়ে তর্ক করতে আসে, জানে না-যে, "বিশ্বাসে মিলয়ে নিদ্রা, তর্কে বহু দূর।"

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ বারবার পরীক্ষা করে দেখা গেচে-যে, তর্ক যতই করতে থাকি নিদ্রা ততই চড়ে যায়, বিনা তর্কে তার হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়। অতএব আজকের মতো চিঠি বন্ধ করে শুতে যাই। যদি সম্ভবপর হয় তাহলে কাল সকালে চিঠি লিখব।

চিঠি বন্ধ করা যাক, কেরোসিন প্রদীপটা নিবিয়ে দেওয়া যাক, ঝপ করে বিছানাটার মধ্যে গিয়ে পড়া যাক। শীত,—বেশ একটু রীতিমতো শীত,—উত্তর-পশ্চিমের দিক থেকে হিমের হাওয়া বইচে। দেহটা বলে উঠচে, "ওহে কবি, আর বাড়াবাড়ি ভালো নয়, তোমার বাজে কথার কারবার বন্ধ করে মোটা কম্বলটা মুড়ি দিয়ে একবার চক্ষু বোজো, অনন্যগতি আমি তোমার আজন্মকালের অনুগত, আর আমরণ কালের সহচর, তাই বলেই কি আমাকে এত দুঃখ দিতে হবে। দেখচ না, পা দুটো কী রকম ঠাণ্ডা হয়ে এসেচে, আর মাথাটা হয়েচে গরম? বুঝচ না কি, এটা তোমার রাত্রিকালের উপযোগী মন্দাক্রান্তা ছন্দের যতি-ভঙ্গের লক্ষণ,—এসময়ে

মস্তিষ্কের মধ্যে শার্দূলবিক্রীড়িতের অবতারণা করা কি প্রকৃতিস্থ লোকের কর্ম।"—কায়ার এই অভিযোগ শুনে তার প্রতি অনুরক্ত আমার মন বলে উঠচে, "ঠিক ঠিক। একটুও অত্যুক্তি নেই।" ক্লান্ত দেহ এবং উদ্‌ভ্রান্ত মন উভয়ের সম্মিলিত এই বেদনাপূর্ণ আবেদনকে আর উপেক্ষা করতে পারিনে, অতএব চললুম শুতে।

প্রভাত হয়েচে। তুমি আমাকে বড়ো চিঠি লিখতে অনুরোধ করেচ। সে-অনুরোধ পালন করা আমার সহজ-স্বভাব-সংগত নয়, পল্লবিত করে পত্র লেখার উৎসাহ আমার একটুও নেই। আমি কখনো মহাকাব্য লিখিনি বলে আমার স্বদেশী অনেক পাঠক আমাকে অবজ্ঞা করে থাকেন,—মহাচিঠিও আমি সচরাচর লিখতে পারিনে। কিন্তু যেহেতু আমার চীনপ্রয়াণের সময় নিকটবর্তী, এবং তখন আমার চিঠিও অগত্যা যথেষ্ট বিরল হয়ে আসবে, সেইজন্যে আগামী অভাব পূরণ করবার উদ্দেশ্যে বড়ো চিঠি লিখচি। সে-অভাব যে অত্যন্ত গুরুতর অভাব এবং সেটা পূরণ করবার আর কোনো উপায় নেই, এটা কল্পনা করচি নিছক অহংকারের জোরে। আসল কথাটা এই-যে, এবার তুমি যে চিঠিটা লিখেচ সেটা তোমার সাধারণ চিঠির আদর্শ অনুসারে কিছু বড়ো, সেইজন্যে তোমার সঙ্গে পাল্লা দেবার গর্বে বড়ো চিঠি লিখচি। তুমি নামতায় আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, লজিকেও তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা আমার কর্ম নয়, কিন্তু বাগ্‌বিস্তার বিদ্যায় কিছুতেই আমাকে পেরে উঠবে না। এই একটি মাত্র জায়গায় যেখানে আমার জিত আছে, সেইখানে তোমার অহংকার খর্ব করবার ইচ্ছা আমার মনে এল। ইতি ৫ই ফাল্গুন, ১৩৩০।

চারিত্রপূজা

চারিত্রপূজা

আমাদের দেশে আমরা বলিয়া থাকি, মহাত্মাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তাহা কৃতজ্ঞতার ঋণ শুধিবার জন্য নহে— ভক্তিভাজনকে দিবসারম্ভে যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে স্মরণ করে তাহার মঙ্গল হয়— মহাপুরুষদের তাহাতে উৎসাহ বৃদ্ধি হয় না, যে ভক্তি করে সে ভালো হয়। ভক্তি করা প্রত্যেকের প্রাত্যহিক কর্তব্য।

কিন্তু তবে তো একটা লম্বা নামের মালা গাঁথিয়া প্রত্যহ আওড়াইতে হয় এবং সে মালা ক্রমশই বাড়িয়া চলে। তাহা হয় না। যথার্থ ভক্তিই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে মালা বেশি বাড়িতে পারে না। ভক্তি যদি নির্জীব না হয় তবে সে জীবনের ধর্ম অনুসারে গ্রহণ-বর্জন করিতে থাকে, কেবলই সঞ্চয় করিতে থাকে না।

পুস্তক কতই প্রকাশিত হইতেছে— কিন্তু যদি অবিচারে সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি না থাকে, যদি মনে করি, কেবল যে-বইগুলি যথার্থই আমার প্রিয়, যাহা আমার পক্ষে চিরদিন পড়িবার যোগ্য, সেইগুলিই রক্ষা করিব, তবে শত বৎসর পরমায়ু হইলেও আমার পাঠ্যগ্রন্থ আমার পক্ষে দুর্ভর হইয়া উঠে না।

আমার প্রকৃতি যে মহাত্মাদিগকে প্রত্যহস্মরণযোগ্য বলিয়া ভক্তি করে তাঁহাদের নাম যদি উচ্চারণ করি তবে কতটুকু সময় লয়। প্রত্যেক পাঠক যদি নিজের মনে চিন্তা করিয়া দেখেন তবে কয়টি নাম তাঁহাদের মুখে আসে। ভক্তি যাঁহাদিগকে হৃদয়ে সজীব করিয়া না রাখে, বাহিরে তাঁহাদের পাথরের মূর্তি গড়িয়া রাখিলে আমার তাহাতে কী লাভ।

তাঁহাদের তাহাতে লাভ আছে এমন কথা উঠিতেও পারে। লোকে দল বাঁধিয়া প্রতিমা স্থাপন করিবে, অথবা মৃতদেহ বিশেষ স্থানে সমাহিত হইয়া গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এই আশা স্পষ্টত বা অলক্ষ্যে মনকে উৎসাহ দিতেও পারে। কবরের দ্বারা খ্যাতিলাভ করিবার একটা মোহ আছে।

কিন্তু মহাত্মাদিগকে সেই বেতন দিয়া বিদায় করা নিজেরই ভক্তিকে বঞ্চিত করা। মাহাত্ম্যের অর্ঘ্য সম্পূর্ণ বিনা-বেতনের। ভারতবর্ষে অধ্যাপক সমাজের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য দান-দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু এমন দিন ছিল যখন অধ্যাপনার বেতন শোধ করিয়া দিয়া আমাদের সমাজ তাঁহাদিগকে অপমানিত করিত না। মঙ্গলকর্ম যিনি করিবেন তিনি নিজের মঙ্গলের জন্যই করিবেন, ইহাই প্রকৃষ্ট আদর্শ। কোনো বাহ্যমূল্য লইতে গেলেই মঙ্গলের মূল্য কমিয়া যায়।

দলের একটা উৎসাহ আছে, তাহা সংক্রামক— তাহা মূঢ়ভাবে পরস্পরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়— তাহার অনেকটা অলীক। 'গোলে হরিবোল' ব্যাপারে হরিবোল যতটা থাকে, গোলের মাত্রা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি হইয়া পড়ে। দলের আন্দোলনে অনেক সময় তুচ্ছ উপলক্ষে ভক্তির ঝড় উঠিতে পারে— তাহার সাময়িক প্রবলতা যতই হোক-না কেন, ঝড় জিনিসটা কখনোই স্থায়ী নহে। সংসারে এমন কতবার কতশত দলের দেবতার অকস্মাৎ সৃষ্টি হইয়াছে এবং জয়ঢাক বাজিতে বাজিতে অতলস্পর্শ বিস্মৃতির মধ্যে তাঁহাদের বিসর্জন হইয়াছে। পাথরের মূর্তি গড়িয়া জবরদস্তি করিয়া কি কাহাকেও মনে রাখা যায়। ওয়েস্ট্‌মিন্‌স্টার-অ্যাবিতে কি এমন অনেকের নাম পাথরে খোদা হয় নাই, ইতিহাসে যাহাদের নামের অক্ষর প্রত্যহ ক্ষুদ্র ও ম্লান হইয়া আসিতেছে। এই-সকল ক্ষণকালের দেবতাগণকে দলীয়

উৎসাহে চিরকালের আসনে বসাইবার চেষ্টা করা, না দেবতার পক্ষে ভালো, না দলের পক্ষে শুভকর। দলগত প্রবল উত্তেজনা যুদ্ধে বিগ্রহে এবং প্রমোদ-উৎসবে উপযোগী হইতে পারে, কারণ ক্ষণিকতাই তাহার প্রকৃতি, কিন্তু ভক্তির পক্ষে সংযত-সমাহিত শান্তিই শোভন এবং অনুকূল, কারণ তাহা অকৃত্রিমতা এবং ধ্রুবতা চাহে, উন্মত্ততায় তাহা আপনাকে নিঃশেষিত করিতে চাহে না।

য়ুরোপেও আমরা কী দেখিতে পাই। সেখানে দল বাঁধিয়া যে ভক্তি উচ্ছ্বসিত হয় তাহা কি যথার্থ ভক্তিভাজনের বিচার করে। তাহা কি সাময়িক উপকারকে চিরন্তন উপকারের অপেক্ষা বড়ো করে না। তাহা কি গ্রাম্যদেবতাকে বিশ্বদেবতার চেয়ে উচ্চে বসায় না। তাহা মুখর দলপতিগণকে যত সম্মান দেয়, নিভৃতবাসী মহাতপস্বীদিগকে কি তেমন সম্মান দিতে পারে। শুনিয়াছি, লর্ড পামার্‌স্টোনের সমাধিকালে যেরূপ বিরাট সম্মানের সমারোহ হইয়াছিল, এমন ক্বচিৎ হইয়া থাকে। দূরে হইতে আমাদের মনে এ কথা উদয় হয় যে, এই ভক্তিই কি শ্রেয়। পামার্‌-স্টোনের নামই কি ইংলন্ডের প্রাতঃস্মরণীয়ের মধ্যে, সর্বাগ্রগণনীয়ের মধ্যে স্থান পাইল। দলের চেষ্টায় যদি কৃত্রিম উপায়ে সেই উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সাধিত হইয়া থাকে তবে দলের চেষ্টাকে প্রশংসা করিতে পারি না, যদি না হইয়া থাকে তবে সেই বৃহৎ আড়ম্বরে বিশেষ গৌরব করিবার এমন কী কারণ আছে।

যাঁহাদের নামস্মরণ আমাদের সমস্ত দিনের বিচিত্র মঙ্গলচেষ্টার উপযুক্ত উপক্রমণিকা বলিয়া গণ্য হইতে পারে তাঁহারাই আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। তাহার অধিক আর বোঝাই করিবার কোনো দরকার নাই। ব্যয়কাতর কৃপণের ধনের মতো, ছোটো বড়ো মাঝারি, ক্ষণিক এবং চিরন্তন, সকলপ্রকার মাহাত্ম্যকেই সাদা পাথর দিয়া লাঞ্ছিত করিবার প্রবৃত্তি যদি আমাদের না হয়, তবে তাহা লইয়া লজ্জা না করিলেও চলে। ভক্তিকে যদি প্রতিদিনের ব্যবহারযোগ্য করিতে হয় তবে তাহা হইতে প্রতিদিনের অভ্যাগত অনাবশ্যক ভারগুলি বিদায় করিবার উপায় রাখিতে হয়, তাহার বিপরীত প্রণালীতে সমস্তই স্তূপাকার করিবার চেষ্টা না করাই ভালো।

যাহা বিনষ্ট হইবার তাহাকে বিনষ্ট হইতে দিতে হইবে, যাহা অগ্নিতে দগ্ধ হইবার তাহা ভস্ম হইয়া যাক। মৃতদেহ যদি লুপ্ত হইয়া না যাইত তবে পৃথিবীতে জীবিতের অবকাশ থাকিত না, ধরাতল একটি প্রকাণ্ড কবরস্থান হইয়া থাকিত। আমাদের হৃদয়ের ভক্তিকে পৃথিবীর ছোটো এবং বড়ো, খাঁটি এবং ঝুঁটা, সমস্ত 'বড়ো'ত্বের গোরস্থান করিয়া রাখিতে পারি না। যাহা চিরজীবী তাহাই থাক্‌, যাহা মৃতদেহ, আজ বাদে কাল কীটের খাদ্য হইবে, তাহাকে মুগ্ধস্নেহে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা না করিয়া শোকের সহিত অথচ বৈরাগ্যের সহিত শ্মশানে ভস্ম করিয়া আসাই বিহিত। পাছে ভুলি এই আশঙ্কায় নিজেকে উত্তেজিত রাখিবার জন্য কল বানাইবার চেয়ে ভোলাই ভালো। ঈশ্বর আমাদিগকে দয়া করিয়াই বিস্মরণশক্তি দিয়াছেন।

সঞ্চয় নিতান্ত অধিক হইয়া উঠিতে থাকিলে বাছাই করা দুঃসাধ্য হয়। তাহা ছাড়া সঞ্চয়ের নেশা বড়ো দুর্জয় নেশা, একবার যদি হাতে কিছু জমিয়া যায় তবে জমাইবার ঝোঁক আর সামলানো যায় না। আমাদের দেশে ইহাকেই বলে নিরেনব্বইয়ের ধাক্কা। য়ুরোপ বড়োলোক জমাইতে আরম্ভ করিয়া এই নিরেনব্বইয়ের আবর্তের মধ্যে পড়িয়া গেছে। য়ুরোপে দেখিতে পাই, কেহ বা ডাকের টিকিট জমায়, কেহ বা দেশালাইয়ের বাক্সের কাগজের আচ্ছাদন জমায়, কেহ বা পুরাতন জুতা, কেহ বা বিজ্ঞাপনের ছবি জমাইতে থাকে—সেই নেশার রোখ যতই চড়িতে

থাকে, ততই এই-সকল জিনিসের একটা কৃত্রিম মূল্য অসম্ভবরূপে বাড়িয়া উঠে। তেমনি য়ুরোপে মৃত বড়োলোক জমাইবার যে-একটা প্রচণ্ড নেশা আছে তাহাতে মূল্যের বিচার আর থাকে না। কাহাকেও আর বাদ দিতে ইচ্ছা করে না। যেখানে একটুমাত্র উচ্চতা বা বিশেষত্ব আছে সেইখানেই য়ুরোপ তাড়াতাড়ি সিঁদুর মাখাইয়া দিয়া ঘণ্টা নাড়িতে থাকে। দেখিতে দেখিতে দল জুটিয়া যায়।

বস্তুত মাহাত্ম্যের সঙ্গে ক্ষমতা বা প্রতিভার প্রভেদ আছে। মহাত্মারা আমাদের কাছে এমন একটি আদর্শ রাখিয়া যান যাহাতে তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে স্মরণ করিলে জীবন মহত্ত্বের পথে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ক্ষমতাশালীকে স্মরণ করিয়া আমরা যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইতে পারি তাহা নহে। ভক্তিভরে শেক্স্পিয়রের স্মরণমাত্র আমাদিগকে শেক্স্পিয়রের গুণের অধিকারী করে না, কিন্তু যথার্থভাবে কোনো সাধুকে অথবা বীরকে স্মরণ করিলে আমাদের পক্ষে সাধুত্ব বা বীরত্ব কিয়ং পরিমাণেও সরল হইয়া আসে।

তবে গুণী সম্বন্ধে আমাদের কী কর্তব্য। গুণীকে তাঁহার গুণের দ্বারা স্মরণ করাই আমাদের স্বাভাবিক কর্তব্য। শ্রদ্ধার সহিত তানসেনের গানের চর্চা করিয়াই গুণমুগ্ধ গায়কগণ তানসেনকে যথার্থভাবে স্মরণ করে। ধ্রুপদ শুনিলে যাহার গায়ে জ্বর আসে সেও তানসেনের প্রতিমা গড়িবার জন্য চাঁদা দিয়া ঐহিক-পারত্রিক কোনো ফললাভ করে, এ কথা মনে করিতে পারি না। সকলকেই যে গানে ওস্তাদ হইতে হইবে এমন কোনো অবশ্যবাধ্যতা নাই। কিন্তু সাধুতা বা বীরত্ব সকলেরই পক্ষে আদর্শ। সাধুদিগের এবং মহৎকর্মে-প্রাণবিসর্জনপর বীরদিগের স্মৃতি সকলেরই পক্ষে মঙ্গলকর। কিন্তু দল বাঁধিয়া ঋণশোধ করাকে সেই স্মৃতিপালন কহে না; স্মরণব্যাপার প্রত্যেকের পক্ষে প্রত্যহের কর্তব্য।

য়ুরোপে এই ক্ষমতা এবং মাহাত্ম্যের প্রভেদ লুপ্তপ্রায়। উভয়েরই জয়ধ্বজা একই রকম, এমন-কি মাহাত্ম্যের পতাকাই যেন কিছু খাটো। পাঠকগণ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, বিলাতে অভিনেতা আর্ভিঙের সম্মান পরম-সাধুর প্রাপ্য সম্মান অপেক্ষা অল্প নহে। রামমোহন রায় আজ যদি ইংলণ্ডে যাইতেন তবে তাঁহার গৌরব ক্রিকেট-খেলোয়াড় রঞ্জিতসিংহের গৌরবের কাছে খর্ব হইয়া থাকিত।

য়ুরোপে ক্ষমতাশালী লোকের জীবনচরিত লেখার একটা নিরতিশয় উদ্যম আছে। য়ুরোপকে চরিত-বায়ুগ্রস্ত বলা যাইতে পারে। কোনোমতে, একটা যে-কোনো প্রকারের বড়োলোকত্বের সুদূর গন্ধটুকু পাইলেই তাহার সমস্ত চিঠিপত্র, গল্পগুজব, প্রাত্যহিক ঘটনার সমস্ত আবর্জনা সংগ্রহ করিয়া মোটা দুই ভল্যুমে জীবনচরিত লিখিবার জন্য লোকে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে। যে নাচে তাহার জীবনচরিত, যে গান করে তাহার জীবনচরিত, যে হাসাইতে পারে তাহার জীবন-চরিত—জীবন যাহার যেমনই হোক, যে লোক কিছু-একটা পারে তাহারই জীবন-চরিত! কিন্তু যে মহাত্মা জীবনযাত্রার আদর্শ দেখাইয়াছেন তাঁহারই জীবনচরিত সার্থক; যাঁহারা সমস্ত জীবনের দ্বারা কোনো কাজ করিয়াছেন তাঁহাদেরই জীবন আলোচ্য। যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, গান তৈরি করিয়াছেন, তিনি কবিতা এবং গানই দান করিয়া গেছেন, তিনি জীবন দান করিয়া যান নাই, তাঁহার জীবনচরিতে কাহার কী প্রয়োজন। টেনিসনের কবিতা পড়িয়া আমরা টেনিসন্‌কে যত বড়ো করিয়া জানিয়াছি, তাঁহার জীবনচরিত পড়িয়া তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা অনেক ছোটো করিয়া জানিয়াছি মাত্র।

কৃত্রিম আদর্শে মানুষকে এইরূপ নির্বিবেক করিয়া তোলে, মেকি এবং খাঁটির এক দর হইয়া আসে। আমাদের দেশে আধুনিক কালে পাপপুণ্যের আদর্শ কৃত্রিম হওয়াতে তাহার ফল কী হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলা লওয়া এবং গঙ্গায় স্নান করাও পুণ্য, আবার অচৌর্য ও সত্যপরায়ণতাও পুণ্য, কিন্তু কৃত্রিমের সহিত খাঁটি পুণ্যের কোনো জাতি-বিচার না থাকাতে, যে ব্যক্তি নিত্য গঙ্গাস্নান ও আচারপালন করে, সমাজে অলুব্ধ ও সত্যপরায়ণের অপেক্ষা তাহার পুণ্যের সম্মান কম নহে, বরঞ্চ বেশি। যে ব্যক্তি যবনের অন্ন খাইয়াছে আর যে ব্যক্তি জাল মকদ্দমায় যবনের অন্নের উপায় অপহরণ করিয়াছে উভয়েই পাপীর কোঠায় পড়ায় প্রথমোক্ত পাপীর প্রতি ঘৃণা ও দণ্ড যেন মাত্রায় বাড়িয়া উঠে।

যথার্থ ভক্তির উপর পূজার ভার না দিয়া লোকারণ্যের উপর পূজার ভার দিলে দেবপূজার ব্যাঘাত ঘটে। বারোয়ারির দেবতার যত ধুম গৃহদেবতা-ইষ্ট-দেবতার তত ধুম নহে। কিন্তু বারোয়ারির দেবতা কি মুখ্যত একটা অবান্তর উত্তেজনার উপলক্ষমাত্র নহে।

আমাদের দেশে আধুনিক কালের বারোয়ারির শোকের মধ্যে—বারোয়ারির স্মৃতিপালনচেষ্টার মধ্যে, গভীর শূন্যতা দেখিয়া আমরা পদে পদে ক্ষুব্ধ হই। নিজের দেবতাকে কোন্ প্রাণে এমন কৃত্রিম সভায় উপস্থিত করিয়া পূজার অভিনয় করা হয় বুঝিতে পারি না। সেই অভিনয়ের আয়োজনে যদি মালমসলা কিছু কম হয় তবে আমরা পরস্পরকে লজ্জা দিই—কিন্তু লজ্জার বিষয় গোড়াতেই। যিনি ভক্ত তিনি মহতের মাহাত্ম্যকীর্তন করিবেন ইহা স্বাভাবিক এবং সকলের পক্ষেই শুভফলপ্রদ; কিন্তু মহাত্মাকে লইয়া সকলে মিলিয়া একদিন বারোয়ারির কোলাহল তুলিয়া কর্তব্যসমাধার চেষ্টা লজ্জাকর এবং নিষ্ফল।

আমরা বলি—কীর্তির্যস্য স জীবতি। যিনি ক্ষমতাপন্ন লোক তিনি নিজের কীর্তির মধ্যেই নিজে বাঁচিয়া থাকেন। কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে বাঙালি একটা কোনোপ্রকারের ধুমধাম করে নাই বলিয়া বাঙালি কৃত্তিবাসকে অবজ্ঞা করিয়াছে এ কথা কেমন করিয়া বলিব। যেমন 'গঙ্গা পূজি গঙ্গাজলে', তেমনি বাংলাদেশে মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত কৃত্তিবাসের কীর্তি-দ্বারাই কৃত্তিবাস কত শতাব্দী ধরিয়া প্রত্যহ পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এমন প্রত্যক্ষপূজা আর কিসে হইতে পারে।

১৩০৮ চৈত্র

বিদ্যাসাগর-চরিত

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ, যে গুণে তিনি পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালিজীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগপ্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া—হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে—করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আমি যদি অদ্য তাঁহার সেই গুণকীর্তন করিতে বিরত হই তবে আমার কর্তব্য একেবারেই

অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। কারণ, বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারম্বার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালি বড়োলোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে—তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্বত-প্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্যে তাঁহারই কৃত কীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনো সাহিত্য-সম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানবসভ্যতার ধাত্রীগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়—যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোকদুঃখের মধ্যে এক নূতন সান্ত্বনাস্থল, সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শলোক, দৈনন্দিন মানবজীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জবন রচনা করিতে পারে, তবেই তাঁহার এই কীর্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।

বাংলাভাষার বিকাশে বিদ্যাসাগরের প্রভাব কিরূপ কার্য করিয়াছে এখানে তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা আবশ্যক।

বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলাগদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্যসমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি ভাষাকে কলা-বন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে: জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা-সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু যিনি এই সেনার রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।

বাংলাভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া, বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার-ব্যবহার-যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা-গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্বে বাংলা গদ্যের যে

অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্প প্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া বিদ্যাসাগরের সম্মান নহে। বিশেষত বিদ্যাসাগর যাহার উপর আপন প্রতিভা প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা প্রবহমান, পরিবর্তনশীল। ভাষা নদীস্রোতের মতো— তাহার উপরে কাহারও নাম খুদিয়া রাখা যায় না। মনে হয়, যেন সে চিরকাল এবং সর্বত্র স্বভাবতই এইভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক সে যে কোন্ কোন্ নির্ঝরধারায় গঠিত ও পরিপুষ্ট তাহা নির্ণয় করিতে হইলে উজানমুখে গিয়া পুরাবৃত্তের দুর্গম গিরিশিখরে আরোহণ করিতে হয়। বিশেষ গ্রন্থ অথবা চিত্র অথবা মূর্তি চিরকাল আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আপন রচনাকর্তাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু ভাষা ছোটো বড়ো অসংখ্য লোকের নিকট হইতে জীবনলাভ করিতে করিতে ব্যাপ্ত হইয়া পূর্ব ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া চলিয়া যায়, বিশেষরূপে কাহারও নাম ঘোষণা করে না।

কিন্তু সেজন্য আক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, বিদ্যাসাগরের গৌরব কেবলমাত্র তাঁহার প্রতিভার উপর নির্ভর করিতেছে না।

প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশ মাত্র। প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো, আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাহা সর্বত্রব্যাপী ও স্থির। প্রতিভা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ, আর মনুষ্যত্ব জীবনের সকল মুহূর্তেই সকল কার্যেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে। প্রতিভা অনেক সময়ে বিদ্যুতের ন্যায় আপনার আংশিকতাবশতই লোকচক্ষে তীব্রতররূপে আঘাত করে, এবং চরিত্রমহত্ত্ব আপনার ব্যাপকতাগুণেই প্রতিভা অপেক্ষা ম্লানতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যে যথার্থ শ্রেষ্ঠতা, ভাবিয়া দেখিলে সে বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না।

ভাষা প্রস্তর অথবা চিত্রপটের দ্বারা সত্য এবং সৌন্দর্য প্রকাশ করা ক্ষমতার কার্য সন্দেহ নাই; তাহাতে বিচিত্র বাধা অতিক্রম এবং অসামান্য নৈপুণ্য প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু নিজের সমগ্র জীবনের দ্বারা সেই সত্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা তদপেক্ষা আরও বেশি দুরূহ, তাহাতে পদে পদে কঠিনতর বাধা অতিক্রম করিতে হয় এবং তাহাতে স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তি ও নৈপুণ্য, সংযম ও বল অধিকতর আবশ্যক হয়।

এই চরিত্ররচনার প্রতিভা কোনো সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র মানিয়া চলে না। প্রকৃত কবির কবিত্ব যেমন অলংকারশাস্ত্রের অতীত, অথচ বিশ্বহৃদয়ের মধ্যে বিধিরচিত নিগূঢ়নিহিত এক অলিখিত অলংকারশাস্ত্রের কোনো নিয়মের সহিত তাহার স্বভাবত কোনো বিরোধ হয় না; তেমনি যাঁহারা যথার্থ মনুষ্য তাঁহাদের শাস্ত্র তাঁহাদের অন্তরের মধ্যে, অথচ বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্বের সমস্ত নিত্যবিধানগুলির সঙ্গে সে শাস্ত্র আপনি মিলিয়া যায়। অতএব, অন্যান্য প্রতিভায় যেমন 'ওরিজিন্যালিটি' অর্থাৎ অনন্যতন্ত্রতা প্রকাশ পায়, মহচ্চরিত্রবিকাশেও সেইরূপ অনন্যতন্ত্রতার প্রয়োজন হয়।— অনেকে বিদ্যাসাগরের অনন্যতন্ত্র প্রতিভা ছিল না বলিয়া আভাস দিয়া থাকেন; তাঁহারা জানেন, অনন্যতন্ত্রত্ব কেবল সাহিত্যে এবং শিল্পে, বিজ্ঞানে এবং দর্শনেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল; এত বিরল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুই-একজনের নাম মনে পড়ে এবং তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্বশ্রেষ্ঠ।

অনন্যতন্ত্রতা শব্দটা শুনিবামাত্র তাহাকে সংকীর্ণতা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; মনে হইতে পারে, তাহা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, সাধারণের সহিত তাহার যোগ নাই। কিন্তু সে কথা যথার্থ নহে। বস্তুত আমরা নিয়মের শৃঙ্খলে, জটিল কৃত্রিমতার বন্ধনে এতই জড়িত ও আচ্ছন্ন হইয়া থাকি যে, আমরা সমাজের কল-চালিত পুত্তলের মতো হইয়া যাই; অধিকাংশ কাজই সংস্কারাধীনে অন্ধভাবে সম্পন্ন করি; নিজত্ব কাহাকে বলে জানি না, জানিবার আবশ্যকতা রাখি না। আমাদের ভিতরকার আসল মানুষটি জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় সুপ্তভাবেই কাটাইয়া দেয়, তাহার স্থানে কাজ করে একটা নিয়ম-বাঁধা যন্ত্র। যাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিমাণ অধিক, চিরাগত প্রথা ও অভ্যাসের জড় আচ্ছাদনে তাঁহাদের সেই প্রবল শক্তিকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। ইঁহারাই নিজের চরিত্রপুরীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন। অন্তরস্থ মনুষ্যত্বের এই স্বাধীনতার নামই নিজত্ব। এই নিজত্ব ব্যক্তভাবে ব্যক্তিবিশেষের, কিন্তু নিগূঢ়ভাবে সমস্ত মানবের। মহৎ ব্যক্তিরা এই নিজত্বপ্রভাবে এক দিকে স্বতন্ত্র, একক—অন্য দিকে সমস্ত মানবজাতির সবর্ণ, সহোদর। আমাদের দেশে রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর উভয়ের জীবনেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এক দিকে যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, তেমনি অপর দিকে য়ুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর নিকটসাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে। বেশভূষায় আচার-ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙালি ছিলেন; স্বজাতির শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমতুল্য কেহ ছিল না; স্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন—অথচ নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন। য়ুরোপীয়-দের তুচ্ছ বাহ্য অনুকরণের প্রতি তাঁহারা যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহাদের য়ুরোপীয়সুলভ গভীর আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় কেন, সরল সত্যপ্রিয় সাঁওতালেরাও যে অংশে মনুষ্যত্বে ভূষিত, সেই অংশে বিদ্যাসাগর তাঁহার স্বজাতীয় বাঙালির অপেক্ষা সাঁওতালের সহিত আপনার অন্তরের যথার্থ ঐক্য অনুভব করিতেন।

মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন। কী নিয়মে বড়োলোকের অভ্যুত্থান হয় তাহা সকল দেশেই রহস্যময়—আমাদের এই ক্ষুদ্রকর্মা ভীরুহৃদয়ের দেশে সে রহস্য দ্বিগুণতর দুর্ভেদ্য। বিদ্যাসাগরের চরিত্রসৃষ্টিও রহস্যাবৃত—কিন্তু ইহা দেখা যায়, সে চরিত্রের ছাঁচ ছিল ভালো। ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষের মধ্যে মহত্ত্বের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল।

বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে প্রথমেই তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লোকটি অনন্যসাধারণ ছিলেন তাহাতে সন্দেহমাত্রই নাই।

মেদিনীপুর জেলায় বনমালীপুরে তাঁহার পৈতৃক বাসভবন ছিল। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে বিষয়বিভাগ লইয়া সহোদরদের সহিত মনান্তর হওয়ায় তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বহুকাল পরে তর্কভূষণ দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী দুর্গাদেবী ভাশুর ও দেবরগণের অনাদরে প্রথমে শ্বশুরালয় হইতে বীরসিংহগ্রামে পিত্রালয়ে পরে সেখানেও ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার

লাঞ্ছনায় বৃদ্ধপিতার সাহায্যে পিতৃভবনের অনতিদূরে এক কুটিরে বাস করিয়া, চরকা কাটিয়া দুই পুত্র ও চারি কন্যা-সহ বহুকষ্টে দিনপাত করিতেছেন। তর্কভূষণ ভ্রাতাদের আচরণ শুনিয়া নিজের স্বত্ব ও তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া ভিন্নগ্রামে দারিদ্র্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কিন্তু যাঁহার স্বভাবের মধ্যে মহত্ত্ব আছে, দারিদ্র্যে তাঁহাকে দরিদ্র করিতে পারে না। বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাঁহার পিতামহের যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন স্থানে স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।—

তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোনো অংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনোপ্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তন তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকার-প্রত্যাশায় অথবা অন্য কোনো কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই।[১]

ইহা হইতেই শ্রোতৃগণ বুঝিতে পারিবেন, একান্নবর্তী পরিবারে কেন এই অগ্নিখণ্ডটিকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহারা পাঁচ সহোদর ছিলেন, কিন্তু তিনি একাই নীহারিকাচক্র হইতে বিচ্ছিন্ন জ্যোতিষ্কের মতো আপন বেগে বাহিরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। একান্নবর্তী পরিবারের বহুভারাক্রান্ত যন্ত্রেও তাঁহার কঠিন চরিত্রস্বাতন্ত্র্য পেষণ করিয়া দিতে পারে নাই।

তাঁহার শ্যালক রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত এবং সাতিশয় গর্বিত ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক তাহা বুঝিতে পারিলে তিনি সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামসুন্দরের অনুগত হইয়া না চলিলে রামসুন্দর নানাপ্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাঁহাকে এই ভয় দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু রামজয় কোনো কারণে ভয় পাইবার লোক ছিলেন না; তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিতেন, বরং বাসত্যাগ করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। শ্যালকের আক্রোশে তাঁহাকে সময়ে সময়ে, প্রকৃতপ্রস্তাবে, একঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানাপ্রকার অত্যাচার-উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত হইতেন না।[১]

তাঁহার তেজস্বিতার উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জমিদার যখন তাঁহাদের বীরসিংহগ্রামের নূতন বাস্তুবাটী নিষ্করব্রহ্মোত্তর করিয়া দিবেন মানস করিয়াছিলেন, তখন রামজয় দানগ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। গ্রামের অনেকেই বসতবাটী লাখেরাজ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু তিনি কাহারও অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। এমন লোকের পক্ষে দারিদ্র্যও মহৈশ্বর্য, ইহাতে তাঁহার স্বাভাবিক সম্পদ্ জাজ্বল্যমান করিয়া তোলে।[২]

কিন্তু তর্কভূষণ যে আপন স্বাতন্ত্র্যগর্বে সর্বসাধারণকে অবজ্ঞা করিয়া দূরে থাকিতেন তাহা নহে। বিদ্যাসাগর বলেন—

তর্কভূষণমহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহংকার ছিলেন; কি ছোটো, কি বড়ো, সর্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটাচারী মনে করিতেন তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন ইহা ভাবিয়া স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সংকুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন।

কাহারও ভয়ে বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনো কারণে তিনি কখনও কোনো বিষয়ে অযথা নির্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন তাঁহাদিগকেই ভদ্র বলিয়া গণ্য করিতেন; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্ ধনবান্ ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।[১]

এ দিকে তর্কভূষণমহাশয়ের বল এবং সাহসও আশ্চর্য ছিল। সর্বদাই তাঁহার হস্তে একখানি লৌহদণ্ড থাকিত। তখন দস্যুভয়ে অনেকে একত্র না হইয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিত না, কিন্তু তিনি একা এই লৌহদণ্ড-হস্তে অকুতোভয়ে সর্বত্র যাতায়াত করিতেন; এমন-কি, দুইচারিবার আক্রান্ত হইয়া দস্যুদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। একুশ বৎসর বয়সে একবার তিনি এক ভালুকের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন।

ভালুক নখরপ্রহারে তাঁহার সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি তদীয় উদরে উপর্যুপরি পদাঘাত করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিলেন।[১]

অবশেষে শোণিতস্রুত বিক্ষতদেহে চারি ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মেদিনীপুরে এক আত্মীয়ের গৃহে শয্যা আশ্রয় করেন; দুই মাস পরে সুস্থ হইয়া বাড়ি ফিরিতে পারেন।

আর একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলে তর্কভূষণের চরিত্রচিত্র সম্পূর্ণ হইবে।

১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবারে বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অদূরে কোমরগঞ্জে মধ্যাহ্নে হাট করিতে গিয়াছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ তাঁহাকে ঘরের একটি শুভসংবাদ দিতে বাহির হইয়াছিলেন। পথের মধ্যে পুত্রের সহিত দেখা হইলে বলিলেন, 'একটি এঁড়ে বাছুর হয়েছে।' শুনিয়া ঠাকুরদাস ঘরে আসিয়া গোয়ালের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন; তর্কভূষণ হাসিয়া কহিলেন, 'ও দিকে নয়, এ দিকে এসো।' বলিয়া সূতিকাগৃহে লইয়া নবপ্রসূত শিশু ঈশ্বরচন্দ্রকে নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

এই কৌতুকহাস্যরশ্মিপাতে রামজয়ের বলিষ্ঠ উন্নতচরিত্র আমাদের নিকট প্রভাতের গিরিশিখরের ন্যায় রমণীয় বোধ হইতেছে। এই হাস্যময় তেজোময় নির্ভীক ঋজুস্বভাব পুরুষের মতো আদর্শ বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল না হইলে বাঙালির মধ্যে পৌরুষের অভাব হইত না। আমরা তাঁহার চরিত্রবর্ণনা বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিলাম, তাহার কারণ, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোনো সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয়সম্পদের উত্তরাধিকারবণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্র-মাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠপৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাধারণ লোক ছিলেন না। যখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ-পনেরো বৎসর, এবং যখন তাঁহার মাতা দুর্গাদেবী চরকায় সুতা কাটিয়া একাকিনী তাঁহার দুই পুত্র এবং চারি কন্যার ভরণপোষণে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন ঠাকুরদাস উপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি তাঁহার আত্মীয় জগন্মোহন তর্কালংকারের বাড়িতে উঠিলেন। ইংরেজি শিখিলে সওদাগর সাহেবদের হৌসে কাজ জুটিতে পারিবে জানিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় এক শিপ্-সরকারের বাড়ি ইংরেজি শিখিতে যাইতেন। যখন বাড়ি ফিরিতেন তখন তর্কালংকারের বাড়িতে উপরি-লোকের আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত, সুতরাং তাঁহাকে রাত্রে অনাহারে থাকিতে হইত।

অবশেষে তিনি তাঁহার শিক্ষকের এক আত্মীয়ের বাড়ি আশ্রয় লইলেন। আশ্রয়-দাতার দারিদ্র্যনিবন্ধন এক-একদিন তাঁহাকে সমস্তদিন উপবাসী থাকিতে হইত। এক দিন ক্ষুধার জ্বালায় তাঁহার যথাসর্বস্ব একখানি পিতলের থালা ও একটি ছোটো ঘটি কাঁসারির দোকানে বেচিতে গিয়াছিলেন। কাঁসারিরা তাহার পাঁচসিকা দর স্থির করিয়াছিল, কিন্তু কিনিতে সম্মত হইল না; বলিল, অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরানো বাসন কিনিয়া মাঝে মাঝে বড়ো ফেসাদে পড়িতে হয়।[২]

আর একদিন ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলিবার অভিপ্রায়ে মধ্যাহ্নে ঠাকুরদাস বাসা হইতে বাহির হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

বড়বাজার হইতে ঠনঠনিয়া পর্যন্ত গিয়া এত অভিভূত হইলেন যে, আর তাঁর চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়িমুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন। ঠাকুরদাস তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সস্নেহ বাক্যে ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস যেরূপ ব্যগ্র হইয়া মুড়কিগুলি খাইলেন তাহা একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই। তিনি বলিলেন, না মা, আজ আমি এখন পর্যন্ত কিছুই খাই নাই। তখন সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর, জল খাইয়ো না, একটু অপেক্ষা করো। এই বলিয়া নিকটবর্তী গোয়ালার দোকান হইতে সত্বর দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন; পরে তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেদিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।[১]

এইরূপ কষ্টে কিছু ইংরাজি শিখিয়া ঠাকুরদাস প্রথমে মাসিক দুই টাকা ও তাহার দুই-তিন বৎসর পরে মাসিক পাঁচ টাকা বেতন উপার্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে জননী দুর্গাদেবী যখন শুনিলেন তাঁহার ঠাকুরদাসের মাসিক আট টাকা মাহিনা হইয়াছে তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না এবং ঠাকুরদাসের সেই তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়সে গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রমে এই ভগবতী দেবী এক অসামান্যা রমণী ছিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত বিদ্যাসাগর-গ্রন্থে লিথোগ্রাফ-পটে এই দেবীমূর্তি প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ প্রতিমূর্তিই অধিকক্ষণ দেখিবার দরকার হয় না, তাহা যেন মুহূর্তকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহা নিপুণ হইতে পারে, সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহার মধ্যে চিত্তনিবেশের যথোচিত স্থান পাওয়া যায় না, চিত্রপটের উপরিতলেই দৃষ্টির প্রসার পর্যবসিত হইয়া যায়। কিন্তু ভগবতী দেবীর এই পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে এবং বহু ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়—এবং ইহাও বুঝিতে পারি, ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনের জন্য কেন বিদ্যাসাগরকে

এই মাতৃদেবী ব্যতীত কোনো পৌরাণিক দেবীপ্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।

ভগবতী দেবীর অকুণ্ঠিত দয়া তাঁহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত। রোগার্তের সেবা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান এবং শোকাতুরের দুঃখে শোক প্রকাশ করা তাঁহার নিত্যনিয়মিত কার্য ছিল। অগ্নিদাহে বীরসিংহগ্রামের বাসস্থান ভস্মীভূত হইয়া গেলে বিদ্যাসাগর যখন তাঁহার জননীদেবীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, তিনি বলিলেন, 'যে-সকল দরিদ্র লোকের সন্তানগণ এখানে ভোজন করিয়া বীরসিংহবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে তাহারা কী খাইয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিবে?'[২]

দয়াবৃত্তি আরও অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোনোপ্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না। সাধারণ লোকের দয়া দিয়াশলাই-শলাকার মতো কেবল বিশেষরূপ সংঘর্ষেই জ্বলিয়া উঠে এবং তাহা অভ্যাস ও লোকাচারের ক্ষুদ্র বাক্সের মধ্যেই বদ্ধ। কিন্তু ভগবতী দেবীর হৃদয় সূর্যের ন্যায় আপনার বুদ্ধি-উজ্জ্বল দয়ারশ্মি স্বভাবতই চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিত, শাস্ত্র বা প্রথা-সংঘর্ষের অপেক্ষা করিত না। বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার ভ্রাতার জীবন-চরিতে লিখিয়াছেন যে, একবার বিদ্যাসাগর তাঁহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'বৎসরের মধ্যে একদিন পূজা করিয়া ছয় সাত শত টাকা বৃথা ব্যয় করা ভালো, কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে ঐ টাকা অবস্থানুসারে মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করা ভালো?' ইহা শুনিয়া জননীদেবী উত্তর করেন, 'গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খাইতে পাইলে পূজা করিবার আবশ্যক নাই।' এ কথাটি সহজ কথা নহে। তাঁহার নির্মল বুদ্ধি এবং উজ্জ্বল দয়া, প্রাচীন সংস্কারের মোহাবরণ যে এমন অনায়াসে বর্জন করিতে পারে, ইহা আমার নিকট বড়ো বিস্ময়কর বোধ হয়। লৌকিক প্রথার বন্ধন রমণীর কাছে যেমন দৃঢ়, এমন আর কার কাছে। অথচ কী আশ্চর্য, স্বাভাবিক চিত্তশক্তির দ্বারা তিনি জড়তাময় প্রথাভিত্তি ভেদ করিয়া নিত্যজ্যোতির্ময় অনন্ত বিশ্বধর্মাকাশের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলেন। এ কথা তাঁহার কাছে এত সহজ বোধ হইল কী করিয়া যে, মনুষ্যের সেবাই যথার্থ দেবতার পূজা। তাহার কারণ, সকল সংহিতা অপেক্ষা প্রাচীনতম সংহিতা তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল।

সিবিলিয়ান হ্যারিসন সাহেব যখন কার্যোপলক্ষে মেদিনীপুর জেলায় গমন করেন তখন ভগবতী দেবী তাঁহাকে স্বনামে পত্র পাঠাইয়া বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন; তৎসম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয় পুত্র শম্ভুচন্দ্র নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন—

> জননীদেবী সাহেবের ভোজনসময়ে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতে সাহেব আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন যে, অতি বৃদ্ধা হিন্দুস্ত্রীলোক সাহেবের ভোজন-সময়ে চিয়ারে উপবিষ্টা হইয়া কথাবার্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন।... সাহেব হিন্দুর মতো জননীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃভাবে অভিবাদন করেন। তদনন্তর নানা বিষয়ের কথাবার্তা হইল। জননীদেবী প্রবীণ হিন্দুস্ত্রীলোক, তথাপি তাঁহার স্বভাব অতি উদার, মন অতিশয় উন্নত, এবং মনে কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। কি ধনশালী কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্ কি মূর্খ, কি উচ্চজাতীয় কি নীচজাতীয়, কি পুরুষ কি স্ত্রী, কি হিন্দুধর্মাবলম্বী কি অন্যধর্মাবলম্বী, সকলেরই প্রতি সমদৃষ্টি।[২]

শম্ভুচন্দ্র অন্যত্র লিখিতেছেন—

১২৬৬ সাল হইতে ৭২ সাল পর্যন্ত ক্রমিক বিস্তর বিধবা কামিনীর বিবাহকার্য সমাধা হয়। ঐ-সকল বিবাহিত লোককে বিপদ হইতে রক্ষার জন্য অগ্রজমহাশয় বিশেষরূপে যত্নবান ছিলেন। উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আপন দেশস্থ ভবনে আনাইতেন। বিবাহিতা ঐ-সকল স্ত্রীলোককে যদি কেহ ঘৃণা করে এ-কারণে জননীদেবী ঐ-সকল বিবাহিতা ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীলোকের সহিত একত্র এক পাত্রে ভোজন করিতেন।[২]

অথচ তখন বিধবাবিবাহের আন্দোলনে দেশের পুরুষেরা বিদ্যাসাগরের প্রাণ-সংহারের জন্য গোপনে আয়োজন করিতেছিল, এবং দেশের পণ্ডিতবর্গ শাস্ত্র মন্থন করিয়া কুযুক্তি এবং ভাষা মন্থন করিয়া কটূক্তি বিদ্যাসাগরের মস্তকের উপর বর্ষণ করিতেছিলেন। আর, এই রমণীকে কোনো শাস্ত্রের কোনো শ্লোক খুঁজিতে হয় নাই; বিধাতার স্বহস্তলিখিত শাস্ত্র তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে রাত্রিদিন উদ্‌ঘাটিত ছিল। অভিমন্যু জননী-জঠরে থাকিতে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও বিধি-লিখিত সেই মহাশাস্ত্র মাতৃগর্ভবাসকালেই অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন।

আশঙ্কা করিতেছি, সমালোচক মহাশয়েরা মনে করিতে পারেন যে, বিদ্যাসাগর-সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার জননী সম্বন্ধে এতখানি আলোচনা কিছু পরিমাণবহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এ কথা তাঁহারা স্থির জানিবেন, এখানে জননীর চরিতে এবং পুত্রের চরিতে বিশেষ প্রভেদ নাই, তাঁহারা যেন পরস্পরের পুনরাবৃত্তি। তাহা ছাড়া, মহাপুরুষের ইতিহাস বাহিরের নানা কার্যে এবং জীবনবৃত্তান্তে স্থায়ী হয়, আর মহৎ নারীর ইতিহাস তাঁহার পুত্রের চরিত্রে, তাঁহার স্বামীর কার্যে রচিত হইতে থাকে—এবং সে লেখায় তাঁহার নামোল্লেখ থাকে না। অতএব, বিদ্যাসাগরের জীবনে তাঁহার মাতার জীবনচরিত কেমন করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা ভালোরূপে আলোচনা না করিলে উভয়েরই জীবনী অসম্পূর্ণ থাকে। আর আমরা যে মহাত্মার স্মৃতিপ্রতিমাপূজার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি, যদি তিনি কোনোরূপে সূক্ষ্ম চিন্ময় দেহে অদ্য এই সভায় আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং যদি এই অযোগ্যভক্তকর্তৃক তাঁহার চরিত-কীর্তন তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়, তবে এই রচনার যে অংশে তাঁহার জীবনী অবলম্বন করিয়া তাঁহার মাতৃদেবীর মাহাত্ম্য মহীয়ান হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার দিব্যনেত্র হইতে প্রভূততম পুণ্যাশ্রু-বর্ষণ হইতে থাকিবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথম-ভাগে গোপাল-নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপ-মায়ে যাহা বলে সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন তখন গোপালের অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক্, পিতা যাহা বলিতেন তিনি ঠিক তাহার উল্‌টা করিয়া বসিতেন। শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন—

পিতা তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যেদিন সাদা বস্ত্র না থাকিত সেদিন বলিতেন, আজ ভালো কাপড় পরিয়া কালেজে যাইতে হইবে। তিনি হঠাৎ বলিতেন, না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যেদিন বলিতেন, আজ স্নান করিতে হইবে, শ্রবণমাত্র দাদা বলিতেন যে, আজ স্নান করিব না; পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া ট্যাঁকশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড় চাপড় মারিয়া জোর করিয়া স্নান করাইতেন।[২]

পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সের সময় যখন গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন তখন

প্রতিবেশী মথুরমণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়া দিবার জন্য যে প্রকার সভ্যবিগর্হিত উপদ্রব তিনি করিতেন, বর্ণপরিচয়ের সর্বজননিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনও করে নাই।

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালিজাতির শীর্ণচরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাস করিয়া ভালো চাকরি-বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সহিত তাহার জীবনচরিত-লেখকের সাদৃশ্য ছিল না। রাখাল পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে, মিছামিছি দেরি করিয়া সকলের শেষে পাঠশালায় যায়। কিন্তু পড়াশুনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। যে প্রবল জিদের সহিত তিনি পিতার আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই দুর্দম জিদের সহিত তিনি পড়িতে যাইতেন। সেও তাঁহার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে নিজের জিদ-রক্ষা। ক্ষুদ্র একগুঁয়ে ছেলেটি মাথায় এক মস্ত ছাতা তুলিয়া তাঁহাদের বড়োবাজারের বাসা হইতে পটলডাঙায় সংস্কৃতকালেজে যাত্রা করিতেন, লোকে মনে করিত একটা ছাতা চলিয়া যাইতেছে। এই দুর্জয় বালকের শরীরটি খর্ব, শীর্ণ, মাথাটা প্রকাণ্ড—স্কুলের ছেলেরা সেইজন্য তাঁহাকে 'যশুরে কৈ', ও তাহার অপভ্রংশে 'কসুরে জৈ' বলিয়া খেপাইত; তিনি তখন তোৎলা ছিলেন, রাগিয়া কথা বলিতে পারিতেন না।[২]

এই বালক রাত্রি দশটার সময় শুইতে যাইতেন। পিতাকে বলিয়া যাইতেন, রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহাকে জাগাইয়া দিতে। পিতা আর্মানিগির্জার ঘড়িতে বারোটা বাজিলেই ঈশ্বরচন্দ্রকে জাগাইতেন, বালক অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া পড়া করিতেন। ইহাও একগুঁয়ে ছেলের নিজের শরীরের প্রতি জিদ। শরীরও তাহার প্রতিশোধ তুলিতে ছাড়িত না। মাঝে মাঝে কঠিন সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু পীড়ার শাসনে তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই।

ইহার উপরে গৃহকর্মও অনেক ছিল। বাসায় তাঁহার পিতা ও মধ্যমভ্রাতা ছিলেন। দাসদাসী ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র দুইবেলা সকলের রন্ধনাদি কার্য করিতেন। সহোদর শম্ভুচন্দ্র তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঈশ্বরচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া কাশীনাথবাবুর বাজারে বাটামাছ ও আলু-পটল-তরকারি ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাটনা বাটিয়া উনান ধরাইয়া রন্ধন করিতেন। বাসায় তাঁহারা চারিজন খাইতেন। আহারের পর উচ্ছিষ্ট মুক্ত ও বাসন ধৌত করিয়া তবে পড়িতে যাইবার অবসর পাইতেন। পাক করিতে করিতে ও স্কুলে যাইবার সময় পথে চলিতে চলিতে পাঠানুশীলন করিতেন।

এই তো অবস্থা। এ দিকে ছুটির সময় যখন জল খাইতে যাইতেন তখন স্কুলের ছাত্র যাহারা উপস্থিত থাকিত, তাহাদিগকে মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। স্কুল হইতে মাসিক যে বৃত্তি পাইতেন, ইহাতেই তাহা ব্যয় হইত। আবার, দরোয়ানের নিকট ধার করিয়া দরিদ্র ছাত্রদিগকে নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিতেন। পূজার ছুটির পর দেশে গিয়া—

দেশস্থ যে-সকল লোকের দিনপাত হওয়া দুষ্কর দেখিতেন তাহাদিগকে যথাসাধ্য

সাহায্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। অন্যান্য লোকের পরিধেয় বস্ত্র না থাকিলে গামছা পরিধান করিয়া নিজের বস্ত্রগুলি তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন।[২]

যে অবস্থায় মানুষ নিজের নিকট নিজে প্রধান দয়ার পাত্র, সে অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র অন্যকে দয়া করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে প্রথম হইতে ইহাই দেখা যায় যে, তাঁহার চরিত্র সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে ক্রমাগতই যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে। তাঁহার মতো অবস্থাপন্ন ছাত্রের পক্ষে বিদ্যালাভ করা পরম দুঃসাধ্য, কিন্তু এই গ্রাম্যবালক শীর্ণ খর্ব দেহ এবং প্রকাণ্ড মাথা লইয়া আশ্চর্য অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর-উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মতো দরিদ্রাবস্থার লোকের পক্ষে দান করা, দয়া করা বড়ো কঠিন, কিন্তু তিনি যখন যে অবস্থাতেই পড়িয়াছেন, নিজের কোনোপ্রকার অসচ্ছলতায় তাঁহাকে পরের উপকার হইতে বিরত করিতে পারে নাই, এবং অনেক মহৈশ্বর্যশালী রাজা রায়বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধি লাভ করিতে পারে নাই, এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান সেই 'দয়ার সাগর' নামে বঙ্গদেশে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।

কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর প্রথমে ফোর্ট্‌ উইলিয়ম-কলেজের প্রধান পণ্ডিত ও পরে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট্‌ সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। এই কার্যোপলক্ষে তিনি যে-সকল ইংরাজ প্রধান কর্মচারীদের সংস্রবে আসিয়াছিলেন, সকলেরই পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশের মর্যাদা নষ্ট করিয়া ইংরাজের অনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাহেবের হস্ত হইতে শিরোপা লইবার জন্য কখনও মাথা নত করেন নাই; তিনি আমাদের দেশের ইংরাজপ্রসাদগর্বিত সাহেবানু-জীবীদের মতো আত্মাবমাননার মূল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। একটা উদাহরণে তাহার প্রমাণ হইবে।— একবার তিনি কার্যোপলক্ষে হিন্দুকলেজের প্রিন্সিপল্‌ কার্‌-সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সভ্যতাভিমানী সাহেব তাঁহার বুট-বেষ্টিত দুই পা টেবিলের উপরে ঊর্ধ্বগামী করিয়া দিয়া বাঙালি ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রতারক্ষা করা বাহুল্য বোধ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ঐ কার্‌-সাহেব কার্যবশত সংস্কৃতকলেজে বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে আসিলে বিদ্যাসাগর চটিজুতা-সমেত তাঁহার সর্বজনবন্দনীয় চরণযুগল টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া এই অহংকৃত ইংরেজ অভ্যাগতের সহিত আলাপ করিলেন। বোধ করি শুনিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না, সাহেব নিজের এই অবিকল অনুকরণ দেখিয়া সন্তোষলাভ করেন নাই।

ইতিমধ্যে কলেজের কার্যপ্রণালীসম্বন্ধে তাঁহার সহিত কর্তৃপক্ষের মতান্তর হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র কর্মত্যাগ করিলেন। সম্পাদক রসময় দত্ত এবং শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ময়েট্‌-সাহেব অনেক উপরোধ-অনুরোধ করিয়াও কিছুতেই তাঁহার পণ ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। আত্মীয়-বান্ধবেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার চলিবে কী করিয়া।' তিনি বলিলেন, 'আলুপটল বেচিয়া, মুদির দোকান করিয়া দিন চালাইব।' তখন বাসায় প্রায় কুড়িটি বালককে তিনি অন্নবস্ত্র দিয়া অধ্যয়ন করাইতেছিলেন— তাহাদের কাহাকেও বিদায় করিলেন না। তাঁহার পিতা পূর্বে চাকরি করিতেন— বিদ্যাসাগরের সবিশেষ অনুরোধে কার্যত্যাগ করিয়া বাড়ি বসিয়া সংসার-খরচের টাকা পাইতেছিলেন। বিদ্যাসাগর কাজ ছাড়িয়া দিয়া প্রতিমাসে ধার করিয়া পঞ্চাশ টাকা বাড়ি পাঠাইতে লাগিলেন। এই সময় ময়েট্‌-সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর কাপ্তেন ব্যাঙ্ক্‌-নামক একজন ইংরেজকে কয়েকমাস বাংলা

ও হিন্দি শিখাইতেন। সাহেব যখন মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে বেতন দিতে গেলেন, তিনি বলিলেন, "আপনি ময়েট্-সাহেবের বন্ধু এবং ময়েট্-সাহেব আমার বন্ধু— আপনার কাছে আমি বেতন লইতে পারি না।"

১৮৫০ খৃস্টাব্দে বিদ্যাসাগর সংস্কৃতকলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক ও ১৮৫১ খৃস্টাব্দে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপল-পদে নিযুক্ত হন। আট-বৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া শিক্ষাবিভাগের নবীন কর্তা এক তরুণ সিবিলিয়ানের সহিত মনান্তর হইতে থাকায় ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে তিনি কর্মত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর স্বভাবতই সম্পূর্ণ স্বাধীনতন্ত্রের লোক ছিলেন। অব্যাহতভাবে আপন ইচ্ছা চালনা করিতে পাইলে তবে তিনি কাজ করিতে পারিতেন। উপরিতন কর্তৃপক্ষের মতের দ্বারা কোনোরূপ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে আপন সংকল্পের প্রবাহ তিলমাত্র পরিবর্তন করিতে পারিতেন না। কর্মনীতির নিয়মে ইহা তাঁহার পক্ষে প্রশংসনীয় ছিল না। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে একাধিপত্য করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, অধীনে কাজ চালাইবার গুণগুলি তাঁহাকে দেন নাই। উপযুক্ত অধীনস্থ কর্মচারী বাংলাদেশে যথেষ্ট আছে, বিদ্যাসাগরকে দিয়া তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা বিধাতা অনাবশ্যক ও অসংগত বোধ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃতকলেজে নিযুক্ত তখন কলেজের কাজকর্মের মধ্যে থাকিয়াও এক প্রচণ্ড সমাজসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদিন বীরসিংহবাটীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পিতার সহিত বীরসিংহস্কুল সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মাতা রোদন করিতে করিতে চণ্ডী-মণ্ডপে আসিয়া একটি বালিকার বৈধব্য সংঘটনের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুই এতদিন এত শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবার কি কোনো উপায় নাই।"[১] মাতার পুত্র উপায়-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহ অথচ ভক্তি ছিল। ইহাও তাঁহার সুমহৎ পৌরুষের একটি প্রধান লক্ষণ। সাধারণত আমরা স্ত্রীজাতির প্রতি ঈর্ষাবিশিষ্ট; অবলা স্ত্রীলোকের সুখ স্বাস্থ্য স্বচ্ছন্দতা আমাদের নিকট পরম পরিহাসের বিষয়, প্রহসনের উপকরণ। আমাদের ক্ষুদ্রতা ও কাপুরুষতার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ইহাও একটি।

বিদ্যাসাগর শৈশবে জগদ্দুর্লভবাবুর বাসায় আশ্রয় পাইয়াছিলেন। জগদ্দুর্লভের কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত জীবনবৃত্তান্তে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আমি কস্মিনকালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফলকথা, এই স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্‌বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণবিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি আমার হৃদয়মন্দিরে দেবীমূর্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে তদীয় অপ্রতিমগুণের কীর্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ অসংগত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ-সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী

হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয় তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।

স্ত্রীজাতির স্নেহ-দয়া-সৌজন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, আমাদের মধ্যে এমন হতভাগ্য কয়জন আছে। কিন্তু ক্ষুদ্রহৃদয়ের স্বভাব এই যে, সে যে পরিমাণে অযাচিত উপকার প্রাপ্ত হয় সেই পরিমাণে অকৃতজ্ঞ হইয়া উঠে। যাহা-কিছু সহজেই পায় তাহাই আপনার প্রাপ্য বলিয়া জানে; নিজের দিক হইতে যে কিছুমাত্র দেয় আছে তাহা সহজেই ভুলিয়া যায়। আমরাও সংসারে মাঝে মাঝে রাইমণিকে দেখিতে পাই; এবং তিনি যখন সেবা করিতে আসেন তখন তাঁহার সমস্ত যত্ন এবং প্রীতি অবহেলাভরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পরম অনুগ্রহ করিয়া থাকি; তিনি যখন চরণপূজা করিতে আসেন তখন আপন পঙ্ককলঙ্কিত পদযুগল অসংকোচে প্রসারিত করিয়া দিয়া অত্যন্ত নির্লজ্জ স্পর্ধাভরে সত্যসত্যই আপনাদিগকে নর-দেবতারূপে নারীসম্প্রদায়ের পূজাগ্রহণের অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করি। কিন্তু এই-সকল সেবক-পূজক অবলাগণের দুঃখমোচন এবং সুখস্বাস্থ্যবিধানে আমাদের মতো মর্ত্যদেবগণের সুমহৎ ঔদাসীন্য কিছুতেই দূর হয় না; তাহার কারণ, নারীদের কৃত সেবা কেবল আমরা আমাদের সাংসারিক স্বার্থসুখের সহিত জড়িত করিয়া দেখি, তাহা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃতজ্ঞতা উদ্রেক করিবার অবকাশ পায় না।

বিদ্যাসাগর প্রথমত বেথুন-সাহেবের সহায়তা করিয়া বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা ও বিস্তার করিয়া দেন। অবশেষে যখন তিনি বালবিধবাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিধবাবিবাহ-প্রচলনের চেষ্টা করেন তখন দেশের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা গালি-মিশ্রিত এক তুমুল কলকোলাহল উত্থিত হইল। সেই মুষলধারে শাস্ত্র ও গালি-বর্ষণের মধ্যে এই ব্রাহ্মণবীর বিজয়ী হইয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিলেন এবং তাহা রাজবিধিসম্মত করিয়া লইলেন।

বিদ্যাসাগর এই সময়ে আরো একটি ক্ষুদ্র সামাজিক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহারও সংক্ষেপে উল্লেখ আবশ্যক। তখন সংস্কৃতকলেজে কেবল ব্রাহ্মণেরই প্রবেশ ছিল, সেখানে শূদ্রেরা সংস্কৃত পড়িতে পাইত না। বিদ্যাসাগর সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শূদ্রদিগকে সংস্কৃতকলেজে বিদ্যাশিক্ষার অধিকার দান করেন।

সংস্কৃতকলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধানকীর্তি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটুশন্। বাঙালির নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজিশিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন; যিনি লোকাচাররক্ষক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন— এবং সংস্কৃত-বিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না তিনিই ইংরাজিবিদ্যাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল এই স্কুল ও কলেজটিকে একাগ্র-চিত্তে প্রাণাধিক যত্নে পালন করিয়া, দীনদরিদ্র রোগীর সেবা করিয়া, অকৃতজ্ঞদিগকে মার্জনা করিয়া, বন্ধুবান্ধবদিগকে অপরিমেয় স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া, আপন পুষ্পকোমল এবং বজ্রকঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনাশল্য বহন করিয়া, আপন আত্ম-

নির্ভরপর উন্নত বলিষ্ঠ চরিত্রের মহান্ আদর্শ বাঙালিজাতির মনে চিরাঙ্কিত করিয়া দিয়া ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ, দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রুপাতপ্রবণ বাঙালি-হৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালিজন-সুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহাতে বাঙালি-দুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রবৃত্তির উত্তেজনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচল কর্তৃত্ব সর্বদা বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্টলাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না। সংস্কৃত-কলেজে কাজ করিবার সময় ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর তারানাথ তর্কবাচস্পতির জন্য মার্শাল-সাহেবকে অনুরোধ করেন। সাহেব বলিলেন, তাঁহার চাকরি লইবার ইচ্ছা আছে কি না, অগ্রে জানা আবশ্যক। শুনিয়া বিদ্যাসাগর সেই দিনই ত্রিশ ক্রোশ পথ দূরে কালনায় তর্কবাচস্পতির চতুষ্পাঠি-অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পর দিনে তর্কবাচস্পতির সম্মতি ও তাঁহার প্রশংসাপত্রগুলি লইয়া পুনরায় পদব্রজে যথাসময়ে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।[২] পরের উপকারকার্যে তিনি আপনার সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন। ইহার মধ্যেও তাঁহার আজন্মকালের একটা জিদ প্রকাশ পাইত। সাধারণত আমাদের দয়ার মধ্যে এই জিদ না থাকাতে তাহা সংকীর্ণ ও স্বল্পফলপ্রসূ হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পৌরুষমহত্ত্ব লাভ করে না।

কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নহে; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম। দয়ার বিধান পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাতে অনেক সময় সুদূরব্যাপী সুদীর্ঘ কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়; তাহা কেবল ক্ষণকালের আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসনিবৃত্তি এবং হৃদয়ের ভারলাঘব করা নহে, তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা উপায়ে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অপেক্ষা রাখে।

একবার গবর্মেণ্টের কোনো অত্যুৎসাহী ভৃত্য জাহানাবাদ-মহকুমায় ইন্‌কম্-ট্যাক্স্ ধার্যের জন্য উপস্থিত হন। আয়ের স্বল্পতাপ্রযুক্ত যে-সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইন্‌কম্‌ট্যাক্সের অধীনে না আসিতে পারে, গবর্মেণ্টের এই সুচতুর শিকারী তাহাদের দুই-তিন জনের নাম একত্র করিয়া ট্যাক্সের জালে বদ্ধ করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ খড়ার গ্রামে অ্যাসেসর-বাবুর নিকট আসিয়া আপত্তি প্রকাশ করেন। বাবুটি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অভিযোগকারীদিগকে ধমক দিয়া বাধ্য করিলেন। বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় আসিয়া লেফ্‌টেনেণ্ট্ গবর্নরের নিকট বাদী হইলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট্ গবর্নর বর্ধমানের কালেক্টর হ্যারিসন-সাহেবকে তদন্ত-জন্য প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর হ্যারিসনের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ব্যবসায়ীদের খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে দুই-মাস-কাল অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া তিনি এই অন্যায়নিবারণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।[২]

বিদ্যাসাগরের জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বাংলায় অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করা দুষ্কর। আমাদের হৃদয়

অত্যন্ত কোমল বলিয়া আমরা প্রচার করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা কোনো ঝঞ্ঝাটে যাইতে চাহি না। এই অলস শান্তিপ্রিয়তা আমাদিগকে অনেক সময়েই স্বার্থপর নিষ্ঠুরতায় অবতীর্ণ করে। একজন জাহাজী গোরা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া মজ্জমান ব্যক্তির পশ্চাতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে; কিন্তু একখানা নৌকা যেখানে বিপন্ন, অন্য নৌকাগুলি তাহার কিছুমাত্র সাহায্য-চেষ্টা না করিয়া চলিয়া যায়, এরূপ ঘটনা আমাদের দেশে সর্বদাই শুনিতে পাই। দয়ার সহিত বীর্যের সম্মিলন না হইলে সে দয়া অনেক স্থলেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে।

কেবল যে সংকট এবং অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমাদের অন্তঃপুরচারিণী দয়া প্রবেশ করিতে চাহে না তাহা নহে। সামাজিক কৃত্রিম শুচিতা রক্ষার নিয়ম-লঙ্ঘনও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি জানি, কোনো এক গ্রাম্য মেলায় এক বিদেশী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে ঘৃণা করিয়া কেহই তাহার অন্ত্যেষ্টিসংকারের ব্যবস্থা করে নাই, অবশেষে তাহার অনুপস্থিত আত্মীয়পরিজনের অন্তরে চিরশোকশল্য নিহিত করিয়া ডোমের দ্বারা মৃতদেহ শ্মশানে শৃগালকুক্কুরের মুখে ফেলিয়া আসা হয়। আমরা অতি সহজেই 'আহা উহু' এবং অশ্রুপাত করিতে পারি, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে পরোপকারের পথে আমরা সহস্র স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বাধার দ্বারা পদে পদে প্রতিহত। বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ—পুরুষোচিত। এইজন্য তাহা সরল এবং নির্বিকার; তাহা কোথাও সূক্ষ্মতর্ক তুলিত না, নাসিকাকুঞ্চন করিত না, বসন তুলিয়া ধরিত না; একেবারে দ্রুতপদে, ঋজুরেখায়, নিঃশঙ্কে, নিঃসংকোচে আপন কার্যে গিয়া প্রবৃত্ত হইত। রোগের বীভৎস মলিনতা তাঁহাকে কখনো রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখে নাই। এমন-কি, (চণ্ডীচরণবাবুর গ্রন্থে লিখিত আছে) কার্মাটাড়ে এক মেথর জাতীয়া স্ত্রীলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কুটিরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বর্ধমান-বাস-কালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমান-গণকে আত্মীয়নির্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার সহোদরের জীবনচরিতে লিখিতেছেন—

> অন্নসত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। অগ্রজমহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যেককে দুই পলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহারা তৈলবিতরণ করিত তাহারা, পাছে মুচি হাড়ি ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্টজাতীয় স্ত্রীলোক স্পর্শ করে এই আশঙ্কায় তফাত হইতে তৈল দিত, ইহা দেখিয়া অগ্রজমহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য জাতীয় স্ত্রীলোকদের মাথায় তৈল মাখাইয়া দিতেন।

এই ঘটনা শ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে— কিন্তু তাঁহার দয়ার মধ্য হইতে যে-একটি নিঃসংকোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচজাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন নিগূঢ় মানবধর্ম-বশত ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

তাঁহার কারুণ্যের মধ্যে যে পৌরুষের লক্ষণ ছিল তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। আমাদের দেশে আমরা যাঁহাদিগকে ভালোমানুষ অমায়িক প্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করি, সাধারণত তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা বেশি। অর্থাৎ, কর্তব্যস্থলে তাঁহারা কাহাকেও বেদনা দিতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের দয়ায় সেই কাপুরুষতা ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন তাঁহাদের বেদান্ত-অধ্যাপক

শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির সহিত তাঁহার বিশেষ প্রীতিবন্ধন ছিল। বাচস্পতি মহাশয় বৃদ্ধবয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার প্রিয়তম ছাত্রের মত জিজ্ঞাসা করিলে ঈশ্বরচন্দ্র প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিলেন। গুরু বারম্বার কাকুতিমিনতি করা সত্ত্বেও তিনি মত পরিবর্তন করিলেন না। তখন বাচস্পতি মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া এক সুন্দরী বালিকাকে বিবাহ-পূর্বক তাহাকে আশু বৈধব্যের তটদেশে আনয়ন করিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে এই ব্যাপারের যে পরিণাম বর্ণন করিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্‌ধৃত করি—

বাচস্পতিমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'তোমার মাকে দেখিয়া যাও।' এই বলিয়া দাসীকে নববধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে বলিলেন। তখন বাচস্পতি-মহাশয়ের নববিবাহিতা পত্নীকে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। সেই জননীস্থানীয়া বালিকাকে দর্শন করিয়া ও এই বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বাচস্পতিমহাশয় 'অকল্যাণ করিস না রে' বলিয়া তাঁহাকে লইয়া বাহিরবাটীতে আসিলেন এবং নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্রের মনের উত্তেজনা ও হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে ও তাহাকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এইরূপ বহুবিধ প্রবোধবাক্যে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া শেষে ঈশ্বরচন্দ্রকে কিঞ্চিৎ জল খাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পাষাণতুল্যকঠিন প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র জলযোগ করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত হইয়া বলিলেন, 'এ ভিটায় আর কখনও জলস্পর্শ করিব না।'

বিদ্যাসাগরের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে যে বলিষ্ঠতা দেখা যায়, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যেও তাহার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ পায়। বাঙালির বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায়, কিন্তু বড়ো বড়ো গ্রন্থি ছেদন করা যায় না। তাহা সুনিপুণ, কিন্তু সবল নহে। আমাদের বুদ্ধি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো অতি সূক্ষ্ম তর্কের বাহাদুরিতে ছোটে ভালো, কিন্তু কর্মের পথে গাড়ি লইয়া চলে না। বিদ্যাসাগর যদিচ ব্রাহ্মণ, এবং ন্যায়শাস্ত্রও যথোচিত অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন, তথাপি যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান সেটা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এই কাণ্ডজ্ঞানটি যদি না থাকিত তবে যিনি এক সময় ছোলা ও বাতাসা জলপান করিয়া পাঠশিক্ষা করিয়াছিলেন তিনি অকুতোভয়ে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া, স্বাধীনজীবিকা অবলম্বন করিয়া, জীবনের মধ্যপথে সচ্ছলস্বচ্ছন্দাবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দয়ার অনুরোধে যিনি ভূরি ভূরি স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, যিনি স্বার্থের অনুরোধে আপন মহোচ্চ আত্মসম্মানকে মুহূর্তের জন্য তিলমাত্র অবনত হইতে দেন নাই, যিনি আপনার ন্যায়সংকল্পের ঋজুরেখা হইতে কোনো মন্ত্রণায় কোনো প্রলোভনে দক্ষিণে বামে কেশাগ্রপরিমাণ হেলিতে চাহেন নাই, তিনি কিরূপ প্রশস্তবুদ্ধি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বলে সংগতিসম্পন্ন হইয়া সহস্রের আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন। গিরিশৃঙ্গের দেবদারুদ্রুম যেমন শুষ্ক শিলাস্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া, প্রাণঘাতক হিমানীবৃষ্টি শিরোধার্য করিয়া, নিজের আভ্যন্তরীণ কঠিনশক্তির দ্বারা আপনাকে প্রচুর সরস-শাখাপল্লব-সম্পন্ন সরলমহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে—তেমনি এই ব্রাহ্মণতনয় জন্মদারিদ্র্য এবং সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের মজ্জাগত অপর্যাপ্তবলবুদ্ধির দ্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন সর্বসম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মেট্রোপলিটান-বিদ্যালয়কে তিনি যে একাকী সর্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে

রক্ষা করিয়া তাহাকে সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন— ইহাতে বিদ্যাসাগরের কেবল লোকহিতৈষা ও অধ্যবসায় নহে, তাঁহার সজাগ ও সহজ কর্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়। এই বুদ্ধিই যথার্থ পুরুষের বুদ্ধি, এই বুদ্ধি সুদূরসম্ভবপর কাল্পনিক বাধাবিঘ্ন ও ফলাফলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অকর্মণ্যতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে না। এই বুদ্ধি, কেবল সূক্ষ্মভাবে নহে, প্রত্যুত প্রশস্তভাবে সমগ্রভাবে কর্ম ও কর্মক্ষেত্রের আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইয়া, দ্বিধা বিসর্জন দিয়া মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত বাধার মর্মস্থল আক্রমণ করিয়া, বীরের মতো কাজ করিয়া যায়। এই সবল কর্মবুদ্ধি বাঙালির মধ্যে বিরল।

যেমন কর্মবুদ্ধি তেমনি ধর্মবুদ্ধির মধ্যেও একটা সবল কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে তাহার দ্বারা যথার্থ কাজ পাওয়া যায়। কবি বলিয়াছেন : ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ। ধর্মের গতি সূক্ষ্ম হইতে পারে, কিন্তু ধর্মের নীতি সরল ও প্রশস্ত। কারণ, তাহা বিশ্বসাধারণের এবং নিত্যকালের, তাহা পণ্ডিতের এবং তার্কিকের নহে। কিন্তু মনুষ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ আপন সংস্রবের সকল জিনিসকেই অলক্ষিতভাবে কৃত্রিম ও জটিল করিয়া তুলে। যাহা সরল, যাহা স্বাভাবিক, যাহা উন্মুক্ত উদার, যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না, বিধাতা যাহা আলোক ও বায়ুর ন্যায় মনুষ্য-সাধারণকে অযাচিত দান করিয়াছেন, মানুষ আপনি তাহাকে দুর্মূল্যদুর্গম করিয়া দেয়। সেইজন্য সহজ কথা ও সরল ভাব প্রচারের জন্য লোকোত্তর মহত্ত্বের অপেক্ষা করিতে হয়।

বিদ্যাসাগর বালবিধবাবিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাও অত্যন্ত সহজ, তাহার মধ্যে কোনো নূতনত্বের অসামান্য নৈপুণ্য নাই। তিনি প্রত্যক্ষ ব্যাপারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এক অমূলক-কল্পনালোক সৃজন করিতে আপন শক্তির অপব্যয় করেন নাই। তিনি তাঁহার 'বিধবাবিবাহ' গ্রন্থে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই আমার কথাটি পরিষ্কার হইবে।—

হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ!...অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তিসকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থাদর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা-নলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; তাহারা দুর্নিবার রিপুবশীভূত হইয়া, ব্যভিচারদোষে দূষিত হইলে তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ; ধর্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোকলজ্জাভয়ে তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু, কী আশ্চর্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে, এবং আপনা-দিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে, সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে, সংসারতরুর কী বিষময় ফলভোগ করিতেছ!

রমণীর দেবীত্ব ও বালিকার ব্রহ্মচর্যমাহাত্ম্যের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর আকাশগামী

ভাবুকতার ভূরিপরিমাণ সজল বাষ্প সৃষ্টি করিতে বসেন নাই; তিনি তাঁহার পরিষ্কার সবল বুদ্ধি ও সরল সহৃদয়তা লইয়া সমাজের যথার্থ অবস্থা ও প্রকৃত বেদনায় সকরুণ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কেবলমাত্র মধুর বাক্যরসে চিঁড়াকে সরস করিতে সেই চায় যাহার দধি নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দধির অভাব না থাকাতে বাক্‌পটুতার প্রয়োজন হয় নাই। দয়া আপনি দুঃখের স্থানে গিয়া আকৃষ্ট হয়। বিদ্যাসাগর স্পষ্ট দেখিতেছেন যে, প্রকৃত সংসারে বিধবা হইবামাত্র বালিকা হঠাৎ দেবী হইয়া উঠে না এবং আমরাও তাহার চতুর্দিকে নিষ্কলঙ্ক দেবলোক সৃষ্টি করিয়া বসিয়া নাই; এমন অবস্থায় সেও দুঃখ পায়, সমাজেরও রাশি রাশি অমঙ্গল ঘটে, ইহা প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ সত্য। সেই দুঃখ সেই অকল্যাণ-নিবারণের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করিয়া বিদ্যাসাগর থাকিতে পারেন না, আমরা সে স্থলে সুনিপুণ কাব্যকলা প্রয়োগপূর্বক একটা স্বকপোলকল্পিত জগতের আদর্শ-বৈধব্য কল্পনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। কারণ, তাঁহার সরল ধর্মবুদ্ধিতে তিনি সহজেই যে বেদনা বোধ করিয়াছেন, আমরা সেই বেদনা যথার্থরূপে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি না। সেইজন্য এ সম্বন্ধে আমাদের রচনায় নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, সরলতা প্রকাশ পায় না। যথার্থ সবলতার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সুবৃহৎ সরলতা থাকে।

এই সরলতা, কেবল মতামতে নহে, লোকব্যবহারেও প্রকাশ পায়। বিদ্যাসাগর পিতৃদর্শনে কাশীতে গমন করিলে সেখানকার অর্থলোলুপ কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে টাকার জন্য ধরিয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাহাদের অবস্থা ও স্বভাব দৃষ্টে তাহাদিগকে দয়া অথবা ভক্তির পাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন নাই, সেইজন্য তৎক্ষণাৎ অকপটচিত্তে উত্তর দিলেন, 'এখানে আছেন বলিয়া আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য করি, তাহা হইলে আমার মতো নরাধম আর নাই।' ইহা শুনিয়া কাশীর ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন, 'তবে আপনি কী মানেন।' বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন, 'আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান।'[২]

যে বিদ্যাসাগর হীনতম শ্রেণীর লোকেরও দুঃখমোচনে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি কৃত্রিম কপট ভক্তি দেখাইয়া কাশীর ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। ইহাই বলিষ্ঠ সরলতা, ইহাই যথার্থ পৌরুষ।

নিজের অশনবসনেও বিদ্যাসাগরের একটি অটল সরলতা ছিল। এবং সেই সরলতার মধ্যেও দৃঢ় বলের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বেই দৃষ্টান্ত দেখানো গিয়াছে, নিজের তিলমাত্র সম্মানরক্ষার প্রতিও তাঁহার লেশমাত্র শৈথিল্য ছিল না। আমরা সাধারণত প্রবল সাহেবি অথবা প্রচুর নবাবি দেখাইয়া সম্মানলাভের চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আড়ম্বরের চাপল্য বিদ্যাসাগরের উন্নত-কঠোর আত্মসম্মানকে কখনো স্পর্শ করিতে পারিত না। ভূষণহীন সারল্যই তাঁহার রাজভূষণ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন তখন তাঁহার দরিদ্রা 'জননীদেবী চরকাসুতা কাটিয়া পুত্রদ্বয়ের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন।'[২] সেই মোটা কাপড়, সেই মাতৃস্নেহমণ্ডিত দারিদ্র্য তিনি চিরকাল সগৌরবে সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু তদানীন্তন লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ গবর্নর হ্যালিডে-সাহেব তাঁহাকে রাজ-সাক্ষাতের উপযুক্ত সাজ করিয়া আসিতে অনুরোধ করেন। বন্ধুর অনুরোধে বিদ্যাসাগর কেবল দুই-একদিন চোগা-চাপকান পরিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সে লজ্জা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'আমাকে যদি এই বেশে আসিতে হয় তবে এখানে আর আমি আসিতে

পারিব না।' হ্যালিডে তাঁহাকে তাঁহার অভ্যস্তবেশে আসিতে অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতিচাদর পরিয়া সর্বত্র সম্মান লাভ করেন বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্রবেশ তখন তিনি অন্য সমাজে অন্য বেশ পরিয়া আপন সমাজের ও সেইসঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। সাদা ধুতি ও সাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না; বরঞ্চ এই কৃষ্ণচর্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই অপমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়— মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।

সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি সোদর কেহ ছিল না। এ দেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে-এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন চারি দিকের জন-মণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন— আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলি-নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স্, এবং নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন। বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে, বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজে সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন; কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লিঝংকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত-পীড়িত অনাথ-অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্তমান নাই, কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালিজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া— সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া— সরল সবল অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি; এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মতো দুর্গমবিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য-

বীর্য-মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব—এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয়জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।[৩]

১৩০২ ভাদ্র

২

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাসাগরের জীবনী সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার আরম্ভে যোগবাশিষ্ঠ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন—

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥

তরুলতাও জীবনধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবনধারণ করে; কিন্তু সে-ই প্রকৃতরূপে জীবিত যে মননের দ্বারা জীবিত থাকে।

মনের জীবন মননক্রিয়া এবং সেই জীবনেই মনুষ্যত্ব।

প্রাণ সমস্ত দেহকে ঐক্যদান করিয়া তাহার বিচিত্র কার্যসকলকে একতন্ত্রে নিয়মিত করে। প্রাণ চলিয়া গেলে দেহ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, তাহার ঐক্য ছিন্ন হইয়া মাটির অংশ মাটিতে, জলের অংশ জলে মিশিয়া যায়। নিয়তক্রিয়াশীল নিরলস প্রাণই এই শরীরটাকে মাটি হইতে, জল হইতে উচ্চ করিয়া, স্বতন্ত্র করিয়া, এক করিয়া, স্বতশ্চালিত এক অপূর্ব ইন্দ্রজাল রচনা করে।

মনের যে জীবন, শাস্ত্রে যাহাকে মনন বলিতেছে, তাহাও সেইরূপ মনকে এক করিয়া তাহাকে তাহার সমস্ত তুচ্ছতা, সমস্ত অসম্বদ্ধতা হইতে উদ্ধার করিয়া খাড়া করিয়া গড়িয়া তোলে. সেই মনন দ্বারা ঐক্যপ্রাপ্ত মন বিচ্ছিন্নভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে না, সে মন বাহ্যপ্রবাহের মুখে জড়পুঞ্জের মতো ভাসিয়া যায় না।

কোনো মনস্বী ইংরাজলেখক বলিয়াছেন, 'এমন লোকটি পাওয়া দুর্লভ, যিনি নিজের পায়ের উপর খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারেন, যিনি নিজের চিত্তবৃত্তিসম্বন্ধে সচেতন, কর্মস্রোতকে প্রবাহিত এবং প্রতিহত করিবার মতো বল যাঁহার আছে, যিনি ধাবমান জনতা হইতে আপনাকে ঊর্ধ্বে রাখিতে পারেন এবং সেই জনতা-প্রবাহ কোথা হইতে আসিতেছে ও কোথায় তাহার গতি, তৎসম্বন্ধে যাঁহার একটি পরিষ্কৃত সংস্কার আছে।'

উক্ত লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহাকে সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলা যায় যে, এমন লোক দুর্লভ 'মনো যস্য মননেন হি জীবতি'।

---

[১] স্বরচিত বিদ্যাসাগর-চরিত [২] শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন-প্রণীত বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত

[৩] বর্তমান প্রবন্ধ, ১৩০২ সালের ১৩ই শ্রাবণ অপরাহ্ণে বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থসভার সাংবৎসরিক অধিবেশনে এমারেল্ড থিএটার রঙ্গমঞ্চে পঠিত।

সাধারণ লোকের মধ্যে মন-নামক যে একটা ব্যাপার আছে বলিয়া ভ্রম হয় তাহাকে খাড়া রাখিয়াছে কিসে। কেবল প্রথা এবং অভ্যাসে। তাহার জড় অঙ্গগুলি অভ্যাসের আটা দিয়া জোড়া— তাহা প্রাণের বন্ধনে এক হইয়া নাই। তাহার গতি চিরকালপ্রবাহিত দশজনের গতি, তাহার অদ্যতন দিন কল্যতন দিনের অভ্যস্ত অন্ধ পুনরাবৃত্তিমাত্র।

জলের মধ্যে তৃণ যেমন করিয়া ভাসিয়া যায়, মাছ তেমন করিয়া ভাসে না। জলের পথ এবং মাছের পথ সর্বদাই এক নহে। মাছকে খাদ্যের অনুসরণে, আত্মরক্ষার উত্তেজনায় নিয়ত আপনার পথ আপনি খুঁজিয়া লইতে হয়। তৃণ সে প্রয়োজন অনুভবই করে না।

মননক্রিয়া-দ্বারা যে মন জীবিত তাহাকেও আত্মরক্ষার জন্যই নিজের পথ নিজে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। দশজনের মধ্যে ভাসিয়া চলা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

সাধারণ বাঙালির সহিত বিদ্যাসাগরের যে একটি জাতিগত সুমহান্ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় সে প্রভেদ শাস্ত্রীমহাশয় যোগবাশিষ্ঠের একটিমাত্র শ্লোকের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়াছেন। আমাদের অপেক্ষা বিদ্যাসাগরের একটা জীবন অধিক ছিল। তিনি কেবল দ্বিজ ছিলেন না, তিনি দ্বিগুণ-জীবিত ছিলেন।

সেইজন্য তাঁহার লক্ষ্য, তাঁহার আচরণ, তাঁহার কার্যপ্রণালী আমাদের মতো ছিল না। আমাদের সম্মুখে আছে আমাদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, ব্যক্তিগত লাভক্ষতি। তাঁহার সম্মুখেও অবশ্য সেগুলা ছিল; কিন্তু তাহার উপরেও ছিল তাঁহার অন্তর্জীবনের সুখদুঃখ, মনোজীবনের লাভক্ষতি। সেই সুখদুঃখ লাভ-ক্ষতির নিকট বাহ্য সুখদুঃখ লাভক্ষতি কিছুই নহে।

আমাদের বহির্জীবনেরও একটা লক্ষ্য আছে, তাহাকে সমস্ত জড়াইয়া এক কথায় স্বার্থ বলা যায়। আমাদের খাওয়া পরা শোওয়া, কাজকর্ম করা, সমস্ত স্বার্থের অঙ্গ। ইহাই আমাদের বহির্জীবনের মূলগ্রন্থি।

মননের দ্বারা আমরা যে অন্তর্জীবন লাভ করি তাহার মূল লক্ষ্য পরমার্থ। এই আম্‌মহল ও খাস্‌মহলের দুই কর্তা— স্বার্থ ও পরমার্থ। ইহাদের সামঞ্জস্য-সাধন করিয়া চলাই মানবজীবনের আদর্শ। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সংসারের বিপাকে পড়িয়া যে অবস্থায় 'অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' তখন পরমার্থকে রাখিয়া স্বার্থই পরিত্যাজ্য, এবং যাঁহার মনোজীবন প্রবল তিনি অবলীলাক্রমে সেই কাজ করিয়া থাকেন।

অধিকাংশের মন সজীব নয় বলিয়া শাস্ত্রে এবং লোকাচারে আমাদের মনঃ-পুত্তলী-যন্ত্রে দম দিয়া তাহাকে একপ্রকার কৃত্রিম গতি দান করে। কেবল সেই জোরে আমরা বহুকাল ধরিয়া দয়া করি না, দান করি; ভক্তি করি না, পূজা করি; চিন্তা করি না, কর্ম করি; বোধ করি না অথচ সেইজন্যই কোন্‌টা ভালো ও কোন্‌টা মন্দ তাহা অত্যন্ত জোরের সহিত অতিশয় সংক্ষেপে চোখ বুজিয়া ঘোষণা করি। ইহাতে সজীব-দেবতা-স্বরূপ পরমার্থ আমাদের মনে জাগ্রত না থাকিলেও তাহার জড়-প্রতিমা কোনোমতে আপনার ঠাট বজায় রাখে।

এই নির্জীবতা ধরা পড়ে বাঁধা নিয়মের নিশ্চেষ্ট অনুসরণ-দ্বারা। যে সমাজে একজন অবিকল আর-একজনের মতো এবং এক কালের সহিত অন্য কালের বিশেষ প্রভেদ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সে সমাজে পরমার্থ সজীব নাই এবং মননক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে এ কথা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।

আমাদের দেশের কবি তাই বলিয়াছেন, 'গতানুগতিকো লোকো ন লোকঃ পারমার্থিকঃ'। অর্থাৎ লোকে গতানুগতিক হইয়া থাকে, পারমার্থিক লোক দেখা যায় না। গতানুগতিক লোক যে পারমার্থিক নহে এবং পারমার্থিক লোক গতানুগতিক হইয়া থাকিতে পারেন না, কবি এই নিগূঢ় কথাটি অনুভব করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর আর যাহাই হউন, গতানুগতিক ছিলেন না। কেন ছিলেন না। তাহার প্রধান কারণ, মননজীবনই তাঁহার মুখ্যজীবন ছিল।

অবশ্য, সকল দেশেই গতানুগতিকের সংখ্যা বেশি। কিন্তু যে দেশে স্বাধীনতার স্ফূর্তি ও বিচিত্র কর্মের চাঞ্চল্য সর্বদা বর্তমান সেখানে লোকসমাজমন্থনে সেই অমৃত উঠে—যাহাতে মনকে জীবনদান করে, মননক্রিয়াকে সতেজ করিয়া তোলে।

তথাপি সকলেই জানেন, কার্লাইলের ন্যায় লেখক তাঁহাদের দেশের সাধারণ জনসমাজের অন্ধ মূঢ়তাকে কিরূপ সুতীব্র ভর্ৎসনা করিয়াছেন। কার্লাইল যাহাকে hero অর্থাৎ বীর বলেন, তিনি কে।—

The hero is he who lives in the inward sphere of things, in the True, Divine and Eternal, which exists always, unseen to most, under the Temporary, Trival: his being is in That; he declares That abroad; by act or speech as it may be, in declaring himself abroad.

অর্থাৎ, তিনিই বীর যিনি বিষয়পুঞ্জের অন্তরতর রাজ্যে সত্য এবং দিব্য এবং অনন্তকে আশ্রয় করিয়া আছেন—যে সত্য দিব্য ও অনন্ত পদার্থ অধিকাংশের অগোচরে চারি দিকের তুচ্ছ এবং ক্ষণিক ব্যাপারের অভ্যন্তরে নিত্যকাল বিরাজ করিতেছেন; সেই অন্তররাজ্যেই তাঁর অস্তিত্ব; কর্মদ্বারা অথবা বাক্যদ্বারা নিজেকে বাহিরে প্রকাশ করিয়া তিনি সেই অন্তররাজ্যকেই বাহিরে বিস্তার করিতেছেন।

কার্লাইলের মতে ইঁহারা কাপড় ঝুলাইবার আলনা বা হজম করিবার যন্ত্র নহেন, ইঁহারাই সজীব মনুষ্য, অর্থাৎ সেই একই কথা, 'স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি'। অথবা, অন্য কবির ভাষায় ইঁহারা গতানুগতিকমাত্র নহেন, ইঁহারা পারমার্থিক।

আমরা স্বার্থকে যেমন সহজে এবং সুতীব্রভাবে অনুভব করি, মননজীবিগণ পরমার্থকে ঠিক তেমনি সহজে অনুভব করেন এবং তাহার দ্বারা তেমনি অনায়াসে চালিত হন। তাঁহাদের দ্বিতীয় জীবন, তাঁহাদের অন্তরতর প্রাণ যে খাদ্য চায়, যে বেদনা বোধ করে, যে আনন্দামৃতে সাংসারিক ক্ষতি এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধেও অমর হইয়া উঠে, আমাদের নিকট তাহার অস্তিত্বই নাই।

পৃথিবীর এমন একদিন ছিল যখন সে কেবল আপনার দ্রবীভূত ধাতুপ্রস্তরময় ভূপিন্ড লইয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিত। বহুযুগ পরে তাহার নিজের অভ্যন্তরে এক অপরূপ প্রাণশক্তির বিকাশে জীবনে এবং সৌন্দর্যে তাহার স্থলজল পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

মানবসমাজেও মননশক্তিদ্বারা মনঃসৃষ্টি বহুযুগের এক বিচিত্র ব্যাপার। তাহার সৃষ্টিকার্য অনবরত চলিতেছে, কিন্তু এখনও সর্বত্র যেন দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। মাঝে মাঝে এক এক স্থানে যখন তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে তখন চারি দিকের সহিত তাহার পার্থক্য অত্যন্ত বেশি বোধ হয়।

বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরকে সেইজন্য সাধারণ হইতে অত্যন্ত পৃথক দেখিতে হইয়াছে। সাধারণত আমরা-যে পরমার্থের প্রভাব একেবারেই অনুভব করি না,

বিবাহের মধ্য দিয়া অতি অবাধে প্রবাহিত হইয়াছিল; মাঝে মাঝে পোর্ট্‌মদিরার অতিসেবা ছাড়া আর কিছুতেই তাঁহার নাড়ী ও তাঁহার মেজাজকে চঞ্চল করিতে পারে নাই। কিন্তু আর-একজন কঠিন বৃদ্ধ তীর্থযাত্রী যিনি অন্তর এবং বাহিরের দুঃখরাশি সত্ত্বেও যুদ্ধ করিয়া জীবনকে শান্তির পথে লইয়া গেছেন, যিনি এই সংসারের মায়ার হাটে উপহসিত হইয়া মৃত্যুচ্ছায়ার অন্ধগুহামধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং যিনি নৈরাশ্য-দৈত্যের বন্ধন হইতে বহু চেষ্টায় বহু কষ্টে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুশয্যায় আমাদের মনে গভীরতর ভাবাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। যখন দেখিতে পাই, এই লোকের অন্তিমকালের হৃদয়বৃত্তি কিরূপ কোমল গম্ভীর এবং সরল তখন আমরা স্বতই অনুভব করি যে, যে নিরীহ ভদ্রলোকটি পরম শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া বাঁচিয়াছিলেন ও মরিয়াছিলেন তাঁহার অপেক্ষা উন্নততর সত্তার সন্নিধানে বর্তমান আছি।

এই বর্ণনা পাঠ করিলে বিদ্যাসাগরের সহিত জন্‌সনের সাদৃশ্য সহজেই মনে পড়ে। বিদ্যাসাগরও কেবল ক্ষুদ্র সংকীর্ণ অভ্যস্ত ভব্যতার মধ্য দিয়া চলিতে পারেন নাই; তাঁহারও স্নেহ ভক্তি দয়া, তাঁহার বিপুলবিস্তীর্ণ হৃদয়, সমস্ত আদবকায়দাকে বিদীর্ণ করিয়া কেমন অসামান্য আকারে ব্যক্ত হইত তাহা তাঁহার জীবনচরিতে নানা ঘটনার প্রকাশ পাইয়াছে।

এইখানে জন্‌সন্‌ সম্বন্ধে কার্লাইল যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করি।—

তিনি বলিষ্ঠচেতা এবং মহৎ-লোক ছিলেন। শেষ পর্যন্তই অনেক জিনিস তাঁহার মধ্যে অপরিণত থাকিয়া গিয়াছিল। অনুকূল উপকরণের মধ্যে তিনি কী না হইতে পারিতেন— কবি, ঋষি, রাজাধিরাজ। কিন্তু মোটের উপরে, নিজের 'উপকরণ' নিজের 'কাল' এবং ঐগুলা লইয়া নালিশ করিবার প্রয়োজন কোনো লোকেরই নাই; উহা একটা নিষ্ফল আক্ষেপমাত্র। তাঁহার কালটা খারাপ ছিল, ভালোই; তিনি সেটাকে আরও ভালো করিবার জন্যই আসিয়াছেন। জন্‌সনের কৈশোরকাল ধনহীন, সঙ্গহীন, আশাহীন এবং দুর্ভাগ্যজালে বিজড়িত ছিল। তা থাক্‌, কিন্তু বাহ্য অবস্থা অনুকূলতম হইলেও জন্‌সনের জীবন দুঃখের জীবন হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভবপর হইত না। প্রকৃতি তাঁহার মহত্ত্বের প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে বলিয়াছিল, রোগাতুর দুঃখরাশির মধ্যে বাস করো। না, বোধ করি, দুঃখ এবং মহত্ত্ব ঘনিষ্ঠভাবে, এমন-কি, অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর জড়িত ছিল। যে কারণেই হউক অভাগা জন্‌সনকে নিয়তই রোগাবিষ্টতা, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বেদনা, কোমরে বাঁধিয়া ফিরিতে হইত। তাঁহাকে একবার কল্পনা করিয়া দেখো, তাঁহার সেই রুগ্নশরীর, তাঁহার ক্ষুধিত প্রকাণ্ড হৃদয় এবং অনির্বচনীয় উদ্‌বর্তিত চিন্তাপুঞ্জ লইয়া পৃথিবীতে বিপদাকীর্ণ বিদেশীর মতো ফিরিতেছেন, ব্যগ্রভাবে গ্রাস করিতেছেন যে-কোনো পারমার্থিক পদার্থ সম্মুখে আসিয়া পড়ে, আর যদি কিছুই না পান, তবে অন্তত বিদ্যালয়ের ভাষা এবং কেবলমাত্র ব্যাকরণের ব্যাপার! সমস্ত ইংলন্ডের মধ্যে বিপুলতম অন্তঃকরণ যাহা ছিল তাঁহারই ছিল, অথচ তাঁহার জন্য বরাদ্দ ছিল সাড়ে চার আনা করিয়া প্রতিদিন। তবু সে হৃদয় ছিল অপরাজিত মহাবলী, প্রকৃত মনুষ্যের হৃদয়! অক্‌স্‌ফোর্ডে তাঁহার সেই জুতাজোড়ার গল্পটা সর্বদাই মনে পড়ে; মনে পড়ে, কেমন করিয়া সেই, দাগ-কাটা মুখ, হাড়-বাহির-করা, কলেজের দীন ছাত্র শীতের সময় জীর্ণ জুতা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কেমন করিয়া এক কৃপালু সচ্ছল ছাত্র গোপনে একজোড়া জুতা তাহার দরজার কাছে রাখিয়া দিল; এবং সেই হাড়-বাহির-করা দরিদ্র ছাত্র সেটা তুলিল, কাছে আনিয়া তাহার বহুচিন্তাজালে অস্ফুট দৃষ্টির নিকট ধরিল এবং তাহার পরে জানালার বাহিরে দূরে করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিল। ভিজা পা বলো, পঙ্ক বলো, বরফ বলো, ক্ষুধা বলো, সবই সহ্য হয়, কিন্তু ভিক্ষা নহে; আমরা ভিক্ষা সহ্য করিতে পারি না। এখানে কেবল রূঢ় আত্মসহায়তা। দৈন্যমালিন্য, উদ্‌ভ্রান্ত বেদনা এবং অভাবের অন্ত নাই, তথাপি অন্তরের মহত্ত্ব এবং পৌরুষ! এই-যে জুতা

ছুঁড়িয়া ফেলা, ইহাই এ মানুষটির জীবনের ছাঁচ। একটি স্বকীয়তন্ত্র (original) মানুষ, এ তোমার গতানুগতিক, ঋণপ্রার্থী ভিক্ষাজীবী লোক নহে। আর যাই হউক, আমরা আমাদের নিজের উপরেই যেন স্থিতি করি— সেই জুতা পায়ে দিয়াই দাঁড়ানো যাক যাহা আমরা নিজে জোটাইতে পারি। যদি তেমনই ঘটে, তবে পাঁকের উপর চলিব, বরফের উপরেই চলিব, কিন্তু উন্নতভাবে চলিব; প্রকৃতি আমাদিগকে যে সত্য দিয়াছেন, তাহারই উপর চলিব; অপরকে যাহা দিয়াছেন তাহারই নকলের উপর চলিব না।

কার্লাইল যাহা লিখিয়াছেন তাহার ঘটনা সম্বন্ধে না মিলুক, তাহার মর্মকথাটুকু বিদ্যাসাগরে অবিকল খাটে। তিনি গতানুগতিক ছিলেন না; তিনি স্বতন্ত্র, সচেতন, পারমার্থিক ছিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার জুতা তাঁহার নিজেরই চটিজুতা ছিল। আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল্ কেহ ছিল না; তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা, সবলতা, গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতিদিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদ্য সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই। বস্‌ওয়েল্ না থাকিলে জন্‌সনের মনুষ্যত্ব লোক-সমাজে স্থায়ী আদর্শ দান করিতে পারিত না। সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্ব তাঁহার কাজের মধ্যে আপনার ছাপ রাখিয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহার অসামান্য মনস্বিতা, যাহা তিনি অধিকাংশ সময়ে মুখের কথায় ছড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা কেবল অপরিস্ফুট জনশ্রুতির মধ্যে অসম্পূর্ণ আকারে বিরাজ করিবে।

১৩০৫

ভারতপথিক রামমোহন রায়

ইতিহাসে দেখি অনেক বড়ো বড়ো প্রাচীন সভ্যতা দেশের নদীর সঙ্গে নাড়ীর যোগে প্রাণবান। নদী দেশকে দেয় জল, দেয় ফল; কিন্তু সব চেয়ে বড়ো তার দান, দেশকে সে দেয় গতি। দূরের সঙ্গে বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ শাখায়িত করে নদী, স্থাবরের মর্মের মধ্যে নিয়ে আসে প্রাণের চলৎপ্রবাহ।

নদীমাতৃক দেশে নদী যদি একেবারে শুকিয়ে যায় তা হলে তার মাটিতে ঘটে কৃপণতা, তার অন্ন-উৎপাদনের শক্তি ক্ষীণ হয়। দেশের আপন জীবিকা যদি-বা কোনোমতে চলে, কিন্তু যে অন্নপ্রাচুর্যের দ্বারা বাইরের বৃহৎ জগতের সঙ্গে তার যোগ সেটা যায় দরিদ্র হয়ে। সে না পারে দিতে, না পারে নিতে। নিজের মধ্যে সে রুদ্ধ হয়ে থাকে, বিভক্ত হয় তার ঐক্যধারা, তার আত্মীয়মিলনের পথ হয় দুর্গম। বাহিরের সঙ্গে সে হয় পৃথক, অন্তরের মধ্যে সে হয় খণ্ডিত।

যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বলা চলে। সে চিত্তের এমন নিত্যপ্রবাহিত মননধারা যার যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে, নিজের মধ্যেকার ভেদ বিভেদ তার ভেসে যায়— যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব নব সফলতায় পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অন্ন জোগায় সকল দেশকে, সকল কালকে।

একদা সেই চিত্ত ছিল ভারতের, তার ছিল বহমান-মনন-ধারা। সে বলতে পেরেছিল 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা', সকলে আসুক সকল দিক থেকে। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে', শুনুক বিশ্বের লোক। বলেছিল 'বেদাহম্', আমি জানি— এমন কিছু

জানি যা বিশ্বের সকলকে আমন্ত্রণ করে জানাবার। যে তারা জ্যোতিহীন তাকে নিখিল নক্ষত্রলোক স্বীকার করে না। প্রাচীন ভারত নিত্যকালের মধ্যে আপন পরিচয়কে দীপ্যমান করেছে; বিশ্বলোকে সে প্রকাশিত হয়েছে প্রভূত দাক্ষিণ্যে, আপনাকে দান করার দ্বারা। সেদিন সে ছিল না অকিঞ্চনরূপে অকিঞ্চিৎকর।

শত শত বৎসর চলে গেল—ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি হল নিস্তব্ধ, ভারতবর্ষের মনোলোকে চিন্তার মহানদী গেল শুকিয়ে। তখন দেশ হয়ে পড়ল স্থাবির, আপনার মধ্যে আপনি সংকীর্ণ, তার সজীব চিত্তের তেজ আর বিকীর্ণ হয় না দূর-দূরান্তরে। শুকনো নদীতে যখন জল চলে না তখন তলাকার অচল পাথরগুলো পথ আগলে বসে; তারা অসংলগ্ন, তারা অর্থহীন, পথিকদের তারা বিঘ্ন। তেমনি দুর্দিন যখন এল এই দেশে তখন জ্ঞানের চলমান গতি হল অবরুদ্ধ, নির্জীব হল নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি, উদ্ধত হয়ে দেখা দিল নিশ্চল আচারপুঞ্জ, আনুষ্ঠানিক নিরর্থকতা, মননহীন লোকব্যবহারের অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি। সর্বজনের প্রশস্ত রাজপথকে তারা বাধাগ্রস্ত করলে; খণ্ড খণ্ড সংকীর্ণ সীমানার বাইরে বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে।

ঘুমের অবস্থায় মনের জানলা যখন সব বন্ধ হয়ে যায়, মন হয় বন্দী। তখন যে-সব স্বপ্ন নিয়ে সে খেলা করে বিশ্বসত্যের সঙ্গে তাদের যোগ নেই, কেবলমাত্র সেই সুপ্ত মনের নিজের উপরেই তাদের প্রভাব এক কেন্দ্রে আবর্তিত, তা তারা যতই অদ্ভুত হোক, অসংগত হোক, উৎকট হোক। বাহিরের বাস্তবরাজ্য থেকে এই স্বপ্নরাজ্যে আর কারও প্রবেশের পথ নেই। একে বিদ্রূপ করা যায়, কিন্তু বিচার করা যায় না; কেননা এ থাকে যুক্তির বাহিরে।

তেমনি ছিল অর্থহারা আচারের স্বপ্নজালে জড়িত ভারতবর্ষ; তার আলো এসেছিল নিবে। তার আপনার কাছে আপন সত্যপরিচয় ছিল আচ্ছন্ন। এমন সময় রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হল এই দেশে, সেই আত্মবিস্মৃত প্রদোষের অন্ধকারে। সেদিন তার ইতিহাস অগৌরবের কালিমায় আবৃত। ভারত আপন বাণী তখন হারিয়েছে, নিখিল পৃথিবীর এই নতুন কালের জন্যে তার কোনো বার্তা নেই, ঘরের কোণে বসে সে মৃত যুগের মন্ত্র জপ করছে।

যখন সে আপন দুর্বলতায় অভিভূত সেই অপমানের দিনে বাইরের লোক এল তার দ্বারে; আপন সম্মান রক্ষা করে তাকে অভ্যর্থনা করবে এমন আয়োজন ছিল না; অতিথিরূপে তাকে গৃহস্বামী ডাকতে পারে নি, দ্বার ভেঙে দস্যুরূপে সে প্রবেশ করলে তার স্বর্ণভাণ্ডারে।

ভারতের চিত্ত সেদিন মনের অন্ন নূতন করে উৎপাদন করতে পারছিল না, তার খেত ভরা ছিল আগাছার জঙ্গলে। সেই অজন্মার দিনে রামমোহন রায় জন্মেছিলেন সত্যের ক্ষুধা নিয়ে। ইতিহাসের প্রাণহীন আবর্জনায়—বাহ্যবিধির কৃত্রিমতায় কিছুতে তাঁকে তৃপ্ত করতে পারলে না। কোথা থেকে তিনি নিয়ে এলেন সেই জ্ঞানের আগ্রহে স্বভাবত উৎসুক মন, যা সম্প্রদায়ের বিচিত্র বেড়া ভেঙে বেরোল, চারি দিকের মানুষ যা নিয়ে ভুলে আছে তাতে যার বিতৃষ্ণা হল। সে চাইল মোহমুক্ত বুদ্ধির সেই অবারিত আশ্রয়, যেখানে সকল মানুষের মিলনতীর্থ।

এই বেড়া ভাঙার সাধনাই যথার্থ ভারতবর্ষের মিলনতীর্থকে উদ্ঘাটিত করা। এইজন্যেই এ সাধনা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের, যেহেতু এর বিরুদ্ধতাই ভারতে এত প্রভূত, এত প্রবল। ইংলণ্ড ক্ষুদ্র দ্বীপের সীমায় বদ্ধ, সেইজন্যেই তার সাধনা গেছে দ্বৈপায়নতার বিপরীত দিকে, বিশ্বে সে আপনাকে সুদূরে বিস্তার করেছে। দেশের

বিশেষ অবস্থার মধ্যেই দেশের অঞ্জলি পাতা রয়েছে, সেই অঞ্জলির অর্থই এই যে, তার শূন্যতাকে পূর্ণ করতে হবে।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে আছে তার নিহিতার্থ, তার বিশেষ সমস্যা; সেই অর্থ তাকে পূরণ করতে হয় নিরন্তর প্রয়াসে। এই প্রয়াসের দ্বারাই তার চরিত্র সৃষ্ট হয়, তার উদ্ভাবনী শক্তি বললাভ করে। মানুষকে তার মনুষ্যত্ব প্রতিক্ষণে জয় করে নিতে হয়। প্রত্যেক জাতির ইতিহাস আপন জয়যাত্রার ইতিহাস। কঠিন বাধা দূর করবার পথেই তার স্বাস্থ্য, তার সম্পদ। এইজন্যেই বলেছে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। দুর্গমকে সুগম করতে এসেছে মানুষ, দুর্লভকে উপলব্ধ। বিশেষ জাতিকে যে বিশেষ সমস্যা দিয়েছেন বিধাতা, তার সত্য উত্তর দিতে থাকার মধ্যেই তার পরিত্রাণ। যারা সমাধান করতে ভুল করেছে তারা মরেছে। আর দুর্গতিগ্রস্ত হয়েছে তারাই যারা মনে করেছে তাদের সমাধান করবার কিছুই নেই, সমস্ত সমাধা হয়ে গেছে। যতক্ষণ মানুষের প্রাণ আছে ততক্ষণই তার সমস্যা, অবিরত সমস্যার উত্তর দিতে থাকাই প্রাণক্রিয়া। চারি দিকে জড়ের জটিল বাধা নিত্যই, সেই বাধা নিত্যই ভেদ করার দ্বারা প্রাণ আপনাকে সপ্রমাণ করে। ইতিহাসে যে জটা পাকিয়ে থাকে সেই গ্রন্থিকেই সনাতন বলে ভক্তি করলে সেটা মরণের ফাঁস হয়ে ওঠে।

মানব-ইতিহাসের প্রধান সমস্যাটা কোথায়। যেখানে কোনো অন্ধতায় কোনো মূঢ়তায় মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটায়।—মানবসমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মানুষের ঐক্য। সভ্যতার অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র হবার অনুশীলনা। এই ঐক্যতত্ত্বের উপলব্ধি যেখানেই দুর্বল সেখানে সেই দুর্বলতা নানা ব্যাধির আকার ধরে দেশকে চারি দিক থেকে আক্রমণ করে।

ভারতবর্ষে তার সমস্যাটা সুস্পষ্ট। এখানে নানা জাতের লোক একত্রে এসে জুটেছে। পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশে এমন ঘটে নি। যারা একত্র হয়েছে তাদের এক করতেই হবে, এই হল ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সমস্যা। এক করতে হবে বাহ্যিক ব্যবস্থায় নয়, আন্তরিক আত্মীয়তায়। ইতিহাস মাত্রেরই সর্বপ্রধান মন্ত্র হচ্ছে 'সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্'—এক হয়ে চলব, এক হয়ে বলব, সকলের মনকে এক বলে জানব। এই মন্ত্রের সাধনা ভারতবর্ষে যেমন অত্যন্ত দুরূহ এমন আর কোনো দেশেই নয়। যতই দুরূহ হোক, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ছাড়া রক্ষা পাবার অন্য কোনো পথ নেই।

অন্য কোনো দেশের শ্রীবৃদ্ধি দেখে যখন আমরা মুগ্ধ হই তখন অনেক সময়ে আমরা তার সিদ্ধির পরিণত রূপটার দিকেই লুব্ধদৃষ্টিপাত করি, তার সাধনার দুর্গম পথটা আমাদের চোখে পড়ে না। দেখতে পাওয়া গেল স্বাধীন দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, মনে করি ঐ ব্যবস্থার একটি অনুরূপ প্রতিমা খাড়া করতে পারলেই আমাদের উদ্ধার। ভুলে যাই রাষ্ট্রব্যবস্থাটা দেহমাত্র—সেই দেহ নিরর্থক, যদি তার প্রাণ না থাকে। সেই প্রাণই জাতিগত ঐক্য। অন্য দেশে সেই ঐক্যেরই আন্তরিক শক্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সে-সব দেশেও সেই ঐক্যে যেখানে যে পরিমাণ বিকার ঘটে সেখানে সেই পরিমাণেই সমস্যা কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে জাতিতে জাতিতে পার্থক্য, পশ্চিম-মহাদেশে শ্রেণীতে শ্রেণীতে। সেই শ্রেণীগত পার্থক্যের মধ্যে আন্তরিক সামঞ্জস্য যদি না ঘটে তা হলে বাহ্য ব্যবস্থায় বিপদ-নিবারণ হবে না।

আমরা যদি কোনো ক্ষেত্রে দেখতে পাই প্রচুর ফসল তা হলে গোড়াতেই এ কথা মনে রাখতে হবে, এ ফসল বালিতে উৎপন্ন হয় নি, হয়েছে মাটিতে। মরুভূমিতে দেখা যায় উদ্ভিদ দূরে দূরে বিশ্লিষ্ট, তারা কাঁটার দ্বারা নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র

করে রক্ষা করেছে। তাদের জননী ধরণী এক রসের দাক্ষিণ্যে সকলকে পরিপোষণ করে নি, তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রাণের ঐক্যে কার্পণ্য। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, মাটির কণায় কণায় বন্ধন আছে, বালির কণায় কণায় বিচ্ছেদ। আমরা যখন সমৃদ্ধিবান জাতির ইতিহাস চর্চা করি তখন ভরা ফসলের দিকে চোখ পড়ে, এবং কৃষিপ্রণালীর বিবরণও যত্ন করে মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করে থাকি; কেবল একটা কথা মনে রাখি নে, এই ফসলের ঐশ্বর্য সম্পূর্ণ অসম্ভব যদি তার ভূমিকাতেই থাকে বিচ্ছিন্নতা। কৃষির যন্ত্রকেও আমরা দাবি করি, ফসলেরও প্রত্যাশা করে থাকি, কিন্তু আমাদের ভূমির প্রকৃতিতেই যে বিচ্ছেদ তাকে চোখ বুজে আমরা নগণ্য বলেই জ্ঞান করি এবং ধর্মের নামে তাকে নিত্যরূপে রক্ষা করবার চেষ্টায় সতর্ক হয়ে থাকি। আমরা ইতিহাসের উপরকার মলাটটা পড়ি, ভিতরকার পাতাগুলো বাদ দিয়ে যাই, ভুলে যাই কোনো দেশেই সমাজগত বিশ্লিষ্টতার উপর রাষ্ট্রজাতিগত স্বাতন্ত্র্য আজ পর্যন্ত সংঘটিত ও সংরক্ষিত হয় নি। প্রজারা যেখানে বিভক্ত সেখানে ব্যক্তিবিশেষের একাধিপত্য তাদের বাইরের বন্ধনে বেঁধে রাখে। তাও বেশি দিন টেকে না, কেবলই হাতবদল হতে থাকে। যেখানে মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ সেখানে কেবল রাষ্ট্রশক্তি নয়, বুদ্ধিবৃত্তিও শিথিল হয়ে যায়। সেখানে মাঝে মাঝে প্রতিভাশালীর অভ্যুদয় হয় না তা নয়, কিন্তু সেই প্রতিভার দান ধারণ ও পোষণ করবার উপযুক্ত আধার সর্বসাধারণের মধ্যে না থাকাতে কেবলই তা বিকৃত ও বিলুপ্ত হতে থাকে। ঐক্যের অভাবে মানুষ বর্বর হয়, ঐক্যের শৈথিল্যে মানুষ ব্যর্থ হয়, তার কারণ সমবায়ধর্ম মানুষের সত্যধর্ম, তার শ্রেষ্ঠতার হেতু।

ঐক্যবোধের উপদেশ উপনিষদে যেমন একান্তভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এমন কোনো দেশে কোনো শাস্ত্রে হয় নি। ভারতবর্ষেই বলা হয়েছে, 'বিদ্বান্ ইতি সর্বান্তরস্থঃ স্বসংবিদ্‌রূপবিদ্ বিদ্বান্'—নিজেরই চৈতন্যকে সর্বজনের অন্তরস্থ করে যিনি জানেন তিনিই বিদ্বান্। অথচ এই ভারতবর্ষেই অসংখ্য কৃত্রিম অর্থহীন বিধি-বিধানের দ্বারা পরস্পরকে যেমন অত্যন্ত পৃথক করে জানা হয় পৃথিবীতে এমন আর কোনো দেশেই নেই। সুতরাং এ কথা বলতে হবে, ভারতবর্ষে এমন একটা বাহ্যস্থূলতা রয়ে গেছে যা ভারতবর্ষের অন্তরতর সত্যের বিরুদ্ধ, যার মর্মান্তিক আঘাত দীর্ঘকাল ধরে ভারতের ইতিহাসে প্রকাশ পাচ্ছে নানা দুঃখে দারিদ্র্যে অপমানে।

এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন, বর্তমান যুগে রামমোহন রায় তাঁদেরই অগ্রণী। এর আগেও নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছে ঐক্যবাণী। মধ্যযুগে অচল সংস্কারের পিঞ্জরদ্বার খুলে বেরিয়ে পড়েছেন প্রত্যূষের অতন্দ্রিত পাখি, গেয়েছেন তাঁরা আলোকের অভিবন্দন-গান সামাজিক জড়ত্বপুঞ্জের ঊর্ধ্ব আকাশে। তাঁরা সেই মুক্ত প্রাণের বার্তা এনেছেন, উপনিষদ যাকে সম্বোধন করে বলেছেন 'ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণ'—হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য, তুমি সংস্কারে বিজড়িত স্থাবর নও। সেই মুক্তিদূতের মধ্যে একজন ছিলেন কবীর, তিনি নিজেকে ভারতপথিক বলে জানিয়েছেন। নানা জটিল জঙ্গলের মধ্যে এই ভারতপথকে যাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আর-একজন ছিলেন দাদূ। তিনি বলেন—

> ভাইরে ঐসা পংথ হমারা
> দ্বৈপখরহিত পংথ গহি পূরা অবরণ এক অধারা।

ভাই রে, আমার পথ এই রকম, সে দুইপক্ষরহিত, বর্ণহীন, সে এক।

তিনি বলেছেন—

জাকোঁ মারণ জাইয়ে সোঈ ফিরি মারৈ,
জাকোঁ তারণ জাইয়ে সোঈ ফিরি তারৈ।

যাকে আমরা মারি সেই আমাদের ফিরে মারে, যাকে ত্রাণ
করি সেই আমাদের ফিরে ত্রাণ করে।

তিনি বলেছেন—

সব ঘট একৈ আতমা, ক্যা হিন্দু মুসলমান।

সেদিন আর-এক সাধু, ভারতের পথ যাঁর কাছে ছিল সুগোচর, তাঁর নাম রজ্জব, তিনি বলেন—

বুংদ বুংদ মিলি রস সিংধ হৈ, জুদা জুদা মরু ভায়।

অর্থাৎ বিন্দুর সঙ্গে বিন্দু যখন মেলে তখনই হয় রসসিন্ধু,
বিন্দুতে বিন্দুতে যখন পৃথক হয়ে যায় তখনই মরুভূমি প্রকাশ পায়।

এই রজ্জব বলেন—

হাথ জোড়ু গুরু সং হোঁ মিলৈ হিন্দু মুসলমান।

গুরুর কাছে আমি করজোড় করছি যেন হিন্দু মুসলমান মিলে যায়।

এই ভারতপথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায়, ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তিলাভের সাধনায়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন-সাধনায় নয়। এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ। সেই পথের পথিক আধুনিক কালে রামমোহন রায়। তিনিও প্রয়োজনের দিক থেকে নয়, মানবাত্মার গভীরে যে মিলনের ধর্ম আছে সেই নিত্য আদর্শের দিক থেকে ভারতের ইতিহাসে শুভবুদ্ধিদ্বারা সংযুক্ত মানুষের এক মহদ্‌রূপ অন্তরে দেখেছিলেন। ভারতের উদার প্রশস্ত পন্থায় তিনি সকলকেই আহ্বান করেছেন, যে পন্থায় হিন্দু মুসলমান খৃস্টান সকলেই অবিরোধে মিলতে পারে। সেই বিপুল পন্থাই যদি ভারতের না হয়, যদি আচারের কাঁটার বেড়ায় বেষ্টিত সাম্প্রদায়িক শতখণ্ডতাই হয় ভারতের নিত্যপ্রকৃতিগত, তা হলে তো আমাদের বাঁচবার কোনো উপায় নেই। ঐ তো এসেছে মুসলমান, ঐ তো এসেছে খৃস্টান—

সাধন মাহি জোগ নহি জৈ, ক্যা সাধন পরমাণ।

ঐতিহাসিক সাধনায় এদের যদি যুক্ত করতে না পারি তা হলে
সাধনার প্রমাণ হবে কিসে?

এদের অঙ্গীভূত করে নেবার প্রাণশক্তি যদি ভারতের না থাকে পাথরের মতো কঠিন পিণ্ডীভূত হয়ে এদের বাইরে ঠেকিয়ে রাখাই যদি আমাদের ধর্ম হয়, তবে সেই পুঞ্জ পুঞ্জ অসংশ্লিষ্ট অনাত্মীয়তার নিদারুণ ভার সইবে কে?

প্রতিদিন কি এরা স্খলিত হয়ে পড়ছে না দলে দলে, সমাজের নিচের স্তরে কি গর্ত প্রসারিত হচ্ছে না। আপনার লোক যখন পর হয়ে যায় তখন সে যে নিদারুণ হয়ে ওঠে তার কি প্রমাণ পাচ্ছি নে? যাদের অবজ্ঞা করি তাদের আলগা করে রাখি, যাদের ছুঁই নে তাদের ধরতে পারি নে। আপনাকে পর করবার যে সহস্র পথ প্রশস্ত করে রেখেছি সেই পথ দিয়েই শনির যত চর দেশে প্রবেশ করেছে। আমাদের বিপুল জনতরণীর তক্তাগুলিকে সাবধানে ফাঁক ফাঁক করে রাখাকেই যদি ভারতের চিরকালীন ধর্ম বলে গণ্য করি, তা হলে বাইরের তরঙ্গগুলোকে শত্রু ঘোষণা করে কেন মিছে বিলাপ করা, তা হলে বিনাশের লবণাশ্রুসমুদ্রে তলিয়ে যাওয়াকেই ভারত-ইতিহাসের চরম লক্ষ্য বলে নিশ্চেষ্ট থাকাই শ্রেয়। সেচনী দিয়ে

ক্রমাগত জল সেঁচে সেঁচে কতদিন চলবে আমাদের জীর্ণ ভাগ্যের তরী বাওয়া?

আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভ-কালেই এসেছেন রামমোহন রায়। তখন এ যুগকে কি বিদেশী কি স্বদেশী কেউ স্পষ্ট করে চিনতে পারে নি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন, এ যুগের যে আহ্বান সে সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান। তিনি জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত আপন উদার হৃদয় বিস্তার করে দেখিয়েছিলেন, সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কারও স্থানসংকীর্ণতা নেই। তাঁর সেই হৃদয় ভারতেরই হৃদয়, তিনি ভারতের সত্য পরিচয় আপনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। ভারতের সত্য পরিচয় সেই মানুষে যে মানুষের মধ্যে সকল মানুষের সম্মান আছে, স্বীকৃতি আছে।

সকল দেশেরই মধ্যে একটা বিরুদ্ধতার দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এক ভাগে তার আপন শ্রেষ্ঠতাকে আপনি প্রতিবাদ, তার অন্ধতা অহমিকা দ্বারাই তার আত্মলাঘব: এই দিকটা অভাবার্থক, এই দিকে তার ক্ষতির বিভাগ, তার কৃষ্ণপক্ষের অংশ। আর-এক দিকে তার আলোক, তার নিহিতার্থ, তার চিরসত্য; এই দিকটাই ভাবার্থক, প্রকাশাত্মক। এই দিকে তার পরিচয় যদি ম্লান না হয়, নিঃশেষিত না হয়, তবেই সর্বকালে সে গৌরবান্বিত।

য়ুরোপের সকল দেশেই একদিন ডাইনির অস্তিত্ব বিশ্বাস করত। শত শত স্ত্রীলোক সেখানে নিরপরাধে পুড়ে মরেছে। কিন্তু এই অন্ধতার দিকটাই আন্তরিক-ভাবে য়ুরোপের একান্ত ছিল না। তাই লোকগণনায় এই বিশ্বাসের প্রসার পরিমাপ করে এর দ্বারা য়ুরোপকে চিনতে গেলে অবিচার হবে। একদিন য়ুরোপের ধর্মমূঢ়বুদ্ধি জিয়োর্ডানো ব্রুনোকে পুড়িয়ে মেরেছিল, কিন্তু সেদিন চিতায় জ্বলতে জ্বলতে একলা জিয়োর্ডানো দিয়েছিলেন য়ুরোপীয় চিত্তের পরিচয়, যে চিত্তকে সে যুগের সাম্প্রদায়িক জড়বুদ্ধি দল বেঁধে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু যাকে আজ সর্বমানব সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে। একদিন ইংরেজের সাহিত্যে, তার ইতিহাসে, ইংরেজের পরিচয় আমরা পেয়েছিলুম; দেখেছিলুম মানুষের প্রতি তার মৈত্রী, দাসপ্রথার 'পরে তার ঘৃণা, পরাধীনের মুক্তির জন্যে তার অনুকম্পা, ন্যায়বিচারের প্রতি তার নিষ্ঠা। আজ যদি ভারতের রাষ্ট্রাসন জুড়ে তার এই স্বভাবের নিষ্ঠুর প্রতিবাদ অজস্র দেখতে পাই তবু তার থেকে ইংরেজের চরম পরিচয় গ্রহণ করা সত্য হবে না। যে কারণেই হোক তার অভাবার্থক দিকটা প্রবল হয়ে উঠেছে, এসমস্ত তারই দুর্লক্ষণ। আজও ইংলন্ডে এমন মানুষ আছে ইংরেজ-স্বভাবের বিরুদ্ধগামী সমস্ত অন্যায় যাদের হৃদয়কে পীড়িত করছে। বস্তুত সব ইংরেজই যে ইংরেজ এ কথাটা মনে করাই ভুল। খাঁটি ইংরেজের সংখ্যা স্বল্প যদি-বা হয়, আর নিজের সমাজে তারা যদি-বা লাঞ্ছনা ভোগ করে, তবুও তারা সমস্ত ইংরেজেরই প্রতিনিধি।

তেমনি একদা যেদিন বাংলাদেশে প্রগাঢ় অন্ধতা, কৃত্রিমতা, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে রামমোহন রায়ের আগমন হল সেদিন এই বিমুখ দেশে তিনিই একলা ভারতের নিত্য পরিচয় বহন করে এসেছেন। তাঁর সর্বতোমুখী বুদ্ধি ও সর্বতঃপ্রসারিত হৃদয় সেদিনকার এই বাংলাদেশের অখ্যাত কোণে দাঁড়িয়ে সকল মানুষের জন্যে আসন পেতে দিয়েছিল। এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলবার দিন এসেছে যে, যে আতিথ্যভ্রষ্ট আসন কৃপণঘরের রুদ্ধ কোণের জন্যে সে আসন নয়, যে আসনে সর্বজন অবাধে স্থান পেতে পারে সেই উদার আসনই চিরন্তন ভারতবর্ষের স্বরচিত: লক্ষ লক্ষ আচারবাদী তাকে যদি সংকুচিত করে, খণ্ড খণ্ড করে, সমস্ত

পৃথিবীর কাছে স্বদেশকে ধিক্‌কৃত করে ভারতসভ্যতার প্রতিবাদ করে তবু বলব এ কথা সত্য। মানুষের ঐক্যের বার্তা রামমোহন রায় একদিন ভারতের বাণীতেই ঘোষণা করেছিলেন, এবং তাঁর দেশবাসী তাঁকে তিরস্কৃত করেছিল— তিনি সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন মুসলমানকে, খৃস্টানকে, ভারতের সর্বজনকে হিন্দুর এক পঙ্‌ক্তিতে ভারতের মহা অতিথিশালায়। যে ভারত বলেছে—

> যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
> সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।
>
> যিনি সকলের মধ্যে আপনাকে, আপনার মধ্যে সকলকে দেখেন, তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না।

তাঁর মৃত্যুর পরে আজ একশত বৎসর অতীত হল। সেদিনকার অনেক কিছুই আজ পুরাতন হয়ে গেছে, কিন্তু রামমোহন রায় পুরাতত্ত্বের অস্পষ্টতায় আবৃত হয়ে যান নি। তিনি চিরকালের মতোই আধুনিক। কেননা তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তার এক সীমা পুরাতন ভারতে, কিন্তু সেই অতীতকালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই—তার অন্য দিক চলে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবীকালের অভিমুখে। তিনি ভারতের সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিত্তকে মুক্তি দিতে পেরেছেন যা জ্ঞানের পথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মুক্ত। তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামী কালে, যে কালে ভারতের মহা ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু মুসলমান খৃস্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়। বায়ুপোতে অত্যূর্ধ্ব আকাশে যখন ওঠা যায় তখন দৃষ্টিচক্র যতদূর প্রসারিত হয়, তার এক দিকে থাকে যে দেশকে বহুদূরে অতিক্রম করে এসেছি, আর-এক দিক থাকে সম্মুখে যা এখনও আছে বহুযোজন দূরে। রামমোহন যে কালে বিরাজ করেন সে কাল তেমনি অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত, আমরা তাঁর সেই কালকে আজও উত্তীর্ণ হতে পারি নি।

আজ আমার অধিক বলবার শক্তি নেই, কেবল এই কথা মাত্র বলতে এসেছি যে, যদিও অজ্ঞানের অশক্তির জগদ্দল পাথর ভারতের বুকে চেপে আছে, লজ্জায় আমরা সংকুচিত, দুঃখে আমাদের দেহমন জীর্ণ, অপমানে আমাদের মাথা অবনত, বিদেশের পথিক আমাদের কলঙ্ক কুড়িয়ে নিয়ে দেশে দেশে নিন্দাপণ্যের ব্যাবসা চালাচ্ছে, তবু আমাদের সকল দুর্গতির উপরে সর্বোচ্চ আশার কথা এই যে, রামমোহন রায় এ দেশে জন্মেছেন, তাঁর মধ্যে ভারতের পরিচয়। তাঁকে দেশের বহুজনে সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র অহমিকায় যদি অবজ্ঞা করে, আপন বলে স্বীকার না করে, তবুও চিরকালের ভারতবর্ষ তাঁকে গভীর অন্তরে নিশ্চিত স্বীকার করেছে। বর্তমান যুগ-রচনায় আজও তাঁর প্রভাব ক্রিয়াশালী, আজও তাঁর নীরব কণ্ঠ ভারতের অমর বাণীতে আহ্বান করছে তাঁকে—

> য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
> বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি
> বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ।

প্রার্থনা করছে—

> স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

১৪ পৌষ ১৩৪০। রামমোহন-মৃত্যু-শতবার্ষিকীতে সভাপতির অভিভাষণ

২

আমাদের প্রাণ বিদ্রোহী। চারি দিকে জড়দানব তার প্রকাণ্ড শক্তি ও অসংখ্য বাহু বিস্তার করে বসে আছে। ক্ষুদ্র প্রাণ প্রতি মুহূর্তে নানা দিক থেকে তাকে নিরস্ত করে তবে আত্মপ্রকাশ করে। এই জড় তার চারি দিকে ক্লান্তির প্রাচীর তুলে তুলে তার প্রয়াসের পরিধিকে কেবলই সংকীর্ণ করে আনতে চায়। বারংবার এই প্রাচীরকে ভেঙে ভেঙে তবে প্রাণ আপন অধিকার রক্ষা করতে পারে। তাই আমাদের হৃৎপিণ্ড দিনে রাত্রে এক মুহূর্ত ছুটি নিতে পারে না, গুরুতর বস্তু-পুঞ্জের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে তার আক্রমণ ক্ষান্ত হলেই মৃত্যু।

প্রাণের এই নিত্য সচেষ্টতাতেই যেমন প্রাণের আত্মপ্রকাশ, মনেরও তাই। তার অনন্ত জিজ্ঞাসা। চার দিকে সত্যের রহস্য মূক হয়ে আছে। আপন শক্তিতে উত্তর আদায় করতে হয়। অল্প অনবধান হলেই ভুল উত্তর পাই। সেই ভুল উত্তরগুলিকে নিশ্চেষ্ট নিঃসংশয়ে স্বীকার করে নিলেই মনের সাংঘাতিক পরাভব। জিজ্ঞাসার শৈথিল্যেই মনের জড়ত্ব। যেমন জীবনীশক্তির নিরুদ্যমেই অস্বাস্থ্য, তাতেই যত রোগের উৎপত্তি, বিনাশের আয়োজন, তেমনি মননশক্তির অবসাদ ঘটলেই মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে যত রকমের বিকার প্রবেশ করে। সত্যমিথ্যা ভালোমন্দ সমস্ত কিছুকেই বিনাপ্রশ্নে অলস ভীরু মন যখন মেনে নিতে থাকে তখনই মনুষ্যত্বের সকল প্রকার দুর্গতি। জড়ের মধ্যে যে অচল মূঢ়তা, মানুষের মন যখনই তার সঙ্গে আপোষে সন্ধি করে তখন থেকে জগতে মানুষ মন-মরা হয়ে থাকে, জড় রাজার খাজনা জুগিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে একদিন মনের স্বরাজ গিয়েছে ধ্বংস হয়ে। পঙ্গু মনের ছিল না আত্মকর্তৃত্ব, প্রশ্ন করবার শক্তি ও ভরসা সে হারিয়েছিল। সে যা শুনেছে তাই মেনেছে, যে বুলি তার কানে দেওয়া হয়েছে সেই বুলিই সে আউড়িয়েছে। যখন কোনো উৎপাত এসে পড়েছে স্কন্ধে তখন তাকে বিধিলিপি বলে নিয়েছে মেনে। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নূতন প্রণালীতে বর্তমানকালীন সংসারসমস্যার সমাধান করা তার অধিকারবহির্ভূত বলে স্বীকার করার দ্বারা আত্মাবমাননায় তার সংকোচ ছিল না। মনের আত্মপ্রকাশের ধারা সেদিন এ দেশে অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেশ তখন সামনের কালের দিকে চলে নি, পিছনের কালকেই ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করেছে—চিন্তাশক্তি যেটুকু বাকি ছিল সে অনুসন্ধান করতে নয়, অনুসরণ করবার জন্যেই।

সুপ্তি যখন আবিষ্ট করে তখনই চুরি যাবার সময়। অন্তরের মধ্যে যখন অসাড়তা, বাইরের বিপদ তখনই প্রবল। চিত্তের মধ্যে যার স্বাধীনতা নেই বাইরের দিক থেকে সে কখনোই স্বাধীন হতে পারে না। অন্তরের দিকে সব কিছুকে যে অবিসম্বাদে মেনে নেয়, বাইরে অন্যায় প্রভুত্বকেও না মানবার শক্তি তার থাকে না—যে বুদ্ধি অসত্যকে ঠেকায় মনে, সেই বুদ্ধিই অমঙ্গলকে ঠেকায় বহিঃসংসারে—নির্জীব মন অন্তরে বাহিরে কোনো আক্রমণকেই ঠেকাতে পারে না। তাই সেদিনকার ভারতের ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেল ভারতবর্ষ তার মর্মান্তিক পরাভবকে মেনে নিলে আর সেই সঙ্গে মেনে নিলে যা না-মানবার এমন হাজার হাজার জিনিস। এই-যে তার বাইরের দুর্দশার বোঝা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো, এ তার অন্তরের অবুদ্ধির বোঝারই সামিল।

যখন আমাদের আর্থিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি মোহাবৃত, সৃষ্টিশক্তি আড়ষ্ট, বর্তমান যুগের কোনো প্রশ্নের নূতন উত্তর দেবার মতো বাণী যখন আমাদের ছিল না, আপন চিত্তদৈন্য সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো চেতনাও যখন দুর্বল, সেই দুর্গতির দিনেই রামমোহন রায়ের এ দেশে আবির্ভাব। প্রবল শক্তিতে তিনি আঘাত করেছিলেন সেই দুরবস্থার মূলে, যা মানুষের পরম সম্পদ স্বাধীনবুদ্ধিকে অবিশ্বাস করেছে। কিন্তু, তখন আমরা সেই দুরবস্থার কারণকেই পূজা করতে অভ্যস্ত, তাই সেদিন আমরাও তাঁকে শত্রু বলে দণ্ড উদ্যত করেছি। ডাক্তার বলেন, রোগ জিনিসটা দেহের অধিকার সম্বন্ধে দীর্ঘকালের দলিল দাখিল করলেও সে বাইরের আগন্তুক, স্বাস্থ্যতত্ত্বই দেহের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্য। রামমোহন রায় তেমনি করেই বলেছিলেন আমাদের অজ্ঞানকে, আমাদের অন্ধতাকে কালের গণনায় সনাতন বলি, কিন্তু সত্যের দিক থেকে তাই আমাদের অনাত্মীয় আগন্তুক। তিনি দেখিয়েছিলেন, আমাদের দেশের অন্তরাত্মার মধ্যেই কোথায় আছে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চিরপুরাতন চিরনূতন প্রতিষ্ঠা: মনের স্বাস্থ্যকে—আত্মার শক্তিকে—প্রবল করবার জন্যে, উজ্জ্বল করবার জন্যে, ভারতের একান্ত আপন যে সাধনসম্পদের ভাণ্ডার তারই দ্বার তিনি খুলে দিয়েছিলেন; সেদিনকার জনতা তাঁকে শত্রু বলে ঘোষণা করেছিল।

আজও কি রামমোহনকে আমরা শত্রু বলে অসম্মান করতে পারি। যার গৌরবে দেশ বিশ্বের কাছে আপন গৌরবের পরিচয় দিতে পারে এমন লোক কি আমাদের অনেক আছে। দেশের যথার্থ মহাপুরুষের নামে গৌরব করার অর্থই দেশের ভবিষ্যতের জন্যেই আশা করা। সে গৌরব প্রাদেশিক হলে, সাময়িক হলে, তার উপরে নির্ভর করা চলে না। সে গৌরব এমন হওয়া চাই সমস্ত পৃথিবী যার সমর্থন করে। রামমোহনের চিত্ত, তাঁর হৃদয়, স্থানিক ও ক্ষণিক পরিধিতে বদ্ধ ছিল না। যদি থাকত তবে দেশের সাধারণ লোকে অনায়াসে তাঁকে সমাদর করতে পারত। কারণ, যে মানদণ্ড আমাদের নিত্য ব্যবহারের দ্বারা সুপরিচিত তা বিশেষ দেশকালের, তা সর্বদেশ ও চিরন্তন কালের নয়। কিন্তু সেই পরিমাপের দ্বারা পরিমিত গৌরবের জোরে দেশ মাথা তুলতে পারবে না, সর্বদেশকালের সর্বলোকের কাছে তাকে আত্মপ্রকাশ করাতে পারবে না। তার মহত্ত্বকে নিম্নভূমিবর্তী জনতার আদর্শকে অনেক উপরে ছাড়িয়ে উঠতে হবে। তাতে করে বর্তমানকালের সাম্প্রতিক রুচি বিশ্বাস ও আচার তাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো আঘাত চিরন্তন আদর্শের আঘাত। দিঙ্‌নাগাচার্যের স্থূলহস্তের আঘাত, সেই উপস্থিত মুহূর্তে নিজেই সদ্যোধ্বংসোন্মুখ, কিন্তু ভারতীয় সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের আঘাত শাশ্বত কালের। সে আঘাতে যারা বিলুপ্ত হয়েছে তাদের সমসাময়িক জয়ধ্বনির তারস্বর মহাকালের মহাকাশে ক্ষীণতম স্পন্দনও রাখে নি।

ক্ষণিক অনাদরের তুফানে যাদের নাম তলিয়ে যায় রামমোহন রায় তো সেই শ্রেণীর লোক নন। বিস্মৃতি বা উপেক্ষার কুহেলিকা তাঁর স্মৃতিকে কিছুকালের জন্য আচ্ছন্ন রাখলেও সে আবরণ কেটে যাবেই। দেশে আজ নবজাগরণের হাওয়া যখন দিয়েছে, সরে যাচ্ছে বাষ্পের অন্তরাল, তখন সর্বপ্রথমেই দেখা যাবে রামমোহনের মহোচ্চ মূর্তি। নবযুগের উদ্‌বোধনের বাণী দেশের মধ্যে তিনিই তো প্রথম এনেছিলেন, সেই বাণী এই দেশেরই পুরাতন মন্ত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল; সেই মন্ত্রে তিনি বলেছিলেন 'অপাবৃণু', হে সত্য, তোমার আবরণ অপাবৃত করো। ভারতের এই বাণী কেবল স্বদেশের জন্যে নয়, সকল দেশের সকল কালের জন্যে।

এই কারণেই ভারতবর্ষের সত্য যিনি প্রকাশ করবেন তাঁরই প্রকাশের ক্ষেত্র সর্বজনীন। রামমোহন রায় সেই সর্বকালের মানুষ। আমরা গর্ব করতে পারি স্থানিক ও সাময়িক ক্ষুদ্র মাপের বড়োলোককে নিয়ে, কিন্তু যাঁদের নিয়ে গৌরব করতে পারি তাঁরা 'পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ'। তাঁদের মহিমা পূর্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রকে স্পর্শ করে আছে।

ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ের যাঁরা পূর্ববর্তী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবীর নিজেকে বলেছিলেন ভারতপথিক। ভারতকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মহাপথরূপে। এই পথে ইতিহাসের আদিকাল থেকে চলমান মানবের ধারা প্রবাহিত। এই পথে স্মরণাতীত কালে এসেছিল যারা, তাদের চিহ্ন ভূগর্ভে। এই পথে এসেছিল হোমাগ্নি বহন করে আর্যজাতি। এই পথে একদা এসেছিল মুক্তিতত্ত্বের আশায় চীনদেশ থেকে তীর্থযাত্রী। আবার কেউ এসেছে সাম্রাজ্যের লোভে, কেউ এল অর্থকামনায়। সবাই পেয়েছে আতিথ্য। এ ভারতে পথের সাধনা, পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে যাওয়া-আসার নেওয়া-দেওয়ার সম্বন্ধ, এখানে সকলের সঙ্গে মেলবার সমস্যা সমাধান করতে হবে। এই সমস্যার সমাধান যতক্ষণ না হয়েছে ততক্ষণ আমাদের দুঃখের অন্ত নেই। এই মিলনের সত্য সমস্ত মানুষের চরম সত্য, এই সত্যকে আমাদের ইতিহাসে অঙ্গীভূত করতে হবে। রামমোহন রায় ভারতের এই পথের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ভারতের যা সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাই নিয়ে। তাঁর হৃদয় ছিল ভারতের হৃদয়ের প্রতীক—সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান সকলে মিলেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ সত্তায়, সেই মেলবার আসন ছিল ভারতের মহা ঐক্যতত্ত্ব, একমেবাদ্বিতীয়ম্। আধুনিক যুগে মানবের ঐক্যবাণী যিনি বহন করে এনেছেন, তাঁরই প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ভারতের আধুনিক কবি ভারতপথের যে গান গেয়েছে তাই উদ্‌ধৃত করে রামমোহনের প্রশস্তি শেষ করি—

> হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
> এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।...
>
> হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওংকারধ্বনি,
> হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি।
> তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
> বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
> সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
> হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
> এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥
>
> এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
> এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
> এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
> এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
> মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
> মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
> সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
> আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

রামমোহন-মৃত্যু-শতবার্ষিকীর শেষ বক্তৃতা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূজনীয় পিতৃদেবের আজ অষ্টাশীতিতম সাংবৎসরিক জন্মোৎসব। এই উৎসব-দিনের পবিত্রতা আমরা বিশেষভাবে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিব।

বহুতর দেশকে সঞ্জীবনস্পর্শে উর্বর করিয়া, পুণ্যধারায় বহুতর গ্রামনগরীর পিপাসা মিটাইয়া, অবশেষে জাহ্নবী যেখানে মহাসমুদ্রের প্রত্যক্ষসম্মুখে আপন সুদীর্ঘ পর্যটন অতলস্পর্শ-শান্তির মধ্যে সমাপ্ত করিতে উদ্যত হন, সেই সাগর-সংগমস্থল তীর্থস্থান। পিতৃদেবের পূতজীবন অদ্য আমাদের সম্মুখে সেই তীর্থস্থান অবারিত করিয়াছে। তাঁহার পুণ্যকর্মরত দীর্ঘজীবনের একাগ্রধারা অদ্য যেখানে তটহীন সীমাশূন্য বিপুল বিরামসমুদ্রের সম্মুখীন হইয়াছে সেইখানে আমরা ক্ষণ-কালের জন্য নতশিরে স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইব। আমরা চিন্তা করিয়া দেখিব. বহুকাল পূর্বে একদিন স্বর্গ হইতে কোন্ শুভ সূর্যকিরণের আঘাতে অকস্মাৎ সুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া কঠিন তুষারবেষ্টনকে অশ্রুধারায় বিগলিত করিয়া এই জীবন আপন কল্যাণযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল—তখন ইহার ক্ষীণ স্বচ্ছ ধারা কখনও আলোক কখনও অন্ধকার, কখনও আশা কখনও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া দুর্গমপথ কাটিয়া চলিতেছিল। বাধা প্রতিদিন বৃহদাকার হইয়া দেখা দিতে লাগিল—কঠিন প্রস্তরপিণ্ডসকল পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু সে-সকল বাধায় স্রোতকে রুদ্ধ না করিতে পারিয়া দ্বিগুণবেগে উদ্‌বেল করিয়া তুলিল—দুঃসাধ্য দুর্গমতা সেই দুর্বার বলের নিকট মস্তক নত করিয়া দিল। এই জীবনধারা ক্রমশ বৃহৎ হইয়া, বিস্তৃত হইয়া, লোকালয়ের মধ্যে অবতরণ করিল; দুই কূলকে নবজীবনে অভিষিক্ত করিয়া চলিল; বাধা মানিল না, বিশ্রাম করিল না, কিছুতেই তাহাকে লক্ষ্য হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল না—অবশেষে আজ সেই একনিষ্ঠ অনন্যপরায়ণ জীবনস্রোত সংসারের দুই কূলকে আচ্ছন্ন করিয়া, অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে—আজ সে তাহার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত চাঞ্চল্যকে পরমপরিণামের সম্মুখে প্রশান্ত করিয়া পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জনের দিকে আপনাকে প্রসারিত করিয়াছে—অনন্ত জীবনসমুদ্রের সহিত সার্থক জীবনধারার এই সুগম্ভীর সম্মিলনদৃশ্য অদ্য আমাদের ধ্যাননেত্রের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া আমাদিগকে ধন্য করুক।

অমৃতপিপাসা ও অমৃতসন্ধানের পথে ঐশ্বর্য একটি প্রধান অন্তরায়। সামান্য সোনার প্রাচীর উচ্চ হইয়া উঠিয়া আমাদের দৃষ্টি হইতে অনন্ত আকাশের অমৃত-আলোককে রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতে পারে। ধনসম্পদের মধ্যেই দীনহৃদয় আপনার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে থাকে—সে বলে, এই তো আমি কৃতার্থ হইয়াছি, দশে আমার স্তব করিতেছে, দেশে আমার প্রতাপ বিকীর্ণ হইতেছে, বাহিরে আমার আড়ম্বর অভ্রভেদ করিতেছে, ঘরে আমার আরামশয়ন প্রতিদিন স্তরে স্তরে রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে, আমার আর কী চাই। হায় রে দরিদ্র, নিখিল মানবের অন্তরাত্মা যখন ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছে—যাহাতে আমি অমর না হইব, তাহা লইয়া আমি কী করিব—'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্'—সপ্তলোক যখন অন্তরীক্ষে ঊর্ধ্বকররাজি প্রসারিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছে, আমাকে সত্য দাও, আলোক দাও, অমৃত দাও, 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়'—তখন তুমি বলিতেছ আমার ধন আছে, আমার মান আছে, আমার আরাম আছে, আমি প্রভু, আমি অধিপতি, আমার আর কী চাই! ঐশ্বর্যের ইহাই

বিড়ম্বনা— দীনাত্মার কাছে ঐশ্বর্যই চরমসার্থকতার রূপ ধারণ করে। অদ্যকার উৎসবে আমরা যাঁহার মাহাত্ম্য স্মরণ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি—একদা প্রথম যৌবনেই তাঁহার অধ্যাত্মদৃষ্টি এই কঠিন ঐশ্বর্যের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া অনন্তের দিকে উন্মীলিত হইয়াছিল—যখন তিনি ধনমানের দ্বারা নীরন্ধ্র ভাবে আবৃত আচ্ছন্ন ছিলেন, তখনই ধনসম্পদের স্থূলতম আবরণ ভেদ করিয়া, স্তাবক-গণের বন্দনাগানকে অধঃকৃত করিয়া, আরাম-আমোদ-আড়ম্বরের ঘন যবনিকা বিচ্ছিন্ন করিয়া এই অমৃতবাণী তাঁহার কর্ণে কেমন করিয়া প্রবেশলাভ করিল যে, 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্'—যাহা কিছু সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন দেখিবে, ধনের দ্বারা নহে, স্বার্থের দ্বারা নহে, আত্মাভিমানের দ্বারা নহে—যিনি 'ঈশানং ভূতভব্যস্য' —যিনি আমাদের অনন্তকালের ঈশ্বর, আমাদের ভূতভবিষ্যতের প্রভু—তাঁহাকে এই ধনিসন্তান কেমন করিয়া মুহূর্তের মধ্যে ঐশ্বর্যপ্রভাবের ঊর্ধ্বে, সমস্ত প্রভুত্বের উচ্চে আপনার একমাত্র প্রভু বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন—সংসারের মধ্যে তাঁহার নিজের প্রভুত্ব, সমাজের মধ্যে তাঁহার ধনমর্যাদার সম্মান, তাঁহাকে অন্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না।

আবার যেদিন এই প্রভূত ঐশ্বর্য অকস্মাৎ এক দুর্দিনের বজ্রাঘাতে বিপুল আয়োজন আড়ম্বর লইয়া তাঁহার চতুর্দিকে সশব্দে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল—ঋণ যখন মুহূর্তের মধ্যেই বৃহদাকার ধারণ করিয়া তাঁহার গৃহদ্বার, তাঁহার সুখসমৃদ্ধি, তাঁহার অশনবসন, সমস্তই গ্রাস করিবার উপক্রম করিল— তখনও পদ্ম যেমন আপন মৃণালবৃন্ত দীর্ঘতর করিয়া জলপ্লাবনের ঊর্ধ্বে আপনাকে সূর্যকিরণের দিকে নির্মল সৌন্দর্যে উন্মেষিত করিয়া রাখে, তেমনি করিয়া তিনি সমস্ত বিপদ্‌বন্যার ঊর্ধ্বে আপনার অম্লানহৃদয়কে ধ্রুবজ্যোতির দিকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া রাখিলেন। সম্পদ যাঁহাকে অমৃতলাভ হইতে তিরস্কৃত করিতে পারে নাই, বিপদ্‌ও তাঁহাকে অমৃতসঞ্চয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারিল না। সেই দুঃসময়কেই তিনি আত্ম-জ্যোতির দ্বারা সুসময় করিয়া তুলিয়াছিলেন—যখন তাঁহার ধনসম্পদ ধূলিশায়ী তখনই তিনি তাঁহার দৈন্যের ঊর্ধ্বে দণ্ডায়মান হইয়া পরমাত্মসম্পদ্‌বিতরণের উপলক্ষে সমস্ত ভারতবর্ষকে মুহুর্মুহু আহ্বান করিতেছিলেন। সম্পদের দিনে তিনি ভুবনেশ্বরের দ্বারে রিক্ত হস্তে ভিক্ষু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বিপদের দিনে তিনি আত্মৈশ্বর্যের গৌরবে ব্রহ্মসত্র খুলিয়া বিশ্বপতির প্রসাদসুধাবণ্টনের ভারগ্রহণ করিয়া ছিলেন।

ঐশ্বর্যের সুখশয্যা হইতে তুলিয়া লইয়া ধর্ম ইঁহাকে তাহার পথের মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিল—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'— কবিরা বলেন, সেই পথ ক্ষুরধারানিশিত অতি দুর্গম পথ। লোকাচারপ্রচলিত চিরাভ্যস্ত ধর্ম, আরামের ধর্ম, তাহা অন্ধভাবে, জড়ভাবেও পালন করিয়া যাওয়া চলে, এবং তাহা পালন করিয়া লোকের নিকট সহজেই যশোলাভ করিতে পারা যায়। ধর্মের সেই আরাম, সেই সম্মানকেও পিতৃদেব পরিহার করিয়াছিলেন। ক্ষুরধারনিশিত দুরতিক্রম্য পথেই তিনি নির্ভয়ে পদনিক্ষেপ করিলেন। লোক-সমাজের আনুগত্য করিতে গিয়া তিনি আত্মবিদ্রোহী, আত্মঘাতী হইলেন না।

ধনিগৃহে যাঁহাদের জন্ম, পৈতৃককাল হইতেই সমাজের নিকট সম্মানলাভে যাঁহারা অভ্যস্ত, সমাজপ্রচলিত সংস্কারের নিবিড়ব্যূহ ভেদ করিয়া নিজের অন্তর্লব্ধ সত্যের পতাকাকে শত্রুমিত্রের ধিক্কার লাঞ্ছনা ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অবিচলিত দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া রাখা তাঁহাদের পক্ষে কোনোমতেই সহজ নহে— বিশেষত

বৈষয়িক সংকটের সময় সকলের আনুকূল্য যখন অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে তখন তাহা যে কিরূপ কঠিন, সে কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সেই তরুণবয়সে, বৈষয়িক দুর্যোগের দিনে, সম্ভ্রান্তসমাজে তাঁহার যে বংশগত প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, পিতৃদেব ভারতবর্ষের ঋষিবন্দিত চিরন্তন ব্রহ্মের, সেই অপ্রতিম দেবাদিদেবের আধ্যাত্মিক পূজা প্রতিকূল সমাজের নিকট মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন।

তাহার পরে তাঁহার জীবনে আর-এক গুরুতর সংগ্রামের দিন উপস্থিত হইল। সকলেই জানেন, বৈচিত্র্যই জগতে ঐক্যকে প্রমাণ করে—বৈচিত্র্য যতই সুনির্দিষ্ট হয়, ঐক্য ততই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ধর্মও সেইরূপ নানা সমাজের ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া, নানা বিভিন্নকণ্ঠে নানা বিচিত্র আকারে এক নিত্যসত্যকে চারি দিক হইতে সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষ বিশেষ সাধনায় বিশেষভাবে যাহা লাভ করিয়াছে, তাহার ভারতবর্ষীয় আকার বিলুপ্ত করিয়া, তাহাকে ভারত-বর্ষের ইতিহাস হইতে উৎপাটিত করিয়া, তাহাকে অন্যদেশীয় আকৃতি-প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে জগতের ঐক্যমূলক বৈচিত্র্যের ধর্মকে লঙ্ঘন করা হয়। প্রত্যেক লোক যখন আপনার প্রকৃতি-অনুসারে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করে তখনই সে মনুষ্যত্বলাভ করে—সাধারণ মনুষ্যত্ব ব্যক্তিগত বিশেষত্বের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। মনুষ্যত্ব হিন্দুর মধ্যে এবং খৃস্টানের মধ্যে বস্তুত একই, তথাপি হিন্দু-বিশেষত্ব মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ সম্পদ, এবং খৃস্টান-বিশেষত্বও মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ লাভ—তাহার কোনোটা সম্পূর্ণ বর্জন করিলে মনুষ্যত্ব দৈন্যপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষের যাহা শ্রেষ্ঠধন তাহাও সার্বভৌমিক, য়ুরোপের যাহা শ্রেষ্ঠধন তাহাও সার্বভৌমিক; তথাপি ভারতবর্ষীয়তা এবং য়ুরোপীয়তা উভয়ের স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে বলিয়া উভয়কে একাকার করিয়া দেওয়া চলে না। মেঘ আকাশ হইতে জলবর্ষণ করে এবং সরোবর ভূতলে থাকিয়া জলদান করে—যদিও দানের সামগ্রী একই, তথাপি এই পার্থক্যবশতই মেঘ আপন প্রকৃতি-অনুসারে বিশেষভাবে ধন্য এবং সরোবরও আপন প্রকৃতি-অনুসারে বিশেষভাবে কৃতার্থ। ইহারা উভয়ে এক হইয়া গেলে জলের পরিমাণ মোটের উপর কমে না, কিন্তু জগতে ক্ষতির কারণ ঘটে।

তরুণ ব্রাহ্মসমাজ যখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে এই কথা ভুলিয়াছিল, যখন ধর্মের স্বদেশীয় রূপ রক্ষা করাকে সে সংকীর্ণতা বলিয়া জ্ঞান করিত, যখন সে মনে করিয়াছিল বিদেশীয় ইতিহাসের ফল ভারতবর্ষীয় শাখায় ফলাইয়া তোলা সম্ভবপর এবং সেই চেষ্টাতেই যথার্থভাবে ঔদার্যরক্ষা হয়, তখন পিতৃদেব সার্ব-ভৌমিক ধর্মের স্বদেশীয় প্রকৃতিকে একটা বিমিশ্রিত একাকারত্বের মধ্যে বিসর্জন দিতে অস্বীকার করিলেন—ইহাতে তাঁহার অনুবর্তী অসামান্যপ্রতিভাশালী ধর্মোৎসাহী অনেক তেজস্বী যুবকের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল। এই বিচ্ছেদ স্বীকার করিতে যে দৃঢ়তা, যে সাহস, যে বলের প্রয়োজন হয়, সমস্ত মতামতের কথা বিস্মৃত হইয়া আজ তাহাই যেন আমরা স্মরণ করি। আধুনিক হিন্দুসমাজের প্রচলিত লোকাচারের প্রবল প্রতিকূলতার মুখে আপন অনুবর্তী সমাজের ক্ষমতাশালী সহায়কগণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে সকল দিক হইতেই রিক্ত করিতে কে পারে, যাঁহার অন্তঃকরণ জগতের আদিশক্তির অক্ষয় নির্ঝরধারায় অহরহ পূর্ণ হইয়া না উঠিতেছে।

ইঁহাকে যেমন আমরা সম্পদে-বিপদে অভয়-আশ্রয়ে অবিচলিত দেখিয়াছি,

তেমনি একবার বর্তমান সমাজের প্রতিকূলে, আর-একবার হিন্দুসমাজের অনুকূলে তাঁহাকে সত্যে বিশ্বাসে দৃঢ় থাকিতে দেখিলাম— দেখিলাম, উপস্থিত গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কা তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। হিন্দুসমাজের মধ্যে তিনি পরম দুর্দিনেও একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজে তিনি নব আশা, নব উৎসাহের অভ্যুদয়ের মুখে পুনর্বার সমস্ত ত্যাগ করিয়া একাকী দাঁড়াইলেন। তাঁহার কেবল এই প্রার্থনা রহিল, 'মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ'— আমি ব্রহ্মকে ত্যাগ করিলাম না, ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ না করুন।

ধনসম্পদের স্বর্ণস্তূপরচিত ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া নবযৌবনের অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তির পরিবেষ্টনের মধ্যে দিব্যজ্যোতি যাঁহার ললাটস্পর্শ করিয়াছিল, ঘনীভূত বিপদের ভ্রূকুটিকুটিল রুদ্রচ্ছায়ায় আসন্ন দারিদ্র্যের উদ্যত বজ্রদণ্ডের সম্মুখেও ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখচ্ছবি যাঁহার অনিমেষ অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে অচঞ্চল ছিল, দুর্দিনের সময়েও সমস্ত লোকভয় অতিক্রম করিয়া যাঁহার কর্ণে ধর্মের 'মা ভৈঃ' বাণী সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল বলবুদ্ধি দলপুষ্টির মুখে যিনি বিশ্বাসের বলে সমস্ত সহায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিঃসংকোচে পরমসহায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, অদ্য তাঁহার পুণ্যচেষ্টাভূয়িষ্ঠ সুদীর্ঘ জীবনদিনের সায়াহ্নকাল সমাগত হইয়াছে। অদ্য তাঁহার ক্লান্তকণ্ঠের স্বর ক্ষীণ, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণপ্রায় জীবনের নিঃশব্দবাণী সুস্পষ্টতর; অদ্য তাঁহার ইহজীবনের কর্ম সমাপ্ত, কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী কর্মচেষ্টার মূলদেশ হইতে যে একাগ্রনিষ্ঠা ঊর্ধ্বলোকে উঠিয়াছে তাহা আজ নিস্তব্ধভাবে প্রকাশমান। অদ্য তিনি তাঁহার এই বৃহৎ সংসারের বহির্দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু সংসারের সমস্ত সুখদুঃখ বিচ্ছেদমিলনের মধ্যে যে অচলা শান্তি জননীর আশীর্বাদের ন্যায় চিরদিন তাঁহার অন্তরে ধ্রুব হইয়া ছিল, তাহা দিনান্তকালের রমণীয় সূর্যাস্তচ্ছটার ন্যায় অদ্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উদ্‌ভাসিত। কর্মশালায় তিনি তাঁহার জীবনেশ্বরের আদেশপালন করিয়া অদ্য বিরামশালায় তিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বরের সহিত নির্বাধমিলনের পথে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এই পুণ্যক্ষণে আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য, তাঁহার সার্থক-জীবনের শান্তিসৌন্দর্যমণ্ডিত শেষ রশ্মিচ্ছটা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি।

বন্ধুগণ, যাঁহার জীবন আপনাদের জীবনশিখাকে ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল করিয়াছে, যাঁহার বাণী অবসাদের সময় আপনাদিগকে বল ও বিষাদের সময় আপনাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছে তাঁহার জন্মদিনকে উৎসবের দিন করিয়া আপনারা ভক্তিকে চরিতার্থ করিতে আসিয়াছেন— এইখানে আমি পুত্রসম্বন্ধ লইয়া এই উৎসবদিনে যদি ক্ষণকালের জন্য পিতার নিকট বিশেষভাবে উপস্থিত হই, তবে আমাকে মার্জনা করিবেন। সন্নিকটবর্তী মহাত্মাকে সমগ্রভাবে সম্পূর্ণভাবে দেখিবার অবসর আত্মীয়দের প্রায় ঘটে না। সংসারের সম্বন্ধ— বিচিত্র সম্বন্ধ, বিচিত্র স্বার্থ, বিচিত্র মত, বিচিত্র প্রবৃত্তি— ইহার দ্বারা বিচারশক্তির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কঠিন হয়, ছোটো জিনিস বড়ো হইয়া উঠে, অনিত্য জিনিস নিত্য জিনিসকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সংসারের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে প্রকৃত পরিচয় প্রত্যহ খণ্ডিত হইয়া যায়। এইজন্যই পিতৃদেবের এই জন্মদিনের উৎসব তাঁহার আত্মীয়দের পক্ষে একটি বিশেষ শুভ অবসর। যে পরিমাণ দূরে দাঁড়াইলে মহত্ত্বকে আদ্যোপান্ত অখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, অদ্যকার এই উৎসবের সুযোগে বাহিরের ভক্তমণ্ডলীর সহিত একাসনে বসিয়া আমরা সেই পরিমাণ দূরে আসিব, তাঁহাকে ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত

তুচ্ছ সম্বন্ধজাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিব, আমাদের সংকীর্ণ জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহারোৎক্ষিপ্ত সমস্ত ধূলিরাশিকে অপসারিত করিয়া তাঁহাকে বৃহৎ আকাশের মধ্যে, নির্মল শান্তির মধ্যে, দেবপ্রসাদের অক্ষুণ্ন আনন্দরশ্মির মধ্যে, তাঁহার যথার্থ মহিমায় তাঁহাকে তাঁহার জীবনের নিত্যপ্রতিষ্ঠার উপরে সমাসীন দেখিব। সংসারের আবর্তে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যত বিদ্রোহ, যত চপলতা, যত অন্যায় করিয়াছি, অদ্য তাহার জন্য তাঁহার শ্রীচরণে একান্তচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিব—আজ তাঁহাকে আমাদের সংসারের, আমাদের সর্বপ্রয়োজনের অতীত করিয়া তাঁহাকে বিশ্বভুবনের ও বিশ্বভুবনেশ্বরের সহিত বৃহৎ নিত্যসম্বন্ধে যুক্ত করিয়া দেখিব এবং তাঁহার নিকট এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করিব যে, যে চিরজীবনের ধনকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে সঞ্চিত করিয়াছেন সেই সঞ্চয়কেই যেন আমরা সর্বপ্রধান পৈতৃক সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করি, তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত যেন আমাদিগকে ধনসম্পদের অন্ধতা হইতে রক্ষা করে, বিপদের বিভীষিকা হইতে উদ্ধার করে, বিশ্বাসের দৃঢ়তার মধ্যে আমাদিগকে ধারণ করিয়া রাখে এবং তিনি ঋষিদের যে মন্ত্র আমাদের কর্ণে ধ্বনিত করিয়াছেন, তাহা যেন কোনো আরামের জড়ত্বে, কোনো নৈরাশ্যের অবসাদে বিস্মৃত না হই—

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ
অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণং মেঽস্তু।

বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, এই সপ্তাশীতিবর্ষীয় জীবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আনন্দিত হও, আশান্বিত হও। ইহা জানো যে, 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'; ইহা জানো যে. ধর্মই ধর্মের সার্থকতা। ইহা জানো যে, আমরা যাহাকে সম্পদ বলিয়া উন্মত্ত হই তাহা সম্পদ নহে; যাহাকে বিপদ বলিয়া ভীত হই তাহা বিপদ নহে; আমাদের অন্তরাত্মা সম্পদ-বিপদের অতীত যে পরমা শান্তি, তাহাকে আশ্রয় করিবার অধিকারী। 'ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ'—সমস্ত জীবন দিয়া ভূমাকেই জানিতে ইচ্ছা করো, এবং সমস্ত জীবনের মধ্যে ভূমাকেই সপ্রমাণ করো। এই প্রার্থনা করো, 'আবিরাবীর্ম এধি'—হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। আমার নিকটে প্রকাশিত হইলে সেই প্রকাশ আমাকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত মানবের নিকট সহজে দীপ্যমান হইয়া উঠিবে—এইরূপে আমার জীবন সমস্ত মানবের নিত্য-জীবনের মধ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকিবে; আমার এই কয়দিনের মানবজন্ম চিরদিনের জন্য সার্থক হইবে।[১]

২

হে পরমপিতঃ, হে পিতৃতমঃ পিতৃণাম্, এ সংসারে যাঁহার পিতৃভাবের মধ্য দিয়া তোমাকে পিতা বলিয়া জানিয়াছি, অদ্য একাদশ দিন হইল তিনি ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত জীবন হোম-হুতাশনের ঊর্ধ্বমুখী পবিত্র শিখার ন্যায় তোমার অভিমুখে নিয়ত উত্থিত হইয়াছে। অদ্য তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনযাত্রার অবসানে তুমি তাঁহাকে কী শান্তিতে, কী অমৃতে অভিষিক্ত করিয়াছ—যিনি স্বর্গ কামনা করেন নাই, কেবল 'ছায়াতপয়োরিব' ব্রহ্মলোকে তোমার সহিত

[১] ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জন্মোৎসবে পঠিত

যুক্ত হইবার জন্য যাঁহার চরমাকাঙ্ক্ষা ছিল, অদ্য তাঁহাকে তুমি কিরূপে সুধাময় চরিতার্থতার মধ্যে বেষ্টন করিয়াছ, তাহা আমাদের মননের অগোচর, তথাপি হে মঙ্গলময়, তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গল-ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তোমাকে বারবার নমস্কার করি। তুমি অনন্তসত্য, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত সত্যচিন্তা নিঃশেষে সার্থক হয়—তুমি অনন্তকল্যাণ, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত শুভকর্ম সম্পূর্ণরূপে সফল হয়—আমাদের সমস্ত অকৃত্রিম প্রেম, হে আনন্দস্বরূপ, তোমারই মধ্যে সুন্দরভাবে ধন্য হয়—আমাদের পিতৃদেবের জীবনের সমস্ত সত্য, সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত প্রেম তোমার মধ্যে অনির্বচনীয়রূপে পরিপূর্ণ হইয়াছে, ইহা জানিয়া আমরা ভ্রাতাভগিনীগণ করজোড়ে তোমার জয়োচ্চারণ করিতেছি।

পৃথিবীতে অধিকাংশ সম্বন্ধই দানপ্রতিদানের অপেক্ষা রাখে—কিন্তু পিতা-মাতার স্নেহ প্রতিদান-প্রত্যাশার অতীত। তাহা পাপ, অপরাধ, কদর্যতা, কৃতঘ্নতা, সমস্তকেই অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। তাহা ঋণ নহে, তাহা দান। তাহা আলোকের ন্যায়, সমীরণের ন্যায়—তাহা শিশুকাল হইতে আমাদিগকে নিয়ত রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তাহার মূল্য কেহ কখনও চাহে নাই। পিতৃস্নেহের সেই অযাচিত, সেই অপর্যাপ্ত মঙ্গলের জন্য, হে বিশ্বপিতঃ, আজ তোমাকে প্রণাম করি।

আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল, আমাদের পিতামহের মৃত্যুর পরে এই গৃহের উপরে সহসা ঋণরাশিভারাক্রান্ত কী দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। পিতৃদেব একাকী বহুবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে দুস্তর ঋণসমুদ্র সন্তরণপূর্বক কেমন করিয়া যে কূলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, আমাদের অদ্যকার অন্নবস্ত্রের সংস্থান কেমন করিয়া যে তিনি ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইয়া আমাদের জন্য রক্ষা করিয়াছেন, আজ তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। সেই ঝঞ্ঝার ইতিহাস আমরা কী জানি। কতকাল ধরিয়া তাঁহাকে কী দুঃখ, কী চিন্তা, কী চেষ্টা, কী দশাবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া প্রতিদিন প্রতিরাত্রি যাপন করিতে হইয়াছে, তাহা মনে করিতে গেলে শরীর কণ্টকিত হয়। তিনি অতুল বৈভবের মধ্যে লালিতপালিত হইয়াছিলেন—অকস্মাৎ ভাগ্যপরিবর্তনের সম্মুখে কেমন করিয়া তিনি অবিচলিত বীর্যের সহিত দণ্ডায়মান হইলেন! যাহারা অপর্যাপ্ত ধনসম্পদ ও বাধাহীন ভোগসুখের মধ্যে মানুষ হইয়া উঠে, দুঃখসংঘাতের অভাবে, বিলাস-লালিত্যের সংবেষ্টনে বাল্যকাল হইতে যাহাদের শক্তির চর্চা অসম্পূর্ণ, সংকটের সময় তাহাদের মতো অসহায় কে আছে! বাহিরের বিপদের অপেক্ষা নিজের অপরিণত চারিত্রবল ও অসংযত প্রবৃত্তি তাহাদের পক্ষে গুরুতর শত্রু। এই সময়ে এই অবস্থায় যে ধনপতির পুত্র নিজের চিরাভ্যাসকে খর্ব করিয়া, ধনিসমাজের প্রভূত প্রতিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া, শান্তসংযত শৌর্যের সহিত এই সুবৃহৎ পরিবারকে স্কন্ধে লইয়া দুঃসহ দুঃসময়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন ও জয়ী হইয়াছেন, তাঁহার সেই অসামান্য বীর্য, সেই সংযম, সেই দৃঢ়চিত্ততা, সেই প্রতিমুহূর্তের ত্যাগস্বীকার আমরা মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধিই বা করিব কী করিয়া এবং তদনুরূপ কৃতজ্ঞতাই বা কেমন করিয়া অনুভব করিব। আমাদের অদ্যকার সমস্ত অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের পশ্চাতে তাঁহার সেই বিপত্তিতে অকম্পিত বলিষ্ঠ দক্ষিণহস্ত ও সেই হস্তের মঙ্গল-আশিস্‌স্পর্শ আমরা যেন নিয়ত নম্রভাবে অনুভব করি।

আমাদের সর্বপ্রকার অভাবমোচনের পক্ষে প্রচুর এই-যে সম্পত্তি তিনি সম্পূর্ণ নিজের বলে রক্ষা করিয়াছেন, ইহা যদি অধর্মের সহায়তায় ঘটিত, তবে অদ্য

অন্তর্যামীর সম্মুখে সেই পিতার নিকটে শ্রদ্ধানিবেদন করিতে আমাদিগকে কুণ্ঠিত হইতে হইত। সর্বাগ্রে তিনি ধর্মকে রক্ষা করিয়া পরে তিনি ধন রক্ষা করিয়াছেন— অদ্য আমরা যাহা লাভ করিয়াছি তাহার সহিত তিনি অসত্যের গ্লানি মিশ্রিত করিয়া দেন নাই; আজ আমরা যাহা ভোগ করিতেছি তাহাকে দেবতার প্রসাদস্বরূপ নির্মলচিত্তে নিঃসংকোচে গ্রহণ করিবার অধিকারী হইয়াছি।

সেই বিপদের দিনে তাঁহার বিষয়ী বন্ধুর অভাব ছিল না; তিনি ইচ্ছা করিলে হয়তো কৌশলপূর্বক তাঁহার পূর্বসম্পত্তির বহুতর অংশ এমন করিয়া উদ্ধার করিতে পারিতেন যে, ধনগৌরবে বঙ্গীয় ধনীদের ঈর্ষাভাজন হইয়া থাকিতেন। তাহা করেন নাই বলিয়া আজ যেন আমরা তাঁহার নিকটে দ্বিগুণতর কৃতজ্ঞ হইতে পারি।

ঘোর সংকটের সময় একদিন তাঁহার সম্মুখে একই কালে শ্রেয়ের পথ ও প্রেয়ের পথ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। তখন সর্বস্ব হারাইবার সম্ভাবনা তাঁহার সম্মুখে ছিল— তাঁহার স্ত্রীপুত্র ছিল, তাঁহার মানসম্ভ্রম ছিল— তৎসত্ত্বে যেদিন তিনি শ্রেয়ের পথ নির্বাচন করিয়া লইলেন সেই মহাদিনের কথা আজ যেন আমরা একবার স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের বিষয়লালসার তীব্রতা শান্ত হইয়া আসিবে এবং সন্তোষের অমৃতে আমাদের হৃদয় অভিষিক্ত হইবে। অর্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন তাহা আমরা গ্রহণ করিয়াছি; বর্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন তাহাও যেন গৌরবের সহিত গ্রহণ করিবার যোগ্য আমরা হইতে পারি।

তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন। কিন্তু তিনি যদি শুদ্ধমাত্র বিষয়ী হইতেন তবে তাঁহার উদ্ধারপ্রাপ্ত সম্পত্তিখণ্ডকে উত্তরোত্তর সঞ্চয়ের দ্বারা বহুলরূপে বিস্তৃত করিতে পারিতেন। কিন্তু বিষয়বিস্তারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঈশ্বরের সেবাকে তিনি বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার ভাণ্ডার ধর্মপ্রচারের জন্য মুক্ত ছিল— কত অনাথ পরিবারের তিনি আশ্রয় ছিলেন, কত দরিদ্র গুণীকে তিনি অভাবের পেষণ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, দেশের কত হিতকর্মে তিনি বিনা আড়ম্বরে গোপনে সাহায্য দিয়াছেন। এই দিকে কৃপণতা করিয়া তিনি কোনোদিন তাঁহার সন্তানদিগকে বিলাসভোগ বা ধনাভিমানচর্চায় প্রশ্রয় দেন নাই। ধর্মপরায়ণ গৃহস্থ যেমন সমস্ত অতিথিবর্গের আহারশেষে নিজে ভোজন করেন, তিনি সেইরূপ তাঁহার ভাণ্ডার-দ্বারের সমস্ত অতিথিবর্গের পরিবেষণশেষ লইয়া নিজের পরিবারকে প্রতিপালন করিয়াছেন। এইরূপে তিনি আমাদিগকে ধনসম্পদের মধ্যে রাখিয়াও আড়ম্বর ও ভোগোন্মত্ততার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এবং এইরূপে যদি তাঁহার সন্তানগণের সম্মুখ হইতে লক্ষ্মীর স্বর্ণপিঞ্জরের অবরোধদ্বার কিছুমাত্র শিথিল হইয়া থাকে, যদি তাঁহারা ভাবলোকের মুক্ত-আকাশে অবাধবিহারের কিছুমাত্র অধিকারী হইয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা পিতার পুণ্যপ্রসাদে বহুতর লক্ষপতির অপেক্ষা সৌভাগ্যবান হইয়াছেন।

আজ এই কথা বলিয়া আমরা সকলের কাছে গৌরব করিতে পারি যে, এতকাল আমাদের পিতা যেমন আমাদিগকে দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি ধনের গণ্ডির মধ্যেও আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। পৃথিবী আমাদের সম্মুখে মুক্ত ছিল— ধনী দরিদ্র সকলেরই গৃহে আমাদের যাতায়াতের পথ সমান প্রশস্ত ছিল। সমাজে যাঁহাদের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা হীন ছিল তাঁহারা সুহৃদ্‌ভাবেই আমাদের পরিবারে অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছেন, পারিষদভাবে নহে। ভবিষ্যতে

আমরা ভ্রষ্ট হইতে পারি, কিন্তু আমরা ভ্রাতাগণ দারিদ্র্যের অসম্মানকে এই পরিবারের ধর্ম বলিয়া জানিতে পাই নাই। ধনের সংকীর্ণতা ভেদ করিয়া মনুষ্য-সাধারণের অকুণ্ঠিত সংস্রবলাভ যাঁহার প্রসাদে আমাদের ঘটিয়াছে তাঁহাকে আজ আমরা নমস্কার করি।

তিনি আমাদিগকে যে কী পরিমাণে স্বাধীনতা দিয়াছেন তাহা আমরা ছাড়া আর কে জানিবে! যে ধর্মকে তিনি ব্যাকুল সন্ধানের দ্বারা পাইয়াছেন, যে ধর্মকে তিনি উৎকট বিপদের মধ্যেও রক্ষা করিয়াছেন, যে ধর্মের উদ্দেশে তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই ধর্মকে তিনি আপনার গৃহের মধ্যেও শাসনের বস্তু করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ছিল, তাঁহার উপদেশ হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই, কিন্তু কোনো নিয়মের শাসনে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে, আমাদের কর্মকে বদ্ধ করেন নাই। তিনি কোনো বিশেষ মতকে অভ্যাস বা অনুশাসনের দ্বারা আমাদের উপরে স্থাপন করিতে চান নাই— ঈশ্বরকে ধর্মকে স্বাধীনভাবে সন্ধান করিবার পথ তিনি আমাদের সম্মুখে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই স্বাধীনতার দ্বারা তিনি আমাদিগকে পরম সম্মানিত করিয়াছেন— তাঁহার প্রদত্ত সেই সম্মানের যোগ্য হইয়া সত্য হইতে যেন স্খলিত না হই, ধর্ম হইতে যেন স্খলিত না হই, কুশল হইতে যেন স্খলিত না হই। পৃথিবীতে কোনো পরিবার কখনোই চিরদিন একভাবে থাকিতে পারে না, ধন ও খ্যাতিকে কোনো বংশ চিরদিন আপনার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণচ্ছটার ন্যায় এই গৃহের সমৃদ্ধি নিশ্চয়ই একদিন দিগন্তরালে বিলীন হইয়া যাইবে, ক্রমে নানা ছিদ্রযোগে বিচ্ছেদবিশ্লেষের বীজ প্রবেশ করিয়া কোন্‌-এক দিন এই পরিবারের ভিত্তিকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া দিবে— কিন্তু এই পরিবারের মধ্য দিয়া যিনি অচেতন সমাজকে ধর্মজিজ্ঞাসায় সজীব করিয়া দিয়াছেন, যিনি নূতন ইংরেজিশিক্ষার ঔদ্ধত্যের দিনে শিশু বঙ্গভাষাকে বহুযত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যিনি দেশকে তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার তপঃপরায়ণ একলক্ষ্য জীবনের দ্বারা আধুনিক বিষয়লুব্ধ সমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পুনঃস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই পরিবারকে সমস্ত মনুষ্যপরিবারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া, ইহার সর্বোচ্চ লাভকে সমস্ত মনুষ্যের লাভ করিয়া দিয়া, ইহার পরম ক্ষতিকে সমস্ত মনুষ্যের ক্ষতি করিয়া দিয়া, আমাদিগকে যে গৌরব দান করিয়াছেন, অন্য সমস্ত ক্ষুদ্র মানমর্যাদা বিস্মৃত হইয়া অদ্য আমরা তাহাই স্মরণ করিব ও একান্ত ভক্তির সহিত তাঁহার নিকটে আপনাকে প্রণত করিয়া দিব, ও যাঁহার মধ্যে তিনি আশ্রয়লাভ করিয়াছেন, সমস্ত ধনমানের ঊর্ধ্বে, খ্যাতিপ্রতিপত্তির ঊর্ধ্বে, তাঁহাকেই দর্শন করিব।

হে বিশ্ববিধাতঃ, আজ আমাদের সমস্ত বিষাদ-অবসাদ দূর করিয়া দাও— মৃত্যু সহসা যে যবনিকা অপসারণ করিয়াছে তাহার মধ্য দিয়া তোমার অমৃতলোকের আভাস আমাদিগকে দেখিতে দাও। সংসারের নিয়ত উত্থানপতন, ধনমানজীবনের আবির্ভাব-তিরোভাবের মধ্যে তোমার 'আনন্দরূপমমৃতম্‌' প্রকাশ করো। কত বৃহৎ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হইতেছে, কত প্রবল প্রতাপ অস্তমিত হইতেছে, কত লোক-বিশ্রুত খ্যাতি বিস্মৃতিমগ্ন হইতেছে, কত কুবেরের ভাণ্ডার ভগ্নস্তূপের বিভীষিকা রাখিয়া অন্তর্হিত হইতেছে— কিন্তু হে আনন্দময়, এই-সমস্ত পরিবর্তনপরম্পরার মধ্যে 'মধু বাতা ঋতায়তে' বায়ু মধু বহন করিতেছে, 'মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ' সমুদ্র-সকল মধু ক্ষরণ করিতেছে— তোমার অনন্ত মাধুর্যের কোনো ক্ষয় নাই, তোমার

সেই বিশ্বব্যাপিনী মাধুরী সমস্ত শোকতাপবিক্ষোভের কুহেলিকা ভেদ করিয়া অদ্য আমাদের চিত্তকে অধিকার করুক।

মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ, মধু নক্তম্ উতোষসঃ, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা, মধুমান্নো বনস্পতিঃ, মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

ওষধিরা আমাদের পক্ষে মাধ্বী হউক, রাত্রি এবং ঊষা আমাদের পক্ষে মধু হউক, পৃথিবীর ধূলি আমাদের পক্ষে মধুমান্ হউক, এই-যে আকাশ পিতার ন্যায় সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে ইহা আমাদের পক্ষে মধু হউক, সূর্য মধুমান্ হউক এবং গাভীরা আমাদের জন্য মাধ্বী হউক।[১]

৩

জগতে যে-সকল মহাপুরুষ ধর্মসমাজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা যাহা দিতে চাহিয়াছেন তাহা আমরা নিতে পারি নাই, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। শুধু পারি নাই যে তাহা নয়, আমরা এক লইতে হয়তো আর লইয়া বসিয়াছি। ধর্মের আসনে সাম্প্রদায়িকতাকে বরণ করিয়া হয়তো নিজেকে সার্থক জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছি।

তাহার একটা কারণ, আমাদের গ্রহণ করিবার শক্তি সকলের এক রকমের নয়। আমার মন যে পথে সহজে চলে, অন্যের মন সে পথে বাধা পায়। আমাদের এই মানসিক বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করিয়া সকল মানুষের জন্য একই বাঁধা রাজপথ বানাইয়া দিবার চেষ্টা আমাদের মনে আসে। কারণ, তাহাতে কাজ সহজ হইয়া যায়। সে চেষ্টা এ পর্যন্ত সফল হয় নাই। সফল হওয়া যে অসাধ্য, তাহাও আমরা ভালো করিয়া বুঝিতে পারি নাই। সেইজন্য যে পথে আমি চলিয়া অভ্যস্ত বা আমার পক্ষে যাহা সহজ, সেই পথই যে সকলের একমাত্র পথ নয়, কাহারও পক্ষে যে তাহা দুর্গম হইতে পারে, এ কথা আমরা মনেও করিতে পারি না। এইজন্যই একই পথে সব মানুষকে টানা আমরা জগতের একমাত্র মঙ্গল বলিয়া মনে করি। এই টানাটানিতে কেহ আপত্তিপ্রকাশ করিলে আমরা আশ্চর্যবোধ করি, মনে করি-- সে লোকটা হয় ইচ্ছা করিয়া নিজের হিত পরিত্যাগ করিতেছে, নয় তাহার মধ্যে এমন একটা হীনতা আছে যাহা অবজ্ঞার যোগ্য।

কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মনের মধ্যে গতিশক্তির যে বৈচিত্র্য দিয়াছেন, আমরা কোনো কৌশলেই তাহাকে একাকার করিয়া দিতে পারিব না। গতির লক্ষ্য এক, কিন্তু তাহার পথ অনেক। সব নদীই সাগরের দিকে চলিয়াছে, কিন্তু সবাই এক নদী হইয়া চলে নাই। চলে নাই, সে আমাদের ভাগ্য।

ঈশ্বর কোনোমতেই আমাদের সকলকেই একটা বাঁধা পথে চলিতে দিবেন না। অনায়াসে চোখ বুজিয়া আমরা একজনের পশ্চাতে আর-একজন চলিব, ঈশ্বর আমাদের পথকে এত সহজ কোনোদিন করিবেন না। কোনো ব্যক্তি, তাঁহার যত বড়ো ক্ষমতাই থাক্, পৃথিবীর সমস্ত মানবাত্মার জন্য নিশ্চেষ্ট জড়ত্বের সুগমতা চিরদিনের জন্য বানাইয়া দিয়া যাইবেন, মানুষের এমন দুর্গতি বিশ্ববিধাতা কখনোই সহ্য করিতে পারেন না।

[১] মহর্ষির আদ্যকৃত্য উপলক্ষে প্রার্থনা। ১৩১১

এইজন্য প্রত্যেক মানুষের মনের গভীরতর স্তরে ঈশ্বর একটি স্বাতন্ত্র্য দিয়াছেন; অন্তত সেখানে একজনের উপর আর-একজনের কোনো অধিকার নাই। সেখানেই তাহার অমরতার বীজকোষ বড়ো সাবধানে রক্ষিত; সেখানেই তাহাকে নিজের শক্তিতে নিজে সার্থক হইতে হইবে। সহজের প্রলোভনে এই জায়গাটার দখল যে ব্যক্তিই ছাড়িয়া দিতে চায় সে লাভে-মূলে সমস্তই হারায়। সেই ব্যক্তিই ধর্মের বদলে সম্প্রদায়কে, ঈশ্বরের বদলে গুরুকে, বোধের বদলে গ্রন্থকে লইয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকে। শুধু বসিয়া থাকিলেও বাঁচিতাম, দল বাড়াইবার চেষ্টায় পৃথিবীতে অনেক ব্যর্থতা এবং অনেক বিরোধের সৃষ্টি করে।

এইজন্য বলিতেছিলাম, মহাপুরুষেরা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, আর আমরা তাহার মধ্য হইতে সম্প্রদায়টাই লই, ধর্মটা লই না। কারণ, বিধাতার বিধানে ধর্ম জিনিসটাকে নিজের স্বাধীন শক্তির দ্বারাই পাইতে হয়, অন্যের কাছ হইতে তাহা আরামে ভিক্ষা মাগিয়া লইবার জো নাই। কোনো সত্যপদার্থই আমরা আর-কাহারও কাছ হইতে কেবল হাত পাতিয়া চাহিয়া পাইতে পারি না। যেখানে সহজ রাস্তা ধরিয়া ভিক্ষা করিতে গিয়াছি সেখানেই ফাঁকিতে পড়িয়াছি। তেমন করিয়া যাহা পাইয়াছি তাহাতে আত্মার পেট ভরে নাই, কিন্তু আত্মার জাত গিয়াছে।

তবে ধর্মসম্প্রদায় ব্যাপারটাকে আমরা কী চোখে দেখিব। তাহাকে এই বলিয়াই জানিতে হইবে যে, তাহা তৃষ্ণা মিটাইবার জল নহে, তাহা জল খাইবার পাত্র। সত্যকার তৃষ্ণা যাহার আছে সে জলের জন্যই ব্যাকুল হইয়া ফিরে, সে উপযুক্ত সুযোগ পাইলে গণ্ডূষে করিয়াই পিপাসানিবৃত্তি করে। কিন্তু যাহার পিপাসা নাই সে পাত্রটাকেই সবচেয়ে দামী বলিয়া জানে। সেইজন্যই জল কোথায় পড়িয়া থাকে তাহার ঠিক নাই, পাত্র লইয়াই পৃথিবীতে বিষম মারামারি বাধিয়া যায়। তখন যে ধর্ম বিষয়বুদ্ধির ফাঁস আল্‌গা করিবে বলিয়া আসিয়াছিল তাহা জগতে একটা নূতনতর বৈষয়িকতার সূক্ষ্মতর জাল সৃষ্টি করিয়া বসে; সে জাল কাটানো শক্ত।

ধর্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতারা নিজের নিজের সাধ্যানুসারে আমাদের জন্য, মাটির হউক আর সোনার হউক, এক-একটা পাত্র গড়িয়া দিয়া যান। আমরা যদি মনে করি, সেই পাত্রটা গড়িয়া দিয়া যাওয়াই তাঁহাদের মাহাত্ম্যের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়, তবে সেটা আমাদের ভুল হইবে। কারণ, পাত্রটি আমাদের কাছে যতই প্রিয় এবং যতই সুবিধাকর হউক, তাহা কখনোই পৃথিবীর সকলেরই কাছে সমান প্রিয় এবং সমান সুবিধাকর হইতে পারে না। ভক্তির মোহে অন্ধ হইয়া, দলের গর্বে মত্ত হইয়া, এ কথা ভুলিলে চলিবে না। কথামালার গল্প সকলেই জানেন— শৃগাল থালায় ঝোল রাখিয়া সারসকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, লম্বা ঠোঁট লইয়া সারস তাহা খাইতে পারে নাই; তার পর সারস যখন সরুমুখ চোঙের মধ্যে ঝোল রাখিয়া শৃগালকে ফিরিয়া নিমন্ত্রণ করিল তখন শৃগালকে ক্ষুধা লইয়াই ফিরিতে হইয়াছিল। সেইরূপ এমন সর্বজনীন ধর্মসমাজ আমরা কল্পনা করিতে পারি না যাহা তাহার মত ও অনুষ্ঠান লইয়া সকলেরই বুদ্ধি রুচি ও প্রয়োজনকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে।

অতএব শাস্ত্রীয় ধর্মমত ও আনুষ্ঠানিক ধর্মসমাজ স্থাপনের দিক হইতে পৃথিবীর ধর্মগুরুদিগকে দেখা তাঁহাদিগকে ছোটো করিয়া দেখা। তেমন করিয়া কেবল দলের লোকেরাই দেখিতে পারে এবং তাহাতে করিয়া কেবল দলাদলিকেই বাড়াইয়া তোলা হয়। তাঁহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটি দেখিবার আছে যাহা

লইয়া সকল দেশে সকল কালে সকল মানুষকেই আহ্বান করা যায়—যাহা প্রদীপমাত্র নহে, যাহা আলো।

সেটি কী। না, যেটি তাঁহারা নিজেরাই পাইয়াছেন। যাহা গড়িয়াছেন তাহা নহে। যাহা পাইয়াছেন সে তো তাঁহাদের নিজের সৃষ্টি নহে, যাহা গড়িয়াছেন তাহা তাঁহাদের নিজের রচনা।

আজ যাঁহার স্মরণার্থ আমরা সকলে এখানে সমবেত হইয়াছি তাঁহাকেও যাহাতে কোনো-একটা দলের দিক হইতে না দেখি, ইহাই আমার নিবেদন। সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা সম্প্রদায়ের ধ্বজাকেই সর্বোচ্চ করিয়া ধরিতে গিয়া পাছে গুরুকেও তাহার কাছে খর্ব করিয়া দেন, এ আশঙ্কা মন হইতে কিছুতেই দূর হয় না—অন্তত আজিকার দিনে নিজেদের সেই সংকীর্ণতা তাঁহার প্রতি যেন আরোপ না করি।

অবশ্যই, কর্মক্ষেত্রে তাঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব নানা রূপে দেখা দিয়াছে। তাঁহার ভাষায়, তাঁহার ব্যবহারে, তাঁহার কর্মে তিনি বিশেষভাবে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহার সেই স্বাভাবিক বিশেষত্ব জীবনচরিত-আলোচনা-কালে উপাদেয় সন্দেহ নাই। সেই আলোচনায় তাঁহার সংস্কার, তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার প্রতি তাঁহার দেশের ও কালের প্রভাব-সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য, আমাদের কৌতূহল-নিবৃত্তি করে। কিন্তু সেই-সমস্ত বিশেষ ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া তাঁহার জীবন কি আর-কাহাকেও আমাদের কাছে প্রকাশ করিতেছে না। আলো কি প্রদীপকে প্রকাশ করিবার জন্য, না প্রদীপ আলোকে প্রচার করিবার জন্য। তিনি যাঁহাকে দেখিতেছেন ও দেখাইতেছেন, যদি আজ সেইদিকেই আমাদের সমস্ত দৃষ্টি না যায়, আজ যদি তাঁহার নিজের বিশেষত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি কোনো অংশে ঠেকিয়া যায়, তবে গুরুর অবমাননা হইবে।

[মহর্ষি একদিন পরিপূর্ণ ভোগের মাঝখানে জাগিয়া উঠিয়া বিলাসমন্দিরের সমস্ত আলোকে অন্ধকার দেখিয়াছিলেন। সেইদিন তিনি তৃষার্ত চিত্ত লইয়া পিপাসা মিটাইবার জন্য দুর্গম পথে যাত্রা করিয়াছিলেন, সে কথা সকলেই জানেন। যেখান হইতে অমৃত-উৎস নিঃসৃত হইয়া সমস্ত জগৎকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে সেই তীর্থস্থানে তিনি না গিয়া ছাড়েন নাই। সেই তীর্থের জল তিনি আমাদের জন্যও পাত্রে ভরিয়া আনিয়াছিলেন। এ পাত্র আজ বাদে কাল ভাঙিয়া যাইতেও পারে, তিনি যে ধর্মসমাজ দাঁড় করাইয়াছেন তাহার বর্তমান আকৃতি স্থায়ী না হইতেও পারে; কিন্তু তিনি সেই-যে অমৃত-উৎসের ধারে গিয়া নিজের জীবনকে ভরিয়া লইয়াছেন, ইহাই আমাদের প্রত্যেকের লাভ। এই লাভ নষ্ট হইবে না, শেষ হইবে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরকে আর-কাহারও হাত দিয়া আমরা পাইব না। তাঁহার কাছে নিজে যাইতে হইবে, তাঁহাকে নিজে পাইতে হইবে। দুঃসাধ্য হয় সেও ভালো, বিলম্ব হয় তাহাতে ক্ষতি নাই। অন্যের মুখে শুনিয়া, উপদেশ পাইয়া, সমাজ-বিহিত অনুষ্ঠান পালন করিয়া, আমরা মনে করি যেন আমরা চরিতার্থতা লাভ করিলাম; কিন্তু সে তো ঘটির জল, সে তো উৎস নহে। তাহা মলিন হয়, তাহা ফুরাইয়া যায়, তাহাতে আমাদের সমস্ত জীবন অভিষিক্ত হয় না এবং তাহা লইয়া আমরা বিষয়ী লোকের মতোই অহংকার ও দলাদলি করিতে থাকি। এমন ঘটির জলে আমাদের চলিবে না—সেই উৎসের কাছে আমাদের প্রত্যেককেই যাইতে হইবে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের নিজের একান্ত সম্বন্ধ তাঁহার সম্মুখে গিয়া আমাদিগকে নিজে স্বীকার করিতে হইবে।] সম্রাট যখন আমাকে দরবারে ডাকেন তখন

প্রতিনিধি পাঠাইয়া কি কাজ সারিতে পারি। ঈশ্বর যে আমাদের প্রত্যেককে ডাক দিয়াছেন, সেই ডাকে সাড়া দিয়া একেবারে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে কোনোমতেই আমাদের সার্থকতা নাই।

[মহাপুরুষদের জীবন হইতে এই কথাটাই আমরা জানিতে পারি। যখন দেখি তাঁহারা হঠাৎ সকল কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়াছেন তখন বুঝিতে পারি, তবে তো আহ্বান আসিতেছে— আমরা শুনিতে পাই নাই, কিন্তু তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছেন। তখন চারি দিকের কোলাহল হইতে ক্ষণকালের জন্য মনটাকে টানিয়া লই, আমরাও কান পাতিয়া দাঁড়াই। অতএব মহাপুরুষদের জীবন হইতে আমরা প্রথমে স্পষ্ট জানিতে পারি, আত্মার প্রতি পরমাত্মার আহ্বান কতখানি সত্য। এই জানিতে পারাটাই লাভ।]

তার পরে আর-একদিন তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই, সুখে-দুঃখে তাঁহারা শান্ত, প্রলোভনে তাঁহারা অবিচলিত, মঙ্গলব্রতে তাঁহারা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। দেখিতে পাই, তাঁহাদের মাথার উপর দিয়া কত ঝড় চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাঁহাদের হাল ঠিক আছে; সর্বস্বক্ষতির সম্ভাবনা তাঁহাদের সম্মুখে বিভীষিকারূপে আবির্ভূত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা অনায়াসেই তাহাকে স্বীকার করিয়া ন্যায়পথে ধ্রুব হইয়া আছেন; আত্মীয়বন্ধুগণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে, কিন্তু তাঁহারা প্রসন্ন-চিত্তে সে-সকল বিচ্ছেদ বহন করিতেছেন— তখনই আমরা বুঝিতে পারি, আমরা কী পাই নাই আর তাঁহারা কী পাইয়াছেন। সে কোন্ শান্তি, কোন্ বন্ধু, কোন্ সম্পদ্। তখন বুঝিতে পারি, আমাদিগকেও নিতান্তই কী পাওয়া চাই, কোন্ লাভে আমাদের সকল অন্বেষণ শান্ত হইয়া যাইবে।

অতএব মহাপুরুষদের জীবনে আমরা প্রথমে দেখি, তাঁহারা কোন্ আকর্ষণে সমস্ত ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন; তাহার পরে দেখিতে পাই, কোন্ লাভে তাঁহাদের সমস্ত ত্যাগ সার্থক হইয়াছে। এই দিকে আমাদের মনের জাগরণটাই আমাদের লাভ। কারণ, এই জাগরণের অভাবেই কোনো লাভই সম্পন্ন হইতে পারে না।

তার পরে যদি ভাবিয়া দেখি, পাইবার ধন কোথায় পাওয়া যাইবে, কেমন করিয়া পাইব, তবে এই প্রশ্নই করিতে হইবে, তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন, কেমন করিয়া পাইয়াছেন।

মহর্ষির জীবনে এই প্রশ্নের কী উত্তর পাই। দেখিতে পাই, তিনি তাঁহার পূর্বতন সমস্ত সংস্কার সমস্ত আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া একেবারে রিক্তহস্তে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। সমাজের প্রচলিত প্রথা তাঁহাকে ধরিয়া রাখে নাই, শাস্ত্র তাঁহাকে আশ্রয় দেয় নাই। তাঁহার ব্যাকুলতাই তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। সে পথ তাঁহার নিজেরই প্রকৃতির গভীর গোপন পথ। সব পথ ছাড়িয়া সেই পথ তাঁহাকে নিজে আবিষ্কার করিয়া লইতে হইয়াছে। এ আবিষ্কার করিবার ধৈর্য ও সাহস তাঁহার থাকিত না, তিনিও পাঁচজনের পথে চলিয়া, ধর্ম না হউক, ধার্মিকতা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন— কিন্তু তাঁহার পক্ষে যে 'না পাইলে নয়' হইয়া উঠিয়াছিল, সেইজন্য তাঁহাকে নিজের পথ নিজেকে বাহির করিতে হইয়াছিল। সেজন্য তাঁহাকে যত দুঃখ, যত তিরস্কার হউক, সমস্ত স্বীকার করিতে হইয়াছিল— ইহা বাঁচাইবার জো নাই। ঈশ্বর যে তাহাই চান। তিনি বিশ্বের ঈশ্বর হইয়াও আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একটি নিতান্ত একমাত্র স্বতন্ত্র সম্বন্ধে ধরা দিবেন— সেইজন্য আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে তিনি একটি দুর্ভেদ্য স্বাতন্ত্র্যকে চারি দিকের আক্রমণ হইতে নিয়ত রক্ষা করিয়াছেন। এই অতি নির্মল নির্জন নিভৃত স্বাতন্ত্র্যের

মধ্যেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের মিলনের স্থান নির্দিষ্ট রহিয়াছে। সেইখানকার দ্বার যখন আমরা নিজের চেষ্টায় খুলিয়া তাঁহার কাছে আমাদের সেই চরম স্বাতন্ত্র্যের অধিকার একেবারে ছাড়িয়া দিব, বিশ্বের মধ্যে যাহা আমি ছাড়া আর-কাহারও নহে সেইটেই যখন তাঁহার কাছে সমর্পণ করিতে পারিব, তখনই আর আমার কিছু বাকি থাকিবে না, তখনই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। এই-যে আমাদের স্বাতন্ত্র্যের দ্বার ইহার প্রত্যেকের চাবি স্বতন্ত্র; একজনের চাবি দিয়া আর-একজনের দ্বার খুলিবে না। পৃথিবীতে যাঁহারা ঈশ্বরকে না পাওয়া পর্যন্ত থামেন নাই, তাঁহারা সকলেই ব্যাকুলতার নির্দেশ মানিয়া, নিজের চাবি নিজে যেমন করিয়া পারেন সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। কেবল পরের প্রতি নির্ভর করিয়া আলস্যবশত এ যাঁহারা না করিয়াছেন তাঁহারা কোনো-একটা ধর্মমত ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মসম্প্রদায়ে আসিয়া ঠেকিয়াছেন ও সেইখানেই তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়া কলরব করিতেছেন, শেষ পর্যন্ত গিয়া পৌঁছেন নাই।

আমাদের শক্তি যদি ক্ষীণ হয়, আমাদের আকাঙ্ক্ষা যদি সত্য না হয়, তবে আমরা শেষ পর্যন্ত কবে গিয়া পৌঁছিব জানি না। কিন্তু মহাপুরুষদের জীবন যেদিন আলোচনা করিতে বসিব সেদিন যেন সেই শেষলক্ষ্যের কথাটাই সম্মুখে রাখি, তাঁহাদের স্মৃতি যেন আমাদিগকে পারের ঘাটের আলো দেখায়, তাহাকে যেন আমরা কোনোদিন সাম্প্রদায়িক অভিযানের মশাল করিয়া না তুলি। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত আমাদিগকে বন্ধন হইতে উদ্ধার করিয়া দিবে, পরবশতা হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে; আমাদিগকে নিজের সত্যশক্তিতে সত্যচেষ্টায় সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবে। আমাদিগকে ভিক্ষা দিবে না, সন্ধান দিবে; আশ্রয় দিবে না, অভয় দিবে; অনুসরণ করিতে বলিবে না, অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিবে। এক কথায়, মহাপুরুষ তাঁহার নিজের রচনার দিকে আমাদিগকে টানিতেছেন না, ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করিতেছেন। আজ আমরা যেন মনকে স্তব্ধ করি, শান্ত করি; যাহা প্রতিদিন ভাঙিতেছে, গড়িতেছে, যাহা লইয়া তর্কবিতর্ক বিরোধবিদ্বেষের অন্ত নাই, যেখানে মানুষের বুদ্ধির রুচির অভ্যাসের অনৈক্য, সে-সমস্তকেই মৃত্যুর সম্মুখে যেন আজ ক্ষুদ্র করিয়া দেখিতে পারি; কেবল আমাদের আত্মার যে শক্তিকে ঈশ্বর আমাদের জীবনমৃত্যুর নিত্যসম্বলরূপে আমাদিগকে দান করিয়াছেন, তাঁহার যে বাণী আমাদের সুখে-দুঃখে উত্থানে-পতনে জয়ে-পরাজয়ে চিরদিন আমাদের অন্তরাত্মায় ধ্বনিত হইতেছে, তাঁহার যে সম্বন্ধ নিগূঢ়রূপে নিত্যরূপে একান্তরূপে আমারই, তাহাই আজ নির্মলচিত্তে উপলব্ধি করিব; মহাপুরুষের সমস্ত সাধনা যাঁহাতে সার্থক হইয়াছে, সমাপ্ত হইয়াছে— সমস্ত কর্মের খণ্ডতা, সমস্ত চেষ্টার ভঙ্গুরতা, সমস্ত প্রকাশের অসম্পূর্ণতা যে-এক পরম পরিণামের মধ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে— সেই দিকেই আজ আমাদের শান্তদৃষ্টিকে স্থির রাখিব। সম্প্রদায়ের লোকদিগকে এই কথা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়া আমরা সেই পরলোকগত মহাত্মার নিকট আমাদের বিনম্র হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করি, তাঁহার স্মৃতিশিখরের ঊর্ধ্বে করজোড়ে সেই ধ্রুবতারার মহিমা নিরীক্ষণ করি— যে শাশ্বত জ্যোতি সম্পদ্-বিপদের দুর্গম সমুদ্রপথের মধ্য দিয়া দীর্ঘদিনের অবসানে তাঁহার জীবনকে তাহার চরম বিশ্রামের তীর্থে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে।[১]

[১] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধসভায় পঠিত। ১৩১৩

৪

আজ পিতৃদেবের মৃত্যুর সাম্বৎসরিক দিন।

আমি যখন জন্মেছি তখন থেকে তিনি হিমালয়ে ও দূরে দূরে ভ্রমণ করেছেন। দু-তিন বছর পর পর তিনি যখন বাড়ি আসতেন তখন সমস্ত পরিবারে একটা পরিবর্তন অনুভব করতুম— সেটা আমার অল্প বয়সকে ভয়েতে সম্ভ্রমে অভিভূত করত। সেই আমার বালকবয়সে তাঁর সত্তার যে মূর্তি আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল সে হচ্ছে তাঁর একক ও বিরাট নিঃসঙ্গতার রূপ। তাঁর এই ভাবটি আমায় খুব স্তম্ভিত করত— এ আমার স্মরণে আছে। কেমন যেন মনে হত যে, নিকটে থাকলেও তিনি যেন দূরে রয়েছেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা যেমন সন্নিকটবর্তী গিরিশৃঙ্গ-সমূহ থেকে পৃথক হয়ে তার উত্তুঙ্গ তুষারকান্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আমার কাছে ঠিক তেমনিভাবে আমার পিতৃদেবের আবির্ভাব হয়েছিল। সমবেত আত্মীয়স্বজন-পরিবারবর্গ থেকে তিনি অতি সহজে পৃথক সমুচ্চ শুভ্র নিষ্কলঙ্ক রূপে প্রতিভাত হতেন। তখন আমি ছোটো ছিলুম; ছোটো ছেলেকে লোকে যেমন কাছে ডেকে ছোটো প্রশ্ন শুধোয় সেইরকমভাবে তিনি তখন আমায় ডেকে দু-এক কথা জিজ্ঞেস করতেন। আমার অগ্রজেরা কেবলমাত্র নিজেদের জীবন সম্বন্ধে নয়, সংসারের নানাবিধ খুঁটিনাটি কাজ সম্পর্কেও তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছেন ও তাঁর কাছ থেকে নানাবিধ নির্দেশ পেয়েছেন— সে সুযোগ প্রথমবয়সে আমার ঘটে নি। তবু পিতৃদেবকে দেখে আমার ক্রমাগত উপনিষদের একটি কথা মনে হয়েছে, 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ', যিনি এক তিনি এই আকাশে বৃক্ষের মতো স্তব্ধ হয়ে আছেন।

এখন মনে হয়, তাঁর সেই নিঃসঙ্গতার অর্থ যেন কিছু কিছু বুঝতে পারি। এখন বুঝতে পারি যে, তিনি বিরাট নিরাসক্ততা নিয়েই জন্মেছিলেন। তাঁর পিতার বিপুল ঐশ্বর্যসম্ভার ছিল, বাহিরের দিক দিয়ে সেই ঐশ্বর্যের কতরকম প্রকাশ হত তার ইয়ত্তা নেই। আহারে বিহারে বিলাসে ব্যসনে কত ধুম, কত জনসমাগম। পিতৃদেব সেই ভিড়ের মধ্যে থেকেও ভিড় থেকে দূরে থাকতেন। আপনার ব্যক্তিত্বের মর্যাদা নিয়ে আপনাতে নিবিষ্ট থাকা, এই ছিল তাঁর স্বভাব। অথচ কর্মেও তাঁকে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। আমার পিতামহের অধিকাংশ অর্থ যে ব্যাঙ্কে খাটত সেইখানে তাঁরই নির্দেশক্রমে সামান্য পারিশ্রমিকে আমার পিতাকে কাজ করতে হত। যাতে তিনি বিষয়কর্মে নিপুণ হয়ে ওঠেন তার জন্য পিতামহ যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করতেন। যদিও দায়িত্বজনক অনেক কাজ তিনি সুচারুরূপে নির্বাহ করতেন, তবু সমস্ত বিষয়কর্মের উপর তাঁর ঔদাসীন্য ও অনাসক্তি দেখে পিতামহ ক্ষুণ্ণ হতেন। তখন তাঁর যৌবনকাল, বাইরের আড়ম্বর ও চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে পড়া হয়তো তাঁর মতো অবস্থায় বিশেষ আশ্চর্যকর হত না; কিন্তু সমস্ত কর্মের মধ্যে জড়িত থেকেও তিনি সকল কর্মের ঊর্ধ্বে ছিলেন। সামাজিক দিক দিয়েও আবিষ্ট হয়ে পড়ার মতো অনুকূল অবস্থা তখন তাঁর প্রবল ছিল; অনেক পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক তখন পিতামহের কাছে বিষয় বা অন্যাবিধ ব্যাপার নিয়ে নিত্য উপস্থিত হতেন। উপরন্তু দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বাড়ির এবং পাথুরেঘাটার রাজবাটির আত্মীয়সমবায় নিয়ে, সেই বহুদূর-পরিব্যাপ্ত সম্পর্কিত মণ্ডলীর সঙ্গে তাকে সংস্পর্শে আসতে হত। আমি ঠিক জানি নে

অবশ্য, তবে নিশ্চিত অনুভব করতে পারি যে, এই আর্থিক প্রতিপত্তি ও সামাজিক সমারোহের মধ্যেও তিনি সেই উপনিষদ-বর্ণিত একক পুরুষের মতো বৃক্ষের স্তব্ধ নিঃসঙ্গতা রক্ষা করে চলতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের তৎকালীন বিপুল ঐশ্বর্যের আমরা যথাযথ ধারণাই করতে পারি না; পিতৃদেবের মুখে শুনেছি যে, পিতামহ যখন বিলাতে অবস্থান করতেন তখন মাসিক তাঁকে লক্ষাধিক টাকা পাঠানো হত। পিতামহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, প্রকাণ্ড এক ভূমিকম্পের ফলে যেন, সেই বিরাট ঐশ্বর্য এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সেই সংকটের মধ্যেও পিতৃদেব অবিচলিত—বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ। তখন তিনি মন্ত্র গ্রহণ করেছেন; হয়তো তখনই সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারলেন উপনিষদ যে মহৎ বাণী প্রচার করে গেছেন—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

আমার অভিজ্ঞতার মধ্যেই দেখেছি, অনেক শোকাবহ ব্যাপারে, আত্মীয়স্বজনের বিয়োগবিচ্ছেদে, তিনি তাঁর সেই তেতলার ঘরে আত্মসমাহিত হয়ে একা বসে আছেন। কেউ সাহস করত না তাঁকে সান্ত্বনা দিতে। বাইরের আনুকূল্যের তিনি কোনোদিন অপেক্ষা রাখেন নি; আপনি আপনার মধ্যে আনন্দ পেতেন।

আমার যখন উপনয়ন হল, দশ বছর বয়সে—মুণ্ডিত কেশ, তার জন্য একটু লজ্জিত ছিলেম—তিনি হঠাৎ আমায় ডেকে বললেন, "হিমালয়ে যেতে ইচ্ছে কর?" আমার তখনকার কী আনন্দ বলবার ভাষা নেই। সেকালে লুপ-লাইনটাই ছিল মেন-লাইন—রাস্তায় আমাদের প্রথম বিরামের জায়গা হল শান্তিনিকেতন। সে জায়গার সঙ্গে এখনকার এ জায়গার অনেক তফাত—ধুধু করছে প্রান্তর, শ্যামল বৃক্ষছায়ার অবকাশ নেই প্রায় কোথাও। সেই ঊষর রুক্ষ প্রান্তরের মধ্যে, আজকাল যেটা অতিথিশালা তারই একটা ছোটো ঘরে আমি থাকতুম, অন্যটাতে তিনি থাকতেন; তাঁর রোপণ-করা শালবীথিকা তখন বড়ো হতে আরম্ভ করেছে। তখন আমার কবিতা লেখার পাগ্‌লামো তার আদিপর্ব পেরিয়েছে; নাট্যঘরের পাশে একটা নারিকেলগাছ ছিল, তারই তলায় বসে 'পৃথ্বীরাজ-বিজয়'[১] নামে একটি কবিতা রচনা করে গর্ব অনুভব করেছিলাম। খোয়াইয়ে বেড়াতে গিয়ে নানা রকমের বিচিত্র নুড়ি সংগ্রহ করা, আর এ ধারে ও ধারে ঘুরে গুহাগহ্বর গাছপালা আবিষ্কার করাই ছিল আমার কাজ। ভোরবেলায় উঠিয়ে দিয়ে তিনি আমায় শ্রীভগবদ্‌গীতা থেকে তাঁর দাগ-দেওয়া শ্লোক নকল করতে দিতেন; রাত্রে সৌর জগতের গ্রহতারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। এ ছাড়া তখন তিনি আমাকে একটু-আধটু ইংরেজি ও সংস্কৃতও পড়াতেন। তবু তাঁর এত কাছে থেকেও সর্বদা মনে হত, তিনি যেন দূরে দূরে রয়েছেন। এই সময় দেখতুম যে, আশেপাশের লোকেরা কথায়-বার্তায় আলাপে-আলোচনায় তাঁর চিত্তবিক্ষেপ করতে সাহসই করত না। সকালবেলা অসমাপ্ত শুক্‌নো পুকুরের ধারে উঁচু জমিতে ও সন্ধ্যায় ছাতিম-তলায় তাঁর যে ধ্যানের আত্মসমাহিত মূর্তি দেখতুম সে আমি কখনও ভুলব না।

তার পর হিমালয়ের কথা। তীব্র শীতের প্রত্যুষে প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্তে তাঁকে দেখতুম, বাতি হাতে। তাঁর দীর্ঘ দেহ লাল একটা শালে আবৃত করে তিনি আমায় জাগিয়ে দিয়ে উপক্রমণিকা পড়তে প্রবৃত্ত করতেন। তখন দেখতুম, আকাশে তারা, আর পর্বতের উপর প্রত্যুষের আবছায়া অন্ধকারে তাঁর পূর্বাস্য ধ্যানমূর্তি, তিনি যেন সেই শান্ত স্তব্ধ আবেষ্টনের সঙ্গে একাঙ্গীভূত। এই কদিন তাঁর নিবিড় সান্নিধ্য সত্ত্বেও এটা আমার বুঝতে দেরি হত না যে, কাছে থেকেও তাঁকে নাগাল পাওয়া যায় না। তার পরে স্বাস্থ্যভঙ্গের সময় তিনি যখন কলকাতায় ছিলেন তখন আমার

যুবক বয়সে তাঁর কাছে প্রায়ই বিষয়কর্মের ব্যাপার নিয়ে যেতে হত। প্রতি মাসের প্রথম তিনটে দিন ব্রাহ্মসমাজের খাতা, সংসারের খাতা, জমিদারির খাতা নিয়ে তাঁর কাছে কম্পান্বিত কলেবরে যেতুম। তাঁর শরীর তখন শক্ত ছিল না, চোখে কম দেখতেন, তবুও শুনে শুনে অঙ্কের সামান্য ত্রুটিও তিনি চট করে ধরে ফেলতেন। এই সময়েও তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্ততা আমায় বিস্মিত করেছে।

আমাদের সকল আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে তিনি ছিলেন তেমনি একা যেমন একা সৌরপরিবারে সূর্য— স্বীয় উপলব্ধির জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে তিনি আত্মসমাহিত থাকতেন। তাঁর প্রকৃতিগত নিরাসক্তির প্রকৃত দান হল এই আশ্রম; জনতা থেকে দূরে অথচ কল্যাণসূত্রে জনতার সঙ্গে আবদ্ধ। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে যে আনন্দ, এবং আত্মার আনন্দ, এই দুইয়েরও প্রতীক হল এই আশ্রম। এই দুই আনন্দ মিলে তাঁর জীবনকে পরিপূর্ণ করেছিল। যে চিত্তবৃত্তি থাকলে মানুষকে সংঘবদ্ধ করা যায় সে তাঁর ছিল না। উপনিষদের মন্ত্র-উপলব্ধির আনন্দ তাঁর অন্তরে নিহিত ছিল— সাধারণের জন্যে সে আনন্দকে ছোটো করে বা জল মিশিয়ে পরিবেষণ করতে পারেন নি। এই-সকল কারণেই তাঁর চার দিকে বিশেষ কোনো-একটা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে নি। আপনার চরিত্র ও জীবনের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর জ্ঞান ও প্রেমের আদর্শ রেখে গেছেন। এর চেয়ে বেশি কিছু তিনি রেখে যান নি, কারণ জনতাকে বন্দী করার দুর্গপ্রতিষ্ঠা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

তাঁর প্রকৃত দান এই আশ্রম; এই আশ্রমে আসতে হলে দীক্ষা নিতে হয় না, খাতায় নাম লিখতে হয় না— যে আসতে পারে সেই আসতে পারে, কারণ এ তো সম্প্রদায়ের নয়। এর ভিতরকার বাণীটা হল 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'। আশ্রমের মধ্যে যে গভীর শান্তি আছে সেটা কেউ মুক্তভাবে নিতে পারে তো নেয়। মোহমুগ্ধ করে তো সে আনন্দ দেওয়া যায় না। সেইজন্যেই কখনও বলেন নি যে, তাঁর বিশেষ একটা মত কাউকে পালন করতে হবে। তাঁর প্রাচীন সংস্কারের বিরুদ্ধে আমার আধুনিকপন্থী অগ্রজেরা অনেক বিরুদ্ধতা করেছেন, তিনি কিন্তু কখনও প্রতিবাদ করেন নি। আমার মধ্যেও অনেক-কিছু ছিল, অনেক মতবাদ, যার সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয় নি, তবু তিনি শাসন করে তাঁর অনুবর্তী হতে কখনও আজ্ঞা করেন নি। তিনি জানতেন যে, সত্য শাসনের অনুগত নয়, তাকে পাওয়ার হলে পাওয়া যায়, নইলে যায়ই না। অত্যাচার করেন অনেক গুরু, নিজেদের মতবাদ দিয়ে অনুবর্তীদের আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন করে গিণ্ট বাঁধতে গিয়ে তাঁরা সোনা হারান। আমার পিতৃদেব স্বতন্ত্র ছিলেন, আমাদের স্বাতন্ত্র্যও তিনি শ্রদ্ধা করতেন। কোনো দিন বাঁধতে চান নি। মরবার আগে তিনি বলে গিয়েছিলেন যে, শান্তিনিকেতন-আশ্রমে যেন তাঁর কোনো বাইরের চিহ্ন বা প্রতিকৃতি না থাকে। তাঁর এই অন্তিম বচনে সেই নিঃসংসক্ত আত্মার মুক্তির বাণী যেন ধ্বনিত হয়েছে। তিনি বুঝেছিলেন, যদি নিজেকে মুক্তি দিতে হয় তবে অন্যকেও মুক্তি দিতে হবে। যা বড়ো, কেবলমাত্র মুক্তির ক্ষেত্রেই তা থাকতে পারে। মুক্ত আকাশেই জ্যোতিষ্ক সঞ্চরণ করে। প্রদীপকেই কুটিরের মধ্যে সন্তর্পণে রাখতে হয়। এই মুক্তির শিক্ষা তাঁর কাছ থেকে আমি পেয়েছি। তাঁর কাছেই শিখেছি যে, সত্যকে জোর করে দেওয়া যায় না; বহু বিরুদ্ধতার ভিতর অপেক্ষা করে থাকতে হয়। এই আমার আজকের দিনের কথা।[২]

[১] 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়'? দ্রষ্টব্য, জীবনস্মৃতি, 'হিমালয়যাত্রা'
[২] ৬ মাঘ ১৩৪২। মহর্ষির মৃত্যুবার্ষিকীতে শান্তিনিকেতনে কথিত

ভারতপথিক রামমোহন রায়

নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে,
যারা অন্যমনা, তারা শোনো,
আপনারে ভুলো না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।

১৩৪৭

ইতিহাসে দেখি অনেক বড়ো বড়ো প্রাচীন সভ্যতা দেশের নদীর সঙ্গে নাড়ীর যোগে প্রাণবান। নদী দেশকে দেয় জল, দেয় ফল; কিন্তু সবচেয়ে বড়ো তার দান, দেশকে সে দেয় গতি। দূরের সঙ্গে বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ শাখায়িত করে নদী, স্থাবরের মর্মের মধ্যে নিয়ে আসে প্রাণের চলৎপ্রবাহ।

নদীমাতৃক দেশে নদী যদি একেবারে শুকিয়ে যায় তা হলে তার মাটিতে ঘটে কৃপণতা, তার অন্ন-উৎপাদনের শক্তি ক্ষীণ হয়। দেশের আপন জীবিকা যদি-বা কোনোমতে চলে, কিন্তু যে অন্নপ্রাচুর্যের দ্বারা বাইরের বৃহৎ জগতের সঙ্গে তার যোগ সেটা যায় দরিদ্র হয়ে। সে না পারে দিতে, না পারে নিতে। নিজের মধ্যে সে রুদ্ধ হয়ে থাকে, বিভক্ত হয় তার ঐক্যধারা, তার আত্মীয়মিলনের পথ হয় দুর্গম। বাহিরের সঙ্গে সে হয় পৃথক, অন্তরের মধ্যে সে হয় খণ্ডিত।

যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বলা চলে। সে চিত্তের এমন নিত্য-প্রবাহিত মননধারা যার যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে, নিজের মধ্যেকার ভেদ বিভেদ তার ভেসে যায়—যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব নব সফলতায় পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অন্ন জোগায় সকল দেশকে, সকল কালকে।

একদা সেই চিত্ত ছিল ভারতের, তার ছিল বহমান-মনন-ধারা। সে বলতে পেরেছিল 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা', সকলে আসুক সকল দিক থেকে। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে', শুনুক বিশ্বের লোক। বলেছিল 'বেদাহম্', আমি জানি—এমন কিছু জানি যা বিশ্বের সকলকে আমন্ত্রণ করে জানাবার। যে তারা জ্যোতিহীন তাকে নিখিল নক্ষত্রলোক স্বীকার করে না। প্রাচীন ভারত নিত্যকালের মধ্যে আপন পরিচয়কে দীপ্যমান করেছে; বিশ্বলোকে সে প্রকাশিত হয়েছে প্রভূত দাক্ষিণ্যে, আপনাকে দান করার দ্বারা। সেদিন সে ছিল না অকিঞ্চনরূপে অকিঞ্চিৎকর।

শত শত বৎসর চলে গেল—ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি হল নিস্তব্ধ, ভারতবর্ষের মনোলোকে চিন্তার মহানদী গেল শুকিয়ে। তখন দেশ হয়ে পড়ল স্থবির, আপনার মধ্যে আপনি সংকীর্ণ, তার সজীব চিত্তের তেজ আর বিকীর্ণ হয় না দূরদূরান্তরে। শুকনো নদীতে যখন জল চলে না তখন তলাকার অচল পাথরগুলো পথ আগলে বসে; তারা অসংলগ্ন, তারা অর্থহীন, পথিকদের তারা বিঘ্ন। তেমনি দুর্দিন যখন এল এই দেশে তখন জ্ঞানের চলমান গতি হল অবরুদ্ধ, নির্জীব হল নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি, উদ্ধত হয়ে দেখা দিল নিশ্চল আচারপুঞ্জ, আনুষ্ঠানিক নিরর্থকতা, মননহীন লোকব্যবহারের অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি। সর্বজনের প্রশস্ত রাজপথকে তারা বাধাগ্রস্ত করলে; খণ্ড খণ্ড সংকীর্ণ সীমানার বাইরে বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে।

ঘুমের অবস্থায় মনের জানলা যখন সব বন্ধ হয়ে যায়, মন হয় বন্দী। তখন যে-সব স্বপ্ন নিয়ে সে খেলা করে বিশ্বসত্যের সঙ্গে তাদের যোগ নেই, কেবলমাত্র সেই সুপ্ত মনের নিজের উপরেই তাদের প্রভাব এক কেন্দ্রে আবর্তিত, তা তারা যতই অদ্ভুত হোক, অসংগত হোক, উৎকট হোক। বাহিরের বাস্তবরাজ্য থেকে এই স্বপ্নরাজ্যে আর কারও প্রবেশের পথ নেই। একে বিদ্রূপ করা যায়, কিন্তু বিচার করা যায় না; কেননা এ থাকে যুক্তির বাহিরে।

তেমনি ছিল অর্থহারা আচারের স্বপ্নজালে জড়িত ভারতবর্ষ, তার আলো এসেছিল নিবে। তার আপনার কাছে আপন সত্যপরিচয় ছিল আচ্ছন্ন। এমন সময় রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হল এই দেশে, সেই আত্মবিস্মৃত প্রদোষের অন্ধকারে। সেদিন তার ইতিহাস অগৌরবের কালিমায় আবৃত। ভারত আপন বাণী তখন হারিয়েছে, নিখিল পৃথিবীর এই নতুন কালের জন্যে তার কোনো বার্তা নেই, ঘরের কোণে বসে সে মৃত যুগের মন্ত্র জপ করছে।

যখন সে আপন দুর্বলতায় অভিভূত সেই অপমানের দিনে বাইরের লোক এল তার দ্বারে; আপন সম্মান রক্ষা করে তাকে অভ্যর্থনা করবে এমন আয়োজন ছিল না; অতিথিরূপে তাকে গৃহস্বামী ডাকতে পারে নি, দ্বার ভেঙে দস্যুরূপে সে প্রবেশ করলে তার স্বর্ণভাণ্ডারে।

ভারতের চিত্ত সেদিন মনের অন্ন নূতন করে উৎপাদন করতে পারছিল না, তার খেত ভরা ছিল আগাছার জঙ্গলে। সেই অজন্মার দিনে রামমোহন রায় জন্মেছিলেন সত্যের ক্ষুধা নিয়ে। ইতিহাসের প্রাণহীন আবর্জনায়—বাহ্যবিধির কৃত্রিমতায় কিছুতে তাঁকে তৃপ্ত করতে পারলে না। কোথা থেকে তিনি নিয়ে এলেন সেই জ্ঞানের আগ্রহে স্বভাবত উৎসুক মন, যা সম্প্রদায়ের বিচিত্র বেড়া ভেঙে বেরোল, চারি দিকের মানুষ যা নিয়ে ভুলে আছে তাতে যার বিতৃষ্ণা হল। সে চাইল মোহমুক্ত বুদ্ধির সেই অবারিত আশ্রয়, যেখানে সকল মানুষের মিলনতীর্থ।

এই বেড়া-ভাঙার সাধনাই যথার্থ ভারতবর্ষের মিলনতীর্থকে উদ্ঘাটিত করা। এইজন্যেই এ সাধনা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের, যেহেতু এর বিরুদ্ধতাই ভারতে এত প্রভূত, এত প্রবল। ইংলণ্ড ক্ষুদ্র দ্বীপের সীমায় বদ্ধ, সেইজন্যেই তার সাধনা গেছে দ্বৈপায়নতার বিপরীত দিকে, বিশ্বে সে আপনাকে সুদূরে বিস্তার করেছে। দেশের বিশেষ অবস্থার মধ্যেই দেশের অঞ্জলি পাতা রয়েছে, সেই অঞ্জলির অর্থই এই যে, তার শূন্যতাকে পূর্ণ করতে হবে।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে আছে তার নিহিতার্থ, তার বিশেষ সমস্যা; সেই অর্থ তাকে পূরণ করতে হয় নিরন্তর প্রয়াসে। এই প্রয়াসের দ্বারাই তার চরিত্র সৃষ্ট হয়, তার উদ্ভাবনী শক্তি বললাভ করে। মানুষকে তার মনুষ্যত্ব প্রতিক্ষণে জয় করে নিতে হয়। প্রত্যেক জাতির ইতিহাস আপন জয়যাত্রার ইতিহাস। কঠিন বাধা দূর করবার পথেই তার স্বাস্থ্য, তার সম্পদ। এইজন্যেই বলেছে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। দুর্গমকে সুগম করতে এসেছে মানুষ, দুর্লভকে উপলব্ধ। বিশেষ জাতিকে যে বিশেষ সমস্যা দিয়েছেন বিধাতা, তার সত্য উত্তর দিতে থাকার মধ্যেই তার পরিত্রাণ। যারা সমাধান করতে ভুল করেছে তারা মরেছে। আর দুর্গতিগ্রস্ত হয়েছে তারাই যারা মনে করেছে তাদের সমাধান করবার কিছুই নেই, সমস্ত সমাধা হয়ে গেছে। যতক্ষণ মানুষের প্রাণ আছে ততক্ষণই তার সমস্যা, অবিরত সমস্যার উত্তর দিতে থাকাই প্রাণক্রিয়া। চারি দিকে জড়ের জটিল বাধা নিত্যই, সেই বাধা নিত্যই ভেদ করার দ্বারা প্রাণ আপনাকে সপ্রমাণ করে। ইতিহাসে যে জটা পাকিয়ে থাকে সেই গ্রন্থিকেই সনাতন বলে ভক্তি করলে সেটা মরণের ফাঁস হয়ে ওঠে।

মানব-ইতিহাসের প্রধান সমস্যাটা কোথায়? যেখানে কোনো অন্ধতায় কোনো মূঢ়তায় মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটায়।—মানবসমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মানুষের ঐক্য। সভ্যতার অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র হবার অনুশীলনা। এই ঐক্যতত্ত্বের উপলব্ধি যেখানেই দুর্বল সেখানে সেই দুর্বলতা নানা ব্যাধির আকার ধরে দেশকে চারি দিক থেকে আক্রমণ করে।

ভারতবর্ষে তার সমস্যাটা সুস্পষ্ট। এখানে নানা জাতের লোক একত্রে এসে জুটেছে। পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশে এমন ঘটে নি। যারা একত্র হয়েছে তাদের এক করতেই হবে, এই হল ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সমস্যা। এক করতে হবে বাহ্যিক ব্যবস্থায় নয়, আন্তরিক আত্মীয়তায়। ইতিহাস মাত্রেরই সর্বপ্রধান মন্ত্র হচ্ছে 'সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্'—এক হয়ে চলব, এক হয়ে বলব, সকলের মনকে এক বলে জানব। এই মন্ত্রের সাধনা ভারতবর্ষে যেমন অত্যন্ত দুরূহ এমন আর কোনো দেশেই নয়। যতই দুরূহ হোক, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ছাড়া রক্ষা পাবার অন্য কোনো পথ নেই।

অন্য কোনো দেশের শ্রীবৃদ্ধি দেখে যখন আমরা মুগ্ধ হই তখন অনেক সময়ে আমরা তার সিদ্ধির পরিণত রূপটার দিকেই লুব্ধদৃষ্টিপাত করি, তার সাধনার দুর্গম পথটা আমাদের চোখে পড়ে না। দেখতে পাওয়া গেল স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা, মনে করি ঐ ব্যবস্থার একটি অনুরূপ প্রতিমা খাড়া করতে পারলেই আমাদের উদ্ধার। ভুলে যাই রাষ্ট্রব্যবস্থাটা দেহমাত্র—সেই দেহ নিরর্থক, যদি তার প্রাণ না থাকে। সেই প্রাণই জাতিগত ঐক্য। অন্য দেশে সেই ঐক্যেরই আন্তরিক শক্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সে-সব দেশেও সেই ঐক্যে যেখানে যে পরিমাণ বিকার ঘটে সেখানে সেই পরিমাণেই সমস্যা কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে জাতিতে জাতিতে পার্থক্য, পশ্চিম-মহাদেশে শ্রেণীতে শ্রেণীতে। সেই শ্রেণীগত পার্থক্যের মধ্যে আন্তরিক সামঞ্জস্য যদি না ঘটে তা হলে বাহ্য ব্যবস্থায় বিপদ-নিবারণ হবে না।

আমরা যদি কোনো ক্ষেত্রে দেখতে পাই প্রচুর ফসল তা হলে গোড়াতেই এ কথা মনে রাখতে হবে, এ ফসল বালিতে উৎপন্ন হয় নি, হয়েছে মাটিতে। মরু-ভূমিতে দেখা যায় উদ্ভিদ দূরে দূরে বিশ্লিষ্ট, তারা কাঁটার দ্বারা নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করে রক্ষা করেছে। তাদের জননী ধরণী এক রসের দাক্ষিণ্যে সকলকে পরিপোষণ করে নি, তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রাণের ঐক্যে কার্পণ্য। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, মাটির কণায় কণায় বন্ধন আছে, বালির কণায় কণায় বিচ্ছেদ। আমরা যখন সমৃদ্ধিমান জাতির ইতিহাস চর্চা করি তখন ভরা ফসলের দিকে চোখ পড়ে, এবং কৃষিপ্রণালীর বিবরণও যত্ন করে মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করে থাকি; কেবল একটা কথা মনে রাখি নে, এই ফসলের ঐশ্বর্য সম্পূর্ণ অসম্ভব যদি তার ভূমিকাতেই থাকে বিচ্ছিন্নতা। কৃষির যন্ত্রকেও আমরা দাবি করি, ফসলেরও প্রত্যাশা করে থাকি, কিন্তু আমাদের ভূমির প্রকৃতিতেই যে বিচ্ছেদ তাকে চোখ বুজে আমরা নগণ্য বলেই জ্ঞান করি এবং ধর্মের নামে তাকে নিত্যরূপে রক্ষা করবার চেষ্টায় সতর্ক হয়ে থাকি। আমরা ইতিহাসের উপরকার মলাটটা পড়ি, ভিতরকার পাতাগুলো বাদ দিয়ে যাই, ভুলে যাই কোনো দেশেই সমাজগত বিশ্লিষ্টতার উপর রাষ্ট্রজাতিগত স্বাতন্ত্র্য আজ পর্যন্ত সংঘটিত ও সংরক্ষিত হয় নি। প্রজারা যেখানে বিভক্ত সেখানে ব্যক্তিবিশেষের একাধিপত্য তাদের বাইরের বন্ধনে বেঁধে রাখে। তাও বেশি দিন টেঁকে না, কেবলই হাতবদল হতে থাকে। যেখানে মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ সেখানে কেবল রাষ্ট্রশক্তি নয়, বুদ্ধিবৃত্তিও শিথিল হয়ে যায়। সেখানে মাঝে মাঝে প্রতিভাশালীর অভ্যুদয় হয় না তা নয়, কিন্তু সেই প্রতিভার দান ধারণ ও পোষণ করবার উপযুক্ত আধার সর্বসাধারণের মধ্যে না থাকাতে কেবলই তা বিকৃত ও বিলুপ্ত হতে থাকে। ঐক্যের অভাবে মানুষ বর্বর হয়, ঐক্যের শৈথিল্যে মানুষ ব্যর্থ হয়, তার কারণ সমবায়ধর্ম মানুষের সত্যধর্ম, তার শ্রেষ্ঠতার হেতু।

ঐক্যবোধের উপদেশ উপনিষদে যেমন একান্তভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এমন কোনো দেশে কোনো শাস্ত্রে হয় নি। ভারতবর্ষেই বলা হয়েছে, 'বিদ্বান্‌ ইতি সর্বান্তরস্থঃ স্বসংবিদ্‌রূপবিদ্‌ বিদ্বান্‌'— নিজেরই চৈতন্যকে সর্বজনের অন্তরস্থ করে যিনি জানেন তিনিই বিদ্বান্‌। অথচ এই ভারতবর্ষেই অসংখ্য কৃত্রিম অর্থহীন বিধিবিধানের দ্বারা পরস্পরকে যেমন অত্যন্ত পৃথক করে জানা হয় পৃথিবীতে এমন আর কোনো দেশেই নেই। সুতরাং এ কথা বলতে হবে, ভারতবর্ষে এমন একটা বাহ্য স্থূলতা রয়ে গেছে যা ভারতবর্ষের অন্তরতর সত্যের বিরুদ্ধ, যার মর্মান্তিক আঘাত দীর্ঘকাল ধরে ভারতের ইতিহাসে প্রকাশ পাচ্ছে নানা দুঃখে দারিদ্র্যে অপমানে।

এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন, বর্তমান যুগে রামমোহন রায় তাঁদেরই অগ্রণী। এর আগেও নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছে ঐক্যবাণী। মধ্য-যুগে অচল সংস্কারের পিঞ্জরদ্বার খুলে বেরিয়ে পড়েছেন প্রত্যুষের অতন্দ্রিত পাখি, গেয়েছেন তাঁরা আলোকের অভিবন্দন-গান সামাজিক জড়ত্বপুঞ্জের ঊর্ধ্ব আকাশে। তাঁরা সেই মুক্ত প্রাণের বার্তা এনেছেন, উপনিষদ যাকে সম্বোধন করে বলেছেন 'ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণ'— হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য, তুমি সংস্কারে বিজড়িত স্থাবর নও। সেই মুক্তিদূতের মধ্যে একজন ছিলেন কবীর, তিনি নিজেকে ভারতপথিক বলে জানিয়েছেন। নানা জটিল জঙ্গলের মধ্যে এই ভারতপথকে যাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আর-একজন ছিলেন দাদূ। তিনি বলেন—

ভাই রে ঐসা পংথ হমারা
দ্বৈপখরহিত পংথ গহি পূরা অবরণ এক অধারা।

ভাই রে, আমার পথ এইরকম, সে দুইপক্ষরহিত, বর্ণহীন, সে এক।

তিনি বলেছেন—

জাকোঁ মারণ জাইয়ে সোঈ ফিরি মারৈ,
জাকোঁ তারণ জাইয়ে সোঈ ফিরি তারৈ।

যাকে আমরা মারি সেই আমাদের ফিরে মারে, যাকে ত্রাণ করি সেই আমাদের ফিরে ত্রাণ করে।

তিনি বলেছেন—

সব ঘট একৈ আতমা, ক্যা হিন্দু মুসলমান।

সেদিন আর-এক সাধু, ভারতের পথ যাঁর কাছে ছিল সুগোচর, তাঁর নাম রজ্জব, তিনি বলেন—

বুংদ বুংদ মিলি রস সিংধ হৈ, জুদা জুদা মরু ভায়।

অর্থাৎ, বিন্দুর সঙ্গে বিন্দু যখন মেলে তখনই হয় রসসিন্ধু, বিন্দুতে বিন্দুতে যখন পৃথক হয়ে যায় তখনই মরুভূমি প্রকাশ পায়।

এই রজ্জব বলেন—

হাথ জোড়ু গুরু সূঁ হোঁ মিলৈ হিন্দু মুসলমান।

গুরুর কাছে আমি করজোড় করছি যেন হিন্দু মুসলমান মিলে যায়।

এই ভারতপথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায়, ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তিলাভের সাধনায়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন-সাধনায় নয়। এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ। সেই পথের পথিক আধুনিক কালে রামমোহন রায়। তিনিও প্রয়োজনের দিক থেকে নয়, মানবাত্মার

গভীরে যে মিলনের ধর্ম আছে সেই নিত্য আদর্শের দিক থেকে ভারতের ইতিহাসকে শুভবুদ্ধিদ্বারা সংযুক্ত মানুষের এক মহদ্‌রূপ অন্তরে দেখেছিলেন। ভারতের উদার প্রশস্ত পন্থায় তিনি সকলকেই আহ্বান করেছেন, যে পন্থায় হিন্দু মুসলমান খৃস্টান সকলেই অবিরোধে মিলতে পারে। সেই বিপুল পন্থাই যদি ভারতের না হয়, যদি আচারের কাঁটার বেড়ায় বেষ্টিত সাম্প্রদায়িক শতখণ্ডতাই হয় ভারতের নিত্যপ্রকৃতিগত, তা হলে তো আমাদের বাঁচবার কোনো উপায় নেই। ঐ তো এসেছে মুসলমান, ঐ তো এসেছে খৃস্টান—

সাধন মাহি জোগ নহি জৈ, ক্যা সাধন পরমাণ।

ঐতিহাসিক সাধনায় এদের যদি যুক্ত করতে না পারি তা হলে সাধনার প্রমাণ হবে কিসে?

এদের অঙ্গীভূত করে নেবার প্রাণশক্তি যদি ভারতের না থাকে, পাথরের মতো কঠিন পিণ্ডীভূত হয়ে এদের বাইরে ঠেকিয়ে রাখাই যদি আমাদের ধর্ম হয়, তবে সেই পুঞ্জ পুঞ্জ অসংশ্লিষ্ট অনাত্মীয়তার নিদারুণ ভার সইবে কে?

প্রতিদিন কি এরা স্খলিত হয়ে পড়ছে না দলে দলে, সমাজের নিচের স্তরে কি গর্ত প্রসারিত হচ্ছে না? আপনার লোক যখন পর হয়ে যায় তখন সে যে নিদারুণ হয়ে ওঠে তার কি প্রমাণ পাচ্ছি নে? যাদের অবজ্ঞা করি তাদের আলগা করে রাখি, যাদের ছুঁই নে তাদের ধরতে পারি নে। আপনাকে পর করবার যে সহস্র পথ প্রশস্ত করে রেখেছি সেই পথ দিয়েই শনির যত চর দেশে প্রবেশ করেছে। আমাদের বিপুল জনতরণীর তক্তাগুলিকে সাবধানে ফাঁক ফাঁক করে রাখাকেই যদি ভারতের চিরকালীন ধর্ম বলে গণ্য করি, তা হলে বাইরের তরঙ্গগুলোকে শত্রু ঘোষণা করে কেন মিছে বিলাপ করা, তা হলে বিনাশের লবণাম্বুসমুদ্রে তলিয়ে যাওয়াকেই ভারত-ইতিহাসের চরম লক্ষ্য বলে নিশ্চেষ্ট থাকাই শ্রেয়। সেচনী দিয়ে ক্রমাগত জল সেঁচে সেঁচে কতদিন চলবে আমাদের জীর্ণ ভাগ্যের তরী বাওয়া?

আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভ-কালেই এসেছেন রামমোহন রায়। তখন এ যুগকে কি বিদেশী কি স্বদেশী কেউ স্পষ্ট করে চিনতে পারে নি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন, এ যুগের যে আহ্বান সে সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান। তিনি জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত আপন উদার হৃদয় বিস্তার করে দেখিয়েছিলেন, সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কারও স্থান-সংকীর্ণতা নেই। তাঁর সেই হৃদয় ভারতেরই হৃদয়, তিনি ভারতের সত্য পরিচয় আপনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। ভারতের সত্য পরিচয় সেই মানুষে যে মানুষের মধ্যে সকল মানুষের সম্মান আছে, স্বীকৃতি আছে।

সকল দেশেরই মধ্যে একটা বিরুদ্ধতার দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এক ভাগে তার আপন শ্রেষ্ঠতাকে আপনি প্রতিবাদ, তার অন্ধতা অহমিকা-দ্বারাই তার আত্মলাঘব; এই দিকটা অভাবার্থক, এই দিকে তার ক্ষতির বিভাগ, তার কৃষ্ণপক্ষের অংশ। আর-এক দিকে তার আলোক, তার নিহিতার্থ, তার চিরসত্য; এই দিকটাই ভাবার্থক, প্রকাশাত্মক। এই দিকে তার পরিচয় যদি ম্লান না হয়, নিঃশেষিত না হয়, তবেই সর্বকালে সে গৌরবান্বিত।

য়ুরোপের সকল দেশেই একদিন ডাইনির অস্তিত্ব বিশ্বাস করত। শত শত স্ত্রীলোক সেখানে নিরপরাধে পুড়ে মরেছে। কিন্তু এই অন্ধতার দিকটাই আন্তরিক-ভাবে য়ুরোপের একান্ত ছিল না। তাই লোকগণনায় এই বিশ্বাসের প্রসার পরিমাপ করে এর দ্বারা য়ুরোপকে চিনতে গেলে অবিচার হবে। একদিন য়ুরোপের

ধর্মমূঢ়বুদ্ধি জিয়োর্ডানো ব্রুনোকে পুড়িয়ে মেরেছিল, কিন্তু সেদিন চিতায় জ্বলতে জ্বলতে একলা জিয়োর্ডানো দিয়েছিলেন য়ুরোপীয় চিত্তের পরিচয়, যে চিত্তকে সে যুগের সাম্প্রদায়িক জড়বুদ্ধি দল বেঁধে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু যাকে আজ সর্বমানব সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে। একদিন ইংরেজের সাহিত্যে, তার ইতিহাসে, ইংরেজের পরিচয় আমরা পেয়েছিলুম; দেখেছিলুম মানুষের প্রতি তার মৈত্রী, দাসপ্রথার 'পরে তার ঘৃণা, পরাধীনের মুক্তির জন্যে তার অনুকম্পা, ন্যায়বিচারের প্রতি তার নিষ্ঠা। আজ যদি ভারতের রাষ্ট্রশাসন জুড়ে তার এই স্বভাবের নিষ্ঠুর প্রতিবাদ অজস্র দেখতে পাই তবু তার থেকে ইংরেজের চরম পরিচয় গ্রহণ করা সত্য হবে না। যে কারণেই হোক তার অভাবার্থক দিকটা প্রবল হয়ে উঠেছে, এ-সমস্ত তারই দুর্লক্ষণ। আজও ইংলণ্ডে এমন মানুষ আছে ইংরেজ-স্বভাবের বিরুদ্ধগামী সমস্ত অন্যায় যাদের হৃদয়কে পীড়িত করছে। বস্তুত সব ইংরেজই যে ইংরেজ এ কথাটা মনে করাই ভুল। খাঁটি ইংরেজের সংখ্যা স্বল্প যদি-বা হয়, আর নিজের সমাজে তারা যদি-বা লাঞ্ছনা ভোগ করে, তবুও তারা সমস্ত ইংরেজেরই প্রতিনিধি।

তেমনি একদা যেদিন বাংলাদেশে প্রগাঢ় অন্ধতা, কৃত্রিমতা, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে রামমোহন রায়ের আগমন হল সেদিন এই বিমুখ দেশে তিনিই একলা ভারতের নিত্য পরিচয় বহন করে এসেছেন। তাঁর সর্বতোমুখী বুদ্ধি ও সর্বতঃপ্রসারিত হৃদয় সেদিনকার এই বাংলাদেশের অখ্যাত কোণে দাঁড়িয়ে সকল মানুষের জন্যে আসন পেতে দিয়েছিল। এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলবার দিন এসেছে যে, যে আতিথ্যভ্রষ্ট আসন কৃপণঘরের রুদ্ধ কোণের জন্যে সে আসন নয়, যে আসনে সর্বজন অবাধে স্থান পেতে পারে সেই উদার আসনই চিরন্তন ভারতবর্ষের স্বরচিত: লক্ষ লক্ষ আচারবাদী তাকে যদি সংকুচিত করে, খণ্ড খণ্ড করে, সমস্ত পৃথিবীর কাছে স্বদেশকে ধিক্‌কৃত করে ভারতসভ্যতার প্রতিবাদ করে তবু বলব এ কথা সত্য। মানুষের ঐক্যের বার্তা রামমোহন রায় একদিন ভারতের বাণীতেই ঘোষণা করেছিলেন, এবং তাঁর দেশবাসী তাঁকে তিরস্কৃত করেছিল— তিনি সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন মুসলমানকে, খৃস্টানকে, ভারতের সর্বজনকে হিন্দুর এক পঙ্‌ক্তিতে ভারতের মহা আতিথিশালায়। যে ভারত বলেছে—

> যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
> সর্ব ভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্‌সতে।

যিনি সকলের মধ্যে আপনাকে, আপনার মধ্যে সকলকে দেখেন, তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না।

তাঁর মৃত্যুর পরে আজ একশত বৎসর অতীত হল। সেদিনকার অনেক কিছুই আজ পুরাতন হয়ে গেছে, কিন্তু রামমোহন রায় পুরাতত্ত্বের অস্পষ্টতায় আবৃত হয়ে যান নি। তিনি চিরকালের মতোই আধুনিক। কেননা তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তার এক সীমা পুরাতন ভারতে, কিন্তু সেই অতীতকালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই— তার অন্য দিক চলে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবীকালের অভিমুখে। তিনি ভারতের সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিত্তকে মুক্তি দিতে পেরেছেন যা জ্ঞানের পথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মুক্ত। তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামী কালে, যে কালে ভারতের মহা ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু মুসলমান খৃস্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়। বায়ুপোতে অত্যূর্ধ্ব আকাশে যখন ওঠা যায় তখন দৃষ্টিচক্র যতদূর প্রসারিত হয়,

তার এক দিকে থাকে যে দেশকে বহুদূরে অতিক্রম করে এসেছি, আর-এক দিক থাকে সম্মুখে যা এখনও আছে বহুযোজন দূরে। রামমোহন যে কালে বিরাজ করেন সে কাল তেমনি অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত, আমরা তাঁর সেই কালকে আজও উত্তীর্ণ হতে পারি নি।

আজ আমার অধিক বলবার শক্তি নেই, কেবল এই কথা মাত্র বলতে এসেছি যে, যদিও অজ্ঞানের অশক্তির জগদ্দল পাথর ভারতের বুকে চেপে আছে, লজ্জায় আমরা সংকুচিত, দুঃখে আমাদের দেহমন জীর্ণ, অপমানে আমাদের মাথা অবনত, বিদেশের পথিক আমাদের কলঙ্ক কুড়িয়ে নিয়ে দেশে দেশে নিন্দাপণ্যের ব্যাবসা চালাচ্ছে, তবু আমাদের সকল দুর্গতির উপরে সর্বোচ্চ আশার কথা এই যে, রামমোহন রায় এ দেশে জন্মেছেন, তাঁর মধ্যে ভারতের পরিচয়। তাঁকে দেশের বহুজনে সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র অহমিকায় যদি অবজ্ঞা করে, আপন বলে স্বীকার না করে, তবুও চিরকালের ভারতবর্ষ তাঁকে গভীর অন্তরে নিশ্চিত স্বীকার করেছে। বর্তমান যুগ-রচনায় আজও তাঁর প্রভাব ক্রিয়াশালী, আজও তাঁর নীরব কণ্ঠ ভারতের অমর বাণীতে আহ্বান করছে তাঁকে—

> য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
> বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি
> বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ।

প্রার্থনা করছে—

> স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

১৪ পৌষ ১৩৪০

২

আমাদের প্রাণ বিদ্রোহী। চার দিকে জড়দানব তার প্রকাণ্ড শক্তি ও অসংখ্য বাহু বিস্তার করে বসে আছে। ক্ষুদ্র প্রাণ প্রতি মুহূর্তে নানা দিক থেকে তাকে নিরস্ত করে তবে আত্মপ্রকাশ করে। এই জড় তার চারি দিকে ক্লান্তির প্রাচীর তুলে তুলে তার প্রয়াসের পরিধিকে কেবলই সংকীর্ণ করে আনতে চায়। বারংবার এই প্রাচীরকে ভেঙে ভেঙে তবে প্রাণ আপন অধিকার রক্ষা করতে পারে। তাই আমাদের হৃৎপিণ্ড দিনে রাত্রে এক মুহূর্ত ছুটি নিতে পারে না, গুরুভার বস্তুপুঞ্জের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে তার আক্রমণ ক্ষান্ত হলেই মৃত্যু।

প্রাণের এই নিত্য সচেষ্টতাতেই যেমন প্রাণের আত্মপ্রকাশ, মনেরও তাই। তার অনন্ত জিজ্ঞাসা। চার দিকে সত্যের রহস্য মূক হয়ে আছে। আপন শক্তিতে উত্তর আদায় করতে হয়। অল্প অনবধান হলেই ভুল উত্তর পাই। সেই ভুল উত্তরগুলিকে নিশ্চেষ্ট নিঃসংশয়ে স্বীকার করে নিলেই মনের সাংঘাতিক পরাভব। জিজ্ঞাসার শৈথিল্যেই মনের জড়তা। যেমন জীবনীশক্তির নিরুদ্যমেই অস্বাস্থ্য, তাতেই যত রোগের উৎপত্তি, বিনাশের আয়োজন, তেমনি মননশক্তির অবসাদ ঘটলেই মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে যত রকমের বিকার প্রবেশ করে। সত্যমিথ্যা ভালোমন্দ সমস্ত কিছুকেই বিনাপ্রশ্নে অলস ভীরু মন যখন মেনে নিতে থাকে তখনই মনুষ্যত্বের সকল প্রকার দুর্গতি। জড়ের মধ্যে যে অচল মূঢ়তা, মানুষের

মন যখনই তার সঙ্গে আপসে সন্ধি করে তখন থেকে জগতে মানুষ মনমরা হয়ে থাকে, জড় রাজার খাজনা জুগিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে একদিন মনের স্বরাজ গিয়েছে ধ্বংস হয়ে। পঙ্গু মনের ছিল না আত্মকর্তৃত্ব, প্রশ্ন করবার শক্তি ও ভরসা সে হারিয়েছিল। সে যা শুনেছে তাই মেনেছে, যে বুলি তার কানে দেওয়া হয়েছে সেই বুলিই সে আওড়িয়েছে। যখন কোনো উৎপাত এসে পড়েছে স্কন্ধে তখন তাকে বিধিলিপি বলে নিয়েছে মেনে। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নূতন প্রণালীতে বর্তমানকালীন সংসারসমস্যার সমাধান করা তার অধিকার-বহির্ভূত বলে স্বীকার করার দ্বারা আত্মাবমাননায় তার সংকোচ ছিল না। মনের আত্মপ্রকাশের ধারা সেদিন এ দেশে অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেশ তখন সামনের কালের দিকে চলে নি, পিছনের কালকেই ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করেছে— চিন্তাশক্তি যেটুকু বাকি ছিল সে অনুসন্ধান করতে নয়, অনুসরণ করবার জন্যেই।

সুপ্তি যখন আবিষ্ট করে তখনই চুরি যাবার সময়। অন্তরের মধ্যে যখন অসাড়তা, বাইরের বিপদ তখনই প্রবল। চিত্তের মধ্যে যার স্বাধীনতা নেই বাইরের দিক থেকে সে কখনোই স্বাধীন হতে পারে না। অন্তরের দিকে সব কিছুকে যে অবিসম্বাদে মেনে নেয়, বাইরে অন্যায় প্রভুত্বকেও না মানবার শক্তি তার থাকে না— যে বুদ্ধি অসত্যকে ঠেকায় মনে, সেই বুদ্ধিই অমঙ্গলকে ঠেকায় বহিঃসংসারে— নির্জীব মন অন্তরে বাহিরে কোনো আক্রমণকেই ঠেকাতে পারে না। তাই সেদিনকার ভারতের ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেল ভারতবর্ষ তার মর্মান্তিক পরাভবকে মেনে নিলে আর সেইসঙ্গে মেনে নিলে যা না-মানবার এমন হাজার হাজার জিনিস। এই-যে তার বাইরের দুর্দশার বোঝা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল, এ তার অন্তরের অবুদ্ধির বোঝারই সামিল।

যখন আমাদের আর্থিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি মোহাবৃত, সৃষ্টিশক্তি আড়ষ্ট, বর্তমান যুগের কোনো প্রশ্নের নূতন উত্তর দেবার মতো বাণী যখন আমাদের ছিল না, আপন চিত্তদৈন্য সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো চেতনাও যখন দুর্বল, সেই দুর্গতির দিনেই রামমোহন রায়ের এ দেশে আবির্ভাব। প্রবল শক্তিতে তিনি আঘাত করেছিলেন সেই দুরবস্থার মূলে, যা মানুষের পরম সম্পদ স্বাধীনবুদ্ধিকে অবিশ্বাস করেছে। কিন্তু, তখন আমরা সেই দুরবস্থার কারণকেই পূজা করতে অভ্যস্ত, তাই সেদিন আমরাও তাঁকে শত্রু বলে দণ্ড উদ্যত করেছি। ডাক্তার বলেন, রোগ জিনিসটা দেহের অধিকার সম্বন্ধে দীর্ঘকালের দলিল দাখিল করলেও সে বাহিরের আগন্তুক, স্বাস্থ্যতত্ত্বই দেহের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্য। রামমোহন রায় তেমনি করেই বলেছিলেন আমাদের অজ্ঞানকে, আমাদের অন্ধতাকে কালের গণনায় সনাতন বলি, কিন্তু সত্যের দিক থেকে তাই আমাদের অনাত্মীয় আগন্তুক। তিনি দেখিয়েছিলেন, আমাদের দেশের অন্তরাত্মার মধ্যেই কোথায় আছে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চিরপুরাতন চিরনূতন প্রতিষ্ঠা; মনের স্বাস্থ্যকে আত্মার শক্তিকে প্রবল করবার জন্যে, উজ্জ্বল করবার জন্যে, ভারতের একান্ত আপন যে সাধনসম্পদের ভাণ্ডার তারই দ্বার তিনি খুলে দিয়েছিলেন; সেদিনকার জনতা তাঁকে শত্রু বলে ঘোষণা করেছিল।

আজও কি রামমোহনকে আমরা শত্রু বলে অসম্মান করতে পারি? যার গৌরবে দেশ বিশ্বের কাছে আপন গৌরবের পরিচয় দিতে পারে এমন লোক কি আমাদের অনেক আছে? দেশের যথার্থ মহাপুরুষের নামে গৌরব করার অর্থই দেশের ভবিষ্যতের জন্যে আশা করা। সে গৌরব প্রাদেশিক হলে, সাময়িক হলে,

তার উপরে নির্ভর করা চলে না। সে গৌরব এমন হওয়া চাই সমস্ত পৃথিবী যার সমর্থন করে। রামমোহনের চিত্ত, তাঁর হৃদয়, স্থানিক ও ক্ষণিক পরিধিতে বদ্ধ ছিল না। যদি থাকত তবে দেশের সাধারণ লোকে অনায়াসে তাঁকে সমাদর করতে পারত। কারণ, যে মানদণ্ড আমাদের নিত্য ব্যবহারের দ্বারা সুপরিচিত তা বিশেষ দেশকালের, তা সর্বদেশ ও চিরন্তন কালের নয়। কিন্তু সেই পরিমাপের দ্বারা পরিমিত গৌরবের জোরে দেশ মাথা তুলতে পারবে না, সর্বদেশকালের সর্বলোকের কাছে তাকে আত্মপ্রকাশ করাতে পারবে না। তার মহত্ত্বকে নিম্নভূমিবর্তী জনতার আদর্শকে অনেক উপরে ছাড়িয়ে উঠতে হবে। তাতে করে বর্তমান-কালের সাম্প্রতিক রূচি বিশ্বাস ও আচার তাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো আঘাত চিরন্তন আদর্শের আঘাত। দিঙ্‌নাগাচার্যের স্থূলহস্তের আঘাত উপস্থিতের আঘাত, সেই উপস্থিত মুহূর্তে নিজেই সদ্যোধ্বংসোন্মুখ, কিন্তু ভারতীয় সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের আঘাত শাশ্বত কালের। সে আঘাতে যারা বিলুপ্ত হয়েছে তাদের সমসাময়িক জয়ধ্বনির তারস্বর মহাকালের মহাকাশে ক্ষীণতম স্পন্দনও রাখে নি।

ক্ষণিক অনাদরের তুফানে যাদের নাম তলিয়ে যায় রামমোহন রায় তো সেই শ্রেণীর লোক নন। বিস্মৃতি বা উপেক্ষার কুহেলিকা তাঁর স্মৃতিকে কিছুকালের জন্য আচ্ছন্ন রাখলেও সে আবরণ কেটে যাবেই। দেশে আজ নবজাগরণের হাওয়া যখন দিয়েছে, সরে যাচ্ছে বাষ্পের অন্তরাল, তখন সর্বপ্রথমেই দেখা যাবে রামমোহনের মহোচ্চ মূর্তি। নবযুগের উদ্‌বোধনের বাণী দেশের মধ্যে তিনিই তো প্রথম এনেছিলেন, সেই বাণী এই দেশেরই পুরাতন মন্ত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল; সেই মন্ত্রে তিনি বলেছিলেন 'অপাবৃণু', হে সত্য, তোমার আবরণ অপাবৃত করো। ভারতের এই বাণী কেবল স্বদেশের জন্যে নয়, সকল দেশের সকল কালের জন্যে। এই কারণেই ভারতবর্ষের সত্য যিনি প্রকাশ করবেন তাঁরই প্রকাশের ক্ষেত্র সর্বজনীন। রামমোহন রায় সেই সর্বকালের মানুষ। আমরা গর্ব করতে পারি স্থানিক ও সাময়িক ক্ষুদ্র মাপের বড়োলোককে নিয়ে, কিন্তু যাঁদের নিয়ে গৌরব করতে পারি তাঁরা 'পূর্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ'। তাঁদের মহিমা পূর্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রকে স্পর্শ করে আছে।

ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ের যাঁরা পূর্ববর্তী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবীর, নিজেকে বলেছিলেন ভারতপথিক। ভারতকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মহাপথরূপে। এই পথে ইতিহাসের আদিকাল থেকে চলমান মানবের ধারা প্রবাহিত। এই পথে স্মরণাতীত কালে এসেছিল যারা, তাদের চিহ্ন ভূগর্ভে। এই পথে এসেছিল হোমাগ্নি বহন করে আর্যজাতি। এই পথে একদা এসেছিল মুক্তিতত্ত্বের আশায় চীনদেশ থেকে তীর্থযাত্রী। আবার কেউ এসেছে সাম্রাজ্যের লোভে, কেউ এল অর্থকামনায়। সবাই পেয়েছে আতিথ্য। এ ভারতে পথের সাধনা, পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে যাওয়া-আসার নেওয়া-দেওয়ার সম্বন্ধ, এখানে সকলের সঙ্গে মেলবার সমস্যা সমাধান করতে হবে। এই সমস্যার সমাধান যতক্ষণ না হয়েছে ততক্ষণ আমাদের দুঃখের অন্ত নেই। এই মিলনের সত্য সমস্ত মানুষের চরম সত্য, এই সত্যকে আমাদের ইতিহাসে অঙ্গীভূত করতে হবে। রামমোহন রায় ভারতের এই পথের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ভারতের যা সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাই নিয়ে। তাঁর হৃদয় ছিল ভারতের হৃদয়ের প্রতীক—সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান সকলে মিলেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ সত্তায়, সেই মেলবার আসন ছিল ভারতের

মহা ঐক্যতত্ত্ব, একমেবাদ্বিতীয়ম্। আধুনিক যুগে মানবের ঐক্যবাণী যিনি বহন করে এনেছেন, তাঁরই প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ভারতের আধুনিক কবি ভারতপথের যে গান গেয়েছে তাই উদ্‌ধৃত করে রামমোহনের প্রশস্তি শেষ করি—

হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।...

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওংকারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

১৬ পৌষ ১৩৪০

৩

আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক প্রতিকূল লোকমত প্রায়ই অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দেয়—ব্যক্তিগত কটুভাষণের সঙ্গে বিজড়িত হওয়াতে সেই তীব্রতার সামনে দাঁড়িয়ে আপন মত প্রকাশ করা সংকোচের বিষয় হয়ে ওঠে। আজ আমার পক্ষে সেই সংকোচের দিনের অবসান হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে আমি মৃত্যুর গহনে অবতরণ করেছিলুম, এখনও তার বন্ধুর তটভাগে স্খলিত পদে চলেছি। আজ আমার পক্ষে লোকমতের প্রভাব আর প্রবল নয়—এখন নিরবধিকাল আমার সম্মুখে বর্তমান।

১১ই মাঘের উৎসব যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাকে আমাদের দেশের জনসাধারণ স্বীকার করে নি। যা তারা স্বীকার করে না তাকে তারা কলঙ্কিত করে। যিনি পরম শ্রদ্ধেয়, যেমন মহাত্মা রামমোহন রায়, তাঁর সম্বন্ধে বিরোধের উত্তাপ আজও প্রশমিত হয় নি। এটা স্বাভাবিক সুতরাং অনিবার্য, অতএব তাই নিয়ে পরস্পরকে লাঞ্ছিত করা নিরর্থক। এ-সকল দ্বন্দ্ব-কোলাহল ভুলে গিয়ে, অদ্যকার উৎসবের মূলে যাঁর মহান্ চারিত্রশক্তি প্রতিষ্ঠিত, শান্তমনে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশে আমাদের ভক্তি নিবেদন করব। মতভেদ সত্ত্বেও এই শ্রদ্ধার কারণকে সত্য

বলে স্বীকার করবেন, এ কথা আমাদের দেশের সকলের কাছেই প্রত্যাশা করতে পারি। কারণ এই সম্মানে স্বদেশের প্রতিই সম্মান।

পরজাতীয়কে যখন আমরা আচার ধর্ম নিয়ে বিচার করি তখন স্বভাবত অত্যুক্তি করে থাকি, বিশেষত যেখানে তাদের সঙ্গে এমন সম্বন্ধ যা দুঃখ দেয় এবং অপমান করে। কিন্তু তাদের ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনে অনেক মহত্ত্ব প্রকাশ করে থাকে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের দেশেও সামাজিক শত বাধা ভেদ করে মহাপুরুষের উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু সংস্কারের আবিলতায় আমরা তাঁদের ক্ষুদ্র করেছি, তাঁদের সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি নি। জাতীয় চিত্তদৈন্যের এই বিকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রত্যহ আমাদের ইতিহাসে।

খৃস্টধর্ম মানুষকে শ্রদ্ধা করেছে, কেননা তাঁদের যিনি পূজনীয় তিনি মানবের রূপে মানবের ভাগ্য স্বীকার করেছিলেন। এই কারণে যাঁরা যথার্থ খৃস্টান তাঁদের মানবপ্রীতি অকৃত্রিমভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে দেশে বিদেশে, আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। যদি তাঁদের ধর্মমতে কোনো অসম্পূর্ণতা থাকে বলে আমরা মনে করি, তবু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, অন্তত এক জায়গায় এই ধর্ম মানবজাতির সঙ্গে আত্মনিবেদনের যোগে তাঁদের সম্বন্ধযুক্ত করতে পেরেছে, সেটা ধর্মবুদ্ধির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁদের সাহিত্য এবং ব্যবহারে যেখানে মাহাত্ম্য দেখেছি মানবিকতা সেখানে সমুজ্জ্বল। সেখানে দৈন্য নেই, সেখানে স্বার্থের সংঘাতের ঊর্ধ্বে একটি উদার সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। আমাদের দেশে ধর্ম মানুষের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে; আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বাহন না হয়ে আধুনিক ভারতীয় ধর্মানুষ্ঠান দেশব্যাপী ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করেছে।

আচার যেখানে সাম্প্রদায়িক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নয় সেখানে তাই নিয়ে মানুষের পরস্পর অনৈক্য ঘটে না। যেমন চীনদেশে। চীন-সভ্যতায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিরোধ নেই মতের পার্থক্য সত্ত্বেও। আচারে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধর্মের নামে সমাজকে তারা নিপীড়িত করে নি। যখন এক সময়ে খৃস্টধর্ম ঈশ্বরের ক্রোধের দোহাই দিয়ে বাহুবলে নিজের প্রভুত্ববিস্তার-চেষ্টা করেছিল তখনই সে ভিন্নমতাবলম্বীদের নির্যাতন করেছে, কেননা তখনও তাদের ধর্ম শুভবুদ্ধিকে অমান্য করে সংস্কারকেই স্বীকার করেছিল। সর্বসাধারণের বিশ্বাসের কোনো বুদ্ধিসম্মত ভূমিকা তাতে দেখা দেয় নি শাস্ত্র-অনুশাসন ছাড়া। আজকের দিনে য়ুরোপীয় সভ্যতার বহু ত্রুটি সত্ত্বেও সমাজে ধর্মের অন্ধ আক্রমণ নেই, তাদের মধ্যে কেউ বৌদ্ধ বা মুসলমান হলে তাকে ধর্মের নাম নিয়ে অত্যাচার করা হয় না। আচার এবং ধর্মের মিশ্রণে তাদের সমাজ কলুষিত হয় নি— তাদের শক্তির একটি কারণ সেইখানে। আমাদের দেশে শক্তিক্ষয়ের প্রধান একটা হেতু, ধর্মের নাম নিয়ে প্রাত্যহিক জীবনে বহু নিরর্থক সংস্কারের আধিপত্য। এতে ধর্মের ভ্রষ্টতা এবং আচারের অত্যাচারপরায়ণ অন্যায় রূপ প্রকাশ পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে দক্ষিণ-মালাবারের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। কোনো ব্রাহ্মণেতর-জাতীয় ডাক্তারকে ব্রাহ্মণ গৃহস্থ আপন বাড়িতে নিয়েছিল চিকিৎসার জন্য, যে পথ দিয়ে গিয়েছিল সেটা কোনো পুষ্করিণীর তীরস্থ। তাতে মকদ্দমা উঠেছিল আদালত পর্যন্ত যে, সমস্ত পুষ্করিণীর জল দূষিত হয়েছে, অতএব তাকে শোধন করবার আইন জারি হোক অপরাধী গৃহস্থের উপর। এখানে দেখি দণ্ডদাতা আইন এবং আচারের সমবেত মূঢ় আক্রমণ, এর মধ্যে শাশ্বত ধর্মের পরিচয় নেই। অথচ ধর্মের নামে এইরকম অমানবিকতা আমাদের দেশে শ্রদ্ধা পেয়ে আসছে। মহাপুরুষ দৈবে

আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এই অধার্মিক ধর্মবিশ্বাস এবং বুদ্ধিবিরোধী আচারের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তথাপি দেশের জনসাধারণের মধ্যে নিরর্থক অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তিই ধর্মের মর্যাদা নিয়েছে এবং আজও ধর্মবোধহীন অমানবিকতার চাপে সমাজ মানুষকে অপমানিত করছে।

এইপ্রকার মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের অভিঘাতে সমাজ শতখণ্ডে ভেঙে পড়ল—তার নাম নিয়ে বেশির ভাগ দেশবাসীকে অবজ্ঞাভাজন করা হল, বলা হল অশুচি এবং অপাঙ্‌ক্তেয়। আচারের বেড়া গেঁথে যে বহুসংখ্যক মানুষকে দূরে সরিয়েছি তাদের দুর্বলতা এবং মূঢ়তা, তাদের আত্মাবমাননা সমগ্র দেশের উপর চেপে তাকে অকৃতার্থ করে রেখেছে সুদীর্ঘকাল। অথচ আমাদের যা বিশুদ্ধ, যা আমাদের সনাতন আধ্যাত্মিক সম্পদ তাতে মানুষের এবং সর্বজীবের মূল্য ভূরিপরিমাণ স্বীকার করেছে। আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি—এত বড়ো কথা বোধ হয় কোনো শাস্ত্রে নেই। সকলের মধ্যে আত্মার এই সম্বন্ধস্বীকার এবং এই সমগ্রের দৃষ্টিকে আমরা হারিয়েছি। আনুষ্ঠানিক মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ঘরে ঘরে আচারের এবং অনৈক্যের ব্যর্থতা বিস্তার করেছি। জাতীয় সত্তা শতধা বিখণ্ডিত হয়ে আজ আমাদের চরম দুরবস্থা উপস্থিত। এই দুর্গতিগ্রস্ত সমাজে একদিন একটি ব্রাহ্মণ-সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন, রামমোহন রায়। সমাজের সমস্ত অন্ধতাকে তিনি প্রতি পদে অস্বীকার করেছেন, নির্ভয়ে দাঁড়িয়েছেন মূঢ় সংস্কারের বিরুদ্ধে। সেজন্যে তিনি নিন্দাভাজন হয়েছেন এবং সেই নিন্দার আক্রমণ এখনও শান্ত হয় নি। এই দুর্গতির দিনেই আজ আমাদের পুনর্বার তাঁর বাণী স্মরণ করবার সময় এল। তাঁর মহাজীবনের মূল সাধনা কোন্‌খানে নিহিত তা আমাদের বুঝতে হবে।

উপনিষদের একটি মন্ত্র আছে—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম; বিশ্ববিধাতার একটা রূপ আছে যা কেবলমাত্র সত্য, অর্থাৎ আছে ছাড়া তার অন্য বাণী নেই। তার পরবর্তী কথা হচ্ছে জ্ঞানং—সে কেবলমাত্র হওয়া নয়। সত্যবোধের উপরে জ্ঞানের উপলব্ধিতে মনুষ্যত্বের বড়ো পদবী লাভ হল। সেই জ্ঞানকে যেখানে অবজ্ঞা করা হয়েছে, বুদ্ধির মোহমুক্ত বহুধা শক্তিকে প্রয়োগ না করে মানবত্বকে যেখানে অস্বীকার করেছি, সেইখানে আমাদের অকৃতার্থতা। জ্ঞানের সোপান দিয়ে উপনীত হই পরমাত্মায়, কৃত্রিম কর্মের পথে নয়। তাঁর সামীপ্যে সর্বমানবের মিলন। ব্রহ্মকে উপনিষদ-কথিত বাণীতে উপলব্ধি করতে হলে বিশ্বসত্যকে স্বীকার করে জ্ঞানের ভিতর দিয়ে আধ্যাত্মিক সত্যে পৌঁছতে হবে।

সংপ্রাপ্যৈনম্ ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি॥

সর্বব্যাপী আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সকলের মধ্যে জ্ঞানতৃপ্ত ঋষিরা প্রবেশ করেন। আমাদের শাস্ত্রমতে এই হচ্ছে মানুষের চরম সার্থকতা। এই বাণী ফিরিয়ে আনলেন মহাত্মা রামমোহন রায়। আনুষ্ঠানিক কৃত্যের বন্ধনে বন্দী সমাজকে ধর্মভ্রষ্টতা হতে আত্মোপলব্ধির সাধনায় প্রবৃত্ত করলেন তিনি; ভারতকে শোনালেন ঐক্যমন্ত্র যাতে চরম মানবসত্যের উপলব্ধি দ্বারা মানুষের মধ্যে সত্য এবং জ্ঞানের যোগে কল্যাণময় সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে। ধর্মের বিকার ভয়াবহ; বৈষয়িক ঈর্ষা-বিরোধে যে ক্ষতি করে তারও চেয়ে সাংঘাতিক ক্ষতি করেছে

ধার্মিকতা। আশ্চর্য ধীশক্তি নিয়ে রামমোহন দাঁড়ালেন জাতীয় ধর্মবিশ্বাসের কুহেলিকার অতীতে, সত্যের অকুণ্ঠিত প্রকাশে নিয়োগ করলেন তাঁর অতুলনীয় চারিত্রশক্তি। এই অধ্যবসায়ে তিনি ছিলেন একক, তিনি ছিলেন নিন্দিত। তাঁর সাধনাকে আজকের এই উৎসবে অন্তরে গ্রহণ করে নিজেকে এবং নিজের দেশকে যেন ধন্য করি।

মাঘ ১৩৪৭

৪

ভারতবর্ষের ভূ-সংস্থানের মধ্যে একটি ঐক্য আছে। এর উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সমুদ্রের বেষ্টন, পূর্ব দিকে গভীর অরণ্য, কেবল পশ্চিমে দুর্গম গিরিসংকটের পথ। ভৌগোলিক আকৃতির দিক থেকে তার অখণ্ডতা, কিন্তু লোকবসতির দিক থেকে সে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। আচারে বিচারে, ধর্মে ভাষায় ভারতবর্ষ পদে পদে খণ্ডিত। এখানে যারা পাশাপাশি আছে তারা মিলতে চায় না। এই দুর্বলতা দ্বারা ভারতবর্ষ ভারাক্রান্ত, আত্মরক্ষায় অক্ষম।

আর-একটি দুর্গতি স্থায়ী হয়ে এ দেশকে জীর্ণ করেছে। অশথ গাছ পুরাতন মন্দিরকে সর্বাঙ্গে বিদীর্ণ করে তাকে শিকড়ে শিকড়ে যেমন আঁকড়ে থাকে তেমনি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের মূঢ় সংস্কার-জাল দেশের চিত্তকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে জড়িয়ে রয়েছে। আগাছার মতো অন্ধসংস্কারের একটা জোর আছে, তার জন্য চাষ-আবাদের প্রয়োজন হয় না, আপনি বেড়ে ওঠে, মরতে চায় না। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানের ও ধর্মের উৎকর্ষের জন্য নিরন্তর সাধনা চাই। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে যেখানে উদার ক্ষেত্রে ফল ফলতে পারত সেখানে সর্বপ্রকার মুক্তির অন্তরায় উত্তুঙ্গ হয়ে উঠে অস্বাস্থ্যকর নিবিড় জঙ্গল হয়ে আছে। এমন-কি, এ দেশে যাঁরা বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁদেরও বহু লোকের মন গূঢ়ভাবে আফিমের নেশার মতো তামসিকতার দ্বারা অভিভূত। এর সঙ্গে লড়াই করা দুঃসাধ্য।

আর্যজাতি যাদের এক দিন পরাজিত করেছিলেন, অবশেষে তাদেরই প্রকৃতি জয়ী হয়েছে। সমস্ত দেশ জুড়ে ঘটিয়ে তুলেছে মারাত্মক আত্মবিচ্ছেদ। পরস্পরকে অবজ্ঞা করা এবং পাশ কাটিয়ে চলার যে দুর্ব্যবহার তা এই দেশের সকল জাতিকেই যুগ যুগ ধরে আঘাত করছে।

আমরা যখন আজ রাষ্ট্রীয় ঐক্যের জন্য বদ্ধপরিকর তখন এ কথা আমাদের স্পষ্টভাবে বোঝা আবশ্যক যে, অন্তরের ঐক্য হারিয়ে শুধু বাহ্য বিধির ঐক্যদ্বারা কোনো দেশ কখনোই সর্বজনীন একত্ববোধে মহাজাতীয় সার্থকতা পায় নি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বহু উপরাষ্ট্রের সমবায়ে একটি প্রকাণ্ড রাষ্ট্র—যেন একটা বৃহৎ রেলোয়ে ট্রেন, অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন গাড়ি পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে চলেছে সুনির্দিষ্ট পথে। সম্ভব হয়েছে তার একমাত্র কারণ, সেখানে সকলে শিক্ষায় দীক্ষায় নিবিড়ভাবে মিলে একজাতি হয়ে উঠেছে, মোটের উপরে ভাবনা ও বেদনার এক স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা সেখানে জনচিত্তকলেবর অধিকৃত। তারা পরস্পর পরস্পরের একপথে চলবার বাধা নয়, পরস্পরের সহায় তারা। তাদের শক্তি-সাফল্যের এই প্রধান কারণ।

খণ্ডিত মন ও আচরণ নিয়ে আমাদের ইতিহাসের গোড়া থেকে আমরা বরাবর হারতে হারতে এসেছি। আর, আজই কি আমরা সকল খণ্ডতা সত্ত্বেও জিতে যাব এমন দুরাশা পোষণ করতে পারি? বিদেশীর অপমান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঐক্যের দরকার আছে, এ কথা আমরা তর্কদ্বারা বুঝি, কিন্তু কোনোমতেই সেই অন্তর দিয়ে বুঝি নে যেখানে বিচ্ছেদের বিষ ছড়িয়ে আছে। বেহারের লোক, মাদ্রাজের লোক, মাড়োয়ারের লোককে আমরা পর বলেই জানি, তার প্রধান কারণ, যে আচারের দ্বারা আমাদের চিত্ত বিভক্ত সে আচার কেবল যে স্বীকার করে না বুদ্ধিকে তা নয়, বুদ্ধির বিরুদ্ধে যায়। আমাদের ভেদের রেখা রক্তের লেখা দিয়ে লিখিত। মূঢ়তার গণ্ডির মতো দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আর কিছুই নেই।

আমাদের দেশের হরিজন-সমস্যা এবং হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার মূলে যে মনোবিকার আছে তার মতো বর্বরতা পৃথিবীতে আর কী আছে জানি না। আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারি না, অথচ সে কথা স্বীকার না করে নিজেদের বঞ্চনা করতে যাই। মনে করি, ইংলণ্ড স্বাধীন হয়েছে পার্লামেণ্টের রীতি মেনে, আমরাও সেই পথ অনুসরণ করব। ভুলে যাই যে, সে দেশে পার্লামেণ্ট বাইরে থেকে আমদানি করা জিনিস নয়, অনুকূল অবস্থায় ভিতর থেকে সৃষ্ট হয়ে ওঠা জিনিস। এককালে ইংলণ্ডে প্রটেস্টাণ্ট এবং রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে প্রবল বিরোধ ছিল, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রভাবে তা ক্ষীণ হয়ে দূর হয়েছে। ধর্মের তফাত সেখানে মানুষকে তফাত করে নি।

মনুষ্যত্বের বিচ্ছিন্নতাই প্রধান সমস্যা। সেইজন্যই আমাদের মধ্যে কালে কালে যে-সব সাধক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আবির্ভাব হয়েছে তাঁরা অনুভব করেছেন, মিলনের পন্থাই ভারতপন্থা। মধ্যযুগে যখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছেদ বড়ো সমস্যা হয়ে উঠেছিল তখন দাদূ কবীর প্রভৃতি সাধকগণ সেই বিচ্ছেদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ঐক্য-সেতু প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে গেছেন।

কিন্তু একটা কথা তাঁরাও ভাবেন নি। প্রদেশে প্রদেশে আজ যে ভেদজ্ঞান, একই প্রদেশের মধ্যে যে পরস্পর ব্যবধান, একই সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে বিভক্ততা, এ দুর্গতি তখন তাঁদের চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে নি। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার বিচ্ছেদ আমাদের পীড়া দিচ্ছে। এই পীড়া উভয় পক্ষেই নিরতিশয় দুঃসহ দুর্বহ হয়ে উঠলে উভয়ের চেষ্টায় তার একটা নিষ্পত্তি হতে পারবে। কিন্তু এর চেয়ে দুঃসাধ্য সমস্যা হিন্দুদের, যারা শাশ্বত ধর্মের দোহাই দিয়ে একই সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষের প্রতি সুবুদ্ধিবিরুদ্ধ অসম্মানকর নিরর্থক ভাগ-বিভাগ নিত্য করে রাখে।

এইজন্যই মনে হয়, নিবিড় প্রদোষান্ধকারের মধ্যে আমাদের দেশে রামমোহন রায়ের জন্ম একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অনেক পূর্বেই তাঁর শিক্ষা ছিল প্রাচ্য বিদ্যায়। অথচ ঘোরতর বিচ্ছেদের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান লাভ করবার মতো বড়ো মন তাঁর ছিল। বর্তমান কালে অন্তত বাংলা দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বপ্রথম দূত ছিলেন তিনি। বেদ-বেদান্তে উপনিষদে তাঁর পারদর্শিতা ছিল, আরবি-পারসিতেও ছিল সমান অধিকার, শুধু ভাষাগত অধিকার নয়, হৃদয়ের সহানুভূতিও ছিল সেইসঙ্গে। যে বুদ্ধি, যে জ্ঞান দেশকালের সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে যায় তারই আলোকে হিন্দু মুসলমান এবং খৃস্টান তাঁর চিত্তে এসে মিলিত হয়েছিল। অসাধারণ দূরদৃষ্টির সঙ্গে সার্বভৌমিক নীতি এবং সংস্কৃতিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। শুধু ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে নয়, কর্মের ক্ষেত্রেও তাঁর বুদ্ধি ছিল সর্বগ। এ দেশে রাষ্ট্রবুদ্ধির তিনিই প্রথম পরিচয় দিয়েছেন। আর

নারীজাতির প্রতি তাঁর বেদনাবোধের কথা কারও অবিদিত নেই। সতীদাহের মতো নিষ্ঠুর প্রথার নামে ধর্মের অবমাননা তাঁর কাছে দুঃসহভাবে অশ্রদ্ধেয় হয়েছিল। সেদিন এই দুর্নীতিকে আঘাত করতে যে পৌরুষের প্রয়োজন ছিল আজ তা আমরা সুস্পষ্টভাবে ধারণা করতে পারি নে।

রামমোহন রায়ের চিত্তভূমিতে বিভিন্ন সম্প্রদায় এসে মিলিত হতে পেরেছিল, এর প্রধান কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপদেশকে তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। ভারতীয় বিদ্যা এবং ধর্মের মধ্যে যেখানে সবাই মিলতে পারে সেখানে ছিল তাঁর সাধনার ক্ষেত্র, সেখান থেকেই তিনি বাণী সংগ্রহ করেছিলেন। সেই ছিল তাঁর পাথেয়। ভারতের ঋষি যে আলো দেখেছিলেন অন্ধকারের পরপার হতে, সেই আলোই তিনি আপন জীবনযাত্রাপথের জন্য গ্রহণ করেছিলেন।

ভাবলেও বিস্ময় জন্মে যে, সেই সময়ে কী করে আমাদের দেশে তাঁর অভ্যাগম সম্ভবপর হয়েছে। তখন দেশে একটা দল ইংরেজি শিক্ষার অত্যন্ত বিরুদ্ধে ছিলেন, ম্লেচ্ছবিদ্যাতে অভিভূত হয়ে আমরা ধর্মচ্যুত হয়ে পড়ব, এই ছিল তাঁদের ভয়। এ কথা কেউ বলতে পারবে না যে, রামমোহন পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা দ্বারা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন. প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞান তাঁর গভীর ছিল, অথচ তিনি সাহস করে বলতে পেরেছিলেন—দেশে বিজ্ঞানমূলক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিস্তার চাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার যথার্থ সমন্বয় সাধন করতে তিনি চেয়েছিলেন। বুদ্ধি জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক সম্পদের ক্ষেত্রে তাঁর এই ঐক্যসাধনের বাণী ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনা।

আজ যদি তাঁকে আমরা ভালো করে স্বীকার করতে না পারি, সে আমাদেরই দুর্বলতা। জীবিতকালে তাঁর প্রত্যেক কাজে আমরা তাঁকে পদে পদে ঠেকিয়েছি। আজও যদি আমরা তাঁকে খর্ব করবার জন্য উদ্যত হয়ে আনন্দ পাই সেও আমাদের বাঙালি চিত্তবৃত্তির আত্মঘাতী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়।

তাঁকে কোনো বিশেষ আচারী সম্প্রদায় সহ্য করতে পারে নি, এতেই তাঁর যথার্থ গৌরবের পরিচয়। প্রচলিত ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আপনাকে সীমাবদ্ধ করে রাখলে তিনি অনায়াসে জয়ধ্বনি পেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে সবাইকে জড়িয়ে সমগ্র দেশের মধ্যে তাঁর বাণীকে প্রচার করে গেছেন। তাঁর এই কাজ সহজ কাজ নয়। এইজন্য তাঁকে আজ নমস্কার করি।

আমাদের অন্তরেও মুক্তি নেই, ঘরেও মুক্তি নেই। পর পর বিদেশী আমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হয়েছে। কেননা, অন্তরের সঙ্গে আমরা স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিতে পারি নি, সকলকে আমরা গ্রহণ করতে পারি নি। আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে, দুঃখ দারিদ্র্য এবং পরাভব যেখানে এত বড়ো সেখানে সকলকে গ্রহণ করার মতো বড়ো হৃদয়ও চাই। মহাপুরুষ রামমোহন রায়ের সেই-রকম বড়ো হৃদয় ছিল। আজ তাঁকেই নমস্কার করব বলে এখানে এসেছি।

১০ আশ্বিন ১৩৪৩

৫

মানুষ সন্ধানী। আদিকাল হতে সে কেবল খুঁজে খুঁজেই বেড়িয়েছে। যখন তার সমস্ত চিত্তের উন্মেষ হয় নি তখনও সে আপনার সন্ধান-প্রবৃত্তিকে ক্রমাগত জাগিয়েছে। এই চলার পথে পরিশ্রান্ত হয়ে সে কত বার তার চার দিকে একটা গণ্ডি টেনে দিয়ে বলেছে— এই হল আমার গম্যস্থান, এখান থেকে আর এক পা'ও নড়ব না। অভ্যাস আর অনুষ্ঠানের বেড়া গড়ে তুলে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে যাতে তাকে আর সাধনা করতে না হয়, সন্ধান করে বেড়াতে না হয়। মন্ত্রকে খুঁটির মতো তৈরি করে সে তার চার দিকে কেবলই ঘানির বলদের মতো ঘুরেছে। পরিচিত কতকগুলো অভ্যাস অবলম্বন করে মানুষ আরাম চেয়েছে।

কিন্তু মানুষ তো আরামের জীব নয়। স্থাণুর মতো স্থির হয়ে আপাত পরিতৃপ্তি নিয়ে সে যখন বসে থাকে তখন তার সেই আরামলোভী সমাজের মধ্যেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব নিয়ে মহামানুষ জন্মায়। সে বলে— আমরা তো গহ্বরচর জীব নই, একটা নিত্যনিয়মিত গতিহারা রুদ্ধ জীবনের আহার বিহার ও আরাম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে আমাদের চলবে না তো! মহাপুরুষ সাধনার পথকে স্বীকার করে নেন, সত্যকে সন্ধান করে তিনি সেই গভীরকে সেই অসীমকে উপলব্ধি করতে চান। সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার সীমা অতিক্রম করার জন্যে তিনি তাঁর বেড়াভাঙার বাণী নিয়ে আসেন। মনে করিয়ে দেন যে, আরামের মধ্যে আনন্দ নেই, আনন্দকে মিলবে কেবল সেই অসীমের প্রাঙ্গণে। লোকে বলে এতদিনকার অভ্যাস আর অনুষ্ঠান দিয়ে বেড়া তৈরি করেছি, এখন সে গণ্ডি ভাঙব কী করে? এসেছি আমরা আমাদের গম্যস্থানে, আরামে আছি, আর খুঁজে বেড়াতে চাই না। তারা তাদের মিথ্যাকেই আঁকড়ে ধরে মহাপুরুষের সত্যবাণীকে অস্বীকার করে; তাঁকে গাল দেয়, অপমানও করে। বিজ্ঞানের দিক দিয়েও আমরা দেখি মানুষ আরাম পাবার জন্যে তার বুদ্ধিকে একদা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। প্রাচীনকালে লোক বলত যে, আকাশ একটা কঠিন গোলকার্ধ, তাতে নড়চড় নেই, মাথার উপর এই ফার্মামেণ্ট (firmament) কল্পনা করে নিয়ে এবং জগৎ-সংসারের সমস্ত নিয়ম একেবারে বেঁধে ফেলে মানুষ আরাম পেলে— যেন বিভ্রমের পথে তার ভ্রাম্যমাণ বুদ্ধির একটা স্থিতি হল। আমাদের দেশের জ্ঞানবৃদ্ধেরাও বলেছেন যে, সুমেরুশিখরের এক দিক দিয়ে সূর্য ওঠে এবং আর-এক দিকে নামে; কচ্ছপের খোলসের উপর আর বাসুকির মাথায় পৃথিবী অবস্থিত এই কল্পনা করে ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তাঁরা একটা ব্যাখ্যা করে নিলেন। এতে করে তাঁদের বুদ্ধি আরাম পেলে। কিন্তু সে বাঁধা নিয়ম টিকল না তো! মানুষই তো শেষকালে বললে, পৃথিবীও চলছে। আরামপ্রিয় মানুষ এই সম্ভাবনায় হিংস্র হয়ে উঠল, সন্ধানের দুরূহ পথে পরিশ্রান্ত হবার ভয়ে সে বৈজ্ঞানিককে বললে, তার কথা প্রত্যাহার করতে। মানুষ কিন্তু অভ্যাসকে মানে নি, যদিও সে বাঁধামতওয়ালাদের কাছে অবমানিত হয়েছে, মার খেয়েছে। প্রাণ দিয়েও মানুষ সত্যকে দেখাবার প্রয়াস করেছে, ভয় পায় নি।

ধর্মেও দেখি সেইরকম বাঁধা নিয়ম, কত শুচিতা কত কৃত্রিম গণ্ডি। নিয়মপালন করে আচার আবৃত্তি আর অভ্যাস রক্ষা করে সে তার চিন্তাকে অবকাশ দিতে চেয়েছে বহুবিধ জটিলতা থেকে। মানুষ বলেছে যে, আদিকাল থেকে ব্রহ্মা যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন, তার বাইরে যাবার জো নেই। ফলে নিত্য কৃত্রিমতার দরুন তার মন অসাড় হয়ে যায়, সে তখন নিত্যধর্ম অর্থাৎ সত্যকে মেনে নিতে দ্বিধাবোধ

করে। আমাদের দেশে ধর্মের যখন এইরকম নিঃসাড় অবস্থা তখন রামমোহন এসেছিলেন। বাঁধা নিয়মের পথ পরিত্যাগ করে তিনি দুর্গম পথের যাত্রী হয়েছিলেন। এ কথা বলা যাবে না যে, শাস্ত্রজ্ঞ না হয়ে তিনি অন্য পথ বেছে নিয়েছিলেন। আচার আবৃত্তি ও অনুষ্ঠানের মধ্যে মন তাঁর তৃপ্তি মানে নি, অসীমের সন্ধান করতে গিয়ে তিনি উপনিষদের দ্বারে এসে পৌঁচেছিলেন। অন্যান্য মহাপুরুষের মতো তিনিও এসেছিলেন সন্ধানের পথে মানুষকে মুক্তি দিতে। তাঁদের মতোই কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা, কত অবমাননা তাঁকে সইতে হয়েছে, কিন্তু বিপদ কোনোদিন তাঁকে সত্যপথ থেকে বিচলিত করতে পারে নি।

অতি বড়ো শোক ও বেদনার মধ্যে পিতামহীর মৃত্যুর পর পিতা আমার শান্তি চেয়েছিলেন। তাঁর সেই পীড়িত ও শোকাতুর চিত্ত আকাশের দিকে হাত বাড়িয়েছিল; তিনিও প্রচলিত ধর্মের বাঁধন ছিঁড়ে এই উপনিষদের দ্বারে, সীমার ঊর্ধ্বে গিয়ে অসীমকে উপলব্ধি করার জন্যে এসেছিলেন। মুক্তির জন্যে তিনি রামমোহনের কাছে গিয়েছিলেন।

রামমোহন সম্পর্কে আজকের দিনটা একটা স্মরণীয় দিন। ছোটো একটা মণ্ডলী গড়ে উঠেছিল তাঁর চার দিকে; তাঁদের কাছে তিনি ধর্মপ্রচার করতে যান নি। তাঁদের সঙ্গে একসাথে সত্যের সাধনা করেছিলেন। অভ্যাসের টান এবং শাসন থেকে বন্ধন-মোচন করতে তিনি এসেছিলেন মুক্তির দূত হয়ে। নিজের বন্ধন মোচন করে অপরকে মুক্ত করার কর্তব্য তিনি করে গিয়েছেন। তিনি যদি ব্যর্থ হয়ে থাকেন তবে সে আমাদের নিজেদেরই ব্যর্থতা; যদি তাঁর সাধনার বীজ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে থাকে তবে তা হল সেই মহাপুরুষেরই কাজ।

১১ মাঘ [১৩৪২]

৬

আমাদের জীবনে যে-সব লাভ পরম লাভ মাঝে মাঝে তাই উপলব্ধি করবার জন্যে আমাদের উৎসবের দিন। সেদিন যা আমাদের শ্রেষ্ঠ, যা আমাদের সত্য, যা আমাদের গৌরবের, তারই জন্যে আসন প্রস্তুত হয়, অন্তরের আলো বড়ো করে জ্বালাই, যা আমাদের চিরন্তন সেদিন তাকে ভালো করে দেখে নেবার জন্যে আমরা মিলি।

পশুপাখিদেরও প্রাণের ঐশ্বর্য আছে। সে তাদের প্রাণশক্তিরই বিশেষ বিকাশ। পাখি উড়তে পারে, এ তার একটি সম্পদ। মাঝে মাঝে এই সম্পদকে সে উপলব্ধি করতে চায়, মাঝে মাঝে সে ওড়ে, কোনো প্রয়োজনে নয়, ওড়বারই জন্যে; সে তার পক্ষচালনা দিয়ে আকাশে এই কথা ঘোষণা করে যে, 'আমি পেয়েছি।' এই তার উৎসব। বুনো ঘোড়া খোলা মাঠে এক-এক সময় খুব করে দৌড়ে নেয়— কোনো কারণ নেই। সে নিজেকে বলে, আমার গতিবেগ আমার সম্পদ; 'আমি পেয়েছি।' এই উৎসাহ ঘোষণা করেই তার উৎসব। ময়ূর এক-একবার আপন মনে তার পুচ্ছ বিস্তার করে, আপন পুচ্ছশোভার প্রাচুর্য-গৌরব সে আপনারই কাছে প্রকাশ করে; আপন অস্তিত্বের ঐশ্বর্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে সে অনুভব করে যে, জীবলোকে তার একটি বিশেষ সম্মান আছে। সেও বলে, 'আমি পেয়েছি।'

কিন্তু মানুষের উৎসব তার প্রাণসম্পদের চেয়ে বেশি কিছু নিয়ে। যা সে সহজে পেয়েছে তাতে সে অন্য জীবজন্তুর সঙ্গে সমান, যা সে সাধনা করে পেয়েছে তাতেই সে মানুষ। সে আপনার ঐশ্বর্য আপনি যখন সৃষ্টি করে তখনই সে আপনাকে সত্য করে পায়। তখনই সে বলে, 'আমি পেয়েছি।' তার আনন্দ সৃষ্টির আনন্দ।

যা খুশি তাই বানিয়ে তোলা মাত্রকেই সৃষ্টি বলে না। কোনো বিশ্বসত্যকে লাভ করার যোগে প্রকাশ, ও প্রকাশ করার যোগে লাভ করাকেই বলে সৃষ্টি। সুতরাং সে কারও একলা নয়। পশুপক্ষীর যে উৎসবের কথা পূর্বে বলেছি সে তাদের একলার, মানুষের উৎসব সকলকে নিয়ে। লক্ষপতি তার ব্যবসায়ে মস্ত লাভ করতে পারে, তা নিয়ে সে ঘটা করে ভোজ দিতেও পারে, কিন্তু সেইখানেই সেটা ফুরাল, মানুষের উৎসবলোকে সে স্থান পেল না। সে আপন লাভকে অতি সতর্কতা ও কৃপণতার সঙ্গে লোহার সিন্দুকের মধ্যে বন্দী করে রাখে, তার পরে একদিন সে অতি কঠিন পাহারার ভিতর থেকেও শূন্যে অন্তর্ধান করে। সে নিজে সৃষ্টি নয় বলেই উৎসব সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি মানে উৎসৃষ্টি, যা সকল ব্যয়কে অতিক্রম করে দানরূপে থেকে যায়।

চিরকালের ঐশ্বর্য যখন তার কাছে প্রকাশ পায় তখন মানুষ বড়ো করে বলতে চায় 'আমি পেয়েছি'। এ কথা সে বলতে চায় সকল দেশকে, সকল কালকে, কেননা পাওয়া তার একলার নয়। ঋষি একদিন বিশ্বকে বলেছিলেন, 'পেয়েছি, জেনেছি —বেদাহং।' ঋষি সেইসঙ্গেই বলেছেন, 'আমার পাওয়া তোমাদের সকলের পাওয়া —শৃণ্বন্তু বিশ্বে।' এই বাণীই উৎসবের বাণী। মানুষের উৎসবে চিরন্তন কালের আনন্দ ও আহ্বান।

ঘরে যখন কোনো শুভ ঘটনা ঘটে, যেমন সন্তানের জন্ম বা বিবাহ, সেটাতেও আমাদের দেশের মানুষ সকলকে ডাকে; বলে, 'আমার আনন্দে তোমরাও আনন্দ করো। আমার গৃহের উৎসব যখন বাইরে গিয়ে পৌঁছবে তখনই তা সম্পূর্ণ হবে।' বস্তুত মানুষের ব্যক্তিগত শুভ ঘটনা, যা মানব-সম্বন্ধের কোনো-একটি বিশেষ রূপকে প্রকাশ করে যেমন জননীর সন্তানলাভ বা নরনারীর প্রেম-সম্মিলন, তাও একান্ত ব্যক্তিগত নয়; নবজাত শিশু বা নবদম্পতি শুধু মাত্র ঘরের না, তারা সমস্ত সমাজের। এইজন্যে গৃহের উৎসবকে সর্বজনের উৎসব যখন করি তখনই তা সার্থক হয়।

আজকের উৎসবের বাণী হচ্ছে এই যে, সমস্ত মানবের হয়ে আমরা একটি ব্রত লাভ করেছি, ব্রতপতি আমাদের এই ব্রতকে সার্থক করুন। এ আমাদের মিলনের ব্রত। একটি মহৎ জীবনের ভিতর থেকে এই ব্রত উদ্ভাবিত—একজন মহামানব এর প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, আমরা যেন একে গ্রহণ করি।

মানুষ তার যে জীবনকে সহজে পেয়েছে সেই জীবনকে সৃষ্টি করার দ্বারা বিশিষ্টতা দিলে তবেই তাকে যথার্থ করে পায়। তা করতে গেলেই কোনো একটি বড়ো সত্যকে আপন জীবনের কেন্দ্ররূপে আশ্রয় করা চাই। সেই কেন্দ্রস্থিত ধ্রুব সত্যের সঙ্গে আপন চিন্তাকে কর্মকে, আপন দিনগুলিকে সংযুক্ত করে জীবনকে সুসংযত ঐক্য দিতে পারলে তবেই তাকে বলে সৃষ্টি। এই সৃষ্টির কেন্দ্রটি না পেলে তার দিনগুলি হয় বিচ্ছিন্ন, তার কর্মগুলির মধ্যে কোনো নিত্যকালের তাৎপর্য থাকে না। তখন জীবনটা আপন উপকরণ নিয়ে স্তূপাকার হয়ে থাকে, রূপ পায় না। তাতেই মানুষের দুঃখ। এই বিশ্বসৃষ্টির যজ্ঞে যা-কিছু থাকে

অস্পষ্ট, বিক্ষিপ্ত, যা-কিছু রূপ না পায়, তাই হয় বর্জিত। একেই বলে বিনষ্টি। যাঁরা আপনার মধ্যে সৃষ্টির সার্থকতা পেয়েছেন, যাঁরা নিজের জীবনের মধ্যে সত্যকে বাস্তব করে তুলেছেন, তাকে রূপ দিতে পেরেছেন, অমৃতাস্তে ভবন্তি।

অধিকাংশ মানুষ বিষয়লাভের উদ্দেশ্যকেই জীবনের কেন্দ্র করে। তার অধিকাংশ উদ্যম এই এক উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এতেও জীবনকে ব্যর্থ করে, তার কারণ এই যে, মানুষ মহৎ, যতটুকু তার নিজের পোষণের জন্য, যতটুকু কেবল তার অদ্যতন, তাতে তার সমস্তটাকে ধরে না। এই সত্যটিকে প্রকাশ করবার জন্যে মানুষ দুটি শব্দ সৃষ্টি করেছে, অহং আর আত্মা। অহং মানুষের সেই সত্তা, যার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও আয়োজন চিরকালের থেকে ক্ষণিকতার মধ্যে, সর্বলোকের থেকে এককের মধ্যে তাকে পৃথক করে রেখেছে। আর আত্মার মধ্যে তার সর্বজনীন ও সর্বকালীন সত্তা। সমস্ত জীবন দিয়ে যদি মানুষ অহংকেই প্রকাশ করে তবে সে সত্যকে পায় না; তার প্রমাণ, সে সত্যকে দেয় না। কেননা সত্যকে পাওয়া আর সত্যকে দেওয়া একই কথা, যেমন প্রদীপের পক্ষে আলোকে পাওয়া। মানুষের পক্ষে আত্মাকে উপলব্ধি ও আত্মাকে দান করা একই কথা। আপনার সৃষ্টিতে মানুষ আপনাকে পায় এবং আপনাকে দেয়। এই দান করার দ্বারাই সে সর্বকাল ও সর্বজনের মধ্যে নিত্য হয়।

আমাদের মধ্যে বিচিত্র অসংলগ্ন ও পরস্পর-বিরুদ্ধ কত প্রবৃত্তি রয়েছে। এগুলি প্রাকৃতিক—মাটি যেমন, শিলাখণ্ড যেমন প্রাকৃতিক। এরা সৃষ্টির উপকরণ। প্রকৃতির ক্ষেত্রে এদের অর্থ আছে, কিন্তু মানুষ এদের ভিতর থেকে আপন সংকল্পের বলে যখন একটি সম্পূর্ণ মূর্তি উদ্ভাবিত করে তখনই মানুষ এদের প্রতি আপন সার্থকতার মূল্য অর্পণ করে। বাঘের অস্তিত্বরক্ষায় প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির প্রয়োজন আছে, তার হিংস্রতা তার জীবনযাত্রার উপযোগী, এইজন্য তার মধ্যে ভালোমন্দর মূল্যভেদ নেই। কিন্তু কেবলমাত্র জৈব অস্তিত্বরক্ষায় মানুষের সম্পূর্ণতা নয়; বহুযুগের ইতিহাসের ভিতর দিয়ে মানুষ আপনাকে সৃষ্টি করে তুলছে—সেই তার মনুষ্যত্ব। এই তার আপন সৃষ্টির পক্ষে তার প্রকৃতিগত যে উপাদান অনুকূল তাই ভালো, যা প্রতিকূল তাই রিপু। এইজন্যে মানুষের জীবনের মাঝখানে এমন একটি মূল সত্যের প্রতিষ্ঠা থাকা চাই যা তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতা-বিরুদ্ধতাকে সমন্বয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে ঐক্যদান করতে পারে। তবেই সে আপনার পরিপূর্ণ চিরন্তন সত্যকে পায়। সেই সত্যকে পাওয়াই অমৃতকে পাওয়া, না পাওয়া মহতী বিনষ্টি। অর্থাৎ যে বিনাশ তার দৈহিক জীবনের অভাবের বিনাশ সে নয়, তার চেয়েও বেশি; যা তার অমৃত থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিনাশ, তাই।

যেমন ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে তেমনি তার সমাজের পক্ষে একটি সত্যের কেন্দ্র থাকা চাই। নইলে সে বিচ্ছিন্ন হয়, দুর্বল হয়, তার অংশগুলি পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে থাকে। সেই কেন্দ্রটি এমন একটি সর্বজনীন সত্য হওয়া চাই, যা তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে সর্বাঙ্গীণ ঐক্য দিতে পারে—নইলে তার না থাকে শান্তি, না থাকে শক্তি, না থাকে সমৃদ্ধি; সে এমন-কিছুকে উদ্ভাবন করতে পারে না যার চিরকালীন মূল্য আছে। সমাজ মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো সৃষ্টি। সেইজন্যেই দেখি ইতিহাসের আরম্ভ হতেই যখন থেকে মানুষ দলবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই সে তার সম্মিলনের কেন্দ্রে এমন একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে যা তার সমস্ত খণ্ডকে জোড়া দিয়ে এক করতে পারে। এইটের

উপরেই তার কল্যাণের নির্ভর। এইটেই তার সত্য, এইটেই তার অমৃত, নইলে তার বিনষ্টি।

বস্তুত এই ঐক্যের মূলে মানবজাতি এমন-কিছুকে অনুভব করে যার প্রতি তার ভক্তি জাগে, যার জন্যে সে প্রাণ দেয়, যাকে সে দেবতা বলে জানে। মানুষ বাহ্যত বিচ্ছিন্ন, অথচ তার অন্তরের মধ্যে পরস্পর-যোগের যে শক্তি নিয়ত কাজ করছে তা পরম রহস্যময়, তা অনির্বচনীয়; তা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দেশে কালে বহুদূরে অতিক্রম করে চলে।

বিশেষ বিশেষ উপজাতি আপনাদের ঐক্যবন্ধনের গোড়ায় যে দেবতাকে স্থাপিত করেছে সেই দেবতাই বিশেষ সমাজের মধ্যে ঐক্য বিস্তার করলেও অন্য সমাজের বিরুদ্ধে ভেদবুদ্ধিকে একান্ত উগ্র করে তোলে। ধর্মের ঐক্যতত্ত্বকে সংকীর্ণ সীমায় স্থানিক রূপ দেবা মাত্রই তা বাহিরের সঙ্গে বিচ্ছেদের সাংঘাতিক অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিভীষিকা অনেক আছে— ঝড়, বন্যা, অগ্ন্যুৎপাত, মারী— কিন্তু মানুষের ইতিহাস খুঁজে দেখলে দেখা যায় ধর্মের বিভীষিকার সঙ্গে তাদের তুলনাই হয় না। সর্বমানবের অন্তরতম যে গভীর ঐক্য, মানুষের ধর্মই তার সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু ছিল, এবং সেই শত্রুতা যে আজও ঘুচে গেছে তা বলতে পারি নে।

তাই যুগে যুগে যাঁরা সাধকশ্রেষ্ঠ তাঁদের সাধনা এই যে, দেবতার সম্বন্ধে মানুষের যে বোধ স্থানে রূপে ও ভাবে খণ্ডিত তাকে অখণ্ড করা; সাম্প্রদায়িক কৃপণতা যে ধর্মকে আপন আপন বিশেষ বিশ্বাস বিধি ও ব্যবহারের দ্বারা বদ্ধ করেছে তাকে মুক্ত করে দিয়ে সর্বমানবের পূজাবেদিতে প্রতিষ্ঠিত করা। যখনই তা ঘটে তখনই সেই ধর্মের উৎসবে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি আহ্বান ধ্বনিত হয়, সেই উৎসবক্ষেত্র কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকে না। তখন ধর্মবোধের সঙ্গে যে অবাধ ঐক্যতত্ত্ব একাত্ম তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ইতিহাসে দেখা গেছে, একদা য়িহুদিরা তাঁদের ঈশ্বরকে তাঁদের জাতিগত অধিকারের মধ্যে সংকীর্ণ করে রেখেছিলেন; তাঁদের ধর্ম তাঁদের দেবতার প্রসাদকে নিজেদের ইতিহাসের মধ্যে একান্ত পুঞ্জিত করে রাখবার ভাণ্ডারঘরের মতো ছিল। সেই দেবতার নামে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্বনাশ করাকে নিজ দেবতার পূজার অঙ্গ বলেই তাঁরা মনে করেছিলেন। তাঁদের দেবতাকে হিংস্র, বিদ্বেষপরায়ণ, রক্তপিপাসু-রূপে ধ্যান করাই তাঁদের বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। সেদিন তাঁদের ধর্মোৎসব তাঁদেরই মন্দিরের প্রাঙ্গণে ছিল সংকুচিত। সেখানে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই শুধু যে ছিল অনাহূত তা নয়, তারা শত্রু বলেই গণ্য হত।

যিশু এলেন ধর্মকে মুক্তি দিতে। ঈশ্বরকে তিনি সর্বমানবের পিতা বলে ঘোষণা করলেন— ধর্মে সকল মানুষের সমান অধিকার, ঈশ্বরে মানুষের পরম ঐক্য, এই সাধন-মন্ত্র যখন তিনি মানুষকে দান করলেন তখন এই সাধনার সম্পদ সকল মানুষের উৎসবের যোগ্য হল।

যিশুর শিষ্যেরা এই মন্ত্র সকলেই সত্যভাবে গ্রহণ করেছে এমন কথা বলতে পারি নে। মুখে যাই বলুক, পাশ্চাত্য জাতির ধর্মবুদ্ধি মোটের উপর ওল্‌ড্‌ টেস্টামেণ্টের ভাবেই সংঘটিত। এইজন্য যুদ্ধবিগ্রহের সময় তারা ঈশ্বরকে নিজেদের দলভুক্ত বলেই গণ্য করে, যুদ্ধে প্রতিকূল পক্ষ বিনষ্ট হলে তাতে তারা ঈশ্বরের পক্ষপাত কল্পনা করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ঈশ্বরের নামে যে য়ুরোপে হিংস্রতা

বহু শতাব্দী ধরে প্রশ্রয় পেয়েছে শুধু তাই নয়, যখন তারা যিশুর বাণীর প্রতিধ্বনি করে স্বর্গরাজ্য-স্থাপনের কথা বলে তখন সেইসঙ্গেই নিজেদের রাজার জন্যে দেশের জন্যে ঈশ্বরের কৃপায় সকলপ্রকার উপায়ে মর্ত্যরাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাকেই জয়ী করতে চেষ্টা করে। এমন-কি, যুদ্ধবিগ্রহের সময় তাদের ধর্ম-যাজকেরা যত বিদ্বেষের উত্তেজনার অনুমোদন করেছে এমন সৈনিকেরাও নয়।

এর কারণ, বাইবেলে যে অংশে ঈশ্বর রাগদ্বেষচালিত দলপতিরূপে কল্পিত ও বর্ণিত সেই অংশই তাদের নিজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহায় হয়ে তাদের অহমিকা ও পরজাতিবিদ্বেষকে বল দিয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও খৃস্টের বাণী যে কাজ করছে না তা হতেই পারে না। তার কাজ গূঢ় গভীর। বস্তুত আমাদের স্বাভাবিক অহংকার দেবতাকে ক্ষুদ্র করে আমাদের শুভবুদ্ধিকে খণ্ডিত করে বলেই পরম সত্যের অদ্বৈতরূপ উপলব্ধির জন্যে আমাদের আত্মার এত গভীর প্রয়োজন।

বুদ্ধদেব জাতিবর্ণ ও শাস্ত্রের সমস্ত ভাগবিভাগ অতিক্রম করে বিশ্বমৈত্রী প্রচার করেছিলেন। এই বিশ্বমৈত্রী যে মুক্তি বহন করে সে হচ্ছে অনৈক্য-বোধ থেকে মুক্তি। রিপুমাত্রই মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ ঘটায়, কেননা ভেদ আমাদের অহং-এর মধ্যে, এবং আমাদের রিপুগুলি এই অহং-এরই অনুচর। তারা আত্মাকে অবরুদ্ধ করে। সাধকেরা যখন ঐক্যের বিশ্বক্ষেত্রে আত্মাকে মুক্তি দান করেন তখনই তার আনন্দকে তার উৎসবকে সর্বদেশে কালে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগে যখন মুসলমান বাহির থেকে এল তখন সেই সংঘাতে দুই ধর্মের পরীক্ষা হয়েছিল। দেখা গেল এই দুই ধর্মের মধ্যেই এমন কিছু ছিল যাতে মানুষে মানুষে শান্তি না এনে নিদারুণ বিরোধ জাগিয়েছে। হিন্দুধর্ম সেদিন হিন্দুকেও ঐক্যদান করে নি, তাকে শতধা বিভক্ত করে তার বল হরণ করেছে। মুসলমান-ধর্ম আপন সম্প্রদায়কে এক করা দ্বারা বলীয়ান করেছিল, কিন্তু তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বোধ নির্দয়ভাবে প্রবল ছিল বলেই সাম্প্রদায়িক ভিন্নতার ভিতর দিয়েও মানুষের অন্তরতর ঐক্যকে উপলব্ধি করে নি। বাইরের দিক থেকে আঘাত করে মুসলমান মানুষের বাহ্যরূপের প্রভেদকে সবলে একাকার করে দিতে চেয়েছিল। অপর পক্ষে ধর্মের বাহ্যরূপের বেড়াকে বহুগুণিত করে হিন্দু, মানুষে মানুষে যে বাহ্যভেদ আছে তার উপর স্বয়ং ধর্মের স্বাক্ষর দিয়ে, তাকে নানা বিধি বিধান ও সংস্কারের দ্বারা আটঘাট বেঁধে পাকা করে দিয়েছিল। সেদিন এই দুই পক্ষে ধর্মবিরোধের অন্ত ছিল না—আজও সেই বিরোধ মিটতে চায় না।

সেদিন ভারতে যে-সব সাধক জন্মেছিলেন তাঁরা ভেদবুদ্ধির নিদারুণ প্রকাশ দেখেছেন। তাই মানুষের চিরকালীন সমস্যার সমন্বয় করবার জন্যে তাঁদের সমস্ত মন জেগেছিল। এই সমস্যা হচ্ছে, ধর্মের বলে ভেদের মধ্যে অভেদের সেতু স্থাপন করা। সে কেমন করে হতে পারে? না, সকল ধর্মের বাহিরে দেশকালের আবর্জনা জমে উঠে তার সাম্প্রদায়িক রূপকে কঠিন করে তোলে, সে দিকে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়কে বাধা দেয়, আঘাত দেয়, কিন্তু তাদের মধ্যে যে অন্তরতম সত্য সেখানে ভেদ নেই বাধা নেই। এক কথায় অবিদ্যার মধ্যেই বাধা অজ্ঞানের বাধা। যেখানে কোনো-এক শাস্ত্রে বলে, বাসুকির মাথার উপরে পৃথিবী স্থাপিত, সেখানে আর-এক শাস্ত্র বলে, দৈত্যের কাঁধের উপর পৃথিবী স্থাপিত; এই মতভেদ নিয়ে আমরা যদি খুনোখুনি করি তবে সেই অজ্ঞানের লড়াই বাইরের দিক থেকে কিছুতেই মিটতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানের দিকে বিরোধ মেটে এইজন্যে যে,

সেখানে বিশ্বাসের যে আদর্শ সে বিশ্বজনীন বুদ্ধি; সে প্রথাগত বিশ্বাস নয়, লোক-মুখের কথা নয়।

আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে বিশ্বজনীনতা আছে, সাম্প্রদায়িক প্রথার মধ্যে নেই। সেইজন্য ভারতবর্ষের ঐক্যসাধক ঋষিরা সকল ধর্মের মূলে যে চিরন্তন ধর্ম আছে তাকেই ভেদবোধপীড়িত মানুষের কাছে উদ্ঘাটিত করেছিলেন। শাস্ত্র সাময়িক ইতিহাসের; আত্মপ্রত্যয় চিরকালের। শাস্ত্র ভেদ ঘটায়, আত্মপ্রত্যয় মিলন আনে। দাদূ কবীর নানক প্রভৃতি মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকেরা ধর্মের শাস্ত্রীয় বাহ্যরূপের বাধা ভেদ করে এক পরম সত্যের আধ্যাত্মিক রূপকে প্রচার করেছিলেন। সেইখানেই সকল বিরোধের সমন্বয়।

এই বিরোধ-সমন্বয়ের প্রয়োজন ভারতে যেমন এমন আর কোথাও নয়। এই ভারত-ইতিহাসে সকলের চেয়ে উজ্জ্বল নাম তাঁদেরই যাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধশান্তি করতে চেয়েছেন। তাঁদের যে গৌরব সে রাষ্ট্রনীতির কূটবুদ্ধির গৌরব নয়, সে গৌরব সহজ সাধনার। এ দেশে বড়ো বড়ো যোদ্ধা ও সম্রাটের জন্ম হয়েছিল, ঐতিহাসিক বহু অন্বেষণে কালের আবর্জনাস্তূপের মধ্য থেকে তাদের লুপ্তপ্রায় নাম উদ্ধার করে আনেন। কিন্তু এই যে-সব সাধক বাহ্যিকতার আবরণ দূর করে ধর্মের আধ্যাত্মিক সত্যকে সর্বজনের কাছে প্রকাশ করেছেন, তাঁরা একদা সর্বজনের কাছে যতই আঘাত ও প্রত্যাখ্যান পেয়ে থাকুন, দেশের চিত্ত থেকে তাঁদের নাম কিছুতে লুপ্ত হতে চায় না। এঁরা অনেকেই ছিলেন অবিদ্বান অন্ত্যজ-জাতীয়, কিন্তু এঁদের সম্মান সর্বকালের; এঁরা ভারতের সবচেয়ে বড়ো অভাব মেটাবার সাধনা করেছেন, এবং ভেবে দেখতে গেলে সেই অভাব সমস্ত মানুষের।

আধুনিক ভারতে সেই সাধনার ধারা বহন করে এনেছেন রামমোহন রায়। তিনি যখন এলেন তখন সমস্যা আরও জটিলতর, তখন প্রবল রাজশক্তির হাত ধরে খৃস্টান-ধর্মও এই ধর্মভারবিদীর্ণ দেশে এসে প্রবেশ করেছে। রামমোহন রায় অপমান ও অত্যাচার স্বীকার করে ধর্মের সর্বজনীন সত্যের যোগে মানুষের বিচ্ছিন্ন চিত্তকে মেলাবার উদ্দেশে তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মানব-লোকে যাঁরা মহাত্মা তাঁদের এই সর্বপ্রধান লক্ষ্য; মানুষের পরমসত্য হচ্ছে মানুষ এক, এই সত্যকে প্রশস্ত ও গভীরতম ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের কাজ। রামমোহন আত্মার দৃষ্টিতে সকল মানুষকে দেখেছিলেন এবং আত্মার যোগে সকল মানুষকে ধর্মসম্বন্ধে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের প্রাচীনতন সাধকরাও এই ঐক্যের বাণী চিরকালের মতো আমাদের দান করে গেছেন। তাঁরা বলেছেন, শান্তং শিবমদ্বৈতং— যিনি অদ্বৈত, যিনি এক, তাঁর মধ্যেই মানুষের শান্তি, তাঁর মধ্যেই মানুষের কল্যাণ। এই বাণী অনেক কাল ভারতে সাম্প্রদায়িক কোলাহলে প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল। তিনি তাকেই তাঁর জীবনে তাঁর কর্মে ধ্বনিত করে তুললেন। আজ প্রায় একশো বছর হল তিনি এই একের মন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন। যে ইচ্ছা ভারতবর্ষের গূঢ়তম ইচ্ছা, সেই তার চিরকালের ইচ্ছার সঙ্গে আজকের দিনের যোগ আছে। ভারতের সেই ইচ্ছাই একশত বৎসর পূর্বে ভারতের এক বরপুত্রের জীবনে আবির্ভূত হয়েছিল এবং এইদিনেই তাকে তিনি সফলতার রূপ দিতে চেয়েছিলেন। জানি সকলে তাঁকে স্বীকার করবে না এবং অনেকে তাঁকে বিরুদ্ধতার দ্বারা আঘাত করবে। কিন্তু জীবনে যাঁরা অমৃত লাভ করেছেন, প্রতিকূলতার সাময়িক কুহেলিকায় তাঁদের দীপ্তিকে গ্রাস

করতে পারবে না। তাই যাঁদের মনে শ্রদ্ধা আছে তাঁরা ভারতের সনাতন ঐক্যবাণীর একটি উৎস-মুখ বলেই আজকের এই দিনের পবিত্রতাকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করবেন, এবং রামমোহনের মধ্যে যে প্রার্থনা ছিল সেই প্রার্থনাকে কায়মনোবাক্যে উচ্চারিত করবেন যে, ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্নতা থেকে, জড়বুদ্ধি থেকে, বহিরন্তরের দাসত্বদশা থেকে, মুক্তিলাভ করুক—'য একঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।'

১১ মাঘ [১৩৩৫]

৭

বন্ধুগণ, জরার ক্লান্তিতে আজ আমি অভিভূত। একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও এই স্মরণ-উৎসবে সম্পূর্ণভাবে যোগ দিতে পারি নি, সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আজ আমাদের উপাসনার একটি বিশেষ দিন। উপাসনার বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ আমাদের কাছে সময় সময় উপস্থিত হয়। প্রকৃতির মধ্যেও দেখি, ঋতু-ঋতুতে নূতন নূতন উৎসব। প্রত্যেক ঋতু তার নিজের অর্ঘ্য-নিবেদন বহন করে আনে। শরৎ যখন তার শিশিরধৌত নির্মল সৌন্দর্যের প্রাচুর্য নিয়ে দেখা দেয়, তখন সে আমাদের আত্মাকে আহ্বান করে, তখন আমাদের একটি বিশেষ বন্দনার দিন উপস্থিত হয়। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে আমরা শুনতে পাই বহুবিচিত্রকে নিয়ে একটি অখণ্ড সুষমার বাণী। জলে স্থলে আকাশে রূপসম্মিলনের মধ্যে সেই অপরূপ একের সংগীত কেবল আমাদের আত্মার কাছেই পৌঁছায়— সে এমন একটি লিপি, যার ঠিকানা একমাত্র এইখানেই।

সৌন্দর্য অনির্বচনীয়। তাকে আমরা কোনোরকম ব্যাখ্যার দ্বারা বোঝাতে পারি না। আমাদের অন্তরতম উপলব্ধির দ্বারা তাকে আমরা শুধু স্বীকার করতে পারি। সংসারের সমস্ত-কিছু প্রয়োজনকে অতিক্রম করে এই সৌন্দর্য বিরাজমান। সৃষ্টি রক্ষা বা পালনের কোনো তাগিদ দিয়ে তার হিসাব পাওয়া যায় না। সকল প্রয়োজনের অতীত যে ঐশ্বর্য, বিশ্বজগতে আনন্দরূপের আবির্ভাবকে সে প্রকাশ করে। তাই সংসারযাত্রার প্রতিদিনের সমস্ত অব্যবহিত দাবি চুকিয়ে দিয়েও যে অসীম উদ্‌বৃত্ত সৌন্দর্য দেখা দেয় তার মধ্যেই আমাদের আত্মা বিশ্বের নিত্যোৎসবের মূল সুরটিকে উপলব্ধি করতে পারে।

জীবনযাত্রার ছোটোখাটো খুঁটিনাটির মধ্যে আমরা এই মূলসুরটিকে ছিন্ন বিক্ষিপ্ত করে দেখি বলে তাকে তার বৃহৎ তাৎপর্যের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারি না। যদি আদ্যন্ত দেখতে পেতেম, যে দেখা নানা বাধায় নানা বিরুদ্ধতার দ্বারা খণ্ডিত নয় এমন একটি স্বচ্ছ সমগ্র দেখা দিয়ে যদি অনুভব করতে পারতেম, তবে আমাদের মন অহৈতুক আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ত। জানতে পারতেম, যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য আমরা শরৎকালের একটি শেফালির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তারই ছন্দ লোকে লোকে আকাশে আকাশে পরিব্যাপ্ত। প্রতিদিনকার কাজ চালাবার দেখার মধ্যে আমাদের আত্মার সেই দেখা চাপা পড়ে, আনন্দরূপের পূর্ণতাবোধ ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে ফেলি, তার পরে নতুন ঋতু যখন পুরাতন ঋতূৎসবের পালা বদল করার আয়োজন করে তখন তার রাগিণীতে সেই মূলসুরের ধুয়াটিকে নতুন করে পাই। চন্দ্রতারাখচিত নীল আকাশে বিশ্বের যে আশ্চর্য-সুন্দর শতদলটি আলোকের

সরোবরে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠছে তাকে সম্পূর্ণ করে সমগ্রভাবে যিনি দেখছেন তাঁর সেই স্থিরগম্ভীর আনন্দের আংশিক উপলব্ধি আমরা অনুভব করি।

এইরকম করেই আমাদের আর-একটি বন্দনার বিষয় হয় যখন আমরা কোনো মহাপুরুষের মধ্যে সেই মহতোমহীয়ানের পরিচয় পাই। এই পরিচয়ের মধ্যে একটি প্রতিবাদ আছে, যে প্রতিবাদ আমরা প্রকৃতির মহোৎসবের মধ্যেও দেখি। চারি দিকে শ্রীহীনতার অভাব নেই— কত কুৎসিত মলিনতা, কত আবর্জনা, কত অসম্পূর্ণতা প্রতিনিয়তই দেখতে পাই। কিন্তু তারই মধ্যে দেখি সুন্দরকে— দেখি ক্ষণজীবী প্রজাপতির ক্ষীণ সূক্ষ্ম সুকুমার পাখার রঙে-রেখায় আশ্চর্য নৈপুণ্য— তখন বুঝি যা-কিছু কুশ্রী তার বিরুদ্ধে চিরকাল ধরে চলেছে সৌন্দর্যের এই প্রতিবাদ। তখন বুঝি সমস্ত কুশ্রীতাকে অতিক্রম করে সৌন্দর্যই ধ্রুবসত্য। বিশ্ব-জগতের ভিতরে ভিতরে আমাদের আত্মা যখন ছন্দোময় সামঞ্জস্যকে আবিষ্কার করে তখন দেখি, অনন্ত আকাশে সৌন্দর্যের তপস্যার আসন বিস্তীর্ণ। যা কুশ্রী, যা নিরর্থক, যা খণ্ড, সে-সমস্তকে একটি আশ্চর্য সুষমার মধ্যে সুপরিমিত করে নেবার জন্যে বিশ্বজগতের অন্তরে অন্তরে একটি অবিশ্রাম প্রবর্তনা কাজ করছে। বিক্ষিপ্তকে সংযত, বিকৃতকে সংস্কৃত করবার এই বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যতত্ত্ব আশ্রয় করে আছে আনন্দস্বরূপকে অমৃতস্বরূপকে। বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত করে আনন্দ-রূপমমৃতং প্রকাশমান বলেই এটি সম্ভবপর হয়েছে।

মানবাত্মার মধ্যেও কত দীনতা, কত কলুষ, কত হিংসা দ্বেষ সর্বদাই প্রকাশ পাচ্ছে জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই আশ্বাস আসে— এ-সমস্তকে অতিক্রম করে যিনি শিবং তিনি আছেন। মহাপুরুষের জীবনের মধ্যে আমরা এই ইঙ্গিত পাই। যা-কিছু অশিব তাকে পরাভূত করে সমস্ত বিরুদ্ধতার সম্মুখে এসে মহাপুরুষের জীবন যখন দাঁড়ায়, আঘাত-অপমানের মাঝখানে কল্যাণের তপস্যাকে সার্থক করে, তখন সেই আশ্চর্য আবির্ভাবের সম্পূর্ণ যে অর্থ তাকে দেখি। প্রমাণ পাই যে, যুগে যুগে কলুষ ক্ষয় করছেন যিনি, অকল্যাণকে দুঃখের মধ্য দিয়ে কল্যাণে উত্তীর্ণ করছেন যিনি, তিনিই মহাপুরুষের বাণীর ভিতর দিয়ে বিরোধ-সংঘাতের মধ্যে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়কে, জাতির সঙ্গে জাতিকে, ইতিহাসের বিপদসংকুল বন্ধুর পথে একসূত্রে বেঁধে দিচ্ছেন, তখন জানি যে তাঁকে প্রণাম করার দিন উপস্থিত।

আমাদের উপাসনায় ধ্যানের যে মন্ত্র আমরা ব্যবহার করি— সত্যং জ্ঞানং অনন্তং— সেই মন্ত্রের গভীর অর্থ হচ্ছে এই যে, চোখের দেখায় সত্যকে পাওয়া যায় না। মানুষের আত্মা নিজের জানবার ধর্ম দিয়েই সত্যের স্বরূপকে দেখে। চোখের দেখা বিচ্ছিন্ন, আত্মার দেখা ঐক্যে বাঁধা। ইন্দ্রিয়বোধ সেই একের বোধ নয়। আত্মা নিজের মধ্যে দেশকালের ভূমিকায় দেশ ও কালকে সমগ্রভাবে অখণ্ডভাবে বিশ্বজগতের ঐক্যসূত্রটিকে আবিষ্কার করার দ্বারাই সত্যকে উপলব্ধি করে। চোখ দিয়ে যখন অসীমতাকে দেখতে যাই তখন আয়তনের মধ্যে সংখ্যার মধ্যে তাকে খুঁজি। এমন করে বাহিরের দিক থেকে অসীমের সত্যকে পাওয়া যায় না। যত ছোটো আয়তনের মধ্যেই হোক না কেন, পরিপূর্ণতাকে যখন আত্মার দৃষ্টি দিয়ে দেখি তখন পাই অনন্ত সত্যকে। শিবকে অশিবের মধ্যে দেখা— সেও হচ্ছে আত্মার দেখা। মহাপুরুষেরা এই দৃষ্টি নিয়ে আসেন। তাঁরা বিপদকে ভয় করেন না, নিন্দা-ক্ষতিকে গ্রাহ্য করেন না। অবমাননার ভিতর দিয়ে তাঁরা এগিয়ে চলেন। যাঁরা মহৎ ভগবান তাঁদের বাহিরের দিক থেকে দয়া করেন না। নিষ্ঠুর ভগবান মহাপুরুষকে সম্মানের পথে পুষ্পবৃষ্টির ভিতর দিয়ে আহ্বান করেন না,

দুঃখের কঠোর পথই তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সেইজন্য দুঃখের মধ্যেই মহাপুরুষের জীবনের সার্থকতা তাঁর সত্যের প্রমাণ। এই নির্দয়তার মধ্যে আমরা দেখি ভগবানের দয়া— তখন ভয় যায়, তখন আমরা ভরসা পাই, তখন আমরা প্রণাম করি।

এই প্রণামের পরিপূর্ণ প্রার্থনা হচ্ছে 'অসতো মা সদ্‌গময়'— অসত্য আছে জানি, তার মধ্যেই সত্য দেখা দাও। কে এই সত্যকে আমাদের কাছে উজ্জ্বল করে দেখায়? যখন বহুল উপকরণের প্রয়োজনকেও অস্বীকার করে মানুষ বলতে পারে, যা অমৃত নয় তা নিয়ে আমি কী করব। বীর যখন আঘাতের পর আঘাতেও অবসন্ন হন না তখন অসত্যের মাঝখানে সত্যের যে আবির্ভাব তাকে আমরা দেখতে পাই। মানব-ইতিহাসের সংকটময় নিত্য বাধাগ্রস্ত অভিযানের মধ্যে আমরা সত্যের প্রকাশকে দেখি। আবার নিজের মধ্যেও দেখি, বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করে অসত্যকে পরাভব করে সত্য প্রকাশ পায়। তখন এই বিরুদ্ধতার ভিতর দিয়েই আমাদের প্রণাম পেঁছয়। তখন বলি 'আবিরাবীর্ম এধি'— আমার অপ্রকাশের অস্বচ্ছতার মধ্যেই তোমার প্রকাশ উজ্জ্বল হোক। তখন আমরা বলি 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' —অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে আলোক প্রকাশ পাক। 'মৃত্যোর্মামৃতং গময়'— মৃত্যুর মধ্যে অমৃত জাগ্রত হউক।

আজ যাঁকে আমরা স্মরণ করছি, রুদ্রের আহ্বান সেই মহাপুরুষকেও একদিন ডাক দিয়েছিল। রুদ্র নিজে তাঁকে আহ্বান করেছিলেন— সেই আহ্বানের মধ্যেই রুদ্রের প্রসন্নতা তাঁকে আশীর্বাদ করেছে। সুখ নয়, খ্যাতি নয়, বিরুদ্ধতার পথে অগ্রসর হওয়া এই ছিল তাঁর প্রতি রুদ্রের নির্দেশ। আজও সে আহ্বান ফুরোয় নি। আজ পর্যন্ত তাঁর অবমাননা চলেছে। তিনি যে সত্যকে বহন করে এনেছেন দেশ এখনও সে সত্যকে গ্রহণ করে নি। যত দিন না দেশ তাঁর সত্যকে গ্রহণ করবে ততদিন এই বিরুদ্ধতা চলতেই থাকবে। দিন-মজুরি দিয়ে জনতার স্তুতিবাক্যে তাঁর ঋণ শোধ হবে না— ক্ষুদ্রের হাতে তাঁকে অপমান সহ্য করতে হবে। এই হচ্ছে তাঁর রুদ্রের প্রসাদ। তাঁর জন্য কোনো ছোটো পুরস্কারের ব্যবস্থা হয় নি। নিন্দা-অপমানের ভিতর দিয়েই সত্যকে প্রকাশ করতে হবে, ক্ষতির মধ্যেই সত্যকে লাভ করতে হবে, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতকে জাগ্রত করতে হবে।

তাই আজ আমাদের প্রার্থনা যেন ছোটো না হয়। ভীরুর মতো বলব না, আমাদের দুঃখ দূর করো। বীরের মতো বলব, দুঃখ দাও, বিপদ দাও, অপমানের পথে আমাদের নিয়ে যাও। কিন্তু দুঃখ বিপদ অপমানের মধ্যেও অন্তরে যেন তোমার প্রসন্নতার আশীর্বাদ অনুভব করি।

হে রুদ্র, 'যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌'— তোমার যে প্রসন্নমুখ আমাদের দেখাও। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'— অন্ধকারের মধ্যে তোমার জ্যোতি প্রকাশ করো। হে রুদ্র, হে নিষ্ঠুর, ক্ষতি-পরাভবের ভিতর দিয়ে আমাদের নিয়ে যাও। বাহিরের আঘাতের দ্বারা আমাদের শক্তিকে অন্তরে অন্তরে পুঞ্জিত করো।

আজ যাঁকে আমরা স্মরণ করছি, যিনি রুদ্রের এই জয়পতাকা বহন করে এনেছিলেন, যিনি আমার পরম পূজনীয়, যাঁর কাছ থেকে আমার জীবনের পূজা, আমার সমস্ত জীবনের সাধনা আমি গ্রহণ করেছি, আজ তাঁর কথা বলতে পারি এমন শক্তি আমার নেই, আজ আমার কণ্ঠ ক্ষীণ। যদি কিছুই না বলতে পারি এই মনে করে আমি কিছু লিখেছিলাম, সেই লেখাটুকু পড়ে আমার বক্তব্য শেষ করব।

মহাপুরুষ যখন আসেন তখন বিরোধ নিয়েই আসেন, নইলে তাঁর আসার কোনো সার্থকতা নেই। ভেসে-চলার দল মানুষের ভাঁটার স্রোতকেই মানে। যিনি উজিয়ে নিয়ে তরীকে ঘাটে পৌঁছিয়ে দেবেন তাঁর দুঃখের অন্ত নেই, স্রোতের সঙ্গে প্রতিকূলতা তাঁর প্রত্যেক পদেই। রামমোহন রায় যে সময়ে এ দেশে এসেছিলেন সেই সময়কার ভাঁটার বেলার স্রোতকে তিনি মেনে নেন নি, সেই স্রোতও তাঁকে আপন বিরুদ্ধ বলে প্রতিমুহূর্তে তিরস্কার করেছে। হিমালয়ের উচ্চতা তার নিম্নতলের সঙ্গে অসমানতারই মাপে। সময়ের বিরুদ্ধতা দিয়েই মহাপুরুষের মহত্ত্বের পরিমাপ।

কোনো জাতির ইতিহাসে মানুষের প্রাণ যতদিন প্রবল থাকে ততদিন সে আপন মর্মগত জাগ্রৎ শক্তিতে নিজেকে নিজে নিরন্তর সংশোধন করে জয়ী করে চলতে পারে। বস্তুত প্রাণের প্রক্রিয়াই তাই। সে তো নিত্য সংগ্রাম। আমরা চলি, সে তো প্রতি পদক্ষেপেই মাটির অবিশ্রাম আকর্ষণের সঙ্গে বিরোধ। জড়তার ব্যূহ চারি দিকেই, দেহের প্রত্যেক যন্ত্রই তার সঙ্গে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত। হৃদ্‌যন্ত্র চলছে, দিনে রাত্রে, নিদ্রায় জাগরণে; জড় রাজ্যের প্রকাণ্ড নিষ্ক্রিয়তা সেই চলার বিরুদ্ধ, মুহূর্তে মুহূর্তেই সে ক্লান্তির বাঁধ বাঁধতে চায়, যতক্ষণ জোর থাকে হৃদ্‌যন্ত্র মুহূর্তে মুহূর্তেই সেই বাধাকে অপসারণ করে চলে। বাতাস আমাদের চারি দিকে আপন নিয়মে প্রবাহিত, তাকে প্রাণের ব্যবস্থাবিভাগ আপন নিয়মের পথে প্রতিক্ষণেই বলপূর্বক চালনা করে। রোগের কারণ ও বীজ অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই, দেহের আরোগ্য-সেনানী তাকে সর্বদাই আক্রমণ করছে—এর আর অবসান নেই। জড়ধর্মের সঙ্গে জীবধর্মের, রোগশক্তির সঙ্গে আরোগ্যশক্তির নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ-ক্রিয়াকেই বলে প্রাণক্রিয়া। সেই সচেষ্ট শক্তি যদি ক্লান্ত হয়, এই প্রবল বিরোধে যদি শৈথিল্য ঘটে, দেহব্যবস্থায় চলার চেয়ে না-চলার প্রভাব যদি বেড়ে ওঠে, তবেই বিকৃতি ও মলিনতায় দেহ কেবলই অশুচি হতে থাকে, তখন মৃত্যুই করুণারূপে অবতীর্ণ হয়ে এই শ্রান্তসংগ্রাম পরাভবকে জীবজগৎ থেকে অপসারিত করে দেয়।

সমাজদেহও সজীব দেহ। জড়ত্বের মধ্যেই তার সমস্ত অমঙ্গল। সমাজের যুদ্ধকুশল প্রাণধর্মকে বুদ্ধির ম্লানতা, সংকল্পের দৈন্য, জ্ঞানের সংকীর্ণতা, প্রীতি-মৈত্রীর দৌর্বল্যের সঙ্গে কেবলই বিরোধ জাগিয়ে রাখতে হয়। চিত্তের অসাড়তা তার সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু। চিত্ত যখন আপন কর্তৃত্বকে খর্ব করে স্থাবর হয়ে বসতে চায় তখনই তার সর্বত্রই বিকৃতির আবর্জনা জমে উঠে তাকে অবরুদ্ধ করে দেয়। এই অবরোধেই মৃত্যুর আরম্ভ। এই সময়ে আসেন যে মহাপুরুষ তিনি জড়ত্বপুঞ্জের মধ্যে প্রবল বিরোধ নিয়ে আসেন, নির্বিচার প্রথার দ্বারা চালিত দীনাত্মা তাঁকে সহ্য করতে পারে না।

৮সুদীর্ঘকাল থেকেই ভারতবর্ষে ইতিহাস স্তম্ভিত হয়ে আছে। কতকাল এই দেশ নিজে চিন্তা করে নি, চেষ্টা করে নি, সৃষ্টি করে নি, বুদ্ধিপূর্বক নিজের অন্তর-বাহিরের সম্মার্জন করে নি, তার সক্রিয় সংকল্প-শক্তি নব নব ব্যবস্থার দ্বারা নব নব কালের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে নি। স্বাস্থ্যদৈন্য, অন্নদৈন্য, জ্ঞানদৈন্য, একে একে তার প্রাণের প্রায় সকল শিখাই ম্লান করে এনেছে। শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে তার পরাভব বিস্তীর্ণ হয়ে চলল। মানুষের পরাভব তাকেই বলে যখন তার আপন ইচ্ছায় অরাজকতা ঘটে এবং বাহিরের ইচ্ছা শূন্য সিংহাসন অধিকার করে বসে, যখন তার নিজের বুদ্ধি অবসর নেয়, বাহিরের বুদ্ধি তাকে চালনা করে—সেই বুদ্ধি তার স্বজাতির অতীত কাল থেকেই তাকে অভিভূত করুক, বা অন্যজাতির বর্তমান

কাল থেকে এসেই তাকে ঘুরিয়ে বেড়াক। মানুষের পরাভব তাকেই বলে যখন তার আত্মার কর্তৃত্ব আড়ষ্ট হয়, যখন সে কালপরম্পরাগত অভ্যাসযন্ত্রের চাকাগুলোকে অন্ধভাবে ঘুরিয়ে চলে, যখন সে যুক্তিকে স্বীকার করে না, উক্তিকে স্বীকার করে, আন্তরধর্মকে খর্ব করে বাহ্য কর্মকে প্রবল করে তোলে। কোনো কূট কৌশলের দ্বারা বাহিরের কোনো সংকীর্ণ সংক্ষিপ্ত পথে এই স্থবিরত্বভার-মন্থর মানুষের পরিত্রাণ নেই।

এমনতর বহুযুগব্যাপী অন্ধতার দিনে দেশ যখন নিশ্চলতাকেই পবিত্রতা বলে স্থির করে নিস্তব্ধ ছিল এমন সময়েই ভারতবর্ষে রামমোহনের আবির্ভাব। দেশকালের সঙ্গে অকস্মাৎ এমন প্রকাণ্ড বৈপরীত্য ইতিহাসে কদাচিৎ ঘটে। তাঁর দেশকাল তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে অস্বীকার করেছিল। সেই অসহিষ্ণু অস্বীকৃতির দ্বারাই দেশ তার মহোচ্চতাকে সর্বকালের কাছে ঘোষণা করেছে। এই পরুষ কণ্ঠের গর্জনধ্বনির চেয়ে আর কোনো উপায়ে স্পষ্টতর করে বলা যায় না যে, তিনি এ দেশে অন্ধকারের বিপক্ষে আলোকের বিরোধ এনেছিলেন, তিনি অভ্যস্ত দুর্বল বচনের পুনরাবৃত্তি করে জড়বুদ্ধির অনুমোদন করেন নি; চাটুলুব্ধ জনতার খ্যাতি-গর্বিত অগ্রণীত্ব করার আত্মাবমাননাকে তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন; তিনি উদ্যতদণ্ড জনসংঘের মূঢ় প্রতিকূলতাকে ভয় করেন নি, এবং তাদের নিবেদিত অন্ধভক্তির প্রলোভনে সত্যপথ থেকে লেশমাত্র বিচলিত হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি বহুযুগের পূজাবেদিতে আসীন জড়ত্বকে আঘাত করেছিলেন এবং জড়ত্ব তাঁকে ক্ষমা করে নি।

তিনি জানতেন সকলপ্রকার জড়ত্বের মূলে আত্মার প্রতি অশ্রদ্ধা। জন্তু পায় নি তার স্বরাজ, কেননা সংস্কারের দ্বারা সে চালিত। জ্ঞানালোকিত আত্মা মানুষের ধর্মকে কর্মকে, তার সৃষ্টিকে যে পরিমাণে অধিকার করে সেই পরিমাণেই তার স্বরাজ প্রসারিত হয়। সভ্যতার ইতিহাস মানুষের আত্মবুদ্ধি আত্মবিশ্বাস আত্মসম্মানের শক্তিতে স্বরাজ্যবিস্তারের ইতিহাস।

মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ শিখরে আত্মার জয়ঘোষণা এক দিন এই ভারতবর্ষে যেমন অসংশয়িত বাণীতে প্রকাশ পেয়েছিল এমন আর কোথাও পায় নি। সেই বাণীই ভারতবর্ষে যখন খণ্ডিত আচ্ছন্ন অবরুদ্ধ তখনই রামমোহন রায় তাকে পুনরায় নূতন করে নির্মল করে বহন করে আনলেন। তার পূর্বেই অধিকাংশ ভারতবর্ষ নিজেকে নিকৃষ্ট অধিকারী বলে স্বীকার করে নিয়ে আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশের দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে জ্ঞানে কর্মে তামসিকতাকে অবলম্বন করে আত্মাবমাননায় নিমগ্ন ছিল। তার প্রথাজড়ত্বের ব্যাধিস্ফীত মন মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকারকে কেবল যে অঙ্গীকার করলে না তা নয়, তাকে ভর্ৎসনা করলে, আঘাত করলে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত দেশের ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যেই তিনি আত্মার বাণীকে উদ্‌বোধিত করতে চেয়েছিলেন এমন নয়। যে-কোনো সম্প্রদায়ই আপন জড় বাহ্য রূপের দ্বারা, জ্ঞানবিরোধী অন্ধ আচারের দ্বারা আপন সত্যরূপকে আবৃত করেছে, তাকেই তিনি আধ্যাত্মিক আদর্শের দ্বারা বিচার করেছিলেন। তিনি মানুষের সমগ্রতাকে যেমন সমস্ত মনে প্রাণে, অনুভব ও ব্যবহারে প্রকাশ করেছেন, সেই যুগে সমস্ত পৃথিবীতে অতি অল্প লোকের পক্ষেই তা সম্ভবপর ছিল। তিনি জানতেন, কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই সকল ধর্মের মধ্যে মানুষের আত্মার মিলন ঘটতে পারে। তিনি জানতেন, মানুষ যখন আপন ধর্মতত্ত্বের বাহ্য বেষ্টনীকে তার আত্মরূপের চেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছে, তখনই

তাতে যেমন মানুষের ব্যবধান ঘটিয়েছে, তার ধর্মগত বিষয়বুদ্ধি অহংকার হিংসা বিদ্বেষ জাগিয়ে পৃথিবীকে রক্তে পঙ্কিল করেছে, এমন আর কিছুতেই করে নি। ধর্মের বিশ্বতত্ত্বের ভূমিকা তিনি সেই ধর্ম-সংকীর্ণতার দিনে আপন চিত্তের মধ্যে লাভ ও আপন জীবনের মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন।

যদিও সেদিন বাহির থেকে পৃথিবীর মানুষ প্রত্যেক সভ্য মানুষের জ্ঞানের মধ্যে স্থান পেয়েছিল, তার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে নি। মানুষের সম্বন্ধে বিশ্ববোধ আজও পৃথিবীতে নানা সংকীর্ণ সংস্কারে বাধাগ্রস্ত। আজও পৃথিবী এ কথা বলতে পাচ্ছে না যে, নূতন যুগ এল। সকল দিকেই এ যে অখণ্ডতার যুগ। এই যুগে জ্ঞানে কর্মে সব মানুষকে মিলিয়ে নেবার প্রশস্ত রাজপথ উদ্‌ঘাটিত হওয়া চাই। বিজ্ঞানরাজ্যে আজ জ্ঞানে জ্ঞানে অসবর্ণতা দূর করে মিলন আরম্ভ হয়েছে; বিশ্ববাণিজ্যের মধ্যে কর্মের মিলও বিস্তীর্ণ হল, যদিও সেই মিলনপথের বাঁকে বাঁকে আজও বাটপাড়ির ব্যাবসা চলে; যতই কঠিন বাধায় কণ্টকাকীর্ণ হোক, তবু বিশ্বরাষ্ট্রনীতির যে সূত্রপাত হয় নি এমন কথা বলা যায় না। এই নূতন যুগধর্মের উদ্‌বোধন বহন করে বাহিরের প্রতিকূলতা ও আত্মীয়ের লাঞ্ছনার মধ্যে যাঁরা এই পৃথিবীতে বুক পেতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের প্রথম ও প্রধানদের মধ্যেই রামমোহন একজন। তিনি ভারতবর্ষের সেই দূত যিনি সর্বপ্রথমে বিশ্বক্ষেত্রে ভারতের বাণীকে বহন করে নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন— সেই বাণী ভারতের স্বকীয় দৈন্য নিয়ে নয়, দুর্যোগ নিয়ে নয়, সমস্ত মানবের কাছে আপনার অর্ঘ্য নিয়ে। মানবসত্যকে তিনি সমগ্র করে দেখেছিলেন। তিনি যখন আপন ভাষায় বাঙালির আত্মপ্রকাশের উপাদানকে বলিষ্ঠ করবার জন্য প্রবৃত্ত ছিলেন তখন বাংলা গদ্য ভাষার অনুদ্ঘাটিত পথ তাঁকে প্রায় প্রথম থেকেই কঠিন প্রয়াসে খনন করতে হয়েছিল; যখন তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে বাঙালির মন উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি সেই অপরিণত গদ্যে দুরূহ অধ্যবসায়ে এমন-সকল পাঠকের কাছে বেদান্তের ভাষ্য করতে কুণ্ঠিত হন নি যাদের কোনো কোনো পণ্ডিতও উপনিষদ্‌কে কৃত্রিম বলে উপহাস করতে সাহস করেছেন, ও মহানির্বাণতন্ত্রকে মনে করেছিলেন রামমোহনেরই জাল-করা শাস্ত্র; সমাজে নারীর অধিকার সমর্থন করতে একলা যখন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তখন পশ্চিম মহাদেশেও নারী অবলাই ছিল এবং তার অধিকার ছিল সকল দিকেই সংকীর্ণ; যখন তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বজাতির সম্মান দাবি করেছিলেন তখন দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সূত্রপাতও হয় নি। মনুষ্যত্বের উপকরণ-বৈচিত্র্যকে তিনি তাঁর সকল শক্তি দিয়েই সম্মান করেছিলেন। মানুষকে তিনি কোনো দিকেই খর্ব করে দেখতে পারতেন না, কারণ তাঁর নিজের মধ্যেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতা অসাধারণ ছিল।

এক শত বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখনও তাঁর সত্য পরিচয় দেশের কাছে অসম্পূর্ণ, এখনও তাঁকে অসম্মান করা দেশের লোকের কাছে অসম্ভব নয়; যে উদার দৃষ্টিতে তাঁর মহত্ত্ব সুস্পষ্ট দেখা যেত সে দৃষ্টি এখনও কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। কিন্তু, এতে সেই কুহেলিকার স্পর্ধার কোনো কারণ নেই। জ্যোতিষ্ককে আবৃত করে সমস্ত প্রভাতকে যদি সে ব্যর্থ করে দেয় তবু সেই জ্যোতিষ্ক কুহেলিকার চেয়ে ধ্রুব ও মহৎ। মহত্ত্ব বাহিরের কর্কশ বাধার মধ্যে থেকেও কাজ করে, আলোকের অনাদরে তার বিলুপ্তি হয় না। রামমোহন যে শক্তিকে চালনা করে গেছেন সেই শক্তি আজও কাজ করছে, এবং অবশেষে এমন দিন আসবে যখন তাঁর অবিচলিত প্রতিষ্ঠাকে, তাঁর বীর্যবান্ অপ্রতিহত মহিমাকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করবার

মতো অন্ধসংস্কারমুক্ত সবল বুদ্ধি ও নির্বিকার শ্রদ্ধার অবস্থায় দেশ উত্তীর্ণ হবে। আমরা যারা তাঁর কাছ থেকে মানুষকে প্রচুর বিঘ্নের মধ্যে দিয়েও সত্য করে দেখবার প্রেরণা লাভ করি, তাঁর প্রত্যেক অসম্মানে আমরা মর্মাহত হই; কিন্তু তাঁর জীবিতকালেও শত শত অবমাননাতেও তাঁর কল্যাণশক্তিকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে নি, এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও সকল অবজ্ঞার মধ্যে সেই শক্তি জাগ্রত থেকে অকৃতজ্ঞতার অন্তরে অন্তরেও সফলতার বীজ বপন করবে।

৬ ভাদ্র ১৩৩৫

৮

রাজা রামমোহনের কর্মজীবনের বৈচিত্র্য নানা দিকে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর জীবনের এই কর্মবৈচিত্র্য-বর্ণনায় আমি অসমর্থ। আমি কেবল তাঁর জীবনের একটি কথা আপনাদের নিকটে বলব। এ পর্যন্ত আমরা তাঁর স্মৃতিসভায় কেউ তাঁর রাজনীতি, কেউ শিক্ষা, কেউ সমাজসংস্কার এইরূপে খণ্ড খণ্ড করে তাঁর জীবনের এক-একটা দিক আলোচনা করেছি। এমন টুকরা টুকরা করে কোনো মহৎচরিত্র আলোচনা করা আমি অন্যায় বলে মনে করি, ইহাতে তাঁকে সম্মান না করে অপমান করা হয়। ঠিক আসল যে শক্তিটি তাঁর জীবনে সংগীতের মতো বেজে উঠেছিল তার দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না। বিশেষত যেখানে রাজা রামমোহনের মহত্ত্ব তাঁর সেই দিকটা বাদ দিয়ে আমরা যদি তাঁকে কেউ আট আনা কেউ বারো আনা স্বীকার করি তা হলে তাঁর অপমানই করা হবে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁদের হয় সম্মান করে ষোলো আনা স্বীকার করতে হবে, না হয় অস্বীকার করে অপমানিত করতে হবে; এর মাঝামাঝি অন্য পথ নেই। আমি মনে করি, সত্যকে স্বীকার করে রামমোহন তাঁর দেশবাসীর নিকটে তখন যে নিন্দা ও অসম্মান পেয়েছিলেন, সেই নিন্দা ও অপমানই তাঁর মহত্ত্ব বিশেষভাবে প্রকাশ করে। তিনি যে নিন্দা লাভ করেছিলেন সেই নিন্দাই তাঁর গৌরবের মুকুট। লোকে গোপনে তাঁর প্রাণবধেরও চেষ্টা করেছিল।

বৈদিক যুগে ঋষিরা এক সময়ে সূর্যকেই দেবতা বলে পূজা করতেন। আবার উপনিষদের ঋষি সেই সূর্যকেই বলেছেন, 'হে সূর্য, তুমি তোমার আবরণ অনাবৃত করো, তোমার মধ্যে আমরা সেই জ্যোতির্ময় সত্যদেবতাকে দেখি।'

সেকালে যতই পূজা, হোম, ক্রিয়া, অনুষ্ঠান থাকুক না কেন, সেই-সকলের আবরণ ভেদ করে ঋষিরা সত্যকে দেখেছিলেন। যে ঈশোপনিষদে ঋষি সূর্যকে অনাবৃত হতে আহ্বান করেছেন সেই উপনিষদেরই প্রথম শ্লোক হচ্ছে—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥

সকলই দেখতে হবে সেই ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন করে, তাঁর দান ভোগ করতে হবে।

রাজা রামমোহন এই এককে, অবিনাশীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই এককেই তিনি দেশাচার লোকাচার প্রভৃতির জঞ্জাল হতে অনাবৃত করে, কেবল বাঙালিকে

নয়, ভারতবাসীকে নয়, পৃথিবীবাসীকে দেখালেন। তিনি তাঁকে জেনে প্রাচীন ঋষির মতো বললেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। তিনি সমস্ত আবরণের মধ্য হতে একক আবিষ্কার করেছেন। তিনি এক দিকে প্রাচীন ঋষি, আবার অন্য দিকে তিনি একেবারে আধুনিক, যতদূর পর্যন্ত আধুনিক হওয়া যায় তিনি তাই। আগে এই বিশ্বাস ছিল, এই ব্রহ্মকে সকলে জানতে পারে না। রামমোহন তাহা স্বীকার করলেন না, তিনি সকলকেই বললেন, 'ভাব সেই একে।'

আজকার সভার এই প্রারম্ভসংগীত—'ভাব সেই একে', ইহাই রামমোহনের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কথা।

যিনি যাহাতে বড়ো, তাঁকে সেই দিক দিয়ে সম্মান দেখাতে হয়; টাকায় বড়ো যিনি তিনি ধনী বলে সম্মান পান; বিদ্যায় বড়ো যিনি, তিনি বিদ্বান বলে সম্মান পান। রামমোহনকে সেই-সকল দিক দিয়ে দেখলে চলবে না; তিনি এককে, সত্যকে লাভ করেছেন, সেই সত্যই তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। তাঁকে স্বীকার করেই তিনি নিন্দার মুকুট উপহার পেয়েছেন।

পৃথিবীর অন্য-সব মহাপুরুষের মতো তিনি টাকাকড়ি বিদ্যা খ্যাতি কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি, তিনি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে সেই একক সত্যকেই চেয়েছিলেন।

ভীষণ মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ এক জায়গায় একটা প্রস্রবণ প্রকাশ পায়। হোক-না সেটা মরুভূমি, তথাপি সেখানেও ধরিত্রীর বুকের ভিতরে প্রাণের রসধারা আছে: এই ধারা সর্বত্রই আছে। চারি দিকে শুষ্ক নির্জীব সমতল বালুর ক্ষেত্রের মধ্যে এই প্রস্রবণ একান্ত খাপছাড়া বলে মনে হবে সন্দেহ নাই। হয়তো চারি দিক বলবে, 'বেশ জড় নির্জীব শান্ত ছিলাম আমরা, হঠাৎ কোত্থেকে এল এই শ্যামলতা ও জলধারার কলধ্বনি।'

এই শুষ্ক নির্জীব দেশে মুক্তির বাণী ও জীবনের শ্যামলতা নিয়ে রামমোহন এসেছেন। আমরা জোর করে তাঁকে অস্বীকার করতে চাই কিন্তু সাধ্য কী তাঁকে অস্বীকার করি। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই তাঁর জীবনধারা দেখতে পাই। আমরা এখন ফল পাচ্ছি, তাই অনায়াসে গাছের গোড়ার কথা অস্বীকার করছি। রামমোহন আমাদের কাছে আত্মার মুক্তির সংবাদ নিয়ে এসেছেন। আমরা এখন বিদেশী কলকব্জা শিখতে চাই, পশ্চিমের অনুকরণে বাইরে থেকে অপকৃষ্ট উপায়ে স্বাধীনতা চাই। সে অসম্ভব। সকল শক্তির যেখানে মধ্যবিন্দু ও প্রাণের যেখানে কেন্দ্র, সেখান থেকে আমরা জীবনধারা লাভ করতে না পারলে আমরা বাইরের চেষ্টায় মুক্তি পাব না।

অনেকের এই ধারণা আছে পশ্চিমে আধ্যাত্মিকতা নেই, তারা বস্তুতেই বড়ো হয়ে উঠেছে। আমি তা স্বীকার করি না। আধ্যাত্মিকতায় বড়ো না হয়ে মানুষ কিছুতেই বড়ো হতে পারে না। তাদের সেবা, তাদের প্রেম, তাদের ত্যাগের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা এ কথা কিছুতেই বলতে পারেন না যে, পশ্চিমে আধ্যাত্মিকতা নেই।

রামমোহনকে সম্মান করতে হলে তাঁর জীবনের এই শ্রেষ্ঠ সত্যকে বরণ করতে হবে।

তাঁর জীবনের এই আসল কথাটিই আমার বক্তব্য। আর কিছু বলার সাধ্য আমার নেই।

কার্তিক ১৩২২

৯

একদা পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, বাল্যকালে অনেক সময়ে রামমোহন রায় তাঁহাকে গাড়ি করিয়া স্কুলে লইয়া যাইতেন; তিনি রামমোহন রায়ের সম্মুখবর্তী আসনে বসিয়া সেই মহাপুরুষের মুখ হইতে মুগ্ধদৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেন না, তাঁহার মুখচ্ছবিতে এমন একটি সুগভীর সুগম্ভীর সুমহৎ বিষাদচ্ছায়া সর্বদা বিরাজমান ছিল।

পিতার নিকট বর্ণনা শ্রবণকালে রামমোহন রায়ের একটি অপূর্ব মানসী মূর্তি আমার মনে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। তাঁহার মুখশ্রীর সেই পরিব্যাপ্ত বিষাদমহিমা, বঙ্গদেশের সুদূর ভবিষ্যৎকালের সীমান্ত পর্যন্ত, স্নেহচিন্তাকুল কল্যাণকামনার কোমল রশ্মিজালরূপে বিকীর্ণ দেখিতে পাই। আমরা বঙ্গবাসী নানা সফলতা এবং বিফলতা, দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব, আশা এবং নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আপনার পথ নির্মাণ করিয়া চলিয়াছি। আমি দেখিতে পাইতেছি, এখনও আমাদের প্রতি সেই নব্যবঙ্গের আদি পুরুষ রামমোহন রায়ের দূরপ্রসারিত বিষাদদৃষ্টি নিস্তব্ধভাবে নিপতিত রহিয়াছে। এবং আমরা যখন আমাদের সমস্ত চেষ্টার অবসান করিয়া এই জীবলোকের কর্মক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইব, যখন নবতর বঙ্গবাসী নব নব শিক্ষা এবং চেষ্টা এবং আশার রঙ্গভূমি-মধ্যে অবতীর্ণ হইবে, তখনও রামমোহন রায়ের সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর বিষণ্ণবিশাল দৃষ্টি তাহাদের সকল উদ্যোগের প্রতি আশীর্বাদ বিকীর্ণ করিতে থাকিবে। আমার পিতাকে যেদিন রামমোহন রায় সঙ্গে করিয়া বিদ্যালয়ে লইয়া যাইতেছিলেন, সেদিন আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই ইহসংসারে ছিলেন না— সেদিন যে পথ দিয়া তাঁহার শকট চলিয়াছিল অদ্য সে পথের মূর্তি-পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। তখন বঙ্গসমাজে একটি নূতন সন্ধ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল— তখন পারস্য শিক্ষা অস্তপ্রায়, ইংরাজি শিক্ষার অরুণোদয় হইতেছে মাত্র; এবং সংস্কৃত শিক্ষা স্বল্পতৈল দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল আলোকের অপেক্ষা ভূরি পরিমাণে মলিন ধূম্র বিকীর্ণ করিতেছিল। তখনও বঙ্গসমাজের অভ্যুদয় হয় নাই; তখন ছোটো ছোটো গ্রামসমাজ-পল্লিসমাজে বঙ্গদেশ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হইয়া ছিল; ব্যক্তিবিশেষের জাতিকুল, কার্য অকার্য, বেতন এবং উপরিপ্রাপ্য সংকীর্ণ গ্রাম্যমণ্ডলীর সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল— এমন সময়ে একদিন রামমোহন রায় তাঁহার মহৎ প্রকৃতির, তাঁহার বৃহৎ সংকল্পের সমস্ত অপরিমেয় বিষাদভার লইয়া আমার পিতাকে তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত নববিদ্যালয়ে পৌঁছাইয়া দিতেছিলেন।

অদ্য ইংরাজি শিক্ষা দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, অদ্য বাঙলা দেশের প্রভাতবিহঙ্গেরা ইংরাজি-অনুবাদ-মিশ্রিত সংগীতে দিগ্‌বিদিক্‌ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন, উষাসমীরণে শত শত সংবাদপত্র ইংরাজি ও বাঙলা ভাষায় মর্মরধ্বনি তুলিয়া অবিরাম আন্দোলিত হইতেছে। তখন গদ্য বাক্যবিন্যাস কী করিয়া বুঝিতে

হয়, রামমোহন রায় তাহা প্রথমে নির্দেশ করিয়া, তবে গদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আজ দেখিতে দেখিতে বঙ্গসাহিত্যলতা গদ্যে পদ্যে পাঠ্যে অপাঠ্যে কোথাও বা কণ্টকিত কোথাও বা মঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে— আজ সভাসমিতি আবেদন-নিবেদন, আলোচনা-আন্দোলন বাদ-প্রতিবাদে বঙ্গভূমি শুকপক্ষী-কুলায়ের ন্যায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ফলত, বঙ্গসমাজপুরীর পুরাতন রাজপথের আজ অনেক নূতন সংস্কার হইয়া গিয়াছে, পথ এবং জনতা উভয়েরই বহুল পরিমাণে রূপান্তর দেখা যাইতেছে, কিন্তু তথাপি আমি কল্পনা করিতেছি, যে শকটে রামমোহন রায় আমার পিতাকে বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন সেই শকটে অদ্য আমরা তাঁহার সম্মুখবর্তী আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছি, তাঁহার মুখ হইতে মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছি না। দেখিতে পাইতেছি, এখনও তাঁহার সমুন্নত ললাট ও উদার নেত্রযুগল হইতে সেই পুরাতন বিষাদচ্ছায়া অপনীত হয় নাই, এখনও তিনি ভবিষ্যতের দিগন্তাভিমুখে তাঁহার সেই গভীর চিন্তাবিষ্ট দূরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

হিমালয়ের দুর্গম নির্জন অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গমালার মধ্যে যে একটি নির্মল নিস্তব্ধ নিঃশব্দ তপঃপরায়ণ বিষাদ বিরাজ করে রামমোহন রায়ের বিষাদ সেই বিষাদ —তাহা অবসাদ নহে, নৈরাশ্য নহে; তাহা দূরগামী সংকল্প, দূরপ্রসারিত দৃষ্টি, সুদূরব্যাপী মহৎ প্রকৃতির ধ্যানধৈর্যের বিশালতা, অনন্ত স্বচ্ছ আকাশের নীলিমা; অতলস্পর্শ নির্মল সরোবরে শ্যামলতা যেরূপ উজ্জ্বল তাঁহার বৃহৎ অন্তঃকরণের বিষাদ সেইরূপ জ্যোতির্ময়, সেইরূপ বহুদূরবিস্তীর্ণ। যে বঙ্গভূমি তাঁহার ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে নিয়ত প্রকাশ পাইতেছিল সে বঙ্গভূমি তখন কোথায় ছিল এবং এখনই বা কোথায় আছে! রামমোহন রায়ের সেই বঙ্গদেশ, তখনকার বঙ্গভূমির সমস্ত ক্ষুদ্রতা জড়তা সমস্ত তুচ্ছতা হইতে বহুদূরে পশ্চিমদিক্‌প্রান্তভাগে স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত মেঘমালার মধ্যে ছায়াপুরীর মতো বিরাজ করিতেছিল। যখন বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ মূঢ়ের মতো তাঁহাকে গালি দিতেছিল তখন তিনি সেই মানস বঙ্গলোক হইতে দূরাগত সংগীতধ্বনির প্রতি কান পাতিয়াছিলেন; সমাজ যখন তাঁহাকে তিরস্কৃত করিবার উদ্দেশে আপন ক্ষুদ্র গৃহদ্বার অবরুদ্ধ করিতেছিল তখন তিনি প্রসারিতবাহু বিশ্ববন্ধুর ন্যায় সেই মানস বঙ্গসমাজের নিত্য-উন্মুক্ত উদার জ্যোতির্ময় সিংহদ্বারের প্রতি আপন উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সে সংগীত, সে দৃশ্য, ভবিষ্যতের সেই স্বর্গীয় আশারাজ্য যাহাদের সম্মুখে বর্তমান ছিল না, তাহারা তাঁহার সেই উদার ললাটের উপর সততসঞ্চরমাণ ছায়ালোকের কোনো অর্থই বুঝিতে পারিত না। তাহাদের আশা ছিল না, ভাষা ছিল না, সাহিত্য ছিল না, জাতিকে তাহারা বর্ণ বলিয়া জানিত, দেশ বলিতে তাহারা নিজের পল্লীকে বুঝিত; বিশ্ব তাহাদের গৃহকোণকল্পিত মিথ্যা বিশ্ব, সত্য তাহাদের অন্ধ সংস্কার; ধর্ম তাহাদের লোকাচারপ্রচলিত ক্রিয়া কর্ম, মনুষ্যত্ব কেবলমাত্র অনুগত প্রতিপালন এবং পৌরুষ রাজদ্বারে সৎ ও অসৎ উপায়ে উচ্চ বেতন লাভ। রামমোহন রায় যদি কেবল ইহাদের মধ্যে আপনার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখিতেন, যদি সেই সংকীর্ণ বর্তমান কালের মধ্যেই আপনার সমস্ত আশাকে প্রতিহত হইতে দিতেন, তাহা হইলে কদাচ কাজ করিতে পারিতেন না— তাহা হইলে তাঁহার মাতৃভূমিকে আপন আদর্শলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত।

যদিও একই পৃথিবী, একই মৃত্তিকা, তথাপি মহাপুরুষদিগের জন্মভূমি আমাদের হইতে অনেক স্বতন্ত্র। এই পৃথিবী, এই মৃত্তিকা আমাদের অজ্ঞাতসারে

অদৃশ্যভাবে তাঁহাদের পদতলে বহু ঊর্ধ্বে উন্নত হইয়া উঠে। যখন তাঁহারা আমাদের সহিত এক সমভূমিতে সঞ্চরণ করিতেছেন তখনও তাঁহারা পর্বতের শিখরাগ্রভাগে আছেন; সেইজন্য তাঁহারা গৃহের মধ্যে থাকিয়াও বিশ্বকে দেখিতে পান, বর্তমানের মধ্যে থাকিলেও ভবিষ্যৎ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে থাকে, ইহলোকের মধ্যে থাকিয়াও পরলোক তাঁহাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। আমরা ভূগোল-বিদ্যার সাহায্যে জ্ঞানে জানি যে, আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীকে অতিক্রম করিয়াও বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, কিন্তু আমরা সেই উচ্চ ভূমিতে নাই যেখান হইতে বিশ্বলোকের সহিত প্রত্যহ প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়। আমরা কল্পনার সাহায্যে আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টিকে ভবিষ্যৎ-অভিমুখে কিয়দ্দূর প্রেরণ করিতে পারি, কিন্তু আমরা সেই উন্নত লোকে বাস করি না যেখানে ভবিষ্যতের অনন্ত আশ্বাস-সামগীতি বিশ্ব-বিধাতার নীরব মাভৈঃ শব্দের সহিত নিরন্তর বিচিত্র স্বরে সম্মিলিত হইতেছে। আমাদের মধ্যে অনেকে পরলোকের প্রতি বিশ্বাসহীন নহি, কিন্তু আমরা সেই স্বাভাবিক সমুচ্চ আসনের উপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত নহি যেখান হইতে ইহলোক-পরলোকের জ্যোতির্ময় সংগমক্ষেত্র প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে অন্তরিন্দ্রিয়ের দৃষ্টি-গোচর হইতে থাকে। সেইজন্য আমাদের এত সংশয়, এত দ্বিধা; সেইজন্যই আমাদের সংকল্প এমন দুর্বল, আমাদের উদ্যম এমন স্বল্পপ্রাণ: সেইজন্যই বিশ্বহিতের উদ্দেশে আত্মসমর্পণ আমাদের নিকট একটি সুমধুর কাব্যকথা মাত্র, সেইজন্য ক্ষুদ্র বাধা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাকে অতিক্রম করিয়া মহাসফলতার অনন্ত বিস্তীর্ণ উর্বরক্ষেত্র আর আমরা দেখিতেই পাই না। মর্ত্যসুখ যখন স্বর্ণমায়ামৃগের মতো আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া ধাবমান করে তখন অমৃতলোক আমাদের নিকট হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। আমাদের নিকট সংসারের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, বর্তমানের উপস্থিত বাধা বিপত্তি, মর্ত্যসুখের বিচিত্র প্রলোভনই প্রত্যক্ষ সত্য, আর সমস্ত শূন্য কথা, শিক্ষালব্ধ মুখস্থবিদ্যা এবং ছায়াময় কল্পনা। কিন্তু মহাপুরুষদের নিকট আমাদের সেই-সকল ছায়ারাজ্য প্রত্যক্ষ সত্য; বস্তুত সেইখানেই তাঁহারা বাস করিতেছেন। আমাদের সংসার, আমাদের সুখদুঃখ, আমাদের বাধাবিপত্তি তাঁহাদিগকে চরম পরিণাম-স্বরূপে আবৃত করিয়া রাখে না।

রামমোহন রায় সেই মহাপুরুষ, যিনি বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াও বিধাতার প্রসাদে নিত্য সত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার শারীরিক জন্মস্থানের সহিত তাঁহার মানসিক জন্মভূমির বিরোধ তাঁহার সম্মুখে প্রধূমিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অন্তরে নিত্যসত্যের স্বাভাবিক আদর্শ, বাহিরে চতুর্দিকেই অসত্য প্রাচীন ভক্তিভাজন বেশে সঞ্চরণ করিতেছে। সেই অসত্যের সহিত তিনি কোনোক্রমেই সন্ধিস্থাপন করিতে পারেন না। সেইজন্য দেশের বৃদ্ধেরা যখন প্রাণহীন ক্রিয়াকর্ম ও প্রথার মধ্যে জড়ত্বের শান্তিসুখ অনুভব করিতেছিল তখন বালক রামমোহন মরীচিকাভীরু তৃষাতুর মৃগশাবকের ন্যায় সত্যের অন্বেষণে দুর্গম প্রবাসে দেশদেশান্তরে ব্যাকুলভাবে পর্যটন করিতেছিলেন। কত লক্ষ লক্ষ লোক, যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানকার জড়সংস্কারের পুরাতন লূতাতন্তুজালের মধ্যে অনায়াসে নির্বিরোধে আত্মসমর্পণ করিয়া আশ্রয়লাভ করে, তদ্দ্বারা অন্তরাত্মাকে খর্ব জীর্ণ জড়বৎ করিয়া রাখে, তাহা আমৃত্যুকাল জানিতেও পারে না, রামমোহন রায়ের আত্মা প্রথম হইতেই সেই-সকল জড় সংস্কারে জড়িত হইতে চাহিল না। নীড়চ্যুত তরুণ ঈগল্ পক্ষী যেমন স্বভাবতই পৃথিবীর সমস্ত নিম্নভূমি পরিহার করিয়া আপন অভ্রংলিহ শৈলকুলায়ের প্রতি ধাবমান হয়,

কিশোর রামমোহন রায় সেইরূপ বঙ্গসমাজের জীর্ণনীড় স্বভাবতই পরিত্যাগ করিয়া অভ্রভেদী অচলশিখর-প্রতিষ্ঠিত সত্য কুলায়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। লোকাচার, সামাজিক সংস্কার বহু পুরাতন হইতে পারে, কিন্তু সত্য তদপেক্ষা পুরাতন— সেই চিরপুরাতন সত্যের সহিত এই নবীন বাঙালি বালকের কোথায় পরিচয় হইয়াছিল? সেই সত্যের অভাবে গৃহবাস, সমাজের আশ্রয়, লৌকিক সুখশান্তি এই গৃহপালিত তরুণ বাঙালির নিকটে কেমন করিয়া এত তুচ্ছ বোধ হইল? সেই ভূমা সত্যসুখের আস্বাদ সে কবে কোথায় লাভ করিয়াছিল? বঙ্গমাতা এই বালককে তাহার অন্যান্য শিশুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া আপনার চির-প্রচলিত ক্রীড়নকগুলি তাহার সম্মুখে একে একে আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিল; বালক কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, ইহা নহে ইহা নহে— আমি ধর্ম চাহি, ধর্মের পুত্তলি চাহি না; আমি সত্য চাহি, সত্যের প্রতিমা চাহি না। বঙ্গমাতা কিছুতেই এই বালকটিকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না— সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সত্যের সন্ধানে সে একাকী বিশ্বজগতে বাহির হইয়া গেল। সে কোন্‌-এক সময় কেমন করিয়া বাঙলাদেশের সমস্ত দেশাচার-লোকাচারের উপরে মস্তক তুলিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে, এই আচার-অনুষ্ঠানই চরম নহে, ইহার বাহিরে অসীম সত্য অনন্তকাল অমৃতপিপাসু ভক্ত মহাত্মাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, মহাপুরুষদের পদতলে ধরণী অদৃশ্যভাবে উন্নত হইয়া উঠিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষগোচর চরাচরের বহির্বর্তী অনন্ত দৃশ্য দেখাইয়া দেয়, তখন তাঁহারা বরঞ্চ নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্তিত্ব অবিশ্বাস করিতে পারেন কিন্তু সেই বিশ্ববেষ্টনকারী দৃশ্যাতীত অনন্ত সত্যলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন না।

নারিকেলের বহিরাবরণের ন্যায় সকল ধর্মেরই বাহ্যিক অংশ তাহার অন্তরস্থিত অমৃতরসকে ন্যূনাধিক পরিমাণে গোপন ও দুর্লভ করিয়া রাখে। তৃষার্ত রামমোহন রায় সেই-সকল কঠিন আবরণ স্বহস্তে ভেদ করিয়া ধর্মের রসশস্য আহরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃত শিখিয়া বেদ-পুরাণের গহন অরণ্যের মধ্যে আপনার পথ কাটিয়া লইলেন, হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিখিয়া খৃস্টধর্মের মূল আকরের মধ্যে অবতরণ করিলেন, আরব্য ভাষা শিখিয়া কোরানের মূল মন্ত্রগুলি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া লইলেন। ইহাই সত্যের জন্য তপস্যা। সত্যের প্রতি যাহার প্রকৃত বিশ্বাস নাই সে বিনা চেষ্টায় যাহা হাতের কাছে প্রস্তুত দেখিতে পায় তাহাকেই আশ্রয় করিয়া অবহেলে জীবনযাপন করিতে চাহে— কর্তব্যবিমুখ অলস ধাত্রীর ন্যায় মোহ-অহিফেন-সেবনে অভ্যস্ত করাইয়া অন্তরাত্মার সমস্ত চেষ্টা সমস্ত ক্রন্দন নিরস্ত করিতে প্রয়াস পায় এবং জড়ত্বসাধনার দ্বারা আত্মাকে অভিভূত করিয়া সংসারাশ্রমে পরিপুষ্ট সুচিক্কণ হইয়া উঠে।

একদিন বহু সহস্র বৎসর পূর্বে সরস্বতীকূলে কোন্‌-এক নিস্তব্ধ তপোবনে কোন্‌-এক বৈদিক মহর্ষি ধ্যানাসনে বসিয়া উদাত্ত স্বরে গান গাহিয়া উঠিয়াছিলেন।

> শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রসকল, তোমরা শ্রবণ করো— আমি সেই তিমিরাতীত মহান্‌ পুরুষকে জানিয়াছি।

রামমোহন রায়ও একদিন উষাকালে নির্বাণদীপ তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্গসমাজের গাঢ়নিদ্রামগ্ন নিশ্চেতন লোকালয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন— হে

মোহশয্যাশায়ী পুরবাসিগণ, আমি সত্যের দর্শন পাইয়াছি—তোমরা জাগ্রত হও!

লোকাচারের পুরাতন শুষ্ক পর্ণশয্যায় সুখসুপ্ত প্রাণিগণ রক্তনেত্র উন্মীলন করিয়া সেই জাগ্রত মহাপুরুষকে রোষদৃষ্টিদ্বারা তিরস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু সত্য যাহাকে একবার আশ্রয় করে সে কি আর সত্যকে গোপন করিতে পারে? দীপবর্তিকায় অগ্নি যখন ধরিয়া উঠে তখন সেই শিখা লুক্কায়িত করা প্রদীপের সাধ্যায়ত্ত নহে—আমরা রুষ্ট হই আর সন্তুষ্ট হই, সে ঊর্ধ্বমুখী হইয়া জ্বলিতে থাকিবে, তাহার অন্য গতি নাই।

রামমোহন রায়েরও অন্য গতি ছিল না—সত্যশিখা তাঁহার অন্তরাত্মায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল—সমাজ তাঁহাকে যত লাঞ্ছনা যত নির্যাতন করুক তিনি সে আলোক কোথায় গোপন করিবেন? তখন হইতে তাঁহার আর বিশ্রাম নাই, নিভৃতগৃহবাসসুখ নাই, বঙ্গসমাজের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে হইবে। তাঁহাকে সমস্ত বিরোধ বিদ্বেষ প্রতিকূলতার রোষগর্জনের ঊর্ধ্বে কণ্ঠ তুলিয়া বলিতে হইবে—মিথ্যা মিথ্যা! হে পৌরগণ, ইহাতে মুক্তি নাই, ইহাতে তৃপ্তি নাই, ইহা ধর্ম নহে, ইহা আত্মার উপজীবিকা নহে, ইহা মোহ, ইহা মৃত্যু! মিথ্যাকে স্তূপাকার করিয়া তুলিলেও তাহা সত্য হয় না, তাহা মহৎ হয় না; সত্যের প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে তবে সাবধানে জ্ঞানালোকে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া লইয়া তবে তাহার পূজা করো—যে ভক্তি যেখানে-সেখানে অর্ঘ্য-উপহার স্থাপন করিয়া দ্রুত তৃপ্তি লাভ করিতে চায় সে ভক্তি আত্মার আলস্য, তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা তপস্যা নহে, তাহা যথার্থ আত্মোৎসর্গ নহে, তাহা অবহেলা, তাহাতে আত্মা বললাভ জ্যোতিলাভ মুক্তিলাভ করে না, কেবল উত্তরোত্তর জড়ত্বজালে জড়িত হইয়া সুপ্তিমগ্ন হইতে থাকে।

গ্রহণ করা এবং বর্জন করা জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ। জীবনীশক্তি প্রবল থাকিলে এই গ্রহণবর্জন-ক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে; যখন ইহার ব্যাঘাত ঘটে তখন স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং মৃত্যু আসিয়া অধিকার করে।

আমাদের শারীর প্রকৃতিতে এই গ্রহণবর্জন-ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়া বহুলাংশে যন্ত্রবৎ চলিতে থাকে। আমরা অচেতনভাবে অম্লজান বায়ু গ্রহণ করি, অঙ্গারক বায়ু ত্যাগ করি; আমাদের দেহ প্রতিক্ষণে নূতন শারীর কোষ নির্মাণ করিতেছে এবং মৃত কোষ পরিত্যাগ করিতেছে—কী করিয়া যে তাহা আমরা জানি না।

আমাদের অন্তরপ্রকৃতিতেও বিচিত্র ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে গূঢ়ভাবে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সেখানে আমাদের কর্তৃত্বের অধিকার অপেক্ষাকৃত ব্যাপক এবং গুরুতর দায়িত্ব-পূর্ণ। ভালোমন্দ পাপপুণ্য শ্রেয়-প্রেয় আমাদিগকে নিজের সতর্ক চেষ্টায় গ্রহণ ও বর্জন করিতে হয়। ইহাতেই আত্মার মাহাত্ম্যও। এ কার্য যদি সম্পূর্ণ জড়বৎ যন্ত্রবৎ সম্পন্ন হইতে থাকিত তবে আমাদের মনুষ্যত্বের গৌরব থাকিত না—তবে ধর্ম ও নীতি শব্দ অর্থহীন হইত।

আত্মার গ্রহণ-বর্জন-কার্য এইরূপ স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করাতে অনেক সময়ে ইচ্ছা আপন কর্তব্য কার্য সতর্কভাবে সম্পন্ন করে না; অনেক পুরাতন আবর্জনা সঞ্চিত হইতে থাকে, অনেক নূতন পোষণপদার্থ দূরে পরিত্যক্ত হয়। শরীর আপন মৃত কোষকে যেমন নির্মমভাবে বর্জন করে আমরা আমাদের মৃত বস্তুগুলিকে তেমন অকাতরে পরিহার করিতে পারি না, এইজন্য সকল মনুষ্যসমাজ

এবং সকল ধর্মেরই চতুর্দিকে বহুযুগসঞ্চিত পরমপ্রিয় মৃতবস্তুগুলি উত্তরোত্তর স্তূপাকার হইয়া ক্রমে তাহার গতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়— অভ্যন্তরের বায়ুকে দূষিত করিয়া তোলে, বাহিরের স্বাস্থ্যকর বায়ুকে প্রবেশ করিতে দেয় না। যাহারা শনৈঃ শনৈঃ অলক্ষিত ভাবে এই বিষবায়ুর মধ্যে পালিত হইয়া উঠে তাহারা বুঝিতে পারে না যে, তাহারা কি আলোক কি স্বাস্থ্য কি মুক্তি হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা মমত্ববশত ভস্মকে ত্যাগ করিতে পারে না, অবশেষে পবিত্র অগ্নি উত্তরোত্তর আচ্ছন্ন হইয়া কখন নির্বাপিত হইয়া যায় তাহা তাহারা জানিতেও পারে না।

ক্রমে এমন হয় যে, যাহা মুখ্য বস্তু, যাহা সার পদার্থ, তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া অনভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহার সহিত আর পরিচয় থাকে না, তাহাকে আমাদের আর একান্ত আবশ্যক বলিয়াই বোধ হয় না; যাহা গৌণ, যাহা ত্যাজ্য, তাহাই পদে পদে আমাদের চক্ষুগোচর হইয়া অভ্যাসজনিত প্রীতি আকর্ষণ করিতে থাকে।

এমন সময়ে সমাজে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তিনি বজ্রস্বরে বলেন, যে মিথ্যা সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে সেই মিথ্যাকে সত্য অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিয়ো না। তখন এই অতি পুরাতন কথা লোকের নিকট সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হয়। কেহ-বা বলে, সত্যকে মিথ্যা স্তূপের মধ্য হইতে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবার কষ্ট আমরা স্বীকার করিব না, আমরা যাহা সহজে পাই তাহাকেই সত্যজ্ঞানে সমাদর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে ইচ্ছা করি। অর্থাৎ, যাহা বর্জনীয় তাহা বর্জন করিতে চাহি না, যাহা গ্রহণীয় তাহাও গ্রহণ করিতে পারি না, আমাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যুদশা উপস্থিত হইয়াছে। তখন সেই মহাপুরুষ বিধি-প্রেরিত উদ্যত বজ্রাগ্নি সেই মৃত আবর্জনাস্তূপের প্রতি নিক্ষেপ করেন। ধূর্জটি যখন মৃত সতীদেহ কোনোমতেই পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, নিষ্ফল মোহে তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তখন বিষ্ণু আপন সুদর্শন চক্র দ্বারা সেই মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন করিয়া শিবকে মোহভার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেইরূপ মানবসমাজকে মোহমুক্ত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষগণ বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র লইয়া আবির্ভূত হন— সমাজ আপনার বহুকালের প্রিয় মোহভার হইতে বঞ্চিত হইয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে, কিন্তু দেবতার চক্রকে আপন কর্ম হইতে কে নিবৃত্ত করিতে পারে?

সর্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের দেশও তাহার ব্যতিক্রমস্থল নহে। বরঞ্চ যে জাতি সজীব সচেষ্ট, যাহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, সবলভাবে কার্য করে, সানন্দ মনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকে, যাহাদের সমাজে প্রাণের প্রবাহ কখনও অবরুদ্ধ থাকে না, তাহারা আপন গতিবেগের দ্বারা আপন ত্যাজ্য পদার্থকে বহুলাংশে দূরে লইয়া যায়, আপন দূষণীয়তা সংশোধন করিতে থাকে।

আমরা বহুকাল হইতে পরাধীন অধঃপতিত উৎপীড়িত জাতি; বহুদিন হইতে আমাদের সেই অন্তরের বল নাই যাহার সাহায্যে আমরা বাহিরের শত্রুকে বাহিরে রাখিতে পারি; সমাজের মধ্যে সেই জীবনীশক্তির ঐক্য নাই যদ্দ্বারা আমরা বিপৎকালে এক মুহূর্তে এক হইয়া গাত্রোত্থান করিতে পারি; আমাদের মধ্যে বহুকাল হইতে কোনো মহৎ সংকল্প সাধন কোনো বৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নাই —সেইজন্য আমাদের অন্তরপ্রকৃতি ক্রমশ তন্দ্রামগ্ন হইয়া আসিয়াছিল। আমাদের হৃদয় রাজপুরুষদের অপ্রতিহত স্বেচ্ছাচারিতায় দলিত নিস্তেজ, আমাদের অন্তঃকরণ

বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক সানন্দ পরিচালনার অভাবে জড়বৎ হইয়া আসিয়াছিল। এমন স্থলে আমাদের সমাজ আমাদের ধর্ম যে আপন আদিম বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতা অক্ষুণ্নভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। যদি রক্ষা করিত তবে সে উজ্জ্বলতা সকল অংশে সকল দিকেই প্রকাশ পাইত, তবে আমাদের মুখচ্ছবি মলিন, মেরুদণ্ড বক্র, মস্তক অবনত হইত না—তবে আমরা লোকসমাজে সর্বদা নির্ভীকভাবে অসংকোচে সঞ্চরণ করিতে পারিতাম। যাহার ধর্ম যাহার সমাজ সজীব সতেজ বিশুদ্ধ উন্নত, ত্রিভুবনে তাহার কাহাকেও ভয় করিবার নাই। বারুদ এবং সীসকের গোলক দ্বারা তাহার স্বাধীনতা অপহৃত হইতে পারে না। আগে আমাদের সমাজ নষ্ট হইয়াছে, ধর্ম বিকৃত হইয়াছে, বুদ্ধি পরবশ হইয়াছে, মনুষ্যত্ব মৃতপ্রায় হইয়াছে, তাহার পরে আমাদের রাষ্ট্রীয় দুর্গতির সূচনা হইয়াছে। সকল অবমাননা, সকল দুর্বলতার মূল সমাজের মধ্যে ধর্মের মধ্যে।

রামমোহন রায় সেই সমাজ সেই ধর্মের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন।, তাঁহার নিজের আদর্শ নহে। তিনি এ কথা বলিলেন না যে, আমার এই নূতন রচিত মত সত্য, আমার এই নূতন উচ্চারিত আদেশ ঈশ্বরাদেশ। তিনি এই কথা বলিলেন, সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, সতর্ক যুক্তি দ্বারা সমাজের সমস্ত অকল্যাণ দূর করিতে হইবে। যেমন বলের দ্বারা ধূম নিরস্ত হয় না, অগ্নিকে সম্পূর্ণ প্রজ্বলিত করিয়া তুলিলে ধূমরাশি আপনি অন্তর্হিত হয়—রামমোহন রায় সেইরূপ ধর্মের প্রচ্ছন্ন বিশুদ্ধ অগ্নিকে প্রজ্বলিত জাগ্রত করিয়া তুলিয়া তাহার ধূমজাল দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বেদ পুরাণ তন্ত্রের সারভাগ উদ্ধার করিয়া আনিয়া তাহার বিশুদ্ধ জ্যোতি আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর করিতে লাগিলেন। যে-সমস্ত নূতন কালিমা সেই পুরাতন জ্যোতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহাকে তিনি সেই জ্যোতির আদর্শের দ্বারাই নিন্দিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, আমাদের পক্ষে সেই পুরাতন জ্যোতিই নূতন, এই নূতন কালিমাই পুরাতন; সেই সনাতন বিশুদ্ধ সত্য শাস্ত্রের মধ্যে আছে, আর এই-সমস্ত অধুনাতন লোকাচার আমাদের ঘরে বাহিরে, আমাদের চিন্তায় কার্যে, আমাদের সুখে দুঃখে শত সহস্র চিহ্ন রাখিয়াছে—চক্ষু উন্মীলন করিলেই তাহাকে আমরা চতুর্দিকে দেখিতে পাই, শাস্ত্র উদ্ঘাটন না করিলে সনাতন সত্যের সাক্ষাৎ পাই না। অতএব হে রামমোহন রায়, তুমি যে মুক্তা আহরণ করিয়াছ তাহা শ্রেয় হইতে পারে, কিন্তু যে শুক্তি যুক্তি-অস্ত্রে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিতেছ তাহাই আমাদের প্রেয়, আমাদের পরিচিত; আমরা মুক্তাকে মুখে বহুমূল্য বলিয়া সম্মান করিতে সম্মত আছি, কিন্তু শুক্তিখণ্ডকেই হৃদয়ের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিব।

তাহা হউক, সত্যকেও সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু একবার যখন সে প্রকাশ পাইয়াছে তখন তাহার সহিতও আমাদের ক্রমশ পরিচয় হইবে। সত্যের পথ যদি বাধাগ্রস্ত না হয় তবে সত্যকে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করিয়া চিনিয়া লইতে পারি না; সন্দেহের দ্বারা পীড়িত নিষ্পীড়িত করিয়া তবে আমরা সত্যের অজেয় বল, অটল স্থায়িতা বুঝিতে পারি। যে প্রিয় পুরাতন মিথ্যা আমাদের গৃহে আমাদের হৃদয়ে এতকাল সত্যের ছদ্মবেশে বিরাজ করিয়া আসিয়াছে তাহাকে কি আমরা এক মুহূর্তের মধ্যে অকাতরে বিদায় দিতে পারি? সত্য যখন আপন কল্যাণময় কঠিন হস্তে তাহাকে আমাদের বক্ষ হইতে একেবারে কাড়িয়া ছিনিয়া লইয়া যাইবে তখন তাহার জন্য আমাদের হৃদয়ের শোণিতপাত এবং অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি তাহার পুরাতন প্রেয় বস্তুকে আপন শিথিল মুষ্টি

হইতে অতি সহজেই ছাড়িয়া দিতে পারে সে লোক নূতন শ্রেয়কে তেমন সবলভাবে একান্তমনে ধারণ করিতে পারে না। পুরাতনের জন্য শোক যেখানে মৃদু, নূতনের জন্য আনন্দ সেখানে ম্লান। অবসন্ন রজনীর বিদায়-শিশিরাশ্রুজলের উপরেই প্রভাতের আনন্দ-অভ্যুদয় নির্মল উজ্জ্বল সুন্দর রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

প্রথমে সকলেই বলিব—না না, ইহাকে চাহি না, ইহাকে চিনি না, ইহাকে দূর করিয়া দাও; তাহার পর একদিন বলিব, এসো এসো হে সর্বশ্রেষ্ঠ, এসো হে হৃদয়ের মহারাজ, এসো হে আত্মার জাগরণ, তোমার অভাবেই আমরা এতদিন জীবন্মৃত হইয়া ছিলাম।—

এসো গো নূতন জীবন।
এসো গো কঠোর নিঠুর নীরব,
এসো গো ভীষণ শোভন॥
এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এসো গো অশ্রুসলিলসিক্ত,
এসো গো ভূষণবিহীন রিক্ত,
এসো গো চিত্তপাবন॥
থাক্ বীণাবেণু, মালতীমালিকা,
পূর্ণিমানিশি, মায়াকুহেলিকা—
এসো গো প্রখর হোমানলশিখা
হৃদয়শোণিতপ্রাশন।
এসো গো পরমদুঃখনিলয়,
মোহ-অঙ্কুর করো গো বিলয়,
এসো সংগ্রাম, এসো মহাজয়,
এসো গো মরণসাধন॥

প্রথমে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম বলিয়াই, যখন আবাহন করিব তখন একান্ত মনে সমস্ত হৃদয়ের সঙ্গে করিব—প্রবল দ্বন্দ্বের পর পরাজয় স্বীকার করিয়া যখন আত্মসমর্পণ করিব তখন সম্পূর্ণরূপেই করিব, তখন আর ফিরিবার পথ রাখিব না।

আমাদের দেশে এখনও সত্যমিথ্যার সেই দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই দ্বন্দ্বের অবতারণাই রামমোহন রায়ের প্রধান গৌরব। কারণ যে সমাজে সত্যমিথ্যার মধ্যে কোনো বিরোধ নাই সে সমাজের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়; এমন-কি জড়ভাবে অন্ধভাবে সত্যকে গ্রহণ করিলেও সে সত্যের কোনো গৌরব থাকে না। সীতার ন্যায় সত্যকেও বারংবার অগ্নিপরীক্ষা সহ্য করিতে হয়।

অনেকে মনে মনে অধৈর্য প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, রামমোহন রায় শাস্ত্র হইতে আহরণ করিয়া যে ধর্মকে বঙ্গসমাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন এখনও তাহাকে সকলে গৃহে আহ্বান করিয়া লয় নাই; এমন-কি এক-এক সময়ে আশঙ্কা হয়, সমাজ সহসা সবেগে তাহার বিপরীত মুখে ধাবিত হইতেছে, এবং রামমোহন রায়ের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হইতেছে না। কিন্তু সে আশঙ্কায় মুহ্যমান হইবার আবশ্যক নাই। রামমোহন রায় যে ধর্মকে সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন সে ধর্মকে তিনি সত্য বলিয়া জানিয়াছিলেন—আমরাও অগ্রে সে ধর্মকে প্রকৃতরূপে সত্য বলিয়া জানিব তবে তাহাকে গ্রহণ করিব, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়; সত্যকে কেবল পঠিত মন্ত্রের ন্যায় গ্রহণ করিব না।

সত্যকে যথার্থ সত্য বলিয়া জানা সহজ নহে—অনেকে যাঁহারা মনে করেন

'জানিয়াছি' তাঁহারাও জানেন না। রামমোহন রায় যে নিদারুণ পিপাসার পর যে কঠোর তপস্যার দ্বারা ধর্মে বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন আমাদের সে পিপাসাও নাই, সে তপস্যাও নাই; আমরা কেবল পরম্পরাগত বাক্য শ্রবণ করিয়া যাই এবং মনে করি যে তাহা সত্য এবং তাহা বুঝিলাম। কিন্তু আমাদের অন্তরাত্মা আকাঙ্ক্ষা দ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করিয়া তাহার সমস্ত সত্যতা একান্তভাবে লাভ করে না।

এখনও আমাদের বঙ্গসমাজে সেই আধ্যাত্মিক ক্ষুৎপিপাসার সঞ্চার হয় নাই, সত্যধর্মের জন্য আমাদের প্রাণের দায় উপস্থিত হয় নাই; যে ধর্ম স্বীকার করি সে ধর্ম বিশ্বাস না করিলেও আমাদের চলে, যে ধর্মে বিশ্বাস করি সে ধর্ম গ্রহণ না করিলেও আমাদের ক্ষতিবোধ হয় না—আমাদের ধর্মজিজ্ঞাসার সেই স্বাভাবিক গভীরতা নাই বলিয়া সে সম্বন্ধে আমাদের এমন অবিনয়, এমন চাপল্য, এমন মুখরতা। কোনো সন্ধান, কোনো সাধনা না করিয়া, অন্তরের মধ্যে কোনো অভাব অনুভব বা কোনো অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া এমন অনায়াসে কোনো-এক বিশেষ পক্ষ অবলম্বনপূর্বক উকিলের মতো নিরতিশয় সূক্ষ্ম তর্ক করিয়া যাইতে পারি। এমন করিয়া কেহ আত্মার খাদ্য পানীয় আহরণ করে না। ইহা জীবনের সর্বোত্তম ব্যাপার লইয়া বাল্যক্রীড়া মাত্র।

দীর্ঘ সুপ্তির পর রামমোহন রায় আমাদিগকে নিদ্রোত্থিত করিয়া দিয়াছেন। এখন কিছুদিন আমাদের চিত্তবৃত্তির পরিপূর্ণ আন্দোলন হইলে পর তবে আমাদের আত্মার স্বাভাবিক সত্যক্ষুধা সঞ্চার হইবে—তখনই সে যথার্থ সত্যকে সত্যরূপে লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

রামমোহন রায় এখন আমাদিগকে সেই সত্যলাভের পথে রাখিয়া দিয়াছেন। প্রস্তুত সত্য মুখে তুলিয়া দেওয়া অপেক্ষা এই সত্যলাভের পথে স্থাপন করা বহু-গুণে শ্রেয়। এখন আমরা বহুকাল অলীক জল্পনা, নাস্তিক্যের অভিমান, বৃথা তর্কবিতর্ক এবং বহুবিধ কাল্পনিক যুক্তির মধ্যে অবিশ্রাম নৃত্য করিয়া ফিরিব, ধর্মের নানারূপ ক্রীড়ায় প্রভাত অতিবাহন করিব; অবশেষে সূর্য যখন মধ্যগগনে অধিরোহণ করিবে, যখন অন্তঃকরণ অমৃতসরোবরে সুধাস্নানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, ক্ষুধিত পিপাসিত অন্তরাত্মা তখন দেখিতে পাইবে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক বিস্তার করিয়া শ্রান্তি বই পরিতৃপ্তি নাই—তখন যথার্থ অনুসন্ধান পড়িয়া যাইবে এবং যতক্ষণ আত্মার যথার্থ খাদ্যপানীয় না পাইব ততক্ষণ আপনাকে বৃথা বাক্যের ছলনায় ভুলাইয়া রাখিতে পারিব না। তখন রামমোহন রায় আত্মার স্বাধীন চেষ্টার যে রাজপথ বাঙালিকে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন সেই পথযাত্রা সার্থক হইবে এবং তখন রামমোহন রায়ের সেই শকট আপন গম্যস্থানে আত্মার বিদ্যা-মন্দিরে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে।

রামমোহন রায় তাঁহার যজুর্বেদীয় কঠোপনিষদের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় যে প্রার্থনা করিয়াছেন আমরাও সেই প্রার্থনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি—

'হে অন্তর্যামিন্ পরমেশ্বর আমাদিগ্যে আত্মার অন্বেষণ হইতে বহির্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্বব্যাপী এবং সর্বনিয়ন্তা করিয়া দৃঢ়রূপে আমরণান্ত জানি এমৎ অনুগ্রহ কর ইতি। ওঁ তৎসৎ॥'

আশ্বিন?, ১৩০৩

১০

মহাপুরুষেরা সমস্ত মানবজাতির গৌরবের ও আদর্শের স্থল বটেন, কিন্তু তাঁহারা জাতিবিশেষের বিশেষ গৌরবের স্থল তাহার আর সন্দেহ নাই। গৌরবের স্থল বলিলে যে কেবলমাত্র সামান্য অহংকারের স্থল বুঝায় তাহা নহে, গৌরবের স্থল বলিলে শিক্ষার স্থল, বললাভের স্থল বুঝায়। মহাপুরুষদিগের মহৎকার্যসকল দেখিয়া কেবলমাত্র সম্ভ্রমমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হইলেই যথেষ্ট ফললাভ হয় না— তাঁহাদিগকে যতই 'আমার' মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি যতই প্রেমের উদ্রেক হয় ততই তাঁহাদের কথা, তাঁহাদের কার্য, তাঁহাদের চরিত্র আমাদের নিকট জীবন্ত হইয়া উঠে। যাঁহাদিগকে লইয়া আমরা গৌরব করি তাঁহাদিগকে শুদ্ধমাত্র যে আমরা ভক্তি করি তাহা নহে, তাঁহাদিগকে 'আমার' বলিয়া মনে করি। এইজন্য তাঁহাদের মহত্ত্বের আলোক বিশেষরূপে আমাদেরই উপরে আসিয়া পড়ে, বিশেষরূপে আমাদেরই মুখ উজ্জ্বল করে। শিশু যেমন সহস্র বলবান ব্যক্তিকে ফেলিয়া বিপদের সময় পিতার কোলে আশ্রয় লইতে যায়, তেমনি আমরা দেশের দুর্গতির দিনে আর-সকলকে ফেলিয়া আমাদের স্বদেশীয় মহাপুরুষদিগের অটল আশ্রয় অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হই। তখন আমাদের নিরাশ হৃদয়ে তাঁহারা যেমন বলবিধান করিতে পারেন এমন আর কেহই নহে। ইংলন্ডের দুর্গতি কল্পনা করিয়া কবি ওআর্ড্‌স্‌ওআর্থ্‌ পৃথিবীর আর-সমস্ত মহাপুরুষকে ফেলিয়া কাতর স্বরে মিল্টনকেই ডাকিলেন, কহিলেন, 'মিল্টন, আহা, তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে ইংলন্ডের বড়োই আবশ্যক হইয়াছে।' যে জাতির মধ্যে স্বদেশীয় মহাপুরুষ জন্মান নাই সে জাতি কাহার মুখ চাহিবে—তাহার কী দুর্দশা! কিন্তু, যে জাতির মধ্যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি যে জাতি কল্পনার জড়তা, হৃদয়ের পক্ষাঘাত-বশত তাঁহার মহত্ত্ব কোনোমতে অনুভব করিতে পারে না, তাহার কী দুর্ভাগ্য!

আমাদের কী দুর্ভাগ্য! আমরা বঙ্গসমাজের বড়ো বড়ো যশোবুদ্‌বুদদিগকে বালুকার সিংহাসনের উপর বসাইয়া দুই দিনের মতো পুষ্পচন্দন দিয়া মহত্ত্ব-পূজার স্পৃহা খেলাচ্ছলে চরিতার্থ করিতেছি, বিদেশীয়দের অনুকরণে কথায় কথায় সভা ডাকিয়া চাঁদা তুলিয়া মহত্ত্বপূজার একটা ভান ও আড়ম্বর করিতেছি।

রামমোহন রায়ের চরিত্র আলোচনা করিবার একটি গুরুতর আবশ্যকতা আছে। আমাদের এখনকার কালে তাঁহার মতো আদর্শের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা কাতর স্বরে তাঁহাকে বলিতে পারি, 'রামমোহন রায়, আহা, তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে বঙ্গদেশের বড়োই আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বাক্‌পটু লোক, আমাদিগকে তুমি কাজ করিতে শিখাও। আমরা আত্মম্ভরি, আমাদিগকে আত্মবিসর্জন দিতে শিখাও। আমরা লঘুপ্রকৃতি, বিপ্লবের স্রোতে চরিত্রগৌরবের প্রভাবে আমাদিগকে অটল থাকিতে শিখাও। আমরা বাহিরের প্রখর আলোকে অন্ধ, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ চিরোজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে ভালোমন্দ নির্বাচন করিতে ও স্বদেশের পক্ষে যাহা স্থায়ী ও যথার্থ মঙ্গল তাহাই অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও।'

রামমোহন রায় যথার্থ কাজ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে প্রগল্‌ভা রসনার এত শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই, সুতরাং তাহার এত সমাদরও ছিল না। কিন্তু আর-একটা কথা দেখিতে হইবে। এক-একটা সময়ে কাজের ভিড় পড়িয়া যায়, কাজের হাট বসিয়া যায়, তখন কাজ করিতে অথবা কাজের ভান করিতে একটা আমোদ আছে। তখন

সেই কার্যাড়ম্বর নাট্যরস জন্মাইয়া মানুষকে মত্ত করিয়া তুলে, বিশেষত একটা তুমুল কোলাহলে সকলে বাহ্যজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া একপ্রকার বিহ্বল হইয়া পড়েন। কিন্তু রামমোহন রায়ের সময়ে বঙ্গসমাজের সে অবস্থা ছিল না। তখন কাজে মত্ততাসুখ ছিল না; একাকী ধীরভাবে সমস্ত কাজ করিতে হইত। সঙ্গীহীন সুগম্ভীর সমুদ্রের গর্ভে যেমন নীরবে অতি ধীরে ধীরে দ্বীপ নির্মিত হইয়া উঠে, সংকল্প তেমনি অবিশ্রাম নীরবে গভীর হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া কার্য-আকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। মহত্ত্বের প্রভাবে, হৃদয়ের অনুরাগের প্রভাবে কাজ না করিলে, কাজ করিবার আর কোনো প্রবর্তনাই তখন বর্তমান ছিল না। অথচ কাজের ব্যাঘাত এখনকার চেয়ে ঢের বেশি ছিল। রামমোহন রায়ের যশের প্রলোভন কিছুমাত্র ছিল না। তিনি যতগুলি কাজ করিয়াছিলেন কোনো কাজেই তাঁহার সমসাময়িক স্বদেশীয়দিগের নিকট হইতে যশের প্রত্যাশা করেন নাই। নিন্দাগ্লানি শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় তাঁহার মাথার উপরে অবিশ্রাম বর্ষিত হইয়াছে—তবুও তাঁহাকে তাঁহার কার্য হইতে বিরত করিতে পারে নাই। নিজের মহত্ত্বে তাঁহার কী অটল আশ্রয় ছিল, নিজের মহত্ত্বের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ের কী সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ছিল, স্বদেশের প্রতি তাঁহার কী স্বার্থশূন্য সুগভীর প্রেম ছিল। তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার সহিত যোগ দেয় নাই, তিনিও তাঁহার সময়ের স্বদেশীয় লোকদের হইতে বহুদূরে ছিলেন, তথাপি তাঁহার বিপুল হৃদয়ের প্রভাবে স্বদেশের যথার্থ মর্মস্থলের সহিত আপনার সুদৃঢ় যোগ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। বিদেশীয় শিক্ষায় সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই এবং তদপেক্ষা গুরুতর যে স্বদেশীয়ের উৎপীড়ন তাহাতেও সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এই অভিমানশূন্য বন্ধনের প্রভাবে তিনি স্বদেশের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কী না করিয়াছিলেন! শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, বঙ্গসাহিত্য বল, সমাজ বল, ধর্ম বল, বঙ্গসমাজের যে-কোনো বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে, সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর কালের নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র। বঙ্গসমাজের সর্বত্রই তাঁহার স্মরণস্তম্ভ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে; তিনি এই মরুস্থলে যে-সকল বীজ রোপণ করিয়াছিলেন তাহারা বৃক্ষ হইয়া শাখাপ্রশাখায় প্রতিদিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। তাহারই বিপুল ছায়ায় বসিয়া আমরা কি তাঁহাকে স্মরণ করিব না!

তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়; আবার তিনি যাহা না করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব আরও প্রকাশ পায়। তিনি যে এত কাজ করিয়াছেন কিছুরই মধ্যে তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন নাই। তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে নিজের অথবা আর-কাহারও প্রতিমূর্তি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি গড়িয়া পিটিয়া একটা নূতন ধর্ম বানাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া পুরাতন ধর্ম প্রচার করিলেন। তিনি নিজেকে গুরু বলিয়া চালাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া প্রাচীন ঋষিদিগকে গুরু বলিয়া মানিলেন। তিনি তাঁহার কাজ স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম স্থায়ী করিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই, বরং তাহার প্রতিকূলতা করিয়াছেন। এরূপ আত্মবিলোপ এখন তো দেখা যায় না। বড়ো বড়ো সংবাদপত্রপুট পরিপূর্ণ করিয়া অবিশ্রাম নিজের নামসুধাপানে একপ্রকার মত্ততা জন্মাইয়া আমাদের কাজের উৎসাহ জাগাইয়া রাখিতে হয়—দেশের জন্য যে সামান্য কাজটুকু করি তাহাও বিদেশী আকারে সমাধা করি, চেষ্টা করি যাহাতে সে কাজটা বিদেশীয়দের নয়ন-

আকর্ষণ পণ্যদ্রব্য হইয়া উঠে। স্তুতিকোলাহল ও দলস্থ লোকের অবিশ্রাম এক-মন্ত্রোচ্চারণশব্দে বিরত থাকিয়া স্থিরভাবে কোনো বিষয়ের যথার্থ ভালোমন্দ বুঝিবার শক্তিও থাকে না, ততটা ইচ্ছাও থাকে না, একটা গোলযোগের আবর্তের মধ্যে মহানন্দে ঘুরিতে থাকি ও মনে করিতে থাকি বিদ্যুৎ-বেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি।

আমরা যে আত্মবিলোপ করিতে পারি না তাহার কারণ, আমরা আপনাকে ধারণ করিতে পারি না। সামান্য মাত্র ভাবের প্রবাহ উপস্থিত হইলেই আমরাই সর্বোপরি ভাসিয়া উঠি। আত্মগোপন করিতে পারি না বলিয়াই সর্বদা ভাবিতে হয়, আমাকে কেমন দেখিতে হইতেছে। যাঁহারা মাঝারি রকমের বড়ো লোক তাঁহারা নিজের শুভসংকল্প সিদ্ধ করিতে চান বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে আপনাকেও প্রচলিত করিতে চান। এ বড়ো বিষম অবস্থা। আপনিই যখন আপনার সংকল্পের প্রতিযোগী হইয়া উঠে তখন সংকল্পের অপেক্ষা আপনার প্রতি আদর স্বভাবতই কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া পড়ে। তখন সংকল্প অনেক সময়ে হীনবল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কথায় কথায় তাহার পরিবর্তন হয়। কিছু কিছু ভালো কাজ সম্পন্ন হয়, কিন্তু সর্বাঙ্গসুন্দর কাজটি হইয়া উঠে না। যে আপনার পায়ে আপনি বাধাস্বরূপ বিরাজ করিতে থাকে সংসারের সহস্র বাধা সে অতিক্রম করিবে কী করিয়া? যে ব্যক্তি আপনাকে ছাড়িয়া সংসারের মধ্যস্থলে নিজের শুভকার্য স্থাপন করে সে স্থায়ী ভিত্তির উপরে নিজের মঙ্গলসংকল্প প্রতিষ্ঠিত করে। আর যে নিজের উপরেই সমস্ত কার্যের প্রতিষ্ঠা করে সে যখন চলিয়া যায় তাহার অসম্পূর্ণ কার্যও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়; যদি বা বিশৃংখল ভগ্নাবশেষ ধূলির উপরে পড়িয়া থাকে তবে তাহার ভিত্তি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রামমোহন রায় আপনাকে ভুলিয়া নিজের মহতী ইচ্ছাকে বঙ্গসমাজের মধ্যে রোপণ করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি না থাকিলেও আজ তাঁহার সেই ইচ্ছা সজীবভাবে প্রতিদিন বঙ্গসমাজের চারি দিকে অবিশ্রাম কাজ করিতেছে। সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার স্মৃতি হৃদয়পট হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তাঁহার সেই অমর ইচ্ছার বংশ বঙ্গসমাজ হইতে বিলুপ্ত করিতে পারে না।

রামমোহন রায়ের আত্মধারণাশক্তি কিরূপ অসাধারণ ছিল তাহা কল্পনা করিয়া দেখুন। অতি বাল্যকালে যখন তিনি হৃদয়ের পিপাসায় ভারতবর্ষের চতুর্দিকে আকুল হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তাঁহার অন্তরে বাহিরে কী সুগভীর অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল! যখন এই মহানিশীথিনীকে মুহূর্তে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রখর আলোক দীপ্ত হইয়া উঠিল তখন তাহাতে তাঁহাকে বিপর্যস্ত করিতে পারে নাই। সে তেজ, সে আলোক তিনি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন। যুগযুগান্তরের সঞ্চিত অন্ধকারময় অঙ্গারের খনিতে যদি বিদ্যুৎশিখা প্রবেশ করে তবে সে কী কাণ্ডই উপস্থিত হয়, ভূগর্ভ শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। তেমনি সহসা জ্ঞানের নূতন উচ্ছ্বাস কয়জন সহজে ধারণ করিতে পারেন? কিন্তু রামমোহন রায় অত্যন্ত মহৎ ছিলেন, এইজন্য এই জ্ঞানের বন্যায় তাঁহার হৃদয় অটল ছিল; এই জ্ঞানের বিপ্লবের মধ্যে মাথা তুলিয়া যাহা আমাদের দেশে ধ্রুব মঙ্গলের কারণ হইবে তাহা নির্বাচন করিতে পারিয়াছিলেন। এ সময়ে ধৈর্যরক্ষা করা যায় কি? আজিকার কালে আমরা তো ধৈর্য কাহাকে বলে জানিই না। কিন্তু রামমোহন রায়ের কী অসামান্য ধৈর্যই ছিল! তিনি আর-সমস্ত ফেলিয়া পর্বত-প্রমাণ স্তূপাকার ভস্মের মধ্যে আচ্ছন্ন যে অগ্নি ফুৎকার দিয়া তাহাকেই প্রজ্বলিত

করিতে চাহিয়াছিলেন; তাড়াতাড়ি চমক লাগাইবার জন্য বিদেশী দেশালাইকাঠি জ্বালাইয়া জাদুগিরি করিতে চাহেন নাই। তিনি জানিতেন, ভস্মের মধ্যে যে অগ্নিকণিকা অবশিষ্ট আছে তাহা ভারতবাসীর হৃদয়ের গূঢ় অভ্যন্তরে নিহিত, সে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে আর নিভিবে না।

রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তখন এখানে চতুর্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। মিথ্যা ও মৃত্যু -নামক মায়াবী রাজাদের প্রকৃত বল নাই, অমোঘ অস্ত্র নাই, কোথাও তাহাদের দাঁড়াইবার স্থল নাই, কেবল নিশীথের অন্ধকার ও একপ্রকার অনির্দেশ্য বিভীষিকার উপরে তাহাদের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অজ্ঞান—আমাদের হৃদয়ের দুর্বলতাই তাহাদের বল। অতি বড়ো ভীরুও প্রভাতের আলোকে প্রেতের নাম শুনিলে হাসিতে পারে, কিন্তু অন্ধকার নিশীথিনীতে একটি শুষ্ক পত্রের শব্দ, একটি তৃণের ছায়াও অবসর পাইয়া আমাদের হৃদয়ে নিষ্ঠুর আধিপত্য করিতে থাকে। যথার্থ দস্যুভয় অপেক্ষা সেই মিথ্যা অনির্দেশ্য ভয়ের শাসন প্রবলতর। অজ্ঞানের মধ্যে মানুষ যেমন নিরুপায়, যেমন অসহায়, এমন আর কোথায়? রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল। তখন শ্মশানস্থলে প্রাচীনকালের হিন্দুধর্মের প্রেতমাত্র রাজত্ব করিতেছিল। তাহার জীবন নাই, অস্তিত্ব নাই, কেবল অনুশাসন ও ভয় আছে মাত্র। সেই নিশীথে শ্মশানে, সেই ভয়ের বিপক্ষে 'মা ভৈঃ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া যিনি একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহার মাহাত্ম্য আমরা আজিকার এই দিনের আলোকে হয়তো ঠিক অনুভব করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি সর্পবধ করিতে অগ্রসর হয় তাহার কেবলমাত্র জীবনের আশঙ্কা থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি বাস্তুসর্প মারিতে যায় তাহার জীবনের আশঙ্কার অপেক্ষা অনির্দেশ্য অমঙ্গলের আশঙ্কা বলবত্তর হইয়া উঠে। তেমনি রামমোহন রায়ের সময়ে হিন্দুসমাজের ভগ্নভিত্তির সহস্র ছিদ্রে সহস্র বাস্তু-অমঙ্গল উত্তরোত্তর পরিবর্ধমান বংশপরম্পরা লইয়া প্রাচীনতা ও জড়তার প্রভাবে অতিশয় স্থূলকায় হইয়া উঠিতেছিল। রামমোহন রায় সমাজকে এই সহস্র নাগপাশবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে নির্ভয়ে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই নিদারুণ বন্ধন অনুরাগবন্ধনের ন্যায় সমাজকে জড়াইয়াছিল, এইজন্য সমস্ত বঙ্গসমাজ আর্তনাদ করিয়া রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে উত্থান করিল। আজি আমাদের বালকেরাও সেই-সকল মৃতসর্পের উপরে হাস্যমুখে পদাঘাত করে, আমরা তাহাদিগকে নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ বলিয়া উপহাস করি—ইহাদের প্রবল প্রতাপ, ইহাদের চক্ষের মোহ-আকর্ষণ, ইহাদের সুদীর্ঘ লাঙ্গুলের ভীষণ আলিঙ্গনের আশঙ্কা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি।

একবার ভাঙচুর করিতে আরম্ভ করিলে একটা নেশা চড়িয়া যায়। সৃজনের যেমন আনন্দ আছে প্রলয়ের তেমনি একপ্রকার ভীষণ আনন্দ আছে। যাঁহারা রাজনারায়ণবাবুর 'এ কাল ও সে কাল' পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, নূতন ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙালি ছাত্রেরা যখন হিন্দুকালেজ হইতে বাহির হইলেন তখন তাঁহাদের কিরূপ মত্ততা জন্মিয়াছিল। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া গুরুতর আঘাতে হিন্দুসমাজের হৃদয় হইতে রক্তপাত করিয়া তাহাই লইয়া প্রকাশ্য পথে আবীর খেলাইতেন। কঠোর অট্টহাস্য ও নিষ্ঠুর উৎসবের কোলাহল তুলিয়া তখনকার শ্মশানদৃশ্য তাঁহারা আরও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের

নিকট হিন্দুসমাজের কিছুই ভালো কিছুই পবিত্র ছিল না; হিন্দুসমাজের যে-সকল কঙ্কাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল তাহাদের ভালোরূপ সংকার করিয়া শেষ ভস্মমুষ্টি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া বিষণ্ণমনে যে গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, প্রাচীন হিন্দুসমাজের স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের ততটুকুও শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা কালভৈরবের অনুচর ভূতপ্রেতের ন্যায় শ্মশানের নরকপালে মদিরা পান করিয়া বিকট উল্লাসে উন্মত্ত হইতেন। সে সময়কার অবস্থা বিবেচনা করিলে তাঁহাদের ততটা দোষ দেওয়া যায় না। প্রথম বিপ্লবের সময় এইরূপই ঘটিয়া থাকে। একবার ভাঙিবার দিকে মন দিলে প্রলয়ের আনন্দ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠে। সে সময়ে খানিকটা খারাপ লাগিলেই সমস্তটা খারাপ লাগে, বাহিরটা খারাপ লাগিলেই ভিতরটা খারাপ লাগে। কিন্তু বর্তমান বঙ্গসমাজে বিপ্লবের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস সর্বপ্রথমে যিনি উৎসারিত করিয়া দিলেন, সেই রামমোহন রায়, তাঁহার তো এরূপ মত্ততা জন্মে নাই। তিনি তো স্থিরচিত্তে ভালোমন্দ সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি আলোক জ্বালাইয়া দিলেন, কিন্তু চিতালোক তো জ্বালান নাই। ইহাই রামমোহন রায়ের প্রধান মহত্ত্ব। কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠান ও জীবনহীন তন্ত্রমন্ত্রের মধ্যে জীবন্তে সমাহিত হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করিলেন। যে মৃতভারে আচ্ছন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম দিন দিন অবসন্ন মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছিল, যে জড়পাষাণস্তূপে পিষ্ট হইয়া হিন্দুধর্মের হৃদয় হতচেতন হইয়া পড়িতেছিল, সেই মৃতভারে, সেই জড়স্তূপে রামমোহন রায় প্রচণ্ড বলে আঘাত করিলেন— তাহার ভিত্তি কম্পিত হইয়া উঠিল, তাহার আপাদমস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। হিন্দুধর্মের বিপুলায়তন প্রাচীন মন্দির জীর্ণ হইয়া প্রতিদিন ভাঙিয়া পড়িতেছিল, অবশেষে হিন্দুধর্মের দেবপ্রতিমা আর দেখা যাইতেছিল না, কেবল মন্দিরেরই কাষ্ঠলোষ্ট্রধূলিস্তূপ অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার গর্ভের মধ্যে অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছিল, ছোটোবড়ো নানাবিধ সরীসৃপগণ গুহা নির্মাণ করিতেছিল, তাহার ইতস্তত প্রতিদিন কণ্টকাকীর্ণ গুল্মসকল উদ্ভিন্ন হইয়া সহস্র শিকড়ের দ্বারা নূতন নূতন বন্ধনে সেই পুরাতন ভগ্নাবশেষকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। হিন্দুসমাজ দেবপ্রতিমাকে ভুলিয়া এই জড়স্তূপকে পূজা করিতেছিল ও পর্বতপ্রমাণ জড়ত্বের তলে পড়িয়া প্রতিদিন চেতনা হারাইতেছিল। রামমোহন রায় সেই ভগ্নমন্দির ভাঙিলেন। সকলে বলিল, তিনি হিন্দুধর্মের উপরে আঘাত করিলেন। কিন্তু তিনিই হিন্দুধর্মের জীবন রক্ষা করিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ এইজন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ। কী সংকটের সময়েই তিনি জন্মিয়াছিলেন! তাঁহার এক দিকে হিন্দুসমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, আর-এক দিকে বিদেশীয় সভ্যতাসাগরের প্রচণ্ড বন্যা বিদ্যুৎ-বেগে অগ্রসর হইতেছিল— রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্ত্বে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে বাঁধ নির্মাণ করিয়া দিলেন খৃস্টীয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার মতো মহৎ লোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।

এইখানে রামমোহন রায়ের উদারতা সম্বন্ধে হয়তো দু-একটা কথা উঠিতে পারে। ভস্মস্তূপের মধ্যে ঋষিদের হৃদয়জাত যে অমর অগ্নি প্রচ্ছন্ন ছিল, ভস্ম উড়াইয়া দিয়া তিনি তাহাই বাহির করিয়াছেন। কিন্তু এত করিবার কী প্রয়োজন ছিল? তাহার উত্তর এই— বিজ্ঞান-দর্শনের ন্যায় ধর্ম যদি কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয় হইত— হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার, লাভ করিবার, সঞ্চয় করিবার বিষয়

না হইত—ধর্ম যদি গৃহের অলংকারের ন্যায় কেবল গৃহভিত্তিতে দুলাইয়া রাখিবার সামগ্রী হইত, আমাদের সংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজের প্রবর্তক নিবর্তক না হইত—তাহা হইলে এরূপ না করিলেও চলিত; তাহা হইলে নানাবিধ বিদেশী অলংকারে গৃহ সাজাইয়া রাখা যাইত; কিন্তু ধর্ম নাকি হৃদয়ে পাইবার ও সংসারের কাজে ব্যবহার করিবার দ্রব্য, দূরে রাখিবার নহে, এইজন্যেই স্বদেশের ধর্ম স্বদেশের জন্য বিশেষ উপযোগী। ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তিনি বিশেষরূপে ভারতবর্ষেরই ব্রহ্ম। অন্য কোনো দেশের লোকে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে না, ব্রহ্ম বলিতে আমরা ঈশ্বরকে যেরূপ ভাবে বুঝি ঈশ্বরের অন্য কোনো বিদেশীয় নামে বিদেশীয়েরা কখনোই তাঁহাকে ঠিক সেরূপ ভাবে বুঝে না। বুঝে বা না বুঝে জানি না, কিন্তু ব্রহ্ম বলিতে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইবে ঈশ্বরের অন্য কোনো বিদেশীয় নামে আমাদের মনে সে ভাব কখনোই উদয় হইবে না। ব্রহ্ম একটি কথার কথা নহে—যে ইচ্ছা পাইতে পারে না, যাহাকে ইচ্ছা দেওয়া যায় না। ব্রহ্ম আমাদের পিতামহদের অনেক সাধনার ধন; সমস্ত সংসার বিসর্জন দিয়া, সমস্ত জীবন-ক্ষেপণ করিয়া, নিভৃত অরণ্যে ধ্যানধারণা করিয়া আমাদের ঋষিরা আমাদের ব্রহ্মকে পাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের সেই আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী। আর-কোনো জাতি ঠিক এমন সাধনা করে নাই, ঠিক এমন অবস্থায় পড়ে নাই, এইজন্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। প্রত্যেক জাতি বিশেষ সাধনা-অনুসারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হয়, সেই ফল তাহারা অন্য জাতিকে দান করে। এইরূপে সমস্ত পৃথিবীর উপকার হয়। আমাদের এত সাধনার ফল কি আমরা ইচ্ছাপূর্বক অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিব?

উদ্ভিজ্জ ও পশুমাংসের মধ্যে যে জীবনীশক্তি আছে তাহা যে আমরা স্বায়ত্ত করিতে পারি তাহার কারণ, আমাদের নিজের জীবন আছে। আমাদের নিজের প্রাণ না থাকিলে আমরা নূতন প্রাণ উপার্জন করিতে পারি না। আমাদের প্রাণ না থাকিলে উদ্ভিজ্জ পশু পক্ষী কীট প্রভৃতি অন্য প্রাণীরা আমাদিগকে গ্রহণ করিত। এ জগতে মৃত টিকিতে পারে না, জীবিতের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। রামমোহন রায় যদি দেখিতেন আমাদের জীবন নাই, তবে পারসিক মৃতদেহের ন্যায় আমাদিগকে মৃতভবনে ফেলিয়া রাখিতে দিতেন, খৃস্টধর্ম প্রভৃতি অন্যান্য জীবিত প্রাণীর উদরস্থ হইতে দিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি চিকিৎসা শুরু করিয়া দিলেন। তিনি দেখিলেন, জীবন আমাদের মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহাকেই তিনি জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। আমাদের চেষ্টা হউক, আমাদের এই জীবনকে সতেজ করিয়া তুলি—তবে আমরা ক্রমে বিদেশীয় সত্য আপনার করিতে পারিব। এই-জন্যই বলি, প্রাচীন ঋষিদের উপনিষদের ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া আমাদের দেশে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লই, সার্বভৌমিকতা আপনিই তাহার মধ্যে বিরাজ করিবে। ঈশ্বর যেমন সকলের ঈশ্বর তেমনি তিনি প্রত্যেকের ঈশ্বর, যেমন তিনি জ্ঞানের ঈশ্বর তেমনি তিনি হৃদয়ের ঈশ্বর, তিনি যেমন সমস্ত জগতের দেবতা তেমনি আমাদের গৃহদেবতা। তাঁহাকে রাজা বলিয়াও দেখিতে পারি, তাঁহাকে পিতা বলিয়াও দেখিতে পারি। কিন্তু পিতা ঈশ্বর আমাদের যত নিকটের, তিনি আমাদের হৃদয়ের যত অভাব মোচন করেন, এমন রাজা ঈশ্বর নহেন। তেমনি ব্রহ্মই ভারতবর্ষের সাধনালব্ধ চিরন্তন আশ্রয়; জিহোবা, গড্ অথবা আল্লা সেরূপ নহেন। রামমোহন রায় হৃদয়ের উদারতা-বশতই ইহা বুঝিয়াছিলেন।

৫ মাঘ ১২৯১

রামমোহন-প্রসঙ্গ

একদিন যে সময়ে য়ুরোপের জ্ঞানের ঐশ্বর্য হঠাৎ আমাদের চোখের সম্মুখে খুলিয়া গিয়া আমাদের দেশের নূতন ইংরেজি-শিক্ষিত লোকদিগকে একেবারে অভিভূত করিয়া দিয়াছিল সেই সময়ে রামমোহন রায় আমাদের স্বজাতির পৈতৃক জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তখনকার নিতান্ত শিশু ও দুর্বল বাংলা গদ্যেও তিনি উপনিষৎ বেদান্ত প্রভৃতি অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনিই সেই ঘোরতর ইংরেজি-বিদ্যাভিমানের দিনে জ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের দেশের দারিদ্র্যের লজ্জা দূর করিয়া দিবার জন্য প্রথম দাঁড়াইয়াছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মন হইতে সেই অগৌরব অল্পমাত্রও দূর না হইয়াছিল ততক্ষণ আমরা নিতান্ত নিঃসম্বল ভিক্ষুকের অবস্থায় আমাদের ইংরেজি মাস্টারের মুখের দিকে চাহিয়া অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম।

কিন্তু কোনো বড়ো জিনিসকে কখনোই ভিক্ষা করিয়া পাওয়া যায় না। নিজের ঘরের মূলধনটি আমরা যতটা পরিমাণে খাটাইব, বাহির হইতেও ততটা পরিমাণে লাভ করিবার অধিকারী হইব। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী এবং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ কথাটার অর্থই তাই। দুই কারণে ভিক্ষুকের দৈন্য ঘোচে না। এক তো পরের নিকট হইতে তাহার উদ্‌বৃত্তের অংশ পাওয়া যায়, কখনোই তাহার ঐশ্বর্য আশা করা যায় না; দ্বিতীয়ত ভিক্ষুক যতই ভিক্ষা করে ততই তাহার নিজের চেষ্টার প্রতি বিশ্বাস পর্যন্ত চলিয়া যায়। এইজন্য ইংরেজের দেশে সমাজের হিতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভিক্ষাবৃত্তিকে দণ্ডনীয় করা হইয়াছে।

রামমোহন রায় ইহুদি খৃস্টান ও মুসলমানের ধর্মগ্রন্থ হইতে তাহার সার-সংকলন করিয়া স্বদেশীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই-সমস্তকে গ্রহণ ও ধারণ করিবার জন্য লজ্জার সহিত ভিক্ষার পাত্র বাড়াইয়া ধরেন নাই, আমাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সোনার থাল বাহির করিয়াছিলেন। আমাদের অধিকার যে কোন্‌খানে ছিল তাহাই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

এই আমাদের স্বদেশীয় অধিকারের পথেই যাত্রা করিয়া আজ বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনস্বী এবং সেইসঙ্গে আমাদের সমস্ত দেশ, ইস্কুলের ছাত্রভাবকে কাটাইয়া পৃথিবীর জ্ঞানীসভায় নিজের গৌরবে প্রবেশ করিতেছে। এমনি করিয়া নিজের সম্পদে মাথা তুলিতে পারিলেই আমরা বিশ্বমানবের জ্ঞানশালায় নিঃসংকোচে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারি— নহিলে মুষ্টিভিক্ষা এবং উঞ্ছবৃত্তি করিয়াই দিন কাটাইতে হয়। সম্পদকে নিজের মধ্যে অনুভব করিলে কেবল যে গৌরব বৃদ্ধি হয় তাহা নহে, শক্তি বৃদ্ধি হয়।

পৌষ ?, ১৩১৪

২

অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত

রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। আশ্চর্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্বকে পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্যবঙ্গের পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্রকে পূর্ব হইতে পশ্চিমের দিকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, আমাদিগকে মানবের চিরন্তন অধিকার, সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন— আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর; আমাদেরই জন্য বুদ্ধ খৃস্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ঋষিদের সাধনার ফল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সঞ্চিত হইয়াছে, পৃথিবীর যে দেশেই যে-কেহ জ্ঞানের বাধা দূর করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের আবদ্ধ শক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন, তিনি আমাদেরই আপন, তাঁহাকে লইয়া আমরা প্রত্যেকে ধন্য। রামমোহন রায় ভারতবর্ষের চিত্তকে সংকুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই, তাহাকে দেশে ও কালে প্রসারিত করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মধ্যে তিনি সেতু স্থাপন করিয়াছেন; এই কারণেই ভারতবর্ষের সৃষ্টিকার্যে আজও তিনি শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কোনো অন্ধ অভ্যাস, কোনো ক্ষুদ্র অহংকার-বশত মহাকালের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মূঢ়ের মতো তিনি বিদ্রোহ করেন নাই; যে অভিপ্রায় কেবল অতীতের মধ্যে নিঃশেষিত নহে, যাহা ভবিষ্যতের দিকে উদ্যত, তাহারই জয়পতাকা সমস্ত বিঘ্নের বিরুদ্ধে বীরের মতো বহন করিয়াছেন।...

রামমোহন রায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ, পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই; তাঁহার আপনার দিকে দুর্বলতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপরে দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য কোথায় তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন; এইজন্যই যেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন তাহা বিচার করিবার নিক্তি ও মানদণ্ড তাঁহার হাতে ছিল; কোনো মূল্যে না বুঝিয়া তিনি মুগ্ধের মতো আপনাকে বিকাইয়া দিয়া অঞ্জলিপূরণ করেন নাই।

শ্রাবণ ১৩১৫

৩

এই নূতন যুগে পৃথিবীর মানবচিত্তে যে প্রভাত আসছে সেই নব প্রভাতের বার্তা বাংলাদেশে আজ আশি বৎসর হল প্রথম এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন পৃথিবীতে দেশের সঙ্গে দেশের বিরোধ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সংগ্রাম; তখন শাস্ত্রবাক্য এবং বাহ্য প্রথার লৌহ সিংহাসনে বিভাগই ছিল রাজা—সেই ভেদবুদ্ধির প্রাচীররুদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে রাজা রামমোহন যখন অদ্বিতীয় একের আলোক তুলে ধরলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও খৃস্টানধর্ম আজ একত্র সমাগত হয়েছে সেই ভারতবর্ষেই বহু পূর্ব যুগে এই বিচিত্র অতিথিদের একসভায় বসাবার জন্যে আয়োজন হয়ে গেছে। মানবসভ্যতা যখন দেশে দেশে

নব নব বিকাশের শাখাপ্রশাখায় ব্যাপ্ত হতে চলেছিল তখন এই ভারতবর্ষ বারংবার মন্ত্র জপ করছিলেন—এক! এক! এক! তিনি বলছিলেন—'ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি,' এই এককেই যদি মানুষ জানে তবে সে সত্য হয়; 'ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ,' এই এককে যদি না জানে তবে তার মহতী বিনষ্টি। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হয়েছে সে কেবল এই মহান্ একের উপলব্ধি-অভাবে। যত ক্ষুদ্রতা নিষ্ফলতা দৌর্বল্য, সে এই একের থেকে বিচ্যুতিতে। যত মহাপুরুষের আবির্ভাব সে এই একককে প্রচার করতে। যত মহাবিপ্লবের আগমন সে এই একককে উদ্ধার করবার জন্যে।

মাঘ ১৩১৫

৪

পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে এ দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি যে কোনো নূতন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়, ভারতবর্ষে যেখানে ধর্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শান্তংশিবমদ্বৈতম্, সেইখানকার সিংহদ্বার তিনি সর্ব-সাধারণের কাছে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।

[১৩১৭]

৫

রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাকে নবীন যুগে উদ্ঘাটিত করে দিলেন। ব্রহ্মকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে জীবনের সমস্ত শক্তিকে বৃহৎ করে বিশ্বব্যাপী করে প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর সকল চিন্তা সকল চেষ্টা, মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম, দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ্য, সমস্তই ব্রহ্মসাধনাকে আশ্রয় করে উদার ঐক্য লাভ করেছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র ধ্যানের বস্তু জ্ঞানের বস্তু করে নিভৃতে নির্বাসিত করে রাখেন নি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে বিশ্বধর্মে বিশ্বকর্মে সর্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নূতন যুগের প্রবর্তন করে দিলেন।

রামমোহন রায়ের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আপন সত্যবাণী ঘোষণা করেছে। বিদেশের গুরু যখন এই ভারতবর্ষকে দীক্ষা দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল এই বাণী তখনই উচ্চারিত হয়েছে।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঘরে বাহিরে তখন এই ব্রহ্মসাধনার কথা চাপা ছিল। আমাদের দেশে তখন ব্রহ্মকে পরমজ্ঞানীর অতি দূর গহন জ্ঞানদুর্গের মধ্যে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল; চারি দিকে রাজত্ব করছিল আচার-বিচার-বাহ্য অনুষ্ঠান

এবং ভক্তি-রস-মাদকতার বিচিত্র আয়োজন। সেদিন রামমোহন রায় যখন ব্রহ্ম-সাধনকে পুঁথির অন্ধকার-সমাধি থেকে মুক্ত করে জীবনের ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করালেন তখন দেশের লোক সবাই ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল, 'এ আমাদের আপন জিনিস নয়, এ আমাদের বাপ পিতামহের সামগ্রী নয়,' বলে উঠল, 'এ খৃস্টানি, একে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না।' শক্তি যখন বিলুপ্ত হয়, জীবন যখন সংকীর্ণ হয়ে আসে, জ্ঞান যখন গ্রাম্যগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কাল্পনিকতাকে নিয়ে যথেচ্ছ বিশ্বাসের অন্ধকার ঘরে স্বপ্ন দেখে আপনাকে বিফল করতে চায় তখনই ব্রহ্ম সকলের চেয়ে সুদূরে, এমন-কি সকলের চেয়ে বিরুদ্ধ হয়ে প্রতিভাত হন। এ দিকে য়ুরোপে মানবশক্তি তখন প্রবলভাবে জাগ্রত হয়ে বৃহৎভাবে আপনাকে প্রকাশ করছে। কিন্তু সে তখন আপনাকেই প্রকাশ করতে চাচ্ছে—আপনার চেয়ে বড়োকে নয়, সকলের চেয়ে শ্রেয়কে নয়। তার জ্ঞানের ক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী, তার কর্মের ক্ষেত্র পৃথিবী-জোড়া, এবং সেই উপলক্ষে মানুষের সঙ্গে তার সম্বন্ধ সুদূরবিস্তৃত। কিন্তু তার ধ্বজপতাকায় লেখা ছিল 'আমি', তার মন্ত্র ছিল জোর যার মুলুক তার; সে যে অস্ত্রপাণি রক্তবসনা শক্তিদেবতাকে জগতে প্রচার করতে চলেছিল, তার বাহন ছিল পণ্যসম্ভার, অন্তহীন উপকরণরাশি।

কিন্তু এই বৃহৎ ব্যাপারকে কিসে ঐক্যদান করতে পারে? এই বিরাট যজ্ঞের যজ্ঞপতি কে? কেউ-বা বলে স্বাজাত্য, কেউ-বা বলে রাষ্ট্রব্যবস্থা, কেউ-বা বলে অধিকাংশের সুখসাধন, কেউ-বা বলে মানবদেবতা। কিন্তু কিছুতেই বিরোধ মেটে না, কিছুতেই ঐক্যদান করতে পারে না, প্রতিকূলতা পরস্পরের প্রতি ভ্রূকুটি করে পরস্পরকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করে, এবং যাকে গ্রহণ করতে দলবদ্ধ স্বার্থের কোনোখানে বাধে তাকে একেবারে ধ্বংস করবার জন্যে সে উদ্যত হয়ে ওঠে। কেবল বিপ্লবের পর বিপ্লব আসছে, কেবল পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলছে—কিন্তু এ কথা একদিন জানতেই হবে, বাহিরে যেখানে বৃহৎ অনুষ্ঠান অন্তরে সেখানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি না করলে কিছুতেই কিছুর সমন্বয় হতে পারবে না; প্রয়োজনবোধকে যত বড়ো নাম দাও, স্বার্থসিদ্ধিকে যত বড়ো সিংহাসনে বসাও, নিয়মকে যত পাকা করে তোলো এবং শক্তিকে যত প্রবল করে দাঁড় করাও, সত্যপ্রতিষ্ঠা কিছুতেই নেই, শেষ পর্যন্ত কিছুই টিকতে এবং টেকাতে পারবে না। যা প্রবল অথচ প্রশান্ত, ব্যাপক অথচ গভীর, আত্মসমাহিত অথচ বিশ্বানুপ্রবিষ্ট, সেই আধ্যাত্মিক জীবন-সূত্রের দ্বারা না বেঁধে তুলতে পারলে অন্য কোনো কৃত্রিম জোড়াতাড়ার দ্বারা জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, কর্মের সঙ্গে কর্ম, জাতির সঙ্গে জাতি যথার্থভাবে সম্মিলিত হতে পারবে না। সেই সম্মিলন যদি না ঘটে তবে আয়োজন যতই বিপুল হবে তার সংঘাত-বেদনা ততই দুঃসহ হয়ে উঠতে থাকবে।

১২ মাঘ ১৩১৭

৬

যখন চারি দিক অচেতন, সমস্ত দ্বার রুদ্ধ, সমস্ত দীপ নির্বাপিত, অভাব যখন এতই অধিক যে অভাববোধ চলিয়া গিয়াছে, বাধা যখন এত নিবিড় যে মানুষ তাহাকে আপনার আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করিয়া ধরে, সেই সময়েই অভাবনীয়রূপে

প্রতিকারের দূত কোথা হইতে দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তাহা বুঝিতেই পারি না। তাহাকে কেহ প্রত্যাশা করে না, কেহ চিনে না, সকলেই তাহাকে শত্রু বলিয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠে। এ দেশে একদিন যখন রাশীকৃত প্রাণহীন সংস্কারের বাধা অনন্তের বোধকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছিল, মানুষের জীবনযাত্রাকে তুচ্ছ ও সমাজকে শতখণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল, মনুষ্যত্বকে যখন আমরা সংকীর্ণ গ্রাম্যতার মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া দেখিতেছিলাম, বিশ্বব্যাপারের কোথাও যখন আমরা একের অমোঘ নিয়ম দেখি নাই, কেবল দশের উৎপাতই কল্পনা করিতেছিলাম; উন্মত্তের দুঃস্বপ্নের মতো যখন সমস্ত জগৎকে বিচিত্র বিভীষিকায় পরিপূর্ণ দেখিতেছিলাম এবং কেবলই মন্ত্রতন্ত্র তাগাতাবিজ শান্তিস্বস্ত্যয়ন মানৎ ও বলিদানের দ্বারা ভীষণ শত্রুকল্পিত সংসারে কোনোমতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম; এইরূপে যখন চিন্তায় ভীরুতা, কর্মে দৌর্বল্য, ব্যবহারে সংকোচ এবং আচারে মূঢ়তা সমস্ত দেশের পৌরুষকে শতদীর্ণ করিয়া অপমানের রসাতলে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল— সেই সময়ে বাহিরের বিশ্ব হইতে আমাদের জীর্ণ প্রাচীরের উপরে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল, সেই আঘাতে যাঁহারা জাগিয়া উঠিলেন তাঁহারা একমুহূর্তেই নিদারুণ বেদনার সহিত বুঝিতে পারিলেন কিসের অভাব এখানে, কিসের এই অন্ধকার, এই জড়তা, এই অপমান, কিসের এই জীবিত-মৃত্যুর আনন্দহীন সর্বব্যাপী অবসাদ! এখানে আকাশ খণ্ডিত, আলোক নিষিদ্ধ, অনন্তের প্রাণসমীরণ প্রতিহত; এখানে নিখিলের সহিত অবাধ যোগ সহস্র কৃত্রিমতার প্রাচীরে প্রতিরুদ্ধ। তাহাদের সমস্ত প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল— ভূমাকে চাই, ভূমাকে চাই!

এই কান্নাই সমস্ত মানুষের কান্না। পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ কোথাও-বা আপনার বহু প্রাচীন অভ্যাসের আবরণের দ্বারা আপনার মঙ্গলকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, কোথাও-বা সে আপনার নানা রচনার দ্বারা সঞ্চয়ের দ্বারা কেবলই আপনাকে বড়ো করিতে গিয়া আপনার চেয়ে বড়োকে হারাইয়া ফেলিতেছে। কোথাও-বা সে নিষ্ক্রিয়ভাবে জড়তার দ্বারা, কোথাও-বা সে সক্রিয়ভাবে প্রয়াসের দ্বারাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতাকে বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছে।

এই বিস্মৃতির গভীর তলদেশ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা, ইহাই আমরা ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসের আরম্ভেই দেখিতে পাই। মানুষের সমস্ত বোধকেই অনন্তের বোধের মধ্যে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসই ব্রাহ্মধর্মের সাধনা রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাইলাম, রামমোহন রায়ের জীবনের কর্মক্ষেত্র সমস্ত মনুষ্যত্ব। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, সকল দিকেই তাঁহার চিত্ত পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে। কেবলমাত্র কর্মশক্তির স্বাভাবিক প্রাচুর্যই তাহার মূল প্রেরণা নহে— ব্রহ্মের বোধ তাঁহার সমস্ত শক্তিকে অধিকার করিয়াছিল। সেই বোধের মধ্য দিয়া তিনি মানুষকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মানুষকে সকল দিকেই এমন বড়ো করিয়া এমন সত্য করিয়া দেখিয়াছিলেন; সেইজন্যই তাঁহার দৃষ্টি সমস্ত সংস্কারের বেষ্টন ছাড়াইয়া গিয়াছিল; সেইজন্য কেবল যে তিনি স্বদেশের চিত্ত-শক্তির বন্ধনমোচন কামনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, মানুষ যেখানেই কোনো মহৎ অধিকার লাভ করিয়া আপনার মুক্তির ক্ষেত্রকে বড়ো করিতে পারিয়াছে সেইখানেই তিনি তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন।

১১ পৌষ ১৩১৮

৭

ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে এই বাংলাদেশে আজ প্রায় শতবৎসর পূর্বে রামমোহন রায় পৃথিবীর সেই বাধামুক্ত ধর্মের পালটাকেই ঈশ্বরের প্রসাদবায়ুর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। ইহাও আশ্চর্যের বিষয় যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের ঐক্য তখন পৃথিবীর অন্য কোথাও মানবের মনে পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পায় নাই। সেদিন রামমোহন রায় যেন সমস্ত পৃথিবীর বেদনাকে হৃদয়ে লইয়া পৃথিবীর ধর্মকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন।

তিনি যে সময়ে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি মূর্তিপূজার মধ্যেই জন্মিয়াছিলেন এবং তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই বহুকালব্যাপী সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যাসের নিবিড়তার মধ্যে থাকিয়াও এই বিপুল এবং প্রবল এবং প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একলা রামমোহন মূর্তিপূজাকে কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহার কারণ এই, তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মূর্তিপূজা সেই অবস্থারই পূজা যে অবস্থায় মানুষ বিশেষ দেশকে বিশেষ জাতিকে বিশেষ বিধিনিষেধসকলকে বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে—যখন সে বলে যাহাতে আমারই বিশেষ দীক্ষা তাহাতে আমারই বিশেষ মঙ্গল; যখন সে বলে আমার এই-সমস্ত বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে বাহিরের আর কাহারও প্রবেশ করিয়া ফল নাই এবং কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবই না।

... ধর্মের সংস্কারকে সংকীর্ণ করিলে তাহা চিরশৃঙ্খলের মতো মানুষকে চাপিয়া ধরে—মানুষের সমস্ত আয়তন যখন বাড়িতেছে তখন সেই ধর্ম আর বাড়ে না, রক্তচলাচলকে বন্ধ করিয়া অঙ্গকে সে কৃশ করিয়াই রাখিয়া দেয়, মৃত্যু পর্যন্ত তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়াই কঠিন হয়। সেই অতি কঠিন সংকীর্ণ ধর্মের প্রাচীন বন্ধনকে রামমোহন রায় যে কোনোমতেই আপনার আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন নাই তাহার কারণ এই যে, তিনি সহজেই বুঝিয়াছিলেন, যে সত্যের ক্ষুধায় মানুষ ধর্মকে প্রার্থনা করে সে সত্য ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত নহে, তাহা সর্বগত। তিনি বাল্যকাল হইতেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, যে দেবতা সর্বদেশে সর্বকালে সকল মানুষের দেবতা না হইতে পারেন, অর্থাৎ যিনি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করেন অন্যের কল্পনাকে বাধা দেন, যিনি আমার অভ্যাসকে আকর্ষণ করেন অন্যের অভ্যাসকে পীড়িত করেন, তিনি আমারও দেবতা হইতে পারেন না, কারণ সকল মানুষের সঙ্গে যোগ কোনোখানে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষের পক্ষে পূর্ণ সত্য হওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না এবং এই পূর্ণ সত্যই ধর্মের সত্য।

১১ মাঘ ১৩১৮

৮

আমাদের দেশে বর্তমানকালে, কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব তাহা লইয়া অন্তত ব্রাহ্মসমাজে একটা তর্ক উঠিয়াছে। অথচ এ তর্কটা রামমোহন রায়ের মনের মধ্যে

একেবারেই ছিল না দেখিতে পাই। এ দিকে তিনি সমাজপ্রচলিত বিশ্বাস ও পূজার্চনা ছাড়িয়াছেন, কোরান পড়িতেছেন, বাইবেল হইতে সত্যধর্মের সারসংগ্রহ করিতেছেন, অ্যাডাম্‌ সাহেবকে দলে টানিয়া ব্রাহ্মসভা স্থাপন করিয়াছেন; সমাজে নিন্দায় কান পাতিবার জো নাই, তাঁহাকে সকলেই বিধর্মী বলিয়া গালি দিতেছে এমন-কি যদি কোনো নিরাপদ সুযোগ মিলিত তবে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে এমন লোকের অভাব ছিল না—কিন্তু কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব সে বিষয়ে তাঁহার মনে কোনোদিন লেশমাত্র সংশয় ওঠে নাই। কারণ হাজার হাজার লোকে তাঁহাকে অহিন্দু বলিলেও তিনি হিন্দু এ সত্য যখন লোপ পাইবার নয় তখন এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট করিবার কোনো দরকার ছিল না।

... রামমোহন রায় তাঁহার চারি দিকের বর্তমান অবস্থা হইতে যত উচ্চেই উঠিয়াছেন সমস্ত হিন্দুসমাজকে তিনি তত উচ্চেই তুলিয়াছেন। এ কথা কোনো-মতেই বলিতে পারিব না যে তিনি হিন্দু নহেন, কেননা অন্যান্য অনেক হিন্দু তাঁহার চেয়ে অনেক নিচে ছিল, এবং নিচে থাকিয়া তাঁহাকে গালি পাড়িয়াছে। কেন বলিতে পারিব না? কেননা এ কথা সত্য নহে। কেননা তিনি যে নিশ্চিতই হিন্দু ছিলেন, অতএব তাঁহার মহত্ত্ব হইতে কখনোই হিন্দুসমাজ বঞ্চিত হইতে পারিবে না—হিন্দুসমাজের বহুশত লক্ষ লোক যদি এক হইয়া স্বয়ং এজন্য বিধাতার কাছে দরখাস্ত করে তথাপি পারিবে না। শেক্‌স্‌পিয়র-নিউটনের প্রতিভা অসাধারণ হইলেও তাহা যেমন সাধারণ ইংরেজের সামগ্রী, তেমনি রামমোহনের মত যদি সত্য হয় তবে তাহা সাধারণ হিন্দুসমাজেরই সত্য মত।

অতএব, যদি সমস্ত বিপুল হিন্দুসমাজের মধ্যে কেবলমাত্র আমার সম্প্রদায়ই সত্যধর্মকে পালন করিতেছে ইহাই সত্য হয় তবে এই সম্প্রদায়কেই আশ্রয় করিয়া সমস্ত হিন্দুসমাজ সত্যকে রক্ষা করিতেছে—তবে অপরিসীম অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র এই পূর্বপ্রান্তে সমস্ত সমাজেরই অরুণোদয় হইয়াছে। আমি সেই রাত্রির অন্ধকার হইতে অরুণোদয়কে ভিন্ন কোঠায় স্বতন্ত্র করিয়া রাখিব না। বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দুসমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। হিন্দু-সমাজেরই নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে তাহারই বিশেষ একটি মর্মান্তিক প্রয়োজন-বোধের ভিতর দিয়া তাহারই আন্তরিক শক্তির উদ্যমে এই সমাজ উদ্‌বোধিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ আকস্মিক অদ্ভুত একটা খাপছাড়া কাণ্ড নহে। যেখানে তাহার উদ্ভব সেখানকার সমগ্রের সহিত তাহার গভীরতম জীবনের যোগ আছে। বীজকে বিদীর্ণ করিয়া গাছ বাহির হয় বলিয়াই সে গাছ বীজের পক্ষে একটা বিরুদ্ধ উৎপাত নহে। হিন্দুসমাজের বহুস্তরবদ্ধ কঠিন আবরণ একদা ভেদ করিয়া সতেজে ব্রাহ্মসমাজ মাথা তুলিয়াছিল বলিয়া তাহা হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধ নহে, ভিতর হইতে যে অন্তর্যামী কাজ করিতেছেন তিনি জানেন তাহা হিন্দুসমাজেরই পরিণাম।

বৈশাখ ১৩১৯

৯

ভারতে সেই আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধের সাধনা আজিকার দিনেও নিশ্চেষ্ট হয় নাই। তাই এ কথা জোর করিয়া বলা যায় যে, রামমোহন রায়ের জন্ম এবং তাঁহার তপস্যা আধুনিক ভারতের সকল ঘটনার মধ্যে বড়ো ঘটনা; কারণ, পূর্ব ও পশ্চিম আপন অবিচ্ছিন্নতা অনুভব করিবে, আজ পৃথিবীতে ইহার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর। পশ্চিম যখন ভারতের দ্বারে আঘাত করিল তখন ভারত সর্বপ্রথমে রামমোহন রায়ের মধ্য দিয়াই সেই আঘাতের সত্যকার সাড়া দিয়াছিল। তিনি ভারতের তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যেই, অর্থাৎ পরমাত্মায় সকল আত্মার ঐক্য এই বিশ্বাসের মধ্যেই, সর্বমানবের মিলনের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

[পৌষ] ১৩২৪

১০

...এক জনের নাম আজ আমার মনে পড়ছে— যিনি প্রাচীন কালের সঙ্গে ভাবী কালের, এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের সম্মিলনের সাধনা করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ও বিদ্যাসাগরের মতো জীবনের আরম্ভকালে শাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শী হয়েছিলেন এবং বাল্যকালে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা শেখেন নি। তিনি দীর্ঘকাল কেবল প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যেই আবিষ্ট থেকে তাকেই একমাত্র শিক্ষার বিষয় করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই সীমার মধ্যেই একান্ত আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারলেন না। রামমোহন সত্যকে নানা দেশে, নানা শাস্ত্রে, নানা ধর্মে অনুসন্ধান করেছিলেন, এই নির্ভীক সাহসের জন্য তিনি ধন্য। যেমন ভৌগোলিক সত্যকে পূর্ণভাবে জানবার জন্য মানুষ নূতন নূতন দেশে নিষ্ক্রমণ করে অসাধারণ অধ্যবসায় ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়েছে, তেমনি মানসলোকের সত্যের সন্ধানে চিত্তকে প্রথার আবেষ্টন থেকে মুক্ত করে নব নব পথে ধাবিত করতে গিয়ে মহাপুরুষেরা আপন চরিত্রমহিমায় দুঃসহ কণ্টকে শিরোধার্য করে নিয়ে থাকেন।

১৭ শ্রাবণ ১৩২৯

১১

ভারতের বাণী বহন করে যে-সকল একের দূত এ দেশে জন্মেছেন তাঁরা যে প্রথম হতেই এখানে আদর পেয়েছেন তা নয়। ... আদর না পাওয়াই স্বাভাবিক, কেননা তাঁরা ভেদ-প্রবর্তক সনাতনবিধির বাহিরের লোক, যেমন খৃস্ট ছিলেন ইহুদি ফ্যারিসি গণ্ডির বাহিরে। কিন্তু বহুদিন তাঁরা অনাদরের অসাম্প্রদায়িক ছায়ায় প্রচ্ছন্ন ছিলেন বলে তাঁরাই যে অভারতীয় ছিলেন তা নয়। তাঁরাই ছিলেন যথার্থ ভারতীয়, কেননা তাঁরাই বাহিরের কোনো সুবিধা থেকে নয়, অন্তরের আত্মীয়তা থেকে, হিন্দুকে মুসলমানকে এক করে জেনেছিলেন; তাঁরাই ঋষিদের সেই বাক্যকে

সাধনার মধ্যে প্রমাণ করেছিলেন যে-বাক্য বলে, সত্যকে তিনিই জানেন যিনি আপনাকেই জানেন সকলের মধ্যে।

ভারতীয় এই সাধকদেরই সাধনাধারা বর্তমান কালে প্রকাশিত হয়েছে রামমোহন রায়ের জীবনে। এই যুগে তিনিই উপনিষদের ঐক্যতত্ত্বের আলোকে হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টানকে সত্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি কাউকেই বর্জন করেন নি। বুদ্ধির মহিমায় ও হৃদয়ের বিপুলতায় তিনি এই বাহ্যভেদের ভারতে আধ্যাত্মিক অভেদকে উজ্জ্বল করে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই অভেদকে প্রচার করতে গিয়ে দেশের লোকের কাছে আজও তিনি তিরস্কৃত। যাঁর নির্মল দৃষ্টির কাছে হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টানের শাস্ত্র আপন দুরূহ বাধা সরিয়ে দিয়েছিল তাঁকে আজ তারাই অভারতীয় বলতে স্পর্ধা করছে, পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা ছাড়া আর কোনো বিদ্যায় যাদের অভিনিবেশ নেই। আজকের দিনেও রামমোহন রায় আমাদের দেশে যে জন্মেছেন তাতে এই বুঝতে পারি যে, কবীর নানক দাদু ভারতের যে সত্য-সাধনাকে বহন করেছিলেন আজও সেই সাধনার প্রবাহ আমাদের প্রাণের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে নি। ভারতচিত্তের প্রকাশের পথ উদ্‌ঘাটিত হবেই।

ভাদ্র ১৩৩২

RAMMOHUN ROY

Rammohun Roy inaugurated the Modern Age in India. He was born at a time when our country, having lost its link with the inmost truths of its being, struggled under a crushing load of unreason, in abject slavery to circumstance. In social usage, in politics, in the realm of religion and art, we had entered the zone of uncreative habit, of decadent tradition, and ceased to exercise our humanity. In this dark gloom of India's degeneration Rammohun rose up, a luminous star in the firmament of India's history, with prophetic purity of vision, and unconquerable heroism of soul. He shed radiance all over the land; he rescued us from the penury of self-oblivion. Through the dynamic power of his personality, his uncompromising freedom of the spirit, he vitalized our national being with the urgency of creative endeavour, and launched it into the arduous adventure of realization. He is the great path-maker of this century who has removed ponderous obstacles that impeded our progress at every step, and initiated us into the present Era of world-wide co-operation of humanity.

Rammohun belongs to the lineage of India's great seers who age after age have appeared in the arena of our history with the message of Eternal Man. India's special genius has been to acknowledge the divine in human affairs, to offer hospitality to all that is imperishable in human civilization, regardless of racial and national divergence. From the early dawn of our history it has been India's privilege and also its problem, as a host, to harmonize the diverse elements of humanity which have inevitably been brought to our midst, to synthetize contrasting cultures in the light of a comprehensive ideal. The stupendous structure of our social system with its intricate arrangement of caste testifies to the vigorous attempt māde at an early stage of human civilization to deal with the complexity of our problem, to relegate to every class of our peoples however wide the cleavage between their levels of culture, a place in a cosmopolitan scheme of society. Rammohun's predecessors, Kabir, Nānak, Dādu, and innumerable saints and seers of medieval India, carried on much further India's great attempt to evolve a human adjustment of peoples and races; they broke through barriers of social and religious exclusiveness and brought together India's different communities on the genuine basis of spiritual reality. Now that our outworn social usages are yielding rapidly to the stress of an urgent call of unity, when rigid enclosures of caste and creed can no more obstruct the freedom of our fellowship, when India's spiritual need of faith and concord between her different peoples has become imperative and seems to have aroused a new stir of consciousness throughout the land, we must not forget that this emancipation of our manhood has been made possible by the indomitable personality of the great Unifier, Rammohun Roy. He paved the path for this reassertion of India's inmost truth of being, her belief in the equality of man in the love of the Supreme Person, who ever dwells in the hearts of all men and unites us in the bond of welfare.

Rammohun was the only person in his time, in the whole world of man, to realize completely the significance of the Modern Age. He knew that the ideal of human civilization does not lie in the isolation of independence,

but in the brotherhood of interdependence of individuals as well as of nations in all spheres of thought and activity. He applied this principle of humanity with his extraordinary depth of scholarship and natural gift of intuition, to social, literary and religious affairs, never acknowledging limitations of circumstance, never deviating from his purpose lured by distractions of temporal excitement. His attempt was to establish our peoples on the full consciousness of their own cultural personality, to make them comprehend the reality of all that was unique and indestructible in their civilization, and simultaneously, to make them approach other civilizations in the spirit of sympathetic co-operation. With this view in his mind he tackled an amazingly wide range of social, cultural, and religious problems of our country, and through a long life spent in unflagging service to the cause of India's cultural reassertion, brought back the pure stream of India's philosophy to the futility of our immobile and unproductive national existence. In social ethics he was an uncompromising interpreter of the truths of human relationship, tireless in his crusade against social wrongs and superstition, generous in his co-operation with any reformer, both of this country and of outside, who came to our aid in a genuine spirit of comradeship. Unsparingly he devoted himself to the task of rescuing from the debris of India's decadence the true products of its civilization, and to make our people build on them, as the basis, the superstructure of an international culture. Deeply versed in Sanskrit, he revived classical studies, and while he imbued the Bengali literature and language with the rich atmosphere of our classical period, he opened its doors wide to the spirit of the Age, offering access to new words from other languages, and to new ideas. To every sphere of our national existence he brought the sagacity of a comprehensive vision, the spirit of self-manifestation of the unique in the light of the universal.

Let me hope that in celebrating his Centenary we shall take upon ourselves the task of revealing to our own and contemporaneous civilizations the multisided and perfectly balanced personality of this great man. We in this

country, however, owe a special responsibility, not only of bringing to light his varied contributions to the Modern Age, but of proving our right of kinship with him by justifying his life, by maintaining in every realm of our national existence the high standard of truth which he set before us. Great men have been claimed by humanity by its persecution of them and wilful neglect. We evade our responsibility for those who are immeasurably superior to us by repudiating them. Rammohun suffered martyrdom in his time, and paid the price of his greatness. But out of his sufferings, his power of transmuting them to carry on further beneficent activities for the good of humanity, the Modern Age has gained an undying urge of life. If we fail him again in this day of our nation-building, if we do not observe perfect equity of human relationship offering uncompromising fight to all forms and conventions, however ancient they may be in usage, which separate man and man, we shall be pitiful in our failure, and shamed for ever in the history of man. Our futility will be in the measure of the greatness of Rammohun Roy.

18 February 1933

মহাত্মা গান্ধী

ঊর্ধ্বে গিরিচূড়ায় বসে আছে ভক্ত, তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে;
আকাশে তার নিদ্রাহীন চক্ষু খোঁজে আলোকের ইঙ্গিত।
মেঘ যখন ঘনীভূত, নিশাচর পাখি চীৎকারশব্দে যখন উড়ে যায়,
সে বলে, 'ভয় নেই ভাই, মানবকে মহান বলে জেনো।'
ওরা শোনে না। বলে, পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি। বলে, পশুই শাশ্বত।
বলে, সাধুতা তলে তলে আত্মপ্রবঞ্চক।
যখন ওরা আঘাত পায় বিলাপ করে বলে, 'ভাই, তুমি কোথায়।'
উত্তরে শুনতে পায়, 'আমি তোমার পাশেই।'
অন্ধকারে দেখতে পায় না; তর্ক করে, এ বাণী ভয়ার্তের মায়াসৃষ্টি,
আত্মসান্ত্বনার বিড়ম্বনা।
বলে, মানুষ চিরদিন কেবল সংগ্রাম করবে
মরীচিকার অধিকার নিয়ে
হিংসাকণ্টকিত অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে।

মেঘ সরে গেল।
শুকতারা দেখা দিল পূর্বদিগন্তে,
পৃথিবীর বক্ষ থেকে উঠল আরামের দীর্ঘনিশ্বাস,
পল্লবমর্মর বনপথে-পথে হিল্লোলিত,
পাখি ডাক দিল শাখায় শাখায়।
ভক্ত বললে, সময় এসেছে।
কিসের সময়।
যাত্রার।
ওরা বসে ভাবলে।
অর্থ বুঝলে না, আপন আপন মনের মতো অর্থ বানিয়ে নিলে।
ভোরের স্পর্শ নামল মাটির গভীরে;
বিশ্বসত্তার শিকড়ে শিকড়ে কেঁপে উঠল প্রাণের চাঞ্চল্য।
কে জানে কোথা হতে একটি অতিসূক্ষ্ম স্বর
সবার কানে কানে বললে,
'চলো সার্থকতার তীর্থে।'
এই বাণী জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে
একটি মহৎ প্রেরণায় বেগবান হয়ে উঠল।
পুরুষেরা উপরের দিকে চোখ তুললে।
জোড়হাত মাথায় ঠেকালে মেয়েরা।
শিশুরা করতালি দিয়ে হেসে উঠল।
প্রভাতের প্রথম আলো ভক্তের মাথায় সোনার রঙের চন্দন পরালে;
সবাই বলে উঠল, 'ভাই, আমরা তোমার বন্দনা করি।'

দয়াহীন দুর্গম পথ উপলখণ্ডে আকীর্ণ।
ভক্ত চলেছে, তার পশ্চাতে বলিষ্ঠ এবং শীর্ণ,
তরুণ এবং জরাজর্জর, পৃথিবী শাসন করে যারা
আর যারা অর্ধাশনের মূল্যে মাটি চাষ করে।
কেউ-বা ক্লান্ত বিক্ষতচরণ, কারও মনে ক্রোধ, কারও মনে সন্দেহ।
তারা প্রতি পদক্ষেপ গণনা করে আর শুধায়, কত পথ বাকি।
তার উত্তরে ভক্ত শুধু গান গায়।
শুনে তাদের ভ্রূ কুটিল হয়, কিন্তু ফিরতে পারে না;
চলমান জনপিণ্ডের বেগ এবং অনতিব্যক্ত আশার তাড়না
তাদের ঠেলে নিয়ে যায়।
ঘুম তাদের কমে এল, বিশ্রাম তারা সংক্ষিপ্ত করলে;
পরস্পরকে ছাড়িয়ে চলবার প্রতিযোগিতায় তারা ব্যগ্র;
ভয়, পাছে বিলম্ব করে বঞ্চিত হয়।
দিনের পর দিন গেল।
দিগন্তের পর দিগন্ত আসে,
অজ্ঞাতের আমন্ত্রণ অদৃশ্য সংকেতে ইঙ্গিত করে।
ওদের মুখের ভাব ক্রমেই কঠিন
আর ওদের গঞ্জনা উগ্রতর হতে থাকে।

রাত হয়েছে।
পথিকেরা বটতলায় আসন বিছিয়ে বসল।
একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ গেল নিবে, অন্ধকার নিবিড়—
যেন নিদ্রা ঘনিয়ে উঠল মূর্ছায়।
জনতার মধ্য থেকে কে-একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বললে,
'মিথ্যাবাদী, আমাদের প্রবঞ্চনা করেছ।'
ভর্ৎসনা এক কণ্ঠ থেকে আর-এক কণ্ঠে উদগ্র হতে থাকল।
তীব্র হল মেয়েদের বিদ্বেষ, প্রবল হল পুরুষদের তর্জন।
অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে
হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।
অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না।
একজনের পর একজন উঠল, আঘাতের পর আঘাত করলে,
তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
রাত্রি নিস্তব্ধ।
ঝরনার কলশব্দ দূর থেকে ক্ষীণ হয়ে আসছে।
বাতাসে যূথীর মৃদু গন্ধ।

যাত্রীদের মন শঙ্কায় অভিভূত।
মেয়েরা কাঁদছে; পুরুষেরা উত্ত্যক্ত হয়ে ভর্ৎসনা করছে, 'চুপ করো!'
কুকুর ডেকে ওঠে; চাবুক খেয়ে আর্ত কাকুতিতে
তার ডাক থেমে যায়।

রাত্রি পোহাতে চায় না।
অপরাধের অভিযোগ নিয়ে মেয়ে পুরুষে তর্ক তীব্র হতে থাকে।
সবাই চীৎকার করে, গর্জন করে;
শেষে যখন খাপ থেকে ছুরি বেরোতে চায়
এমনসময় অন্ধকার ক্ষীণ হল,
প্রভাতের আলো গিরিশৃঙ্গ ছাপিয়ে আকাশ ভরে দিলে।
হঠাৎ সকলে স্তব্ধ।
সূর্যরশ্মির তর্জনী এসে স্পর্শ করল
রক্তাক্ত মৃত মানুষের শান্ত ললাট।
মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, পুরুষেরা মুখ ঢাকল দুই হাতে।
কেউ-বা অলক্ষিতে পালিয়ে যেতে চায়, পারে না;
অপরাধের শৃঙ্খলে আপন বলির কাছে তারা বাঁধা।
পরস্পরকে তারা শুধায়, 'কে আমাদের পথ দেখাবে।'
পূর্বদেশের বৃদ্ধ বললে,
'আমরা যাকে মেরেছি সেই দেখাবে।'
সবাই নিরুত্তর ও নতশির।
বৃদ্ধ আবার বললে, 'সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি,
ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি,
প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব—
কেননা, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত,
সেই মহামৃত্যুঞ্জয়।'
সকলে দাঁড়িয়ে উঠল; কণ্ঠ মিলিয়ে গান করলে,
'জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়!'

তরুণের দল ডাক দিল, 'চলো যাত্রা করি, প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে।'
হাজার কণ্ঠের ধ্বনিনির্ঝরে ঘোষিত হল,
'আমরা ইহলোক জয় করব এবং লোকান্তর।'
উদ্দেশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট নয়, কেবল আগ্রহে সকলে এক;
মৃত্যুবিপদকে তুচ্ছ করেছে সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ।
তারা আর পথ শুধায় না; তাদের মনে নেই সংশয়,
চরণে নেই ক্লান্তি।
মৃত অধিনেতার আত্মা তাদের অন্তরে বাহিরে;
সে যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়েছে
এবং জীবনের সীমাকে করেছে অতিক্রম।
তারা সেই ক্ষেত্র দিয়ে চলেছে যেখানে বীজ বোনা হল,
সেই ভাণ্ডারের পাশ দিয়ে যেখানে শস্য হয়েছে সঞ্চিত,
সেই অনুর্বর ভূমির উপর দিয়ে
যেখানে কঙ্কালসার দেহ বসে আছে প্রাণের কাঙাল;
তারা চলেছে প্রজাবহুল নগরের পথ দিয়ে,

চলেছে জনশূন্যতার মধ্যে দিয়ে
যেখানে বোবা অতীত তার ভাঙা কীর্তি কোলে নিয়ে নিস্তব্ধ;
চলেছে লক্ষ্মীছাড়াদের জীর্ণ বসতি বেয়ে
আশ্রয় যেখানে আশ্রিতকে বিদ্রূপ করে।

রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের দীর্ঘ প্রহর কাটল পথে পথে।
সন্ধ্যাবেলায় আলোক যখন ম্লান তখন তারা কালজ্ঞকে শুধায়,
'ওই কি দেখা যায় আমাদের চরম আশার তোরণচূড়া।'
সে বলে, 'না, ও যে সন্ধ্যাভ্রশিখরে অস্তগামী সূর্যের বিলীয়মান আভা।'
তরুণ বলে, 'থেমো না বন্ধু, অন্ধতমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে
আমাদের পৌঁছতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।'
অন্ধকারে তারা চলে।
পথ যেন নিজের অর্থ নিজে জানে।
পায়ের তলার ধূলিও যেন নীরব স্পর্শে দিক চিনিয়ে দেয়।
স্বর্গপথযাত্রী নক্ষত্রের দল মূক সংগীতে বলে, 'সাথি, অগ্রসর হও।'
অধিনেতার আকাশবাণী কানে আসে, 'আর বিলম্ব নেই।'

গান্ধী মহারাজ

গান্ধী মহারাজের শিষ্য
কেউ-বা ধনী, কেউ-বা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল—
গরিব মেরে ভরাই নে পেট,
ধনীর কাছে হই নে তো হেঁট,
আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।
ষণ্ডা যখন আসে তেড়ে
উঁচিয়ে ঘুষি ডাণ্ডা নেড়ে
আমরা হেসে বলি জোয়ানটাকে,
'ঐ যে তোমার চোখ-রাঙানো
খোকাবাবুর ঘুম-ভাঙানো,
ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে।'
সিধে ভাষায় বলি কথা,
স্বচ্ছ তাহার সরলতা,
ডিপ্লম্যাসির নাইকো অসুবিধে।
গারদখানার আইনটাকে
খুঁজতে হয় না কথার পাকে,
জেলের দ্বারে যায় সে নিয়ে সিধে।

দলে দলে হরিণবাড়ি
চলল যারা গৃহ ছাড়ি
ঘুচল তাদের অপমানের শাপ—
চিরকালের হাতকড়ি যে,
ধুলায় খসে পড়ল নিজে,
লাগল ভালে গান্ধীরাজের ছাপ।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১৩ ডিসেম্বর ১৯৪০

মহাত্মা গান্ধী

ভারতবর্ষের একটি সম্পূর্ণ ভৌগোলিক মূর্তি আছে। এর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত যে-একটি সম্পূর্ণতা বিদ্যমান, প্রাচীন কালে তার ছবি অন্তরে গ্রহণ করার ইচ্ছে দেশে ছিল, দেখতে পাই। একসময়, দেশের মনে নানা কালে নানা স্থানে যা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল তা সংগ্রহ করে, এক করে দেখবার চেষ্টা, মহাভারতে খুব সুস্পষ্ট ভাবে জাগ্রত দেখি। তেমনি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক স্বরূপকে অন্তরে উপলব্ধি করবার একটি অনুষ্ঠান ছিল, সে তীর্থভ্রমণ। দেশের পূর্বতম অঞ্চল থেকে পশ্চিমতম অঞ্চল এবং হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত সর্বত্র এর পবিত্র পীঠস্থান রয়েছে, সেখানে তীর্থ স্থাপিত হয়ে একটি ভক্তির ঐক্যজালে সমস্ত ভারতবর্ষকে মনের ভিতরে আনবার সহজ উপায় সৃষ্টি করেছে।

ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ দেশ। একে সম্পূর্ণ ভাবে মনের ভিতর গ্রহণ করা প্রাচীন কালে সম্ভবপর ছিল না। আজ সার্ভে করে, মানচিত্র এঁকে, ভূগোলবিবরণ গ্রথিত করে ভারতবর্ষের যে ধারণা মনে আনা সহজ হয়েছে, প্রাচীন কালে তা ছিল না। এক হিসাবে সেটা ভালোই ছিল। সহজ ভাবে যা পাওয়া যায় মনের ভিতরে তা গভীর ভাবে মুদ্রিত হয় না। সেইজন্য কৃচ্ছ্রসাধন করে ভারত-পরিক্রমা দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ হত তা সুগভীর, এবং মন থেকে সহজে দূর হত না।

মহাভারতের মাঝখানে গীতা প্রাচীনের সেই সমন্বয়তত্ত্বকে উজ্জ্বল করে। কুরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে এই-যে খানিকটা দার্শনিক ভাবে আলোচনা, এটাকে কাব্যের দিক থেকে অসংগত বলা যেতে পারে; এমনও বলা যেতে পারে যে, মূল মহাভারতে এটা ছিল না। পরে যিনি বসিয়েছেন তিনি জানতেন যে, উদার কাব্য-পরিধির মধ্যে, ভারতের চিত্তভূমির মাঝখানে এই তত্ত্বকথার অবতারণা করার প্রয়োজন ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষকে অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করবার প্রয়াস ছিল ধর্মানুষ্ঠানেরই অন্তর্গত। মহাভারতপাঠ যে আমাদের দেশে ধর্মকর্মের মধ্যে গণ্য হয়েছিল তা কেবল তত্ত্বের দিক থেকে নয়, দেশকে উপলব্ধি করার জন্যও এর কর্তব্যতা আছে। আর, তীর্থযাত্রীরাও ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে দেশকে স্পর্শ করতে করতে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে ক্রমশ এর ঐক্যরূপ মনের ভিতরে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন।

এ হল পুরাতন কালের কথা।

পুরাতন কালের পরিবর্তন হয়েছে। আজকাল দেশের মানুষ আপনার প্রাদেশিক কোণের ভিতর সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সংস্কার ও লোকাচারের জালে আমরা জড়িত, কিন্তু মহাভারতের প্রশস্ত ক্ষেত্রে একটা মুক্তির হাওয়া আছে। এই মহাকাব্যের বিরাট প্রাঙ্গণে মনস্তত্ত্বের কত পরীক্ষা। যাকে আমরা সাধারণত নিন্দনীয় বলি, সেও এখানে স্থান পেয়েছে। যদি আমাদের মন প্রস্তুত থাকে, তবে অপরাধ দোষ সমস্ত অতিক্রম করে মহাভারতের বাণী উপলব্ধি করতে পারা যেতে পারে। মহাভারতে একটা উদাত্ত শিক্ষা আছে; সেটা নঙর্থক নয়, সদর্থক, অর্থাৎ তার মধ্যে একটা হাঁ আছে। বড়ো বড়ো সব বীরপুরুষ আপন মাহাত্ম্যের গৌরবে উন্নতশির, তাঁদেরও দোষ ত্রুটি রয়েছে, কিন্তু সেই-সমস্ত দোষ ত্রুটিকে আত্মসাৎ করেই তাঁরা বড়ো হয়ে উঠেছেন। মানুষকে যথার্থ ভাবে বিচার করবার এই প্রকাণ্ড শিক্ষা আমরা মহাভারত থেকে পাই।

পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ হবার পর থেকে আরও কিছু চিন্তনীয় বিষয় এসে পড়েছে যেটা আগে ছিল না। পুরাকালের ভারতে দেখি স্বভাবত বা কার্যত যারা পৃথক তাদের আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তবু খণ্ডিত করেও একটা ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টা ছিল। সহসা পশ্চিমের সিংহদ্বার ভেদ করে শত্রুর আগমন হল। আর্যরা ওই পথেই এসে একদিন পঞ্চনদীর তীরে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, এবং তার পরে বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে নিজেদের পরিব্যাপ্ত করেছিলেন। ভারত তখন গান্ধার প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক প্রদেশ-সুদ্ধ একটি সমগ্র সংস্কৃতিতে পরিবেষ্টিত থাকায়, বাইরের আঘাত লাগে নি। তার পরে একদিন এল বাইরের থেকে সংঘাত। সে সংঘাত বিদেশীর; তাদের সংস্কৃতি পৃথক। যখন তারা এল তখন দেখা গেল যে, আমরা একত্র ছিলুম, অথচ এক হই নি। তাই সমস্ত ভারতবর্ষে বিদেশী আক্রমণের একটা প্লাবন বয়ে গেল। তার পর থেকে আমাদের দিন কাটছে দুঃখ ও অপমানের গ্লানিতে। বিদেশী আক্রমণের সুযোগ নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে কেউ, কেউ-বা খণ্ড খণ্ড জায়গায় বিশৃঙ্খল ভাবে বিদেশীদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্যে। কিছুতেই তো সফলকাম হওয়া গেল না। রাজপুতনায়, মারাঠায়, বাংলাদেশে, যুদ্ধবিগ্রহ অনেক কাল শান্ত হয় নি। এর কারণ এই যে, যত বড়ো দেশ ঠিক তত বড়ো ঐক্য হল না; দুর্ভাগ্যের ভিতর দিয়ে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করলেম বহু শতাব্দী পরে। বিদেশী আক্রমণের পথ প্রশস্ত হল এই অনৈক্যের সুবিধা নিয়ে। নিকটের শত্রুর পর হুড়মুড় করে এসে পড়ল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশী শত্রু তাদের বাণিজ্যতরী নিয়ে; এল পর্তুগীজ, এল ওলন্দাজ, এল ফ্রেঞ্চ, এল ইংরেজ। সকলে এসে সবলে ধাক্কা মারলে; দেখতে পেল যে, এমন কোনো বেড়া নেই যেটা দুর্লঙ্ঘ্য। আমাদের সম্পদ সম্বল সব দিতে লাগলুম, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষীণতা এল, চিত্তের দিক দিয়ে সম্বলহীন রিক্ত হয়ে পড়লুম। এমনি করেই বাইরের নিঃস্বতা ভিতরেও নিঃস্বতা আনে।

এইরকম দুঃসময়ে আমাদের সাধক পুরুষদের মনে যে চিন্তার উদয় হয়েছিল সেটা হচ্ছে, পরমার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভারতের স্বাতন্ত্র্য উদ্‌বোধিত করার একটা আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা। তখন থেকে আমাদের সমস্ত মন গেছে পারমার্থিক পুণ্য-উপার্জনের দিকে। আমাদের পার্থিব সম্পদ পৌঁছয় নি সেখানে যেখানে যথার্থ

দৈন্য ও শিক্ষার অভাব। পারমার্থিক সম্বলটুকুর লোভে যে পার্থিব সম্বল খরচ করি সেটা যায় মোহান্ত ও পান্ডাদের গর্বস্ফীত জঠরের মধ্যে। এতে ভারতের ক্ষয় ছাড়া বৃদ্ধি হচ্ছে না।

বিপুল ভারতবর্ষের বিরাট জনসমাজের মধ্যে আর-এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা জপ তপ ধ্যান ধারণা করার জন্যে মানুষকে পরিত্যাগ করে দারিদ্র্য ও দুঃখের হাতে সংসারকে ছেড়ে দিয়ে চলে যান। এই অসংখ্য উদাসীনমন্ডলীর এই মুক্তি-কামীদের অন্ন জুটিয়েছে তারা যারা এঁদের মতে মোহগ্রস্ত সংসারাসক্ত। একবার কোনো গ্রামের মধ্যে এইরকম এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁকে বলেছিলুম, 'গ্রামের মধ্যে দুষ্কৃতিকারী, দুঃখী, পীড়াগ্রস্ত যারা আছে, এদের জন্যে আপনারা কিছু করবেন না কেন।' আমার এই প্রশ্ন শুনে তিনি বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছিলেন; বললেন, 'কী। যারা সাংসারিক মোহগ্রস্ত লোক, তাদের জন্যে ভাবতে হবে আমায়! আমি একজনা সাধক, বিশুদ্ধ আনন্দের জন্যে ওই সংসার ছেড়ে এসেছি, আবার ওর মধ্যে নিজেকে জড়াব!' এই কথাটি যিনি বলেছিলেন তাঁকে এবং তাঁরই মতো অন্য সকল সংসারে-বীতস্পৃহ উদাসীনদের ডেকে জিগ্গেস করতে ইচ্ছে হয় যে, তাঁদের তৈলচিক্কণ নধর কান্তির পরিপুষ্টি সাধন করল কে। যাদেরকে ওঁরা পাপী ও হেয় বলে ত্যাগ করে এসেছেন সেই সংসারী লোকই ওঁদের অন্ন জুটিয়েছে। পরলোকের দিকে ক্রমাগত দৃষ্টি দিয়ে কতখানি শক্তির অপচয় হয়েছে তা বলা যায় না। বহু শতাব্দী ধরে ভারতের এই দুর্বলতা চলে আসছে। এর যা শাস্তি, ইহলোকের বিধাতা সে শাস্তি আমাদের দিয়েছেন। তিনি আমাদের হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছেন সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, এই সংসারের উপযোগী হতে হবে। সে হুকুমের অবমাননা করেছি, সুতরাং শাস্তি পেতেই হবে।

সম্প্রতি ইউরোপে স্বাতন্ত্র্যপ্রতিষ্ঠার একটা চেষ্টা চলেছে। ইতালি এক সময়ে বিদেশীর কবলে ধিক্‌কৃত জীবন যাপন করেছিল; তার পরে ইতালির ত্যাগী যাঁরা, যাঁরা বীর, ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডি, বিদেশীর অধীনতা-জাল থেকে মুক্তিদান করে নিজেদের দেশকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও দেখেছি এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার জন্যে কত দুঃখ, কত চেষ্টা, কত সংগ্রাম হয়েছে। মানুষকে মনুষ্যোচিত অধিকার দেবার জন্যে পাশ্চাত্ত্য দেশে কত লোক আপনাদের বলি দিয়েছে। বিভাগ সৃষ্টি করে পরস্পরকে যে অপমান করা হয়, সেটার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্ত্যে আজও বিদ্রোহ চলছে। ও দেশের কাছে জনসাধারণ, সর্বসাধারণ, মানব-গৌরবের অধিকারী; কাজেই রাষ্ট্রতন্ত্রের যাবতীয় অধিকার সর্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ও দেশের আইনের কাছে ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রভেদ নেই। একতাবদ্ধ হয়ে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার শিক্ষা আমরা পাশ্চাত্ত্যের ইতিহাস থেকে পেয়েছি। সমস্ত ভারতবাসী যাতে আপন দেশকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পায়, এই যে ইচ্ছে এটা আমরা পশ্চিম থেকে পেয়েছি। এত দিন ধরে আমরা নিজেদের গ্রাম ও প্রতিবাসীদের নিয়ে খন্ড খন্ড ভাবে ছোটোখাটো ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর কাজ করেছি ও চিন্তা করেছি। গ্রামে জলাশয় ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের সার্থক মনে করেছি, এবং এই গ্রামকেই আমরা জন্মভূমি বা মাতৃভূমি বলেছি। ভারতকে মাতৃভূমি বলে স্বীকার করার অবকাশ হয় নি। প্রাদেশিকতার জালে জড়িত ও দুর্বলতায় অভিভূত হয়ে আমরা যখন পড়ে ছিলুম তখন রানাডে সুরেন্দ্রনাথ, গোখলে প্রমুখ মহদাশয় লোকেরা এলেন জনসাধারণকে গৌরব দান করার জন্যে। তাঁদের আরব্ধ সাধনাকে যিনি প্রবল শক্তিতে দ্রুত বেগে আশ্চর্য

সিদ্ধির পথে নিয়ে গেছেন সেই মহাত্মার কথা স্মরণ করতে আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি— তিনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী।

অনেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, ইনিই কি প্রথম এলেন। তার পূর্বে কংগ্রেসের ভিতরে কি আরও অনেকে কাজ করেন নি। কাজ করেছেন সত্য, কিন্তু তাঁদের নাম করলেই দেখতে পাই যে, কত ম্লান তাঁদের সাহস, কত ক্ষীণ তাঁদের কণ্ঠধ্বনি।

আগেকার যুগে কংগ্রেসওয়ালারা আমলাতন্ত্রের কাছে কখনও নিয়ে যেতেন আবেদন-নিবেদনের ডালা, কখনও-বা করতেন চোখরাঙানির মিথ্যে ভান। ভেবে-ছিলেন তাঁরা যে, কখনও তীক্ষ্ম কখনও সুমধুর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে তাঁরা ম্যাজিনি-গ্যারিবল্ডির সমগোত্রীয় হবেন। সে ক্ষীণ অবাস্তব শৌর্য নিয়ে আজ আমাদের গৌরব করার মতো কিছুই নেই। আজ যিনি এসেছেন তিনি রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কলুষ থেকে মুক্ত। রাষ্ট্রতন্ত্রের অনেক পাপ ও দোষের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড দোষ হল এই স্বার্থান্বেষণ। হোক-না রাষ্ট্রীয় স্বার্থ খুব বড়ো স্বার্থ, তবু স্বার্থের যা পঙ্কিলতা তা তার মধ্যে না এসে পারেই না। পোলিটিশ্যান বলে একটা জাত আছে, তাদের আদর্শ বড়ো আদর্শের সঙ্গে মেলে না। তারা অজস্র মিথ্যা বলতে পারে; তারা এত হিংস্র যে নিজেদের দেশকে স্বাতন্ত্র্য দেবার অছিলায় অন্য দেশ অধিকার করার লোভ ত্যাগ করতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য দেশে দেখি, এক দিকে তারা দেশের জন্যে প্রাণ দিতে পেরেছে, অন্য দিকে আবার দেশের নাম করে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য দেশ একদিন যে মুষল প্রসব করেছে আজ তারই শক্তি ইউরোপের মস্তকের উপর উদ্যত হয়ে আছে। আজকে এমন অবস্থা হয়েছে যে সন্দেহ হয়, আজ বাদে কাল ইউরোপীয় সভ্যতা টিকবে কি না। তারা যাকে পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ বলছে সেই পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ই তাদের নিঃশেষে মারবে। তারা যখন মরবে তখন অবশ্য আমাদের মতো নির্জীব ভাবে মরবে না, ভয়ংকর অগ্নি উৎপাদন করে একটা ভীষণ প্রলয়ের মধ্যে তারা মরবে।

আমাদের মধ্যেও অসত্য এসেছে; দলাদলির বিষ ছড়িয়েছেন পোলিটিশ্যানের জাতীয় যাঁরা। আজ এই পলিটিক্স্‌ থেকেই ছাত্রছাত্রীর মধ্যেও দলাদলির বিষ প্রবেশ করেছে। পোলিটিশ্যানরা কেজো লোক; তাঁরা মনে করেন যে, কার্য উদ্ধার করতে হলে মিথ্যার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিধাতার বিধানে সে ছলচাতুরী ধরা পড়বে। পোলিটিশ্যানদের, এ-সব চতুর বিষয়ীদের, আমরা প্রশংসা করতে পারি কিন্তু ভক্তি করতে পারি না। ভক্তি করতে পারি মহাত্মাকে, যাঁর সত্যের সাধনা আছে। মিথ্যার সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি সত্যের সার্বভৌমিক ধর্মনীতিকে অস্বীকার করেন নি। ভারতের যুগসাধনায় এ একটা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এই একটি লোক যিনি সত্যকে সকল অবস্থায় মেনেছেন, তাতে আপাতত সুবিধে হোক বা না হোক; তাঁর দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে মহৎ দৃষ্টান্ত। পৃথিবীতে স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য -লাভের ইতিহাস রক্তধারায় পঙ্কিল, অপহরণ ও দস্যু-বৃত্তির দ্বারা কলঙ্কিত। কিন্তু পরস্পরকে হনন না করে, হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় না নিয়েও যে স্বাধীনতা লাভ করা যেতে পারে, তিনি তার পথ দেখিয়েছেন। লোকে অপহরণ করেছে, বিজ্ঞান দস্যুবৃত্তি করেছে দেশের নামে। দেশের নাম নিয়ে এই-যে তাদের গৌরব, এ গর্ব টিকবে না তো। আমাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন যাঁরা হিংস্রতাকে মন থেকে দূর করে দেখতে পারেন। এই হিংসা-

প্রবৃত্তি স্বীকার না করেও আমরা জয়ী হব, এ কথা আমরা মানি কি। মহাত্মা যদি বীরপুরুষ হতেন কিংবা লড়াই করতেন তবে আমরা এমনি করে আজ ওঁকে স্মরণ করতুম না। কারণ, লড়াই করার মতো বীরপুরুষ এবং বড়ো বড়ো সেনাপতি পৃথিবীতে অনেক জন্মগ্রহণ করেছেন। মানুষের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ, নৈতিক যুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধের ভিতরেও নিষ্ঠুরতা আছে, তা গীতা ও মহাভারতে পেয়েছি। তার মধ্যে বাহুবলেরও স্থান আছে কি না এ নিয়ে শাস্ত্রের তর্ক তুলব না। কিন্তু এই-যে একটা অনুশাসন, মরব তবু মারব না, এবং এই করেই জয়ী হব—এ একটা মস্ত বড়ো কথা, একটা বাণী। এটা চাতুরী কিংবা কার্যোদ্ধারের বৈষয়িক পরামর্শ নয়। ধর্মযুদ্ধ বাইরে জেতবার জন্য নয়, হেরে গিয়েও জয় করবার জন্য। অধর্ম-যুদ্ধে মরাটা মরা। ধর্মযুদ্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে; হার পেরিয়ে থাকে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত। যিনি এই কথাটা নিজের জীবনে উপলব্ধি করে স্বীকার করেছেন, তাঁর কথা শুনতে আমরা বাধ্য।

এর মূলে একটা শিক্ষার ধারা আছে। ইউরোপে আমরা স্বাধীনতার কলুষ ও স্বাদেশিকতার বিষাক্ত রূপ দেখতে পাই। অবশ্য, আরম্ভে তারা অনেক ফল পেয়েছে, অনেক ঐশ্বর্য লাভ করেছে। সেই পাশ্চাত্ত্য দেশে খৃস্টধর্মকে শুধু মৌখিক ভাবে গ্রহণ করেছে। খৃস্টধর্মে মানবপ্রেমের বড়ো উদাহরণ আছে: ভগবান মানুষ হয়ে মানুষের দেহে যত দুঃখ পাপ সব আপন দেহে স্বীকার করে নিয়ে মানুষকে বাঁচিয়েছেন—এই ইহলোকেই, পরলোকে নয়। যে সকলের চেয়ে দরিদ্র তাকে বস্ত্র দিতে হবে, যে নিরন্ন তাকে অন্ন দিতে হবে, এ কথা খৃস্টধর্মে যেমন সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে এমন আর কোথাও নয়।

মহাত্মাজি এমন একজন খৃস্টসাধকের সঙ্গে মিলতে পেরেছিলেন, যাঁর নিয়ত প্রচেষ্টা ছিল মানবের ন্যায্য অধিকারকে বাধামুক্ত করা। সৌভাগ্যক্রমে সেই ইউরোপীয় ঋষি টলস্টয়ের কাছ থেকে মহাত্মা গান্ধী খৃস্টানধর্মের অহিংস্রনীতির বাণী যথার্থ ভাবে লাভ করেছিলেন। আরও সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এ বাণী এমন একজন লোকের যিনি সংসারের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে এই অহিংস্র-নীতির তত্ত্ব আপন চরিত্রে উদ্ভাবিত করেছিলেন। মিশনারি অথবা ব্যবসায়ী প্রচারকের কাছে মানবপ্রেমের বাঁধা বুলি তাঁকে শুনতে হয় নি। খৃস্টবাণীর এই একটি বড়ো দান আমাদের পাবার অপেক্ষা ছিল। মধ্যযুগে মুসলমানদের কাছ থেকেও আমরা একটি দান পেয়েছি। দাদু, কবীর, রজ্জব প্রভৃতি সাধুরা প্রচার করে গিয়েছেন যে, যা নির্মল, যা মুক্ত, যা আত্মার শ্রেষ্ঠ সামগ্রী, তা রুদ্ধদ্বার মন্দিরে কৃত্রিম অধিকারীবিশেষের জন্যে পাহারা-দেওয়া নয়; তা নির্বিচারে সর্ব মানবেরই সম্পদ। যুগে যুগে এইরূপই ঘটে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা সমস্ত পৃথিবীর দানকে আপন মাহাত্ম্য দ্বারাই গ্রহণ করেন, এবং গ্রহণ করার দ্বারা তাকে সত্য করে তোলেন। আপন মাহাত্ম্য দ্বারাই পৃথুরাজা পৃথিবীকে দোহন করে-ছিলেন রত্ন আহরণ করবার জন্যে। যাঁরা শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ তাঁরা সকল ধর্ম ইতিহাস ও নীতি থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দান গ্রহণ করেন।

খৃস্টবাণীর শ্রেষ্ঠ নীতি বলে যে, যারা নম্র তারা জয়ী হয়; আর খৃস্টানজাতি বলে, নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যের দ্বারা জয়লাভ করা যায়। এর মধ্যে কে জয়ী হবে ঠিক করে জানা যায় নি; কিন্তু উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় যে, ঔদ্ধত্যের ফলে ইউরোপে কী মহামারীই না হচ্ছে। মহাত্মা নম্র অহিংস্রনীতি গ্রহণ করেছেন, আর চতুর্দিকে তাঁর জয় বিস্তীর্ণ হচ্ছে। তিনি যে নীতি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে প্রমাণ করছেন,

সম্পূর্ণে পারি বা না পারি, সে নীতি আমাদের স্বীকার করতেই হবে। আমাদের অন্তরে ও আচরণে রিপু ও পাপের সংগ্রাম আছে, তা সত্ত্বেও পুণ্যের তপস্যার দীক্ষা নিতে হবে সত্যব্রত মহাত্মার নিকটে। আজকের দিন স্মরণীয় দিন, কারণ সমস্ত ভারতে রাষ্ট্রীয় মুক্তির দীক্ষা ও সত্যের দীক্ষা এক হয়ে গেছে সর্বসাধারণের কাছে।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন ১৩৪৪

গান্ধীজি

আজ মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবসে আশ্রমবাসী আমরা সকলে আনন্দোৎসব করব। আমি আরম্ভের সুরটুকু ধরিয়ে দিতে চাই।

আধুনিক কালে এই রকমের উৎসব অনেকখানি বাহ্য অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। খানিকটা ছুটি ও অনেকখানি উত্তেজনা দিয়ে এটা তৈরি। এইরকম চাঞ্চল্যে এই-সকল উপলক্ষের গভীর তাৎপর্য অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করবার সুযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

ক্ষণজন্মা লোক যাঁরা তাঁরা শুধু বর্তমান কালের নন। বর্তমানের ভূমিকার মধ্যে ধরাতে গেলে তাঁদের অনেকখানি ছোটো করে আনতে হয়, এমনি করে বৃহৎ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে যে শাশ্বত মূর্তি প্রকাশ পায় তাকে খর্ব করি। আমাদের আশু প্রয়োজনের আদর্শে তাঁদের মহত্ত্বকে নিঃশেষিত করে বিচার করি। মহাকালের পটে যে ছবি ধরা পড়ে, বিধাতা তার থেকে প্রাত্যহিক জীবনের আত্ম-বিরোধ ও আত্মখণ্ডনের অনিবার্য কুটিল ও বিচ্ছিন্ন রেখাগুলি মুছে দেন, যা আকস্মিক ও ক্ষণকালীন তাকে বিলীন করেন; আমাদের প্রণম্য যাঁরা তাঁদের একটি সংহত সম্পূর্ণ মূর্তি সংসারে চিরন্তন হয়ে থাকে। যাঁরা আমাদের কালে জীবিত তাঁদেরকেও এই ভাবে দেখবার প্রয়াসেই উৎসবের সার্থকতা।

আজকের দিনে ভারতবর্ষে যে রাষ্ট্রিক বিরোধ পরশুদিন হয়তো তা থাকবে না, সাময়িক অভিপ্রায়গুলি সময়ের স্রোতে কোথায় লুপ্ত হবে। ধরা যাক, আমাদের রাষ্ট্রিক সাধনা সফল হয়েছে, বাহিরের দিক থেকে চাইবার আর কিছুই নেই, ভারতবর্ষ মুক্তিলাভ করল— তৎসত্ত্বেও আজকের দিনের ইতিহাসের কোন্ আত্মপ্রকাশটি ধূলির আকর্ষণ বাঁচিয়ে উপরে মাথা তুলে থাকবে সেইটিই বিশেষ করে দেখবার যোগ্য। সেই দিক থেকে যখন দেখতে যাই তখন বুঝি, আজকের উৎসবে যাঁকে নিয়ে আমরা আনন্দ করছি তাঁর স্থান কোথায়, তাঁর বিশিষ্টতা কোন্‌খানে। কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনসিদ্ধির মূল্য আরোপ করে তাঁকে আমরা দেখব না, যে দৃঢ়শক্তির বলে তিনি আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রবল ভাবে সচেতন করেছেন সেই শক্তির মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করব। প্রচণ্ড এই শক্তি, সমস্ত দেশের বুকজোড়া জড়ত্বের জগদ্দল পাথরকে আজ নাড়িয়ে দিয়েছে; কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের যেন রূপান্তর জন্মান্তর ঘটে গেল। ইনি আসবার পূর্বে, দেশ ভয়ে আচ্ছন্ন, সংকোচে অভিভূত ছিল; কেবল ছিল অন্যের

অনুগ্রহের জন্য আবদার আবেদন, মজ্জায় মজ্জায় আপনার 'পরে আস্থাহীনতার দৈন্য।

ভারতবর্ষের বাহির থেকে যারা আগন্তুকমাত্র তাদেরই প্রভাব হবে বলশালী, দেশের ইতিহাস বেয়ে যুগপ্রবাহিত ভারতের প্রাণধারা চিত্তধারা সেইটেই হবে ম্লান, যেন সেইটেই আকস্মিক—এর চেয়ে দুর্গতির কথা আর কী হতে পারে। সেবার দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, দেশকে ঘনিষ্ঠ ভাবে উপলব্ধি করবার বাধা ঘটাতে যথার্থই আমরা পরবাসী হয়ে পড়েছি। শাসনকর্তাদের শিক্ষাপ্রণালী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, ওদের তলোয়ার বন্দুক নিয়ে, ভারতে ওরাই হল মুখ্য; আর আমরাই হলুম গৌণ—মোহাভিভূত মনে এই কথাটির স্বীকৃতি অল্প কাল পূর্বে পর্যন্ত আমাদের সকলকে তামসিকতায় জড়বুদ্ধি করে রেখেছিল। স্থানে স্থানে লোকমান্য তিলকের মতো জনকতক সাহসী পুরুষ জড়ত্বকে প্রাণপণে আঘাত করেছেন, এবং আত্ম-শ্রদ্ধার আদর্শকে জাগিয়ে তোলবার কাজে ব্রতী হয়েছেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এই আদর্শকে বিপুল ভাবে প্রবল প্রভাবে প্রয়োগ করলেন মহাত্মা গান্ধী। ভারতবর্ষের স্বকীয় প্রতিভাকে অন্তরে উপলব্ধি করে তিনি অসামান্য তপস্যার তেজে নূতন যুগগঠনের কাজে নামলেন। আমাদের দেশে আত্মপ্রকাশের ভয়হীন অভিযান এত দিনে যথোপযুক্ত রূপে আরম্ভ হল।

এত কাল আমাদের নিঃসাহসের উপরে দুর্গ বেঁধে বিদেশী বণিকরাজ সাম্রাজ্যিকতার ব্যাবসা চালিয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত ভালো করে দাঁড়াবার জায়গা পেত না যদি আমাদের দুর্বলতা তাকে আশ্রয় না দিত। পরাভবের সবচেয়ে বড়ো উপাদান আমরা নিজের ভিতর থেকেই জুগিয়েছি। এই আমাদের আত্মকৃত পরাভব থেকে মুক্তি দিলেন মহাত্মাজি; নববীর্যের অনুভূতির বন্যাধারা ভারতবর্ষে প্রবাহিত করলেন। এখন শাসনকর্তারা উদ্যত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে রফা-নিষ্পত্তি করতে; কেননা তাঁদের পরশাসনতন্ত্রের গভীরতর ভিত্তি টলেছে, যে ভিত্তি আমাদের বীর্যহীনতায়। আমরা অনায়াসে আজ জগৎসমাজে আমাদের স্থান দাবি করছি।

তাই আজ আমাদের জানতে হবে, যে মানুষ বিলেতে গিয়ে রাউন্ড্ টেবল্ কন্‌ফারেন্সে তর্কযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, যিনি খদ্দর চরকা প্রচার করেন, যিনি প্রচলিত চিকিৎসাশাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রপাতিতে বিশ্বাস করেন বা করেন না—এই-সব মতামত ও কর্মপ্রণালীর মধ্যে যেন এই মহাপুরুষকে সীমাবদ্ধ করে না দেখি। সাময়িক যে-সব ব্যাপারে তিনি জড়িত তাতে তাঁর ত্রুটিও ঘটতে পারে, তা নিয়ে তর্কও চলতে পারে—কিন্তু, এহ বাহ্য। তিনি নিজে বারংবার স্বীকার করেছেন, তাঁর ভ্রান্তি হয়েছে; কালের পরিবর্তনে তাঁকে মত বদলাতে হয়েছে। কিন্তু এই-যে অবিচলিত নিষ্ঠা যা তাঁর সমস্ত জীবনকে অচলপ্রতিষ্ঠ করে তুলেছে এই-যে অপরাজেয় সংকল্পশক্তি, এ তাঁর সহজাত, কর্ণের সহজাত কবচের মতো—এই শক্তির প্রকাশ মানুষের ইতিহাসে চিরস্থায়ী সম্পদ। প্রয়োজনের সংসারে নিত্য-পরিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে, কিন্তু সকল প্রয়োজনকে অতিক্রম করে যে মহাজীবনের মহিমা আজ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হল তাকেই যেন আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখি।

মহাত্মাজির জীবনের এই তেজ আজ সমগ্র দেশে সঞ্চারিত হয়েছে, আমাদের ম্লানতা মার্জনা করে দিচ্ছে। তাঁর এই তেজোদ্দীপ্ত সাধকের মূর্তিই মহাকালের আসনকে অধিকার করে আছেন। বাধা-বিপত্তিকে তিনি মানেন নি, নিজের ভ্রমে

তাঁকে খর্ব করে নি, সাময়িক উত্তেজনার ভিতরে থেকেও তার ঊর্ধ্বে তাঁর মন অপ্রমত্ত। এই বিপুল চরিত্রশক্তির আধার যিনি তাঁকেই আজ তাঁর জন্মদিনে আমরা নমস্কার করি।

পরিশেষে আমার বলবার কথা এই যে, পূর্বপুরুষের পুনরাবৃত্তি করা মনুষ্যধর্ম নয়। জীবজন্তু তাদের জীর্ণ অভ্যাসের বাসাকে আঁকড়ে ধরে থাকে; মানুষ যুগে যুগে নব নব সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করে, পুরাতন সংস্কারে কোনো দিন তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। মহাত্মাজি ভারতবর্ষের বহুযুগব্যাপী অন্ধতা মূঢ় আচারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ এক দিক থেকে জাগিয়ে তুলেছেন, আমাদের সাধনা হোক সকল দিক থেকেই তাকে প্রবল করে তোলা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, মূঢ় সংস্কারের আবর্তে যত দিন আমরা চালিত হতে থাকব তত দিন কার সাধ্য আমাদের মুক্তি দেয়। কেবল ভোটের সংখ্যা এবং পরস্পরের স্বত্বের চুলচেরা হিসাব গণনা করে কোনো জাত দুর্গতি থেকে উদ্ধার পায় না। যে জাতির সামাজিক ভিত্তি বাধায় বিরোধে শতছিদ্র হয়ে আছে, যারা পঞ্জিকায় ঝুড়ি ঝুড়ি আবর্জনা বহন করে বেড়ায়, বিচারশক্তিহীন মূঢ় চিত্তে বিশেষ ক্ষণের বিশেষ জলে পুরুষানুক্রমিক পাপক্ষালন করতে ছোটে, যারা আত্মবুদ্ধি-আত্মশক্তির অবমাননাকে আপ্তবাক্যের নাম দিয়ে আদরে পোষণ করছে, তারা কখনও এমন সাধনাকে স্থায়ী ও গভীর ভাবে বহন করতে পারে না যে সাধনায় অন্তরে বাহিরে পরদাসত্বের বন্ধন ছেদন করতে পারে, যার দ্বারা স্বাধীনতার দুরূহ দায়িত্বকে সকল শত্রুর হাত থেকে দৃঢ় শক্তিতে রক্ষা করতে পারে। মনে রাখা চাই, বাহিরের শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে তেমন বীর্যের দরকার হয় না, আপন অন্তরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করাতেই মনুষ্যত্বের চরম পরীক্ষা। আজ যাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করছি এই পরীক্ষায় তিনি জয়ী হয়েছেন; তাঁর কাছ থেকে সেই দুরূহ সংগ্রামে জয়ী হবার সাধনা যদি দেশ গ্রহণ না করে তবে আজ আমাদের প্রশংসাবাক্য, উৎসবের আয়োজন, সম্পূর্ণই ব্যর্থ হবে। আমাদের সাধনা আজ আরম্ভ হল মাত্র। দুর্গম পথ আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে।

শান্তিনিকেতন
১৫ আশ্বিন ১৩৩৮

চৌঠা আশ্বিন

সূর্যের পূর্ণগ্রাসের লগ্নে অন্ধকার যেমন ক্রমে ক্রমে দিনকে আচ্ছন্ন করে তেমনি আজ মৃত্যুর ছায়া সমস্ত দেশকে আবৃত করছে। এমন সর্বদেশব্যাপী উৎকণ্ঠা ভারতের ইতিহাসে ঘটে নি, পরম শোকে এই আমাদের মহৎসান্ত্বনা। দেশের আপামর সাধারণকে আজকের দিনের বেদনা স্পর্শ করেছে। যিনি সুদীর্ঘকাল দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশকে যথার্থ ভাবে, গভীর ভাবে, আপন করে নিয়েছেন, সেই মহাত্মা আজ আমাদের সকলের হয়ে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করলেন।

দেশকে অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত নিয়ে যারা বাহুবলে অধিকার করে, যত বড়ো হোক-না তাদের প্রতাপ, যেখানে দেশের প্রাণবান সত্তা সেখানে তাদের প্রবেশ

অবরুদ্ধ। দেশের অন্তরে সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমি জয় করবে এমন শক্তি নেই তাদের। অস্ত্রের জোরে ভারতবর্ষকে অধিকার করেছে কত বিদেশী কতবার। মাটিতে রোপণ করেছে তাদের পতাকা, আবার সে পতাকা মাটিতে পড়ে ধুলো হয়ে গেছে।

অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটাবেড়া দিয়ে যারা বিদেশে আপন স্বত্বকে স্থায়ী করবার দুরাশা মনে লালন করে, একদিন কালের আহ্বানে যে মুহূর্তে তারা নেপথ্যে সরে দাঁড়ায়, তখনই ইঁটকাঠের ভগ্নস্তূপে পুঞ্জীভূত হয় তাদের কীর্তির আবর্জনা। আর যাঁরা সত্যের বলে বিজয়ী তাঁদের আধিপত্য তাঁদের আয়ুকে অতিক্রম করে দেশের মর্মস্থানে বিরাজ করে।

*

দেশের সমগ্র চিত্তে যাঁর এই অধিকার তিনি সমস্ত দেশের হয়ে আজ আরও একটি জয়যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, চরম আত্মোৎসর্গের পথে। কোন্ দুরূহ বাধা তিনি দূর করতে চান, যার জন্যে তিনি এত বড়ো মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হলেন না, সেই কথাটি আজ আমাদের স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করবার দিন।

আমাদের দেশে একটি ভয়ের কারণ আছে। যে পদার্থ মানসিক তাকে আমরা বাহ্যিক দক্ষিণা দিয়ে সুলভ সম্মানে বিদায় করি। চিহ্নকে বড়ো করে তুলে সত্যকে খর্ব করে থাকি। আজ দেশনেতারা স্থির করেছেন যে দেশের লোকেরা উপবাস করবে। আমি বলি, এতে দোষ নেই, কিন্তু ভয় হয় : মহাত্মাজি যে প্রাণপণ মূল্যের বিনিময়ে সত্যকে লাভ করবার চেষ্টা করছেন তার তুলনায় আমাদের কৃত্য নিতান্ত লঘু এবং বাহ্যিক হয়ে পাছে লজ্জা বাড়িয়ে তোলে। হৃদয়ের আবেগকে কোনো একটা অস্থায়ী দিনের সামান্য দুঃখের লক্ষণে ক্ষীণ রেখায় চিহ্নিত করে কর্তব্য মিটিয়ে দেবার মতো দুর্ঘটনা যেন না ঘটে।

আমরা উপবাসের অনুষ্ঠান করব, কেননা মহাত্মাজি উপবাস করতে বসেছেন— এই দুটোকে কোনো অংশেই যেন একত্রে তুলনা করবার মূঢ়তা কারও মনে না আসে। এ দুটো একেবারেই এক জিনিস নয়। তাঁর উপবাস, সে তো অনুষ্ঠান নয়, সে একটি বাণী, চরম ভাষার বাণী। মৃত্যু তাঁর সেই বাণীকে সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে, বিশ্বের কাছে, ঘোষণা করবে চিরকালের মতো। সেই বাণীকেই যদি গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য হয় তবে তা যথোচিত ভাবে করতে হবে। তপস্যার সত্যকে তপস্যার দ্বারাই অন্তরে গ্রহণ করা চাই।

আজ তিনি কী বলছেন সেটা চিন্তা করে দেখো। পৃথিবীময় মানব-ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকে দেখি এক দল মানুষ আর-এক দলকে নিচে ফেলে তার উপর দাঁড়িয়ে নিজের উন্নতি প্রচার করে। আপন দলের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে অন্য দলের দাসত্বের উপরে। মানুষ দীর্ঘ কাল ধরে এই কাজ করে এসেছে। কিন্তু তবু বলব এটা অমানুষিক। তাই দাসনির্ভরতার ভিত্তির উপরে মানুষের ঐশ্বর্য স্থায়ী হতে পারে না। এতে কেবল যে দাসেদের দুর্গতি হয় তা নয়, প্রভুদেরও এতে বিনাশ ঘটায়। যাদের আমরা অপমানিত করে পায়ের তলায় ফেলি তারাই আমাদের সম্মুখপথে পদক্ষেপের বাধা। তারা গুরুভারে আমাদের নিচের দিকে টেনে রাখে। যাদের আমরা হীন করি তারা ক্রমশই আমাদের হেয় করে। মানুষ-খেগো সভ্যতা রোগে জীর্ণ হবে, মরবে। মানুষের দেবতার এই বিধান। ভারতবর্ষে মানুষোচিত সম্মান থেকে যাদের আমরা বঞ্চিত করেছি তাদের অগৌরবে আমরা সমস্ত ভারতবর্ষের অগৌরব ঘটিয়েছি।

আজ ভারতে কত সহস্র লোক কারাগারে রুদ্ধ, বন্দী। মানুষ হয়ে পশুর মতো তারা পীড়িত, অবমানিত। মানুষের এই পুঞ্জীভূত অবমাননা সমস্ত

রাজ্যশাসনতন্ত্রকে অপমানিত করছে, তাকে গুরুভারে দুরূহ করছে। তেমনি আমরাও অসম্মানের বেড়ার মধ্যে বন্দী করে রেখেছি সমাজের বৃহৎ এক দলকে। তাদের হীনতার ভার বহন করে আমরা এগোতে পারছি নে। বন্দীদশা শুধু তো কারাপ্রাচীরের মধ্যে নয়। মানুষের অধিকার-সংক্ষেপ করাই তো বন্ধন। সম্মানের খর্বতার মতো কারাগার তো নেই। ভারতবর্ষে সেই সামাজিক কারাগারকে আমরা খণ্ডে খণ্ডে বড়ো করেছি। এই বন্দীর দেশে আমরা মুক্তি পাব কী করে। যারা মুক্তি দেয় তারাই তো মুক্ত হয়।

এত দিন এইভাবে চলছিল; ভালো করে বুঝি নি আমরা কোথায় তলিয়ে ছিলাম। সহসা ভারতবর্ষ আজ মুক্তির সাধনায় জেগে উঠল। পণ করলাম, চিরদিন বিদেশী শাসনে মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে রাখার এ ব্যবস্থা আর স্বীকার করব না। বিধাতা ঠিক সেই সময় দেখিয়ে দিলেন কোথায় আমাদের পরাভবের অন্ধকার গহ্বরগুলো। আজ ভারতে মুক্তিসাধনার তাপস যাঁরা তাঁদের সাধনা বাধা পেল তাদেরই কাছ থেকে যাদের আমরা অকিঞ্চিৎকর করে রেখেছি। যারা ছোটো হয়েছিল তারাই আজ বড়োকে করেছে অকৃতার্থ। তুচ্ছ বলে যাদের আমরা মেরেছি তারাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মার মারছে।

এক ব্যক্তির সঙ্গে আর-এক ব্যক্তির শক্তির স্বাভাবিক উচ্চনীচতা আছে। জাতিবিশেষের মধ্যেও তেমন দেখা যায়। উন্নতির পথে সকলে সমান দূর এগোতে পারে নি। সেইটেকে উপলক্ষ্য করে সেই পশ্চাদ্‌বর্তীদেরকে অপমানের দুর্লঙ্ঘ্য বেড়া তুলে দিয়ে স্থায়ী ভাবে যখনই পিছিয়ে রাখা যায় তখনই পাপ জমা হয়ে ওঠে। তখনই অপমানবিষ দেশের এক অঙ্গ থেকে সর্ব অঙ্গে সঞ্চারিত হতে থাকে। এমনি করে মানুষের সম্মান থেকে যাদের নির্বাসিত করে দিলুম তাদের আমরা হারালুম। আমাদের দুর্বলতা ঘটল সেইখানেই, সেইখানেই শনির রন্ধ্র। এই রন্ধ্র দিয়েই ভারতবর্ষের পরাভব তাকে বারে বারে নত করে দিয়েছে। তার ভিতের গাঁথুনি আল্‌গা, আঘাত পাবা মাত্র ভেঙে ভেঙে পড়েছে। কালক্রমে যে ভেদ দূর হতে পারত তাকে আমরা চেষ্টা করে, সমাজরীতির দোহাই দিয়ে, স্থায়ী করে তুলেছি। আমাদের রাষ্ট্রিক মুক্তিসাধনা কেবলই ব্যর্থ হচ্ছে এই ভেদবুদ্ধির অভিশাপে।

যেখানেই এক দলের অসম্মানের উপর আর-এক দলের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেইখানেই ভারসামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে বিপদ ঘটে। এর থেকেই বোঝা যায়, সাম্যই মানুষের মূলগত ধর্ম। য়ুরোপে এক রাষ্ট্রজাতির মধ্যে অন্য ভেদ যদি বা না থাকে, শ্রেণীভেদ আছে। শ্রেণীভেদে সম্মান ও সম্পদের পরিবেষণ সমান হয় না। সেখানে তাই ধনিকের সঙ্গে কর্মিকের অবস্থা যতই অসমান হয়ে উঠছে ততই সমাজ টলমল করছে। এই অসাম্যের ভারে সেখানকার সমাজব্যবস্থা প্রত্যহই পীড়িত হচ্ছে। যদি সহজে সাম্য স্থাপন হয় তবেই রক্ষা, নইলে নিষ্কৃতি নেই। মানুষ যেখানেই মানুষকে পীড়িত করবে সেখানেই তার সমগ্র মনুষ্যত্ব আহত হবেই; সেই আঘাত মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যায়।

সমাজের মধ্যেকার এই অসাম্য, এই অসম্মানের দিকে, মহাত্মাজি অনেক দিন থেকে আমাদের লক্ষ্য নির্দেশ করেছেন। তবুও তেমন একান্ত চেষ্টায় এই দিকে আমাদের সংস্কারকার্য প্রবর্তিত হয় নি। চরখা ও খদ্দরের দিকে আমরা মন দিয়েছি, আর্থিক দুর্গতির দিকে দৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু সামাজিক পাপের দিকে নয়। সেইজন্যেই আজ এই দুঃখের দিন এল। আর্থিক দুঃখ অনেকটা এসেছে বাইরে থেকে, তাকে ঠেকানো একান্ত কঠিন না হতে পারে। কিন্তু যে সামাজিক

পাপের উপর আমাদের সকল শত্রুর আশ্রয় তাকে উৎপাটন করতে আমাদের বাজে, কেননা তার উপরে আমাদের মমত্ব। সেই প্রশ্রয়প্রাপ্ত পাপের বিরুদ্ধে আজ মহাত্মা চরম যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই রণক্ষেত্রে তাঁর দেহের অবসান ঘটতেও পারে। কিন্তু সেই লড়াইয়ের ভার তিনি আমাদের প্রত্যেককে দান করে যাবেন। যদি তাঁর হাত থেকে আজ আমরা সর্বান্তঃকরণে সেই দান গ্রহণ করতে পারি তবেই আজকের দিন সার্থক হবে। এত বড়ো আহ্বানের পরেও যারা একদিন উপবাস করে তার পরদিন হতে উদাসীন থাকবে, তারা দুঃখ থেকে যাবে দুঃখে, দুর্ভিক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষে। সামান্য কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা সত্যসাধনার অবমাননা যেন না করি।

মহাত্মাজির এই ব্রত আমাদের শাসনকর্তাদের সংকল্পকে কী পরিমাণে ও কী ভাবে আঘাত করবে জানি নে। আজ সেই পোলিটিকাল তর্ক-অবতারণার দিন নয়। কেবল একটা কথা বলা উচিত বলে বলব। দেখতে পাচ্ছি, মহাত্মাজির এই চরম উপায়-অবলম্বনের অর্থ অধিকাংশ ইংরেজ বুঝতে পারছেন না। না পারবার একটা কারণ এই যে, মহাত্মাজির ভাষা তাঁদের ভাষা নয়। আমাদের সমাজের মধ্যে সাংঘাতিক বিচ্ছেদ ঘটাবার বিরুদ্ধে মহাত্মাজির এই প্রাণপণ প্রয়াস তাঁদের প্রয়াসের প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে মেলে না বলেই এটাকে এত অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। একটা কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি— আয়ার্লণ্ড্ যখন ব্রিটিশ ঐক্যবন্ধন থেকে স্বতন্ত্র হবার চেষ্টা করেছিল তখন কী বীভৎস ব্যাপার ঘটেছিল। কত রক্তপাত, কত অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। পলিটিক্‌সে এই হিংস্র পদ্ধতিই পশ্চিম-মহাদেশে অভ্যস্ত। সেই কারণে আয়ার্লণ্ডে রাষ্ট্রিক প্রয়াসের এই রক্তাক্ত মূর্তি তো কারও কাছে, অন্তত অধিকাংশ লোকের কাছে, আর যাই হোক, অদ্ভুত বলে মনে হয় নি। কিন্তু অদ্ভুত মনে হচ্ছে মহাত্মাজির অহিংস্র আত্মত্যাগী প্রয়াসের শান্ত মূর্তি। ভারতবর্ষের অবমানিত জাতির প্রতি মহাত্মাজির মমতা নেই, এত বড়ো অমূলক কথা মনে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়েছে তার কারণ এই যে, এই ব্যাপারে তিনি আমাদের রাজসিংহাসনের উপর সংকটের ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। রাজপুরুষদের মন বিকল হয়েছে বলেই এমন কথা তাঁরা কল্পনা করতে পেরেছেন। এ কথা বুঝতে পারেন নি, রাষ্ট্রিক অস্ত্রাঘাতে হিন্দুসমাজকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখা হিন্দুর পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে কম বিপদের নয়। একদা বাহির থেকে কোনো তৃতীয় পক্ষ এসে যদি ইংলণ্ডে প্রটেস্টাণ্ট্ ও রোমান-ক্যাথলিকদের এই ভাবে সম্পূর্ণ বিভক্ত করে দিত তা হলে সেখানে একটা নরহত্যার ব্যাপার ঘটা অসম্ভব ছিল না। এখানে হিন্দু-সমাজের পরম সংকটের সময় মহাত্মাজির দ্বারা সেই বহুপ্রাণঘাতক যুদ্ধের ভাষান্তর ঘটেছে মাত্র। প্রটেস্টাণ্ট্ ও রোমান-ক্যাথলিকদের মধ্যে বহুদীর্ঘকাল যে অধিকারভেদ চলে এসেছিল, সমাজই আজ স্বয়ং তার সমাধান করেছে; সেজন্য তুর্কির বাদশাকে ডাকে নি। আমাদের দেশের সামাজিক সমস্যা সমাধানের ভার আমাদের 'পরেই থাকার প্রয়োজন ছিল।

রাষ্ট্রব্যাপারে মহাত্মাজি যে অহিংস্রনীতি এতকাল প্রচার করেছেন আজ তিনি সেই নীতি নিজের প্রাণ দিয়ে সমর্থন করতে উদ্যত, এ কথা বোঝা অত্যন্ত কঠিন বলে আমি মনে করি নে।

শান্তিনিকেতন
৪ আশ্বিন ১৩৩৯

মহাত্মাজির পুণ্যব্রত

যুগে যুগে দৈবাৎ এই সংসারে মহাপুরুষের আগমন হয়। সব সময় তাঁদের দেখা পাই নে। যখন পাই সে আমাদের সৌভাগ্য। আজকের দিনে দুঃখের অন্ত নেই; কত পীড়ন, কত দৈন্য, কত রোগ শোক তাপ আমরা নিত্য ভোগ করছি; দুঃখ জমে উঠেছে রাশি রাশি। তবু সব দুঃখকে ছাড়িয়ে গেছে আজ এক আনন্দ। যে মাটিতে আমরা বেঁচে আছি, সঞ্চরণ করছি, সেই মাটিতেই একজন মহাপুরুষ, যাঁর তুলনা নেই, তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন।

যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা যখন আসেন, আমরা ভালো করে চিনতে পারি নে তাঁদের। কেননা, আমাদের মন ভীরু, অস্বচ্ছ, স্বভাব শিথিল, অভ্যাস দুর্বল। মনেতে সেই সহজ শক্তি নেই যাতে করে মহৎকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারি, গ্রহণ করতে পারি। বারে বারে এমন ঘটেছে, যাঁরা সকলের বড়ো তাঁদেরই সকলের চেয়ে দূরে ফেলে রেখেছি।

যাঁরা জ্ঞানী, গুণী, কঠোর তপস্বী, তাঁদের বোঝা সহজ নয়; কেননা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি সংস্কার তাঁদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে কঠিন লাগে না, সেটা ভালোবাসা। যে মহাপুরুষ ভালোবাসা দিয়ে নিজের পরিচয় দেন, তাঁকে আমাদের ভালোবাসায় আমরা একরকম করে বুঝতে পারি। সেজন্যে ভারতবর্ষে এই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল যে, এবার বুঝেছি। এমনটি সচরাচর ঘটে না। যিনি আমাদের মধ্যে এসেছেন তিনি অত্যন্ত উচ্চ, অত্যন্ত মহৎ। তবু তাঁকে স্বীকার করেছি, তাঁকে জেনেছি। সকলে বুঝেছে 'তিনি আমার'। তাঁর ভালোবাসায় উচ্চ-নীচের ভেদ নেই, মূর্খ-বিদ্বানের ভেদ নেই, ধনী-দরিদ্রের ভেদ নেই। তিনি বিতরণ করেছেন সকলের মধ্যে সমান ভাবে তাঁর ভালোবাসা। তিনি বলেছেন, সকলের কল্যাণ হোক, সকলের মঙ্গল হোক। যা বলেছেন, শুধু কথায় নয়, বলেছেন দুঃখের বেদনায়। কত পীড়া, কত অপমান তিনি সয়েছেন। তাঁর জীবনের ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস। দুঃখ অপমান ভোগ করেছেন কেবল ভারতবর্ষে নয়, দক্ষিণ-আফ্রিকায় কত মার তাঁকে মৃত্যুর ধারে এনে ফেলেছে। তাঁর দুঃখ নিজের বিষয়সুখের জন্যে নয়, স্বার্থের জন্যে নয়, সকলের ভালোর জন্যে। এই-যে এত মার খেয়েছেন, উল্টে কিছু বলেন নি কখনও, রাগ করেন নি। সমস্ত আঘাত মাথা পেতে নিয়েছেন। শত্রুরা আশ্চর্য হয়ে গেছে ধৈর্য দেখে, মহত্ত্ব দেখে। তাঁর সংকল্প সিদ্ধ হল, কিন্তু জোর-জবরদস্তিতে নয়। ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা তিনি জয়ী হয়েছেন। সেই তিনি আজ ভারতবর্ষের দুঃখের বোঝা নিজের দুঃখের বেগে ঠেলবার জন্যে দেখা দিয়েছেন।

তোমরা সকলে তাঁকে দেখেছ কি না জানি না। কারও কারও হয়তো তাঁকে দেখার সৌভাগ্য ঘটেছে। কিন্তু তাঁকে জান সকলেই, সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁকে জানে। সবাই জান, সমস্ত ভারতবর্ষ কিরকম করে তাঁকে ভক্তি দিয়েছে; একটি নাম দিয়েছে— মহাত্মা। আশ্চর্য, কেমন করে চিনলে। মহাত্মা অনেককেই বলা হয়, তার কোনো মানে নেই। কিন্তু এই মহাপুরুষকে যে মহাত্মা বলা হয়েছে, তার মানে আছে। যাঁর আত্মা বড়ো, তিনিই মহাত্মা। যাদের আত্মা ছোটো, বিষয়ে বদ্ধ, টাকাকড়ি-ঘরসংসারের চিন্তায় যাদের মন আচ্ছন্ন, তারা দীনাত্মা। মহাত্মা তিনিই, সকলের সুখ দুঃখ যিনি আপনার করে নিয়েছেন, সকলের ভালোকে যিনি আপনার

ভালো বলে জানেন। কেননা, সকলের হৃদয়ে তাঁর স্থান, তাঁর হৃদয়ে সকলের স্থান। আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে বলে মহাত্মা, মর্ত্যলোকে সেই দিব্য ভালোবাসা সেই প্রেমের ঐশ্বর্য দৈবাৎ মেলে। সেই প্রেম যাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁকে আমরা মোটের উপর এই বলে বুঝেছি যে, তিনি হৃদয় দিয়ে সকলকে ভালোবেসেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝতে পারি না, ভালো করে চিনতে একটু বাধা লাগে। বাঁকা হয়ে গেছে আমাদের মন। সত্যকে স্বীকার করতে ভীরুতা দ্বিধা সংশয় আমাদের জাগে। বিনা ক্লেশে যা মানতে পারি তাই মানি, কঠিনটাকে সরিয়ে রেখে দিই এক পাশে। তাঁর সকলের চেয়ে বড়ো সত্যটাকে নিতে পারলুম না। এইখানেই তাঁকে মারলুম। তিনি এসেছেন, ফিরে গেলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিতে পারলুম না।

খৃস্টানশাস্ত্রে পড়েছি, আচারনিষ্ঠ য়িহুদিরা যিশুখৃস্টকে শত্রু বলে মেরেছিল। কিন্তু মার কি শুধু দেহের। যিনি প্রাণ দিয়ে কল্যাণের পথ খুলে দিতে আসেন, সেই পথকে বাধাগ্রস্ত করা সেও কি মার নয়। সকলের চেয়ে বড়ো মার সেই। কী অসহ্য বেদনা অনুভব করে তিনি আজকের দিনে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করেছেন। সেই ব্রতকে যদি আমরা স্বীকার করে না নিই, তবে কি তাঁকে আমরা মারলুম না। আমাদের ছোটো মনের সংকোচ, ভীরুতা, আজ লজ্জা পাবে না? আমরা কি তাঁর সেই বেদনাকে মর্মের মধ্যে ঠিক জায়গায় অনুভব করতে পারব না। গ্রহণ করতে পারব না তাঁর দান? এত সংকোচ, এত ভীরুতা আমাদের? সে ভীরুতার দৃষ্টান্ত তো তাঁর মধ্যে কোথাও নেই। সাহসের অন্ত নেই তাঁর; মৃত্যুকে তিনি তুচ্ছ করেছেন। কঠিন কারাগার, তার সমস্ত লোহার শিকল নিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে ঠেকাতে পারে নি। সেই তিনি এসেছেন আজ আমাদের মাঝখানে। আমরা যদি ভয়ে পিছিয়ে পড়ি, তবে লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকবে না। তিনি আজ মৃত্যুব্রত গ্রহণ করেছেন ছোটো-বড়োকে এক করবার জন্যে। তাঁর সেই সাহস, তাঁর সেই শক্তি, আসুক আমাদের বুদ্ধিতে, আমাদের কাজে। আমরা যেন আজ গলা ছেড়ে বলতে পারি, 'তুমি যেয়ো না, আমরা গ্রহণ করলাম তোমার ব্রত।' তা যদি না পারি, এত বড়ো জীবনকে যদি ব্যর্থ হতে দিই, তবে তার চেয়ে বড়ো সর্বনাশ আর কী হতে পারে।

আমরা এই কথাই বলে থাকি যে, বিদেশীরা আমাদের শত্রুতা করছে। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো শত্রু আছে আমাদের মজ্জার মধ্যে, সে আমাদের ভীরুতা। সেই ভীরুতাকে জয় করার জন্যে বিধাতা আমাদের শক্তি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে; তিনি আপন অভয় দিয়ে আমাদের ভয় হরণ করতে এসেছেন। সেই তাঁর দান-সুদ্ধ তাঁকে আজ কি আমরা ফিরিয়ে দেব। এই কৌপীনধারী আমাদের দ্বারে দ্বারে আঘাত করে ফিরেছেন, তিনি আমাদের সাবধান করেছেন কোন্‌খানে আমাদের বিপদ। মানুষ যেখানে মানুষের অপমান করে, মানুষের ভগবান সেইখানেই বিমুখ। শত শত বছর ধরে মানুষের প্রতি অপমানের বিষ আমরা বইয়ে দিয়েছি ভারতবর্ষের নাড়ীতে নাড়ীতে। হীনতার অসহ্য বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি শত শত নত মস্তকের উপরে; তারই ভারে সমস্ত দেশ আজ ক্লান্ত, দুর্বল। সেই পাপে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি নে। আমাদের চলবার রাস্তায় পদে পদে পঙ্ককুণ্ড তৈরি করে রেখেছি; আমাদের সৌভাগ্যের অনেকখানি তলিয়ে যাচ্ছে তারই মধ্যে। এক ভাই আর-এক ভাইয়ের কপালে স্বহস্তে কলঙ্ক লেপে দিয়েছে, মহাত্মা সইতে পারেন নি এই পাপ।

সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে শোনো তাঁর বাণী। অনুভব করো, কী প্রচণ্ড তাঁর

সংকল্পের জোর। আজ তপস্বী উপবাস আরম্ভ করেছেন, দিনের পর দিন তিনি অন্ন নেবেন না। তোমরা দেবে না তাঁকে অন্ন? তাঁর বাণীকে গ্রহণ করাই তাঁর অন্ন, তাই দিয়ে তাঁকে বাঁচাতে হবে। অপরাধ অনেক করেছি, পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবহার করেছি দাসের মতো, পশুর মতো। সেই অপমানে সমস্ত পৃথিবীর কাছে ছোটো করে রেখেছে আমাদের। যদি তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতাম তা হলে আজ এত দুর্গতি হত না আমাদের। পৃথিবীর অন্য-সব সমাজকে লোকে সম্মান করে, ভয় করে, কেননা তারা পরস্পর ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ। আমাদের এই হিন্দুসমাজকে আঘাত করতে, অপমান করতে, কারও মনে ভয় নেই, বার বার তার প্রমাণ পাই। কিসের জোরে তাদের এই স্পর্ধা সে কথাটা যেন এক মুহূর্ত না ভুলি।

যে সম্মান মহাত্মাজি সবাইকে দিতে চেয়েছেন, সে সম্মান আমরা সকলকে দেব। যে পারবে না দিতে, ধিক্ তাকে। ভাইকে ভাই বলে গ্রহণ করতে বাধা দেয় যে সমাজ, ধিক্ সেই জীর্ণ সমাজকে। সব চেয়ে বড়ো ভীরুতা তখনই প্রকাশ পায় যখন সত্যকে চিনতে পেরেও মানতে পারি নে। সে ভীরুতার ক্ষমা নেই।

অভিশাপ অনেক দিন থেকে আছে দেশের উপর। সেইজন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেছেন একজন। সেই প্রায়শ্চিত্তে সকলকে মিলতে হবে, সেই মিলনেই আমাদের চিরমিলন শুরু হবে। মৃত্যুর বৃহৎ পাত্রে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত তিনি আমাদের সকলের সামনে ধরলেন, এগিয়ে দিলেন আমাদের হাতের কাছে। গ্রহণ করো সকলে, ক্ষালন করো পাপ। মঙ্গল হবে। তাঁর শেষ কথা আজ আমি তোমাদের শোনাতে এসেছি। তিনি দূরে আছেন, কিন্তু তিনি দূরে নেই। তিনি আমাদের অন্তরেই আছেন। যদি জীবন দিতে হয় তাঁকে আমাদের জন্যে তবে অন্ত থাকবে না পরিতাপের।

মাথা হেঁট হয়ে যাবে আমাদের। তিনি আমাদের কাছে যা চেয়েছেন, তা দুরূহ, দুঃসাধ্য ব্রত। কিন্তু তার চেয়ে দুঃসাধ্য কাজ তিনি করেছেন, তার চেয়ে কঠিন ব্রত তাঁর। সাহসের সঙ্গে যেন গ্রহণ করতে পারি তাঁর দেওয়া ব্রত। যাকে আমরা ভয় করছি সে কিছুই নয়। সে মায়া, মিথ্যা। সে সত্য নয়; মানব না আমরা তাকে। বলো আজ সবাই মিলে, আমরা মানব না সেই মিথ্যাকে। বলো, আজ সমস্ত হৃদয় দিয়ে বলো, ভয় কিসের। তিনি সমস্ত ভয় হরণ করে বসে আছেন। মৃত্যুভয়কে জয় করেছেন। কোনো ভয় যেন আজ থাকে না আমাদের। লোকভয়, রাজভয়, সমাজভয়, কিছুতেই যেন সংকুচিত না হই আমরা। তাঁর পথে তাঁরই অনুবর্তী হয়ে চলব, পরাভব ঘটতে দেব না তাঁর। সমস্ত পৃথিবী আজ তাকিয়ে আছে। যাদের মনে দরদ নেই তারা উপহাস করছে। এত বড়ো ব্যাপারটা সত্যই উপহাসের বিষয় হবে, যদি আমাদের উপরে কোনো ফল না হয়। সমস্ত পৃথিবী আজ বিস্মিত হবে, যদি তাঁর শক্তির আগুন আমাদের সকলের মনের মধ্যে জ্বলে ওঠে; যদি সবাই বলতে পারি, 'জয় হোক তপস্বী, তোমার তপস্যা সার্থক হোক।' এই জয়ধ্বনি সমুদ্রের এক পার থেকে পৌঁছবে আর-এক পারে; সকলে বলবে, সত্যের বাণী অমোঘ। ধন্য হবে ভারতবর্ষ। আজকের দিনেও এত বড়ো সার্থকতায় যে বাধা দেবে সে অত্যন্ত হেয়; তাকে তোমরা ভয়ে যদি মান তবে তার চেয়ে হেয় হবে তোমরা।

জয় হোক সেই তপস্বীর যিনি এই মুহূর্তে বসে আছেন মৃত্যুকে সামনে নিয়ে, ভগবানকে অন্তরে বসিয়ে, সমস্ত হৃদয়ের প্রেমকে উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে।

তোমরা জয়ধ্বনি করো তাঁর, তোমাদের কণ্ঠস্বর পৌঁছক তাঁর আসনের কাছে। বলো, 'তোমাকে গ্রহণ করলেম, তোমার সত্যকে স্বীকার করলেম।'

আমি কীই-বা বলতে পারি। আমার ভাষায় জোর কোথায়। তিনি যে-ভাষায় বলছেন সে কানে শোনবার নয়, সে প্রাণে শোনবার; মানুষের সেই চরম ভাষা, নিশ্চয়ই তোমাদের অন্তরে পৌঁচেছে।

আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য, পর যখন আপন হয়। সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ, আপন যখন পর হয়। ইচ্ছে করেই যাদের আমরা হারিয়েছি, ইচ্ছে করেই আজ তাদের ফিরে ডাকো; অপরাধের অবসান হোক, অমঙ্গল দূর হয়ে যাক। মানুষকে গৌরবদান করে মনুষ্যত্বের সগৌরব অধিকার লাভ করি।

শান্তিনিকেতন
৫ আশ্বিন ১৩৩৯

ব্রত উদ্‌যাপন

গভীর উদ্‌বেগের মধ্যে, মনে আশা নিয়ে, পুনা অভিমুখে যাত্রা করলেম। দীর্ঘ পথ, যেতে যেতে আশঙ্কা বেড়ে ওঠে, পৌঁছে কী দেখা যাবে। বড়ো স্টেশনে এলেই আমার সঙ্গী দুজনে খবরের কাগজ কিনে দেন, উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে দেখি। সুখবর নয়। ডাক্তারেরা বলছে, মহাত্মাজির শরীরের অবস্থা danger zoneএ পৌঁচেছে। দেহেতে মেদ বা মাংসের উদ্‌বৃত্ত এমন নেই যে দীর্ঘ কালের ক্ষয় সহ্য হয়, অবশেষে মাংসপেশী ক্ষয় হতে আরম্ভ করেছে। apoplexy হয়ে অকস্মাৎ প্রাণহানি ঘটতে পারে। সেই সঙ্গে কাগজে দেখছি, দিনের পর দিন দীর্ঘকাল ধরে জটিল সমস্যা নিয়ে তাঁকে স্বপক্ষ প্রতিপক্ষের সঙ্গে গুরুতর আলোচনা চালাতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হিন্দুসমাজের অন্তর্গত রূপেই অনুন্নত সমাজকে রাষ্ট্রনৈতিক বিশেষ অধিকার বিষয়ে দুই পক্ষকে তিনি রাজি করেছেন। দেহের সমস্ত যন্ত্রণা দুর্বলতাকে জয় করে তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন; এখন বিলেত হতে এই ব্যবস্থা মঞ্জুর হওয়ার উপর সব নির্ভর করছে। মঞ্জুর না হওয়ার কোনো সংগত কারণ থাকতে পারে না; কেননা প্রধান মন্ত্রীর কথাই ছিল, অনুন্নত সমাজের সঙ্গে একযোগে হিন্দুরা যে ব্যবস্থা মেনে নেবে তাকে তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য।

আশানৈরাশ্যে আন্দোলিত হয়ে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর প্রাতে আমরা কল্যাণ স্টেশনে পৌঁছলেম। সেখানে শ্রীমতী বাসন্তী ও শ্রীমতী ঊর্মিলার সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা অন্য গাড়িতে কলকাতা থেকে কিছু পূর্বে এসে পৌঁচেছেন। কালবিলম্ব না করে আমাদের ভাবী গৃহস্বামিনীর প্রেরিত মোটরগাড়িতে চড়ে পুনার পথে চললেম।

পুনার পার্বত্য পথ রমণীয়। পুরদ্বারে যখন পৌঁছলেম, তখন সামরিক অভ্যাসের পালা চলেছে—অনেকগুলি armoured car, machine gun, এবং পথে পথে সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ চোখে পড়ল। অবশেষে শ্রীযুক্ত বিঠলভাই থ্যাকার্‌সে মহাশয়ের প্রাসাদে গাড়ি থামল। তাঁর বিধবা পত্নী সৌম্যসহাস্য মুখে

আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে চললেন। সিঁড়ির দু পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা গান করে অভিনন্দন জানালেন।

গৃহে প্রবেশ করেই বুঝেছিলেম, গভীর একটি আশঙ্কায় হাওয়া ভারাক্রান্ত। সকলের মুখেই দুশ্চিন্তার ছায়া। প্রশ্ন করে জানলেম, মহাত্মাজির শরীরের অবস্থা সংকটাপন্ন। বিলাত হতে তখনও খবর আসে নি। প্রধান মন্ত্রীর নামে আমি একটি জরুরি তার পাঠিয়ে দিলেম।

দরকার ছিল না পাঠাবার। শীঘ্রই জনরব কানে এল, বিলাত থেকে সম্মতি এসেছে। কিন্তু জনরব সত্য কি না তার প্রমাণ পাওয়া গেল বহু ঘণ্টা পরে।

মহাত্মাজির মৌনাবলম্বনের দিন আজ। একটার পরে কথা বলবেন। তাঁর ইচ্ছা, সেই সময়ে আমি কাছে থাকি। পথে যেতে যারবেদা জেলের খানিক দূরে আমাদের মোটর গাড়ি আটকা পড়ল; ইংরেজ সৈনিক বললে, কোনো গাড়ি এগোতে দেবার হুকুম নেই। আজকের দিনে জেলখানায় প্রবেশের পথ ভারতবর্ষে প্রশস্ত বলেই তো জানি। গাড়ির চতুর্দিকে নানা লোকের ভিড় জমে উঠল।

আমাদের পক্ষ হতে লোক জেলের কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি নিতে খানিক এগিয়ে যেতেই শ্রীমান দেবদাস এসে উপস্থিত, জেল-প্রবেশের ছাড়পত্র তাঁর হাতে। পরে শুনলেম, মহাত্মাজি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। কেননা তাঁর হঠাৎ মনে হয়, পুলিস কোথাও আমাদের গাড়ি আটকেছে—যদিও তার কোনো সংবাদ তাঁর জানা ছিল না।

লোহার দরজা একটার পর একটা খুলল, আবার বন্ধ হয়ে গেল। সামনে দেখা যায় উঁচু দেয়ালের ঔদ্ধত্য, বন্দী আকাশ, সোজা-লাইন-করা বাঁধা রাস্তা, দুটো চারটে গাছ।

দুটো জিনিসের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে বিলম্বে ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট পেরিয়ে ঢুকেছি সম্প্রতি। জেলখানায় প্রবেশে আজ বাধা ঘটলেও অবশেষে এসে পৌঁছনো গেল।

বাঁ দিকে সিঁড়ি উঠে, দরজা পেরিয়ে, দেয়ালে-ঘেরা একটি অঙ্গনে প্রবেশ করলেম। দূরে দূরে দু-সারি ঘর। অঙ্গনে একটি ছোটো আমগাছের ঘনছায়ায় মহাত্মাজি শয্যাশায়ী।

মহাত্মাজি আমাকে দুই হাতে বুকের কাছে টেনে নিলেন, অনেক ক্ষণ রাখলেন। বললেন, কত আনন্দ হল।

শুভ সংবাদের জোয়ার বেয়ে এসেছি, এ জন্যে আমার ভাগ্যের প্রশংসা করলেম তাঁর কাছে। তখন বেলা দেড়টা। বিলাতের খবর ভারতময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে; রাজনৈতিকের দল তখন সিমলায় দলিল নিয়ে প্রকাশ্য সভায় আলোচনা করছিলেন, পরে শুনলেম। খবরের কাগজওয়ালারাও জেনেছে। কেবল যাঁর প্রাণের ধারা প্রতি মুহূর্তে শীর্ণ হয়ে মৃত্যুসীমায় সংলগ্নপ্রায় তাঁর প্রাণসংকট-মোচনের যথেষ্ট সত্বরতা নেই। অতি দীর্ঘ লাল ফিতের জটিল নির্মমতায় বিস্ময় অনুভব করলেম। সওয়া চারটে পর্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রতিক্ষণ বেড়ে চলতে লাগল। শুনতে পাই, দশটার সময় খবর পুনায় এসেছিল।

চতুর্দিকে বন্ধুরা রয়েছেন। মহাদেব, বল্লভভাই, রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এঁদের লক্ষ্য করলেম। শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ এবং সরোজিনীকে দেখলেম। জওহরলালের পত্নী কমলাও ছিলেন।

মহাত্মাজির স্বভাবতই শীর্ণ শরীর শীর্ণতম, কণ্ঠস্বর প্রায় শোনা যায় না।

জঠরে অম্ল জমে উঠেছে, তাই মধ্যে মধ্যে সোডা মিশিয়ে জল খাওয়ানো হচ্ছে। ডাক্তারদের দায়িত্ব অতিমাত্রায় পৌঁচেছে।

অথচ চিত্তশক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নি। চিন্তার ধারা প্রবহমান, চৈতন্য অপরিশ্রান্ত। প্রায়োপবেশনের পূর্ব হতেই কত দুরূহ ভাবনা, কত জটিল আলোচনায় তাঁকে নিয়ত ব্যাপৃত হতে হয়েছে। সমুদ্রপারের রাজনৈতিকদের সঙ্গে পত্রব্যবহারে মনের উপর কঠোর ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে। উপবাসকালে নানান দলের প্রবল দাবি তাঁর অবস্থার প্রতি মমতা করে নি, তা সকলেই জানেন। কিন্তু মানসিক জীর্ণতার কোনো চিহ্নই তো নেই। তাঁর চিন্তার স্বাভাবিক স্বচ্ছ প্রকাশধারায় আবিলতা ঘটে নি। শরীরের কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়েও আত্মার অপরাজিত উদ্যমের এই মূর্তি দেখে আশ্চর্য হতে হল। কাছে না এলে এমন করে উপলব্ধি করতেম না, কত প্রচণ্ড শক্তি এই ক্ষীণদেহ পুরুষের।

আজ ভারতবর্ষের কোটি প্রাণের মধ্যে পৌঁছল মৃত্যুর বেদীতল-শায়ী এই মহৎ প্রাণের বাণী। কোনো বাধা তাকে ঠেকাতে পারল না—দূরত্বের বাধা, ইঁটকাঠ-পাথরের বাধা, প্রতিকূল পলিটিক্‌সের বাধা। বহু শতাব্দীর জড়ত্বের বাধা আজ তার সামনে ধূলিসাৎ হল।

মহাদেব বললেন, আমার জন্যে মহাত্মাজি একান্তমনে অপেক্ষা করছিলেন। আমার উপস্থিতি দ্বারা রাষ্ট্রিক সমস্যার মীমাংসা-সাধনে সাহায্য করতে পারি এমন অভিজ্ঞতা আমার নেই। তাঁকে যে তৃপ্তি দিতে পেরেছি, এই আমার আনন্দ।

সকলে ভিড় করে দাঁড়ালে তাঁর পক্ষে কণ্টকর হবে মনে করে আমরা সরে গিয়ে বসলেম। দীর্ঘ কাল অপেক্ষা করছি কখন খবর এসে পৌঁছবে। অপরাহ্নের রৌদ্র আড় হয়ে পড়েছে ইঁটের প্রাচীরের উপর। এখানে ওখানে দু-চারজন শুভ্র-খদ্দর-পরিহিত পুরুষ নারী শান্ত ভাবে আলোচনা করছেন।

লক্ষ্য করবার বিষয়, কারাগারের মধ্যে এই জনতা। কারও ব্যবহারে প্রশ্রয়জনিত শৈথিল্য নেই। চরিত্রশক্তি বিশ্বাস আনে, জেলের কর্তৃপক্ষ তাই শ্রদ্ধা করেই এঁদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে মেলামেশা করতে দিতে পেরেছেন। এঁরা মহাত্মাজির প্রতিশ্রুতির প্রতিকূলে কোনো সুযোগ গ্রহণ করেন নি। আত্মমর্যাদার দৃঢ়তা এবং অচাঞ্চল্য এঁদের মধ্যে পরিস্ফুট। দেখলেই বোঝা যায়, ভারতের স্বরাজ্য-সাধনার যোগ্য সাধক এঁরা।

অবশেষে জেলের কর্তৃপক্ষ গবর্মেণ্টের ছাপ-মারা মোড়ক হাতে উপস্থিত হলেন। তাঁর মুখেও আনন্দের আভাস পেলুম। মহাত্মাজি গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেন। সরোজিনীকে বললেম, এখন ওঁর চার পাশ থেকে সকলের সরে যাওয়া উচিত। মহাত্মাজি পড়া শেষ করে বন্ধুদের ডাকলেন। শুনলেম, তিনি তাঁদের আলোচনা করে দেখতে বললেন। এবং নিজের তরফ থেকে জানালেন, কাগজটা ডাক্তার আম্বেদকরকে দেখানো দরকার; তাঁর সমর্থন পেলে তবেই তিনি নিশ্চিন্ত হবেন।

বন্ধুরা এক পাশে দাঁড়িয়ে চিঠিখানি পড়লেন। আমাকেও দেখালেন। রাষ্ট্র-বুদ্ধির রচনা সাবধানে লিখিত, সাবধানেই পড়তে হয়। বুঝলেম, মহাত্মাজির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ নয়। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর 'পরে ভার দেওয়া হল চিঠিখানার বক্তব্য বিশ্লেষণ করে মহাত্মাজিকে শোনাবেন। তাঁর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় মহাত্মাজির মনে আর কোনো সংশয় রইল না। প্রায়োপবেশনের ব্রত উদ্‌যাপন হল।

প্রাচীরের কাছে ছায়ায় মহাত্মাজির শয্যা সরিয়ে আনা হল। চতুর্দিকে জেলের কম্বল বিছিয়ে সকলে বসলেন। লেবুর রস প্রস্তুত করলেন শ্রীমতী কমলা নেহেরু। Inspector-General of Prisons— যিনি গবর্মেণ্টের পত্র নিয়ে এসেছেন— অনুরোধ করলেন, রস যেন মহাত্মাজিকে দেন শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ নিজের হাতে। মহাদেব বললেন 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো' গীতাঞ্জলির এই গানটি মহাত্মাজির প্রিয়। সুর ভুলে গিয়েছিলেম। তখনকার মতো সুর দিয়ে গাইতে হল। পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রী বেদ পাঠ করলেন। তার পর মহাত্মাজি শ্রীমতী কস্তুরীবাঈয়ের হাত হতে ধীরে ধীরে লেবুর রস পান করলেন। পরিশেষে সবরমতী-আশ্রমবাসিগণ এবং সমবেত সকলে 'বৈষ্ণব জন কো' গানটি গাইলেন। ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ হল, সকলে গ্রহণ করলেম।

জেলের অবরোধের ভিতর মহোৎসব। এমন ব্যাপার আর কখনও ঘটে নি। প্রাণোৎসর্গের যজ্ঞ হল জেলখানায়, তার সফলতা এইখানেই রূপ ধারণ করলে। মিলনের এই অকস্মাৎ আবির্ভূত অপরূপ মূর্তি, একে বলতে পারি যজ্ঞসম্ভবা।

রাত্রে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু প্রমুখ পুনার সমবেত বিশিষ্ট নেতারা এসে আমাকে ধরলেন, পরদিন মহাত্মাজির বার্ষিকী উৎসবসভায় আমাকে সভাপতি হতে হবে; মালব্যজিও বোম্বাই হতে আসবেন। মালব্যজিকেই সভাপতি করে আমি সামান্য দু-চার কথা লিখে পড়ব, এই প্রস্তাব করলেম। শরীরের দুর্বলতাকেও অস্বীকার করে শুভদিনের এই বিরাট জনসভায় যোগ দিতে রাজি না হয়ে পারলেম না।

বিকালে শিবাজিমন্দির-নামক বৃহৎ মুক্ত অঙ্গনে বিরাট জনসভা। অতি কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করলেম। ভাবলেম, অভিমন্যুর মতো প্রবেশ তো হল, বেরোবার কী উপায়। মালব্যজি উপক্রমণিকায় সুন্দর করে বোঝালেন তাঁর বিশুদ্ধ হিন্দি ভাষায় যে, অস্পৃশ্যবিচার হিন্দুশাস্ত্রসংগত নয়। বহু সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তাঁর যুক্তি প্রমাণ করলেন। আমার কণ্ঠ ক্ষীণ, সাধ্য নেই এত বড়ো সভায় আমার বক্তব্য শ্রুতিগোচর করতে পারি। মুখে মুখে দু-চারটি কথা বললেম, পরে রচনা পাঠ করবার ভার নিলেন পণ্ডিতজির পুত্র গোবিন্দ মালব্য। ক্ষীণ অপরাহ্নের আলোকে অদৃষ্টপূর্ব রচনা অনর্গল অমন সুস্পষ্ট কণ্ঠে পড়ে গেলেন, এতে বিস্মিত হলেম।

আমার সমগ্র রচনা কাগজে আপনারা দেখে থাকবেন। সভায় প্রবেশ করবার অনতিপূর্বে তার পাণ্ডুলিপি জেলে গিয়ে মহাত্মাজির হাতে দিয়ে এসেছিলেম।

মতিলাল নেহেরুর পত্নী কিছু বললেন তাঁর ভ্রাতা-ভগিনীদের উদ্দেশ করে, সামাজিক সাম্যবিধানের ব্রত-রক্ষায় তাঁদের যেন একটুও ত্রুটি না ঘটে। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ অন্যান্য নেতারাও অন্তরের ব্যথা দিয়ে দেশবাসীকে সামাজিক অশুচি দূর করতে আবাহন করলেন। সভায় সমবেত বিরাট জনসংঘ হাত তুলে অস্পৃশ্যতানিবারণের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। বোঝা গেল, সকলের মনে আজকের বাণী পৌঁচেছে। কিছু দিন পূর্বেও এমন দুরূহ সংকল্পে এত সহস্র লোকের অনুমোদন সম্ভব ছিল না।

আমার পালা শেষ হল। পরদিন প্রাতে মহাত্মাজির কাছে অনেক ক্ষণ ছিলেম। তাঁর সঙ্গে এবং মালব্যজির সঙ্গে দীর্ঘকাল নানা বিষয়ে আলোচনা হল। এক দিনেই মহাত্মাজি অপ্রত্যাশিত বল লাভ করেছেন। কণ্ঠস্বর তাঁর দৃঢ়তর, blood

pressure প্রায় স্বাভাবিক। অতিথি অভ্যাগত অনেকেই আসছেন প্রণাম করে আনন্দ জানিয়ে যেতে। সকলের সঙ্গেই হেসে কথা কইছেন। শিশুর দল ফুল নিয়ে আসছে, তাদের নিয়ে তাঁর কী আনন্দ। বন্ধুদের সঙ্গে সামাজিক সাম্যবিধান প্রসঙ্গে নানাবিধ আলোচনা চলছে। এখন তাঁর প্রধান চিন্তার বিষয় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-ভঞ্জন।

আজ যে মহাত্মার জীবন আমাদের কাছে বিরাট ভূমিকায় উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল, তাতে সর্বমানুষের মধ্যে মহামানুষকে প্রত্যক্ষ করবার প্রেরণা আছে। সেই প্রেরণা সার্থক হোক ভারতবর্ষের সর্বত্র।

মুক্তিসাধনার সত্য পথ মানুষের ঐক্যসাধনায়। রাষ্ট্রিক পরাধীনতা আমাদের সামাজিক সহস্র ভেদবিচ্ছেদকে অবলম্বন করেই পুষ্ট।

জড়প্রথার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে উদার ঐক্যের পথে মানবসভ্যতা অগ্রসর হবে, সেইদিন আজ সমাগত।

বুদ্ধদেব

আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলংকার নয়, একান্তে নিভৃতে যা তাঁকে বার-বার সমর্পণ করেছি সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি।

একদিন বুদ্ধগয়াতে গিয়েছিলাম মন্দিরদর্শনে, সেদিন এই কথা আমার মনে জেগেছিল—যাঁর চরণস্পর্শে বসুন্ধরা একদিন পবিত্র হয়েছিল তিনি যেদিন সশরীরে এই গয়াতে ভ্রমণ করছিলেন, সেদিন কেন আমি জন্মাই নি, সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর পুণ্যপ্রভাব অনুভব করি নি?

তখনি আবার এই কথা মনে হল যে, বর্তমান কালের পরিধি অতি সংকীর্ণ, সদ্য উৎক্ষিপ্ত ঘটনার ধূলি-আবর্তে আবিল, এই অল্পপরিসর অস্বচ্ছ কালের মধ্যে মহামানবকে আমরা পরিপূর্ণ করে উপলব্ধি করতে পারি নে ইতিহাসে বার-বার তার প্রমাণ হয়েছে। বুদ্ধদেবের জীবিতকালে ক্ষুদ্র মনের কত ঈর্ষা, কত বিরোধ তাঁকে আঘাত করেছে; তাঁর মাহাত্ম্য খর্ব করবার জন্যে কত মিথ্যা নিন্দার প্রচার হয়েছিল। কত শত লোক যারা ইন্দ্রিয়গত ভাবে তাঁকে কাছে দেখেছে তারা অন্তরগত ভাবে নিজেদের থেকে তাঁর বিপুল দূরত্ব অনুভব করতে পারে নি, সাধারণ লোকালয়ের মাঝখানে থেকে তাঁর অলৌকিকত্ব তাদের মনে প্রতিভাত হবার অবকাশ পায় নি। তাই মনে করি, সেদিনকার প্রত্যক্ষ ধাবমান ঘটনাবলীর অস্পষ্টতার মধ্যে তাঁকে যে দেখি নি সে ভালোই হয়েছে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা জন্মমুহূর্তেই স্থান গ্রহণ করেন মহাযুগে, চলমান কালের অতীত কালেই তাঁরা বর্তমান, দূরবিস্তীর্ণ ভাবী কালে তাঁরা বিরাজিত। এ কথা সেদিন বুঝেছিলুম সেই মন্দিরেই। দেখলুম, দূর জাপান থেকে সমুদ্র পার হয়ে একজন দরিদ্র মৎস্যজীবী এসেছে কোনো দুষ্কৃতির অনুশোচনা করতে। সায়াহ্ন উত্তীর্ণ হল নির্জন নিঃশব্দ মধ্যরাত্রিতে, সে একাগ্রমনে করজোড়ে আবৃত্তি করতে লাগল: আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। কত শত শতাব্দী হয়ে গেছে, একদা শাক্যরাজপুত্র গভীর রাত্রে মানুষের দুঃখ দূর করবার সাধনায় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়েছিলেন; আর সেদিনকার সেই মধ্যরাত্রে জাপান থেকে এল তীর্থযাত্রী গভীর দুঃখে তাঁরই শরণ কামনা করে। সেদিন তিনি ঐ পাপপরিতপ্তের কাছে পৃথিবীর সকল প্রত্যক্ষ বস্তুর চেয়ে প্রত্যক্ষতম, অন্তরতম; তাঁর জন্মদিন ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে ঐ মুক্তিকামীর জীবনের মধ্যে। সেদিন সে আপন মনুষ্যত্বের গভীরতম আকাঙ্ক্ষার দীপ্তশিখায় সম্মুখে দেখতে পেয়েছে তাঁকে যিনি নরোত্তম। যে বর্তমান কালে ভগবান বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল সেদিন যদি তিনি প্রতাপশালী রাজরূপে, বিজয়ী বীররূপেই প্রকাশ পেতেন, তা হলে তিনি সেই বর্তমান কালকে অভিভূত করে সহজে সম্মান লাভ করতে পারতেন; কিন্তু সেই প্রচুর সম্মান আপন ক্ষুদ্র কালসীমার মধ্যেই বিলুপ্ত হত। প্রজা বড়ো করে জানত রাজাকে, নির্ধন জানত ধনীকে, দুর্বল জানত প্রবলকে—কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণতাকে সাধনা করছে যে মানুষ সেই স্বীকার করে, সেই অভ্যর্থনা করে মহামানবকে। মানবকর্তৃক মহামানবের স্বীকৃতি মহাযুগের ভূমিকায়। তাই আজ ভগবান বুদ্ধকে দেখছি যথাস্থানে মানবমনের মহাসিংহাসনে মহাযোগের বেদীতে, যার মধ্যে অতীত কালের মহৎপ্রকাশ বর্তমানকে

অতিক্রম করে চলেছে। আপনার চিত্তবিকারে আপন চরিত্রের অপূর্ণতায় পীড়িত মানুষ আজও তাঁরই কাছে বলতে আসছে: বুদ্ধের শরণ কামনা করি। এই সুদূর কালে প্রসারিত মানবচিত্তের ঘনিষ্ঠ উপলব্ধিতেই তাঁর যথার্থ আবির্ভাব।

আমরা সাধারণ লোক পরম্পরের যোগে আপনার পরিচয় দিয়ে থাকি; সে পরিচয় বিশেষ শ্রেণীর, বিশেষ জাতির, বিশেষ সমাজের। পৃথিবীতে এমন লোক অতি অল্পই জন্মেছেন যাঁরা আপনাতে স্বতই প্রকাশবান্, যাঁদের আলোক প্রতিফলিত আলোক নয়, যাঁরা সম্পূর্ণ প্রকাশিত আপন মহিমায়, আপনার সত্যে। মানুষের খণ্ড প্রকাশ দেখে থাকি অনেক বড়ো লোকের মধ্যে; তাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা বিদ্বান, তাঁরা বীর, তাঁরা রাষ্ট্রনেতা; তাঁরা মানুষকে চালনা করেছেন আপন ইচ্ছামত; তাঁরা ইতিহাসকে সংঘটন করেছেন আপন সঙ্কল্পের আদর্শে। কেবল পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ তাঁরই, সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষকে যিনি আপনার মধ্যে অধিকার করেছেন, যাঁর চেতনা খণ্ডিত হয় নি রাষ্ট্রগত জাতিগত দেশকালের কোনো অভ্যস্ত সীমানায়।

মানুষের প্রকাশ সত্যে। এই সত্য যে কী তা উপনিষদে বলা হয়েছে: আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি। যিনি সকল জীবকে আপনার মতো করে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। আপনার মধ্যে সত্যকে যিনি এমনি করে জেনেছেন তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হয়েছে, তিনি আপন মানবমহিমায় দেদীপ্যমান।

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
চাত্মানং সর্বভূতেষু ন ততো বিজুগুপ্সতে।

সকলের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সকলকে যিনি দেখতে পেয়েছেন, তিনি আর গোপন থাকতে পারেন না, সকল কালে তাঁর প্রকাশ।

মানুষের এই প্রকাশ জগতে আজ অধিকাংশ লোকের মধ্যে আবৃত। কিছু কিছু দেখা যায়, অনেকখানি দেখা যায় না। পৃথিবীসৃষ্টির আদি যুগে ভূমণ্ডল ঘন বাষ্প-আবরণে আচ্ছন্ন ছিল। তখন এখানে সেখানে উচ্চতম পর্বতের চূড়া অবারিত আলোকের মধ্যে উঠতে পেরেছে। আজকের দিনে তেমনি অধিকাংশ মানুষ প্রচ্ছন্ন, আপন স্বার্থে, আপন অহঙ্কারে, অবরুদ্ধ চৈতন্যে। যে সত্যে আত্মার সর্বত্র প্রবেশ সেই সত্যের বিকাশ তাদের মধ্যে অপরিণত।

মানুষের সৃষ্টি আজও অসম্পূর্ণ হয়ে আছে। এই অসমাপ্তির নিবিড় আবরণের মধ্যে থেকে মানুষের পরিচয় আমরা পেতুম কী করে যদি না মানব সহসা আমাদের কাছে আবির্ভূত হত কোনো প্রকাশবান্ মহাপুরুষের মধ্যে? মানুষের সেই মহাভাগ্য ঘটেছে, মানুষের সত্যস্বরূপ দেদীপ্যমান হয়েছে ভগবান বুদ্ধের মধ্যে, তিনি সকল মানুষকে আপন বিরাট হৃদয়ে গ্রহণ করে দেখা দিয়েছেন। ন ততো বিজুগুপ্সতে— আর তাঁকে গোপন করবে কিসে, দেশকালের কোন্ সীমাবদ্ধ পরিচয়ের অন্তরালে, কোন্ সদ্যপ্রয়োজন-সিদ্ধির প্রলুব্ধতায়?

ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের। মানব-ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশে দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেননা বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে। সে কাউকে অবজ্ঞা করে নি, এইজন্যে সে আর গোপন রইল না। সত্যের বন্যায় বর্ণের বেড়া দিলে ভাসিয়ে; ভারতের আমন্ত্রণ পৌঁছল দেশ-বিদেশের সকল জাতির

কাছে। এল চীন ব্রহ্মদেশ জাপান, এল তিব্বত মঙ্গোলিয়া। দুস্তর গিরি-সমুদ্র পথ ছেড়ে দিলে অমোঘ সত্যবার্তার কাছে। দূর হতে দূরে মানুষ বলে উঠল, মানুষের প্রকাশ হয়েছে, দেখেছি— মহান্তং পুরুষং তমসঃ পরস্তাৎ। এই ঘোষণা-বাক্য অক্ষয় রূপ নিল মরুপ্রান্তরে প্রস্তরমূর্তিতে। অদ্ভুত অধ্যবসায়ে মানুষ রচনা করলে বুদ্ধবন্দনা, মূর্তিতে, চিত্রে, স্তূপে। মানুষ বলেছে, যিনি অলোকসামান্য দুঃসাধ্য সাধন করেই তাঁকে জানাতে হবে ভক্তি। অপূর্ব শক্তির প্রেরণা এল তাদের মনে; নিবিড় অন্ধকারে গুহাভিত্তিতে তারা আঁকল ছবি, দুর্বহ প্রস্তরখণ্ড-গুলোকে পাহাড়ের মাথায় তুলে তারা নির্মাণ করলে মন্দির, শিল্পপ্রতিভা পার হয়ে গেল সমুদ্র, অপরূপ শিল্পসম্পদ রচনা করলে, শিল্পী আপনার নাম করে দিলে বিলুপ্ত, কেবল শাশ্বত কালকে এই মন্ত্র দান করে গেল : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। জাভাদ্বীপে বরোবুদরে দেখে এলুম সুবৃহৎ স্তূপ পরিবেষ্টন করে শত শত মূর্তি খুদে তুলেছে বুদ্ধের জাতককথার বর্ণনায়; তার প্রত্যেকটিতেই আছে কারুনৈপুণ্যের উৎকর্ষ, কোথাও লেশমাত্র আলস্য নেই, অনবধান নেই; একে বলে শিল্পের তপস্যা, একই সঙ্গে এই তপস্যা ভক্তির— খ্যাতিলোভহীন নিষ্কাম কৃচ্ছ্র-সাধনায় আপন শ্রেষ্ঠশক্তিকে উৎসর্গ করা চিরবরণীয়ের চিরস্মরণীয়ের নামে। কঠিন দুঃখ স্বীকার করে মানুষ আপন ভক্তিকে চরিতার্থ করেছে; তারা বলেছে, যে প্রতিভা নিত্যকালের সর্বমানবের ভাষায় কথা বলে সেই অকৃপণ প্রতিভার চূড়ান্ত প্রকাশ না করতে পারলে কোন্ উপায়ে যথার্থ করে বলা হবে 'তিনি এসেছিলেন সকল মানুষের জন্যে সকল কালের জন্যে'? তিনি মানুষের কাছে সেই প্রকাশ চেয়েছিলেন, যা দুঃসাধ্য, যা চিরজাগরূক, যা সংগ্রামজয়ী, যা বন্ধনচ্ছেদী। তাই সেদিন পূর্ব মহাদেশের দুর্গমে দুস্তরে বীর্যবান পূজার আকারে প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর জয়ধ্বনি, শৈলশিখরে, মরুপ্রান্তরে, নির্জন গুহায়। এর চেয়ে মহত্তর অর্ঘ্য এল ভগবান বুদ্ধের পদমূলে যেদিন রাজাধিরাজ অশোক শিলালিপিতে প্রকাশ করলেন তাঁর পাপ, অহিংস্র ধর্মের মহিমা ঘোষণা করলেন, তাঁর প্রণামকে চির-কালের প্রাঙ্গণে রেখে গেলেন শিলাস্তম্ভে।

এত বড়ো রাজা কি জগতে আর কোনো দিন দেখা দিয়েছে! সেই রাজাকে মাহাত্ম্য দান করেছেন যে গুরু তাঁকে আহ্বান করবার প্রয়োজন আজ যেমন একান্ত হয়েছে এমন সেদিনও হয় নি যেদিন তিনি জন্মেছিলেন এই ভারতে। বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, অপবিত্র ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তা ধর্মের নামে আজ রক্তে পঙ্কিল করে তুলেছে এই ধরাতল; পরস্পর হিংসার চেয়ে সাংঘাতিক পরস্পর ঘৃণায় মানুষ এখানে পদে পদে অপমানিত। সর্বজীবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ বলে ঘোষণা করেছিলেন সেই তাঁরই বাণীকে আজ উৎকণ্ঠিত হয়ে কামনা করি এই ভ্রাতৃবিদ্বেষকলুষিত হতভাগ্য দেশে। পূজার বেদীতে আবির্ভূত হোন মানব-শ্রেষ্ঠ, মানবের শ্রেষ্ঠতাকে উদ্ধার করবার জন্যে। সকলের চেয়ে বড়ো দান যে শ্রদ্ধাদান, তার থেকে কোনো মানুষকে তিনি বঞ্চিত করেন নি। যে দয়াকে, যে দানকে তিনি ধর্ম বলেছেন সে কেবল দূরের থেকে স্পর্শ বাঁচিয়ে অর্থদান নয়, সে দান আপনাকে দান— যে দানধর্মে বলে 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'। নিজের শ্রেষ্ঠতাভিমান, পুণ্যাভিমান, ধনাভিমান প্রবেশ করে দানকে অপমানকর অধর্মে পরিণত করতে পারে এই ভয়ের কারণ আছে; এইজন্যে উপনিষদ্ বলেন : ভিয়া দেয়ম্। ভয় করে দেবে। যে ধর্মকর্মের দ্বারা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারাবার আশঙ্কা আছে তাকেই ভয় করতে হবে। আজ ভারতবর্ষে ধর্মবিধির প্রণালীযোগে মানুষের প্রতি

অশ্রদ্ধার পথ চারি দিকে প্রসারিত হয়েছে। এরই ভয়ানকত্ব কেবল আধ্যাত্মিক দিকে নয়, রাষ্ট্রীয় মুক্তির দিকে সর্বপ্রধান অন্তরায় হয়েছে এ প্রত্যক্ষ দেখছি। এই সমস্যার কি কোনো দিন সমাধান হতে পারে রাষ্ট্রনীতির পথে কোনো বাহ্য উপায়ের দ্বারা?

ভগবান্ বুদ্ধ একদিন রাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন। সে তপস্যা সকল মানুষের দুঃখমোচনের সংকল্প নিয়ে। এই তপস্যার মধ্যে কি অধিকারভেদ ছিল? কেউ ছিল কি ম্লেচ্ছ? কেউ ছিল কি অনার্য? তিনি তাঁর সব-কিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মূর্খতম মানুষেরও জন্যে। তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁর সেই এত বড়ো তপস্যা আজ কি ভারতবর্ষ থেকে বিলীন হবে?

জিজ্ঞাসা করি, মানুষে মানুষে বেড়া তুলে দিয়ে আমরা কী পেরেছি ঠেকাতে? ছিল আমাদের পরিপূর্ণ ধনের ভাণ্ডার; তার দ্বার, তার প্রাচীর, বাইরের আঘাতে ভেঙে পড়ে নি কি? কিছু কি তার অবশিষ্ট আছে? আজ প্রাচীরের পর প্রাচীর তুলেছি মানুষের প্রতি আত্মীয়তাকে অবরুদ্ধ করে, আজ দেবতার মন্দিরের দ্বারে পাহারা বসিয়েছি দেবতার অধিকারকেও কৃপণের মতো ঠেকিয়ে রেখে। দানের দ্বারা, ব্যয়ের দ্বারা, যে ধনের অপচয় হয় তাকে বাঁচাতে পারলুম না; কেবল দানের দ্বারা যার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয়, মানুষের প্রতি সেই শ্রদ্ধাকে সাম্প্রদায়িক সিন্দুকের মধ্যে তালা বন্ধ করে রাখলুম। পুণ্যের ভাণ্ডার বিষয়ীর ভাণ্ডারের মতোই আকার ধরল। একদিন যে ভারতবর্ষ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর কাছে আপন মনুষ্যত্ব উজ্জ্বল করে তুলেছিল আজ সে আপন পরিচয়কে সঙ্কুচিত করে এনেছে; মানুষকে অশ্রদ্ধা করেই সে মানুষের অশ্রদ্ধাভাজন হল। আজ মানুষ মানুষের বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে; কেননা মানুষ আজ সত্যভ্রষ্ট, তার মনুষ্যত্ব প্রচ্ছন্ন। তাই আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের প্রতি মানুষের এত সন্দেহ, এত আতঙ্ক, এত আক্রোশ। তাই আজ মহামানবকে এই বলে ডাকবার দিন এসেছে: তুমি আপনার প্রকাশের দ্বারা মানুষকে প্রকাশ করো।

ভগবান্ বুদ্ধ বলেছেন, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে। কিছুদিন পূর্বেই পৃথিবীতে এক মহাযুদ্ধ হয়ে গেল। এক পক্ষের জয় হল, সে জয় বাহু-বলের। কিন্তু যেহেতু বাহুবল মানুষের চরম বল নয়, এইজন্যে মানুষের ইতিহাসে সে জয় নিষ্ফল হল, সে জয় নূতন যুদ্ধের বীজ বপন করে চলেছে। মানুষের শক্তি অক্রোধে, ক্ষমাতে, এই কথা বুঝতে দেয় না সেই পশু যে আজও মানুষের মধ্যে মরে নি। তাই মানবের সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে মানবের গুরু বলেছেন: ক্রোধকে জয় করবে অক্রোধের দ্বারা, নিজের ক্রোধকে এবং অন্যের ক্রোধকে। এ না হলে মানুষ ব্যর্থ হবে, যেহেতু সে মানুষ। বাহুবলের সাহায্যে ক্রোধকে প্রতি-হিংসাকে জয়ী করার দ্বারা শান্তি মেলে না, ক্ষমাই আনে শান্তি, এ কথা মানুষ আপন রাষ্ট্রনীতিতে সমাজনীতিতে যতদিন স্বীকার করতে না পারবে ততদিন অপরাধীর অপরাধ বেড়ে চলবে; রাষ্ট্রগত বিরোধের আগুন কিছুতে নিভবে না; জেলখানার দানবিক নিষ্ঠুরতায় এবং সৈন্যনিবাসের সশস্ত্র ভ্রূকুটিবিক্ষেপে পৃথিবীর মর্মান্তিক পীড়া উত্তরোত্তর দুঃসহ হতে থাকবে—কোথাও এর শেষ পাওয়া যাবে না। পাশবতার সাহায্যে মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন 'অক্কোধেন জিনে কোধং', আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মনুষ্যত্বের জগদ্ব্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন

এল : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি নঙর্থক নয়, সদর্থক; যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে; যে মুক্তি রাগদ্বেষবর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়। আজ স্বার্থক্ষুধান্ধ বৈশ্যবৃত্তির নির্মম নিঃসীম লুব্ধতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি যিনি আপনার মধ্যে বিশ্ব-মানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

[বৈশাখী পূর্ণিমা : ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২]

ব্রহ্মবিহার

ব্রহ্মবিহারের এই সাধনার পথে বুদ্ধদেব মানুষকে প্রবর্তিত করবার জন্যে বিশেষ-রূপে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জানতেন কোনো পাবার যোগ্য জিনিস ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যায় না, সেইজন্যে তিনি বেশি কথা না বলে একেবারে ভিত খোঁড়া থেকে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, শীল গ্রহণ করাই মুক্তিপথের পাথেয় গ্রহণ করা। চরিত্র শব্দের অর্থই এই যাতে করে চলা যায়। শীলের দ্বারা সেই চরিত্র গড়ে ওঠে; শীল আমাদের চলবার সম্বল।

পাণং ন হানে : প্রাণীকে হত্যা করবে না—এই কথাটি শীল। ন চাদিন্ন-মাদিয়ে : যা তোমাকে দেওয়া হয় নি তা নেবে না—এই একটি শীল। মুসা ন ভাসে : মিথ্যা কথা বলবে না—এই একটি শীল। ন চ মজ্জপো সিয়া : মদ খাবে না—এই একটি শীল। এমনি করে যথাসাধ্য একটি একটি করে শীল সঞ্চয় করতে হবে।

আর্যশ্রাবকেরা প্রতিদিন নিজেদের এই শীলকে স্মরণ করেন : ইধ অরিয়সাবকো অত্তনো সীলানি অনুস্সরতি।

শীলসকলকে কী বলে অনুস্মরণ করেন?

অখণ্ডানি, অচ্ছিদ্দানি, অসবলানি, অকম্মাসানি, ভুজিস্সানি, বিঞ্ঞুপ্-পসত্থানি, অপরামট্ঠানি, সমাধিসংবত্তনিকানি।

অর্থাৎ, আমার এই শীল খণ্ডিত হয় নি, এতে ছিদ্র হয় নি, আমার এই শীল জোর করে রক্ষিত হয় নি, অর্থাৎ ইচ্ছা করেই রাখছি, এই শীলে পাপ স্পর্শ করে নি, এই শীল ধন মান প্রভৃতি কোনো স্বার্থসাধনের জন্য আচরিত নয়, এই শীল বিজ্ঞজনের অনুমোদিত, এই শীল বিদলিত হয় নি এবং এই শীল মুক্তিপ্রবর্তন করবে। এই বলে আর্যশ্রাবকগণ নিজ নিজ শীলের গুণ বারম্বার স্মরণ করেন।

এই শীলগুলিই হচ্ছে মঙ্গল। মঙ্গললাভই প্রেম ও মুক্তিলাভের সোপান। বুদ্ধদেব কাকে যে মঙ্গল বলেছেন তা মঙ্গলসুত্তে কথিত আছে। সেটি অনুবাদ করে দিই—

বহূ দেবা মনুস্সা চ মঙ্গলানি অচিন্তয়ুং
আকঙ্খমানা সোত্থানং ব্রূহি মঙ্গলমুত্তমং।

বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, 'বহু দেবতা বহু মানুষ যাঁরা শুভ আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁরা মঙ্গলের চিন্তা করে এসেছেন, সেই মঙ্গলটি কী বলো।'

বুদ্ধ উত্তর দিচ্ছেন—

অসেবনা চ বালানং পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা
পূজা চ পূজনেয়্যানং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অসংগণের সেবা না করা, সজ্জনের সেবা করা, পূজনীয়কে পূজা করা—এই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।

পতিরূপদেসবাসো পুব্বে চ কতপুঞ্ঞতা
অত্তসম্মাপণিধি চ এতং মঙ্গলমুত্তমং।

যে দেশে ধর্মসাধন বাধা পায় না সেই দেশে বাস, পূর্বকৃত পুণ্যকে বর্ধিত করা, আপনাকে সৎকর্মে প্রণিধান করা—এই উত্তম মঙ্গল।

বহুসচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চ বিনয়ো চ সুসিক্‌খিতো
সুভাসিতা চ যা বাচা এতং মঙ্গলমুত্তমং।

বহু-শাস্ত্র-অধ্যয়ন, বহু-শিল্প-শিক্ষা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলা—এই উত্তম মঙ্গল।

মাতাপিতু-উপট্‌ঠানং পুত্তদারস্‌স সংগহো
অনাকুলা চ কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং।

মাতাপিতাকে পূজা করা, স্ত্রীপুত্রের কল্যাণ করা, অনাকুল কর্ম করা—এই উত্তম মঙ্গল।

দানঞ্চ ধম্মচরিয়ঞ্চ ঞ্ঞাতকানঞ্চ সংগহো
অনবজ্জানি কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং।

দান, ধর্মচর্যা, জ্ঞাতিবর্গের উপকার, অনিন্দনীয় কর্ম—এই উত্তম মঙ্গল।

আরতী বিরতি পাপা মজ্জপানা চ সঞ্ঞমো
অপ্‌পমাদো চ ধম্মেসু এতং মঙ্গলমুত্তমং।

পাপে অনাসক্তি এবং বিরতি, মদ্যপানে বিতৃষ্ণা, ধর্মকর্মে অপ্রমাদ—এই উত্তম মঙ্গল।

গারবো চ নিবাতো চ সন্তুট্‌ঠী চ কতঞ্ঞুতা
কালেন ধম্মসবনং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

গৌরব অথচ নম্রতা, সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, যথাকালে ধর্মকথাশ্রবণ—এই উত্তম মঙ্গল।

খন্তী চ সোবচস্‌সতা সমণানঞ্চ দস্‌সনং
কালেন ধম্মসাকচ্ছা এতং মঙ্গলমুত্তমং।

ক্ষমা, প্রিয়বাদিতা, সাধুগণকে দর্শন, যথাকালে ধর্মালোচনা—এই উত্তম মঙ্গল।

তপো চ ব্রহ্মচরিয়ঞ্চ অরিয়সচ্চান দস্‌সনং
নিব্বানসচ্ছিকিরিয়া এতং মঙ্গলমুত্তমং।

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রেষ্ঠ সত্যকে জানা, মুক্তিলাভের উপযুক্ত সৎকার্য—এই উত্তম মঙ্গল।

ফুট্‌ঠস্‌স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্‌স ন কম্পতি
অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

লাভ ক্ষতি নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি লোকধর্মের দ্বারা আঘাত পেলেও যার চিত্ত কম্পিত হয় না, যার শোক নেই, মলিনতা নেই, যার ভয় নেই—সে উত্তম মঙ্গল পেয়েছে।

এতাদিসানি কত্বান সব্বত্থমপরাজিতা
সব্বত্থ সোত্থিং গচ্ছন্তি তং তেসং মঙ্গলমুত্তমন্তি।

এই রকম যারা করেছে তারা সর্বত্র অপরাজিত, তারা সর্বত্র স্বস্তি লাভ করে, তাদের উত্তম মঙ্গল হয়।

যারা বলে ধর্মনীতিই বৌদ্ধধর্মের চরম তারা ঠিক কথা বলে না। মঙ্গল একটা উপায় মাত্র। তবে নির্বাণই চরম? তা হতে পারে, কিন্তু সেই নির্বাণটি কী? সে কি শূন্যতা?

যদি শূন্যতাই হত তবে পূর্ণতার দ্বারা তাতে গিয়ে পেঁছিনো যেত না। তবে কেবলই সমস্তকে অস্বীকার করতে করতে, 'নয় নয় নয়' বলতে বলতে, একটার পর একটা ত্যাগ করতে করতেই, সেই সর্বশূন্যতার মধ্যে নির্বাপণ লাভ করা যেত।

কিন্তু, বৌদ্ধধর্মে সে পথের ঠিক উল্টা পথ দেখি যে। তাতে কেবল তো মঙ্গল দেখছি নে, মঙ্গলের চেয়েও বড়ো জিনিসটি দেখছি যে।

মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে। অর্থাৎ, তাতে একটা কোনো ভালো উদ্দেশ্য সাধন করে, কোনো-একটা সুখ হয় বা সুযোগ হয়।

কিন্তু, প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ, প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা; সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলই দেওয়া।

যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা, সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ—তিনি নেন না।

এই প্রেমের ভাবে, এই আদানবিহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্যে বুদ্ধদেবের উপদেশ আছে, তিনি তার সাধনপ্রণালীও বলে দিয়েছেন।

এ তো বাসনাসংহরণের প্রণালী নয়, এ তো বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়, এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম 'মেত্তিভাবনা'—মৈত্রীভাবনা।

প্রতিদিন এই কথা ভাবতে হবে : সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, সব্বে সত্তা মা যথালব্ধসম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।

সকল প্রাণী সুখিত হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক, সুখী আত্মা হয়ে কালহরণ করুক। সকল প্রাণী আপন যথালব্ধ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক।

মনে ক্রোধ দ্বেষ লোভ ঈর্ষা থাকলে এই মৈত্রীভাবনা সত্য হয় না, এইজন্য শীল-গ্রহণ শীলসাধন প্রয়োজন। কিন্তু, শীলসাধনার পরিণাম হচ্ছে সর্বত্র মৈত্রীকে দয়াকে বাধাহীন করে বিস্তার। এই উপায়েই আত্মাকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

এই মৈত্রীভাবনার দ্বারা আত্মাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করা, এ তো শূন্যতার পন্থা নয়।

তা যে নয় তা বুদ্ধ যাকে ব্রহ্মবিহার বলছেন তা অনুশীলন করলেই বোঝা যাবে।

করণীয় মত্থ কুসলেন
যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ
সক্কো উজূ চ সুহুজূ চ
সুবচো চস্‌স মূদু অনতিমানী।

শান্তপদ লাভ করে পরমার্থকুশল ব্যক্তির যা করণীয় তা এই— তিনি শক্তিমান, সরল, অতি সরল, সুভাষী, মৃদু, নম্র এবং অনভিমানী হবেন।

সন্তুস্‌সকো চ সুভরো চ,
অপ্‌পকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি
সন্তিন্দ্রিয়ো চ নিপকো চ
অপ্‌পগব্‌ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো।

তিনি সন্তুষ্টহৃদয় হবেন, অল্পেই তাঁর ভরণ হবে; তিনি নিরুদ্‌বেগ, অল্পভোজী, শান্তেন্দ্রিয়, সদ্‌বিবেচক, অপ্রগল্‌ভ এবং সংসারে অনাসক্ত হবেন।

ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি
যেন বিঞ্‌ঞূপরে উপবদেয়্যুং।
সুখিনো বা খেমিনো বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

এমন ক্ষুদ্র অন্যায়ও কিছু আচরণ করবেন না যার জন্যে অন্যে তাঁকে নিন্দা করতে পারে। তিনি কামনা করবেন সকল প্রাণী সুখী হোক, নিরাপদ হোক, সুস্থ হোক।

যে কেচি পাণভূতত্থি
তসা বা থাবরা বা অনবসেসা।
দীঘা বা যে মহন্তা বা
মজ্ঝিমা রস্‌সকা অণুকথূলা।
দিট্‌ঠা বা যে চ অদিট্‌ঠা
যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে।
ভূতা বা সম্ভবেসী বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

যে কোনো প্রাণী আছে, কী সবল কী দুর্বল, কী দীর্ঘ কী প্রকাণ্ড, কী মধ্যম কী হ্রস্ব, কী সূক্ষ্ম কী স্থূল, কী দৃষ্ট কী অদৃষ্ট, যারা দূরে বাস করছে বা যারা নিকটে, যারা জন্মেছে বা যারা জন্মাবে, অনবশেষে সকলেই সুখী-আত্মা হোক।

ন পরোপরং নিকুব্বেথ
নাতিমঞ্‌ঞেথ কত্থচি ন কঞ্চি
ব্যারোসনা পটিঘ সঞ্‌ঞা
নঞ্‌ঞ মঞ্‌ঞস্‌স দুক্‌খমিচ্ছেয্য।

পরস্পরকে বঞ্চনা কোরো না, কোথাও কাউকে অবজ্ঞা কোরো না, কায়ে বাক্যে বা মনে ক্রোধ করে অন্যের দুঃখ ইচ্ছা কোরো না।

মাতা যথা নিযং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে
এবম্পি সব্বভূতেসু
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

মা যেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেই-প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে।

মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ
অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

ঊর্ধ্বে অধোতে চার-দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।

তিট্‌ঠং চরং নিসিন্নো বা
সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং
ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যন্ত, এইপ্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে ব্রহ্মবিহার বলে।

অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়—মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালোবাসেন সেইরকম ভালোবাসা।

ব্রহ্মের অপরিমিত মানস যে বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে, এক পুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই প্রেম যে তাঁর সর্বত্র। তাঁরই সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে সে তো ব্রহ্মবিহার হল না।

কথাটা খুব বড়ো। কিন্তু, বড়ো কথাই যে হচ্ছে, বড়ো কথাকে ছোটো কথা করে তো লাভ নেই। ব্রহ্মকে চাওয়াই যে সকলের চেয়ে বড়োকে চাওয়া। উপনিষৎ বলেছেন : ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। ভূমাকেই, সকলের চেয়ে বড়োকেই, জানতে চাইবে।

সেই চাওয়া সেই পাওয়ার রূপটা কী সে তো স্পষ্ট করে, পরিষ্কার করে সম্মুখে ধরতে হবে। ভগবান্ বুদ্ধ ব্রহ্মবিহারকে সুস্পষ্ট করে ধরেছেন; তাকে ছোটো করে, ঝাপসা করে, সকলের কাছে চলনসই করবার চেষ্টা করেন নি।

অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীকে সর্বত্র প্রসারিত করে দিলে ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয়।

এই তো হল লক্ষ্য। কিন্তু, এ তো আমরা একেবারে পারব না। এই দিকে আমাদের প্রত্যহ চলতে হবে। এই লক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করে প্রত্যহ বুঝতে পারব আমরা কতদূর অগ্রসর হলুম।

ঈশ্বরের প্রতি আমার প্রেম জন্মাচ্ছে কি না সে সম্বন্ধে আমরা নিজেকে নিজে ভোলাতে পারি। কিন্তু সকলের প্রতি আমার প্রেম বিস্তৃত হচ্ছে কি না, আমার শত্রুতা ক্ষয় হচ্ছে কি না, আমার মঙ্গলভাব বাড়ছে কি না তার পরিমাণ স্থির করা শক্ত নয়।

একটা-কোনো নির্দিষ্ট সাধনার সুস্পষ্ট পথ পাবার জন্যে মানুষের একটা ব্যাকুলতা আছে। বুদ্ধদেব এক দিকে উদ্দেশ্যকে যেমন খর্ব করেন নি তেমনি তিনি পথকেও খুব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেমন করে ভাবতে হবে এবং কেমন করে চলতে হবে তা তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন। প্রত্যহ শীলসাধনার দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রীভাবনা-দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদিন এই কথা স্মরণ করো যে, আমার শীল অখণ্ড আছে, অচ্ছিদ্র আছে এবং প্রতিদিন চিত্তকে এই ভাবনায় নিবিষ্ট করো যে, ক্রমশ সকল বিরোধ কেটে গিয়ে আমার আত্মা সর্বভূতে প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ, এক দিকে বাধা কাটছে আর-এক দিকে স্বরূপলাভ হচ্ছে। এই

পদ্ধতিকে তো কোনোক্রমেই শূন্যতালাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিললাবের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মলাভের পদ্ধতি।

১১ চৈত্র [১৩১৫]

বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ

ডাক্তার রিচার্ড্ দীর্ঘকাল চীনদেশে বাস করিতেছেন। তিনি খৃস্টান মিশনরি।

তিনি লিখিতেছেন, একবার তিনি কার্যবশত ন্যান্‌কিং শহরে গিয়াছিলেন। সেখানে একটি বৌদ্ধশাস্ত্রপ্রকাশ-সভা আছে। টাইপিং বিপ্লবের সময় যে-সকল গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে তাহাই পুনরুদ্ধার করা এই সভার উদ্দেশ্য।

এই সভার প্রধান উদ্যোগী যিনি তাঁহার নাম য়াঙ্ বেন্ হুই। তিনি চীনের রাজপ্রতিনিধির অনুচররূপে দীর্ঘকাল য়ুরোপে যাপন করিয়াছেন। কন্‌ফুসীয় শাস্ত্র-শিক্ষায় তিনি উচ্চ-উপাধি-ধারী।

ডাক্তার রিচার্ড্ তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনি কন্‌ফুসীয় উপাধি লইয়া কী করিয়া বৌদ্ধ হইলেন', তিনি উত্তর করিলেন, 'আপনি 'মিশনরি' হইয়া আমাকে এমন প্রশ্ন করিলেন, ইহাতে আমি বিস্মিত হইতেছি। আপনি তো জানেন, কেবলমাত্র সাংসারিক ব্যাপারের প্রতিই কন্‌ফুসীয় ধর্মের লক্ষ্য—যাহা সংসারের অতীত তাহার প্রতি তাহার দৃষ্টি নাই।' রিচার্ড্‌সাহেব কহিলেন, 'যাহা সংসারের অতিবর্তী, তাহার সম্বন্ধে মানবমনের যে প্রশ্ন, বৌদ্ধধর্মে তাহার কি কোনো সত্য মীমাংসা আছে?' তিনি কহিলেন, 'হাঁ।' পাদ্রিসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় তাহা পাওয়া যায়?' বেন্ হুই উত্তর করিলেন, 'ভক্তি-উদ্‌বোধন-নামক একটি গ্রন্থে পাইবেন। এই পুস্তক পড়িয়াই কন্‌ফুসীয় ধর্ম ছাড়িয়া আমি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছি।'

ডাক্তার রিচার্ড্ এই বই আনাইলেন। পড়িতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি বই ছাড়িতে পারিলেন না। আর-একজন মিশনরি রাত্রি জাগিয়া তাঁহার পাশে কাজ করিতেছিলেন; তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এ আমি আশ্চর্য একটি খৃস্টান বই পড়িতেছি।'

ডাক্তার রিচার্ড্ যে বইটির কথা বলিয়াছেন তাহার মূল গ্রন্থটি সংস্কৃত, অশ্বঘোষের রচনা। এই সংস্কৃত গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে; কেবল চীন ভাষায় ইহার অনুবাদ এখন বর্তমান আছে।[১]

বৌদ্ধধর্ম জিনিসটা কী সে সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করিয়া লইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস এই যে, এই ধর্মে ধর্মের আর-সমস্ত অঙ্গই আছে, কেবল ইহার মধ্যে ঈশ্বরের কোনো স্থান নাই। জ্ঞানে ইহার ভিত্তি এবং কর্মে ইহার মন্দিরটি গড়া।

[১] 'শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র' বা 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র'। এই গ্রন্থের মূল সংস্কৃত এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ইহার ইংরেজি অনুবাদ Asvaghosha's Discourse on the Awakening of Faith in the Mahāyāna, translated for the first time from the Chinese version by Teitaro Suzuki, Chicago, 1900.

পাদটীকা শান্তিনিকেতন চীন-ভবনের শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

কিন্তু মন্দিরের মধ্যে কেহ নাই; সেখানে নির্বাণের অন্ধকার, ভক্তি সেখান হইতে নির্বাসিত।

আমরা তো বৌদ্ধধর্মকে এইভাবে দেখি, অথচ দেখিতে পাইতেছি—বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে খৃস্টান এমন-কিছু লাভ করিতেছেন যাহার সঙ্গে তিনি আপন ধর্মের প্রভেদ দেখিতেছেন না এবং যাহার রসে আকৃষ্ট হইয়া কন্‌ফুসীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহার প্রচারে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন।

ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিবেন, 'হাঁ, চরিত্রনীতির উপদেশে খৃস্টান-ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মিল আছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করে।' কিন্তু একটি কথা মনে রাখা উচিত, চারিত্রনীতির উপদেশ জিনিসটা মনোরম নহে; তাহা ঔষধ, তাহা খাদ্য নহে; তাহার সাড়া পাইলে ছুটিয়া লোক জড়ো হয় না, বরঞ্চ উল্টাই হয়। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যদি এমন-কিছু থাকে যাহা আমাদের হৃদয়কে টানে এবং পরিতৃপ্ত করে, তবে জানিব, তাহার মর্মটি, তাহার ধর্মটি সেই জায়গাতেই আছে।

ডাক্তার রিচার্ড্‌ অশ্বঘোষের গ্রন্থটির মধ্যে এমন-কিছু দেখিয়াছিলেন যাহা নীতি-উপদেশের অপেক্ষা গভীরতর, পূর্ণতর; যাহা দার্শনিক তত্ত্ব নহে, যাহা আচার-অনুষ্ঠানের পদ্ধতিমাত্র নহে। সেই জিনিসটি কোথা হইতে আসিল?

সম্প্রতি ইংলণ্ডে কোনো সভায় কয়েকজন ভিন্নজাতীয় ব্যক্তি আপন আপন ধর্ম লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। একজন জাপানী বক্তা তাঁহার দেশের বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্যের ধর্মোপদেশ হইতে স্থানে স্থানে উদ্‌ধৃত করিয়া বৌদ্ধমতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই বৌদ্ধ আচার্যের নাম সোয়েন শাকু; ইনি কামাকুরার এঙ্গাকুজি এবং কেঙ্কোজি মঠের অধ্যক্ষ। ইনি এক স্থানে বলিয়াছেন—

'আমরা বস্তুমাত্রের সীমাবদ্ধ বিশেষ সত্তা মানিয়া থাকি। সকল বস্তুই দেশে কালে বদ্ধ হইয়া কার্যকারণের নিয়মে চালিত হয়। বিষয়রাজ্যের বহুত্ব আমরা স্বীকার করি। এই সংসার বাস্তব, ইহা শূন্য নহে; এই জীবন সত্য, ইহা স্বপ্ন নহে। আমরা বৌদ্ধরা একটি আদিকারণ মানি যাহা সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ও সর্বপ্রেমী। এই জগৎ সেই মহাপ্রজ্ঞা মহাপ্রাণের প্রকাশ। ইহার সকল বস্তুতেই সেই আদিকারণের প্রকৃতির অংশ আছে। কেবল মনুষ্যে নহে, পশু ও জড় বস্তুতেও আদিকারণের দিব্য স্বভাব প্রকাশমান হইতেছে।

'ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, আমাদের মতে একই বহু এবং বহুই এক। এই জীবন এবং জগতের বাহিরে জগতের কারণকে খুঁজিতে যাওয়া ভ্রম। তাহা আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তাই বলিয়া এই জগতের মধ্যেই তাহার শেষ নহে, জগতের সমস্ত পদার্থসমষ্টিকে অতিক্রম করিয়াও সে আছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করে যে, এই বিষয়রাজ্য অসত্য নহে, ইহার মূল কারণ জ্ঞানস্বরূপ এবং তাহা সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত।'

উপরে যাহা উদ্‌ধৃত করা গেল তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে সাধারণত আমাদের যে ধারণা তাহার সহিত এই বৌদ্ধাচার্যের মতের মিল নাই। সম্ভবত কোনো কোনো বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতের সঙ্গেও ইহার অনৈক্য হইবে।

কিন্তু ভাবিয়া দেখিবার বিষয় এই যে, কোনো কোনো বৌদ্ধসমাজে বৌদ্ধধর্ম এইরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং নামান্তর গ্রহণ না করিয়া ইহা বৌদ্ধধর্ম বলিয়াই পরিচিত। ইতিহাসের কোনো-একটা বিশেষ স্থানে যাহা থামিয়া গিয়াছে তাহাকেই বৌদ্ধধর্ম বলিব— আর, যাহা মানুষের জীবনের মধ্যে নব নব কালে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, নব নব খাদ্যকে আত্মসাৎ করিয়া আপন জীবনকে

পরিপুষ্ট প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে, তাহাকে বৌদ্ধধর্ম বলিব না—এই যদি পণ করিয়া বসি তবে কোনো জীবিত ধর্মকে ধর্ম নাম দেওয়া চলে না।

কোনো বৃহৎ ধর্মই একটিমাত্র সরল সূত্র নহে, তাহাতে নানা সূত্র জড়াইয়া আছে। সেই ধর্মকে যাহারা আশ্রয় করে তাহারা আপনার প্রকৃতির বিশেষত্ব-অনুসারে তাহার কোনো একটা সূত্রকেই বিশেষ করিয়া বা বেশি করিয়া বাছিয়া লয়। খৃস্টান-ধর্মে রোমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে ক্যাল্‌ভিন-পন্থীদের অনেক প্রভেদ আছে। দুই ধর্মের মূল এক জায়গায় থাকিলেও তাহার পরিণতিতে গুরুতর পার্থক্য ঘটিয়াছে। আমরা যদি কেবলমাত্র ক্যাল্‌ভিন-পন্থীদের মত হইতে খৃস্টান-ধর্মকে বিচার করি, তবে নিশ্চয়ই তাহা অসম্পূর্ণ হইবে।

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। সকলেই জানেন এই ধর্ম হীনযান এবং মহাযান এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই দুই শাখার মধ্যে প্রভেদ গুরুতর। আমরা সাধারণত হীনযানমতাবলম্বী বৌদ্ধদের ধর্মকেই বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছি।

তাহার একটা কারণ, মহাযান-সম্প্রদায়ী বৌদ্ধদিগকে ভারতবর্ষে আমরা দেখিতে পাই না। দ্বিতীয় কারণ, যে পালি-সাহিত্য অবলম্বন করিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাহার মধ্যে মহাযান সম্প্রদায়ের মতগুলি পরিণত আকার ধারণ করে নাই।

ধর্মকে চিনিতে গেলে তাহাকে জীবনের মধ্যে দেখিতে হয়। পুরাতত্ত্ব-আলোচনার দ্বারা তাহার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেক সময় মিশনরিরা যখন আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বিচার করেন, তখন দেখিতে পাই, তাঁহারা কেবলমাত্র বই পড়িয়া বা সাময়িক বিকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিদেশীর ধর্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা নিতান্তই অঙ্গহীন। বস্তুত শাস্ত্রবচন খুঁটিয়া লইয়া, টুকরা জোড়া দিয়া, ধর্মকে চেনা যায় না। তাহার একটি সমগ্র ভাব আছে। সেই ভাবটিকে ঠিকমত ধরা শক্ত এবং ধরিলেও তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া নির্দেশ করা সহজ নহে।

আমাদের দেশে যাঁহারা খৃস্টান-ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁহাদের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, খৃস্টানের মুখ হইতেই তাঁহারা খৃস্টান-ধর্মের কথা শুনিতে পান, এইজন্য তাহার ভিতরকার সুরটা তাঁহাদের কানে গিয়া পৌঁছায়। যদি কেবল প্রাচীন শাস্ত্র পড়িয়া, বচন জোড়া দিয়া, তাঁহাদিগকে এই কাজটি করিতে হইত তবে অন্ধ যেমন হাত বুলাইয়া রূপ নির্ণয় করে তাঁহাদেরও সেই দশা ঘটিত। অর্থাৎ, মোটামুটি একটা আকৃতির ধারণা হইত, কিন্তু সেই ধারণাটাই সর্বোচ্চ ধারণা নহে। রূপের সঙ্গে যে বর্ণ, যে লাবণ্য, যে-সকল অনির্বচনীয় প্রকাশ আছে, তাহা তাঁহাকে সম্পূর্ণ এড়াইয়া যাইত।

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সেই দশা ঘটিয়াছে। পুঁথি-পড়া বিদেশী পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের গ্রন্থের শুষ্কপত্র হইতে আমরা এই ধর্মের পরিচয় গ্রহণ করি। এই ধর্মের রসধারায় সেই পণ্ডিতদের চিত্ত স্তরে স্তরে অভিষিক্ত নহে। এক প্রদীপের শিখা হইতে আর-এক প্রদীপ যেমন করিয়া শিখা গ্রহণ করে তেমন করিয়া তাঁহারা এই ধর্মকে সমগ্রভাবে লাভ করেন নাই। এমন অবস্থায় তাঁহাদের কাছ হইতে আমরা যাহা পাই তাহা নিতান্ত মোটা জিনিস; তাহা আলোকহীন, চক্ষুহীন, স্পর্শগত অনুভব মাত্র।

এইজন্য এইরূপ শাস্ত্র-গড়া বৌদ্ধধর্ম হইতে আমরা এমন জিনিস পাই না

যাহা আমাদের অন্তঃকরণের গভীর ক্ষুধার খাদ্য জোগাইতে পারে। একজন ধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তি অনেক কাল পালি গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখের কথার আভাসে একদিন বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি এই আলোচনায় রস পান নাই, তাঁহার সময় মিথ্যা কাটিয়াছে।

অথচ এই ধর্ম হইতে কেহ রস পায় নাই এমন কথা বলিতে পারি না। ইহার মধ্যে একটি গভীর রসের প্রস্রবণ আছে যাহা ভক্তচিত্তকে আনন্দে মগ্ন করিয়াছে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করিয়া যে ভক্তির বন্যা দেশকে প্লাবিত করিয়াছিল তাহার সঙ্গে আমাদের দেশে বৈষ্ণবধর্মের আন্দোলনের বিশেষ প্রভেদ দেখি না।

আমাদের দেশে এক বেদান্তসূত্রকে অবলম্বন করিয়া দুই বিপরীত মতবাদ দেখা দিয়াছে, শংকরের অদ্বৈতবাদ আর বৈষ্ণবের দ্বৈতবাদ। শংকরের অদ্বৈতবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া কেহ কেহ নিন্দা করিয়াছেন। ইহা হইতে অন্তত এ কথা বুঝা যায় যে, বৌদ্ধদর্শনের সংঘাতে এবং অনেক পরিমাণে তাহার সহায়তায় শংকরের এই মতের উৎপত্তি হইয়াছে।

কিন্তু সেই দ্রাবিড় হইতেই যে প্রেমের ধর্মের স্রোত সমস্ত ভারতবর্ষে একদিন ব্যাপ্ত হইয়াছে সেই বৈষ্ণবধর্মকেও কি এই বৌদ্ধধর্মই সঞ্জীবিত করিয়া তোলে নাই? আমরা দেখিয়াছি বৌদ্ধ মন্দিরে বৈষ্ণব দেবতা স্থান লইয়াছে, এককালে যাহা বুদ্ধের পদচিহ্ন বলিয়া পূজিত হইত তাহাই বিষ্ণুপদচিহ্ন বলিয়া গণ্য হইয়াছে, রথযাত্রা প্রভৃতি বৌদ্ধ উৎসবকে বৈষ্ণব আত্মসাৎ করিয়াছে।

বৌদ্ধযুগের পূর্বে আমরা যে বৈদিক দেবতাদিগকে দেখি তাঁহারা স্বর্গবাসী দিব্যপুরুষ। সংসারপাশে আবদ্ধ মানুষকে মুক্তিদান করিবার জন্য পরমদয়া যে মানবরূপে মর্ত্যলোকে আবির্ভূত— এই ভাবটির উদ্ভব কি সর্বপ্রথমে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেই নহে? বৈদিক যুগে কি কোথাও আমরা ইহার কোনো আভাস পাইয়াছি?

জাপানী অধ্যাপক আনেসাকি 'হিবার্ট্ জর্নালে' খৃস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের তুলনা করিয়া এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে, এই দুই ধর্মধারার মূলে আমরা একটি জিনিস দেখিতে পাই— উভয় স্থানেই সত্য মানবরূপ গ্রহণ করিয়াছে, ভক্তি নরদেহ ধারণ করিয়াছে, প্রেমেতে এবং ভক্তিতে সত্যকে সম্মিলিত করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য বিশ্বমানবের প্রতিনিধিস্বরূপ একজন মানুষের প্রয়োজন হইয়াছে।

বস্তুত বৌদ্ধধর্মেই সর্বপ্রথমে কোনো-একজন মানুষকে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি করিয়া দেখা হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি তাঁহার ভক্তদের চক্ষে মানুষের সমস্ত স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিয়াই যেন প্রতিভাত হইয়াছেন। তিনি যে অসামান্য শক্তিসম্পন্ন পুরুষ তাহা নহে— তিনি যেন মূর্তিমান অসীমপ্রজ্ঞা, অসীমকরুণা। তিনি মুক্ত হইয়াও কেবল জীবকে দুঃখ হইতে ত্রাণ করিবার জন্যই বন্ধন স্বীকার করিয়াছেন— সে তাঁহার কর্মফলের অনিবার্য বন্ধন নহে; সে তাঁহার প্রেমের দ্বারা, দয়ার দ্বারা স্বেচ্ছারচিত বন্ধন।

কোনো বিশেষ একজন মানুষকে এমন করিয়া অসীম করিয়া দেখা বৌদ্ধধর্মে প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং যিশুকে ত্রাণকর্তা অবতাররূপে স্বীকার করা যে এই বৌদ্ধ মতেরই অনুসরণ করিয়া ঘটে নাই তাহা বলিতে পারি না। বৌদ্ধধর্মের এই অবতারবাদ, এই ভক্তিবাদের দিকটাই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া ভারতে বৌদ্ধধর্মের পরিণামরূপে বিরাজ করিতেছে এইরূপ আমার বিশ্বাস।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সাধু হোনেন জাপানে বৌদ্ধধর্মের মধ্য হইতে যে ভক্তির উৎস উৎসারিত করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ অধ্যাপক আনেসাকি ধর্ম-ইতিহাস-আলোচনার আন্তর্জাতিক সম্মিলনসভায় বিবৃত করিয়াছিলেন। ভাগবত ধর্মের সঙ্গে তাঁহার সে ভক্তিধর্মের মর্মগত প্রভেদ নাই বলিলেই হয়। তিনি বলিয়াছেন, অমিত বুদ্ধের দয়াতেই জীবের মুক্তি। এই অমিত সুখাবতী-নামক বৌদ্ধশাস্ত্রের আনন্দলোকের অধীশ্বর। ইনি সর্বশক্তিমান, করুণাময়, মুক্তিদাতা। যে-কেহ ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিবে সে বুদ্ধকে মনশ্চক্ষুতে দেখিতে পাইবে ও মৃত্যুকালে সমস্ত পার্ষদমণ্ডলী-সহ অমিত আসিয়া তাহাকে আদরে গ্রহণ করিবেন। এই অমিতাভের জ্যোতি বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত, দৃষ্টি মেলিলেই দেখা যায়; এই অমিতায়ুর প্রাণ মুক্তিধামে নিত্যকাল উপলব্ধ, যিনি ইচ্ছা করেন লাভ করিতে পারেন।

ইহা হইতে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন, বুদ্ধ যেখানেই মানুষের জ্ঞানকে ছাড়াইয়া তাহার ভক্তিকে অধিকার করিয়াছেন সেখানেই তাঁহার মানবভাব বিলুপ্ত হইয়াছে; সেখানে তাঁহার ধারণার সঙ্গে ভগবানের ধারণা এক হইয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের তিনটি মুখ—বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ। তাহার ধর্মে জ্ঞান, সংঘে কর্ম ও বুদ্ধে ভক্তি আশ্রিত হইয়া আছে। যদিও এই তিনের পরিপূর্ণ সম্মিলনই বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ আদর্শ, তবু দেশ কাল পাত্রের প্রকৃতি -অনুসারে সে আদর্শ বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তখন ইহার কোনো-একটা দিকই প্রবল হইয়া দেখা দেয়। হীনযান ও মহাযানে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। হীনযানের দিকে যখন দেখি তখন মনে হয় বৌদ্ধধর্মে পূজাভক্তি বুঝি নাই, প্রত্যক্ষের অতীত কোনো মহৎ-সত্তাকে বৌদ্ধধর্ম বুঝি একেবারেই অস্বীকার করে—আবার মহাযানের দিকে তাকাইলে মনে হয় ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে বৌদ্ধধর্ম নানা বিচিত্র রূপ রস সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, কোথাও তাহার জ্ঞানের সংযম নাই।

কিন্তু আসল কথা, বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এই দুটা দিকই আছে। সমস্ত বাসনা ও কর্ম নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া নির্বাণমুক্তির মধ্যেই আপনাকে একেবারে 'না' করিয়া দেওয়াই যে বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্য নহে তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। সর্বভূতের প্রতি প্রেম জিনিসটি শূন্য পদার্থ নহে। এমন বিশ্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন কোনো ধর্মেই নাই। প্রেমের দ্বারা সমস্ত সম্বন্ধ সত্য এবং পূর্ণ হয়, কোনো সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। অতএব প্রেমের চরমে যে বিনাশ ইহা কোনো-মতেই শ্রদ্ধেয় নহে।

এক দিকে স্বার্থপর বাসনাকে ক্ষয় ও অন্য দিকে স্বার্থত্যাগী প্রেমকে সমস্ত সীমা অবলুপ্ত করিয়া বিস্তার করা এই দুই শিক্ষাই যেখানে প্রবল মাত্রায় একত্র মিলিত হইয়াছে, বুঝিতেই হইবে, শূন্যতাই সেখানে লক্ষ্য নহে। কোনো-এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদলের বা কোনো বিশেষ বৌদ্ধগ্রন্থের মধ্যে পোষক প্রমাণ থাকিলেও আমরা তাহাকেই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। মাটি চাষ করাটাকেই মুখ্য বলিয়া গণ্য করিব এবং ফসল বোনাটাকেই গৌণ বলিয়া উপেক্ষা করিব, ইহা হইতেই পারে না।

এই ফসলের কথাটা যেখানে আছে সেইখানেই মানুষের মন বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট হইয়াছে এবং সেই আকর্ষণেই কঠিন সাধনার দুঃখ মানুষ মাথায় করিয়া লইয়াছে। এক-দল তার্কিক এমনভাবে তর্ক করে যে, যেহেতু ক্ষেত্রকে দীর্ণ বিদীর্ণ করিতে বলা হইয়াছে, অতএব সমস্ত ফসল নষ্ট করিয়া ফেলাই এই উপদেশের

তাৎপর্য। আগাছা উৎপাটন করিয়া ফেলাই যে তাহার উদ্দেশ্য সে কথা বুঝিতে বাকি থাকে না যখন শুনিতে পাই 'প্রেমের বীজ মুঠা মুঠা দিকে দিকে ছড়াইয়া দিবে'। এই প্রেমের ফসল নির্বাণ নহে, আনন্দ, সে কথা বলাই বাহুল্য।

শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব শূন্যবাদী ছিলেন না ও তিনি ব্রহ্মকে স্বীকার করিয়াছেন। লেখক বলিয়াছেন, ইতিবুত্তকং -নামক পালিগ্রন্থে লিখিত আছে যে, এক সময়ে ভগবান বুদ্ধ নিম্নলিখিত গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

যস্স রাগো চ দোসো চ অবিজ্জা চ বিরাজিতা
তম্ ভাবিতত্তঞ্ঞতরম্ ব্রহ্মভূতম্ তথাগতম্
বুদ্ধম্ বেরভয়াতীতম্ আহু সব্বপহায়িনন্তি।

যাঁহার রাগ দ্বেষ এবং অবিদ্যা তিরোহিত হইয়াছে তাঁহাকে ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মভূত, তথাগত এবং বৈর ও ভয়াতীত এবং সর্বত্যাগী বুদ্ধ বলা হয়।

ব্রহ্মভূত শব্দের অর্থ এই যে, যিনি ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজ করেন।

মহেশবাবু যে শ্লোকটি উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহাতে ব্রহ্মভূত ব্যক্তির যে-সকল লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে তাহা ত্যাগমূলক। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম কেবলমাত্র ত্যাগের ধর্ম নহে। তা যদি হইত তবে তাহার মধ্যে প্রেমের কোনো স্থান থাকিত না।

বস্তুত বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্বই এই যে, এক দিকে তাহার যেমন কঠোর ত্যাগ অন্য দিকে তাহার তেমনি উদার প্রেম। ইহা কেবলমাত্র জ্ঞানের ধর্ম, ধ্যানের ধর্ম নহে। বুদ্ধদেব নিজের জীবনেই তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি যখন দীর্ঘকাল তপস্যার পর তপস্যা পরিত্যাগ করিলেন তখন যাহারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছিল তাহাদের শ্রদ্ধা তিনি হারাইলেন। কারণ, তখনকার বিশ্বাস ছিল এই যে, তপশ্চরণের দ্বারা সমাধিপ্রাপ্তিই ব্রহ্মলাভ, তাহাই চরম সিদ্ধি। কিন্তু যখন বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন তখনই তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। সে কর্ম বিশুদ্ধ কর্ম, কারণ তাহাতে ভয় লোভ মোহ হিংসা নাই; তাহা স্বার্থবন্ধনের অতীত; তাহা দয়ার কর্ম, প্রেমের কর্ম।

অতএব যেখানে বাসনার ক্ষয় হয় সেখানে যে কিছুই বাকি থাকে না তাহা নহে। সেখানে সমস্ত আসক্তি ও রিপুর আকর্ষণ দূর হইয়া যায় বলিয়াই দয়া প্রেম আনন্দ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সেই পরিপূর্ণতাই ব্রহ্মের স্বরূপ। অতএব যিনি ব্রহ্মভূত হইবেন, ব্রহ্মের স্বরূপে বিরাজ করিবেন, তাঁহাকে কেবল ত্যাগের রিক্ততা নহে, ত্যাগের দ্বারা প্রেমের পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে।

এইজন্যই ব্রহ্মবিহার কাহাকে বলে বুদ্ধ তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন—

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।
তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধ্বদিকে অধোদিকে চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে।

কী দাঁড়াইতে কী চলিতে, কী বসিতে কী শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে— ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

এইরূপ বিশ্বব্যাপী প্রেমের মধ্যে চিত্তকে প্রসারিত করাকেই বুদ্ধ ব্রহ্মবিহার বলিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, বুদ্ধ ব্রহ্মকে প্রেমস্বরূপ বলিয়াই জানিয়াছেন, ব্রহ্ম তাঁহার কাছে শূন্যতা নহে।

এই প্রেমকেই যদি সর্বব্যাপী পরম সত্য বলিয়া গণ্য করা হয় তবে সংসারকে একেবারে বাদ দিয়া বসিলে চলিবে কেন?

করুণা বলো, প্রেম বলো, আপনাকে লইয়া আপনি থাকিতে পারে না। প্রেমের বিষয়কে বাদ দিয়া প্রেমের সত্যতা নাই।

মহাযান-সম্প্রদায়ীরা এ সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা প্রণিধানের যোগ্য। পরে আমরা তাহা আলোচনা করিব।

যিনি নিজে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অথচ যিনি আধুনিক কালের পাঠকসমাজের কাছে নিজের মত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারই নিকট হইতে আমরা এ সম্বন্ধে সহায়তা প্রত্যাশা করিতে পারি।

জাপানী বৌদ্ধ পণ্ডিত আইতারো সুজুকির নিকট হইতে এ বিষয়ে আমরা জ্ঞানলাভ করিতে পারিব। তিনি অশ্বঘোষের গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন এবং মহাযান বৌদ্ধ মতেরও ব্যাখ্যা করিয়া বই লিখিয়াছেন।

তাঁহার গ্রন্থগুলি আমরা দেখিবার সুযোগ পাই নাই। কিন্তু তাঁহার পুস্তক অবলম্বন করিয়া ইংরেজি Quest পত্রে সম্পাদক-মহাশয় যে বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে ইহা বুঝা যায় যে, যেমন বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে কেবলমাত্র শাংকর ভাষ্য পড়িলে ভারতে প্রচলিত বেদান্তকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা হইল মনে করা যায় না, সেইরূপ পালিগ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের যে পরিচয় পাওয়া যায় এবং যাহা অবলম্বন করিয়া সাধারণত য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক দিন ধরিয়া আলোচনা করিতেছেন, বৌদ্ধধর্মের মর্মগত সত্য-সন্ধানের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট নহে।

এ কথা স্পষ্টই মনে হয়, ভারতবর্ষের চিত্ত হইতে জ্ঞানের ধারা এবং প্রেমের ধারাকে বুদ্ধদেব একত্রে আকর্ষণ করিয়া একদিন মিলাইয়াছিলেন। সেই মিলনের বন্যায় একদিন পৃথিবীর দেশ বিদেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। তাহার পরে এত বড়ো মিলনের একটি বিপুল শক্তি ভারতবর্ষ হইতে যে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে তাহা নহে। বৌদ্ধযুগের পরবর্তী দর্শনে পুরাণে কোথাও বা নবীনরূপে, কোথাও বা পুরাতনকে নূতন আকার দিয়া, সেই ধারা নানা শাখা প্রশাখায় নানা নামে আজও প্রবাহিত হইতেছে।

আমরা পূর্বে এক স্থানে আভাস দিয়াছি, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণব-ধর্মের একটা সম্মিলন ঘটিয়াছিল। বস্তুত বৌদ্ধধর্ম বৈষ্ণবধর্মকে সৃষ্টি করে নাই। তাহার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। গুরুকে দেবতা জ্ঞান করা এবং তাঁহার প্রসাদেই মুক্তি এই কথা স্বীকার করা, আমাদের আধুনিক পৌরাণিক ধর্মে দেখা যায়— আমার বিশ্বাস, এইরূপ গুরুবাদের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্ম হইতে। ইহার কারণ এই যে, মানুষের ভক্তিবৃত্তি একটা সত্য পদার্থ, তাহাকে খাদ্য জোগাইতেই হইবে। যে ধর্মের যেমন মতই হউক-না কেন, ভক্তির আশ্রয় কাড়িয়া লইলে ভক্তি যেমন করিয়া হউক আপনার একটা আশ্রয় খাড়া করিয়া লয়। বুদ্ধদেব তাঁহার উপদেশে স্পষ্ট করিয়া ভক্তির কোনো চরম আশ্রয় নির্দেশ করেন নাই। এইজন্য তাঁহার অনুবর্তী-

দের ভক্তিবৃত্তি তাঁহাকেই বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে এবং ভক্তির স্বাভাবিক চরম গতি যে পরমপুরুষে, বুদ্ধকে তাঁহার সঙ্গেই মিলাইয়া লইয়াছে। এইরূপে বৌদ্ধধর্মে মানুষের ভক্তি অগত্যা মানুষকেই আশ্রয় করিয়াছে এবং সেই সমস্ত সীমাকে ভেদ করিয়া, বিদীর্ণ করিয়া, ভগবানের মধ্যে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়াছে। অশ্বত্থ গাছ যখন মন্দিরের ভিত্তিতে জন্মায় তখন সেই মন্দিরকে নিজের প্রয়োজন-অনুসারে ভাঙিয়া-চুরিয়া নানাখানা করিয়া ফেলে— কেননা, যেখানে তাহার খাদ্য, যেমন করিয়া হউক, সেখানে তাহাকে শিকড় পাঠাইতে হইবে। বৌদ্ধধর্ম একদা দেবতাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই এই ধর্মে ভক্তি মানুষকে আশ্রয় করিয়াছিল; কিন্তু মানুষের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ খাদ্য নাই, এই কারণে সে বাঁকিয়া-চুরিয়া যেমন করিয়া পারে আপন আশ্রয়কে অতিক্রম করিয়া নিত্য আশ্রয়ের মধ্যে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছে। এমনি করিয়া এইখানে গুরুবাদের উৎপত্তি ঘটিয়াছে।

মুক্তির পক্ষে আত্মশক্তিই প্রধান এই কথার উপরেই বৌদ্ধধর্মে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। তাহার কারণও ছিল। ভারতবর্ষে যে সময় বুদ্ধের আবির্ভাব সে সময়ে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা মুক্তি হইতে পারে এই কথার খুব প্রভাব ছিল। হোমাদি করিয়া দেবতাদিগকে খুশি করিতে পারিলেই তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি-দ্বারা মানুষ সহজেই সদ্‌গতি লাভ করিবে এই প্রকার তখন বিশ্বাস ছিল। ইহারই বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইয়াছিল, সাধু চিন্তা, সাধু বাক্য, সাধু কর্মের দ্বারাই মুক্তির পথ সুগম হয়। মুক্তি যথার্থ সাধনার দ্বারাই সাধ্য, এখানে অল্পমাত্রও ফাঁকি চলে না।

কিন্তু মানুষ জানে আত্মশক্তিই পর্যাপ্ত নহে। শুধু চোখ দিয়া আমরা দেখি না, বাহিরের আলো নহিলে আমাদের দেখা চলে না। তাহার একটা দিক আছে শক্তির দিক, আর-একটা দিক আছে নির্ভরের দিক। এই দুইয়ের যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে, ইহার একটাকেই একান্ত করিয়া দিলে, এমন একটা প্রতিক্রিয়ার বিপ্লব উপস্থিত হয় যে উল্টা দিকটা অতিমাত্র প্রবল হইয়া উঠে।

বৌদ্ধধর্ম আত্মশক্তিতে মানুষকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিবার পক্ষে যত জোরে টান দিয়াছিল তত জোরেই সে দৈবশক্তির দিকে ছুটিয়াছে। এমন দিন আসিল যেদিন মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধের প্রতি বৌদ্ধের নির্ভরের আর সীমা রহিল না। হোনেন বলিয়াছেন, বড়ো বড়ো ভারী পাথর যেমন জাহাজকে আশ্রয় করিয়া অনায়াসে সমুদ্র পার হইয়া যায়, তেমনি পর্বতাকার পাপের বোঝা -সত্ত্বেও আমরা অমিত বুদ্ধের দয়াবলেই জন্মমৃত্যুর সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারি। হোনেন স্পষ্টই বলেন, 'কখনো মনে করিয়ো না আমরা স্বকর্মের বলে নিজের আন্তরিক ক্ষমতাতেই পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইতে পারি, অসাধুও বুদ্ধের শক্তি-প্রভাবে পরমগতি লাভ করে।'

এই-যে কথা উঠিল, বুদ্ধের প্রসাদ এবং শক্তিই আমাদিগকে ত্রাণ করিতে পারে, এইখানেই মানবগুরুর অলৌকিক ক্ষমতা প্রথম স্বীকার করা হইয়াছে। অবশ্য, মানবকে এখানে যেভাবে কল্পনা করা হয় তাহাতে তাহার মানবত্বই থাকে না, সর্বত্রই গুরুবাদের সেই বিশেষত্ব; গুরুর মধ্যে এমন শক্তির আরোপ করা হয় যাহা মানুষের শক্তি নহে।

সুফিধর্মেও গুরুবাদের এইরূপ প্রবলতা দেখা যায়। অথচ বিশুদ্ধ মুসলমান-ধর্ম এই প্রকার গুরুবাদের বিরুদ্ধ। আমার বিশ্বাস, এশিয়াখণ্ডে মানবগুরুকে

দৈবশক্তিসম্পন্ন ত্রাণকর্তা বলিয়া পূজা করিবার যে প্রথা চলিয়াছে বৌদ্ধধর্ম হইতেই তাহার উৎপত্তি। সুফিধর্মের এই গুরুবাদ পুনশ্চ আমাদের দেশেই বাউল ও কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এমনি করিয়া বৌদ্ধধর্ম হইতে জন্মলাভ করিয়া গুরুবাদ ও অবতারবাদ নব নব আকারে আবর্তিত হইতেছে।

বৌদ্ধধর্মেই মানবকে দেবতার স্থান প্রথম দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর হইতে মানব সেই দেবসিংহাসনের অধিকার আর সহজে ছাড়িতে পারিতেছে না। মানুষের মন একবার যখন এই অদ্ভুত কল্পনায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তখন এই পথে চিন্তা প্রবাহিত হওয়ার বাধা সে আর দেখিতেছে না।

নাম জপ করা এবং নামাবলী-আবৃত্তিও আমরা মহাযান-বৌদ্ধসম্প্রদায়ে দেখিতে পাই। হোনেন বলিয়াছেন, যে-কেহ সর্বান্তঃকরণে অমিতের নাম স্মরণ করিবে তাহাদের কেহই পুণ্যজীবনলাভে বঞ্চিত হইবে না। যে-কোনো প্রাণী বুদ্ধের নাম স্মরণ করে তাহাকে পরমাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, ইহাও হোনেনের উপদেশ। বস্তুত বুদ্ধই যখন বৌদ্ধের ভক্তির একমাত্র ও চরম লক্ষ্য তখন তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার নামই তাহাদের প্রধান সম্বল হইয়াছিল। তিনি নাই, কিন্তু তাঁহার নাম আছে। মানুষের অভাবে মানুষের এই নামকে আশ্রয় না করিয়া উপায় কী?

বৌদ্ধধর্মে একদিন মুক্তির পথ অত্যন্ত দুর্গম ছিল, সংযম এবং ত্যাগের কঠোরতার সীমা ছিল না। এই বৌদ্ধধর্ম করুণাকে আদর করিয়াছে, কিন্তু ভক্তিকে অস্বীকার করিয়াছিল। সেই ভক্তি আসিয়া একদিন আপন অবমাননার প্রতিশোধ লইয়াছে। সাধনার সমস্ত কঠোরতা সে অপহরণ করিয়াছে। পাপের বোঝা লইয়াও মানুষ উদ্ধার পাইবে এই কথা প্রচার করিয়াছে, কেবল নাম-স্মরণে ও উচ্চারণেই মুক্তি হইতে পারে এই আশ্বাস দিয়া মানুষের পুণ্যচেষ্টাকে শিথিল করিয়া দিয়াছে। অবশেষে এই নামের মাহাত্ম্যে নির্ভর এত দূর পর্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, অজ্ঞানে ভ্রমক্রমে নাম-উচ্চারণ করিলেও মহাপাপী উদ্ধার পায় এমন বিশ্বাস ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত কোনো সত্যকে অবজ্ঞা করিয়া কোনো ধর্ম বাঁচে না। জ্ঞানকে হতমান করিলে সে তাহার শোধ লয়, ভক্তিকে অপমান করিলে সে তাহা ক্ষমা করে না। যেখানে অভাব আছে পূরণ করিতে করিতে, যেখানে ত্রুটি আছে সংশোধন করিতে করিতে, ধর্ম অগ্রসর হইয়া চলে। যদি না চলে তবে মানুষের উপায় নাই। এইজন্যই কোনো বড়ো ধর্মকে কোনো এক কালে এক অবস্থায় এক ভাবে আবদ্ধ করিয়া দেখিলে ঠিক দেখা হয় না। এক দিকে হেলিলে অন্য দিকে হেলিয়া সে আপনার ভারসামঞ্জস্য উদ্ধার করে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই দিকেই সে হেলিয়া থাকিতে পারে না—মধ্যপথকে আশ্রয় করিবার জন্যই তাহার চেষ্টা। একেবারেই না যদি করে তবে নৌকাডুবি।

বৌদ্ধধর্ম যে কী, তাহা নির্ণয় করিবার বেলায় তাহার সচলতার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। হীনযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে, মহাযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে। বৌদ্ধধর্ম সংসারের অতীত কোনো পূজনীয় সত্তাকে স্বীকার যে করে না এ কথাকে আমরা বৌদ্ধধর্মের নিত্য সত্য বলিয়া মানি না—এবং বৌদ্ধধর্ম যে আত্মশক্তির সাধনাকে ভক্তির জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে এ কথাও তাহার চিরসত্য নহে। বৌদ্ধ-ধর্ম এখনো মানুষের জ্ঞান ভক্তি কর্মের মধ্যে আপনার অমর সত্যকে বাধামুক্ত

করিয়া তুলিবার জন্য সেই লক্ষ্য-অভিমুখে চলিয়াছে সকল ধর্মেরই গম্যস্থান যেখানে।

১৩১৮

বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন।

এমনি করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, মানুষের অন্তরের জ্ঞান শক্তি ও উদ্যমকে তিনি মহীয়ান করিয়া তুলিলেন। মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।

এমন সময় হিন্দুর চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল, 'সে কথা যথার্থ— মানুষ দীন নহে, হীন নহে, কারণ মানুষের যে শক্তি— যে শক্তি মানুষের মুখে ভাষা দিয়াছে, মনে ধী দিয়াছে, বাহুতে নৈপুণ্য দিয়াছে, যাহা সমাজকে গঠিত করিতেছে, সংসারকে চালনা করিতেছে, তাহাই দৈবী শক্তি।'

বুদ্ধদেব যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করিলেন, নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু তাহারই মধ্যে তাঁহার দেবতাকে লাভ করিলেন। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অন্তর্গত হইয়া গেল। মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতি-মুহূর্তের সুখদুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, ইহাই নব-হিন্দুধর্মের মর্মকথা হইয়া উঠিল। শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের প্রেম ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল— মানুষের ক্ষুদ্র কাজে কর্মে শক্তির প্রত্যক্ষ হাত, মানুষের স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে দিব্যপ্রেমের প্রত্যক্ষলীলা, অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া দেখা দিল। এই দেবতার আবির্ভাবে ছোটোবড়োর ভেদ ঘুচিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমাজে যাহারা ঘৃণিত ছিল তাহারাও দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া অভিমান করিল; প্রাকৃত পুরাণগুলিতে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে।

১৩১০

২

সন্তানের জন্য আমরা মানুষকে দুঃসাধ্যকর্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছি, অনেক জন্তুকেও সেরূপ দেখিয়াছি; স্বদেশীয়-স্বদলের জন্যও আমরা মানুষকে দুরূহ চেষ্টা প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি, পিপীলিকাকেও মধুমক্ষিকাকেও সেরূপ দেখিয়াছি। কিন্তু মানুষের কর্ম যেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া গেছে, সেইখানেই আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির

বিকাশে পরম গৌরব লাভ করিয়াছি। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তান-বাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে— বৎস যেমন গাভীমাতার পূর্ণস্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো শ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য। ঈশ্বর প্রয়োজনবশত নহে, শক্তির অপরিসীম প্রাচুর্য-বশতই আপনাকে নির্বিশেষে নিয়তই বিশ্বরূপে দান করিতেছেন। মানুষের মধ্যেও যখন আমরা সেইরূপ শক্তির প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য ও স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসর্জন দেখিতে পাই, তখনই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিশেষভাবে অনুভব করি।

বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং॥
তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু॥

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধ্বদিকে অধোদিকে চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কী দাঁড়াইতে কী চলিতে, কী বসিতে কী শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে— ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

এই-যে ব্রহ্মবিহারের কথা ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা মুখের কথা নহে, ইহা অভ্যস্ত নীতিকথা নহে; আমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্যে হইতে সত্য হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লইয়া অদ্য আমরা গৌরব করিব। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই ব্রহ্মবিহার, এই সমস্ত-আবশ্যকের-অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি, মানুষের মধ্যে কেবল কথার কথা হইয়া থাকে নাই, ইহা কোনো-না-কোনো স্থানে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তিকে আর আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না; এই শক্তি মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের মতো সঞ্চিত হইয়া গেল। যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অপর্যাপ্ত দয়াশক্তির এমন সত্যরূপে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিয়া উৎসব করিতেছি।

১৩১১

৩

বুদ্ধদেব যখন বেদনাপূর্ণচিত্তে ধ্যানদ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন যে, মানুষের বন্ধন বিকার বিনাশ কেন, দুঃখ জরা মৃত্যু কেন, তখন তিনি কোন্‌ উত্তর পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন? তখন তিনি এই উত্তরই পেয়েছিলেন যে, মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করলেই, আত্মাকে প্রকাশ করলেই, মুক্তিলাভ করবে। সেই প্রকাশের বাধাতেই তার দুঃখ, সেইখানেই তার পাপ।

এইজন্যে তিনি প্রথমে কতকগুলি নিষেধ স্বীকার করিয়ে মানুষকে শীল গ্রহণ

করতে আদেশ করেন। তাকে বললেন, 'তুমি লোভ কোরো না, হিংসা কোরো না, বিলাসে আসক্ত হোয়ো না।' যে-সমস্ত আবরণ তাকে বেষ্টন করে ধরেছে সেইগুলি প্রতিদিনের নিয়ত অভ্যাসে মোচন করে ফেলবার জন্যে তাকে উপদেশ দিলেন। সেই আবরণগুলি মোচন হলেই আত্মা আপনার বিশুদ্ধ স্বরূপটি লাভ করবে।

সেই স্বরূপটি কী? শূন্যতা নয়, নৈষ্কর্ম্য নয়। সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেন নি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ, এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়। সূর্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।

৯ চৈত্র ১৩১৫

৪

বুদ্ধদেব যে দুঃখনিবৃত্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন সে পথের একটা সকলের চেয়ে বড়ো আকর্ষণ কী? সে এই যে, অত্যন্ত দুঃখ স্বীকার করে এই পথে অগ্রসর হতে হয়। এই দুঃখ-স্বীকারের দ্বারা মানুষ আপনাকে বড়ো করে জানে। খুব বড়ো রকম করে ত্যাগ, খুব বড়ো রকম করে ব্রত-পালনের মাহাত্ম্য মানুষের শক্তিকে বড়ো করে দেখায় বলে মানুষের মন তাতে ধাবিত হয়।

১৪ চৈত্র [১৩১৫]

৫

বুদ্ধদেব শূন্যকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন সে তর্কের মধ্যে যেতে চাই নে। কিন্তু তিনি মঙ্গলসাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মুক্তির সাধনাই ছিল স্বার্থত্যাগ অহংকারত্যাগ ক্রোধত্যাগের সাধনা, ক্ষমার সাধনা, দয়ার সাধনা, প্রেমের সাধনা। এমনি করে প্রেম যখন অহং-এর শাসন অতিক্রম করে বিশ্বের মধ্যে অনন্তের মধ্যে মুক্ত হয় তখন সে যা পায় তাকে যে নামই দাও-না কেন, সে কেবল ভাষার বৈচিত্র্য মাত্র, কিন্তু সেই-ই মুক্তি। এই প্রেম যা যেখানে আছে কিছুকেই ত্যাগ করে না; সমস্তকেই সত্যময় করে, পূর্ণতম করে উপলব্ধি করে। নিজেকে পূর্ণের মধ্যে সমর্পণ করবার কোনো বাধাই মানে না।

৭ বৈশাখ [১৩১৬]

৬

বিশেষ স্থানে গিয়ে, বিশেষ মন্ত্র পড়ে, বিশেষ অনুষ্ঠান করে মুক্তিলাভ করা যায়, এই বিশ্বাসের অরণ্যে যখন মানুষ পথ হারিয়েছিল তখন বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিষ্কার ও প্রচার করবার জন্যে এসেছিলেন যে, স্বার্থত্যাগ করে,

সর্বভূতে দয়া বিস্তার করে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেললে তবেই মুক্তি হয়; কোনো স্থানে গেলে, বা জলে স্নান করলে, বা অগ্নিতে আহুতি দিলে, বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাটি শুনতে নিতান্তই সরল, কিন্তু এই কথাটির জন্যে একটি রাজপুত্রকে রাজ্যত্যাগ করে বনে বনে, পথে পথে, ফিরতে হয়েছে।

৭ পৌষ [১৩১৬]

৭

বুদ্ধদেবের আসল কথাটা কী সেটা দেখতে গেলে তাঁর শিক্ষার মধ্যে যে অংশটা নেগেটিভ সে দিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না— যে অংশ পজিটিভ সেইখানেই তাঁর আসল পরিচয়। যদি দুঃখ-দূরই চরম কথা হয় তা হলে বাসনালোপের দ্বারা অস্তিত্বলোপ করে দিলেই সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়— কিন্তু মৈত্রীভাবনা কেন? মৃত্যুদণ্ডই যার উপর বিধান তার আর ভালোবাসা কেন, দয়া কেন? এর থেকে বোঝা যায় যে, এই ভালোবাসাটার দিকেই আসল লক্ষ্য— আমাদের অহং, আমাদের বাসনা স্বার্থের দিকে টানে— বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে, আনন্দের দিকে নয়— এইজন্যই অহংকে নির্বাপিত করে দিলেই সহজেই সেই আনন্দলোক পাওয়া যাবে। আমার 'পূর্ণিমা' বলে চিত্রার একটা কবিতা পড়েছ? তাতে আছে, একদিন সন্ধ্যার সময় বোটে বসে সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি ইংরেজি বই পড়তে পড়তে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে যেমনি বাতি নিবিয়ে দিলুম অমনি দেখি নৌকার সমস্ত জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নার ধারা এসে আমার কক্ষ প্লাবিত করে দিলে। ঐ ছোট্ট একটি বাতি আমার টেবিলে জ্বলছিল বলে আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না আমার ঘরে প্রবেশ করতেই পারে নি— বাইরে যে এত অজস্র সৌন্দর্য দ্যুলোক ভূলোক আচ্ছন্ন করে অপেক্ষা করছিল তা আমি জানতেও পারি নি। অহং আমাদের সেইরকম জিনিস— অত্যন্ত কাছে এই জিনিসটা আমাদের সমস্ত বোধশক্তিকে চার দিক থেকে এমনি আবৃত করে রেখেছে যে অনন্ত-আকাশ-ভরা অজস্র আনন্দ আমরা বোধ করতেই পারছি নে— এই অহংটার যেমনি নির্বাণ হবে অমনি অনির্বচনীয় আনন্দ এক মুহূর্তে আমাদের কাছে পরিপূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ হবেন। সেই আনন্দই যে বুদ্ধদেবের লক্ষ্য তা বোঝা যায় যখন দেখি তিনি লোকলোকান্তরের জীবের প্রতি মৈত্রী বিস্তার করতে বলছেন। জগতে যে অনন্ত আনন্দ বিরাজমান তারও যে ওই প্রকৃতি— সে যে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তর প্রতি অপরিমেয় প্রেম। এই জগদ্‌ব্যাপী প্রেমকে সত্যরূপে লাভ করতে গেলে নিজের অহংকে নির্বাপিত করতে হয়, এই শিক্ষা দিতেই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন— নইলে মানুষ বিশুদ্ধ আত্মহত্যার তত্ত্বকথা শোনবার জন্য কখনোই তাঁর চার দিকে ভিড় করে আসত না।

৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

৮

বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার

প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই।

তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি; পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনো দিকেই মানুষকে খর্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।

১৩১৯

৯

বৌদ্ধযুগ ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধান যুগ। ইহা আর্য-ভারতবর্ষ ও হিন্দু-ভারতবর্ষের মাঝখানকার যুগ। আর্যযুগে ভারতের আগন্তুক ও আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। বৌদ্ধযুগে সেই-সকল বিরুদ্ধ জাতিদের মাঝখানকার বেড়াগুলি একধর্মবন্যায় ভাঙিয়াছিল— শুধু তাই নয়, বাহিরের নানা জাতি এই ধর্মের আহ্বানে ভারতবাসীদের সঙ্গে মিশিয়াছিল। তার পরে এই মিশ্রণকে যথাসম্ভব স্বীকার করিয়া এবং ইহাকে লইয়া একটা ব্যবস্থা খাড়া করিয়া আধুনিক হিন্দুযুগ মাথা তুলিয়াছে। বৈদিকযুগ ও হিন্দুযুগের মধ্যে আচারে ও পূজাতন্ত্রে যে গুরুতর পার্থক্য আছে তাহার মাঝখানের সন্ধিস্থল বৌদ্ধযুগ। এই যুগে আর্য ও অনার্য এক গণ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে উভয়ের মানসপ্রকৃতি ও বাহ্য আচারের মধ্যে আদান-প্রদান ও রফানিষ্পত্তির চেষ্টা হইতে থাকে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন; তাই সকল দিকেই বেশ সুসংগত রকমে রফা হইয়া গিয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। আভ্যন্তরিক নানা অসংগতির জন্য আমরা অন্তরে বাহিরে দুর্বল রহিয়াছি; সামাজিক ব্যবহারে এবং ধর্মবিশ্বাসে পদে পদেই বিচারবুদ্ধিকে অন্ধ করিয়া আমাদিগকে চলিতে হয়— যাহা-কিছু আছে তাহাকে বুদ্ধির দ্বারা মিলাইয়া লওয়া নহে, অভ্যাসের দ্বারা মানিয়া লওয়াই আমরা প্রধানত আশ্রয় করিয়াছি।

যাহাই হউক, আমাদের এই বর্তমান যুগকে যদি ঠিকমত চিনিতে হয় তবে পূর্ববর্তী সন্ধিযুগের সঙ্গে আমাদের ভালোরূপ পরিচয় হওয়া চাই। একটা কারণে আমাদের দেশে এই পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধধর্মের যে সম্প্রদায়ের রূপটিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন তাহা হীনযান সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বজ্ঞানের দিকেই বেশি ঝোঁক দিয়াছে। মহাযান সম্প্রদায়ে বৌদ্ধধর্মের হৃদয়ের দিকটা প্রকাশ করে। সেইজন্য মানব-ইতিহাসের সৃষ্টিতে এই সম্প্রদায়ই প্রধানতর। শ্যাম, চীন, জাপান, জাভা প্রভৃতি দেশে এই মহাযান সম্প্রদায়ই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এইজন্যই মহাযান সম্প্রদায় এমন একটা প্রণালীর মতো হইয়াছিল যাহার ভিতর দিয়া নানা জাতির নানা ক্রিয়াকর্ম মন্ত্রতন্ত্র পূজার্চনা ভারতে প্রবাহিত এবং এক মন্থনদণ্ডের দ্বারা মথিত হইয়াছে।

এই মহাযান সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগুলিকে আলোচনা করিয়া দেখিলে আমাদের পুরাণগুলির সঙ্গে সকল বিষয়েই তাহার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সাদৃশ্যের কিছু অংশ বৌদ্ধধর্মের নিজেরই বিশুদ্ধ স্বরূপগত, কিন্তু অনেকটা ভারতের অবৈদিক সমাজের সহিত মিশ্রণ-জনিত। এই মিশ্রণের উপাদানগুলি নূতন নহে; ইহারাও অনেক কালের পুরাতন, মানবের শিশুকালের সৃষ্টি। দিনের বেলায় যেমন তারা দেখা যায় না তেমনি বৈদিক কালের সাহিত্যে এগুলি প্রকাশ পায় নাই, দেশের মধ্যে ইহারা ছড়ানো ছিল। বৌদ্ধযুগে যখন নানা জাতির সম্মিশ্রণ হইল তখন ক্রমশ ইহাদের প্রভাব জাগিয়া উঠিল এবং বৌদ্ধযুগের শেষ ভাগে ইহারাই আর-সমস্তকে ঠেলিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। সেই ভিড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা করিবার চেষ্টা, যাহা নিতান্ত অনার্য তাহাকে আর্যবেশ পরাইবার প্রয়াস, ইহাই হিন্দুযুগের ঐতিহাসিক সাধনা।

১৩২৬

১০

একদিন বুদ্ধ বললেন, আমি সমস্ত মানুষের দুঃখ দূর করব। দুঃখ তিনি সত্যই দূর করতে পেরেছিলেন কি না সেটি বড়ো কথা নয়; বড়ো কথা হচ্ছে তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতবর্ষ ধনী হোক, প্রবল হোক, এ তাঁর তপস্যা ছিল না; সমস্ত মানুষের জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। আজ ভারতের মাটিতে আবার সেই সাধনা জেগে উঠুক, সেই ইচ্ছাকে ভারতবর্ষ থেকে কি দূর করে দেওয়া চলে!

১৭ ভাদ্র ১৩৩১

১১

ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্যকে জানতে হলে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে বসে ধূলিকলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে ভারতবর্ষের নিত্য-কালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে।

চীনে গেলাম। দেখলাম জাত হিসাবে তারা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নাকে চোখে ভাষায় ব্যবহারে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো মিলই নেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন একটি গভীর আত্মীয়তার যোগ অনুভব করা গেল, যা ভারতবর্ষীয় অনেকের সঙ্গে করা কঠিন হয়ে উঠেছে। এই যোগ রাজশক্তির দ্বারা স্থাপন করা হয় নি; এই যোগ উদ্যত তরবারির জোরেও নয়; এই যোগ কাউকে দুঃখ দিয়ে নয়, নিজে দুঃখ স্বীকার করে। অত্যন্ত পরের মধ্যেও যে সত্যের বলে অত্যন্ত আত্মীয়তা স্বীকার করা সম্ভব হয় সেই সত্যের জোরেই চীনের সঙ্গে সত্যভারতের চিরকালের যোগবন্ধন বাঁধা হয়েছে। এই সত্যের কথা বিদেশী পলিটিক্সের ইতিহাসে স্থান পায় নি বলে আমরা একে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি নে। কিন্তু একে বিশ্বাস করবার প্রমাণ ভারতের বাইরে সুদূর দেশে আজও রয়ে গেছে।

জাপানে প্রতিদিনের ব্যবহারে জাপানির সুগভীর ধৈর্য, আত্মসংযম, তার

রসবোধের বিচিত্র পরিচয়ে যখন বিস্মিত হতেছিলাম তখন এ কথা কতবার শুনেছি যে, এই-সকল গুণের প্রেরণা অনেকখানি বৌদ্ধধর্মের যোগে ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। সেই মূল প্রেরণা স্বয়ং ভারতবর্ষ থেকে আজ লুপ্তপ্রায় হল। সত্যের যে বন্যা একদিন ভারতবর্ষের দুই কূল উপ্‌চিয়ে দেশে দেশে বয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষের প্রবাহিণীতে আজ তা তলায় নেমে আসছে, কিন্তু তার জলসঞ্চয় আজও দূরের নানা জলাশয়ে গভীর হয়ে আছে। এই কারণেই সেই-সকল জায়গা আধুনিক ভারতবাসীর পক্ষে তীর্থস্থান। কেননা, ভারতবর্ষের ধ্রুব পরিচয় সেই-সব জায়গাতেই।

শ্রাবণ ১৩৩৪

১২

বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে; এর মধ্যে শুদ্ধ মানুষের নয়, অন্য জীবেরও, যথেষ্ট স্থান আছে। জাতককাহিনীর মধ্যে খুব একটা মস্ত কথা আছে: তাতে বলেছে, যুগ-যুগ ধরে বুদ্ধ সর্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশ প্রকাশিত। প্রাণিজগতে নিত্যকাল ভালো-মন্দ'র যে দ্বন্দ্ব চলেছে সেই দ্বন্দ্বের প্রবাহ ধরেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত। অতি সামান্য জন্তুর ভিতরেও অতি সামান্য রূপেই এই ভালোর শক্তি মন্দ'র ভিতর দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলছে; তার চরম বিকাশ হচ্ছে অপরিমেয় মৈত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ। জীবে জীবে লোকে লোকে সেই অসীম মৈত্রী অল্প অল্প করে নানা দিক থেকে আপন গ্রন্থি মোচন করছে, সেই দিকেই মোক্ষের গতি। জীব মুক্ত নয়, কেননা আপনার দিকেই তার টান; সমস্ত প্রাণীকে নিয়ে ধর্মের যে অভিব্যক্তি তার প্রণালী-পরম্পরায় সেই আপনার দিকে টানের 'পরে আঘাত লাগছে। সেই আঘাত যে পরিমাণে যেখানেই দেখা যায় সেই পরিমাণে সেখানেই বুদ্ধের প্রকাশ। মনে আছে, ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, দড়িতে বাঁধা ধোপার বাড়ির গাধার কাছে এসে একটি গাভী স্নিগ্ধ চক্ষে তার গা চেটে দিচ্ছে; দেখে আমার বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। বুদ্ধই যে তাঁর কোনো-এক জন্মে সেই গাভী হতে পারেন, এ কথা বলতে জাতককথা-লেখকের একটুও বাধত না। কেননা, গাভীর এই স্নেহেরই শেষ গিয়ে পৌঁচেছে মুক্তির মধ্যে। জাতককথায় অসংখ্য সামান্যের মধ্যে দিয়েই চরম অসামান্যকে স্বীকার করেছে। এতেই সামান্য এত বড়ো হয়ে উঠল। সেইজন্যেই এত বড়ো মন্দিরভিত্তির গায়ে গায়ে তুচ্ছ জীবনের বিবরণ এমন সরল ও নির্মল শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত। ধর্মেরই প্রকাশচেষ্টার আলোতে সমস্ত প্রাণীর ইতিহাস বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে মহিমান্বিত।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ [১৩৩৪]

১৩

বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন, সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ মৈত্রী পোষণ করবে। দাঁড়াতে বসতে চলতে শুতে যাবৎ

নিদ্রিত না হবে, এই মৈত্রীস্মৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকবে— একেই বলে ব্রহ্মবিহার।

এত বড়ো উপদেশ মানুষকেই দেওয়া চলে। কেননা, মানুষের মধ্যে গভীর হয়ে আছে সোঽহংতত্ত্ব। সে কথা বুদ্ধদেব নিজের মধ্য থেকেই জেনেছেন, তাই বলেছেন, অপরিমাণ প্রেমেই আপনার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে মানুষ প্রকাশ করে।

অথর্ববেদ বলেন, তস্মাদ্ বৈ বিদ্বান্ পুরুষমিদং ব্রহ্মেতি মন্যতে— যিনি বিদ্বান্ তিনি মানুষকে তার প্রত্যক্ষের অতীত বৃহৎ বলেই জানেন। সেইজন্যে তিনি তার কাছে প্রত্যাশা করতে পারেন দুঃসাধ্য কর্মকে, অপরিমিত ত্যাগকে। যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্— যাঁরা ভূমাকে জানেন মানুষে, তাঁরা জানেন পরম দেবতাকেই। সেই মানবদেবতাকে মানুষের মধ্যে জেনেছিলেন বলেই বুদ্ধদেব উপদেশ দিতে পেরেছিলেন—

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।

মা যেমন আপন আয়ু ক্ষয় করেই নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি মনে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাবে। মাথা গনে বলব না, কজন এই উপদেশ পালন করতে পারে। সেই গণনায় নয় সত্যের বিচার।

মানুষের অসীমতা যিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলেন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় নি মাথা গোনবার। তিনি অসংকোচে মানুষের মহামানবকে আহ্বান করেছিলেন; বলেছিলেন, অপরিমাণ ভালোবাসায় প্রকাশ করো আপনার অন্তরে ব্রহ্মকে। এই বাণী অসংকোচে সকলকে শুনিয়ে তিনি মানুষকে শ্রদ্ধা করেছিলেন।

[১৩৩৯]

বুদ্ধজন্মোৎসব

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোরকুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

এস দানবীর, দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা—
মহাভিক্ষু, লও সবার অহংকারভিক্ষা।
লোক লোক ভুলুক শোক, খণ্ডন কর মোহ,
উজ্জ্বল কর জ্ঞানসূর্য-উদয়-সমারোহ—
প্রাণ লভুক সকল ভুবন, নয়ন লভুক অন্ধ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয় তাপদহনদীপ্ত,
বিষয়বিষবিকারজীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন তব দক্ষিণ পাণি—
তব শুভসংগীতরাগ, তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

২১ ফাল্গুন ১৩৩৩

সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম-অনুসারে পঠনীয়

সকলকলুষতামসহর

সকল কলুষতামস হর,
জয় হোক তব জয়।
অমৃতবারি সিঞ্চন কর
নিখিলভুবনময়।
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম!

জ্ঞানসূর্য-উদয়ভাতি
ধ্বংস করুক তিমিররাতি,
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি
অপগত কর ভয়।
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম!

মোহমলিন অতিদুর্দিন—
শঙ্কিতচিত পান্থ
জটিলগহনপথসংকট-
সংশয়-উদ্‌ভ্রান্ত।
করুণাময়, মাগি শরণ—
দুর্গতিভয় করহ হরণ,
দাও দুঃখবন্ধতরণ
মুক্তির পরিচয়।
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম!

বৈশাখী পূর্ণিমা
১৩৩৮

বুদ্ধদেবের প্রতি

সারনাথে মূলগন্ধকুটীবিহার-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে রচিত

ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি।
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ-আবরণ--
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।

চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান্।
খুলে যাক রুদ্ধ দ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত-অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শত কণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি—
এনে দিক অজেয় আহ্বান।

দার্জিলিং
২৪ অক্টোবর ১৯৩১ [১৩৩৮]

বোরোবুদুর

সেদিন প্রভাতে সূর্য এইমত উঠেছে অম্বরে
অরণ্যের বন্দনমর্মরে;
নীলিম বাষ্পের স্পর্শ লভি
শৈলশ্রেণী দেখা দেয় যেন ধরণীর স্বপ্নচ্ছবি।

নারিকেলবনপ্রান্তে নরপতি বসিল একাকী
ধ্যানমগ্ন-আঁখি।
উচ্চে উচ্ছ্বসিল প্রাণ অন্তহীন আকাঙ্ক্ষাতে,
কী সাহসে চাহিল পাঠাতে
আপন পূজার মন্ত্র যুগ-যুগান্তরে।

অপরূপ অমৃত অক্ষরে
লিখিল বিচিত্র লেখা; সাধকের ভক্তির পিপাসা
রচিল আপন মহাভাষা—
সর্বকাল সর্বজন
আনন্দে পড়িতে পারে যে ভাষার লিপির লিখন।

সে লিপি ধরিল দ্বীপ আপন বক্ষের মাঝখানে,
সে লিপি তুলিল গিরি আকাশের পানে।
সে লিপির বাণী সনাতন
করেছে গ্রহণ
প্রথম-উদিত সূর্য শতাব্দীর প্রত্যহ প্রভাতে।

অদূরে নদীর কিনারাতে
আল-বাঁধা মাঠে
কত যুগ ধরে চাষী ধান বোনে আর ধান কাটে—
আঁধারে আলোয়
প্রত্যহের প্রাণলীলা সাদায় কালোয়
ছায়ানাট্যে ক্ষণিকের নৃত্যচ্ছবি যায় লিখে লিখে,
লুপ্ত হয় নিমিখে নিমিখে।
কালের সে লুকাচুরি, তারি মাঝে সংকল্প সে কার
প্রতিদিন করে মন্ত্রোচ্চার,
বলে অবিশ্রাম—
'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।

প্রাণ যার দু দিনের, নাম যার মিলালো নিঃশেষে
সংখ্যাতীত বিস্মৃতের দেশে,
পাষাণের ছন্দে ছন্দে বাঁধিয়া গেছে সে
আপনার অক্ষয় প্রণাম—
'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।

কত যাত্রী কত কাল ধরে
নম্রশিরে দাঁড়ায়েছে হেথা করজোড়ে।
পূজার গম্ভীর ভাষা খুঁজিতে এসেছে কতদিন
তাদের আপন কণ্ঠ ক্ষীণ।
বিপুল ইঙ্গিতপুঞ্জ পাষাণের সংগীতের তানে
আকাশের পানে
উঠেছে তাদের নাম,
জেগেছে অনন্ত ধ্বনি 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।

অর্থ আজ হারায়েছে সে যুগের লিখা,
নেমেছে বিস্মৃতিকুহেলিকা।

অর্ঘ্যশূন্য কৌতূহলে দেখে যায় দলে দলে আসি
ভ্রমণবিলাসী—
বোধশূন্য দৃষ্টি তার নিরর্থক দৃশ্য চলে গ্রাসি।
চিত্ত আজি শান্তিহীন লোভের বিকারে,
হৃদয় নীরস অহংকারে।
ক্ষিপ্রগতি বাসনার তাড়নায় তৃপ্তিহীন ত্বরা,
কম্পমান ধরা।
বেগ শুধু বেড়ে চলে ঊর্ধ্বশ্বাসে মৃগয়া-উদ্দেশে—
লক্ষ্য ছোটে পথে পথে, কোথাও পোঁছে না পরিশেষে।

অন্তহারা সঞ্চয়ের আহুতি মাগিয়া
সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া।
তাই আসিয়াছে দিন,
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির—
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।

বোরোবুদুর। যবদ্বীপ
২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ [১৩৩৪]

সিয়াম

প্রথম দর্শনে

ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে
বজ্রমন্দ্ররবে
আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পূরবে,
মরুপারে, শৈলতটে, সমুদ্রের কূলে উপকূলে,
দেশে দেশে চিত্তদ্বার দিল যবে খুলে
আনন্দমুখর উদ্‌বোধন—
উদ্দাম ভাবের ভার ধরিতে নারিল যবে মন,
বেগ তার ব্যাপ্ত হল চারি ভিতে,
দুঃসাধ্য কীর্তিতে কর্মে, চিত্রপটে মন্দিরে মূর্তিতে,

আত্মদানসাধনস্ফূর্তিতে,
উচ্ছ্বসিত উদার উক্তিতে,
স্বার্থঘন দীনতার বন্ধনমুক্তিতে—
সে মন্ত্র অমৃতবাণী, হে সিয়াম, তব কানে
কবে এল কেহ নাহি জানে
অভাবিত অলক্ষিত আপনাবিস্মৃত শুভক্ষণে
দূরাগত পান্থ সমীরণে।

সে মন্ত্র তোমার প্রাণে লভি প্রাণ
বহুশাখাপ্রসারিত কল্যাণে করেছে ছায়াদান।
সে মন্ত্র-ভারতী
দিল অস্খলিত গতি
কত শত শতাব্দীর সংসারযাত্রারে—
শুভ আকর্ষণে বাঁধি তারে
এক ধ্রুবকেন্দ্র-সাথে
চরম মুক্তির সাধনাতে—
সর্বজনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে—
এক ধর্ম, এক সংঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে।

সে বাণীর সৃষ্টিক্রিয়া নাহি জানে শেষ,
নবযুগযাত্রাপথে দিবে নিত্য নূতন উদ্দেশ।
সে বাণীর ধ্যান
দীপ্যমান করি দিবে নব নব জ্ঞান
দীপ্তির ছটায় আপনার,
এক সূত্রে গাঁথি দিবে তোমার মানসরত্নহার।

হৃদয়ে হৃদয়ে মিল করি
বহু যুগ ধরি
রচিয়া তুলেছ তুমি সুমহৎ জীবনমন্দির,
পদ্মাসন আছে স্থির,
ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন
চিরদিন—
মৌন যাঁর শান্তি অন্তহারা,
বাণী যাঁর সকরুণ সান্ত্বনার ধারা।

আমি সেথা হতে এনু যেথা ভগ্নস্তূপে
বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ণকীর্ণ মূক শিলারূপে,
ছিল যেথা সমাচ্ছন্ন করি
বহু যুগ ধরি
বিস্মৃতিকুয়াশা
ভক্তির-বিজয়স্তম্ভে-সমুৎকীর্ণ অর্চনার ভাষা।

সে অর্চনা সেই বাণী
আপন সজীব মূর্তিখানি
রাখিয়াছে ধ্রুব করি শ্যামল সরস বক্ষে তব,
আজি আমি তারে দেখি লব।

ভারতের যে মহিমা
ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন-অঙ্গন-সীমা
অর্ঘ্য দিব তারে
ভারত-বাহিরে তব দ্বারে।
স্নিগ্ধ করি প্রাণ
তীর্থজলে করি যাব স্নান
তোমার জীবনধারাস্রোতে,
যে নদী এসেছে বহি ভারতের পুণ্যযুগ হতে—
যে যুগের গিরিশৃঙ্গ-'পর
একদা উদিয়াছিল প্রেমের মঙ্গলদিনকর।

ব্যাঙ্কক
১১ অক্টোবর ১৯২৭ [১৩৩৪]

খৃষ্ট

যিশুচরিত

বাউল সম্প্রদায়ের একজন লোককে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'তোমরা সকলের ঘরে খাও না?' সে কহিল, 'না।' কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, 'যাহারা আমাদের স্বীকার করে না আমরা তাহাদের ঘরে খাই না।' আমি কহিলাম, 'তারা স্বীকার না করে নাই করিল, তোমরা স্বীকার করিবে না কেন?' সে লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরল ভাবে কহিল, 'তা বটে, ঐ জায়গাটাতে আমাদের একটু প্যাঁচ আছে।'

আমাদের সমাজে যে ভেদবুদ্ধি আছে তাহারই দ্বারা চালিত হইয়া কোথায় আমরা অন্ন গ্রহণ করিব আর কোথায় করিব না তাহারই কৃত্রিম গণ্ডিরেখা-দ্বারা আমরা সমস্ত পৃথিবীকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি। এমন-কি, যে-সকল মহাপুরুষ সমস্ত পৃথিবীর সামগ্রী, তাঁহাদিগকেও এইরূপ কোনো-না-কোনো একটা নিষিদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পর করিয়া রাখিয়াছি। তাঁহাদের ঘরে অন্ন গ্রহণ করিব না বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া আছি। সমস্ত জগৎকে অন্ন বিতরণের ভার দিয়া বিধাতা যাঁহাদিগকে পাঠাইয়াছেন আমরা স্পর্ধার সঙ্গে তাঁহাদিগকেও জাতে ঠেলিয়াছি।

মহাত্মা যিশুর প্রতি আমরা অনেক দিন এইরূপ একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু এজন্য একলা আমাদিগকেই দায়ী করা চলে না। আমাদের খৃস্টের পরিচয় প্রধানত সাধারণ খৃস্টান মিশনরিদের নিকট হইতে। খৃস্টকে তাঁহারা খৃস্টানি-দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের কাছে ধরিয়াছেন। এ পর্যন্ত বিশেষভাবে তাঁহাদের ধর্মমতের দ্বারা আমাদের ধর্মসংস্কারকে তাঁহারা পরাভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং আত্মরক্ষার চেষ্টায় আমরা লড়াই করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া থাকি।

লড়াইয়ের অবস্থায় মানুষ বিচার করে না। সেই মত্ততার উত্তেজনায় আমরা খৃস্টানকে আঘাত করিতে গিয়া খৃস্টকেও আঘাত করিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা জগতের মহাপুরুষ, শত্রু কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে আঘাত করা আত্মঘাতেরই নামান্তর। বস্তুত শত্রুর প্রতি রাগ করিয়া আমাদেরই দেশের উচ্চ আদর্শকে খর্ব করিয়াছি— আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া দিয়াছি।

সকলেই জানেন ইংরাজি শিক্ষার প্রথমাবস্থায় আমাদের সমাজে একটা সংকটের দিন উপস্থিত হইয়াছিল। তখন সমস্ত সমাজ টলমল, শিক্ষিতের মন আন্দোলিত। ভারতবর্ষে পূজার্চনা সমস্তই বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুর খেলামাত্র—এ দেশে ধর্মের কোনো উচ্চ আদর্শ, ঈশ্বরের কোনো সত্য উপলব্ধি কোনো কালে ছিল না— এই বিশ্বাসে তখন আমরা নিজেদের সম্বন্ধে লজ্জা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এইরূপে হিন্দু সমাজের কূল যখন ভাঙিতেছিল, শিক্ষিতদের মন যখন ভিতরে ভিতরে বিদীর্ণ হইয়া দেশের দিক হইতে ধসিয়া পড়িতেছিল, স্বদেশের প্রতি অন্তরের অশ্রদ্ধা যখন বাহিরের আক্রমণের সম্মুখে আমাদিগকে দুর্বল করিয়া

তুলিতেছিল, সেই সময়ে খৃস্টান মিশনারি আমাদের সমাজে যে বিভীষিকা আনয়ন করিয়াছিল তাহার প্রভাব এখনও আমাদের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ দূর হয় নাই।

কিন্তু সেই সংকট আজ আমাদের কাটিয়া গিয়াছে। সেই ঘোরতর দুর্যোগের সময় রামমোহন রায় বাহিরের আবর্জনা ভেদ করিয়া আমাদের দেশের নিত্য সম্পদ সংশয়াকুল স্বদেশবাসীর নিকট উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন। এখন ধর্মসাধনায় আমাদের ভিক্ষাবৃত্তির দিন ঘুচিয়াছে। এখন হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র কতকগুলি অদ্ভুত কাহিনী এবং বাহ্য-আচার-রূপে আমাদের নিকট প্রকাশমান নহে। এখন আমরা নির্ভয়ে সকল ধর্মের মহাপুরুষদের মহাবাণী-সকল গ্রহণ করিয়া আমাদের পৈতৃক ঐশ্বর্যকে বৈচিত্র্যদান করিতে পারি।

কিন্তু দুর্গতির দিনে মানুষ যখন দুর্বল থাকে তখন সে এক দিকের আতিশয্য হইতে রক্ষা পাইলে আর-এক দিকের আতিশয্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। বিকারের জ্বরে মানুষের দেহের তাপ যখন উপরে চড়ে তখনও ভয় লাগাইয়া দেয় আবার যখন নিচে নামিতে থাকে তখনও সে ভয়ানক। আমাদের দেশের বর্তমান বিপদ আমাদের পূর্বতন বিপদের উল্টাদিকে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতেছে।

আমাদের দেশের মহত্ত্বের মূর্তিটি প্রকাশ করিয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করিবার বাধা আমাদের শক্তির জীর্ণতা। আমাদের অধিকার পাকা হইল না, কিন্তু আমাদের অহংকার বাড়িল। পূর্বে একদিন ছিল যখন আমরা কেবল সংস্কারবশত আমাদের সমাজ ও ধর্মের সমস্ত বিকারগুলিকে পুঞ্জীভূত করিয়া তাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম। এখন অহংকারবশতই সমস্ত বিকৃতিকে জোর করিয়া স্বীকার করাকে আমরা বলিষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া মনে করি। ঘরে ঝাঁট দিব না, কোনো আবর্জনাকেই বাহিরে ফেলিব না, যেখানে যাহা-কিছু আছে সমস্তকেই গায়ে মাখিয়া লইব, ধুলামাটির সঙ্গে মণিমাণিক্যকে নির্বিচারে একত্রে রক্ষা করাকেই সমন্বয়নীতি বলিয়া গণ্য করিব—এই দশা আমাদের ঘটিয়াছে। ইহা বস্তুত তামসিকতা। নির্জীবতাই যেখানে যাহা-কিছু আছে সমস্তকেই সমান মূল্যে রক্ষা করে। তাহার কাছে ভালোও যেমন মন্দও তেমন, ভুলও যেমন সত্যও তেমনি।

জীবনের ধর্মই নির্বাচনের ধর্ম। তাহার কাছে নানা পদার্থের মূল্যের তারতম্য আছেই। সেই অনুসারে সে গ্রহণ করে, ত্যাগ করে। এবং যাহা তাহার পক্ষে যথার্থ শ্রেয় তাহাকেই সে গ্রহণ করে এবং বিপরীতকেই বর্জন করিয়া থাকে।

পশ্চিমের আঘাত খাইয়া আমাদের দেশে যে জাগরণ ঘটিয়াছে তাহা মুখ্যত জ্ঞানের দিকে। এই জাগরণের প্রথম অবস্থায় আমরা নিজের সম্বন্ধে বার বার ইহাই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম যে, আমরা জ্ঞানে যাহা বুঝি ব্যবহারে তাহার উল্টা করি। ইহাতে ক্রমে যখন আত্মধিক্কারের সূত্রপাত হইল তখন নিজের বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের সামঞ্জস্য-সাধনের অতি সহজ উপায় বাহির করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের যাহা-কিছু আছে সমস্তই ভালো, তাহার কিছুই বর্জনীয় নহে, ইহাই প্রমাণ করিতে বসিয়াছি।

এক দিকে আমরা জাগিয়াছি। সত্য আমাদের দ্বারে আঘাত করিতেছেন তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দিতেছি না—সাড়া দিতেছি, কিন্তু পাদ্য-অর্ঘ্য আনিয়া দিতেছি না। ইহাতে আমাদের অপরাধ প্রতিদিন কেবল বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু সেই অপরাধকে ঔদ্ধত্যের সহিত অস্বীকার করিবার যে অপরাধ সে আরও গুরুতর। লোকভয়ে এবং অভ্যাসের আলস্যে সত্যকে

আমরা যদি দ্বারের কাছে দাঁড় করাইয়া লজ্জিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম তাহা হইলেও তেমন ক্ষতি হইত না, কিন্তু 'তুমি সত্য নও— যাহা অসত্য তাহাই সত্য' ইহাই প্রাণপণ শক্তিতে প্রমাণ করিবার জন্য যুক্তির কুহক বিস্তার করার মতো এত বড়ো অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা ঘরের পুরাতন জঞ্জালকে বাঁচাইতে গিয়া সত্যকে বিনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না।

এই চেষ্টার মধ্যে যে দুর্বলতা প্রকাশ পায় তাহা মূলত চরিত্রের দুর্বলতা। চরিত্র অসাড় হইয়া আছে বলিয়াই আমরা কাজের দিকটাতে আপনাকে ও সকলকে ফাঁকি দিতে উদ্যত। যে-সকল আচার বিচার বিশ্বাস পূজাপদ্ধতি আমাদের দেশের শতসহস্র নরনারীকে জড়তা মূঢ়তা ও নানা দুঃখে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, যাহা আমাদিগকে কেবলই ছোটো করিতেছে, ব্যর্থ করিতেছে, বিচ্ছিন্ন করিতেছে, জগতে আমাদিগকে সকলের কাছে অপমানিত ও সকল আক্রমণে পরাভূত করিতেছে, কোনোমতেই আমরা সাহস করিয়া স্পষ্ট করিয়া তাহাদের অকল্যাণরূপ দেখিতে এবং ঘোষণা করিতে চাহি না— নিজের বুদ্ধির চোখে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার ধুলা ছড়াইয়া নিশ্চেষ্টতার পথে স্পর্ধা করিয়া পদচারণ করিতে চাই। ধর্মবুদ্ধি চরিত্রবল যখন জাগিয়া উঠে তখন সে এই-সকল বিড়ম্বনা-সৃষ্টিকে প্রবল পৌরুষের সহিত অবজ্ঞা করে। মানুষের যে-সকল দুঃখ দুর্গতি সম্মুখে স্পষ্ট বিদ্যমান তাহাকে সে হৃদয়হীন ভাবুকতার সূক্ষ্ম কারুকার্যে মনোরম করিয়া তোলার অধ্যবসায়কে কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারে না।

ইহা হইতেই আমাদের প্রয়োজন বুঝা যাইবে। জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ বলবৃদ্ধি হইতেছে না। আমাদের মনুষ্যত্বকে সমগ্রভাবে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলার অভাবে আমরা নির্ভীক পৌরুষের সহিত পূর্ণশক্তিতে জীবনকে মঙ্গলের সরল পথে প্রবাহিত করিতে পারিতেছি না।

এই দুর্গতির দিনে সেই মহাপুরুষেরাই আমাদের সহায় যাঁহারা কোনো কারণেই কোনো প্রলোভনেই আপনাকে এবং অন্যকে বঞ্চনা করিতে চান নাই, যাঁহারা প্রবল বলে মিথ্যাকে অস্বীকার করিয়াছেন এবং সমস্ত পৃথিবীর লোকের নিকট অপমানিত হইয়াও সত্যকে যাঁহারা নিজের জীবন দিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের চরিত চিন্তা করিয়া সমস্ত কৃত্রিমতা কুটিলতর্ক ও প্রাণহীন বাহ্য-আচারের জটিল বেষ্টন হইতে চিত্ত মুক্তিলাভ করিয়া রক্ষা পায়।

যিশুর চরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যাঁহারা মহাত্মা তাঁহারা সত্যকে অত্যন্ত সরল করিয়া সমস্ত জীবনের সামগ্রী করিয়া দেখেন— তাঁহারা কোনো নূতন পন্থা, কোনো বাহ্য প্রণালী, কোনো অদ্ভুত মত প্রচার করেন না। তাঁহারা অত্যন্ত সহজ কথা বলিবার জন্য আসেন— তাঁহারা পিতাকে পিতা বলিতে ও ভাইকে ভাই ডাকিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা এই অত্যন্ত সরল বাক্যটি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলিয়া যান যে, যাহা অন্তরের সামগ্রী তাহাকে বাহিরের আয়োজনে পুঞ্জীকৃত করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহারা মনকে জাগাইতে বলেন, তাঁহারা দৃষ্টিকে সরল করিয়া সম্মুখে লক্ষ্য করিতে বলেন, অন্ধ অভ্যাসকে তাঁহারা সত্যের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিতে আদেশ করেন। তাঁহারা কোনো অপরূপ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনেন না, কেবল তাঁহাদের দীপ্ত নেত্রের দৃষ্টিপাতে আমাদের জীবনের মধ্যে তাঁহারা সেই চিরকালের আলোক নিক্ষেপ করেন যাহার আঘাতে আমাদের দুর্বল জড়তার সমস্ত ব্যর্থ জাল-বুনানির মধ্য হইতে আমরা লজ্জিত হইয়া জাগিয়া উঠি।

জাগিয়া উঠিয়া আমরা কী দেখি? আমরা মানুষকে দেখিতে পাই। আমরা নিজের সত্যমূর্তি সম্মুখে দেখি। মানুষ যে কত বড়ো সে কথা আমরা প্রতিদিন ভুলিয়া থাকি; স্বরচিত ও সমাজরচিত শত শত বাধা আমাদিগকে চারি দিক হইতে ছোটো করিয়া রাখিয়াছে, আমরা আমাদের সমস্তটা দেখিতে পাই না। যাঁহারা আপনার দেবতাকে ক্ষুদ্র করেন নাই, পূজাকে কৃত্রিম করেন নাই, লোকাচারের দাসত্বচিহ্ন ধূলায় ফেলিয়া দিয়া যাঁহারা আপনাকে অমৃতের পুত্র বলিয়া সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারা মানুষের কাছে মানুষকে বড়ো করিয়া দিয়াছেন। ইহাকেই বলে মুক্তি দেওয়া। মুক্তি স্বর্গ নহে, সুখ নহে। মুক্তি অধিকারবিস্তার, মুক্তি ভূমাকে উপলব্ধি।

সেই মুক্তির আহ্বান বহন করিয়া নিত্যকালের রাজপথে ঐ দেখো কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাকে অনাদর করিয়ো না, আঘাত করিয়ো না, 'তুমি আমাদের কেহ নও' বলিয়া আপনাকে হীন করিয়ো না। 'তুমি আমাদের জাতির নও' বলিয়া আপনার জাতিকে লজ্জা দিয়ো না। সমস্ত জড়সংস্কারজাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আইস, ভক্তিনম্র চিত্তে প্রণাম করো, বলো—'তুমি আমাদের অত্যন্ত আপন, কারণ, তোমার মধ্যে আমরা আপনাকে সত্যভাবে লাভ করিতেছি।'

যে সময়ে কোনো দেশে কোনো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সে সময়কে আমরা তাঁহার আবির্ভাবের অনুকূল সময় বলিয়া গণ্য করি। এ কথা এক দিক হইতে সত্য হইলেও, এ সম্বন্ধে আমাদের ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। সাধারণত যে লক্ষণগুলিকে আমরা অনুকূল বলিয়া মনে করি তাহার বিপরীতকেই প্রতিকূল বলিয়া গণ্য করা চলে না। অভাব অত্যন্ত কঠোর হইলে মানুষের লাভের চেষ্টা অত্যন্ত জাগ্রত হয়। অতএব একান্ত অভাবকেই লাভসম্ভাবনার প্রতিকূল বলা যাইতে পারে না। বাতাস যখন অত্যন্ত স্থির হয় তখনই ঝড়কে আমরা আসন্ন বলিয়া থাকি। বস্তুত মানুষের ইতিহাসে আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি—প্রতিকূলতা যেমন আনুকূল্য করে এমন আর কিছুতেই নহে। যিশুর জন্মগ্রহণ-কালের প্রতি লক্ষ্য করিলেও আমরা এই সত্যটির প্রমাণ পাইব।

মানুষের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য যখন চোখে দেখিতে পাই তখন আমাদের মনের উপর তাহার প্রভাব যে কিরূপ প্রবল হইয়া উঠে তাহা বর্তমান যুগে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। সে আপনার চেয়ে বড়ো যেন আর কাহাকেও স্বীকার করিতে চায় না। মানুষ এই ঐশ্বর্যের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া কেহ বা ভিক্ষাবৃত্তি, কেহ বা দাস্যবৃত্তি, কেহ বা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়া দেয়—এক মুহূর্ত অবকাশ পায় না।

যিশু যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন রোম-সাম্রাজ্যের প্রতাপ অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছিল। যে কেহ যে দিকে চোখ মেলিত এই সাম্রাজ্যেরই গৌরবচূড়া সকল দিক হইতেই চোখে পড়িতে থাকিত; ইহারই আয়োজন উপকরণ সকলের চিত্তকে অভিভূত করিয়া দিতেছিল। রোমের বিদ্যাবুদ্ধি বাহুবল ও রাষ্ট্রীয় শক্তির মহাজালে যখন বিপুল সাম্রাজ্য চারি দিকে আবদ্ধ, সেই সময়ে সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে দরিদ্র ইহুদি মাতার গর্ভে এই শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন।

তখন রোম-সাম্রাজ্যে ঐশ্বর্যের যেমন প্রবল মূর্তি, ইহুদি-সমাজে লোকাচার ও শাস্ত্রশাসনেরও সেইরূপ প্রবল প্রভাব।

ইহুদিদের ধর্ম স্বজাতির মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ। তাহাদের ঈশ্বর জিহোভা বিশেষ-ভাবে তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইয়াছেন এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস। তাঁহার নিকট

তাহারা কতকগুলি সত্যে বদ্ধ, এই সত্যগুলি বিধিরূপে তাহাদের সংহিতায় লিখিত। এই বিধি পালন করাই ঈশ্বরের আদেশ-পালন।

বিধির অচল গণ্ডির মধ্যে নিয়ত বাস করিতে গেলে মানুষের ধর্মবুদ্ধি কঠিন ও সংকীর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহুদিদের সনাতন-আচার-নিষ্পেষিত চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিবার উপায় ঘটিয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহাদের পাথরের প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক-একজন ঋষি আসিয়া দেখা দিতেন। ধর্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বহন করিয়াই তাঁহাদের অভ্যুদয়। তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রের মৃতপত্র-মর্মরকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া অমৃতবাণী প্রচার করিতেন। এই ইসায়া জেরেমায়া প্রভৃতি ইহুদি ঋষিগণ পরমদুর্গতির দিনে আলোক জ্বালাইয়াছেন, তাঁহাদের তীব্র জ্বালাময় বাক্যের বজ্রবর্ষণে স্বজাতির বদ্ধ জীবনের বহুদিনসঞ্চিত কলুষরাশি দগ্ধ করিয়াছেন।

শাস্ত্র ও আচারধর্মের দ্বারাই ইহুদিদের সমস্ত জীবন নিয়মিত। যদিচ তাহারা সাহসিক যোদ্ধা ছিল, তবু রাষ্ট্ররক্ষা-ব্যাপারে তাহাদের পটুত্ব প্রকাশ পায় নাই। এই জন্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিদেশী প্রতিবেশীদের হাতে তাহারা দুর্গতিলাভ করিয়াছিল।

যিশুর জন্মের কিছুকাল পূর্ব হইতে ইহুদিদের সমাজে ঋষি-অভ্যুদয় বন্ধ ছিল। কালের গতি প্রতিহত করিয়া, প্রাণের প্রবাহ অবরুদ্ধ করিয়া, পুরাতনকে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টায় তখন সকলে নিযুক্ত ছিল। বাহিরকে একেবারে বাহিরে ঠেকাইয়া, সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া, দেয়াল গাঁথিয়া তুলিবার দলই তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। নবসংকলিত তাল্‌মুদ্‌ শাস্ত্রে বাহ্য আচারবন্ধনের আয়োজন পাকা হইল, এবং ধর্মপালনের মূলে যে-একটি মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীনতা-তত্ত্ব আছে তাহাকে স্থান দেওয়া হইল না।

জড়ত্বের চাপ যতই কঠোর হউক মনুষ্যত্বের বীজ একেবারে মরিতে চায় না। অন্তরাত্মা যখন পীড়িত হইয়া উঠে, বাহিরে যখন সে কোনো আশার মূর্তি দেখিতে পায় না, তখন তাহার অন্তর হইতেই আশ্বাসের বাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে— সেই বাণীকে সে হয়তো সম্পূর্ণ বোঝে না, অথচ তাহাকে প্রচার করিতে থাকে। এই সময়টাতে ইহুদিরা আপনা-আপনি বলাবলি করিতেছিল মর্ত্যে পুনরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাল আসিতেছে। তাহারা মনে করিতেছিল তাহাদেরই দেবতা তাহাদের জাতিকেই এই স্বর্গরাজ্যের অধিকার দান করিবেন— ঈশ্বরের বরপুত্র ইহুদি জাতির সত্যযুগ পুনরায় আসন্ন হইয়াছে।

এই আসন্ন শুভ মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এই ভাবটিও জাতির মধ্যে কাজ করিতেছিল। এই জন্য মরুস্থলীতে বসিয়া অভিষেকদাতা যোহন্‌ যখন ইহুদিদিগকে অনুতাপের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও জর্ডনের তীর্থজলে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন তখন দলে দলে পুণ্যকামিগণ তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। ইহুদিরা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া পৃথিবীতে আপনাদের অপমান ঘুচাইতে চাহিল, ধরাতলের রাজত্ব এবং সকলের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবার আশ্বাসে তাহারা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে যিশুও মর্ত্যলোকে ঈশ্বরের রাজ্যকে আসন্ন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য যিনি স্থাপন করিতে আসিবেন তিনি কে? তিনি তো রাজা, তাঁহাকে তো রাজপদ গ্রহণ করিতে হইবে। রাজপ্রভাব না থাকিলে সর্বত্র ধর্মবিধি প্রবর্তন করিবে কী করিয়া? একবার কি মরুস্থলীতে মানবের

মঙ্গল ধ্যান করিবার সময় যিশুর মনে এই দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই? ক্ষণকালের জন্য কি তাঁহার মনে হয় নাই রাজপীঠের উপরে ধর্মসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিলে তবেই তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত হইতে পারে? কথিত আছে, শয়তান তাঁহার সম্মুখে রাজ্যের প্রলোভন বিস্তার করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সেই প্রলোভনকে নিরস্ত করিয়া তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। এই প্রলোভনের কাহিনীকে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার হেতু নাই। রোমের জয়পতাকা তখন রাজগৌরবে আকাশে আন্দোলিত হইতেছিল এবং সমস্ত ইহুদি জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সুখস্বপ্নে নিবিষ্ট হইয়াছিল। এমন অবস্থায় সমস্ত জনসাধারণের সেই অন্তরের আন্দোলন যে তাঁহারও ধ্যানকে গভীরভাবে আঘাত করিতে থাকিবে ইহাতে আশ্চর্যের কথা কিছুই নাই।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, এই সর্বব্যাপী মায়াজালকে ছেদন করিয়া তিনি ঈশ্বরের সত্যরাজ্যকে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলেন। ধনমানের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না, মহাসাম্রাজ্যের দৃপ্ত প্রতাপের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না; বাহ্য উপকরণহীন দারিদ্র্যের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন এবং সমস্ত বিষয়ী লোকের সম্মুখে একটা অদ্ভুত কথা অসংকোচে প্রচার করিলেন যে, যে নম্র পৃথিবীর অধিকার তাহারই। তিনি চরিত্রের দিক দিয়া এই যেমন একটা কথা বলিলেন, উপনিষদের ঋষিরা মানুষের মনের দিক দিয়া ঠিক এই প্রকারই অদ্ভুত একটা কথা বলিয়াছেন : যাহারা ধীর তাহারাই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে। ধীরাঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

যাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং যাহা সর্বজনের চিত্তকে অভিভূত করিয়া বর্তমান, তাহাকে সম্পূর্ণ ভেদ করিয়া, সাধারণ মানবের সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া, ঈশ্বরের রাজ্যকে এমন একটি সত্যের মধ্যে তিনি দেখিলেন যেখানে সে আপনার আন্তরিক শক্তিতে আপনি প্রতিষ্ঠিত— বাহিরের কোনো উপাদানের উপর তাহার আশ্রয় নহে। সেখানে অপমানিতেরও সম্মান কেহ কাড়িতে পারে না, দরিদ্রেরও সম্পদ কেহ নষ্ট করিতে পারে না। সেখানে যে নত সেই উন্নত হয়, যে পশ্চাদ্‌বর্তী সেই অগ্রগণ্য হইয়া উঠে। এ কথা তিনি কেবল কথায় রাখিয়া যান নাই। যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের রাজদণ্ড অনায়াসে তাঁহার প্রাণবিনাশ করিয়াছে তাহার নাম ইতিহাসের পাতার এক প্রান্তে লেখা আছে মাত্র। আর যিনি সামান্য চোরের সঙ্গে একত্রে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, মৃত্যুকালে সামান্য কয়েকজন ভীত অখ্যাত শিষ্য যাঁহার অনুবর্তী, অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাধ্যমাত্র যাঁহার ছিল না, তিনি আজ মৃত্যুহীন গৌরবে সমস্ত পৃথিবীর হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন এবং আজও বলিতেছেন, 'যাহারা দীন তাহারা ধন্য; কারণ, স্বর্গরাজ্য তাহাদের। যাহারা নম্র তাহারা ধন্য; কারণ, পৃথিবীর অধিকার তাহারাই লাভ করিবে।'

এইরূপে স্বর্গরাজ্যকে যিশু মানুষের অন্তরের মধ্যে নির্দেশ করিয়া মানুষকেই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহাকে বাহিরের উপকরণের মধ্যে স্থাপিত করিয়া দেখাইলে মানুষের বিশুদ্ধ গৌরব খর্ব হইত। তিনি আপনাকে বলিয়াছেন মানুষের পুত্র। মানবসন্তান যে কে তাহাই তিনি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন।

তাই তিনি দেখাইয়াছেন, মানুষের মনুষ্যত্ব সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যেও নহে, আচারের অনুষ্ঠানেও নহে; কিন্তু মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ আছে এই সত্যেই সে সত্য। মানবসমাজে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরকে তিনি পিতা বলিয়াছেন। পিতার সঙ্গে পুত্রের যে সম্বন্ধ তাহা আত্মীয়তার নিকটতম সম্বন্ধ— আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ। তাহা আদেশ-

পালনের ও অঙ্গীকার-রক্ষার বাহ্য সম্পর্ক নহে। ঈশ্বর পিতা এই চিরন্তন সম্বন্ধের দ্বারাই মানুষ মহীয়ান, আর কিছুর দ্বারা নহে। তাই ঈশ্বরের পুত্ররূপে মানুষ সকলের চেয়ে বড়ো, সাম্রাজ্যের রাজারূপে নহে। তাই শয়তান আসিয়া যখন তাঁহাকে বলিল 'তুমি রাজা' তিনি বলিলেন, 'না, আমি মানুষের পুত্র।' এই বলিয়া তিনি সমস্ত মানুষকে সম্মানিত করিয়াছেন।

তিনি এক জায়গায় ধনকে নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন ধন মানুষের পরিত্রাণের পথে প্রধান বাধা। ইহা একটা নিরর্থক বৈরাগ্যের কথা নহে। ইহার ভিতরকার অর্থ এই যে, ধনী ধনকেই আপনার প্রধান অবলম্বন বলিয়া জানে— অভ্যাসের মোহ-বশত ধনের সঙ্গে সে আপনার মনুষ্যত্বকে মিলাইয়া ফেলে। এমন অবস্থায় তাহার প্রকৃত আত্মশক্তি আবৃত হইয়া যায়। যে আত্মশক্তিকে বাধামুক্ত করিয়া দেখে সে ঈশ্বরের শক্তিকেই দেখিতে পায় এবং সেই দেখার মধ্যেই তাহার যথার্থ পরিত্রাণের আশা। মানুষ যখন যথার্থভাবে আপনাকে দেখে তখনই আপনার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে; আর আপনাকে দেখিতে গিয়া যখন সে কেবল ধনকে দেখে, মানকে দেখে, তখনই আপনাকে অবমানিত করে এবং সমস্ত জীবনযাত্রার দ্বারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে থাকে।

মানুষকে এই মানবপুত্র বড়ো দেখিয়াছেন বলিয়াই মানুষকে যন্ত্ররূপে দেখিতে চান নাই। বাহ্য ধনে যেমন মানুষকে বড়ো করে না তেমনি বাহ্য আকারে মানুষকে পবিত্র করে না। বাহিরের স্পর্শ বাহিরের খাদ্য মানুষকে দূষিত করিতে পারে না; কারণ, মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে, সেখানে তাহার প্রবেশ নাই। যাহারা বলে বাহিরের সংস্রবে মানুষ পতিত হয় তাহারা মানুষকে ছোটো করিয়া দেয়। এইরূপে মানুষ যখন ছোটো হইয়া যায় তখন তাহার সংকল্প, তাহার ক্রিয়াকর্ম, সমস্তই ক্ষুদ্র হইয়া আসে; তাহার শক্তি হ্রাস হয় এবং সে কেবলই ব্যর্থতার মধ্যে ঘুরিয়া মরে। এই জন্যই মানবপুত্র আচার ও শাস্ত্রকে মানুষের চেয়ে বড়ো হইতে দেন নাই এবং বলিয়াছেন, বলি-নৈবেদ্যের দ্বারা ঈশ্বরের পূজা নহে, অন্তরের ভক্তির দ্বারাই তাঁহার ভজনা। এই বলিয়াই তিনি অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিলেন, অনাচারীর সহিত একত্রে আহার করিলেন, এবং পাপীকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাকে পরিত্রাণের পথে আহ্বান করিলেন।

শুধু তাই নয়, সমস্ত মানুষের মধ্যে তিনি আপনাকে এবং সেই যোগে ভগবানকে উপলব্ধি করিলেন। তিনি শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'দরিদ্রকে যে খাওয়ায় সে আমাকেই খাওয়ায়, বস্ত্রহীনকে যে বস্ত্র দেয় সে আমাকেই বসন পরায়।' ভক্তিবৃত্তিকে বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা সংকীর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত তিনি দেখান নাই। ঈশ্বরের ভজনা ভক্তিরস-সম্ভোগ করার উপায়মাত্র নহে। তাঁহাকে ফুল দিয়া, নৈবেদ্য দিয়া, বস্ত্র দিয়া, স্বর্ণ দিয়া, ফাঁকি দিলে যথার্থ আপনাকেই ফাঁকি দেওয়া হয়; ভক্তি লইয়া খেলা করা হয় মাত্র এবং এইরূপ খেলায় যতই সুখ হউক তাহা মনুষ্যত্বের অবমাননা। যিশুর উপদেশ যাঁহারা সত্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কেবল মাত্র পূজার্চনা-দ্বারা দিনরাত কাটাইয়া দিতে পারেন না; মানুষের সেবা তাঁহাদের পূজা, অতি কঠিন তাঁহাদের ব্রত। তাঁহারা আরামের শয্যা ত্যাগ করিয়া, প্রাণের মমতা বিসর্জন দিয়া, দূর দেশ-দেশান্তরে নরখাদকদের মধ্যে, কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে, জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন —কেননা, যাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তিনি মানবপুত্র, তাঁহার আবির্ভাবে মানবের প্রতি ঈশ্বরের দয়া সুস্পষ্ট প্রকাশমান হইয়াছে। কারণ,

এই মহাপুরুষ সর্বপ্রকারে মানবের মাহাত্ম্য যেমন করিয়া প্রচার করিয়াছেন এমন আর কে করিয়াছেন?

তাঁহাকে তাঁহার শিষ্যেরা দুঃখের মানুষ বলেন। দুঃখ-স্বীকারকে তিনি মহৎ করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহাতেও তিনি মানুষকে বড়ো করিয়াছেন। দুঃখের উপরেও মানুষ যখন আপনাকে প্রকাশ করে তখনই মানুষ আপনার সেই বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বকে প্রচার করে যাহা আগুনে পোড়ে না যাহা অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হয় না।

সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেমের দ্বারা যিনি ঈশ্বরের প্রেম প্রচার করিয়াছেন, সমস্ত মানুষের দুঃখভার স্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করিবার উপদেশ তাঁহার জীবন হইতে আপনিই নিঃশ্বসিত হইয়া উঠিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কী আছে। কারণ, স্বেচ্ছায় দুঃখবহন করিতে অগ্রসর হওয়াই প্রেমের ধর্ম। দুর্বলের নির্জীব প্রেমই ঘরের কোণে ভাবাবেশের অশ্রুজলপাতে আপনাকে আপনি আর্দ্র করিতে থাকে। যে প্রেমের মধ্যে যথার্থ জীবন আছে সে আত্মত্যাগের দ্বারা, দুঃখস্বীকারের দ্বারা গৌরব লাভ করে। সে গৌরব অহংকারের গৌরব নহে; কারণ, অহংকারের মদিরায় নিজেকে মত্ত করা প্রেমের পক্ষে অনাবশ্যক— তাহার নিজের মধ্যে স্বত-উৎসারিত অমৃতের উৎস আছে।

মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ— যিশুর এই বাণী কেবলমাত্র তত্ত্বকথারূপে কোনো-একটি শাস্ত্রের শ্লোকের মধ্যে বন্দী হইয়া বাস করিতেছে না। তাঁহার জীবনের মধ্যে তাহা একান্ত সত্য হইয়া দেখা দিয়াছিল বলিয়াই আজ পর্যন্ত তাহা সজীব বনস্পতির মতো নব নব শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছে। মানবচিত্তের শত সহস্র সংস্কারের বাধা প্রতিদিনই সে ক্ষয় করিবার কাজে নিযুক্ত আছে। ক্ষমতার মদে মাতাল প্রতিদিন তাহাকে অপমান করিতেছে, জ্ঞানের গর্বে উদ্ধত প্রতিদিন তাহাকে উপহাস করিতেছে, শক্তি-উপাসক তাহাকে অক্ষমের দুর্বলতা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে, কঠোর বিষয়ী তাহাকে কাপুরুষের ভাবুকতা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে— তবু সে নম্র হইয়া নীরবে মানুষের গভীরতম চিত্তে ব্যাপ্ত হইতেছে, দুঃখকেই আপনার সহায় এবং সেবাকে আপনার সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে— যে পর তাহাকে আপন করিতেছে, যে পতিত তাহাকে তুলিয়া লইতেছে, যাহার কাছ হইতে কিছুই পাইবার নাই তাহার কাছে আপনাকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিতেছে। এমনি করিয়া মানবপুত্র পৃথিবীকে, সকল মানুষকেই বড়ো করিয়া তুলিয়াছেন— তাহাদের অনাদর দূর করিয়াছেন, তাহাদের অধিকার প্রশস্ত করিয়াছেন, তাহারা যে তাহাদের পিতার ঘরে বাস করিতেছে এই সংবাদের দ্বারা অপমানের সংকোচ মানবসমাজ হইতে অপসারিত করিয়াছেন— ইহাকেই বলে মুক্তিদান করা।

শান্তিনিকেতন
২৫ ডিসেম্বর ১৯১০

খৃস্টধর্ম

সম্প্রদায় এই বলে অহংকার করে যে, সত্য আর-সকলকে ত্যাগ করে তাকেই আশ্রয় করেছে। সেই অহংকারে সে সত্যের মর্যাদা যতই তোলে নিজের বাহ্যরূপকে ততই পল্লবিত করতে থাকে। ধনের অহংকার ধনীর যতই বাড়ে ধনেরই আড়ম্বর তার ততই বিস্তৃত হয়, মনুষ্যত্বের গৌরব তার ততই খর্ব হয়ে যায়।

বিষয়ীলোক বিষয়কে নিয়ে অহংকার করে তাতে ক্ষতি হয় না; কারণ, বিষয়কে আপনার মধ্যে বদ্ধ রাখাই তার লক্ষ্য। কিন্তু সম্প্রদায় যখন তার সত্যটিকে আপন অহংকারের বিষয় করে তোলে, তখন সেই সত্য সে দান করতে এলে অন্যের পক্ষে তা গ্রহণ করা কঠিন হয়।

খৃস্টান খৃস্টধর্মকে নিয়ে যখনই অহংকার করে তখনই বুঝতে পারি তার মধ্যে এমন খাদ মিশিয়েছে যা তার ধর্ম নয়, যা তার আপনি। এই জন্যে সে যখন দাতাবৃত্তি করতে আসে তখন তার হাত থেকে ভিক্ষুকের মতো সত্যকে গ্রহণ করতে আমরা লজ্জা বোধ করি। অহংকারের প্রতিঘাতে অহংকার জেগে ওঠে— এবং যে অহংকার অহংকৃতের দানগ্রহণে কুণ্ঠিত সে নিন্দনীয় নয়।

এই জন্যেই মানুষকে সাম্প্রদায়িক খৃস্টানের হাত থেকে খৃস্টকে, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের হাত থেকে বিষ্ণুকে, সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মের হাত থেকে ব্রহ্মকে উদ্ধার করে নেবার জন্যে বিশেষ ভাবে সাধনা করতে হয়।

আমাদের আশ্রমে আমরা সম্প্রদায়ের উপর রাগ করে সত্যের সঙ্গে বিরোধ করব না। আমরা খৃস্টধর্মের মর্মকথা গ্রহণ করবার চেষ্টা করব— খৃস্টানের জিনিস বলে নয়; মানবের জিনিস বলে।

বেদে ঈশ্বরের একটি নাম 'আবিঃ'; অর্থাৎ, আবির্ভাবই তাঁর স্বভাব, সৃষ্টিতে তিনি আপনাকে প্রকাশ করছেন সেই তাঁর ধর্ম। ভারতবর্ষের ঋষিরা দেখেছেন, জলে স্থলে শূন্যে সেই তাঁর নিরন্তর আনন্দধারা।

বদ্ধ ঘরে কেরোসিন জ্বলছে, সমস্ত রাত সেখানে অনেকে মিলে ঘুমোচ্ছে, দূষিত বাষ্পে ঘর ভরা— তখন যদি দরজা জানলা খুলে দিয়ে বদ্ধ-আকাশকে অসীম-আকাশের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তা হলে সমস্ত সঞ্চিত তাপ এবং গ্লানি তখনি দূর হয়ে যায়। তেমনি আপনার বদ্ধ চিত্তকে ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোকে পরম চৈতন্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেই তার চারি দিকের পাপসঞ্চয় সহজেই বিলীন হয়— এই মুক্তির সাধনা ভারতবর্ষের।

ভারতবর্ষ যেমন ব্রহ্মের প্রকাশকে সর্বত্র উপলব্ধি করে আপন চৈতন্যকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করবার সাধনা করেছে, তেমনি ঈশ্বরের যে প্রকাশ মানবে সেইটির মধ্যে বিশেষ-ভাবে আপন অনুভূতি প্রীতি ও চেষ্টাকে ব্যাপ্ত করার প্রতি খৃস্টধর্মের লক্ষ্য।

বিশ্বে তাঁর প্রকাশ সরল, কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রকাশে বিরোধ আছে। কারণ, সেখানে ইচ্ছার মধ্যে ইচ্ছার প্রকাশ। যতক্ষণ না প্রেম জাগে ততক্ষণ এই ইচ্ছা পরম-ইচ্ছাকে বাধা দিতে থাকে।

অভাব হতে জীব দুঃখ পায়, কিন্তু এই বিরোধ হতে মানুষের অকল্যাণ। দুঃখ পশুও পায়, কিন্তু এই অকল্যাণ বিশেষ ভাবে মানুষের। যে অংশে মানুষ পশু সে অংশে অভাবের দুঃখ তাকে কষ্ট দেয়, যে অংশে মানুষ মানুষ সে অংশে অকল্যাণের আঘাত তার অন্য সকল আঘাতের চেয়ে বেশি। তাই মানুষের পশু-

অংশ বলে, 'সঞ্চয় করে করে আমি অভাবের দুঃখ দূর করব'; মানুষের মানুষ-অংশ বলে, 'ত্যাগ করে করে আমার ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে পরম ইচ্ছায় উৎসর্গ করব— বাসনাকে দগ্ধ করে প্রেমে সমুজ্জ্বল করে তুলব। সেই প্রেমেই আমার মধ্যে পরম-ইচ্ছার পূর্ণ প্রকাশ।'

সকল দুঃখের চেয়ে বড়ো দুঃখ মানুষের এই যে, তার বড়ো তার ছোটোর দ্বারা নিত্য পীড়া পাচ্ছে। এই তার পাপ। সে আপনার মধ্যে আপনার সেই বড়োকে প্রকাশ করতে পাচ্ছে না, সেই বাধাই তার কলুষ।

অন্নবস্ত্রের ক্লেশ সহ্য করা সহজ। কিন্তু আপনার ভিতরে আপনার সেই বড়ো কষ্ট পাচ্ছেন প্রকাশের অভাবে, এ কি মানুষ সইতে পারে? মানুষের ইতিহাসে এত যুদ্ধ কেন? কিসের খেদে উন্মত্ত হয়ে মানুষ আপন শতবৎসরের পুরাতন ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে আবার নূতন সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়? তার কান্না এই যে, আমার ছোটো আমার বড়োকে ঠেকিয়ে রাখছে।

এই ব্যথা যখন মানুষের মধ্যে এত সত্য তখন নিশ্চয়ই তার ঔষধ আছে। সে ঔষধ কোনো স্নানে পানে, বাহ্যিক কোনো আচারে অনুষ্ঠানে নয়। মানুষের মধ্যে ভূমার প্রকাশ যে কেমন করে বাধাহীন হতে পারে, যাঁরা মহামানুষ তাঁরা আপন জীবনের মধ্যে দিয়ে তাই দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

তাঁরা এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়েছেন যে, মানুষ আপনার চেয়ে আপনি বড়ো; সেইজন্যে মানুষ মৃত্যুকে দুঃখকে ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করতে পারে। এ যদি ক্ষণে ক্ষণে নিদারুণ স্পষ্টরূপে দেখতে না পেতুম তা হলে ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে যে বিরাট রয়েছেন এ কথা বিশ্বাস করতুম কেমন করে?

মানুষের সেই বড়োর সঙ্গে মানুষের ছোটোর নিয়ত সংঘাতে যে দুঃখ জন্মাচ্ছে সেই দুঃখ পান করছেন কে? সেই বড়ো, সেই শিব। রাগ কাকে মারছে? চিরদিন ক্ষমা যে করে তার উপরেই সমস্ত মার গিয়ে পড়ছে। লোভ কার ধন হরণ করছে? যে কেবলই ক্ষতিস্বীকার করে এবং চোরাই মাল ফিরে আসবে বলে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে থাকে। পাপ কাকে কাঁদাতে চায়? যার প্রেমের অবধি নেই, পাপ যে তাকেই কাঁদাচ্ছে।

এ যে আমরা চারি দিকে প্রত্যক্ষ দেখি। দুর্বৃত্ত সন্তান অন্য সকলকে যে আঘাত দেয় সেই আঘাতে আপন মাকেই সকলের চেয়ে ব্যথিত করে, তাই তো দুষ্প্রবৃত্তির পাপ এতই বিষম। অকল্যাণের দুঃখ জগতের সকল দুঃখের বাড়া: কেননা, সেই দুঃখে যিনি কাঁদছেন তিনি যে বড়ো, তিনি যে প্রেম। খৃস্টধর্ম জানাচ্ছে, সেই পরমব্যথিতই মানুষের ভিতরকার ভগবান।

এই কথাটা বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে বিশেষ দেশকাল-পাত্রের মধ্যে ক্ষুদ্র করে দেখলে সত্যকে তার আপন গৃহ থেকে নির্বাসিত করে কারাশৃঙ্খলে বেঁধে মারবার চেষ্টা করা হবে।

আসল সত্য এই যে, আমার মধ্যে যিনি বড়ো, যিনি আমার হাতে চিরদিন দুঃখ পেয়ে আসছেন, তিনি বলছেন, 'জগতের সমস্ত পাপ আমাকেই মারে, কিন্তু আমাকে মারতে পারে না। আজ পর্যন্ত সব চেয়ে বড়ো চোর কি সব ধন হরণ করতে পেরেছে? মানুষের পরম সম্পদের কি ক্ষয় হল? বিশ্বাসঘাতক আছে, কিন্তু সংসারে বিশ্বাস মরে নি। হিংসক আছে, কিন্তু ক্ষমাকে সে মারতে পারলে না।'

সেই বড়ো যিনি, তিনি তাঁর বেদনায় অমর। কিন্তু সেই ব্যথাই যদি চরম সত্য হত তা হলে কি রক্ষা ছিল? বড়োর মধ্যে আনন্দের অমৃত আছে বলেই তো

বেদনা সহ্য হল। ছোটো কি লেশমাত্র ব্যথা সইতে পারে? সে কি তিলমাত্র কিছু ছাড়তে পারে? কেন পারে না? তার আছে কী যে পারবে? তার প্রেম কোথায়, আনন্দ কোথায়?

আমরা তো ভারে ভারে কলুষ এনে জমাচ্ছি। যে বড়ো সে ক্রমাগত তাই ক্ষালন করছে—আপন রক্ত দিয়ে, দুঃখ দিয়ে, অশ্রু দিয়ে। প্রতিদিন এই হচ্ছে ঘরে ঘরে। বড়ো বলছেন, 'আমায় মারো, মারো, মারো! তোমার মার আমি ছাড়া আর কেউ সইবে না।' তখন আমরা কেঁদে বলছি, 'তোমাকে আর মারব না—তুমি যে আমার চেয়ে বেশি। তোমার প্রকাশে ধুলো দিয়েছি—অশ্রুজলে সব ধোব। আজ হতে বসলুম তোমার আসনে, তোমার দুঃখ আমি বইব। তুমি নাও, নাও, নাও, আমার সব নাও। তুমি ভালোবেসেছ, আমিও বাসব।' এমনি করে তবে বিরোধ মেটে। তিনি যখন শাস্তি নেন তখন সেই শাস্তির দারুণ দুঃখ আর সহ্য হয় না, তবেই তো পাপের মূল মরে; নরকদণ্ডে তো মরে না।

যিনি বড়ো তিনি যে প্রেমিক। ছোটোকে নিয়ে তাঁর প্রেমের সাধ্যসাধনা। আকাশের আলো দিয়ে, পৃথিবীর লক্ষ্মীশ্রী দিয়ে, মানুষের প্রেমের সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে তিনি আমাকে সাধছেন। আপনার সেই বড়োটিকে দেখে মন মুগ্ধ হয়েছে বলেই কবি কবিতা লিখেছে, শিল্পী কারু রচনা করেছে, কর্মী কর্মে আপনাকে ঢেলে দিয়েছে। মানুষের সকল রচনা এই বলেছে—'তোমার মতো এমন সুন্দর আর দেখলুম না। ক্ষুধা লোভ কাম ক্রোধ এ-যে সব কালো—কিন্তু তুমি কী সুন্দর, কী পবিত্র তুমি, তুমি আমার।'

মানুষের মধ্যে মানুষের এই-যে বড়োর আবির্ভাব; যিনি মানুষের হাতের সমস্ত আঘাত সহ্য করছেন এবং যাঁর সেই বেদনা মানুষের পাপের একেবারে মূলে গিয়ে বাজছে—এই আবির্ভাব তো ইতিহাসের বিশেষ কোনো একটি প্রান্তে নয়। সেই মানুষের দেবতা মানুষের অন্তরেই—তাঁরই সঙ্গে বিরোধেই মানুষের পাপ, তাঁরই সঙ্গে যোগেই মানুষের পাপের নিবৃত্তি। মানুষের সেই বড়ো, নিয়ত আপনার প্রাণ উৎসর্গ করে মানুষের ছোটোকে প্রাণদান করছেন।

রূপকের আকারে এই সত্য খৃস্টধর্মে প্রকাশ হচ্ছে।

শান্তিনিকেতন
২৫ ডিসেম্বর ১৯১৪

খৃস্টোৎসব

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর, তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।

দুইয়ের মধ্যে একের যে প্রকাশ তাই হল যথার্থ সৃষ্টির প্রকাশ। নানা বিরোধে যেখানে এক বিরাজমান সেখানেই মিলন, সেখানেই একে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায়। আমাদের দেশের শাস্ত্রে তাই, এক ছাড়া দুইকে মানতে চায় নি। কারণ, দুইয়ের মধ্যে একের যে ভেদ তার অবকাশকে পূর্ণ করে দেখলেই একে যথার্থ-ভাবে পাওয়া যায়। এইটিই হচ্ছে সৃষ্টির লীলা। উপরের সঙ্গে নিচের যে মিলন,

বিশ্বকর্মার কর্মের সঙ্গে ক্ষুদ্র আমাদের কর্মের যে মিলন, বিশ্বে নিরন্তর তারই লীলা চলছে। তার দ্বারা সব পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

যাঁরা বিচ্ছেদের মধ্যে সত্যের এই অখণ্ড রূপকে এনে দেন তাঁরা জীবনে নিয়ত আনন্দবার্তা বহন করে এনেছেন। ইতিহাসে এই-সকল মহাপুরুষ বলেছেন যে, কোনোখানে ফাঁক নেই, প্রেমের ক্রিয়া নিত্য চলেছে। মানুষের মনের দ্বার উদ্ঘাটিত যদি না'ও হয় তবু এই প্রক্রিয়ার বিরাম নেই। তার অস্ফুট চিত্তকমলের উপর আলোকপাত হয়েছে, তাকে উদ্‌বোধিত করবার প্রয়াসের বিশ্রাম নেই। মানুষ জানুক বা নাই জানুক, সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করে সেই অস্ফুট কুঁড়িটির বিকাশের জন্যে আলোকের মধ্যেও প্রেমের প্রতীক্ষা আছে।

তেমনি ভাবে এক মহাপুরুষ বিশেষ করে তাঁর জীবন দিয়ে এই কথা বলেছিলেন যে, লোকলোকান্তরে যিনি তাঁর অভ্রচুম্বিত আলোকমালার প্রাসাদ সৃষ্টি করেছেন সেই বিচিত্র বিশ্বের অধিপতিই আমার পিতা, আমার কোনো ভয় নেই। এই বিরাট আকাশের তলে যাঁর প্রতাপে পৃথিবী ঘূর্ণ্যমান হচ্ছে তাঁর শক্তির অন্ত নেই, তা অতিপ্রচণ্ড—তার তুলনায় আমরা মানুষ কত নগণ্য সামান্য জীব। কিন্তু আমাদের ভয় নেই; এই-সকলের অন্তর্যামী-নিয়ন্তা আমারই পরম আত্মীয়, আমারই পিতা। বিশ্বের মূলে এই পরম সম্বন্ধ যা শূন্যকে পূর্ণতা দান করছে, মৃত্যুশোকের উপর আনন্দধারা প্রবাহিত করছে, সেই মধুর সম্বন্ধটি আজ আমাদের অন্তরে অনুভব করতে হবে। আমাদের পরম পিতা যিনি তিনি বলছেন যে, 'ভয় নেই, সূর্যচন্দ্রের মধ্যে আমার অখণ্ড রাজত্ব, আমার অমোঘ নিয়ম অলঙ্ঘ্য, কিন্তু তুমি যে আমারই, তোমাকে আমার চাই।' যুগে যুগে এই মাভৈঃ বাণী যাঁরা পৃথিবীতে আনয়ন করেন তাঁরা আমাদের প্রণম্য।

এমনি করেই একজন মানবসন্তান একদিন বলেছিলেন যে, আমরা সকলে বিশ্বপিতার সন্তান, আমাদের অন্তরে যে প্রেমের পিপাসা আছে তা তাঁকে স্পর্শ করেছে। এ কথা হতেই পারে না যে, আমাদের বেদনা-আকাঙ্ক্ষার কোনো লক্ষ্য নেই, কারণ তিনি সত্যই আমাদের পরমসখা হয়ে তাঁর সাড়া দিয়ে থাকেন। তাই সাহস করে মানুষ তাঁকে আনন্দদায়িনী মা, মানবাত্মার কল্যাণবিধায়ক পিতারূপে জেনেছে। মানুষ যেখানে বিশ্বকে কেবল বাহিরের নিয়মযন্ত্রের অধীন বলে জানছে সেখানে সে কেবলই আপনাকে দুর্বল অশক্ত করছে, কিন্তু যেখানে সে প্রেমের বলে সমস্ত বিশ্বলোকে আত্মীয়তার অধিকার বিস্তার করেছে সেখানেই সে যথার্থ ভাবে আপনার স্বরূপকে উপলব্ধি করেছে।

এই বার্তা ঘোষণা করতে এক দিন মহাত্মা যিশু লোকালয়ের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি তো অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যোদ্ধৃবেশে আসেন নি, তিনি তো বাহুবলের পরিচয় দেন নি—তিনি ছিন্নচীর পরে পথে পথে ঘুরেছিলেন। তিনি সম্পদবান্‌ ও প্রতাপশালীদের কাছ থেকে আঘাত অপমান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি যে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন তার বদলে বাইরের কোনো মজুরি পান নি, কিন্তু তিনি পিতার আশীর্বাদ বহন করেছিলেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন হয়ে দ্বারে দ্বারে এই বার্তা বহন করে এনেছিলেন যে, ধনের উপর আশ্রয় করলে চলবে না, পরম আশ্রয় যিনি তিনি বিশ্বকে পূর্ণ করে রয়েছেন। তিনি দেশ কাল পূর্ণ করে বিরাজমান। তিনি 'পরম-আনন্দঃ পরমাগতিঃ' এই কথা উপলব্ধি করবার জন্য যে ত্যাগের দরকার যারা তা শেখে নি তারা মৃত্যুর ভয়ে, ক্ষতির ভয়ে, প্রাণকে বুকে করে নিয়ে ফিরেছে—অন্তরের ভয় লোভ মোহের দ্বারা শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ

করেছে। এই মহাপুরুষ তাই আপনার জীবনে ত্যাগের দ্বারা মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হয়ে মানুষের কাছে এই বাণী এনে দিয়েছিলেন। তাই তিনি মানবাত্মার পরম পথকে উন্মুক্ত করবার জন্য এক দিন দরিদ্র বেশে পথে বার হয়েছিলেন। যে-সব সরল প্রকৃতির মানুষ তাঁর অনুগমন করেছিল তারা সম্পূর্ণরূপে তাঁর বাণীর মর্ম বুঝতে পারে নি। তারা কিসের স্পর্শ পেয়েছিল জানি নে, কিন্তু ভক্তিভরে তাদের মাথা অবনত হয়ে গিয়েছিল। তাদের মাথা নিচুই ছিল—কারণ তাদের পরিচয় নাম ধাম কেউ জানত না, তারা সামান্য ধীবর ছিল। তারা যিশুর বাণীর প্রেরণা অনুভব করেছিল, একটি অব্যক্ত মধুর রসে তাদের অন্তর আপ্লুত হয়েছিল। এমনি করে যাদের কিছু নেই তারা পেয়ে গেল। কিন্তু যারা গর্বিত তারা এই পরমা বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এই মহাত্মার বাণী যে তাঁর ধর্মাবলম্বীরাই গ্রহণ করেছিল তা নয়। তারা বারে বারে ইতিহাসে তাঁর বাণীর অবমাননা করেছে, রক্তের চিহ্নের দ্বারা ধরাতল রঞ্জিত করে দিয়েছে—তারা যিশুকে এক বার নয়, বার-বার ক্রুশেতে বিদ্ধ করেছে। সেই খৃস্টান নাস্তিকদের অবিশ্বাস থেকে যিশুকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে আপন শ্রদ্ধার দ্বারা দেখলেই যথার্থ ভাবে সম্মান করা হবে। খৃস্টের আত্মা তাই আজ চেয়ে আছে। বড়ো বড়ো গির্জায় তাঁর বাণী প্রচারিত হবে বলে তিনি পথে পথে ফেরেন নি, কিন্তু যার অন্তরে ভক্তিরস বিশুষ্ক হয়ে যায় নি তারই কাছে তিনি তাঁর সমস্ত প্রত্যাশা নিয়ে একদিন উপনীত হয়েছিলেন। তিনি সেদিনকার কালের সব চেয়ে অখ্যাত দরিদ্র অভাজনদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বিশ্বের অধিপতিকে বলেছিলেন যে 'পিতা নোঽসি'—তুমি আমাদের পিতা।

মানুষ জীবন ও মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, এই দুইয়ের মধ্যে সে একের মিল দেখে না। যেমন তার দেহে পিঠের দিকে চোখ নেই বলে কেবল সামনেরই অঙ্গকে মেনে নেওয়া বিষম ভুল, তেমনি জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে আপাত-অনৈক্যকেই সত্য বলে জানলে জীবনকে খণ্ডিত করে দেখা হয়। এই মিথ্যা মায়া থেকে যারা মুক্তিলাভ করে অমৃতকে সর্বত্র দেখেছেন তাঁদের আমরা প্রণাম করি। তাঁরা মৃত্যুর দ্বারা অমৃতকে লাভ করেছেন, এই মর্ত্যলোকেই অমরাবতী সৃজন করেছেন। অমর ধামের তেমন এক যাত্রী একদিন পৃথিবীতে অমর লোকের বাণী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে আমরাও যেন মৃত্যুর তমোরাশির উপর অমৃত আলোর সম্পাত দেখতে পাই। রাত্রিতে সূর্য অস্তমিত হলে মূঢ় যে সে ভাবে যে, আলো বুঝি নির্বাপিত হল, সৃষ্টি লোপ পেল। এমন সময় সে অন্তরীক্ষে চেয়ে দেখে যে সূর্য অপসারিত হলে লোকলোকান্তরের জ্যোতির্ধাম উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে— মহারাজার এক দরবার ছেড়ে আর-এক দরবারে আলোর সংগীত ধ্বনিত হচ্ছে। সেই সংগীতে আমাদেরও নিমন্ত্রণ বেজে উঠেছে। মহা আলোকের মিলনে যেন আমরা পূর্ণ করে দেখি। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানকার এই অখণ্ড যোগসূত্র যেন আমরা না হারাই। যে মহাপুরুষ তাঁর জীবনের মধ্যেই অমৃতলোকের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর দ্বারা অমৃতরূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, আজ তাঁর মৃত্যুর অন্তর্নিহিত সেই পরম সত্যটিকে যেন আমরা স্পষ্ট আকারে দেখতে পাই।

শান্তিনিকেতন
২৫ ডিসেম্বর ১৯২৩

মানবসম্বন্ধের দেবতা

এই সংসারে একটা জিনিস অস্বীকার করতে পারি নে যে, আমরা বিধানের বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের জীবন, আমাদের অস্তিত্ব বিশ্বনিয়মের দ্বারা দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত। এ-সমস্ত নিয়মকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতেই হবে, নইলে নিষ্কৃতি নেই। নিয়মকে যে পরিমাণে জানি ও মানি সেই পরিমাণেই স্বাস্থ্য পাই, সম্পদ পাই, ঐশ্বর্য পাই। কিন্তু জীবনে একটা সত্য আছে যা এই নিয়মের মধ্যে আপনাকে দেখতে পায় না। কেননা, নিয়মের মধ্যে পাই বন্ধন, আত্মার মধ্যে চাই সম্বন্ধকে। বন্ধন এক-তরফা, সম্বন্ধে দুই পক্ষের সমান যোগ। যদি বলি বিশ্বব্যাপারে আমার আত্মার কোনো অসীম সম্বন্ধের ক্ষেত্র নেই, শুধু কতকগুলি বাহ্যসম্পর্কসূত্রেই সে ক্ষণকালের জন্য জড়িত— তা হলে জানব তার মধ্যে যে-একটি গভীর ধর্ম আছে নিখিলের মধ্যে তার কোনো নিত্যকালীন সাড়া নেই। কেননা, তার মধ্যে যা আছে তা কেবল সত্তার নিয়ম নয়, সত্তার আনন্দ। এই-যে তার আনন্দ এ কি কেবল সংকীর্ণভাবে তারই মধ্যে? অসীমের মধ্যে কোথাও তার প্রতিষ্ঠা নেই? এর সত্যটা তা হলে কোন্‌খানে? সত্যকে আমরা একের মধ্যে খুঁজি। হাত থেকে লাঠি পড়ে গেল, গাছ থেকে ফল পড়ল, পাহাড়ের উপর থেকে ঝরনা নিচে নেমে এল, এ-সমস্ত ঘটনাকে যেই এক তত্ত্বের মধ্যে দেখতে পেলে অমনি মানুষের মন বললে 'সত্যকে দেখেছি'। যতক্ষণ এই ঘটনাগুলি আমাদের কাছে বিচ্ছিন্ন ততক্ষণ আমাদের কাছে তারা নিরর্থক। তাই বৈজ্ঞানিক বলেন, তথ্যগুলি বহু, কিন্তু তারা সত্য হয়েছে অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে।

এই তো গেল বস্তুরাজ্যের নিয়মক্ষেত্র, কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যের আনন্দক্ষেত্রে কি এই ঐক্যতত্ত্বের কোনো স্থান নেই?

আমরা আনন্দ পাই বন্ধুতে, সন্তানে, প্রকৃতির সৌন্দর্যে। এগুলি ঘটনার দিক থেকে বহু, কিন্তু কোনো অসীম সত্যে কি এদের চরম ঐক্য নেই? এ প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিক দেন না, দেন সাধক। তিনি বলেন, 'বেদাহমেতম্‌, আমি যে এঁকে দেখেছি, রসো বৈ সঃ, তিনি যে রসের স্বরূপ— তিনি যে পরিপূর্ণ আনন্দ।' নিয়মের বিধাতাকে তো পদে পদেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ঋষি যাঁকে বলছেন 'স নো বন্ধুর্জনিতা', কে সেই বন্ধু, কে সেই পিতা? যিনি সত্যদ্রষ্টা তিনি 'হৃদা মনীষা মনসা' সকল বন্ধুর ভিতর দিয়ে সেই এক বন্ধুকে, সকল পিতার মধ্য দিয়ে সেই এক পিতাকে দেখছেন। বৈজ্ঞানিকের উত্তরে প্রশ্নের যেটুকু বাকি থাকে তার উত্তর তিনিই দেন। তখন আত্মা বলে, 'আমার জগৎকে পেলুম, আমি বাঁচলুম।' আমাদের অন্তরাত্মার এই প্রশ্নের উত্তর যাঁরা দিয়েছেন তাঁদেরই মধ্যে একজনের নাম যিশুখৃস্ট। তিনি বলেছেন, 'আমি পুত্র, পুত্রের মধ্যেই পিতার আবির্ভাব।' পুত্রের সঙ্গে পিতার শুধু কার্যকারণের যোগ নয়, পুত্রে পিতারই আত্মস্বরূপের প্রকাশ। খৃস্ট বলেছেন 'আমাতে তিনিই আছেন', প্রেমিক-প্রেমিকা যেমন বলতে পারে 'আমাদের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই'। অন্তরের সম্বন্ধ যেখানে নিবিড়, বিশুদ্ধ, সেখানেই এমন কথা বলতে পারা যায়; সেখানেই মহাসাধক বলেন, 'পিতাতে আমাতে একাত্মতা।' এ কথাটি নূতন না হতে পারে, এ বাণী হয়তো আরও অনেকে বলেছেন। কিন্তু যে বাণী সফল হল জীবনের ক্ষেত্রে, নানা ফল ফলালো, তাকে নমস্কার করি। খৃস্ট বলেছিলেন, 'আমার মধ্যে আমার পিতারই

প্রকাশ।' এই ভাবের কথা ভারতবর্ষেও উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু সেটি শাস্ত্রবচনের সীমানা উত্তীর্ণ হয়ে প্রাণের সীমায় যতক্ষণ না পৌঁছয় ততক্ষণ সে কথা বন্ধ্যা। যতই বড়ো ভাষায় তাকে স্বীকার করি ব্যবহারের দৈন্যে তাকে ততই বড়ো আকারে অপমানিত করি। খৃস্টান সম্প্রদায় পদে পদে তা করে থাকেন। কথার বেলায় যাকে তারা বলে 'প্রভু', সেবার বেলায় তাকে দেয় ফাঁকি। সত্য কথার দাম দিতে হয় সত্য সেবাতেই। যদি সেই দিকেই দৃষ্টি রাখি তবে বলতে হয় যে, খৃস্টের জন্ম ব্যর্থ হয়েছে; বলতে হয়, ফুল ফুটেছে সুন্দর, তার মাধুর্য উপভোগ করেছি, কিন্তু পরিণামে তাতে ফল ধরল না। এ দিকে চোখে দেখেছি বটে হিংসা রিপুর প্রাবল্য খৃস্টীয় সমাজে। তৎসত্ত্বেও মানুষের প্রতি প্রেম, লোকহিতের জন্য আত্মত্যাগ খৃস্টীয় সমাজের সাফল্য দেখিয়েছে—এ কথাটি সাম্প্রদায়িকতার মোহে পড়ে যদি না মানি তবে সত্যকেই অস্বীকার করা হবে। খৃস্টানের ধর্মবুদ্ধি প্রতিদিন বলছে— মানুষের মধ্যে ভগবানের সেবা করো, তাঁর নৈবেদ্য নিরন্নের অন্নথালিতে, বস্ত্রহীনের দেহে। এই কথাটিই খৃস্টধর্মের বড়ো কথা। খৃস্টানরা বিশ্বাস করেন—খৃস্ট আপন মানবজন্মের মধ্যে ভগবান ও মানবের একাত্মতা প্রতিপন্ন করেছেন।

ধনী তাঁর গ্রামের লোকের জলাভাবকে উপেক্ষা করে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দিলেন পুত্রের অন্নপ্রাশনে দেবমন্দিরে দেবপ্রতিমার গলায় রত্নহার পরাতে। এই কথাটি তাঁর হৃদয়ে পৌঁছয় নি যে, যেখানে সূর্যের তেজ সেখানে দীপশিখা আনা মূঢ়তা, যেখানে গভীর সমুদ্র সেখানে জলগণ্ডূষ দেওয়া বালকোচিত। অথচ মানুষের তৃষ্ণার মধ্য দিয়ে ভগবান যে জল চাইছেন সে চাওয়া অতি স্পষ্ট, অতি তীব্র: সেই চাওয়ার প্রতি বধির হয়ে এরা দেবালয়ে রত্নালংকারের জোগান দেয়।

পুত্রের মধ্যে পিতাকে বিড়ম্বিত করে দানের দ্বারা তাঁকে ভোলাবার চেষ্টায় মানুষ তাঁকে দ্বিগুণ অপমানিত করতে থাকে। দেখেছি ধনী মহিলা পাণ্ডার দুই পা সোনার মোহর দিয়ে ঢাকা দিয়ে মনে করেছে স্বর্গে পৌঁছবার পুরো মাশুল চুকিয়ে দেওয়া হল; অথচ সেই মোহরের জন্য দেবতা যেখানে কাঙাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেই মানুষের প্রতি দৃষ্টিই পড়ল না।

আজ প্রাতে আমাদের আশ্রমবন্ধু অ্যান্ড্রুজের চিঠি পেলুম। তিনি যে কাজ করতে গেছেন সে তাঁর আত্মীয়স্বজনের কাজ নয়, বরং তাদের প্রতিকূল। বাহ্যত যারা তাঁর অনাত্মীয়, যারা তাঁর স্বজাতীয় নয়, তাদের জন্য তিনি কঠিন দুঃখ সইছেন, স্বজাতীয়দের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম করে দুঃখপীড়া পাচ্ছেন। এবার সেখানে যাবা মাত্র তিনি দেখলেন বসন্তমারীতে বহু ভারতীয় পীড়িত, মৃত্যুগ্রস্ত; তাঁর কাজ হল তাদের সেবা করা। মারীর মধ্যে ভারতীয় বণিক্‌দের এই যে তিনি সেবা করেছেন, এতে কিসে তাঁকে বল দিয়েছে? মানবসন্তানের সেবায় বিশ্বপিতার সেবার উপদেশ খৃস্টানদেশের মধ্যে এতকাল ধরে এত গভীররূপে প্রবেশ করেছে যে সেখানে আজ যাঁরা নিজেকে নাস্তিক বলে প্রচার করেন তাঁদেরও নাড়ির রক্তে এই বাণী বহমান। তাঁরাও মানুষের জন্য প্রাণান্তকর দুঃখ স্বীকার করাকে আপন ধর্ম বলে প্রমাণ করেছেন। এ ফল কোন্ বৃক্ষে ফলল? কে এতে রসসঞ্চার করে? এ প্রশ্নের উত্তরে এ কথা অস্বীকার করতে পারি নে যে, সে খৃস্টধর্ম।

লক্ষ্যে অলক্ষ্যে বিবিধ আকারে এই ধর্ম পশ্চিম মহাদেশে কাজ করছে। যাকে সেখানকার লোকে হিউম্যান ইণ্টরেস্ট্ অর্থাৎ মানবের প্রতি ঔৎসুক্য বলে তা

জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপে যেমন জাগরূক তেমন আর কোথাও দেখি নি। সে দেশে সর্বত্রই মানুষকে সেখানকার লোকে সম্পূর্ণরূপে চেনবার জন্য তথ্য অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। যারা নরমাংস খায় তাদেরও মধ্যে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, 'তুমি মানুষ, তুমি কী কর, তুমি কী ভাব?' আর আমরা? আমাদের পাশের লোকেরও খবর নিই নে। তাদের সম্বন্ধে না আছে কৌতূহল, না আছে শ্রদ্ধা। উপেক্ষা ও অবজ্ঞার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করে দিয়ে অধিকাংশ প্রতিবেশীর সম্বন্ধে অজ্ঞান হয়ে আছি। কেন এমন হয়? মানুষকে যথোচিত মূল্য দিই নে বলেই আজকের দিনে আমাদের এই দুর্দশা। খৃস্ট বাঁচিয়েছেন পৃথিবীর অনেককে, বাঁচিয়েছেন মানুষের ঔদাসীন্য থেকে মানুষকে। আজকে যারা তাঁর নাম নেয় না, তাঁকে অপমান করতেও কুণ্ঠিত হয় না, তারাও তাঁর সে বাণীকে কোনো-না-কোনো আকারে গ্রহণ করেছে।

মানুষ যে বহুমূল্য, তার সেবাতেই যে ভগবানের সেবা সার্থক, এই কথা ইউরোপ যেখানে মানে নি সেখানেই সে মার খেয়েছে। এ কথার মূল্য যে পরিমাণে ইউরোপ দিয়েছে সেই পরিমাণেই সে উন্নত হয়েছে। মানুষের প্রতি খৃস্টধর্ম যে অসীম শ্রদ্ধা জাগরূক করেছে আমরা যেন নিরভিমানচিত্তে তাকে গ্রহণ করি এবং যে মহাপুরুষ সে সত্যের প্রচার করেছিলেন তাঁকে প্রণাম করি।

শান্তিনিকেতন
২৫ ডিসেম্বর ১৯২৬

বড়োদিন

যাঁকে আমরা পরম মানব বলে স্বীকার করি তাঁর জন্ম ঐতিহাসিক নয়, আধ্যাত্মিক। প্রভাতের আলো সদ্য-প্রভাতের নয়, সে চিরপ্রভাতের। আমরা যখনই তাকে দেখি তখনই সে নূতন, কিন্তু তবু সে চিরন্তন। নব নব জাগরণের মধ্যে দিয়ে সে প্রকাশ করে অনাদি আলোককে। জ্যোতির্বিদ্ জানেন নক্ষত্রের আলো যেদিন আমাদের চোখে এসে পোঁছয় তার বহু যুগ পূর্বেই সে যাত্রা করেছে। তেমনি সত্যের দূতকে যেদিন আমরা দেখতে পাই সেইদিন থেকেই তাঁর বয়সের আরম্ভ নয়— সত্যের প্রেরণা রয়েছে মহাকালের অন্তরে। কোনো কালে অন্ত নেই তাঁর আগমনের এই কথা যেন জানতে পারি।

বিশেষ দিনে বিশেষ পূজা-অনুষ্ঠান করে যাঁরা নরোত্তম তাঁদের শ্রদ্ধা জানানো সুলভে মূল্য চুকিয়ে দেওয়া। তিন শত চৌষট্টি দিন অস্বীকার করে তিন-শত-পঁয়ষট্টি-তম দিনে তাঁর স্তব দ্বারা আমরা নিজের জড়ত্বকে সান্ত্বনা দিই। সত্যের সাধনা এ নয়, দায়িত্বকে অস্বীকার করা মাত্র। এমনি করে মানুষ নিজেকে ভোলায়। নামগ্রহণের দ্বারা কর্তব্য রক্ষা করি, সত্যগ্রহণের দুরূহ অধ্যবসায় পিছনে পড়ে যায়। কর্মের মধ্যে তাঁকে স্বীকার করলেম না, স্তবের মধ্যে সহজ নৈবেদ্য দিয়েই খালাস। যাঁরা এলেন বাহ্যিকতা থেকে আমাদের মুক্তি দিতে তাঁদেরকে বন্দী করলেম বাহ্যিক অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তির মধ্যে।

আজ আমি লজ্জা বোধ করেছি এমন করে এক দিনের জন্যে আনুষ্ঠানিক কর্তব্য সমাধা করবার কাজে আহূত হয়ে। জীবন দিয়ে যাঁকে অঙ্গীকার করাই সত্য, কথা দিয়ে তাঁর প্রাপ্য চুকিয়ে দেওয়া নিরতিশয় ব্যর্থতা।

আজ তাঁর জন্মদিন এ কথা বলব কি পঞ্জিকার তিথি মিলিয়ে? অন্তরে যে দিন ধরা পড়ে না সে দিনের উপলব্ধি কি কালগণনায়? যেদিন সত্যের নামে ত্যাগ করেছি, যেদিন অকৃত্রিম প্রেমে মানুষকে ভাই বলতে পেরেছি, সেইদিনই পিতার পুত্র আমাদের জীবনে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেইদিনই বড়োদিন—যে তারিখেই আসুক। আমাদের জীবনে তাঁর জন্মদিন দৈবাৎ আসে, কিন্তু ক্রুশে বিদ্ধ তাঁর মৃত্যু সে তো আসে দিনের পর দিন। জানি আজ বিশেষ দিনে দেশে দেশে গির্জায় গির্জায় তাঁর স্তবধ্বনি উঠছে, যিনি পরমপিতার বার্তা এনেছেন মানবসন্তানের কাছে—আর সেই গির্জার বাইরে রক্তাক্ত হয়ে উঠছে পৃথিবী ভ্রাতৃহত্যায়। দেবালয়ে স্তবমন্ত্রে তাঁকে আজ যারা ঘোষণা করছে তারাই কামানের গর্জনে তাঁকে অস্বীকার করছে, আকাশ থেকে মৃত্যুবর্ষণ করে তাঁর বাণীকে অতি ভীষণ ব্যঙ্গ করছে। লোভ আজ নিদারুণ, দুর্বলের অন্নগ্রাস আজ লুণ্ঠিত, প্রবলের সামনে দাঁড়িয়ে খৃস্টের দোহাই দিয়ে মার বুকে পেতে নিতে সাহস নেই যাদের তারাই আজ পূজাবেদীর সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুশূলবিদ্ধ সেই কারুণিকের জয়ধ্বনি করছে অভ্যস্ত বচন আবৃত্তি করে। তবে কিসের উৎসব আজ? কেমন করে জানব খৃস্ট জন্মেছেন পৃথিবীতে? আনন্দ করব কী নিয়ে? এক দিকে যাঁকে মারছি নিজের হাতে, আর-এক দিকে পুনরুজ্জীবন প্রচার করব শুধু মাত্র কথায়? আজও তিনি মানুষের ইতিহাসে প্রতিমুহূর্তে ক্রুশে বিদ্ধ হচ্ছেন।

তিনি ডেকেছিলেন মানুষকে পরমপিতার সন্তান বলে, ভাইকে মিলতে বলেছিলেন ভাইয়ের সঙ্গে। প্রাণোৎসর্গ করলেন এই মানবসত্যের বেদীতে। চিরদিনের জন্যে এই মিলনের আহ্বান রেখে গেলেন আমাদের কাছে।

তাঁর আহ্বানকে আমরা যুগে যুগে প্রত্যাখ্যান করেছি। বেড়েই চলল তাঁর বাণীর প্রতিবাদ করবার অতি বিপুল আয়োজন।

বেদমন্ত্রে আছে তিনি আমাদের পিতা : পিতা নোঽসি। সেইসঙ্গে প্রার্থনা আছে : পিতা নো বোধি। তিনি যে পিতা এই বোধ যেন আমাদের মনে জাগে। সেই পিতার বোধ যিনি দান করতে এসেছিলেন তিনি ব্যর্থ হয়ে, উপহসিত হয়ে, ফিরছেন আমাদের দ্বারের বাইরে—সেই কথাকে গান গেয়ে স্তব করে চাপা যেন না দিই। আজ পরিতাপ করবার দিন, আনন্দ করবার নয়। আজ মানুষের লজ্জা সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করে। আজ আমাদের উদ্ধত মাথা ধুলায় নত হোক, চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে যাক। বড়োদিন নিজেকে পরীক্ষা করবার দিন, নিজেকে নম্র করবার দিন।

শান্তিনিকেতন
২৫ ডিসেম্বর ১৯৩২

খৃস্ট

আমাদের এই ভূলোককে বেষ্টন করে আছে ভুবর্লোক, আকাশমণ্ডল, যার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রাণের নিশ্বাসবায়ু সমীরিত হয়। ভূলোকের সঙ্গে সঙ্গে এই ভুবর্লোক আছে বলেই আমাদের পৃথিবী নানা বর্ণসম্পদে গন্ধসম্পদে সংগীতসম্পদে সমৃদ্ধ —পৃথিবীর ফল শস্য সবই এই ভুবর্লোকের দান। এক সময় পৃথিবী যখন দ্রবপ্রায় অবস্থায় ছিল তখন তার চার দিকে বিষবাষ্প ছিল ঘন হয়ে, সূর্যকিরণ এই আচ্ছাদন ভালো করে ভেদ করতে পারত না। ভূগর্ভের উত্তাপ অসংযত হয়ে জল-স্থলকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ক্রমশ এই তাপ শান্ত হয়ে গেলে আকাশ নির্মল হয়ে এল, মেঘপুঞ্জ হল ক্ষীণ, সূর্যকিরণ পৃথিবীর ললাটে আশীর্বাদটিকা পরিয়ে দেবার অবকাশ পেল। ভুবর্লোককে আচ্ছন্ন করেছিল যে কালিমা তা অপসারিত হলে পৃথিবী হল সুন্দর, জীবজন্তু হল আনন্দিত। মানবলোকসৃষ্টিও এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। মানবচিত্তের আকাশমণ্ডলকে মোহকালিমা থেকে নির্মুক্ত করবার জন্য, সমাজকে শোভন বাসযোগ্য করবার জন্য, মানুষকে চলতে হয়েছে দুঃখস্বীকারের কাঁটাপথ দিয়ে। অনেক সময় সে চেষ্টায় মানুষ ভুল করেছে, কালিমা শোধন করতে গিয়ে অনেক সময় তাকে ঘনীভূত করেছে। পৃথিবী যখন তার সৃষ্টি-উপাদানের সামঞ্জস্য পায় নি তখন কত বন্যা, ভূকম্প, অগ্নি-উচ্ছ্বাস, বায়ুমণ্ডলে কত আবিলতা। কত স্বার্থপরতা, হিংস্রতা, লুব্ধতা, দুর্বলকে পীড়ন আজও চলছে; আদিম কালে রিপুর অন্ধবেগের পথে শুভবুদ্ধির বাধা আরও অল্প ছিল। এই-যে বিষনিশ্বাসে মানুষের ভুবর্লোক আবিল মেঘাচ্ছন্ন, এই-যে কালিমা আলোককে অবরুদ্ধ করে, তাকে নির্মল করবার চেষ্টায় কত সমাজতন্ত্র ধর্মতন্ত্র মানুষ রচনা করেছে। যতক্ষণ এই চেষ্টা শুধু নিয়ম-শাসনে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তা সফল হতে পারে না। নিয়মের বল্‌গায় প্রমত্ত রিপুর উচ্ছৃঙ্খলতাকে কিছু পরিমাণে দমন করতে পারে; কিন্তু তার ফল বাহ্যিক।

মানুষ নিয়ম মানে ভয়ে; এই ভয়টাতে প্রমাণ করে তার আত্মিক দুর্বলতা। ভয়দ্বারা চালিত সমাজে বা সাম্রাজ্যে মানুষকে পশুর তুল্য অপমানিত করে। বাহিরের এই শাসনে তার মনুষ্যত্বের অমর্যাদা। মানবলোকে এই ভয়ের শাসন আজও আছে প্রবল।

মানুষের অন্তরের বায়ুমণ্ডল মলিনতামুক্ত হয় নি বলেই তার এই অসম্মান সম্ভবপর হয়েছে। মানুষের অন্তরলোকের মোহাবরণ মুক্ত করবার জন্যে যুগে যুগে মহৎ প্রাণের অভ্যুদয় হয়েছে। পৃথিবীর একটা অংশ আছে, যেখানে তার সোনারুপার খনি, যেখানে মানুষের অশনবসনের আয়োজনের ক্ষেত্র; সেই স্থূল ভূমিকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সেই স্থূল মৃত্তিকাভাণ্ডারই তো পৃথিবীর মাহাত্ম্যভাণ্ডার নয়। যেখানে তার আলোক বিচ্ছুরিত, যেখানে নিশ্বসিত তার প্রাণ, যেখানে প্রসারিত তার মুক্তি, সেই ঊর্ধ্বলোক থেকেই প্রবাহিত হয় তার কল্যাণ; সেইখান থেকেই বিকশিত হয় তার সৌন্দর্য। মানবপ্রকৃতিতেও আছে স্থূলতা, যেখানে তার বিষয়বুদ্ধি, যেখানে তার অর্জন এবং সঞ্চয়; তারই প্রতি আসক্তিই যদি কোনো মূঢ়তায় সর্বপ্রধান হয়ে ওঠে তা হলে শান্তি থাকে না, সমাজ বিষবাষ্পে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ তারই পরিচয় পাচ্ছি, আজ বিশ্বব্যাপী লুব্ধতা প্রবল হয়ে উঠে মানুষে মানুষে হিংস্রবুদ্ধির

আগুন জ্বালিয়ে তুলেছে। এমন দিনে স্মরণ করি সেই মহাপুরুষদের যাঁরা মানুষকে সোনারুপার ভাণ্ডারের সন্ধান দিতে আসেন নি, দুর্বলের বুকের উপর দিয়ে প্রবলের ইস্পাত-বাঁধানো বড়ো রাস্তা পাকা করবার মন্ত্রণাদাতা যাঁরা নন-- মানুষের সব চেয়ে বড়ো সম্পদ যে মুক্তি সেই মুক্তি দান করা যাঁদের প্রাণপণ ব্রত।

এমন মহাপুরুষ নিশ্চয়ই পৃথিবীতে অনেক এসেছেন, আমরা তাঁদের সকলের নামও জানি না। কিন্তু নিশ্চয়ই এমন অনেক আছেন এখনও যাঁরা এই পৃথিবীকে মার্জনা করছেন, আমাদের জীবনকে সুন্দর উজ্জ্বল করছেন। বিজ্ঞানে জেনেছি, জন্তুরা যে বিষনিশ্বাস পরিত্যাগ করে গাছপালা সে নিশ্বাস গ্রহণ করে প্রাণদায়ী অক্সিজেন প্রশ্বসিত করে দেয়। তেমনি মানুষের চরিত্র প্রতিনিয়ত যে বিষ উদ্গার করছে নিয়ত তা নির্মল হচ্ছে পবিত্রজীবনের সংস্পর্শে। এই শুভ চেষ্টা মানবলোকে যাঁরা জাগ্রত রাখছেন তাঁদের যিনি প্রতীক, যস্তদ্রং তন্ন আসুব এই বাণী যাঁর মধ্যে উজ্জ্বল পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তাঁকে প্রণাম করার যোগেই সেই সাধুদের সকলকে একসঙ্গে প্রণাম জানাই—যাঁরা আত্মোৎসর্গের দ্বারা পৃথিবীতে কল্যাণ বিতরণ করছেন।

আজকের দিন যাঁর জন্মদিন বলে খ্যাত সেই যিশুর নিকটেই উপস্থিত করি জগতে যাঁরা প্রণম্য তাঁদের সকলের উদ্দেশে প্রণাম। আমরা মানবের পরিপূর্ণ কল্যাণরূপ দেখতে পেয়েছি কয়েক জনের মধ্যে। এই কল্যাণের দূত আমাদের ইতিহাসে অল্পই এসেছেন, কিন্তু পরিমাণ দিয়ে কল্যাণের বিচার তো হতে পারে না।

ভারতবর্ষে উপনিষদের বাণী মানুষকে বল দিয়েছে। কিন্তু সে তো মন্ত্র, ধ্যানের বিষয়। যাঁদের জীবনে রূপ পেয়েছে সেই বাণী তাঁরা যদি আমাদের আপন হয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ হয়ে আসেন তবে সে আমাদের মস্ত সুযোগ। কেননা শাস্ত্রবাক্য তো কথা বলে না, মানুষ বলে। আজকে আমরা যাঁর কথা স্মরণ করছি তিনি অনেক আঘাত পেয়েছেন, বিরুদ্ধতা শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছেন, নিষ্ঠুর মৃত্যুতে তাঁর জীবনান্ত হয়েছিল। এই-যে পরম দুঃখের আলোকে মানুষের মনুষ্যত্ব চিরকালের মতো দেদীপ্যমান হয়ে আছে এ তো বইপড়া ব্যাপার নয়। এখানে দেখছি মানুষকে দুঃখের আগুনে উজ্জ্বল। এঁকে উপলব্ধি করা সহজ; শাস্ত্রবাক্যকে তো আমরা ভালোবাসতে পারি নে। সহজ হয় আমাদের পথ, যদি আমরা ভালোবাসতে পারি তাঁদের যাঁরা মানুষকে ভালোবেসেছেন। বুদ্ধ যখন অপরিমেয় মৈত্রী মানুষকে দান করেছিলেন তখন তো তিনি কেবল শাস্ত্র প্রচার করেন নি, তিনি মানুষের মনে জাগ্রত করেছিলেন ভক্তি। সেই ভক্তির মধ্যেই যথার্থ মুক্তি। খৃস্টকে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভালোবাসতে পেরেছেন তাঁরা শুধু একা বসে রিপু দমন করেন নি, তাঁরা দুঃসাধ্য সাধন করেছেন। তাঁরা গিয়েছেন দূর-দূরান্তরে, পর্বত সমুদ্র পেরিয়ে মানবপ্রেম প্রচার করেছেন। মহাপুরুষেরা এইরকম আপন জীবনের প্রদীপ জ্বালান; তাঁরা কেবল তর্ক করেন না, মত প্রচার করেন না। তাঁরা আমাদের দিয়ে যান মানুষরূপে আপনাকে।

খৃস্টের প্রেরণা মানবসমাজে আজ ছোটো বড়ো কত প্রদীপ জ্বালিয়েছে, অনাথ-পীড়িতদের দুঃখ দূর করবার জন্যে তাঁরা অপরিসীম ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন। কী দানবতা আজ চার দিকে, কলুষে পৃথিবী আচ্ছন্ন—তবু বলতে হবে : স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। এই বিরাট কলুষনিবিড়তার মধ্যে দেখা যায় না তাঁদের যাঁরা মানবসমাজের পুণ্যের আকর। কিন্তু তাঁরা নিশ্চয়ই

আছেন—নইলে পৃথিবী অভিশপ্ত হত, সমস্ত সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যেত, সমস্ত মানবলোক অন্ধকারে অবলুপ্ত হত।

শান্তিনিকেতন
২৫ ডিসেম্বর ১৯০৬

খৃস্ট-প্রসঙ্গ

খৃস্টান শাস্ত্রে বলে, ঈশ্বর মানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদনার ভার বহন ও দুঃখের কণ্টককিরীট মাথায় পরিয়াছিলেন। মানুষের সকলপ্রকার পরিত্রাণের একমাত্র মূল্যই সেই দুঃখ। মানুষের নিতান্ত আপন সামগ্রী যে দুঃখ, প্রেমের দ্বারা তাহাকে ঈশ্বরও আপন করিয়া এই দুঃখসংগমে মানুষের সঙ্গে মিলিয়াছেন, দুঃখকে অপরিসীম মুক্তিতে ও আনন্দে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন—ইহাই খৃস্টানধর্মের মর্মকথা।

[১১ মাঘ] ১৩১৪

২

যিশু কোন্ অখ্যাত গ্রামের প্রান্তে কোন্-এক পশুরক্ষণশালায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন—কোনো পণ্ডিতের ঘরে নয়, কোনো রাজার প্রাসাদে নয়, কোনো মহৈশ্বর্যশালী রাজধানীতে নয়, কোনো মহাপুণ্যক্ষেত্র তীর্থস্থানে নয়। যারা মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করত এমন কয়েকজন মাত্র ইহুদি যুবক তাঁর শিষ্য হয়েছিল— যেদিন তাঁকে রোমরাজের প্রতিনিধি অনায়াসেই ক্রুশে বিদ্ধ করবার আদেশ দিলেন সেই দিনটি জগতের ইতিহাসে যে চিরদিন ধন্য হবে এমন কোনো লক্ষণ সেদিন কোথাও প্রকাশ পায় নি। তাঁর শত্রুরা মনে করলে সমস্তই চুকেবুকে গেল, এই অতি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গটিকে একেবারে দলন করে নিবিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু, কার সাধ্য নেবায়! ভগবান যিশু তাঁর ইচ্ছাকে তাঁর পিতার ইচ্ছার সঙ্গে যে মিলিয়ে দিয়েছিলেন—সেই ইচ্ছার মৃত্যু নেই, তার স্বাভাবিকী ক্রিয়ার ক্ষয় নেই। অত্যন্ত কৃশ এবং দীন ভাবে যা নিজেকে প্রকাশ করেছিল তাই আজ দুই সহস্র বৎসর ধরে বিশ্বজয় করছে।

১১ ফাল্গুন [১৩১৫]

৩

আর-এক মহাপুরুষ যিনি তাঁর পিতার মহিমা প্রচার করতে জগতে এসেছিলেন তিনি বলেছেন, 'তোমার পিতা যেরকম সম্পূর্ণ তুমি তেমনি সম্পূর্ণ হও।'

এ কথাটিও ছোটো কথা নয়। মানবাত্মার সম্পূর্ণতার আদর্শকে তিনি পরমাত্মার মধ্যে স্থাপন করে সেই দিকেই আমাদের লক্ষ্য স্থির করতে বলেছেন।

সেই সম্পূর্ণতার মধ্যেই আমাদের ব্রহ্মবিহার, কোনো ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে নয়। পিতা যেমন সম্পূর্ণ পুত্র তেমনি সম্পূর্ণ হতে নিয়ত চেষ্টা করবে। এ না হলে পিতাপুত্রে সত্যযোগ হবে কেমন করে?

এই সম্পূর্ণতার যে-একটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন সেও বড়ো কম নয়। যেমন বলেছেন, তোমার প্রতিবেশীকে তোমার আপনার মতো ভালোবাসো। কথাটাকে লেশমাত্র খাটো করে বলেন নি। বলেন নি যে, প্রতিবেশীকে ভালোবাসো; বলেছেন, প্রতিবেশীকে আপনারই মতো ভালোবাসো। যিনি ব্রহ্মবিহার কামনা করেন তাঁকে এই ভালোবাসায় গিয়ে পৌঁছতে হবে—এই পথেই তাঁকে চলা চাই।

ভগবান যিশু বলেছেন, শত্রুকেও প্রীতি করবে। শত্রুকে ক্ষমা করবে বলে ভয়ে-ভয়ে মাঝপথে থেমে যান নি। শত্রুকে প্রীতি করবে বলে তিনি ব্রহ্মবিহার পর্যন্ত লক্ষ্যকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন, যে তোমার গায়ের জামা কেড়ে নেয় তাকে তোমার উত্তরীয় পর্যন্ত দান করো।

সংসারী লোকের পক্ষে এগুলি একেবারে অত্যুক্তি। তার কারণ, সংসারের চেয়ে বড়ো লক্ষ্যকে সে মনের সঙ্গে বিশ্বাস করে না। সংসারকে সে তার জামা ছেড়ে উত্তরীয় পর্যন্ত দিয়ে ফেলতে পারে যদি তাতে তার সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কিন্তু, ব্রহ্মবিহারকে সে যদি প্রয়োজনের চেয়ে ছোটো বলে জানে তবে জামাটুকু দেওয়াও শক্ত হয়।

কিন্তু, যাঁরা জীবের কাছে সেই ব্রহ্মকে, সেই সকলের চেয়ে বড়োকেই ঘোষণা করতে এসেছেন, তাঁরা তো সংসারী লোকের দুর্বল বাসনার মাপে ব্রহ্মকে অতি ছোটো করে দেখাতে চান নি। তাঁরা সকলের চেয়ে বড়ো কথাকেই অসংকোচে একেবারে শেষ পর্যন্ত বলেছেন।

এই বড়ো কথাকে এত বড়ো করে বলার দরুন তাঁরা আমাদের একটা মস্ত ভরসা দিয়েছেন। এর দ্বারা তাঁরা প্রকাশ করেছেন মনুষ্যত্বের গতি এত দূর পর্যন্তই যায়, তার প্রেম এত বড়োই প্রেম, তার ত্যাগ এত বড়োই ত্যাগ।

১২ চৈত্র [১৩১৫]

৪

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে গ্রন্থিবন্ধনের প্রয়োজন আছে মন্ত্র তার সহায়তা করে। এই মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা তাঁর সঙ্গে একটা-কোনো বিশেষ সম্বন্ধকে পাকা করে নেব।

সেইরূপ একটি মন্ত্র হচ্ছে : পিতা নোঽসি।

এই সুরে জীবনটাকে বাঁধলে সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে একটি বিশেষ রাগিণী জেগে উঠবে। আমি তাঁর পুত্র এইটেই মূর্তি ধরে আমার সমস্তের মধ্যেই এই কথাটাই প্রকাশ করবে যে, আমি তাঁর পুত্র।

আজ আমি কিছুই প্রকাশ করছি নে। আহার করছি, কাজ করছি, বিশ্রাম করছি, এই পর্যন্তই। কিন্তু, অনন্ত কালে অনন্ত জগতে আমার পিতা যে আছেন তার কোনো লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে না। অনন্তের সঙ্গে আজও আমার কোনো গ্রন্থি কোথাও বাঁধা হয় নি।

ওই মন্ত্রটিকে দিয়ে জীবনের তার আজ বাঁধা যাক। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে ওই মন্ত্রটি বারম্বার আমার মনের মধ্যে বাজতে থাক্ : পিতা নোঽসি। জগতে আমার পিতা আছেন এই কথাটি সকলেই জানুক, কারও কাছে গোপন না থাক্।

ভগবান যিশু ওই সুরটিকে পৃথিবীতে বাজিয়ে গিয়েছেন। এমনি ঠিক করে তাঁর জীবনের তার বাঁধা ছিল যে মরণান্তিক যন্ত্রণার দুঃসহ আঘাতেও সেই তার লেশমাত্র বেসুর বলে নি, সে কেবলই বলেছে : পিতা নোঽসি।

সেই-যে সুরের আদর্শটি তিনি দেখিয়ে গেছেন সেই খাঁটি আদর্শের সঙ্গে একান্ত যত্নে মিশিয়ে তারটি বাঁধতে হবে, যাতে আর ভাবতে না হয়, যাতে সুখে দুঃখে প্রলোভনে আপনিই সে গেয়ে ওঠে : পিতা নোঽসি।

২৭ চৈত্র [১৩১৫]

৫

ইহুদিদের মধ্যে ফ্যারিসি-সম্প্রদায়ের অনুশাসনে যখন বাহ্য নিয়মপালনই ধর্ম বলে গণ্য হয়ে উঠেছিল, যখন তারা নিজের গণ্ডির বাইরে অন্য জাতি অন্য ধর্মপন্থীদের ঘৃণা করে তাদের সঙ্গে একত্রে আহার বিহার বন্ধ করাকেই ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় বলে স্থির করেছিল, যখন ইহুদির ধর্মানুষ্ঠান ইহুদিজাতিরই নিজস্ব স্বতন্ত্র সামগ্রী হয়ে উঠেছিল, তখন যিশু এই অত্যন্ত সহজ কথাটি বলবার জন্যেই এসেছিলেন যে,—ধর্ম অন্তরের সামগ্রী, ভগবান অন্তরের ধন, পাপপুণ্য বাহিরের কৃত্রিম বিধিনিষেধের অনুগত নয়; সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, মানুষের প্রতি ঘৃণাহীন প্রেম ও পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ ভক্তির দ্বারাই ধর্মসাধনা হয়; বাহ্যিকতা মৃত্যুর নিদান, অন্তরের সার পদার্থেই প্রাণ পাওয়া যায়। কথাটি এতই অত্যন্ত সরল যে শোনবামাত্রই সকলকেই বলতে হয় যে 'হাঁ', কিন্তু তবুও এই কথাটিকেই সকল দেশেই মানুষ এতই কঠিন করে তুলেছে যে এর জন্যে যিশুকে মরুপ্রান্তরে গিয়ে তপস্যা করতে এবং ক্রুশের উপরে অপমানিত মৃত্যুদণ্ডকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

৭ পৌষ ১৩১৬

৬

মানুষের যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এমন জায়গায় সকলের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়ান যেখানে সর্বব্যাপীর সঙ্গে তাঁদের আত্মার যোগস্থাপন হয়। যেখানে মানুষ সকলকে ঠেলে-ঠুলে নিজে বড়ো হয়ে উঠতে চায় সেখানেই তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। সেইজন্যেই যাঁরা মানবজন্মের সফলতা লাভ করেছেন উপনিষৎ তাঁদের ধীর বলেছেন, যুক্তাত্মা বলেছেন। অর্থাৎ, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই শান্ত, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই সেই পরম-একের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ নেই, তাঁরা যুক্তাত্মা।

খৃস্টের উপদেশবাণীর মধ্যেও এই কথাটির আভাস আছে। তিনি বলেছেন,

সূচির ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যেমন উট প্রবেশ করতে পারে না, ধনীর পক্ষে মুক্তি-লাভও তেমনি দুঃসাধ্য।

তার মানে হচ্ছে এই যে, ধন বলো, মান বলো, যা কিছু আমরা জমিয়ে তুলি তার দ্বারা আমরা স্বতন্ত্র হয়ে উঠি; তার দ্বারা সকলের সঙ্গে আমাদের যোগ নষ্ট হয়। তাকেই বিশেষভাবে আগলাতে সামলাতে গিয়ে সকলকে দূরে ঠেকিয়ে রাখি। সঞ্চয় যতই বাড়তে থাকে ততই সকলের চেয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র বলে গর্ব হয়। সেই গর্বের টানে এই স্বাতন্ত্র্যকে কেবলই বাড়িয়ে নিয়ে চলতে চেষ্টা হয়। এর আর সীমা নেই— আরও বড়ো, আরও বড়ো; আরও বেশি, আরও বেশি। এমনি করে মানুষ সকলের সঙ্গে যোগ হারাবার দিকেই চলতে থাকে, তার সর্বত্র প্রবেশের অধিকার কেবল নষ্ট হয়। উট যেমন সূচির ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে গলতে পারে না সেও তেমনি কেবলই স্থূল হয়ে উঠে নিখিলের কোনো পথ দিয়েই গলতে পারে না; সে আপনার 'বড়ো'ত্বের মধ্যেই বন্দী। সে ব্যক্তি মুক্তস্বরূপকে কেমন করে পাবে যিনি এমন প্রশস্ততম জায়গায় থাকেন যেখানে জগতের ছোটোবড়ো সকলেরই সমান স্থান।

[১৩১৬]

৭

ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে এইটি বরাবর দেখা গেছে, ধর্ম যখন আপনার রসের মূর্তি প্রকাশ করে তখনই সে বাঁধন ভাঙে এবং সকল মানুষকে এক করবার দিকে ধাবিত হয়। খৃস্ট যে প্রেম-ভক্তিরসের বন্যাকে মুক্ত করে দিলেন তা ইহুদিধর্মের কঠিন শাস্ত্রবন্ধনের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখতে পারলে না এবং সেই ধর্ম আজ পর্যন্ত প্রবল জাতির স্বার্থের শৃঙ্খলকে শিথিল করবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করছে, আজ পর্যন্ত সমস্ত সংস্কার এবং অভিমানের বাধা ভেদ করে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাবার দিকে তার আকর্ষণশক্তি প্রয়োগ করছে।

[১৩১৬]

৮

মানবসংসারের মধ্যেই সেই ভীষণকে সুন্দর করে দেখতে চাও? তা হলে নিজের স্বার্থপর ছয়-রিপু-চালিত ক্ষুদ্র জীবন থেকে দূরে এসো। মানবচরিতকে যেখানে বড়ো করে দেখতে পাওয়া যায় সেই মহাপুরুষদের সামনে এসে দাঁড়াও। ওই দেখো শাক্যরাজবংশের তপস্বী। তাঁর পুণ্যচরিত আজ কত ভক্তের কণ্ঠে, কত কবির গাথায় উচ্চারিত হচ্ছে— তাঁর চরিত ধ্যান করে কত দীনচেতা ব্যক্তিরও মন আজ মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কী তার দীপ্তি, কী তার সৌন্দর্য, কী তার পবিত্রতা! কিন্তু, সেই জীবনের প্রত্যেক দিনকে একবার স্মরণ করে দেখো। কী দুঃসহ! কত দুঃখের দারুণ দাহে ওই সোনার প্রতিমা তৈরি হয়ে উঠেছে! সেই দুঃখগুলিকে স্বতন্ত্র করে যদি পুঞ্জীভূত করে দেখানো যেত তা হলে সেই নিষ্ঠুর দৃশ্যে মানুষের মন একেবারে বিমুখ হয়ে যেত। কিন্তু, সমস্ত দুঃখের সঙ্গে সঙ্গেই তার

আদিতে ও অন্তে যে ভূমানন্দ আছে তাকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বলেই এই চরিত এত সুন্দর, মানুষ একে এত আদরে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছে।

ভগবান ঈশাকে দেখো। সেই একই কথা। কত আঘাত, কত বেদনা! সমস্তকে নিয়ে তিনি কত সুন্দর! শুধু তাই নয়, তাঁর চারি দিকে মানুষের সমস্ত নিষ্ঠুরতা সংকীর্ণতা ও পাপ সেও তাঁর চরিতমূর্তির উপকরণ; পঙ্ককে পঙ্কজ যেমন সার্থক করে তেমনি মানবজীবনের সমস্ত অমঙ্গলকে তিনি আপনার আবির্ভাবের দ্বারা সার্থক করে দেখিয়েছেন।

ভীষণ শক্তির প্রচণ্ড লীলাকে আজ আমরা যেমন এই সন্ধ্যাকাশে শান্ত সুন্দর করে দেখতে পাচ্ছি, মহাপুরুষদের জীবনেও মহদ্‌দুঃখের ভীষণ লীলাকে সেই-রকম বৃহৎ করে সুন্দর করে দেখতে পাই। কেননা, সেখানে আমরা দুঃখকে পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে দেখি, এইজন্য তাকে দুঃখরূপে দেখি নে, আনন্দরূপেই দেখি।

১৫ চৈত্র ১৩১৭

৯

খৃস্টের জীবনবৃক্ষ হইতে যে ধর্মবীজ য়ুরোপের চিত্তক্ষেত্রে পড়িয়াছে তাহাই সেখানে এমন করিয়া ফলবান হইয়া উঠিয়াছে। সেই বীজের মধ্যে যে জীবনীশক্তি আছে সেটি কী? সেটি দুঃখকে পরম ধন বলিয়া গ্রহণ করা।

স্বর্গের দয়া যে মানুষের প্রেমে মানুষের সমস্ত দুঃখকে আপনার করিয়া লয়, এই কথাটি আজ বহুশত বৎসর ধরিয়া নানা মন্ত্রে অনুষ্ঠানে সংগীতে য়ুরোপ শুনিয়া আসিতেছে। শুনিতে শুনিতে এই আইডিয়াটি তাহার এমন একটি গভীর মর্মস্থানকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে যাহা চেতনারও অন্তরালবর্তী অতিচেতনার দেশ—সেইখানকার গোপন নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে মানুষের সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে—সেই অগোচর গভীরতার মধ্যেই মানুষের সমস্ত ঐশ্বর্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

সেইজন্য আজ য়ুরোপে সর্বদা এই একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখিতে পাই, যাহারা মুখে খৃস্টধর্মকে অমান্য করে এবং জড়বাদের জয় ঘোষণা করিয়া বেড়ায় তাহারাও সময় উপস্থিত হইলে ধনে প্রাণে আপনাকে এমন করিয়া ত্যাগ করে, নিন্দাকে দুঃখকে এমন বীরের মতো বহন করে যে, তখনই বুঝা যায় তাহারা নিজের অজ্ঞাতসারেও মৃত্যুর উপরে অমৃতকে স্বীকার করে এবং সুখের উপরে মঙ্গলকেই সত্য বলিয়া মানে।

টাইটানিক জাহাজে যাঁহারা নিজের প্রাণকে নিশ্চিতভাবে অবজ্ঞা করিয়া পরের প্রাণকে রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই যে নিষ্ঠাবান ও উপাসনারত খৃস্টান তাহা নহে, এমনকি তাঁহাদের মধ্যে নাস্তিক বা অজ্ঞেয়িকও কেহ কেহ থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা কেবলমাত্র মতান্তর গ্রহণের দ্বারা সমস্ত জাতির ধর্মসাধনা হইতে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিবেন কী করিয়া? কোনো জাতির মধ্যে যাঁহারা তাপস তাঁহারা সে জাতির সকলের হইয়া তপস্যা করেন। এইজন্য সেই জাতির পনেরো-আনা মূঢ়ও যদি সেই তাপসদের গায়ে ধুলা দেয় তথাপি তাহারাও তপস্যার ফল হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় না।

ভগবানের প্রেমে মানুষের ছোটো বড়ো সমস্ত দুঃখ নিজে বহন করিবার শক্তি ও সাধনা আমাদের দেশে পরিব্যাপ্তভাবে দেখিতে পাই না, এ কথা যতই অপ্রিয় হউক তথাপি ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। প্রেমভক্তির মধ্যে যে ভাবের আবেগ, যে রসের লীলা, তাহা আমাদের যথেষ্ট আছে; কিন্তু প্রেমের মধ্যে যে দুঃখস্বীকার, যে আত্মত্যাগ, যে সেবার আকাঙ্ক্ষা আছে, যাহা বীর্যের দ্বারাই সাধ্য, তাহা আমাদের মধ্যে ক্ষীণ। আমরা যাহাকে ঠাকুরের সেবা বলি তাহা দুঃখ-পীড়িত মানুষের মধ্যে ভগবানের সেবা নহে। আমরা প্রেমের রসলীলাকেই একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছি, প্রেমের দুঃখলীলাকে স্বীকার করি নাই।

দুঃখকে লাভের দিক দিয়া স্বীকার করার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই; দুঃখকে প্রেমের দিক দিয়া স্বীকার করাই আধ্যাত্মিকতা। কৃপণ ধনসঞ্চয়ের যে দুঃখ ভোগ করে, পারলৌকিক সদ্‌গতির লোভে পুণ্যকামী যে দুঃখব্রত গ্রহণ করে, মুক্তি-লোলুপ মুক্তির জন্য যে দুঃখসাধন করে, এবং ভোগী ভোগের জন্য যে দুঃখকে বরণ করে, তাহা কোনোমতেই পরিপূর্ণতার সাধনা নহে। তাহাতে আত্মার অভাবকেই, দৈন্যকেই প্রকাশ করে। প্রেমের জন্য যে দুঃখ তাহাই যথার্থ ত্যাগের ঐশ্বর্য; তাহাতেই মানুষ মৃত্যুকে জয় করে ও আত্মার শক্তিকে ও আনন্দকে সকলের ঊর্ধ্বে মহীয়ান করিয়া তুলে।

এই দুঃখলীলার ক্ষেত্রেই আমরা আপনাকে ছাড়িয়া বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করিতে পারি। সত্যের মূল্যই এই দুঃখ। এই দুঃখসম্পদই মানবাত্মার প্রধান ঐশ্বর্য। এই দুঃখের দ্বারাই তাহার বল প্রকাশ হয় এবং এই দুঃখের দ্বারাই সে আপনাকে এবং অন্যকে লাভ করে। তাই শাস্ত্রে বলে : নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অর্থাৎ, দুঃখ স্বীকার করিবার বল যাহার নাই সে আপনাকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না।...

মানুষকে এইরূপ সত্য বলিয়া দেখা, ইহা আত্মার সত্যদৃষ্টি, অর্থাৎ, প্রেমের দ্বারাই ঘটে। তত্ত্বজ্ঞান যখন বলে, সর্বভূতই এক, সে একটা বাক্যমাত্র; সেই তত্ত্ব-কথার দ্বারা সর্বভূতকে আত্মবৎ করা যায় না। প্রেম-নামক আত্মার যে চরমশক্তি, যাহার ধৈর্য অসীম, আপনাকে ত্যাগ করাতেই যাহার স্বাভাবিক আনন্দ, সেই সেবাতৎপর প্রেম না হলে আর কিছুতেই পরকে আপন করা যায় না; এই শক্তির দ্বারাই দেশপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত দেশের মধ্যে উপলব্ধি করেন, মানবপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত মানবের মধ্যে লাভ করেন।

য়ুরোপের ধর্ম য়ুরোপকে সেই দুঃখপ্রদীপ্ত সেবাপরায়ণ প্রেমের দীক্ষা দিয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন সহজ হইয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে দুঃখ-তপস্যার হোমাগ্নি নিবিতেছে না এবং জীবনের সকল বিভাগেই শত শত তাপস আত্মাহুতির যজ্ঞ করিয়া সমস্ত দেশের চিত্তে অহরহ তেজ সঞ্চার করিতেছেন। সেই দুঃসহ যজ্ঞহুতাশন হইতে যে অমৃতের উদ্‌ভব হইতেছে তাহার দ্বারাই সেখানে শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্য বাণিজ্য রাষ্ট্রনীতির এমন বিরাট বিস্তার হইতেছে; ইহা কোনো কারখানাঘরে লোহার যন্ত্রে তৈরি হইতেই পারে না; ইহা তপস্যার সৃষ্টি এবং সেই তপস্যার অগ্নিই মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি, মানুষের ধর্মবল।

১০

আজ খৃস্ট্‌মাস্‌। এইমাত্র ভোরের বেলা আমরা আমাদের খৃস্টোৎসব সমাধা করে উঠেছি।...আমরা তিনজনে আমাদের শোবার ঘরের একটি কোণে বসে আমাদের উৎসব করলুম— কিছু অভাব বোধ হল না— উৎসবের যিনি দেবতা তিনি যদি আসন গ্রহণ করেন তা হলে কোনো আয়োজনের ত্রুটি চোখে পড়েই না। তাঁকে আজ আমরা প্রণাম করেছি, তাঁর আশীর্বাদ আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা একান্ত-মনে প্রার্থনা করেছি যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব। আমাদের সমস্ত ইচ্ছাকে নিঃশেষে পরাস্ত করে দিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে আমাদের জীবনে জয়ী করুন, জীবন একেবারে পরিপূর্ণরূপে সত্য হোক। সেজন্য যত ত্যাগ যত দুঃখদাহ সমস্তই যেন মাথা নত করে স্বীকার করে নিতে পারি। এই ইচ্ছা তাঁকে জানিয়েছি— এই ইচ্ছার মধ্যে কিছুমাত্র মিথ্যা যেন না থাকে এই কামনা করছি— যদি মিথ্যা থাকে তবে তা চূর্ণবিচূর্ণ হোক, বজ্রাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে যাক! এই সত্যের পথে যাবার পক্ষে মানুষই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো বাধা, তেমনি মানুষই মানুষের পক্ষে পরম সহায়— সেই মানুষটিই আজ জন্মেছিলেন, তিনিই আজ আমাদের জীবনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করুন— নিষ্কলঙ্ক শুভ্র শিশুটি হয়ে, একেবারে নিরুপায় পিতার সন্তানটি হয়ে, একেবারে নিঃসম্বল নিষ্কিঞ্চন হয়ে। মনুষ্যত্বের পরম অধিকার লাভ করবার প্রার্থনা অনেকদিন জানিয়েছি— দুর্যোগের মুখে, বিঘ্নের মুখে, মোহান্ধতার মুখে এই আমার প্রার্থনা— এ প্রার্থনা ব্যর্থ হতেই পারে না— বিপুল ইন্ধনের তলায় যখন আগুন ধরে তখন সে কি চোখে পড়ে? সে নিতান্তই ছোটো, কিন্তু তার শক্তি কি কম? আজ সকালে তাঁর দরবারে আর-একবার দাঁড়িয়েছি। সমস্ত মানুষের হয়ে মানুষের বড়ো ভাই এই প্রার্থনা করে গিয়েছেন: Thy Kingdom come! আমাদের ঋষিরাও এই কথাই আর-এক ভাষায় বলেছেন: আবিরাবীর্ম এধি! সমস্ত মানুষের সেই অন্তরতম প্রার্থনাকে নিজের জীবনের মধ্যে সত্য করে তোলবার চেষ্টায় যদি বিরত হই তা হলে আমাদের প্রতিদিনের অন্ন চুরি করে খাওয়া হবে— তা হলে আমাদের মানবজন্মটা একটা অপরিশোধিত ঋণের স্বরূপ হয়ে আমাদের চিরদায়িক করে রেখে দেবে।

Urbana: Illinois
১০ পৌষ ১৩১৯

১১

খৃস্টধর্ম যে কাঠামোর ভিতর দিয়ে এসে যে রূপটি পেয়েছে তার সঙ্গে বর্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক জায়গাতেই অনৈক্য হচ্ছে। তাতে করে পুরোনো ধর্মবিশ্বাস একেবারে গোড়া ঘেঁষে উন্মূলিত করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন যা 'বিশ্বাস করি' বলে মানুষকে স্বীকার করতে হয় তা স্বীকার করা সে দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের পক্ষে অসম্ভব। অনেকের পক্ষে চর্চে যাওয়া অসাধ্য হয়েছে। ধর্ম মানুষের জীবনের বাইরে পড়ে রয়েছে; লোকের মনকে তা আর আশ্রয় দিতে পারছে না। সেইজন্য ফরাসীস্‌ বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে দেখা গিয়েছে যে, ধর্মকে আঘাত দেবার উদ্যম সেখানকার বুদ্ধিমান লোকদের পেয়ে বসেছে। অথচ

ধর্মকে আঘাতমাত্র দিয়ে মানুষ আশ্রয় পাবে কেমন করে? তাতে কিছুদিনের মতো মানুষ প্রবৃত্ত থাকতে পারে, কিন্তু তাতে ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের অন্তরে যে স্বাভাবিক পিপাসা রয়েছে তার কোনোই তৃপ্তি হয় না।

এখনকার কালে সেই পিপাসার দাবি জেগে উঠেছে। তার নানা লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নাস্তিকতা নিয়ে যেদিন জ্ঞানী লোকেরা দম্ভ করতেন সেদিন চলে গিয়েছে। ধর্মকে আবৃত করে অন্ধ সংস্কারগুলো যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন সেগুলিকে ঝেঁটিয়ে ফেলার একটা দরকার হয়, নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের সেই কারণে প্রয়োজন হয়।...ইউরোপের লোকেরা ধর্মবিশ্বাসের একটা প্রত্যক্ষগম্য প্রমাণের অনুসন্ধান করছে—যেমন ভূতের বিশ্বাস, টেলিপ্যাথি প্রভৃতি কতগুলো অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে তারা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তাতে ও দেশের লোকেরা মনে করছে যে, ওই-সব প্রমাণ সংগৃহীত হলে ধর্মবিশ্বাস তার ভিত্তি পাবে।...একজন ইংরাজ কবি একদিন আমাকে বললেন যে, তাঁর ধর্মবিশ্বাস অত্যন্ত শিথিল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রেডিয়মের আবিষ্কারে তাঁর বিশ্বাসকে ফিরিয়েছে। তার মানে, ওরা বাইরের দিক থেকে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিকে পাকা করবার চেষ্টা করে। সেইজন্য ওরা যদি কখনো দেখে যে, মানুষের ভক্তির গভীরতার মধ্যেই একটা প্রমাণ রয়েছে—যেমন চোখ দিয়ে বাহ্য ব্যাপারকে দেখছি বলে তার প্রমাণ পাচ্ছি তেমনি একটা অধ্যাত্মদৃষ্টির দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়—তা হলে ওরা একটা ভরসা পায়। প্রফেসর জেম্‌স্‌ প্রভৃতি দেখিয়েছেন যে, মিস্টিক বলে যাঁরা গণ্য তাঁরা তাঁদের ধর্মবিশ্বাসকে কেমন করে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সব জীবনের সাক্ষ্য থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে, তাঁরা সবাই একই কথা বলেছেন, তাঁদের সকলেরই অভিজ্ঞতা একই পথ দিয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন দেশে নানা অবস্থার নানা লোক একই বাণী নানা কালে ব্যক্ত করেছেন। এ বড়ো আশ্চর্য।

৭ পৌষ ১৩২০

১২

খৃস্টধর্ম মানুষকে শ্রদ্ধা করেছে, কেননা তাঁদের যিনি পূজনীয় তিনি মানবের রূপে মানবের ভাগ্য স্বীকার করেছিলেন। এই কারণে যাঁরা যথার্থ খৃস্টান তাঁদের মানবপ্রীতি অকৃত্রিমভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে দেশে বিদেশে, আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। যদি তাঁদের ধর্মমতে কোনো অসম্পূর্ণতা থাকে বলে আমরা মনে করি, তবু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, অন্তত এক জায়গায় এই ধর্ম মানবজাতির সঙ্গে আত্মনিবেদনের যোগে তাঁদের সম্বন্ধযুক্ত করতে পেরেছে, সেটা ধর্মবুদ্ধির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁদের সাহিত্য এবং ব্যবহারে যেখানে মাহাত্ম্য দেখেছি মানবিকতা সেখানে সমুজ্জ্বল। সেখানে দৈন্য নেই, সেখানে স্বার্থের সংঘাতের ঊর্ধ্বে একটি উদার সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে।

১১ মাঘ ১৩৪৭

মানবপুত্র

মৃত্যুর পাত্রে খৃস্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন
রবাহূত অনাহূতের জন্যে,
তার পরে কেটে গেছে বহুশত বৎসর।
আজ তিনি একবার নেমে এলেন নিত্যধাম থেকে মর্ত্যধামে।
চেয়ে দেখলেন,
সে কালেও মানুষ ক্ষতবিক্ষত হত যে-সমস্ত পাপের মারে—
যে উদ্ধত শেল ও শল্য, যে চতুর ছোরা ও ছুরি,
যে ক্রূর কুটিল তলোয়ারের আঘাতে,
বিদ্যুদ্‌বেগে আজ তাদের ফলায় শান দেওয়া হচ্ছে
হিস্‌হিস্‌ শব্দে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে
বড়ো বড়ো মসীধূমকেতন কারখানাঘরে।

কিন্তু দারুণতম যে মৃত্যুবাণ নূতন তৈরি হল,
ঝক্‌ ঝক্‌ করে উঠল নরঘাতকের হাতে,
পূজারি তাতে লাগিয়েছে তাঁরই নামের ছাপ
তীক্ষ্ন নখে আঁচড় দিয়ে।
খৃস্ট বুকে হাত চেপে ধরলেন—
বুঝলেন, শেষ হয় নি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত,
নূতন শূল তৈরি হচ্ছে বিজ্ঞানশালায়,
বিঁধছে তাঁর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।
সেদিন তাঁকে মেরেছিল যারা
ধর্মমন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে
তারাই আজ নূতন জন্ম নিল দলে দলে,
তারাই আজ ধর্মমন্দিরের বেদির সামনে থেকে
পূজামন্ত্রের সুরে ডাকছে ঘাতক সৈন্যকে—
বলছে, 'মারো! মারো!'

মানবপুত্র যন্ত্রণায় বলে উঠলেন ঊর্ধ্বে চেয়ে:
'হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর,
কেন আমাকে ত্যাগ করলে!'

শ্রাবণ ১৩৩৯

বড়োদিন

একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে
রাজার দোহাই দিয়ে
এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি,
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি—
ঘাতক সৈন্যে ডাকি
'মারো মারো' ওঠে হাঁকি।
গর্জনে মিশে পূজামন্ত্রের স্বর—
মানবপুত্র তীব্র ব্যথায় কহেন, 'হে ঈশ্বর!
এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভরা
দূরে ফেলে দাও, দূরে ফেলে দাও ত্বরা।'

বড়োদিন ১৯৩৯

পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে

গির্জাঘরের ভিতরটি স্নিগ্ধ,
সেখানে বিরাজ করে স্তব্ধতা,
রঙিন কাচের ভিতর দিয়ে সেখানে প্রবাহিত রমণীয় আলো।
এইখানে আমাদের প্রভুকে দেখি তাঁর ন্যায়াসনে,
মুখশ্রীতে বিষাদ-দুঃখ,
বিচারকের বিরাট মহিমায় তিনি মুকুটিত।
তিনি যেন বলছেন,
"তোমরা যারা চলে যাচ্ছ,
তোমাদের কাছে এ কি কিছুই নয়?
তাকাও দেখি, বলো দেখি,
কোনো দুঃখ কি আছে আমার দুঃখের তুল্য?"
পুণ্য দীক্ষা অনুষ্ঠান শেষ হল।
মনে জাগল তাঁর প্রেমের গৌরব, তাঁর আশ্বাসবাণী—
"এসো আমার কাছে, যারা কর্মক্লিষ্ট,
এসো যারা ভারাক্রান্ত,
আমি তোমাদের বিরাম দেব।"
এই বাক্যে শান্তি এবং আনন্দ আনল আমাদের মনে,
ক্ষণকালের জন্য সঙ্গ পেলুম তাঁর স্বর্গলোকে।
শুনলুম, "ঊর্ধ্বে তোলো তোমার হৃদয়কে।"
উত্তর দিলুম, "প্রভু, আমরা হৃদয় তুলে ধরেছি তোমারই দিকে।"

চলে এলুম বাইরে।
গির্জাঘর থেকে ফেরবার পথে
দেখা গেল সেই দীর্ঘ জনশ্রেণী।
তারা দেহকে পীড়ন করে চলেছে
ক্লান্ত আক্রান্ত গুরুভারে,
তাদের জন্যে নেই স্বর্গ, নেই হৃদয়কে ঊর্ধ্বে উদ্‌বাহন,
ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টিতে নেই তাদের রোমাঞ্চিত আনন্দ,
নেই তাদের শান্তি, নেই বিশ্রাম।
কেবল আরামহীন পরিশ্রম দিনের পর দিন,
ক্ষুধিত তৃষার্ত তারা, ছিন্ন বসন, জীর্ণ আবাস,
পরিপোষণহীন দেহ।
এ দিকে তাঁর বিষণ্ণ দুঃখাভিভূত মুখশ্রী,
উদার বিচারের মহিমায় তিনি মুকুটিত।
গম্ভীর অভিযোগে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—
"আমার এই ভাইদের মধ্যে তুচ্ছতমের প্রতি যে নির্মমতা
সে আমারই প্রতি।"

মংপু। দার্জিলিং
২২ এপ্রিল ১৯৪০

শিক্ষা

শিক্ষা

অধ্যাপনারত রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপনারত সিলভ্যাঁ লেভি

শিক্ষার হেরফের

যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যক-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎ-পরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা, অর্থাৎ অত্যাবশ্যক, তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না— বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের হাতে কিছুমাত্র সময় নাই। যত শীঘ্র পারি বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া, পাস দিয়া, কাজে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। কাজেই শিশুকাল হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে, দ্রুত বেগে, দক্ষিণে বামে দৃক্‌পাত না করিয়া, পড়া মুখস্থ করিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনো-কিছুর সময় পাওয়া যায় না। সুতরাং ছেলেদের হাতে কোনো শখের বই দেখিলেই সেটা তৎক্ষণাৎ ছিনাইয়া লইতে হয়।

শখের বই জুটিবেই বা কোথা হইতে? বাংলায় সেরূপ গ্রন্থ নাই। এক রামায়ণ মহাভারত আছে, কিন্তু ছেলেদের এমন করিয়া বাংলা শেখানো হয় না যাহাতে তাহারা আপন ইচ্ছায় ঘরে বসিয়া কোনো বাংলা কাব্যের যথার্থ স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে। আবার, দুর্ভাগারা ইংরাজিও এতটা জানে না যাহাতে ইংরাজি বাল্যগ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। বিশেষত, শিশুপাঠ্য ইংরাজি গ্রন্থ এরূপ খাস ইংরাজি, তাহাতে এত ঘরের গল্প, ঘরের কথা যে, বড়ো বড়ো বি.এ. এম.এ.-দের পক্ষেও তাহা সকল সময় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তগম্য হয় না।

কাজেই বিধির বিপাকে বাঙালির ছেলের ভাগ্যে ব্যাকরণ অভিধান এবং ভূগোলবিবরণ ছাড়া আর-কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বাঙালির ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্য দেশের ছেলেরা যে বয়সে নবোদ্গত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্বণ করিতেছে, বাঙালির ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচা-সমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধমাত্র বেত হজম করিতেছে, মাস্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর কোনোরূপ মশলা মিশানো নাই।

তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতেই হ্রাস হইয়া আসে। যথেষ্ট খেলাধুলা এবং উপযুক্ত আহারাভাবে বঙ্গসন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায় মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না। আমরা যতই বি.এ. এম.এ. পাস করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না। তেমন মুঠা করিয়া কিছু ধরিতে

পারিতেছি না, তেমন আদ্যোপান্ত কিছু গড়িতে পারিতেছি না, তেমন জোরের সহিত কিছু দাঁড় করাইতে পারিতেছি না। আমাদের মতামত কথাবার্তা এবং আচার-অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মতো নহে। সেইজন্য আমরা অত্যুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।

ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে; কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার। তেমনি একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তা-শক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।

কিন্তু এই মানসিক-শক্তি-হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষার হাত বাঙালি কী করিয়া এড়াইবে, কিছুতেই ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

এক তো, ইংরাজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোনোপ্রকার মিল নাই। তাহার 'পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয়প্রসঙ্গও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়। হয়তো কোনো-একটা শিশুপাঠ্য রীডারে hay-making সম্বন্ধে একটা আখ্যান আছে; ইংরাজ ছেলের নিকট সে ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিচিত, এইজন্য বিশেষ আনন্দদায়ক। অথবা snowball খেলায় চার্লি এবং কেটির মধ্যে যে কিরূপ বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহার ইতিহাস ইংরাজ-সন্তানের নিকট অতিশয় কৌতুকজনক। কিন্তু আমাদের ছেলেরা যখন বিদেশী ভাষায় সেগুলো পড়িয়া যায় তখন তাহাদের মনে কোনোরূপ স্মৃতির উদ্রেক হয় না, মনের সম্মুখে ছবির মতো করিয়া কিছু দেখিতে পায় না, আগাগোড়া অন্ধভাবে হাতড়াইয়া চলিতে হয়।

আবার নিচের ক্লাসে যে-সকল মাস্টার পড়ায় তাহারা কেহ এন্‌ট্রেন্‌স্‌ পাস, কেহ বা এন্‌ট্রেন্‌স্‌ ফেল; ইংরাজি ভাষা ভাব আচার ব্যবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনোই সুপরিচিত নহে। তাহারাই ইংরাজির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় সংঘটন করাইয়া থাকে। তাহারা না জানে ভালো বাংলা, না জানে ভালো ইংরাজি; কেবল তাহাদের একটা সুবিধা এই যে, শিশুদিগকে শিখানো অপেক্ষা ভুলানো ঢের সহজ কাজ এবং তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্যতা লাভ করে।

বেচারাদের দোষ দেওয়া যায় না।—Horse is a noble animal: বাংলায় তর্জমা করিতে গেলে বাংলারও ঠিক থাকে না, ইংরাজিও ঘোলাইয়া যায়। কথাটা কেমন করিয়া প্রকাশ করা যায়? ঘোড়া একটি মহৎ জন্তু, ঘোড়া অতি উঁচুদরের জানোয়ার, ঘোড়া জন্তুটা খুব ভালো—কথাটা কিছুতেই তেমন মনঃপূত-রকম হয় না; এমন স্থলে গোঁজামিলন দেওয়াই সুবিধা। আমাদের প্রথম ইংরাজি শিক্ষায় এইরূপ কত গোঁজামিলন চলে তাহার আর সীমা নাই। ফলত, অল্প বয়সে আমরা যে ইংরাজিটুকু শিখি তাহা এত যৎসামান্য এবং এত ভুল যে, তাহার ভিতর হইতে কোনো প্রকারের রস আকর্ষণ করিয়া লওয়া বালকদের পক্ষে অসম্ভব হয়, কেহ

তাহা প্রত্যাশাও করে না; মাস্টারও বলে ছাত্রও বলে, 'আমার রসে কাজ নাই, টানিয়া বুনিয়া কোনোমতে একটা অর্থ বাহির করিতে পারিলে এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই, পরীক্ষায় পাস হই, আপিসে চাকরি জোটে।' সচরাচর যে অর্থটা বাহির হয় তৎসম্বন্ধে শঙ্করাচার্যের এই বচনটি খাটে—

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।

অর্থকে অনর্থ বলিয়া জানিয়ো, তাহাতে সুখও নাই এবং সত্যও নাই।

তবে ছেলেদের ভাগ্যে বাকি রহিল কী? যদি কেবল বাংলা শিখিত তবে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পাইত; যদি কিছুই না শিখিত তবে খেলা করিবার অবসর থাকিত—গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপাইয়া, ফুল ছিঁড়িয়া, প্রকৃতিজননীর উপর সহস্র দৌরাত্ম্য করিয়া, শরীরের পুষ্টি, মনের উল্লাস এবং বাল্যপ্রকৃতির পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিত। আর ইংরাজি শিখিতে গিয়া না হইল শেখা, না হইল খেলা, প্রকৃতির সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিবারও অবকাশ থাকিল না, সাহিত্যের কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করিবারও দ্বার রুদ্ধ রহিল। অন্তরে এবং বাহিরে যে দুইটি উদার এবং উন্মুক্ত বিহারক্ষেত্র আছে, মনুষ্য যেখান হইতে জীবন বল এবং স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে—যেখানে নানা বর্ণ, নানা রূপ, নানা গন্ধ, বিচিত্র গতি এবং গীতি, প্রীতি ও প্রফুল্লতা সর্বদা হিল্লোলিত হইয়া আমাদিগকে সর্বাঙ্গসচেতন এবং সম্পূর্ণবিকশিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে—সেই দুই মাতৃভূমি হইতে নির্বাসিত করিয়া হতভাগ্য শিশুদিগকে কোন্ বিদেশী কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়? ঈশ্বর যাহাদের জন্য পিতামাতার হৃদয়ে স্নেহসঞ্চার করিয়াছেন, জননীর কোল কোমল করিয়া দিয়াছেন, যাহারা আকারে ক্ষুদ্র তবু সমস্ত গৃহের সমস্ত শূন্য অধিকার করিয়াও তাহাদের খেলার জন্য যথেষ্ট স্থান পায় না, তাহাদিগকে কোথায় বাল্য যাপন করিতে হয়? বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং অভিধানের মধ্যে। যাহার মধ্যে জীবন নাই, আনন্দ নাই, অবকাশ নাই, নবীনতা নাই, নড়িয়া বসিবার একতিল স্থান নাই, তাহারই অতি শুষ্ক কঠিন সংকীর্ণতার মধ্যে। ইহাতে কি সে ছেলের কখনো মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হইতে পারে? সে কি একপ্রকার পাণ্ডুবর্ণ রক্তহীন শীর্ণ অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে না? সে কি বয়ঃপ্রাপ্তিকালে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু বাহির করিতে পারে, নিজের বল খাটাইয়া বাধা অতিক্রম করিতে পারে, নিজের স্বাভাবিক তেজে মস্তক উন্নত করিয়া রাখিতে পারে? সে কি কেবল মুখস্থ করিতে, নকল করিতে এবং গোলামি করিতে শেখে না?

এক বয়স হইতে আর-এক বয়স পর্যন্ত একটা যোগ আছে। যৌবন যে বাল্যকাল হইতে ক্রমশ পরিণত হইয়া উঠে, এ কথা নূতন করিয়া বলাই বাহুল্য। যৌবনে সহসা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই যখন যাহা আবশ্যক অমনি যে হাতের কাছে পাওয়া যায় তাহা নহে—জীবনের যথার্থ নির্ভরযোগ্য এবং একান্ত আবশ্যক জিনিস হস্তপদের মতো আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহারা কোনো প্রস্তুত সামগ্রীর মতো নহে যে, প্রয়োজনের সময়ে অখণ্ড আকারে বাজার হইতে কিনিতে পারা যাইবে।

চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা-নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ, যদি মানুষের মতো মানুষ হইতে হয় তবে ঐ দুটা পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে

চিন্তা ও কল্পনার চর্চা না করিলে কাজের সময় যে তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না, এ কথা অতি পুরাতন।

কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষায় সে পথ একপ্রকার রুদ্ধ। আমাদিগকে বহুকাল পর্যন্ত শুদ্ধমাত্র ভাষাশিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, ইংরাজি এতই বিদেশীয় ভাষা এবং আমাদের শিক্ষকেরা সাধারণত এত অল্প-শিক্ষিত যে, ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব আমাদের মনে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য ইংরাজি ভাবের সহিত কিয়ৎপরিমাণে পরিচয় লাভ করিতে আমাদিগকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় এবং ততক্ষণ আমাদের চিন্তাশক্তি নিজের উপযুক্ত কোনো কাজ না পাইয়া নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে থাকে। এন্‌ট্রেন্‌স্‌ এবং ফার্স্ট্‌-আর্ট্‌স্‌ পর্যন্ত কেবল চলনসই রকমের ইংরাজি শিখিতেই যায়; তার পরেই সহসা বি.এ. ক্লাসে বড়ো বড়ো পুঁথি এবং গুরুতর চিন্তাসাধ্য প্রসঙ্গ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয়; তখন সেগুলা ভালো করিয়া আয়ত্ত করিবার সময়ও নাই, শক্তিও নাই— সবগুলা মিলাইয়া এক-একটা বড়ো বড়ো তাল পাকাইয়া একেবারে এক-এক গ্রাসে গিলিয়া ফেলিতে হয়।

যেমন যেমন পড়িতেছি অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতেছি না ইহার অর্থ এই যে স্তূপ উঁচা করিতেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ করিতেছি না। ইঁট সুরকি কড়ি বরগা বালি চুন যখন পর্বতপ্রমাণ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হুকুম আসিল একটা তেতালার ছাদ প্রস্তুত করো। অমনি আমরা সেই উপকরণ-স্তূপের শিখরে চড়িয়া দুই বৎসর ধরিয়া পিটাইয়া তাহার উপরিভাগ কোনোমতে সমতল করিয়া দিলাম, কতকটা ছাদের মতো দেখিতে হইল। কিন্তু ইহাকে কি অট্টালিকা বলে? ইহার মধ্যে বায়ু এবং আলোক প্রবেশ করিবার কি কোনো পথ আছে? ইহার মধ্যে মনুষ্যের চিরজীবনের বাসযোগ্য কি কোনো আশ্রয় আছে? ইহা কি আমাদিগকে বহিঃ-সংসারের প্রখর উত্তাপ এবং অনাবরণ হইতে রীতিমত রক্ষা করিতে পারে? ইহার মধ্যে কি কোনো একটা শৃঙ্খলা সৌন্দর্য এবং সুষমা দেখিতে পাওয়া যায়?

মাল-মশলা যাহা জড়ো হইতেছে তাহা প্রচুর তাহার আর সন্দেহ নাই; মানসিক অট্টালিকা-নির্মাণের উপযুক্ত এত ইঁট-পাটকেল পূর্বে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। কিন্তু সংগ্রহ করিতে শিখিলেই যে নির্মাণ করিতে শেখা হইল ধরিয়া লওয়া হয়, সেইটেই একটা মস্ত ভুল। সংগ্রহ এবং নির্মাণ যখন একই সঙ্গে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে থাকে তখনই কাজটা পাকা রকমের হয়।

অর্থাৎ, সংগ্রহযোগ্য জিনিসটা যখনই হাতে আসে তখনই তাহার ব্যবহারটি জানা, তাহার প্রকৃত পরিচয়টি পাওয়া, জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আশ্রয়স্থলটি গড়িয়া তোলাই রীতিমত শিক্ষা। মানুষ এক দিকে বাড়িতেছে, আর তাহার বিদ্যা আর-এক দিকে জমা হইতেছে; খাদ্য এক দিকে ভাণ্ডারকে ভারাক্রান্ত করিতেছে, পাকযন্ত্র আর-এক দিকে আপনার জারক রসে আপনাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে —আমাদের দেশে এই একপ্রকার অভূতপূর্ব কাণ্ড চলিতেছে।

অতএব, ছেলে যদি মানুষ করিতে চাই তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে; নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না। শিশুকাল হইতেই, কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া, সঙ্গে সঙ্গে যথা-পরিমাণে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর দিতে হইবে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবলই লাঙল দিয়া চাষ এবং মই দিয়া ঢেলা ভাঙা,

কেবলই ঠেঙালাঠি মুখস্থ এবং এক্‌জামিন— আমাদের এই 'মানব-জনম'-আবাদের পক্ষে, আমাদের এই দুর্লভ ক্ষেত্রে সোনা ফলাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। এই শুষ্ক ধূলির সঙ্গে, এই অবিশ্রাম কর্ষণ-পীড়নের সঙ্গে রস থাকা চাই। কারণ, মাটি যত সরস থাকে ধান তত ভালো হয়। তাহার উপর আবার এক-একটা বিশেষ সময় আসে যখন ধান্যক্ষেত্রের পক্ষে বৃষ্টি বিশেষরূপে আবশ্যক। সে সময়টি অতিক্রম হইয়া গেলে হাজার বৃষ্টি হইলেও আর তেমন সুফল ফলে না। বয়োবিকাশেরও তেমনি একটা বিশেষ সময় আছে যখন জীবন্ত ভাব এবং নবীন কল্পনাসকল জীবনের পরিণতি এবং সরসতা-সাধনের পক্ষে অত্যাবশ্যক, ঠিক সেই সময়টিতে যদি সাহিত্যের আকাশ হইতে খুব এক পশলা বর্ষণ হইয়া যায় তবে 'ধন্য রাজা পুণ্য দেশ'। নবোদ্ভিন্ন হৃদয়াঙ্কুরগুলি যখন অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং অনন্ত নীলাম্বরের দিকে প্রথম মাথা তুলিয়া দেখিতেছে, প্রচ্ছন্ন জন্মান্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিয়া বহিঃসংসারের সহিত তাহার নূতন পরিচয় হইতেছে— যখন নবীন বিস্ময়, নবীন প্রীতি, নবীন কৌতূহল চারি দিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে— তখন যদি ভাবের সমীরণ এবং চিরানন্দলোক হইতে আলোক এবং আশীর্বাদধারা নিপতিত হয়, তবেই তাহার সমস্ত জীবন যথাকালে সফল সরস এবং পরিণত হইতে পারে। কিন্তু সেই সময় যদি কেবল শুষ্ক ধূলি এবং তপ্ত বালুকা, কেবল নীরস ব্যাকরণ এবং বিদেশী অভিধান তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তবে পরে মুষলধারায় বর্ষণ হইলেও— য়ুরোপীয় সাহিত্যের নব নব জীবন্ত সত্য, বিচিত্র কল্পনা এবং উন্নত ভাবসকল লইয়া দক্ষিণে বামে ফেলাছড়া করিলেও— সে আর তেমন সফলতা লাভ করিতে পারে না, সাহিত্যের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি আর তাহার জীবনের মধ্যে তেমন সহজভাবে প্রকাশ করিতে পারে না।

আমাদের নীরস শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্দ্র ক্ষণ অতীত হইয়া যায়। আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলা কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি; পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না। যখন ইংরাজি ভাবরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ অন্তরঙ্গের মতো বিহার করিতে পারি না। যদি-বা ভাবগুলা একরূপ বুঝিতে পারি, কিন্তু সেগুলাকে মর্মস্থলে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি না; বক্তৃতায় এবং লেখায় ব্যবহার করি, কিন্তু জীবনের কার্যে পরিণত করিতে পারি না।

এইরূপে বিশ-বাইশ বৎসর ধরিয়া আমরা যে-সকল ভাব শিক্ষা করি আমাদের জীবনের সহিত তাহার একটা রাসায়নিক মিশ্রণ হয় না বলিয়া আমাদের মনের ভারী একটা অদ্ভুত চেহারা বাহির হয়। শিক্ষিত ভাবগুলি কতক আটা দিয়া জোড়া থাকে, কতক কালক্রমে ঝরিয়া পড়ে। অসভ্যেরা যেমন গায়ে রঙ মাখিয়া, উল্কি পরিয়া পরম গর্ব অনুভব করে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা এবং লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আমাদের বিলাতি বিদ্যা আমরা সেইরূপ গায়ের উপর লেপিয়া দম্ভভরে পা ফেলিয়া বেড়াই; আমাদের যথার্থ আন্তরিক জীবনের সহিত তাহার অল্পই যোগ থাকে। অসভ্য রাজারা যেমন কতকগুলা সস্তা বিলাতি কাচ-খণ্ড পুঁতি প্রভৃতি লইয়া শরীরের যেখানে সেখানে ঝুলাইয়া রাখে এবং বিলাতি সাজসজ্জা অযথাস্থানে বিন্যাস করে, বুঝিতেও পারে না কাজটা কিরূপ অদ্ভুত এবং হাস্যজনক হইতেছে, আমরাও সেইরূপ কতকগুলা সস্তা চক্‌চকে বিলাতি কথা

লইয়া ঝল্‌মল্‌ করিয়া বেড়াই এবং বিলাতি বড়ো বড়ো ভাবগুলি লইয়া হয়তো সম্পূর্ণ অযথাস্থানে অসংগত প্রয়োগ করি; আমরা নিজেও বুঝিতে পারি না অজ্ঞাতসারে কী একটা অপূর্ব প্রহসন অভিনয় করিতেছি এবং কাহাকেও হাসিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ য়ুরোপীয় ইতিহাস হইতে বড়ো বড়ো নজির প্রয়োগ করিয়া থাকি।

বাল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, আমরা বেশ সহজ মানুষের মতো হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি।

যখন আমরা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা যে ভাবে জীবন নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে, আমরা যে গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে গৃহের উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই, যে সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্মযাপন করিতেই হইবে সেই সমাজের কোনো উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতনশিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না, আমাদের পিতা মাতা—আমাদের সুহৃৎ বন্ধু—আমাদের ভ্রাতা ভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না, আমাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোনো স্থান পায় না, আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী—আমাদের নির্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা—আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোনো সংগীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না, তখন বুঝিতে পারি, আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যক অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না। আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে; বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌঁছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানিগিরি অথবা কোনো-একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোনো ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীগুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য আমাদের ছাত্রদিগকে দোষ দেওয়া অন্যায়। তাহাদের গ্রন্থজগৎ এক প্রান্তে আর তাহাদের বসতিজগৎ অন্য প্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু। এইজন্য যখন দেখা যায় একই লোক এক দিকে য়ুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্য দিকে চিরকুসংস্কারগুলিকে সযত্নে পোষণ করিতেছেন—এক দিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্য দিকে অধীনতার শত সহস্র লূতাতন্তুপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতি মুহূর্তে আচ্ছন্ন ও দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন—এক দিকে বিচিত্রভাবপূর্ণ সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতেছেন, অন্য দিকে জীবনকে ভাবের উচ্চ শিখরে অধিরূঢ় করিয়া রাখিতেছেন না, কেবল ধনোপার্জন এবং বৈষয়িক উন্নতি-সাধনেই ব্যস্ত—তখন আর আশ্চর্য বোধ হয় না। কারণ, তাঁহাদের বিদ্যা এবং ব্যবহারের মধ্যে একটা সত্যকার দুর্ভেদ্য ব্যবধান আছে, উভয়ে কখনো সুসংলগ্নভাবে মিলিত হইতে পায় না।

তাহার ফল হয় এই, উভয়ে উভয়ের প্রতি উত্তরোত্তর বাম হইতে থাকে। যেটা আমাদের শিক্ষিত বিদ্যা আমাদের জীবন ক্রমাগতই তাহার প্রতিবাদ করিয়া চলাতে সেই বিদ্যাটার প্রতিই আগাগোড়া অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জন্মিতে থাকে। মনে হয়, ও জিনিসটা কেবল ভুয়া এবং সমস্ত য়ুরোপীয় সভ্যতা ঐ ভুয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের যাহা আছে তাহা সমস্তই সত্য এবং আমাদের শিক্ষা যে দিকে পথ নির্দেশ করিয়া দিতেছে সে দিকে সভ্যতা-নামক একটি মায়াবিনী মহামিথ্যার সাম্রাজ্য। আমাদের অদৃষ্টক্রমে বিশেষ কারণবশতই যে আমাদের শিক্ষা আমাদের নিকট নিষ্ফল হইয়া উঠিয়াছে তাহা না মনে করিয়া আমরা স্থির করি, উহার নিজের মধ্যে স্বভাবতই একটা বৃহৎ নিষ্ফলতার কারণ বর্তমান রহিয়াছে। এইরূপে আমাদের শিক্ষাকে আমরা যতই অশ্রদ্ধা করিতে থাকি আমাদের শিক্ষাও আমাদের জীবনের প্রতি ততই বিমুখ হইতে থাকে, আমাদের চরিত্রের উপর তাহার সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; এইরূপে আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের গৃহবিচ্ছেদ ক্রমশ বাড়িয়া উঠে, প্রতি মুহূর্তে পরস্পর পরস্পরকে সুতীব্র পরিহাস করিতে থাকে এবং অসম্পূর্ণ জীবন ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া বাঙালির সংসারযাত্রা দুই সঙের প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়।

এইরূপে জীবনের একতৃতীয়াংশকাল যে শিক্ষায় যাপন করিলাম তাহা যদি চিরকাল আমাদের জীবনের সহিত অসংলগ্ন হইয়া রহিল এবং অন্য শিক্ষালাভের অবসর হইতেও বঞ্চিত হইলাম, তবে আর আমরা কিসের জোরে একটা যাথার্থ্য লাভ করিতে পারিব?

• আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এখনকার দিনের সর্ব-প্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য। যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মতো আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগৎ কেন এমন একটি অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল? য়ুরোপের দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না এমন কোনো নূতন তত্ত্ব, নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল? তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরাজি শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল, বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দসম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এতদিন মথুরায় কৃষ্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন, বিশ-পঁচিশ বৎসর কাল দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া তাঁহার সুদূর সাক্ষাৎলাভ হইত; বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবনধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্যমুখী কমলমণি-রূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালি পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল।

বঙ্গদর্শন সেই-যে এক অনুপম নূতন আনন্দের আস্বাদ দিয়া গেছে তাহার ফল হইয়াছে এই যে, আজকালকার শিক্ষিত লোকে বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। এটুকু বুঝিয়াছে যে, ইংরাজি আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা, কিন্তু ভাবের ভাষা নহে। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে যে, যদিও আমরা

শৈশবাবধি এত একান্ত যত্নে একমাত্র ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করি, তথাপি আমাদের দেশীয় বর্তমান স্থায়ী সাহিত্য যাহা-কিছু তাহা বাংলা ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, বাঙালি কখনোই ইংরাজি ভাষার সহিত তেমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-ভাবে পরিচিত হইতে পারে না যাহাতে সাহিত্যের স্বাধীন ভাবোচ্ছ্বাস তাহার মধ্যে সহজে প্রকাশ করিতে পারে। যদি বা ভাষার সহিত তাহার তেমন পরিচয় হয় তথাপি বাঙালির ভাব ইংরাজের ভাষায় তেমন জীবন্ত-রূপে প্রকাশিত হয় না। যে-সকল বিশেষ মাধুর্য, বিশেষ স্মৃতি আমাদিগকে প্রকাশচেষ্টায় উত্তেজিত করে, যে-সকল সংস্কার পুরুষানুক্রমে আমাদের সমস্ত মনকে একটা বিশেষ গঠন দান করিয়াছে, তাহা কখনোই বিদেশী ভাষার মধ্যে যথার্থ মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

অতএব আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখনই ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তখনই বাংলা ভাষা অবলম্বন করিতে তাঁহাদের একটা কাতরতা জন্মে। কিন্তু হায় অভিমানিনী ভাষা, সে কোথায়! সে কি এত দীর্ঘকাল অবহেলার পর মুহূর্তের আহ্বানে অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত সৌন্দর্য, তাহার সমস্ত গৌরব লইয়া একজন শিক্ষাভিমানী গর্বোদ্ধত পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে? হে সুশিক্ষিত, হে আর্য, তুমি কি আমাদের এই সুকুমারী সুকোমলা তরুণী ভাষার যথার্থ মর্যাদা জান? ইহার কটাক্ষে যে উজ্জ্বল হাস্য, যে অশ্রুম্লান করুণা, যে প্রখর তেজ-স্ফুলিঙ্গ, যে স্নেহ প্রীতি ভক্তি স্ফুরিত হয়, তাহার গভীর মর্ম কি কখনো বুঝিয়াছ? হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছ? তুমি মনে কর, 'আমি যখন মিল-স্পেন্সার পড়িয়াছি, সব কটা পাস করিয়াছি, আমি যখন এমন একজন স্বাধীন চিন্তাশীল মেধাবী যুবাপুরুষ, যখন হতভাগ্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাগণ আপন কুমারী কন্যা এবং যথাসর্বস্ব লইয়া আমার দ্বারে আসিয়া সাধ্যসাধনা করিতেছে, তখন ঐ অশিক্ষিত সামান্য গ্রাম্য লোকদিগের ঘরের তুচ্ছ ভাষাটার উচিত ছিল আমার ইঙ্গিতমাত্রে আমার শরণাপন্ন হইয়া কৃতকৃতার্থ হওয়া। আমি যে ইংরাজি পড়িয়া বাংলা লিখি ইহা অপেক্ষা বাংলার সৌভাগ্য কী হইতে পারে! আমি যখন ইংরাজি ভাষায় আমার অনায়াসপ্রাপ্য যশ পরিহার করিয়া আমার এত বড়ো বড়ো ভাব এই দরিদ্র দেশে হেলায় বিসর্জন দিতেছি, তখন জীর্ণবস্ত্র দীন পান্থগণ রাজাকে দেখিলে যেমন সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দেয় তেমনি আমার সম্মুখ হইতে সমস্ত তুচ্ছ বাধাবিপত্তির শশব্যস্ত হইয়া সরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। একবার ভাবিয়া দেখো, আমি তোমাদের কত উপকার করিতে আসিয়াছি! আমি তোমাদিগকে পোলিটিক্যাল ইকনমি সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিতে পারিব, জীবরাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজ এবং আধ্যাত্মিক জগৎ পর্যন্ত এভোল্যুশনের নিয়ম কিরূপে কার্য করিতেছে তৎসম্বন্ধে আমি যাহা শিখিয়াছি তাহা তোমাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ গোপন করিব না, আমার ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক প্রবন্ধের ফুট্‌নোটে নানা ভাষার দুরূহ গ্রন্থ হইতে নানা বচন ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে পারিব, এবং বিলাতি সাহিত্যের কোন্‌ পুস্তক সম্বন্ধে কোন্‌ সমালোচক কী কথা বলেন তাহাও বাঙালির অগোচর থাকিবে না— কিন্তু যদি তোমাদের এই জীর্ণচীর অসম্পূর্ণ ভাষা আদেশমাত্র অগ্রসর হইয়া আমাকে সমাদর করিয়া না লয় তবে আমি বাংলায় লিখিব না; আমি ওকালতি করিব; ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইব; ইংরাজি খবরের কাগজে লীডার লিখিব; তোমাদের যে কত ক্ষতি হইবে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।'

বঙ্গদেশের পরমদুর্ভাগ্যক্রমে তাহার এই লজ্জাশীলা অথচ তেজস্বিনী নন্দিনী বঙ্গভাষা অগ্রবর্তিনী হইয়া এমন-সকল ভালো ভালো ছেলের সমাদর করে না এবং ভালো ছেলেরাও রাগ করিয়া বাংলা ভাষার সহিত কোনো সম্পর্ক রাখে না। এমন-কি, বাংলায় চিঠিও লেখে না, বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যতটা পারে বাংলা হাতে রাখিয়া ব্যবহার করে এবং বাংলা গ্রন্থ অবজ্ঞাভরে অন্তঃপুরে নির্বাসিত করিয়া দেয়। ইহাকে বলে, লঘু পাপে গুরু দণ্ড।

পূর্বে বলিয়াছি, আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না। আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে; যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না। এ কথাও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা একত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই য়ুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকটসংসর্গ আমরা লাভ করি না এবং সেইজন্যই আজকাল আমাদের অনেক শিক্ষিত লোকে য়ুরোপীয় ভাবসকলের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্য দিকেও তেমনি ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মাতৃভাষাকে দৃঢ়-সম্বদ্ধ রূপে পান নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা দূরে পড়িয়া গেছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের একটি অবজ্ঞা জন্মিয়া গেছে। বাংলা তাঁহারা জানেন না সে কথা স্পষ্টরূপে স্বীকার না করিয়া তাঁহারা বলেন, 'বাংলায় কি কোনো ভাব প্রকাশ করা যায়? এ ভাষা আমাদের মতো শিক্ষিত মনের উপযোগী নহে।' প্রকৃত কথা, আঙুর আয়ত্তের অতীত হইলে তাহাকে টক বলিয়া উপেক্ষা আমরা অনেক সময় অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকি।

যে দিক হইতে যেমন করিয়াই দেখা যায়, আমাদের ভাব ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামঞ্জস্য দূর হইয়া গেছে। মানুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া নিষ্ফল হইতেছে, আপনার মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্যলাভ করিয়া বলিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, যখন যেটি আবশ্যক তখন সেটি হাতের কাছে পাইতেছে না। একটি গল্প আছে, একজন দরিদ্র সমস্ত শীতকালে অল্প অল্প ভিক্ষা সঞ্চয় করিয়া যখন শীতবস্ত্র কিনিতে সক্ষম হইত তখন গ্রীষ্ম আসিয়া পড়িত, আবার সমস্ত গ্রীষ্মকাল চেষ্টা করিয়া যখন লঘুবস্ত্র লাভ করিত তখন অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি; দেবতা যখন তাহার দৈন্য দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বর দিতে চাহিলেন তখন সে কহিল, 'আমি আর কিছু চাহি না, আমার এই হেরফের ঘুচাইয়া দাও। আমি-যে সমস্ত জীবন ধরিয়া গ্রীষ্মের সময় শীতবস্ত্র এবং শীতের সময় গ্রীষ্মবস্ত্র লাভ করি, এইটে যদি একটু সংশোধন করিয়া দাও তাহা হইলেই আমার জীবন স্যার্থক হয়।'

আমাদেরও সেই প্রার্থনা। আমাদের হেরফের ঘুচিলেই আমরা চরিতার্থ হই। শীতের সহিত শীতবস্ত্র, গ্রীষ্মের সহিত গ্রীষ্মবস্ত্র, কেবল একত্র করিতে পারিতেছি না বলিয়াই আমাদের এত দৈন্য; নহিলে আছে সকলই। এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও। আমরা আছি যেন—

পানীমে মীন পিয়াসী
শুনত শুনত লাগে হাসি।

আমাদের পানিও আছে পিয়াসও আছে দেখিয়া পৃথিবীর লোক হাসিতেছে এবং আমাদের চক্ষে অশ্রু আসিতেছে, কেবল আমরা পান করিতে পারিতেছি না।

পৌষ ১২৯৯

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এমন দিন ছিল যখন ইংরেজি পাঠশালা হইতে আমাদের একেবারে ছুটি ছিল না। বাড়ি আসিতাম, সেখানেও পাঠশালা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া আসিত। বন্ধুকেও সম্ভাষণ করিতাম ইংরেজিতে, পিতাকেও পত্র লিখিতাম ইংরেজিতে, প্রাণের কথা বলিতাম ইংরেজি কাব্যে, দেশের লোককে সভায় আহ্বান করিতাম ইংরেজি বক্তৃতায়। আজ যখন সেই পাঠশালা হইতে, একেবারে না হউক, ক্ষণে ক্ষণে ছুটি পাইয়া থাকি, তখন সেই ছুটির সময়টাতে আনন্দ করিব কোথায়? মাতার অন্তঃপুরে নহে কি? দিনের পড়া তো শেষ হইল, তার পরে ক্রিকেট-খেলাতেও নাহয় রণজিৎ হইয়া উঠিলাম। তার পরে? তার পরে গৃহবাতায়ন হইতে মাতার স্বহস্তজ্বালিত সন্ধ্যাদীপটি কি চোখে পড়িবে না? যদি পড়ে তবে কি অবজ্ঞা করিয়া বলিব 'ওটা মাটির প্রদীপ'? ঐ মাটির প্রদীপের পশ্চাতে কি মাতার গৌরব নাই? যদি মাটির প্রদীপই হয় তো সে দোষ কার? মাতার কক্ষে সোনার প্রদীপ গড়িয়া দিতে কে বাধা দিয়াছে? যেমনি হউক-না কেন, মাটিই হউক আর সোনাই হউক, যখন আনন্দের দিন আসিবে তখন ঐখানেই আমাদের উৎসব; আর যখন দুঃখের অন্ধকার ঘনাইয়া আসে তখন রাজপথে দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলা যায় না, তখন ঐ গৃহ ছাড়া আর গতি নাই।

আজ এখানে আমরা সেই পাঠশালার ফেরত আসিয়াছি। আজ সাহিত্য-পরিষদ্‌ আমাদিগকে যেখানে আহ্বান করিয়াছেন তাহা কলেজ-ক্লাস হইতে দূরে, তাহা ক্রিকেট-ময়দানেরও সীমান্তরে, সেখানে আমাদের দরিদ্র জননীর সন্ধ্যা-বেলাকার মাটির প্রদীপটিই জ্বলিতেছে।

পরীক্ষাশালা হইতে আজ তোমরা সদ্য আসিতেছ, সেইজন্য ঘরের কথা আজই তোমাদিগকে স্মরণ করাইবার যথার্থ অবকাশ উপস্থিত হইয়াছে; সেইজন্যই বঙ্গবাণীর হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ্‌ আজ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

কলেজের বাহিরে যে দেশ পড়িয়া আছে তাহার মহত্ত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করিতে হইবে।

অন্য দেশে সে যোগ চেষ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। সে-সকল দেশের কলেজ দেশেরই একটা অঙ্গ—সমস্ত দেশের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি তাহাকে গঠিত করিয়া তোলাতে দেশের সহিত কোথাও তাহার কোনো বিচ্ছেদের রেখা নাই। আমাদের কলেজের সহিত দেশের ভেদচিহ্নহীন সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই।

এমন অবস্থায় আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয় এই হইয়াছে, কী করিলে বিদেশী-চালিত কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে একটা স্বাধীন শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া শিক্ষাকার্যকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে। তাহা না করিলে শিক্ষাকে কোনোমতে পুঁথির গণ্ডির বাহিরে আনা দুঃসাধ্য হইবে।

নানা আলোচনা, নানা বাদ-প্রতিবাদের ভিতর দিয়া পাঠ্যবিষয়গুলি যেখানে প্রত্যহ প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে—যাঁহারা আবিষ্কার করিতেছেন, সৃষ্টি করিতেছেন, প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারাই যেখানে শিক্ষা দিতেছেন সেখানে শিক্ষা জড় শিক্ষা নহে। সেখানে কেবল যে বিষয়গুলিকেই পাওয়া যায় তাহা নহে, সেই সঙ্গে দৃষ্টির শক্তি, মননের উদ্যম, সৃষ্টির উৎসাহ পাওয়া যায়। এমন অবস্থায় পুঁথিগত বিদ্যার

অসহ্য জুলুম থাকে না, গ্রন্থ হইতে যেটুকু লাভ করা যায় তাহারই মধ্যে একান্ত-ভাবে বদ্ধ হইতে হয় না।

আমাদের দেশেও পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে পুঁথির উপর আধিপত্য দিবার উপায় একটু বিশেষভাবে চিন্তা ও একটু বিশেষ উদ্‌যোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে। এই কাজের জন্য আমি বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ্‌কে অনুরোধ করিতেছি — আমার অনুনয়, বাঙালি ছাত্রদের জন্য তাঁহারা যথাসম্ভব একটি স্বাধীন শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিন, যে ক্ষেত্রে ছাত্রগণ কিঞ্চিৎপরিমাণেও নিজের শক্তিপ্রয়োগ ও বুদ্ধির কর্তৃত্ব অনুভব করিয়া চিত্তবৃত্তিকে স্ফূর্তিদান করিতে পারিবে।

বাংলাদেশের সাহিত্য ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য, সমস্তই বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়। দেশের এই-সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহা না হইবার কারণ, আমরা শিশুকাল হইতে ইংরেজি বিদ্যা-লয়ের পাঠ্যপুস্তক, যাহা ইংরেজ ছেলেদের জন্য রচিত, তাহাই পড়িয়া আসিতেছি। ইহাতে নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিস আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।

এজন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের দেশের যথার্থ বিবরণ আজ পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই; সেইজন্য যদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি তথাপি স্বদেশ আমাদের জ্ঞানের কাছে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া আছে।

এইরূপে স্বদেশকে মুখ্যভাবে সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত না করিবার একটা দোষ এই যে, স্বদেশের সেবা করিবার জন্য আমরা কেহ যথার্থভাবে যোগ্য হইতে পারি না। আর-একটা কথা এই, জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে তবে সে জ্ঞান দুর্বল হইবেই। যাহা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।

আমাদের বিদেশী গুরুরা প্রায়ই আমাদিগকে খোঁটা দিয়া বলেন যে, 'এতদিন যে তোমরা আমাদের পাঠশালে এত করিয়া পড়িলে, কিন্তু তোমাদের উদ্ভাবনাশক্তি জন্মিল না, কেবল কতকগুলো মুখস্থ বিদ্যা সংগ্রহ করিলে মাত্র।'

যদি তাঁহাদের এ অপবাদ সত্য হয় তবে ইহার প্রধান কারণ এই, বস্তুর সহিত বহির সহিত আমরা মিলাইয়া শিখিবার অবকাশ পাই না। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা যে-সকল দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে। আমরা ইতিহাস পড়ি; কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করি; কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের

যেমন বহুতর অবস্থাবৈচিত্র্য আছে, এমন বোধ হয় আর কোনো দেশে নাই। অনুসন্ধানপূর্বক অভিনিবেশপূর্বক সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে এমন দূরদেশের ধর্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় বই পড়িয়া মাত্র কখনো হইতেই পারে না।

ধারণা যখন অস্পষ্ট ও দুর্বল থাকে তখন উদ্ভাবনাশক্তির আশা করা যায় না; এমন-কি, তখনকার সমস্ত উদ্ভাবনা অবাস্তবিক অদ্ভুত আকার ধারণ করে। এই-জন্যই আমরা কেতাবে ইতিহাস শিখিয়াও ঐতিহাসিক বিচার তেমন করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি নাই, কেতাবে বিজ্ঞান শিখিয়াও অভূতপূর্ব কাল্পনিকতাকে বিজ্ঞান বলিয়া চালাইয়া থাকি, ধর্ম সমাজ এমন-কি সাহিত্য-সমালোচনাতেও অপ্রমত্ত পরিমাণবোধ রক্ষা করিতে পারি না।

বাস্তবিকতাবিবর্জিত হইলে আমাদের মনই বলো, হৃদয়ই বলো, কল্পনাই বলো, কৃশ এবং বিকৃত হইয়া যায়। আমাদের দেশহিতৈষা ইহার প্রমাণ। দেশের লোকের হিতের সঙ্গে এই হিতৈষার যোগ নাই। দেশের লোক রোগে মরিতেছে, দারিদ্র্যে জীর্ণ হইতেছে, অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় নষ্ট হইতেছে—ইহার প্রতিকারের জন্য যাহারা কিছুমাত্র নিজের চেষ্টা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয় না তাহারা বিদেশী সাহিত্য-ইতিহাসের পুঁথিগত প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ নানাপ্রকার অসংগত অনুকরণের দ্বারা 'লাভ করিয়াছি' বলিয়া কল্পনা করে। এইজন্যই, এত কাল গেল, তথাপি এই প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ আমাদিগকে যথার্থ কোনো ত্যাগস্বীকারে প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। যে দেশে প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ অবাস্তব নহে, পুঁথিগত অনুকরণ-মূলক নহে, সেখানকার লোক দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতেছে; আমরা সামান্য অর্থ দিতে পারি না, সময় দিতে পারি না, আমাদের দেশ যে কিরূপ তাহা সন্ধানপূর্বক জানিবার জন্য উৎসাহ অনুভব করি না। যোশিদা তোরাজিরো জাপানের একজন বিখ্যাত প্যাট্রিয়ট ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রথমাবস্থায় চালচিঁড়া বাঁধিয়া পায়ে হাঁটিয়া ক্রমাগতই সমস্ত দেশ কেবল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। এইরূপে দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া তাহার পরে ছাত্র পড়াইবার কাজে নিযুক্ত হন; শেষ দশায় তাঁহাকে দেশের কাজে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এরূপ প্যাট্রিয়টিজ্‌মের অর্থ বুঝা যায়। দেশের বাস্তবিক জ্ঞান এবং দেশের বাস্তবিক কাজের উপরে যখন দেশহিতৈষা প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই তাহা মাটিতে বদ্ধমূল গাছের মতো ফল দিতে থাকে।

অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো, নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে, তবে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম—ইহারই ভাষা সাহিত্য ইতিহাস সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ্‌ আপনার আলোচ্য বিষয় করিয়াছেন। পরিষদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এই আলোচনাব্যাপারে তাঁহারা ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া লউন। তাহা হইলে প্রত্যক্ষ বস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মনন-শক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারি দিককে, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে। তা ছাড়া, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানার চর্চা নিজের দেশকে যথার্থভাবে প্রীতির চর্চার অঙ্গ।

বাংলাদেশে এমন জিলা নাই যেখান হইতে কলিকাতায় ছাত্রসমাগম না হইয়াছে।

দেশের সমস্ত বৃত্তান্ত-সংগ্রহে ইঁহাদের যদি সহায়তা পাওয়া যায় তবে সাহিত্য-পরিষদ্ সার্থকতা লাভ করিবেন। এ সাহায্য কিরূপ এবং তাহার কত দূর প্রয়োজনীয়তা তাহার দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ-রচনা সাহিত্যপরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ-সংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

বাংলায় এমন প্রদেশ নাই যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃত লোকদের মধ্যে নূতন নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে। শিক্ষিত লোকেরা এগুলির কোনো খবরই রাখেন না। তাঁহারা এ কথা মনেই করেন না প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্য-গতিতে নিঃশব্দচরণে চলিয়াছে, আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে; নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই, সে পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না। শুধু যে দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য তাহা আমি বলি না। যেখানেই হউক-না কেন, মানব-সাধারণের মধ্যে যা-কিছু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিতেছে তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে, পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না। পরিষদের অধিনায়কতায় ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে-সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় আছে তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে-একটা শিক্ষা তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।

আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnologyর বই যে পড়ি না তাহা নহে। কিন্তু যখন দেখিতে পাই সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি ডোম কৈবর্ত বাগ্দি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না তখনই বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে, পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের এইসকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখিয়াই সাহিত্যপরিষদ্ নিজের কর্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন।

আমাদের ছাত্রগণকে পরিষদের কর্মশালায় সহায়স্বরূপে আকর্ষণ করিবার জন্য

আমার অনুরোধ পরিষদ্ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অদ্যকার এই সভায় আমি ছাত্রগণকে আমন্ত্রণ করিবার ভার লইয়াছি। সেই কাজে প্রবৃত্ত হইবার সময় আমাদের তরুণাবস্থার কথা আমার মনে পড়িতেছে।

আমাদের তরুণাবস্থা বলিলে যে অত্যন্ত সুদূর কালের কথা বোঝায় এত বড়ো প্রাচীনত্বের দাবি আমি করিতে পারি না; কিন্তু আমাদের তখনকার দিনের সঙ্গে এখনকার দিনের এমন একটা পরিবর্তন দেখিতে পাই যে, সেই অদূরবর্তী সময়কে যেন একটা যুগান্তর বলিয়া মনে হয়। এই পরিবর্তনটা বয়সের দোষে আমি দেখিতেছি অথবা এই পরিবর্তনটা সত্যই ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। একটু বয়স বেশি হইলেই প্রাচীনতর লোকেরা তাঁহাদের সে কালের সঙ্গে তুলনা করিয়া এ কালকে খোঁটা দিতে বসেন তাহার একটা কারণ, সে কাল তাঁহাদের আশা করিবার কাল ছিল এবং এ কালটা তাঁহাদের হিসাব বুঝিবার দিন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, এ কালের যুবকেরাও আশা করিয়া জীবন আরম্ভ করিতেছে, এখনো তাহারা চশমা-চোখে হিসাব মিটাইতে বসে নাই। অতএব আমাদের সেদিনকার কালের সঙ্গে অদ্যকার কালের যে প্রভেদটা আমি দেখিতেছি তাহা যথার্থ কি না তাহার বিচারক একা আমি নহি, তোমাদিগকেও তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

সত্যমিথ্যা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু মনে হয়, এখনকার ছেলেদের চেয়ে তখন আমরা অনেক বেশি ছেলেমানুষ ছিলাম। সেটা ভালো কি মন্দ তাহার দুই পক্ষেই বলিবার কথা আছে, কিন্তু ছেলেমানুষ থাকিবার একটা গুণ এই ছিল যে, আমাদের আশার অন্ত ছিল না, ভবিষ্যতের দিকে কী চোখে যে চাহিতাম— কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব বলিয়া মনে হইত না। তখন আমরা এমন-সকল সভা করিয়াছিলাম, এমন-সকল দল বাঁধিয়াছিলাম, এমন-সকল সংকল্পে বদ্ধ হইয়াছিলাম, যাহা এখনকার দিনে তোমরা শুনিলে নিশ্চয় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবে না— এবং আমাদের সাহিত্যে কোনো কোনো স্থলে আমাদের সেদিনকার চিত্র হাস্যরসরঞ্জিত তুলিকায় চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

কিন্তু সব কথা যদি খুলিয়া বলি তবে তোমরা এই মনে করিয়া বিস্মিত হইবে যে, আমাদের সে কালে আমরা, বালকেরা, সকলেই যে একবয়সি ছিলাম তাহা নহে, আমাদের মধ্যে পক্ককেশের অভাব ছিল না এবং তাঁহাদের আশা ও উৎসাহ আমাদের চেয়ে যে কিছুমাত্র অল্প ছিল তাহাও বলিতে পারি না। তখন আমরা নবীনে প্রবীণে মিলিয়া ভয় লজ্জা নৈরাশ্য কেমন নিঃশেষে বিসর্জন দিয়াছিলাম তাহা আজও ভুলিতে পারিব না।

সে দিনের চেয়ে নিঃসন্দেহই আজ আমরা অনেক বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু আজ আকাশে আশার আলোক যেন ম্লান এবং পথিকের হস্তে আনন্দের পাথেয় যেন অপ্রচুর।

কেন এমনটা ঘটিল, তাহার জবাবদিহি এখনকার কালের নহে, আমাদিগকেই তাহার কৈফিয়ত দিতে হইবে। যে আশার সম্বল লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা পথের মধ্যে কোন্‌খানে উড়াইয়া পুড়াইয়া দিয়া আজ এমন রিক্ত হইয়া বসিয়া আছি?

অপরিমিত আশা উৎসাহ আমাদের অল্প বয়সের প্রথম সম্বল; কর্মের পথে যাত্রা করিবার আরম্ভকালে বিধাতৃমাতা এইটে আমাদের অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া আশীর্বাদ করিয়া প্রেরণ করেন। কিন্তু অর্থ যেমন খাদ্য নহে, তাহা ভাঙাইয়া তবে খাইতে হয়, তেমনি আশা-উৎসাহ মাত্র আমাদিগকে সার্থক করে না, তাহাকে

বিশেষ কাজে খাটাইয়া তবে ফললাভ করি। সে কথা ভুলিয়া আমরা বরাবর ঐ আশা-উৎসাহেই পেট ভরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

শিশুরা শুইয়া শুইয়াই হাত পা ছুঁড়িতে থাকে, তাহাদের সেই শরীর-সঞ্চালনের কোনো লক্ষ্য নাই। প্রথমাবস্থায় শক্তির এইরূপ অনির্দিষ্ট বিক্ষেপের একটা অর্থ আছে, কিন্তু সেই অকারণ হাত-পা ছোঁড়া ক্রমে যদি তাহাকে সকারণ চেষ্টার জন্য প্রস্তুত করিয়া না তোলে তবে তাহা ব্যাধি বলিয়াই গণ্য হইবে।

আমাদেরও অল্প বয়সের উদ্যমগুলি প্রথমে কেবলমাত্র নিজের আনন্দেই বিক্ষিপ্তভাবে উদ্দামভাবে চারি দিকে সঞ্চালিত হইতেছিল; তখনকার পক্ষে তাহা অদ্ভুত ছিল না, তাহা বিদ্রূপের বিষয় ছিল না। কিন্তু ক্রমেই যখন দিন যাইতে লাগিল, এবং আমরা কেবল পড়িয়া পড়িয়া অঙ্গসঞ্চালন করিতে লাগিলাম, কিন্তু চলিতে লাগিলাম না, শরীরের আক্ষেপবিক্ষেপকেই অগ্রসর হইবার উপায় বলিয়া কল্পনা করিতে লাগিলাম, তখন আর আনন্দের কারণ রহিল না—এবং এক সময়ে যাহা আবশ্যক ছিল অন্য সময়ের পক্ষে তাহাই দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল।

আমাদের প্রথম বয়সে ভারতমাতা ভারতলক্ষ্মী প্রভৃতি শব্দগুলি বৃহদায়তন লাভ করিয়া আমাদের কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু মাতা যে কোথায় প্রত্যক্ষ আছেন তাহা কখনো স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই; লক্ষ্মী দূরে থাকুন, তাঁহার পেচকটাকে পর্যন্ত কখনো চক্ষে দেখি নাই। আমরা বায়রনের কাব্য পড়িয়াছিলাম, গারিবল্‌ডির জীবনী আলোচনা করিয়াছিলাম এবং প্যাট্রিয়টিজ্‌মের ভাবরস-সম্ভোগের নেশায় একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলাম।

মাতালের পক্ষে মদ্য যেরূপ খাদ্যের অপেক্ষা প্রিয় হয়, আমাদের পক্ষেও দেশহিতৈষার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ প্রত্যক্ষ তাহার ভাষাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার সুখ-দুঃখকে নিজের জীবনযাত্রা হইতে বহু দূরে রাখিয়াও আমরা দেশহিতৈষী হইতে-ছিলাম। দেশের সহিত লেশমাত্র লিপ্ত না হইয়াও বিদেশীয় রাজদরবারকেই দেশহিতৈষিতার একমাত্র কার্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য করিতেছিলাম। এমন অবস্থাতেও, এমন ফাঁকি দিয়াও, ফললাভ করিব, আনন্দলাভ করিব, উৎসাহকে বরাবর বজায় রাখিব, এমন আশা করিতে গেলে বিশ্ববিধাতার চক্ষে ধুলা দিবার আয়োজন করিতে হয়।

'আইডিয়া' যত বড়োই হউক, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হউক, দীন হউক, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। দূরকে নিকট করিবার একমাত্র উপায় নিকট হইতে সেই দূরে যাওয়া। ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র। কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের তপোবনে শমীবৃক্ষমূলে আলবালে জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণচীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজিবিদ্যালয়ে শিখাইয়া কেরানিগিরির বিড়ম্বনার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য অর্ধাশনে পরের

পাকশালে রাঁধিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাকে তো অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।

যাহাই হউক, কিছুই হইল না। বিজয়ীর মতো বাহির হইলাম, ভিখারির মতো পরের দ্বারে দাঁড়াইলাম, অবশেষে সংসারী হইয়া দাওয়ায় বসিয়া সেভিংস্-ব্যাঙ্কের খাতা খুলিলাম। কারণ, যে ভারতমাতা, যে ভারতলক্ষ্মী কেবল সাহিত্যের ইন্দ্রধনুবাষ্পে রচিত, যাহা পরানুসরণের মৃগতৃষ্ণিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহার চেয়ে নিজের সংসারটুকু যে ঢের বেশি প্রত্যক্ষ, নিজের জঠরগহ্বরটা যে ঢের বেশি সুনির্দিষ্ট। এবং ভারতমাতার অশ্রুধারা ঝিঁঝিটখাম্বাজ রাগিণীতে যতই মর্মভেদী হউক-না, ডেপুটিগিরিতে মাসে মাসে যে স্বর্ণঝংকারমধুর বেতনটি মিলে তাহাতে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা পাওয়া যায়, ইহা পরীক্ষিত। এমনি করিয়া যে মানুষ একদিন উদারভাবে বিস্ফারিত হইয়া দিন আরম্ভ করে সে যখন সেই ভাবপুঞ্জকে কোনো প্রত্যক্ষ বস্তুতে প্রয়োগ করিতে না পারে, তখন সে আত্মম্ভরি স্বার্থপর হইয়া ব্যর্থভাবে দিনশেষ করে; একদিন যে ব্যক্তি নিজের ধনপ্রাণ সমস্তই হঠাৎ দিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হয় সে যখন দান করিবার কোনো লক্ষ্য নির্ণয় করিতে পারে না, কেবল সংকল্পকল্পনার বিলাসভোগেই আপনাকে পরিতৃপ্ত করে, সে একদিন এমন কঠিনহৃদয় হইয়া উঠে যে উপবাসী স্বদেশকে যদি সুদূর পথে দেখে তবে টাকা ভাঙাইয়া সিকিটি বাহির করিবার ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। ইহার কারণ এই যে, শুদ্ধমাত্র ভাব যত বড়োই হউক, ক্ষুদ্রতম প্রত্যক্ষ বস্তুর কাছে তাহাকে পরাস্ত হইতে হইবে।

এইজন্যই বলিতেছিলাম, যাহা আমরা পুঁথি হইতে পড়িয়া পাইয়াছি, যাহাকে আমরা ভাবসম্ভোগ বা অহংকারতৃপ্তির উপায়স্বরূপ করিয়া রসালস জড়ত্বের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি ও ক্রমে অবসাদের মধ্যে অবতরণ করিতেছি, তাহাকে প্রত্যক্ষতার মূর্তি, বাস্তবিকতার গুরুত্ব দান করিলে তবে আমরা রক্ষা পাইব। শুধু বড়ো জিনিস কল্পনা করিলেও হইবে না, বড়ো দান ভিক্ষা করিলেও হইবে না, এবং ছোটো মুখে বড়ো কথা বলিলেও হইবে না, দ্বারের পার্শ্বে নিতান্ত ছোটো কাজ শুরু করিতে হইবে। বিলাতের প্রাসাদে গিয়া রোদন করিলে হইবে না, স্বদেশের ক্ষেত্রে বসিয়া কণ্টক উৎপাটন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের শক্তির চর্চা হইবে—সেই শক্তির চর্চামাত্রেই স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতামাত্রেই আনন্দ।

আজ তোমাদের তারুণ্যের মধ্যে আমার অবারিত প্রবেশাধিকার নাই, তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আদর্শ যে কী তাহা স্পষ্টরূপে অনুভব করা আজ আমার পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু নিজেদের নবীন কৈশোরের স্মৃতিটুকুও তো ভস্মাবৃত অগ্নিকণার মতো পক্বকেশের নিচে এখনো প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেই স্মৃতির বলে ইহা নিশ্চয় জানিতেছি যে, মহৎ আকাঙ্ক্ষার রাগিণী মনে যে তারে সহজে বাজিয়া উঠে তোমাদের অন্তরের সেই সূক্ষ্ম, সেই তীক্ষ্ন, সেই প্রভাতসূর্যরশ্মিনির্মিত তন্তুর ন্যায় উজ্জ্বল তন্ত্রীগুলিতে এখনো অব্যবহারের মরিচা পড়িয়া যায় নাই; উদার উদ্দেশ্যের প্রতি নির্বিচারে আত্মবিসর্জন করিবার দিকে মানুষের মনের যে-একটা স্বাভাবিক ও সুগভীর প্রেরণা আছে তোমাদের অন্তঃকরণে এখনো তাহা ক্ষুদ্র বাধার দ্বারা বারংবার প্রতিহত হইয়া নিস্তেজ হয় নাই; আমি জানি, স্বদেশ যখন অপমানিত হয়, আহত অগ্নির ন্যায় তোমাদের হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে; নিজের ব্যবসায়ের সংকীর্ণতা ও স্বার্থসাধনের চেষ্টা তোমাদের সমস্ত মনকে গ্রাস করে নাই. দেশের অভাব ও অগৌরব যে কেমন করিয়া দূর হইতে পারে সেই চিন্তা

নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তোমাদের রজনীর বিনিদ্র প্রহর ও দিবসের নিভৃত অবকাশকে আক্রমণ করে; আমি জানি, ইতিহাসবিশ্রুত যে-সকল মহাপুরুষ দেশহিতের জন্য, লোকহিতের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়া মৃত্যুকে পরাস্ত, স্বার্থকে লজ্জিত ও দুঃখক্লেশকে অমর মহিমায় সমুজ্জ্বল করিয়া গেছেন তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তোমাদিগকে যখন আহ্বান করে তখন তাহাকে আজও তোমরা বিজ্ঞ বিষয়ীর মতো বিদ্রূপের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে চাও না—তোমাদের সেই অনাঘ্রাতপুষ্প অখণ্ডপুণ্যের ন্যায় নবীন হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি আজ তোমাদের দেশের সারস্বতবর্গের নামে আহ্বান করিতেছি, ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে, কর্মের পথে। কর্মশালার প্রবেশদ্বার অতি ক্ষুদ্র, রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের ন্যায় ইহা অভ্রভেদী নহে; কিন্তু গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে নিজের শক্তি সম্বল করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ভিক্ষাপাত্র লইয়া নহে। গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে প্রবেশের জন্য দ্বারীর অনুমতির অপমান স্বীকার করিতে হয় না, ঈশ্বরের আদেশ শিরোধার্য করিয়া আসিতে হয়। এখানে প্রবেশ করিতে গেলে মাথা নত করিতে হয় বটে, কিন্তু সে কেবল নিজের উচ্চ আদর্শের নিকট, দেশের নিকট, যিনি নত ব্যক্তিকে উন্নত করিয়া দেন সেই মঙ্গলবিধাতার নিকট। তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া এপর্যন্ত কেহ তো সম্পূর্ণ নিরাশ হন নাই; দেশ যখন বিলাতি পিনাক বাজাইয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিল তখন তোমরা পশ্চাৎপদ হও নাই, প্রাচীন শ্লোকে যে স্থানটাকে শ্মশানের ঠিক পূর্বেই বসাইয়াছেন সেই রাজদ্বারে তোমরা যাত্রা করিয়া আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিয়াছ। আর আজ সাহিত্যপরিষদ্ তোমাদিগকে যে আহ্বান করিতেছেন তাহার ভাষা মাতৃভাষা ও তাহার কার্য মাতার অন্তঃপুরের কার্য বলিয়াই কি তাহা ব্যর্থ হইবে— দেশের কাব্যে গানে ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটিরে পরিষদ্ যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন সেখানে বিদেশী লোকে কোনোদিন বিস্ময়দৃষ্টিপাত করে না, সেখান হইতে সংবাদপত্রবাহন খ্যাতি সমুদ্রপারে জয়ঘোষণা করিতে যায় না, সেখানে তোমাদের কোনো প্রলোভন নাই— কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিস্‌মাত্রকে যদি রাজমহিষীর ভোজ্যাবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পারো তবে মাতার নিভৃত অন্তঃপুরচারী এই-সকল মাতৃসেবকদের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা পুরস্কারে, খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো। তাহা হইলে অন্তত এইটুকু বুঝিবে যে, যদি শক্তি থাকে তবে কর্মও আছে, যদি প্রীতি থাকে তবে সেবার উপলক্ষের অভাব নাই, সেজন্য গবর্মেন্টের কোনো আইন-পাসের অপেক্ষা করিতে হয় না এবং কোনো অধিকার-ভিক্ষার প্রত্যাশায় রুদ্ধ দ্বারের কাছে অনন্যকর্মা হইয়া দিনরাত্রি যাপন করা অত্যাবশ্যক নহে।

আমার আশঙ্কা হইতেছে, অদ্যকার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আমি ঠিক মাত্রারক্ষা করিতে পারি নাই। কথাটা তো শুদ্ধমাত্র এই যে, দেশী ভাষার ব্যাকরণ চর্চা করো, অভিধান সংকলন করো, পল্লী হইতে দেশের আভ্যন্তরিক বিবরণ সংগ্রহ করো। এই সামান্য প্রস্তাবের অবতারণার জন্য এমন করিয়া উচ্চভাবের দোহাই দিয়া দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করা কিছু যেন অসংগত হইয়াছে। হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু কালের গতিকে এইরূপ অসংগত ব্যাপার আমাদের দেশে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। বর্তমান কালে আমাদের দেশে যদি বলা যায়

যে, দেশের জন্য বক্তৃতা করো, সভা করো, তর্ক করো, তবে তাহা সকলে অতি সহজেই বুঝিতে পারেন ; কিন্তু যদি বলা হয় 'দেশকে জানো ও তাহার পরে স্বহস্তে যথাসাধ্য দেশের সেবা করো' তবে দেখিয়াছি, অর্থ বুঝিতে লোকের বিশেষ কষ্ট হয়। এমন অবস্থায় দেশের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে দুটো-একটা সামান্য কথা বলিতে যদি অসামান্য বাক্যব্যয় করিয়া থাকি, তবে মার্জনা করিতে হইবে। বস্তুত সকাল বেলায় যদি ঘন কুয়াশা হইয়া থাকে তবে অধীর হইয়া ফল নাই, এবং হতাশ হইবারও প্রয়োজন দেখি না ; সূর্য সে কুয়াশা ভেদ করিবেনই এবং করিবামাত্র সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। আজ আমি অধীরভাবে অধিক আকাঙ্ক্ষা করিব না ; অবিচলিত আশার সহিত, আনন্দের সহিত এই কথাই বলিব, নিবিড় কুজ্ঝটিকার মাঝে মাঝে ঐ-যে বিচ্ছেদ দেখা যাইতেছে, সূর্যরশ্মির ছটা খরধার কৃপাণের মতো আমাদের দৃষ্টির আবরণ তিন চারি জায়গায় ভেদ করিয়াছে, আর ভয় নাই, গৃহদ্বারের সম্মুখেই আমাদের যাত্রাপথ অনতিবিলম্বে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, তখন দিগ্‌বিদিক্‌ সম্বন্ধে দশজন মিলিয়া দশ প্রকারের মত লইয়া ঘরে বসিয়া বাদবিতণ্ডা করিতে হইবে না— তখন সকলে আপন-আপন শক্তি-অনুসারে আপন-আপন পথ নির্বাচন করিয়া তর্কসভা হইতে, পুঁথির রুদ্ধকক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িব—তখন নিকটের কাজকে দূর মনে হইবে না এবং অত্যাবশ্যক কাজকে ক্ষুদ্র বলিয়া অবজ্ঞা জন্মিবে না। এই শুভক্ষণ আসিবে বলিয়া আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সেইজন্য, পরিষদের অদ্যকার আহ্বান যদি তোমাদের অন্তরে স্থান না পায়, বাংলাদেশের ঘরের কথা জানাকে যদি তোমরা বেশি একটা কিছু বলিয়া না মনে করো, তবু আমি ক্ষুব্ধ হইব না এবং আমার যে মাতৃভূমি এত দিন তাঁহার সন্তানগণের গৃহপ্রত্যাগমনের জন্য অনিমেষ দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিব, 'জননী, সময় নিকটবর্তী হইয়াছে, ইস্কুলের ছুটি হইয়াছে, সভা ভাঙিয়াছে, এইবার তোমার কুটীরপ্রাঙ্গণের অভিমুখে তোমার ক্ষুধিত সন্তানদের পদধ্বনি ঐ শুনা যাইতেছে—এখন বাজাও তোমার শঙ্খ, জ্বালো তোমার প্রদীপ, তোমার প্রসারিত শীতলপাটির উপরে আমাদের ছোটো-বড়ো সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার অশ্রুগদ্‌গদ আশীর্বচনের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকো।'

বৈশাখ ১৩১২

শিক্ষাসংস্কার

যাঁহারা খবরের কাগজ পড়েন তাঁহারা জানেন, ইংলন্‌ডে ফ্রান্‌সে শিক্ষা সম্বন্ধে খুব একটা গোলমাল চলিতেছে। শিক্ষা লইয়া আমরাও নিশ্চিন্ত নাই তাহাও কাহারও অবিদিত নাই।

এমন সময়ে স্পীকার-নামক বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রে আইরিশ শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে, তাহা আমাদের মনোযোগপূর্বক চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়।

য়ুরোপের যে যুগকে অন্ধকার যুগ বলে, যখন বর্বর-আক্রমণের ঝড়ে রোমের

বাতি নিবিয়া গেল, সেই সময়ে য়ুরোপের সকল দেশের মধ্যে কেবলমাত্র আয়র্লন্ডেই বিদ্যার চর্চা জাগিয়া ছিল। তখন য়ুরোপের ছাত্রগণ আয়র্লন্ডের বিদ্যালয়ে আসিয়া পড়াশুনা করিত। সপ্তম শতাব্দীতে যখন বহুতর বিদ্যার্থী এখানে আসিয়া জুটিয়াছিল তখন তাহারা আহার বাসা পুঁথি এবং শিক্ষা বিনা মূল্যেই পাইত। কতকটা আমাদের দেশের টোলের মতো আর-কি।

য়ুরোপের অধিকাংশ দেশেই আইরিশ বৈরাগিগণ বিদ্যা এবং খৃস্টধর্মের নির্বাণপ্রায় শিখা আবার উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। ফ্রান্সের রাজা শার্ল্‌মান অষ্টম শতাব্দীতে পারিস য়ুনিভর্সিটির প্রতিষ্ঠাভার বিখ্যাত আইরিশ পণ্ডিত ক্লেমেন্সের হাতে দিয়াছিলেন। এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

প্রাচীন আইরিশ বিদ্যালয়ে যদিচ লাটিন গ্রীক এবং হিব্রু শেখানো হইত তবু সেখানে শিখাইবার ভাষা ছিল আইরিশ। গণিতজ্যোতিষ ফলিতজ্যোতিষ এবং তখনকার কালে যে-সকল বিজ্ঞান প্রচলিত ছিল তাহা আইরিশ ভাষা দ্বারাই শেখানো হইত, সুতরাং এ ভাষায় পারিভাষিক শব্দের দৈন্য ছিল না।

যখন দিনেমার এবং ইংরেজেরা আয়র্লন্ড্ আক্রমণ করে তখন এই-সকল বিদ্যালয়ে আগুন লাগাইয়া বিপুলসঞ্চিত পুঁথিপত্র জ্বালাইয়া দেওয়া হয় এবং অধ্যাপক ও ছাত্রগণ হত ও বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু আয়র্লন্ডের যে যে স্থান এই-সকল উৎপাত হইতে দূরে থাকিয়া ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দেশীয় রাজাদের অধীন ছিল সে-সকল স্থানের বড়ো বড়ো বিদ্যাগারে শিক্ষাকার্য সম্পূর্ণ আইরিশ প্রণালীতেই নির্বাহিত হইত। অবশেষে এলিজাবেথের কালে লড়াই হইয়া যখন সমস্ত সম্পত্তি অপহৃত হইল তখন আয়র্লন্ডের স্বায়ত্ত বিদ্যা ও বিদ্যালয় একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

এইরূপে আয়র্লন্ড্‌বাসীরা জ্ঞানচর্চা হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিল। তাহাদের ভাষা নিকৃষ্ট সমাজের ভাষা বলিয়া অবজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে থাকিল। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীতে 'ন্যাশনাল স্কুল' প্রণালীর সূত্রপাত হইল। জ্ঞানপিপাসু আইরিশগণ এই প্রণালীর দোষগুলি বিচারমাত্র না করিয়া ব্যগ্রভাবে ইহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। কেবল একজন বড়োলোক, টুয়ামের আর্চ্‌বিশপ জন ম্যাক্‌হেল, এই প্রণালীর বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করেন এবং ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে যে অমঙ্গল হইবে তাহা ব্যক্ত করেন।

আইরিশদিগকে জোর করিয়া স্যাক্সনের ছাঁচে ঢালা এবং ইংরেজ করিয়া তোলাই ন্যাশনাল স্কুল-প্রণালীর মতলব ছিল। ফলে এই চেষ্টার ব্যর্থতা প্রমাণ হইল। ভালোই বলো আর মন্দই বলো, প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এমন ভিন্ন রকম করিয়া গড়িয়াছেন যে এক জাতকে ভিন্ন জাতের কাঠামোর মধ্যে পুরিতে গেলে সমস্ত খাপছাড়া হইয়া যায়।

যে সময়ে এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তন করা হয় তখন আয়র্লন্ডের শতকরা আশিজন লোক আইরিশ ভাষায় কথা কহিত। যদি শিক্ষা দেওয়াই ন্যাশনাল বোর্ডের উদ্দেশ্য হইত, তবে আইরিশ ছাত্রদিগকে আগে নিজের ভাষায় পড়িতে শুনিতে শিখাইয়া তাহার পরে সেই মাতৃভাষার সাহায্যে তাহাদিগকে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া নানা প্রকার কঠিন শাস্তি দ্বারা বালকদিগকে তাহাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে একেবারে নিরস্ত করিয়া দেওয়া হইল।

শুধু ভাষা নয়, আইরিশ ইতিহাস পড়ানো বন্ধ হইল। আইরিশ ভূবৃত্তান্তও

প্রতিবাদ করিবে না, ও পরের কাজের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ। আমরা স্বভাবত স্বজাতিকে স্বাতন্ত্র্যের জন্য প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিব, সে কথা বলাই বাহুল্য। ইংলন্ডের যখন সুদিন ছিল তখন ইংলন্ডও কোনো জাতি সম্বন্ধেই এই আদর্শে বাধা দিত না, ভারতবর্ষে শিক্ষানীতি সম্বন্ধে মেকলের মন্তব্য তাহার প্রমাণ। এখন কালের পরিবর্তন হইয়াছে— এইজন্যই শিক্ষার আদর্শ লইয়া কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে স্বদেশ-ভক্তদের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বিদ্যালয়ের সাহায্যে এ দেশে তাঁবেদারির চিরস্থায়ী ভিত্তি-পত্তন করিতে কিছুতেই রাজি হইতে পারি না। কাজেই, সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করিয়া হউক নিজের হাতে গ্রহণ করিতেই হইবে।

গবর্মেন্ট্-প্রতিষ্ঠিত সেনেটে সিন্ডিকেটে বাঙালি থাকিলেই যে বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে রহিল তাহা আমি মনে করি না। গবর্মেন্টের আমাদের কাছে জবাবদিহি না থাকিয়া দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি থাকা চাই। আমরা গবর্মেন্টের সম্মতির অধীনে যখন বাহ্যস্বাতন্ত্র্যের একটা বিড়ম্বনা লাভ করি তখনই আমাদের বিপদ সব চেয়ে বেশি। তখন প্রসাদলব্ধ সেই মিথ্যা স্বাতন্ত্র্যের মূল্য যাহা দিতে হয় তাহাতে মাথা বিকাইয়া যায়। বিশেষত দেশী লোককে দিয়াই দেশের মঙ্গল দলন করা গবর্মেন্টের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে, নহিলে এ দেশের দুর্গতি কিসের! অতএব, চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ্য রাখি, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চেষ্টার দিন আসিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি তবে আমরা সর্ব প্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব, অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব— ইহা নিশ্চয়। বস্তুত আমরা প্রত্যহই মরিতেছি, অথচ তাহার প্রতিকারের উপযুক্ত চেষ্টামাত্র করিতেছি না, তাহার চিন্তামাত্র যথার্থরূপে আমাদের মনেও উদয় হইতেছে না, এই-যে নিবিড় মোহাবৃত নিরুদ্যম ও চরিত্রবিকার— বাল্যকাল হইতে প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত কোনো অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ইহা নিবারণের কোনো উপায় নাই।

বর্তমান কালে যে একটিমাত্র সাধক য়ুরোপে গুরুর আসনে বসিয়া নিরন্তর অরণ্যে রোদন করিয়া মরিতেছেন সেই টল্স্টয় রুশিয়ার শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি।—

It seems to me that it is now specially important to do what is right quietly and persistently, not only without asking permission from Government but consciously avoiding its participation. The strength of the Government lies in the people's ignorance, and the Government knows this, and will therefore always oppose true enlightenment. It is time we realized that fact. And it is most undesirable to let the Government, while it is spreading darkness, pretend to be busy with the enlightenment of the people. It is doing this now by means of all sorts of pseudo-educational establishments which it controls : schools, high schools, universities, academies, and all kinds of committees and congresses. But good is good and enlightenment is

enlightenment, only when it is quite good and quite enlightened and not when it is toned down to meet the requirements of Delyanof's or Dournovo's circulars. And I am extremely sorry when I see valuable, disinterested, and self-sacrificing efforts spent unprofitably. It is strange to see good, wise people spending their strength in a struggle against the Government, but carrying on that struggle on the basis of whatever laws the Government itself likes to make.

আষাঢ় ১৩১৩

শিক্ষাসমস্যা

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সভ্য আমার কয়েক জন শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ এই পরিষদের স্কুল-বিভাগের একটি গঠনপত্রিকা তৈরি করিবার জন্য আমার উপরে ভার দিয়াছিলেন।

তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে বসিয়া দেখিলাম কাজটি সহজ নহে। কেননা, গোড়ায় জানা উচিত এই সংকল্পিত বিদ্যালয়ের কারণবীজটি কী, ইহার মূলে কোন্ ভাব আছে। আমার তাহা জানা নাই।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, বাসনাই জন্মপ্রবাহের কারণ, বস্তুপুঞ্জের আকস্মিক সংঘটনই জন্মের হেতু নহে। যদি বাসনার ছেদ হয় তবে গোড়া কাটা পড়িয়া জন্মমৃত্যুর অবসান হইয়া যায়।

তেমনি বলা যাইতে পারে, ভাব জিনিসটাই সকল অনুষ্ঠানের গোড়ায়। যদি ভাব না থাকে তবে নিয়ম থাকিতে পারে, টাকা থাকিতে পারে, কমিটি থাকিতে পারে, কিন্তু কর্মের শিকড় কাটা পড়িয়া তাহা শুকাইয়া যায়।

তাই গোড়াতেই মনে প্রশ্ন উদয় হয় যে, জাতীয় শিক্ষাপরিষৎটি কোন্ ভাবের প্রেরণায় জন্মগ্রহণ করিতেছে। দেশে সম্প্রতি যে-সকল বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহার মধ্যে কোন্ ভাবের অভাব ছিল যাহাতে সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতেছিল না, এবং প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে সেই ভাবটিকে কোথায় স্থান দেওয়া হইতেছে।

জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ শুধু যদি কারুবিদ্যালয়-স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে বুঝিতাম যে, একটা বিশেষ সংকীর্ণ প্রয়োজন সাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে সাধারণত দেশের সমস্ত শিক্ষার প্রতি পরিষৎ দৃষ্টি রাখিতে চান তখন এই জিজ্ঞাসা মনে উঠে যে, কোন্ ভাবে এই শিক্ষাকার্য চলিবে। কোন্ নিয়মে চলিবে এবং কী কী বই পড়ানো হইবে, সে-সমস্ত বাহিরের কথা।

ইহার উত্তরে যদি কেহ বলেন 'জাতীয়' ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে তবে প্রশ্ন উঠিবে, শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় ভাব বলিতে কী বুঝায়? 'জাতীয়' শব্দটার কোনো সীমানির্দেশ হয় নাই, হওয়াও শক্ত। কোন্‌টা জাতীয় এবং কোন্‌টা জাতীয় নহে, শিক্ষা সুবিধা ও সংস্কার-অনুসারে ভিন্ন লোকে তাহা ভিন্ন রকমে স্থির করেন।

অতএব শিক্ষাপরিষদের মূল ভাবটি সম্বন্ধে গোড়াতেই দেশের লোকে সকলে মিলিয়া একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। ইংরেজ সরকারের প্রতি রাগ করিয়া

আমরা এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ কথা এক মুহূর্তের জন্য মনে স্থান দিতে পারি না। দেশের অন্তঃকরণ একটা-কিছু অভাব বোধ করিয়াছিল, একটা-কিছু চায়, সেইজন্যই আমরা দেশের সেই ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে একত্র হইয়াছি এই কথাই সত্য।

আমরা চাই, কিন্তু কী চাই তাহা বাহির করা যে সহজ তাহা মনে করি না। এই সম্বন্ধে সত্য-আবিষ্কারের 'পরেই আমাদের উদ্ধার নির্ভর করে। যদি ভুল করি —যেটা হাতের কাছেই আছে, আমরা যেটাতে অভ্যস্ত, জড়ত্ববশত যদি সেইটেকেই সত্য মনে করি, তবে বড়ো বড়ো নাম আমাদিগকে বিফলতা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।

এইজন্য শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠাতাগণ যখন উদ্যোগে প্রবৃত্ত আছেন তখন দেশের সর্বসাধারণের তরফ হইতে নিজের চিত্ত, নিজের অভাব, বুঝিবার জন্য একটা আলোচনা হওয়া উচিত।

সেই আলোচনাকে জাগাইয়া তোলাই আমার এই রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উপলক্ষে, যে ভাবটি আমার মনের সম্মুখে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে দেশের দরবারে উপস্থিত করা আমার কর্তব্য। যদি শিক্ষিত সমাজের প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে ইহার বিরোধ বাধে তবে ইহা গ্রাহ্য হইবে না, জানি। যদি গ্রাহ্য না হয় তবে আপনাদের একটা সুবিধা আছে—আপনারা সমস্তটাকে কবিকল্পনার আকাশকুসুম বলিয়া অতি সংক্ষেপেই বর্জন করিতে পারিবেন এবং আমিও ব্যর্থ কবিদের সান্ত্বনাস্থল 'পস্টারিটি' অর্থাৎ কোনো-একটা অনির্দিষ্ট উত্তরকালের মধ্যে আমার অনাদৃত প্রস্তাবটির ভাবী সদ্গতি কল্পনা করিয়া আশ্বাসলাভের চেষ্টা করিব। কিন্তু তৎপূর্বে আজ আপনাদের নিকট বহুল পরিমাণে ধৈর্য ও ক্ষমা সানুনয়ে প্রার্থনা করি।

ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন; ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।

কলের একটা সুবিধা, ঠিক মাপে, ঠিক ফর্মাশ-দেওয়া জিনিসটা পাওয়া যায়; এক কলের সঙ্গে আর-এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড়ো একটা তফাত থাকে না, মার্কা দিবার সুবিধা হয়।

কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের অনেক তফাত। এমন-কি, একই মানুষের এক দিনের সঙ্গে আর-এক দিনের ইতর-বিশেষ ঘটে।

তবু মানুষের কাছ হইতে মানুষ যাহা পায় কলের কাছ হইতে তাহা পাইতে পারে না। কল সম্মুখে উপস্থিত করে, কিন্তু দান করে না; তাহা তেল দিতে পারে, কিন্তু আলো জ্বালাইবার সাধ্য তাহার নাই।

য়ুরোপে মানুষ সমাজের ভিতরে থাকিয়া মানুষ হইতেছে, ইস্কুল তাহার কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে। লোকে যে বিদ্যা লাভ করে সে বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে; সেইখানেই তাহার চর্চা হইতেছে, সেইখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে, সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানা ভাবে তাহার সঞ্চার হইতেছে, লেখাপড়ায় কথাবার্তায় কাজে-কর্মে তাহা অহরহ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে।

সেখানে জনসমাজ যাহা কালে কালে নানা ঘটনায় নানা লোকের দ্বারায় লাভ করিয়াছে, সঞ্চয় করিয়াছে এবং ভোগ করিতেছে, তাহাই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া বালকদিগকে পরিবেষণের একটা উপায় করিয়াছে মাত্র।

এইজন্য সেখানকার বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে মিশিয়া আছে, তাহা সমাজের মাটি হইতেই রস টানিতেছে এবং সমাজকেই ফলদান করিতেছে।

কিন্তু বিদ্যালয় যেখানে চারি দিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই— যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া তাহা শুষ্ক, তাহা নির্জীব, তাহার কাছ হইতে যাহা পাই তাহা কষ্টে পাই, এবং সে বিদ্যা প্রয়োগ করিবার বেলা কোনো সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি না। দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে, চারি দিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে, তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপ মা ভাই বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিনমাত্র হইয়া থাকে; তাহা বস্তু জোগায়, প্রাণ জোগায় না।

এইজন্য বলিতেছি, য়ুরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করিলেই আমরা যে সেই একই জিনিস পাইব এমন নহে। এই নকলে সেই বেঞ্চি, সেই টেবিল, সেই প্রকার কার্যপ্রণালী সমস্তই ঠিক মিলাইয়া পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে।

পূর্বে যখন আমরা গুরুর কাছে বিদ্যা পাইতাম, শিক্ষকের কাছে নহে— মানুষের কাছে জ্ঞান চাহিতাম, কলের কাছে নয়— তখন আমাদের শিক্ষার বিষয় এত বিচিত্র ও বিস্তৃত ছিল না এবং তখন আমাদের সমাজে-প্রচলিত ভাব ও মতের সঙ্গে পুঁথির শিক্ষার কোনো বিরোধ ছিল না। ঠিক সে দিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সেও একটা নকল হইবে মাত্র, তাহার বাহ্য আয়োজন বোঝা হইয়া উঠিবে, কোনো কাজেই লাগিবে না।

অতএব আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে, যাহাতে পাঠ্য বিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে, যাহাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে। দেখিতে হইবে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের চতুর্দিকের যে বিচ্ছেদ, এমন-কি বিরোধ আছে, তাহার দ্বারা যেন ছাত্রদের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া না যায় ও এইরূপে বিদ্যাশিক্ষাটা যেন কেবল দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা মাত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়া বাস্তবিকতাসম্পর্কশূন্য একটা অত্যন্ত গুরুপাক আব্‌স্ট্রাক্ট্‌ ব্যাপার হইয়া না দাঁড়ায়।

বিদ্যালয়ে ঘর বানাইলে তাহা বোর্ডিং ইস্কুল-আকার ধারণ করে। এই বোর্ডিং ইস্কুল বলিতে যে ছবি মনে জাগিয়া উঠে তাহা মনোহর নয়; তাহা বারিক, পাগ্‌লাগারদ, হাসপাতাল বা জেলেরই এক গোষ্ঠী-ভুক্ত।

অতএব বিলাতের নজির একেবারে ছাড়িতে হইবে; কারণ, বিলাতের ইতিহাস, বিলাতের সমাজ আমাদের নহে। আমাদের দেশের লোকের মনকে কোন্ আদর্শ বহু দিন মুগ্ধ করিয়াছে, আমাদের দেশের হৃদয়ে রসসঞ্চার হয় কিসে, তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে।

বুঝিবার বাধা যথেষ্ট আছে। আমরা ইংরেজি ইস্কুলে পড়িয়াছি, যে দিকে

তাকাই ইংরেজের দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ। ইহার আড়ালে আমাদের দেশের ইতিহাস, আমাদের স্বজাতির হৃদয়, অস্পষ্ট হইয়া আছে। আমরা ন্যাশনাল পতাকাটাকে উচ্চে তুলিয়া যখন স্বাধীন চেষ্টায় কাজ করিব বলিয়া কোমর বাঁধিয়া বসি তখনো বিলাতের বেড়ি কোমরবন্ধ হইয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলে, আমাদিগকে নজিরের বাহিরে নড়িতে দেয় না।

আমাদের একটা মুশকিল এই যে, আমরা ইংরেজি বিদ্যা ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি সমাজকে, অর্থাৎ সেই বিদ্যা ও বিদ্যালয়কে, তাহার যথাস্থানে দেখিতে পাই না। আমরা ইহাকে সজীব লোকালয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া জানি না। এইজন্য সেই বিদ্যালয়ের এদেশী প্রতিরূপটিকে কেমন করিয়া আমাদের জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে তাহাই জানি না, অথচ ইহাই জানা সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। বিলাতের কোন্ কলেজে কোন্ বই পড়ানো হয় এবং তাহার নিয়ম কী, ইহা লইয়া তর্কবিতর্কে কালক্ষেপ করা সময়ের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার নহে।

এ সম্বন্ধে আমাদের হাড়ের মধ্যে একটা অন্ধ সংস্কার প্রবেশ করিয়াছে। যেমন তিব্বতী মনে করে যে লোক ভাড়া করিয়া তাহাকে দিয়া একটা মন্ত্রলেখা চাকা চালাইলেই পুণ্যলাভ হয় তেমনি আমরাও মনে করি, কোনোমতে একটা সভা স্থাপন করিয়া কমিটির দ্বারা যদি সেটা চালাইয়া যাই তবেই আমরা ফললাভ করিব। বস্তুত সেই স্থাপন করাটাই যেন লাভ। আমরা অনেক দিন হইল একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করিয়াছি; তাহার পরে বৎসরে বৎসরে বিলাপ করিয়া আসিয়াছি দেশের লোকে বিজ্ঞানশিক্ষায় উদাসীন। কিন্তু একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করা এক, আর দেশের লোকের চিত্তকে বিজ্ঞানশিক্ষায় নিবিষ্ট করা আর। সভা ফাঁদিলেই তাহার পরে দেশের লোক বিজ্ঞানী হইয়া উঠিবে, এরূপ মনে করা ঘোর কলিযুগের কলনিষ্ঠার পরিচয়।

আসল কথা, মানুষের মন পাইতে হইবে। তাহা হইলে যেটুকু আয়োজন করা যায় সেইটুকুই পুরা ফল দেয়। ভারতবর্ষ যখন শিক্ষা দিত তখন মন পাইয়াছিল কী করিয়া সে কথাটা ভাবিয়া দেখা চাই— বিদেশী য়ুনিভার্সিটির ক্যালেণ্ডার খুলিয়া তাহার রস বাহির করিবার জন্য তাহাতে পেন্সিলের দাগ দিতে নিষেধ করিব না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বিচারটাও উপেক্ষার বিষয় নহে। কী শিখাইব তাহা ভাবিবার বটে, কিন্তু যাহাকে শিখাইব তাহার সমস্ত মনটা কী করিয়া পাওয়া যাইতে পারে সেও কম কথা নয়।

একদিন তপোবনে ভারতবর্ষের গুরুগৃহ ছিল, এইরূপ একটা পুরাণকথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। অবশ্য তপোবনের যে একটা পরিষ্কার ছবি আমাদের মনে আছে তাহা নহে এবং তাহা অনেক অলৌকিকতার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যে কালে এই-সকল আশ্রম সত্য ছিল সে কালে তাহারা ঠিক কিরূপ ছিল তাহা লইয়া তর্ক করিব না, করিতে পারিব না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, এই-সকল আশ্রমে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা গৃহী ছিলেন এবং শিষ্যগণ সন্তানের মতো তাঁহাদের সেবা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতেন। এই ভাবটাই আমাদের দেশের টোলেও আজ কতকটা পরিমাণে চলিয়া আসিয়াছে।

এই টোলের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে, চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র পুঁথির পড়াটাই সব চেয়ে বড়ো জিনিস নয়, সেখানে চারি দিকেই অধ্যয়ন-অধ্যাপনার হাওয়া বহিতেছে। গুরু নিজেও ঐ পড়া লইয়াই আছেন। শুধু তাই নয়, সেখানে

জীবনযাত্রা নিতান্ত সাদাসিধা; বৈষয়িকতা বিলাসিতা মনকে টানাছেঁড়া করিতে পারে না, সুতরাং শিক্ষাটা একেবারে স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাইবার সময় ও সুবিধা পায়। য়ুরোপের বড়ো বড়ো শিক্ষাগারেও যে এই ভাবটি নাই, সে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের মতে, যত দিন অধ্যয়নের কাল তত দিন ব্রহ্মচর্যপালন এবং গুরুগৃহে বাস আবশ্যক।

ব্রহ্মচর্যপালন বলিতে যে কৃচ্ছ্রসাধন বুঝায় তাহা নহে। সংসারের মাঝখানে যাহারা থাকে তাহারা ঠিক স্বভাবের পথে চলিতে পারে না। নানা লোকের সংঘাতে নানা দিক হইতে নানা ঢেউ আসিয়া অনেক সময়ে অনাবশ্যকরূপে তাহাদিগকে চঞ্চল করিতে থাকে— যে সময়ে যে-সকল হৃদয়বৃত্তি ভ্রূণ অবস্থায় থাকিবার কথা তাহারা কৃত্রিম আঘাতে অকালে জন্মগ্রহণ করে; ইহাতে কেবলই শক্তির অপব্যয় হয় এবং মন দুর্বল এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

অথচ জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। প্রবৃত্তির অকাল-বোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদ্গমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্য-পালনের উদ্দেশ্য।

বস্তুত এই স্বভাবের নিয়মের মধ্যে থাকা বালকদের পক্ষে সুখের অবস্থা। ইহাতে তাহাদের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করে, ইহাতেই তাহারা যথার্থভাবে স্বাধীনতার আনন্দলাভ করিতে পায়। ইহাতে তাহাদের নবাঙ্কুরিত নির্মল সতেজ মন সমস্ত শরীরের মধ্যে দীপ্তির সঞ্চার করে।

ব্রহ্মচর্যপালনের পরিবর্তে আজকাল নীতিপাঠের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যে-কোনো উপলক্ষে ছাত্রদিগকে নীতি-উপদেশ দিতে হইবে, দেশের অভিভাবকদের এইরূপ অভিপ্রায়।

ইহাও ঐ কলের ব্যাপার। নিয়মিত প্রত্যহ খানিকটা করিয়া সালসা খাওয়ানোর মতো খানিকটা নীতি-উপদেশ— ইহা একটা বরাদ্দ, শিশুকে ভালো করিয়া তুলিবার এই একটা বাঁধা উপায়।

নীতি-উপদেশ জিনিসটা একটা বিরোধ। ইহা কোনোমতেই মনোরম হইতে পারে না। যাহাকে উপদেশ দেওয়া হয় তাহাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। উপদেশ হয় তাহার মাথা ডিঙাইয়া চলিয়া যায় নয় তাহাকে আঘাত করে। ইহাতে যে কেবল চেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহা নয়, অনেক সময় অনিষ্ট করে। সৎ কথাকে বিরস ও বিফল করিয়া তোলা মনুষ্যসমাজের যেমন ক্ষতিকর এমন আর-কিছুই নয়— অথচ অনেক ভালো লোক এই কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, ইহা দেখিয়া মনে আশঙ্কা হয়।

সংসারে কৃত্রিম জীবনযাত্রায় হাজার রকমের অসত্য ও বিকৃতি যেখানে প্রতি মুহূর্তে রুচি নষ্ট করিয়া দিতেছে সেখানে ইস্কুলে দশটা-চারটের মধ্যে গোটাকতক পুঁথির বচনে সমস্ত সংশোধন করিয়া দিবে ইহা আশাই করা যায় না। ইহাতে কেবল ভূরি ভূরি ভানের সৃষ্টি হয় এবং নৈতিক জ্যাঠামি, যাহা সকল জ্যাঠামির অধম, তাহা সুবুদ্ধির স্বাভাবিকতা ও সৌকুমার্য নষ্ট করিয়া দেয়।

ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা ধর্ম সম্বন্ধে সুরুচিকে স্বাভাবিক করিয়া দেওয়া হয়। উপদেশ দেওয়া নহে, শক্তি দেওয়া হয়। নীতিকথাকেই বাহ্য ভূষণের মতো জীবনের উপরে চাপাইয়া দেওয়া নহে, জীবনকেই ধর্মের সঙ্গে গড়িয়া তোলা এবং

এইরূপে ধর্মকে বিরুদ্ধ পক্ষে দাঁড় না করাইয়া তাহাকে অন্তরঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। অতএব জীবনের আরম্ভে মনকে চরিত্রকে গড়িয়া তুলিবার সময়, উপদেশ নহে, অনুকূল অবস্থা এবং অনুকূল নিয়মই সকলের চেয়ে বেশি আবশ্যক।

শুধু এই ব্রহ্মচর্যপালন নয়, তাহার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য থাকা চাই। শহর ব্যাপারটা মানুষের কাজের প্রয়োজনেই তৈরি হইয়াছে; তাহা আমাদের স্বাভাবিক আবাস নয়। ইঁট কাঠ পাথরের কোলে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা মানুষ হইব, বিধাতার এমন বিধান ছিল না। আপিসের কাছে এবং এই আপিসের শহরের কাছে পুষ্পপল্লব-চন্দ্রসূর্যের কোনো দাবি নাই— তাহা সজীব সরস বিশ্বপ্রকৃতির বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া আমাদিগকে তাহার উত্তপ্ত জঠরের মধ্যে গিলিয়া পরিপাক করিয়া ফেলে। যাহারা ইহাতেই অভ্যস্ত এবং যাহারা কাজের নেশায় বিহ্বল তাহারা এ সম্বন্ধে কোনো অভাবই অনুভব করে না— তাহারা স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বৃহৎ জগতের সংস্রব হইতে প্রতি দিনই দূরে চলিয়া যায়।

কিন্তু কাজের ঘূর্ণির মধ্যে ঘাড়মুড় ভাঙিয়া পড়িবার পূর্বে, শিখিবার কালে, বাড়িয়া উঠিবার সময়ে, প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্ত বায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য— ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।

চিরদিন উদার বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে থাকিয়াই ভারতবর্ষের মন গড়িয়া উঠিয়াছে। জগতের জড় উদ্ভিদ্ চেতনের সঙ্গে নিজেকে একান্তভাবে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া ভারতবর্ষের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের তপোবনে দ্বিজ বটুগণ এই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছেন—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে আবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে নমস্কার করি, নমস্কার করি।

অগ্নি বায়ু জল স্থল বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা। এই শিক্ষা শহরের ইস্কুলে ঠিকমত সম্ভবে না; সেখানে বিদ্যাশিক্ষার কারখানা-ঘরে জগৎকে আমরা একটা যন্ত্র বলিয়াই শিখিতে পারি।

কিন্তু এখনকার দিনের কাজের-লোকেরা এ-সকল কথা মিস্টিসিজ্‌ম্ বা ভাবকুহেলিকা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, অতএব ইহা লইয়া সমস্ত আলোচনাটাকে অশ্রদ্ধাভাজন করিবার প্রয়োজন নাই।

তথাপি খোলা আকাশ, খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীর-মনের সুপরিণতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার এ কথা বোধ হয় কেজো লোকেরাও একেবারেই উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। বয়স যখন বাড়িবে, আপিস যখন টানিবে, লোকের ভিড় যখন ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইবে, মন যখন নানা মতলবে নানা দিকে ফিরিবে, তখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহার পূর্বে যে জলস্থল-আকাশবায়ুর চিরন্তন ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি তাহার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক, মাতৃস্তন্যের মতো তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত্র গ্রহণ করি— তবেই সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে পারিব। বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ, তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও— তাহাদিগকে এই ভূমার

আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়ো না। স্নিগ্ধ নির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ময় অঙ্গুলির দ্বারা উদ্ঘাটিত করুক এবং সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্য গম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক। তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানারসবিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক, নববর্ষা প্রথম-যৌবরাজ্যে-অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজলনিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দগর্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্ন বর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে— এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল, নানা বর্ণে বিচিত্র, দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্যাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও। হে প্রবীণ অভিভাবক, হে বিষয়ী, তুমি কল্পনাবৃত্তিকে যতই নির্জীব, হৃদয়কে যতই কঠিন করিয়া থাক, দোহাই তোমার, এ কথা অন্তত লজ্জাতেও বলিয়ো না যে, ইহার কোনো আবশ্যক নাই— তোমার বালকদিগকে বিশাল বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বজননীর প্রত্যক্ষলীলাস্পর্শ অনুভব করিতে দাও— তাহা তোমার ইন্‌স্‌পেক্টরের তদন্ত এবং পরীক্ষকের প্রশ্নপত্রিকার চেয়ে যে কত বেশি কাজ করে তাহা অন্তরে অনুভব কর না বলিয়াই তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা করিয়ো না।

মন যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহার চারি দিকে একটা বৃহৎ অবকাশ থাকা চাই। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশালভাবে বিচিত্রভাবে সুন্দরভাবে বিরাজমান। কোনোমতে সাড়ে-নয়টা দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি অন্ন গিলিয়া বিদ্যা-শিক্ষার 'হরিণবাড়ি'র মধ্যে হাজিরা দিয়া কখনোই ছেলেদের প্রকৃতি সুস্থভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দরোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টা দ্বারা তাড়া দিয়া, মানবজীবনের আরম্ভে এ কী নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে! শিশু যে অ্যাল্‌জেব্রা না কষিয়াই, ইতিহাসের তারিখ না মুখস্থ করিয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেজন্য সে কি অপরাধী? তাই সে হতভাগ্যদের নিকট হইতে তাহাদের আকাশ বাতাস, তাহাদের আনন্দ অবকাশ, সমস্ত কাড়িয়া লইয়া শিক্ষাকে সর্বপ্রকারেই তাহাদের পক্ষে শাস্তি করিয়া তুলিতে হইবে? না জানা হইতে ক্রমে ক্রমে জানিবার আনন্দ পাইবে বলিয়াই কি শিশুরা অশিক্ষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না? আমাদের অক্ষমতা ও বর্বরতা-বশত জ্ঞানশিক্ষাকে যদি আমরা আনন্দজনক করিয়া না তুলিতে পারি, তবু চেষ্টা করিয়া, ইচ্ছা করিয়া, নিতান্ত নিষ্ঠুরতাপূর্বক নিরপরাধ শিশুদের বিদ্যাগারকে কেন আমরা কারাগারের আকৃতি দিই? শিশুদের জ্ঞানশিক্ষাকে বিশ্বপ্রকৃতির উদার রমণীয় অবকাশের মধ্য দিয়া উন্মেষিত করিয়া তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল; সেই অভিপ্রায় আমরা যে পরিমাণে ব্যর্থ করিতেছি সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছি। হরিণবাড়ির প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলো, মাতৃগর্ভের দশ মাসে পণ্ডিত হইয়া উঠে নাই বলিয়া শিশুদের প্রতি সশ্রম কারা-দণ্ডের বিধান করিয়ো না— তাহাদিগকে দয়া করো।

তাই আমি বলিতেছি, শিক্ষার জন্য এখনো আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরুগৃহও চাই। বন আমাদের সজীব বাসস্থান এবং গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক। এই বনে এই গুরুগৃহে আজও বালকদিগকে ব্রহ্মচর্যপালন করিয়া শিক্ষা সমাধা করিতে হইবে। কালে আমাদের অবস্থার যতই পরিবর্তন হইয়া থাক, এই

শিক্ষানিয়মের উপযোগিতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই; কারণ এ নিয়ম মানবচরিত্রের নিত্যসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

অতএব, আদর্শ-বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক; এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রাম-কালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।

অনুকূল ঋতুতে বড়ো বড়ো ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাস বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষত্রপরিচয়ে, সংগীতচর্চায়, পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।

অপরাধ করিলে ছাত্রগণ আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত পালন করিবে। শাস্তি পরের নিকট হইতে অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্ত নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন। দণ্ডস্বীকার করা যে নিজেরই কর্তব্য এবং না করিলে যে গ্লানিমোচন হয় না, এই শিক্ষা বাল্যকাল হইতেই হওয়া চাই—পরের নিকটে নিজেকে দণ্ডনীয় করিবার হীনতা মনুষ্যোচিত নহে।

যদি অভয় পাই তবে এই প্রসঙ্গে সাহসে ভর করিয়া আর-একটা কথা বলিয়া রাখি। এই বিদ্যালয়ে বেঞ্চি টেবিল চৌকির প্রয়োজন নাই। আমি ইংরেজি সামগ্রীর বিরুদ্ধে গোঁড়ামি করিয়া এই কথা বলিতেছি, এমন কেহ যেন না মনে করেন। আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের বিদ্যালয়ে অনাবশ্যককে খর্ব করিবার একটা আদর্শ সর্বপ্রকারে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। চৌকি টেবিল ডেস্ক্‌ সকল মানুষের সকল সময়ে জোটা সহজ নহে, কিন্তু ভূমিতল কেহ কাড়িয়া লইবে না। চৌকি-টেবিলে সত্যসত্যই ভূমিতলকে কাড়িয়া লয়। এমন দশা ঘটে যে, ভূমিতল ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলে সুখ পাই না, সুবিধা হয় না। ইহা একটা প্রকাণ্ড ক্ষতি। আমাদের দেশ শীতের দেশ নহে, আমাদের বেশভূষা এমন নয় যে আমরা নিচে বসিতে পারি না, অথচ পরদেশের অভ্যাসে আমরা আসবাবের বাহুল্য সৃষ্টি করিয়া কষ্ট বাড়াইতেছি। অনাবশ্যককে যে পরিমাণে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিব সেই পরিমাণে আমাদের শক্তির অপব্যয় ঘটিবে। অথচ ধনী য়ুরোপের মতো আমাদের সম্বল নাই; তাহার পক্ষে যাহা সহজ আমাদের পক্ষে তাহা ভার। কোনো একটা সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলেই গোড়াতে ঘরবাড়ি ও আসবাব-পত্রের হিসাব খতাইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়। এই হিসাবের মধ্যে অনাবশ্যকের দৌরাত্ম্য বারো আনা। আমরা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারি না—আমরা মাটির ঘরে কাজ আরম্ভ করিব, আমরা নিচে আসন পাতিয়া সভা করিব। এ কথা বলিতে পারিলে আমাদের অর্ধেক ভার লাঘব হইয়া যায়, অথচ কাজের বিশেষ তারতম্য হয় না। কিন্তু যে দেশে শক্তির সীমা নাই, যে দেশে ধন কানায় কানায় ভরিয়া উপচিয়া পড়িতেছে, সেই দেশের আদর্শে সমস্ত কাজের পত্তন না করিলে

আমাদের লজ্জা দূর হয় না, আমাদের কল্পনা তৃপ্ত হয় না। ইহাতে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির অধিকাংশই আয়োজনে নিঃশেষিত হইয়া যায়, আসল জিনিসকে খোরাক জোগাইতে পারি না। যত দিন মেঝেতে খড়ি পাতিয়া হাত পাকাইয়াছি তত দিন পাঠশালা স্থাপন করিতে আমাদের ভাবনা ছিল না; এখন বাজারে স্লেট পেন্সিলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, কিন্তু পাঠশালা হওয়াই মুশকিল। সকল দিকেই ইহা দেখা যাইতেছে। পূর্বে আয়োজন যখন অল্প ছিল, সামাজিকতা অধিক ছিল; এখন আয়োজন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং সামাজিকতায় ভাঁটা পড়িতেছে। আমাদের দেশে এক দিন ছিল যখন আসবাবকে আমরা ঐশ্বর্য বলিতাম কিন্তু সভ্যতা বলিতাম না; কারণ তখন দেশে যাঁহারা সভ্যতার ভাণ্ডারী ছিলেন তাঁহাদের ভাণ্ডারে আসবাবের প্রাচুর্য ছিল না। তাঁহারা দারিদ্র্যকে সুভদ্র করিয়া সমস্ত দেশকে সুস্থ স্নিগ্ধ রাখিয়াছিলেন। অন্তত শিক্ষার দিনে যদি আমরা এই আদর্শে মানুষ হইতে পারি তবে আর-কিছু না হউক ইহাতে আমরা কতকগুলি ক্ষমতা লাভ করি— মাটিতে বসিবার ক্ষমতা, মোটা পরিবার মোটা খাইবার ক্ষমতা, যথাসম্ভব অল্প আয়োজনে যথাসম্ভব বেশি কাজ চালাইবার ক্ষমতা। এগুলি কম ক্ষমতা নহে, এবং ইহা সাধনার অপেক্ষা রাখে। সুগমতা, সরলতা, সহজতাই যথার্থ সভ্যতা; বহু আয়োজনের জটিলতা, বর্বরতা; বস্তুত তাহা গলদ্‌ঘর্ম অক্ষমতার স্তূপাকার জঞ্জাল। কতকগুলা জড়বস্তুর অভাবে মনুষ্যত্বের সম্ভ্রম যে নষ্ট হয় না, বরঞ্চ অধিকাংশ স্থলেই স্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এ শিক্ষা শিশুকাল হইতে বিদ্যালয়ে লাভ করিতে হইবে— নিষ্ফল উপদেশের দ্বারা নহে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা। এই নিতান্ত সহজ কথাকে সকল প্রকারে সাক্ষাৎভাবে ছেলেদের কাছে স্বাভাবিক করিয়া দিতে হইবে। এ শিক্ষা নাহিলে শুধু যে আমরা নিজের হাতকে পা'কে, ঘরের মেঝেকে, মাটিকে অবজ্ঞা করিতে অভ্যস্ত হইব তাহা নহে— আমাদের পিতা পিতামহকে ঘৃণা করিব এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের সাধনার মাহাত্ম্য যথার্থভাবে অনুভব করিতেই পারিব না।

এইখানে কথা উঠিবে, বাহিরের চিকনচাকনকে যদি তুমি খাতির করিতে না চাও তবে ভিতরের জিনিসটাকে বিশেষভাবে মূল্যবান করিয়া তুলিতে হইবে— সে মূল্য দিবার সাধ্য কি আমাদের আছে? প্রথমেই, জ্ঞানশিক্ষার আশ্রম স্থাপন করিতে হইলে গুরুর প্রয়োজন। শিক্ষক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই জোটে, কিন্তু গুরু তো ফর্মাশ দিলেই পাওয়া যায় না।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের সংগতি যাহা আছে তাহার চেয়ে বেশি আমরা দাবি করিতে পারি না এ কথা সত্য। অত্যন্ত প্রয়োজন হইলেও সহসা আমাদের পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের আসনে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির আমদানি করা কাহারও আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু এ কথাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, আমাদের যে সংগতি আছে অবস্থাদোষে তাহার পুরাটা দাবি না করিয়া আমরা সম্পূর্ণ মূলধন খাটাইতে পারি না এমন ঘটনাও ঘটে। ডাকের টিকিট লেফাফায় আঁটিবার জন্যই যদি জলের ঘড়া ব্যবহার করি তবে তাহার অধিকাংশ জলই অনাবশ্যক হয়, আবার স্নান করিতে হইলে সেই ঘড়ার জলই সম্পূর্ণ নিঃশেষ করা যায়— একই ঘড়ার উপযোগিতা ব্যবহারের গুণে কমে বাড়ে। আমরা যাঁহাকে ইস্কুলের শিক্ষক করি তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার হৃদয়মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে— ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মগজ জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যাইতে পারে।

কিন্তু এই শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও তবে স্বভাবতই তাঁহার হৃদয়মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে। অবশ্য, তাঁহার যাহা সাধ্য তাহার চেয়ে বেশি তিনি দিতে পারিবেন না, কিন্তু তাহার চেয়ে কম দেওয়াও তাঁহার পক্ষে লজ্জাকর হইবে। এক পক্ষ হইতে যথার্থভাবে দাবি না উত্থাপিত হইলে অন্য পক্ষে সম্পূর্ণ শক্তির উদ্‌বোধন হয় না। আজ ইস্কুলের শিক্ষকরূপে দেশের যেটুকু শক্তি কাজ করিতেছে, দেশ যদি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করে তবে গুরুরূপে তাহার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি খাটিতে থাকিবে।

আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে আসা, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্যের গরজ গুরুকে লাভ করা। শিক্ষক দোকানদার, বিদ্যাদান তাঁহার ব্যবসায়। তিনি খরিদ্দারের সন্ধানে ফেরেন। ব্যাবসাদারের কাছে লোকে বস্তু কিনিতে পারে, কিন্তু তাহার পণ্যতালিকার মধ্যে স্নেহ শ্রদ্ধা নিষ্ঠা প্রভৃতি হৃদয়ের সামগ্রী থাকিবে এমন কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। এই প্রত্যাশা অনুসারেই শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন ও বিদ্যাবস্তু বিক্রয় করেন— এইখানেই ছাত্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থাতেও অনেক শিক্ষক দেনাপাওনার সম্বন্ধ ছাড়াইয়া উঠেন, সে তাঁহাদের বিশেষ মাহাত্ম্যগুণে। এই শিক্ষকই যদি জানেন যে তিনি গুরুর আসনে বসিয়াছেন, যদি তাঁহার জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবন-সঞ্চার করিতে হয়, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণসাধন করিতে হয়, তবেই তিনি গৌরবলাভ করিতে পারেন; তবে তিনি এমন জিনিস দান করিতে বসেন যাহা পণ্যদ্রব্য নহে, যাহা মূল্যের অতীত; সুতরাং ছাত্রের নিকট হইতে শাসনের দ্বারা নহে, ধর্মের বিধানে, স্বভাবের নিয়মে, তিনি ভক্তিগ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে অনেক বেশি দিয়া আপন কর্তব্যকে মহিমান্বিত করেন। এবারে বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলির 'পরে রাজচক্রের শনির দৃষ্টি পড়িবামাত্র কত প্রবীণ এবং নবীন শিক্ষক জীবিকালুব্ধ শিক্ষকবৃত্তির কলঙ্ককালিমা নির্লজ্জভাবে সমস্ত দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কাহারও অগোচর নাই। তাঁহারা যদি গুরুর আসনে থাকিতেন তবে পদগৌরবের খাতিরে এবং হৃদয়ের অভ্যাস-বশতই ছোটো ছোটো ছেলেদের উপরে কন্‌স্টেবলি করিয়া নিজের ব্যবসায়কে এরূপ ঘৃণ্য করিয়া তুলিতে পারিতেন না। এই শিক্ষা-দোকানদারির নীচতা হইতে দেশের শিক্ষককে ও ছাত্রগণকে কি আমরা রক্ষা করিব না?

কিন্তু, এ-সকল বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বোধ করি বৃথা হইতেছে। বোধ হয় গোড়ার কথাতেই অনেকের আপত্তি আছে। আমি জানি অনেকের মত এই যে, লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ঘর হইতে ছাত্রদিগকে দূরে পাঠানো তাহাদের পক্ষে হিতকর নহে।

এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য কথা এই যে, লেখাপড়া শেখানো বলিতে আমরা আজকাল যাহা বুঝি তাহার জন্য বাড়ির গলির কাছে যে-কোনো একটা সুবিধামত ইস্কুল এবং তাহার সঙ্গে বড়োজোর একটা প্রাইভেট টিউটার রাখিলেই যথেষ্ট। কিন্তু এইরূপ 'লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই' শিক্ষার দীনতা ও কার্পণ্য মানবসন্তানের পক্ষে যে অযোগ্য তাহা আমি একপ্রকার ব্যক্ত করিয়াছি।

দ্বিতীয় কথা এই, শিক্ষার জন্য বালকদিগকে ঘর হইতে দূরে পাঠানো উচিত নহে, এ কথা মানিতে পারি যদি ঘর তেমনি ঘর হয়। কামার কুমার তাঁতি প্রভৃতি

শিল্পিগণ ছেলেদিগকে নিজের কাছে রাখিয়াই মানুষ করে— তাহার কারণ, তাহারা যেটুকু শিক্ষা দিতে চায় তাহা ঘরে রাখিয়াই ভালোরূপে চলিতে পারে। শিক্ষার আদর্শ আর-একটু উন্নত হইলে ইস্কুলে পাঠাইতে হয়— তখন এ কথা কেহ বলে না যে বাপ-মায়ের কাছে শেখানোই সর্বাপেক্ষা শ্রেয়; কেননা, নানা কারণে তাহা সম্ভবপর হয় না। শিক্ষার আদর্শকে আরও যদি উচ্চে তুলিতে পারি, যদি কেবল পরীক্ষাফললোলুপ পুঁথির শিক্ষার দিকেই না তাকাইয়া থাকি, যদি সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের ভিত্তিস্থাপনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া স্থির করি তবে তাহার ব্যবস্থা ঘরে এবং ইস্কুলে করা সম্ভবই হয় না।

সংসারে কেহ বা বণিক, কেহ বা উকিল, কেহ বা ধনী জমিদার, কেহ বা আর-কিছু। ইঁহাদের প্রত্যেকের ঘরের রকমসকম আবহাওয়া স্বতন্ত্র। ইঁহাদের ঘরে ছেলেরা শিশুকাল হইতে বিশেষ একটা ছাপ পাইতে থাকে।

জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যে মানুষের আপনি যে একটা বিশেষত্ব ঘটে তাহা অনিবার্য এবং এইরূপে এক-একটা ব্যবসায়ের বিশেষ আকারপ্রকার লইয়া মানুষ এক-একটা কোঠায় বিভক্ত হইয়া যায়, কিন্তু বালকেরা সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে অজ্ঞাতসারে তাহাদের অভিভাবকদের ছাঁচে তৈরি হইতে থাকা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যাক, ধনীর ছেলে। ধনীর ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু ধনীর ছেলে বলিয়া বিশেষ একটা-কিছু হইয়া কেহ জন্মায় না। ধনীর ছেলে এবং দরিদ্রের ছেলে কোনো প্রভেদ লইয়া আসে না। জন্মের পরদিন হইতে মানুষ সেই প্রভেদ নিজের হাতে তৈরি করিয়া তুলিতে থাকে।

এমন অবস্থায় বাপ-মায়ের উচিত ছিল গোড়ায় সাধারণ মনুষ্যত্বে পাকা করিয়া তাহার পরে আবশ্যকমতে ছেলেকে ধনীর সন্তান করিয়া তোলা। কিন্তু তাহা ঘটে না, সে সম্পূর্ণরূপে মানবসন্তান হইতে শিখিবার পূর্বেই ধনীর সন্তান হইয়া উঠে। ইহাতে দুর্লভ মানবজন্মের অনেকটাই তাহার অদৃষ্টে বাদ পড়িয়া যায়, জীবনধারণের অনেক রসাস্বাদের ক্ষমতাই তাহার বিলুপ্ত হয়। প্রথমেই তো বদ্ধ-ডানা খাঁচার পাখির মতো বাপ-মা ধনীর ছেলেকে, হাত পা সত্ত্বেও একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলেন। তাহার চলিবার জো নাই, গাড়ি চাই; সামান্য বোঝাটুকু বহিবার জো নাই, মুটে চাই; নিজের কাজ চালাইবার জো নাই, চাকর চাই। শুধু যে শারীরিক ক্ষমতার অভাবে এরূপ ঘটে তাহা নহে, লোকলজ্জায় সে হতভাগ্য সুস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সত্ত্বেও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া থাকে। যাহা সহজ তাহা তাহার পক্ষে কষ্টকর, যাহা স্বাভাবিক তাহা তাহার পক্ষে লজ্জাকর হইয়া উঠে। দলের লোকের মুখ চাহিয়া তাহাকে যে-সকল অনাবশ্যক শাসনে বদ্ধ হইতে হয় তাহাতে সে সহজ মনুষ্যের বহুতর অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। পাছে তাহাকে কেহ ধনী না মনে করে এইটুকু লজ্জা সে সহিতে পারে না; ইহার জন্য পর্বতপ্রমাণ ভার তাহাকে বহন করিতে হয় এবং এই ভারে পৃথিবীতে সে পদে পদে আবদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাকে কর্তব্য করিতে হইলেও এই-সকল ভার বহিয়া করিতে হয়, আরাম করিতে হইলেও এই-সকল ভার লইয়া করিতে হয়, ভ্রমণ করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে এই-সকল ভার টানিয়া বেড়াইতে হয়। সুখ যে মনে, আয়োজনে নহে, এই সরল সত্যটুকু তাহাকে সর্বপ্রকার চেষ্টার দ্বারা ভুলিতে দিয়া তাহাকে সহস্রবিধ জড়পদার্থের দাসানুদাস করিয়া তোলা হয়। নিজের সামান্য প্রয়োজনগুলিকে সে এত বাড়াইয়া তোলে যে, তাহার পক্ষে ত্যাগস্বীকার অসাধ্য হয়, কষ্টস্বীকার করা অসম্ভব হইয়া

উঠে। জগতে এত বড়ো বন্দী, এত বড়ো পঙ্গু আর-কেহ নাই। তবু কি বলিতে হইবে— এই-সকল অভিভাবক, যাহারা কৃত্রিম অক্ষমতাকে গর্বের সামগ্রী করিয়া দাঁড় করাইয়া পৃথিবীর শস্যক্ষেত্রগুলিকে কাঁটার গাছে ছাইয়া ফেলিল তাহারাই সন্তানদের হিতৈষী? যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্বক বিলাসিতাকে বরণ করিয়া লয় তাহাদিগকে বাধা দেওয়া কাহারও সাধ্য নয়। কিন্তু শিশুরা, যাহারা ধুলামাটিকে ঘৃণা করে না, যাহারা রৌদ্রবৃষ্টিবায়ুকে প্রার্থনা করে, যাহারা সাজসজ্জা করাইতে গেলে পীড়া বোধ করে, নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া জগৎকে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখাতেই যাহাদের সুখ— নিজের স্বভাবে স্থিতি করিয়া যাহাদের লজ্জা নাই, সংকোচ নাই, অভিমান নাই— তাহাদিগকে চেষ্টার দ্বারা বিকৃত করিয়া দিয়া চিরদিনের মতো অকর্মণ্য করিয়া দেওয়া কেবল পিতামাতার দ্বারাই সম্ভব; সেই পিতামাতার হাত হইতে এই নিরপরাধগণকে রক্ষা করো।

আমরা জানি, অনেকের ঘরে বালকবালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে। তাহারা আয়ার হাতে মানুষ হয়, বিকৃত হিন্দুস্থানি শেখে, বাংলা ভুলিয়া যায় এবং বাঙালির ছেলে বাংলাসমাজ হইতে যে শত-সহস্র ভাবসূত্রে আজন্মকাল বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয় সেই-সকল স্বজাতীয় নাড়ির যোগ হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হয়— অথচ ইংরেজি সমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা অরণ্য হইতে উৎপাটিত হইয়া বিলাতি টিনের টবের মধ্যে বড়ো হইতেছে। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি এই শ্রেণীর একটি ছেলে দূর হইতে কয়েকজন দেশীভাবাপন্ন আত্মীয়কে দেখিয়া তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে : Mamma, Mamma, look, lot of Babus are coming। বাঙালির ছেলের এমন দুর্গতি আর কী হইতে পারে! বড়ো হইয়া স্বাধীন রুচি ও প্রবৃত্তি-বশত যাহারা সাহেবি চাল অবলম্বন করে তাহারা করুক, কিন্তু তাহাদের শিশু-অবস্থায় যে-সকল বাপ-মা বহু অপব্যয়ে ও বহু অপচেষ্টায় সন্তানদিগকে সকল সমাজের বাহির করিয়া দিয়া স্বদেশে অযোগ্য এবং বিদেশে অগ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছে, সন্তানদিগকে কেবলমাত্র কিছুকাল নিজের উপার্জনের নিতান্ত অনিশ্চিত আশ্রয়ের মধ্যে বেষ্টন করিয়া রাখিয়া ভবিষ্যৎ দুর্গতির জন্য বিধিমতে প্রস্তুত করিতেছে, এই-সকল অভিভাবকদের নিকট হইতে বালকগণ দূরে থাকিলেই কি অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিবে?

আমি শেষোক্ত দৃষ্টান্তটি যে দিলাম, তাহার একটু কারণ আছে। সাহেবিয়ানায় যাঁহারা অভ্যস্ত নন এই দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগকে প্রবলভাবে আঘাত করিবে। তাঁহারা নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবিবেন, লোকে কেন এটুকু বুঝিতে পারে না, কেন সমস্ত ভবিষ্যৎ ভুলিয়া কেবল নিজের কতকগুলা বিকৃত অভ্যাসের অন্ধতায় ছেলেদের এমন সর্বনাশ করিতে বসে!

কিন্তু মনে রাখিবেন, যাঁহারা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত, তাঁহারা এই কাণ্ড অতি সহজেই করিয়া থাকেন, তাঁহারা সন্তানদের যে কোনো প্রকার অভ্যাস-দোষ ঘটাইতেছেন তাহা মনেও করিতে পারেন না। ইহাতে এইটুকু বোঝা উচিত, আমাদের নিজেদের মধ্যে যে-সকল বিশেষ বিকৃতি আছে তাহার সম্বন্ধে আমরা অনেকটা অচেতন— তাহা আমাদিগকে এত বেশি পাইয়া বসিয়াছে যে, তাহাতে করিয়া আর-কাহারও অনিষ্ট অসুবিধা হইলেও আমরা উদাসীন থাকি। আমরা মনে করি, পরিবারের মধ্যে নানা প্রকার রোষ-দ্বেষ অন্যায়-পক্ষপাত বিবাদ-বিরোধ নিন্দা-গ্লানি কু-অভ্যাস কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব থাকিলেও পরিবার হইতে দূরে

থাকাই ছেলেদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপদ। আমরা যাহার মধ্যে মানুষ হইয়াছি তাহারই মধ্যে আর-কেহ মানুষ হইলে ক্ষতি আছে, এ কথা আমাদের মনেও আসে না। কিন্তু মানুষ করিবার আদর্শ যদি খাঁটি হয়, যদি ছেলেকে আমাদের মতোই চলনসই কাজের লোক করাকেই আমরা যথেষ্ট না মনে করি, তবে এ কথা আমাদের মনে উদয় হইবেই যে, ছেলেদিগকে শিক্ষাকালে এমন জায়গায় রাখা কর্তব্য যেখানে তাহারা স্বভাবের নিয়মে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মচর্যপালনপূর্বক গুরুর সহবাসে জ্ঞানলাভ করিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারে।

ভ্রূণকে গর্ভের মধ্যে এবং বীজকে মাটির মধ্যে নিজের উপযুক্ত খাদ্যের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গোপনে থাকিতে হয়। তখন দিনরাত্রি তাহার একমাত্র কাজ খাদ্যশোষণ করিয়া নিজেকে আকাশের জন্য আলোকের জন্য প্রস্তুত করা। তখন সে আহরণ করে না, চারি দিক হইতে শোষণ করে। প্রকৃতি তাহাকে অনুকূল অন্তরালের মধ্যে আহার দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখে; বাহিরের নানা আঘাত অপঘাত তাহার নাগাল পায় না এবং নানা আকর্ষণে তাহার শক্তি বিভক্ত হইয়া পড়ে না।

ছাত্রদের শিক্ষাকালও তাহাদের পক্ষে এইরূপ মানসিক ভ্রূণ-অবস্থা। এই সময়ে তাহারা জ্ঞানের একটি সজীব বেষ্টনের মধ্যে দিনরাত্রি মনের খোরাকের মধ্যেই বাস করিয়া বাহিরের সমস্ত বিভ্রান্তি হইতে দূরে গোপনে যাপন করিবে, ইহাই স্বাভাবিক বিধান। এই সময়ে চতুর্দিকে সমস্তই তাহাদের অনুকূল হওয়া চাই, যাহাতে তাহাদের মনের একমাত্র কাজ হয়— জানিয়া এবং না জানিয়া খাদ্য-শোষণ, শক্তিসঞ্চয় এবং নিজের পুষ্টিসাধন করা।

সংসার কাজের জায়গা এবং নানা প্রবৃত্তির লীলাভূমি। সেখানে এমন অনুকূল অবস্থার সংঘটন হওয়া বড়ো কঠিন যাহাতে শিক্ষাকালে অক্ষুব্ধভাবে ছেলেরা শক্তিলাভ এবং পরিপূর্ণ জীবনের মূলপত্তন করিতে পারে। শিক্ষা সমাধা হইলে গৃহী হইবার যথার্থ ক্ষমতা তাহাদের জন্মিবে। কিন্তু সংসারের সমস্ত প্রবৃত্তি-সংঘাতের মধ্যে যথেচ্ছ মানুষ হইলে গৃহস্থ হইবার উপযুক্ত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না— বিষয়ী হওয়া যায়, ব্যবসায়ী হওয়া যায়, কিন্তু মানুষ হওয়া কঠিন হয়। একদিন গৃহধর্মের আদর্শ আমাদের দেশে অত্যন্ত উচ্চ ছিল বলিয়াই সমাজে তিন বর্ণকে সংসারপ্রবেশের পূর্বে ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করিবার উপদেশ ও ব্যবস্থা ছিল। অনেক দিন হইতেই সে আদর্শ হীন হইয়াছে এবং তাহার স্থলে কোনো মহৎ-আদর্শই গ্রহণ করি নাই বলিয়া আজ আমরা কেরানি সেরেস্তাদার দারোগা ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াই সন্তুষ্ট থাকি; তাহার বেশি হওয়াকে মন্দ বলি না, তবে বাহুল্য বলি।

কিন্তু তাহার অনেক বেশিও বাহুল্য নয়। আমি কেবল হিন্দুর তরফে বলিতেছি না, কোনো দেশেই কোনো সমাজেই বাহুল্য নয়। অন্য দেশে ঠিক এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বিত হয় নাই অথচ তাহারা লড়াই করিতেছে, বাণিজ্য করিতেছে, টেলিগ্রাফের তার খাটাইতেছে, রেলগাড়ির এঞ্জিন চালাইতেছে— এ দেখিয়া আমরা ভুলিয়াছি। এ ভুল যে সভাস্থলে কোনো-একটা প্রবন্ধের আলোচনা করিয়াই ভাঙিবে এমন আশা করিতে পারি না। অতএব আশঙ্কা হয় আজ আমরা 'জাতীয়' শিক্ষাপরিষৎ রচনা করিবার সময় নিজের দেশ নিজের ইতিহাস ছাড়া সর্বত্রই নজির খুঁজিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আরো একটা ছাঁচে-ঢালা কলের ইস্কুল তৈরি করিয়া বসিব। আমরা প্রকৃতিকে বিশ্বাস করি না, মানুষের প্রতি ভরসা রাখি না, কল বৈ আমাদের গতি নাই। আমরা মনে বুঝিয়াছি, নীতিপাঠের কল

পাতিলেই মানুষ সাধু হইয়া উঠিবে এবং পুঁথি পড়াইবার বড়ো ফাঁদ পাতিলেই মানুষের তৃতীয় চক্ষু যে জ্ঞাননেত্র তাহা আপনি উন্মাটিত হইয়া যাইবে।

দস্তুরমত একটা ইস্কুল ফাঁদার চেয়ে জ্ঞানদানের উপযুক্ত আশ্রম স্থাপন কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কঠিনকে সহজ করাই ভারতবর্ষের কাজ হইবে। কারণ, এই আশ্রমের আদর্শ আমাদের কল্পনা হইতে এখনো যায় নাই এবং য়ুরোপের নানাপ্রকার বিদ্যাও আমাদের গোচর হইয়াছে। বিদ্যালাভ ও জ্ঞানলাভের প্রণালীর মধ্যে আমাদিগকে সামঞ্জস্যস্থাপন করিতে হইবে। ইহাই যদি না পারিলাম তবে কেবলই নকলের দিকে মন রাখিয়া আমরা সর্বপ্রকারে ব্যর্থ হইব। অধিকার লাভ করিতে গেলেই আমরা পরের কাছে হাত পাতি এবং গড়িয়া তুলিতে গেলেই আমরা নকল করিতে বসিয়া যাই— নিজের শক্তি এবং নিজের মনের দিকে, দেশের প্রকৃতি ও দেশের যথার্থ প্রয়োজনের দিকে তাকাই না, তাকাইতে সাহসই হয় না। যে শিক্ষার ফলে আমাদের এই দশা হইতেছে সেই শিক্ষাকেই নূতন একটা নাম দিয়া স্থাপন করিলেই যে তাহা নূতন ফল প্রসব করিতে থাকিবে, এরূপ আশা করিয়া নূতন আর-একটা নৈরাশ্যের মুখে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি হয় না। এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, যেখানে মুষলধারায় চাঁদার টাকা আসিয়া পড়ে সেইখানেই যে শিক্ষা বেশি করিয়া জমা হইতে থাকে তাহা নহে, মনুষ্যত্ব টাকায় কেনা যায় না; যেখানে কমিটির নিয়মধারা অহরহ বর্ষিত হয় সেইখানেই যে শিক্ষা-কল্পলতা তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠে তাহাও নহে— শুদ্ধমাত্র নিয়মাবলী অতি উত্তম হইলেও তাহা মানুষের মনকে খাদ্য দান করে না। বহুবিধ বিষয়-পাঠনার ব্যবস্থা করিলেই যে শিক্ষায় লাভের অঙ্ক অগ্রসর হয় তাহা নহে, মানুষ যে বাড়ে সে 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। যেখানে নিভৃতে তপস্যা হয় সেইখানেই আমরা শিখিতে পারি। যেখানে গোপনে ত্যাগ, যেখানে একান্তে সাধনা, সেইখানেই আমরা শক্তিলাভ করি। যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর। যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাহীন, অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত। ব্রহ্মচর্যের সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আত্মবশ, ধর্মশিক্ষা সেইখানেই সরল ও স্বাভাবিক। আর, যেখানে কেবল পুঁথি ও মাস্টার, সেনেট ও সিন্‌ডিকেট, ইঁটের কোঠা ও কাঠের আসবাব, সেখানে আজও আমরা যত বড়ো হইয়া উঠিয়াছি কালও আমরা তত বড়োটা হইয়াই বাহির হইব।

আষাঢ় ১৩১৩

জাতীয় বিদ্যালয়

জাতীয় বিদ্যালয় তো বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, এখন, এই বিদ্যালয়ের উপযোগিতা যে কী সে কি যুক্তি দিয়া বুঝাইবার আর-কোনো প্রয়োজন আছে?

যুক্তির অভাবে পৃথিবীতে খুব অল্প জিনিসই ঠেকিয়াছে। প্রয়োজন আছে এ কথা বুঝাইয়া দিলেই যে প্রয়োজনসিদ্ধি হয়, অন্তত আমাদের দেশে তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের অভাব তো অনেক আছে, অভাব আছে

এ কথা বুঝাইবার লোকও অনেক আছে এবং এ কথা মানিবার লোকেরও অভাব নাই, তবু ইহাতে ইতর-বিশেষ কিছুই ঘটে না।

আসল কথা, যুক্তি কোনো বড়ো জিনিসের সৃষ্টি করিতে পারে না। স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের তালিকা-যোগে লাভ সুবিধা প্রয়োজনের কথা বুঝাপড়া করিতে করিতে কেবল গলা ভাঙে, তাহাতে কিছু গড়ে না। শ্রোতারা গবেষণার প্রশংসা করে, আর-কিছু করা আবশ্যক বোধ করে না।

আমাদের দেশের একটা মুশকিল এই হইয়াছে, শিক্ষা বলো, স্বাস্থ্য বলো, সম্পদ বলো, আমাদের উপরে-যে কিছু নির্ভর করিতেছে এ কথা আমরা এক রকম ভুলিয়াছিলাম। অতএব এ-সকল বিষয়ে আমাদের বোঝা না-বোঝা দুই'ই প্রায় সমান ছিল। আমরা জানি দেশের সমস্ত মঙ্গলসাধনের দায়িত্ব গবর্মেন্টের, অতএব আমাদের অভাব কী আছে না-আছে তাহা বোঝার দরুন কোনো কাজ অগ্রসর হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। এমনতরো দায়িত্ববিহীন আলোচনায় পৌরুষের ক্ষতি করে। ইহাতে পরের উপর নির্ভর আরো বাড়াইয়া তোলে।

স্বদেশ যে আমাদেরই কর্মক্ষেত্র এবং আমরাই যে তাহার সর্বপ্রধান কর্মী, এমন-কি অন্যে অনুগ্রহপূর্বক যতই আমাদের কর্মভার লাঘব করিবে, আমাদের স্বচেষ্টার কঠোরতাকে যতই খর্ব করিবে, ততই আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কাপুরুষ করিয়া তুলিবে— এ কথা যখন নিঃসংশয়ে বুঝিব তখনই আর-আর কথা বুঝিবার সময় হইবে।

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ শুনিতে পাই, ইচ্ছা যেখানে পথ সেখানেই আছে। এ কথা কেহ বলে না, যুক্তি যেখানে আছে পথ সেইখানেই। কিন্তু, আমাদের ইচ্ছা যে আমাদের পথ রচনা করিতে পারে, পুরুষোচিত এই কথার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ছিল না। আমরা জানিতাম, ইচ্ছা আমরা করিব, কিন্তু পথ করা না-করা সে অন্যের হাত, তাহাতে আমাদের হাত কেবল দরখাস্তে সই করিবার বেলায়।

এইজন্য উপযোগিতা বিচার করিয়া, অভাব বুঝিয়া, এতদিন আমরা কিছুই করি নাই। পরিণামবিহীন আন্দোলন-আলোচনার দ্বারা আমাদের প্রকৃতি যথার্থ বললাভ করে নাই। এইজন্যই ইচ্ছাশক্তির প্রভাব যে কিরূপ অব্যর্থ আমাদের নিজের মধ্যে তাহার পরিচয় পাইবার বড়োই প্রয়োজন ছিল। রাজা যে আমাদের পক্ষে কত বড়ো অনুকূল তাহা নহে, কিন্তু ইচ্ছা যে আমাদের মধ্যে কত বড়ো শক্তি ইহাই নিশ্চয় বুঝিবার জন্য আমাদের একান্ত অপেক্ষা ছিল।

বিধাতার প্রসাদে আজ কেমন করিয়া সেই পরিচয় পাইয়াছি। আজ আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম ইচ্ছাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, সমস্ত সৃষ্টির গোড়াকার কথাটা ইচ্ছা। যুক্তি নহে, তর্ক নহে, সুবিধা-অসুবিধার হিসাব নহে, আজ বাঙালির মনে কোথা হইতে একটা ইচ্ছার বেগ উপস্থিত হইল এবং পরক্ষণেই সমস্ত বাধা-বিপত্তি সমস্ত দ্বিধাসংশয় বিদীর্ণ করিয়া অখণ্ড পুণ্যফলের ন্যায় আমাদের জাতীয় বিদ্যাব্যবস্থা আকারগ্রহণ করিয়া দেখা দিল। বাঙালির হৃদয়ের মধ্যে ইচ্ছার যজ্ঞহুতাশন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই অগ্নিশিখা হইতে চরু হাতে করিয়া আজ দিব্যপুরুষ উঠিয়াছেন— আমাদের বহুদিনের শূন্য আলোচনার বন্ধ্যাত্ব এইবার বুঝি ঘুচিবে। যাহা চেষ্টা করিয়া, কষ্ট করিয়া, তর্ক করিয়া দীর্ঘ কালেও হইবার নহে, পূর্বতন সমস্ত হিসাবের খাতা খতাইয়া দেখিলে বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই যাহাকে অসাময়িক অসম্ভব অসংগত বলিয়া সবলে পক্কশীর্ষ চালনা করিতেন, তাহা কত সহজে কত অল্প সময়ে আজ সত্যরূপে আবির্ভূত হইল।

অনেক দিন পরে আজ বাঙালি যথার্থভাবে একটা-কিছু পাইল। এই পাওয়ার মধ্যে কেবল-যে একটা উপস্থিত লাভ আছে তাহা নহে, ইহা আমাদের একটা শক্তি। আমাদের যে পাইবার ক্ষমতা আছে সে ক্ষমতাটা যে কী এবং কোথায়, আমরা তাহাই বুঝিলাম। এই পাওয়ার আরম্ভ হইতে আমাদের পাইবার পথ প্রশস্ত হইল। আমরা বিদ্যালয়কে পাইলাম যে তাহা নহে, আমরা নিজের সত্যকে পাইলাম, নিজের শক্তিকে পাইলাম।

আমি আপনাদের কাছে আজ সেই আনন্দের জয়ধ্বনি তুলিতে চাই। আজ বাংলাদেশে যাহার আবির্ভাব হইল তাহাকে কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা যেন আমরা না ভুলি। আমরা পাঁচ জনে যুক্তি করিয়া কাঠখড় দিয়া কোনোমতে কোনো-একটা সুবিধার খেলনা গড়িয়া তুলি নাই— আমাদের বঙ্গমাতার সূতিকা-গৃহে আজ সজীব মঙ্গল জন্মগ্রহণ করিয়াছে; সমস্ত দেশের প্রাঙ্গণে আজ যেন আনন্দশঙ্খ বাজিয়া উঠে; আজ যেন উপঢৌকন প্রস্তুত থাকে, আজ আমরা যেন কৃপণতা না করি।

সুযোগ-সুবিধার কথা কালক্রমে চিন্তা করিবার অবসর আসিবে, আজ আমাদিগকে গৌরব অনুভব করিয়া উৎসব আরম্ভ করিতে হইবে। আমি ছাত্র-দিগকে বলিতেছি, আজ তোমরা গৌরবে সমুদয় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া স্বদেশের বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করো; তোমরা অনুভব করো বাঙালি জাতির শক্তির একটি সফলমূর্তি তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহাকে যে পরিমাণে যথার্থরূপে তোমরা মানিবে তিনি সেই পরিমাণে তেজ লাভ করিবেন এবং সেই তেজে আমরা সকলে তেজস্বী হইব। এই-যে জাতীয় শক্তির তেজ ইহার কাছে ব্যক্তিগত সামান্য ক্ষতিবৃদ্ধি সমস্তই তুচ্ছ। তোমরা যদি এই বিদ্যা-ভবনের জন্য গৌরব অনুভব কর তবেই ইহার গৌরববৃদ্ধি হইবে। বড়ো বাড়ি, মস্ত জমি বা বৃহৎ আয়োজনে ইহার গৌরব নহে; তোমাদের শ্রদ্ধা, তোমাদের নিষ্ঠা, বাঙালির আত্মসমর্পণে ইহার গৌরব। বাঙালির ইচ্ছায় ইহার সৃষ্টি, বাঙালির নিষ্ঠায় ইহার রক্ষা— ইহাই ইহার গৌরব এবং এই গৌরবই আমাদের গৌরব।

আমাদের অন্তঃকরণে যতক্ষণ পর্যন্ত গৌরববোধ না জন্মে ততক্ষণ কেবলই অন্যের সঙ্গে আমাদের অনুষ্ঠানের তুলনা করিয়া আমরা পদে পদে লজ্জিত ও হতাশ হইতে থাকি। ততক্ষণ আমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্য দেশের বিদ্যালয় মিলাইয়া দেখিবার প্রবৃত্তি হয়; যেটুকু মেলে সেইটুকুতেই গর্ববোধ করি, যেটুকু না মেলে সেইটুকুতেই খাটো হইয়া যাই।

কিন্তু এরূপ তুলনা কেবল নির্জীব পদার্থ সম্বন্ধেই খাটে। গজকাঠিতে বা ওজনের বাটখারায় জীবিত বস্তুর পরিমাপ হয় না। আজ আমাদের দেশে এই-যে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আমি বলিতেছি, ইহা নির্জীব ব্যাপার নহে —আমরা প্রাণ দিয়া প্রাণসৃষ্টি করিয়াছি। সুতরাং যেখানে ইহাকে দাঁড় করানো হইল সেইখানেই ইহার শেষ নহে; ইহা বাড়িবে, ইহা চলিবে— ইহার মধ্যে বিপুল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে, তাহার ওজন কে করিতে পারে! যে-কোনো বাঙালি নিজের প্রাণের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের প্রাণ অনুভব করিবে, সে কোনোমতেই ইঁটকাঠের দরে ইহার মূল্যনিরূপণ করিবে না; সে ইহার প্রথম আরম্ভের মধ্যে চরম পরিণামের মহতী সম্পূর্ণতা অনুভব করিবে, সে ইহার ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমস্তটাকে এক করিয়া সজীব সত্যের সেই সমগ্রমূর্তির নিকট আনন্দের সহিত আত্মসমর্পণ করিবে।

তাই আজ আমি ছাত্রদিগকে অনুরোধ করিতেছি, এই বিদ্যালয়ের প্রাণকে

অনুভব করো, সমস্ত বাঙালি জাতির প্রাণের সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের যে প্রাণের যোগ হইয়াছে তাহা নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে উপলব্ধি করো—ইহাকে কোনোদিন একটা ইস্কুলমাত্র বলিয়া ভ্রম করিয়ো না। তোমাদের উপরে এই একটি মহৎ দায়িত্ব রহিল। স্বদেশের একটি পরম ধনের রক্ষণভার আজ তোমাদের উপরে যতটা পরিমাণে ন্যস্ত হইল, তোমাদিগকে একান্ত ভক্তির সহিত, নম্রতার সহিত তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহাতে তপস্যার প্রয়োজন হইবে। ইতিপূর্বে অন্য কোনো বিদ্যালয় তোমাদের কাছে এত কঠোরতা দাবি করিতে পারে নাই। এই বিদ্যালয় হইতে কোনো সহজ সুবিধা আশা করিয়া ইহাকে ছোটো হইতে দিয়ো না। বিপুল চেষ্টার দ্বারা ইহাকে তোমাদের মস্তকের ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরো, ইহার ক্লেশসাধ্য আদর্শকে মহত্তম করিয়া রাখো; ইহাকে কেহ যেন লজ্জা না দেয়, উপহাস করিতে না পারে; সকলেই যেন স্বীকার করে যে, আমরা শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দিবার জন্য, জড়ত্বকে সম্মানিত করিবার জন্য বড়ো নাম দিয়া একটা কৌশল অবলম্বন করি নাই। তোমাদিগকে পূর্বাপেক্ষা যে দুরূহতর প্রয়াস, যে কঠিনতর সংযম আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা ব্রতস্বরূপ, ধর্মস্বরূপ গ্রহণ করিয়ো। কারণ, এ বিদ্যালয় তোমাদিগকে বাহিরের কোনো শাসনের দ্বারা, কোনো প্রলোভনের দ্বারা আবদ্ধ করিতে পারিবে না—ইহার বিধানকে অগ্রাহ্য করিলে তোমরা কোনো পদ বা পদবীর ভরসা হইতে ভ্রষ্ট হইবে না—কেবল তোমাদের স্বদেশকে, তোমাদের ধর্মকে শিরোধার্য করিয়া, স্বজাতির গৌরব এবং নিজের চরিত্রের সম্মানকে নিয়ত স্মরণে রাখিয়া তোমাদিগকে এই বিদ্যালয়ের সমস্ত কঠিন ব্যবস্থা স্বেচ্ছাপূর্বক অনুদ্ধত আত্মোৎসর্গের সহিত নতশিরে বহন করিতে হইবে।

আমাদের এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে যখন চিন্তা করিবে তখন এই কথা ভাবিয়া দেখিয়ো যে, যে দেশে জলাশয় নাই সে দেশে আকাশের বৃষ্টিপাত ব্যর্থ হইয়া যায়। জল ধরিবার স্থান না থাকিলে বৃষ্টিধারার অধিকাংশ ব্যবহার নষ্ট হইতে থাকে। আমাদের দেশে যে জ্ঞানী, গুণী, ক্ষমতাসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করেন না তাহা নহে; কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান গুণ ও ক্ষমতা ধরিয়া রাখিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। তাঁহারা চাকরি করেন, ব্যাবসা করেন, রোজগার করেন, পরের হুকুম মানিয়া চলেন, তাহার পরে পেন্সন লইয়া ভাবিয়া পান না কেমন করিয়া দিন কাটিবে। এমন প্রত্যহ কত রাশি রাশি সামর্থ্য দেশের উপর দিয়া গড়াইয়া, বহিয়া, উবিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহা আমরা নিশ্চয় জানি, বিধাতার অভিশাপে আমাদের দেশে যে শক্তির চিরন্তন অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছে তাহা নহে—দেশের শক্তিকে দেশের কাজে ব্যবহারে লাগাইবার, তাহাকে কোথাও একত্রে সংগ্রহ করিবার কোনো বিধান আমরা করি নাই। এইজন্য যে শক্তি আছে সে শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিবার, অনুভব করিবার কোনো উপায় আমাদের হাতে নাই। যদি আমাদের প্রতি কেহ শক্তিহীনতার অপবাদ দেয় তবে রাজসরকারের চাকরির ইতিবৃত্ত হইতে রায়বাহাদুরের তালিকা খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়, নিতান্ত তুচ্ছ সাময়িক প্রতিপত্তির উঞ্ছ খুঁটিয়া নিজেদের সামর্থ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়; কিন্তু তাহাতে আমরা সান্ত্বনা পাই না এবং নিজেদের প্রতি বিশ্বাস আন্তরিক হইয়া উঠে না।

এমন দুর্দশার দিনে এই জাতীয় বিদ্যালয় আমাদের বিধিদত্ত শক্তিসঞ্চয়ের একটি উপায়স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। দেশের মহত্ত্ব এইখানে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া বাঙালি জাতির চিরদিনের সম্বলের মতো এই ভাণ্ডে, এই ভাণ্ডারে

রক্ষিত ও বর্ধিত হইতে থাকিবে। অতি অল্প কালের মধ্যেই কি তাহার প্রমাণ আমরা পাই নাই? এই বিদ্যালয়ে দেখিতে দেখিতে দেশের যে-সকল প্রভাবসম্পন্ন পূজ্য ব্যক্তিগণকে আমরা একত্রে লাভ করিয়াছি তাঁহাদের প্রচুর সামর্থ্য কি কেবলমাত্র আহ্বানেরই অভাবে, কেবলমাত্র যজ্ঞক্ষেত্রেরই অবর্তমানে ক্ষীণভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত না? এ কি আমাদের কম সৌভাগ্য! দেশের গুরুজনেরা যেখানে স্বেচ্ছাপূর্বক উৎসাহের সহিত সমবেত হইতেছেন সেইখানেই দেশের ছাত্রগণের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা হইয়াছে, এ কি আমাদের সামান্য কল্যাণ! উপযুক্ত দাতাসকলে শ্রদ্ধার সহিত দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছেন, উপযুক্ত গ্রহীতারাও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবার জন্য করজোড়ে দাঁড়াইয়াছেন, এমন শুভযোগ যেখানে সেখানে দাতাও ধন্য, গ্রহীতাও ধন্য এবং সেই যজ্ঞভূমিও পুণ্যস্থান।

আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমাদের দেশের লোক দেশহিতকর কাজে ত্যাগস্বীকার করিতে পারে না। কেন পারে না? তাহার কারণ, হিতকর কার্য তাহাদের সম্মুখে সত্য হইয়া দেখা দেয় না। কতকগুলি কাজের মতো কাজ আমাদের নিকটে বর্তমান থাকে, ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। না থাকিলে প্রতিদিনের তুচ্ছ স্বার্থ আমাদের কাছে অত্যন্ত বেশি সত্য হইয়া, বড়ো হইয়া উঠে। স্বীকার করি, আমরা এ পর্যন্ত দেশের মঙ্গলের জন্য তেমন করিয়া ত্যাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু মঙ্গল যদি মূর্তি ধরিয়া আমাদের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইত তবে তাহাকে না চিনিয়া এবং না দিয়া কি থাকিতে পারিতাম? ত্যাগস্বীকার মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ত্যাগে প্রবৃত্ত করাইবার উপলক্ষ কেবল কথার কথা হইলে চলে না; চাঁদার খাতা এবং অনুষ্ঠানপত্র আমাদের মন এবং অর্থে টান দিতে পারে না।

যে জাতি আপনার ঘরের কাছে সত্যভাবে প্রত্যক্ষভাবে আত্মত্যাগের উপলক্ষ রচনা করিতে পারে নাই তাহার প্রাণ ক্ষুদ্র, তাহার লাভ সামান্য। সে কোম্পানির কাগজ, ব্যাঙ্কের ডিপজিট ও চাকরির সুযোগকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতে বাধ্য। সে কোনো মহৎ ভাবকে মনের সহিত বিশ্বাস করে না; কারণ, ভাব যেখানে কেবলই ভাবমাত্র, কর্মের মধ্যে যাহার আকার নাই, সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে, সম্পূর্ণ সত্যের প্রবল দাবি সে করিতে পারে না। সুতরাং তাহার প্রতি আমরা অনুগ্রহের ভাব প্রকাশ করি, তাহাকে ভিক্ষুকের মতো দেখি; কখনো বা কৃপা করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ দিই, কখনো বা অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করি। যে দেশে মহৎ ভাব ও বৃহৎ কর্তব্যগুলি এমন কৃপাপাত্ররূপে দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া বেড়ায় সে দেশের কল্যাণ নাই।

আজ জাতীয় বিদ্যালয় মঙ্গলের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে। ইহার মধ্যে মন বাক্য এবং কর্মের পূর্ণ সম্বন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকে আমরা কখনোই অস্বীকার করিতে পারিব না। ইহার নিকটে আমাদিগকে পূজা আহরণ করিতেই হইবে। এইরূপ পূজার বিষয়-প্রতিষ্ঠার দ্বারাই জাতি বড়ো হইয়া উঠে। অতএব জাতীয় বিদ্যালয় যে কেবল আমাদের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া কল্যাণসাধন করিবে তাহা নহে, কিন্তু দেশের মাঝখানে একটি পূজার যোগ্য প্রকৃত মহৎ ব্যাপারের উপস্থিতিই লক্ষ্যে অলক্ষ্যে আমাদিগকে মহত্ত্বের দিকে লইয়া যাইবে।

এই কথা মনে রাখিয়া আজ আমরা ইহাকে আবাহন ও অভিবাদন করিব।

এই কথা মনে রাখিয়া আমরা ইহাকে রক্ষা করিব ও মান্য করিব। ইহাকে রক্ষা করা আত্মরক্ষা, ইহাকে মান্য করাই আত্মসম্মান।

কিন্তু যদি এই কথাই সত্য হয় যে আমরা আমাদের অস্থিমজ্জার মধ্যে দাসখত বহন করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, যদি সত্য হয় যে পরের দ্বারা তাড়িত না হইলে আমরা চলিতেই পারিব না, তবেই আমরা স্বেচ্ছাপূর্বক স্বদেশের মান্য ব্যক্তিদের শাসনে অসহিষ্ণু হইব; তবেই আমরা তাঁহাদের নিয়মের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিতে গৌরববোধ করিব না; তবেই অন্যত্র সামান্য সুযোগের জন্য আমাদের মন প্রলুব্ধ হইতে থাকিবে এবং সংযম ও শিক্ষার কঠোরতার জন্য আমাদের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে।

কিন্তু এ-সকল অশুভ কল্পনাকে আজ মনে স্থান দিতে চাই না। সম্মুখে পথ সুদীর্ঘ এবং পথ দুর্গম; আশার পাথেয় দ্বারা হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া আজ যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। উদয়াচলের অরুণচ্ছটার ন্যায় এই আশা এবং বিশ্বাসই পৃথিবীর সমস্ত সৌভাগ্যবান জাতির মহদ্দিনের প্রথম সূচনা করিয়াছে। এই আশাকে, এই বিশ্বাসকে আমরা আজ কোথাও লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দিব না। এই আশার মধ্যে কোথাও যেন দুর্বলতা, বিশ্বাসের মধ্যে কোথাও যেন সাহসের অভাব না থাকে। নিজের মধ্যে নিজেকে যেন আজ দীন বলিয়া অনুভব না করি। ইহা যেন পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি, আমাদের দেশের মধ্যে, আমাদের দেশবাসী প্রত্যেকের মধ্যে বিধাতার একটি অপূর্ব অভিপ্রায় নিহিত আছে। সে অভিপ্রায় আর-কোনো দেশের আর-কোনো জাতির দ্বারা সিদ্ধ হইতেই পারে না। আমরা পৃথিবীকে যাহা দিব তাহা আমাদের নিজের দান হইবে, তাহা অন্যের উচ্ছিষ্ট হইবে না। আমাদের পিতামহগণ তপোবনের মধ্যে সেই দানের সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছিলেন। আমরাও নানা দুঃখের দাহে, নানা দুঃসহ আঘাতের তাড়নায়, সেই সামগ্রীর বিচিত্র উপকরণকে একত্রে বিগলিত করিয়া তাহাকে গঠনের উপযোগী করিয়া তুলিতেছি; তাঁহাদের সেই তপস্যা, আমাদের এই দুর্বহ দুঃখ কখনোই ব্যর্থ হইবে না।

জগতের মধ্যে ভারতবাসীর যে-একটি বিশেষ অধিকার আছে সেই অধিকারের জন্য আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় আমাদিগকে প্রস্তুত করিবে, আজ এই মহতী আশা হৃদয়ে লইয়া আমরা এই নূতন বিদ্যাভবনের মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলাম। সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। এতদিন আমরা ইস্কুল-কলেজে যে শিক্ষালাভ করিতেছিলাম তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। আমরা তাহা মুখস্থ করিয়াছি, আবৃত্তি করিয়াছি, শিক্ষালব্ধ বাঁধি বচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছি। যে ইতিহাস ইংরেজি কেতাবে পড়িয়াছি তাহাই আমাদের একমাত্র ইতিহাসের বিদ্যা, যে পোলিটিকাল ইকনমি মুখস্থ করিয়াছি তাহাই আমাদের একমাত্র পোলিটিকাল ইকনমি। যাহা-কিছু পড়িয়াছি তাহা আমাদিগকে ভূতের মতো পাইয়া বসিয়াছে; সেই পড়া বিদ্যা আমাদের মুখ দিয়া কথা বলাইতেছে, বাহির হইতে মনে হইতেছে যেন আমরাই কথা বলিতেছি। আমরা মনে করিতেছি, পোলিটিকাল সভ্যতা ছাড়া সভ্যতার আর-কোনো আকার হইতেই পারে না। আমরা স্থির করিয়াছি, য়ুরোপীয় ইতিহাসের মধ্য দিয়া যে পরিণাম প্রকাশ পাইয়াছে জাতিমাত্রেরই সেই একমাত্র সদ্গতি। যাহা অন্য দেশের শাস্ত্রসম্মত তাহাকেই আমরা হিত বলিয়া জানি এবং আগাগোড়া অন্য দেশের প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা স্বদেশের হিতসাধন করিতে ব্যগ্র।

মানুষ যদি এমন করিয়া শিক্ষার নিচে চাপা পড়িয়া যায় সেটাকে কোনো-মতেই মঙ্গল বলিতে পারি না। আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব, ইহাই শিক্ষার ফল। আমরা চলন্ত পুঁথি হইব, অধ্যাপকের সজীব নোট্‌বুক হইয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইব, ইহা গর্বের বিষয় নহে। আমরা জগতের ইতিহাসকে নিজের স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখিতে সাহস করিলাম কৈ, আমরা পোলিটিকাল ইকনমিকে নিজের স্বাধীন গবেষণার দ্বারা যাচাই করিলাম কোথায়? আমরা কী, আমাদের সার্থকতা কিসে, ভারতবর্ষকে বিধাতা যে ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছেন সে ক্ষেত্র হইতে মহাসত্যের কোন্ মূর্তি কী ভাবে দেখা যায়, শিক্ষার দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া তাহা আমরা আবিষ্কার করিলাম কৈ? আমরা কেবল—

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
ভয়ে ভয়ে শুধু পুঁথি আওড়াই।

হায়, শিক্ষা আমাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

আজ আমি আশা করিতেছি, এবারে আমরা শিক্ষার নাগপাশ কাটিয়া ফেলিয়া শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব। আমরা এতকাল যেখানে নিভৃতে ছিলাম আজ সেখানে সমস্ত জগৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নানা জাতির ইতিহাস তাহার বিচিত্র অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, দেশ দেশান্তর হইতে যুগ-যুগান্তরের আলোকতরঙ্গ আমাদের চিত্তাকে নানা দিকে আঘাত করিতেছে—জ্ঞানসামগ্রীর সীমা নাই, ভাবের পণ্য বোঝাই হইয়া উঠিল। এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের দ্বারের সম্মুখবর্তী এই মেলায় আমরা বালকের মতো হতবুদ্ধি হইয়া কেবল পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না; সময় আসিয়াছে যখন ভারতবর্ষের মন লইয়া এই-সকল নানা স্থানের বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের উপর সাহসের সহিত গিয়া পড়িব, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইব, আমাদের চিত্ত তাহাদিগকে একটি অপূর্ব ঐক্যদান করিবে, আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে তাহারা যথাযথ স্থানে বিভক্ত হইয়া একটি অপরূপ ব্যবস্থায় পরিণত হইবে; সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য নূতনদীপ্তি নূতনব্যাপ্তি লাভ করিবে এবং মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে তাহা নূতন সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিবে। ব্রহ্ম-বাদিনী মৈত্রেয়ী জানিয়াছিলেন, উপকরণের মধ্যে অমৃত নাই। বিদ্যারই কি আর বিষয়েরই কি, উপকরণ আমাদিগকে আবদ্ধ করে, আচ্ছন্ন করে। চিত্ত যখন সমস্ত উপকরণকে জয় করিয়া অবশেষে আপনাকেই লাভ করে তখনই সে অমৃতলাভ করে। ভারতবর্ষকেও আজ সেই সাধনা করিতে হইবে; নানা তথ্য নানা বিদ্যার ভিতর দিয়া পূর্ণতররূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে হইবে। পাণ্ডিত্যের বিদেশী বেড়ি ভাঙিয়া ফেলিয়া পরিণত জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইবে। আজ হইতে ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ। হে দেবগণ, আমরা কান দিয়া যেন ভালো করিয়া শুনি, বই দিয়া না শুনি। ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। হে পূজ্যগণ, আমরা চোখ দিয়া যেন ভালো করিয়া দেখি, পরের বচন দিয়া না দেখি। জাতীয় বিদ্যালয় আবৃত্তিগত ভীরু বিদ্যার গণ্ডি হইতে বাহির করিয়া আমাদের বন্ধনজর্জর বুদ্ধির মধ্যে উদার সাহস ও স্বাতন্ত্র্যের সঞ্চার করিয়া যেন দেয়। পাঠ্যপুস্তকটির সঙ্গে আমাদের যে কথাটি না মিলিবে তাহার জন্য আমরা যেন লজ্জিত না হই। এমন-কি আমরা ভুল করিতেও সংকোচ বোধ করিব না। কারণ, ভুল করিবার অধিকার যাহার নাই সত্যকে আবিষ্কার করিবার অধিকারও সে পায় নাই। পরের শত শত ভুল জড়ভাবে মুখস্থ করিয়া রাখার চেয়ে সচেষ্টভাবে নিজে ভুল করা অনেক

ভালো। কারণ, যে চেষ্টা ভুল করায় সেই চেষ্টাই ভুলকে লঙ্ঘন করাইয়া লইয়া যায়। যাহাই হউক, যেমন করিয়াই হউক, শিক্ষার দ্বারা আমরা যে পূর্ণপরিণত আমরাই হইব, আমরা যে ইংরেজি লেক্‌চারের ফোনোগ্রাফ, বিলিতি অধ্যাপকের শিকল-বাঁধা দাঁড়ের পাখি হইব না, এই একান্ত আশ্বাস হৃদয়ে লইয়া আমি আমাদের নূতনপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যামন্দিরকে আজ প্রণাম করি। এখানে আমাদের ছাত্রগণ যেন শুদ্ধমাত্র বিদ্যা নহে, তাহারা যেন শ্রদ্ধা, যেন নিষ্ঠা, যেন শক্তি লাভ করে; তাহারা যেন অভয় প্রাপ্ত হয়; দ্বিধাবর্জিত হইয়া তাহারা যেন নিজেকে নিজে লাভ করিতে পারে; তাহারা যেন অস্থিমজ্জার মধ্যে উপলব্ধি করে : সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্। তাহাদের অন্তরে যেন এই মহামন্ত্র সর্বদাই ধ্বনিত হইতে থাকে : ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি। যাহা ভূমা, যাহা মহান্, তাহাই সুখ; অল্পে সুখ নাই।

ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনে ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ গুরু মুক্তিকাম ছাত্রগণকে যে মন্ত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন সে মন্ত্র বহুদিন এ দেশে ধ্বনিত হয় নাই। আজ আমাদের বিদ্যালয় সেই গুরুর স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মপুত্র এবং ভাগীরথীর তীরে তীরে এই বাণী প্রেরণ করিতেছেন : যথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা। জলসকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হইতে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন—স্বাহা। সহ বীর্যং করবাবহৈ। আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া যেন বীর্যপ্রকাশ করি। তেজস্বি নাবধীতমস্তু। তেজস্বীভাবে আমাদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হউক। মা বিদ্বিষাবহৈ। আমরা পরস্পরের প্রতি যেন বিদ্বেষ না করি। ভদ্রন্নো অপি বাতয় মনঃ। হে দেব, আমাদের মনকে মঙ্গলের প্রতি সবেগে প্রেরণ করো।

ভাদ্র ১৩১৩

আবরণ

পায়ের তেলোটি এমন করিয়া তৈরি হইয়াছিল যে, খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া পৃথিবীতে চলিবার পক্ষে এমন ব্যবস্থা আর হইতে পারে না। যে দিন হইতে জুতা পরিতে শুরু করিলাম সেই দিন হইতে তেলোকে মাটির সংস্রব হইতে বাঁচাইয়া তাহার প্রয়োজনকেই মাটি করিয়া দেওয়া গেল। পদতল এতদিন অতি সহজেই আমাদের ভার বহন করিতেছিল; এখন হইতে পদতলের ভার আমাদিগকে লইতে হইল, এখন খালি পায়ে পথে চলিতে হইলে পদতল আমাদের সহায় না হইয়া পদে পদে দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, ওটাকে লইয়া সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়; মনকে নিজের পদতলের সেবায় নিযুক্ত না রাখিলে বিপদ ঘটে। ওখানে ঠান্ডা লাগিলেই হাঁচি, জল লাগিলেই জ্বর; অবশেষে মোজা চটি গোড়তোলা-জুতা বুট প্রভৃতি বিবিধ উপচারে এই প্রত্যঙ্গটির পূজা করিয়া ইহাকে সকল কর্মের বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ঈশ্বর আমাদিগকে ক্ষুর দেন নাই বলিয়া ইহা তাঁহার প্রতি একপ্রকার অনুযোগ।

এইরূপে বিশ্বজগৎ এবং আমাদের স্বাধীন শক্তির মাঝখানে আমরা সুবিধার প্রলোভনে অনেকগুলা বেড়া তুলিয়া দিয়াছি। এইরূপে সংস্কার ও অভ্যাস-ক্রমে সেই কৃত্রিম আশ্রয়গুলাকেই আমরা সুবিধা এবং নিজের স্বাভাবিক শক্তিগুলিকেই অসুবিধা বলিয়া জানিয়াছি। কাপড় পরিয়া পরিয়া এমনি করিয়া তুলিয়াছি যে, কাপড়টাকে নিজের চামড়ার চেয়ে বড়ো করা হইয়াছে। এখন আমরা বিধাতার সৃষ্ট আমাদের এই আশ্চর্য সুন্দর অনাবৃত শরীরকে অবজ্ঞা করি।

কিন্তু কাপড়-জুতাকে একটা অন্ধ সংস্কারের মতো জড়াইয়া ধরা আমাদের এই গরম দেশে ছিল না। এক তো সহজেই আমাদের কাপড় বিরল ছিল। তাহার 'পরে বালককালে ছেলেমেয়েরা অনেক দিন পর্যন্ত কাপড় জুতা না পরিয়া উলঙ্গ শরীরের সঙ্গে উলঙ্গ জগতের যোগ অসংকোচে অতি সুন্দর ভাবে রক্ষা করিয়াছে। এখন আমরা ইংরেজের নকল করিয়া শিশুদেহের জন্যও লজ্জা বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। শুধু বিলাত-ফেরত নহে, শহরবাসী সাধারণ বাঙালি গৃহস্থও আজকাল বাড়ির বালককে অতিথির সামনে অনাবৃত দেখিলে সংকোচ বোধ করেন এবং এইরূপে ছেলেটাকেও নিজের দেহ সম্বন্ধে সংকুচিত করিয়া তোলেন।

এমনি করিয়া আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে একটা কৃত্রিম লজ্জার সৃষ্টি হইতেছে। যে বয়স পর্যন্ত শরীর সম্বন্ধে আমাদের কোনো কুণ্ঠা থাকা উচিত নয় সে বয়স আর পার হইতে দিতে পারিতেছি না; এখন আজন্মকাল মানুষ আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় হইয়া উঠিতেছে। শেষকালে কোন্ একদিন দেখিব, চৌকি-টেবিলের পায়া ঢাকা না দেখিলেও আমাদের কর্ণমূল আরক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

শুধু লজ্জার উপর দিয়াই যদি যাইত আক্ষেপ করিতাম না। কিন্তু ইহা পৃথিবীতে দুঃখ আনিতেছে। আমাদের লজ্জার দায়ে শিশুরা মিথ্যা কষ্ট পায়। এখনো তাহারা প্রকৃতির খাতক, সভ্যতার ঋণ তাহারা গ্রহণ করিতেই চায় না। কিন্তু বেচারাদের জোর নাই, এক কান্না সম্বল। অভিভাবকদের লজ্জানিবারণ ও গৌরববৃদ্ধি করিবার জন্য লেস ও সিল্কের আবরণে বাতাসের সোহাগ ও আলোকের চুম্বন হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা চীৎকারশব্দে বধির বিচারকের কর্ণে শিশুজীবনের অভিযোগ উত্থাপিত করিতে থাকে। জানে না, বাপ-মায়ে এক্‌জিক্যুটিভ ও জুডিশ্যাল একত্র হওয়াতে তাহার সমস্ত আন্দোলন ও আবেদন বৃথা হইয়া যায়।

আর, দুঃখ অভিভাবকের। অকাল লজ্জার সৃষ্টি করিয়া অনাবশ্যক উপসর্গ বাড়ানো হইল। যাহারা ভদ্রলোক নহে, সরল শিশুমাত্র, তাহাদিগকেও একেবারে শুরু হইতেই অর্থহীন ভদ্রতা ধরাইয়া অর্থের অপব্যয় করা আরম্ভ হইল। উলঙ্গতার একটা সুবিধা, তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতা নাই। কিন্তু কাপড় ধরাইলেই শখের মাত্রা, আড়ম্বরের আয়োজন, রেষারেষি করিয়া বাড়িয়া চলিতে থাকে। শিশুর নবনীতকোমল সুন্দর দেহ ধনাভিমানপ্রকাশের উপলক্ষ হইয়া উঠে; ভদ্রতার বোঝা অকারণে অপরিমিত হইতে থাকে।

এ-সমস্ত ডাক্তারির বা অর্থনীতির তর্ক তুলিব না। আমি শিক্ষার দিক হইতে বলিতেছি। মাটি জল বাতাস আলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ না থাকিলে শরীরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শীতে গ্রীষ্মে কোনো কালে আমাদের মুখটা ঢাকা থাকে না, তাই আমাদের মুখের চামড়া দেহের চামড়ার চেয়ে বেশি শিক্ষিত; অর্থাৎ, বাহিরের সঙ্গে কী করিয়া আপনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয় তাহা সে

ঠিক জানে। সে আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ; তাহাকে কৃত্রিম আশ্রয় প্রায় লইতে হয় না।

এ কথা বলা বাহুল্য, আমি ম্যাঞ্চেস্টারকে ফতুর করিবার জন্য ইংরেজের রাজ্যে উলঙ্গতা প্রচার করিতে বসি নাই। আমার কথা এই যে, শিক্ষা করিবার একটা বয়স আছে, সেটা বাল্যকাল। সেই সময়টাতে আমাদের শরীরমনের পরিণতি-সাধনের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের বাধাবিহীন যোগ থাকা চাই। সে সময়টা ঢাকাঢাকির সময় নয়, তখন সভ্যতা একেবারেই অনাবশ্যক। কিন্তু সেই বয়স হইতেই শিশুর সঙ্গে সভ্যতার সঙ্গে লড়াই আরম্ভ হইতেছে দেখিয়া বেদনাবোধ করি। শিশু আচ্ছাদন ফেলিয়া দিতে চায়, আমরা তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে চাই। বস্তুত এ ঝগড়া তো শিশুর সঙ্গে নয়, এ ঝগড়া প্রকৃতির সঙ্গে। প্রকৃতির মধ্যে যে পুরাতন জ্ঞান আছে তাহাই কাপড় পরাইবার সময় শিশুর ক্রন্দনের মধ্য হইতে প্রতিবাদ করিতে থাকে; আমরাই তো তাহার কাছে শিশু।

যেমন করিয়া হউক, সভ্যতার সঙ্গে একটা রফা দরকার। অন্তত একটা বয়স পর্যন্ত সভ্যতার এলেকাকে সীমাবদ্ধ করা চাই। আমি খুব কম করিয়া বলিতেছি, সাত বছর। সে-পর্যন্ত শিশুর সজ্জায় কাজ নাই, লজ্জায় কাজ নাই। সে-পর্যন্ত বর্বরতার যে অত্যাবশ্যক শিক্ষা, তাহা প্রকৃতির হাতে সম্পন্ন হইতে দিতে হইবে। বালক তখন যদি পৃথিবী-মায়ের কোলে গড়াইয়া ধুলা মাটি না মাখিয়া লইতে পারে তবে কবে তাহার সে সৌভাগ্য হইবে? সে তখন যদি গাছে চড়িয়া ফল পাড়িতে না পায় তবে হতভাগা ভদ্রতার লোকলজ্জায় চিরজীবনের মতো গাছ-পালার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সখ্য-সাধনে বঞ্চিত হইবে। এই সময়টায় বাতাস আকাশ মাঠ গাছপালার দিকে তাহার শরীরমনের যে একটা স্বাভাবিক টান আছে, সব জায়গা হইতেই তার যে একটা নিমন্ত্রণ আসে, সেটাতে যদি কাপড়-চোপড় দরজা-দেয়ালের ব্যাঘাত স্থাপন করা যায় তবে ছেলেটার সমস্ত উদ্যম অবরুদ্ধ হইয়া তাহাকে ইঁচড়ে পাকায়। খোলা পাইলে যে উৎসাহ স্বাস্থ্যকর হইত বদ্ধ হইয়া তাহাই দূষিত হইতে থাকে।

ছেলেকে কাপড় পরাইলেই কাপড়ের জন্য তাহাকে সাবধানে রাখিতে হয়। ছেলেটার দাম আছে কি না সে কথা সব সময়ে মনে থাকে না, কিন্তু দর্জির হিসাব ভোলা শক্ত। এই কাপড় ছিঁড়িল, এই কাপড় ময়লা হইল, আহা সেদিন এত টাকা দিয়া এমন সুন্দর জামা করাইয়া দিলাম---লক্ষ্মীছাড়া কোথা হইতে তাহাতে কালী মাখাইয়া আনিল, এই বলিয়া যথোচিত চপেটাঘাত ও কান-মলার যোগে শিশুজীবনের সকল খেলা সকল আনন্দের চেয়ে কাপড়কে যে কী প্রকারে খাতির করিয়া চলিতে হয় শিশুকে তাহা শিখানো হইয়া থাকে। যে কাপড়ে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই সে কাপড়ের জন্য বেচারাকে এ বয়সে এমন করিয়া দায়ী করা কেন! বেচারাদের জন্য ঈশ্বর বাহিরে যে-কয়টা অবাধ সুখের আয়োজন এবং মনের মধ্যে অব্যাহত সুখসম্ভোগের ক্ষমতা দিয়াছিলেন অতি অকিঞ্চিৎকর পোশাকের মমতায় তাহার জীবনারম্ভের সেই সরল আনন্দের লীলাক্ষেত্রকে অকারণে এমন বিঘ্নসংকুল করিয়া তুলিবার কী প্রয়োজন ছিল! মানুষ কি সকল জায়গাতেই নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও তুচ্ছ প্রবৃত্তির শাসন বিস্তার করিয়া কোথাও স্বাভাবিক সুখশান্তির স্থান রাখিবে না! আমার ভালো লাগে, অতএব যেমন করিয়া হউক উহারও ভালো লাগা উচিত, এই জবরদস্তির যুক্তিতে কি জগতের চারি দিকে কেবলই দুঃখ বিস্তার করিতে হইবে!

যাই হউক, প্রকৃতির দ্বারা যেটুকু করিবার তাহা আমাদের দ্বারা কোনোমতেই হয় না, অতএব মানুষের সমস্ত ভালো কেবল আমরা বুদ্ধিমানেরাই করিব এমন পণ না করিয়া প্রকৃতিকেও খানিকটা পথ ছাড়িয়া দেওয়া চাই। সেইটে গোড়ায় হইলেই ভদ্রতার সঙ্গে কোনো বিরোধ বাধে না এবং ভিত্তি পাকা হয়। এই প্রাকৃতিক শিক্ষা যে কেবল ছেলেদের তাহা নহে, ইহাতে আমাদেরও উপকার আছে। আমরা নিজের হাতের কাজে সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়া সেইটেতেই আমাদের অভ্যাসকে এমন বিকৃত করি যে, স্বাভাবিককে আর কোনোমতেই সহজ দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। আমরা যদি মানুষের সুন্দর শরীরকে নির্মল বাল্য অবস্থাতেও উলঙ্গ দেখিতে সর্বদাই অভ্যস্ত না থাকি, তবে বিলাতের লোকের মতো শরীর সম্বন্ধে যে একটা বিকৃত সংস্কার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয় তাহা যথার্থই বর্বর এবং লজ্জার যোগ্য।

অবশ্য ভদ্রসমাজে কাপড়চোপড় জুতামোজার একটা প্রয়োজন আছে বলিয়াই ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু এই-সকল কৃত্রিম সহায়কে প্রভু করিয়া তুলিয়া তাহার কাছে নিজেকে কুণ্ঠিত করিয়া রাখা সংগত নয়। এই বিপরীত ব্যাপারে কখনোই ভালো ফল হইতে পারে না। অন্তত ভারতবর্ষের জলবায়ু এরূপ যে, আমাদের এই-সকল উপকরণের চিরদাস হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই; কোনো কালে আমরা ছিলামও না। আমরা প্রয়োজনমত কখনো বা বেশভূষা ব্যবহার করিয়াছি, কখনো বা তাহা খুলিয়াও রাখিয়াছি। বেশভূষা-জিনিসটা যে নৈমিত্তিক, ইহা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে মাত্র, এই প্রভুত্বটুকু আমাদের বরাবর ছিল। এইজন্য খোলা গায়ে আমরা লজ্জিত হইতাম না এবং অন্যকে দেখিলেও আমাদের রাগ হইত না। এ সম্বন্ধে বিধাতার প্রসাদে য়ুরোপীয়দের চেয়ে আমাদের বিশেষ সুবিধা ছিল। আমরা আবশ্যকমত লজ্জারক্ষাও করিয়াছি, অথচ অনাবশ্যক অতি-লজ্জার দ্বারা নিজেকে ভারগ্রস্ত করি নাই।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, অতিলজ্জা লজ্জাকে নষ্ট করে। কারণ, অতি-লজ্জাই বস্তুত লজ্জাজনক। তা ছাড়া, অতি'র বন্ধন মানুষ যখন একবার ছিঁড়িয়া ফেলে তখন তাহার আর বিচার থাকে না। আমাদের মেয়েরা গায়ে বেশি কাপড় দেয় না মানি, কিন্তু তাহারা কোনোক্রমেই ইচ্ছা করিয়া সচেষ্টভাবে বুকপিঠের আবরণের বারো-আনা বাদ দিয়া পুরুষসমাজে বাহির হইতে পারে না। আমরা লজ্জা করি না, কিন্তু লজ্জাকে এমন করিয়া আঘাতও করি না।

কিন্তু লজ্জাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে বসি নাই, অতএব ও কথা থাক্। আমার কথা এই, মানুষের সভ্যতা কৃত্রিমের সহায়তা লইতে বাধ্য, সেইজন্য এই কৃত্রিম যাহাতে অভ্যাসদোষে আমাদের কর্তা হইয়া না উঠে, যাহাতে আমরা নিজের গড়া সামগ্রীর চেয়ে সর্বদাই উপরে মাথা তুলিয়া থাকিতে পারি, এ দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার। আমাদের টাকা যখন আমাদিগকেই কিনিয়া বসে, আমাদের ভাষা যখন আমাদের ভাবের নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া মারে, আমাদের সাজ যখন আমাদের অঙ্গকে অনাবশ্যক করিবার জো করে, আমাদের নিত্য যখন নৈমিত্তিকের কাছে অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত হইয়া থাকে, তখন সভ্যতার সমস্ত বুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া এ কথা বলিতেই হইবে : এটা ঠিক হইতেছে না। ভারত-বাসীর খালি গা কিছুমাত্র লজ্জার নহে; যে সভ্যব্যক্তির চোখে ইহা অসহ্য সে আপনার চোখের মাথা খাইয়া বসিয়াছে।

শরীর সম্বন্ধে কাপড় জুতা মোজা যেমন আমাদের মন সম্বন্ধে বই জিনিসটা

ঠিক তেমনি হইয়া উঠিয়াছে। বই-পড়াটা যে শিক্ষার একটা সুবিধাজনক সহায়মাত্র তাহা আর আমাদের মনে হয় না, আমরা বই-পড়াটাকেই শিক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ঠিক করিয়া বসিয়া আছি। এ সম্বন্ধে আমাদের সংস্কারকে নড়ানো বড়োই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

মাস্টার বই হাতে করিয়া শিশুকাল হইতেই আমাদিগকে বই মুখস্থ করাইতে থাকেন। কিন্তু বইয়ের ভিতর হইতে জ্ঞানসঞ্চয় করা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। প্রত্যক্ষ জিনিসকে দেখিয়া-শুনিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গেই অতি সহজেই আমাদের মননশক্তির চর্চা হওয়া স্বভাবের বিধান ছিল। অন্যের অভিজ্ঞাত ও পরীক্ষিত জ্ঞান, তাও লোকের মুখ হইতে শুনিলে তবে আমাদের সমস্ত মন সহজে সাড়া দেয়। কারণ, মুখের কথা তো শুধু কথা নহে, তাহা মুখের কথা; তাহার সঙ্গে প্রাণ আছে। চোখমুখের ভঙ্গি, কণ্ঠের স্বরলীলা, হাতের ইঙ্গিত—ইহার দ্বারা কানে শুনিবার ভাষা, সংগীত ও আকার লাভ করিয়া, চোখ কান দুয়েরই সামগ্রী হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, আমরা যদি জানি, মানুষ তাহার মনের সামগ্রী সদ্য মন হইতে আমাদিগকে দিতেছে, সে একটা বই পড়িয়া মাত্র যাইতেছে না, তাহা হইলে মনের সঙ্গে মনের প্রত্যক্ষ সম্মিলনে জ্ঞানের মধ্যে রসের সঞ্চার হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মাস্টাররা বই পড়াইবার একটা উপলক্ষমাত্র; আমরাও বই পড়িবার একটা উপসর্গ। ইহাতে ফল হইয়াছে এই, আমাদের শরীর যেমন কৃত্রিম জিনিসের আড়ালে পড়িয়া পৃথিবীর সঙ্গে গায়ে গায়ে যোগটা হারাইয়াছে এবং হারাইয়া এমন অভ্যস্ত হইয়াছে যে সে যোগটাকে আজ ক্লেশকর লজ্জাকর বলিয়া মনে করে, তেমনি আমাদের মন এবং বাহিরের মাঝখানে বই আসিয়া পড়াতে আমাদের মন জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের স্বাদশক্তি অনেকটা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সব জিনিসকে বইয়ের ভিতর দিয়া জানিবার একটা অস্বাভাবিক অভ্যাস আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেছে। পাশেই যে জিনিসটা আছে সেইটেকেই জানিবার জন্য বইয়ের মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয়। নবাবের গল্প শুনিয়াছি—জুতাটা ফিরাইয়া দিবার জন্য চাকরের অপেক্ষা করিয়া শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছিল। বই-পড়া বিদ্যার গতিকে আমাদেরও মানসিক নবাবি তেমনি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। তুচ্ছ বিষয়টুকুর জন্যও বই নহিলে মন আশ্রয় পায় না। বিকৃত সংস্কারের দোষে এইরূপ নবাবিয়ানা আমাদের কাছে লজ্জাকর না হইয়া গৌরবজনক হইয়া উঠে এবং বইয়ের ভিতর দিয়া জানাকেই আমরা পাণ্ডিত্য বলিয়া গর্ব করি। জগৎকে আমরা মন দিয়া ছুঁই না বই দিয়া ছুঁই।

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়। বাবু-নামক জীব চাকর-বাকর জিনিসপত্রের সুবিধার অধীন। নিজের চেষ্টাপ্রয়োগে যেটুকু কষ্ট, যেটুকু কাঠিন্য আছে, সেইটুকুতেই যে আমাদের সুখ সত্য হয়, আমাদের লাভ মূল্যবান হইয়া উঠে, বাবু তাহা বোঝে না। বই-পড়া বাবুয়ানাতেও জ্ঞানকে নিজে পাওয়ার যে একটা আনন্দ, সত্যকে তাহার যথাস্থানে কঠিন প্রেমাভিসারের দ্বারা লাভ করার যে একটা সার্থকতা, তাহা থাকে না। ক্রমে মনের সেই স্বাভাবিক স্বাধীনশক্তিটাই মরিয়া যায়; সুতরাং সেই শক্তিচালনার সুখটাও থাকে না, বরঞ্চ চালনা করিতে বাধ্য হইলে তাহা কষ্টের কারণ হইয়া উঠে।

এইরূপে বই-পড়ার আবরণে মন শিশুকাল হইতে আপাদমস্তক আবৃত হওয়াতে আমরা মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করিবার শক্তি হারাইতেছি। আমাদের কাপড়-পরা শরীরের যেমন একটা সংকোচ জন্মিয়াছে আমাদের মনেরও তেমনি ঘটিয়াছে; সে বাহিরে আসিতেই চায় না। লোকজনদের সহজে আদর-অভ্যর্থনা করা, তাহাদের সঙ্গে আপন-ভাবে মিলিয়া কথাবার্তা কওয়া, আমাদের শিক্ষিত লোকদের পক্ষে ক্রমশই কঠিন হইয়া উঠিতেছে তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। আমরা বইয়ের লোককে চিনি, পৃথিবীর লোককে চিনি না; বইয়ের লোক আমাদের পক্ষে মনোহর, পৃথিবীর লোক শ্রান্তিকর। আমরা বিরাট সভায় বক্তৃতা করিতে পারি, কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে পারি না। যখন আমরা বড়ো কথা, বইয়ের কথা লইয়া আলোচনা করিতে পারি, কিন্তু সহজ আলাপ, সামান্য কথা আমাদের মুখ দিয়া ঠিকমত বাহির হইতে চায় না, তখন বুঝিতে হইবে, দৈবদুর্যোগে আমরা পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি, কিন্তু আমাদের মানুষটি মারা গেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষভাবে আমাদের অবারিত গতিবিধি থাকিলে ঘরের বার্তা, সুখদুঃখের কথা, ছেলেপুলের খবর, প্রতিদিনের আলোচনা, আমাদের পক্ষে সহজ ও সুখকর হয়। বইয়ের মানুষ তৈরি-করা কথা বলে, তাহারা যে-সকল কথায় হাসে তাহা প্রকৃতপক্ষেই হাস্যরসাত্মক, তাহারা যাহাতে কাঁদে তাহা করুণ-রসের সার। কিন্তু সত্যকার মানুষ-যে রক্তমাংসের প্রত্যক্ষগোচর মানুষ, সেইখানেই যে তাহার মস্ত জিত; এইজন্য তাহার কথা, তাহার হাসিকান্না অত্যন্ত পয়লা নম্বরের না হইলেও চলে। বস্তুত সে স্বভাবত যাহা তাহার চেয়ে বেশি হইবার আয়োজন না করিলেই সুখের বিষয় হয়। মানুষ বই হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে মানুষের স্বাদ নষ্ট হইয়া যায়।

চাণক্য বুঝি বলিয়া গেছেন, বিদ্যা যাহাদের নাই তাহারা 'সভামধ্যে ন শোভন্তে'। কিন্তু সভা তো চিরকাল চলে না। এক সময়ে তো সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া আলো নিবাইয়া দিতেই হয়। মুশকিল এই যে, আমাদের দেশের এখনকার বিদ্বানরা সভার বাহিরে 'ন শোভন্তে'; তাঁহারা বই পড়ার মধ্যে মানুষ, তাই মানুষের মধ্যে তাঁহাদের কোনো সোয়াস্তি নাই।

এরূপ অবস্থার স্বাভাবিক পরিণাম নিরানন্দ। একটা সৃষ্টিছাড়া মানসিক ব্যাধি য়ুরোপের সাহিত্যে সমাজে সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছে; তাহাকে সে দেশের লোকে বলে world-weariness। লোকের স্নায়ু বিকল হইয়া গেছে, জীবনের স্বাদ চলিয়া গেছে, নব নব উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া নিজেকে ভুলাইবার চেষ্টা চলিতেছে। এই অসুখ, এই বিকলতা যে কিসের জন্য কিছুই বুঝিবার জো নাই। এই অবসাদ মেয়ে পুরুষ উভয়কেই পাইয়া বসিয়াছে।

স্বভাব হইতে ক্রমশই অনেক দূরে চলিয়া যাওয়া ইহার কারণ। কৃত্রিম সুবিধা উত্তরোত্তর আকাশপ্রমাণ হইয়া জগতের জীবকে জগৎছাড়া করিয়া দিয়াছে। পুঁথির মধ্যে মন, আসবাবের মধ্যে শরীর প্রচ্ছন্ন হইয়া আত্মার সমস্ত দরজা-জানালাগুলাকে অবরুদ্ধ করিয়াছে। যাহা সহজ, যাহা নিত্য, যাহা মূল্যহীন বলিয়াই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান, তাহার সঙ্গে আনাগোনা বন্ধ হওয়াতে তাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা চলিয়া গেছে। যে-সকল জিনিস উত্তেজনার নব নব তাড়নায় উদ্ভাবিত হইয়া দুই-চারিদিন ফ্যাশানের আবর্তে আবিল হইয়া উঠে এবং তাহার পরেই অনাদরে আবর্জনার মধ্যে জমা হইয়া সমাজের বাতাসকে দূষিত করে তাহাই কেবল পুনঃপুনঃ লক্ষ লক্ষ গুণী ও মজুরের চেষ্টাকে সমস্ত সমাজ জুড়িয়া ঘানির বলদের মতো ঘুরাইয়া মারিতেছে।

এক বই হইতে আর-এক বই উৎপন্ন হইতেছে, এক কাব্যগ্রন্থ হইতে আর-এক কাব্যগ্রন্থের জন্ম, একজনের মত মুখে-মুখে সহস্র লোকের মত হইয়া দাঁড়াইতেছে, অনুকরণ হইতে অনুকরণের প্রবাহ চলিয়াছে—এমনি করিয়া পুঁথি ও কথার অরণ্য মানুষের চার দিকে নিবিড় হইয়া উঠিতেছে। প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ ক্রমশই দূরে চলিয়া যাইতেছে। মানুষের অনেকগুলি মনের ভাব উৎপন্ন হইতেছে যাহা কেবল পুঁথির সৃষ্টি। এই-সকল বাস্তবতাবর্জিত ভাবগুলা ভূতের মতো মানুষকে পাইয়া বসে, তাহার মনের স্বাস্থ্য নষ্ট করে, তাহাকে অত্যুক্তি এবং আতিশয্যের দিকে লইয়া যায়, সকলে মিলিয়া ক্রমাগতই একই ধুয়া ধরিয়া কৃত্রিম উৎসাহের দ্বারা সত্যের পরিমাণ নষ্ট করিয়া তাহাকে মিথ্যা করিয়া তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতে পারি প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌-নামক পদার্থ, ইহার মধ্যে যেটুকু সত্য ছিল প্রতিদিন সকলে পড়িয়া সেটাকে তুলা ধুনিয়া একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা করিয়া তুলিয়াছে; এখন এই তৈরি বুলিটাকে প্রাণপণ চেষ্টায় সত্য করিয়া তুলিবার জন্য কত কৃত্রিম উপায়, কত অলীক উদ্দীপনা, কত অন্যায় শিক্ষা, কত গড়িয়া-তোলা বিদ্বেষ, কত কূট যুক্তি, কত ধর্মের ভান সৃষ্ট হইতেছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। এই-সকল স্বভাবভ্রষ্ট কুহেলিকার মধ্যে মানুষ বিভ্রান্ত হয়; সরল ও উদার, প্রশান্ত ও সুন্দর হইতে সে কেবল দূরে চলিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু বুলির মোহ ভাঙানো বড়ো শক্ত। বস্তুকে আক্রমণ করিয়া ভূমিসাৎ করা যায়, বুলির গায়ে ছুরি বসে না। এইজন্য বুলি লইয়া মানুষে মানুষে যত ঝগড়া, যত রক্তপাত হইয়াছে, এমন তো বিষয় লইয়া হয় নাই।

সমাজের সরল অবস্থায় দেখিতে পাই, লোকে যেটুকু জানে তাহা মানে। সেটুকুর প্রতি তাহাদের নিষ্ঠা অটল; তাহার জন্য ত্যাগস্বীকার, কষ্টস্বীকার তাহাদের পক্ষে সহজ। ইহার কতকগুলি কারণ আছে, কিন্তু একটি প্রধান কারণ, তাহাদের হৃদয় মন মতের দ্বারা আবৃত হইয়া যায় নাই; যতটুকু সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার অধিকার ও শক্তি তাহাদের আছে ততটুকুই তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। মন যাহা সত্যরূপে গ্রহণ করে, হৃদয় তাহার জন্য অনেক ক্লেশ অনায়াসেই সহিতে পারে; সেটাকে সে বাহাদুরি বলিয়া মনেই করে না।

সভ্যতার জটিল অবস্থায় দেখা যায়, মতের বহুতর স্তর জমিয়া গেছে। কোনোটা চার্চের মত, চর্চার মত নহে; কোনোটা সভার মত, ঘরের মত নহে; কোনোটা দলের মত, অন্তরের মত নহে; কোনো মতে চোখ দিয়া জল বাহির হয়, পকেট হইতে টাকা বাহির হয় না; কোনো মতে টাকাও বাহির হয়, কাজও চলে, কিন্তু হৃদয়ে তাহার স্থান নাই, ফ্যাশানে তাহার প্রতিষ্ঠা। এই-সকল অবিশ্রাম-উৎপন্ন ভূরি ভূরি সত্যবিকারের মাঝখানে পড়িয়া মানুষের মন সত্য মতকেও অবিচলিতসত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য তাহার আচরণ সর্বত্র সর্বতোভাবে সত্য হইতে পারে না। সে সরলভাবে আপন শক্তি ও প্রকৃতি-অনুযায়ী কোনো পন্থা নির্বাচন করিবার অবকাশ না পাইয়া বিভ্রান্তভাবে দশের কথার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে; অবশেষে কাজের বেলায় তাহার প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ বাধিয়া যায়। সে যদি নিজের স্বভাবকে নিজে পাইত তবে সেই স্বভাবের ভিতর দিয়া যাহা-কিছু পাইত তাহা ছোটো হউক বড়ো হউক খাঁটি জিনিস হইত। তাহা তাহাকে সম্পূর্ণ বল দিত, সম্পূর্ণ আশ্রয় দিত; সে তাহাকে সর্বতোভাবে কাজে না খাটাইয়া থাকিতে পারিত না। এখন তাহাকে গোলেমালে পড়িয়া পুঁথির মত, মুখের মত, সভার মত, দলের মত লইয়া ধ্রুবলক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া

কেবল বিস্তর কথা আওড়াইয়া বেড়াইতে হয়। সেই কথা আওড়াইয়া বেড়ানোকে সে হিতকর্ম বলিয়া মনে করে। সেজন্য সে বেতন পায়; তাহা বেচিয়া সে লাভ করে। এই-সকল কথার একটুখানি এ দিক-ও দিক লইয়া সে অন্য সম্প্রদায় অন্য জাতিকে হেয় এবং নিজের জাতি ও দলকে শ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রচার করে।

মানুষের মনের চারি দিকে এই-যে অতিনিবিড় পুঁথির অরণ্যে বুলির বোল ধরিয়াছে ইহার মোদো গন্ধে আমাদিগকে মাতাল করিতেছে; শাখা হইতে শাখান্তরে কেবলই চঞ্চল করিয়া মারিতেছে; কিন্তু যথার্থ আনন্দ, গভীর তৃপ্তি দিতেছে না। নানাপ্রকার বিদ্রোহ ও মনোবিকার উৎপন্ন করিতেছে।

সহজ জিনিসের গুণ এই যে, তাহার স্বাদ কখনোই পুরাতন হয় না, তাহার সরলতা তাহাকে চিরদিন নবীন করিয়া রাখে। যাহা যথার্থ স্বভাবের কথা তাহা মানুষ যতবার বলিয়াছে ততবারই নূতন লাগিয়াছে। পৃথিবীতে গুটিদুইতিন মহাকাব্য আছে যাহা সহস্রবৎসরেও ম্লান হয় নাই; নির্মল জলের মতো তাহা আমাদের পিপাসা হরণ করিয়া তৃপ্তি দেয়, মদের মতো তাহা আমাদিগকে উত্তেজনার ডগার উপরে তুলিয়া শুষ্ক অবসাদের মধ্যে আছাড় মারিয়া ফেলে না। সহজ হইতে দূরে আসিলেই একবার উত্তেজনা ও একবার অবসাদের মধ্যে কেবলই ঢেঁকি-কোটা হইতে হয়। উপকরণবহুল অতি-সভ্যতার ইহাই ব্যাধি।

এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ বাহির করিয়া, এই রাশীকৃত পুঁথি ও বচনের আবরণ ভেদ করিয়া, সমাজের মধ্যে, মানুষের মনের মধ্যে, স্বভাবের বাতাস ও আলোক আনিবার জন্য মহাপুরুষ এবং হয়তো মহাবিপ্লবের প্রয়োজন হইবে। অত্যন্ত সহজ কথা, অত্যন্ত সরল সত্যকে হয়তো রক্তসমুদ্র পাড়ি দিয়া আসিতে হইবে। যাহা আকাশের মতো ব্যাপক, যাহা বাতাসের মতো মূল্যহীন, তাহাকে কিনিয়া, উপার্জন করিয়া লইতে হয়তো প্রাণ দিতে হইবে। য়ুরোপের মনোরাজ্যে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের অশান্তি মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখা দিতেছে; স্বভাবের সঙ্গে জীবনের, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির প্রকাণ্ড অসামঞ্জস্যই ইহার কারণ।

কিন্তু য়ুরোপের এই বিকৃতি কেবল অনুকরণের দ্বারা, কেবল ছোঁয়াচ লাগিয়া আমরা পাইতেছি। ইহা আমাদের দেশজ নহে। আমরা শিশুকাল হইতে বিলাতি বই মুখস্থ করিতে লাগিয়া গেছি, যাহা আবর্জনা তাহাও লাভ মনে করিয়া লইতেছি। আমরা যে-সকল বিদেশী বুলি সর্বদাই অসন্দিগ্ধমনে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া চলিতেছি, জানি না, তাহার প্রত্যেকটিকে অবিশ্বাসের সহিত আদিসত্যের নিকষপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিয়া লওয়া চাই; তাহার বারো-আনা কেবল পুঁথির সৃষ্টি, কেবল তাহারা মুখে-মুখেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, দশ জনে পরস্পরের অনুকরণ করিয়া বলিতেছে বলিয়া আর-দশ জনে তাহাকে ধ্রুবসত্য বলিয়া গণ্য করিতেছে। আমরাও সেই-সকল বাঁধিগৎ এমন করিয়া ব্যবহার করিতেছি যেন তাহার সত্য আমরা আবিষ্কার করিয়াছি, যেন তাহা বিদেশী ইস্কুল-মাস্টারের আবৃত্তির জড় প্রতিধ্বনিমাত্র নহে।

আবার, যাহারা নূতন পড়া আওড়াইতেছে তাহাদের উৎসাহ কিছু বেশি হইয়া থাকে। সুশিক্ষিত টিয়াপাখি যত উচ্চস্বরে কানে তালা ধরায় তাহার শিক্ষকের গলা তত চড়া নয়। শুনা যায়, যে-সব জাতির মধ্যে বিলাতি সভ্যতা নূতন প্রবেশ করে তাহারা বিলাতের মদ ধরিয়া একেবারে মারা পড়িবার জো হয়, অথচ যাহাদের অনুকরণে তাহারা মদ ধরে তাহারা মদে এত বেশি অভিভূত হয় না। তেমনি দেখা যায়, যে-সকল কথার মোহে কথার সৃষ্টিকর্তারা অনেকটা পরিমাণে অবিচলিত

থাকে, আমরা তাহাতে একেবারে ধরাশায়ী হইয়া যাই। সেদিন কাগজে দেখিলাম, বিলাতের কোন্-এক সভায় আমাদের দেশী লোকেরা একজনের পর আর একজন উঠিয়া ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার অভাব ও সেই অভাবপূরণ সম্বন্ধে অতি পুরাতন বিলাতি বুলি দাঁড়ের পাখির মতো আওড়াইয়া গেলেন; শেষকালে একজন ইংরেজ উঠিয়া ভারতবর্ষের মেয়েদের ইংরেজি কায়দায় শেখানোই যে একমাত্র 'শিক্ষা' নামের যোগ্য এবং সেই শিক্ষাই আমাদের স্ত্রীলোকের পক্ষে যে একমাত্র শ্রেয় সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। আমি দুই পক্ষের তর্কের সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে কোনো কথা তুলিতেছি না। কিন্তু, বিলাতে প্রচলিত দস্তুর ও মত যে গন্ধমাদনের মতো আদ্যোপান্ত উৎপাটন করিয়া আনিবার যোগ্য এ সম্বন্ধে আমাদের মনে বিচারমাত্র উপস্থিত হয় না, তাহার কারণ, ছেলেবেলা হইতে এ-সব কথা আমরা পুঁথি হইতেই শিখিয়াছি এবং আমাদের যাহা-কিছু শিক্ষা সমস্তই পুঁথির শিক্ষা।

বুলি ও পুঁথির বিবরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের দেশেও শিক্ষিত লোকের মধ্যে নিরানন্দ দেখা দিয়াছে। কোথায় হৃদ্যতা, কোথায় মেলা-মেশা, কোথায় সহজ হাস্যকৌতুক! জীবনযাত্রার ভার বাড়িয়া গেছে বলিয়াই যে এতটা অবসন্নতা তাহা নহে। সে একটা কারণ বটে সন্দেহ নাই, আমাদের সহিত সর্বপ্রকার সামাজিক যোগ-বিহীন আত্মীয়তাশূন্য রাজশক্তির অহরহ অলক্ষ্য চাপও আর একটা কারণ; কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত কৃত্রিম লেখাপড়ার তাড়নাও কম কারণ নহে। নিতান্ত শিশুকাল হইতে তাহার পেষণ আরম্ভ হয়; এই জ্ঞানলাভের সঙ্গে মনের সঙ্গে যোগ অতি অল্প। এ জ্ঞান আনন্দের জন্যও নহে, এ কেবল প্রাণের দায়ে এবং কতকটা মানের দায়েও বটে।

আমরা মন খাটাইয়া সজীবভাবে যে জ্ঞান উপার্জন করি তাহা আমাদের মজ্জার সঙ্গে মিশিয়া যায়; বই মুখস্থ করিয়া যাহা পাই তাহা বাহিরে জড়ো হইয়া সকলের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। তাহাকে আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারি না বলিয়া অহংকার বাড়িয়া উঠে; সেই অহংকারের যেটুকু সুখ সেই আমাদের একমাত্র সম্বল। নহিলে জ্ঞানের স্বাভাবিক আনন্দ আমরা যদি লাভ করিতাম তবে এতগুলি শিক্ষিত লোকের মধ্যে অন্তত গুটিকয়েককেও দেখিতে পাইতাম যাঁহারা জ্ঞানচর্চার জন্য নিজের সমস্ত স্বার্থকে খর্ব করিয়াছেন। কিন্তু দেখিতে পাই, সায়ান্সের পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া সমস্ত বিদ্যা আইন-আদালতের অতলস্পর্শ নিরর্থকতার মধ্যে চিরদিনের মতো বিসর্জন করিতে সকলে ব্যগ্র, এবং কতকগুলা পাস করিয়া কেবল হতভাগা কন্যার পিতাকে ঋণের পঙ্কে ডুবাইয়া মারাই তাঁহাদের একমাত্র স্থায়ী কীর্তি হইয়া থাকে। দেশে বড়ো বড়ো শিক্ষিত উকিল জজ কেরানির অভাব নাই, কিন্তু জ্ঞানতপস্বী কোথায়? ✔

কথায় কথায় কথা অনেক বাড়িয়া গেল। উপস্থিতমত আমার যেটুকু বক্তব্য সে এই, বই পড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধসংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতেই যে বইয়ের সঞ্চয় আহরিত হইয়াছে, অন্তত হওয়া উচিত, এবং সেখানে যে আমাদেরও অধিকার আছে, এ কথা পদে পদে জানানো চাই। বইয়ের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেশি হইয়াছে বলিয়াই বেশি করিয়া জানানো চাই। এ দেশে অতি পুরাকালে, যখন লিপি প্রচলিত ছিল, তখনো তপোবনে পুঁথি ব্যবহার হয় নাই। তখনো গুরু শিষ্যকে মুখে-মুখেই শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্র তাহা খাতায় নহে, মনের মধ্যেই লিখিয়া লইত। এমনি করিয়া এক দীপশিখা হইতে আর-এক দীপশিখা জ্বলিত। এখন ঠিক এমনটি হইতে

পারে না। কিন্তু যথাসম্ভব ছাত্রদিগকে পুঁথির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পারতপক্ষে ছাত্রদিগকে পরের রচনা পড়িতে দেওয়া নহে, তাহারা গুরুর কাছে যাহা শিখিবে তাহাদের নিজেকে দিয়া তাহাই রচনা করাইয়া লইতে হইবে; এই স্বরচিত গ্রন্থই তাহাদের গ্রন্থ। এমন হইলে তাহারা মনেও করিবে না, গ্রন্থগুলা আকাশ হইতে পড়া বেদবাক্য। 'আর্যরা মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছেন', 'খৃস্ট-জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বে বেদরচনা হইয়াছে', এ-সকল কথা আমরা বই হইতে পড়িয়াছি। বইয়ের অক্ষরগুলো কাটকুট-হীন নির্বিকার, তাহারা শিশুবয়সে আমাদের উপরে সম্মোহন প্রয়োগ করে; তাই আমাদের কাছে আজ এ-সমস্ত কথা একেবারে দৈববাণীর মতো। ছেলেদের প্রথম হইতেই জানিতে হইবে, এই-সকল আনুমানিক কথা কতকগুলা যুক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। সেই-সকল যুক্তির মূল উপকরণগুলি যথাসম্ভব তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া তাহাদের নিজেদের অনুমান-শক্তির উদ্রেক করিতে হইবে। বইগুলা যে কী করিয়া তৈরি হইতে থাকে তাহা প্রথম হইতেই অল্পে-অল্পে ক্রমে-ক্রমে তাহারা নিজেদের মনের মধ্যে অনুভব করিতে থাকুক; তাহা হইলেই বইয়ের যথার্থ ফল তাহারা পাইবে, অথচ তাহার অন্ধ শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে এবং নিজের স্বাধীন উদ্যমের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিবার যে স্বাভাবিক মানসিক শক্তি তাহা ঘাড়ের-উপরে-বাহির-হইতে-বোঝা-চাপানো বিদ্যার দ্বারায় আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইবে না, বইগুলোর উপরে মনের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বালক অল্পমাত্রও যেটুকু শিখিবে তখনই তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে, তাহা হইলে শিক্ষা তাহার উপরে চাপিয়া বসিবে না; শিক্ষার উপরে সেই চাপিয়া বসিবে। এ কথায় সায় দিয়া যাইতে অনেকে দ্বিধা করেন না, কিন্তু কাজে লাগাইবার বেলা আপত্তি করেন। তাঁহারা মনে করেন, বালকদিগকে এমন করিয়া শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। তাঁহারা যাহাকে শিক্ষা বলেন তাহা এমন করিয়া দেওয়া অসম্ভব বটে। তাঁহারা কতকগুলা বই ও কতকগুলা বিষয় বাঁধিয়া দেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে তাহার পরীক্ষা লওয়া হয়—ইহাকেই তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া বলেন এবং যেখানে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাকেই বিদ্যালয় বলা হয়। বিদ্যা জিনিসটা যেন একটা স্বতন্ত্র পদার্থ, শিশুর মন হইতে সেটাকে যেন তফাত করিয়া দেখিতে হয়; সেটা যেন বইয়ের পাতা এবং অক্ষরের সংখ্যা; তাহাতে ছাত্রের মন যদি পিষিয়া যায়, সে যদি পুঁথির গোলাম হয়, তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি যদি অভিভূত হইয়া পড়ে—সে যদি নিজের প্রাকৃতিক ক্ষমতাগুলি চালনা করিয়া জ্ঞান অধিকার করিবার শক্তি অনভ্যাস ও উৎপীড়ন-বশত চিরকালের মতো হারায়—তবু ইহা বিদ্যা, কারণ, ইহা এতটুকু ইতিহাসের অংশ, এতগুলি ভূগোলের পাতা, এতক'টা অঙ্ক এবং এতটা পরিমাণ বি-এল-এ ব্লে, সি-এল-এ ক্লে! শিশুর মন যতটুকু শিক্ষার উপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারে অল্প হইলেও সেইটুকু শিক্ষাই শিক্ষা; আর যাহা শিক্ষা নাম ধরিয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় তাহাকে পড়ানো বলিতে পার, কিন্তু তাহা শেখানো নহে। মানুষের 'পরে মানুষ অনেক অত্যাচার করিবে জানিয়াই বিধাতা তাহাকে শক্ত করিয়া গড়িয়াছেন; সেইজন্য গুরুপাক অখাদ্য খাইয়া অজীর্ণে ভুগিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকে এবং শিশুকাল হইতে শিক্ষার দুর্বিষহ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও সে খানিকটা পরিমাণে বিদ্যালাভও করে ও তাহা লইয়া গর্বও করিতে পারে। এই তাড়নায় ও পীড়নে তাহাকে যে কতটা লোকসান দিতে হয়, কী বিপুল মূল্য দিয়া সে যে কত অল্পই ঘরে আনিতে পায়, তাহা কেহ বা বুঝেন

না; কেহ বা বুঝেন, স্বীকার করেন না; কেহ বা বুঝেন ও স্বীকার করেন, কিন্তু কাজের বেলায় যেমন চলিয়া আসিতেছে তাহাই চালাইতে থাকেন।

ভাদ্র ১৩১৩

তপোবন

আধুনিক সভ্যতালক্ষ্মী যে পদ্মের উপর বাস করেন সেটি ইঁট-কাঠে তৈরি, সেটি শহর। উন্নতির সূর্য যতই মধ্যগগনে উঠছে ততই তার দলগুলি একটি একটি করে খুলে গিয়ে ক্রমশই চার দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। চুন-সুরকির জয়যাত্রাকে বসুন্ধরা কোথাও ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না।

এই শহরেই মানুষ বিদ্যা শিখছে, বিদ্যা প্রয়োগ করছে, ধন জমাচ্ছে, ধন খরচ করছে, নিজেকে নানা দিক থেকে শক্তি ও সম্পদে পূর্ণ করে তুলছে। এই সভ্যতায় সকলের চেয়ে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ তা নগরের সামগ্রী।

বস্তুত, এ ছাড়া অন্যরকম কল্পনা করা শক্ত। যেখানে অনেক মানুষের সম্মিলন সেখানে বিচিত্র বুদ্ধির সংঘাতে চিত্ত জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং চার দিক থেকে ধাক্কা খেয়ে প্রত্যেকের শক্তি গতি প্রাপ্ত হয়। এমনি করে চিত্তসমুদ্রের মন্থন হতে থাকলে মানুষের নিগূঢ় সারপদার্থসকল আপনিই ভেসে উঠতে থাকে।

তার পরে মানুষের শক্তি যখন জেগে ওঠে তখন সে সহজেই এমন ক্ষেত্র চায় যেখানে আপনাকে ফলাও রকম করে প্রয়োগ করতে পারে। সে ক্ষেত্র কোথায়? যেখানে অনেক মানুষের অনেকপ্রকার উদ্যম নানা সৃষ্টিকার্যে সর্বদাই সচেষ্ট হয়ে রয়েছে। সেই ক্ষেত্রই হচ্ছে শহর।

গোড়ায় মানুষ যখন খুব ভিড় করে এক জায়গায় শহর সৃষ্টি করে বসে তখন সেটা সভ্যতার আকর্ষণে নয়। অধিকাংশ স্থলেই শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্ম-রক্ষার জন্যে কোনো সুরক্ষিত সুবিধার জায়গায় মানুষ একত্র হয়ে থাকবার প্রয়োজন অনুভব করে। কিন্তু যে কারণেই হোক, অনেকে একত্র হবার একটা উপলক্ষ ঘটলেই সেখানে নানা লোকের প্রয়োজন এবং বুদ্ধি একটা কলেবরবদ্ধ আকার ধারণ করে, এবং সেইখানেই সভ্যতার অভিব্যক্তি আপনি ঘটতে থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা নদীসরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল; ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয় নি, বরঞ্চ তার চেতনাকে আরো উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। এরকম ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটেছে বলে দেখা যায় না।

আমরা এই দেখেছি, যে-সব মানুষ অবস্থাগতিকে বনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তারা বুনো হয়ে ওঠে। হয় তারা বাঘের মতো হিংস্র হয়, নয় তারা হরিণের মতো নির্বোধ হয়।

কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই অরণ্যের নির্জনতা মানুষের বুদ্ধিকে

অভিভূত করে নি, বরঞ্চ তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে সেই অরণ্যবাস-নিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে, এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় নি।

এই রকমে আরণ্যকদের সাধনা থেকে ভারতবর্ষ সভ্যতার যে প্রৈতি (energy) লাভ করেছিল সেটা নাকি বাইরের সংঘাত থেকে ঘটে নি, নানা প্রয়োজনের প্রতিযোগিতা থেকে জাগে নি, এইজন্যে সেই শক্তিটা প্রধানত বহিরভিমুখী হয় নি। সে ধ্যানের দ্বারা বিশ্বের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে, নিখিলের সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন করেছে। সেইজন্যে ঐশ্বর্যের উপকরণেই প্রধানভাবে ভারতবর্ষ আপনার সভ্যতার পরিচয় দেয় নি। এই সভ্যতার যাঁরা কাণ্ডারী তাঁরা নির্জনবাসী, তাঁরা বিরলবসন তপস্বী।

সমুদ্রতীর যে জাতিকে পালন করেছে তাকে বাণিজ্যসম্পদ দিয়েছে, মরুভূমি যাদের অল্পস্তন্যদানে ক্ষুধিত করে রেখেছে তারা দিগ্‌বিজয়ী হয়েছে— এমনি করে এক-একটি বিশেষ সুযোগে মানুষের শক্তি এক-একটি বিশেষ পথ পেয়েছে।

সমতল আর্যাবর্তের অরণ্যভূমিও ভারতবর্ষকে একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছিল। ভারতবর্ষের বুদ্ধিকে সে জগতের অন্তরতম রহস্যালোক-আবিষ্কারে প্রেরণ করেছিল। সেই মহাসমুদ্রতীরের নানা সুদূর দ্বীপ দ্বীপান্তর থেকে সে যে-সমস্ত সম্পদ আহরণ করে এনেছিল সমস্ত মানুষকেই দিনে দিনে তার প্রয়োজন স্বীকার করতেই হবে। যে ওষধি-বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাত্রে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং প্রাণের লীলা নানা অপরূপ ভঙ্গীতে ধ্বনিতে ও রূপবৈচিত্র্যে নিরন্তর নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তারই মাঝখানে ধ্যানপরায়ণ চিত্ত নিয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজের চারি দিকেই একটি আনন্দময় রহস্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্যে তাঁরা এত সহজে বলতে পেরেছিলেন: যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। এই যা-কিছু সমস্তই পরমপ্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। তাঁরা স্বরচিত ইঁট কাঠ লোহার কঠিন খাঁচার মধ্যে ছিলেন না, তাঁরা যেখানে বাস করতেন সেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাঁদের জীবনের অবারিত যোগ ছিল। এই বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফল ফুল দিয়েছে, কুশ সমিধ্ জুগিয়েছে; তাঁদের প্রতি দিনের সমস্ত কর্ম অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদানপ্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারি দিকের একটি বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেরেছিলেন। চতুর্দিককে তাঁরা শূন্য বলে, নির্জীব বলে, পৃথক্ বলে জানতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক বাতাস অন্নজল প্রভৃতি যে-সমস্ত দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শূন্য আকাশের নয়, একটি চেতনাময় অনন্ত আনন্দের মধ্যেই তার মূল প্রস্রবণ, এইটি তাঁরা একটি সহজ অনুভবের দ্বারা জানতে পেরে-ছিলেন; সেইজন্যেই নিশ্বাস আলো অন্নজল সমস্তই তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে, ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্যই নিখিলচরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।

এর থেকেই বোঝা যাবে, বন ভারতবর্ষের চিত্তকে নিজের নিভৃত ছায়ার মধ্যে, নিগূঢ় প্রাণের মধ্যে, কেমন করে পালন করেছে। ভারতবর্ষে যে দুই বড়ো বড়ো প্রাচীন যুগ চলে গেছে, বৈদিক যুগ ও বৌদ্ধ যুগ, সে দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে

ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান্ বুদ্ধও কত আম্রবন কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন; রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলায় নি, বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল।

ক্রমশ ভারতবর্ষে রাজ্য-সাম্রাজ্য নগর-নগরী স্থাপিত হয়েছে; দেশবিদেশের সঙ্গে তার পণ্য-আদান-প্রদান চলেছে; অন্নলোলুপ কৃষিক্ষেত্র অল্পে অল্পে ছায়া-নিভৃত অরণ্যগুলিকে দূরে হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই প্রতাপশালী ঐশ্বর্যপূর্ণ যৌবনদৃপ্ত ভারতবর্ষ বনের কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করতে কোনোদিন লজ্জাবোধ করে নি। তপস্যাকেই সে সকল প্রয়াসের চেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছে এবং বনবাসী পুরাতন তপস্বীদেরই আপনাদের আদিপুরুষ বলে জেনে ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজাও গৌরব বোধ করেছেন। ভারতবর্ষের পুরাণকথায় যা-কিছু মহৎ আশ্চর্য পবিত্র, যা-কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য, সমস্ত সেই প্রাচীন তপোবনস্মৃতির সঙ্গেই জড়িত। বড়ো বড়ো রাজার রাজত্বের কথা সে মনে করে রাখবার জন্যে চেষ্টা করে নি, কিন্তু নানা বিপ্লবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকেই তার প্রাণের সামগ্রী করে আজ পর্যন্ত সে বহন করে এসেছে। মানব-ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।

ভারতবর্ষের বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উজ্জয়িনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি, তখন এ দেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে। তখন মানবের মহামেলার মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি; তখন চীন হূন শক পারসিক গ্রীক রোমক সকলে আমাদের চার দিকে ভিড় করে এসেছে; তখন জনকের মতো রাজা এক দিকে স্বহস্তে লাঙল নিয়ে চাষ করছেন, অন্য দিকে দেশ-দেশান্তর হতে আগত জ্ঞানপিপাসুদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন, এ দৃশ্য দেখবার আর কাল ছিল না। কিন্তু সেদিনকার ঐশ্বর্যমদগর্বিত যুগেও তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি তপোবনের কথা কেমন করে বলেছেন তা দেখলেই বোঝা যায় যে, তপোবন যখন আমাদের দৃষ্টির বাহিরে গেছে তখনো কতখানি আমাদের হৃদয় জুড়ে বসেছে।

কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি তা তাঁর তপোবনচিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মূর্তিমান করতে পেরেছে!

রঘুবংশ কাব্যের যবনিকা যখনই উদ্ঘাটিত হল তখন প্রথমেই তপোবনের শান্ত সুন্দর পবিত্র দৃশ্যটি আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

সেই তপোবনে বনান্তর হতে কুশ সমিধ্ ফল আহরণ করে তপস্বীরা আসছেন এবং যেন একটি অদৃশ্য অগ্নি তাঁদের প্রত্যুদ্গমন করছে। সেখানে হরিণগুলি ঋষিপত্নীদের সন্তানের মতো, তারা নীবারধান্যের অংশ পায় এবং নিঃসংকোচে কুটীরের দ্বার রোধ করে পড়ে থাকে। মুনিকন্যারা গাছে জল দিচ্ছেন এবং আলবাল যেমনি জলে ভরে উঠছে অমনি তাঁরা সরে যাচ্ছেন, পাখিরা নিঃশঙ্কমনে আলবালের জল খেতে আসে এই তাঁদের অভিপ্রায়। রৌদ্র পড়ে এসেছে, নীবার-ধান্য কুটীরের প্রাঙ্গণে রাশীকৃত এবং সেখানে হরিণরা শুয়ে রোমন্থন করছে। আহুতির সুগন্ধধূম বাতাসে প্রবাহিত হয়ে এসে আশ্রমোন্মুখ অতিথিদের সর্বশরীর পবিত্র করে দিচ্ছে।

তরুলতা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মানুষের মিলনের পূর্ণতা, এই হচ্ছে এর ভিতরকার ভাব।

সমস্ত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মধ্যে ভোগলালসানিষ্ঠুর রাজপ্রাসাদকে

ধিক্কার দিয়ে যে-একটি তপোবন বিরাজ করছে তারও মূল সুরটি হচ্ছে ওই— চেতন অচেতন সকলেরই সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধের পবিত্র মাধুর্য।

কাদম্বরীতে তপোবনের বর্ণনায় কবি লিখছেন—সেখানে বাতাসে লতাগুলি মাথা নত করে প্রণাম করছে, গাছগুলি ফুল ছড়িয়ে পূজা করছে, কুটীরের অঙ্গনে শ্যামাক ধান শুকোবার জন্যে মেলে দেওয়া আছে, সেখানে আমলক লবলী লবঙ্গ কদলী বদরী প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করা হয়েছে, বটুদের অধ্যয়নে বনভূমি মুখরিত, বাচাল শুকেরা অনবরত-শ্রবণের দ্বারা অভ্যস্ত আহুতিমন্ত্র উচ্চারণ করছে, অরণ্য-কুক্কুটেরা বৈশ্বদেববলিপিণ্ড আহার করছে, নিকটে জলাশয় থেকে কলহংসশাবকেরা এসে নীবারবলি খেয়ে যাচ্ছে, হরিণীরা জিহ্বাপল্লব দিয়ে মুনিবালকদের লেহন করছে।

এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে ওই। তরুলতা জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ দূর করে তপোবন প্রকাশ পাচ্ছে, এই পুরানো কথাই আমাদের দেশে বরাবর চলে এসেছে।

কেবল তপোবনের চিত্রেই যে এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা নয়। মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সম্মিলনই আমাদের দেশের সমস্ত প্রসিদ্ধ কাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট। যে-সকল ঘটনা মানবচরিত্রকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হতে থাকে তাই নাকি প্রধানত নাটকের উপাদান, এইজন্যেই অন্য দেশের সাহিত্যে দেখতে পাই বিশ্বপ্রকৃতিকে নাটকে কেবল আভাসে রক্ষা করা হয় মাত্র, তার মধ্যে তাকে বেশি জায়গা দেবার অবকাশ থাকে না। আমাদের দেশের প্রাচীন যে নাটকগুলি আজ পর্যন্ত খ্যাতি রক্ষা করে আসছে তাতে দেখতে পাই, প্রকৃতিও নাটকের মধ্যে নিজের অংশ থেকে বঞ্চিত হয় না।

মানুষকে বেষ্টন করে এই-যে জগৎপ্রকৃতি আছে, এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মানুষের সকল চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মানুষের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনোমতে প্রবেশাধিকার না পায়, তা হলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশ কলুষিত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে মরে। এই-যে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে নিত্যনিয়ত কাজ করছে অথচ দেখাচ্ছে যেন সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন আমরাই সব মস্ত কাজের লোক আর সে বেচারা নিতান্তই একটা বাহার মাত্র—এই প্রকৃতিকে আমাদের দেশের কবিরা বেশ করে চিনে নিয়েছেন। এই প্রকৃতি মানুষের সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে যে অনন্তের সুরটি মিলিয়ে রাখছে সেই সুরটিকে আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা সর্বদাই তাঁদের কাব্যের মধ্যে বাজিয়ে রেখেছেন।

ঋতুসংহার কালিদাসের কাঁচা বয়সের লেখা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মধ্যে তরুণতরুণীর যে মিলনসংগীত আছে তাতে স্বরগ্রাম লালসার নিচের সপ্তক থেকেই শুরু হয়েছে, শকুন্তলা-কুমারসম্ভবের মতো তপস্যার উচ্চতম সপ্তকে গিয়ে পৌঁছয় নি।

কিন্তু কবি নবযৌবনের এই লালসাকে প্রকৃতির বিচিত্র ও বিরাট সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে মুক্ত আকাশের মাঝখানে তাকে ঝংকৃত করে তুলেছেন। ধারাযন্ত্র-মুখরিত নিদাঘদিনান্তের চন্দ্রকিরণ এর মধ্যে আপনার সুরটুকু যোজনা করেছে, বর্ষায় নবজলসেকে-ছিন্নতাপ বনান্তে পবনচলিত কদম্বশাখা এর ছন্দে আন্দোলিত, আপক্বশালিরুচিরা শারদলক্ষ্মী তাঁর হংসরবনূপুরধ্বনিকে এর তালে তালে

মন্দ্রিত করেছেন এবং বসন্তের দক্ষিণবায়ুচঞ্চল কুসুমিত আম্রশাখার কলমর্মর এরই তানে তানে বিস্তীর্ণ।

বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে যেখানে যার স্বাভাবিক স্থান সেখানে তাকে স্থাপন করে দেখলে তার অত্যুগ্রতা থাকে না; সেইখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে কেবলমাত্র মানুষের গণ্ডির মধ্যে সংকীর্ণ করে দেখলে তাকে ব্যাধির মতো অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং রক্তবর্ণ দেখতে হয়। শেক্‌স্‌পিয়রের দুই-একটি খণ্ডকাব্য আছে, নরনারীর আসক্তি তার বর্ণনীয় বিষয়; কিন্তু সেই-সকল কাব্যে আসক্তিই একেবারে একান্ত। তার চার দিকে আর-কিছুরই স্থান নেই, আকাশ নেই, বাতাস নেই, প্রকৃতির যে গীতগন্ধবর্ণবিচিত্র বিশাল আবরণে বিশ্বের সমস্ত লজ্জা রক্ষা করে আছে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এইজন্যে সেই-সকল কাব্যে প্রবৃত্তির উন্মত্ততা অত্যন্ত দুঃসহরূপে প্রকাশ পাচ্ছে।

কুমারসম্ভবে তৃতীয় সর্গে যেখানে মদনের আকস্মিক আবির্ভাবে যৌবন-চাঞ্চল্যের উদ্দীপনা বর্ণিত হয়েছে সেখানে কালিদাস উন্মত্ততাকে একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই সর্বময় করে দেখাবার প্রয়াসমাত্র পান নি। আতশকাঁচের ভিতর দিয়ে একটি বিন্দুমাত্র সূর্যকিরণ সংহত হয়ে পড়লে সেখানে আগুন জ্বলে ওঠে; কিন্তু সেই সূর্যকিরণ যখন আকাশের সর্বত্র স্বভাবত ছড়িয়ে থাকে তখন সে তাপ দেয় বটে, কিন্তু দগ্ধ করে না। কালিদাস বসন্তপ্রকৃতির সর্বব্যাপী যৌবনলীলার মাঝখানে হরপার্বতীর মিলনচাঞ্চল্যকে নিবিষ্ট করে তার সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন।

অকালবসন্তসমাগমে বনস্থলীতে যখন অশোকের গাছে গুঁড়ি থেকে একেবারে পল্লব পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফুল ফুটে উঠল, সহকারের শাখা নতুন কিশলয়ে ছেয়ে গেল, তখন মধুকর তার প্রিয়ার সঙ্গে এক পুষ্পপাত্রে মধুপান করতে বসে গেল; কৃষ্ণসার হরিণ স্পর্শনিমীলিতাক্ষী মৃগীর গায়ে শিঙ দিয়ে কণ্ডূয়ন করে দিতে লাগল; তখন হস্তিনী পদ্মরেণুগন্ধি গণ্ডূষজল হস্তীকে পান করিয়ে দিলে এবং চক্রবাক আধখানা মৃণাল নিজে খেয়ে বাকি আধখানা চক্রবাকীকে খাইয়ে দিতে লাগল। এমনি করে, কালিদাস পুষ্পধনুর জ্যানির্ঘোষকে বিশ্বসংগীতের সুরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও বেসুরো করে বাজান নি. যে পটভূমিকার উপরে তিনি তাঁর ছবিটি এঁকেছেন সেটি তরুলতা-পশুপক্ষীকে নিয়ে সমস্ত আকাশে অতি বিচিত্র বর্ণে বিস্তারিত।

কেবল তৃতীয় সর্গ নয়, সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্যটিই একটি বিশ্বব্যাপী পট-ভূমিকার উপরে অঙ্কিত। এই কাব্যের ভিতরকার কথাটি একটি গভীর এবং চিরন্তন কথা। যে পাপদৈত্য প্রবল হয়ে উঠে হঠাৎ স্বর্গলোককে কোথা থেকে ছারখার করে দেয় তাকে পরাভূত করবার মতো বীরত্ব কোন্‌ উপায়ে জন্মগ্রহণ করে?

এই সমস্যাটি মানুষের চিরকালের সমস্যা, প্রত্যেক লোকের জীবনের সমস্যাও এই বটে, আবার এই সমস্যা সমস্ত জাতির মধ্যে নূতন নূতন মূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ করে।

কালিদাসের সময়েও একটি সমস্যা ভারতবর্ষে অত্যন্ত উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছিল, তা কবির কাব্য পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে জীবনযাত্রায় যে-একটি সরলতা ও সংযম ছিল তখন সেটি ভেঙে এসেছিল। রাজারা তখন রাজধর্ম বিস্মৃত হয়ে আত্মসুখপরায়ণ ভোগী হয়ে উঠেছিলেন। এ দিকে শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ তখন বারম্বার দুর্গতিপ্রাপ্ত হচ্ছিল।

তখন বাহিরের দিক থেকে দেখলে ভোগবিলাসের আয়োজনে, কাব্য সংগীত শিল্পকলার আলোচনায়, ভারতবর্ষ সভ্যতার প্রকৃষ্টতা লাভ করেছিল। কালিদাসের কাব্যকলার মধ্যেও তখনকার সেই উপকরণবহুল সম্ভোগের সুর যে বাজে নি তা নয়। বস্তুত তাঁর কাব্যের বহিরংশ তখনকার কালেরই কারুকার্যে খচিত হয়েছিল। এইরকম এক দিকে তখনকার কালের সঙ্গে তখনকার কবির যোগ আমরা দেখতে পাই।

কিন্তু এই প্রমোদভবনের স্বর্ণখচিত অন্তঃপুরের মাঝখানে বসে কাব্যলক্ষ্মী বৈরাগ্যবিকল চিত্তে কিসের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন? হৃদয় তো তাঁর এখানে ছিল না। তিনি এই আশ্চর্যকারুবিচিত্র মাণিক্যকঠিন কারাগার হতে কেবলই মুক্তি-কামনা করছিলেন।

কালিদাসের কাব্যে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের, অবস্থার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার একটা দ্বন্দ্ব আছে। ভারতবর্ষে যে তপস্যার যুগ তখন অতীত হয়ে গিয়েছিল ঐশ্বর্যশালী রাজসিংহাসনের পাশে বসে কবি সেই নির্মল সুদূর কালের দিকে একটি বেদনা বহন করে তাকিয়ে ছিলেন।

রঘুবংশ কাব্যে তিনি ভারতবর্ষের পুরাকালীন সূর্যবংশীয় রাজাদের চরিত-গানে যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার মধ্যে কবির সেই বেদনাটি নিগূঢ় হয়ে রয়েছে। তার প্রমাণ দেখুন।

আমাদের দেশের কাব্যে পরিণামকে অশুভকর ভাবে দেখানো ঠিক প্রথা নয়। বস্তুত যে রামচন্দ্রের জীবনে রঘুর বংশ উচ্চতম চূড়ায় অধিরোহণ করেছে সেইখানেই কাব্য শেষ করলে তবেই কবির ভূমিকার বাক্যগুলি সার্থক হত।

তিনি ভূমিকায় বলেছেন : সেই যাঁরা জন্মকাল অবধি শুদ্ধ, যাঁরা ফলপ্রাপ্তি অবধি কর্ম করতেন, সমুদ্র অবধি যাঁদের রাজ্য এবং স্বর্গ অবধি যাঁদের রথবর্ত্ম গিয়েছিল; যথাবিধি যাঁরা অগ্নিতে আহুতি দিতেন, যথাকাম যাঁরা প্রার্থীদের অভাব পূর্ণ করতেন, যথাপরাধ যাঁরা দণ্ড দিতেন এবং যথাকালে যাঁরা জাগ্রত হতেন; যাঁরা ত্যাগের জন্যে অর্থ সঞ্চয় করতেন, যাঁরা সত্যের জন্য মিতভাষী, যাঁরা যশের জন্য জয় ইচ্ছা করতেন এবং সন্তানলাভের জন্য যাঁদের দারগ্রহণ; শৈশবে যাঁরা বিদ্যাভ্যাস করতেন, যৌবনে যাঁদের বিষয়সেবা ছিল, বার্ধক্যে যাঁরা মুনিবৃত্তি গ্রহণ করতেন এবং যোগান্তে যাঁদের দেহত্যাগ হত— আমি বাক্‌সম্পদে দরিদ্র হলেও সেই রঘুরাজদের বংশ কীর্তন করব, কারণ তাঁদের গুণ আমার কর্ণে প্রবেশ করে আমাকে চঞ্চল করে তুলছে।

কিন্তু গুণকীর্তনেই এই কাব্যের শেষ নয়। কবিকে যে কিসে চঞ্চল করে তুলেছে তা রঘুবংশের পরিণাম দেখলেই বোঝা যায়।

রঘুবংশ যাঁর নামে গৌরবলাভ করেছে তার জন্মকাহিনী কী? তাঁর আরম্ভ কোথায়?

তপোবনে দিলীপদম্পতির তপস্যাতেই এমন রাজা জন্মেছেন। কালিদাস তাঁর রাজপ্রভুদের কাছে এই কথাটি নানা কাব্যে নানা কৌশলে বলেছেন যে, কঠিন তপস্যার ভিতর দিয়ে ছাড়া কোনো মহৎফললাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। যে রঘু উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের সমস্ত রাজাকে বীরতেজে পরাভূত করে পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন তিনি তাঁর পিতামাতার তপঃসাধনার ধন। আবার যে ভরত বীর্যবলে চক্রবর্তী সম্রাট হয়ে ভারতবর্ষকে নিজ নামে ধন্য

করেছেন তাঁর জন্মঘটনায় অবারিত প্রবৃত্তির যে কলঙ্ক পড়েছিল কবি তাকে তপস্যার অগ্নিতে দগ্ধ এবং দুঃখের অশ্রুজলে সম্পূর্ণ ধৌত না করে ছাড়েন নি।

রঘুবংশ আরম্ভ হল রাজোচিত ঐশ্বর্যগৌরবের বর্ণনায় নয়। সুদক্ষিণাকে বামে নিয়ে রাজা দিলীপ তপোবনে প্রবেশ করলেন। চতুঃসমুদ্র যাঁর অনন্যশাসনা পৃথিবীর পরিখা সেই রাজা অবিচলিত নিষ্ঠায় কঠোর সংযমে তপোবনধেনুর সেবায় নিযুক্ত হলেন।

সংযমে তপস্যায় তপোবনে রঘুবংশের আরম্ভ, আর মদিরায় ইন্দ্রিয়মত্ততায় প্রমোদভবনে তার উপসংহার। এই শেষ সর্গের চিত্রে বর্ণনার উজ্জ্বলতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু যে অগ্নি লোকালয়কে দগ্ধ করে সর্বনাশ করে সেও তো কম উজ্জ্বল নয়। এক পত্নীকে নিয়ে দিলীপের তপোবনে বাস শান্ত এবং অনতিপ্রকট বর্ণে অঙ্কিত, আর বহু নায়িকা নিয়ে অগ্নিবর্ণের আত্মঘাতসাধন অসম্বৃত বাহুল্যের সঙ্গে যেন জ্বলন্ত রেখায় বর্ণিত।

প্রভাত যেমন শান্ত, যেমন পিঙ্গলজটাধারী ঋষিবালকের মতো পবিত্র, প্রভাত যেমন মুক্তাপাণ্ডুর সৌম্য আলোকে শিশিরস্নিগ্ধ পৃথিবীর উপরে ধীরপদে অবতরণ করে এবং নবজীবনের অভ্যুদয়বার্তায় জগৎকে উদ্‌বোধিত করে তোলে, কবির কাব্যেও তপস্যার দ্বারা সুসমাহিত রাজমাহাত্ম্য তেমনি স্নিগ্ধ তেজে এবং সংযত বাণীতে মহোদয়শালী রঘুবংশের সূচনা করেছিল। আর, নানাবর্ণবিচিত্র মেঘজালের মধ্যে আবিষ্ট অপরাহ্ণ আপনার অদ্ভুত রশ্মিচ্ছটায় পশ্চিম-আকাশকে যেমন ক্ষণকালের জন্যে প্রগল্‌ভ করে তোলে এবং দেখতে দেখতে ভীষণ ক্ষয় এসে তার সমস্ত মহিমা অপহরণ করতে থাকে, অবশেষে অনতিকালেই বাক্যহীন কর্মহীন অচেতন অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়, কবি তেমনি করেই কাব্যের শেষ সর্গে বিচিত্র ভোগায়োজনের ভীষণ সমারোহের মধ্যেই রঘুবংশজ্যোতিষ্কের নির্বাপণ বর্ণনা করেছেন।

কাব্যের এই আরম্ভ এবং শেষের মধ্যে কবির একটি অন্তরের কথা প্রচ্ছন্ন আছে। তিনি নীরব দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন, ছিল কী আর হয়েছে কী! সে কালে যখন সম্মুখে ছিল অভ্যুদয় তখন তপস্যাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান ঐশ্বর্য, আর এ কালে যখন সম্মুখে দেখা যাচ্ছে বিনাশ তখন বিলাসের উপকরণ-রাশির সীমা নেই আর ভোগের অতৃপ্ত বহ্নি সহস্র শিখায় জ্বলে উঠে চারি দিকের চোখ ধাঁদিয়ে দিচ্ছে।

কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কোথায় কুমারসম্ভবে তাই দেখানো হয়েছে। কবি এই কাব্যে বলেছেন, ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্যের উদ্ভব; সেই শৌর্যেই মানুষ সকলপ্রকার পরাভব হতে উদ্ধার পায়।

অর্থাৎ ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনো স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সতী যখন তাঁর পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনো দৈত্যের উপদ্রব প্রবল।

প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।

কোনো-একটি সংকীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহংকারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এই হচ্ছে পাপ।

এইজন্যেই ত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করবার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য। এইজন্যেই উপনিষদে বলা হয়েছে, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।

প্রথমে পার্বতী মদনের সাহায্যে শিবকে চেয়েছিলেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ হল; অবশেষে ত্যাগের সাহায্যে তপস্যার দ্বারাতেই তাঁকে লাভ করলেন।

কাম হচ্ছে কেবল অংশের প্রতিই আসক্ত, সমগ্রের প্রতি অন্ধ; কিন্তু শিব হচ্ছেন সকল দেশের, সকল কালের—কামনাত্যাগ না হলে তাঁর সঙ্গে মিলন ঘটতেই পারে না।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে, এইটি উপনিষদের অনুশাসন। এইটেই কুমারসম্ভব কাব্যের মর্মকথা এবং এইটেই আমাদের তপোবনের সাধনা—লাভ করবার জন্যে ত্যাগ করবে।

Sacrifice এবং resignation, আত্মত্যাগ এবং দুঃখস্বীকার, এই দুটি পদার্থের মাহাত্ম্য আমরা কোনো কোনো ধর্মশাস্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত দেখেছি। জগতের সৃষ্টিকার্যে উত্তাপ যেমন একটি প্রধান জিনিস, মানুষের জীবনগঠনে দুঃখও তেমনি একটি খুব বড়ো রাসায়নিক শক্তি; এর দ্বারা চিত্তের দুর্ভেদ্য কাঠিন্য গলে যায় এবং অসাধ্য হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হয়। অতএব সংসারে যিনি দুঃখকে দুঃখরূপেই নম্রভাবে স্বীকার করে নিতে পারেন তিনি যথার্থ তপস্বী বটেন।

কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন এই দুঃখস্বীকারকেই উপনিষৎ লক্ষ্য করছেন। ত্যাগকে দুঃখরূপে অঙ্গীকার করে নেওয়া নয়, ত্যাগকে ভোগরূপেই বরণ করে নেওয়া উপনিষদের অনুশাসন। উপনিষৎ যে ত্যাগের কথা বলছেন সেই ত্যাগই পূর্ণতর গ্রহণ, সেই ত্যাগই গভীরতর আনন্দ। সেই ত্যাগই নিখিলের সঙ্গে যোগ, ভূমার সঙ্গে মিলন। অতএব, ভারতবর্ষের যে আদর্শ তপোবন সে তপোবন শরীরের বিরুদ্ধে আত্মার, সংসারের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসের একটা নিরন্তর হাতাহাতি যুদ্ধ করবার মল্লক্ষেত্র নয়। যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, অর্থাৎ যা-কিছু-সমস্তের সঙ্গে, ত্যাগের দ্বারা বাধাহীন মিলন—এইটেই হচ্ছে তপোবনের সাধনা। এইজন্যেই তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীয়সম্বন্ধের যোগ এমন ঘনিষ্ঠ যে অন্য দেশের লোকের কাছে সেটা অদ্ভুত মনে হয়।

এইজন্যেই আমাদের দেশের কবিত্বে যে প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় অন্য দেশের কাব্যের সঙ্গে তার যেন একটা বিশিষ্টতা আছে। আমাদের এ প্রকৃতির প্রতি প্রভুত্ব করা নয়, প্রকৃতিকে ভোগ করা নয়, এ প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলন।

অথচ এই সম্মিলন অরণ্যবাসীর বর্বরতা নয়। তপোবন আফ্রিকার বন যদি হত তা হলে বলতে পারতুম, প্রকৃতির সঙ্গে মিলে থাকা একটা তামসিকতা মাত্র। কিন্তু মানুষের চিত্ত যেখানে সাধনার দ্বারা জাগ্রত আছে সেখানকার মিলন কেবল-মাত্র অভ্যাসের জড়ত্বজনিত হতে পারে না। সংস্কারের বাধা ক্ষয় হয়ে গেলে যে মিলন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তপোবনের মিলন হচ্ছে তাই।

আমাদের কবিরা সকলেই বলেছেন, তপোবন শান্তরসাস্পদ। তপোবনের যে-একটি বিশেষ রস আছে সেটি শান্তরস। শান্তরস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। যেমন সাতটা বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রঙ হয় তেমনি চিত্তের

প্রবাহ নানা ভাগে বিভক্ত না হয়ে যখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভরে তোলে তখনই শান্তরসের উদ্ভব হয়।

তপোবনে সেই শান্তরস। এখানে সূর্য অগ্নি বায়ু জলস্থল আকাশ তরুলতা মৃগপক্ষী সকলের সঙ্গেই চেতনার একটি পরিপূর্ণ যোগ। এখানে চতুর্দিকের কিছুর সঙ্গেই মানুষের বিচ্ছেদ নেই এবং বিরোধ নেই।

ভারতবর্ষের তপোবনে এই-যে একটি শান্তরসের সংগীত বাঁধা হয়েছিল, এই সংগীতের আদর্শেই আমাদের দেশে অনেক মিশ্র রাগরাগিণীর সৃষ্টি হয়েছে। সেইজন্যেই আমাদের কাব্যে মানবব্যাপারের মাঝখানে প্রকৃতিকে এত বড়ো স্থান দেওয়া হয়েছে; এ কেবল সম্পূর্ণতার জন্যে আমাদের যে-একটি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করবার উদ্দেশে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে যে দুটি তপোবন আছে সে দুটিই শকুন্তলার সুখ-দুঃখকে একটি বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। তার একটি তপোবন পৃথিবীতে, আর-একটি স্বর্গলোকের সীমায়। একটি তপোবনে সহকারের সঙ্গে নবমল্লিকার মিলনোৎসবে নবযৌবনা ঋষিকন্যারা পুলকিত হয়ে উঠছেন, মাতৃহীন মৃগশিশুকে তাঁরা নীবারমুষ্টি দিয়ে পালন করছেন, কুশসূচিতে তার মুখ বিদ্ধ হলে ইঙ্গুদীতৈল মাখিয়ে শুশ্রূষা করছেন—এই তপোবনটি দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেমকে সারল্য সৌন্দর্য এবং স্বাভাবিকতা দান করে তাকে বিশ্বসুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে।

আর, সন্ধ্যামেঘের মতো কিম্পুরুষপর্বত যে হেমকূট, যেখানে সুরাসুরগুরু মরীচি তাঁর পত্নীর সঙ্গে মিলে তপস্যা করছেন, লতাজালজড়িত যে হেমকূট পক্ষিনীড়খচিত অরণ্যজটামন্ডল বহন করে যোগাসনে অচল শিবের মতো সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন, যেখানে কেশর ধরে সিংহশিশুকে মাতার স্তন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যখন দুরন্ত তপস্বিবালক তার সঙ্গে খেলা করে তখন পশুর সেই দুঃখ ঋষিপত্নীর পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে—সেই তপোবন শকুন্তলার অপমানিত বিচ্ছেদদুঃখকে অতি বৃহৎ শান্তি ও পবিত্রতা দান করেছে।

এ কথা স্বীকার করতে হবে, প্রথম তপোবনটি মর্ত্যলোকের, আর দ্বিতীয়টি অমৃতলোকের। অর্থাৎ, প্রথমটি হচ্ছে যেমন-হয়ে-থাকে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে যেমন-হওয়া-ভালো। এই যেমন-হওয়া-ভালোর দিকে যেমন-হয়ে-থাকে চলেছে। এরই দিকে চেয়ে সে আপনাকে শোধন করছে, পূর্ণ করছে। যেমন-হয়ে-থাকে হচ্ছেন সতী অর্থাৎ সত্য, আর যেমন-হওয়া-ভালো হচ্ছেন শিব অর্থাৎ মঙ্গল। কামনা ক্ষয় করে তপস্যার মধ্য দিয়ে এই সতী ও শিবের মিলন হয়। শকুন্তলার জীবনেও যেমন-হয়ে-থাকে তপস্যার দ্বারা অবশেষে যেমন-হওয়া-ভালোর মধ্যে এসে আপনাকে সফল করে তুলেছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে মর্ত্য শেষকালে স্বর্গের প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।

মানস লোকের এই-যে দ্বিতীয় তপোবন এখানেও প্রকৃতিকে ত্যাগ করে মানুষ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে নি। স্বর্গে যাবার সময় যুধিষ্ঠির তাঁর কুকুরকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের কাব্যে মানুষ যখন স্বর্গে পৌঁছয় প্রকৃতিকে সঙ্গে নেয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজে বড়ো হয়ে ওঠে না। মরীচির তপোবনে মানুষ যেমন তপস্বী হেমকূটও তেমনি তপস্বী; সিংহও সেখানে হিংসা ত্যাগ করে, গাছপালাও সেখানে ইচ্ছাপূর্বক প্রার্থীর অভাব পূরণ করে। মানুষ একা নয়, নিখিলকে নিয়ে সে

সম্পূর্ণ; অতএব, কল্যাণ যখন আবির্ভূত হয় তখন সকলের সঙ্গে যোগেই তার আবির্ভাব।

রামায়ণে রামের বনবাস হল। কেবল রাক্ষসের উপদ্রব ছাড়া সে বনবাসে তাঁদের আর কোনো দুঃখই ছিল না। তাঁরা বনের পর বন, নদীর পর নদী, পর্বতের পর পর্বত পার হয়ে গেছেন; তাঁরা পর্ণকুটীরে বাস করেছেন, মাটিতে শুয়ে রাত্রি কাটিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা ক্লেশ বোধ করেন নি। এই-সমস্ত নদী-গিরি-অরণ্যের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের মিলন ছিল; এখানে তাঁরা প্রবাসী নন।

অন্য দেশের কবি রাম লক্ষ্মণ সীতার মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বল করে দেখাবার জন্যেই বনবাসের দুঃখকে খুব কঠোর করেই চিত্রিত করতেন। কিন্তু বাল্মীকি একেবারেই তা করেন নি, তিনি বনের আনন্দকেই বারম্বার পুনরুক্তিদ্বারা কীর্তন করে চলেছেন।

রাজৈশ্বর্য যাঁদের অন্তঃকরণকে অভিভূত করে আছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন কখনোই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে না। সমাজগত সংস্কার ও চিরজন্মের কৃত্রিম অভ্যাস পদে পদেই তাঁদের বাধা না দিয়ে থাকতে পারে না। সেই-সকল বাধার ভিতর থেকে প্রকৃতিকে তাঁরা কেবল প্রতিকূলই দেখতে থাকেন।

আমাদের রাজপুত্র ঐশ্বর্যে পালিত কিন্তু ঐশ্বর্যের আসক্তি তাঁর অন্তঃকরণকে অভিভূত করে নি। ধর্মের অনুরোধে বনবাস স্বীকার করাই তার প্রথম প্রমাণ। তাঁর চিত্ত স্বাধীন ছিল, শান্ত ছিল, এইজন্যেই তিনি অরণ্যে প্রবাসদুঃখ ভোগ করেন নি; এইজন্যেই তরুলতা পশুপক্ষী তাঁর হৃদয়কে কেবলই আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দ প্রভুত্বের আনন্দ নয়, ভোগের আনন্দ নয়, সম্মিলনের আনন্দ। এই আনন্দের ভিত্তিতে তপস্যা, আত্মসংযম। এর মধ্যেই উপনিষদের সেই বাণী, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

কৌশল্যার রাজগৃহবধূ সীতা বনে চলেছেন—

> একৈকং পাদপং গুল্মং লতাং বা পুষ্পশালিনীম্
> অদৃষ্টরূপাং পশ্যন্তী রামং পপ্রচ্ছ সাবলা।
> রমণীয়ান্ বহুবিধান্ পাদপান্ কুসুমোৎকরান্
> সীতাবচনসংরব্ধ আনয়ামাস লক্ষ্মণঃ।
> বিচিত্রবালুকাজলাং হংসসারসনাদিতাম্
> রেমে জনকরাজস্য সুতা প্রেক্ষ্য তদা নদীম্।

যে-সকল তরুগুল্ম কিম্বা পুষ্পশালিনী লতা সীতা পূর্বে কখনো দেখেন নি তাদের কথা তিনি রামকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ তাঁর অনুরোধে তাঁকে পুষ্পমঞ্জরীতে ভরা বহুবিধ গাছ তুলে এনে দিতে লাগলেন। সেখানে বিচিত্রবালুকাজলা হংসসারসমুখরিতা নদী দেখে জানকী মনে আনন্দবোধ করলেন।

প্রথম বনে গিয়ে রাম চিত্রকূট পর্বতে যখন আশ্রয় গ্রহণ করলেন, তিনি—

> সুরম্যমাসাদ্য তু চিত্রকূটং নদীঞ্চ তাং মাল্যবতীং সুতীর্থাং
> ননন্দ হৃষ্টো মৃগপক্ষিজুষ্টাং জহৌ চ দুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ।

সেই সুরম্য চিত্রকূট, সেই সুতীর্থা মাল্যবতী নদী, সেই মৃগপক্ষিসেবিতা বনভূমিকে প্রাপ্ত হয়ে পুরবিপ্রবাসের দুঃখকে ত্যাগ করে হৃষ্টমনে রাম আনন্দ করতে লাগলেন।

> দীর্ঘকালোষিতস্তস্মিন্ গিরৌ গিরিবনপ্রিয়ঃ

গিরিবনপ্রিয় রাম দীর্ঘকাল সেই গিরিতে বাস করে, একদিন সীতাকে চিত্রকূট-শিখর দেখিয়ে বলছেন—

ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্‌ভির্বিনাভবঃ
মনো মে বাধতে দৃষ্টা রমণীয়মিমং গিরিম্‌।

রমণীয় এই গিরিকে দেখে রাজ্যভ্রংশনও আমাকে দুঃখ দিচ্ছে না, সুহৃদ্‌গণের কাছ থেকে দূরে বাসও আমার পীড়ার কারণ হচ্ছে না।

সেখান থেকে রাম যখন দণ্ডকারণ্যে গেলেন সেখানে গগনে সূর্যমণ্ডলের মতো দুর্দর্শ প্রদীপ্ত তাপসাশ্রমমণ্ডল দেখতে পেলেন। এই আশ্রম 'শরণ্যং সর্বভূতানাম্‌'। ইহা ব্রাহ্মী লক্ষ্মী-দ্বারা সমাবৃত। কুটিরগুলি সুমার্জিত, চারি দিকে কত মৃগ কত পক্ষী।

রামের বনবাস এমনি করেই কেটেছিল, কোথাও বা রমণীয় বনে কোথাও বা পবিত্র তপোবনে।

রামের প্রতি সীতার ও সীতার প্রতি রামের প্রেম তাঁদের পরস্পর থেকে প্রতিফলিত হয়ে চারি দিকের মৃগপক্ষীকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাঁদের প্রেমের যোগে তাঁরা কেবল নিজেদের সঙ্গে নয়, বিশ্বলোকের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েছিলেন; এইজন্য সীতাহরণের পর রাম সমস্ত অরণ্যকেই আপনার বিচ্ছেদ-বেদনার সহচর পেয়েছিলেন। সীতার অভাব কেবল রামের পক্ষে নয়, সমস্ত অরণ্যই যে সীতাকে হারিয়েছে। কারণ, রামসীতার বনবাসকালে অরণ্য একটি নূতন সম্পদ পেয়েছিল, সেটি হচ্ছে মানুষের প্রেম। সেই প্রেমে তার পল্লবঘনশ্যামলতাকে, তার ছায়াগম্ভীর গহনতার রহস্যকে, একটি চেতনার সঞ্চারে রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল।

শেক্‌স্‌পীয়রের As You Like It নাটক একটি বনবাসকাহিনী— Tempestও তাই, Midsummer Night's Dreamও অরণ্যের কাব্য। কিন্তু সে-সকল কাব্যে মানুষের প্রভুত্ব ও প্রবৃত্তির লীলাই একেবারে একান্ত, অরণ্যের সঙ্গে সৌহার্দ দেখতে পাই নে। অরণ্যবাসের সঙ্গে মানুষের চিত্তের সামঞ্জস্যসাধন ঘটে নি; হয় তাকে জয় করবার নয় তাকে ত্যাগ করবার চেষ্টা সর্বদাই রয়েছে, হয় বিরোধ নয় বিরাগ নয় ঔদাসীন্য। মানুষের প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতিকে ঠেলেঠুলে স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আপনার গৌরব প্রকাশ করেছে।

মিল্‌টনের Paradise Lost কাব্যে আদি মানবদম্পতির স্বর্গারণ্যে বাস বিষয়টি এমন যে অতি সহজেই সেই কাব্যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সম্বন্ধে বিরাট ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতিসৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন, জীবজন্তুরা সেখানে হিংসা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করছে তাও বলেছেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো সাত্ত্বিক সম্বন্ধ নেই। তারা মানুষের ভোগের জন্যেই বিশেষ করে সৃষ্ট, মানুষ তাদের প্রভু। এমন আভাসটি কোথাও পাই নে যে এই আদিদম্পতি প্রেমের আনন্দপ্রাচুর্যে তরুলতা পশুপক্ষীর সেবা করছেন, ভাবনাকে কল্পনাকে নদী গিরি অরণ্যের সঙ্গে নানা লীলায় সম্মিলিত করে তুলছেন। এই স্বর্গারণ্যের যে নিভৃত নিকুঞ্জটিতে মানবের প্রথম পিতামাতা বিশ্রাম করতেন সেখানে—

Beast, bird, insect, or worm, durst enter none
Such was their awe of Man. . . .

অর্থাৎ, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ কেউ প্রবেশ করতে সাহস করত না, মানুষের প্রতি এমনি তাদের একটি সভয় সম্ভ্রম ছিল।

এই-যে নিখিলের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ, এর মূলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, জগতে যা-কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা সমাবৃত করে জানবে, এই বাণীটির অভাব আছে। এই পাশ্চাত্ত্য কাব্যে ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বরের যশোকীর্তন করবার জন্যেই, ঈশ্বর স্বয়ং দূরে থেকে তাঁর এই বিশ্বরচনা থেকে বন্দনা গ্রহণ করছেন।

মানুষের সঙ্গেও আংশিক পরিমাণে প্রকৃতির সেই সম্বন্ধ প্রকাশ পেয়েছে, অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠতা প্রচারের জন্যে।

ভারতবর্ষও যে মানুষের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করে তা নয়। কিন্তু প্রভুত্ব করাকেই, ভোগ করাকেই সে শ্রেষ্ঠতার প্রধান লক্ষণ বলে মানে না; মানুষের শ্রেষ্ঠতার সর্বপ্রধান পরিচয়ই হচ্ছে এই যে, মানুষ সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। সে মিলন মূঢ়তার মিলন নয়; সে মিলন চিত্তের মিলন, সুতরাং আনন্দের মিলন। এই আনন্দের কথাই আমাদের কাব্যে কীর্তিত।

উত্তরচরিতে রাম ও সীতার যে প্রেম সেই প্রেম আনন্দের প্রাচুর্যবেগে চারি দিকের জল স্থল আকাশের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই রাম দ্বিতীয়বার গোদাবরীর গিরিতট দেখে বলে উঠেছিলেন 'যত্র দ্রুমা অপি মৃগা অপি বন্ধবো মে'; তাই সীতাবিচ্ছেদকালে তিনি তাঁদের পূর্বনিবাসভূমি দেখে আক্ষেপ করেছিলেন যে, 'মৈথিলী তাঁর করকমলাবিকীর্ণ জল নীবার ও তৃণ দিয়ে যে-সকল গাছ পাখি ও হরিণদের পালন করেছিলেন তাদের দেখে আমার হৃদয় পাষাণ গলার মতো গলে যাচ্ছে।'

মেঘদূতে যক্ষের বিরহ নিজের দুঃখের টানে স্বতন্ত্র হয়ে একলা কোণে বসে বিলাপ করছে না। বিরহদুঃখই তার চিত্তকে নববর্ষায়-প্রফুল্ল পৃথিবীর সমস্ত নদনদী-অরণ্য-নগরীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। মানুষের হৃদয়বেদনাকে কবি সংকীর্ণ করে দেখান নি, তাকে বিরাটের মধ্যে বিস্তীর্ণ করেছেন; এইজন্যেই প্রভুশাপগ্রস্ত একজন যক্ষের দুঃখবার্তা চিরকালের মতো বর্ষাঋতুর মর্মস্থান অধিকার করে প্রণয়ীহৃদয়ের খেয়ালকে বিশ্বসংগীতের ধ্রুপদে এমন করে বেঁধে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের এইটেই হচ্ছে বিশেষত্ব। তপস্যার ক্ষেত্রেও এই দেখি, যেখানে তার হৃদয়বৃত্তির লীলা সেখানেও এই দেখতে পাই।

মানুষ দুই রকম করে নিজের মহত্ত্ব উপলব্ধি করে— এক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, আর-এক মিলনের মধ্যে; এক ভোগের দ্বারা, আর-এক যোগের দ্বারা। ভারতবর্ষ স্বভাবতই শেষের পথ অবলম্বন করেছে। এইজন্যেই দেখতে পাই, যেখানেই প্রকৃতির মধ্যে কোনো বিশেষ সৌন্দর্য বা মহিমার আবির্ভাব সেইখানেই ভারতবর্ষের তীর্থস্থান; মানবচিত্তের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মিলন যেখানে স্বভাবতই ঘটতে পারে সেই স্থানটিকেই ভারতবর্ষ পবিত্র তীর্থ বলে জেনেছে। এ-সকল জায়গায় মানুষের প্রয়োজনের কোনো উপকরণই নেই— এখানে চাষও চলে না, বাসও চলে না; এখানে পণ্যসামগ্রীর আয়োজন নেই, এখানে রাজার রাজধানী নয়; অন্তত সেই-সমস্তই এখানে মুখ্য নয়, এখানে নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ আপনার যোগ উপলব্ধি করে আত্মাকে সর্বগ ও বৃহৎ বলে জানে। এখানে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজন-সাধনের ক্ষেত্র বলে মানুষ জানে না, তাকে আত্মার উপলব্ধি-সাধনের ক্ষেত্র বলেই মানুষ অনুভব করে, এইজন্যেই তা পুণ্য স্থান।

ভারতবর্ষের হিমালয় পবিত্র, ভারতবর্ষের বিন্ধ্যাচল পবিত্র, ভারতবর্ষের যে

নদীগুলি লোকালয়-সকলকে অক্ষয়ধারায় স্তন্য দান করে আসছে তারা সকলেই পুণ্যসলিলা। হরিদ্বার পবিত্র, হৃষীকেশ পবিত্র, কেদারনাথ বদরিকাশ্রম পবিত্র, কৈলাস পবিত্র, মানসসরোবর পবিত্র, পুষ্কর পবিত্র, গঙ্গার মধ্যে যমুনার মিলন পবিত্র, সমুদ্রের মধ্যে গঙ্গার অবসান পবিত্র। যে বিরাট প্রকৃতির দ্বারা মানুষ পরিবেষ্টিত, যার আলোক এসে তার চক্ষুকে সার্থক করেছে, যার উত্তাপ তার সর্বাঙ্গে প্রাণকে স্পন্দিত করে তুলছে, যার জলে তার অভিষেক, যার অন্নে তার জীবন, যার অভ্রভেদী রহস্যনিকেতনের নানা দ্বার দিয়ে নানা দূত বেরিয়ে এসে শব্দে গন্ধে বর্ণে ভাবে মানুষের চৈতন্যকে নিত্যনিয়ত জাগ্রত করে রেখে দিয়েছে, ভারতবর্ষ সেই প্রকৃতির মধ্যে আপনার ভক্তিবৃত্তিকে সর্বত্র ওতপ্রোত করে প্রসারিত করে দিয়েছে। জগৎকে ভারতবর্ষ পূজার দ্বারা গ্রহণ করেছে, তাকে কেবলমাত্র উপভোগের দ্বারা খর্ব করে নি; তাকে ঔদাসীন্যের দ্বারা নিজের কর্মক্ষেত্রের বাইরে দূরে সরিয়ে রেখে দেয় নি: এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পবিত্র যোগেই ভারতবর্ষ আপনাকে বৃহৎ করে সত্য করে জেনেছে, ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলি এই কথাই ঘোষণা করছে।

বিদ্যালাভ করা কেবল বিদ্যালয়ের উপরেই নির্ভর করে না, প্রধানত ছাত্রের উপরেই নির্ভর করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে যায়, এমন-কি উপাধিও পায়, অথচ বিদ্যা পায় না। তেমনি তীর্থে অনেকেই যায়, কিন্তু তীর্থের যথার্থ ফল সকলে লাভ করতে পারে না। যারা দেখবার জিনিসকে দেখবে না, পাবার জিনিসকে নেবে না, শেষ পর্যন্তই তাদের বিদ্যা পুঁথিগত ও ধর্ম বাহ্য আচারে আবদ্ধ থাকে। তারা তীর্থে যায় বটে, কিন্তু যাওয়াকেই তারা পুণ্য মনে করে, পাওয়াকে নয়। তারা বিশেষ জল বা বিশেষ মাটির কোনো বস্তুগুণ আছে বলেই কল্পনা করে। এতে মানুষের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়, যা চিত্তের সামগ্রী তাকে বস্তুর মধ্যে নির্বাসিত করে নষ্ট করে। আমাদের দেশে সাধনামার্জিত চিত্তশক্তি যতই মলিন হয়েছে এই নিরর্থক বাহ্যিকতা ততই বেড়ে উঠেছে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আমাদের এই দুর্গতির দিনের জড়ত্বকেই আমি কোনোমতেই ভারতবর্ষের চিরন্তন অভিপ্রায় বলে গ্রহণ করতে পারি নে।

কোনো-একটি বিশেষ নদীর জলে স্নান করলে নিজের অথবা ত্রিকোটি-সংখ্যক পূর্বপুরুষের পারলৌকিক সদ্গতি ঘটার সম্ভাবনা আছে, এ বিশ্বাসকে আমি সমূলক বলে মেনে নিতে রাজি নই এবং এ বিশ্বাসকে আমি বড়ো জিনিস বলে শ্রদ্ধা করি নে। কিন্তু অবগাহন-স্নানের সময় নদীর জলকে যে ব্যক্তি যথার্থ ভক্তির দ্বারা সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনে গ্রহণ করতে পারে, আমি তাকে ভক্তির পাত্র বলেই জ্ঞান করি। কারণ, নদীর জলকে সামান্য তরল পদার্থ বলে সাধারণ মানুষের যে একটা স্থূল সংস্কার, একটা তামসিক অবজ্ঞা আছে, সাত্ত্বিকতার দ্বারা অর্থাৎ চৈতন্যময়তার দ্বারা সেই জড় সংস্কারকে সে লোক কাটিয়ে উঠেছে—এইজন্যে নদীর জলের সঙ্গে কেবলমাত্র তার শারীরিক ব্যবহারের বাহ্যসংস্রব ঘটে নি, তার সঙ্গে তার চিত্তের যোগসাধন হয়েছে। এই নদীর ভিতর দিয়ে পরমচৈতন্য তার চেতনাকে এক ভাবে স্পর্শ করেছেন। সেই স্পর্শের দ্বারা স্নানের জল কেবল তার দেহের মলিনতা নয়, তার চিত্তেরও মোহপ্রলেপ মার্জনা করে দিচ্ছে।

অগ্নি জল মাটি অন্ন প্রভৃতি সামগ্রীর অনন্ত রহস্য পাছে অভ্যাসের দ্বারা আমাদের কাছে একেবারে মলিন হয়ে যায় এইজন্যে প্রত্যহই নানা কর্মে, নানা অনুষ্ঠানে তাদের পবিত্রতা আমাদের স্মরণ করবার বিধি আছে; যে লোক চেতন-

ভাবে তাই স্মরণ করতে পারে, তাদের সঙ্গে যোগে ভূমার সঙ্গে আমাদের যোগ এ কথা যার বোধশক্তি স্বীকার করতে পারে, সে লোক খুব একটি মহৎসিদ্ধি লাভ করেছে। স্নানের জলকে আহারের অন্নকে শ্রদ্ধা করবার যে শিক্ষা সে মূঢ়তার শিক্ষা নয়, তাতে জড়ত্বের প্রশ্রয় হয় না। কারণ, এই-সমস্ত অভ্যস্ত সামগ্রীকে তুচ্ছ করাই হচ্ছে জড়তা; তার মধ্যেও চিত্তের উদ্‌বোধন এ কেবল চৈতন্যের বিশেষ বিকাশেই সম্ভবপর। অবশ্য, যে ব্যক্তি মূঢ়, সত্যকে গ্রহণ করতে যার প্রকৃতিতে স্থূল বাধা আছে, সমস্ত সাধনাকেই সে বিকৃত করে এবং লক্ষ্যকে সে কেবলই ভুল জায়গায় স্থাপন করতে থাকে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

বহুকোটি লোক, প্রায় একটি সমগ্র জাতি, মৎস্যমাংস-আহার একেবারে পরিত্যাগ করেছে, পৃথিবীতে কোথাও এর তুলনা পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে এমন জাতি দেখি নে যে আমিষ আহার না করে।

ভারতবর্ষ এই-যে আমিষ পরিত্যাগ করেছে সে কৃচ্ছ্রব্রতসাধনের জন্যে নয়, নিজের শরীরকে পীড়া দিয়ে কোনো শাস্ত্রোপদিষ্ট পুণ্যলাভের জন্যে নয়; তার একমাত্র উদ্দেশ্য, জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করা।

এই হিংসা ত্যাগ না করলে জীবের সঙ্গে জীবের যোগসামঞ্জস্য নষ্ট হয়। প্রাণীকে যদি আমরা খেয়ে ফেলবার, পেট ভরাবার জিনিস বলে দেখি তবে কখনোই তাকে সত্যরূপে দেখতে পারি নে। তবে প্রাণ জিনিসটাকে এতই তুচ্ছ করে দেখা অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, কেবল আহারের জন্য নয়, শুদ্ধমাত্র প্রাণীহত্যা করাই আমাদের অঙ্গ হয়ে ওঠে এবং নিদারুণ অহৈতুকী হিংসাকে জলে-স্থলে আকাশে গুহায়-গহ্বরে দেশে-বিদেশে মানুষ ব্যাপ্ত করে দিতে থাকে।

এই যোগভ্রষ্টতা এই বোধশক্তির অসাড়তা থেকে ভারতবর্ষ মানুষকে রক্ষা করবার জন্যে চেষ্টা করেছে।

মানুষের জ্ঞান বর্বরতা থেকে অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছে, তার একটি প্রধান লক্ষণ কী? না, মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের সর্বত্রই নিয়মকে দেখতে পাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না দেখতে পাচ্ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞানের সম্পূর্ণ সার্থকতা ছিল না। ততক্ষণ বিশ্বচরাচরে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছিল; সে দেখছিল জ্ঞানের নিয়ম কেবল তার নিজের মধ্যেই আছে, আর এই বিরাট বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে নেই। এইজন্যেই তার জ্ঞান আছে বলেই সে যেন জগতে একঘরে হয়ে ছিল। কিন্তু আজ তার জ্ঞান অণু হতে অণুতম ও বৃহৎ হতে বৃহত্তম সকলের সঙ্গেই নিজের যোগস্থাপনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, এই হচ্ছে বিজ্ঞানের সাধনা।

ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ।

গীতা বলেছেন—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।

ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্ছেন তিনি।

ইন্দ্রিয়সকল কেন শ্রেষ্ঠ? না, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগসাধন হয়। কিন্তু, সে যোগ আংশিক। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ, মনের দ্বারা যে জ্ঞানময় যোগ ঘটে তা ব্যাপকতর। কিন্তু, জ্ঞানের যোগেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দূর হয় না। মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ, বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময় যোগ তা

একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

এই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা।

অতএব, যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ, কেবল কারখানায় দক্ষতাশিক্ষা নয়; স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় পাস করা নয়; আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।

আমাদের স্কুল-কলেজেও তপস্যা আছে, কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা; বোধের তপস্যা নয়।

জ্ঞানের তপস্যায় মনকে বাধামুক্ত করতে হয়। যে-সকল পূর্বসংস্কার আমাদের মনের ধারণাকে এক-ঝোঁকা করে রাখে তাদের ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার করে দিতে হয়। যা নিকটে আছে বলে বড়ো এবং দূরে আছে বলে ছোটো, যা বাইরে আছে বলেই প্রত্যক্ষ এবং ভিতরে আছে বলেই প্রচ্ছন্ন, যা বিচ্ছিন্ন করে দেখলে নিরর্থক, সংযুক্ত করে দেখলেই সার্থক— তাকে তার যাথার্থ্য রক্ষা করে দেখবার শিক্ষা দিতে হয়।

বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা। প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না, সুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়। কামনার জিনিসকে আমরা শ্রেয় দেখি; সে জিনিসটা সত্যই শ্রেয় বলে নয়, আমাদের কামনা আছে বলেই। লোভের জিনিসকে আমরা বড়ো দেখি; সে জিনিসটা সত্যই বড়ো বলে নয়, আমাদের লোভ আছে বলেই।

এইজন্য ব্রহ্মচর্যের সংযমের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক; ভোগবিলাসের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়, যে-সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষুব্ধ এবং বিচারবুদ্ধিকে সামঞ্জস্যভ্রষ্ট করে দেয় তার ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে বুদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়।

যেখানে সাধনা চলছে, যেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত জাতিগত বিরোধবুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেইখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা বলেছে তাই লাভ করবার স্থান।

আমি জানি অনেকেই বলে উঠবেন, এ একটা ভাবুকতার উচ্ছ্বাস, কাণ্ডজ্ঞান-বিহীনের দুরাশা মাত্র। কিন্তু, সে আমি কোনোমতেই স্বীকার করতে পারি নে। যা সত্য তা যদি অসাধ্য হয় তবে তা সত্যই নয়। অবশ্য, যা সকলের চেয়ে শ্রেয় তাই যে সকলের চেয়ে সহজ তা নয়, সেইজন্যেই তার সাধনা চাই। আসলে, প্রথম শক্ত হচ্ছে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করা। টাকা জিনিসটার দরকার আছে, এই বিশ্বাস যখন ঠিক মনে জন্মায় তখন এ আপত্তি আমরা আর করি নে যে, টাকা উপার্জন করা শক্ত। তেমনি ভারতবর্ষ যখন বিদ্যাকেই নিশ্চয়রূপে শ্রদ্ধা করেছিল তখন সেই বিদ্যালাভের সাধনাকে অসাধ্য বলে হেসে উড়িয়ে দেয় নি; তখন তপস্যা আপনি সত্য হয়ে উঠেছিল।

অতএব, প্রথমত দেশের সেই সত্যের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা যদি জন্মে তবে দুর্গম বাধার মধ্য দিয়েও তার পথ আপনিই তৈরি হয়ে উঠবে।

বর্তমানকালে এখনই দেশে এইরকম তপস্যার স্থান, এইরকম বিদ্যালয় যে অনেকগুলি হবে, আমি এমনতরো আশা করি নে। কিন্তু আমরা যখন বিশেষ-ভাবে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি তখন ভারতবর্ষের বিদ্যালয় যেমনটি হওয়া উচিত অন্তত তার একটিমাত্র আদর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য নানা বিরুদ্ধ ভাবের আন্দোলনের ঊর্ধ্বে জেগে ওঠা দরকার হয়েছে।

ন্যাশনাল বিদ্যাশিক্ষা বলতে য়ুরোপ যা বোঝে আমরা যদি তাই বুঝি তবে তা নিতান্তই বোঝার ভুল হবে। আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনোমতে ন্যাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারি নে। জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পূজা করি নে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা। ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—এইটিই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তার মন্ত্র।

প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে মহাসাধনার বনস্পতি একদিন মাথা তুলে উঠেছিল এবং সর্বত্র তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সমাজের নানা দিককে অধিকার করে নিয়েছিল, সেই ছিল আমাদের ন্যাশনাল সাধনা। সেই সাধনা যোগসাধনা। যোগসাধনা কোনো উৎকট শারীরিক মানসিক ব্যায়ামচর্চা নয়। যোগসাধনা মানে সমস্ত জীবনকে এমনভাবে চালনা করা যাতে স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিক্রমশালী হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য না হয়, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠাকেই আমরা চরম পরিণাম বলে মানি; ঐশ্বর্যকে সঞ্চিত করে তোলা নয়, আত্মাকে সত্যে উপলব্ধি করাই আমরা সফলতা বলে স্বীকার করি।

বহুপ্রাচীনকালে একদিন অরণ্যসংকুল ভারতবর্ষে আমাদের আর্যপিতামহেরা প্রবেশ করেছিলেন। আধুনিক ইতিহাসে য়ুরোপীয় দল ঠিক তেমনি করেই নূতন-আবিষ্কৃত মহাদ্বীপের মহারণ্যে পথ উদ্‌ঘাটন করেছেন। তাঁদের মধ্যে সাহসিকগণ অগ্রগামী হয়ে অপরিচিত ভূখণ্ডসকলকে অনুবর্তীদের জন্যে অনুকূল করে নিয়েছেন। আমাদের দেশেও অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিরা অগ্রগামী ছিলেন। তাঁরা অপরিচিত দুর্গমতার বাধা অতিক্রম করে গহন অরণ্যকে বাসোপযোগী করে তুলেছিলেন। পূর্বতন অধিবাসীদের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই তখনো যেমন হয়েছিল এখনো তেমনি হয়েছে। কিন্তু এই দুই ইতিহাসের ধারা যদিও ঠিক একই অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তবু একই সমুদ্রে এসে পৌঁছয় নি।

আমেরিকার অরণ্যে যে তপস্যা হয়েছে তার প্রভাবে বনের মধ্যে থেকে বড়ো বড়ো শহর ইন্দ্রজালের মতো জেগে উঠেছে। ভারতবর্ষেও তেমন করে শহরের সৃষ্টি হয় নি তা নয়, কিন্তু ভারতবর্ষ সেই সঙ্গে অরণ্যকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। অরণ্য ভারতবর্ষের দ্বারা বিলুপ্ত হয় নি, ভারতবর্ষের দ্বারা সার্থক হয়েছিল; যা বর্বরের আবাস ছিল তাই ঋষির তপোবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকায় অরণ্য যা অবশিষ্ট আছে তা আজ আমেরিকার প্রয়োজনের সামগ্রী, কোথাও বা তা ভোগের বস্তুও বটে, কিন্তু যোগের আশ্রম নয়; ভূমার উপলব্ধি দ্বারা এই অরণ্যগুলি পুণ্য স্থান হয়ে ওঠে নি; মানুষের শ্রেষ্ঠতর অন্তরতর প্রকৃতির সঙ্গে এই আরণ্য প্রকৃতির পবিত্র মিলন স্থাপিত হয় নি। অরণ্যকে নব্য আমেরিকা আপনার বড়ো জিনিস কিছুই দেয় নি, অরণ্যও তাকে আপনার বড়ো পরিচয়

থেকে বঞ্চিত করেছে। নূতন আমেরিকা যেমন তার পুরাতন অধিবাসীদের প্রায় লুপ্তই করেছে, আপনার সঙ্গে যুক্ত করে নি, তেমনি অরণ্যগুলিকে আপনার সভ্যতার বাইরে ফেলে দিয়েছে, তার সঙ্গে মিলিত করে নেয় নি। নগরনগরীই আমেরিকার সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন; এই নগরস্থাপনার দ্বারা মানুষ আপনার স্বাতন্ত্র্যের প্রতাপকে অভ্রভেদী করে প্রচার করেছে। আর, তপোবনই ছিল ভারতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন; এই বনের মধ্যে মানুষ নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলনকেই শান্ত সমাহিত ভাবে উপলব্ধি করেছে।

কেউ না মনে করেন, ভারতবর্ষের এই সাধনাকেই আমি একমাত্র সাধনা বলে প্রচার করতে ইচ্ছা করি। আমি বরঞ্চ বিশেষ করে এই কথাই জানাতে চাই যে, মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। সে তালগাছের মতো একটিমাত্র ঋজুরেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে বটগাছের মতো অসংখ্য ডালে-পালায় আপনাকে চার দিকে বিস্তীর্ণ করে দেয়। তার যে শাখাটি যে দিকে সহজে যেতে পারে তাকে সেই দিকেই সম্পূর্ণভাবে যেতে দিলে তবেই সমগ্র গাছটি পরিপূর্ণতা লাভ করে, সুতরাং সকল শাখারই তাতে মঙ্গল।

মানুষের ইতিহাস জীবধর্মী। সে নিগূঢ় প্রাণশক্তিতে বেড়ে ওঠে। সে লোহা-পিতলের মতো ছাঁচে ঢালবার জিনিস নয়। বাজারে কোনো বিশেষ কালে কোনো বিশেষ সভ্যতার মূল্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে বলেই সমস্ত মানবসমাজকে একই কারখানায় ঢালাই করে ফ্যাশনের বশবর্তী মূঢ় খরিদ্দারকে খুশি করে দেবার দুরাশা একেবারেই বৃথা।

ছোটো পা সৌন্দর্য বা আভিজাত্যের লক্ষণ, এই মনে করে কৃত্রিম উপায়ে তাকে সংকুচিত করে চীনের মেয়ে ছোটো পা পায় নি, বিকৃত পা পেয়েছে। ভারতবর্ষও হঠাৎ জবরদস্তি দ্বারা নিজেকে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুগত করতে গেলে প্রকৃত য়ুরোপ হবে না, বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।

এ কথা দৃঢ়রূপে মনে রাখতে হবে, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অনুকরণ-অনুসরণের সম্বন্ধ নয়, আদান-প্রদানের সম্বন্ধ। আমার যে জিনিসের অভাব নেই তোমারও যদি ঠিক সেই জিনিসটাই থাকে তবে তোমার সঙ্গে আমার আর অদল-বদল চলতে পারে না, তা হলে তোমাকে সমকক্ষভাবে আমার আর প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষ যদি খাঁটি ভারতবর্ষ হয়ে না ওঠে তবে পরের বাজারে মজুরিগিরি করা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। তা হলে তার আপনার প্রতি আপনার সম্মানবোধ চলে যাবে এবং আপনাতে আপনার আনন্দও থাকবে না।

তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিন্তভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে; বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্য-ব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবীর নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রকাশ করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে সেই তপস্যা আজ হিন্দু

মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে —দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, ততদিন নানা দিক থেকে আমাদের বারম্বার ব্যর্থ হতে হবে। ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বজীবে দয়া, সর্বভূতে আত্মোপলব্ধি—একদিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা, কেবল মতবাদ-রূপে ছিল না; প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য করে তোলবার জন্যে অনুশাসন ছিল। সেই অনুশাসনকে আজ যদি আমরা বিস্মৃত না হই, আমাদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত করি, তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে এবং কোনো সাময়িক বাহ্য অবস্থা আমাদের সেই স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না।

প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে; এই যোগ অহংকারকে দূর করে বিনম্র হয়ে। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি, এ দুর্বল স্বভাবের অধিগম্য নয়। বায়ুর যে প্রবাহ নিত্য, শান্ততার দ্বারাই ঝড়ের চেয়ে তার শক্তি বেশি। এইজন্যেই ঝড় চিরদিন টিকতে পারে না, এইজন্যেই ঝড় কেবল সংকীর্ণ স্থানকেই কিছুকালের জন্য ক্ষুব্ধ করে, আর শান্ত বায়ুপ্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্যকাল বেষ্টন করে থাকে। যথার্থ নম্রতা, যা সাত্ত্বিকতার তেজে উজ্জ্বল, যা ত্যাগ ও সংযমের কঠোর শক্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, সেই নম্রতাই সমস্তের সঙ্গে অবাধে যুক্ত হয়ে সত্যভাবে নিত্যভাবে সমস্তকে লাভ করে। সে কাউকে দূর করে না, বিচ্ছিন্ন করে না, আপনাকে ত্যাগ করে এবং সকলকেই আপন করে। এইজন্যেই ভগবান যিশু বলেছেন যে, যে বিনম্র সেই পৃথ্বীবিজয়ী, শ্রেষ্ঠধনের অধিকার একমাত্র তারই।

পৌষ ১৩১৬

ধর্মশিক্ষা

বালক-বালিকাদিগকে গোড়া হইতেই ধর্মশিক্ষা কেমন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, এ তর্ক আজকাল খৃস্টান মহাদেশে খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং বোধ করি কতকটা একই কারণে এ চিন্তা আমাদের দেশেও জাগ্রত হইবার উপক্রম করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজে এই ধর্মশিক্ষার কিরূপ আয়োজন হইতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য বন্ধুগণ আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশ লোকের একটা সংকট এই দেখিতে পাই যে, আমাদের একটা মোটামুটি সংস্কার আছে যে ধর্ম জিনিসটা প্রার্থনীয়, অথচ তাহার প্রার্থনাটা আমাদের জীবনে সত্য হইয়া উঠে নাই। এইজন্য তাহা আমরা চাহিও বটে, কিন্তু যতদূর সম্ভব সস্তায় পাইতে চাই—সকল প্রয়োজনের শেষে উদ্‌বৃত্তটুকু দিয়া কাজ সারিয়া লইবার চেষ্টা করি।

সস্তা জিনিস পৃথিবীতে অনেক আছে, তাহাদিগকে অল্প চেষ্টাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু মূল্যবান জিনিস কী করিয়া বিনা মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে এ কথা

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিতে আসে তবে বুঝিতে হইবে, সে ব্যক্তি সিঁধ কাটিবার বা জাল করিবার পরামর্শ চাহে; সে জানে উপার্জনের বড়ো রাস্তাটা প্রশস্ত এবং সেই বড়ো রাস্তা ধরিয়াই জগতের মহাজনেরা চিরকাল মহাজনি করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সেই রাস্তায় চলিবার মতো সময় দিতে বা পাথেয় খরচ করিতে সে রাজি নহে।

তাই ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে আমরা সত্যই কিরূপ পরামর্শ চাহিতেছি সেটা একটু ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার। কারণ, গীতায় বলিয়াছেন, আমাদের ভাবনাটা যেরূপ তাহার সিদ্ধিও সেইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের ভাবনাটা কী? যদি এমন কথা আমাদের মনে থাকে যে, যেমন যাহা আছে এমনিই সমস্ত থাকিবে, তাহাকে বেশি-কিছুই নাড়াচাড়া করিব না অথচ তাহাকেই পূর্ণভাবে সফল করিয়া তুলিব, তবে পিতলকে সোনা করিয়া তুলিবার আশা দেওয়া যে-সকল চতুর লোকের ব্যবসায় তাহাদেরই শরণাপন্ন হইতে হয়।

কিন্তু, এমন অবস্থা আছে যখন ধর্মশিক্ষা নিতান্তই সহজ। একেবারে নিশ্বাস-গ্রহণের মতোই সহজ। তবে কিনা, যদি কোথাও বাধা ঘটে তবে নিশ্বাসগ্রহণ এমনি কঠিন হইতে পারে যে বড়ো বড়ো ডাক্তারেরা হাল ছাড়িয়া দেয়। যখনই মানুষ বলে 'আমার নিশ্বাস লওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছে' তখনই বুঝিতে হইবে, ব্যাপারটা শক্ত বটে।

ধর্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। সমাজে যখন ধর্মের বোধ যে কারণেই হউক উজ্জ্বল হয় তখন স্বভাবতই সমাজের লোক ধর্মের জন্য সকলের চেয়ে বড়ো ত্যাগ করিতে থাকে; তখন ধর্মের জন্য মানুষের চেষ্টা চারি দিকেই নানা আকারে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে থাকে, তখন দেশের ধর্মমন্দির ধনীর ধনের অধিকাংশকে এবং শিল্পীর শিল্পের শ্রেষ্ঠ প্রয়াসকে অনায়াসে আকর্ষণ করিয়া আনে, তখন ধর্ম যে কত বড়ো জিনিস তাহা সমাজের ছেলেমেয়েদের বুঝাইবার জন্য কোনো-প্রকার তাড়না করিবার দরকার হয় না। সেই সমাজে অনেকেই আপনিই ধর্মসাধনার কঠোরতাকে আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইতে পারে। আমাদের দেশের ইতিহাস অনুসরণ করিলে এরূপ সমাজের আদর্শকে নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

ধর্ম যেখানে পরিব্যাপ্ত ধর্মশিক্ষা সেইখানেই স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে তাহা জীবনযাত্রার কেবল একটা অংশমাত্র সেখানে মন্ত্রীরা বসিয়া যতই মন্ত্রণা করুক-না কেন, ধর্মশিক্ষা যে কেমন করিয়া যথার্থরূপে দেওয়া যাইতে পারে ভাবিয়া তাহার কিনারা পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই আধুনিকদের যে দশা ব্রাহ্মসমাজেও তাহাই লক্ষিত হইতেছে। আমাদের বুদ্ধির এবং ইচ্ছার টান বাহিরের দিকেই এত অত্যন্ত যে, অন্তরের দিকে রিক্ততা আসিয়াছে। এই অসামঞ্জস্য যে কী নিদারুণ তাহা উপলব্ধি করিবার অবকাশই পাই না; বাহিরের দিকে ছুটিয়া চলিবার মত্ততা দিন-রাত্রি আমাদিগকে দৌড় করাইতেছে। এমন-কি, আমাদের ধর্মসমাজ-সম্বন্ধীয় চেষ্টাগুলিও নিরন্তর-ব্যস্ততা-ময় উত্তেজনাপরম্পরার আকার ধারণ করিতেছে। অন্তরের দিকে একটুও তাকাইবার যদি অবসর পাইতাম তবে দেখিতাম, তাহা গ্রীষ্মকালের বালুকাবিস্তীর্ণ নদীর মতো—সেখানে অগভীর ধর্মবোধ আমাদের জীবনযাত্রার নিতান্ত এক পাশে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহাকে আমরা অধিক জায়গা ছাড়িয়া দিতে চাই না। আমরা নবযুগের মানুষ, আমাদের জীবন-যাত্রায় সরলতা নাই; আমাদের ভোগের আয়োজন প্রচুর এবং তাহার অভিমানও

অত্যন্ত প্রবল; ধর্ম আমাদের অনেকের পক্ষেই সামাজিকতার একটা অঙ্গমাত্র। এমন-কি, সমাজে এমন লোক দেখিয়াছি যাঁহারা যথার্থ ধর্মনিষ্ঠাকে চিত্তের দুর্বলতা বলিয়া অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিয়া থাকেন।

এইরূপে ধর্মকে যদি আমাদের জীবনের এক কোণে সরাইয়া রাখি, অথচ এই অবস্থায় ছেলেমেয়েদের জন্য ধর্মশিক্ষা কী করিয়া অল্পমাত্রায় ভদ্রতারক্ষার পরিমাণে বরাদ্দ করা যাইতে পারে সে কথা চিন্তা করিয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠি, তবে সেই উদ্‌বেগ অত্যন্ত সহজে কী উপায়ে নিবারণ করা যাইতে পারে তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। তবু বর্তমান অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই ব্যবস্থা চিন্তা করিতে হইবে। অতএব, এ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক সময়ে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই শিক্ষাব্যাপারটা ধর্মাচার্যগণের হাতে ছিল। তখন রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে এমন একটা অনিশ্চয়তা ছিল যে, দেশের সর্বসাধারণে দীর্ঘকাল শান্তি ভোগ করিবার অবসর পাইত না। এইজন্য জাতিগত সমস্ত বিদ্যা ও ধর্মকে অবিচ্ছিন্নভাবে রক্ষা করিবার জন্য স্বভাবতই এমন একটি বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল যাহার প্রতি ধর্মালোচনা ও শাস্ত্রালোচনা ছাড়া আর কোনোপ্রকার সামাজিক দাবি ছিল না, তাহার জীবিকার ভারও সমাজ গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং এই শ্রেণীর লোকেরাই সমাজের শিক্ষক ছিলেন। তখন শিক্ষার বিষয় ছিল সংকীর্ণ, শিক্ষার্থীও ছিল অল্প, এবং শিক্ষকের দলও ছিল একটি সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ। এই কারণে শিক্ষাসমস্যা তখন বিশেষ জটিল ছিল না, তাই তখনকার ধর্মশিক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষা অনায়াসে একত্র মিলিত হইয়াছিল।

এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাষ্ট্রব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জন-সাধারণের শিক্ষালাভের ইচ্ছা চেষ্টা ও সুযোগ প্রশস্ত হইয়া উঠিতেছে; সেই সঙ্গে বিদ্যার শাখাপ্রশাখাও চারি দিকে অবাধে বাড়িয়া চলিয়াছে। এখন কেবল ধর্ম-যাজকগণের রেখাঙ্কিত গণ্ডির ভিতর সমস্ত শিক্ষাব্যাপার বদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিতেছে না।

তবু সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও পুরাতন প্রথা সহজে মরিতে চায় না। তাই বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষা কোনোমতে এ পর্যন্ত ধর্মশিক্ষার সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে জড়িত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, সমস্ত য়ুরোপখণ্ডেই আজ তাহাদের বিচ্ছেদসাধনের জন্য তুমুল চেষ্টা চলিতেছে। এই বিচ্ছেদকে কোনো-মতেই স্বাভাবিক বলিতে পারি না, কিন্তু তবু বিশেষ কারণে ইহা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

কেননা, সেখানকার ইতিহাসে ইহা দেখা গিয়াছে যে, একদিন যে ধর্মসম্প্রদায় দেশের বিদ্যাকে পালন করিয়া আসিয়াছে পরে তাহারাই সে বিদ্যাকে বাধা দিবার সর্বপ্রধান হেতু হইয়া উঠিল। কারণ, বিদ্যা যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকে ততই সে প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের সনাতন সীমাকে চারি দিকেই অতিক্রম করিতে উদ্যত হয়। শুধু যে বিশ্বতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্বন্ধেই সে ধর্মশাস্ত্রের বেড়া ভাঙিতে বসে তাহা নহে, মানুষের চারিত্রনীতিগত নূতন উপলব্ধির সঙ্গেও প্রাচীন শাস্ত্রানুশাসনের আগাগোড়া মিল থাকে না।

এমন অবস্থায় হয় ধর্মশাস্ত্রকে নিজের ভ্রান্তি কবুল করিতে হয়, নয় বিদ্রোহী বিদ্যা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে; উভয়ের এক অন্নে থাকা আর সম্ভবপর হয় না।

কিন্তু ধর্মশাস্ত্র যদি স্বীকার করে যে কোনো অংশে তাহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও

ভ্রান্ত, তবে তাহার প্রতিষ্ঠাই চলিয়া যায়। কারণ, সে বিশুদ্ধ দৈববাণী এবং তাহার সমস্ত দলিল ও পরোয়ানার উপর স্বয়ং সর্বজ্ঞ দেবতার শিলমোহরের স্বাক্ষর আছে, এই বলিয়াই সে আপন শাসন পাকা করিয়া আসিয়াছে। বিদ্যা তখন বিশ্বেশ্বরের বিশ্বশাস্ত্রকে সাক্ষী মানে, আর ধর্মসম্প্রদায় তাহাদের সনাতন ধর্মশাস্ত্রকে সাক্ষী খাড়া করিয়া তোলে—উভয়ের সাক্ষ্যে এমনি বিপরীত অমিল ঘটিতে থাকে যে, ধর্মশাস্ত্র ও বিশ্বশাস্ত্র যে একই দেবতার বাণী এ কথা আর টেকে না এবং এ অবস্থায় ধর্মশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষাকে জোর করিয়া মিলাইয়া রাখিতে গেলে হয় মূঢ়তাকে নয় কপটতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

প্রথম কিছুদিন মারিয়া কাটিয়া, বাঁধিয়া, পুড়াইয়া, একঘরে করিয়া, বিদ্যার দলকে চিরকেলে দাঁড়ে বসাইয়া চিরদিন আপনার পুরাতন বুলি বলাইবার জন্য ধর্মের দল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। কিন্তু, বিদ্যার পক্ষ যতই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল ধর্মের পক্ষ ততই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যার দ্বারা আপনার বুলিকে বৈজ্ঞানিক বুলির সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা শুরু করিয়া দিল। এখন এমন একটা অসামঞ্জস্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, বর্তমান কালে য়ুরোপে রাজা বা সমাজ ধর্মবিশ্বাসকে কঠোর শাসনে আটে-ঘাটে বাঁধিয়া রাখিবার আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে। এইজন্যই পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রায় সর্বত্রই বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে ধর্ম-শিক্ষার যোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইবার আয়োজন চলিতেছে। এইজন্য সেখানে সন্তানদিগকে বিনা ধর্মশিক্ষায় মানুষ করিয়া তোলা ভালো কি মন্দ, সে তর্ক কিছুতেই মিটিতে চাহিতেছে না।

আমাদের দেশেও আধুনিক কালে সে সমস্যা ক্রমশই দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। কেননা, বিদ্যাশিক্ষার দ্বারাতেই আমাদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িতেছে। উভয়ের মধ্যে এক জায়গায় বিরোধ ঘটিয়াছে। কারণ, আমাদের দেশেও সৃষ্টিতত্ত্ব ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি অধিকাংশ বিদ্যাই পৌরাণিক ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। দেবদেবীদের কাহিনীর সঙ্গে তাহারা এমন করিয়া জড়িত যে, কোনোপ্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সাহায্যেও তাহাদিগকে পৃথক করা অসম্ভব বলিলেই হয়। যখনই আমাদের দেশের আধুনিক ধর্মাচার্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-দ্বারা পৌরাণিক কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করিতে বসেন তখনই তাঁহারা বিপদকে উপস্থিতমত ঠেকাইতে গিয়া তাহাকে বদ্ধমূল করিয়া দেন। কারণ, বিজ্ঞানকে যদি একবার বিচারক বলিয়া মানেন তবে কেবলমাত্র ওকালতির জোরে চিরদিন মকদ্দমায় জিত হইবার আশা নাই। বরাহ অবতার যে সত্যসত্যই বরাহবিশেষ নহে, তাহা ভূকম্প-শক্তির রূপকমাত্র, এ কথা বলাও যা আর ধর্মবিশ্বাসের শাস্ত্রীয় ভিত্তিকে কোনো-প্রকারে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া বিদায় করাও তা। কেবলমাত্র শাস্ত্রলিখিত মত ও কাহিনীগুলি নহে, শাস্ত্রীয় সামাজিক অনুশাসনগুলিকেও আধুনিক কালের বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও অবস্থান্তরের সহিত সংগতরূপে মিলাইয়া তোলাও একেবারে অসাধ্য। অতএব, বিজ্ঞান ইতিহাস ও সামাজিক আচারকে আমরা কোনোমতেই শাস্ত্রসীমার মধ্যে খাপ খাওয়াইয়া রাখিতে পারিব না। এমন অবস্থায় আমাদের দেশেও প্রচলিত ধর্মশিক্ষার সহিত অন্য শিক্ষার প্রাণান্তিক বিরোধ ঘটিতে বাধ্য এবং আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত-সারে সেরূপ বিরোধ ঘটিতেছেই। এইজন্য এ দেশে হিন্দুবিদ্যালয়-সম্বন্ধীয় নূতন যে-সকল উদ্যোগ চলিতেছে তাহার প্রধান চিন্তা এই যে, বিদ্যাশিক্ষার মাঝখানে ধর্মশিক্ষাকে স্থান দেওয়া যায় কী করিয়া।

আধুনিক কালের জ্ঞান বিজ্ঞান ও মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আদর্শের সহিত প্রাচীন

ধর্মশাস্ত্রের যে বিরোধ ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু, সেই বিরোধের কথাটা যদি ছাড়িয়া দিই, যদি শিথিলভাবে চিন্তা ও অন্ধভাবে বিশ্বাস করাটাকে দোষ বলিয়া গণ্য না করি, যদি সত্যকে যথাযথরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও অভ্যাসকে আমাদের প্রকৃতিতে সুদৃঢ় করিয়া তোলা মনুষ্যত্বলাভের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক বলিয়া মনে না হয়, তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, এইরূপ বাঁধা ধর্মশাস্ত্রের একটা সুবিধা আছে। ধর্ম সম্বন্ধে বালকদিগকে কী শিখাইব, কেমন করিয়া শিখাইব, তাহা লইয়া বেশি-কিছু ভাবিতে হয় না; তাহাদের বুদ্ধি-বিচারকে উদ্‌বোধিত করিবার প্রয়োজন হয় না, এমন-কি না-করারই প্রয়োজন হয়; কতকগুলি নির্দিষ্ট মত কাহিনী ও আচারকে ধ্রুব সত্য বলিয়া তাহাদের মনে সংস্কার বদ্ধ করিয়া দিলেই যথোচিত ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইল বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

বস্তুত, ব্রাহ্মসমাজে ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে যে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে তাহা এইখানেই। আমরা মানুষের মনকে বাঁধিব কী দিয়া? তাহাকে ব্যাপৃত করিব কিরূপে? তাহাকে আকর্ষণ করিব কী উপায়ে? যেমন কেবলমাত্র বৃষ্টিবর্ষণ হইলেই তাহাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগানো যায় না, তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য নানাপ্রকার পাকা ব্যবস্থা থাকা চাই, তেমনি কেবলমাত্র ধর্মবক্তৃতায় যদি বা ক্ষণকালের জন্য মনকে একটু ভিজায় কিন্তু তাহা গড়াইয়া চলিয়া যায়—মধ্যাহ্নের পিপাসায়, গৃহদাহের দুর্বিপাকে তাহাকে খুঁজিয়া পাই না। তা ছাড়া, মন জিনিসটা কতকটা জলের মতো, তাহাকে কেবল এক দিকে চাপিয়া ধরিলেই ধরা যায় না, তাহাকে সকল দিক দিয়া ঘিরিয়া ধরিতে হয়।

কিন্তু, ব্রাহ্মসমাজে মানুষের মনকে নানা দিক দিয়া আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ধরিবার বাঁধা পদ্ধতি নাই। তাই আমরা কেবলই আক্ষেপ করিয়া থাকি, ছেলেদের মন যে আলগা হইয়া খসিয়া খসিয়া যাইতেছে। তথাপি এইপ্রকার অনির্দিষ্টতার যে অসুবিধা আছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক অতিনির্দিষ্টতার যে সাংঘাতিক অকল্যাণ তাহা স্বীকার করা ব্রাহ্ম-সমাজের পক্ষে প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

ব্রাহ্মধর্মের ভিতরকার এই অনির্দিষ্টতাকে যথাসম্ভব দূর করিয়া তাহাকে এক জায়গায় চিরন্তনরূপে স্থির রাখিবার জন্য আজকাল ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্মকে একটি ধর্মতত্ত্ব, একটি বিশেষ ফিলজফি, বলিতে ইচ্ছা করেন। ইহার মধ্যে কতটুকু দ্বৈত, কতটুকু অদ্বৈত, কতটুকু দ্বৈতাদ্বৈত---ইহার মধ্যে শংকরের প্রভাব কতটা, কতটা কাণ্টের, কতটা হেগেল বা গ্রীনের, তাহা একেবারে পাকা করিয়া একটা-কোনো বিশেষ তত্ত্বকেই চিরকালের মতো ব্রাহ্মধর্ম নাম দিয়া সমাপ্ত করিয়া দিবার জন্য তাঁহারা উদ্যত হইয়াছেন। বস্তুত, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই তাঁহারা অনেকেই এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মধর্মকে নিন্দা করিয়াছেন যে উহা ধর্মই নহে, উহা একটা ফিলজফি মাত্র। ইঁহারা সেই কলংককেই গৌরব বলিয়া বরণ করিয়া লইতে চাহেন।

অথচ ইহা আমরা স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মধর্ম অন্যান্য বিশ্বজনীন ধর্মেরই ন্যায় ভক্তের জীবনকে আশ্রয় করিয়াই ইতিহাসে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা কোনো ধর্মবিদ্যালয়ের টেক্‌স্ট বুক-কমিটির সংকলিত সামগ্রী নহে এবং ইহা গ্রন্থের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে পরিচ্ছন্ন হইয়া কোনো দপ্তরির হাতে মজবুত করিয়া বাঁধাই হইয়া যায় নাই।

যাহা জীবনের সামগ্রী তাহা বাড়িবে, তাহা চলিবে। একটা পাথরকে দেখাইয়া বলিতে পার ইহাকে যেমনটি দেখিতেছ ইহা তেমনিই, কিন্তু একটা বীজ সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তাহার মধ্যে এই একটি আশ্চর্য রহস্য আছে যে, সে যেমনটি সে তাহার চেয়ে অনেক বড়ো। এই রহস্যকে যদি অনির্দিষ্টতা বলিয়া নিন্দা কর তবে ইহাকে জাঁতায় ফেলিয়া পেষো—ইহার জীবধর্মকে নষ্ট করিয়া ফেলো। কিন্তু, যিনি যাহাই বলুন, ব্রাহ্মধর্ম কোনো-একটি বিশেষ নির্দিষ্ট সুপ্রণালীবদ্ধ তত্ত্ববিদ্যা নহে। কারণ, আমরা ইহাকে ভক্তের জীবন-উৎস হইতে উৎসারিত হইতে দেখিয়াছি। তাহা ডোবা নহে, বাঁধানো সরোবর নহে, তাহা কালের ক্ষেত্রে ধাবিত নদী; তাহার রূপ প্রবহমান রূপ, তাহা বাধাহীন বেগে নব নব যুগকে আপন অমৃতধারা পান করাইয়া চলিবে। নব নব হেগেল ও গ্রীন তাহার মধ্যে নব নব পাথরের ঘাট বাঁধাইয়া দিতে থাকিবে, কিন্তু সে-সকল ঘাটকেও তাহা বহু দূরে ছাড়াইয়া চলিবে; কোনো স্পর্ধিত তত্ত্বজ্ঞানীকে সে এমন কথা কদাচ বলিতে দিবে না যে ইহাই তাহার শেষ তত্ত্ব। কোনো দর্শনতত্ত্ব এই ধর্মকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য যদি ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফাঁস লইয়া ছোটে তবে এ কথা তাহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, যদি ইহাকে বন্দী করিতে হয় তবে তাহার আগে ইহাকে বধ করিতে হইবে।

তাই যদি হইল তবে ব্রাহ্মধর্মের ভাবাত্মক লক্ষণটি কী? তাহা একটা মোটা কথা—তাহা অনন্তের ক্ষুধাবোধ, অনন্তের রসবোধ। এই অনন্তের জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া যিনি যেরূপ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কারণ, এরূপ ব্যাখ্যা চিরকালই চলিবে, এ রহস্যের অন্ত পাওয়া যাইবে না; কিন্তু আসল কথা এই যে, রামমোহন রায় হইতে কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত সকলেরই জীবনে আমরা এই অনন্তের ক্ষুধাবোধের আনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেশের প্রচলিত আচার ও ধর্মবিশ্বাস যে তাঁহাদের জ্ঞানকে আঘাত দিয়াছে তাহা নহে, তাঁহাদের প্রাণকে আঘাত দিয়াছে।

কিন্তু, ব্রাহ্মধর্মকে কয়েকজন মানুষের জীবনের মধ্য দিয়া দেখিতে গেলেও তাহাকে ছোটো করিয়া দেখা হইবে। বস্তুত ইহা মানব-ইতিহাসের সামগ্রী। মানুষ আপনার গভীরতম অভাব-মোচনের জন্য নিয়ত যে গূঢ় চেষ্টা করিতেছে ব্রাহ্ম-সমাজের সৃষ্টির মধ্যে আমরা তাহারই পরিচয় পাই। মানুষ যতবারই কৃত্রিম আচারপদ্ধতির দ্বারা অনন্তকে ছোটো করিয়া আপনার সুবিধার মতো করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে ততবারই সে সোনা ফেলিয়া আঁচলে গ্রন্থি বাঁধিয়াছে। আমি একবার অত্যন্ত অদ্ভুত এই একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে, মা তাহার কোলের ছেলেটিকে সর্বত্র অতি সহজে বহন করিবার সুবিধা করিতে গিয়া তাহার মুণ্ডটা কাটিয়া লইয়াছিল। ইহা স্বপ্ন বটে, কিন্তু মানুষ এমন কাজ করিয়া থাকে। আইডিয়াকে সহজসাধ্য করিবার জন্য সে তাহার মাথা কাটিয়া তাহাকে দিব্য সংক্ষিপ্ত করিয়া লয়; ইহাতে মুণ্ডটাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ আয়ত্ত করা যায় বটে, কিন্তু প্রাণটাকেই বাদ দিতে হয়। এমনি করিয়া মানুষ যেটাকে সব চেয়ে বেশি চায় সেইটে হইতেই আপনাকে সব চেয়ে বেশি ফাঁকি দিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় মানুষের মধ্যে দুই দল হইয়া পড়ে। এক দল আপনার সাধনার সামগ্রীকে খেলার সামগ্রী করিয়া সেই খেলাটাকেই সিদ্ধি মনে করে, আর-এক দল ইহাদের খেলার বিঘ্ন না করিয়া অতিদূরে নিভৃতে গিয়া আপনার সাধনার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করে।

কিন্তু এমন করিয়া কখনোই চিরদিন চলে না। যখন চারি দিক অচেতন, সমস্ত দ্বার রুদ্ধ, সমস্ত দীপ নির্বাপিত, অভাব যখন এতই অধিক যে অভাববোধ চলিয়া গিয়াছে, বাধা যখন এত নিবিড় যে মানুষ তাহাকে আপনার আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করিয়া ধরে, সেই সময়েই অভাবনীয়রূপে প্রতিকারের দূত কোথা হইতে দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তাহা বুঝিতেই পারি না। তাহাকে কেহ প্রত্যাশা করে না, কেহ চিনে না, সকলেই তাহাকে শত্রু বলিয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠে। এ দেশে একদিন যখন রাশীকৃত প্রাণহীন সংস্কারের বাধা অনন্তের বোধকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছিল, মানুষের জীবনযাত্রাকে তুচ্ছ ও সমাজকে শতখণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল, মনুষ্যত্বকে যখন আমরা সংকীর্ণ গ্রাম্যতার মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া দেখিতেছিলাম, বিশ্বব্যাপারের কোথাও যখন আমরা একের অমোঘ নিয়ম দেখি নাই, কেবল দশের উৎপাতই কল্পনা করিতেছিলাম, উন্মত্তের দুঃস্বপ্নের মতো যখন সমস্ত জগৎকে বিচিত্র বিভীষিকায় পরিপূর্ণ দেখিতেছিলাম এবং কেবলই মন্ত্রতন্ত্র তাগাতাবিজ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন মানত ও বলিদানের দ্বারা ভীষণ শত্রুকল্পিত সংসারে কোনোমতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম—এইরূপে যখন চিন্তায় ভীরুতা, কর্মে দৌর্বল্য, ব্যবহারে সংকোচ এবং আচারে মূঢ়তা সমস্ত দেশের পৌরুষকে শতদীর্ণ করিয়া অপমানের রসাতলে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল, সেই সময়ে বাহিরের বিশ্ব হইতে আমাদের জীর্ণ প্রাচীরের উপরে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল—সেই আঘাতে যাঁহারা জাগিয়া উঠিলেন তাঁহারা এক মুহূর্তেই নিদারুণ বেদনার সহিত বুঝিতে পারিলেন কিসের অভাব এখানে, কিসের এই অন্ধকার, কিসের এই জড়তা এই অপমান, কিসের এই জীবিত-মৃত্যুর আনন্দহীন সর্বব্যাপী অবসাদ। এখানে আকাশ খণ্ডিত, আলোক নিষিদ্ধ, অনন্তের প্রাণসমীরণ প্রতিহত; এখানে নিখিলের সহিত অবাধ যোগ সহস্র কৃত্রিমতার প্রাচীরে প্রতিরুদ্ধ। তাঁহাদের সমস্ত প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, 'ভূমাকে চাই, ভূমাকে চাই।'

এই কান্নাই সমস্ত মানুষের কান্না। পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ কোথাও বা আপনার বহু প্রাচীন অভ্যাসের আবরণের দ্বারা আপনার মঙ্গলকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে; কোথাও বা সে আপনার নানা রচনার দ্বারা, সঞ্চয়ের দ্বারা কেবলই আপনাকে বড়ো করিতে গিয়া আপনার চেয়ে বড়োকে হারাইয়া ফেলিতেছে; কোথাও বা সে নিষ্ক্রিয়ভাবে জড়তার দ্বারা, কোথাও বা সে সক্রিয়ভাবে প্রয়াসের দ্বারাই, মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতাকে বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছে।

এই বিস্মৃতির গভীর তলদেশ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা, ইহাই আমরা ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসের আরম্ভেই দেখিতে পাই। মানুষের সমস্ত বোধকেই অনন্তের বোধের মধ্যে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসই ব্রাহ্মধর্মের সাধনা-রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাইলাম, রামমোহন রায়ের জীবনের কর্মক্ষেত্র সমস্ত মনুষ্যত্ব। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, সকল দিকেই তাঁহার চিত্ত পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে। কেবলমাত্র কর্মশক্তির স্বাভাবিক প্রাচুর্যই তাহার মূল প্রেরণা নহে—ব্রহ্মের বোধ তাঁহার সমস্ত শক্তিকে অধিকার করিয়াছিল। সেই বোধের মধ্য দিয়া তিনি মানুষকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মানুষকে সকল দিকেই এমন বড়ো করিয়া, এমন সত্য করিয়া দেখিয়াছিলেন; সেইজন্যই তাঁহার দৃষ্টি সমস্ত সংস্কারের বেষ্টন ছাড়াইয়া গিয়াছিল; সেইজন্য কেবল যে তিনি স্বদেশের চিত্তশক্তির বন্ধনমোচন কামনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, মানুষ যেখানেই কোনো

মহৎ অধিকার লাভ করিয়া আপনার মুক্তির ক্ষেত্রকে বড়ো করিতে পারিয়াছে সেইখানেই তিনি তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজে, আরম্ভে এবং আজ পর্যন্ত, এই সত্যকেই আমরা সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতেছি। কোনো বিশেষ শাস্ত্র, বিশেষ মন্দির, বিশেষ দর্শনতন্ত্র বা পূজাপদ্ধতি যদি এই মুক্ত সত্যের স্থান নিজে অধিকার করিয়া লইতে চেষ্টা করে তবে তাহা ব্রাহ্মধর্মের স্বভাববিরুদ্ধ হইবে। আমরা মানুষের জীবনের মধ্যেই এই সত্যকে নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিব যে, অনন্তবোধের আলোকে সমস্তকে দেখা এবং অনন্তবোধের প্রেরণায় সমস্ত কাজ করা ইহাই মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ সিদ্ধি, ইহাই মানুষের সত্যধর্ম।

ধর্মশিক্ষা কেমন করিয়া দেওয়া যাইবে তাহা আলোচনার পূর্বে, আমরা কাহাকে ধর্ম বলি তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া দেখা আবশ্যক বলিয়া এত কথা বলিতে হইল। এ কথা স্থির জানিতে হইবে যে, বাঁধা বচন মুখস্থ করা বা বাঁধা আচার অভ্যাস করা আমাদের ধর্মশিক্ষা নহে। অতএব, ইহার যে অসুবিধা আছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্মে অন্য প্রণালীতে কতকগুলি সহজ সুযোগ আছে, এ কথা চিন্তা করিয়া আমাদিগকে বিচলিত হইলে চলিবে না। কারণ, সত্যের জায়গায় সহজকে বসাইয়া লাভ কী? সোনার চেয়ে যে ধুলা সহজ।

যাহা হউক, এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, স্বাস্থ্য যেমন সমস্ত শরীরকে জুড়িয়া আছে ধর্ম তেমনি মানুষের সমগ্রপ্রকৃতিগত।

স্বাস্থ্যকে টাকা-পয়সার মতো হাতে তুলিয়া দেওয়া যায় না কিন্তু আনুকূল্যের দ্বারা ভিতরের দিক হইতে তাহাকে জাগাইয়া তোলা যায়। তেমনি মানুষের প্রকৃতিনিহিত এই অনন্তের বোধকে, তাহার এই ধর্মপ্রবৃত্তিকে ইতিহাস ভূগোল অঙ্কের মতো স্কুল-কমিটির শাসনাধীনে সমর্পণ করা যায় না, ইন্‌স্পেক্টরের তদন্তজালে তাহার উন্নতির পরিমাণ ধরা পড়ে না এবং পরীক্ষকের নীল পেন্সিলের মার্কা দ্বারা তাহার ফলাফল চিহ্নিত হওয়া অসম্ভব; কেবল সর্বপ্রকার অনুকূল অবস্থার মধ্যে রাখিয়া তাহার সর্বাঙ্গীণ পরিণতি সাধন করা যাইতে পারে, তাহাকে বাঁধা নিয়মে বিদ্যালয়ে দেওয়া-নেওয়ার ব্যবসায়ের জিনিস করা যাইতে পারে না।

সাধকেরা আপনারাই বলিয়াছেন, তাঁহাকে পাইবার পথ 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। অর্থাৎ, এটা কোনোমতেই পঠনপাঠনের ব্যাপার নহে। কিন্তু, কেমন করিয়া সাধকেরা এই পূর্ণতার উপলব্ধিতে গিয়া উপনীত হইয়াছেন তাহা আজ পর্যন্ত কোনো মহাপুরুষ আমাদিগকে বলিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল বলেন : বেদাহমেতং। আমি জানিয়াছি, আমি পাইয়াছি। তাঁহারা বলেন : য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারাই অমৃত হন। কেমন করিয়া যে তাঁহারা ইঁহাকে জানেন সে অভিজ্ঞতা এতই অন্তরতম যে তাহা তাঁহাদের নিজেদেরই গোচর নহে। সে রহস্য যদি তাঁহারা প্রকাশ করিয়া দিতে পারিতেন তবে ধর্মশিক্ষা লইয়া আজ কোনোরূপ তর্কই থাকিত না।

অথচ, ঈশ্বরের বোধ কেমন করিয়া পূর্ণভাবে উদ্‌বোধিত করা যাইতে পারে, এরূপ প্রশ্ন করিলে কোনো কোনো মহাত্মা অত্যন্ত বাঁধা প্রণালীর উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও দেখা গিয়াছে। এক দিকে যেমন এক দল মহাপুরুষ বলিয়াছেন, চিত্তকে শুদ্ধ করো, পাপকে দমন করো, ঈশ্বরের বোধ অন্তরের সামগ্রী, অতএব অন্তরকেই আপন আন্তরিক চেষ্টায় উদ্‌বোধিত করিয়া তোলো, অপর দিকে তেমনি আর-এক

দল বিশেষ বিশেষ বাহ্য প্রক্রিয়ার কথাও বলিয়াছেন। কেহ বা বলেন, যজ্ঞ করো; কেহ বা বলেন, বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করিয়া বিশেষ মূর্তিকে ধ্যান করো; এমন-কি কেহ বা বলেন, মাদক পদার্থের দ্বারা অথবা অন্য নানা উপায়ে শারীরিক উত্তেজনার সাহায্যে মনকে তাড়না করিয়া দ্রুত বেগে সিদ্ধিলাভের দিকে অগ্রসর হইতে থাকো।

এমনি করিয়া যখনই চেষ্টাকে বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত করিবার উপদেশ দেওয়া হয় তখনি প্রমাদের পথ খুলিয়া দেওয়া হয়। তখনই মিথ্যাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না, কল্পনাকে সংযত করা অসাধ্য হয়; তখনই মানুষের বিশ্বাসমুগ্ধতা লুব্ধ হইয়া উঠিয়া কোথাও আপনার সীমা দেখিতে পায় না; মানুষ আপনাকে ভোলায়, অন্যকে ভোলায়, সম্ভব-অসম্ভবের ভেদ বিলুপ্ত হইয়া ধর্মসাধনার ব্যাপার বিচিত্র মূঢ়তায় একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে।

অথচ, যাঁহারা এইরূপ উপদেশ দেন তাঁহারা অনেকেই সাধু ও সাধক। তাঁহারা যে ইচ্ছা করিয়া লোকের মনকে মোহের পথে লইয়া যান তাহা নহে, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহাদের ভুল করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কারণ, পাওয়া এক জিনিস, আর সেই পাওয়া ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণ করিয়া জানা আর-এক জিনিস।

মনে করো, আহার পরিপাক করিবার শক্তি আমার অসামান্য; আমাকে যদি কোনো বেচারা অজীর্ণপীড়িত রোগী আসিয়া প্রশ্ন করে 'তুমি কেমন করিয়া এতটা পরিমাণ খাদ্য ও অখাদ্য বিনা দুঃখে হজম করিতে পার' তবে আমি হয়তো সরল বিশ্বাসে তাহাকে বলিয়া দিতে পারি যে, 'আহারের পর আমি দুই খণ্ড কাঁচা সুপারি মুখে দিয়া বর্মাদেশজাত একটা করিয়া আস্ত চুরুট নিঃশেষে ছাই করিয়া থাকি, ইহাতেই আমার সমস্ত হজম হইয়া যায়।' আসলে আমি যে এতৎসত্ত্বেও হজম করিয়া থাকি তাহা আমি নিজেই জানি না; এমন-কি যে অভ্যাসকে আমি আমার পরিপাকের সহায় বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছি কোনোদিন যদি তাহার অভাব ঘটে তবে আমার নিজেরই মনে হইতে থাকে যে, 'আজ বুঝি পাকযন্ত্রটা তেমন বেশ উৎসাহের সহিত কাজ করিতেছে না।'

শুনা যায়, কবিতা লিখিবার সময় বিখ্যাত জর্মান কবি শিলার পচা আপেল তাঁহার ডেস্কের মধ্যে রাখিতেন। তাঁহার পক্ষে ইহার উগ্র গন্ধ হয়তো একটা উত্তেজনার কাজ করিত। তাঁহার শিষ্য যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত 'আপনি কী করিয়া এমন ভালো কবিতা লেখেন' তবে তিনি আর-কোনো প্রকাশযোগ্য কারণ ঠাহর করিতে না পারিয়া ঐ পচা আপেলটাকেই হয়তো উপায় বলিয়া নির্দেশ করিতেও পারিতেন। এ স্থলে, তিনি যত বড়ো কবি হউন-না কেন, তাঁহার বাক্যকেই যে কবিত্বচর্চার উপায় সম্বন্ধে বেদবাক্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, এমন কথা নাই। এরূপ স্থলে তাঁহাকে যদি মুখের সামনে বলি 'তুমি কবিতাই লিখিতে পার, তাই বলিয়া তাহার উপায় সম্বন্ধে কী জান' তবে তাঁহাকে কবি হিসাবে অশ্রদ্ধা করা হয় না। বস্তুত, স্বাভাবিক প্রতিভা-বশতই যাহারা কোনো-একটা জিনিস পায়, পাওয়ার প্রণালীটা তাহাদেরই কাছে সব চেয়ে বেশি বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

যেমন ব্যক্তিগত অভ্যাসের কথা বলিলাম তেমনি এমন অনেক অভ্যাস আছে যাহা কৌলিক বা স্বাদেশিক। সেই-সকল অভ্যাসমাত্রেই যে শক্তির সঞ্চার করে তাহা নহে; এমন-কি তাহারা শক্তিকে বহিরাশ্রিত করিয়া চিরদুর্বল করিয়া রাখে। অনেক মহাপুরুষ এইরূপ দেশপ্রচলিত অভ্যাসকে অমঙ্গলের হেতু বলিয়া আঘাত

করিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ সংস্কারের প্রভাবে তাহার অবলম্বন ত্যাগ করেন নাই তাহাও দেখা যায়। শেষোক্ত সাধকেরা যে নিজের প্রতিভাগুণে এই-সকল অভ্যাসের বাধা অতিক্রম করিয়াও আসল জায়গায় গিয়া পৌঁছিয়াছেন তাহা সকল সময় নিজেরাও বুঝেন না এবং কখনো বা মনে করেন, 'এখন আমার পক্ষে এই-সকল বাহ্য প্রক্রিয়া বাহুল্য হইলেও গোড়ায় ইহার প্রয়োজন ছিল।' ইহার ফল হয় এই, যাহাদের স্বাভাবিক শক্তি নাই তাহারা কেবলমাত্র এই অভ্যাসগুলিকেই অবলম্বন করিয়া কল্পনা করে যে 'আমরা সার্থকতা লাভ করিয়াছি'; তাহারা অহংকৃত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে এবং যেখানে তাহাদের অভ্যাসের সামগ্রী না দেখিতে পায় সেখানে যে সত্য আছে এ কথা মনে করিতেই পারে না— কারণ, তাহাদের কাছে এই-সকল বাহ্য অভ্যাস এবং সত্য এক হইয়া গেছে।

যে-সকল জিনিসের মূল কারণ বাহিরের অভ্যাস নহে, অন্তরের বিকাশ, তাহাদের সম্বন্ধে কোনো কৃত্রিম প্রণালী থাকিতে পারে না, কিন্তু স্বাভাবিক আনুকূল্য আছে। ধর্মবোধ জিনিসটাকে যদি আমরা কোনো-একটা সাম্প্রদায়িক ফ্যাশান বা ভদ্রতার আসবাব বলিয়া গণ্য না করি, যদি তাহাকে মানুষের সর্বাঙ্গীণ চরম সার্থকতা বলিয়াই জানি, তবে প্রথম হইতেই বালকবালিকাদের মনকে ধর্ম-বোধে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিবার উপযুক্ত স্থান এবং অবকাশ থাকা আবশ্যক, এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে; অর্থাৎ চারি দিকে সেই রকমের হাওয়া আলো আকাশটা থাকা চাই যাহাতে নিশ্বাস লইতেই প্রাণসঞ্চার হয় এবং আপনা হইতেই চিত্ত বড়ো হইয়া উঠিতে থাকে।

নিজের বাড়িতে যদি সেই অনুকূল অবস্থা পাওয়া যায় তবে তো কথাই নাই। অর্থাৎ, সেখানে যদি বৈষয়িকতাই নিজের মূর্তিকে সকলের চেয়ে প্রবল করিয়া না বসিয়া থাকে, যদি অর্থই সেখানে পরমার্থ না হয়, যদি গৃহস্বামী নিজেকেই নিজের সংসারের স্বামী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত না করিয়া থাকেন, যদি তিনি বিশ্বের মঙ্গলময় স্বামীকেই বাক্যে ও ব্যবহারে মানিয়া চলেন, যদি সকলপ্রকার সাময়িক ঘটনাকে নিজের রাগদ্বেষের নিক্তিতে তৌল না করিয়া ভূমার মধ্যে স্থাপিত করিয়া যথাসাধ্য তাহাদিগকে বিচার ও যথোচিতভাবে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, তবে সেইখানেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার স্থান বটে।

এরূপ সুযোগ সকল ঘরে নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ঘরে নাই আর বাহিরে আছে এ কথা বলিলেই বা চলিবে কেন, এ-সব দুর্লভ জিনিস তো আবশ্যক বুঝিয়া ফর্মাশ দিয়া তৈরি করা যায় না। সে কথা সত্য। কিন্তু আবশ্যকতা যদি থাকে এবং তাহার বোধ যদি জাগে তবে আপনিই যে সে আপনার পথ করিতে থাকিবে। সেই পথ করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে; আমরা ইচ্ছা করিতেছি, আমরা সন্ধান করিতেছি, আমরা চেষ্টা করিতেছি। আমরা যা চাই আমাদের মনের মধ্যে তাহার একটা আদর্শ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা যখনি বলিতেছি, 'ব্রাহ্মসমাজের ছেলেরা ধর্মশিক্ষার একটা কেন্দ্র, একটা যথার্থ আশ্রয়, যথার্থভাবে পাইতেছে না' তখনি সে জিনিসটা যে কেমনতরো হইতে পারে তাহার একটা আভাস আমাদের মনে জাগিতেছে।

বস্তুত, ব্রাহ্মসমাজে আমরা দেবমন্দির চাই না, বাহ্য আচার অনুষ্ঠান চাই না, আমরা আশ্রম চাই। অর্থাৎ, যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য এবং মানুষের চিত্তের পবিত্র সাধনা একত্র মিলিত হইয়া একটি যোগাসন রচনা করিতেছে এমন আশ্রম। বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবের আত্মা যুক্ত হইয়াই আমাদের দেবমন্দির স্থাপন

করে এবং স্বার্থবন্ধনহীন মঙ্গলকর্মই আমাদের পূজানুষ্ঠান। এমন কি কোনো-একটি স্থান আমরা পাইব না যেখানে 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' বিশ্বপ্রকৃতিকে এবং মানুষকে, সুন্দরকে এবং মঙ্গলকে এক করিয়া দিয়া প্রাত্যহিক জীবনের কাজে ও পরিবেষ্টনে মানুষের হৃদয়ে সহজে অবাধে প্রত্যক্ষ হইতেছেন? সেই জায়গাটি যদি পাওয়া যায় তবে সেইখানেই ধর্মশিক্ষা হইবে। কেননা পূর্বেই বলিয়াছি, ধর্মসাধনার হাওয়ার মধ্যে স্বভাবের গূঢ় নিয়মেই ধর্মশিক্ষা হইতে পারে, সকল-প্রকার কৃত্রিম উপায় তাহাকে বিকৃত করে ও বাধা দেয়।

আমি জানি, যাঁহারা সকল বিষয়কেই শ্রেণীবিভক্ত ও নামাঙ্কিত করিয়া সংক্ষেপে সরাসরি বিচার করিতে ভালোবাসেন তাঁহারা বলিবেন, 'এটা তো এ কালের কথা হইল না। এ যে দেখি মধ্যযুগের monasticism অর্থাৎ মঠাশ্রয়ী ব্যবস্থা। ইহাতে সংসারের সঙ্গে সাধকজীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়, ইহাতে মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করা হয়, ইহা কোনোমতেই চলিবে না।'

অন্য কোনো-এক কালে যে জিনিসটা ছিল এবং যাহা তাহার চরমে আসিয়া মরিয়াছে তাহার নকল করিতে বলা যে পাগলামি, সে কথা আমি খুবই স্বীকার করি। বর্বরদের ধনুর্বাণ যতই মনোহর হউক তাহাতে এখনকার কালের যোদ্ধার কাজ চলে না।

কিন্তু অসভ্যযুগের যুদ্ধপ্রবৃত্তির উপকরণ সভ্যযুগে যদি বা অনাদৃত হয়, কিন্তু সেই যুদ্ধের প্রবৃত্তিটা তো আছে। তাহা যতক্ষণ লুপ্ত না হয় ততক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন যুগের যুদ্ধব্যাপারের মধ্যে একটা প্রণালীগত সাদৃশ্য থাকিবেই। অতএব, যুদ্ধ করিতে হইলেই ব্যাপারটা তখনকার কাল হইতে একেবারে উল্টা রকমের কিছু হইতে পারিবে না। এখনো সেকালেরই মতো সৈন্য লইয়া দল বাঁধিতে এবং দুই পক্ষে হানাহানি করিতে হইবে।

মানুষের মনের যে ইচ্ছা পূর্বে একদিন ধর্মসাধন উপলক্ষে একটি বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছিল সেই ইচ্ছা যদি আজও প্রবল হইয়া উঠে তবে তাহারও সাধনোপায়, নকল না করিয়াও, অনেকটা সেই পূর্ব-আকার লইবে। এখনকার কালের উপযোগী বলিয়া ইহার একটা স্বাতন্ত্র্যও থাকিবে এবং চিরকালীন সত্যের প্রকাশ বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন কালের সহিত ইহার মিলও থাকিবে। অতএব, মৃত পিতার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ছেলেকে যেমন শ্মশানে দাহ করাটা কর্তব্য নহে, তেমনি সত্যের নূতন প্রকাশচেষ্টা তাহার পুরাতন চেষ্টার সঙ্গে কোনো অংশে মেলে বলিয়াই তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিতে ব্যস্ত হওয়াটাকে সংগত বলিতে পারি না।

অথচ, আমরা অনুকরণচ্ছলে অনেক জিনিস গ্রহণ করি যাহার সংগতি বিচার করি না। যদি বলা গেল এটা বর্তমানকালীন, তবেই যেন তাহার পক্ষে সব কথা বলা হইল। কিন্তু যাহা তোমার বর্তমান তাহা যে আমার বর্তমান নহে, সে কথা চিন্তা করিতে চাই না। এইজন্যই যদি বলা যায় 'আমরা যথাসম্ভব গির্জার মতো একটা পদার্থ গড়িয়া তুলিব' তবে আমাদের মনে মস্ত এই একটা সান্ত্বনা আসে যে, আমরা বর্তমানের সঙ্গে ঠিক তাল রাখিয়া চলিতেছি; অথচ গির্জার হাজার বছরের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগই নাই। কিন্তু যে-সকল ব্যবস্থা আমাদের স্বদেশীয়, যাহা আমাদের জাতির প্রকৃতিগত, তাহাকে আমরা অন্য দেশের ইতিহাসের মধ্যে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া মাথা নাড়িয়া বলি, 'না, ইহা চলিবে না। ইহা মডার্‌ন্ নহে।' মনের এমন অবস্থা মানুষের যখন জন্মায় তখন সে

আধুনিকতা-নামক অপরূপ পদার্থকে গুরু করিয়া তাহার নিকট হইতে কতকগুলো বাঁধা মন্ত্রকে কানে লয় এবং সত্যকে পরিত্যাগ করে।

আমি এখানে কেবল একটা কাল্পনিক প্রসঙ্গ লইয়া তর্ক করিতেছি না। আপনারা সকলেই জানেন, আমার পূজনীয় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বোল-পুরের উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণছায়াতলে যেখানে একদিন তাঁহার নিভৃত সাধনার বেদী নির্মাণ করিয়াছিলেন সেইখানে তিনি একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই আশ্রমের প্রতি কেবল যে তাঁহার একটি গভীর প্রীতি ছিল তাহা নহে, ইহার প্রতি তাঁহার একটি সুদৃঢ় শ্রদ্ধা ছিল। যদিও সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত এই স্থান প্রায় শূন্যই পড়িয়া ছিল তথাপি তাঁহার মনে লেশমাত্র সংশয় ছিল না যে, ইহার মধ্যে একটি গভীর সার্থকতা আছে। সেই সার্থকতা তিনি চক্ষে না দেখিলেও তাহার প্রতি তাঁহার পূর্ণ নির্ভর ছিল। তিনি জানিতেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে ব্যস্ততা নাই কিন্তু অমোঘতা আছে।

একদিন এই আশ্রমে বিদ্যালয়স্থাপনের প্রস্তাব যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল তখন পরমোৎসাহে তিনি সম্মতি দিলেন। এতদিন আশ্রম এই বিদ্যালয়ের জন্যই যে অপেক্ষা করিতেছিল তাহা তিনি অনুভব করিলেন। ছেলেদের মনকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভারই এই আশ্রমের উপর। কারণ, মা যখন সন্তানকে অন্ন দেন তখন এক দিকে তাহা অন্ন, আর-এক দিকে তাহা তাঁহার হৃদয়। এই অন্নের সঙ্গে তাঁহার হৃদয় সম্মিলিত হইয়াই তাহা অমৃত হইয়া উঠে। আশ্রমও বালক-দিগকে যে বিদ্যা-অন্ন দিবে তাহা হোটেলের অন্ন ইস্কুলের বিদ্যা নহে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের একটি প্রাণরস, একটি অমৃতরস, অলক্ষ্যে মিলিত হইয়া তাহাদের চিত্তকে আপনি পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে থাকিবে।

ইহা কেবল আশামাত্র নহে, বস্তুত ইহাই আমরা ঘটিতে দেখিয়াছি। শিক্ষকদের উপদেশ-অনুশাসন নিতান্ত স্থূলভাবে কাজ করে এবং তাহার অধিকাংশই উগ্র ঔষধের মতো কেবল যে ব্যর্থ হয় তাহা নহে, অনিষ্টই করিতে থাকে। কিন্তু এই আশ্রমের অলক্ষ্য ক্রিয়া অত্যন্ত গভীর এবং স্বাভাবিক। কেহ মনে করিবেন না, আমি এখানে কোনো অলৌকিক শক্তির উল্লেখ করিতেছি। এখানে যে একজন সাধক সাধনা করিয়াছেন এবং সেই সাধনার আনন্দই যে এই আশ্রমকে মানুষের চিরদিনের সামগ্রী করিয়া তুলিবার জন্য এখনো নিযুক্ত আছে, তাহা এখানকার সর্বত্রই নানা আকারে প্রকাশমান। বর্তমান আশ্রমবাসী আমরা সেই প্রকাশকে অহরহ নানা প্রকারে বাধা দিয়াও তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারি নাই। সেই প্রকাশটি কেবল বালকদের নহে, শিক্ষকদের মনেও প্রতিনিয়ত অগোচরে কাজ করিয়া চলিয়াছে। এই স্থানটি যে নিতান্ত একটি বিদ্যালয়মাত্র নহে, ইহা যে আশ্রম, কেবলমাত্র এই ভাবটিরই প্রবলতা বড়ো সামান্য নহে।

ইহা দেখা গিয়াছে, যতদিন পর্যন্ত মনে করিয়াছিলাম 'আমরাই বালকদিগকে শিক্ষা দিব' 'আমরাই তাহাদের উপকার করিব' ততদিন আমরা নিতান্তই সামান্য কাজ করিয়াছি। ততদিন যত যন্ত্রই গড়িয়া তুলিয়াছি তত যন্ত্রই ভাঙিয়া ফেলিতে হইয়াছে। এখনো যন্ত্র গড়িবার উৎসাহ আমাদের একেবারে যায় নাই, কেননা এখনো ভিতরের জিনিসটি বেশ করিয়া ভরিয়া উঠে নাই। কিন্তু, তবুও যখন হইতে এই ভাবনাটা আমাদের মনে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল যে আপনারই শূন্যতাকে পূর্ণ করিতে হইবে, আমরাই এখানে পাইতে আসিয়াছি, এখানে বালকদের সাধনার এবং আমাদের সাধনার একই সমতল আসন, এখানে গুরু শিষ্য

সকলেই একই ইস্কুলে সেই মহাগুরুর ক্লাসে ভর্তি হইয়াছি, তখন হইতে ফল যেন আপনি ফলিয়া উঠিল, কাজের শৃংখলা আপনি ঘটিতে লাগিল। এখনো আমাদের যাহা-কিছু নিষ্ফলতা সে এখানেই। যেখানেই আমরা মনে করি 'আমরা দিব অন্যে নিবে' 'সাধনা কেবল ছাত্রদের এবং আমরা তাহার চালক ও নিয়ন্তা' সেখানেই আমরা কোনো সত্য পদার্থ দিতে পারি না: সেইখানেই আমরা নিজের অপরাধ অন্যের স্কন্ধে চাপাই এবং প্রাণের অভাব কলের দ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করি।

নিজেদের এই অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এ কথা আমাকে বিশেষভাবে বলিতে হইবে যে, আমরা অন্যকে ধর্মশিক্ষা দিব এই বাক্যই যেখানে প্রবল সেখানে ধর্মশিক্ষা কখনোই সহজ হইবে না। যেমন, 'অন্যকে দৃষ্টিশক্তি দিব' বলিয়া দীপশিখা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায় না, নিজে সে যে পরিমাণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে সেই পরিমাণে স্বভাবতই অন্যের দৃষ্টিকে সাহায্য করে। ধর্মও সেই প্রকারের জিনিস, তাহা আলোর মতো। তাহার পাওয়া এবং দেওয়া একই কথা, তাহা একেবারে একসঙ্গেই ঘটে। এইজন্যই ধর্মশিক্ষার ইস্কুল নাই, তাহার আশ্রম আছে: যেখানে মানুষের ধর্মসাধনা অহোরাত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সকল কর্মই ধর্মকর্মের অঙ্গ-রূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেইখানেই স্বভাবের নিয়মে ধর্মবোধের উদ্‌বোধন হয়। এইজন্য সকল শাস্ত্রেই সঙ্গকেই ধর্মলাভের সর্বপ্রধান উপায় বলা হইয়াছে। এই সঙ্গ জিনিসটিকে, এই সাধকদের জীবনের সাধনাকে, যদি আমরা কোনো-একটি বিশেষ অনুকূল স্থানে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারি, তাহা যদি স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া না থাকে, তবে এই পুঞ্জীভূত শক্তিকে আমরা মানবসমাজের উচ্চতম ব্যবহারে লাগাইতে পারি।

এ দেশে একদিন তপোবনের এইরূপ ব্যবহারই ছিল: সেখানে সাধনা ও শিক্ষা একত্র মিলিত হইয়াছিল বলিয়া, সেখানে পাওয়া এবং দেওয়ার কাজ অতি সহজে নিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছিল বলিয়াই, তপোবন হৃৎপিণ্ডের মতো সমস্ত সমাজের মর্মস্থান অধিকার করিয়া তাহার প্রাণকে শোধন পরিচালন এবং রক্ষা করিয়াছে। বৌদ্ধ বিহারেরও সেই কাজ ছিল। সেখানে পাওয়া এবং দেওয়া অবিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

এইখানে স্বভাবতই শ্রোতাদের মনে এই প্রশ্ন উঠিবে যে, তবে পূর্বে যে আশ্রমটির কথা বলা হইয়াছে সেখানে কি সাধকদের সমাগমে একটি পরিপূর্ণ ধর্মজীবনের শতদল পদ্ম বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে?

না, তাহা হয় নাই। আমরা যাহারা সেখানে সমবেত হইয়াছি আমাদের লক্ষ্য এক নহে এবং তাহা যে নির্বিশেষে উচ্চ এমন কথাও বলিতে পারি না। আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা যে গভীর এবং ধ্রুব তাহা নহে এবং তাহা আশাও করি না। আমরা যাহাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাম দিয়া থাকি, অর্থাৎ সাংসারিক উন্নতি ও খ্যাতিপ্রতিপত্তির ইচ্ছা, তাহা আমাদের মনে খুবই উচ্চ হইয়া আছে: সকলের-চেয়ে-উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চে স্থাপন করিতে পারি নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ কথা আমি দৃঢ় করিয়া বলিব, সেই আশ্রমের যে আহ্বান তাহা সেই শান্তম্‌ শিবমদ্বৈতম্‌ যিনি তাঁহারই আহ্বান। আমরা যে যাহা মনে করিয়া আসি-না কেন, তিনিই ডাকিতেছেন এবং সে ডাক এক মুহূর্তের জন্য থামিয়া নাই। আমরা কোনো কলরবে সেই অনবচ্ছিন্ন মঙ্গলশঙ্খ-ধ্বনিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারিতেছি না: তাহা সকলের উচ্চে বাজিতেছে, তাহার সুগম্ভীর স্বরতরঙ্গ সেখানকার তরুশ্রেণীর পল্লবে পল্লবে স্পন্দিত হইতেছে এবং

সেখানকার নির্মল আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাহার আলোককে পুলকিত ও অন্ধকারকে নিস্তব্ধ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।

সাধকদের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়; তাঁহারা যখন আসিবেন তখন আসিবেন; তাঁহারা সকলেই কিছু গেরুয়া পরিয়া মাথায় তিলক কাটিয়া আসিবেন না, তাঁহারা এমন দীনবেশে নিঃশব্দে আসিবেন যে তাঁহাদের আগমনবার্তা জানিতেও পারিব না। কিন্তু ইতিমধ্যে ঐ-যে সাধনার আহ্বানটি ইহাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ; এই ভূমার আহ্বানের একেবারে মাঝখানেই আশ্রমবাসীদিগকে বাস করিতে হইতেছে; সেই একাগ্র ধ্বনি যে তাহাদের বিমুখ কর্ণের বধিরতাকে দিনে দিনে ভেদ করিতেছে; সে যে তাহাদের শুষ্ক হৃদয়ের কঠিনতম স্তরের মধ্যেও অগোচরে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে রসসঞ্চার করিতেছে।

এমন কথা আমি একদিন কোনো বন্ধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জনতা হইতে দূরে একটা নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে যে জীবনযাত্রা তাহার মধ্যে একটা শৌখিনতা আছে, তাহার মধ্যে পুরাপুরি সত্য নাই, সুতরাং এখানকার যে শিক্ষা তাহা সম্পূর্ণ কাজের শিক্ষা নহে। কোনো কাল্পনিক আশ্রম সম্বন্ধে এ কথা খাটিতে পারে, কিন্তু আমাদের এই আধুনিক আশ্রমটি সম্বন্ধে এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

সত্য বটে শহরে জনতার অভাব নাই, কিন্তু সেই জনতার সঙ্গে সত্যকার যোগ আছে কয়জন মানুষের? সে জনতা এক হিসাবে ছায়াবাজির ছায়ার মতো। নগরে গৃহস্থ তরঙ্গিত জনতাসমুদ্রের মধ্যে বেষ্টিত হইয়া এক-একটি রবিন্‌সন্‌ ক্রুসোর মতো আপনার ফ্রাইডেটিকে লইয়া নিরালায় দিন কাটাইতে থাকেন। এত বড়ো জনময় নির্জনতা কোথায় পাওয়া যাইবে?

কিন্তু একশো-দুশো মানুষকে এক আশ্রয়ে লইয়া দিনযাপন করাকে কোনো-মতেই নির্জনবাস বলা চলে না। এই-যে একশো-দুশো মানুষ ইহারা দূরের মানুষ নহে, ইহারা পথের পথিক নহে; ইচ্ছা করিলাম ইহাদের সঙ্গ লইলাম, আর ইচ্ছা না হইল তো আপনার ঘরের কোণে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলাম, এমনটি হইবার জো নাই; এই একশো-দুশো মানুষের দিনরাত্রির সমস্ত প্রয়োজনের প্রত্যেক তুচ্ছ অংশটির সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হইবে; ইহাদের সমস্ত সুখদুঃখ সুবিধা-অসুবিধাকে আপনার করিয়া লইতে হইবে---ইহাকেই কি বলে মানুষের সঙ্গ এড়াইয়া দায়িত্ব কাটাইয়া শৌখিন শান্তির মধ্যে একটা বেড়া-দেওয়া পারমার্থিকতার দুর্বল সাধনা?

আমার সেই বন্ধু হয়তো বলিবেন, নির্জনতার কথা ছাড়িয়া দাও, কিন্তু সংসারে যেখানে চারি দিকেই ভালো-মন্দর তরঙ্গ কেবলই উঠাপড়া করিতেছে সেইখানেই ঠিক সত্যভাবে ভালোকে চিনাইয়া দিবার সুযোগ পাওয়া যায়। কাঁটার পরিচয় যেখানে নাই সেখানে কাঁটা বাঁচাইয়া চলিবার শিক্ষা হইবে কেমন করিয়া? কাঁটা-বনের গোলাপটাই সত্যকার গোলাপ, আর বারবার অতি যত্নে চোলাই করিয়া লওয়া সাধুতার গোলাপি আতর একটা নবাবি জিনিস।

হায়, সাধুতার এই নিষ্কণ্টক আতরটি কোন্‌ দোকানে মেলে তাহা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু আমাদের আশ্রমে যে তাহার কারবার নাই তাহা নিজের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারি। কাব্যে পুরাণে সর্বত্রই তপোবনের আদর্শটি অত্যুজ্জ্বল বর্ণনায় বিরাজ করে, কিন্তু তবু সেই বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে বহুতরো 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ' ঘন ঘন উঁকি মারিতেছে। মানুষের আদর্শও যেমন সত্য সেই আদর্শের

ব্যাঘাতও তেমনি সত্য; যাহারা সেই ব্যাঘাতের ভিতর দিয়াই চোখ মেলিয়া আদর্শকে দেখিতে না পারে চোখ বুজিয়া স্বপ্ন দেখা ছাড়া তাহাদের আর গতি নাই।

আমরা যে আশ্রমের কথা বলিতেছি সেখানে লোকালয়ের অন্য বিভাগেরই মতো মন্দের জন্য সিংহদ্বার খোলাই আছে। শয়তানকে সেখানে সকল সময়ে সাপের মতো ছদ্মবেশে প্রবেশ করিতে হয় না, সে দিব্য ভদ্রলোকেরই মতো মাথা তুলিয়া যাতায়াত করে। সেখানে সংসারের নানা দাবি, বৈষয়িকতার নানা আড়ম্বর, প্রবৃত্তির নানা চাঞ্চল্য এবং অহংপুরুষের নানা উদ্ধত মূর্তি সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকালয়ে বরঞ্চ তাহারা তেমন করিয়া চোখেই পড়ে না, কারণ ভালোমন্দ সেখানে একপ্রকার আপস করিয়া মিলিয়া মিশিয়াই থাকে; এখানে তাহাদের মাঝখানে একটা বিচ্ছেদ আছে বলিয়াই মন্দটা এখানে খুব করিয়া দেখা দেয়।

তাই যদি হইল তবে আর হইল কী? বন্ধুরা বলিবেন, যদি সেখানে জনতার চাপ লোকালয়ের চেয়ে কম না হইয়া বরঞ্চ বেশিই হয়, এবং মন্দকেই যদি সেখান হইতে নিঃশেষে ছাঁকিয়া ফেলিবার আশা না করিতে পার, এবং যদি সেখানকার আশ্রমবাসীরা সংসারের সাধারণ লোকেরই মতো মাঝারি রকমেরই মানুষ হন, তবে সেইপ্রকার স্থানই যে বালকবালিকাদের ধর্মশিক্ষার অনুকূল স্থান তাহা কেমন করিয়া বলিবে?

এ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা এই—কবিকল্পনার দ্বারা আগাগোড়া মনোরম করিয়া যে একটা আকাশকুসুমখচিত আশ্রম গড়া যায় না, এ কথাটা আমাকে খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিতে হইতেছে; কারণ, আমার মতো লোকের মুখে কোনো প্রস্তাব শুনিলেই সেটাকে নিরতিশয় ভাবুকতা বলিয়া শ্রোতারা সন্দেহ করিতে পারেন। আশ্রম বলিতে আমি যে কোনো-একটা অদ্ভুত অসম্ভব স্বপ্নসুলভ পদার্থের কল্পনা করিতেছি তাহা নহে। সকল স্থূলদেহধারীর সঙ্গেই তাহার স্থূল দেহের ঐক্য আছে, এ কথা আমি বারম্বার স্বীকার করিব। কেবল যেখানে তাহার সূক্ষ্ম জায়গাটি সেইখানেই তাহার স্বাতন্ত্র্য। সে স্বাতন্ত্র্য সেইখানেই যেখানে তাহার মাঝখানে একটি আদর্শ বিরাজ করিতেছে। সে আদর্শটি সাধারণ সংসারের আদর্শ নহে, সে আদর্শ আশ্রমের আদর্শ; তাহা বাসনার দিকে নয়, সাধনার দিকেই নিয়ত লক্ষ্য নির্দেশ করিতেছে। এই আশ্রম যদি-বা পাঁকের মধ্যেও ফুটিয়া থাকে তবু ভূমার দিকে তাহার মুখ তুলিয়াছে; সে আপনাকে যদি-বা ছাড়িতে না পারিয়া থাকে তবু আপনাকে কেবলই ছাড়াইতে চাহিতেছে; সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেখানেই তাহার পরিচয় নয়, সে যেখানে দৃষ্টি রাখিয়াছে সেইখানেই তাহার প্রকাশ। তাহার সকলের ঊর্ধ্বে যে সাধনার শিখাটি জ্বলিতেছে তাহাই তাহার সর্বোচ্চ সত্য।

কিন্তু, কেনই-বা বড়ো কথাটাকে গোপন করিব? কেনই-বা কেবল কেজো লোকদের মন জোগাইবার জন্য ভিতরকার আসল রসটিকে আড়াল করিয়া রাখিব? এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে আমি অসংকোচে বলিব, আশ্রম বলিতেই আমাদের মনের সামনে যে ছবিটি জাগে, যে ভাবটি ভরিয়া উঠে, তাহা আমাদের সমস্ত হৃদয়কে হরণ করে। তাহার কারণ শুদ্ধমাত্র এ নহে যে, তাহা আমাদের জাতির অনেক যুগের ধ্যানের ধন, সাধনার সৃষ্টি; তাহার গভীর কারণ এই, আমাদের সমস্তের সঙ্গে তাহার ভারী একটি সংগতি দেখিতে পাই, এইজন্যই তাহাকে এমন সত্য,

এমন সুন্দর বলিয়া ঠেকে। বিধাতার কাছে আমরা যে দান পাইয়াছি তাহাকে অস্বীকার করিব কেমন করিয়া? আমরা তো ঘন মেঘের কালিমা-লিপ্ত আকাশের নিচে জন্মগ্রহণ করি নাই; শীতের নিষ্ঠুর পীড়ন আমাদিগকে তো রুদ্ধ ঘরের মধ্যে তাড়না করিয়া বদ্ধ করে নাই; আকাশ যে আমাদের কাছে তাহার বিরাট বক্ষপট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে; আলোক যে কোনোখানে কিছুমাত্র কার্পণ্য রাখিল না; সূর্যোদয় যে ভক্তির পুজাঞ্জলির মতো আকাশে উঠে এবং সূর্যাস্ত যে ভক্তের প্রণামের মতো দিগন্তে নীরবে অবনমিত হয়; কী উদার নদীর ধারা, কী নির্জন গম্ভীর তাহার প্রসারিত তট; অবারিত মাঠ রুদ্রের যোগাসনের মতো স্থির হইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু তবু সে যেন বিষ্ণুর বাহন মহাবিহঙ্গমের মতো তাহার দিগন্ত-জোড়া পাখা মেলিয়া দিয়া কোন্‌ অনন্তের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়াছে সেখানে তাহার গতিকে আর লক্ষ্য করা যাইতেছে না; এখানে তরুতল আমাদিগকে আতিথ্য করে, ভূমিশয্যা আমাদিগকে আহ্বান করে, আতপ্ত বায়ু আমাদিগকে বসন পরাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের দেশে এ-সমস্তই যে সত্য, চিরকালের সত্য। পৃথিবীতে নানা জাতির মধ্যে যখন সৌভাগ্য ভাগ করা হইতেছিল তখন এই-সমস্ত যে আমাদের ভাগে পড়িয়াছিল, তবু আমাদের জীবনের সাধনায় ইহাদের কোনো ব্যবহারই করিব না? এত বড়ো সম্পদ আমাদের চেতনার বহির্দ্বারে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া থাকিবে? আমরাই তো জগৎপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির মিলন ঘটাইয়া চিত্তের বোধকে সর্বানুভূ, ধর্মের সাধনাকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিব, সেইজন্যই এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সেইজন্যই আমাদের দুই চক্ষুর মধ্যে এমন একটি সুগভীর দৃষ্টি আছে যাহা রূপের মধ্যে অরূপকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য স্নিগ্ধ শান্ত অচঞ্চল হইয়া রহিয়াছে; সেইজন্যই অনন্তের বাঁশির সুর এমনি করিয়া আমাদের প্রাণের মধ্যে পৌঁছে যে সেই অনন্তকে আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়া ছুঁইবার জন্য, তাহাকে ঘরে বাহিরে চিন্তায় কল্পনায় সেবায় রসভোগে স্নানে আহারে কর্মে ও বিশ্রামে বিচিত্র প্রকারে ব্যবহার করিবার জন্য আমরা কত কাল ধরিয়া কত দিক দিয়া কত কত পথে কত কত চেষ্টা করিতেছি তাহার অন্ত নাই। সেইজন্য ভারত-বর্ষের আশ্রম ভারতবর্ষের জীবনকে এমন করিয়া অধিকার করিয়াছে, আমাদের কাব্যপুরাণকে এমন করিয়া আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছে; সেইজন্যই ভারতবর্ষের যে দান আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে অক্ষয় হইয়া আছে এই আশ্রমেই তাহার উদ্ভব। নাহয় আজ যে কালে আমরা জন্মিয়াছি তাহাকে আধুনিক কাল বলা হয় এবং যে শতাব্দী ছুটিয়া চলিয়াছে তাহা বিংশ শতাব্দী বলিয়া আদর পাইতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া বিধাতার অতি পুরাতন দান আজ নূতন কালের ভারতবর্ষে কি একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল, তিনি কি আমাদের নির্মল আকাশের উন্মুক্ততায় একেবারে কুলুপ লাগাইয়া দিলেন? নাহয় আমরা কয়জন এই শহরের পোষ্যপুত্র হইয়া তাহার পাথরের প্রাঙ্গণটাকে খুব বড়ো মনে করিতেছি, কিন্তু যে মাতার আমরা সন্তান সেই প্রকৃতি কি ভারতবর্ষ হইতে তাহার দিগন্তবিস্তীর্ণ শ্যামাঞ্চলটি তুলিয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন? তাহা যদি সত্য না হয় তবে আমাদের দেশের বাহিরের ও অন্তরের প্রকৃতিকে নির্বাসিত করিয়া সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে অন্য দেশের ইতিহাসকে অনুসরণ করিয়া চলাকেই মঙ্গলের পথ বলিয়া মানিয়া লইতে পারিব না।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিদ্যালয়টির সহিত আমার জীবনের একাদশবর্ষ জড়িত হইয়াছে, অতএব তাহার সফলতার কথা প্রকাশ করাতে সেটাকে আপনারা

আমার নিরবচ্ছিন্ন অহমিকা বলিয়া মনে করিতে পারেন। সেই আশঙ্কা-সত্ত্বেও আমি আপনাদের কাছে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বিবৃত করিলাম; কারণ, আনুমানিক কথার কোনো মূল্য নাই এবং সকল অপবাদ স্বীকার করিয়াও সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে হইবে। অতএব আমি সবিনয়ে অথচ অসংশয় বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিতেছি যে, যে ধর্ম কোনোপ্রকার রূপকল্পনা বা বাহ্য প্রক্রিয়াকে সাধনার বাধা ও মানুষের বুদ্ধি ও চরিত্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়াই মনে করে সাময়িক বক্তৃতা বা উপদেশের দ্বারা সে ধর্ম মানুষের চিত্তকে সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারিবে না। সে ধর্মের পক্ষে এমন-সকল আশ্রমের প্রয়োজন যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের যোগ ব্যবধানবিহীন ও যেখানে তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধ স্বাভাবিক, যেখানে ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণবাহুল্য নিত্যই মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ করিতেছে না, সাধনা যেখানে কেবলমাত্র ধ্যানের মধ্যেই বিলীন না হইয়া ত্যাগে ও মঙ্গলকর্মে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে, কোনো সংকীর্ণ দেশকালপাত্রের দ্বারা কর্তব্যবুদ্ধিকে খণ্ডিত না করিয়া যেখানে বিশ্বজনীন মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিবার অনুশাসন গভীরভাবে বিরাজ করিতেছে, যেখানে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে শ্রদ্ধার চর্চা হইতেছে, জ্ঞানের আলোচনায় উদারতার ব্যাপ্তি হইতেছে এবং সকল দেশের মহাপুরুষদের চরিত স্মরণ করিয়া ভক্তির সাধনায় মন রসাভিষিক্ত হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সংকীর্ণ বৈরাগ্যের কঠোরতার দ্বারা মানুষের সরল আনন্দকে বাধাগ্রস্ত করা হইতেছে না ও সংযমকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতার উল্লাসই সর্বদা প্রকাশমান হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত ও নৈশ আকাশে জ্যোতিষ্কসভার নীরব মহিমা প্রতিদিন ব্যর্থ হইতেছে না এবং প্রকৃতির ঋতু-উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আনন্দসংগীত একসুরে বাজিয়া উঠিতেছে, যেখানে বালকগণের অধিকার কেবলমাত্র খেলা ও শিক্ষার মধ্যে বদ্ধ নহে—তাহারা নানাপ্রকার কল্যাণভার লইয়া কর্তৃত্বগৌরবের সহিত প্রতি দিনের জীবনচেষ্টার দ্বারা আশ্রমকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে, এবং যেখানে ছোটো-বড়ো বালকবৃদ্ধ সকলেই একাসনে বসিয়া নতশিরে বিশ্বজননীর প্রসন্ন হস্ত হইতে জীবনের প্রতিদিনের এবং চিরদিনের অন্ন গ্রহণ করিতেছে।

মাঘ ১৩১৮

শিক্ষাবিধি

এখানে আসিবার সময় আমার একটা সংকল্প ছিল, এখানকার বিদ্যালয়গুলিকে ভালো করিয়া দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া লইব, শিক্ষা সম্বন্ধে এখানকার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে খাটে কি না তাহা দেখিয়া যাইব। সামান্য কিছু দেখিয়াছি, কাগজে পত্রে এখানকার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও পড়িয়াছি। পরীক্ষা নানা প্রকারের চলিতেছে, প্রণালী নানা রকমের উদ্ভাবিত হইতেছে। এক দল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষা যথাসম্ভব সুখকর হওয়া উচিত; আর-এক দল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষার মধ্যে দুঃখের ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে তাহাদিগকে সংসারের জন্য পাকা করিয়া মানুষ করা যায় না। এক দল বলিতেছে, চোখে-কানে ভাবে-আভাসে শিক্ষার বিষয়গুলিকে প্রকৃতির মধ্যে শোষণ করিয়া

লইবার ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা; আর-এক দল বলিতেছে, সচেষ্টভাবে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করিয়া সাধনার দ্বারা বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিয়া লওয়াই যথার্থ ফলদায়ক। বস্তুত, এ দ্বন্দ্ব কোনোদিনই মিটিবে না; কেননা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এ দ্বন্দ্ব সত্য— সুখও তাহাকে শিক্ষা দেয়, দুঃখও তাহাকে শিক্ষা দেয়; শাসন নহিলেও তাহার চলে না, স্বাধীনতা নহিলেও তাহার রক্ষা নাই; এক দিকে তাহার পড়িয়া-পাওয়া জিনিসের প্রবেশদ্বার খোলা, আর-এক দিকে তাহার খাটিয়া-আনা জিনিসের আনাগোনার পথ উন্মুক্ত। এ কথা বলা সহজ যে, দুইয়ের মাঝখানের পথটিকে পাকা করিয়া চিহ্নিত করিয়া লও, কিন্তু কার্যত তাহা অসাধ্য। কারণ, জীবনের গতি কোনোদিনই একেবারে সোজা রেখায় চলে না— অন্তর-বাহিরের নানা বাধায় ও নানা তাগিদে সে নদীর মতো আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলে, কাটা খালের মতো সিধা পড়িয়া থাকে না; অতএব তাহার মাঝখানের রেখাটি সোজা রেখা নহে, তাহাকেও কেবলই স্থান-পরিবর্তন করিতে হয়। এখন তাহার পক্ষে যাহা মধ্যরেখা আর-এক সময়ে তাহাই তাহার পক্ষে চরম প্রান্তরেখা; এক জাতির পক্ষে যাহা প্রান্তপথ, আর-এক জাতির পক্ষে তাহাই মধ্যপথ। নানা অনিবার্য কারণে মানুষের ইতিহাসে কখনো যুদ্ধ আসে, কখনো শান্তি আসে; কখনো ধন-সম্পদের জোয়ার আসে, কখনো তাহার ভাঁটার দিন উপস্থিত হয়; কখনো নিজের শক্তিতে সে উন্মত্ত হইয়া উঠে, কখনো নিজের অক্ষমতাবোধে সে অভিভূত হইয়া পড়ে। এমন অবস্থায় মানুষ যখন এক দিকে হেলিয়া পড়িতেছে তখন আর-এক দিকে প্রবল টান দেওয়াই তাহার পক্ষে সংশিক্ষা। মানুষের প্রকৃতি যখন সবল-ভাবে সজীব থাকে তখন আপনার ভিতর হইতেই একটা সহজ শক্তিতে আপনার ভারসামঞ্জস্যের পথ সে বাছিয়া লয়। যে মানুষের নিজের শরীরের উপর দখল আছে সে যখন এক দিক হইতে ধাক্কা খায় তখন সে স্বভাবতই অন্য দিকে ভর দিয়া আপনাকে সামলাইয়া লয়, কিন্তু মাতাল একটু ঠেলা খাইলেই কাৎ হইয়া পড়ে এবং সেই অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে। য়ুরোপে ছেলেদের মানুষ করিবার পন্থা আপনা-আপনি পরিবর্তিত হইতেছে। ইহাদের চিত্ত যতই নানা ভাবের জ্ঞানের অভিজ্ঞতার সংস্রবে সচেতন হইয়া উঠিতেছে ততই ইহাদের পথের পরিবর্তন দ্রুত হইতেছে।

অতএব, চিত্তের গতি-অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দেশ করিতে হয়। কিন্তু যেহেতু গতি বিচিত্র এবং তাহাকে সকলে স্পষ্ট করিয়া চোখে দেখিতে পায় না, এইজন্যই কোনোদিনই কোনো এক জন বা এক দল লোক এই পথ দৃঢ় করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না। নানা লোকের নানা চেষ্টার সমবায়ে আপনিই সহজ পথটি অঙ্কিত হইতে থাকে। এইজন্য সকল জাতির পক্ষেই আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সত্যপথ-আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা।

কিন্তু, যে দেশে সামাজিক শিক্ষাশালায় বাঁধা প্রথা হইতে এক চুল সরিয়া গেলে জাত হারাইতে হয় সে দেশে মানুষ হইবার পক্ষে গোড়াতেই একটা প্রকাণ্ড বাধা। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছেই এবং ঘটিবেই, কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না, অথচ ব্যবস্থাকে সনাতন রেখায় পাকা করিয়া রাখিলে মানুষের পক্ষে তেমন দুর্গতির কারণ আর-কিছুই হইতে পারে না। এ কেমনতরো? যেমন, নদী সরিয়া যাইতেছে, কিন্তু বাঁধা ঘাট একই জায়গায় পড়িয়া আছে; খেয়া-নৌকার পথ একই জায়গায় নির্দিষ্ট; সে ঘাট ছাড়া অন্য ঘাটে নামিলে ধোবা নাপিত বন্ধ। সুতরাং, ঘাট আছে কিন্তু জল পাই না, নৌকা আছে কিন্তু তাহার চলা বন্ধ।

এমন অবস্থায় আমাদের সমাজ আমাদের কালের উপযোগী শিক্ষা আমাদিগকে দিতেছে না, আমাদিগকে দুই-চারি হাজার বৎসর পূর্ব-কালের শিক্ষা দিতেছে। অতএব, মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে সকলের চেয়ে যে বড়ো বিদ্যালয় সেটা আমাদের বন্ধ। আমাদের বর্তমান কালের দিকে তাকাইয়া আমাদের জীবনযাত্রার প্রতি তাহার কোনো দাবি নাই। একদিন আমাদের ইতিহাসের একটা বিশেষ অবস্থায় আমাদের সমাজ মানুষের কাহাকেও ব্রাহ্মণ, কাহাকেও ক্ষত্রিয়, কাহাকেও বৈশ্য বা শূদ্র হইতে বলিয়াছিল। আমাদের প্রতি তাহার এই একটা কালোপযোগী দাবি ছিল, সুতরাং এই দাবির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা বিচিত্র আকারে আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল। কারণ, সৃষ্টির নিয়মই তাই; একটা মূল ভাবের বীজ জীবনের তাগিদে স্বতই আপন শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া ওঠে, বাহির হইতে কেহ ডালপালা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জুড়িয়া দেয় না। আমাদের বর্তমান সমাজের কোনো সজীব দাবি নাই; এখনো সে মানুষকে বলিতেছে, 'ব্রাহ্মণ হও, শূদ্র হও।' যাহা বলিতেছে তাহা সত্যভাবে পালন করা কোনোমতেই সম্ভবপর নহে, সুতরাং মানুষ তাহাকে কেবলমাত্র বাহিরের দিক হইতে মানিয়া লইতেছে। ব্রাহ্মণ হইবার কালে ব্রহ্মচর্য নাই, মাথা মুড়াইয়া তিন দিনের প্রহসন অভিনয়ের পর গলায় সূত্রধারণ আছে। তপস্যার দ্বারা পবিত্র জীবনের শিক্ষা ব্রাহ্মণ এখন আর দান করিতে পারে না, কিন্তু পদধূলিদানের বেলায় সে অসংকোচে মুক্তপদ। এ দিকে জাতিভেদের মূল প্রতিষ্ঠা বৃত্তিভেদ একেবারেই ঘুচিয়া গেছে এবং তাহাকে রক্ষা করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছে, অথচ বর্ণভেদের বাহ্য বিধিনিষেধ সমস্তই অচল হইয়া বসিয়া আছে। খাঁচাটাকে তাহার সমস্ত লোহার শিক ও শিকল-সমেত মানিতেই হইবে, অথচ পাখিটা মরিয়া গেছে। দানাপানি নিয়ত জোগাইতেছি, অথচ তাহা কোনো প্রাণীর খোরাকে লাগিতেছে না। এমনি করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনের সঙ্গে সামাজিক বিধির বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাওয়াতে আমরা কেবল যে অনাবশ্যক কালবিরোধী ব্যবস্থার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হইয়া আছি তাহা নহে, আমরা সামাজিক সত্যরক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমরা মূল্য দিতেছি ও লইতেছি, অথচ তাহার পরিবর্তে কোনো সত্যবস্তু নাই। শিষ্য গুরুকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণা চুকাইয়া দিতেছে, কিন্তু গুরু শিষ্যকে গুরুর দেনা শোধ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেছে না এবং গুরু পুরাকালের বিস্মৃত ভাষায় শিষ্যকে উপদেশ দিতেছে— শিষ্যের তাহা গ্রহণ করিবার মতো শ্রদ্ধাও নাই, সাধ্যও নাই, ইচ্ছাও নাই। ইহার ফল হইতেছে এই, সত্যবস্তুর যে কোনো প্রয়োজন আছে এই বিশ্বাসটাই আমরা ক্রমশ হারাইতেছি। এ কথা স্বীকার করিতে আমরা লেশমাত্র লজ্জাও বোধ করি না যে, বাহিরের ঠাট বজায় রাখিয়া গেলেই যথেষ্ট। এমন-কি, এ কথা বলিতেও আমাদের বাধে না যে 'ব্যবহারত যথেচ্ছাচার করো কিন্তু প্রকাশ্যত তাহা কবুল না করিলে কোনো ক্ষতি নাই'। এমনতরো মিথ্যাচার মানুষকে দায়ে পড়িয়া অবলম্বন করিতে হয়। কারণ, যখন তোমার শ্রদ্ধা অন্য পথে গিয়াছে তখনো সমাজ যদি কঠোর শাসনে আচারকে একই জায়গায় বাঁধিয়া রাখে তাহা হইলে সমাজের পনেরো আনা লোক মিথ্যাচারকে অবলম্বন করিতে লজ্জাবোধ করে না। কারণ, মানুষের মধ্যে বীরপুরুষের সংখ্যা অল্প; অতএব সত্যকে প্রকাশ্যে স্বীকার করিবার দণ্ড যেখানে অসহ্যরূপে অতিমাত্র সেখানে কপটতাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা আর চলে না। এইজন্য আমাদের দেশে এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যহই দেখা যায়— মানুষ একটা জিনিসকে ভালো বলিয়া

স্বীকার করিতে অনায়াসে পারে, অথচ সেই মুহূর্তেই অম্লানবদনে বলিতে পারে যে 'সামাজিক ব্যবহারে ইহা আমি পালন করিতে পারিব না'। আমরাও এই মিথ্যাচারকে ক্ষমা করি যখন চিন্তা করিয়া দেখি, এ সমাজে নিজের সত্যবিশ্বাসকে কাজে খাটাইবার মাশুল কত অসাধ্যরূপে অতিরিক্ত।

অতএব, সমাজ যেখানে জীবনপ্রবাহের সহিত আপন স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্যের পথ একেবারেই খোলা রাখে নাই, সুতরাং পুরাতন কালের ব্যবস্থা যেখানে পদে পদে বাধাস্বরূপ হইয়া তাহাকে বদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, সেখানে মানুষের যে শিক্ষাশালা সকলের চেয়ে স্বাভাবিক ও প্রশস্ত সেটা যে আমাদের পক্ষে নাই তাহা নহে—তাহা তদপেক্ষা ভয়ংকর, তাহা আছে অথচ নাই, তাহা সত্যকে পথ ছাড়িয়া দেয় না এবং মিথ্যাকে জমাইয়া রাখে। এ সমাজ গতিকে একেবারেই স্বীকার করিতে চায় না বলিয়া স্থিতিকে কলুষিত করিয়া তোলে।

সামাজিক বিদ্যালয়ের তো এই বদ্ধ দশা, তাহার পরে রাজকীয় বিদ্যালয়। সেও একটা প্রকাণ্ড ছাঁচে-ঢালা ব্যাপার। দেশের সমস্ত শিক্ষাবিধিকে সে এক ছাঁচে শক্ত করিয়া জমাইয়া দিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চেষ্টা। পাছে দেশ আপনার স্বতন্ত্র প্রণালী আপনি উদ্ভাবিত করিতে চায়, ইহাই তাহার সব চেয়ে ভয়ের বিষয়। দেশের মনঃপ্রকৃতিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া সে আপনার আইন খাটাইবে, ইহাই তাহার মতলব। সুতরাং এই বৃহৎ বিদ্যার কল কেরানিগিরির কল হইয়া উঠিতেছে। মানুষ এখানে নোটের নুড়ি কুড়াইয়া ডিগ্রির বস্তা বোঝাই করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তাহা জীবনের খাদ্য নহে। তাহার গৌরব কেবল বোঝাইয়ের গৌরব, তাহা প্রাণের গৌরব নহে।

সামাজিক বিদ্যালয়ের পুরাতন শিকল এবং রাজকীয় বিদ্যালয়ের নূতন শিকল দুইই আমাদের মনকে যে পরিমাণে বাঁধিতেছে সে পরিমাণে মুক্তি দিতেছে না, ইহাই আমাদের একমাত্র সমস্যা। নতুবা নূতন প্রণালীতে কেমন করিয়া ইতিহাস মুখস্থ সহজ হইয়াছে বা অঙ্ক কষা মনোরম হইয়াছে, সেটাকে আমি বিশেষ খাতির করিতে চাই না। কেননা আমি জানি, আমরা যখন প্রণালীকে খুঁজি তখন একটা অসাধ্য সস্তা পথ খুঁজি। মনে করি, উপযুক্ত মানুষকে যখন নিয়মিত ভাবে পাওয়া শক্ত তখন বাঁধা প্রণালীর দ্বারা সেই অভাব পূরণ করা যায় কি না। মানুষ বারবার সেই চেষ্টা করিয়া বারবারই অকৃতকার্য হইয়াছে এবং বিপদে পড়িয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া যেমন করিয়াই চলি-না কেন শেষকালে এই অলঙ্ঘ্য সত্যে আসিয়া ঠেকিতেই হয় যে, শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষাবিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না। মানুষের মন চলনশীল এবং চলনশীল মনই তাহাকে বুঝিতে পারে। এ দেশেও পুরাকাল হইতে আজ পর্যন্ত এক-একজন বিখ্যাত শিক্ষক জন্মিয়াছেন, তাঁহারাই ভগীরথের মতো শিক্ষার পুণ্য স্রোতকে আকর্ষণ করিয়া সংসারের পাপের বোঝা হ্রাস করিয়াছেন ও মৃত্যুর জড়তা দূর করিয়াছেন। তাঁহারাই শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমস্ত বাঁধা বিধানের বাধার ভিতর দিয়াও ছাত্রদের মনে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশেও ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভদিনের কথা স্মরণ করিয়া দেখো। ডিরোজিয়ো, কাপ্তেন রিচার্ড্‌সন, ডেভিড হেয়ার, ইঁহারা শিক্ষক ছিলেন; শিক্ষার ছাঁচ ছিলেন না, নোটের বোঝার বাহন ছিলেন না। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যূহ এমন ভয়ংকর পাকা ছিল না, তখন তাহার মধ্যে আলো এবং হাওয়া-প্রবেশের উপায় ছিল; তখন নিয়মের ফাঁকে শিক্ষক আপন আসন পাতিবার স্থান করিয়া লইতে পারিতেন।

যেমন করিয়া হউক, আমাদের দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করিতেই হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি বাহ্য পন্থায় আমরা আমাদের চেষ্টাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া বিশেষ কোনো ফল পাইতেছি না। সেই শক্তিকে ও উদ্যমকে সফলতার পথে প্রবাহিত করিয়া স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমাদের নিজেকে লইতে হইবে। দেশের কাজে যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিতে চান এইটেই তাঁহাদের সব চেয়ে প্রধান কাজ। নানা শিক্ষকের নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া আমাদের দেশের শিক্ষার স্রোতকে সচল করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই তাহা আমাদের দেশের স্বাভাবিক সামগ্রী হইয়া উঠিবে। তবেই আমরা স্থানে স্থানে ও ক্ষণে ক্ষণে যথার্থ শিক্ষকের দেখা পাইব। তবেই স্বভাবের নিয়মে শিক্ষকপরম্পরা আপনি জাগিয়া উঠিতে থাকিবে। 'জাতীয়' নামের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া আমরা কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধিকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিতে পারি না। যে শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার দ্বারা নানা ভাবে চালিত হইতেছে তাহাকেই 'জাতীয়' বলিতে পারি। স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনে হউক, যখন কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা কোনো ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে 'জাতীয়' বলিতে পারিব না; তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।

শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম, মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মানুষ থাকে না, সে তখন আপিস-আদালতের বা কল-কারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে; তখনি সে মানুষ না হইয়া মাস্টার-মশায় হইতে চায়; তখনি সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়। গুরু-শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিতস্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে। কারণ, শিশুদের পালন ও শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতামাতার উপর। কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকাতেই অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাবশ্যক হইয়া ওঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসকে টাকা দিয়া কিনিয়া বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, তাহা স্নেহ-প্রেম-ভক্তির দ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি; তাহাই মনুষ্যত্বের পাকযন্ত্রের জারকরস, তাহাই জৈব সামগ্রীকে জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত করিতে পারে। বর্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাবশ্যক হইয়াছে। শিশুবয়সে নির্জীব শিক্ষার মতো ভয়ংকর ভার আর কিছুই নাই, তাহা মনকে যতটা দেয় তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশি। আমাদের সমাজব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া হউক, সকল দিকেই আমরা মানুষকে চাই; তাহার পরিবর্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোনো কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

চ্যাল্‌ফোর্ড্‌। ৩১ শ্রাবণ ১৩১৯

আশ্বিন ১৩১৯

লক্ষ্য ও শিক্ষা

আমার কোনো-এক বন্ধু ফলিত জ্যোতিষ লইয়া আলোচনা করেন। তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, যে-সব মানুষ বিশেষ কিছুই নহে, যাহাদের জীবনে হাঁ এবং না জিনিসটা খুব স্পষ্ট করিয়া দাগা নাই, জ্যোতিষের গণনা তাহাদের সম্বন্ধে ঠিক দিশা পায় না। তাহাদের সম্বন্ধে শুভগ্রহ ও অশুভগ্রহের ফল কী তাহা হিসাবের মধ্যে আনা কঠিন। বাতাস যখন জোরে বহে তখন পালের জাহাজ হুহু করিয়া দুই দিনের রাস্তা এক দিনে চলিয়া যাইবে এ কথা বলিতে সময় লাগে না, কিন্তু কাগজের নৌকাটা এলোমেলো ঘুরিতে থাকিবে কি ডুবিয়া যাইবে, কি কী হইবে তাহা বলা যায় না। যাহার বিশেষ কোনো একটা বন্দর নাই তাহার অতীতই বা কী আর ভবিষ্যৎই বা কী? সে কিসের জন্য প্রতীক্ষা করিবে, কিসের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিবে? তাহার আশা-তাপমানযন্ত্রে দুরাশার উচ্চতম রেখা অন্য দেশের নৈরাশ্যরেখার কাছাকাছি।

আমাদের দেশের বর্তমান সমাজে এই অবস্থাটাই সব চেয়ে সাংঘাতিক অবস্থা— আমাদের জীবনে সুস্পষ্টতা নাই। আমরা যে কী হইতে পারি, কতদূর আশা করিতে পারি, তাহা বেশ মোটা লাইনে বড়ো রেখায় দেশের কোথাও আঁকা নাই। আশা করিবার অধিকারই মানুষের শক্তিকে প্রবল করিয়া তোলে। প্রকৃতির গৃহিণীপনায় শক্তির অপব্যয় ঘটিতে পারে না, এইজন্য আশা যেখানে নাই শক্তি সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে চক্ষুষ্মান প্রাণীরা যখন দীর্ঘকাল গুহবাসী হইয়া থাকে তখন তাহারা দৃষ্টিশক্তি হারায়। আলোক থাকিবে না অথচ দৃষ্টি থাকিবে এই অসংগতি যেমন প্রকৃতি সহিতে পারে না তেমনি আশা নাই অথচ শক্তি আছে ইহাও প্রকৃতির পক্ষে অসহ্য। এইজন্য বিপদের মুখে পলায়নের যখন উপায় নাই পলায়নের শক্তিও তখন আড়ষ্ট হইয়া পড়ে।

এই কারণে দেখা যায়, আশা করিবার ক্ষেত্র বড়ো হইলেই মানুষের শক্তিও বড়ো হইয়া বাড়িয়া ওঠে। শক্তি তখন স্পষ্ট করিয়া পথ দেখিতে পায় এবং জোর করিয়া পা ফেলিয়া চলে। কোনো সমাজ সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস যাহা মানুষকে দিতে পারে তাহা সকলের চেয়ে বড়ো আশা। সেই আশার পূর্ণ সফলতা সমাজের প্রত্যেক লোকেই যে পায় তাহা নহে; কিন্তু নিজের গোচরে এবং অগোচরে সেই আশার অভিমুখে সর্বদাই একটা তাগিদ থাকে বলিয়াই প্রত্যেকের শক্তি তাহার নিজের সাধ্যের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। একটা জাতির পক্ষে সেইটেই সকলের চেয়ে মস্ত কথা। লোকসংখ্যার কোনো মূল্য নাই; কিন্তু সমাজে যতগুলি লোক আছে তাহাদের অধিকাংশের যথাসম্ভব শক্তি-সম্পদ কাজে খাটিতেছে, মাটিতে পোঁতা নাই, ইহাই সমৃদ্ধি। শক্তি যেখানে গতিশীল হইয়া আছে সেইখানেই মঙ্গল, ধন যেখানে সজীব হইয়া খাটিতেছে সেইখানেই ঐশ্বর্য।

এই পাশ্চাত্ত্য দেশে লক্ষ্যবেধের আহ্বান সকলেই শুনিতে পাইয়াছে; মোটের উপর সকলেই জানে সে কী চায়; এইজন্য সকলেই আপনার ধনুকবাণ লইয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। যজ্ঞসম্ভবা যাজ্ঞসেনীকে পাইবে এই আশায় যে লক্ষ্য বহু উচ্চে ঝুলিতেছে তাহাকে বিদ্ধ করিতে সকলেই পণ করিয়াছে। এই লক্ষ্যবেধের নিমন্ত্রণ আমরা পাই নাই। এইজন্য কী পাইতে হইবে সে বিষয়ে অধিক চিন্তা

করা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক এবং কোথায় যাইতে হইবে তাহাও আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট নাই।

এইজন্য যখন এমনতরো প্রশ্ন শুনি 'আমরা কী শিখিব, কেমন করিয়া শিখিব, শিক্ষার কোন্‌ প্রণালী কোথায় কী ভাবে কাজ করিতেছে' তখন আমার এই কথাই মনে হয়, শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতি-হীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখিব এই দুটা কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যত বড়ো জল তাহার চেয়ে বেশি ধরে না।

চাহিবার জিনিস আমাদের বেশি কিছু নাই। সমাজ আমাদিগকে কোনো বড়ো ডাক ডাকিতেছে না, কোনো বড়ো ত্যাগে টানিতেছে না; ওঠা-বসা খাওয়া-ছোঁয়ার কতকগুলো কৃত্রিম নিরর্থক নিয়ম-পালন ছাড়া আমাদের কাছ হইতে সে আর-কোনো বিষয়ে কোনো কৈফিয়ত চায় না। রাজশক্তিও আমাদের জীবনের সম্মুখে কোনো বৃহৎ সঞ্চরণের ক্ষেত্র অবারিত করিয়া দেয় নাই; সেখানকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে আমরা যেটুকু আশা করিতে পারি তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর; এবং সেই বেড়ার ছিদ্র দিয়া আমরা যেটুকু দেখিতে পাই তাহাও অতি যৎসামান্য। জীবনের ক্ষেত্রকে বড়ো করিয়া দেখিতে পাই না বলিয়াই জীবনকে বড়ো করিয়া তোলা এবং বড়ো করিয়া উৎসর্গ করিবার কথা আমাদের স্বভাবত মনেই আসে না। সে সম্বন্ধে যেটুকু চিন্তা করিতে যাই তাহা পুঁথিগত চিন্তা, যেটুকু কাজ করিতে যাই সেটুকু অন্যের অনুকরণ। আমাদের আরও বিপদ এই যে, যাহারা আমাদের খাঁচার দরজা এক মুহূর্তের জন্য খুলিয়া দেয় না তাহারাই রাত্রিদিন বলে 'তোমাদের উড়িবার শক্তি নাই'। পাখির ছানা তো বি. এ. পাস করিয়া উড়িতে শেখে না; উড়িতে পায় বলিয়াই উড়িতে শেখে। সে তাহার স্বজনসমাজের সকলকেই উড়িতে দেখে; সে নিশ্চয় জানে তাহাকে উড়িতেই হইবে। উড়িতে পারা যে সম্ভব এ সম্বন্ধে কোনোদিন তাহার মনে সন্দেহ আসিয়া তাহাকে দুর্বল করিয়া দেয় না। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, অপরে আমাদের শক্তি সম্বন্ধে সর্বদা সন্দেহ প্রকাশ করে বলিয়াই এবং সেই সন্দেহকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার কোনো ক্ষেত্র পাই না বলিয়াই অন্তরে অন্তরে নিজের সম্বন্ধেও একটা সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া যায়। এমনি করিয়া আপনার প্রতি যে লোক বিশ্বাস হারায় সে কোনো বড়ো নদী পাড়ি দিবার চেষ্টা পর্যন্তও করিতে পারে না; অতি ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে ডাঙার কাছে কাছে সে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহাতেই সে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকে এবং যেদিন সে কোনো গতিকে বাগবাজার হইতে বরানগর পর্যন্ত উজান ঠেলিয়া যাইতে পারে সেদিন সে মনে করে, 'আমি অবিকল কলম্বসের সমতুল্য কীর্তি করিয়াছি।'

'তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি মুন্‌সেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুলমাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে' এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে এ কথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।

কিন্তু যদি কেহ মনে করেন তবে বুঝি দেশের সম্বন্ধে আমি হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, তবে তিনি ভুল বুঝিবেন। আমরা কোথায় আছি, কোন্‌ দিকে চলিতেছি তাহা সুস্পষ্ট করিয়া জানা চাই। সে জানাটা যতই অপ্রিয় হউক তবু

সেটা সর্বাগ্রে আবশ্যক। আমরা এপর্যন্ত বারবার নিজের দুর্গতি সম্বন্ধে নিজেকে কোনোমতে ভুলাইয়া আরাম পাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এ কথা বলিয়া কোনো লাভ নাই, মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে আমাদের সনাতন সমাজ বিশ্ব-সংসারের সকল সমাজের সেরা; এত বড়ো একটা অদ্ভুত অত্যুক্তি যাহা মানবের ইতিহাসে প্রত্যক্ষতই প্রত্যহ আপনাকে অপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে তাহাকে আড়ম্বর-সহকারে ঘোষণা করা নিশ্চেষ্টতার গায়েরজোরি কৈফিয়ত; যে লোক কোনোমতেই কিছু করিবে না এবং নড়িবে না সে এমনি করিয়াই আপনার কাছে ও অন্যের কাছে আপনার লজ্জা রক্ষা করিতে চায়। গোড়াতেই নিজের এই মোহটাকে কঠিন আঘাতে ছিন্ন করিয়া ফেলা চাই। বিষফোড়ায় চিকিৎসক যখন অস্ত্রাঘাত করে তখন সেই ক্ষত আপনার আঘাতের মুখকে কেবলই ঢাকিয়া ফেলিতে চায়; কিন্তু সুচিকিৎসক ফোড়ার সেই চেষ্টাকে আমল দেয় না, যতদিন না আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দেয় ততদিন প্রত্যহই ক্ষতমুখ খুলিয়া রাখে। আমাদের দেশের প্রকাণ্ড বিষফোড়া বিধাতার কাছ হইতে মস্ত একটা অস্ত্রাঘাত পাইয়াছে; এই বেদনা তাহার প্রাপ্য; কিন্তু প্রতিদিন ইহাকে সে ফাঁকি দিয়া ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। সে আপনার অপমানকে মিথ্যা করিয়া লুকাইতে গিয়া সেই অপমানের ফোড়াকে চিরস্থায়ী করিয়া পুষিয়া রাখিবার উদ্যোগ করিতেছে। কিন্তু যতবার সে ঢাকিবে চিকিৎসকের অস্ত্রাঘাত ততবারই তাহার সেই মিথ্যা অভিমানকে বিদীর্ণ করিয়া দিবে। এ কথা তাহাকে একদিন সুস্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, ফোড়াটা তাহার বাহিরের জোড়াদেওয়া আকস্মিক জিনিস নহে। ইহা তাহার ভিতরকারই ব্যাধি। দোষ বাহিরের নহে, তাহার রক্ত দূষিত হইয়াছে; নহিলে এমন সাংঘাতিক দুর্বলতা, এমন মোহাবিষ্ট জড়তা মানুষকে এত দীর্ঘকাল এমন করিয়া সকল বিষয়ে পরাভূত করিয়া রাখিতে পারে না। আমাদের নিজের সমাজই আমাদের নিজের মনুষ্যত্বকে পীড়িত করিয়াছে, ইহার বুদ্ধিকে ও শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে; সেইজন্যই সে সংসারে কোনোমতেই পারিয়া উঠিতেছে না। এই আপনার সম্বন্ধে আপনার মোহকে জোরের সঙ্গে স্পষ্ট করিয়া ভাঙিতে দেওয়া নৈরাশ্য ও নিশ্চেষ্টতার লক্ষণ নহে। ইহাই চেষ্টার পথকে মুক্তি দিবার উপায় এবং মিথ্যা আশার বাসা ভাঙিয়া দেওয়াই নৈরাশ্যকে যথার্থভাবে নির্বংশ করিবার পন্থা।

আমার বলিবার কথা এই, শিক্ষা কোনো দেশেই সম্পূর্ণত ইস্কুল হইতে হয় না এবং আমাদের দেশেও হইতেছে না। পরিপাকশক্তি ময়রার দোকানে তৈরি হয় না, খাদ্যই তৈরি হয়। মানুষের শক্তি যেখানে বৃহৎভাবে উদ্যমশীল সেইখানেই তাহার বিদ্যা তাহার প্রকৃতির সঙ্গে মেশে। আমাদের জীবনের চালনা হইতেছে না বলিয়াই আমাদের পুঁথির বিদ্যাকে আমাদের প্রাণের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না।

এ কথা মনে উদয় হইতে পারে, তবে আর আমাদের আশা কোথায়? কারণ, জীবনের চালনাক্ষেত্র তো সম্পূর্ণ আমাদের হাতে নাই; পরাধীন জাতির কাছে তো শক্তির দ্বার খোলা থাকিতে পারে না।

এ কথা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। বস্তুত, শক্তির ক্ষেত্র সকল জাতির পক্ষেই কোনো না কোনো দিকে সীমাবদ্ধ। সর্বত্রই অন্তরপ্রকৃতি এবং বাহিরের অবস্থা উভয়ে মিলিয়া আপসে আপনার ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট করিয়া লয়। এই সীমানির্দিষ্ট ক্ষেত্রই সকলের পক্ষে দরকারি; কারণ, শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করা শক্তিকে

ব্যবহার করা নহে। কোনো দেশেই অনুকূল অবস্থা মানুষকে অবারিত স্বাধীনতা দেয় না, কারণ তাহা ব্যর্থতা। ভাগ্য আমাদিগকে যাহা দেয় তাহা ভাগ করিয়াই দেয়; এক দিকে যাহার ভাগে বেশি পড়ে অন্য দিকে তাহার কিছু না কিছু কম পড়িবেই।

অতএব, কী পাইলাম সেটা মানুষের পক্ষে তত বড়ো কথা নয়, সেটাকে কেমন ভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করিব সেইটে যত বড়ো। সামাজিক বা মানসিক যে-কোনো ব্যবস্থায় সেই গ্রহণের শক্তিকে বাধা দেয়, সেই ব্যবহারের শক্তিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে, তাহাই সর্বনাশের মূল। মানুষ যেখানে কোনো জিনিসকেই পরখ করিয়া লইতে দেয় না, ছোটো বড়ো সকল জিনিসকেই বাঁধা বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে ও বাঁধা নিয়মের দ্বারা ব্যবহার করিতে বলে, সেখানে অবস্থা যতই অনুকূল হউক-না কেন মনুষ্যত্বকে শীর্ণ হইতেই হইবে। আমাদের অবস্থার সংকীর্ণতা লইয়া আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের অবস্থা যে যথার্থত কী তাহা আমরা জানিই না; তাহাকে আমরা সকল দিকে পরখ করিয়া দেখি নাই। সেই পরখ করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিকেই আমরা অপরাধ বলিয়া সর্বাগ্রে দাঁড়িদড়া দিয়া বাঁধিয়াছি। মানবপ্রকৃতির উপর ভরসা নাই বলিয়া এ কথা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছি যে, মানুষকে ভুল করিতে না দিলে মানুষকে শিক্ষা করিতে দেওয়া হয় না। মানুষকে সাহস করিয়া ভালো হইয়া উঠিবার প্রশস্ত অধিকার দিব না, তাহাকে সনাতন নিয়মে সকল দিকেই খর্ব করিয়া ভালো-মানুষির জেলখানায় চিরজীবন কারাদণ্ড বিধান করিয়া রাখিব, এমনতরো যাহাদের ব্যবস্থা তাহারা যতক্ষণ নিজের বেড়ি নিজে খুলিয়া না ফেলিবে এবং বেড়িটাকেই নিজের হাত-পায়ের চেয়ে পবিত্র ও পরমধন বলিয়া পূজা করা পরিত্যাগ না করিবে ততক্ষণ ভাগ্যবিধাতার কোনো বদান্যতায় তাহাদের কোনো স্থায়ী উপকার হইতে পারিবে না।

নিজের অবস্থাকে নিজের শক্তির চেয়ে প্রবল বলিয়া গণ্য করিবার মতো দীনতা আর কিছু নাই। মানুষের আকাঙ্ক্ষার বেগকে তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত ভোগ, ব্যক্তিগত মুক্তির ক্ষুদ্র প্রলুব্ধতা হইতে উপরের দিকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই তাহার এমন কোনো বাহ্য অবস্থাই নাই যাহার মধ্য হইতে সে বাড়িয়া উঠিতে পারে না; এমন-কি, সে অবস্থায় বাহিরের দারিদ্র্যই তাহাকে বড়ো হইয়া উঠিবার দিকে সাহায্য করে। কাঁঠাল গাছকে দ্রুত বেগে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য আমাদের দেশে তাহার চারাকে বাঁশের চোঙের মধ্যে ঘিরিয়া বাঁধিয়া রাখে। সে চারা আশেপাশে ডালপালা ছড়াইতে পারে না, এইজন্য কোনোমতে চোঙের বেড়াকে ছাড়াইয়া আলোকে উঠিবার জন্য সে আপনার শক্তিকে একাগ্রভাবে চালনা করে এবং সিধা হইয়া আপন বন্ধনকে লঙ্ঘন করে। কিন্তু সেই চারাটির মজ্জার মধ্যে এই দুর্নিবার বেগটি সজীব থাকা চাই যে, 'আমাকে উঠিতেই হইবে, বাড়িতেই হইবে; আলোককে যদি পাশেই না পাই তবে তাহাকে উপরে খুঁজিতে বাহির হইব; মুক্তিকে যদি এক দিকে না পাই তবে তাহাকে অন্য দিকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা ছাড়িব না।' 'চেষ্টা করাই অপরাধ, যেমন আছি তেমনিই থাকিব' কোনো প্রাণবান জিনিস এমন কথা যখন বলে তখন তাহার পক্ষে বাঁশের চোঙও যেমন অনন্ত আকাশও তেমনি।

মানুষের সকলের চেয়ে যাহা পরম আশার সামগ্রী তাহা কখনো অসাধ্য হইতে পারে না, এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় আছে। আমাদের জাতির মুক্তি যদি পার্শ্বের

দিকে না থাকে তবে উপরের দিকে আছেই, এ কথা এক মুহূর্তে ভুলিলে চলিবে না। ডালপালা ছড়াইয়া পাশের দিকের বাড়টাকেই আমরা চারি দিকে দেখিতেছি, এইজন্য সেইটেকেই একমাত্র পরমার্থ বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু উচ্চের দিকের গতিও জীবনের গতি; সেখানেও সার্থকতার ফল সম্পূর্ণ হইয়াই ফলে। আসল কথা, এক দিকে হউক বা আর-এক দিকে হউক ভূমার আকর্ষণকে স্বীকার করিতেই হইবে; আমাদিগকে বড়ো হইতে হইবে, আরও বড়ো হইতে হইবে। সেই বাণী আমাদিগকে কান পাতিয়া শুনিতে হইবে যাহা আমাদিগকে কোণের বাহির করে, যাহা আমাদিগকে অনায়াসে আত্মত্যাগ করিতে শক্তি দেয়, যাহা কেবলমাত্র আপিসের দেয়াল ও চাকরির খাঁচাটুকুর মধ্যে আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে বদ্ধ করিয়া রাখে না। আমাদের জাতীয় জীবনে সেই বেগ যখন সঞ্চারিত হইবে, সেই শক্তি যখন প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন প্রতি মুহূর্তেই আমাদের অবস্থাকে আমরা অতিক্রম করিতে থাকিব; তখন আমাদের বাহ্য অবস্থার কোনো সংকোচ আমাদিগকে কিছুমাত্র লজ্জা দিতে পারিবে না।

বর্তমানের ইতিহাসকে সুনির্দিষ্ট করিয়া দেখা যায় না; এইজন্য যখন আলোক আসন্ন তখনও অন্ধকারকে চিরন্তন বলিয়া ভয় হয়। কিন্তু আমি তো স্পষ্টই মনে করি, আমাদের চিত্তের মধ্যে একটা চেতনার অভিঘাত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহার বেগ ক্রমশই আপনার কাজ করিতে থাকিবে, কখনোই আমাদিগকে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে দিবে না। আমাদের প্রাণশক্তি কোনোমতেই মরিবে না, যে দিক দিয়া হউক তাহাকে বাঁচিতেই হইবে; সেই আমাদের দুর্জয় প্রাণচেষ্টা যেখানে একটু ছিদ্র পাইতেছে সেইখান দিয়াই এখনই আমাদিগকে আলোকের অভিমুখে ঠেলিয়া তুলিতেছে। মানুষের সম্মুখে যে পথ সর্বাপেক্ষা উন্মুক্ত বলিয়াই মানুষ যে পথ ভুলিয়া থাকে, রাজা যে পথে বাধা দিতে পারে না এবং দারিদ্র্য যে পথের পাথেয় হরণ করিতে অক্ষম, স্পষ্ট দেখিতেছি, সেই ধর্মের পথ আমাদের এই সর্বত্রপ্রতিহত চিত্তকে মুক্তির দিকে টানিতেছে। আমাদের দেশে এই পথযাত্রার আহ্বান বারম্বার নানা দিক হইতে নানা কণ্ঠে জাগিয়া উঠিতেছে। এই ধর্মবোধের জাগরণের মতো এত বড়ো জাগরণ জগতে আর কিছু নাই; ইহাই মূককে কথা বলায়, পঙ্গুকে পর্বত লঙ্ঘন করায়। ইহা আমাদের সমস্ত চিত্তকে চেতাইবে, সমস্ত চেষ্টাকে চালাইবে; ইহা আশার আলোকে এবং আনন্দের সংগীতে আমাদের বহুদিনের বঞ্চিত জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিবে। মানবজীবনের সেই পরম লক্ষ্য যতই আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকিবে ততই আপনাকে অকৃপণভাবে আমরা দান করিতে পারিব এবং সমস্ত ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার জাল ছিন্ন হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশের এই লক্ষ্যকে যদি আমরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে মনে রাখি তবেই আমাদের দেশের শিক্ষাকে আমরা সত্য আকার দান করিতে পারিব। জীবনের কোনো লক্ষ্য নাই অথচ শিক্ষা আছে, ইহার কোনো অর্থই নাই। আমাদের ভারতভূমি তপোভূমি হইবে, সাধকের সাধনক্ষেত্র হইবে, সাধুর কর্মস্থান হইবে, এইখানেই ত্যাগীর সর্বোচ্চ আত্মোৎসর্গের হোমাগ্নি জ্বলিবে— এই গৌরবের আশাকে যদি মনে রাখি তবে পথ আপনি প্রস্তুত হইবে এবং অকৃত্রিম শিক্ষাবিধি আপনি আপনাকে অঙ্কুরিত পল্লবিত ও ফলবান করিয়া তুলিবে। চ্যাল্‌ফোর্ড্‌। গ্লস্টরশিয়র। ১৯ অগস্ট ১৯১২

অগ্রহায়ণ ১৩১৯

স্ত্রীশিক্ষা

আমরা শ্রীমতী লীলা মিত্রের কাছ হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একখানি চিঠি পাইয়াছি, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। চিঠিখানি এই—

এক দল লোক বলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন নাই, কারণ স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইলে পুরুষের নানা বিষয়ে নানা অসুবিধা। শিক্ষিতা স্ত্রী স্বামীকে দেবতা বলিয়া মনে করে না, স্বামীসেবায় তার তেমন মন থাকে না, পড়াশুনা লইয়াই সে ব্যস্ত ইত্যাদি।

আবার আর-এক দল বলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন খুবই আছে, কেননা আমরা পুরুষরা শিক্ষিত, আমরা যাহাদের লইয়া ঘরসংসার করিব তাহারা যদি আমাদের ভাব চিন্তা আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝিতেই না পারে তবে আমাদের পারিবারিক সুখের ব্যাঘাত হইবে ইত্যাদি।

দুই দলই নিজেদের দিক হইতে স্ত্রীশিক্ষার বিচার করিতেছেন। নারীর যে পুরুষের মতো ব্যক্তিত্ব আছে, সে যে অন্যের জন্য সৃষ্ট নয়, তাহার নিজের জীবনের যে সার্থকতা আছে, তাহা স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষের বা বিপক্ষের কোনো উকিল স্বীকার করেন না। উকিলরা যে পক্ষ লইয়াছেন বস্তুত তাহা তাঁহাদের নিজেরই পক্ষ। মামলার নিষ্পত্তিতে যাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থ তাঁহাদের কথা কাহারও মনে উদয় হয় না, এইটেই আশ্চর্য।

বিদ্যা যদি মনুষ্যত্বলাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভে যদি মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে তবে নারীকে কোন্ নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না।

আবার, যাঁরা স্ত্রীলোককে তাঁহাদের নিজের জন্যই সৃষ্ট বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছেন তাঁরা যেটুকু বিদ্যা স্ত্রীর জন্য উচ্ছিষ্ট রাখিতে চান তাহা হইতে স্ত্রীলোকের মনুষ্যত্বের যথোচিত পুষ্টি আশা করা বাতুলতা।

যাঁহারা শিক্ষাদানে স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই সমভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত তাঁহারা সাধারণ পুরুষের পঙ্‌ক্তিতে পড়েন না; তাঁহাদের আসন অনেক উচ্চে, সুতরাং তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত।

অতএব, গরজ যাঁহাদের তাঁহাদিগকেই কার্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। নিজের উদ্যমে ও শক্তিতে নিজেকে মুক্ত না করিলে অন্যে মুক্তি দিতে পারে না। অন্যে যেটাকে মুক্তি বলিয়া উপস্থিত করে সেটা বন্ধনেরই অন্য মূর্তি। পুরুষ যে স্ত্রীশিক্ষার ছাঁচ গড়িয়াছে সেটা পুরুষের খেলার যোগ্য পুতুল গড়িবার ছাঁচ।

কিন্তু যিনি এ কার্যে অবতীর্ণা হইবেন তাঁহাকে সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো গতানুগতিক হইলে চলিবে না। সংসারের লোকে যাহাকে সুখ বলে সেটাকে তিনি আদর্শ করিবেন না। এ কথা তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে, সন্তান গর্ভে ধারণ করাই তাঁহার চরম সার্থকতা নয়। তিনি পুরুষের আশ্রিতা, লজ্জাভয়ে লীলাঙ্গিনী, সামান্য ললনা নহেন; তিনি তাহার সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারপথে প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।—

এই চিঠির মূল কথাটা আমি মানি। যাহা-কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে, মেয়েকেও জানিতে হইবে— শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে তাহা নয়, জানিবার জন্যই।

মানুষ জানিতে চায়, সেটা তার ধর্ম; এইজন্য জগতের আবশ্যক অনাবশ্যক সকল তত্ত্বই তার কাছে বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। সেই তার জানিতে চাওয়াকে যদি খোরাক না জোগাই কিম্বা তাকে কুপথ্য দিয়া ভুলাইয়া রাখি তবে তার মানব-প্রকৃতিকেই দুর্বল করি, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু, মানুষকে পুরো পরিমাণে মানুষ করিব এ কথা আমাদের সকলের অন্তরের কথা নয়। যখন সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব হয় তখন এক দল শিক্ষিত লোক বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথা হইতে? বোধ হয় শীঘ্রই এ সম্বন্ধে রসিক লোকে প্রহসন লিখিবেন যাহাতে দেখা যাইবে— বাবুর চাকর কবিতা লিখিতেছে কিম্বা নক্ষত্রলোকের নাড়িনক্ষত্র গণনা করিবার জন্য বড়ো বড়ো অঙ্ক ফাঁদিয়া বসিয়াছে, বাবু তাহাকে ধুতি কোঁচাইবার জন্য ডাকিতে সাহস করিতেছেন না পাছে তার ধ্যানের ব্যাঘাত হয়। মেয়েদের সম্বন্ধেও সেই এক কথা যে, তারা যদি লেখাপড়া শেখে তবে যে ঝাঁটা বঁটি ও শিলনোড়া বাবুদের ভাগে পড়ে।

অথচ ইঁহাদের তর্কের যুক্তিটা এই যে, মেয়েদের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তাঁহাদের ভয়টা কিসের? পৃথিবীকে আমরা চ্যাপ্টা ভাবি কিন্তু তাহা গোল, এ কথা জানিলে পুরুষের পৌরুষ কমে না। তেমনি, বাসুকির মাথার উপর পৃথিবী নাই এ খবরটা পাইলে মেয়েদের মেয়েলিভাব নষ্ট হইবে এ কথা যদি বলি তবে বুঝিতে হইবে, মেয়েরা মেয়েই নয়, আমরা তাহাদিগকে অজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া মেয়ে করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি।

বিধাতা একদিন পুরুষকে পুরুষ এবং মেয়েকে মেয়ে করিয়া সৃষ্টি করিলেন, এটা তাঁর একটা আশ্চর্য উদ্ভাবন, সে কথা কবি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবতত্ত্ববিৎ সকলেই স্বীকার করেন। জীবলোকে এই-যে একটা ভেদ ঘটিয়াছে এই ভেদের মুখ দিয়া একটা প্রবল শক্তি এবং পরম আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। ইস্কুল-মাস্টার কিম্বা টেক্স্ট্বুক-কমিটি তাঁহাদের এক্সেসাইজের খাতা কিম্বা পাঠ্য ও অপাঠ্য বইয়ের বোঝা দিয়া এই শক্তি এবং সৌন্দর্য-প্রবাহের মুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিতে পারেন, এমন কথা আমি মানি না। মোটের উপর, বিধাতা এবং ইস্কুল-মাস্টার এই দুইয়ের মধ্যে আমি বিধাতাকে বেশি বিশ্বাস করি। সেইজন্য আমার ধারণা এই যে, মেয়েরা যদি বা কাণ্ট্-হেগেল্ও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দূর-ছাই করিবে না।

কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে-পুরুষে কোথাও কোনো ভেদ থাকিবে না, এ কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষের পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে, এ কথা মানিতে দোষ কী?

মেয়েদের শরীরের এবং মনের প্রকৃতি পুরুষের হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র হইয়াছে। আজকাল বিদ্রোহের ঝোঁকে এক দল মেয়ে এই গোড়াকার কথাটাকেই অস্বীকার করিতেছেন। তাঁরা বলেন, মেয়েদের ব্যবহারের ক্ষেত্র পুরুষের সঙ্গে একেবারে সমান।

এটা তাঁদের নিতান্তই ক্ষোভের কথা। ক্ষোভের কারণ এই যে, পুরুষ আপন

কর্মের পথ ধরিয়া জগতে নানা বিচিত্র ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে; কিন্তু মেয়েদের কর্ম যেখানে সেখানে অধিকাংশ বিষয়েই তাহাদিগকে দায়ে পড়িয়া পুরুষের অনুগত হইতে হইয়াছে। এই আনুগত্যকে তাঁরা অনিবার্য বলিয়া মনে করেন না।

তাঁরা বলেন, পুরুষ এতদিন কেবলমাত্র গায়ের জোরেই মেয়েদের কাঁধের উপর এই আনুগত্যটা চাপাইয়া দিয়াছে। জগতের সর্বত্রই এই কথাটা যদি এতদিন ধরিয়া সত্য হইয়া থাকে, যদি মেয়েদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে পুরুষের শক্তি তাহাদিগকে সংসারের তলায় ফেলিয়া রাখিয়া থাকে তবে বলিতেই হইবে, দাসত্বই মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। দাসত্ব বলিতে এই বোঝায়, দায়ে পড়িয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে পরের দায় বহন করা। যাদের পক্ষে এটা প্রকৃতিসিদ্ধ নয়, তারা বরঞ্চ মরে তবু এমন উৎপাত সহ্য করে না।

এতদিনের মানবের ইতিহাসে যদি এই কথাটাই সর্বদেশে সপ্রমাণ হইয়া থাকে যে দাসীত্ব মেয়েদের স্বাভাবিক, তবে পৃথিবীর সেই অর্ধেক মানুষের লজ্জায় সমস্ত পৃথিবী আজ মুখ তুলিতে পারিত না। কিন্তু আমি বলি, বিদ্রোহী মেয়েরা স্বজাতির বিরুদ্ধে এই-যে অপবাদ ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আসল কথা এই, স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব; দাসী হওয়া নয়। ভালোবাসার অংশ মেয়েদের স্বভাবে বেশি আছে— এ নহিলে সন্তান মানুষ হইত না, সংসার টিঁকিত না। স্নেহ আছে বলিয়াই মা সন্তানের সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই; প্রেম আছে বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই।

কিন্তু দায় আসিয়া পড়ে যখন স্নেহপ্রেমের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ না হয়। সকল স্বামীকেই সকল স্ত্রী যদি স্বভাবতই ভালোবাসিতে পারিত তাহা হইলে কথাই ছিল না, তাহা সম্ভবপর নহে। অথচ যতদিন সমাজ বলিয়া একটা পদার্থ আছে ততদিন মানুষকে অনেক বিষয়ে এবং অনেক পরিমাণে একটা নিয়ম মানিয়া চলিতেই হইবে।

কিন্তু, সেই নিয়ম সৃষ্টি করিবার সময় সমাজ ভিতরে ভিতরে স্বভাবেরই অনুসরণ করিতে থাকে। মেয়েদের সম্বন্ধে সমাজ আপনিই এটা ধরিয়া লইয়াছে যে, মেয়েদের পক্ষে ভালোবাসাটাই সহজ। তাই মেয়েদের সম্বন্ধে নিয়ম ভালোবাসার নিয়ম। সমাজ তাই মেয়েদের কাছে এই দাবি করে যে, তারা এমন করিয়া কাজ করিবে যেন তারা সংসারকে ভালোবাসিতেছে। বাপ মা ভাই বোন স্বামী ও ছেলেমেয়ের সেবা তারা করিবে। তাদের কাজ ভালোবাসার কাজ, এইটেই তাদের আদর্শ।

এইজন্য মেয়েদের সংসারে কোনো কারণে যেখানে তাদের ভালোবাসা নাই সেখানেও তাহাদিগকে সমাজ ভালোবাসার আদর্শেই বিচার করিয়া থাকে। যে স্বামীকে স্ত্রী ভালোবাসিতে পারে নাই তার সম্বন্ধেও তার ব্যবহারকে ভালোবাসার মাপকাঠিতেই মাপিতে হয়। সংসারকে সে ভালোবাসুক আর না-বাসুক তার আচরণকে কষিয়া দেখিবার ঐ একটিমাত্র কষ্টিপাথর আছে, সেটা ভালোবাসার কষ্টিপাথর।

ভালোবাসার ধর্মই আত্মসমর্পণে, সুতরাং তার গৌরবও তাহাতেই। যেটাকে আনুগত্য বলিয়া লজ্জা করা হইতেছে সেটা লজ্জার বিষয় হয় যদি তাহাতে প্রীতি না থাকে, কেবলমাত্র দায় থাকে। মেয়েরা আপনার স্বভাবের দ্বারাই সমাজে এমন একটা জায়গা পাইয়াছে যেখানে সংসারের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করিতেছে।

যদি কোনো কারণে সমাজের এমন অবস্থা ঘটে যাতে এই আত্মসমর্পণ ভালোবাসার আদর্শ হইতে বহুল পরিমাণে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা মেয়েদের পক্ষে পীড়া ও অবমাননা।

মেয়েরা স্বভাবতই ভালোবাসে এবং একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের আদর্শকেই সামাজিক শিক্ষায় তাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে, এই সুবিধাটুকু ধরিয়া অনেক স্বার্থপর পুরুষ তাদের প্রতি অত্যাচার করে। যেখানে পুরুষ যথার্থ পৌরুষের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট সেখানে মেয়েরা আপন উচ্চ আদর্শের দ্বারাই পীড়িত ও বঞ্চিত হইতে থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে যত বেশি এমন আর-কোনো দেশে আছে কিনা আমি সন্দেহ করি। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথাটাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না যে, সমাজে মেয়েরা যে ব্যবহারের ক্ষেত্রটি অধিকার করিয়াছে সেখানে স্বভাববশতই তারা আপনিই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বাহিরের কোনো অত্যাচার তাহাদিগকে বাধ্য করে নাই।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, সমাজে পুরুষের দাসত্ব মেয়েদের চেয়ে অল্প নহে, বরঞ্চ বেশি। এতকালের সভ্যতার সাধনার পরেও মানুষের সমাজ আজও দাসের হাতের খাটুনিতে চলিতেছে। এ সমাজে যথার্থ স্বাধীনতা অতি অল্প লোকেই ভোগ করে। রাজ্যতন্ত্রে বাণিজ্যতন্ত্রে এবং সমাজের সর্ববিভাগেই দাসের দল প্রাণপাত করিয়া সমাজ-জগন্নাথের প্রকাণ্ড রথ টানিয়া চলিতেছে। কোথায় লইয়া চলিতেছে তাহাও জানে না, কাহার রথ টানিতেছে তাহাও দেখিতে পায় না। সমস্ত জীবন দিনের পর দিন এমন দায় বহন করিতেছে যাহার মধ্যে প্রীতি নাই, সৌন্দর্য নাই। এই দাসত্বের বারো-আনা ভাগ পুরুষের কাঁধে চাপিয়াছে। মেয়েদের ভালোবাসার উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এইজন্য মেয়েদের দায় ভালোবাসার দায়। পুরুষের শক্তির উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এইজন্য পুরুষের দায় শক্তির দায়। অবস্থাগতিকে সেই দায় এত অতিরিক্ত হইতে পারে যাহাতে ভালোবাসা উৎপীড়িত হয় ও শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। তখন সমাজের সংস্কার আবশ্যক হয়। সেই সংস্কারের জন্য আজ সমস্ত মানবসমাজে বেদনা জাগিয়াছে। কিন্তু সংস্কার যতদূর পর্যন্তই যাক্ সৃষ্টির গোড়া পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিবে না এবং শেষ পর্যন্ত কবির দল এই বলিয়া আনন্দ করিতে পারিবেন যে, পুরুষ পুরুষই থাকিবে, মেয়েরা মেয়ে থাকিয়া যাইবে বলিয়াই তার 'সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন'।

ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২

শিক্ষার বাহন

প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বিদ্যায় মানুষের কত প্রয়োজন সে কথা বলা বাহুল্য। অথচ সে দিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তর্ক ওঠে। চাষিকে বিদ্যা শিখাইলে তার চাষ করিবার শক্তি কমে কি না, স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে তার হরিভক্তি ও পতিভক্তির ব্যাঘাত হয় কি না, এ-সব সন্দেহের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, যে বেহারা বসিয়া বসিয়া পাখা টানিবে তার পক্ষে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি কাজের, যে গোরু ঘানি ঠেলিবে তার পক্ষে খোলা

আকাশের চেয়ে চোখের ঠুলিই বড়ো সহায়, এ কথা সহজেই মনে আসে। যে দেশে একই চক্রে ঘানি ঠেলাটা সব চেয়ে বড়ো কাজ সে দেশের বিজ্ঞ লোকেরা আলোটাকে শত্রু মনে করিতে পারেন।

কিন্তু, দিনের আলোককে আমরা কাজের প্রয়োজনের চেয়ে আরো বড়ো করিয়া দেখিতে পারি, সে হইতেছে জাগার প্রয়োজন। এবং তার চেয়ে আরো বড়ো কথা, এই আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়।

জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। বাংলাদেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে য়ুরোপের প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।

জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই-যে জগৎজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে, যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়, সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক; কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোনো কারণেই বঞ্চিত করিবার কথা মনেই করা যায় না।

সেই জ্ঞানের প্রদীপ এই ভারতবর্ষে কত বহু দূরে দূরে এবং কত মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে সে কথা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি, ভারতবাসীর পক্ষে সেই পরম যোগের পথ কত সংকীর্ণ—যে যোগ জ্ঞানের যোগ, যে যোগে সমস্ত পৃথিবীর লোক আজ মিলিত হইবার সাধনা করিতেছে।

যাহা হউক, বিদ্যাশিক্ষার উপায় ভারতবর্ষে কিছু কিছু হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাবিস্তারের বাধা এখানে মস্ত বেশি। নদী দেশের এক ধার দিয়া চলে, বৃষ্টি আকাশ জুড়িয়া হয়। তাই ফসলের সব চেয়ে বড়ো বন্ধু বৃষ্টি, নদী তার অনেক নিচে; শুধু তাই নয়, এই বৃষ্টিধারার উপরেই নদীজলের গভীরতা বেগ এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

আমাদের দেশে যাঁরা বজ্র হাতে ইন্দ্রপদে বসিয়া আছেন তাঁদের সহস্রচক্ষু, কিন্তু বিদ্যার এই বর্ষণের বেলায় অন্তত তার ৯৯০টা চক্ষু নিদ্রা দেয়। গর্জনের বেলায় অট্টহাস্যের বিদ্যুৎ বিকাশ করিয়া বলেন, বাবুগুলোর বিদ্যা একটা অদ্ভুত জিনিস; তার খোসার কাছে তল্‌তল্‌ করে, তার আঁঠির কাছে পাক ধরে না। যেন এটা বাবুসম্প্রদায়ের প্রকৃতিগত। কিন্তু বাবুদের বিদ্যাটাকে যে প্রণালীতে জাগ্‌ দেওয়া হয় সেই প্রণালীতেই আমাদের উপরওয়ালাদের বিদ্যাটাকেও যদি পাকানোর চেষ্টা করা যাইত তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ হইত যে, যে বিদ্যার উপরে ব্যাপক শিক্ষার সূর্যালোকের তাপ লাগে না তার এমনি দশাই হয়।

জবাবে কেহ কেহ বলেন, 'পশ্চিম যখন পশ্চিমেই ছিল, পূর্বদেশের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে নাই, তখন তোমাদের টোলে চতুষ্পাঠীতে যে তর্কশাস্ত্রের প্যাঁচ কষা এবং ব্যাকরণসূত্রের জাল বোনা চলিত সেও তো অত্যন্ত কুনোরকমের বিদ্যা।' এ কথা মানি, কিন্তু বিদ্যার যে অংশটা নির্জলা পাণ্ডিত্য সে অংশ সকল দেশেই পণ্ড এবং কুনো, পশ্চিমেও পেডান্‌ট্রি মরিতে চায় না। তবে কিনা, যে দেশ দুর্গতিগ্রস্ত সেখানে বিদ্যার বল কমিয়া গিয়া বিদ্যার কায়দাটাই বড়ো হইয়া ওঠে। তবু এ কথা মানিতে হইবে, তখনকার দিনের পাণ্ডিত্যটাই তর্কচঞ্চু ও ন্যায়পঞ্চাননদের মগজের কোণে কোণে বদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু তখনকার কালের বিদ্যাটা সমাজের নাড়ীতে নাড়ীতে সজীব ও সবল হইয়া বহিত। কি গ্রামের নিরক্ষর চাষি কি অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক, সকলেরই মন নানা উপায়ে এই বিদ্যার সেঁচ পাইত।

সুতরাং, এ জিনিসের মধ্যে অন্য অভাব অসম্পূর্ণতা যাই থাক্, ইহা নিজের মধ্যে সুসংগত ছিল।

কিন্তু, আমাদের বিলাতি বিদ্যাটা কেমন ইস্কুলের জিনিস হইয়া সাইন্‌বোর্ডে টাঙানো থাকে, আমাদের জীবনের ভিতরের সামগ্রী হইয়া যায় না। তাই পশ্চিমের শিক্ষায় যে ভালো জিনিস আছে তার অনেকখানি আমাদের নোট্‌বুকেই আছে; সে কি চিন্তায় কি কাজে ফলিয়া উঠিতে চায় না।

আমাদের দেশের আধুনিক পণ্ডিত বলেন, ইহার একমাত্র কারণ জিনিসটা বিদেশী। এ কথা মানি না। যা সত্য তার জিয়োগ্রাফি নাই। ভারতবর্ষও একদিন যে সত্যের দীপ জ্বালিয়াছে তা পশ্চিম মহাদেশকেও উজ্জ্বল করিবে, এ যদি না হয় তবে ওটা আলোই নয়। বস্তুত, যদি এমন কোনো ভালো থাকে যা একমাত্র ভারতবর্ষেরই ভালো তবে তা ভালোই নয়, এ কথা জোর করিয়া বলিব। যদি ভারতের দেবতা ভারতেরই হন তবে তিনি আমাদের স্বর্গের পথ বন্ধ করিবেন, কারণ স্বর্গ বিশ্বদেবতার।

আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই, তার চলা-ফেরার পথ খোলসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সর্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না। মহাত্মা গোখ্‌লে এই লইয়া লড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি, দেশের মধ্যে বাংলাদেশের কাছ হইতেই তিনি সব চেয়ে বাধা পাইয়াছেন। বাংলাদেশে শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা অদ্ভুত মহামারীর হাওয়া বহিয়াছে। ভূতের পা পিছন দিকে, বাংলাদেশে সামাজিক সকল চেষ্টারই পা পিছনে ফিরিয়াছে। আমরা ঠিক করিয়াছি, সংসারে চলিবার পথে আমরা পিছন মুখে চলিব, কেবল রাষ্ট্রীয় সাধনার আকাশে উড়িবার পথে আমরা সামনের দিকে উড়িব; আমাদের পা যে দিকে আমাদের ডানা ঠিক তার উল্টা দিকে গজাইবে।

যে সর্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চশিক্ষার শিকড়ে রস জোগাইবে কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না, তার উপরে আবার আর-এক উপসর্গ জুটিয়াছে। এক দিকে আসবাব বাড়াইয়া অন্য দিকে স্থান কমাইয়া আমাদের সংকীর্ণ উচ্চশিক্ষার আয়তনকে আরো সংকীর্ণ করা হইতেছে। ছাত্রের অভাব ঘটুক, কিন্তু সরঞ্জামের অভাব না ঘটে সে দিকে কড়া দৃষ্টি।

কাগজে দেখিলাম, সেদিন বেহার-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত গাড়িতে গিয়া ছোটোলাট বলিয়াছেন যে, যারা বলে ইমারতের বাহুল্যে আমরা শিক্ষার সম্বল খর্ব করি তারা অবুঝ, কেননা শিক্ষা তো কেবল জ্ঞানলাভ নয়, ভালো ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করাও একটা শিক্ষা; ক্লাসে বড়ো অধ্যাপকের চেয়ে বড়ো দেয়ালটা বেশি বই কম দরকারি নয়।

মানুষের পক্ষে অন্নেরও দরকার থালারও দরকার এ কথা মানি, কিন্তু গরিবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করাই দরকার। যখন দেখিব ভারত জুড়িয়া বিদ্যার অন্নসত্র খোলা হইয়াছে তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোনার থালা দাবি করিবার দিন আসিবে। আমাদের জীবনযাত্রা গরিবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকার থলি তৈরি করার মতো হইবে।

আঙিনায় মাদুর বিছাইয়া আমরা আসর জমাইতে পারি, কলাপাতায় আমাদের ধনীর যজ্ঞের ভোজও চলে। আমাদের দেশের নমস্য যাঁরা তাঁদের অধিকাংশই

খোড়ো ঘরে মানুষ; এ দেশে লক্ষ্মীর কাছ হইতে ধার না লইলে সরস্বতীর আসনের দাম কমিবে, এ কথা আমাদের কাছে চলিবে না।

পূর্বদেশে জীবনসমস্যার সমাধান আমাদের নিজের প্রণালীতেই করিতে হইয়াছে। আমরা অশনে বসনে যতদূর পারি বস্তুভার কমাইয়াছি। এ বিষয়ে এখানকার জল হাওয়া হাতে ধরিয়া আমাদের হাতে-খড়ি দিয়াছে। ঘরের দেয়াল আমাদের পক্ষে তত আবশ্যক নয় যতটা আবশ্যক দেয়ালের ফাঁক; আমাদের গায়ের কাপড়ের অনেকটা অংশই তাঁতির তাঁতের চেয়ে আকাশের সূর্যকিরণেই বোনা হইতেছে; আহারের যে অংশটা দেহের উত্তাপ-সঞ্চারের জন্য তার অনেকটার বরাত পাকশালার ও পাকযন্ত্রের 'পরে নয়, দেবতার 'পরে। দেশের প্রাকৃতিক এই সুযোগ জীবনযাত্রায় খাটাইয়া আমাদের স্বভাবটা এক রকম দাঁড়াইয়া গেছে; শিক্ষাব্যবস্থায় সেই স্বভাবকে অমান্য করিলে বিশেষ লাভ আছে এমন তো আমার মনে হয় না।

গাছতলায় মাঠের মধ্যে আমার এক বিদ্যালয় আছে। সে বিদ্যালয়টি তপোবনের শকুন্তলারই মতো 'অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈঃ'; অবশ্য, ইন্‌স্পেক্টরের কররুহ। মৈত্রেয়ী যেমন যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন তিনি উপকরণ চান না, অমৃতকে চান, এই বিদ্যালয়ের হইয়া আমার সেই কামনা ছিল। এইখানে ছোটোলাটের সঙ্গে একটা খুব গোড়ার কথায় আমাদের হয়তো অমিল আছে, এবং এইখানটায় আমরাও তাঁকে উপদেশ দিবার অধিকার রাখি। সত্যকে গভীর করিয়া দেখিলে দেখা যায়, উপকরণের একটা সীমা আছে যেখানে অমৃতের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। মেদ যেখানে প্রচুর, মজ্জা সেখানে দুর্বল।

দৈন্য জিনিসটাকে আমি বড়ো বলি না, সেটা তামসিক। কিন্তু অনাড়ম্বর, বিলাসীর ভোগসামগ্রীর চেয়ে দামে বেশি— তাহা সাত্ত্বিক। আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি যাহা পূর্ণতারই একটি ভাব, যাহা আড়ম্বরের অভাবমাত্র নহে। সেই ভাবের যেদিন আবির্ভাব হইবে সেদিন সভ্যতার আকাশ হইতে বস্তুকুয়াশার বিস্তর কলুষ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে। সেই ভাবের অভাব আছে বলিয়া যে-সব জিনিস প্রত্যেক মানুষের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা দুর্মূল্য ও দুর্ভর হইতেছে; গান-বাজনা আহার-বিহার আমোদ-আহ্লাদ শিক্ষা-দীক্ষা রাজ্যশাসন আইন-আদালত সভ্য দেশে সমস্তই অতি জটিল, সমস্তই মানুষের বাহিরের ও ভিতরের প্রভূত জায়গা জুড়িয়া বসে। এই বোঝার অধিকাংশই অনাবশ্যক; এই বিপুল ভার-বহনে মানুষের জোর প্রকাশ পায় বটে, ক্ষমতা প্রকাশ পায় না। এইজন্য বর্তমান সভ্যতাকে যে দেবতা বাহির হইতে দেখিতেছেন তিনি দেখিতেছেন, ইহা অপটু দৈত্যের সাঁতার দেওয়ার মতো; তার হাত-পা ছোঁড়ায় জল ঘুলাইয়া ফেনাইয়া উঠিতেছে, সে জানেও না এত বেশি হাঁস্‌ফাঁস্ করার যথার্থ প্রয়োজন নাই। মুশকিল এই যে, দৈত্যটার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রচণ্ড জোরে হাত-পা ছোঁড়াটারই একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেদিন পূর্ণতার সরল সত্য সভ্যতার অন্তরের মধ্যে আবির্ভূত হইবে সেদিন পাশ্চাত্ত্য বৈঠকখানার দেয়াল হইতে জাপানি পাখা, চীনা বাসন, হরিণের শিঙ, বাঘের চামড়া— তার এ-কোণ ও-কোণ হইতে বিচিত্র নিরর্থকতা— দুঃস্বপ্নের মতো ছুটিয়া যাইবে; মেয়েদের মাথার টুপিগুলো হইতে মরা পাখি, পাখির পালক, নকল ফুল পাতা এবং রাশিরাশি অদ্ভুত জঞ্জাল খসিয়া পড়িবে; তাদের সাজসজ্জার অমিতাচার বর্বরতার পুরাতত্ত্বে স্থান পাইবে; যে-সব পাঁচতলা দশতলা বাড়ি আকাশের আলোর দিকে ঘুষি তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে তারা লজ্জায় মাথা হেঁট করিবে; শিক্ষা বলো, কর্ম বলো, ভোগ বলো, সহজ হইয়া

ওঠাকেই আপনার শক্তির সত্য পরিচয় বলিয়া গণ্য করিবে; এবং মানুষের অন্তরপ্রকৃতি বাহিরের দাসরাজাদের রাজত্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে পায়ের তলায় বসাইয়া রাখিবে। একদিন পশ্চিমের মৈত্রেয়ীকেও বলিতে হইবে : যেনাহং নামৃতা স্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্যাম্‌।

সে কবে হইবে ঠিক জানি না। ততদিন ঘাড় হেঁট করিয়া আমাদিগকে উপদেশ শুনিতে হইবে যে, প্রভূত আসবাবের মধ্যে বড়ো বাড়ির উচ্চতলায় বসিয়া শিক্ষাই উচ্চশিক্ষা। কারণ, মাটির তলাটাই মানুষের প্রাইমারি, ঐটেই প্রাথমিক; ইঁটের কোঠা যত বড়ো হাঁ করিয়া হাই তুলিবে বিদ্যা ততই উপরে উঠিতে থাকিবে।

একদা বন্ধুরা আমার সেই মেঠো বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটা কলেজ জুড়িবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু, একদিন আমাদের দেশের যে উচ্চশিক্ষা তরুতলকে অশ্রদ্ধা করে নাই আজ তাকে তৃণাসন দেখাইলে সে কি সহিতে পারিবে? সে যে ধনী পশ্চিমের পোষ্যপুত্র, বিলিতি বাপের কায়দায় সে বাপকেও ছাড়াইয়া চলিতে চায়। যতই বলি-না কেন 'শিক্ষাটাকে যতদূর পারি উচ্চেই রাখিব, কায়দাটাকে আমাদের মতো করিতে দাও' সে কথায় কেহ কান দেয় না। বলে কিনা, 'ঐ কায়দাটাই তো শিক্ষা, তাই তোমাদের ভালোর জন্যই ঐ কায়দাটাকে যথাসাধ্য দুঃসাধ্য করিয়া তুলিব।' কাজেই আমাকে বলিতে হইল, অন্তঃকরণকেই আমি বড়ো বলিয়া মানি, উপকরণকে তার চেয়েও বড়ো বলিয়া মানিব না।

উপকরণ যে অংশে অন্তঃকরণের অনুচর সে অংশে তাকে অমান্য করা দীনতা, এ কথা জানি। কিন্তু, সেই সামঞ্জস্যটাকে য়ুরোপ এখনো বাহির করিতে পারে নাই; বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের নিজের মতে আমাদিগকে সেই চেষ্টা করিতে কেন পাকা নিয়ম করিয়া বাধা দেওয়া হইবে? প্রয়োজনকে খর্ব না করিয়াও সমস্তটাকে সাদাসিধা করিয়া তুলিব, সে আমাদের নিজের স্বভাব ও নিজের গরজ অনুসারে। শিক্ষার বিষয়কে আমরা অন্য জায়গা হইতে লইতে পারি, কিন্তু মেজাজটাকে-সুদ্ধ লইতে হইবে সে যে বিষম জুলুম।

পূর্বেই বলিয়াছি, পশ্চিমের পোষ্যপুত্র তার বিলিতি বাপকেও ছাড়াইয়া চলে। আমেরিকায় দেখিলাম, স্টেটের সাহায্যে কত বড়ো বড়ো বিদ্যালয় চলিতেছে যেখানে ছাত্রদের বেতন নাই বলিলেই হয়। য়ুরোপেও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সুলভ শিক্ষার উপায় অনেক আছে। কেবল গরিব বলিয়াই, আমাদের দেশের শিক্ষা আমাদের সামর্থ্যের তুলনায় পশ্চিমের চেয়ে এত বেশি দুর্মূল্য হইল? অথচ, এই ভারত-বর্ষেই একদিন বিদ্যা টাকা লইয়া বেচাকেনা হইত না।

দেশকে শিক্ষা দেওয়া স্টেটের গরজ, ইহা তো অন্যত্র দেখিয়াছি। এইজন্য য়ুরোপে জাপানে আমেরিকায় শিক্ষায় কৃপণতা নাই। কেবলমাত্র আমাদের গরিব দেশেই শিক্ষাকে দুর্মূল্য ও দুর্লভ করিয়া তোলাতেই দেশের বিশেষ মঙ্গল, এ কথা উচ্চাসনে বসিয়া যত উচ্চস্বরে বলা হইবে বেসুর ততই উচ্চ সপ্তকে উঠিবে। মাতার স্তন্যকে দুর্মূল্য করিয়া তোলাই উচিত, এমন কথা যদি স্বয়ং লর্ড কার্জনও শপথ করিয়া বলিতেন তবু আমরা বিশ্বাস করিতাম না যে শিশুর প্রতি করুণায় রাত্রে তাঁর ঘুম হয় না।

বয়স বাড়িতে বাড়িতে শিশুর ওজন বাড়িবে, এই তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সমান থাকিলেও ভালো নয়, কমিতে থাকিলে ভাবনার কথা। তেমনি, আমাদের দেশে যেখানে শিক্ষার অধিকাংশ জমিই পতিত আছে সেখানে বছরে বছরে ছাত্রসংখ্যা বাড়িবে, হিতৈষীরা এই প্রত্যাশা করে। সমান থাকিলে সেটা দোষের আর সংখ্যা

যদি কমে তো বুঝিব, পাল্লাটা মরণের দিকে ঝুঁকিয়াছে। বাংলাদেশে ছাত্রসংখ্যা কমিল। সেজন্য শিক্ষাবিভাগে উদ্‌বেগ নাই। এই উপলক্ষে একটি ইংরেজি কাগজে লিখিয়াছে : এই তো দেখি লেখাপড়ায় বাঙালির শখ আপনিই কমিয়াছে, যদি গোখ্‌লের অবশ্যশিক্ষা এখানে চলিত তবে তো অনিচ্ছুকের 'পরে জুলুম করাই হইত।

এ-সব কথা নির্মমের কথা। নিজের জাতের সম্বন্ধে এমন কথা কেহ এমন অনায়াসে বলিতে পারে না। আজ ইংলন্‌ডে যদি দেখা যাইত লোকের মনে শিক্ষার শখ আপনিই কমিয়া আসিতেছে তবে নিশ্চয়ই এই-সব লোকই উৎকণ্ঠিত হইয়া লিখিত যে, কৃত্রিম উপায়েও শিক্ষার উত্তেজনা বাড়াইয়া তোলা উচিত।

নিজের জাতির 'পরে যে দরদ বাঙালির 'পরেও ইংরেজের সেই দরদ হইবে, এমন আশা করিতেও লজ্জা বোধ করি। কিন্তু, জাতিপ্রেমের সমস্ত দাবি মিটাইয়াও মনুষ্যপ্রেমের হিসাবে কিছু প্রাপ্য বাকি থাকে। ধর্মবুদ্ধির বর্তমান অবস্থায় স্বজাতির জন্য প্রতাপ ঐশ্বর্য প্রভৃতি অনেক দুর্লভ জিনিস অন্যকে বঞ্চিত করিয়াও লোকে কামনা করে, কিন্তু এখনো এমন-কিছু আছে যা খুব কম করিয়াও সকল মানুষেরই জন্য কামনা করা যায়। আমরা কোনো দেশের সম্বন্ধেই এমন কথা বলিতে পারি না যে, সেখানকার স্বাস্থ্য যখন আপনিই কমিয়া আসিতেছে তখন সে দেশের জন্য ডাক্তার-খরচটা বাদ দিয়া অন্ত্যেষ্টিসৎকারেরই আয়োজনটা পাকা করা উচিত।

তবে কিনা, এ কথাও কবুল করিতে হইবে, স্বজাতি সম্বন্ধে আমাদের নিজের মনে শুভবুদ্ধি যথেষ্ট সজাগ নয় বলিয়াই বাহিরের লোক আমাদের অন্নবস্ত্র-বিদ্যাবুদ্ধির মূল্য খুব কম করিয়া দেখে। দেশের অন্ন, দেশের বিদ্যা, দেশের স্বাস্থ্য আমরা তেমন করিয়া চাই নাই। পরের কাছে চাহিয়াছি, নিজের কাছে নহে। ওজর করিয়া বলি, আমাদের সাধ্য কম ; কিন্তু আমাদের সাধনা তার চেয়েও অনেক কম।

দেশের দাম আমাদের নিজের কাছে যত অন্যের কাছে তার চেয়ে বেশি দাবি করিলে সে এক রকম ঠকানো হয়। ইহাতে বড়ো কেহ ঠকেও না। কেবল চিনা-বাজারের দোকানদারের মতো করিয়া পরের কাছে দর চড়াইয়া সময় নষ্ট করিয়া থাকি। তাতে যে পরিমাণে সময় যায় সে পরিমাণে লাভ হয় না। এতকাল রাষ্ট্রীয় হাটে সেই দোকানদারি করিয়া আসিয়াছি, যে জিনিসের জন্য নিজে যত দাম দিয়াছি বা দিতে রাজি তার চেয়ে অনেক বড়ো দাম হাঁকিয়া খুব একটা হট্টগোল করিয়া কাটাইলাম।

শিক্ষার জন্য আমরা আব্দার করিয়াছি, গরজ করি নাই। শিক্ষাবিস্তারে আমাদের গা নাই। তার মানে, শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিয়া যাইব, পাতের প্রসাদটুকু পর্যন্ত আর-কোনো ক্ষুধিত পায় বা না পায় সে দিকে খেয়ালই নাই। এমন কথা যারা বলে 'নিম্নসাধারণের জন্য যথেষ্ট শিক্ষার দরকার নাই, তাতে তাদের ক্ষতিই করিবে' তারা কর্তৃপক্ষদের কাছ হইতে এ কথা শুনিবার অধিকারী যে, বাঙালির পক্ষে বেশি শিক্ষা অনাবশ্যক, এমন-কি অনিষ্টকর। 'জনসাধারণকে লেখাপড়া শিখাইলে আমাদের চাকর জুটিবে না' এ কথা যদি সত্য হয় তবে আমরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদেরও দাস্যভাবের ব্যাঘাত হইবে এ আশঙ্কাও মিথ্যা নহে।

এ সম্বন্ধে নিজের মনের ভাবটা ঠিকমত যাচাই করিতে হইলে দুটো-একটা দৃষ্টান্ত দেখা দরকার। আমরা বেঙ্গল প্রোভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্স্‌ নামে একটা রাষ্ট্রসভার সৃষ্টি করিয়াছি। সেটা প্রাদেশিক, তার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলার অভাব

ও অভিযোগ সম্বন্ধে সকলে মিলিয়া আলোচনা করিয়া বাঙালির চোখ ফুটাইয়া দেওয়া। বহুকাল পর্যন্ত এই নিতান্ত সাদা কথাটা কিছুতেই আমাদের মনে আসে নাই যে, তা করিতে হইলে বাংলাভাষায় আলোচনা করা চাই। তার কারণ, দেশের লোককে দেশের লোক বলিয়া সমস্ত চৈতন্য দিয়া আমরা বুঝি না। এইজন্যই দেশের পুরো দাম দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। যা চাহিতেছি তা পেট ভরিয়া পাই না তার কারণ এ নয় যে দাতা প্রসন্নমনে দিতেছে না, তার কারণ এই যে আমরা সত্যমনে চাহিতেছি না।

বিদ্যাবিস্তারের কথাটাকে যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে, কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রফ্‌তানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যাবসা শহরেই আট্‌কা পড়িয়া থাকিবে।

এ পর্যন্ত এ অসুবিধাটাতে আমাদের অসুখ বোধ হয় নাই। কেননা মুখে যাই বলি, মনের মধ্যে এই শহরটাকেই দেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। দাক্ষিণ্য যখন খুব বেশি হয় তখন এই পর্যন্ত বলি : আচ্ছা বেশ, খুব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা বাংলাভাষায় দেওয়া চলিবে, কিন্তু সে যদি উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায় তবে 'গমিষ্যত্যুপহাস্যতাম্‌'।

আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে যা-কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।

অথচ, জাপানি ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তা ছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকার প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না, সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল, 'য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব।' যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।

আমাদের ভরসা এতই কম যে, স্কুল-কলেজের বাহিরে আমরা যে-সব লোকশিক্ষার আয়োজন করিয়াছি সেখানেও বাংলাভাষার প্রবেশ-নিষেধ। বিজ্ঞানশিক্ষাবিস্তারের জন্য দেশের লোকের চাঁদায় বহুকাল হইতে শহরে এক বিজ্ঞানসভা খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচ্যদেশের কোনো কোনো রাজার মতো গৌরবনাশের ভয়ে জনসাধারণের কাছে সে বাহির হইতেই চায় না। বরং অচল হইয়া থাকিবে তবু কিছুতে সে বাংলা বলিবে না। ও যেন বাঙালির চাঁদা দিয়া বাঁধানো পাকা ভিতের উপর বাঙালির অক্ষমতা ও ঔদাসীন্যের স্মরণ-স্তম্ভের মতো স্থাণু হইয়া আছে। কথাও বলে না, নড়েও না। উহাকে ভুলিতেও পারি না, উহাকে মনে রাখাও শক্ত। ওজর এই যে, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের, ভীরুর ওজর। কঠিন বৈকি। সেইজন্যই কঠোর সংকল্প চাই। একবার

ভাবিয়া দেখুন, একে ইংরেজি তাতে সায়ান্স্, তার উপরে দেশে যে-সকল বিজ্ঞান-বিশারদ আছেন তাঁরা জগদ্‌বিখ্যাত হইতে পারেন কিন্তু দেশের কোণে এই-যে একটুখানি বিজ্ঞানের নীড় দেশের লোক বাঁধিয়া দিয়াছে এখানে তাঁদের ফলাও জায়গা নাই, এমন অবস্থায় এই পদার্থটা বঙ্গসাগরের তলায় যদি ডুব মারিয়া বসে তবে ইহার সাহায্যে সেখানকার মৎস্যশাবকের বৈজ্ঞানিক উন্নতি আমাদের বাঙালির ছেলের চেয়ে যে কিছুমাত্র কম হইতে পারে এমন অপবাদ দিতে পারিব না।

মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক, সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?

বলা বাহুল্য, ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই, শুধু পেটের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি কেন, ফরাসি জর্মন শিখিলে আরো ভালো। সেই সঙ্গে এ কথা বলাও বাহুল্য, অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিংবা অর্ধাশনই ব্যবস্থা, এ কথা কোন্ মুখে বলা যায়?

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে বড়ো কারখানা আছে তার কলের চাকার অল্পমাত্র বদল করিতে গেলেই বিস্তর হাতুড়ি-পেটাপেটি করিতে হয়, সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। আশু মুখুজ্জে মশায় ওরই মধ্যে এক জায়গায় একটুখানি বাংলা হাতল জুড়িয়া দিয়াছেন।

তিনি যেটুকু করিয়াছেন তার ভিতরকার কথা এই, বাঙালির ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় যতই পাকা হোক্ বাংলা না শিখিলে তার শিক্ষা পুরা হইবে না। কিন্তু এ তো গেল যারা ইংরেজি জানে তাদেরই বিদ্যাকে চৌকস করিবার ব্যবস্থা। আর, যারা বাংলা জানে, ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এত বড়ো অস্বাভাবিক নির্মমতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে?

আমাকে লোকে বলিবে, 'শুধু কবিত্ব করিলে চলিবে না, একটা প্র্যাক্‌টিক্যাল পরামর্শ দাও; অত্যন্ত বেশি আশা করাটা কিছু নয়।' অত্যন্ত বেশি আশা চুলায় যাক্, লেশমাত্র আশা না করিয়াই অধিকাংশ পরামর্শ দিতে হয়। কিছু করিবার এবং হইবার আগে ক্ষেত্রটাতে দৃষ্টি তো পড়ুক। কোনোমতে মনটা যদি একটু উস্‌খুস্ করিয়া ওঠে তা হলেই আপাতত যথেষ্ট। এমন-কি লোকে যদি গালি দেয় এবং মারিতে আসে তা হলেও বুঝি যে, একটা বেশ উত্তম-মধ্যম ফল পাওয়া গেল।

অতএব পরামর্শে নামা যাক্।

আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশস্ত পরিমণ্ডল তৈরি হইয়া উঠিতেছে। একদিন মোটের উপর ইহা এক্‌জামিন পাসের কুস্তির আখড়া ছিল। এখন আখড়ার বাহিরেও ল্যাঙোটটার উপর ভদ্রবেশ ঢাকা দিয়া একটু হাঁফ ছাড়িবার জায়গা করা হইয়াছে। কিছুদিন হইতে দেখিতেছি বিদেশ হইতে বড়ো বড়ো অধ্যাপকেরা আসিয়া উপদেশ দিতেছেন, এবং আমাদের দেশের মনীষীদেরও এখানে আসন পড়িতেছে। শুনিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের এইটুকু ভদ্রতাও আশু মুখুজ্জে মশায়ের কল্যাণে ঘটিয়াছে।

আমি এই বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বাড়িটার ভিতরের আঙিনায় যেমন

চলিতেছে চলুক, কেবল তার এই বাহিরের প্রাঙ্গণটাতে যেখানে আম-দরবারের নূতন বৈঠক বসিল সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙালির জিনিস করিয়া তোলা যায় তাতে বাধাটা কী? আহূত যারা তারা ভিতর-বাড়িতেই বসুক, আর রবাহূত যারা তারা বাহিরে পাত পাড়িয়া বসিয়া যাক্-না। তাদের জন্য বিলিতি টেবিল নাহয় না রহিল, দিশি কলাপাত মন্দ কী? তাদের একেবারে দরোয়ান দিয়া ধাক্কা মারিয়া বিদায় করিয়া দিলে কি এ যজ্ঞে কল্যাণ হইবে? অভিশাপ লাগিবে না কি?

এমনি করিয়া, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে, কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।

শহরে যদি একটিমাত্র বড়ো রাস্তা থাকে তবে সে পথে বিষম ঠেলাঠেলি পড়ে। শহর-সংস্কারের প্রস্তাবের সময় রাস্তা বাড়াইয়া ভিড়কে ভাগ করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে আর-একটি সদর রাস্তা খুলিয়া দিলে ঠেলাঠেলি নিশ্চয় কমিবে।

বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে দেখিয়াছি, এক দল ছেলে স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদি-বা তারা কোনোমতে এন্ট্রেন্সের দেউড়িটা তরিয়া যায়, উপরের সিঁড়ি ভাঙিবার বেলাতেই চিত হইয়া পড়ে।

এমনতরো দুর্গতির অনেকগুলা কারণ আছে। এক তো যে ছেলের মাতৃভাষা বাংলা তার পক্ষে ইংরেজি ভাষার মতো বালাই আর নাই; ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে, গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয়; ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসামান্য স্মৃতিশক্তির জোরে যে ভাগ্যবানরা এমনতরো কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড করিতে পারে তারা শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পাইয়া যায়, কিন্তু যাদের মেধা সাধারণ মানুষের মাপে প্রমাণসই তাদের কাছে এতটা আশা করাই যায় না। তারা এই রুদ্ধ ভাষার ফাঁকের মধ্য দিয়া গলিয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়াও তাদের পক্ষে অসাধ্য।

এখন কথাটা এই, এই যে-সব বাঙালির ছেলে স্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না তারা কি এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে যেজন্য তারা বিদ্যামন্দির হইতে যাবজ্জীবন আণ্ডামানে চালান হইবার যোগ্য? ইংলন্ডে একদিন ছিল যখন সামান্য কলাটা মুলাটা চুরি করিলেও মানুষের ফাঁসি হইতে পারিত, কিন্তু এ যে তার চেয়েও কড়া আইন। এ যে চুরি করিতে পারে না বলিয়াই ফাঁসি। কেননা মুখস্থ করিয়া পাস করাই তো চৌর্যবৃত্তি। যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায়, সেই-বা কম কী করিল? সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্মরণ-শক্তির মহলটা ছাপাখানায় অধিকার করিয়াছে। অতএব, যারা বই মুখস্থ করিয়া

পাস করে তারা অসভ্যরকমে চুরি করে, অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই?

যাই হোক, ভাগ্যক্রমে যারা পার হইল তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাই না। কিন্তু যারা পার হইল না তাদের পক্ষে হাবড়ার পুলটাই নাহয় দুফাঁক হইল, কিন্তু কোনো রকমের সরকারি খেয়াও কি তাদের কপালে জুটিবে না? স্টীমার না হয় তো পান্‌সি?

ভালোমত ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না?

আমার প্রশ্ন এই, প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ত এক রকম পড়াইয়া তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায়, তা হইলে কি নানা প্রকারে সুবিধা হয় না? এক তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।

ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই বেশি লোক ঝুঁকিবে তা জানি এবং দুটো রাস্তার চলাচল ঠিক সহজ অবস্থায় পৌঁছিতে কিছু সময়ও লাগিবে। রাজভাষার দর বেশি সুতরাং আদরও বেশি। কেবল চাকরির বাজারে নয়, বিবাহের বাজারেও বরের মূল্যবৃদ্ধি ঐ রাস্তাটাতেই। তাই হোক, বাংলাভাষা অনাদর সহিতে রাজি, কিন্তু অকৃতার্থতা সহ্য করা কঠিন। ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক-না, কিন্তু গরিবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন?

অনেক দিন হইতে অনেক মার খাইয়াছি বলিয়া সাবধানে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। তবু অভ্যাসদোষে বেফাঁস কথা আপনি বাহির হইয়া পড়ে। আমার তো মনে হয়, গোড়ায় কথাটা আমি বেশ কৌশলেই পাড়িয়াছিলাম। নিজেকে বুঝাইয়াছিলাম, গোপাল অতি সুবোধ ছেলে, তাকে কম খাইতে দিলেও সে চেঁচামেচি করে না। তাই মৃদুস্বরে শুরু করিয়াছিলাম, আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরঙ্গনে যে একটা বক্তৃতার বৈঠক বসিয়াছে তারই এক কোণে বাংলার একটা আসন পাতিলে জায়গায় কুলাইয়া যাইবে। এ কথাটা গোপালের মতোই কথা হইয়াছিল; ইহাতে অভিভাবকেরা যদি-বা নারাজ হন তবু বিরক্ত হইবেন না।

কিন্তু, গোপালের সুবুদ্ধির চেয়ে যখন তার ক্ষুধা বাড়িয়া ওঠে তখন তার সুর আপনি চড়িতে থাকে; আমার প্রস্তাবটা অনেকখানি বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। তার ফল প্রস্তাবের পক্ষেও সাংঘাতিক হইতে পারে, প্রস্তাবকের পক্ষেও। সেটা নূতন নয়। শুনিয়াছি, আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুসংখ্যা খুব বেশি। এ দেশে শতকরা একশো-পঁচিশটা প্রস্তাব আঁতুরঘরেই মরে। আর, সাংঘাতিক মার এ বয়সে এত খাইয়াছি যে, ও জিনিসটাকে সাংঘাতিক বলিয়া একেবারেই বিশ্বাস করি না।

আমি জানি তর্ক এই উঠিবে, 'তুমি বাংলাভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই?' নাই সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিংবা সে আগাছাও নয় যে মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা, এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।

বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। বঙ্গসাহিত্যপরিষৎ কিছুকাল হইতে এই কাজের গোড়াপত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। পরিভাষা-রচনা ও সংকলনের ভার পরিষৎ লইয়াছেন, কিছু কিছু করিয়াওছেন। তাঁদের কাজ ঢিমা চালে চলিতেছে বা অচল হইয়া আছে বলিয়া নালিশ করি। কিন্তু দু পা'ও যে চলিয়াছে এইটেই আশ্চর্য। দেশে এই পরিভাষা-তৈরির তাগিদ কোথায়? ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন বা সুযোগ কৈ? দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাঁকশাল চলিতেই থাকিবে, এমন আব্দার করি কোন্ লজ্জায়?

যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিন বাংলাশিক্ষার রাস্তা খুলিয়া যায় তবে তখন এই বঙ্গসাহিত্যপরিষদের দিন আসিবে। এখন রাস্তা নাই তাই সে হুঁচট খাইতে খাইতে চলে; তখন চার ঘোড়ার গাড়ি বাহির করিবে। আজ আক্ষেপের কথা এই যে, আমাদের উপায় আছে, উপকরণ আছে, ক্ষেত্র নাই। বাংলার যজ্ঞে আমরা অন্নসত্র খুলিতে পারি। এই তো সব আছেন আমাদের জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী এবং আরো অনেক এই শ্রেণীর নামজাদা ও প্রচ্ছন্ননামা বাঙালি। অথচ যে-সব বাঙালি কেবল বাংলা জানে তাদের উপবাস কোনোদিন ঘুচিবে না? তারা এঁদের লইয়া গৌরব করিবে, কিন্তু লইয়া ব্যবহার করিতে পারিবে না? বাংলাবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে বরঞ্চ সাত সমুদ্র পার হইয়া বিদেশী ছেলে এঁদের কাছে শিক্ষা লইয়া যাইতে পারে, কেবল বাংলাদেশের যে ছাত্র বাংলা জানে এঁদের কাছে বসিয়া শিক্ষা লইবার অধিকার তাদেরই নাই!

জার্মানিতে ফ্রান্সে আমেরিকায় জাপানে যে-সকল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছে তাদের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের চিত্তকে মানুষ করা। দেশকে তারা সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুরকে, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষকে তারা মুক্তিদান করিতেছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে, চিত্তশক্তিকে উদ্ঘাটিত করিতেছে।

দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব, কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না; আমরা চিন্তা করিব, কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে; আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না—সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে!

তার ফল হইয়াছে, উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা যদি-বা আমরা পাই উচ্চ-অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ, চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোশাকি ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেই সঙ্গে তার পকেটে যা-কিছু সঞ্চয় থাকে তা আলনায় ঝোলানো থাকে; তার পরে আমাদের চিরদিনের আটপৌরে ভাষায় আমরা গল্প করি, গুজব করি, রাজা-উজির মারি, তর্জমা করি, চুরি করি এবং খবরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি। এসত্ত্বেও আমাদের দেশে বাংলায় সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না এমন কথা বলি না, কিন্তু এ সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট দেখিতে পাই। যেমন, এমন রোগী দেখা যায় যে খায় প্রচুর অথচ তার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি দেখি আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তার সমস্তটা আমাদের সাহিত্যের সর্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না

তার প্রধান কারণ, আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই না; আমাদের কলে করিয়া খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভর্তি করে, দেহপুর্তি করে না।

সকলেই জানেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লনডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে তৈরি। ঐ বিদ্যালয়টি পরীক্ষায় পাস করা ডিগ্রীধারীদের নামের উপর মার্কা মারিবার একটা বড়োগোছের শিলমোহর। মানুষকে তৈরি করা নয়, মানুষকে চিহ্নিত করা তার কাজ। মানুষকে হাটের মাল করিয়া তার বাজার-দর দাগিয়া দিয়া ব্যাবসাদারির সহায়তা সে করিয়াছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও আমরা সেই ডিগ্রীর টাঁকশালার ছাপ লওয়াকেই বিদ্যালাভ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের অভ্যাস হইয়া গেছে। আমরা বিদ্যা পাই বা না পাই বিদ্যালয়ের একটা ছাঁচ পাইয়াছি। আমাদের মুশকিল এই যে, আমরা চিরদিন ছাঁচের উপাসক। ছাঁচে-ঢালাই-করা রীতিনীতি চালচলনকেই নানা আকারে পুজার অর্ঘ্য দিয়া এই ছাঁচদেবীর প্রতি অচলা ভক্তি আমাদের মজ্জাগত। সেইজন্য ছাঁচে-ঢালা বিদ্যাটাকে আমরা দেবীর বরদান বলিয়া মাথায় করিয়া লই; ইহার চেয়ে বড়ো কিছু আছে এ কথা মনে করাও আমাদের পক্ষে শক্ত।

তাই বলিতেছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি একটা বাংলা অঙ্গের সৃষ্টি হয় তার প্রতি বাঙালি অভিভাবকদের প্রসন্ন দৃষ্টি পড়িবে কি না সন্দেহ। তবে কিনা, ইংরেজি চালুনির ফাঁক দিয়া যারা গলিয়া পড়িতেছে এমন ছেলে এখানে পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয়, তার চেয়ে একটা বড়ো সুবিধার কথা আছে।

সে সুবিধাটি এই যে, এই অংশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে। তার একটা কারণ, এই অংশের শিক্ষা অনেকটা পরিমাণে বাজার-দরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। আমাদের অনেককেই ব্যাবসার খাতিরে জীবিকার দায়ে ডিগ্রী লইতেই হয়, কিন্তু সে পথ যাদের অগত্যা বন্ধ কিংবা যারা শিক্ষার জন্যই শিখিতে চাহিবে তারাই এই বাংলা-বিভাগে আকৃষ্ট হইবে। শুধু তাই নয়, যারা দায়ে পড়িয়া ডিগ্রী লইতেছে তারাও অবকাশমত বাংলাভাষার টানে এই বিভাগে আনাগোনা করিতে ছাড়িবে না। কারণ, দু দিন না যাইতেই দেখা যাইবে, এই বিভাগেই আমাদের দেশের অধ্যাপকদের প্রতিভার বিকাশ হইবে। এখন যাঁরা কেবল ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ও নোটের ধুলা উড়াইয়া আঁধি লাগাইয়া দেন তাঁরাই সেদিন ধারাবর্ষণে বাংলার তৃষিত চিত্ত জুড়াইয়া দিবেন।

এমনি করিয়া যাহা সজীব তাহা ক্রমে কলকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের স্বাভাবিক সফলতাকে প্রমাণ করিয়া তুলিবে। একদিন ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি নিজের ইংরেজি লেখার অভিমানে বাংলাভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে নব বাংলাসাহিত্যের ছোটো একটি অঙ্কুর বাংলার হৃদয়ের ভিতর হইতে গজাইয়া উঠিল— তখন তার ক্ষুদ্রতাকে তার দুর্বলতাকে পরিহাস করা সহজ ছিল— কিন্তু সে যে সজীব, ছোটো হইলেও উপেক্ষার সামগ্রী নয়; আজ সে মাথা তুলিয়া বাঙালির ইংরেজি রচনাকে অবজ্ঞা করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। অথচ, বাংলা-সাহিত্যের কোনো পরিচয় কোনো আদর রাজদ্বারে ছিল না— আমাদের মতো অধীন জাতির পক্ষে সেই প্রলোভনের অভাব কম অভাব নয়— বাহিরের সেই-সমস্ত অনাদরকে গণ্য না করিয়া বিলাতি বাজারের যাচনদারের দৃষ্টির বাহিরে কেবলমাত্র নিজের প্রাণের আনন্দেই সে আজ পৃথিবীতে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য হইতেছে।

এতদিন ধরিয়া আমাদের সাহিত্যিকেরা যদি ইংরেজি কপিবুক নকল করিয়া আসিতেন তাহা হইলে জগতে যে প্রভূত আবর্জনার সৃষ্টি হইত তাহা কল্পনা করিলেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

এতদিন ধরিয়া ইংরেজি বিদ্যার যে কলটা চলিতেছে সেটাকে মিস্ত্রিখানার যোগে বদল করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তার দুটো কারণ আছে। এক, কলটা একটা বিশেষ ছাঁচে গড়া, একেবারে গোড়া হইতে সে ছাঁচ বদল করা সোজা কথা নয়। দ্বিতীয়ত, এই ছাঁচের প্রতি ছাঁচ-উপাসকদের ভক্তি এত সুদৃঢ় যে, আমরা ন্যাশনাল কলেজই করি আর হিন্দু য়ুনিভার্সিটিই করি আমাদের মন কিছুতেই ঐ ছাঁচের মুঠা হইতে মুক্তি পায় না। ইহার সংস্কারের একটিমাত্র উপায় আছে, এই ছাঁচের পাশে একটা সজীব জিনিসকে অল্প একটু স্থান দেওয়া। তাহা হইলে সে তর্ক না করিয়া, বিরোধ না করিয়া, কলকে আচ্ছন্ন করিয়া একদিন মাথা তুলিয়া উঠিবে এবং কল যখন আকাশে ধোঁওয়া উড়াইয়া ঘর্ঘর শব্দে হাটের জন্য মালের বস্তা উদ্গার করিতে থাকিবে তখন এই বনস্পতি নিঃশব্দে দেশকে ফল দিবে, ছায়া দিবে এবং দেশের সমস্ত কলভাষী বিহঙ্গদলকে নিজের শাখায় শাখায় আশ্রয় দান করিবে।

কিন্তু ঐ কলটার সঙ্গে রফা করিবার কথাই বা কেন বলা? ওটা দেশের আপিস-আদালত, পুলিসের থানা, জেলখানা, পাগ্‌লাগারদ, জাহাজের জেটি, পাটের কল প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার আসবাবের সামিল হইয়া থাক্‌-না। আমাদের দেশ যেখানে ফল চাহিতেছে, ছায়া চাহিতেছে, সেখানে কোঠাবাড়িগুলা ছাড়িয়া একবার মাটির দিকেই নামিয়া আসি-না কেন? গুরুর চারি দিকে শিষ্য আসিয়া যেমন স্বভাবের নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করিয়া তোলে, বৈদিককালে যেমন ছিল তপোবন, বৌদ্ধকালে যেমন ছিল নালন্দা-তক্ষশিলা, ভারতের দুর্গতির দিনেও যেমন করিয়া টোল-চতুষ্পাঠী দেশের প্রাণ হইতে প্রাণ লইয়া দেশকে প্রাণ দিয়া রাখিয়াছিল, তেমনি করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়কে জীবনের দ্বারা জীবলোকে সৃষ্টি করিয়া তুলিবার কথাই সাহস করিয়া বলা যাক্‌-না কেন?

সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র 'আমরা চাই'। এই মন্ত্র কি দেশের চিত্তকুহর হইতে একেবারেই শুনা যাইতেছে না? দেশে যাঁরা আচার্য, যাঁরা সন্ধান করিতেছেন, সাধনা করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, তাঁরা কি এই মন্ত্রে শিষ্যদের কাছে আসিয়া মিলিবেন না? বাষ্প যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে, তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একত্র মিলিবেন, কবে তাঁদের সাধনা মাতৃভাষায় গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে?

আমার এই শেষ কথাটি কেজো কথা নহে, ইহা কল্পনা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়া চলিয়াছে, সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনায়।

পৌষ ১৩২২

ছাত্রশাসনতন্ত্র

প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রদের সহিত কোনো কোনো য়ুরোপীয় অধ্যাপকের যে বিরোধ ঘটিয়াছে তাহা লইয়া কোনো কথা বলিতে সংকোচ বোধ করি। তার একটা কারণ, ব্যাপারটা দেখিতেও ভালো হয় নাই, শুনিতেও ভালো নয়। আর-একটা

কারণ, ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্কটার মধ্যে যেখানে কিছু ব্যথা আছে সেখানে নাড়া দিতে ইচ্ছা করে না।

কিন্তু কথাটাকে চাপা দিলে চলিবে না। চাপা থাকেও নাই, বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মনে মনে বা কানে কানে বা মুখে মুখে সকলেই এর বিচার করিতেছে।

বিকৃতি ভিতরে জমিতে থাকিলে একদিন সে আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। লাল হইয়া শেষকালে ফাটিয়া পড়ে। তখনকার মতো সেটা সুদৃশ্য নয়।

বাহিরে ফুটিয়া পড়াটাকেই দোষ দেওয়া বিশ্ববিধানকে দোষ দেওয়া; এমনতরো অপবাদে বিশ্ববিধাতা কান দেন না। ভিতরে ভিতরে জমিতে দেওয়া লইয়াই আমাদের নালিশ চলে।

যাক, বাহির যখন হইয়াছেই তখন বিচার করিয়া কোনো-একটা জায়গায় শান্তি না দিলে নয়। এইটেই সংকটের সময়। জিনিসটা ভদ্র রকমের নহে, এটা ঠিক। ইহার আক্রোশটা প্রকাশ করিব কার উপরে? প্রায় দেখা যায় সহজে যার উপরে জোর খাটে শাসনের ধাক্কাটা তারই উপরে পড়ে। ঘরের গৃহিণী যেখানে বউকে মারিতে ভয় পায় সেখানে ঝিকে মারিয়া কর্তব্য পালন করে।

বিচারসভা বসিয়াছে। ইতিমধ্যেই ছাত্রদের সম্বন্ধে শাসন কড়া করিবার জন্য কোনো মিশনরি কলেজের কর্তা কর্তৃপক্ষের নিকট আবদার প্রকাশ করিয়াছেন। কথাটা শুনিতেও হঠাৎ সংগত বোধ হয়। কারণ, ছাত্রেরা অধ্যাপকদের অসম্মান করিলে সেটা যে কেবল অপরাধ হয় তাহা নহে, সেটা অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। যেখান হইতে আমরা জ্ঞান পাই সেখানে আমাদের শ্রদ্ধা যাইবে, এটা মানবপ্রকৃতির ধর্ম। তাহার উল্টা দেখিলে বাহিরের শাসনে এই বিকৃতির প্রতিকার করিতে হইবে, সে কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

কিন্তু, প্রতিকারের প্রণালী স্থির করিবার পূর্বে ভাবিয়া দেখা চাই, স্বভাব ওল্টায় কিসে।

কাগজে দেখিতে পাই, অনেকে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন যে, যে ভারতবর্ষে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ধর্মসম্বন্ধ সেখানে এমনতরো ঘটনা বিশেষভাবে গর্হিত। শুধু গর্হিত এ কথা বলিয়া পার পাইব না, চিরকালীন এই সংস্কার অস্থিমজ্জার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে কেন এর একটা সত্য উত্তর বাহির করিতে হইবে।

বাংলাদেশের ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব যে বিধাতার একটি খাপছাড়া খেয়াল এ কথা মানি না। ছেলেরা যে বয়সে কলেজে পড়ে সেটা একটা বয়ঃসন্ধির কাল। তখন শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় সে প্রথম পা বাড়াইয়াছে। এই স্বাধীনতা কেবল বাহিরের ব্যবহারগত নহে; মনোরাজ্যেও সে ভাষার খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে শুরু করিয়াছে। তার মন প্রশ্ন করিবার, তর্ক করিবার, বিচার করিবার অধিকার প্রথম লাভ করিয়াছে। শরীর-মনের এই বয়ঃসন্ধিকালটিই বেদনাকাতরতায় ভরা। এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে। এই সময়েই মানবসংস্রবের জোর তার 'পরে যতটা খাটে এমন আর-কোনো সময়েই নয়।

এই বয়সটাই মানুষের জীবন মানুষের সঙ্গপ্রভাবেই গড়িয়া উঠিবার পক্ষে সকলের চেয়ে অনুকূল, স্বভাবের এই সত্যটিকে সকল দেশের লোকেই মানিয়া লইয়াছে। এইজন্যই আমাদের দেশে বলে: প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং

মিত্রবদাচরেৎ।' তার মানে এই বয়সেই ছেলে যেন বাপকে পুরোপুরি মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারে, শাসনের কল বলিয়া নহে; কেননা, মানুষ হইবার পক্ষে মানুষের সংস্রব এই বয়সেই দরকার। এইজন্যই সকল দেশেই য়ুনিভার্সিটিতে ছাত্ররা এমন একটুখানি সম্মানের পদ পাইয়া থাকে যাহাতে অধ্যাপকদের বিশেষ কাছে তারা আসিতে পারে এবং সেই সুযোগে তাদের জীবনের 'পরে মানবসংস্রবের হাত পড়িতে পায়। এই বয়সে ছাত্রগণ শিক্ষার উদ্যোগপর্ব শেষ করিয়া মনুষ্যত্বের সার জিনিসগুলিকে আত্মসাৎ করিবার পালা আরম্ভ করে; এই কাজটি স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান ছাড়া হইবার জো নাই। সেইজন্যই এই বয়সে আত্মসম্মানের সম্বন্ধে দরদ বড়ো বেশি হয়। চিবাইয়া খাইবার বয়স আসিলে বেশ একটু জানান দিয়া দাঁত ওঠে, তেমনি মনুষ্যত্বলাভের যখন বয়স আসে তখন আত্মসম্মানবোধটা একটু ঘটা করিয়াই দেখা দেয়।

এই বয়ঃসন্ধির কালে ছাত্ররা মাঝে মাঝে এক-একটা হাঙ্গাম বাধাইয়া বসে। যেখানে ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপকের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সেখানে এই-সকল উৎপাতকে জোয়ারের জলের জঞ্জালের মতো ভাসিয়া যাইতে দেওয়া হয়; কেননা, তাকে টানিয়া তুলিতে গেলেই সেটা বিশ্রী হইয়া উঠে।

বিধাতার নিয়ম অনুসারে বাঙালি ছাত্রদেরও এই বয়ঃসন্ধির কাল আসে, তখন তাহাদের মনোবৃত্তি যেমন এক দিকে আত্মশক্তির অভিমুখে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে চায় তেমনি আর-এক দিকে যেখানে তারা কোনো মহত্ত্ব দেখে, যেখান হইতে তারা শ্রদ্ধা পায়, জ্ঞান পায়, দরদ পায়, প্রাণের প্রেরণা পায়, সেখানে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। মিশনরি কলেজের বিধাতাপুরুষের বিধানে ঠিক এই বয়সেই তাহাদিগকে শাসনে পেষণে দলনে দমনে নির্জীব জড়পিণ্ড করিয়া তুলিবার জাঁতাকল বানাইয়া তোলা জগদ্‌বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; ইহাই প্রকৃত নাস্তিকতা।

জেলখানার কয়েদি নিয়মের নড়চড় করিলে তাকে কড়া শাসন করিতে কারও বাধে না; কেননা তাকে অপরাধী বলিয়াই দেখা হয়, মানুষ বলিয়া নয়। অপমানের কঠোরতায় মানুষের মনে কড়া পড়িয়া তাকে কেবলই অমানুষ করিতে থাকে, সে হিসাবটা কেহ করিতে চায় না; কেননা, মানুষের দিক দিয়া তাকে হিসাব করাই হয় না। এইজন্য জেলখানার সর্দারি যে করে সে মানুষকে নয়, অপরাধীকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখে।

সৈন্যদলকে তৈরি করিয়া তুলিবার ভার যে লইয়াছে সে মানুষকে একটিমাত্র সংকীর্ণ প্রয়োজনের দিক হইতেই দেখিতে বাধ্য। লড়াইয়ের নিখুঁত কল বানাইবার ফর্মাশ তার উপরে। সুতরাং, সেই কলের হিসাবে যে কিছু ত্রুটি সেইটে সে একান্ত করিয়া দেখে এবং নির্মমভাবে সংশোধন করে।

কিন্তু, ছাত্রকে জেলের কয়েদি বা ফৌজের সিপাই বলিয়া আমরা তো মনে ভাবিতে পারি না। আমরা জানি, তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। মানুষের প্রকৃতি সূক্ষ্ম এবং সজীব তন্তুজালে বড়ো বিচিত্র করিয়া গড়া। এইজন্যই মানুষের মাথা ধরিলে মাথায় মুগুর মারিয়া সেটা সারানো যায় না; অনেক দিক বাঁচাইয়া প্রকৃতির সাধ্যসাধনা করিয়া তার চিকিৎসা করিতে হয়। এমন লোকও আছে এ সম্বন্ধে যারা বিজ্ঞানকে খুবই সহজ করিয়া আনিয়াছে; তারা সকল ব্যাধিরই একটিমাত্র কারণ ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, সে ভূতে পাওয়া। এবং তারা মিশনরি কলেজের ওঝাটির মতো ব্যাধির ভূতকে মারিয়া ঝাড়িয়া, গরম লোহার

ঝ্যাঁকা দিয়া, চীৎকার করিয়া, তাড়াইতে চায়। তাহাতে ব্যাধি যায়। এবং প্রাণ-পদার্থের প্রায় পনেরো আনা তার অনুসরণ করে।

এ হইল আনাড়ির চিকিৎসা। যারা বিচক্ষণ তারা ব্যাধিটাকেই স্বতন্ত্র করিয়া দেখে না; চিকিৎসার সময় তারা মানুষের সমস্ত ধাতটাকে অখণ্ড করিয়া দেখে; মানবপ্রকৃতির জটিলতা ও সূক্ষ্মতাকে তারা মানিয়া লয় এবং বিশেষ কোনো ব্যাধিকে শাসন করিতে গিয়া সমস্ত মানুষকে নিকাশ করিয়া বসে না।

অতএব যাদের উচিত ছিল জেলের দারোগা বা ড্রিল সার্জেণ্ট্ বা ভূতের ওঝা হওয়া তাদের কোনোমতেই উচিত হয় না ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ভার লওয়া। ছাত্রদের ভার তাঁরাই লইবার অধিকারী যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্বলকেও সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারেন; যাঁরা জানেন, শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা; যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

যিশুখৃস্ট বলিয়াছেন, 'শিশুদিগকে আমার কাছে আসিতে দাও।' তিনি শিশুদিগকে বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছেন। কেননা, শিশুদের মধ্যেই পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা আছে। যে মানুষ বয়সে পাকা হইয়া অভ্যাসে সংস্কারে ও অহমিকায় কঠিন হইয়া গেছে সে মানুষ সেই পূর্ণতার ব্যঞ্জনা হারাইয়াছে; বিশ্বগুরুর কাছে আসা তার পক্ষেই বড়ো কঠিন।

ছাত্রেরা গড়িয়া উঠিতেছে; ভাবের আলোকে, রসের বর্ষণে তাদের প্রাণ-কোরকের গোপন মর্মস্থলে বিকাশবেদনা কাজ করিতেছে। প্রকাশ তাদের মধ্যে থামিয়া যায় নাই; তাদের মধ্যে পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেইজন্যই সৎগুরু ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন, প্রেমের সহিত কাছে আহ্বান করেন, ক্ষমার সহিত ইহাদের অপরাধ মার্জনা করেন এবং ধৈর্যের সহিত ইহাদের চিত্তবৃত্তিকে ঊর্ধ্বের দিকে উদ্‌ঘাটন করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে পূর্ণমনুষ্যত্বের মহিমা প্রভাতের অরুণরেখার মতো অসীম সম্ভাব্যতার গৌরবে উজ্জ্বল; সেই গৌরবের দীপ্তি যাদের চোখে পড়ে না, যারা নিজের বিদ্যা পদ বা জাতির অভিমানে ইহাদিগকে পদে পদে অবজ্ঞা করিতে উদ্যত, তারা গুরুপদের অযোগ্য। ছাত্রদিগকে যারা স্বভাবতই শ্রদ্ধা করিতে না পারে ছাত্রদের নিকট হইতে ভক্তি তারা সহজে পাইতে পারিবে না। কাজেই ভক্তি জোর করিয়া আদায় করিবার জন্য তারাই রাজদরবারে কড়া আইন ও চাপরাশওয়ালা পেয়াদার দরবার করিয়া থাকে।

ছাত্রদিগকে কড়া শাসনের জালে যাঁরা মাথা হইতে পা পর্যন্ত বাঁধিয়া ফেলিতে চান তাঁরা অধ্যাপকদের যে কত বড়ো ক্ষতি করিতেছেন সেটা যেন ভাবিয়া দেখেন। পৃথিবীতে অল্প লোকই আছে নিজের অন্তরের মহৎ আদর্শ যাহাদিগকে সত্য পথে আহ্বান করিয়া লইয়া যায়। বাহিরের সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতের ঠেলাতেই তারা কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া থাকে। বাহিরের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে বলিয়াই তারা আত্মবিস্মৃত হইতে পারে না।

এইজন্যই চারি দিকে যেখানে দাসত্ব মনিবের সেখানে দুর্গতি, শূদ্র যেখানে শূদ্র ব্রাহ্মণের সেখানে অধঃপতন। কঠোর শাসনের চাপে ছাত্রেরা যদি মানব-স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হয়, সকলপ্রকার অপমান দুর্ব্যবহার ও অযোগ্যতা যদি তারা নির্জীবভাবে নিঃশব্দে সহিয়া যায়, তবে অধিকাংশ অধ্যাপকদিগকেই তাহা অধোগতির দিকে টানিয়া লইবে। ছাত্রদের মধ্যে অবজ্ঞার কারণ তাঁরা নিজে ঘটাইয়া তুলিয়া তাহাদের অবমাননার দ্বারা নিজেকে অহরহ অবমানিত করিতে থাকিবেন। অবজ্ঞার ক্ষেত্রে নিজের কর্তব্য কখনোই কেহ সাধন করিতে পারে না।

অপর পক্ষ বলিবেন, তবে কি ছেলেরা যা খুশি তাই করিবে আর সমস্তই সহিয়া লইতে হইবে? আমার কথা এই, ছেলেরা যা খুশি তাই কখনোই করিবে না। তারা ঠিক পথেই চলিবে, যদি তাহাদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করা হয়। যদি তাহাদিগকে অপমান কর, তাহাদের জাতি বা ধর্ম বা আচারকে গালি দাও, যদি দেখে তাহাদের পক্ষে সুবিচার পাইবার আশা নাই, যদি অনুভব করে যোগ্যতা-সত্ত্বেও তাহাদের স্বদেশীয় অধ্যাপকেরা অযোগ্যের কাছে মাথা হেঁট করিতে বাধ্য, তবে ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেই; যদি না করে তবে আমরা সেটাকে লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করিব।

অপর পক্ষে একটি সংগত কথা বলিবার আছে। য়ুরোপীয়ের পক্ষে ভারতবর্ষ বিদেশ, এখানকার আবহাওয়া ক্লান্তিকর, তাঁহাদের পানাহার উত্তেজক, আমরা তাঁহাদের অধীনস্থ জাতি, আমাদের বর্ণ ধর্ম ভাষা আচার সমস্তই স্বতন্ত্র। তার উপরে, এ দেশে প্রত্যেক ইংরেজই রাজশক্তি বহন করেন, সুতরাং রাজাসন তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে থাকে; এইজন্য ছাত্রকে কেবলমাত্র ছাত্র বলিয়া দেখা তাঁর পক্ষে শক্ত, তাকে প্রজা বলিয়াও দেখেন। অতএব, অতি সামান্য কারণেই অসহিষ্ণু হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বাঙালি ছাত্রদের মানুষ করিবার ভার কেবল তাঁর নয়, ইংরেজ-রাজের প্রতিষ্ঠা রক্ষার ভারও তাঁর। অতএব, একে তিনি ইংরেজ, তার উপর তিনি ইম্পীরিএল সার্ভিসের অধ্যাপক, তার উপরে তিনি রাজার অংশ, তার উপরে তাঁর বিশ্বাস তিনি পতিত-উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের প্রতি কৃপা করিয়াই এ দেশে আসিয়াছেন—এমন অবস্থায় সকল সময়ে তাঁর মেজাজ ঠিক না থাকিতেও পারে। অতএব, তিনি কিরূপ ব্যবহার করিবেন সে বিচার না করিয়া ছাত্রদেরই ব্যবহারকে আষ্টেপৃষ্ঠে কঠিন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। সমুদ্রকে বলিলে চলিবে না যে, 'তুমি এ পর্যন্ত আসিবে তার ঊর্ধ্বে নয়', তীরে যারা আছে তাহাদিগকেই বলিতে হইবে, 'তোমরা হঠো, হঠো, আরো হঠো।'

তাই বলিতেছি, এ কথা সত্য বলিয়া মানিতেই হইবে যে, নানা অনিবার্য কারণে ইংরেজ অধ্যাপক বাঙালি ছাত্রের সহিত বিশুদ্ধ অধ্যাপকের মতো ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারেন না। কেম্‌ব্রিজে অক্‌স্‌ফোর্ডে ছাত্রদের সহিত অধ্যাপকদের সম্বন্ধ কিরূপ তর্কস্থলে আমরা সে নজির উত্থাপন করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতে লাভ কী! সেখানে যে সম্বন্ধ স্বাভাবিক এখানে যে তাহা নহে, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব, স্বাভাবিকতায় যেখানে গর্ত আছে সেখানে শাসনের ইঁটপাটকেল দিয়া ভরাট করিবার কথাটাই সর্বাগ্রে মনে আসে।

সমস্যাটা আমাদের পক্ষে শক্ত হইয়াছে এই কারণেই। এইজন্যই আমাদের স্বদেশীয় বিজ্ঞেরাও ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়া থাকেন যে, 'বাপু, তোমরা কোনো-মতে এগ্‌জামিন পাস করিয়াই সন্তুষ্ট থাকো, মানুষ হইবার দুরাশা মনে রাখিয়ো না।'

এ বেশ ভালো কথা। কিন্তু সুবুদ্ধির কথা চিরদিন খাটে না; মানবপ্রকৃতি সুবুদ্ধির পাকা ভিতের উপরে পাথরে গাঁথিয়া তৈরি হয় নাই। তাকে বাড়িতে হইবে, এইজন্যই সে কাঁচা। এইজন্যই কৃত্রিম ঘেরটাকে সে খানিকটা দূর পর্যন্ত সহ্য করে; তার পরে প্রাণের বাড় আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, একদিন হঠাৎ বেড়া ফাটিয়া ভাঙিয়া পড়ে। যে প্রাণ কাঁচ তারই জয় হয়, যে বাঁধন পাকা সে টেঁকে না।

অতএব, স্বভাবকে যদি কেবল এক পক্ষেই মানি এবং অপর পক্ষে একেবারেই

অগ্রাহ্য করি তবে কিছুদিন মনে হয়, সেই এক-তরফা নিষ্পত্তিতে বেশ কাজ চলিতেছে। তার পরে একদিন হঠাৎ দেখিতে পাই, কাজ একেবারেই চলিতেছে না। তখন দ্বিগুণ রাগ হয়; যা এতদিন ঠাণ্ডা ছিল তার অকস্মাৎ চঞ্চলতা গুরুতর অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইতে থাকে এবং সেই কারণেই শাস্তির মাত্রা দণ্ডবিধির সহজ বিধানকে ছাড়াইয়া যায়। তার পর হইতে সমস্ত ব্যাপারটা এমনি জটিল হইয়া উঠে যে কমিশনের পঞ্চায়েত তার মধ্যে পথ খুঁজিয়া পায় না; তখন বলিতে বাধ্য হয় যে, 'কুড়াল দিয়া কাটিয়া, আগুন দিয়া পোড়াইয়া, স্টীম্‌রোলার দিয়া পিষিয়া রাস্তা তৈরি করো।'

কথাটা বেশ। কর্ণধার কানে ধরিয়া ঝিঁকা মারিতে মারিতে স্কুলের খেয়া পার করিয়া দিল, তার পরে লৌহশাসনের কলের গাড়িতে প্রাণরসকে অন্তররুদ্ধ তপ্তবাষ্পে পরিণত করিয়া য়ুনিভার্সিটির শেষ ইস্‌টেশনে গিয়া নামিলাম, সেখানে চাকরির বালুমরুতে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন জীবিকামরীচিকার পিছনে ধুঁকিতে ধুঁকিতে চলিলাম, তার পরে সূর্য যখন অস্ত যায় তখন যমরাজের সদর গেটের কাছে গিয়া মাথার বোঝা নামাইয়া দিয়া মনে করিলাম 'জীবন সার্থক হইল'। জীবনযাত্রার এমন নিরাপদ এবং শান্তিময় আদর্শ অন্য কোথাও নাই। এই আদর্শ আমাদের দেশে যদি চিরদিন টেকা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে কোনো কথা বলিতাম না।

কিন্তু, টিঁকিল না। তার কারণ, আমরা তো কেবলমাত্র খৃস্টানকলেজের প্রধান অধ্যক্ষ এবং পতিত-উদ্ধারের দুঃসাধ্যব্রতধারীদের কাছ হইতেই শিক্ষা পাই নাই। আমরা যে ইংলন্‌ডের কাছ হইতে শিখিতেছি। সেও আজ একশো বছরের উপর হইয়া গেল। সে শিক্ষা তো বন্ধ্যা নহে, নূতন প্রাণকে সে জন্ম দিবেই। তার পরে সেই প্রাণের ক্ষুধাতৃষ্ণা যে অন্নপানীয়ের দাবি করিবে তাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে কেহ পারিবে না।

মনে আছে, ছেলেবেলা যখন ইংরেজি মাস্টারের কাছে ইংরেজি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ মুখস্থ করিতে হইত তখন I শব্দের একটা প্রতিশব্দ বহু কষ্টে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, সে হইতেছে: Myself—I, by Myself I। ইংরেজি এই I শব্দের প্রতিশব্দটি আয়ত্ত করিতে কিছুদিন সময় লাগিয়াছে; ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া ওটা একরকম সড়গড় হইয়া আসিল। এখন মাস্টারমশায় I হইতে ঐ myself-টাকে কালীর দাগে লাঞ্ছিত করিয়া রবারের ঘর্ষণে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আমাদের খৃস্টান হেড্‌মাস্টার বলিতেছেন, 'আমাদের দেশে I শব্দের যে অর্থ তোমাদের দেশে সে অর্থ হইতেই পারে না।' কিন্তু, ওটাকে কণ্ঠস্থ করিতে যদি আমাদের দুইশো বছর লাগিয়া থাকে ওটাকে সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত করিতে তার ডবল সময়েও কুলায় কি না সন্দেহ করি। কেননা, ঐ I শব্দের ইংরেজি মন্ত্রটা ভয়ংকর কড়া, গুরু যদি গোড়া হইতেই ওটা সম্পূর্ণ চাপিয়া যাইতে পারিতেন তো কোনো বালাই থাকিত না; এখন ওটা কান হইতে প্রাণের মধ্যে পৌঁছিয়াছে, এখন প্রাণটাকে মারিয়া ওটাকে উপড়ানো যায়। কিন্তু প্রাণ বড়ো শক্ত জিনিস।

ইংলন্‌ড্‌ যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে আপন সম্পর্ক রাখিয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে আপনি লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। যাহা তার সর্বোচ্চ সম্পদ তাহা ইচ্ছা করিয়াই হউক, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হউক, আমাদিগকে দিতেই হইবে। ইহাই বিধাতার অভিপ্রায়, তার সঙ্গে প্রিন্‌সিপাল সাহেবের অভিপ্রায় মিলুক আর নাই মিলুক। তাই আজ আমাদের ছাত্রেরা কেবলমাত্র ইংরেজি কেতাবের ইংরেজি

নোট কুড়ানোর উঞ্ছবৃত্তিতেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে না, আজ তারা আত্ম-সম্মানকে বজায় রাখিতে চাহিবেই; আজ তারা নিজেকে কলের পুতুল বলিয়া ভুল করিতে পারিবে না; আজ তারা জেলের দারোগাকে নিজের গুরু বলিয়া মানিয়া শাসনের চোটে তাকে গুরুভক্তি দেখাইতে রাজি হইবে না। আজ যাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাকে গালি দিলেও তাহা মিথ্যা হইবে না এবং তার গালে চড় মারিলেও সে যে সত্য ইহাই আরো বেশি করিয়া প্রমাণ হইতে থাকিবে।

যে কথা লইয়া আজ আলোচনা চলিতেছে এ যদি একটা সামান্য ও সাময়িক আন্দোলন মাত্র হইত তাহা হইলে আমি কোনো কথাই বলিতাম না। কিন্তু ইহার মূলে খুব একটা বড়ো কথা আছে, সেইজন্যই এই প্রসঙ্গে চুপ করিয়া থাকা অন্যায় মনে করি।

মানুষের ইতিহাস ভিন্ন দেশে ভিন্ন মূর্তি ধরে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও বিশেষত্ব আছে। সেই ইতিহাসের গোড়া হইতেই আমরা দেখিয়া আসিতেছি, এ দেশ কোনো বিশেষ একটি জাতির বা বিশেষ একটি সভ্যতার দেশ নয়। এ দেশে আর্যসভ্যতাও যেমন সত্য, দ্রাবিড়সভ্যতাও তেমনি সত্য, এ দেশে হিন্দুও যত বড়ো, মুসলমানও তার চেয়ে নিতান্ত কম নয়। এইজন্যই এখানকার ইতিহাস নানা বিরোধের বাষ্পসংঘাতে প্রকাণ্ড নীহারিকার মতো ঝাপসা হইয়া আছে। এই ইতিহাসে আমরা নানা শক্তির আলোড়ন দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু একটা অখণ্ড ঐতিহাসিক মূর্তির উদ্ভাবন এখনো দেখি নাই। এই পরিব্যাপ্ত বিপুলতার মধ্য হইতে একটি নিরবচ্ছিন্ন 'আমি'র সুস্পষ্ট ক্রন্দন জাগিল না।

স্ফটিক যখন দ্রব অবস্থায় থাকে তখন তাহা মূর্তিহীন; আমরা সেই অবস্থায় অনেক দিন কাটাইলাম। এমন সময় সমুদ্রপার হইতে একটি আঘাত এই তরল পদার্থের উপর হইতে নিচে, এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্তে সঞ্চারিত হইয়াছে; তাই অনুভব করিতেছি দানা বাঁধিবার মতো একটা সর্বব্যাপী আবেগ ইহার কণায় কণায় যেন নড়িয়া উঠিল। মূর্তি ধরিয়া উঠিবার একটা বেদনা ইহার সর্বত্র যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

তাই দেখিতেছি, ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেমন আর্য আছে দ্রাবিড় আছে, যেমন মুসলমান আছে, তেমনি ইংরেজও আসিয়া পড়িয়াছে। তাই, ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস কেবল আমাদের ইতিহাস নহে, তাহা ইংরেজেরও ইতিহাস। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে, ইতিহাসের এই-সমস্ত অংশগুলি ঠিকমত করিয়া মেলে, সমস্তটাই এক সজীব শরীরের অঙ্গ হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে কোনো-একটা অংশকে বাদ দিব সে আমাদের সাধ্য নাই। মুসলমানকে বাদ দিতে পারি নাই, ইংরেজকেও বাদ দিতে পারিব না। এ কেবল বাহুবলের অভাব-বশত নহে, আমাদের ইতিহাসটার প্রকৃতিই এই; তাহা কোনো-এক জাতির ইতিহাস নয়, তাহা একটা মানব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস।

এই-যে নানা যুগ, নানা জাতি ও নানা সভ্যতা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গড়িয়া তুলিতেছে, আজ সেই ঐতিহাসিক অভিপ্রায়ের অনুগত করিয়া আমাদের অভিপ্রায়কে সজাগ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, আমাদের দেশ ইংলন্‌ড্‌ নয়, ইটালি নয়, আমেরিকা নয়; সেখানকার মাপে কোনোমতেই আমাদের ইতিহাসকে ছাঁটা চলিবে না। এখানে একেবারে মূলে তফাত। ও-সকল দেশ মোটের উপরে একটা ঐক্যকে লইয়াই নিজেরা ইতিহাস ফাঁদিয়াছে, আমরা অনৈক্য

লইয়াই প্রথম হইতে শুরু করিয়াছি এবং আজ পর্যন্ত কেবল তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, এই লইয়াই আমরা কী করিতে পারি। বাহিরকে কেমন করিয়া বাহির করিয়া দিব, স্বভাবতই অন্য ইতিহাসের এই ভাবনা; বাহিরকে কেমন করিয়া আপন করিয়া লইব, স্বভাবতই আমাদের ইতিহাসের এই ভাবনা।

ইংরেজকে আমাদের দেশের পক্ষে আপন করিয়া না লইতে পারিলে আমাদের স্বাস্থ্য নাই, কল্যাণ নাই। ইংরেজের শাসন যতক্ষণ আমাদের পক্ষে কলের শাসন থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সম্বন্ধ মানবসম্বন্ধ না হইবে, ততক্ষণ Pax Britannica আমাদিগকে 'শান্তি' দিবে, জীবন দিবে না। আমাদের অন্নের হাঁড়িতে জল চড়াইবে মাত্র, চুলাতে আগুন ধরাইবে না। অর্থাৎ, ততক্ষণ ইংরেজ ভারতবর্ষের সৃজনকার্যে বিশ্বকর্মার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হইবে না, বাহির হইতে মজুরি করিয়া কেবল ইঁট কাঠ ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে। ইহাকেই একজন ইংরেজ কবি বলিয়াছেন the white man's burden। কিন্তু, 'বার্ডেন' কেন হইতে যাইবে? এ কেন সৃজনকার্যের আনন্দ না হইবে? সৃষ্টিকর্তার ডাকে ইংরেজ এখানে আসিয়াছে, তাকে সৃষ্টিকার্যে যোগ দিতেই হইবে। যদি আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতে পারে তবেই সব দিকে ভালো, যদি না পারে তবে এই land of regrets-এর তপ্ত বালুকাপথ তাহাদের কঙ্কালে খচিত হইয়া যাইবে, তবু ভার বহিতেই হইবে। ভারত-ইতিহাসের গঠনকাজে যদি তাহাদের প্রাণের যোগ না ঘটে, কেবলমাত্র কাজের যোগ ঘটে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের বিধাতা বেদনা পাইবেন, ইংরেজও সুখ পাইবে না।

তাই ভারত-ইতিহাসের প্রধান সমস্যা এই, ইংরেজকে পরিহার করা নয়, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধকে সজীব ও স্বাভাবিক করিয়া তোলা। এত দিন পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান ও ভারতবর্ষের নানা বিচিত্র জাতিতে মিলিয়া এ দেশের ইতিহাস আপনা-আপনি যেমন-তেমন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল। আজ ইংরেজ আসার পর এই কাজে আমাদের চেতনা জাগিয়াছে; ইতিহাস-রচনায় আজ আমাদের ইচ্ছা কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

এইজন্যই ইচ্ছায় ইচ্ছায় মাঝে মাঝে দ্বন্দ্ব বাধিবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু যাঁরা এ দেশের সঞ্জীবনমন্ত্রের তপস্বী রাগদ্বেষে ক্ষুব্ধ হইলে তাঁদের চলিবে না। তাঁহাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিল করাই চাই। কারণ, ইংরেজ ভারতের ইতিহাস-ধারাকে বাধা দিতে আসে নাই, তাহাতে যোগ দিতে আসিয়াছে। ইংরেজকে নহিলে ভারত-ইতিহাস পূর্ণ হইতেই পারে না। সেইজন্যই আমরা কেবলমাত্র ইংরেজের আপিস চাই না, ইংরেজের হৃদয় চাই।

ইংরেজ যদি আমাদিগকে অবাধে অনায়াসে অবজ্ঞা করিতে পায় তাহা হইলেই আমরা তার হৃদয় হারাইব। শ্রদ্ধা আমাদিগকে দাবি করিতেই হইবে; আমরা খৃস্টান প্রিন্‌সিপালের নিকট হইতেও এক গালে চড় খাইয়া অন্য গাল ফিরাইয়া দিতে পারিব না।

ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর জীবনের সম্বন্ধ কোথায় সহজে ঘটিতে পারে? বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়, রাজকীয় ক্ষেত্রেও নয়। তার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান বিদ্যাদানের ক্ষেত্র। জ্ঞানের আদানপ্রদানের ব্যাপারটি সাত্ত্বিক। তাহা প্রাণকে উদ্‌বোধিত করে। সেইজন্য এইখানেই প্রাণের নাগাল পাওয়া সহজ। এইখানেই গুরুর সঙ্গে

শিষ্যের সম্বন্ধ যদি সত্য হয় তবে ইহজীবনে তার বিচ্ছেদ নাই। তাহা পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধের চেয়েও গভীরতর।

আমাদের য়ুনিভার্সিটিতে এই সুযোগ ঘটিয়াছিল। এইখানে ইংরেজ এমন একটি স্থান পাইতে পারিত যাহা সে রাজসিংহাসনে বসিয়াও পায় না। এই সুযোগ যখন ব্যর্থ হইতে দেখা যায় তখন আক্ষেপের সীমা থাকে না।

ব্যর্থতার কারণ আমাদের ছাত্ররাই, এ কথা আমি কিছুতেই মানিতে পারি না। আমাদের দেশের ছাত্রদের আমি ভালো করিয়াই জানি। ইংরেজ ছেলের সঙ্গে একটা বিষয়ে ইহাদের প্রভেদ আছে। ইহারা ভক্তি করিতে পাইলে আর কিছু চায় না। অধ্যাপকের কাছ হইতে একটুমাত্রও যদি ইহারা খাঁটি স্নেহ পায় তবে তাঁর কাছে হৃদয় উৎসর্গ করিয়া দিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। আমাদের ছেলেদের হৃদয় নিতান্তই সস্তা দামে পাওয়া যায়।

এইজন্যই আমার যে-একটি বিদ্যালয় আছে সেখানে ইংরেজ অধ্যাপক আনিবার জন্য অনেক দিন হইতে উদ্যোগ করিয়াছি। বহুকাল পূর্বে একজনকে আনিয়াছিলাম। তিনি সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় পাকিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁর অন্তঃকরণে পিত্তাধিক্য ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁর ক্লাসে ছেলেদের জাতি তুলিয়া গালি দিতেন; তারা বাঙালির ঘরে জন্মিয়াছে এই অপরাধ তিনি সহিতে পারিতেন না। সেই ছেলেরা যদিচ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র নয়, তাদের বয়স নয়-দশ বৎসর হইবে, তবু তারা তাঁর ক্লাসে যাওয়া ছাড়িল। হেড্‌মাস্টারের তাড়নাতেও কোনো ফল হইল না। দেখিলাম হিতে বিপরীত ঘটিল। এই মাস্টারটিকে white man's burden হইতে সে যাত্রায় নিষ্কৃতি দিলাম।

কিন্তু, আশা ছাড়ি নাই এবং আমার কামনাও সফল হইয়াছে। আজ ইংরেজ গুরুর সঙ্গে বাঙালি ছাত্রের জীবনের গভীর মিলন ঘটিয়া আশ্রম পবিত্র হইয়াছে। এই পুণ্য মিলনটি সমস্ত ভারতক্ষেত্রে দেখিবার জন্য বিধাতা অপেক্ষা করিতেছেন। যে-দুটি ইংরেজ তাপস সেখানে আছেন তাঁরা নিজের ধর্ম প্রচার করিতে যান নাই, তাঁরা পতিত-উদ্ধারের দুঃসহ কর্তব্যভার গ্রহণ করেন নাই; তাঁরা গ্রীকদের মতো বর্বর জাতিকে সভ্যতায় দীক্ষিত করিবার জন্য ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এমন অভিমান মনে রাখেন না। তাঁরা তাঁদের পরমগুরুর মতো করিয়াই দুই হাত বাড়াইয়া বলিয়াছেন, 'ছেলেদের আসিতে দাও আমার কাছে, হোক-না তারা বাঙালির ছেলে।' ছেলেরা তাঁদের অত্যন্ত কাছে আসিতে লেশমাত্র বিলম্ব করে নাই, হোন-না তাঁরা ইংরেজ। আজ এই কথা বলিতে পারি, এই দুটি ইংরেজের সঙ্গে আমার ছেলেদের যে সম্বন্ধ ঘটিয়াছে তাহা তাহাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই ছেলেরা ইংরেজ-বিদ্বেষের বিষে জীবন পূর্ণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে না।

প্রথমে যে শিক্ষকটি আসিয়াছিলেন তিনি শিক্ষকতায় পাকা ছিলেন। তাঁর কাছে পড়িতে পাইলে ছেলেদের ইংরেজি উচ্চারণ ও ব্যাকরণ দুরস্ত হইয়া যাইত। সেই লোভে আমি কঠোর শাসনে ছাত্রগুলিকে তাঁর ক্লাসে পাঠাইতে পারিতাম। মনে করিতে পারিতাম, শিক্ষক যেমনই দুর্ব্যবহার করুন ছাত্রদের কর্তব্য সমস্ত সহিয়া তাঁকে মানিয়া চলা। কিছুদিন তাদের মনে বাজিত, হয়তো কিছুদিন পরে তাদের মনে বাজিতও না, কিন্তু তাদের অ্যাক্‌সেন্ট্‌ বিশুদ্ধ হইত। তা হউক, কিন্তু এই মানবের ছেলেদের কি ভগবান নাই? আমরাই কি চুল পাকিয়াছে বলিয়া

তাদের বিধাতাপুরুষ? ইংরেজি ভাষায় বিশুদ্ধ অ্যাক্‌সেণ্টের জোরে সেই ভগবানের বিচারে আমি কি খালাস পাইতাম?

ইংরেজ অধ্যাপকের সহিত বাঙালি ছাত্রদের সম্বন্ধ সরল ও স্বাভাবিক হওয়া বর্তমানে বিশেষ কঠিন হইয়াছে। তার কারণ কী, একদিন ইংলন্‌ডে থাকিতে তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। রেলগাড়িতে একজন ইংরেজ আমার পাশে বসিয়াছিলেন; প্রথমটা আমাকে দেখিয়া তাঁর ভালোই লাগিল। এমন-কি তাঁর মনে হইল ইংলন্‌ডে আমি ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়াছি। য়ুরোপের লোককে সাধু উপদেশ দিবার অধিকার আমাদেরও আছে, এ মত তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রকাশ করিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর কৌতূহল হইল আমি ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশ হইতে আসিয়াছি তাহা জানিবার জন্য। আমি বলিলাম, আমি বাংলাদেশের লোক। শুনিয়া তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। কোনো দুষ্কর্মই যে বাংলাদেশের লোকের অসাধ্য নহে, তাহা তিনি তীব্র উত্তেজনার সঙ্গে বলিতে লাগিলেন।

কোনো জাতির উপর যখন রাগ করি তখন সে জাতির প্রত্যেক মানুষ আমাদের কাছে একটা অ্যাব্‌স্‌ট্র্যাক্‌ট্ সত্তা হইয়া উঠে। তখন সে আর বিশেষ্য থাকে না, বিশেষণ হয়। আমার সহযাত্রী যতক্ষণ না জানিয়াছিলেন আমি বাঙালি ততক্ষণ তিনি আমার সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের মতো ব্যবহার করিতেছিলেন, সুতরাং আদব-কায়দার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু, যেই তিনি শুনিলেন আমি বাঙালি অমনি আমার ব্যক্তিবিশেষত্ব বাষ্প হইয়া গিয়া একটা বিকট বিশেষণে আসিয়া দাঁড়াইল, সেই বিশেষণটি অভিধানে যাকে বলে 'নিদারুণ'। বিশেষণ-পদার্থের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার কথা মনেই হয় না। কেননা, ওটা অপদার্থ বলিলেই হয়।

রাশিয়ানের উপর ইংরেজের যখন রাগ ছিল তখন রাশিয়ান-মাত্রেই তার কাছে একটা বিশেষণ হইয়া উঠিয়াছিল। আজ ইংরেজি কাগজে প্রায়ই দেখিতে পাই, রাশিয়ানের ধর্মপরতা সহৃদয়তার সীমা নাই। মানুষকে বিশেষণ হইতে বিশেষ্যের কোঠায় ফেলিবামাত্র তার মানবধর্ম প্রকাশ হইয়া পড়ে; তখন তার সঙ্গে সহজ ব্যবহার করিতে আর বাধে না।

বাঙালি আজ ইংরেজের কাছে বিশেষণ হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য বাঙালির বাস্তব সত্তা ইংরেজের চোখে পড়া আজ বড়ো কঠিন। এইজন্যই ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বর্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধে বাঙালি যুবকদিগকে ভলন্‌টিয়ার রূপে লড়িতে দেওয়া হয়। ইংরেজের সঙ্গে এক যুদ্ধে মরিতে পারিলে বাঙালিও ইংরেজের চোখে বাস্তব হইয়া উঠিত, ঝাপ্‌সা থাকিত না; সুতরাং তার পর হইতে তাকে বিচার করা সহজ হইত।

সে সুযোগ তো চলিয়া গেল। এখনো আমরা অস্পষ্টতার আড়ালেই রহিয়া গেলাম। অস্পষ্টতাকে মানুষ সন্দেহ করে। আজ বাংলাদেশে একজন মানুষও আছে কি যে এই সন্দেহ হইতে মুক্ত?

যাহা হউক, আমাদের মধ্যে এই অস্পষ্টতার গোধূলি ঘনাইয়া আসিয়াছে; এইটেই ছায়াকে বস্তু ও বস্তুকে ছায়া ভ্রম করিবার সময়। এখন পরে পরে কেবলই ভুল-বোঝাবুঝির সময় বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু, এই অন্ধকারটাকে কি কড়া শাসনের ধুলা উড়াইয়াই পরিষ্কার করা যায়? এখনই কি আলোকের প্রয়োজন সব চেয়ে অধিক নয়? সে আলোক প্রীতির আলোক, সে আলোক সমবেদনার প্রদীপে পরস্পর মুখ-চেনাচিনি করিবার

আলোক। এই দুর্যোগের সময়েই কি খৃস্টান কলেজের কর্তৃপক্ষেরা তাঁহাদের গুরুর চরিত ও উপদেশ স্মরণ করিবেন না? এখনই কি 'চ্যারিটি'র প্রয়োজন সব চেয়ে অধিক নয়? এই-যে দেশব্যাপী সংশয় ঘনাইয়া উঠিয়া সত্যকে আচ্ছন্ন ও বিকৃত করিয়া তুলিতেছে, ইহাকে সম্পূর্ণ কাটাইয়া তুলিবার শক্তি তাঁদেরই হাতে যাঁরা উপরে আছেন। পৃথিবীর কুয়াশা কাটাইয়া দিবার ভার আকাশের সূর্যের। যখন বারিবর্ষণের প্রয়োজন একান্ত তখন যাঁরা বজ্রবর্ষণের পরামর্শ দিতেছেন তাঁরা যে কেবলমাত্র সহৃদয়তা ও ঔদার্যের অভাব দেখাইতেছেন তাহা নহে, তাঁরা ভীরুতার পরিচয় দিতেছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ অন্যায় উপদ্রব ভয় হইতে, সাহস হইতে নয়।

উপসংহারে আমি এই কথা কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে স্মরণ করিতে অনুনয় করি। যে বিদ্যালয়ে ইংরেজ অধ্যাপকের কাছে বাঙালি ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করিতেছে সেই বিদ্যালয় হইতে নবযুগের বাঙালি যুবক ইংরেজজাতির 'পরে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি বহন করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে, ইহাই আশা করিতে পারিতাম। যে বয়সে যে ক্ষেত্রে নূতন নূতন জ্ঞানের আলোকে ও ভাবের বর্ষণে ছাত্রদের মধ্যে নবজীবনের প্রথম বিকাশ ঘটিতেছে সেই বয়সে ও সেই ক্ষেত্রেই ইংরেজ গুরু যদি তাহাদের হৃদয়কে প্রীতির দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারেন তবেই এই যুবকেরা ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্বন্ধকে সজীব ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে পারিবে। এই শুভক্ষণে এবং এই পুণ্যক্ষেত্রে ইংরেজ অধ্যাপকের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রের সম্বন্ধ যদি সন্দেহের বিদ্বেষের ও কঠিন শাসনের সম্বন্ধ হয় তবে আমাদের পরস্পরের ভিতরকার এই বিরোধের বিষ ক্রমশই দেশের নাড়ীর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিবে; ইংরেজের প্রতি অবিশ্বাস পুরুষানুক্রমে আমাদের মজ্জাগত হইয়া অন্ধ সংস্কারে পরিণত হইতে থাকিবে। সে অবস্থায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপারে জঞ্জাল কেবলই বাড়িতে থাকিবে বলিয়া যে আশঙ্কা তাহাকেও আমি তেমন গুরুতর বলিয়া মনে করি না; আমার ভয় এই যে, ইংরেজের কাছ হইতে আমরা যে দান দিনে দিনে আনন্দে গ্রহণ করিতে পারিতাম সে দান প্রত্যহ আমাদের হৃদয়ের দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইতে থাকিবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করিলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেখানে সেই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নাই সেখানে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ কলুষিত হইয়া উঠে। জেলখানার কয়েদিরা হাতে বেড়ি পরিয়া যে অন্ন খাইতে বসে তাকে যজ্ঞের ভোজ বলা বিদ্রূপ করা। জ্ঞানের ভোজ আনন্দের ভোজ। সেখানেও যে-সকল কর্তারা ভোক্তার জন্য আজ লোহার হাতকড়ি ফর্মাশ দিতেছেন তাঁরা কাল নিতান্ত ভালোমানুষটির মতো আশ্চর্য হইয়া বলিবেন 'এত করিয়াও বাঙালির ছেলের মন পাওয়া গেল না— কৃতজ্ঞতাবৃত্তি ইহাদের একেবারেই নাই' এবং তাঁরা রাত্রে শুইতে যাইবার সময় এবং প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া প্রার্থনা করিবেন: Father, do not forgive them!

চৈত্র ১৩২২

অসন্তোষের কারণ

ভারতবর্ষের নানা স্থানেই নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। ইহাতে বুঝা যায়, শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা অসন্তোষ জন্মিয়াছে। কেন সেই অসন্তোষ? দুইটি কারণ আছে; একটা বাহিরের, একটা ভিতরের।

সকলেই জানেন, আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার যখন প্রথম পত্তন হইয়াছিল তখন তাহার লক্ষ্য ছিল এই যে, ব্রিটিশ ভারতের রাজ্যশাসন ও বাণিজ্যচালনের জন্য ইংরেজি-জানা দেশি কর্মচারী গড়িয়া তোলা। অনেক দিন হইতেই সেই গড়নের কাজ চলিতেছে। যতকাল ছাত্রসংখ্যা অল্প ছিল ততকাল প্রয়োজনের সঙ্গে আয়োজনের সামঞ্জস্য ছিল; কাজেই সে দিক হইতে কোনো পক্ষে অসন্তোষের কোনো কারণ ঘটে নাই। যখন হইতে ছাত্রের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে তখন হইতেই এই শিক্ষাব্যবস্থার একটা প্রধান উদ্দেশ্য অধিকাংশ ছাত্রেরই পক্ষে ব্যর্থ হইতেছে। যদি আমাদের দেশের শিক্ষায় ছাত্রদিগকে চাকরি ছাড়া অন্যান্য জীবিকার সংস্থানে পটু করিয়া তুলিত তাহা হইলে এই সম্বন্ধে নালিশের কথা থাকিত না। কিন্তু পটু না করিয়া সর্বপ্রকারে অপটুই করিতেছে, এ কথা আমরা নিজের প্রতি তাকাইলে বুঝিতে পারি।

এই তো গেল বাহিরের দিকে নালিশ। ভিতরের দিকের নালিশ এই যে, এত কাল ধরিয়া ইংরেজের স্কুলে পড়িতেছি, কিন্তু ছাত্রদশা তো কোনোমতেই ঘুচিল না। বিদ্যা বাহির হইতেই কেবল জমা করিলাম, ভিতর হইতে কিছু তো দিলাম না। কলসে কেবলই জল ভরিতে থাকিব, অথচ সে জল কোনোদিনই যথেষ্ট পরিমাণে দান-পানের উপযোগী ভরা হইবে না, এ যে বিষম বিপত্তি। ভয়ে ভয়ে ইংরেজের ডাক্তার ছাত্র পুঁথি মিলাইয়া ডাক্তারি করিয়া চলিল, কিন্তু শারীরবিদ্যায় বা চিকিৎসাশাস্ত্রে একটা-কোনো নূতন তত্ত্ব বা তথ্য যোগ করিল না। ইংরেজের এঞ্জিনিয়ার ছাত্র সতর্কতার সহিত পুঁথি মিলাইয়া এঞ্জিনিয়ারি করিয়া পেন্সন লইতেছে, কিন্তু যন্ত্রতত্ত্বে বা যন্ত্র-উদ্ভাবনায় মনে রাখিবার মতো কিছুই করিতেছে না। শিক্ষার এই শক্তিহীনতা আমরা স্পষ্টই বুঝিতেছি। আমাদের শিক্ষাকে আমাদের বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়াই চলিলাম, ইহারই পরম দুঃখ গোচরে অগোচরে আমাদের মনের মধ্যে জমিয়া উঠিতেছে।

অথচ, বুদ্ধির এই কৃশতা নির্জীবতা যে আমাদের প্রকৃতিগত নয় তার বর্তমান প্রমাণ : জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায়, ব্রজেন্দ্র শীল। আমাদের শিক্ষার একান্ত দীনতা ও পরবশতা-সত্ত্বেও ইঁহাদের বুদ্ধি ও বিদ্যা বিশ্বজ্ঞানের মহাকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর, অতীত কালের একটা মস্ত প্রমাণ এই যে, আমাদের প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র নানা শাখায় প্রশাখায়, নানা পরীক্ষায় ও উদ্ভাবনায় বিচিত্র বৃহৎ ও প্রাণবান হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরের ইস্কুলে-শেখা চিকিৎসাবিদ্যায় আজ আমাদের এত ক্ষীণতা ও ভীরুতা কেন!

ইহার প্রধান কারণ, ভাণ্ডারঘর যেমন করিয়া আহার্য দ্রব্য সঞ্চয় করে আমরা তেমনি করিয়াই শিক্ষা সঞ্চয় করিতেছি, দেহ যেমন করিয়া আহার্য গ্রহণ করে তেমন করিয়া নহে। ভাণ্ডারঘর যাহা-কিছু পায় হিসাব মিলাইয়া সাবধানে তাহার প্রত্যেক কণাটিকে রাখিবার চেষ্টা করে। দেহ যাহা পায় তাহা রাখিবার জন্য নহে, তাহাকে অঙ্গীকৃত করিবার জন্য। তাহা গোরুর গাড়ির মতো ভাড়া খাটিয়া বাহিরে

বহন করিবার জন্য নহে, তাহাকে অন্তরে রূপান্তরিত করিয়া রক্তে মাংসে স্বাস্থ্যে শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য। আজ আমাদের মুশকিল হইয়াছে এই যে, এই এত বছরের নোটবুকের বস্তা-ভরা শিক্ষার মাল লইয়া আজ আমাদের গোরুর গাড়িও বাহিরে তেমন করিয়া ভাড়া খাটিতেছে না, অথচ সেটাকে মনের আনন্দে দিব্য পাক করিয়া ও পরিপাক করিয়া পেট ভরাই সে ব্যবস্থাও কোথাও নাই। তাই আমাদের বাহিরের থলিটাও রহিল ফাঁকা, অন্তরের পাকযন্ত্রটাও রহিল উপবাসী। গাড়োয়ান তাহার লাইসেন্সের পদক গলায় ঝুলাইয়া মালখানার দ্বারে চোখের জল মুছিতেছে, তাহার একমাত্র আশাভরসা কন্যার পিতার কাছে। এমন অবস্থাতেও এখনো যে যথেষ্ট পরিমাণে অসন্তোষ জন্মে নাই তাহার কারণ, বৃথা আশা মরিতে মরিতেও মরে না এবং নিষ্ফল অভ্যাস আপন বেড়ার বাহিরে ফললাভের কোনো ক্ষেত্র চোখেই দেখিতে পায় না। উপবাসকৃশ অক্ষম আপন ব্যর্থতার মধ্যেই চিত হইয়া পড়িয়া মনে করিতে থাকে, এইখানেই এক পাশ হইতে আর-এক পাশে ফিরিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া দৈবকৃপায় যেমন-তেমন একটা সদুপায় হইবেই। জামা কিনিতে গেলাম, পাইলাম একপাটি মোজা; এখন ভাবিতেছি, ঐটেকেই কাটিয়া ছাঁটিয়া কোনোমতে জামা করিয়া পরিব। ভাগ্য আমাদের সেই চেষ্টা দেখিয়া অট্টহাস্য করিতেছে।

বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীটাই যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ, অভ্যাসগত অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি না। ঘুরিয়া ফিরিয়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবার বেলাতেও প্রণালী বদল করিবার কথা মনেই আসে না; তাই, নূতনের ঢালাই করিতেছি সেই পুরাতনের ছাঁচে। নূতনের জন্য ইচ্ছা খুবই হইতেছে অথচ ভরসা কিছুই হইতেছে না। কেননা ঐটেই যে রোগ, এত দিনের শিক্ষা-বোঝার চাপে সেই ভরসাটাই যে সমূলে মরিয়াছে।

অনেক কাল এমনি করিয়া কাটিল, আর সময় নষ্ট করা চলিবে না। এখন মনুষ্যত্বের দিকে তাকাইয়া লক্ষ্যেরও পরিবর্তন করিতে হইবে। সাহস করিয়া বলিতে হইবে, যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ তাহা বোঝাই করিয়া আমরা বাঁচিব না, যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত তাহার সাহায্যেই আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইব।

শিক্ষাকে কেমন করিয়া সত্য এবং প্রাণের জিনিস করা যায়, সেই কথার আলোচনা যথাসাধ্য ক্রমে ক্রমে করা যাইবে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

বিদ্যার যাচাই

আমার মনে আছে, বালককালে একজনকে জানিতাম তিনি ইংরেজিতে পরম পণ্ডিত ছিলেন, বাংলাদেশে তিনি ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগের শেষভাগের ছাত্র। ডিরোজিয়ো প্রভৃতি শিক্ষকদের কাছে তিনি পাঠ লইয়াছিলেন। তিনি জানি না কী মনে করিয়া কিছুদিন আমাদিগকে ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিলেন। ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে তিনি মনে একটা শ্রেণী-বিভাগ-করা ফর্দ লট্‌কাইয়া রাখিয়াছিলেন। তার মধ্যে পয়লা দোসরা এবং তেসরা নম্বর পর্যন্ত সমস্ত পাকাপাকি ঠিক করা ছিল। সেই ফর্দ তিনি আমাদিগকে লিখিয়া দিয়া

মুখস্থ করিতে বলিলেন। তখন আমাদের যেটুকু ইংরেজি জানা ছিল তাহাতে পয়লা নম্বর দূরে থাক্ তেসরা নম্বরেরও কাছ ঘেঁষিতে পারি এমন শক্তি আমাদের ছিল না। তথাপি ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে বাঁধা বিচারটা আগে হইতেই আমাদের আয়ত্ত করিয়া দেওয়াতে দোষ ছিল না। কেননা, রুচিরসনা দিয়া রসবিচার ইংরেজি কাব্য সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে প্রশস্ত নহে। যেহেতু আমাদিগকে চাখিয়া নহে কিন্তু গিলিয়া খাইতে হইবে, কাজেই কোন্‌টা মিষ্ট কোন্‌টা অম্ল সেটা নোটবুকে লেখা না থাকিলে ভুল করার আশঙ্কা আছে। ইহার ফল কী হইয়াছে বলি। আমাদের শিশু বয়সে দেখিতাম, কবি বায়্‌রন সম্বন্ধে আমাদের দেশের ইংরেজি-পোড়োদের মনে অসীম ভক্তি ছিল। আধুনিক পোড়োদের মনে সে ভক্তি আদবেই নাই। অল্প কিছু দিন আগেই আমাদের যুবকেরা টেনিসনের নাম শুনিলেই যেরূপ রোমাঞ্চিত হইতেন এখন আর সেরূপ হন না। উক্ত কবিদের সম্বন্ধে ইংলন্‌ডে কাব্য-বিচারকদের রায় অল্পবিস্তর বদল হইয়া গিয়াছে, ইহা জানা কথা। সেই বদল হইবার স্বাভাবিক কারণ সেখানকার মনের গতি ও সামাজিক গতির মধ্যেই আছে। কিন্তু, সে কারণ তো আমাদের মধ্যে নাই। অথচ তাহার ফলটা ঠিক ঠিক মিলিতেছে। আদালতটাই আমাদের এখানে নাই, কাজেই বিদেশের বিচারের নকল আনাইয়া আমাদিগকে বড়ো সাবধানে কাজ চালাইতে হয়। যে কবির যে দর আধুনিক বাজারে প্রচলিত পাছে তাহার উল্টা বলিলেই আহাম্মক বলিয়া দাগা পড়ে, এইজন্য বিদেশের সাহিত্যের বাজার-দরটা সর্বদা মনে রাখিতে হয়। নহিলে আমাদের ইস্কুল-মাস্টারি চলে না, নহিলে মাসিকপত্রে ইব্‌সেন মেটার্লিঙ্ক্ ও রাশিয়ান ঔপন্যাসিকদের কথা পাড়িবার বেলা লজ্জা পাইতে হয়। শুধু সাহিত্য নহে, অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিদেশের পরিবর্তনশীল বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে অবিকল তাল মিলাইয়া যদি না চলি, যদি জনস্টুয়ার্ট্ মিলের মন্ত্র কার্লাইল-রাস্কিনের আমলে আওড়াই, বিলাতে যে সময়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের হাওয়া বদল হইয়াছে সেই সময় বুঝিয়া আমরাও যদি সংঘবাদের সুরে কণ্ঠ না মিলাই, তবে আমাদের দেশের হাই ইংরেজি স্কুলের মাস্টার ও ছাত্রদের কাছে মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না।

ইংরেজি ইস্কুলে এত দীর্ঘ কাল দাগা বুলাইয়াও কেন আমরা কোনো বিষয়ে জোরের সঙ্গে মৌলিন্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এই প্রশ্ন আমাদের মনে উঠিয়াছে। ইহার কারণ, বিদ্যাটাও যেখান হইতে ধার করিয়া লইতেছি বুদ্ধিটাও সেখান হইতে ধার-করা। কাজেই নিজের বিচার খাটাইয়া এ বিদ্যা তেজের সঙ্গে ব্যবহার করিতে ভরসা পাই না। বিদ্যা এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে ইংরেজের ছেলে পরবশ নহে, তাহার চারি দিকেই স্বাধীন সৃষ্টি ও স্বাধীন বিচারের হাওয়া বহিতেছে। একজন ফরাসি বিদ্বান নির্ভয়ে ইংরেজি বিদ্যার বিচার করিতে পারে; তার কারণ, যে ফরাসি বিদ্যা তাহার নিজের সেই বিদ্যার মধ্যেই বিচারের শক্তি ও বিধি রহিয়াছে। এইজন্য মাল যেখান হইতেই আসে যাচাই করিবার ভার তাহার নিজেরই হাতে, এইজন্য নিজের হিসাবমত সে মূল্য দেয় এবং কোন্‌টা লইবে কোন্‌টা ছাড়িবে সে সম্বন্ধে নিজের রুচি ও মতই তাহার পক্ষে প্রামাণ্য। কাজেই, জ্ঞানের ও ভাবের কারবারে নিজের 'পরেই ইহাদের ভরসা। এই ভরসা না থাকিলে মৌলিন্য কিছুতেই থাকিতে পারে না।

আমাদের মুশকিল এই যে, আগাগোড়া সমস্ত বিদ্যাটাই আমরা পরের কাছ হইতে পাই। সে বিদ্যা মিলাইব কিসের সঙ্গে, বিচার করিব কী দিয়া? নিজের

যে বাটখারা দিয়া পরিমাপ করিতে হয় সেই বাটখারাই নাই। কাজেই আমদানি মালের উপরে ওজনের ও দামের যে টিকিট মারা থাকে সেই টিকিটটাকেই ষোলো আনা মানিয়া লইতে হয়। এইজন্যই ইস্কুলমাস্টার এবং মাসিকপত্র-লেখকদের মধ্যে এই টিকিটে লিখিত মালের পরিচয় ও অঙ্ক যে যতটা ঠিকমত মুখস্থ রাখিতে ও আওড়াইতে পারে তাহার ততই পসার বাড়ে। এত কাল ধরিয়া কেবল এমনি করিয়াই কাটিল, কিন্তু চিরকাল ধরিয়াই কি এমনি করিয়া কাটিবে?

আষাঢ় ১৩২৬

বিদ্যাসমবায়

এলাহাবাদ ইংরেজি-বাংলা স্কুলের কোনো ছাত্রকে একদা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে 'রিভার্' শব্দের সংজ্ঞা কী। মেধাবী বালক তাহার নির্ভুল উত্তর দিয়াছিল। তাহার পরে যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল কোনোদিন সে কোনো রিভার্ দেখিয়াছে কি না, তখন গঙ্গাযমুনার তীরে বসিয়া এই বালক বলিল যে, 'না, আমি দেখি নাই।' অর্থাৎ, এই বালকের ধারণা হইয়াছিল, যাহা চেষ্টা করিয়া, কষ্ট করিয়া, বানান করিয়া, অভিধান ধরিয়া, পরের ভাষায় শেখা যায় তাহা আপন জিনিস নয়; তাহা বহুদূরবর্তী, অথবা তাহা কেবল পুঁথিলোক-ভুক্ত। এই ছেলে তাই নিজের জানা দেশটাকে মনে মনে জিয়োগ্রাফি-বিদ্যা হইতে বাদ দিয়াছিল। অবশ্য, পরে এক সময়ে এ শিখিয়াছিল যে, যে দেশে তাহার জন্ম ও বাস সেও ভূগোলবিদ্যার সামগ্রী, সেও একটা দেশ, সেখানকার রিভার্ও রিভার্। কিন্তু মনে করা যাক, তার বিদ্যাচর্চার শেষ পর্যন্ত এই খবরটি সে পায় নাই— শেষ পর্যন্তই সে জানিয়াছে যে আর-সকল জাতিরই দেশ আছে, কেবল তারই দেশ নাই— তবে কেবল যে তার পক্ষে সমস্ত পৃথিবীর জিয়োগ্রাফি অস্পষ্ট ও অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে তাহা নহে, তাহার মনটা অন্তরে অন্তরে গৃহহীন গৌরবহীন হইয়া রহিবে। অবশেষে বহুকাল পরে যখন কোনো বিদেশী জিয়োগ্রাফি-পণ্ডিত আসিয়া কথাচ্ছলে তাহাকে বলে যে 'তোমাদের একটা প্রকাণ্ড বড়ো দেশ আছে, তার হিমালয় প্রকাণ্ড বড়ো পাহাড়, তার সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র প্রকাণ্ড বড়ো নদী', তখন হঠাৎ এই-সমস্ত খবরটায় তাহার মাথা ঘুরিয়া যায়; নূতন জ্ঞানটাকে সে সংযতভাবে বহন করিতে পারে না; অনেক কালের অগৌরবটাকে এক দিনে শোধ দিবার জন্য সে চীৎকারশব্দে চার দিকে বলিয়া বেড়ায়, 'আর-সকলের দেশ দেশমাত্র, আমাদের দেশ স্বর্গ।' একদিন যখন সে মাথা হেঁট করিয়া আওড়াইয়াছে যে 'পৃথিবীতে আর-সকলেরই দেশ আছে, কেবল আমাদেরই নাই' তখনো বিশ্বসত্যের সঙ্গে তার অজ্ঞান-কৃত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল; আর আজ যখন সে মাথা তুলিয়া অসংগত তারস্বরে হাঁকিয়া বেড়ায় যে 'আর-সকলের দেশ আছে, আর আমাদের আছে স্বর্গ' তখনো বিশ্বসত্যের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ। পূর্বের বিচ্ছেদ ছিল অজ্ঞানের, সুতরাং তাহা মার্জনীয়; এখনকার বিচ্ছেদ শিক্ষিত মূঢ়তার, সুতরাং তাহা হাস্যকর এবং ততোধিক অনিষ্টকর।

সাধারণত, ভারতীয় বিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা সেও এই শ্রেণীর। শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আমাদের নিজ দেশের বিদ্যার স্থান নাই, অথবা তার স্থান সব-

পিছনে; সেইজন্য আমাদের সমস্ত শিক্ষার মধ্যে এই কথাটি প্রচ্ছন্ন থাকে যে, আমাদের নিজ দেশের বিদ্যা বলিয়া পদার্থই নাই, যদি থাকে সেটা অপদার্থ বলিলেই হয়। এমন সময় হঠাৎ বিদেশী পণ্ডিতের মুখে আমাদের বিদ্যার সম্বন্ধে একটু যদি বাহবা শুনিতে পাই অমনি উন্মত্ত হইয়া বলিতে থাকি, পৃথিবীতে আর-সকলের বিদ্যা মানবী, আমাদের বিদ্যা দৈবী। অর্থাৎ, আর-সকল দেশের বিদ্যা মানবের স্বাভাবিক বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ভ্রম কাটাইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, কেবল আমাদের দেশেই বিদ্যা ব্রহ্মা বা শিবের প্রসাদে এক মুহূর্তে ঋষিদের ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া ভ্রমলেশবিবর্জিত হইয়া অনন্ত কালের উপযোগী আকারে বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইংরেজিতে যাকে বলে স্পেশাল ক্রিয়েশন ইহা তাই, ইহাতে ক্রমবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়ম খাটে না, ইহা ইতিহাসের ধারাবাহিক পথের অতীত, সুতরাং ইহাকে ঐতিহাসিক বিচারের অধীন করা চলে না; ইহাকে কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা বহন করিতে হইবে, বুদ্ধি-দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে না। অহংকারের আঁধি লাগিয়া এ কথা আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই যে, কোনো-একটি বিশেষ জাতির জন্যই বিধাতা সর্বাপেক্ষা অনুকূল ব্যবস্থা স্বহস্তে করিয়া দিয়াছেন, এ-সব কথা বর্বরকালের কথা। স্পেশাল ক্রিয়েশনের কথা আজিকার দিনে আর ঠাঁই পায় না। আজ আমরা এই বুঝি যে, সত্যের সহিত সত্যের সম্বন্ধ, সকল বিদ্যার উদ্ভব যে নিয়মে বিশেষ বিদ্যার উদ্ভব সেই নিয়মেই। পৃথিবীতে কেবলমাত্র কয়েদিই অপর সাধারণের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া সলিটারি সেলে থাকে। সত্যের অধিকার সম্বন্ধে বিধাতা কেবলমাত্র ভারতবর্ষকেই সেই সলিটারি সেলে অন্তরায়িত করিয়া রাখিয়াছেন, এ কথা ভারতের গৌরবের কথা নয়।

দীর্ঘকাল আমাদের বিদ্যাকে আমরা একঘরে করিয়া রাখিয়াছিলাম। দুই রকম করিয়া একঘরে করা যায়— এক অবজ্ঞার দ্বারা, আর-এক অতিসম্মানের দ্বারা। দুইয়েরই ফল এক। দুইয়েতেই তেজ নষ্ট করে। এক কালে জাপানের মিকাডো তাঁর দুর্ভেদ্য রাজকীয় সম্মানের বেড়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিতেন, প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। তার ফলে শোগুন ছিল সত্যকার রাজা আর মিকাডো ছিলেন নামমাত্র রাজা। যখন মিকাডোকে যথার্থই আধিপত্য দিবার সংকল্প হইল তখন তাঁর অতিসম্মানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভাঙিয়া তাঁহাকে সর্বসাধারণের গোচর করিয়া দেওয়া হইল। আমাদের ভারতীয় বিদ্যার প্রাচীরও তেমনি দুর্লঙ্ঘ্য ছিল। নিজেকে তাহা সকল দেশের বিদ্যা হইতে একান্ত স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল, পাছে বিপুল বিশ্বসাধারণের সম্পর্কে তার মধ্যে বিকার আসে। তার ফলে আমাদের দেশে সে হইল বিদ্যারাজ্যের মিকাডো, আর যে বিদেশী বিদ্যা বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে অবিরত যোগ রক্ষা করিয়া নিয়তই আপন প্রাণশক্তিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছে সেই শোগুন হইয়া আমাদিগকে প্রবল প্রতাপে শাসন করিতেছে। আমরা অন্যটিকে উদ্দেশে নমস্কার করিয়া ইহাকেই প্রত্যক্ষ সেলাম করিলাম, ইহাকেই খাজনা দিলাম এবং ইহারই কানমলা খাইলাম। ঘরে আসিয়া ইহাকে ম্লেচ্ছ বলিয়া গাল দিলাম; ইহার শাসনে আমাদের মতিগতি বিকৃত হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করিলাম; এ দিকে স্ত্রীর গহনা বেচিয়া, নিজের বাস্তুবাড়ি বন্ধক রাখিয়া, ইহার খাজনার শেষ কড়াটি শোধ করিবার জন্য ছেলেটাকে নিত্য ইহার কাছারিতে হাঁটাহাঁটি করাইতে লাগিলাম।

শিশু যে সেই ধাত্রীর কোলে থাকে। সাধারণের ভিড় হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াই মানুষ করিতে হয়। তাহার ঘরটি নিভৃত, তাহার দোলাটি নিরাপদ।

কিন্তু, তাহাকে যদি চিরদিনই ঢাকাঢ়ুকি দিয়া ঘরের কোণে অঞ্চলের আড়াল করিয়া রাখি তাহা হইলে উলটা ফল হয়। অর্থাৎ, যে শিশু একদা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও সুরক্ষিত ছিল বলিয়াই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল সেই শিশুই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহার নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে অকর্মণ্য, কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত হইয়া উঠে। শুটির মধ্যে যে বীজ লালিত হইয়াছে ক্ষেতের মধ্যে সেই বীজের বর্ধিত হওয়া চাই।

একদিন চৈন পারসিক মৈশর গ্রীক রোমীয় প্রভৃতি প্রত্যেক বড়ো জাতিই ভারতীয়ের মতোই ন্যূনাধিক পরিমাণে নিজের সুরক্ষিত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে নিজ সভ্যতাকে বড়ো করিয়া তুলিয়াছিল। পৃথিবীর এখন বয়স হইয়াছে; জাতিগত বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করিবার দিন আজ আর নাই। আজ বিদ্যা-সমবায়ের যুগ আসিয়াছে। সেই সমবায়ে যে বিদ্যা যোগ দিবে না, যে বিদ্যা কৌলীন্যের অভিমানে অনূঢ়া হইয়া থাকিবে, সে নিষ্ফল হইয়া মরিবে।

অতএব, আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান প্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।

তাহা করিতে গেলে ভারতীয় বিদ্যাকে তাহার সমস্ত শাখা-উপশাখার যোগে সমগ্র করিয়া জানা চাই। ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পাইলে তাহার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত বিদ্যার সম্বন্ধনির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হইতে পারে। কাছের জিনিসের বোধ দূরের জিনিসের বোধের সহজ ভিত্তি।

বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, প্রধানত এই চারি শাখায় প্রবাহিত। ভারতচিত্তগঙ্গোত্রীতে ইহার উদ্ভব। কিন্তু যে দেশে নদী চলিতেছে কেবল সেই দেশের জলেই সেই নদী পুষ্ট না হইতেও পারে। ভারতের গঙ্গার সঙ্গে তিব্বতের ব্রহ্মপুত্র মিলিয়াছে। ভারতের বিদ্যার স্রোতেও সেইরূপ মিলন ঘটিয়াছে। বাহির হইতে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা এখানে বহন করিয়া আনিয়াছে সেই ধারা ভারতের চিত্তকে স্তরে স্তরে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা আমাদের ভাষায় আচারে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে নানা আকারে প্রকাশমান। অবশেষে সম্প্রতি য়ুরোপীয় বিদ্যার বন্যা সকল বাঁধ ভাঙিয়া দেশকে প্লাবিত করিয়াছে; তাহাকে হাসিয়া উড়াইতেও পারি না, কাঁদিয়া ঠেকানোও সম্ভবপর নহে।

অতএব, আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।

সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়া যাহারা ভারতকে একান্ত করিয়া দেখে তাহারা ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না। তেমনি যাহারা ভারতের কেবল এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখে তাহারাও ভারতচিত্তকে নিজের চিত্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই কারণ-বশতই পোলিটিক্যাল ঐক্যের অপেক্ষা গভীরতর উচ্চতর মহত্তর যে ঐক্য আছে তার কথা আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারি না। পৃথিবীর সকল ঐক্যের যাহা শাশ্বত ভিত্তি তাহাই সত্য ঐক্য। সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য, আত্মার ঐক্য। ভারতে সেই চিত্তের ঐক্যকে পোলিটিক্যাল ঐক্যের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে; কারণ, এই ঐক্যে সমস্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষ আপন অঙ্গনে আহ্বান করিতে পারে। অথচ, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বর্তমান শিক্ষা এমন যে, সেই শিক্ষার গুণেই ভারতীয় চিত্তকে আমরা তাহার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না। ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন

মুসলমান শিখ পার্সি খৃস্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ—ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স্‌ শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও; দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।

আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬

শিক্ষার মিলন

এ কথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মতো দোহন করছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি, দিন দিন দেখছি আমাদের ভোগে অন্নের ভাগ কম পড়ে যাচ্ছে। ক্ষুধার তাপ বাড়তে থাকলে ক্রোধের তাপও বেড়ে ওঠে; মনে মনে ভাবি, যে মানুষটা খাচ্ছে ওটাকে একবার সুযোগমত পেলে হয়। কিন্তু ওটাকে পাব কি, ওইই আমাদের পেয়ে বসেছে; সুযোগ এপর্যন্ত ওরই হাতে আছে, আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি।

কিন্তু কেন এসে পৌঁছয় নি? বিশ্বকে ভোগ করবার অধিকার ওরা কেন পেয়েছে? নিশ্চয় সে কোনো-একটা সত্যের জোরে। আমরা কোনো উপায়ে দল বেঁধে বাইরে থেকে ওদের খোরাক বন্ধ করে নিজের খোরাক বরাদ্দ করব, কথাটা এতই সোজা নয়। ড্রাইভারটার মাথায় বাড়ি দিলেই যে এঞ্জিনটা তখনই আমার বশে চলবে, এ কথা মনে করা ভুল। বস্তুত, ড্রাইভারের মূর্তি ধরে ওখানে একটা বিদ্যা এঞ্জিন চালাচ্ছে। অতএব, শুধু আমার রাগের আগুনে এঞ্জিন চলবে না, বিদ্যাটা দখল করা চাই—তা হলেই সত্যের বর পাব।

মনে করো, এক বাপের দুই ছেলে। বাপ স্বয়ং মোটর হাঁকিয়ে চলেন। তাঁর ভাবখানা এই, ছেলেদের মধ্যে মোটর চালাতে যে শিখবে মোটর তারই হবে। ওর মধ্যে একটি চালাক ছেলে আছে, তার কৌতূহলের অন্ত নেই। সে তন্ন তন্ন করে দেখে গাড়ি চলে কী করে। অন্য ছেলেটি ভালোমানুষ, সে ভক্তিভরে বাপের পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে; তাঁর দুই হাত মোটরের হাল যে কোন্‌ দিকে কেমন করে ঘোরাচ্ছে তার দিকেও খেয়াল নেই। চালাক ছেলেটি মোটরের কলকারখানা পুরোপুরি শিখে নিলে এবং একদিন গাড়িখানা নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে ঊর্ধ্বস্বরে বাঁশি বাজিয়ে দৌড় মারলে। গাড়ি চালাবার শখ দিন রাত এমনি তাকে পেয়ে বসল যে, বাপ আছেন কি নেই সে হুঁশই তার রইল না। তাই বলেই তার বাপ যে তাকে তলব করে গালে চড় মেরে তার গাড়িটা কেড়ে নিলেন তা নয়; তিনি স্বয়ং যে রথের রথী তাঁর ছেলেও যে সেই রথেরই রথী, এতে তিনি প্রসন্ন হলেন। ভালোমানুষ ছেলে দেখলে, ভায়াটি তার পাকা ফসলের ক্ষেত লণ্ডভণ্ড করে তার মধ্যে দিয়ে দিনে দুপুরে হাওয়াগাড়ি চালিয়ে বেড়াচ্ছে; তাকে রোখে কার সাধ্য, তার সামনে দাঁড়িয়ে বাপের দোহাই পাড়লে মরণং ধ্রুবং—তখনো সে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল আর বললে, 'আমার আর-কিছুতে দরকার নেই।'

কিন্তু দরকার নেই বলে কোনো সত্যকার দরকারকে যে মানুষ খাটো করেছে তাকে দুঃখ পেতেই হবে। প্রত্যেক দরকারেরই একটা মর্যাদা আছে, সেইটুকুর মধ্যে তাকে মানলে তবেই ছাড়পত্র পাওয়া যায়। দরকারকে অবজ্ঞা করলে তার কাছে চিরঋণী হয়ে সুদ দিতে দিতে জীবন কেটে যায়। তাকে ঠিক পরিমাণে মেনে তবে আমরা মুক্তি পাই। পরীক্ষকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সব চেয়ে প্রশস্ত রাস্তা হচ্ছে পরীক্ষায় পাস করা।

বিশ্বের একটা বাইরের দিক আছে, সেই দিকে সে মস্ত একটা কল। সে দিকে তার বাঁধা নিয়মে এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। এই বিরাট বস্তুবিশ্ব আমাদের নানা রকমে বাধা দেয়; কুঁড়েমি করে বা মূর্খতা করে যে তাকে এড়াতে গেছে বাধাকে সে ফাঁকি দিতে পারে নি, নিজেকেই ফাঁকি দিয়েছে। অপর পক্ষে বস্তুর নিয়ম যে শিখেছে শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেছে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েছে— বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে, সকল জায়গায় সকলের আগে গিয়ে সে পৌঁছতে পারে বলে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে তারই পাতে; আর, পথ হাঁটতে হাঁটতে যাদের বেলা বয়ে যায় তারা গিয়ে দেখে যে, তাদের ভাগ্যে হয় অতি সামান্যই বাকি, নয় সমস্তই ফাঁকি।

এমন অবস্থায়, পশ্চিমের লোকে যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা, বিদ্যা যে সত্য। কিন্তু এ কথা যদি বল 'শুধু তো বিদ্যা নয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানিও আছে' তা হলে বলতে হবে, ঐ শয়তানির যোগেই ওদের মরণ। কেননা, শয়তানি সত্য নয়।

জন্তুরা আহার পায় বাঁচে, আঘাত পায় মরে, যেটাকে পায় সেটাকেই বিনা তর্কে মেনে নেয়। কিন্তু মানুষের সব চেয়ে বড়ো স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেওয়া। জন্তুরা বিদ্রোহী নয়, মানুষ বিদ্রোহী। বাইরে থেকে যা ঘটে, যাতে তার নিজের কোনো হাত নেই, কোনো সায় নেই, সেই ঘটনাকে মানুষ একেবারে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নি বলেই জীবের ইতিহাসে সে আজ এত বড়ো গৌরবের পদ দখল করে বসেছে। আসল কথা, মানুষ একেবারেই ভালোমানুষ নয়। ইতিহাসের আদিকাল থেকে মানুষ বলেছে, বিশ্বঘটনার উপরে সে কর্তৃত্ব করবে। কেমন করে করবে? না, ঘটনার পিছনে যে প্রেরণা আছে, যার থেকে ঘটনাগুলো বেরিয়ে এসেছে, তারই সঙ্গে কোনোমতে যদি রফা করতে বা তাকে বাধ্য করতে পারে তা হলেই সে আর ঘটনার দলে থাকবে না, ঘটয়িতার দলে গিয়ে ভর্তি হবে। সাধনা আরম্ভ করলে মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে। গোড়ায় তার বিশ্বাস ছিল, জগতে যা-কিছু ঘটছে এ-সমস্তই একটা অদ্ভুত জাদুশক্তির জোরে, অতএব তারও যদি জাদুশক্তি থাকে তবেই শক্তির সঙ্গে শক্তির যোগে সে কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে।

সেই জাদুমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যে চেষ্টা শুরু করেছিল আজ বিজ্ঞানের সাধনায় তার সেই চেষ্টার পরিণতি। এই চেষ্টার মূল কথাটা হচ্ছে : মানব না, মানাব। অতএব, যারা এই চেষ্টায় সিদ্ধি লাভ করেছে তারাই বাহিরের বিশ্বে প্রভু হয়েছে, দাস নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও একটুও ত্রুটি থাকতে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর করে নিয়মকে চেপে ধরেছে, আর তারা বাহিরের জগতের সকল সংকট তরে যাচ্ছে। এখনো যারা বিশ্বব্যাপারে জাদুকে অস্বীকার করতে ভয় পায় এবং দায়ে ঠেকলে জাদুর শরণাপন্ন হবার জন্যে যাদের মন

ঝোঁকে বাহিরের বিশ্বে তারা সকল দিকেই মার খেয়ে মরছে; তারা আর কর্তৃত্ব পেল না।

পূর্বদেশে আমরা যে সময়ে রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাকছি, দৈন্য হলে গ্রহশান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়চ্ছি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখবার ভার দিচ্ছি শীতলাদেবীর 'পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্যে মারণ-উচাটন মন্ত্র আওড়াতে বসেছি, ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম মহাদেশে ভল্‌টেয়ার্‌কে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'শুনেছি নাকি মন্ত্রগুণে পালকে পাল ভেড়া মেরে ফেলা যায়, সে কি সত্য?' ভল্‌টেয়ার জবাব দিয়েছিলেন, 'নিশ্চয়ই মেরে ফেলা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ থাকা চাই।' য়ুরোপের কোনো কোণে-কানাচে জাদুমন্ত্রের 'পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সেঁকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ববাদিসম্মত। এইজন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে, আর আমরা ইচ্ছে না করলেও মরতে পারি।

আজ এ কথা বলা বাহুল্য যে, বিশ্বশক্তি হচ্ছে ত্রুটিবিহীন বিশ্বনিয়মেরই রূপ; আমাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি এই নিয়ন্ত্রিত শক্তিকে উপলব্ধি করে। বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জস্য আছে; এইজন্যে, এই নিয়মের 'পরে অধিকার আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই নিহিত এই কথা জেনে তবেই আমরা আত্মশক্তির উপর নিঃশেষে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি। বিশ্বব্যাপারে যে মানুষ আকস্মিকতাকে মানে সে নিজেকে মানতে সাহস করে না, সে যখন-তখন যাকে-তাকে মেনে বসে; শরণাগত হবার জন্যে সে একেবারে ব্যাকুল। মানুষ যখন ভাবে বিশ্বব্যাপারে তার নিজের বুদ্ধি খাটে না তখন সে আর সন্ধান করতে চায় না, প্রশ্ন করতে চায় না; তখন সে বাইরের দিকে কর্তাকে খুঁজে বেড়ায়। এইজন্যে বাইরের দিকে সকলেরই কাছে সে ঠকছে, পুলিসের দারোগা থেকে ম্যালেরিয়ার মশা পর্যন্ত। বুদ্ধির ভীরুতাই হচ্ছে শক্তিহীনতার প্রধান আড্ডা।

পশ্চিমদেশে পোলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েছে কখন থেকে? অর্থাৎ, কখন থেকে দেশের সকল লোক এই কথা বুঝেছে যে, রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের খেয়ালের জিনিস নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতির সম্বন্ধ আছে? যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত করেছে। যখন থেকে তারা জেনেছে, সেই নিয়মই সত্য যে নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না, খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হয় না। বিপুলকায় রাশিয়া সুদীর্ঘকাল রাজার গোলামি করে এসেছে, তার দুঃখের আর অন্ত ছিল না। তার প্রধান কারণ, সেখানকার অধিকাংশ প্রজাই সকল বিষয়েই দৈবকে মেনেছে, নিজের বুদ্ধিকে মানে নি। আজ যদি-বা তার রাজা গেল, কাঁধের উপরে তখনই আর-এক উৎপাত চড়ে বসে তাকে রক্তসমুদ্র সাঁতারিয়ে নিয়ে দুর্ভিক্ষের মরুডাঙায় আধমরা করে পেঁছিয়ে দিলে। এর কারণ, স্বরাজের প্রতিষ্ঠা বাইরে নয়, যে আত্মবুদ্ধির প্রতি আস্থা আত্মশক্তির প্রধান অবলম্বন সেই আস্থার উপরে।

আমি একদিন একটি গ্রামের উন্নতি করতে গিয়েছিলুম। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করলুম, 'সেদিন তোদের পাড়ায় আগুন লাগল, একখানা চালাও বাঁচাতে পারলি নে কেন?' তারা বললে, 'কপাল!' আমি বললেম, 'কপাল নয় রে, কুয়োর অভাব। পাড়ায় একখানা কুয়ো দিস নে কেন?' তারা তখনই বললে, 'আজ্ঞে, কর্তার ইচ্ছে হলেই হয়।' যাদের ঘরে আগুন লাগাবার বেলায় থাকে দৈব তাদেরই জল দান করবার ভার কোনো-একটি কর্তার। সুতরাং, যে করে হোক এরা একটা

কর্তা পেলে বেঁচে যায়। তাই এদের কপালে আর-সকল অভাবই থাকে, কিন্তু কোনো কালেই কর্তার অভাব হয় না।

বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ, বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি তার থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর-কেউ না, আর-কিছুতে না। এইজন্যেই আমাদের উপনিষৎ এই দেবতা সম্বন্ধে বলেছেন: যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। অর্থাৎ, অর্থের বিধান তিনি যা করেছেন সে বিধান যথাতথ, তাতে খামখেয়ালি এতটুকুও নেই, এবং সে বিধান শাশ্বত কালের, আজ একরকম কাল একরকম নয়। এর মানে হচ্ছে, অর্থরাজ্যে তাঁর বিধান তিনি চিরকালের জন্যে পাকা করে দিয়েছেন। এ না হলে মানুষকে চিরকাল তাঁর আঁচল-ধরা হয়ে দুর্বল হয়ে থাকতে হত; কেবলই এ ভয়ে, ও ভয়ে, সে ভয়ে, পেয়াদার ঘুষ জুগিয়ে ফতুর হতে হত। কিন্তু, তাঁর পেয়াদার ছদ্মবেশধারী মিথ্যা বিভীষিকার হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে যে দলিল সে হচ্ছে তাঁর বিশ্বরাজ্যে আমাদের স্বরাজের দলিল; তারই মহা আশ্বাসবাণী হচ্ছে: যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। তিনি অনন্তকাল থেকে অনন্তকালের জন্য অর্থের যে বিধান করেছেন তা যথাতথ। তিনি তাঁর সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েছেন, 'বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চলবে, ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম। এক দিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম, আর-এক দিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম, এই দুয়ের যোগে তুমি বড়ো হও। জয় হোক তোমার, এ রাজ্য তোমারই হোক; এর ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই।' এই বিধিদত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করেছে অন্য সকল রকম স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।

কিন্তু নিজের বুদ্ধিবিভাগে যে লোক কর্তাভজা পোলিটিক্যাল বিভাগেও কর্তাভজা হওয়া ছাড়া তাদের আর গতি নেই। বিধাতা স্বয়ং যেখানে কর্তৃত্ব দাবি করেন না সেখানেও যারা কর্তা জুটিয়ে বসে, যেখানে সম্মান দেন সেখানেও যারা আত্মাবমাননা করে, তাদের স্বরাজে রাজার পর রাজার আমদানি হবে; কেবল ছোট্টো ঐ স্ব'টুকুকে বাঁচানোই দায় হবে।

মানুষের বুদ্ধিকে ভূতের উপদ্রব এবং অদ্ভুতের শাসন থেকে মুক্তি দেবার ভার যে পেয়েছে তার বাসাটা পূর্বেই হোক আর পশ্চিমেই হোক তাকে ওস্তাদ বলে কবুল করতে হবে। দেবতার অধিকার আধ্যাত্মিক মহলে, আর দৈত্যের অধিকার বিশ্বের আধিভৌতিক মহলে। দৈত্য বলছি আমি বিশ্বের সেই শক্তিরূপকে যা সূর্যনক্ষত্র নিয়ে আকাশে আকাশে তালে তালে চক্রে চক্রে লাটিম ঘুরিয়ে বেড়ায়। সেই আধিভৌতিক রাজ্যের প্রধান বিদ্যাটা আজ শুক্রাচার্যের হাতে। সেই বিদ্যাটার নাম সঞ্জীবনী বিদ্যা। সেই বিদ্যার জোরে সম্যক্‌রূপে জীবনরক্ষা হয়, জীবনপোষণ হয়, জীবনের সকলপ্রকার দুর্গতি দূর হতে থাকে; অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব মোচন হয়; জড়ের অত্যাচার, জন্তুর অত্যাচার, মানুষের অত্যাচার থেকে এই বিদ্যাই রক্ষা করে। এই বিদ্যা যথাতথ বিধির বিদ্যা; এ যখন আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে মিলবে তখনই স্বাতন্ত্র্যলাভের গোড়াপত্তন হবে, অন্য উপায় নেই।

এই শিক্ষা থেকে ভ্রষ্টতার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। হিন্দুর কুয়ো থেকে মুসলমানে জল তুললে তাতে জল অপবিত্র করে। এটা বিষম মুশকিলের কথা। কেননা, পবিত্রতা হল আধ্যাত্মিক রাজ্যের আর কুয়োর জলটা হল বস্তুরাজ্যের। যদি

বলা যেত, মুসলমানকে ঘৃণা করলে মন অপবিত্র হয় তা হলে সে কথা বোঝা যেত; কেননা, সেটা আধ্যাত্মিক মহলের কথা। কিন্তু মুসলমানের ঘড়ার মধ্যে অপবিত্রতা আছে বললে তর্কের সীমানাগত জিনিসকে তর্কের সীমানার বাইরে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধিকে ফাঁকি দেওয়া হয়। পশ্চিম-ইস্কুল-মাস্টারের আধুনিক হিন্দু ছাত্র বলবে, আসলে ওটা স্বাস্থ্যতত্ত্বের কথা। কিন্তু স্বাস্থ্যতত্ত্বের কোনো অধ্যায়ে তো পবিত্রতার বিচার নেই। ইংরেজের ছাত্র বলবে, আধিভৌতিকে যাদের শ্রদ্ধা নেই, আধ্যাত্মিকের দোহাই দিয়ে তাদের ভুলিয়ে কাজ করাতে হয়। এ জবাবটা একেবারেই ভালো নয়। কারণ, যাদের বাইরে থেকে ভুলিয়ে কাজ আদায় করতে হয় চিরদিনই বাইরে থেকে তাদের কাজ করাতে হয়; নিজের থেকে কাজ করার শক্তি তাদের থাকে না, সুতরাং কর্তা না হলে তাদের চলেই না। আর-একটি কথা, এই ভুল যখন সত্যের সহায়তা করতে যায় তখনো সে সত্যকে চাপা দেয়। 'মুসলমানের ঘড়া হিন্দুর কুয়োর জল অপরিষ্কার করে' না বলে যেই বলা হয় 'অপবিত্র করে', তখনই সত্যনির্ণয়ের সমস্ত পথ বন্ধ করা হয়। কেননা, কোনো জিনিস অপরিষ্কার করে কি না-করে সেটা প্রমাণসাপেক্ষ। সে স্থলে হিন্দুর ঘড়া, মুসলমানের ঘড়া—হিন্দুর কুয়োর জল, মুসলমানের কুয়োর জল— হিন্দুপাড়ার স্বাস্থ্য, মুসলমানপাড়ার স্বাস্থ্য—যথানিয়মে ও যথেষ্ট পরিমাণে তুলনা করে পরীক্ষা করে দেখা চাই। পবিত্রতাঘটিত দোষ অন্তরের; কিন্তু স্বাস্থ্যঘটিত দোষ বাইরের, অতএব বাইরে থেকে তার প্রতিকার চলে। স্বাস্থ্যতত্ত্ব হিসাবে ঘড়া পরিষ্কার রাখার নিয়ম বৈজ্ঞানিক নিয়ম; তা মুসলমানের পক্ষেও যেমন হিন্দুর পক্ষেও তেমনি; সেটা যাতে উভয় পক্ষে সমান গ্রহণ করে উভয়ের কুয়ো উভয়েই ব্যবহার করতে পারে সেইটেই চেষ্টার বিষয়। কিন্তু বাহ্য বস্তুকে অপরিষ্কার না বলে অপবিত্র বলার দ্বারা চিরকালের জন্যেই এ সমস্যাকে সাধারণের বুদ্ধি ও চেষ্টার বাইরে নির্বাসিত করে রাখা হয়। এটা কি কাজ সারার পক্ষেও ভালো রাস্তা? এক দিকে বুদ্ধিকে মুগ্ধ রেখে আর-এক দিকে সেই মূঢ়তার সাহায্য নিয়েই ফাঁকি দিয়ে কাজ চালানো, এটা কি কোনো উচ্চ অধিকারের পথ? চালিত যে তার দিকে অবুদ্ধি, আর চালক যে তার দিকে অসত্য, এই দুইয়ের সম্মিলনে কি কোনো কল্যাণ হতে পারে? এইরকম বুদ্ধিগত কাপুরুষতা থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের যেতে হবে শুক্রাচার্যের ঘরে। সে ঘর পশ্চিম-দুয়ারি বলে যদি খামকা বলে বসি 'ও ঘরটা অপবিত্র' তা হলে যে বিদ্যা বাহিরের নিয়মের কথা শেখায় তার থেকে বঞ্চিত হব, আর যে বিদ্যা অন্তরের পবিত্রতার কথা বলে তাকেও ছোটো করা হবে।

এই প্রসঙ্গে একটা তর্ক ওঠবার আশঙ্কা আছে। এ কথা অনেকে বলবেন, পশ্চিমদেশ যখন বুনো ছিল, পশুচর্ম পরে মৃগয়া করত, তখন কি আমরা নিজের দেশকে অন্ন জোগাই নি, বস্ত্র জোগাই নি? ওরা যখন দলে দলে সমুদ্রের এ পারে, ও পারে, দস্যুবৃত্তি করে বেড়াত, আমরা কি তখন স্বরাজশাসনবিধি আবিষ্কার করি নি? নিশ্চয় করেছি, কিন্তু কারণটা কী? আর তো কিছুই নয়, বস্তুবিদ্যা ও নিয়মতত্ত্ব ওরা যতটা শিখেছিল আমরা তার চেয়ে বেশি শিখেছিলেম। পশুচর্ম পরতে যে বিদ্যা লাগে তাঁত বুনতে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যার দরকার, পশু মেরে খেতে যে বিদ্যা খাটাতে হয় চাষ করে খেতে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যা লাগে। দস্যুবৃত্তিতে যে বিদ্যা রাজ্যচালনে ও পালনে তার চেয়ে অনেক বেশি। আজ আমাদের পরস্পরের অবস্থাটা যদি একেবারে উল্‌টে গিয়ে থাকে তার মধ্যে দৈবের কোনো ফাঁকি নেই। কলিঙ্গের রাজাকে পথে ভাসিয়ে দিয়ে বনের ব্যাধকে

আজ সিংহাসনে যে চড়িয়ে দিয়েছে সে তো কোনো দৈব নয়, সে ঐ বিদ্যা। অতএব, আমাদের সঙ্গে ওদের প্রতিযোগিতার জোর কোনো বাহ্য ক্রিয়াকলাপে কমবে না; ওদের বিদ্যাকে আমাদের বিদ্যা করতে পারলে তবেই ওদের সামলানো যাবে। এ কথার একমাত্র অর্থ, আমাদের সর্বপ্রধান সমস্যা শিক্ষাসমস্যা। অতএব শঙ্করাচার্যের আশ্রমে আমাদের যেতে হচ্ছে।

এই পর্যন্ত এগিয়ে একটা কথায় এসে মন ঠেকে যায়। সামনে এই প্রশ্নটা দেখা দেয়, 'সব মানলেম, কিন্তু পশ্চিমের যে শক্তিরূপ দেখে এলে তাতে কি তৃপ্তি পেয়েছ?' না, পাই নি। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বলছি নে, ইংরেজিতে বলতে হলে হয়তো বলতেম, টাইট্যানিক ওয়েল্‌থ্‌। অর্থাৎ, যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানলার কাছে রোজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ-তলা বাড়ির ভ্রূকুটির সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর—অনেক তফাত। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। দুই দুগুণে চার, চার দুগুণে আট, আট দুগুণে ষোলো, অঙ্কগুলো ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলে; সেই লাফের পাল্লা কেবলই লম্বা হতে থাকে। এই নিরন্তর উল্লম্ফনের ঝোঁকের মাঝখানে যে পড়ে গেছে তার রোখ চেপে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বাহাদুরির মত্ততায় সে ভোঁ হয়ে যায়। আর, যে লোক বাইরে বসে আছে তার যে কত বড়ো পীড়া এইখানে তার একটা উপমা দিই।

একদিন আশ্বিনের ভরা নদীতে আমি বজরার জানলায় বসে ছিলেম, সেদিন পূর্ণিমার সন্ধ্যা। অদূরে ডাঙার উপরে এক গহনার নৌকোর ভোজপুরি মাল্লার দল উৎকট উৎসাহে আত্মবিনোদনের কাজে লেগে গিয়েছিল। তাদের কারও হাতে ছিল মাদল, কারও হাতে করতাল। তাদের কণ্ঠে সুরের আভাসমাত্র ছিল না, কিন্তু বাহুতে শক্তি ছিল সে কথা কার সাধ্য অস্বীকার করে। খচমচ শব্দে তালের নাচন ক্রমেই দুনে চৌদুনে লয়ে চড়তে লাগল। রাত এগারোটা হয়, দুপুর বাজে, ওরা থামতেই চায় না। কেননা, থামবার কোনোই সংগত কারণ নেই। সঙ্গে যদি গান থাকত তা হলে সমও থাকত; কিন্তু অরাজক তালের গতি আছে শান্তি নেই, উত্তেজনা আছে পরিতৃপ্তি নেই। সেই তালমাতালের দল প্রতিক্ষণেই ভাবছিল ভরপুর মজা হচ্ছে। আমি ছিলেম তাণ্ডবের বাইরে, আমিই বুঝছিলেম গানহীন তালের দৌরাত্ম্য বড়ো অসহ্য।

তেমনি করেই আট্‌লান্‌টিকের ও পারে ইঁটপাথরের জঙ্গলে বসে আমার মন প্রতিদিনই পীড়িত হয়ে বলেছে, তালের খচমচ'র অন্ত নেই, কিন্তু সুর কোথায়! আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই—এ বাণীতে তো সৃষ্টির সুর লাগে না। তাই সেদিন সেই ভ্রূকুটিকুটিল অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের সামনে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিক্কারের সঙ্গে বলেছে: ততঃ কিম্‌!

এ কথা বারবার বলেছি, আবার বলি, আমি বৈরাগ্যের নাম করে শূন্য ঝুলির সমর্থন করি নে। আমি এই বলি, অন্তরে গান বলে সত্যটি যদি ভরপুর থাকে তবে তার সাধনায় সুর-তাল রসের সংযমরক্ষা করে; বাহিরের বৈরাগ্য অন্তরের পূর্ণতার সাক্ষ্য দেয়। কোলাহলের উচ্ছৃঙ্খল নেশায় সংযমের কোনো বালাই নেই। অন্তরে প্রেম বলে সত্যটি যদি থাকে তবে তার সাধনায় ভোগকে হতে হয় সংযত,

সেবাকে হতে হয় খাঁটি। এই সাধনার সতীত্ব থাকা চাই। এই সতীত্বের যে বৈরাগ্য অর্থাৎ সংযম সেই হল প্রকৃত বৈরাগ্য। অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন সেই হল প্রকৃত মিলন।

যখন জাপানে ছিলেম তখন প্রাচীন জাপানের যে রূপ সেখানে দেখেছি সে আমাকে গভীর তৃপ্তি দিয়েছে। কেননা, অর্থহীন বহুলতা তার বাহন নয়। প্রাচীন জাপান আপন হৃৎপদ্মের মাঝখানে সুন্দরকে পেয়েছিল। তার সমস্ত বেশভূষা, কর্ম খেলা, তার বাসা আসবাব, তার শিষ্টাচার ধর্মানুষ্ঠান, সমস্তই একটি মূল ভাবের দ্বারা অধিকৃত হয়ে সেই এককে সেই সুন্দরকে বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশ করেছে। একান্ত রিক্ততাও নিরর্থক, একান্ত বহুলতাও তেমনি। প্রাচীন জাপানের যে জিনিসটি আমার চোখে পড়েছিল তা রিক্ততাও নয়, বহুলতাও নয়, তা পূর্ণতা। এই পূর্ণতাই মানুষের হৃদয়কে আতিথ্য দান করে; সে ডেকে আনে, সে তাড়িয়ে দেয় না। আধুনিক জাপানকেও এর পাশাপাশি দেখেছি। সেখানে ভোজপুরি মাল্লার দল আড্ডা করেছে; তাদের যে প্রচণ্ড খচমচ উঠেছে সুন্দরের সঙ্গে তার মিল হল না, পূর্ণিমাকে তা ব্যঙ্গ করতে লাগল।

পূর্বে যা বলেছি তার থেকে এ কথা সবাই বুঝবেন যে, আমি বলি নে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ কল কারখানার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমি বলি, প্রয়োজন আছে কিন্তু তার বাণী নেই; বিশ্বের কোনো সুরে সে সায় দেয় না, হৃদয়ের কোনো ডাকে সে সাড়া দেয় না। মানুষের যেখানে অভাব সেইখানে তৈরি হয় তার উপকরণ, মানুষের যেখানে পূর্ণতা সেইখানে প্রকাশ হয় তার অমৃতরূপ। এই অভাবের দিকে উপকরণের মহলে মানুষের ঈর্ষা বিদ্বেষ; এইখানে তার প্রাচীর, তার পাহারা; এইখানে সে আপনাকে বাড়ায়, পরকে তাড়ায়। সুতরাং এইখানেই তার লড়াই। যেখানে তার অমৃত, যেখানে মানুষ— বস্তুকে নয়— আত্মাকে প্রকাশ করে, সেখানে সকলকে সে ডেকে আনে; সেখানে ভাগের দ্বারা ভোজের ক্ষয় হয় না। সুতরাং সেইখানেই শান্তি।

য়ুরোপ যখন বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে বিশ্বের রহস্যনিকেতনের দরজা খুলতে লাগল তখন যে দিকে চায় সেই দিকেই দেখে বাঁধা নিয়ম। নিয়ত এই দেখার অভ্যাসে তার এই বিশ্বাসটা ঢিলে হয়ে এসেছে যে, নিয়মেরও পশ্চাতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের মানবত্বের অন্তরঙ্গ মিল আছে। নিয়মকে কাজে খাটিয়ে আমরা ফল পাই, কিন্তু ফল পাওয়ার চেয়েও মানুষের একটা বড়ো লাভ আছে। চা-বাগানের ম্যানেজার কুলিদের 'পরে যে নিয়ম চালনা করে সে নিয়ম যদি পাকা হয় তা হলে চায়ের ফলনের পক্ষে কাজে লাগে। কিন্তু, বন্ধু সম্বন্ধে ম্যানেজারের তো পাকা নিয়ম নেই। তার বেলায় নিয়মের কথাই ওঠে না। ঐ জায়গাটাতে চায়ের আয় নেই, ব্যয় আছে। কুলির নিয়মটা আধিভৌতিক বিশ্বনিয়মের দলে, সেইজন্যে সেটা চা-বাগানেও খাটে। কিন্তু, যদি এমন ধারণা হয় যে, ঐ বন্ধুতার সত্য কোনো বিরাট সত্যের অঙ্গ নয়, তা হলে সেই ধারণায় মানবত্বকে শুকিয়ে ফেলে। কলকে তো আমরা আত্মীয় বলে বরণ করতে পারি নে; তা হলে কলের বাইরে কিছু যদি না থাকে তবে আমাদের যে আত্মা আত্মীয়কে খোঁজে সে দাঁড়ায় কোথায়? এক রোখে বিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে পশ্চিমদেশে এই আত্মাকে কেবলই সরিয়ে সরিয়ে ওর জন্যে আর জায়গা রাখলে না। এক-ঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্যে দুর্বলতায় কাত হয়ে পড়েছি, আর ওরাই কি এক-ঝোঁকা আধিভৌতিক চালে এক পায়ে লাফিয়ে মনুষ্যত্বের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁচচ্ছে?

বিশ্বের সঙ্গে যাদের এমনিতরো চা-বাগানের ম্যানেজারির সম্বন্ধ তাদের সঙ্গে যে-সে লোকের পেরে ওঠা শক্ত। সুদক্ষতার বিদ্যাটা এরা আয়ত্ত করে নিয়েছে। ভালোমানুষ লোক তাদের সন্ধানপর আড়কাঠির হাতে ঠকে যায়, ধরা দিলে ফেরবার পথ পায় না। কেননা, ভালোমানুষ লোকের নিয়মবোধ নেই, যেখানে বিশ্বাস করবার নয় ঠিক সেইখানেই আগে-ভাগে সে বিশ্বাস করে বসে আছে—তা সে বৃহস্পতিবারের বারবেলা হোক, রক্ষামন্ত্রের তাবিজ হোক, উকিলের দালাল হোক, আর চা-বাগানের আড়কাঠি হোক। কিন্তু এই নেহাত ভালোমানুষেরও একটা জায়গা আছে যেটা নিয়মের উপরকার; সেখানে দাঁড়িয়ে সে বলতে পারে, 'সাত জন্মে আমি যেন চা-বাগানের ম্যানেজার না হই, ভগবান, আমার 'পরে এই দয়া করো।' অথচ, এই অনবচ্ছিন্ন চা-বাগানের ম্যানেজারসম্প্রদায় নিখুঁত করে উপকার করতে জানে; জানে তাদের কুলির বস্তি কেমন করে ঠিক যেন কাঁচিছাঁটা সোজা লাইনে পরিপাটি করে বানিয়ে দিতে হয়; দাওয়াইখানা ডাক্তারখানা হাট-বাজারের যে ব্যবস্থা করে সে খুব পরিপাটি। এদের এই নির্মানুষিক সুব্যবস্থায় নিজেদের মুনাফা হয়, অন্যদের উপকারও হতে পারে, কিন্তু নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।

কেউ না মনে করেন, আমি কেবলমাত্র পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের সম্বন্ধ নিয়েই এই কথাটা বলছি। যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড়ো করে তুলে পশ্চিমসমাজে মানবসম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেছে। কেননা, স্ক্রু দিয়ে আঁটা, আঠা দিয়ে জোড়ার বন্ধনকেই ভাবনায় এবং চেষ্টায় প্রধান করে তুললে, অন্তরতম যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে যায়, সেই সৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন বন্ধন শিথিল হতে থাকে। অথচ, মানুষকে কলের নিয়মে বাঁধার আশ্চর্য সফলতা আছে; তাতে পণ্যদ্রব্য রাশীকৃত হয়, বিশ্ব জুড়ে হাট বসে, মেঘ ভেদ করে কোঠাবাড়ি ওঠে। এ দিকে সমাজব্যাপারে শিক্ষা বলো, আরোগ্য বলো, জীবিকার সুযোগসাধন বলো, নানাপ্রকার হিতকর্মেও মানুষের ষোলো আনা জিত হয়। কেননা পূর্বেই বলেছি, বিশ্বের বাহিরের দিকে এই কল জিনিসটা সত্য। সেইজন্যে এই যান্ত্রিকতায় যাদের মন পেকে যায় ফললাভের দিকে তাদের লোভের অন্ত থাকে না। লোভ যতই বাড়তে থাকে মানুষকে মানুষ খাটো করতে ততই আর দ্বিধা করে না।

কিন্তু লোভ তো একটা তত্ত্ব নয়, লোভ হচ্ছে রিপু। রিপুর কর্ম নয় সৃষ্টি করা। তাই, ফললাভের লোভ যখন কোনো সভ্যতার অন্তরে প্রধান আসন গ্রহণ করে তখন সেই সভ্যতায় মানুষের আত্মিক যোগ বিশ্লিষ্ট হতে থাকে। সেই সভ্যতা যতই ধন লাভ করে, বল লাভ করে, সুবিধাসুযোগের যতই বিস্তার করতে থাকে, মানুষের আত্মিক সত্যকে ততই সে দুর্বল করে।

একা মানুষ ভয়ংকর নিরর্থক; কেননা, একার মধ্যে ঐক্য নেই। বহুকে নিয়ে যে এক সেই হল সত্য এক। বহু থেকে বিচ্ছিন্ন যে সেই লক্ষ্মীছাড়া এক ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক। ছবি এক লাইনে হয় না, সে হয় নানা লাইনের ঐক্যে। ছবির মধ্যে প্রত্যেক লাইনটি ছোটো বড়ো সমস্ত লাইনের আত্মীয়। এই আত্মীয়তার সামঞ্জস্যে ছবি হল সৃষ্টি। এঞ্জিনিয়র সাহেব নীলরঙের মোমজামার উপর বাড়ির প্ল্যান আঁকেন, তাকে ছবি বলি নে; কেননা, সেখানে লাইনের সঙ্গে লাইনের অন্তরের আত্মিক সম্বন্ধ নয়, বাহির-মহলের ব্যবহারিক সম্বন্ধ। তাই ছবি হল সৃজন, প্ল্যান হল নির্মাণ।

তেমনি ফললাভের লোভে ব্যবসায়িকতাই যদি মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে তবে মানবসমাজ প্রকাণ্ড প্ল্যান হয়ে উঠতে থাকে, ছবির আর কিছু বাকি থাকে না। তখন মানুষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ খাটো হতে থাকে। তখন ধন হয় সমাজের রথ, ধনী হয় সমাজের রথী, আর শক্ত বাঁধনে বাঁধা মানুষগুলো হয় রথের বাহন। গড় গড় শব্দে এই রথটা এগিয়ে চলাকেই মানুষ বলে সভ্যতার উন্নতি। তা হোক, কিন্তু এই কুবেরের রথযাত্রায় মানুষের আনন্দ নেই। কেননা কুবেরের 'পরে মানুষের অন্তরের ভক্তি নেই। ভক্তি নেই বলেই মানুষের বাঁধন দড়ির বাঁধন হয়, নাড়ীর বাঁধন হয় না। দড়ির বাঁধনের ঐক্যকে মানুষ সইতে পারে না, বিদ্রোহী হয়। পশ্চিমদেশে আজ সামাজিক বিদ্রোহ কালো হয়ে ঘনিয়ে এসেছে এ কথা সুস্পষ্ট। ভারতে আচারের বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে নির্জীব করেছে, য়ুরোপে ব্যবহারের বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে সে বিশ্লিষ্ট করেছে। কেননা আচারই হোক আর ব্যবহারই হোক, তারা তো তত্ত্ব নয়; তাই তারা মানুষের আত্মাকে বাদ দিয়ে সকল ব্যবস্থা করে।

তত্ত্ব কাকে বলে? যিশু বলেছেন : আমি আর আমার পিতা এক। এ হল তত্ত্ব। পিতার সঙ্গে আমার যে ঐক্য সেই হল সত্য ঐক্য, ম্যানেজারের সঙ্গে কুলির যে ঐক্য সে সত্য ঐক্য নয়।

চরম তত্ত্ব আছে উপনিষদে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

পশ্চিমসভ্যতার অন্তরাসনে লোভ রাজা হয়ে বসেছে, পূর্বেই তার নিন্দা করেছি। কিন্তু, নিন্দাটা কিসের? ঈশোপনিষদে তত্ত্বস্বরূপে এরই উত্তরটি দেওয়া হয়েছে। ঋষি বলেছেন : মা গৃধঃ। লোভ কোরো না। কেন করব না? যেহেতু লোভে সত্যকে মেলে না। নাই-বা মিলল, আমি ভোগ করতে চাই। ভোগ কোরো না, এ কথা তো বলা হচ্ছে না। ভুঞ্জীথাঃ, ভোগই করবে; কিন্তু সত্যকে ছেড়ে আনন্দকে ভোগ করবার পন্থা নেই। তা হলে সত্যটা কী? সত্য হচ্ছে এই : ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্। সংসারে যা-কিছু চলছে সমস্ত ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন। যা-কিছু চলছে সেইটেই যদি চরম সত্য হত, তার বাইরে আর-কিছুই না থাকত, তা হলে চলমান বস্তুকে যথাসাধ্য সংগ্রহ করাই মানুষের সব চেয়ে বড়ো সাধনা হত। তা হলে লোভই মানুষকে সব চেয়ে বড়ো চরিতার্থতা দিত। কিন্তু ঈশ সমস্ত পূর্ণ করে রয়েছেন এইটেই যখন শেষ কথা তখন আত্মার দ্বারা এই সত্যকে ভোগ করাই হবে পরম সাধনা। আর, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারাই এই ভোগের সাধন হবে, লোভের দ্বারা নয়। সাত মাস ধরে আমেরিকায় আকাশের বক্ষোবিদারী ঐশ্বর্যপুরীতে বসে এই সাধনার উল্টোপথে চলা দেখে এলেম। সেখানে 'যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' সেটাই মস্ত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, আর 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' সেইটেই ডলারের ঘন ধুলায় আচ্ছন্ন। এইজন্যেই সেখানে 'ভুঞ্জীথাঃ' এই বিধানের পালন সত্যকে নিয়ে নয়, ধনকে নিয়ে; ত্যাগকে নিয়ে নয়, লোভকে নিয়ে।

ঐক্য দান করে সত্য। ভেদবুদ্ধি ঘটায় ধন। তা ছাড়া সে অন্তরাত্মাকে শূন্য রাখে; সেইজন্যে পূর্ণতাকে বাইরের দিক থেকে ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে। সুতরাং কেবল সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে দিনরাত উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে হয়; 'আরো' 'আরো' হাঁকতে-হাঁকতে হাঁপাতে-হাঁপাতে নামতার কোঠায় কোঠায় আকাঙ্ক্ষার

ঘোড়দৌড় করাতে-করাতে ঘূর্ণি লাগে; ভুলেই যেতে হয় অন্য যা-কিছু পাই আনন্দ পাচ্ছি নে।

তা হলে চরিতার্থতা কোথায়? তার উত্তর একদিন ভারতবর্ষের ঋষিরা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, চরিতার্থতা পরম একের মধ্যে। গাছ থেকে আপেল পড়ে একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। আপেল পড়ার অন্তবিহীন সংখ্যাগণনার মধ্যেই আপেল পড়ার সত্যকে পাওয়া যায় এ কথা যে বলে প্রত্যেক সংখ্যার কাছে এসে তাকে তার মন ধাক্কা দিয়ে বলবে 'ততঃ কিম্'। তার দৌড়ও থামবে না, তার প্রশ্নের উত্তরও মিলবে না। কিন্তু অসংখ্য আপেল পড়া যেমনি একটি আকর্ষণতত্ত্বে এসে ঠেকে অমনি বুদ্ধি খুশি হয়ে বলে ওঠে, 'বাস্! হয়েছে।'

এই তো গেল আপেল পড়ার সত্য। মানুষের সত্যটা কোথায়? সেন্‌সস্ রিপোর্টে? এক দুই তিন চার পাঁচে? মানুষের স্বরূপপ্রকাশ কি অন্তহীন সংখ্যায়? এই প্রকাশের তত্ত্বটি উপনিষৎ বলেছেন—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সর্বভূতকে আপনারই মতো দেখেন এবং আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে সে থাকে লুপ্ত; আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত। মনুষ্যত্বের এই প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নতার একটা মস্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। বুদ্ধদেব মৈত্রী-বুদ্ধিতে সকল মানুষকে এক দেখেছিলেন, তাঁর সেই ঐক্যতত্ত্ব চীনকে অমৃত দান করেছিল। আর, যে বণিক লোভের প্রেরণায় চীনে এল এই ঐক্যতত্ত্বকে সে মানলে না; সে অকুণ্ঠিতচিত্তে চীনকে মৃত্যুদান করেছে, কামান দিয়ে ঠেসে ঠেসে তাকে আফিম গিলিয়েছে। মানুষ কিসে প্রকাশ পেয়েছে আর কিসে প্রচ্ছন্ন হয়েছে, এর চেয়ে স্পষ্ট করে ইতিহাসে আর-কখনো দেখা যায় নি।

আমি জানি, আজকের দিনে আমাদের দেশে অনেকেই বলে উঠবেন, 'ওই কথাটাই তো আমরা বারবার বলে আসছি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে পাকিয়ে এক-এক গ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এত বড়ো হাঁ করেছে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কারবার চলতে পারে না। কেননা ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে, আমরা বিদ্যাকে। এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা বিষের মতো পরিহার করা চাই।' এক দিকে এটাও ভেদবুদ্ধির কথা, অপর দিকে এটা সাধারণ বিষয়বুদ্ধির কথাও নয়। ভারতবর্ষ এই মোহকে সমর্থন করেন নি। তাই মনু বলেছেন—

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ।

বিষয়ের সেবা -ত্যাগের দ্বারা তেমন করে সংযমন হয় না, বিষয়ে নিযুক্ত থেকে জ্ঞানের দ্বারা নিত্য-নিত্য যেমন করে হয়। এর কারণ, বিষয়ের দায় আধিভৌতিক বিশ্বের দায়, সে দায়কে ফাঁকি দিয়ে আধ্যাত্মিকের কোঠায় ওঠা যায় না; তাকে বিশুদ্ধরূপে পূর্ণ করে তবে উঠতে হয়। তাই উপনিষৎ বলেছেন: অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে। অবিদ্যার পথ দিয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচতে হবে, তার পরে বিদ্যার তীর্থে অমৃত লাভ হবে। শুক্রাচার্য এই মৃত্যু থেকে বাঁচাবার বিদ্যা নিয়ে আছেন, তাই অমৃতলোকের ছাত্র কচকেও এই বিদ্যা শেখবার জন্যে দৈত্যপাঠশালার খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল।

আত্মিক সাধনার একটা অঙ্গ হচ্ছে জড়বিশ্বের অত্যাচার থেকে আত্মাকে মুক্ত করা। পশ্চিমমহাদেশের লোকেরা সাধনার সেই দিকটার ভার নিয়েছে। এইটে হচ্ছে সাধনার সব-নিচেকার ভিত, কিন্তু এটা পাকা করতে না পারলে অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ শক্তিই পেটের দায়ে জড়ের গোলামি করতে ব্যস্ত থাকবে। পশ্চিম তাই হাতের আস্তিন গুটিয়ে খন্তা কোদাল নিয়ে এমনি করে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে যে উপর-পানে মাথা তোলবার ফুরসত তার নেই বললেই হয়। এই পাকা ভিতের উপর উপর-তলা যখন উঠবে তখনই হাওয়া-আলোর যারা ভক্ত তাদের বাসাটি হবে বাধাহীন। তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানীরা বলেছেন, না-জানাই বন্ধনের কারণ, জানাতেই মুক্তি। বস্তুবিশ্বেও সেই একই কথা। এখানকার নিয়মতত্ত্বকে যে না জানে সেই বদ্ধ হয়, যে জানে সেই মুক্তিলাভ করে। তাই বিষয়রাজ্যে আমরা যে বাহ্য বন্ধন কল্পনা করি সেও মায়া; এই মায়া থেকে নিষ্কৃতি দেয় বিজ্ঞানে। পশ্চিমমহাদেশ বাহ্য বিশ্বে মায়ামুক্তির সাধনা করছে; সেই সাধনা ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে বের করে সেইখানে লাগাচ্ছে ঘা; এই হচ্ছে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা আর পূর্বমহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করেছে সেই হচ্ছে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব, পূর্বপশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তা হলে উভয়েই ব্যর্থ হবে; তাই পূর্বপশ্চিমের মিলনমন্ত্র উপনিষৎ দিয়ে গেছেন। বলেছেন—

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্‌বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, এইখানে বিজ্ঞানকে চাই। ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্‌, এইখানে তত্ত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়কে মেলাবার কথা যখন ঋষি বলেছেন তখন পূর্বপশ্চিমকে মিলতে হবে। এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত, সে নির্জীব; আর পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।

এই ঐক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কথা ভুল বোঝবার আশঙ্কা আছে। তাই যে কথাটা একবার আভাসে বলেছি সেইটে আর-একবার স্পষ্ট বলা ভালো। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্‌ হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি; গিলে খাওয়াকেই সে এক করা বলে প্রচার করে। পূর্বে আমি বলেছি, আধিভৌতিককে আধ্যাত্মিক যদি আত্মসাৎ করে বসে তা হলে সেটাকে সমন্বয় বলা চলে না; পরস্পরের স্ব-ক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র থাকলে তবেই সমন্বয় সত্য হয়। তেমনি মানুষ যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলে তবেই মানুষ যেখানে এক সেখানে তার সত্য ঐক্য পাওয়া যায়। সেদিনকার মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপ যখন শান্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল তখন থেকে সেখানে কেবলই ছোটো ছোটো জাতির স্বাতন্ত্র্যের দাবি প্রবল হয়ে উঠছে। যদি আজ নবযুগের আরম্ভ হয়ে থাকে তা হলে এই যুগে অতিকায় ঐশ্বর্য, অতিকায় সাম্রাজ্য, সংঘবন্ধনের সমস্ত অতিশয়তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে। যারা নবযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় জাতিবিশেষের মুক্তি নয়, নিখিল মানবের মুক্তি।

যারা অন্যকে আপনার মতো জেনেছে 'ন ততো বিজুগুপ্সতে', তারাই প্রকাশ

পেয়েছে, এই তত্ত্বটি কি মানুষের পুঁথিতেই লেখা আছে? মানুষের সমস্ত ইতিহাসই কি এই তত্ত্বের নিরন্তর অভিব্যক্তি নয়? ইতিহাসের গোড়াতেই দেখি, মানুষের দল পর্বতসমুদ্রের এক-একটি বেড়ার মধ্যে একত্র হয়েছে। মানুষ যখন একত্র হয় তখন যদি এক হতে না পারে তা হলেই সে সত্য হতে বঞ্চিত হয়। একত্রিত মনুষ্যদলের মধ্যে যারা যদুবংশের মাতাল বীরদের মতো কেবলই হানাহানি করেছে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে নি, পরস্পরকে বঞ্চিত করতে গিয়েছে, তারা কোন্ কালে লোপ পেয়েছে। আর, যারা এক আত্মাকে আপনাদের সকলের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল তারাই মহাজাতিরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেছে, এত রথ ছুটেছে যে, ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই। আজ, কেবল নানা ব্যক্তি নয়, নানা জাতি কাছাকাছি এসে জুটল; অমনি মানুষের সত্যের সমস্যা বড়ো হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক শক্তি যাদের একত্র করেছে তাদের এক করবে কে? মানুষের যোগ যদি সংযোগ হল তো ভালোই, নইলে সে দুর্যোগ। সেই মহাদুর্যোগ আজ ঘটেছে। একত্র হবার বাহ্যশক্তি হু হু করে এগোল, এক করবার আন্তর শক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল। ঠিক যেন গাড়িটা ছুটেছে এঞ্জিনের জোরে, বেচারা ড্রাইভার্‌টা 'আরে আরে! হাঁ হাঁ' করতে করতে তার পিছন পিছন দৌড়েছে— কিছুতে নাগাল পাচ্ছে না। অথচ, এক দল লোক এঞ্জিনের প্রচণ্ড বেগ দেখে আনন্দ করে বললে, 'শাবাশ! একেই তো বলে উন্নতি।' এ দিকে, আমরা পূর্বদেশের ভালোমানুষ যারা ধীরমন্দগমনে পায়ে হেঁটে চলি ওদের ঐ উন্নতির ধাক্কা আজও সামলে উঠতে পারছি নে। কেননা যারা কাছেও আসে, তফাতেও থাকে, তারা যদি চঞ্চল পদার্থ হয় তা হলে পদে পদে ঠকাঠক ধাক্কা দিতে থাকে। এই ধাক্কার মিলন সুখকর নয়, অবস্থাবিশেষে কল্যাণকর হতেও পারে।

যাই হোক, এর চেয়ে স্পষ্ট আজ আর কিছুই নয় যে, জাতিতে জাতিতে একত্র হচ্ছে অথচ মিলছে না। এরই বিষম বেদনায় সমস্ত পৃথিবী পীড়িত। এত দুঃখেও দুঃখের প্রতিকার হয় না কেন? তার কারণ এই যে, গণ্ডির ভিতরে যারা এক হতে শিখেছিল গণ্ডির বাইরে তারা এক হতে শেখে নি।

মানুষ সাময়িক ও স্থানিক কারণে গণ্ডির মধ্যে সত্যকে পায় বলেই সত্যের পুজো ছেড়ে গণ্ডির পুজো ধরে; দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে মানে; রাজাকে ভোলে, দারোগাকে কিছুতে ভুলতে পারে না। পৃথিবীতে নেশন গড়ে উঠল সত্যের জোরে; কিন্তু ন্যাশন্যালিজ্‌ম্ সত্য নয়, অথচ সেই জাতীয় গণ্ডি-দেবতার পুজোর অনুষ্ঠানে চারি দিক থেকে নরবলির জোগান চলতে লাগল। যতদিন বিদেশী বলি জুটত ততদিন কোনো কথা ছিল না; হঠাৎ ১৯১৪ খৃস্টাব্দে পরস্পরকে বলি দেবার জন্যে স্বয়ং যজমানদের মধ্যে টানাটানি পড়ে গেল। তখন থেকে ওদের মনে সন্দেহ জাগতে আরম্ভ হল, একেই কি বলে ইষ্টদেবতা! এ যে ঘর পর কিছুই বিচার করে না! এ যখন একদিন পূর্বদেশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোমল অংশ বেছে তাতে দাঁত বসিয়েছিল এবং 'ভিক্ষু যথা ইক্ষু খায় ধরি ধরি চিবায় সমস্ত'— তখন মহাপ্রসাদের ভোজ খুব জমেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মদমত্ততারও অবধি ছিল না। আজ মাথায় হাত দিয়ে ওদের কেউ কেউ ভাবছে, 'এর পুজো আমাদের বংশে সইবে না।' যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছিল তখন সকলেই ভাবছিল, যুদ্ধ মিটলেই অকল্যাণ

মিটবে। যখন মিটল তখন দেখা গেল ঘুরে ফিরে সেই যুদ্ধটাই এসেছে সন্ধিপত্রের মুখোশ পরে। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে যার প্রকাণ্ড লেজটা দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আঁতকে উঠেছিল, আজ লঙ্কাকাণ্ডের গোড়ায় দেখি সেই লেজটার উপর মোড়কে মোড়কে সন্ধিপত্রের স্নেহসিক্ত কাগজ জড়ানো চলেছে; বোঝা যাচ্ছে, ঐটাতে আগুন যখন ধরবে তখন কারোর ঘরের চাল আর বাকি থাকবে না। পশ্চিমের মনীষী লোকেরা ভীত হয়ে বলছেন যে, যে দুর্বুদ্ধি থেকে দুর্ঘটনার উৎপত্তি এত মারের পরেও তার নাড়ী বেশ তাজা আছে। এই দুর্বুদ্ধিরই নাম ন্যাশন্যালিজ্‌ম্‌, দেশের সর্বজনীন আত্মম্ভরিতা। এ হল রিপু, ঐক্যতত্ত্বের উল্টা দিকে অর্থাৎ আপনার দিকটাতেই এর টান। কিন্তু জাতিতে জাতিতে আজ একত্র হয়েছে এই কথাটা যখন অস্বীকার করবার জো নেই, এত বড়ো সত্যের উপর যখন কোনো একটামাত্র প্রবল জাতি আপন সাম্রাজ্যরথ চালিয়ে দিয়ে চাকার তলায় একে ধুলো করে দিতে পারে না, তখন এর সঙ্গে সত্য ব্যবহার করতেই হবে। তখন ঐ রিপুটাকে এর মাঝখানে আনলে শকুনির মতো কপট দ্যূতের ডিপ্লমাসিতে বারে বারে সে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে।

বর্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্তমান যুগের শিক্ষার সংগতি হওয়া চাই। রাষ্ট্রীয় গণ্ডি-দেবতার যারা পূজারি তারা শিক্ষার ভিতর দিয়ে নানা ছুতোয় জাতীয় আত্মম্ভরিতার চর্চা করাকে কর্তব্য মনে করে। জর্মানি একদা শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তার রাষ্ট্রনৈতিক ভেদবুদ্ধির ক্রীতদাসী করেছিল বলে পশ্চিমের অন্যান্য নেশন তার নিন্দা করেছে। পশ্চিমের কোন্‌ বড়ো নেশন এ কাজ করে নি? আসল কথা, জর্মানি সকল বিভাগেই বৈজ্ঞানিক রীতিকে অন্যান্য সকল জাতির চেয়ে বেশি আয়ত্ত করেছে, সেইজন্যে পাকা নিয়মের জোরে শিক্ষাবিধিকে নিয়ে স্বাজাত্যের ডিমে তা দেবার ইনক্যুবেটার যন্ত্র সে বানিয়েছিল। তার থেকে যে বাচ্চা জন্মেছিল দেখা গেছে অন্যদেশী বাচ্চার চেয়ে তার দম অনেক বেশি। কিন্তু তার প্রতিপক্ষ পক্ষীদের ডিমেতেও তা দিয়েছিল সেদিককার শিক্ষাবিধি। আর, আজ ওদের অধিকাংশ খবরের কাগজের প্রধান কাজটা কী? জাতীয় আত্মম্ভরিতার কুশল কামনা করে প্রতিদিন অসত্যপীরের সিন্নি মানা।

স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সার্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে। যে-সকল রিপু যে-সকল চিন্তার অভ্যাস ও আচারপদ্ধতি এর প্রতিকূল তা আগামী কালের জন্যে আমাদের অযোগ্য করে তুলবে। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, কিন্তু আমি একান্ত আগ্রহে ইচ্ছা করি যে, সেই বুদ্ধি যেন কখনো আমাকে এ কথা না ভোলায় যে একদিন আমার দেশে সাধকেরা যে মন্ত্র প্রচার করেছিলেন সে হচ্ছে ভেদবুদ্ধি দূর করবার মন্ত্র। শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ও পারের মানুষ আজ আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে, 'আমাদের কোন্‌ শিক্ষা, কোন্‌ চিন্তা, কোন্‌ কর্মের মধ্যে মোহ প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল যার জন্যে আমাদের আজ এমন নিদারুণ শোক?' তার উত্তর আমাদের দেশ থেকেই দেশে দেশান্তরে পৌঁছুক যে, 'মানুষের একত্বকে তোমরা সাধনা থেকে দূরে রেখেছিলে, সেইটেই মোহ, এবং তার থেকেই শোক।'—

যস্মিন্‌ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্‌ বিজানতঃ
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।

আমরা শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ও পারে মানুষ ব্যাকুল হয়ে বলছে, 'শান্তি চাই।'

এই কথা তাদের জানাতে হবে, শান্তি সেখানেই যেখানে মঙ্গল, মঙ্গল সেখানেই যেখানে ঐক্য। এইজন্য পিতামহেরা বলেছেন : শান্তং শিবমদ্বৈতম্। অদ্বৈতই শান্ত, কেননা অদ্বৈতই শিব। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, সেইজন্যে এই সম্ভাবনার কল্পনাতেও আমার লজ্জা হয় যে, অতীত যুগের যে আবর্জনাভার সরিয়ে ফেলবার জন্যে আজ রুদ্রদেবতার হুকুম এসে পৌঁচেছে এবং পশ্চিমদেশ সেই হুকুমে জাগতে শুরু করেছে আমরা পাছে স্বদেশে সেই আবর্জনার পীঠ স্থাপন করে আজ যুগান্তরের প্রত্যুষেও তামসী পূজাবিধি দ্বারা তা অর্চনা করবার আয়োজন করতে থাকি। যিনি শান্ত, যিনি শিব, যিনি সার্বজাতিক মানবের পরমাশ্রয় অদ্বৈত, তাঁরই ধ্যানমন্ত্র কি আমাদের ঘরে নেই? সেই ধ্যানমন্ত্রের সহযোগেই কি নবযুগের প্রথম প্রভাতরশ্মি মানুষের মনে সনাতন সত্যের উদ্‌বোধন এনে দেবে না?

এইজন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্বপশ্চিমের মিলননিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটতেও চায় না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই। যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, আতিথ্য করতে যার কৃপণতা, সে দীনাত্মা। শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চলবে না, তার অতিথিশালা চাই যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা করে সে ধন্য হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা। দুর্ভাগা ভারতবর্ষে বর্তমান কালে শিক্ষার যত-কিছু সরকারি ব্যবস্থা আছে তার পনেরো-আনা অংশই পরের কাছে বিদ্যাভিক্ষার ব্যবস্থা। ভিক্ষা যার বৃত্তি আতিথ্য করে না বলে লজ্জা করাও তার ঘুচে যায়। সেইজন্যই বিশ্বের আতিথ্য করে না বলে ভারতীয় আধুনিক শিক্ষালয়ের লজ্জা নেই। সে বলে, 'আমি ভিখারি, আমার কাছে আতিথ্যের প্রত্যাশা কারো নেই।' কে বলে নেই? আমি তো শুনেছি পশ্চিমদেশ বারম্বার জিজ্ঞাসা করছে, 'ভারতের বাণী কই?' তার পর সে যখন আধুনিক ভারতের দ্বারে এসে কান পাতে তখন বলে, 'এ তো সব আমারই বাণীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যেন ব্যঙ্গের মতো শোনাচ্ছে।' তাই তো দেখি, আধুনিক ভারত যখন ম্যাক্‌স্‌-ম্যুলরের পাঠশালা থেকে বাহির হয়েই আর্যসভ্যতার দম্ভ করতে থাকে তখন তার মধ্যে পশ্চিম গড়ের বাদ্যের কড়িমধ্যম লাগে, আর পশ্চিমকে যখন সে প্রবল ধিক্কারের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে তখনো তার মধ্যে সেই পশ্চিম রাগেরই তারসপ্তকের নিখাদ তীব্র হয়ে বাজে।

আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্বভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি, কিন্তু তার সাধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর-মহলে তার আসন পড়বে। কিন্তু আমি বলি, এই মানসম্মানের কথা এও বাহিরের, একেও উপেক্ষা করা চলে। এই কথাই বলবার কথা যে, সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে; কোনো সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তা হলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব; নবযুগের উদ্‌বোধন করে আমরা জরামুক্ত হব। আমাদের শিক্ষালয়ের সেই

শিক্ষামন্ত্রটি এই—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

আশ্বিন ১৩২৮

বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ

অপরিচিত আসনে অনভ্যস্ত কর্তব্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে আহ্বান করেছেন। তার প্রত্যুত্তরে আমি আমার সাদর অভিবাদন জানাই।

এই উপলক্ষে নিজের ন্যূনতা-প্রকাশ হয়তো শোভন রীতি। কিন্তু প্রথার এই অলংকারগুলি বস্তুত শোভন নয়, এবং তা নিষ্ফল। কর্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করার উপক্রমেই আগে থাকতে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখলে সাধারণের মন অনুকূল হতে পারে, এই ব্যর্থ আশার ছলনায় মনকে ভোলাতে চাই নে। ক্ষমা প্রার্থনা করলেই অযোগ্যতার ত্রুটি সংশোধন হয় না, তাতে কেবল ত্রুটি স্বীকার করাই হয়। যাঁরা অকরুণ তাঁরা সেটাকে বিনয় বলে গ্রহণ করেন না, আত্মগ্লানি বলেই গণ্য করেন।

যে কর্মে আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার সম্বল কী আছে তা কারো অগোচর নেই। অতএব ধরে নিতে পারি, কর্মটি আমার যে উপযুক্ত সে বিচার কর্তৃপক্ষদের দ্বারা পূর্বেই হয়ে গেছে।

এই ব্যবস্থার মধ্যে কিছু নূতনত্ব আছে—তার থেকে অনুমান করা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্প্রতি কোনো-একটি নূতন সংকল্পের সূচনা হয়েছে। হয়তো মহৎ তার গুরুত্ব। এইজন্য সুস্পষ্টরূপে তাকে উপলব্ধি করা চাই।

বহুকাল থেকে কোনো-একটি বিশেষ পরিচয়ে আমি সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে দিন কাটিয়েছি। আমি সাহিত্যিক; অতএব, সাহিত্যিকরূপেই আমাকে এখানে আহ্বান করা হয়েছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। সাহিত্যিকের পদবী আমার পক্ষে নিরুদ্‌বেগের বিষয় নয়, বহু দিনের কঠোর অভিজ্ঞতায় সে আমি নিশ্চিত জানি। সাহিত্যিকের সমাদর রুচির উপরে নির্ভর করে, যুক্তিপ্রমাণের উপর নয়। এ ভিত্তি কোথাও কাঁচা, কোথাও পাকা, কোথাও কুটিল; সর্বত্র এ সমান ভার সয় না। তাই বলি কবির কীর্তি কীর্তিস্তম্ভ নয়, সে কীর্তিতরণী। আবর্ত-সংকুল বহুদীর্ঘ কালস্রোতের সকল পরীক্ষা সকল সংকট উত্তীর্ণ হয়েও যদি তার এগিয়ে চলা বন্ধ না হয়, অন্তত নোঙর করে থাকবার একটা ভদ্র ঘাট যদি সে পায়, তবেই সাহিত্যের পাকা খাতায় কোনো-একটা বর্গে তার নাম চিহ্নিত হতে পারে। ইতিমধ্যে লোকের মুখে মুখে নানা অনুকূল প্রতিকূল বাতাসের আঘাত খেতে খেতে তাকে ঢেউ কাটিয়ে চলতে হবে। মহাকালের বিচারদরবারে চূড়ান্ত শুনানির দাম ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘটে না, বৈতরণীর পরপারে তাঁর বিচারসভা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্বানের আসন চিরপ্রসিদ্ধ। সেই পাণ্ডিত্যের গৌরবগম্ভীর পদে সহসা সাহিত্যিককে বসানো হল। সুতরাং এই রীতিবিপর্যয় অত্যন্ত বেশি করে চোখে পড়বার বিষয় হয়েছে। এরকম বহুতীক্ষ্ণদৃষ্টিসংকুল কুশাঙ্কুরিত পথে সহজে চলাফেরা করা আমার চেয়ে অনেক শক্ত মানুষের পক্ষেও দুঃসাধ্য। আমি যদি পণ্ডিত হতুম তবে নানা লোকের সম্মতি-অসম্মতির দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও পথের বাধা

কঠোর হত না। কিন্তু স্বভাবতই এবং অভ্যাসবশতই আমার চলন অব্যবসায়ীর চালে। বাহির থেকে আমি এসেছি আগন্তুক, এইজন্য প্রশ্রয় প্রত্যাশা করতে আমার ভরসা হয় না।

অথচ আমাকে নির্বাচন করার মধ্যেই আমার সম্বন্ধে একটি অভয়পত্রী প্রচ্ছন্ন আছে, সেই আশ্বাসের আভাস পূর্বেই দিয়েছি। নিঃসন্দেহ আমি এখানে চলে এসেছি কোনো-একটি ঋতুপরিবর্তনের মুখে। পুরাতনের সঙ্গে আমার অসংগতি থাকতে পারে, কিন্তু নূতন বিধানের নবোদ্যম হয়তো আমাকে তার আনুচর্যে গ্রহণ করতে অপ্রসন্ন হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রে প্রথম-পদার্পণ-কালে এই কথাটির আলোচনা করে অন্যের কাছে না হোক, অন্তত নিজের কাছে বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলার প্রয়োজন আছে। অতএব, আমাকে জড়িত করে যে ব্রতটির উপক্রম হল তার ভূমিকা এখানে স্থির করে নিই।

বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র। সাধারণভাবে বলা চলে, সে সাধনা বিদ্যার সাধনা। কিন্তু তা বললে কথাটা সুনির্দিষ্ট হয় না; কেননা বিদ্যা শব্দের অর্থ ব্যাপক এবং তার সাধনা বহুবিচিত্র।

এ দেশে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ আকার প্রকার ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসেই তার মূল নিহিত। এই উপলক্ষে তার বিস্তারিত বিচার অসংগত হবে না। বাল্যকাল হতে যাঁরা এই বিদ্যালয়ের নিকট-সংস্রবে আছেন তাঁরা আপন অভ্যাস ও মমত্বের বেষ্টনী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একে বৃহৎ কালের পরিপ্রেক্ষণিকায় দেখতে হয়তো কিছু বাধা পেতে পারেন। সামীপ্যের এবং অভ্যাসের সম্বন্ধ না থাকাতে আমার পক্ষে সেই ব্যক্তিগত বাধা নেই; অতএব আমার অসংসক্ত মনে এর স্বরূপ কিরকম প্রতিভাত হচ্ছে সেটা সকলের পক্ষে স্বীকার করবার যোগ্য না হলেও বিচার করবার যোগ্য।

বলা বাহুল্য, য়ুরোপীয় ভাষায় যাকে য়ুনিভার্সিটি বলে প্রধানত তার উদ্ভব য়ুরোপে। অর্থাৎ য়ুনিভার্সিটির যে চেহারার সঙ্গে আমাদের আধুনিক পরিচয় এবং যার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষিতসমাজের ব্যবহার সেটা সমূলে ও শাখা-প্রশাখায় বিলিতি। আমাদের দেশের অনেক ফলের গাছকে আমরা বিলিতি বিশেষণ দিয়ে থাকি, কিন্তু দিশি গাছের সঙ্গে তাদের কুলগত প্রভেদ থাকলেও প্রকৃতিগত ভেদ নেই। আজ পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সে কথা সম্পূর্ণ বলা চলবে না। তার নামকরণ, তার রূপকরণ, এ দেশের সঙ্গে সংগত নয়; এ দেশের আব-হাওয়ায় তার স্বভাবীকরণও ঘটে নি।

অথচ এই য়ুনিভার্সিটির প্রথম প্রতিরূপ একদিন ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছিল। নালন্দা বিক্রমশিলা তক্ষশিলার বিদ্যায়তন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নিশ্চিত কালনির্ণয় এখনো হয় নি, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, য়ুরোপীয় য়ুনি-ভার্সিটির পূর্বেই তাদের আবির্ভাব। তাদের উদ্ভব ভারতীয় চিত্তের আন্তরিক প্রেরণায়, স্বভাবের অনিবার্য আবেগে। তার পূর্ববর্তী কালে বিদ্যার সাধনা ও শিক্ষা বিচিত্র আকারে ও বিবিধ প্রণালীতে দেশে নানা স্থানে ব্যাপ্ত হয়েছিল, এ কথা সুনিশ্চিত। সমাজের সেই সর্বত্র-পরিকীর্ণ সাধনাই পুঞ্জীভূত কেন্দ্রীভূত রূপে এক সময়ে স্থানে স্থানে দেখা দিল।

এর থেকে মনে পড়ে ভারতবর্ষে বেদব্যাসের যুগ, মহাভারতের কাল। দেশে যে বিদ্যা, যে মননধারা, যে ইতিহাসকথা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল, এমন-কি দিগন্তের

কাছে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেছে, এক সময়ে তাকে সংগ্রহ করা তাকে সংহত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে। নিজের চিৎপ্রকর্ষের যুগব্যাপী ঐশ্বর্যকে সুস্পষ্টরূপে নিজের গোচর করতে না পারলে তা ক্রমশ অনাদরে অপরিচয়ে জীর্ণ হয়ে বিলুপ্ত হয়। কোনো-এক কালে এই আশঙ্কায় দেশ সচেতন হয়ে উঠেছিল; দেশ একান্ত ইচ্ছা করেছিল, আপন সূত্রচ্ছিন্ন রত্নগুলিকে উদ্ধার করতে, সংগ্রহ করতে, তাকে সূত্রবদ্ধ করে সমগ্র করতে এবং তাকে সর্ব-লোকের ও সর্বকালের ব্যবহারে উৎসর্গ করতে। দেশ আপন বিরাট চিন্ময়ী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষরূপে সমাজে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করতে উৎসুক হয়ে উঠল। যা আবদ্ধ ছিল বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতের অধিকারে তাকেই অনবচ্ছিন্নরূপে সর্বসাধারণের আয়ত্তগোচর করবার এই এক আশ্চর্য অধ্যবসায়। এর মধ্যে একটি প্রবল চেষ্টা, অক্লান্ত সাধনা, একটি সমগ্রদৃষ্টি ছিল। এই উদ্যোগের মহিমাকে শক্তিমতী প্রতিভা আপন লক্ষ্যীভূত করেছিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারত নামটিতেই। মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বল রূপ যাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন 'মহাভারত' নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমণ্ডলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকে দেখেছিলেন তাঁরা মনে। সেই বিশ্বদৃষ্টির প্রবল আনন্দে তাঁরা ভারতবর্ষে চিরকালের শিক্ষার প্রশস্ত ভূমি পত্তন করে দিলেন। সে শিক্ষা ধর্মে কর্মে রাজনীতিতে সমাজনীতিতে তত্ত্বজ্ঞানে বহুব্যাপক। তার পর থেকে ভারতবর্ষ আপন নিষ্ঠুর ইতিহাসের হাতে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছে, তার মর্মগ্রন্থি বারবার বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে, দৈন্য এবং অপমানে সে জর্জর, কিন্তু ইতিহাসবিস্মৃত সেই যুগের সেই কীর্তি এতকাল লোকশিক্ষার অবাধ জলসেক-প্রণালীকে নানা ধারায় পূর্ণ ও সচল করে রেখেছে। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তার প্রভাব আজও বিরাজমান। সেই মূল প্রস্রবণ থেকে এই শিক্ষার ধারা যদি নিরন্তর প্রবাহিত না হত তা হলে দুঃখে দারিদ্র্যে অসম্মানে দেশ বর্বরতার অন্ধকূপে মনুষ্যত্ব বিসর্জন করত। সেইদিন ভারতবর্ষে যথার্থ আপন সজীব বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি। তার মধ্যে জীবনীশক্তির বেগ যে কত প্রবল তা স্পষ্টই বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই সমুদ্রপারে জাভাদ্বীপে সর্বসাধারণের সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত করে কী-একটি কল্পলোকের সৃষ্টি সে করেছে; এই আর্যেতর জাতির চরিত্রে, তার কল্পনায়, তার রূপরচনায় কিরকম সে নিরন্তর সক্রিয়।

জ্ঞানের একটা দিক আছে, তা বৈষয়িক। সে রয়েছে জ্ঞানের বিষয় সংগ্রহ করবার লোভকে অধিকার করে, সে উত্তেজিত করে পাণ্ডিত্যের অভিমানকে। এই কৃপণের ভাণ্ডারের অভিমুখে কোনো মহৎ প্রেরণা উৎসাহ পায় না। ভারতে এই-যে মহাভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-যুগের উল্লেখ করলেম সেই যুগের মধ্যে তপস্যা ছিল; তার কারণ, ভাণ্ডারপূরণ তার লক্ষ্য ছিল না; তার উদ্দেশ্য ছিল সর্বজনীন চিত্তের উদ্দীপন, উদ্‌বোধন, চারিত্রসৃষ্টি। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের যে আদর্শ জ্ঞানে কর্মে হৃদয়ভাবে ভারতের মনে উদ্ভাসিত হয়েছিল এই উদ্যোগ তাকেই সঞ্চারিত করতে চেয়েছিল চিরদিনের জন্য সর্বসাধারণের জীবনের মধ্যে, তার আর্থিক ও পারমার্থিক সদ্‌গতির দিকে, কেবলমাত্র তার বুদ্ধিতে নয়।

নালন্দা বিক্রমশিলার বিদ্যায়তন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সে যুগে সে বিদ্যার মহৎমূল্য দেশের লোক গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল; তাকে সমগ্র সম্পূর্ণতায় কেন্দ্রীভূত করে সর্বজনীন জ্ঞানসত্র রচনা করবার ইচ্ছা স্বতই ভারত-বর্ষের মনে সমুদ্যত হয়েছিল সন্দেহ নেই। ভগবান বুদ্ধ একদিন যে ধর্ম প্রচার

করেছিলেন সে ধর্ম তার নানা তত্ত্ব, নানা অনুশাসন, তার সাধনার নানা প্রণালী নিয়ে সাধারণচিত্তের আন্তর্ভৌম স্তরে প্রবেশ করে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তখন দেশ প্রবলভাবে কামনা করেছিল এই বহুশাখায়িত পরিব্যাপ্ত ধারাকে কোনো কোনো সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রস্থলে উৎসরূপে উৎসারিত করে দিতে সর্বসাধারণের স্নানের জন্য, পানের জন্য, কল্যাণের জন্য।

এই ইচ্ছাটি যে কিরকম সত্য ছিল, কিরকম উদার, কিরকম বেগবান ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই, এর অকৃপণ ঐশ্বর্যে। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বিস্ময়োচ্ছ্বাসিত ভাষায় এই বিদ্যানিকেতনের বর্ণনা করেছেন। তাঁর লেখনীচিত্রে দেখতে পাই এর অলংকরণরেখায়িত শুক্তিরক্ত স্তম্ভশ্রেণী, এর অভ্রভেদী হর্ম্যশিখর, ধূপসুগন্ধি মন্দির, ছায়ানিবিড় আম্রবন, নীলপদ্মে-প্রফুল্ল গভীর সরোবর। তিনটি বড়ো বড়ো বাড়িতে এখানকার গ্রন্থাগার ছিল; তাদের নাম রত্নসাগর, রত্নোদধি, রত্নরঞ্জক। রত্নোদধি নয়-তলা; সেইখানে প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ রক্ষিত ছিল। বহু রাজা পরে পরে এই সংঘের বিস্তারসাধন করেছেন; চারি দিকে উন্নত চৈত্য উঠেছে, সেই চৈত্যগুলির মধ্যে মধ্যে শিক্ষাভবন, তর্কসভাগৃহ, প্রত্যেক সরোবরের চারি দিকে বেদী ও মন্দির; স্থানে স্থানে শিক্ষক ও প্রচারকদের জন্যে চারতলা বাসস্থান। এখানকার গৃহনির্মাণে কিরকম সযত্ন সতর্কতা সেই প্রসঙ্গে ডাক্তার স্পুনার বলেন, আধুনিক কালে যে রকমের ইঁট ও গাঁথুনি প্রচলিত এখানকার গৃহনির্মাণের উপকরণ ও যোজনাপদ্ধতি তার চেয়ে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। ইৎসিঙ বলেন, এই বিদ্যালয়ের প্রয়োজন-নির্বাহের জন্য দুই শতের অধিক গ্রাম উৎসর্গ করা হয়েছে: বহুসহস্র ছাত্র ও অধ্যাপকের জীবিকার উপযুক্ত ভোজ্য প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে গ্রামের অধিবাসীরা নিয়মিত জুগিয়ে থাকে।

এই বিদ্যায়তনগুলির মধ্যে, শুধু বিদ্যার সঞ্চয় মাত্র নয়, বিদ্যার গৌরব ছিল প্রতিষ্ঠিত। যে-সকল আচার্য অধ্যাপক ছিলেন, হিউয়েন সাঙ বলেন, তাঁদের যশ বহুদূরব্যাপী; তাঁদের চরিত্র পবিত্র, অনিন্দনীয়। তাঁরা সদ্ধর্মের অনুশাসন অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেন। অর্থাৎ যে বিদ্যা প্রচারের ভার ছিল তাঁদের 'পরে সমস্ত দেশ এবং দূরদেশের ছাত্রেরা তাকে সম্মান করত; সেই সম্মানকে উজ্জ্বল করে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল তাঁদের 'পরে—কেবল মেধা দ্বারা নয়, বহু-শ্রুতের দ্বারা নয়, চরিত্রের দ্বারা, অস্খলিত কঠোর তপস্যার দ্বারা। এটা সম্ভব হতে পেরেছিল, কেননা সমস্ত দেশের শ্রদ্ধা এই সাত্ত্বিক আদর্শ তাঁদের কাছে প্রত্যাশা করেছে। আচার্যেরা জানতেন, দূর দূর দেশকে জ্ঞানবিতরণের মহৎ ভার তাঁদের 'পরে; সমুদ্র পর্বত পার হয়ে, প্রাণপণ কঠিন দুঃখ স্বীকার করে, বিদেশের ছাত্রেরা আসছে তাঁদের কাছে জ্ঞানপিপাসায়। এইভাবে বিদ্যার 'পরে সর্বজনীন শ্রদ্ধা থাকলে যাঁরা বিদ্যা বিতরণ করেন আপন যোগ্যতা সম্বন্ধে শৈথিল্য তাঁদের পক্ষে সহজ হয় না। সমস্ত দেশের কলাপ্রতিভাও আপন শ্রদ্ধার অর্ঘ্য এখানে পূর্ণ শক্তিতে নিবেদন করেছিল। সেই উপলক্ষে দেশ আপন শিল্পরচনার উৎকর্ষ এই বিদ্যামন্দিরের ভিত্তিতে ভিত্তিতে মিলিত করেছে, ঘোষণা করেছে; ভারতের কলা-বিদ্যা ভারতের বিশ্ববিদ্যাকে প্রণাম করেছে।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা চাই, তখনকার রাজাদের প্রাসাদভবন বা ভোগের স্থান কোনো বিশেষ সমারোহে ইতিহাসের স্মৃতিকে অধিকারচেষ্টা করেছিল, তার প্রমাণ পাই নে। এই চেষ্টা যে নিন্দনীয় তা বলি নে: কেননা

সাধারণত দেশ আপন ঐশ্বর্যগৌরব প্রকাশ করবার উপলক্ষ রচনা করে আপন নৃপতিকে বেষ্টন করে, সমস্ত প্রজার আত্মসম্মান সেইখানে কলানৈপুণ্যে শোভা-প্রাচুর্যে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যে কারণেই হোক, অতীত ভারতবর্ষের সেই চেষ্টাকে আমরা আজ দেখতে পাই নে। হয়তো রাজাসনের ধ্রুবত্ব ছিল না বলেই সেখানে ক্রমাগতই ধ্বংসধূমকেতুর সম্মার্জনী কাজ করেছে। কিন্তু নালন্দা বিক্রমশিলা প্রভৃতি স্থানে স্মৃতিরক্ষাচেষ্টার বিরাম ছিল না। তার প্রতি দেশের ভক্তি, দেশের বেদনা যে কত প্রবল ছিল এই তার একটি প্রমাণ।

আপন সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যার প্রতি সর্বজনের যে উদার শ্রদ্ধা প্রভূতত্যাগস্বীকারে অকুণ্ঠিত সেই অকৃত্রিম শ্রদ্ধাই ছিল স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ প্রাণ-উৎস।

এ কথা সহজেই কল্পনা করা যায় যে, জ্ঞানসাধনার এই-সকল বিরাট যজ্ঞভূমিতে মানুষের মনের সঙ্গে মনের কিরকম অতি বৃহৎ ও নিবিড় সংঘর্ষ চলেছিল, তাতে ধীশক্তির বহ্নিশিখা কিরকম নিরন্তর প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকত। ছাপানো টেক্‌স্‌ট্‌বুক্‌ থেকে নোট দেওয়া নয়, অন্তর থেকে অন্তরে অবিশ্রাম উদ্যম সঞ্চার করা। বিদ্যায় বুদ্ধিতে জ্ঞানে দেশের যাঁরা সুধীশ্রেষ্ঠ দূর দূরান্তর থেকে এখানে তাঁরা সম্মিলিত। ছাত্রেরাও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শ্রদ্ধাবান্‌, সুযোগ্য; দ্বারপণ্ডিতের কাছে কঠিন পরীক্ষা দিয়ে তবে তারা পেয়েছে প্রবেশের অধিকার। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, এই পরীক্ষায় দশ জনের মধ্যে অন্তত সাত-আট জন বর্জিত হত। অর্থাৎ তৎকালীন ম্যাট্রিকুলেশনের যে ছাঁকনি ছিল তাতে মোটা মোটা ফাঁক ছিল না। তার কারণ, সমস্ত পৃথিবীর হয়ে আদর্শকে বিশুদ্ধ ও উন্নত রাখবার দায়িত্ব ছিল জাগরূক। লোকের মনে উদ্‌বেগ ছিল, পাছে অযথা প্রশ্রয়ের দ্বারা বিদ্যার অধঃপতনে দেশের পক্ষে মানসিক আত্মঘাত ঘটে। নানা প্রকৃতির মন এখানে এক জায়গায় সমবেত হত; তারা একজাতীয় নয়, একদেশীয় নয়। এক লক্ষ্য দৃঢ় রেখে এক জীবিকাব্যবস্থায় তারা পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ঐক্য লাভ করেছিল। বিদ্যার সম্মিলনক্ষেত্রে এই ঐক্যের মূল্য যে কতখানি তাও মনে রাখা চাই। তখন পৃথিবীর আরো নানা স্থানে বড়ো বড়ো সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল; কিন্তু, জ্ঞানের তপস্যা-উপলক্ষে মানবমনের এমন বিশাল সমবায় আর কোথাও শোনা যায় নি। এর মূল কারণ, বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা, বিদ্যার প্রতি গৌরববোধ, চিত্ত-সম্পদ যাঁরা নিজে পেয়েছেন বা সৃষ্টি করেছেন সেই পাওয়ার ও সৃষ্টির পরম আনন্দে সেই সম্পদ দেশবিদেশের সকলকে দান করবার একাগ্র দায়িত্বজ্ঞান। আজ নিজের প্রতি, মানুষের প্রতি, নিজের সাধনার প্রতি, আলস্যবিজড়িত অশ্রদ্ধার দিনে বিশেষ করে আমাদের মনে করবার সময় এসেছে যে, মানব-ইতিহাসে সর্বাগ্রে ভারতবর্ষেই জ্ঞানের বিশ্বদানযজ্ঞ উদার দাক্ষিণ্যের সঙ্গে প্রবর্তিত হয়েছিল। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আরো-একটি কথা আমাদের মনে রাখবার যোগ্য, নালন্দায় হিউয়েন সাঙের যিনি গুরু ছিলেন তিনি ছিলেন বাঙালি, তাঁর নাম শীলভদ্র। তিনি বাংলাদেশের কোনো-এক স্থানের রাজা ছিলেন, রাজ্য ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। এই সংঘে যাঁরা শিক্ষাদান করতেন তাঁদের সকলের মধ্যে একলা কেবল ইনিই সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

সেকালে বৌদ্ধভারতে সংঘ ছিল নানা স্থানে। সেই-সকল সংঘে সাধকেরা শাস্ত্রজ্ঞেরা তত্ত্বজ্ঞানীরা শিষ্যেরা সমবেত হয়ে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়ে রাখতেন, বিদ্যার পুষ্টিসাধন করতেন। নালন্দা বিক্রমশিলা তাদেরই বিশ্বরূপ, তাদেরই স্বাভাবিক পরিণতি।

উপনিষদের কালেও ভারতবর্ষে এইরকম বিদ্যাকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছিল, তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু পাঞ্চালদেশের 'পরিষদ্'এ জৈবালি প্রবাহণের কাছে এসেছিলেন। এই স্থানটি আলোচনা করলে বোঝা যায়, ঐ পরিষদ ঐ দেশের বড়ো বড়ো জ্ঞানীদের সমবায়ে। এই পরিষদ জয় করতে পারলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ হত। অনুমান করা যায় যে, সমস্ত পাঞ্চালদেশের মধ্যে উচ্চতম শিক্ষার উদ্দেশে সম্মিলিতভাবে একটা প্রতিষ্ঠান ছিল, বিদ্যার পরীক্ষা দেবার জন্যে সেখানে অন্যত্র থেকে লোক আসত। উপনিষদ্-কালের বিদ্যা যে স্বভাবতই স্থানে স্থানে শিক্ষা-আলোচনা তর্কবিতর্ক ও জ্ঞানসংগ্রহের জন্য আপন আশ্রয়রূপে পরিষদ্ রচনা করেছিল, তা নিশ্চিত অনুমান করা যেতে পারে।

য়ুরোপের ইতিহাসেও সেইরকম ঘটেছে। সেখানে খৃস্টধর্মের আরম্ভকালে পুরাতন ধর্মের সঙ্গে নূতন ধর্মের দ্বন্দ্ব এবং নিষ্ঠুর উৎপীড়নের দ্বারা নব-দীক্ষিতদের ভক্তির পরীক্ষা চলেছিল। অবশেষে ক্রমে যখন এই ধর্ম সাধারণ্যে স্বীকৃত হল তখন স্বভাবতই পূজার ধারার পাশেপাশেই তত্ত্বের ধারা প্রবাহিত হল। বাঁধ যদি বেঁধে না দেওয়া যায় তবে ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ প্রকৃতির প্ররোচনায় ভক্তির বিষয় বিচিত্র রূপ ও বিকৃত রূপ নিতে থাকে। তখন তর্ক অবলম্বন করে বিচারের প্রয়োজন হয়। বিশ্বাস তখন বুদ্ধির সাহায্যে, জ্ঞানের সাহায্যে আপন স্থায়ী ও বিশুদ্ধ ভিত্তির সন্ধান করে। তখন তার প্রশ্ন ওঠে : কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। ভক্তি তখন কেবলমাত্র পূজার বিষয় না হয়ে বিদ্যার বিষয় হয়ে ওঠে। এইরকম অবস্থায় য়ুরোপের নানা স্থানে আচার্য ও ছাত্রদের সংঘ সৃষ্টি হচ্ছিল। তার মধ্যে থেকে নির্বাচনের দরকার হল। কোথায় শিক্ষা শ্রদ্ধেয়, কোথায় তা প্রামাণিক, তা স্থির করবার ভার নিলে রোমের প্রধান ধর্মসংঘ, তারই সঙ্গে রাজার শাসন ও উৎসাহ।

সকলেই জানেন, সে সময়কার আলোচ্য বিদ্যায় প্রধান স্থান ছিল তর্কশাস্ত্রের। তখনকার পণ্ডিতেরা জানতেন, ডায়েলেক্‌টিক সকল বিজ্ঞানের মূলবিজ্ঞান। এর কারণ স্পষ্টই বোঝা যায়। শাস্ত্রের উপদেশগুলি বাক্যের দ্বারা বদ্ধ। সেই-সকল আপ্তবাক্যের অবিসম্বাদিত অর্থে পৌঁছতে গেলে শাব্দিক তর্কের প্রয়োজন হয়। য়ুরোপের মধ্যযুগে সেই তর্কের যুক্তিজাল যে কিরকম সূক্ষ্ম ও জটিল হয়ে উঠেছিল তা সকলেরই জানা আছে। শাস্ত্রজ্ঞানের বিশুদ্ধতার জন্য এই ন্যায়শাস্ত্র। সমাজরক্ষার জন্য আর দুটি বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন, আইন এবং চিকিৎসা। তখনকার য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই কয়টি বিদ্যাকেই প্রধানত গ্রহণ করেছিল। নালন্দাতে বিশেষভাবে শিক্ষার বিষয় ছিল হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শব্দবিদ্যা। তার সঙ্গে ছিল তন্ত্র।

ইতিমধ্যে য়ুরোপে মানুষের অন্তর ও বাহিরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার য়ুনিভার্সিটিতে মস্ত দুটি মূলগত পরিবর্তন ঘটেছে। ধর্মশাস্ত্রের প্রতি সেখানকার মনুষ্যত্বের ঐকান্তিক যে নির্ভর ছিল সেটা ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে এল। একদিন সেখানে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রের প্রায় সমস্তটা ধর্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অন্তর্গত না হোক, অন্তত শাসনগত ছিল। লড়াই করতে করতে অবশেষে সেই অধিকারের কর্তৃত্বভার তার হাত থেকে স্খলিত হয়েছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে যেখানে শাস্ত্রবাক্যের বিরোধ সেখানে শাস্ত্র আজ পরাভূত, বিজ্ঞান আজ আপন স্বতন্ত্র বেদিতে একেশ্বর-রূপে প্রতিষ্ঠিত। ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়

বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতির অনুগত হয়ে ধর্মশাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞাতব্য ও মন্তব্য বিষয় সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রবণতা আজ বৈজ্ঞানিক। আপ্তবাক্যের মোহ তার কেটে গেছে।

এইসঙ্গে আর-একটা বড়ো পরিবর্তন ঘটেছে ভাষা নিয়ে। একদিন লাটিন ভাষাই ছিল সমস্ত য়ুরোপের শিক্ষার ভাষা, বিদ্যার আধার। তার সুবিধা এই ছিল, সকল দেশের ছাত্রই এক পরিবর্তনহীন সাধারণভাষার যোগে শিক্ষালাভ করতে পারত। কিন্তু তার প্রধান ক্ষতি ছিল এই যে, বিদ্যার আলোক পাণ্ডিত্যের ভিত্তিসীমা এড়িয়ে বাইরে অতি অল্পই পৌঁছত। যখন থেকে য়ুরোপের প্রত্যেক জাতিই আপন আপন ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করলে তখন শিক্ষা ব্যাপ্ত হল সর্বসাধারণের মধ্যে। তখন বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত দেশের চিত্তের সঙ্গে অন্তরঙ্গরূপে যুক্ত হল। শুনতে কথাটা স্বতোবিরুদ্ধ, কিন্তু সেই ভাষাস্বাতন্ত্র্যের সময় থেকেই সমস্ত য়ুরোপে বিদ্যার যথার্থ সমবায়সাধন হয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্য য়ুরোপের চিৎপ্রকর্ষকে খণ্ডিত না করে আশ্চর্যরূপে সম্মিলিত করেছে। য়ুরোপে এই স্বদেশী ভাষায় বিদ্যার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানের ঐশ্বর্য বেড়ে উঠল, ব্যাপ্ত হল সমস্ত প্রজার মধ্যে, যুক্ত হল প্রতিবেশী ও দূরবাসীদের জ্ঞানসাধনার সঙ্গে, স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের সমস্ত শস্য সংগৃহীত হল য়ুরোপের সাধারণ ভাণ্ডারে। এখন সেখানে য়ুনিভর্সিটি যেমন উদারভাবে সকল দেশের তেমনি একান্তভাবে আপন দেশের। এইটিই হচ্ছে মানুষের প্রকৃতির অনুগত। কারণ, মানুষ যদি সত্যভাবে নিজেকে উপলব্ধি না করে তা হলে সত্যভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে না। বিশ্বজনীনতার দাক্ষিণ্য বাস্তব হতে পারে না সেইসঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উৎকর্ষ যদি বাস্তব না হয়। এসিয়ার মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মকে তিব্বত চীন মঙ্গোলিয়া গ্রহণ করেছিল, কিন্তু গ্রহণ করেছিল নিজের ভাষাতেই। এইজন্যেই সে-সকল দেশে সে ধর্ম সর্বজনের অন্তরের সামগ্রী হতে পেরেছে, এক-একটি সমগ্র জাতিকে মানুষ করেছে, তাকে মোহান্ধকার থেকে উদ্ধার করেছে।

য়ুনিভর্সিটির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। আমার বলবার মোট কথাটি এই যে, বিশেষ দেশ, বিশেষ জাতি যে বিদ্যার সম্বন্ধে বিশেষ প্রীতি গৌরব ও দায়িত্ব অনুভব করেছে তাকেই রক্ষা ও প্রচারের জন্যে স্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সৃষ্টি। যে ইচ্ছা সকল সৃষ্টির মূলে, সমস্ত দেশের সেই ইচ্ছাশক্তির থেকেই তার উদ্ভব। এই ইচ্ছার মূলে থাকে শক্তির ঐশ্বর্য। সেই ঐশ্বর্য দাক্ষিণ্য দ্বারা নিজেকে স্বতই প্রকাশ করতে চায়; তাকে নিবারণ করা যায় না।

সমস্ত সভ্যদেশ আপন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জ্ঞানের অবারিত আতিথ্য করে থাকে। যার সম্পদে উদ্‌বৃত্ত আছে সেই ডাকে অতিথিকে। গৃহস্থ আপন অতিথিশালায় বিশ্বকে স্বীকার করে। নালন্দায় ভারত আপন জ্ঞানের অন্নসত্র খুলেছিল স্বদেশীবিদেশের সকল অভ্যাগতের জন্য। ভারত সেদিন অনুভব করেছিল, তার এমন সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে সকল মানুষকে দিতে পারলে তবেই যার চরম সার্থকতা। পাশ্চাত্ত্য মহাদেশের অধিকাংশ দেশেই বিদ্যার এই অতিথিশালা বর্তমান। সেখানে স্বদেশী-বিদেশীর ভেদ নেই। সেখানে জ্ঞানের বিশ্বক্ষেত্রে সব মানুষই পরস্পর আপন। সমাজের আর-আর প্রায় সকল অংশেই ভেদের প্রাচীর প্রতিদিন দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠছে; কেবল মানুষের আমন্ত্রণ রইল জ্ঞানের এই মহাতীর্থে। কেননা এইখানে দৈন্যস্বীকার, এইখানে কৃপণতা, ভদ্র-

জাতির পক্ষে সকলের চেয়ে আত্মলাঘব। সৌভাগ্যবান দেশের প্রাঙ্গণ এইখানে বিশ্বের দিকে উন্মুক্ত।

আমাদের দেশে য়ুনিভর্সিটির পত্তন হল বাহিরের দানের থেকে। সে দানে দাক্ষিণ্য অধিক নেই। তার রাজানুচিত কৃপণতা থেকে আজ পর্যন্ত দুঃখ পাচ্ছি। ইংরেজের দেশে রাজদ্বারে যে অতিথিশালা খোলা আছে লন্ডন য়ুনিভর্সিটিতে, এ দেশের দরিদ্রপাড়ায় তারই একটা ছোটো শাখা স্থাপন হল। ভারতীয় বিদ্যা বলে কোনো-একটা পদার্থ যে কোথাও আছে এই বিদ্যালয়ে গোড়াতেই তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এর স্বভাবটা পৃথিবীর সকল য়ুনিভর্সিটির একেবারে বিপরীত। এর দানের বিভাগ অবরুদ্ধ, কেবল গ্রহণের বিভাগ আপন ক্ষুধিত কবল উদ্ঘাটিত করে আছে। তাতে গ্রহণের কাজও ঠিকমত ঘটে না। কেননা, যেখানে দেওয়া-নেওয়ার চলাচল নেই সেখানে পাওয়াটাই থাকে অসম্পূর্ণ।

আধুনিক কালে জীবনযাত্রা সকল দিকেই জটিল। নূতন নূতন নানা সমস্যার আলোড়নে মানুষের মন সর্বদাই উৎক্ষুব্ধ। নিয়ত তার নানা প্রশ্নের নানা উত্তর, তার নানা বেদনার নানা প্রকাশ সমাজে তরঙ্গিত, সাহিত্যে বিচিত্র ভঙ্গিতে আবর্তিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা যুগের ধ্রুব আদর্শগুলি যেমন মনের সামনে বিধৃত, সঞ্চিত, তেমনি প্রচলিত সাহিত্যে প্রকাশ পাচ্ছে প্রবহমান চিত্তের লীলাচাঞ্চল্য। পাশ্চাত্ত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহিরের এই চিত্তমথনের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের শিক্ষার এই দুই ধারা সেখানে গঙ্গাযমুনার মতো মেলে। কেননা সেখানে সমস্ত দেশের একই চিত্ত তার বিদ্যাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি করে তুলছে, পৃথিবীর সৃষ্টিকার্য যেমন জলে স্থলে উভয়তই সক্রিয়।

এ সংবাদ বোধ হয় সকলেই জানেন যে, বর্তমান কালের সঙ্গে পদক্ষেপ মিলিয়ে চলবার জন্যে ইংলন্ডের য়ুনিভর্সিটিগুলিতে সম্প্রতি বিশেষভাবে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা প্রবৃত্ত। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধের পরে অক্স্ফোর্ডে দর্শন রাষ্ট্রতত্ত্ব অর্থনীতির আধুনিক ধারার চর্চা স্বীকার করা হয়েছে। চারি দিকে কী ঘটছে, সমাজ কোন্ দিকে চলেছে, সেইটে যারা ভালো করে জানতে চায় তাদের সাহায্য করবার জন্যে য়ুনিভর্সিটির এই উদ্যোগ। ম্যাঞ্চেস্টর য়ুনিভর্সিটি আধুনিক অর্থতত্ত্ব এবং আধুনিক ইতিহাসের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ করছে। বর্তমান কালের চিন্তাদ্বন্দ্ব ও কর্মসংঘাতের দিনে এইরূপ শিক্ষার ফলে ছাত্র ও ছাত্রীরা উপযুক্তভাবে আপন কর্তব্য ও জীবনযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

আমাদের দেশে বিদেশ-থেকে-পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশের মনের এরকম সম্মিলন ঘটতে পারে নি। তা ছাড়া য়ুরোপীয় বিদ্যাও এখানে বদ্ধজলের মতো, তার চলৎ রূপ আমরা দেখতে পাই নে। যে-সকল প্রবীণ মত আসন্ন পরিবর্তনের মুখে, আমাদের সম্মুখে তারা স্থির থাকে ধ্রুবসিদ্ধান্তরূপে। সনাতনত্বমুগ্ধ আমাদের মন তাদের ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করে থাকে। য়ুরোপীয় বিদ্যাকে আমরা স্থাবরভাবে পাই এবং তার থেকে বাক্য চয়ন করে আবৃত্তি করাকেই আধুনিক রীতির বৈদগ্ধ্য বলে জানি, এই কারণে তার সম্বন্ধে নূতন চিন্তার সাহস আমাদের থাকে না। দেশের জনসাধারণের সমস্ত দুরূহ প্রশ্ন, গুরুতর প্রয়োজন, কঠোর বেদনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানে দূরের বিদ্যাকে আমরা আয়ত্ত করি জড় পদার্থের মতো বিশ্লেষণের দ্বারা, সমগ্র উপলব্ধির দ্বারা নয়। আমরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাক্য মুখস্থ করি এবং সেই টুকরো-করা মুখস্থবিদ্যার পরীক্ষা দিয়ে নিষ্কৃতি পাই। টেক্স্‌ট্-বুক-সংলগ্ন আমাদের মন পরাশ্রিত

প্রাণীর মতো নিজের খাদ্য নিজে সংগ্রহ করবার, নিজে উদ্ভাবন করবার শক্তি হারিয়েছে।

ইংরেজি ভাষা আমাদের প্রয়োজনের ভাষা, এইজন্যে সমস্ত শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে এই বিদেশী ভাষার প্রতি আমাদের লোভ; সে প্রেমিকের প্রীতি নয়, কৃপণের আসক্তি। ইংরেজি সাহিত্য পড়ি, প্রধান লক্ষ্য থাকে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা। অর্থাৎ ফুলের কীটের মতো আমাদের মন, মধুকরের মতো নয়। মুষ্টিভিক্ষায় যে দান সংগ্রহ করি ফর্দ ধরে তার পরীক্ষা দিয়ে থাকি। সে পরীক্ষায় পরিমাণের হিসাব দেওয়া; সেই পরিমাণগত পরীক্ষার তাগিদে শিক্ষা করতে হয় ওজন-দরে। বিদ্যাকে চিত্তের সম্পদ বলে গ্রহণ করা অনাবশ্যক হয় যদি তাকে বাহ্যবস্তুরূপে বহন করি। এরকম বিদ্যার দানেও গৌরব নেই, গ্রহণেও না। এমন দৈন্যের অবস্থাতেও কখনো কখনো এমন শিক্ষক মেলে শিক্ষাদান যাঁর স্বভাবসিদ্ধ। তিনি নিজগুণেই জ্ঞান দান করেন, নিজের অন্তর থেকে শিক্ষাকে অন্তরের সামগ্রী করেন, তাঁর অনুপ্রেরণায় ছাত্রদের মনে মননশক্তির সঞ্চার হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিশ্বক্ষেত্রে আপন বিদ্যাকে ফলবান করে কৃতী ছাত্রেরা তার সত্যতার প্রমাণ দেয়।

যে বিশ্ববিদ্যালয় সত্য সে এইরকম শিক্ষককে আকর্ষণ করে; শিক্ষার সাহায্যে সেখানে মনোলোকে সৃষ্টিকার্য চলে, এই সৃষ্টিই সকল সভ্যতার মূলে। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনতরো যথার্থ শিক্ষক না হলেও চলে। হয়তো-বা ভালোই চলে। কেননা এখানকার পরীক্ষাপদ্ধতিতে যে ফলের প্রতি দৃষ্টি সে আহরণ-করা ফল, ফলন-করা ফল নয়। দৈন্যের নিষ্ঠুর তাগিদে এমনতরো শিক্ষার প্রতি দেশের লোভ আছে, কিন্তু ভক্তি নেই। তাই শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্যমকে পরিপূর্ণমাত্রায় সতর্ক করে রাখবার প্রয়োজন হয় না। কেননা, দেশের প্রত্যাশা উচ্চ নয়; বাজার-দরের হিসাব করে যে পরীক্ষার মার্কা সে চায় সত্যের নিকষে তার মূল্য অতি সামান্য। এইজন্য দুর্মূল্য বিদ্যাকে সম্পূর্ণ সত্য করে তোলবার মতো শ্রদ্ধা রক্ষা করা এত কঠিন; তাই শৈথিল্য তার মজ্জায় প্রবেশ করেছে।

অভাব থেকে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত অন্যত্র আছে। যেমন জাপানে। জাপান যখন স্পষ্ট বুঝলে যে, আধুনিক য়ুরোপ আজ যে বিদ্যার প্রভাবে বিশ্ব-বিজয়ী তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে সকল দিকেই পরাভব সুনিশ্চিত, তখন জাপান প্রাণপণ আকাঙ্ক্ষার বেগে আপন সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই য়ুরোপীয় বিদ্যার পীঠস্থান রচনা করলে। বিদ্যাসাধনায় আধুনিক মানবসমাজে তার লেশমাত্র অগৌরব না ঘটে এই তার একান্ত স্পর্ধা। সুতরাং সমস্ত জাতির শিক্ষাদানকার্যে সিদ্ধির আদর্শকে খাটো করে নিজেকে বঞ্চনা করার কথা তার মনেও আসতে পারে না। আমাদের দেশে বিদ্যায় সফলতার কৃত্রিম আদর্শ অনেকটা পরিমাণে পরের হাতে। বিদেশী মনিবেরা ন্যূন পরিমাণে কতটুকু হলে তাঁদের আশু প্রয়োজনের হিসাবে সন্তুষ্ট হন তার একটা ওজন বুঝে নিয়েছিলুম। প্রথম থেকেই প্রধানত এইজন্যই বিদ্যার আন্তরিক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আমাদের হ্রাস হয়ে এসেছে।

জাপানে বিদ্যাকে সত্য করে তোলবার ইচ্ছার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন স্বদেশী ভাষাকে সে আপন শিক্ষার ভাষা করতে বিলম্ব করলে না। সর্বজনের ভাষার ভিতর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বজনের করে তুললে; শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে চিত্তপ্রসারের পথ অবাধ প্রশস্ত হয়ে উঠল। তাই আজ সেখানে সমস্ত দেশে বুদ্ধির জ্যোতি অবারিতভাবে দীপ্যমান।

আমাদের দেশে মাতৃভাষায় একদা যখন শিক্ষার আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব ওঠে তখন অধিকাংশ ইংরেজি-জানা বিদ্বান আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। সমস্ত দেশের সামান্য যে-কয়জন লোক ইংরেজি ভাষাটাকে কোনোমতে ব্যবহার করবার সুযোগ পাচ্ছে তাদের ভাগে উক্ত ভাষার অধিকারে পাছে লেশমাত্র কমতি ঘটে এই ছিল তাঁদের ভয়। হায় রে, দরিদ্রের আকাঙ্ক্ষাও দরিদ্র!

এ কথা মানতে হবে, জাপান স্বাধীন দেশ; সেখানকার লোক বিদ্যার যে মূল্য স্থির করেছে সে মূল্য পুরো পরিমাণে মিটিয়ে দিতে কৃপণতা করে নি। আর, হতভাগা আমরা পুলিস ও ফৌজ-বিভাগের ভূরিভোজনের ভুক্তশেষ রাজস্বের উচ্ছিষ্টকণা খুঁটে তারই দামে বিদ্যার ঠাট কোনোমতে বজায় রাখছি ফাঁকা মাল-মশলায়। আমাদের কাঁথার ছিদ্র ঢাকতে হয় ছেঁড়া কাপড়ের তালি দিয়ে। তাতে গৌরব নেই; কেবল কিছু পরিমাণে লজ্জা-নিবারণ ঘটে, লোক-দেখানো মান রক্ষা হয়, জীর্ণতা সত্ত্বেও আবরণটা থাকে।

এটা সত্য কথা। কিন্তু আক্ষেপ করে যখন কোনোই ফল নেই তখন এর দোহাই দিয়ে নিজের চেষ্টাকে খর্ব করলে চলবে না; তুফান উঠেছে বলেই হাল আরো শক্ত করেই ধরতে হবে। যে বিদ্যাকে এতদিন আমরা বিদেশের নিলামে সস্তায়-কেনা ভাঙা বেঞ্চিতে বসিয়ে রেখেছি তাকে স্বদেশের চিত্তবেদিতে সমাদরে বসাতেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে যখন যথার্থভাবে স্বদেশের সম্পদ করে তুলতে পারব তখন সমস্ত দেশের অন্তরের এই দাবি তার কাছে সার্থক হবে: শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। দান করা চাই শ্রদ্ধার সঙ্গে। সেই শ্রদ্ধার অন্ন প্রাণের সঙ্গে মেলে, প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলে।

অনেক দিন থেকে ইংরেজি বিদ্যার খাঁচা স্থাবরভাবে আমাদের দেশে রাজবাড়ির দেউড়িতে রক্ষিত ছিল। এর দরজা খুলে দিয়ে দেশের চিত্তশক্তির জন্য যে নীড় নির্মাণ করতে হবে সব-প্রথমে আশুতোষ সে কথা বুঝেছিলেন। প্রবল বলে এই জড়ত্বকে বিচলিত করবার সাহস তাঁর ছিল। সনাতনপন্থীদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত প্রথার মধ্যে বাংলাকে স্থান দেবার প্রস্তাব প্রথমে তাঁর মনে উঠেছিল ভীরু এবং লোভীদের নানা তর্কের বিরুদ্ধে। বাংলাভাষা আজও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার ভাষা হবার মতো পাকা হয়ে ওঠে নি সে কথা সত্য। কিন্তু আশুতোষ জানতেন যে না হবার কারণ তার নিজের শক্তিদৈন্যের মধ্যে নেই, সে আছে তার অবস্থাদৈন্যের মধ্যে। তাকে শ্রদ্ধা করে, সাহস করে, শিক্ষার আসন দিলে তবেই সে আপন আসনের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। আর, তা যদি একান্তই অসম্ভব বলে গণ্য করি তবে বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিনই বিলেতের-আমদানি টবের গাছ হয়ে থাকবে; সে টব মূল্যবান হতে পারে, অলংকৃত হতে পারে, কিন্তু গাছকে সে চিরদিন পৃথক করে রাখবে ভারতবর্ষের মাটি থেকে; বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শখের জিনিস হবে, প্রাণের জিনিস হবে না।

তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অগৌরব ঘোচাবার জন্যে পরীক্ষার শেষ দেউড়ি পার করে দিয়ে আশুতোষ এখানে গবেষণাবিভাগ স্থাপন করেছিলেন—বিদ্যার ফসল শুধু জমানো নয়, বিদ্যার ফসল ফলানোর বিভাগ। লোকের অভাব, অর্থের অভাব, স্বজন-পরজনের প্রতিকূলতা, কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মশ্রদ্ধার প্রবর্তন হয়েছে এইখানেই। তার প্রধান কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়কে আশুতোষ আপন করে দেখতে পেরেছিলেন, সেই অভিমানেই এই বিদ্যালয়কে তিনি সমস্ত দেশের আপন করে তোলবার ভরসা করতে পারলেন।

দেশের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মোটা বেড়াটা উঁচু করে তোলা ছিল তার

মধ্যে অবকাশ রচনা করতে তিনি প্রবৃত্ত ছিলেন। সেই প্রবেশপথ দিয়েই আমার মতো লোকের আজ এইখানে অকুণ্ঠিত মনে উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। আমার মহৎ সৌভাগ্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বদেশী ভাষায় দীক্ষিত করে নেবার পুণ্য অনুষ্ঠানে আমারও কিছু হাত রইল, অন্তত নামটা রয়ে গেল। আমি মনে করি যে, স্বদেশের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনসেতুরূপেই আমাকে আহ্বান করা হয়েছে। স্বদেশী ভাষায় চিরজীবন আমি যে সাধনা করে এসেছি সেই সাধনাকে সম্মান দেবার জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয় আজ তাঁর সভায় আমাকে আসন দিলেন। দুই কালের সন্ধিস্থলে আমাকে রাখলেন একটি চিহ্নের মতো। দেখলেম যথারীতি আমাকে পদবী দেওয়া হয়েছে, অধ্যাপক। এ পদবীতে যথেষ্ট সম্মান আছে, কিন্তু আমার পক্ষে এটা অসংগত। এর দায়িত্ব আছে, সেও আমার পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব, তার শব্দের উৎপত্তি ও বিশ্লিষ্ট উপাদান, অর্থাৎ সাহিত্যের নাড়িনক্ষত্র আমার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। আমি অনুশীলন করেছি তার অখণ্ড রূপ, তার গতি, তার ভঙ্গি, তার ইঙ্গিত।

তখন আমার বয়স সতেরো, ইংরেজিভাষার জটিল গহনে আলো-আঁধারে কোনোমতে হাতড়ে চলতে পারি মাত্র। সেই সময়ে লন্‌ডন য়ুনিভর্সিটিতে মাস-তিনেকের জন্যে সাহিত্যের ক্লাসে ছাত্র ছিলেম। আমাদের অধ্যাপক ছিলেন শুভ্রকেশ সৌম্যমূর্তি হেন্‌রি মর্লি। সাহিত্য তিনি পড়াতেন তার অন্তরতর রসটুকু দেবার জন্যে। শেক্‌স্‌পিয়রের কোরায়োলেনস, টমাস ব্রাউনের রেলিজিয়ো মেডিসি আর্‌ন্‌ এবং মিল্‌টনের প্যারাডাইস রিগেন্‌ড্‌ আমাদের পাঠ্য ছিল। নোট প্রভৃতির সাহায্যে বইগুলি নিজে পড়ে আসতুম তার অর্থ গ্রহণের জন্যে। অধ্যাপক ক্লাসে বসে মূর্তিমান নোট-বইয়ের কাজ করতেন না। যে কাব্য পড়াতেন তার ছবিটি পাওয়া যেত তাঁর মুখে মুখে, আবৃত্তি করে যেতেন তিনি অতি সরসভাবে, যেটি শব্দার্থের চেয়ে অনেক বেশি, অনেক গভীর, সেটি পাওয়া যেত তাঁর কণ্ঠ থেকে। মাঝে মাঝে দুরূহ জায়গায় দ্রুত বুঝিয়ে যেতেন, পঠনধারার ব্যাঘাত করতেন না। রচনাশক্তির উৎকর্ষসাধন সাহিত্যশিক্ষার আর-একটি আনুষঙ্গিক লক্ষ্য। এই দায়িত্বও তাঁর ছিল। ভাষাশিক্ষা সাহিত্যশিক্ষার কাজ মুখ্যত ভাষাতত্ত্ব দিয়ে নয়, সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব দিয়ে নয়, রসের পরিচয় দিয়ে ও রচনায় ভাষার ব্যবহার দিয়ে। যেমন আর্ট্‌শিক্ষার কাজ আর্কিয়লজি আইকনোগ্রাফি দিয়ে নয়, আর্টেরই আন্তরিক রসস্বরূপের ব্যাখ্যা দিয়ে। সপ্তাহে একদিন তিনি সমগ্রভাবে ছাত্রদের প্রদত্ত রচনার ব্যাখ্যা করতেন; তার পদচ্ছেদ, প্যারাগ্রাফবিভাগ, শব্দপ্রয়োগের সূক্ষ্ম ত্রুটি বা শোভনতা, সমস্তই তাঁর আলোচ্য ছিল। সাহিত্য ও ভাষার স্বরূপবোধ, তার আঙ্গিকের অর্থাৎ টেক্‌নিকের পরিচয় ও চর্চাই সাহিত্যশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, এই কথাটিই তাঁর ক্লাস থেকে জেনেছিলেম।

বয়স যদি পর্যবসিতপ্রায় না হত আর যদি আমার কর্তব্য হত ক্লাসে সাহিত্য-শিক্ষকতা করা, তবে এই আদর্শ-অনুসারেই কাজ করবার চেষ্টা করতুম। সম্ভবত আমার পক্ষে তার পরিণাম শোকাবহ হত। কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রেরা কেউ দীর্ঘকাল আমাকে সহ্য করতেন না। সেই সম্ভবপর সংকট কাটিয়ে এসেছি।

আজ আমার শেষ বয়সে আমার কাছ থেকে কোনো রীতিমত কর্মপদ্ধতির প্রত্যাশা করা ধর্মবিরুদ্ধ, তাতে প্রত্যবায় আছে। আমার ক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নকালে আমাকে বাংলা-অধ্যাপকের সুলভ সংস্করণরূপে চালাতে গেলে তাতে কাজেরও ক্ষতি হবে, আমার পক্ষেও সেটা স্বাস্থ্যকর হবে না। আমি এই জানি যে, আজ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্গবাণী-বীণাপাণির মন্দিরদ্বারে বরণ করে নেবার ভার আমার 'পরে। সেই কথা মনে রেখে আমি তাকে অভিনন্দিত করি। এই কামনা করি যে, যখন ধূমমলিন নিশীথপ্রদীপের নির্বাপণের ক্ষণ এল তখন বঙ্গদেশের চিত্তাকাশে নবসূর্যোদয়ের প্রত্যূষকে যথার্থ স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেন ভৈরবরাগে ঘোষণা করে, এবং বাংলার প্রতিভাকে নব নব সৃষ্টির পথ দিয়ে অক্ষয় কীর্তিলোকে উত্তীর্ণ করে দেয়।

ভাষণ : ডিসেম্বর ১৯৩২

শিক্ষার বিকিরণ

ভোজ্য জিনিসে ভাণ্ডার উঠল ভরে, রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়েছে, তবু ভোজ বলে না তাকে। আঙিনায় পাত পড়ল কত, ডাকা হয়েছে কত জনকে, সেই হিসাবেই ভোজের মর্যাদা। আমরা যে এডুকেশন শব্দটা আবৃত্তি করে মনে মনে খুশি থাকি সেটাতে ভাঁড়ার-ঘরের চেহারা আছে, কিন্তু বাইরে তাকিয়ে দেখি ধু ধু করছে আঙিনা। শিক্ষার আলোর জন্যে উঁচু লন্ঠন ঝোলানো হয়েছে ইস্কুলে কলেজে, কিন্তু সেটা যদি রুদ্ধ দেয়ালে বন্দী আলোক হয় তা হলে বলব আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। সমস্ত পট-জোড়া ভূমিকার মধ্যেই ছবির প্রকাশ, তেমনি পরিস্ফুটতা পাবার জন্যে শিক্ষা চায় দেশজোড়া ভূমিকা। ব্যাপক-ভূমিকা-ভ্রষ্ট শিক্ষা কতই অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, কেবল অভ্যাসবশতই তার দৈন্যের বেদনা আমাদের মন থেকে মরে গিয়েছে। এডুকেশন নিয়ে অন্য দেশের সঙ্গে স্বদেশের যখন তুলনা করি তখন দৃশ্য অংশটাই লক্ষ্য করি, অদৃশ্য অংশের হিসাব রাখি নে। মিলিয়ে দেখি য়ুনিভার্সিটি সেখানেও আছে, আমাদের দেশেও তার প্রতিরূপ দুটো-একটা দেখা দিচ্ছে। ভুলে যাই এমন কোনো ভাগ্যবান দেশ নেই যেখানে বাঁধা শিক্ষালয়ের বাইরে সমস্ত সমাজ জুড়ে আবাঁধা শিক্ষার একটা দিগন্তবিকীর্ণ বৃহত্তর পরিধি না আছে।

এককালে আমাদের দেশেও ছিল। য়ুরোপের মধ্যযুগের মতো আমাদের দেশে শাস্ত্রিক শিক্ষাই ছিল প্রধান। এই শিক্ষার বিশেষ চর্চা টোলে, চতুষ্পাঠীতে, কিন্তু সমস্ত দেশেই বিস্তীর্ণ ছিল বিদ্যার ভূমিকা। বিশিষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের নিত্যই ছিল চলাচল। ওয়েসিসের সঙ্গে মরুভূমির যে বৈপরীত্যের সম্বন্ধ, তেমন ছিল না পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে অপণ্ডিত লোকালয়ের। দেশে এমন অনাদৃত অংশ ছিল না যেখানে রামায়ণ মহাভারত পুরাণকথা ধর্মব্যাখ্যা নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে না পড়ত। এমন-কি যে-সকল তত্ত্বজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রে কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত তারও সেচন চলেছিল সর্বক্ষণ জনসাধারণের চিত্তভূমিতে। গাছের খাদ্য যথেষ্ট-পরিমাণ জল দিয়ে তরল হলে তবেই গাছ তাকে শাখায় প্রশাখায় গ্রহণ করতে পারে, তেমনি করেই সেদিন কঠিন বিদ্যাকে রসে বিগলিত করে সর্বজনের মনে সঞ্চারিত করা হয়েছে। যে সময়ে আমাদের দেশে পূর্তকর্ম ধর্মের অঙ্গ ছিল তখন গ্রামে গ্রামে জলাশয়ের আয়োজন স্বতই ছিল বিস্তৃত, সর্বজনে মিলে আপনিই আপনার তৃষ্ণার জল জুগিয়েছে; রাজপরিষদের কোনো ব্যয়কুণ্ঠ আমলা-সেরেস্তায় জলের জন্যে মাথা খুঁড়তে হয়নি। তেমনি করেই সমাজ দেশের

বিদ্যা আপনিই দেশময় বিতরণ করেছে। না যদি করত তবে সমস্ত দেশ আজ বর্বরতায় কালো কর্কশ হয়ে উঠত। বিদ্যা তখন বিদ্বানের সম্পত্তি ছিল না, সে ছিল সমস্ত সমাজের সম্পদ।

যেখানে খবরের কাগজেরও পত্রমর্মর শোনা যায় না এমন একটি সামান্য গ্রামে চাষিরা একদিন আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেখানে প্রায় সকলেই মুসলমান। আমার অভ্যর্থনা উপলক্ষে চলছিল একটা গানের পালা। চাঁদোয়ার তলায় কেরোসিন-লন্ঠন জ্বলছে, মাটির উপর ছেলে বুড়ো সকলেই বসে আছে স্তব্ধ হয়ে। যাত্রাগানের প্রধান বিষয়টা গুরুশিষ্যের মধ্যে তত্ত্বালোচনা—দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব। থেকে থেকে তারই সঙ্গে নাচ গান কৌতুকের দ্রুতমুখরিত ঝংকার। এই পালার একটি বিশেষ অংশ আজও আমার মনে আছে। কথাটা এই, যাত্রী প্রবেশ করতে চলেছে বৃন্দাবনে, পাহারাওয়ালা আটক করলে তার পথ; বললে, 'তুমি চোর, ভিতরে তোমাকে যেতে দেওয়া হবে না।' যাত্রী বললে, 'সে কী কথা, কোথায় দেখলে আমার চোরাই মাল?' দ্বারী বললে, 'ঐ-যে তোমার কাপড়ের নিচে লুকোনো, ঐ-যে তোমার আপনি, ওটা ষোলো আনা আমার রাজার পাওনা, ফাঁকি দিয়ে রেখেছ নিজেরই জিম্মায়।' এই বলতে বলতে মহা ঢাক ঢোল বেজে উঠল, চলল পরচুলো ঝাঁকানি দিয়ে ঘন ঘন নাচ। যেন ঐখানটা পাঠের প্রধান অংশ, অধ্যাপকমশায় পেন্‌সিলের মোটা দাগ ডবল করে টেনে দিলেন। রাত এগোতে লাগল, দুপুর পেরিয়ে একটা বাজে, শ্রোতারা স্থির হয়ে বসে শুনছে। সব কথা স্পষ্ট বুঝুক বা না বুঝুক, এমন একটা-কিছুর স্বাদ পাচ্ছে যেটা প্রতিদিনের নীরস তুচ্ছতা ভেদ করে পথ খুলে দিলে চিরন্তনের দিকে।

এমনি কতকাল চলেছে দেশে; বারবার বিচিত্র রসের যোগে লোকে শুনেছে ধ্রুবপ্রহ্লাদের কথা, সীতার বনবাস, কর্ণের কবচদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বত্যাগ। তখন দুঃখ ছিল অনেক, অবিচার ছিল, জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে, কিন্তু সেইসঙ্গে এমন একটি শিক্ষার প্রবাহ ছিল যাতে করে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যে মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের অবারিত পথ দেখিয়েছে, মানুষের যে শ্রেষ্ঠতাকে অবস্থার হীনতায় হেয় করতে পারে না তার পরিচয়কে উজ্জ্বল করেছে। আর যাই হোক, আমেরিকান টকির দ্বারা এ কাজটা হয় না।

অন্য সকল দেশে আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে অল্পদিন হল। আমাদের দেশে যে জনশিক্ষা তাকে আবশ্যিক বলব না, তাকে বলব স্বৈচ্ছিক। সে অনেক কালের। তার পশ্চাতে কোনো আইন ছিল না, তাগিদ ছিল না; তার স্বতঃসঞ্চার ছিল ঘরে ঘরে, যেমন রক্তচলাচল হয় সর্বদেহে।

তার পরে সময়ের পরিবর্তন হল। ইতিমধ্যে শিক্ষিতসমাজ যখন রাজদ্বারের দিকে মুখ ফিরিয়ে মন্ত্রিসভায় প্রবেশাধিকারের আবেদন কখনো-বা করুণকণ্ঠে কখনো-বা কৃত্রিম আক্রোশে পেশ করছিলেন তখন তাঁদের পিছনের দিকে গ্রামে গ্রামে পিপাসার জল এল পাঁকের কাছে নেমে, এ দিকে শহরে শহরে দ্বারে দ্বারে ঝরতে লাগল কলের জল। আমরা বিস্মিত হয়ে বললেম, একেই বলে উন্নতি। দেশের যেটা বৃহৎ রূপ সেটা লুকোল আমাদের অগোচরে, যে প্রাণ যে আলো দেশের সর্বত্র বিকীর্ণ ছিল সেটা প্রতিসংহৃত হল ছোটো ছোটো কেন্দ্রে।

এ কালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যাবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেলকামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে

সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।

শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এন্‌লাইটেন্‌ড্‌, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণ গ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজি পড়া মুখস্থ করলেন শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিতসমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত। সেই দিন থেকে জলকষ্ট বলো, পথকষ্ট বলো, রোগ বলো, অজ্ঞান বলো, জমে উঠল কাংস্যবাদ্যমন্দ্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে। নগরী হল সুজলা; সুফলা, টানাপাখা-শীতলা; সেইখানেই মাথা তুললে আরোগ্যনিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ। দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর-কোনোদিন চালানো হয় নি, সে কথা মনে রাখতে হবে। একে আধুনিকের লক্ষণ বলে নিন্দা করলে চলবে না। কেননা, কোনো সভ্য দেশেরই অবস্থা এরকম নয়। আধুনিকতা সেখানে সপ্তমীর চাঁদের মতো অর্ধেক আলোয় অর্ধেক অন্ধকারে খণ্ডিত হয়ে নেই। জাপানে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার সংস্রব ভারতবর্ষের চেয়ে অল্প কালের, কিন্তু সেখানে সেটা তালি-দেওয়া ছেঁড়া কাঁথা নয়। সেখানে পরিব্যাপ্ত বিদ্যার প্রভাবে সমস্ত দেশের মনে চিন্তা করবার শক্তি অবিচ্ছিন্ন সঞ্চারিত। এই চিন্তা এক ছাঁচে ঢালা নয়। আধুনিক কালেরই লক্ষণ অনুসারে এই চিন্তায় বৈচিত্র্য আছে অথচ ঐক্যও আছে, সেই ঐক্য যুক্তির ঐক্য।

কেউ কেউ তথ্য গণনা করে দেখিয়েছেন, পূর্বকালে এ দেশে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার যে উদ্যোগ ছিল ব্রিটিশ শাসনে ক্রমেই তা কমেছে। কিন্তু, তার চেয়ে সর্বনেশে ক্ষতি হয়েছে, জনশিক্ষাবিধির সহজ পথগুলি লোপ পেয়ে আসাতে। শোনা যায়, একদিন বাংলাদেশ জুড়ে নানা শাখায় খাল কাটা হয়েছিল অতি আশ্চর্য নৈপুণ্যে; হাল আমলের অনাদরে এবং নির্বুদ্ধিতায় সে-সমস্তই বন্ধ হয়ে গেছে বলেই তাদের কূলে কূলে এত চিতা আজ জ্বলছে। তেমনি এ দেশে শিক্ষার খালগুলোও গেল বন্ধ হয়ে, আর অন্তর-বাহিরের সমস্ত দীনতা বল পেয়ে উঠছে। শিক্ষার একটা বড়ো সমস্যার সমাধান হয়েছিল আমাদের দেশে। শাসনের শিক্ষা আনন্দের শিক্ষা হয়ে দেশের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল, মিলেছিল সমস্ত সমাজের প্রাণক্রিয়ার সঙ্গে। দেশব্যাপী সেই প্রাণের খাদ্যে আজ দুর্ভিক্ষ। পূর্বসঞ্চয় কিছু বাকি আছে, তাই এখনো দেখতে পাচ্ছি নে এর মারমূর্তি।

মধ্য-এসিয়ার মরুভূমিতে যে-সব পর্যটক প্রাচীন যুগের চিহ্ন সন্ধান করেছেন তাঁরা দেখেছেন, সেখানে কত সমৃদ্ধ জনপদ আজ বালিচাপা পড়ে হারিয়ে গেছে। এক কালে সে-সব জায়গায় জলের সঞ্চয় ছিল, নদীর রেখাও পাওয়া যায়। কখন রস এল শুকিয়ে, এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এল মরু, শুষ্ক রসনা মেলে লেহন করে নিল প্রাণ, লোকালয়ের শেষ স্বাক্ষর মিলিয়ে গেল অসীম পাণ্ডুরতার মধ্যে। বিপুলসংখ্যক গ্রাম নিয়ে আমাদের যে দেশ সেই দেশের মনোভূমিতেও রসের জোগান আজ অবসিত। যে রস অনেক কাল থেকে নিম্ন স্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ নিশ্বাসে উবে যাবে, অবশেষে প্রাণনাশা মরু অগ্রসর হয়ে তৃষ্ণার অজগর সাপের মতো পাকে পাকে গ্রাস করতে থাকবে আমাদের এই গ্রামে-গাঁথা দেশকে। এই মরুর আক্রমণটা আমাদের চোখে পড়ছে না, কেননা, বিশেষ শিক্ষার গতিকেই দেশ-দেখা চোখ আমরা হারিয়েছি;

গবাক্ষলন্ঠনের আলোর মতো আমাদের সমস্ত দৃষ্টির লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত শিক্ষিত-সমাজের দিকে।

আমি একদিন দীর্ঘকাল ছিলুম বাংলাদেশের গ্রামের নিকটসংস্রবে। গরমের সময়ে একটা দুঃখের দৃশ্য পড়ত চোখে। নদীর জল গিয়েছে নেমে, তীরের মাটি গিয়েছে ফেটে, বেরিয়ে পড়েছে পাড়ার পুকুরের পঙ্কস্তর, ধূ ধূ করছে তপ্ত বালু। মেয়েরা বহুদূর পথ থেকে ঘড়ায় করে নদীর জল বয়ে আনছে, সেই জল বাংলাদেশের অশ্রুজলমিশ্রিত। গ্রামে আগুন লাগলে নিবোবার উপায় পাওয়া যায় না; ওলাউঠো দেখা দিলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

এই গেল এক, আর-এক দুঃখের বেদনা আমার মনে বেজেছিল। সন্ধে হয়ে এসেছে, সমস্ত দিনের কাজ শেষ করে চাষিরা ফিরেছে ঘরে। এক দিকে বিস্তৃত মাঠের উপর নিস্তব্ধ অন্ধকার, আর-এক দিকে বাঁশঝাড়ের মধ্যে এক-একটি গ্রাম যেন রাত্রির বন্যার মধ্যে জেগে আছে ঘনতর অন্ধকারের দ্বীপের মতো। সেই দিক থেকে শোনা যায় খোলের শব্দ, আর তারই সঙ্গে একটানা সুরে কীর্তনের কোনো-একটা পদের হাজারবার তারস্বরে আবৃত্তি। শুনে মনে হত, এখানেও চিত্ত-জলাশয়ের জল তলায় এসে পড়েছে। তাপ বাড়ছে, কিন্তু ঠাণ্ডা করবার উপায় কতটুকুই বা! বছরের পর বছর যে অবস্থাদৈন্যের মধ্যে দিন কাটে তাতে কী করে প্রাণ বাঁচবে যদি মাঝে মাঝে এটা অনুভব না করা যায় যে, হাড়ভাঙা মজুরির উপরেও মন বলে মানুষের একটা-কিছু আছে যেখানে তার অপমানের উপশম, দুর্ভাগ্যের দাসত্ব এড়িয়ে যেখানে হাঁফ ছাড়বার জায়গা পাওয়া যায়! তাকে সেই তৃপ্তি দেবার জন্যে একদিন সমস্ত সমাজ প্রভূত আয়োজন করেছিল। তার কারণ, সমাজ এই বিপুল জনসাধারণকে স্বীকার করে নিয়েছিল আপন লোক বলে। জানত এরা নেমে গেলে সমস্ত দেশ যায় নেমে। আজ মনের উপবাস ঘোচাবার জন্যে কেউ তাদের কিছুমাত্র সাহায্য করে না। তাদের আত্মীয় নেই, তারা নিজে-নিজেই আগেকার দিনের তলানি নিয়ে কোনোমতে একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। আর-কিছুদিন পরে এটুকুও যাবে শেষ হয়ে; সমস্ত দিনের দুঃখধন্দার রিক্ত প্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। ঝিল্লি ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে প্রহরে; আর সেই সময়ে শহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।

এক দিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়ালো, অন্য দিকে আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হল তার প্রবাহ বইল না সর্বজনীন দেশের অভিমুখে। পাথরে-গাঁথা কুণ্ডের মতো স্থানে স্থানে সে আবদ্ধ হয়ে রইল; তীর্থের পাণ্ডাকে দর্শনী দিয়ে দূর থেকে এসে গণ্ডূষ ভর্তি করতে হয়, নানা নিয়মে তার আটঘাট বাঁধা। মন্দাকিনী থাকেন শিবের ঘোরালো জটাজুটের মধ্যে বিশেষভাবে; তবুও দেবললাট থেকে তিনি তাঁর ধারা নামিয়ে দেন, বহে যান সাধারণভাবে ঘাটে ঘাটে মর্ত্যজনের দ্বারের সম্মুখ দিয়ে, ঘটে ঘটে ভরে দেন আপন প্রসাদ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যা তেমন নয়। তার আছে বিশিষ্ট রূপ, সাধারণ রূপ নেই। সেইজন্যে ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।

ইংরেজি ভাষায় অবগুণ্ঠিত বিদ্যা স্বভাবতই আমাদের মনের সহবর্তিনী হয়ে

চলতে পারে না। সেইজন্যেই আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাই নে। চার দিকের আবহাওয়ার থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন; আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্র্যাম চলে, মন চলে না। ইস্কুলের বাইরে পড়ে আছে আমাদের দেশ; সেই দেশে ইস্কুলের প্রতিবাদ রয়েছে বিস্তর, সহযোগিতা নেই বললেই হয়। সেই বিচ্ছেদে আমাদের ভাষা ও চিন্তা অধিকাংশ স্থলেই ইস্কুলের ছেলের মতোই। ঘুচল না আমাদের নোট্‌বইয়ের শাসন, আমাদের বিচারবুদ্ধিতে নেই সাহস; আছে নজির মিলিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলে চলা। শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাবার আয়োজন আজ পর্যন্ত হল না। যেন কনে রইল বাপের বাড়ির অন্তঃপুরে; শ্বশুরবাড়ি নদীর ও পারে বালির চর পেরিয়ে। খেয়া-নৌকাটা গেল কোথায়?

পারাপারের একখানা ডোঙা দেখিয়ে দেওয়া হয়, তাকে বলে সাহিত্য। এ কথা মানতেই হবে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্য বর্তমান যুগের অস্ত্রে বস্ত্রে মানুষ। এই সাহিত্য আমাদের মনে লাগিয়েছে এ কালের ছোঁওয়া; কিন্তু খাদ্য তো ও পার থেকে পুরোপুরি বহন করে আনছে না। যে বিদ্যা বর্তমান যুগের চিত্তশক্তিকে বিচিত্র আকারে প্রকাশ করছে, উদ্ঘাটন করছে বিশ্বরহস্যের নব নব প্রবেশদ্বার, বাংলা-সাহিত্যের পাড়ায় তার যাওয়া-আসা নেই বললেই হয়। চিন্তা করে যে মন, যে মন বিচার করে, বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের যোগসাধন করে যে, সে পড়ে আছে পূর্ব-যুগান্তরে; আর যে মন রসসম্ভোগ করে সে যাতায়াত শুরু করেছে আধুনিক ভোজের নিমন্ত্রণশালার আঙিনায়। স্বভাবতই তার ঝোঁক পড়েছে সেই দিকটাতে যে দিকে চলেছে মদের পরিবেষণ, যেখানে ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস হয়েছে মাতাল।

গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলাসাহিত্যের পনেরো-আনা আয়োজন। অর্থাৎ ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়। পাশ্চাত্ত্য দেশের চিত্তোৎকর্ষ বিচিত্র চিত্তশক্তির প্রবল সমবায় নিয়ে। মনুষ্যত্ব সেখানে দেহ মন প্রাণের সকল দিকেই ব্যাপৃত। তাই সেখানে যদি ত্রুটি থাকে তো পূর্তিও আছে। বটগাছের কোনো ডাল বা ঝড়ে ভাঙল, কোনোখানে বা পোকায় ছিদ্র করেছে, কোনো বৎসর বা বৃষ্টির কার্পণ্য, কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে বনস্পতি জমিয়ে রেখেছে আপন স্বাস্থ্য, আপন বলিষ্ঠতা। তেমনি পাশ্চাত্ত্য দেশের মনকে ক্রিয়াবান্ করে রেখেছে তার বিদ্যা, তার শিক্ষা, তার সাহিত্য, সমস্ত মিলে; তার কর্মশক্তির অক্লান্ত উৎকর্ষ ঘটিয়েছে এই-সমস্তের উৎকর্ষ।

আমাদের সাহিত্যে রসেরই প্রাধান্য। সেইজন্যে যখন কোনো অসংযম কোনো চিত্তবিকার অনুকরণের নালা বেয়ে এই সাহিত্যে প্রবেশ করে তখন সেটাই একান্ত হয়ে ওঠে, কল্পনাকে রুগ্ন বিলাসিতার দিকে গাঁজিয়ে তোলে। প্রবল প্রাণশক্তি জাগ্রত না থাকলে দেহের ক্ষুদ্র বিকার কথায় কথায় বিষফোড়া হয়ে রাঙিয়ে ওঠে। আমাদের দেশে সেই আশঙ্কা। এ নিয়ে দোষ দিলে আমরা নজির দেখাই পাশ্চাত্ত্য সমাজের; বলি, এটাই তো সভ্যতার আধুনিকতম পরিণতি। কিন্তু সেইসঙ্গে সকল দিকে আধুনিক সভ্যতার যে সচিন্ত সচল প্রবল বৃহৎ সমগ্রতা আছে সেটার কথা চাপা রাখি।

একদা পাড়াগাঁয়ে যখন বাস করতুম তখন সাধু সাধকের বেশ-ধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত; তারা সাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়চর্চার সংবাদ আমাকে জানিয়েছে। তাতে ধর্মের প্রশ্রয় ছিল। তাদেরই কাছে শুনেছি, এই প্রশ্রয় সুরঙ্গপথে শহর পর্যন্ত গোপনে শিষ্যে প্রশিষ্যে শাখায়িত। এই পৌরুষনাশী

ধর্মনামধারী লালসার লোলতা ব্যাপ্ত হবার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের সাহিত্যে সমাজে সেই-সমস্ত উপাদানের অভাব যাতে বড়ো বড়ো চিন্তাকে, বুদ্ধির সাধনাকে আশ্রয় করে কঠিন গবেষণার দিকে মনের ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখতে পারে।

এজন্যে অন্তত বাঙালি সাহিত্যিকদের দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের সাহিত্য সারগর্ভ নয় বলে একে নিন্দা করা সহজ, কিন্তু কী করলে একে সারালো করা যায় তার পন্থা নির্ণয় করা তত সহজ নয়। রুচির সম্বন্ধে লোকে বেপরোয়া, কেননা ও দিকে কোনো শাসন নেই। অশিক্ষিত রুচিও রসের সামগ্রী থেকে যা-হোক-কোনো-একটা আস্বাদন পায়। আর, যদি সে মনে করে তারই বোধ রসবোধের চরম আদর্শ তবে তা নিয়ে তর্ক তুললে ফৌজদারি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। কবিতা গল্প নাটকের বাজারের দিকে যারা সমঝদারের রাজপথটা পায় নি অন্তত তারা আনাড়িপাড়ার মাঠ দিয়েও চলতে পারে, কোনো মাশুল দিতে হয় না কোথাও। কিন্তু যে বিদ্যা মননের সেখানে কড়া পাহারার সিংহদ্বার পেরিয়ে যেতে হয়, মাঠ পেরিয়ে নয়। যে-সব দেশের 'পরে লক্ষ্মী প্রসন্ন, এবং সরস্বতীও, তারা সেই বিদ্যার দিকে নতুন নতুন পথ পাকা করছে প্রত্যহ; পণ্যের আদানপ্রদান চলছে দূরে নিকটে, ঘরে বাইরে। আমাদের দেশেও তো বিলম্ব করলে চলবে না।

বাংলার আকাশে দুর্দিন এসেছে চার দিক থেকে ঘনঘোর করে। একদা রাজদরবারে বাঙালির প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বাঙালি কর্মে পেয়েছে খ্যাতি, শিক্ষাপ্রসারণে হয়েছে অগ্রণী। সেদিন সেখানকার লোকের কাছে সে শ্রদ্ধা পেয়েছে, পেয়েছে অকুণ্ঠিত কৃতজ্ঞতা। আজ রাজপুরুষ তার প্রতি অপ্রসন্ন; অন্যান্য প্রদেশে তার সম্বন্ধে আতিথ্য সংকুচিত, দ্বার অবরুদ্ধ। এ দিকে বাংলার আর্থিক দুর্গতিও চরমে এল।

অবস্থার দৈন্যে অশিক্ষার আত্মগ্লানিতে যেন বাঙালি নিচে তলিয়ে না যায়, যেন তার মন মাথা তুলতে পারে দুর্ভাগ্যের ঊর্ধ্বে, এই দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টা জাগাতে হবে তো। মানুষের মন যখন ছোটো হয়ে যায় তখন ক্ষুদ্রতার নখচঞ্চুর আঘাতে সকল উদ্যোগকেই সে ক্ষুন্ন করে। বাংলাদেশে এই ভাঙন-ধরানো ঈর্ষা নিন্দা দলাদলি এবং দুয়ো-দেবার উত্তেজনা তো বরাবরই আছে, তার উপরে চিত্তের আলো যতই ম্লান হয়ে আসবে ততই নিজের 'পরে অশ্রদ্ধাবশতই অন্য-সকলকে খর্ব করবার অহৈতুক প্রয়াস আরো উঠবে বিষাক্ত হয়ে। আজ হিন্দু-মুসলমানে যে-একটা লজ্জাজনক আড়াআড়ি দেশকে আত্মঘাতে প্রবৃত্ত করছে তার মূলেও আছে সর্বদেশব্যাপী অবুদ্ধি। অলক্ষ্মী সেই অশিক্ষিত অবুদ্ধির সাহায্যেই আমাদের ভাগ্যের ভিত্তি ভাঙবার কাজে চর লাগিয়েছে; আত্মীয়কে তুলছে শত্রু করে, বিধাতাকে করছে আমাদের বিপক্ষ। শেষকালে নিজের সর্বনাশ করবার জেদ এতদূর পর্যন্ত আজ এগোল যে, বাঙালি হয়ে বাংলাভাষার মধ্যেও ফাটল ধরাবার চেষ্টা আজ সম্ভবপর হয়েছে; শিক্ষার ও সাহিত্যের যে উদার ক্ষেত্রে সকল মতভেদ সত্ত্বেও একরাষ্ট্রীয় মানুষের মেলবার জায়গা সেখানেও স্বহস্তে কাঁটাগাছ রোপণ করবার উৎসাহ ব্যথা পেল না, লজ্জা পেল না। দুঃখ পাই তাতে ধিক্কার নেই, কিন্তু দেশজোড়া অশিক্ষাগ্রস্ত হেয়তা আমাদের মাথা হেঁট করে দিল, ব্যর্থ করে দিল আমাদের সকল মহৎ উদ্যম। রাষ্ট্রিক হাটে রাষ্ট্রাধিকার নিয়ে দর-দস্তুর করে হট্টগোল যতই পাকানো যাক, সেখানে গোল টেবিলের চক্রবাত্যায় প্রতিকারের চরম উপায় মিলবে না। তরীর তলায় যেখানে বাঁধন আলগা সেইখানে অবিলম্বে হাত লাগাতে হবে।

সকলের গোড়ায় চাই শিক্ষিত মন। ইস্কুল কলেজের বাইরে শিক্ষা বিছিয়ে দেবার উপায় সাহিত্য। কিন্তু সেই সাহিত্যকে সর্বাঙ্গীণরূপে শিক্ষার আধার করতে হবে; দেখতে হবে তাকে গ্রহণ করবার পথ সর্বত্র সুগম হয়েছে। এজন্যে কোন্ বন্ধুকে ডাকব? বন্ধু যে আজ দুর্লভ হল। তাই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারেই আবেদন উপস্থিত করছি।

মস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ুজালের অবিচ্ছিন্ন যোগ সমস্ত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মস্তিষ্কের স্থান নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র প্রেরণ করতে হবে দেশের সর্বদেহে। প্রশ্ন এই, কেমন করে করা যেতে পারে? তার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে, একটা পরীক্ষার বেড়াজাল দেশ জুড়ে পাতা হোক। এমন সহজ ও ব্যাপক ভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইস্কুল-কলেজের বাইরে থেকেও দেশে পরীক্ষাপাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অন্তঃপুরের মেয়েরা কিংবা পুরুষদের যারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না তারা অবকাশকালে নিজের চেষ্টায় অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করছে, এইটি দেখবার উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। বহু বিষয় একত্র জড়িত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি দেওয়া হয়, এ ক্ষেত্রে উপাধি দেবার উপলক্ষে সেরকম বহুলতার প্রয়োজন নেই। প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের মনের প্রবণতা থাকে বিষয়বিশেষে। সেই বিষয়েই আপন বিশেষ অধিকারের পরিচয় দিতে পারলে সমাজে সে আপন বিশেষ স্থান পাবার অধিকারী হয়। সেটুকু অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবার কোনো কারণ দেখি নে।

বিশ্ববিদ্যালয় আপন পীঠস্থানের বাহিরেও যদি ব্যাপক উপায়ে আপন সত্তা প্রসারণ করে তবেই বাংলাভাষায় যথোচিত পরিমাণে শিক্ষাপাঠ্য গ্রন্থ-রচনা সম্ভবপর হবে। নইলে কোনো কালেই বাংলাসাহিত্যে বিষয়ের দৈন্য ঘুচতেই পারে না। যে-সব শিক্ষণীয় বিষয় জানা থাকলে আত্মসম্মান রক্ষা হয় তার জন্যে অগত্যা যদি ইংরেজি ভাষারই দ্বারস্থ হতে হয় তবে সেই অকিঞ্চনতায় মাতৃভাষাকে চিরদিন অপমানিত করে রাখা হবে। বাঙালি যারা বাংলাভাষাই জানে শিক্ষিতসমাজে তারা কি চিরদিন অন্ত্যজ শ্রেণীতেই গণ্য হয়ে থাকবে? এমনও এক সময় ছিল যখন ইংরেজি ইস্কুলের পয়লা শ্রেণীর ছাত্রেরা 'বাংলা জানি নে' বলতে অগৌরব বোধ করত না, এবং দেশের লোকেরাও সসম্ভ্রমে তাদের চৌকি এগিয়ে দিয়েছে। সেদিন আজ আর নেই বটে, কিন্তু বাঙালির ছেলেকে মাথা হেঁট করতে হয়, 'শুধু কেবল বাংলা ভাষা জানি' বলতে। এ দিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার জন্যে প্রাণপণ দুঃখ স্বীকার করি, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগে নি বললে কম বলা হয়। এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা তার বিরুদ্ধতা করতে প্রস্তুত, যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলাভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে কমে। বিলেতে যাতায়াতের প্রথম যুগে ইঙ্গবঙ্গী নেশা যখন উৎকট ছিল তখন সেই মহলে স্ত্রীকে শাড়ি পরালে প্রেস্‌টিজ-হানি হত। শিক্ষাসরস্বতীকে শাড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালি বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে। অথচ এটা জানা কথা যে, শাড়ি-পরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে আরাম পাবেন, খুরওয়ালা বুটজুতোয় পায়ে পায়ে বাধা পাবার কথা।

একদিন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে যখন আমার শক্তি ছিল তখন কখনো কখনো ইংরেজি সাহিত্য মুখে মুখে বাংলা করে শুনিয়েছি। আমার শ্রোতারা ইংরেজি জানতেন সবাই। তবু তাঁরা স্বীকার করেছেন, ইংরেজি সাহিত্যের বাণী বাংলা-

ভাষায় তাঁদের মনে সহজে সাড়া পেয়েছে। বস্তুত আধুনিক শিক্ষা ইংরেজিভাষা-বাহিনী বলেই আমাদের মনের প্রবেশ-পথে তার অনেকখানি মারা যায়। ইংরেজি খানার টেবিলে আহারের জটিল পদ্ধতি যার অভ্যস্ত নয় এমন বাঙালির ছেলে বিলেতে পাড়ি দেবার পথে পি. এন্ড. ও. কোম্পানির ডিনার-কামরায় যখন খেতে বসে তখন ভোজ্য ও রসনার মধ্যপথে কাঁটাছুরির দৌত্য তার পক্ষে বাধাগ্রস্ত বলেই ভরপুর ভোজের মাঝখানেও ক্ষুধিত জঠরের দাবি সম্পূর্ণ মিটতে চায় না। আমাদের শিক্ষার ভোজেও সেই দশা; আছে সবই, অথচ মাঝপথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়। এ যা বলছি এ কলেজি যজ্ঞের কথা, আমার আজকের আলোচ্য বিষয় এ নিয়ে নয়। আমার বিষয়টা সর্বসাধারণের শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষার জলের কল চালানোর কথা নয়, পাইপ যেখানে পৌঁছয় না সেখানে পানীয়ের ব্যবস্থার কথা। মাতৃভাষায় সেই ব্যবস্থা যদি গোষ্পদের চেয়ে প্রশস্ত না হয় তবে এই বিদ্যাহারা দেশের মরুবাসী মনের উপায় হবে কী?

বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি: তোমার অভ্রভেদী শিখরচূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জে পুঞ্জে শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্‌বেল ধারা বাঙালিচিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।

ভাষণ: ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে...আলোচনা করব স্থির করেছিলুম, ইতিমধ্যে কোনো-একটি আমেরিকান কাগজে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়লুম; পড়ে খুশি হয়েছি। আমার মতটি এই লেখায় ঠিকমত ব্যক্ত হয়েছে। হবার প্রধান কারণ এই, আমেরিকা দীর্ঘকাল থেকে বৈষয়িক সিদ্ধির নেশায় মেতে ছিল। সেই সিদ্ধির আয়তন ছিল অতি স্থূল, তার লোভ ছিল প্রকাণ্ড মাপের। এর ব্যাপ্তি ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। তার ফলে সামাজিক মানুষের যে পূর্ণতা সেটা চাপা পড়ে গিয়ে বৈষয়িক মানুষের কৃতিত্ব সব ছাড়িয়ে উঠেছিল। আজ হঠাৎ সেই অতিকায় বৈষয়িক মানুষটি আপন সিদ্ধিপথের মাঝখানে অনেক দামের জটিল যানবাহনের চাকা ভেঙে, কল বিগ্‌ড়িয়ে, ধুলোয় কাত হয়ে পড়েছে। এখন তার ভাবনার কথা এই যে, সব ভাঙাচোরা বাদ দিয়ে মানুষটার বাকি রইল কী? এত কাল ধরে যা-কিছু সে গড়ে তুলছিল, যা-কিছুকে সে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছিল, তার প্রায় সমস্তই বাইরের। বাইরে যখন ভাঙন ধরে তখন ভিতরটাতে যদি দেখে সমস্ত ফাঁক তা হলে সান্ত্বনা পাবে কী নিয়ে? আসবাবগুলো গেল, কিন্তু মানুষটা কোথায়? সে এই বলে শোক করছে যে, সে আজ ভিক্ষুক; বলতে পারছে না 'আমার অন্তরে সম্পদ আছে'। আজ তার মূল্য নেই; কেননা সে আপনাকে হাটের মানুষ করে তুলেছিল, সেই হাট গেছে ভেঙে।

একদিন ভারতবর্ষে যখন তার নিজের সংস্কৃতি ছিল পরিপূর্ণ তখন ধন-

লাঘবকে সে ভয় করত না, লজ্জা করত না; কেননা তার প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্তরের দিকে। সেই লক্ষ্য নির্ণয় করা, অভ্যাস করা, তার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ। অবশ্য, তারই এক সীমানায় বৈষয়িক শিক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই, কেননা মানুষের সত্তা ব্যবহারিক-পারমার্থিককে মিলিয়ে। সংস্কৃতির অভাব আছে অথচ দক্ষতা পুরোমাত্রায়, এমন খোঁড়া মানুষ চলেছিল বাইসিক্‌ল্‌ চড়ে। ভাবে নি কোনো চিন্তার কারণ আছে, এমন সময় বাইসিক্‌ল্‌ পড়ল ভেঙে। তখন বুঝল, বহুমূল্য যন্ত্রটার চেয়ে বিনা মূল্যের পায়ের দাম বেশি। যে মানুষ উপকরণ নিয়ে বড়াই করে সে জানে না আসলে সে কতই গরিব। বাইসিক্‌লের আদর কমাতে চাই নে, কিন্তু দুটো সজীব পায়ের আদর তার চেয়ে বেশি। যে শিক্ষায় এই সজীব পায়ের জীবনীশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে তাকেই ধন্য বলি, যে শিক্ষায় প্রধানত আসবাবের প্রতিই মানুষকে নির্ভরশীল করে তোলে তাকে মূঢ়তার বাহন বলব।

যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করি তখন এই লক্ষ্যটাই আমার মনে প্রবল ছিল। আসবাব জুটে গেলে তাকে ব্যবহার করার জন্যে সাধনার দরকার নেই, কিন্তু আসবাব-নিরপেক্ষ হয়ে কী করে বাহিরে কর্মকুশলতা ও অন্তরে আপন সম্মানবোধ রক্ষা করা যায় এইটেই শিক্ষাসাধ্য। তখন আশ্রমে গরিবের মতোই ছিল জীবনযাত্রা, সেই গরিবিয়ানাকে লজ্জা করাই লজ্জাকর এ কথাটা তখন মনে ছিল। উপকরণবানের জীবনকে ঈর্ষা করা বা বিশেষভাবে সম্মান করাই যে কুশিক্ষা, এ কথাটা আমি তখনকার শিক্ষকদের স্মরণ করিয়ে রেখেছিলুম।

বলা বাহুল্য, যে দারিদ্র্য শক্তিহীনতা থেকে উদ্ভূত সে কুৎসিত। কথা আছে : শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। তেমনি বলা যায়, সামর্থ্যবানেরই ভূষণ অকিঞ্চনতা। অতএব সামর্থ্য শিক্ষা করাই চাই ভোগের অভ্যাস বর্জন করে। সামর্থ্যহীন দারিদ্র্যেই ভারতবর্ষের মাথা হেঁট হয়ে গেছে, অকিঞ্চনতায় নয়। অক্ষমকে দেবতা ক্ষমা করেন না।

'আমি সব পারি, সব পারব' এই আত্মবিশ্বাসের বাণী আমাদের শরীর মন যেন তৎপরতার সঙ্গে বলতে পারে। 'আমি সব জানি' এই কথা বলবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় মন উৎসুক হয় তো হোক, কিন্তু তার পরেও চরমের কথা 'আমি সব পারি'। আজ এই বাণী সমস্ত য়ুরোপের। সে বলে, 'আমি সব পারি, সব পারব।' তার আপন ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করার অন্ত নেই। এই শ্রদ্ধার দ্বারা সে নির্ভীক হয়েছে, জলে স্থলে আকাশে সে জয়ী হয়েছে। আমরা দৈবের দিকে তাকিয়ে আছি, সেইজন্যে বহু শতাব্দী ধরে আমরা দৈবকর্তৃক প্রবঞ্চিত।

সুইডেনের বিখ্যাত ভূপর্যটক স্বেন হেডিনের ভ্রমণবৃত্তান্ত অনেক দিন পরে আবার আমি পড়েছিলুম। এসিয়ার দুর্গম মরুপ্রদেশে আবহতত্ত্ব পর্যবেক্ষণের উপায় করবার জন্যে তিনি দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই অধ্যবসায়ের মূলমন্ত্র হচ্ছে, 'আমি সব জানব, সব পারব।' এই পারবার শক্তি বলতে কী বোঝায় সে তাঁর বই পড়লে বোঝা যায়। আমরা কথায় কথায় ওদের বলে থাকি বস্তুতান্ত্রিক। আত্মার শক্তি যার এত প্রবল যে জ্ঞান-অর্জনের জন্যে সে প্রাণকে তুচ্ছ করে, যার কিছুতে ভয় নেই, সাংঘাতিক বাধাকে যে স্বীকার করে না, দুঃসহ কৃচ্ছ্রসাধনে যাকে পরাহত করতে পারে না—প্রাণপণ সাধনা এমন-কিছুর জন্যে যা আর্থিক নয়, জীবিকার পক্ষে যা অত্যাবশ্যক নয়, বরঞ্চ বিপরীত—তাকে বলব বস্তুতান্ত্রিক! আর, সে কথা বলবে আমাদের মতো দুর্বল-আত্মা!

'আমরা সব-কিছু পারব' এই কথা সত্য করে বলবার শিক্ষাই আত্মাবমাননা থেকে আমাদের দেশকে পরিত্রাণ করতে পারে, এ কথা ভুললে চলবে না। আমাদের বিদ্যালয়ে সকল কর্মে সকল ইন্দ্রিয়মনের তৎপরতা প্রথম হতেই অনুশীলিত হোক, এইটেই শিক্ষাসাধনার গুরুতর কর্তব্য বলে মনে করতে হবে। জানি এর প্রধান অন্তরায় অভিভাবক; পড়া মুখস্থ করতে করতে জীবনীশক্তি মননশক্তি কর্মশক্তি সমস্ত যতই কৃশ হতে থাকে তাতে বাধা দিতে গেলে তাঁরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু মুখস্থ বিদ্যার চাপে এই-সব চিরপঙ্গু মানুষের অকর্মণ্যতার বোঝা দেশ বহন করবে কী করে? উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। আমাদের শিক্ষালয়ে নবীন প্রাণের মধ্যে অক্লান্ত উদ্যোগিতার হাওয়া বয়েছে যদি দেখতে পাই তা হলেই বুঝব, দেশে লক্ষ্মীর আমন্ত্রণ সফল হতে চলল। এই আমন্ত্রণ ইকনমিক্‌সে ডিগ্রি নেওয়ায় নয়; চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্যে নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধনা করায়। অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্যচর্চায় নয়, পৌরুষচর্চায়। সাধারণ ইস্কুলে এই সাধনার সুযোগ নেই, আমাদের আশ্রমে আছে। এখানে নানা বিভাগে নানা কর্ম চলছে, তার মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করাতে পারে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই।

এই কৃতিত্বশিক্ষা অত্যাবশ্যক হলেও এই-যে যথেষ্ট নয় সে কথা মানতে হবে। আমেরিকান লেখক এই কথাটারই আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আধুনিক শিক্ষা থেকে একটা জিনিস কেমন করে স্খলিত হয়ে পড়েছে, সে হচ্ছে সংস্কৃতি। চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে?

সংস্কৃতি সমগ্র মানুষের চিত্তবৃত্তিকে গভীরতর স্তর থেকে সফল করতে থাকে। তার প্রভাবে মানুষ অন্তর থেকে স্বতই সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করে। তার প্রভাবে নিষ্কাম জ্ঞানার্জনের অনুরাগ এবং নিঃস্বার্থ কর্মানুষ্ঠানের উৎসাহ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যথার্থ সংস্কৃতি জড়ভাবে প্রথাপালনের চেয়ে অকৃত্রিম সৌজন্যকে বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে কাজ উদ্ধার করবার উপযোগী বিনয়কৌশল তার অনুশাসন নয়; সংস্কৃতিবান্‌ মানুষ নিজের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু নিজেকে হেয় করতে পারে না। সে আড়ম্বরপূর্বক নিজেকে প্রচার করতে বা স্বার্থপরভাবে সবাইকে ঠেলে নিজেকে অগ্রসর করতে লজ্জা বোধ করে। যা-কিছু ইতর বা কপট তার গ্লানি তাকে বেদনা দেয়। শিল্পে সাহিত্যে মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় থাকাতে সকল-প্রকার শ্রেষ্ঠতাকে সম্মান করতে সে আনন্দ পায়। সে বিচার করতে পারে, ক্ষমা করতে পারে, মতবিরোধের বাধা ভেদ করেও যেখানে যেটুকু ভালো আছে সে তা দেখতে পায়, অন্যের সফলতাকে ঈর্ষা করাকে সে নিজের লাঘব বলেই জানে।

সমগ্র মনুষ্যত্বের স্বকীয় আদর্শ প্রত্যেক বড়ো সমাজেই আছে। সেই আদর্শ কেবল পাঠাগারে নয়, পরিবারের মধ্যেও। আমাদের দেশে বর্তমান দুর্গতির দিনে সেই আদর্শ দুর্বল হয়ে গেছে, তার শোচনীয় দৃষ্টান্ত প্রতিদিন দেখতে পাই। তাই বীভৎস কুৎসা আমাদের দেশে আয়জনক পণ্যদ্রব্য হয়ে উঠেছে। তারস্বরে নিন্দা বিস্তার করে বাতাসকে বিষাক্ত করার অপরাধকে আমরা গ্রাহ্যই করি নে: একটু উপলক্ষ ঘটবা-মাত্র এই বীভৎসতাকে উদ্ভাবিত করার ও প্রশ্রয় দেবার লোক দলে দলে ভিড় করে আসে, ইতর হিংস্রতায় সমস্ত দেশ মারীগ্রস্ত হয়ে ওঠে। তীক্ষ্ম

মেধার গুণে আমরা পড়া মুখস্থ করি; বিএ এমএ পাস করি; কিন্তু আত্মলাঘব-কারী পরস্পরের সৌভাগ্যবিদ্বেষী নিন্দালোলুপ যে চরিত্রদৈন্য শুভকর্মে পরস্পর মিলিত হবার পথে পথে সচেষ্টভাবে কাঁটার বীজ বপন করে চলেছে, সকল প্রকার সদনুষ্ঠানকে জীর্ণ বিদীর্ণ করে দেবার জন্যে মহোল্লাসে উঠে পড়ে লেগেছে, সে কেবল সংস্কৃতির অভাবে মনুষ্যত্বের আদর্শ ক্ষুণ্ন হয়েছে বলেই সম্ভব হল। সকল কর্মানুষ্ঠানে উৎসাহপূর্বক নিজেদেরকে অকৃতার্থ করে আজ বাঙালি সমস্ত পৃথিবীর কাছে অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠল। শিশুকাল থেকে এই ইতরতার বিষবীজ শিক্ষার ভিতর দিয়ে উন্মূলিত করা আমাদের বিদ্যালয়ের সর্বপ্রধান লক্ষ্য হোক, এই আমি একান্ত মনে কামনা করি। এর একমাত্র উপায় হচ্ছে পরীক্ষা-পাসের জন্যে পড়া মুখস্থ করা নয়, মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু ভালো তার সঙ্গে আনন্দময় পরিচয়সাধন করিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করবার সুযোগ সর্বদা ঘটিয়ে দেওয়া। একদা আশ্রমে আমার কবিসহযোগী সতীশ রায় এই কাজ করতেন এবং আর-একজন সহযোগী ছিলেন অজিত চক্রবর্তী। তেমন শিক্ষক নিঃসন্দেহ এখনো আমাদের মধ্যে আছেন, কিন্তু রক্তপিপাসু পরীক্ষাদানবের কাছে শিশুদের মন বলি দিতে তাঁদের এত অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয় যে শিক্ষার উপরের তলায় ওঠবার সময় থাকে না।

আমেরিকান লেখক সংস্কৃতির এই ফলশ্রুতি বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, সংস্কৃতির প্রভাবে চিত্তের সেই ঔদার্য ঘটে যাতে করে অন্তঃকরণে শান্তি আসে, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আসে, আত্মসংযম আসে এবং মনে মৈত্রীভাবের সঞ্চার হয়ে জীবনের প্রত্যেক অবস্থাকেই কল্যাণময় করে।

একদিন দেখেছিলেম, শান্তিনিকেতনের পথে গোরুর গাড়ির চাকা কাদায় বসে গিয়েছিল; আমাদের ছাত্ররা সকলে মিলে ঠেলে গাড়ি উদ্ধার করে দিলে। সেদিন কোনো অভ্যাগত আশ্রমে যখন উপস্থিত হলেন তাঁর মোট বয়ে আনবার কুলি ছিল না; আমাদের কোনো তরুণ ছাত্র অসংকোচে তাঁর বোঝা পিঠে করে নিয়ে যথাস্থানে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। অপরিচিত অতিথিমাত্রের সেবা ও আনুকূল্য তারা কর্তব্য বলে জ্ঞান করত। সেদিন তারা আশ্রমের পথ নির্মাণ করেছে, গর্ত বুজিয়ে দিয়েছে। এ-সমস্তই তাদের সতর্ক ও বলিষ্ঠ সৌজন্যের অঙ্গ ছিল, বইয়ের পাতা অতিক্রম করে তাদের শিক্ষার মধ্যে সংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল। সেই-সব ছেলেদের প্রত্যেককে তখন আমি জানতেম; তার পরে অনেক দিন তাদের অনেককে দেখি নি। আশা করি, তারা নিন্দাবিলাসী নয়, পরশ্রীকাতর নয়; অক্ষমকে সাহায্য করতে তারা তৎপর এবং ভালোকে তারা ঠিকমত যাচাই করতে জানে। ১৫ জুলাই ১৯৩৫

শ্রাবণ ১৩৪২

শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ

আমাদের দেশের আর্থিক দারিদ্র্য দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব। এই অকিঞ্চিৎকরত্বের মূলে আছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা, দেশের মাটির সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিচ্ছেদ। চিত্ত-বিকাশের যে আয়োজনটা স্বভাবতই সকলের চেয়ে আপন হওয়া উচিত ছিল সেইটেই রয়েছে সব

চেয়ে পর হয়ে—তার সঙ্গে আমাদের দড়ির যোগ হয়েছে, নাড়ীর যোগ হয় নি; এর ব্যর্থতা আমাদের স্বজাতিক ইতিহাসের শিকড়কে জীর্ণ করছে, খর্ব করে দিচ্ছে সমস্ত জাতির মানসিক পরিবৃদ্ধিকে। দেশের বহুবিধ অতিপ্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থায় অনাত্মীয়তার দুঃসহ ভার অগত্যাই চেপে রয়েছে; আইন আদালত, সকলপ্রকার সরকারি কার্যবিধি, যা বহুকোটি ভারতবাসীর ভাগ্য চালনা করে, তা সেই বহুকোটি ভারতবাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্বোধ, দুর্গম। আমাদের ভাষা, আমাদের আর্থিক অবস্থা, আমাদের অনিবার্য অশিক্ষার সঙ্গে রাষ্ট্রশাসনবিধির বিপুল ব্যবধান-বশত পদে পদে যে দুঃখ ও অপব্যয় ঘটে তার পরিমাণ প্রভূত। তবু বলতে পারি 'এহ বাহ্য'। কিন্তু শিক্ষাব্যাপার দেশের প্রাণগত আপন জিনিস না হওয়া তার চেয়ে মর্মান্তিক। ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত কৃত্রিম অন্নে দেশের পেট ভরাবার মতো সেই চেষ্টা; অতি অল্পসংখ্যক পেটেই সেটা পৌঁছয়, এবং সেটাকে সম্পূর্ণ রক্তে পরিণত করবার শক্তি অতি অল্প পাকযন্ত্রেরই থাকে। দেশের চিত্তের সঙ্গে দেশের শিক্ষার এই দূরত্ব এবং সেই শিক্ষার অপমান-জনক স্বল্পতা দীর্ঘকাল আমাকে বেদনা দিয়েছে; কেননা নিশ্চিত জানি সকল পরাশ্রয়তার চেয়ে ভয়াবহ—শিক্ষায় পরধর্ম। এ সম্বন্ধে বরাবর আমি আলোচনা করেছি, আবার তার পুনরুক্তি করতে প্রবৃত্ত হলেম; যেখানে ব্যথা সেখানে বারবার হাত পড়ে। আমার এই প্রসঙ্গে পুনরুক্তি অনেকেই হয়তো ধরতে পারবেন না; কেননা অনেকেরই কানে আমার সেই পুরোনো কথা পৌঁছয় নি। যাঁদের কাছে পুনরুক্তি ধরা পড়বে তাঁরা যেন ক্ষমা করেন। কেননা আজ আমি দুঃখের কথা বলতে এসেছি, নূতন কথা বলতে আসি নি। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া যেমন নিত্যই আপনার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, আমাদের দেশের সকল সাংঘাতিক দুঃখগুলির সেই দশা। ম্যালেরিয়া অপ্রতিহার্য নয় এ কথায় যাদের নিশ্চিত বিশ্বাস তাদেরই অজেয় ইচ্ছা ও প্রবল অধ্যবসায়ের কাছে ম্যালেরিয়া দৈববিহিত দুর্যোগের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করে। অন্যশ্রেণীয় দুঃখও নিজের পৌরুষের দ্বারা প্রতিহত হতে পারে এই বিশ্বাসের দোহাই পাড়বার কর্তব্যতা স্মরণ করে অপটু দেহ নিয়ে আজ এসেছি।

একদা একজন অব্যবসায়ী ভদ্রসন্তান তার চেয়ে আনাড়ি এক ব্যক্তির বাড়ি তৈরি করবার ভার নিয়েছিলেন। মাল-মশলার জোগাড় হয়েছিল সেরা দরের; ইমারতের গাঁথুনি হয়েছিল মজবুত; কিন্তু কাজ হয়ে গেলে প্রকাশ পেল, সিঁড়ির কথাটা কেউ ভাবেই নি। শনির চক্রান্তে এমনতরো পৌরব্যবস্থা যদি কোনো রাজ্যে থাকে যেখানে এক-তলার লোকের নিত্যবাস এক-তলাতেই আর দোতলার লোকের দোতলায়, তবে সেখানে সিঁড়ির কথাটা ভাবা নিতান্তই বাহুল্য। কিন্তু আলোচিত পূর্বোক্ত বাড়িটাতে সিঁড়িযোগে ঊর্ধ্বপথযাত্রায় একতলার প্রয়োজন ছিল; এই ছিল তার উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়।

এ দেশে শিক্ষা-ইমারতে সিঁড়ির সংকল্প গোড়া থেকেই আমাদের রাজমিস্ত্রির প্ল্যানে ওঠে নি। নিচের তলাটা উপরের তলাকে নিঃস্বার্থ ধৈর্যে শিরোধার্য করে নিয়েছে: তার ভার বহন করেছে, কিন্তু সুযোগ গ্রহণ করে নি; দাম জুগিয়েছে, মাল আদায় করে নি।

আমার পূর্বকার লেখায় এ দেশের সিঁড়িহারা শিক্ষাবিধানে এই মস্ত ফাঁকটার উল্লেখ করেছিলুম। তা নিয়ে কোনো পাঠকের মনে কোনো-যে উদ্‌বেগ ঘটেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার কারণ, অভ্রভেদী বাড়িটাই আমাদের অভ্যস্ত,

তার গৌরবে আমরা অভিভূত, তার বুকের কাছটাতে উপর-নিচে সম্বন্ধস্থাপনের যে সিঁড়ির নিয়মটা ভদ্র নিয়ম সেটাতে আমাদের অভ্যাস হয় নি। সেইজন্যেই ইতিপূর্বে আমার আলোচ্য বিষয়টা হয়তো সেলাম পেয়ে থাকবে, কিন্তু আসন পায় নি। তবু আর-একবার চেষ্টা দেখতে দোষ নেই, কেননা ভিতরে ভিতরে কখন যে দেশের মনে হাওয়া বদল হয় পরীক্ষা না করে তা বলা যায় না।

শিক্ষা সম্বন্ধে সব চেয়ে স্বীকৃত এবং সব চেয়ে উপেক্ষিত কথাটা এই যে, শিক্ষা জিনিসটি জৈব, ওটা যান্ত্রিক নয়। এর সম্বন্ধে কার্যপ্রণালীর প্রসঙ্গ পরে আসতে পারে, কিন্তু প্রাণক্রিয়ার প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে। ইন্‌কুবেটর যন্ত্রটা সহজ নয় বলেই কৌশল এবং অর্থব্যয়ের দিক থেকে তার বিবরণ শুনতে খুব মস্ত; কিন্তু মুর্গির জীবধর্মানুগত ডিম-পাড়াটা সহজ বলেই বেশি কথা জোড়ে না, তবু সেটাই অগ্রগণ্য।

বেঁচে থাকার নিয়ত ইচ্ছা ও সাধনাই হচ্ছে বেঁচে থাকার প্রকৃতিগত লক্ষণ। যে সমাজে প্রাণের জোর আছে সে সমাজ টিকে থাকবার স্বাভাবিক গরজেই আত্ম-রক্ষাঘটিত দুটি সর্বপ্রধান প্রয়োজনের দিকে অক্লান্তভাবে সজাগ থাকে, অন্ন আর শিক্ষা, জীবিকা আর বিদ্যা। সমাজের উপরের থাকের লোক খেয়ে-পরে পরিপুষ্ট থাকবে আর নিচের থাকের লোক অর্ধাশনে বা অনশনে বাঁচে কি মরে সে সম্বন্ধে সমাজ থাকবে অচেতন, এটাকে বলা যায় অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত। এই অসাড়তার ব্যামোটা বর্বরতার ব্যামো।

পশ্চিম-মহাদেশে আজ সর্বব্যাপী অর্থসংকটের সঙ্গে সঙ্গে অন্নসংকট প্রবল হয়েছে। এই অভাব-নিবারণের জন্যে সেখানকার বিদ্বানের দল এবং গবর্মেণ্ট যেরকম অসামান্য দাক্ষিণ্য প্রকাশ করছেন সেরকম উদ্‌বেগ এবং চেষ্টা আমাদের বহুসহিষ্ণু বুভুক্ষার অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ নিয়ে বড়ো বড়ো অঙ্কের ঋণ স্বীকার করতেও তাঁদের সংকোচ দেখি নে। আমাদের দেশে দু বেলা দু মুঠো খেতে পায় অতি অল্প লোক, বাকি বারো-আনা লোক আধপেটা খেয়ে ভাগ্যকে দায়ী করে এবং জীবিকার কৃপণ পথ থেকে মৃত্যুর উদার পথে সরে পড়তে বেশি দেরি করে না। এর থেকে যে নির্জীবতার সৃষ্টি হয়েছে তার পরিমাণ কেবল মৃত্যুসংখ্যার তালিকা দিয়ে নিরূপিত হতে পারে না। নিরুৎসাহ অবসাদ অকর্মণ্যতা রোগপ্রবণতা মেপে দেখবার প্রত্যক্ষ মানদণ্ড যদি থাকত তা হলে দেখতে পেতুম এ দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত জুড়ে প্রাণকে ব্যঙ্গ করছে মৃত্যু: সে অতি কুৎসিত দৃশ্য, অত্যন্ত শোচনীয়। কোনো স্বাধীন সভ্য দেশ মৃত্যুর এরকম সর্বনেশে নাট্যলীলা নিশ্চেষ্টভাবে স্বীকার করতেই পারে না, আজ তার প্রমাণ ভারতের বাইরে নানা দিক থেকেই পাচ্ছি।

শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। শিক্ষার অভিসেচনক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই-এক ইঞ্চি মাত্র ভিজিয়ে দেবে আর নিচের স্তরপরম্পরা নিত্যনীরস কাঠিন্যে সুদূরপ্রসারিত মরুময়তাকে ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে, এমন চিত্তঘাতী সুগভীর মূর্খতাকে কোনো সভ্য সমাজ অলসভাবে মেনে নেয় নি। ভারতবর্ষকে মানতে বাধ্য করেছে আমাদের যে নির্মম ভাগ্য তাকে শতবার ধিক্কার দিই।

এমন কোনো কোনো গ্রহ উপগ্রহ আছে যার এক অর্ধেকের সঙ্গে অন্য অর্ধেকের চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ; সেই বিচ্ছেদ আলোক-অন্ধকারের বিচ্ছেদ। তাদের একটা পিঠ সূর্যের অভিমুখে, অন্য পিঠ সূর্যবিমুখ। তেমনি করে যে সমাজের

এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে, অন্য বৃহত্তর অংশ শিক্ষাবিহীন, সে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত। সেখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মাঝখানে অসূর্যম্পশ্য অন্ধকারের ব্যবধান। দুই ভিন্নজাতীয় মানুষের চেয়েও এদের চিত্তের ভিন্নতা আরও বেশি প্রবল। একই নদীর এক পারের স্রোত ভিতরে ভিতরে অন্য পারের স্রোতের বিরুদ্ধ দিকে চলছে; সেই উভয় বিরুদ্ধের পার্শ্ববর্তিতাই এদের দূরত্বকে আরও প্রবলভাবে প্রমাণিত করে।

শিক্ষার ঐক্য-যোগে চিত্তের ঐক্য-রক্ষাকে সভ্য সমাজ মাত্রই একান্ত অপরিহার্য বলে জানে। ভারতের বাইরে নানা স্থানে ভ্রমণ করেছি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মহাদেশে। দেখে এসেছি, এসিয়ায় নবজাগরণের যুগে সর্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-প্রচারের দায়িত্ব একান্ত আগ্রহের সঙ্গে স্বীকৃত। বর্তমান যুগের সঙ্গে যে-সব দেশ চিত্তের ও বিত্তের আদানপ্রদান বুদ্ধিবিচারের সঙ্গে চালনা করতে না পারবে তারা কেবলই হঠে যাবে, কোণ-ঠেসা হয়ে থাকবে, এই শঙ্কার কারণ দূর করতে কোনো ভদ্র দেশ অর্থাভাবের কৈফিয়ত মানে নি। আমি যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলুম তখন সেখানে আট বছর মাত্র নূতন স্বরাজতন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে; তার প্রথম ভাগে অনেক কাল বিদ্রোহে বিপ্লবে দেশ ছিল শান্তিহীন, অর্থসচ্ছলতা ছিলই না। তবু এই স্বল্পকালেই রাশিয়ার বিরাট রাজ্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে যে অদ্ভুত দ্রুত-গতিতে শিক্ষাবিস্তার হয়েছে সেটা ভাগ্যবঞ্চিত ভারতবাসীর কাছে অসাধ্য ইন্দ্রজাল বলেই মনে হল।

শিক্ষার ঐক্য-সাধন ন্যাশনাল ঐক্য-সাধনের মূলে, এই সহজ কথা সুস্পষ্ট করে বুঝতে আমাদের দেরি হয়েছে তারও কারণ আমাদের অভ্যাসের বিকার। একদা মহাত্মা গোখ্‌লে যখন সার্বজনিক অবশ্যশিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন সব চেয়ে বাধা পেয়েছিলেন বাংলাপ্রদেশের কোনো কোনো গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকেই। অথচ, রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা এই বাংলাদেশেই সব চেয়ে মুখর ছিল। শিক্ষায় অনৈক্যে বিজড়িত থেকেও রাষ্ট্রিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলা সম্ভবপর এই কল্পনা এ প্রদেশের মনে বাধা পায় নি, এই অনৈক্যের অভ্যাস এমনিই ছিল মজ্জাগত। অভ্যাসে চিন্তার যে জড়ত্ব আনে আমাদের দেশে তার আর-একটা দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরেই আছে। আহারে কুপথ্য বাঙালির প্রাত্যহিক, বাঙালির মুখ-রোচক; সেটা আমাদের কাছে এতই সহজ হয়ে গেছে যে, যখন দেহটার আধমরা দশা বিচার করি তখন ডাক্তারের কথা ভাবি, ওষুধের কথা ভাবি, হাওয়া-বদলের কথা ভাবি, তুকতাক-মন্ত্রতন্ত্রের কথা ভাবি, এমন-কি বিদেশী শাসনকেও সন্দেহ করি, কিন্তু পথ্যসংস্কারের কথা মনেও আসে না। নৌকোটার নোঙর থাকে মাটি আঁকড়িয়ে, সেটা চোখে পড়ে না; মনে করি পালটা ছেঁড়া বলেই পারঘাটে পৌঁছনো হচ্ছে না।

আমার কথার জবাবে এমন তর্ক হয়তো উঠবে, আমাদের দেশে সমাজ পূর্বেও তো সজীব ছিল, আজও একেবারে মরে নি—তখনো কি আমাদের দেশ শিক্ষায় অশিক্ষায় যেন জলে স্থলে বিভক্ত ছিল না? তখনকার টোলে চতুষ্পাঠীতে তর্ক-শাস্ত্র ব্যাকরণশাস্ত্রের যে প্যাঁচ-কষাকষি চলত সে তো ছিল পণ্ডিত পালোয়ানদের ওস্তাদি-আখড়াতেই বদ্ধ; তার বাইরে যে বৃহৎ দেশটা ছিল সেও কি সর্বত্র ঐরকম পালোয়ানি কায়দায় তাল ঠুকে পাঁয়তারা করে বেড়াত? যা ছিল বিদ্যানামধারী পরিণত গজের বপ্রক্রীড়া সেই দিগ্‌গজ পণ্ডিতি তো তার শুঁড় আস্ফালন করে নি দেশের ঘরে ঘরে। কথাটা মেনে নিলুম। বিদ্যার যে আড়ম্বর, নিরবচ্ছিন্ন

পাণ্ডিত্য, সকল দেশেই সেটা প্রাণের ক্ষেত্র থেকে দূরবর্তী। পাশ্চাত্ত্য দেশেও স্থূলপদবিক্ষেপে তার চলন আছে, তাকে বলে পেডাণ্ট্রি। আমার বক্তব্য এই যে, এ দেশে একদা বিদ্যার যে ধারা সাধনার দুর্গম তুঙ্গ শৃঙ্গ থেকে নির্ঝরিত হত সেই একই ধারা সংস্কৃতিরূপে দেশকে সকল স্তরেই অভিষিক্ত করেছে। এজন্যে যান্ত্রিক নিয়মে এডুকেশন ডিপার্ট্‌মেন্‌টে কারখানাঘর বানাতে হয় নি; দেহে যেমন প্রাণ-শক্তির প্রেরণায় মোটা ধমনীর রক্তধারা নানা আয়তনের বহুসংখ্যক শিরা-উপশিরা-যোগে সমস্ত দেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রবাহিত হতে থাকে তেমনি করেই আমাদের দেশের সমস্ত সমাজদেহে একই শিক্ষা স্বাভাবিক প্রাণপ্রক্রিয়ায় নিরন্তর সঞ্চারিত হয়েছে— নাড়ীর বাহনগুলি কোনোটা-বা স্থূল, কোনোটা-বা অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু তবু তারা এক কলেবর-ভুক্ত নাড়ী, এবং রক্তও একই প্রাণ-ভরা রক্ত।

অরণ্য যে মাটি থেকে প্রাণরস শোষণ করে বেঁচে আছে সেই মাটিকে আপনিই প্রতিনিয়ত প্রাণের উপাদান অজস্র জুগিয়ে থাকে। তাকে কেবলই প্রাণময় করে তোলে। উপরের ডালে যে ফল সে ফলায় নিচের মাটিতে তার আয়োজন তার নিজকৃত। অরণ্যের মাটি তাই হয়ে ওঠে আরণ্যিক, নইলে সে হত বিজাতীয় মরু। যেখানে মাটিতে সেই উদ্‌ভিদসার পরিব্যাপ্ত নয় সেখানে গাছপালা বিরল হয়ে জন্মায়, উপবাসে বেঁকেচুরে শীর্ণ হয়ে থাকে। আমাদের সমাজের বনভূমিতে এক-দিন উচ্চশীর্ষ বনস্পতির দান নিচের ভূমিতে নিত্যই বর্ষিত হত। আজ দেশে যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে মাটিকে সে দান করেছে অতি সামান্য; ভূমিকে সে আপন উপাদানে উর্বরা করে তুলছে না। জাপান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে আমাদের এই প্রভেদটাই লজ্জাজনক এবং শোকাবহ। আমাদের দেশ আপন শিক্ষার ভূমিকা-সৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীন। এখানে দেশের শিক্ষা এবং দেশের বৃহৎ মন পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। সেকালে আমাদের দেশের মস্ত মস্ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে নিরক্ষর গ্রামবাসীর মনঃপ্রকৃতির বৈপরীত্য ছিল না। সেই শাস্ত্রজ্ঞানের প্রতি তাদের মনের অভিমুখিতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল; সেই ভোজে অর্ধভোজন তাদের ছিল নিত্য, কেবল ঘ্রাণে নয়, উদ্‌বৃত্ত-উপভোগে।

কিন্তু সায়ান্সে-গড়া পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার সঙ্গে আমাদের দেশের মনের যোগ হয় নি; জাপানে সেটা হয়েছে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে, তাই পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার ক্ষেত্রে জাপান স্বরাজের অধিকারী। এটা তার পাস-করা বিদ্যা নয়, আপনকরা বিদ্যা। সাধারণের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্‌, সায়ান্সে ডিগ্রি-ধারী পণ্ডিত এ দেশে বিস্তর আছে যাদের মনের মধ্যে সায়ান্সের জমিনটা তল্‌তলে; তাড়াতাড়ি যা-তা বিশ্বাস করতে তাদের অসাধারণ আগ্রহ, মেকি সায়ান্সের মন্ত্র পড়িয়ে অন্ধ সংস্কারকে তারা সায়ান্সের জাতে তুলতে কুণ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ, শিক্ষার নৌকোতে বিলিতি দাঁড় বসিয়েছি, হাল লাগিয়েছি, দেখতে হয়েছে ভালো, কিন্তু সমস্ত নদীটার স্রোত উল্টো দিকে— নৌকো পিছিয়ে পড়ে আপনিই। আধুনিক কালে বর্বর দেশের সীমানার বাইরে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে শতকরা আট-দশ জনের মাত্র অক্ষরপরিচয় আছে। এমন দেশে ঘটা করে বিদ্যাশিক্ষার আলোচনা করতে লজ্জা বোধ করি। দশ জন মাত্র যার প্রজা তার রাজত্বের কথাটা চাপা দেওয়াই ভালো। বিশ্ববিদ্যালয় অক্‌স্‌ফোর্ডে আছে, কেম্‌ব্রিজে আছে, লন্‌ডনে আছে। আমাদের দেশেও স্থানে স্থানে আছে, পূর্বোক্তের সঙ্গে এদের ভাবভঙ্গী ও বিশেষণের মিল দেখে আমরা মনে করে বসি, এরা পরস্পরের সবর্ণ; যেন ওটিন ক্রিম ও পাউডার মাখলেই মেম-সাহেবের সঙ্গে সত্যসত্যই বর্ণভেদ ঘুচে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় যেন তার ইমারতের

দেওয়াল এবং নিয়মাবলীর পাকা প্রাচীরের মধ্যেই পর্যাপ্ত। অক্‌স্‌ফোর্ড কেম্‌ব্রিজ বলতে শুধু ঐটুকুই বোঝায় না, তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শিক্ষিত ইংলন্‌ড্‌কেই বোঝায়। সেইখানেই তারা সত্য, তারা মরীচিকা নয়। আর আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় হঠাৎ থেমে গেছে তার আপন পাকা প্রাচীরের তলাটাতেই। থেমে যে গেছে সে কেবল বর্তমানের অসমাপ্তি-বশত নয়। এখনো বয়স হয় নি বলে যে মানুষটি মাথায় খাটো তার জন্যে আক্ষেপ করবার দরকার নেই, কিন্তু যার ধাতের মধ্যেই সম্পূর্ণে বাড়বার জৈবধর্ম নেই তাকে যেন গ্রেনেডিয়ারের স্বজাতীয় বলে কল্পনা না করি।

গোড়ায় যাঁরা এ দেশে তাঁদের রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন, দেখতে পাই, তাঁদেরও উত্তরাধিকারীরা বাইরের আসবাব এবং ইঁট-কাঠ-চুন-সুরকির প্যাটার্ন্‌ দেখিয়ে আমাদের এবং নিজেদেরকে ভোলাতে আনন্দ বোধ করেন। কিছুকাল পূর্বে একদিন কাগজে পড়েছিলুম, অন্য-এক প্রদেশের রাজ্য-সচিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত-পত্তনের সময় বলেছিলেন যে, যারা বলে ইমারতের বাহুল্যে আমরা শিক্ষার সম্বল খর্ব করি তারা অবুঝ, কেননা শিক্ষা তো কেবল জ্ঞানলাভ নয়, ভালো দালানে বসে পড়াশুনো করা সেও একটা শিক্ষা। অর্থাৎ ক্লাসে বড়ো অধ্যাপকের চেয়ে বড়ো দেওয়ালটা বেশি বৈ কম নয়। আমাদের নালিশ এই যে, তলোয়ারটা যেখানে তালপাতার চেয়ে বেশি দামি করা অর্থাভাববশত অসম্ভব বলে সংবাদ পাই সেখানে তার খাপটাকে ইস্পাত দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে আসল কাজ এগোয় না। তার চেয়ে ঐ ইস্পাতটাকে গলিয়ে একটা চলনসই গোছের ছুরি বানিয়ে দিলেও কতকটা সান্ত্বনার আশা থাকে।

আসল কথা, প্রাচ্য দেশে মূল্যবিচারের যে আদর্শ তাতে আমরা উপকরণকে অমৃতের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার দরকার বোধ করি নে। বিদ্যা জিনিসটি অমৃত, ইঁটকাঠের দ্বারা তার পরিমাপের কথা আমাদের মনেই হয় না। আন্তরিক সত্যের দিকে যা বড়ো বাহ্য রূপের দিকে তার আয়োজন আমাদের বিচারে না হলেও চলে। অন্তত, এতকাল সেইরকমই আমাদের মনের ভাব ছিল। বস্তুত, আমাদের দেশের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় আজও আছে বারাণসীতে। অত্যন্ত সত্য, নিতান্ত স্বাভাবিক, অথচ মস্ত করে চোখে পড়ে না। এ দেশের সনাতন সংস্কৃতির মূল উৎস সেইখানেই, কিন্তু তার সঙ্গে না আছে ইমারত, না আছে অতিজটিল ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থাপ্রণালী। সেখানে বিদ্যাদানের চিরন্তন ব্রত দেশের অন্তরের মধ্যে অলিখিত অনুশাসনে লেখা। বিদ্যাদানের পদ্ধতি, তার নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা, তার সৌজন্য, তার সরলতা, গুরুশিষ্যের মধ্যে অকৃত্রিম হৃদ্যতার সম্বন্ধ, সর্বপ্রকার আড়ম্বরকে উপেক্ষা করে এসেছে—কেননা, সত্যেই তার পরিচয়। প্রাচ্য দেশের কারিগররা যেরকম অতি সামান্য হাতিয়ার দিয়ে অতি অসামান্য শিল্পদ্রব্য তৈরি করে থাকে পাশ্চাত্ত্য বুদ্ধি তা কল্পনা করতে পারে না। যে নৈপুণ্যটি ভিতরের জিনিস তার বাহন প্রাণে এবং মনে। বাইরের স্থূল উপাদানটি অত্যন্ত হয়ে উঠলে আসল জিনিসটি চাপা পড়ে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সহজ কথাটা আমরাই আজকাল পাশ্চাত্ত্যের চেয়েও কম বুঝি। গরিব যখন ধনীকে মনে মনে ঈর্ষা করে তখন এইরকমই বুদ্ধিবিকার ঘটে। কোনো অনুষ্ঠানে যখন আমরা পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণ করি তখন ইঁটকাঠের বাহুল্যে এবং যন্ত্রের চক্রে উপচক্রে নিজেকে ও অন্যকে ভুলিয়ে গৌরব করা সহজ। আসল জিনিসের কার্পণ্যে এইটেরই দরকার হয় বেশি। আসলের চেয়ে নকলের সাজসজ্জা স্বভাবতই যায় বাহুল্যের দিকে। প্রত্যহই দেখতে পাই, পূর্বদেশে জীবনসমস্যার

আমরা যে সহজ সমাধান করেছিলুম তার থেকে কেবলই আমরা স্খলিত হচ্ছি। তার ফলে হল এই যে, আমাদের অবস্থাটা রয়ে গেল পূর্ববৎ, এমন-কি তার চেয়ে কয়েক ডিগ্রি নিচের দিকে, অথচ আমাদের মেজাজটা ধার করে এনেছি অন্য দেশ থেকে যেখানে সমারোহের সঙ্গে তহবিলের বিশেষ আড়াআড়ি নেই।

মনে করে দেখো-না—এ দেশে বহুরোগজর্জর জনসাধারণের আরোগ্য বিধানের জন্যে রিক্ত রাজকোষের দোহাই দিয়ে ব্যয়সংকোচ করতে হয়, দেশজোড়া অতিবিরাট মূর্খতার কালিমা যথোচিত পরিমার্জন করতে অর্থে কুলোয় না, অর্থাৎ যে-সব অভাবে দেশ অন্তরে-বাহিরে মৃত্যুর তলায় তলাচ্ছে তার প্রতিকারের অতি ক্ষীণ উপায় দেউলে দেশের মতোই; অথচ এ দেশে শাসনব্যবস্থায় ব্যয়ের অজস্র প্রাচুর্য একেবারেই দরিদ্র দেশের মতো নয়। তার ব্যয়ের পরিমাণ স্বয়ং পাশ্চাত্ত্য ধনী দেশকেও অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। এমন-কি বিদ্যাবিভাগের সমস্ত বাহ্য ঠাট বজায় রাখবার ব্যয় বিদ্যা-পরিবেষণের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ গাছের পাতাকে দর্শন-ধারী আকারে ঝাঁকড়া করে তোলবার খাতিরে ফল ফলাবার রস-জোগানে টানাটানি চলেছে। তা হোক, এর এই বাইরের দিকের অভাবের চেয়ে এর মর্মগত গুরুতর অভাবটাই সব চেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয়। সেই কথাটাই বলতে চাই। সেই অভাবটা শিক্ষার যথাযোগ্য আধারের অভাব।

আজকালকার অস্ত্রচিকিৎসায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বাইরে থেকে জোড়া লাগাবার কৌশল ক্রমশই উৎকর্ষ লাভ করছে। কিন্তু বাইরে-থেকে-জোড়-লাগা জিনিসটা সমস্ত কলেবরের সঙ্গে প্রাণের মিলে মিলিত না হলে সেটাকে সুচিকিৎসা বলে না। তার ব্যান্ডেজ-বন্ধনের উত্তরোত্তর প্রভূত পরিস্ফীতি দেখে স্বয়ং রোগীর মনেও গর্ব এবং তৃপ্তি হতে পারে, কিন্তু মুমূর্ষু প্রাণপুরুষের এতে সান্ত্বনা নেই। শিক্ষা সম্বন্ধে এই কথাটা পূর্বেই বলেছি। বলেছি, বাইরের থেকে আহরিত শিক্ষাকে সমস্ত দেশ যতক্ষণ আপন করতে না পারবে ততক্ষণ তার বাহ্য উপকরণের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাপটাকে হিসাবের খাতায় লাভের কোঠায় ফেললে হুন্ডি-কাটা ধারের টাকাটাকে মূলধন-হারা ব্যবসায়ে মুনাফা বলে আনন্দ করার মতো হয়। সেই আপন করবার সর্বপ্রধান সহায় আপন ভাষা। শিক্ষার সকল খাদ্য ঐ ভাষার রসায়নে আমাদের আপন খাদ্য হয়। পক্ষীশাবক গোড়া থেকেই পোকা খেয়ে মানুষ; কোনো মানবসমাজে হঠাৎ যদি কোনো পক্ষীমহারাজের একাধিপত্য ঘটে তা হলেই কি এমন কথা বলা চলবে যে, সেই রাজখাদ্যটা খেলেই মানুষ-প্রজাদেরও পাখা গজিয়ে উঠবে।

শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলেম; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজি-শিক্ষার-মন্ত্র-মুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবে আশা করি, পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।

আপন ভাষায় ব্যাপকভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন করবার আগ্রহ স্বভাবতই সমাজের মনে কাজ করে, এটা তার সুস্থ চিত্তের লক্ষণ। রামমোহন রায়ের বন্ধু পাদ্রি এডাম সাহেব বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে দেখা যায় বাংলা-বিহারে এক লক্ষের উপর পাঠশালা ছিল, দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছিল জনসাধারণকে অন্তত ন্যূনতম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। এ ছাড়া প্রায় তখনকার ধনী মাত্রেই আপন চণ্ডীমণ্ডপে সামাজিক কর্তব্যের অঙ্গরূপে পাঠশালা রাখতেন,

গুরুমশায় বৃত্তি ও বাসা পেতেন তাঁরই কাছ থেকে। আমার প্রথম অক্ষরপরিচয় আমাদেরই বাড়ির দালানে, প্রতিবেশী পোড়োদের সঙ্গে। মনে আছে এই দালানের নিভৃত খ্যাতিহীনতা ছেড়ে আমার সতীর্থ আত্মীয় দুজন যখন অশ্বরথযোগে সরকারি বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেলেন তখন মানহানির দুঃসহ দুঃখে অশ্রুপাত করেছি এবং গুরুমশায় আশ্চর্য ভবিষ্যদ্দৃষ্টির প্রভাবে বলেছিলেন, ঐখান থেকে ফিরে আসবার ব্যর্থ প্রয়াসে আরো অনেক বেশি অশ্রু আমাকে ফেলতে হবে। তখনকার প্রথম শিক্ষার জন্য শিশুশিক্ষা প্রভৃতি যে-সকল পাঠ্যপুস্তক ছিল, মনে আছে, অবকাশকালেও বারবার তার পাতা উলটিয়েছি। এখনকার ছেলেদের কাছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হব, কিন্তু সমস্ত দেশের শিক্ষা-পরিবেষণের স্বাভাবিক ইচ্ছা ঐ অত্যন্ত গরিব-ভাবে-ছাপানো বইগুলির পত্রপুটে রক্ষিত ছিল —এই মহৎ গৌরব এখনকার কোনো শিশুপাঠ্য বইয়ে পাওয়া যাবে না। দেশের খাল-বিল-নদী-নালায় আজ জল শুকিয়ে এল, তেমনি রাজার অনাদরে আধমরা হয়ে এল সর্বসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করবার স্বাদেশিক ব্যবস্থা।

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে সরকারি কারখানা আছে তার চাকায় সামান্য কিছু বদল করতে হলে অনেক হাতুড়ি-পেটাপিটির দরকার হয়। সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। সেই শক্ত হাতই ছিল আশু মুখুজ্জেমশায়ের। বাঙালির ছেলে ইংরেজি-বিদ্যায় যতই পাকা হোক, তবু শিক্ষা পুরো করবার জন্যে তাকে বাংলা শিখতেই হবে, ঠেলা দিয়ে মুখুজ্জেমশায় বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়কে এতটা দূর পর্যন্ত বিচলিত করেছিলেন। হয়তো ঐ পথটায় তার চলৎশক্তির সূত্রপাত করে দিয়েছেন, হয়তো তিনি বেঁচে থাকলে চাকা আরও এগোত। হয়তো সেই চালনার সংকেত মন্ত্রণা-সভার দফতরে এখনও পরিণতির দিকে উন্মুখ আছে।

তবু আমি যে আজ উদ্‌বেগ প্রকাশ করছি তার কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের যান-বাহনটা অত্যন্ত ভারী এবং বাংলাভাষার পথ এখনো কাঁচা পথ। এই সমস্যা-সমাধান দুরূহ বলে পাছে হতে-করতে এমন একটা অতি অস্পষ্ট ভাবী কালে তাকে ঠেলে দেওয়া হয় যা অসম্ভাবিতের নামান্তর, এই আমাদের ভয়। আমাদের গতি মন্দাক্রান্তা, কিন্তু আমাদের অবস্থাটা সবুর করবার মতো নয়। তাই আমি বলি পরিপূর্ণ সুযোগের জন্যে সুদীর্ঘ কাল অপেক্ষা না করে অল্প বহরে কাজটা আরম্ভ করে দেওয়া ভালো, যেমন করে চারাগাছ রোপণ করে সেই সহজ ভাবে। অর্থাৎ তার মধ্যে সমগ্র গাছেরই আদর্শ আছে; বাড়তে বাড়তে দিনে দিনে সেই আদর্শ সম্পূর্ণ হয়। বয়স্ক ব্যক্তির পাশে শিশু যখন দাঁড়ায় সে আপন সমগ্রতার সম্পূর্ণ ইঙ্গিত নিয়েই দাঁড়ায়। এমন নয়, একটা ঘরে বছর-দুয়েক ধরে ছেলেটার কেবল পা'খানা তয়ের হচ্ছে, আর-একটা ঘরে এগিয়েছে হাতের কনুইটা পর্যন্ত। এতদূর অত্যন্ত সতর্কতা সৃষ্টিকর্তার নেই। সৃষ্টির ভূমিকাতেও অপরিণতি সত্ত্বেও সমগ্রতা থাকে।

তেমনি বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব সমগ্র শিশুমূর্তি দেখতে চাই, সে মূর্তি কারখানাঘরে-তৈরি খণ্ড খণ্ড বিভাগের ক্রমশ যোজনা নয়। বয়স্ক বিদ্যালয়ের পাশে এসেই সে দাঁড়াক বালক বিদ্যালয় হয়ে। তার বালকমূর্তির মধ্যেই দেখি তার বিজয়ী মূর্তি, দেখি ললাটে তার রাজাসন-অধিকারের প্রথম টিকা।

বিদ্যালয়ের কাজে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা জানেন, এক দল ছাত্র স্বভাবতই ভাষা-শিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষায় অনধিকার সত্ত্বেও যদি তারা কোনোমতে ম্যাট্রিকের

দেউড়িটা পেরিয়ে যায় উপরের সিঁড়ি ভাঙবার বেলায় বসে পড়ে, আর ঠেলে তোলা যায় না।

এই দুর্গতির অনেকগুলো কারণ আছে। একে তো যে ছেলের মাতৃভাষা বাংলা, ইংরেজি ভাষার মতো বালাই তার আর নেই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপে দিশি খাঁড়া ভরবার কসরত। তার পরে, গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শেখার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলেই গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। সেরকম ত্রেতাযুগীয় বীরত্ব কজন ছেলের কাছে আশা করা যায়?

শুধু এই কারণেই কি তারা বিদ্যামন্দির থেকে আন্ডামানে চালান যাবার উপযুক্ত? ইংলন্ডে একদিন চুরির দণ্ড ছিল ফাঁসি, এ যে তার চেয়েও কড়া আইন, এ যে চুরি করতে পারে না বলেই ফাঁসি। না বুঝে বই মুখস্থ করে পাস করা কি চুরি করে পাস করা নয়? পরীক্ষাগারে বইখানা চাদরের মধ্যে নিয়ে গেলেই চুরি, আর মগজের মধ্যে করে নিয়ে গেলে তাকে কী বলব? আস্ত-বই-ভাঙা উত্তর বসিয়ে যারা পাস করে তারাই তো চোরাই কড়ি দিয়ে পারানি জোগায়।

তা হোক, যে উপায়েই তারা পার হোক, নালিশ করতে চাই নে। তবু এ প্রশ্নটা থেকে যায় যে, বহুসংখ্যক যে-সব হতভাগা পার হতে পারল না তাদের পক্ষে হাওড়ার পুলটাই নাহয় দু-ফাঁক হয়েছে, কিন্তু কোনো রকমেরই সরকারি খেয়াও কি তাদের কপালে জুটবে না—একটা লাইসেন্স্-দেওয়া পানিস, মোটর-চালিত নাই-বা হল, নাহয় হল দিশি হাতে-দাঁড়-টানা?

অন্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে আমাদের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। সেখানে শিক্ষার পূর্ণতার জন্যে যারা দরকার বোঝে তারা বিদেশী ভাষা শেখে। কিন্তু, বিদ্যার জন্যে যেটুকু আবশ্যক তার বেশি তাদের না শিখলেও চলে। কেননা, তাদের দেশের সমস্ত কাজই নিজের ভাষায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ কাজই ইংরেজি ভাষায়। যাঁরা শাসন করেন তাঁরা আমাদের ভাষা শিখতে, অন্তত যথেষ্ট পরিমাণে শিখতে, বাধ্য নন। পর্বত নড়েন না, কাজেই সচল মানুষকেই প্রয়োজনের গরজে পর্বতের দিকে নড়তে হয়। ইংরেজি ভাষা কেবল যে আমাদের জানতে হবে তা নয়, তাকে ব্যবহার করতে হবে। সেই ব্যবহার বিদেশী আদর্শে যতই নিখুঁত হবে সেই পরিমাণেই স্বদেশীদের এবং কর্তাদের কাছে আমাদের সমাদর। আমি একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে জানতুম; তিনি বাংলা সহজেই পড়তে পারতেন। বাংলাসাহিত্যে তাঁর রুচির আমি প্রশংসা করবই; কারণ, রবীন্দ্রনাথের রচনা তিনি পড়তেন এবং পড়ে আনন্দ পেতেন। একবার গ্রামবাসীদের এক সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। গ্রামহিতৈষী বাঙালি বক্তাদের মধ্যে যার যা বক্তব্য ছিল বলা হলে পর ম্যাজিস্ট্রেটের মনে হল, গ্রামের লোককে বাংলায় কিছু বলা তাঁরও কর্তব্য। কোনো প্রকারে দশ মিনিট কর্তব্য পালন করেছিলেন। গ্রামের লোকেরা বাড়ি ফিরে আত্মীয়দের জানালো যে, সাহেবের ইংরেজি বক্তৃতা এইমাত্র তারা শুনে এসেছে। পরভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে বিদেশীর কাছে খুব বেশি আশা না করলেও তাকে অসম্মান করা হয় না। ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই জানতেন তাঁর বাংলাকথনের ভাষা এমন নয় যে, গৌড়জন আনন্দে যার অর্থবোধ করতে পারে সম্যক্। তাই নিয়ে তিনি হেসেওছিলেন। আমরা হলে কিছুতেই হাসতে পারতুম না, ধরণীকে অনুনয় করতুম দ্বিধা হতে। ইংরেজি সম্বন্ধে আমাদের বিদেশিত্বের কৈফিয়ত আত্মীয় বা

অনাত্মীয় -সমাজে গ্রাহ্য হয় না। একদা বিশ্ববিখ্যাত জর্মান তত্ত্বজ্ঞানী অয়্‌কেনের ইংরেজি বক্তৃতা শুনেছিলেম। আশা করি এ কথাটা অত্যুক্তি বলে মনে করবেন না যে, ইংরেজি শুনলে আমি বুঝতে পারি সেটা ইংরেজি। কিন্তু অয়্‌কেনের ইংরেজি শুনে আমার ধাঁধা লেগেছিল। এ নিয়ে অয়্‌কেনকে অবজ্ঞা করতে কেউ পারে নি। কিন্তু এই দশা আমার হলে কী হত সে কথা কল্পনা করলেও কর্ণমূল রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। বাবু-ইংলিশ নামে নিরতিশয় অবজ্ঞা-সূচক একটা শব্দ ইংরেজিতে আছে; কিন্তু ইংরেজি-বাংলা তার চেয়ে বহুগুণে বিকৃত হলেও ওটাকে অনিবার্য বলে মেনে নিই, অবজ্ঞা করতে পারি নে। আমাদের কারও ইংরেজিতে ত্রুটি হলে দেশের লোকের কাছে সেটা যেমন হসনীয় হয় এমন কোনো প্রহসন হয় না। সেই হাসির মধ্য থেকে পরাধীনতারই কলঙ্ক দেখা দেয় কালো হয়ে। যতদিন আমাদের এই দশা বহাল থাকবে ততদিন আমাদের শিক্ষাভিমানীকে কেবল যথেষ্ট ইংরেজি নয়, অতিরিক্ত ইংরেজি শিখতে হবে। তাতে যে অতিরিক্ত সময় লাগে সেই সময়টা যথোচিত শিক্ষার হিসাব থেকে কাটা যায়। তা হোক, অত্যাবশ্যকের চেয়ে অতিরিক্তকে যতদিন আমাদের মেনে চলতেই হবে ততদিন ইংরেজি-ভাষায়-পেটাই-করা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজাতীয় ভার আমাদের আগাগোড়াই বহন করা অনিবার্য। কেননা, ভালো করে বাংলা শেখার দ্বারাতেই ভালো করে ইংরেজি শেখার সহায়তা হতে পারে, এ কথা মনে করতে সাহস হবে না। গরজটা অতিশয় জরুরি, তাই মন বলতে থাকে, কী জানি! আমার সেই শিক্ষানেতা গুরুজনের মতো অভিভাবক বাংলাদেশে বেশি পাওয়া যাবে না, তাই বেশি দাবি করে লাভ নেই। বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একেশ্বরত্বের অধিকার আজ সহ্য হবে না। নূতন স্বাধীনতার দাবিকে পুরাতন অধীনতার সেফ্‌গার্ড্‌স্‌এর দ্বারা বেড়া তুলে দেবার আশ্বাস না দিতে পারলে সবটাই ফেঁসে যেতে পারে, এই আমার ভয়। তাই বলছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের দালানে বিদ্যার ভোজের যে আয়োজন চলছে তার রান্নাটা বিলিতি মশলায় বিলিতি ডেক্‌চিতে, তার আহারটা বিলিতি আসনে বিলিতি পাত্রেই চলুক; তার জন্যে প্রাণপণে আমরা যে মূল্য দিতে পারি তাতে ভূরিভোজের আশা করা চলবে না। যারা কার্ড পেয়েছে তারা ভিতর-মহলেই বসুক, আর যারা রবাহূত বাইরের আঙিনায় তাদের জন্যে পাত পেড়ে দেওয়া যাক-না। টেবিল পাতা নাই হল, কলাপাত পড়ুক।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষাকে চিরকাল অথবা অতি দীর্ঘকাল পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হয়ে থাকতেই হবে, কেননা এ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক নেই, এই কঠিন তর্ক তুললে একদা সেটা কথা-কাটাকাটির ঘূর্ণি হাওয়াতেই আবর্তিত হতে পারত; দূর দেশ ছাড়া কাছের পাড়া থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করে ঐ উৎপাতটাকে শান্ত করা যেতে পারত না। আজ হাতের কাছেই সুযোগ মিলেছে।

ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ বয়সে অল্প; সেইজন্যই বোধ করি তার সাহস বেশি, তা ছাড়া এ কথাও বোধ করি সেখানে স্বীকৃত হওয়া সহজ হয়েছে যে, শিক্ষাবিধানে কৃপণতা করার মতো নিজেকে ফাঁকি দেওয়া আর-কিছুই হতে পারে না। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিচলিত নিষ্ঠার সহায়তায় আদ্যন্তমধ্যে উর্দু ভাষার প্রবর্তন হয়েছে। তারই প্রবল তাড়নায় ঐ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক-রচনা প্রায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ইমারতও হল, সিঁড়িও হল, নিচে থেকে উপরে লোক-যাতায়াত চলছে। হতে পারে, সেখানে যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু তবুও চারি দিকের প্রচলিত মত ও অভ্যাসের দুস্তর

বাধা অতিক্রম করে যিনি এমন মহৎ সংকল্পকে মনে এবং কাজের ক্ষেত্রে স্থান দিতে পেরেছেন সেই স্যর আকবর হয়দরির সাহসকে ধন্য বলি। বিনা দ্বিধায় জ্ঞান-সাধনার দুর্গমতাকে তাঁদের মাতৃভাষার ক্ষেত্রে সমভূম করে দিয়ে উর্দুভাষীদের তিনি যে মহৎ উপকার করেছেন তার দৃষ্টান্ত যদি আমাদের মন থেকে সংশয় দূর এবং শিক্ষাসংস্কৃতির বিলম্বিত গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে তবে একদা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অন্য সকল সভ্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে গৌরব করতে পারবে। নইলে প্রতিধ্বনি ধ্বনির সঙ্গে একই মূল্য দাবি করবে কোন্ স্পর্ধায়? বনস্পতির শাখায় যে পরগাছা ঝুলছে সে বনস্পতির সমতুল্য নয়।

বিদেশ থেকে যেখানে আমরা যন্ত্র কিনে এনে ব্যবহার করি সেখানে তার ব্যবহারে ভয়ে ভয়ে অক্ষরে অক্ষরে পুঁথি মিলিয়ে চলতে হয়, কিন্তু সজীব গাছের চারার মধ্যে তার আত্মচালনা-আত্মপরিবর্ধনার তত্ত্ব অনেক পরিমাণে ভিতরে ভিতরে কাজ করতে থাকে। যন্ত্র আমাদের স্বায়ত্ত হতে পারে, কিন্তু তাতে আমাদের স্বানুবর্তিতা থাকে না। স্বাধীন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেখানে ন্যাশনাল কলেজ গড়া হয়েছে, হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনায় যেখানে দেখা গেল অর্থব্যয় অজস্র হয়েছে, সেখানেও ছাঁচ-উপাসক আমরা ছাঁচের মুঠো থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে কিছুতে ছাড়িয়ে নিতে পারছি নে। সেখানেও শুধু যে ইংরেজি য়ুনিভর্সিটির গায়ের মাপে ছেঁটেছুঁটে কুর্তি বানাচ্ছি তা নয়, ইংরেজের জমি থেকে তার ভাষাসুদ্ধ উপড়ে এনে দেশের চিত্তক্ষেত্রকে কোদালে কুড়ুলে ক্ষত বিক্ষত করে বিরুদ্ধ ভূমিতে তাকে রোপণের গলদ্‌ঘর্ম চেষ্টা করছি; তাতে শিকড় না ছড়াচ্ছে চারি দিকে, না পৌঁচচ্ছে গভীরে।

বাংলাভাষার দোহাই দিয়ে যে শিক্ষার আলোচনা বারম্বার দেশের সামনে এনেছি তার মূলে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যখন বালক ছিলেম, আশ্চর্য এই যে, তখন অবিমিশ্র বাংলাভাষায় শিক্ষা দেবার একটা সরকারি ব্যবস্থা ছিল। তখনো যে-সব স্কুলের রাস্তা ছিল কলকাতা য়ুনিভর্সিটির প্রবেশদ্বারের দিকে জৃম্ভিত, যারা ছাত্রদের আবৃত্তি করাচ্ছিল 'he is up তিনি হন উপরে', যারা ইংরেজি I সর্বনাম শব্দের ব্যাখ্যা মুখস্থ করাচ্ছিল 'I, by myself I', তাদের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিল সেই-সব পরিবারের ছাত্র যারা ভদ্রসমাজে উচ্চ পদবীর অভিমান করতে পারত। এদেরই দূর পার্শ্বে সংকুচিতভাবে ছিল প্রথমোক্ত শিক্ষাবিভাগ, ছাত্রবৃত্তির পোড়োদের জন্য। তারা কনিষ্ঠ অধিকারী, তাদের শেষ সদ্গতি ছিল 'নর্মাল স্কুল' -নামধারী মাথা-হেঁট-করা বিদ্যালয়ে। তাদের জীবিকার শেষ লক্ষ্য ছিল বাংলা-বিদ্যালয়ে স্বল্পসন্তুষ্ট বাংলা-পণ্ডিতি ব্যবসায়ে। আমার অভিভাবক সেই নর্মাল স্কুলের দেউড়ি-বিভাগে আমাকে ভর্তি করেছিলেন। আমি সম্পূর্ণ বাংলাভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলেম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু-পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলাভাষা সংস্কৃতভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধু ভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করত। এই শিক্ষার আদর্শ ও পরিমাণ বিদ্যা হিসাবে তখনকার ম্যাট্রিকের চেয়ে কম দরের ছিল না। আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজি-বর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল। তার পরে ইংরেজি-বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনতিকাল পরেই আমি ইস্কুল-মাস্টারের শাসন হতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাতক।

এর ফলে শিশুকালেই বাংলাভাষার ভাণ্ডারে আমার প্রবেশ ছিল অবারিত।

সে ভাণ্ডারে উপকরণ যতই সামান্য থাক্, শিশুমনের পোষণ ও তোষণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। উপবাসী মনকে দীর্ঘকাল বিদেশী ভাষার চড়াই পথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দম হারিয়ে চলতে হয় নি, শেখার সঙ্গে বোঝার প্রত্যহ সাংঘাতিক মাথা-ঠোকাঠুকি না হওয়াতে আমাকে বিদ্যালয়ের হাসপাতালে মানুষ হতে হয় নি। এমন-কি সেই কাঁচা বয়সে যখন আমাকে মেঘনাদবধ পড়তে হয়েছে তখন একদিন মাত্র আমার বাঁ গালে একটা বড়ো চড় খেয়েছিলুম, এইটেই একমাত্র অবিস্মরণীয় অপঘাত; যতদূর মনে পড়ে মহাকাব্যের শেষ সর্গ পর্যন্তই আমার কানের উপরেও শিক্ষকের হস্তক্ষেপ ঘটে নি, অথবা সেটা অত্যন্তই বিরল ছিল।

কৃতজ্ঞতার কারণ আরো আছে। মনের চিন্তা এবং ভাব কথায় প্রকাশ করবার সাধনা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। অন্তরে বাহিরে দেওয়া-নেওয়ার এই প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্যসাধনই সুস্থ প্রাণের লক্ষণ। বিদেশী ভাষাই প্রকাশচর্চার প্রধান অবলম্বন হলে সেটাতে যেন মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাবপ্রকাশের অভ্যাস দাঁড়ায়। মুখোশ-পরা অভিনয় দেখেছি; তাতে ছাঁচে-গড়া ভাবকে অবিচল করে দেখানো যায় একটা বাঁধা সীমানার মধ্যে, তার বাইরে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। বিদেশী ভাষার আবরণের আড়ালে প্রকাশের চর্চা সেই জাতের। একদা মধুসূদনের মতো ইংরেজি-বিদ্যায় অসামান্য পণ্ডিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিজাতীয় বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এই মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাব বাংলাতে চেষ্টা করেছিলেন; শেষকালে হতাশ হয়ে সেটা টেনে ফেলে দিতে হল।

রচনার সাধনা অমনিতেই সহজ নয়। সেই সাধনাকে পরভাষার দ্বারা ভারাক্রান্ত করলে চিরকালের মতো তাকে পঙ্গু করার আশঙ্কা থাকে। বিদেশী ভাষার চাপে বামন হওয়া মন আমাদের দেশে নিশ্চয়ই বিস্তর আছে। প্রথম থেকেই মাতৃভাষার স্বাভাবিক সুযোগে মানুষ হলে সেই মন কী হতে পারত আন্দাজ করতে পারি নে বলে, তুলনা করতে পারি নে।

যাই হোক, ভাগ্যবলে অখ্যাত নর্মাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলুম, তাই কাঁচ বয়সে রচনা করা ও কুস্তি করাকে এক করে তুলতে হয় নি; চলা এবং রাস্তা খোঁড়া ছিল না একসঙ্গে। নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা, সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না; ইংরেজির অতিপ্রচলিত জীর্ণ বাক্যাবলী সাবধানে সেলাই করে করে কাঁথা বুনতে হয় না। ইস্কুল-পালানে অবকাশে যেটুকু ইংরেজি আমি পথে-পথে সংগ্রহ করেছি সেটুকু নিজের খুশিতে ব্যবহার করে থাকি; তার প্রধান কারণ, শিশুকাল থেকে বাংলাভাষায় রচনা করতে আমি অভ্যস্ত। অন্তত, আমার এগারো বছর বয়স পর্যন্ত আমার কাছে বাংলাভাষার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। রাজসম্মানগর্বিত কোনো সুয়োরানী তাকে গোয়ালঘরের কোণে মুখ চাপা দিয়ে রাখে নি। আমার ইংরেজিশিক্ষায় সেই আদিম দৈন্য সত্ত্বেও পরিমিত উপকরণ নিয়ে আমার চিত্তবৃত্তি কেবল গৃহিণীপনার জোরে ইংরেজি-জানা ভদ্র সমাজে আমার মান বাঁচিয়ে আসছে; যা-কিছু ছেঁড়া-ফাঁটা, যা-কিছু মাপে খাটো, তাকে কোনোরকমে ঢেকে বেড়াতে পেরেছে। নিশ্চিত জানি তার কারণ, শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো-ভেজাল-না-দেওয়া মাতৃভাষায়; সেই খাদ্যে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ ছিল, যে খাদ্যপ্রাণে সৃষ্টিকর্তা তাঁর জাদুমন্ত্র দিয়েছেন।

অবশেষে আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো ভগীরথ বাংলাভাষায় শিক্ষা-স্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলুন; দেশের সহস্র সহস্র মন মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে বেঁচে উঠুক; পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক; বিদ্যাবিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক।

জানি নে হয়তো অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলবেন, এ কথাটা কাজের কথা নয়, এ কবিকল্পনা। তা হোক, আমি বলব, আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়া-তাড়ার কাজ চলেছে, সৃষ্টি হয়েছে কল্পনার বলে।

ভাষণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

আশ্রমের শিক্ষা

প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটার ঠিক বাস্তব রূপ কী তার ঐতিহাসিক ধারণা আজ সহজ নয়। তপোবনের যে প্রতিরূপ স্থায়ীভাবে আঁকা পড়েছে ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে সে হচ্ছে একটি কল্যাণময় কল্পমূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত প্রাণবান আনন্দের মূর্তি।

আধুনিক কালে জন্মেছি। কিন্তু, এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। বর্তমান যুগের বিদ্যায়তনে ভাবলোকের সেই তপোবনকে রূপলোকে প্রকাশ করবার জন্যে একদা কিছুকাল ধরে আমার মনে আগ্রহ জেগেছিল।

দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ—নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্য-সাধনেই তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটি আশ্রমের শিক্ষার সব চেয়ে মূল্যবান উপাদান। তার সেই মূল্য অধ্যাপনার বিষয়ে নয়, উপকরণে নয়, পদ্ধতিতে নয়। গুরুর মন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ সপ্রমাণ করছে নিজের সত্যতা দেওয়ার আনন্দেই।

একদা একজন জাপানি ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলাম, বাগানের কাজে ছিল তাঁর বিশেষ শখ। তিনি বৌদ্ধ, মৈত্রীর সাধক। তিনি বলতেন, 'আমি ভালোবাসি গাছপালা। তরুলতায় সেই ভালোবাসার শক্তি প্রবেশ করে, ওদের ফুলে ফলে জাগে সেই ভালোবাসারই প্রতিক্রিয়া।' বলা বাহুল্য, মানবচিত্তের মালীর সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। মনের সঙ্গে মন যথার্থভাবে মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি সৃজনশক্তিশীল। আশ্রমের শিক্ষাদান এই খুশির দান। যাদের মনে কর্তব্যবোধ আছে কিন্তু সেই খুশি নেই, তাদের দোসরা পথ। গুরু-শিষ্যের মধ্যে পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মাধ্যম বলে জেনেছি।

আরো একটি কথা মনে ছিল। যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর

যোগ থাকে না। নদীর সঙ্গে যদি প্রকৃত শিক্ষকের তুলনা করি তবে বলব, কেবল ডাইনে বাঁয়ে কতকগুলো বুড়ো বুড়ো উপনদীর যোগেই নদী পূর্ণ নয়। তার আদি ঝর্নার ধারাটি মোটা মোটা পাথরগুলোর মধ্যে হারিয়ে যায় নি। যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁর ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকেই তাঁকে স্বশ্রেণীয় জীব বলে চিনতে না পারে, যদি মনে করে 'লোকটা যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী', তবে নির্ভয়ে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না। সাধারণত আমাদের গুরুরা সর্বদা নিজের প্রবীণতা অর্থাৎ নবীনের কাছ থেকে দূরবর্তিতা সপ্রমাণ করতে ব্যগ্র; প্রায়ই ওটা সস্তায় কর্তৃত্ব করবার প্রলোভনে। ছেলেদের পাড়ায় চোপদার না নিয়ে এগোলে পাছে সম্ভ্রম নষ্ট হয় এই ভয়ে তাঁরা সতর্ক। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি উঠছে 'চুপ চুপ'; তাই পাকা শাখায় কচি শাখায় ফুল ফোটাবার ফল ফলাবার মর্মগত সহযোগ রুদ্ধ হয়ে থাকে; চুপ করে যায় ছেলেদের চিত্তে প্রাণের ক্রিয়া।

আর-একটা কথা আছে। ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের। আরাম-কেদারায় তারা আরাম চায় না, সুযোগ পেলেই গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির নাড়ীতে নাড়ীতে প্রথম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল। শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চার করে। বয়স্কদের শাসনে অভ্যাসের দ্বারা যে-পর্যন্ত তারা অভিভূত না হয়েছে সে-পর্যন্ত কৃত্রিমতার জাল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তারা ছট্‌ফট্‌ করে। আরণ্য ঋষিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের অমর ছেলে। তাই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন, এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। এ কি বের্গ্‌সঁ'এর বচন! এ মহান্‌ শিশুর বাণী। বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে, শহরের বোবা কালা মরা দেয়ালগুলোর বাইরে।

তার পরে আশ্রমে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথা। মনে পড়ছে কাদম্বরীতে একটি বর্ণনা: তপোবনে আসছে সন্ধ্যা, গোষ্ঠে-ফিরে-আসা পাটল হোমধেনুটির মতো। শুনে মনে জাগে, সেখানে গোরু-চরানো, গোদোহন, সমিধ-কুশ-আহরণ, অতিথিপরিচর্যা, যজ্ঞবেদীরচনা আশ্রম-বালকবালিকাদের দিনকৃত্য। এই-সব কর্ম-পর্যায়ের দ্বারা তপোবনের সঙ্গে নিরন্তর মিলে যায় তাদের নিত্যপ্রবাহিত জীবনের ধারা। সহকারিতার সখ্য-বিস্তারে আশ্রমে হতে থাকে প্রতি ক্ষণে আশ্রমবাসীদের নিজ হাতের রচনা। আমাদের আশ্রমে সতত-উদ্যমশীল এই কর্মসহযোগিতা কামনা করছি।

মানুষের প্রকৃতিতে যেখানে জড়তা আছে সেখানে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা কুশ্রী ও মলিন। স্বভাবের বর্বরতা সেখানে প্রকাশে বাধা পায় না। ধনীসমাজে আন্তরিক শক্তির অভাব থাকলেও বাহ্যিক উপকরণপ্রাচুর্যে কৃত্রিম উপায়ে এই দীনতাকে চাপা দিয়ে রাখা যায়। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই ধনীগৃহে সদর-অন্দরের প্রভেদ দেখলে এই প্রকৃতিগত তামসিকতা ধরা পড়ে।

নিজের চার দিককে নিজের চেষ্টায় সুন্দর সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর করে তোলার দ্বারা একত্র বাসের সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই সহজ করা চাই। একজনের শৈথিল্য অন্যের অসুবিধা অস্বাস্থ্য ও ক্ষতির কারণ হতে পারে, এই বোধটি সভ্য জীবনযাত্রার ভিত্তিগত। সাধারণত আমাদের দেশের গার্হস্থ্যে এই বোধের ত্রুটি সর্বদাই দেখা যায়।

সহযোগিতার সভ্য নীতিকে প্রত্যহ সচেতন করে তোলা আশ্রমের শিক্ষার প্রধান সুযোগ। সুযোগটিকে সফল করবার জন্যে শিক্ষার প্রথম পর্বে উপকরণ-লাঘব অত্যাবশ্যক। একান্ত বস্তুপরায়ণ স্বভাবে প্রকাশ পায় চিত্তবৃত্তির স্থূলতা। সৌন্দর্য এবং সুব্যবস্থা মনের জিনিস। সেই মনকে মুক্ত করা চাই কেবল আলস্য এবং অনৈপুণ্য থেকে নয়, বস্তুলুব্ধতা থেকেও। রচনাশক্তির আনন্দ ততই সত্য হয় যতই তা জড়বাহুল্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। বাল্যকাল থেকেই ব্যবহারসামগ্রী সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়। সেই বয়সেই প্রতিদিন অল্প-কিছু উপকরণ, যা সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাই দিয়েই সৃষ্টির আনন্দকে উদ্ভাসিত করবার চেষ্টা যেন নিরলস হতে পারে এবং সেইসঙ্গেই সাধারণের সুখ স্বাস্থ্য সুবিধা-বিধানের কর্তব্যে ছাত্রেরা যেন আনন্দ পেতে শেখে, এই আমার কামনা।

আপন পরিবেশের প্রতি ছেলেদের আত্মকর্তৃত্বচর্চাকে আমাদের দেশে অসুবিধাজনক আপদজনক ও ঔদ্ধত্য মনে করে সর্বদা আমরা দমন করি। এতে করে পরনির্ভরতার লজ্জা তাদের চলে যায়, পরের প্রতি আব্দার বেড়ে ওঠে, এমন-কি ভিক্ষুকতার ক্ষেত্রেও তাদের অভিমান প্রবল হতে থাকে; তারা আত্মপ্রসাদ পায় পরের ত্রুটি নিয়ে কলহ করে। এই লজ্জাকর দীনতা চার দিকে সর্বদাই দেখা যাচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পাওয়াই চাই।

মনে আছে ছাত্রদের প্রাত্যহিক কাজে যখন আমার যোগ ছিল তখন এক দল বয়স্ক ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমার কাছে নালিশ এল যে, অন্নভরা বড়ো বড়ো ধাতুপাত্র পরিবেষণের সময় মেজের উপর দিয়ে টানতে টানতে তার তলা ক্ষয়ে গিয়ে ঘরময় নোংরামি ছড়িয়ে পড়ে। আমি বললেম, 'তোমরা পাচ্ছ দুঃখ, অথচ তাকিয়ে আছ আমি এর প্রতিবিধান করব। এই সামান্য কথাটা তোমাদের বুদ্ধিতে আসছে না যে, ঐ পাত্রটার নিচে একটা বিড়ে বেঁধে দিলেই ঐ ঘর্ষণ থামে। চিন্তা করতে পার না তার একমাত্র কারণ, তোমরা এইটাই স্থির করে রেখেছ যে, নিষ্ক্রিয়ভাবে ভোক্তৃত্বের অধিকারই তোমাদের, আর কর্তৃত্বের অধিকার অন্যের। এতে আত্ম-সম্মান থাকে না।'

শিক্ষার অবস্থায় উপকরণের কিছু বিরলতা, আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই ভালো; অভ্যস্ত হওয়া চাই স্বল্পতায়। অনায়াসে-প্রয়োজন-জোগানোর দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আদুরে করে তোলা তাদের নষ্ট করা। সহজেই তারা যে এত-কিছু চায় তা নয়। আমরাই বয়স্ক লোকের চাওয়াটা কেবলই তাদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে বস্তুর নেশায় দীক্ষিত করে তুলি। শরীরমনের শক্তির সম্যক্ চর্চা সেখানেই ভালো করে সম্ভব যেখানে বাইরের সহায়তা অনতিশয়। সেখানে মানুষের আপনার সৃষ্টি-উদ্যম আপনি জাগে। যাদের না জাগে প্রকৃতি তাদেরকে আবর্জনার মতো ঝেঁটিয়ে ফেলে দেয়। আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টিকর্তৃত্ব। সেই মানুষই যথার্থ স্বরাট আপনার রাজ্য যে আপনি সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে অতিলালিত ছেলেরা সেই স্বচেষ্টতার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বঞ্চিত। তাই আমরা অন্যদের শক্ত হাতের চাপে পরের নির্দিষ্ট নমুনামত রূপ নেবার জন্যে কর্দমাক্ত ভাবে প্রস্তুত।

এই উপলক্ষে আর-একটা কথা বলবার আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শরীর-তন্তুর শৈথিল্য বা অন্য যে কারণেই হোক, আমাদের মানস প্রকৃতিতে ঔৎসুক্যের অত্যন্ত অভাব। একবার আমেরিকা থেকে জল-তোলা বায়ুচক্র আনিয়েছিলুম।

আশা ছিল, প্রকাণ্ড এই যন্ত্রটার ঘূর্ণিপাখার চালনা দেখতে ছেলেদের আগ্রহ হবে। কিন্তু দেখলুম অতি অল্প ছেলেই ভালো করে ওটার দিকে তাকালে। ওরা নিতান্তই আলগা ভাবে ধরে নিলে, ওটা যা-হোক একটা জিনিস, জিজ্ঞাসার অযোগ্য।

নিরোৎসুক্যই আন্তরিক নির্জীবতা। আজকের দিনে যে-সব জাতি পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সমস্ত পৃথিবীর সব-কিছুরই 'পরে তাদের অপ্রতিহত ঔৎসুক্য। এমন দেশ নেই, এমন কাল নেই, এমন বিষয় নেই, যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে। তাদের এই সজীব চিত্তশক্তি জয়ী হল সর্বজগতে।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি, আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকবার শিক্ষা। মরা মন নিয়েও পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর উর্ধ্বশিখরে ওঠা যায়, আমাদের দেশে প্রত্যহ তার পরিচয় পাই। দেখা যায় অতি ভালো কলেজি ছেলেরা পদবী অধিকার করে, বিশ্ব অধিকার করে না। প্রথম থেকেই আমার সংকল্প ছিল আশ্রমের ছেলেরা চার দিকের অব্যবহিত-সম্পর্ক-লাভে উৎসুক হয়ে থাকবে; সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। এখানে এমন-সকল শিক্ষক সমবেত হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে; যাঁরা চক্ষুষ্মান্, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে।

সব-শেষে বলব যেটাকে সব-চেয়ে বড়ো মনে করি এবং যেটা সব-চেয়ে দুর্লভ। তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান। ছেলেদের প্রতি স্বভাবতই যাঁদের স্নেহ আছে এই ধৈর্য তাঁদেরই স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে গুরুতর বিপদের কথা এই যে, যাঁদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার তারা ক্ষমতায় তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে বা কাল্পনিক কারণে অসহিষ্ণু হওয়া, তাদের বিদ্রূপ করা, অপমান করা, শাস্তি দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব। দুর্বল পর-জাতিকে শাসন করাই যাদের কাজ তারা যেমন নিজের অগোচরেও সহজেই অন্যায়প্রবণ হয়ে ওঠে, এও তেমনি। ক্ষমতা-ব্যবহারের স্বাভাবিক যোগ্যতা যাদের নেই অক্ষমের প্রতি অবিচার করতে কেবল যে তাদের বাধা থাকে না তা নয়, তাতে তাদের আনন্দ। ছেলেরা অবোধ হয়ে দুর্বল হয়েই মায়ের কোলে আসে, এইজন্যে তাদের রক্ষার প্রধান উপায়— মায়ের মনে অপর্যাপ্ত স্নেহ। তৎসত্ত্বেও অসহিষ্ণুতা ও শক্তির অভিমান স্নেহকে অতিক্রম করেও ছেলেদের 'পরে অন্যায় অত্যাচারে প্রবৃত্ত করে, ঘরে ঘরে তার প্রমাণ পাই। ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত যেখানে দেখা যায় প্রায়ই সেখানে মূলত শিক্ষকেরাই দায়ী। তাঁরা দুর্বলমনা বলেই কঠোরতা দ্বারা নিজের কর্তব্যকে সহজ করতে চান।

রাষ্ট্রতন্ত্রেই হোক আর শিক্ষাতন্ত্রেই হোক, কঠোর শাসননীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমা যেখানে ক্ষীণ সেখানে শক্তিরই ক্ষীণতা।

আষাঢ় ১৩৪০

ছাত্রসম্ভাষণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবি-সম্মান-বিতরণের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আজ আমি আহূত। আমার জীর্ণ শরীরের অপটুতা এই দায়িত্বভার গ্রহণের প্রতিকূল ছিল। কিন্তু অদ্যকার একটি বিশেষ গৌরবের উপলক্ষ আমাকে সমস্ত বাধার উপর দিয়ে আকর্ষণ করে এনেছে। আজ বাংলাদেশের প্রথমতম বিশ্ববিদ্যালয় আপন ছাত্রদের মাঙ্গল্যবিধানের শুভকর্মে বাংলার বাণীকে বিদ্যামন্দিরের উচ্চ বেদীতে বরণ করেছেন। বহুদিনের শূন্য আসনের অকল্যাণ আজ দূর হল।

দুর্ভাগ্যদিনের সকলের চেয়ে দুঃসহ লক্ষণ এই যে, সেই দিনে স্বতঃস্বীকার্য সত্যকেও বিরোধের কণ্ঠে জানাতে হয়। এ দেশে অনেক কাল জানিয়ে আসতে হয়েছে যে, পরভাষার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত শিক্ষায় বিদ্যার প্রাণীন পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়।

ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা-বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। য়ুরোপীয় বিদ্যায় জাপানের দীক্ষা এক শতাব্দীও পার হয় নি। তার বিদ্যারম্ভের প্রথম সূচনায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলি অগত্যা বিদেশী ভাষাকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই শিক্ষাবিধির একান্ত লক্ষ্য ছিল, স্বদেশী ভাষার অধিকারে স্বাধীন সঞ্চরণ লাভ করা। কেননা, যে বিদ্যাকে আধুনিক জাপান অভ্যর্থনা করেছিল সে কেবলমাত্র বিশেষ-সুযোগ-প্রাপ্ত সংকীর্ণ শ্রেণীবিশেষের অলংকারপ্রসাধনের সামগ্রী বলেই আদরণীয় হয় নি; নির্বিশেষে সমগ্র মহাজাতিকেই শক্তি দেবে, শ্রী দেবে বলেই ছিল তার আমন্ত্রণ। এইজন্যই এই শিক্ষার সর্বজনগম্যতা ছিল অত্যাবশ্যক। যে শিক্ষা ঈর্ষাপরায়ণ শক্তিশালী জাতিদের দস্যুবৃত্তি থেকে জাপানকে আত্মরক্ষায় সামর্থ্য দেবে, যে শিক্ষা নগণ্যতা থেকে উদ্ধার করে মানবের মহাসভায় তাকে সম্মানের অধিকারী করবে, সেই শিক্ষার প্রসারসাধনচেষ্টায় অর্থে বা অধ্যবসায়ে সে লেশমাত্র কৃপণতা করে নি। সকলের চেয়ে অনর্থকর কৃপণতা, বিদ্যাকে বিদেশী ভাষার অন্তরালে দূরত্ব দান করা, ফসলের বড়ো মাঠকে বাইরে শুকিয়ে রেখে টবের গাছকে আঙিনায় এনে জলসেচন করা। দীর্ঘকাল ধরে আমাদের প্রতি ভাগ্যের এই অবজ্ঞা আমরা সহজেই স্বীকার করে এসেছি। নিজের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা শিরোধার্য করতে অভ্যস্ত হয়েছি; জেনেছি যে, সম্মুখবর্তী কয়েকটি মাত্র জনবিরল পঙ্‌ক্তিতে ছোটো হাতার মাপে ব্যয়কুণ্ঠ পরিবেষণকেই বলে দেশের এডুকেশন। বিদ্যাদানের এই অকিঞ্চিৎকরত্বকে পেরিয়ে যেতে পারে শিক্ষার এমন ঔদার্যের কথা ভাবতেই আমাদের সাহস হয় নি, যেমন সাহারামরুবাসী বেদুয়িনরা ভাবতেই সাহস পায় না যে, দূরবিক্ষিপ্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র ওয়েসিসের বাইরে ব্যাপক সফলতায় তাদের ভাগ্যের সম্মতি থাকতে পারে। আমাদের দেশে শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যে যে প্রভেদ সে ঐ সাহারা ও ওয়েসিসেরই মতো, অর্থাৎ পরিমাণগত ভেদ এবং জাতিগত ভেদ। আমাদের দেশের রাষ্ট্রশাসন এক, কিন্তু শিক্ষার সংকোচ-বশত চিত্তশাসন এক হতে পারে নি। বর্তমান কালে চীন জাপান পারস্য আরব তুরস্কে প্রাচ্যজাতীয়দের মধ্যে সর্বত্র এই ব্যর্থতাজনক আত্মবিচ্ছিন্নতার প্রতিকার হয়েছে, হয় নি কেবলমাত্র আমাদেরই দেশে।

প্রাণীবিবরণে দেখা যায়, একজাতীয় জীব আছে যারা পরাসক্ত হয়ে জন্মায়, পরাসক্ত হয়েই মরে। পরের অঙ্গীভূত হয়ে কেবল প্রাণধারণমাত্রে তাদের বাধা

ঘটে না, কিন্তু নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিণতি ও ব্যবহারে তারা চিরদিনই থাকে পঙ্গু হয়ে। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা সেইজাতীয়। আরম্ভ থেকেই এই শিক্ষা বিদেশী ভাষার আশ্রয়ে পরজীবী। একেবারেই যে তার পোষণ হয় না তা নয়, কিন্তু তার পূর্ণতা হওয়া অসাধ্য। আত্মশক্তিব্যবহারে সে যে পঙ্গু হয়ে আছে সে কথা সে আপনি অনুভব করতেও অক্ষম হয়ে পড়েছে, কেননা ঋণ করে তার দিন চলে যায়। গৌরব বোধ করে এই ঋণলাভের পরিমাণ হিসাব করে। মহাজন-মহলে সে দাসখত লিখিয়ে দিয়েছে। যারা এই শিক্ষায় পার হল তারা যা ভোগ করে তা উৎপন্ন করে না। পরের ভাষায় পরের বুদ্ধি দ্বারা চিন্তিত বিষয়ের প্রশ্রয় পেয়ে স্বাভাবিক প্রণালীতে নিজে চিন্তা করবার, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করবার আন্তরিক প্রেরণা ও সাহস তাদের দুর্বল হয়ে আসে। পরের কথিত বাণীর আবৃত্তি যতই যন্ত্রের মতো অবিকল হয় ততই তারা পরীক্ষায় কৃতার্থ হবার অধিকারী বলে গণ্য হতে থাকে। বলা বাহুল্য যে, পরাসক্ত মনকে এই চিরদৈন্য থেকে মুক্ত করবার একটা প্রধান উপায়, শিক্ষণীয় বিষয়কে শিশুকাল থেকে নিজের ভাষার ভিতর দিয়ে গ্রহণ করা ও প্রয়োগ করার চর্চা। কে না জানে, আহার্যকে আপন প্রাণের সামগ্রী করে নেবার উপায় হচ্ছে ভোজ্যকে নিজের দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নিজের রসনার রসে জারিয়ে নেওয়া?

এ প্রসঙ্গে এ কথা স্বীকার করা চাই যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার সম্মানের আসন বিচলিত হতে পারবে না। তার কারণ এ নয় যে, বর্তমান অবস্থায় আমাদের জীবনযাত্রায় তার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আজকের দিনে য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান সমস্ত মানবলোকের শ্রদ্ধা অধিকার করেছে, স্বাজাত্যের অভিমানে এ কথা অস্বীকার করলে অকল্যাণ। আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আত্ম-রক্ষার পক্ষে এই শিক্ষার যেমন প্রয়োজন তেমনি মনকে ও ব্যবহারকে মূঢ়তামুক্ত করবার জন্য তার প্রভাব মূল্যবান। যে চিত্ত এই প্রভাবকে প্রতিরোধ করে, একে অঙ্গীকার করে নিতে অক্ষম হয়, সে আপন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ নিরালোক জীবযাত্রায় ক্ষীণজীবী হয়ে থাকে। যে জ্ঞানের জ্যোতি চিরন্তন তা যে-কোনো দিগন্ত থেকেই বিকীর্ণ হোক, অপরিচিত বলে তাকে বাধা দেয় বর্বরতার অস্বচ্ছ মন। সত্যের প্রকাশমাত্রই জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকারগম্য; এই অধিকার মনুষ্যত্বের সহজাত অধিকারেরই অঙ্গ। রাষ্ট্রগত বা ব্যক্তিগত বিষয়সম্পদে মানুষের পার্থক্য অনিবার্য, কিন্তু চিত্তসম্পদের দানসত্রে সর্বদেশে সর্বকালে মানুষ এক। সেখানে দান করবার দাক্ষিণ্যেই দাতা ধন্য ও গ্রহণ করবার শক্তি দ্বারাই গ্রহীতার আত্মসম্মান। সকল দেশেই অর্থভাণ্ডারের দ্বারে কড়া পাহারা, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানভাণ্ডারে সর্বমানবের ঐক্যের দ্বার অর্গলবিহীন। লক্ষ্মী কৃপণ; কারণ লক্ষ্মীর সঞ্চয় সংখ্যাগণিতের সীমায় আবদ্ধ, ব্যয়ের দ্বারা তার ক্ষয় হতে থাকে। সরস্বতী অকৃপণ; কেননা, সংখ্যার পরিমাপে তাঁর ঐশ্বর্যের পরিমাপ নয়, দানের দ্বারা তার বৃদ্ধিই ঘটে। বোধ করি, বিশেষভাবে বাংলাদেশের এই গৌরব করবার কারণ আছে যে, য়ুরোপীয় সংস্কৃতির কাছ থেকে সে আপন প্রাপ্য গ্রহণ করতে বিলম্ব করে নি। এই সংস্কৃতির বাধাহীন সংস্পর্শে অতি অল্পকালের মধ্যে তার সাহিত্য প্রচুর শক্তি ও সম্পদ লাভ করেছে, এ কথা সকলের স্বীকৃত। এই প্রভাবের প্রধান সার্থকতা এই দেখেছি যে, অনুকরণের দুর্বল প্রবৃত্তিকে কাটিয়ে ওঠবার উৎসাহ সে প্রথম থেকে দিয়েছে। আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে যাঁরা বিদ্বান বলে গণ্য ছিলেন তাঁরা যদিচ পড়াশুনোয় চিঠিপত্রে কথাবার্তায় একান্তভাবেই ইংরেজি

ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, যদিচ তখনকার ইংরেজিশিক্ষিত চিত্তে চিন্তার ঐশ্বর্য ভাবরসের আয়োজন মুখ্যত ইংরেজি প্রেরণা থেকেই উদ্ভাবিত, তবু সেদিনকার বাঙালি লেখকেরা এই কথাটি অচিরে অনুভব করেছিলেন যে দূরদেশী ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র, কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত-আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়। পরভাষার মদগর্বে আত্ম-বিস্মৃতির দিনে এই সহজ কথার নূতন আবিষ্কৃতির দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখেছি আমাদের নবসাহিত্যসৃষ্টির উপক্রমেই। ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে মাইকেলের অধিকার ছিল প্রশস্ত, অনুরাগ ছিল সুগভীর। সেইসঙ্গে গ্রীক লাটিন আয়ত্ত করে য়ুরোপীয় সাহিত্যের অমরাবতীতে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন ও তৃপ্ত হয়েছেন সেখানকার অমৃতরসভোগে। স্বভাবতই প্রথমে তাঁর মন গিয়েছিল ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করতে। কিন্তু, এ কথা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি যে ধার-করা ভাষায় সুদ দিতে হয় অত্যধিক, তার উদ্‌বৃত্ত থাকে অতি সামান্য। তিনি প্রথমেই মাতৃভাষায় এমন একটি কাব্যের আবাহন করলেন যে কাব্যে স্খলিতগতি প্রথম-পদচারণার ভীরু সতর্কতা নেই। এই কাব্যে বাহিরের গঠনে আছে বিদেশী আদর্শ, অন্তরে আছে কৃত্তিবাসি বাঙালি কল্পনার সাহায্যে মিল্‌টন-হোমর-প্রতিভার আতিথিসৎকার। এই আতিথ্যে অগৌরব নেই, এতে নিজের ঐশ্বর্যের প্রমাণ হয় এবং তার বৃদ্ধি হতে থাকে।

এই যেমন কাব্যসাহিত্যে মধুসূদন তেমনি আধুনিক বাংলা গদ্য-সাহিত্যের পথমুক্তির আদিতে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন বরণীয় ব্যক্তি। বলা বাহুল্য, তাঁর চিত্ত অনু-প্রাণিত হয়েছিল প্রধানভাবে ইংরেজি শিক্ষায়। ইংরেজি কথাসাহিত্য থেকে তিনি যে প্ররোচনা পেয়েছিলেন তাকে প্রথমেই ইংরেজি ভাষায় রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টার অকৃতার্থতা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি। কিন্তু, যেহেতু বিদেশী শিক্ষা থেকে তিনি যথার্থ সংস্কৃতি লাভ করেছিলেন তাই সেই সংস্কৃতিই তাঁকে আপন সার্থকতার সন্ধানে স্বদেশী ভাষায় টেনে এনেছিল। যেমন দূর গিরি-শিখরের জলপ্রপাত যখন শৈলবক্ষ ছেড়ে প্রবাহিত হয় জনস্থানের মধ্য দিয়ে তখন দুই-তীরবর্তী ক্ষেত্রগুলিকে ফলবান করে তোলে তাদের নিজেরই ভূমি-উদ্ভিন্ন ফলশস্যে, তেমনি নূতন শিক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র ফলবান করে তুলেছেন নিজেরই ভাষাপ্রকৃতির স্বকীয় দানের দ্বারা। তার আগে বাংলাভাষায় গদ্যপ্রবন্ধ ছিল ইস্কুলে-পোড়োদের উপদেশের বাহন। বঙ্কিমের আগে বাঙালি শিক্ষিতসমাজ নিশ্চিত স্থির করেছিলেন যে, তাঁদের ভাবরস-ভোগের ও সত্যসন্ধানের উপকরণ একান্তভাবে য়ুরোপীয় সাহিত্য হতেই সংগ্রহ করা সম্ভব, কেবল অল্পশিক্ষিতদের ধাত্রীবৃত্তি করবার জন্যেই দরিদ্র বাংলাভাষার যোগ্যতা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষার পরিণত শক্তিকেই রূপ দিতে প্রবৃত্ত হলেন বাংলাভাষায় বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রে। বস্তুত নবযুগপ্রবর্তক প্রতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলা-দেশেই য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবী কালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য-আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্যসম্পদের মতো। সেই শস্যের বীজ যদি-বা বিদেশ থেকে উড়ে এসে আমাদের ক্ষেত্রে পড়ে থাকে তবু তার অঙ্কুরিত প্রাণ এখানকার মাটিরই। মাটি যাকে গ্রহণ করতে পারে সে ফসল বিদেশী হলেও আর বিদেশী থাকে না। আমাদের দেশের বহু ফলে ফুলে তার পরিচয় আছে।

ইংরেজি শিক্ষার সার্থকতা আমাদের সাহিত্যে বঙ্গীয় দেহ নিয়ে বিচরণ করছে বাংলার ঘরে ঘরে, এই প্রদেশের শিক্ষানিকেতনেও সে তেমনি আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে দেখা দেবে, এজন্য অনেক দিন আমাদের মাতৃভূমি অপেক্ষা করেছে।

বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় আপন স্বাভাবিক ভাষায় স্বদেশে সর্বজনের আত্মীয়তা-লাভে গৌরবান্বিত হবে, সেই আশার সংকেত আজকের দিনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার সুযোগ আমি পেয়েছি। তাই সমস্ত বাংলাদেশের গর্ব ও আনন্দ বহন করে এই সভায় আজ আমার উপস্থিতি। নতুবা এখানে স্থান পাবার মতো প্রবেশিকার মূল্য দেওয়া আমার দ্বারা সাধ্য হয় নি। আমার জীবনে প্রথম বয়সে স্বল্পক্ষণস্থায়ী ছাত্রদশা কেটেছে অভ্রভেদী শিক্ষাসৌধের অধস্তন তলায়। তার পর কিশোরবয়সে অভিভাবকদের নির্দেশমত একদিন সসংকোচে আমি প্রবেশ করেছিলুম বাহিরঙ্গছাত্ররূপে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথমবার্ষিক শ্রেণীতে। সেই এক দিন আর দ্বিতীয় দিনে পৌঁছল না। আকারে প্রকারে সমস্ত ক্লাসের সঙ্গে আমার এমন-কিছু ছন্দের ব্যত্যয় ছিল যাতে আমাকে দেখবামাত্র পরিহাস উঠল উচ্ছ্বসিত হয়ে। বুঝলুম মণ্ডলীর বাহির থেকে অসামঞ্জস্য নিয়ে এসেছি। পরের দিন থেকেই অনধিকার প্রবেশের দুঃসাহসিকতা থেকে বিরত হয়েছিলেম এবং আর যে কোনো দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হয়ে অধিকারীবর্গের এক পাশে স্থান পাব এমন দুরাশা আমার মনে ছিল না। অবশেষে একদিন মাতৃভাষার সাধনা-পুণ্যেই আজ সেই দুর্লভ অধিকার আমার মিলবে, সেদিন তা স্বপ্নের অতীত ছিল।

বর্তমান যুগ য়ুরোপীয় সভ্যতা-কর্তৃক সম্পূর্ণ অধিকৃত এ কথা মানতেই হবে। এই যুগ একটি বিশেষ উদ্যমশীল চিত্তপ্রকৃতির ভূমিকা সমস্ত জগতে প্রবর্তিত করছে। মানুষের বুদ্ধিগত জ্ঞানগত বিচিত্র চিন্তা ও কর্ম নব নব আকার নিচ্ছে এই ভূমিকার 'পরেই। বুদ্ধিপরিশীলনার বিশেষ গতি ও বিস্তৃতি সভ্য পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মানুষের মধ্যেই একটা ঐক্যলাভে প্রবৃত্ত হয়েছে। বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ই এবং চিন্তা করবার পদ্ধতি, সন্ধান করবার প্রণালী, সত্য যাচাই করবার আদর্শ, য়ুরোপীয় চিত্তের ভূমিকার উপরে উদ্ভাবিত ও আলোচিত হচ্ছে। এটা সম্ভবপর হতই না, যদি এর উপযোগিতা সর্বত্র নিয়ত পরীক্ষার দ্বারা স্বীকৃত না হত, যদি-না এই চিত্ত জয়যুক্ত হত তার সর্বপ্রকার অধ্যবসায়ে। সংসারযাত্রার কৃতার্থতালাভের জন্য আজ পৃথিবীতে সকল নবজাগ্রত দেশই য়ুরোপের এই চিত্তস্রোতকে জনসাধারণের মধ্যে প্রবাহিত করে দেবার চেষ্টায় অবিরাম প্রবৃত্ত। সর্বত্রই বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রজাদের মনঃক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নববিদ্যাসেচনের প্রণালী। এমন দেশও প্রত্যক্ষ দেখেছি নবযুগের প্রভাবে যে আজ বহু দীর্ঘ শতাব্দীর উপেক্ষা-সঞ্চিত স্তূপাকার নিরক্ষরতার বাধা অল্প কালের মধ্যে আশ্চর্য শক্তিতে উত্তীর্ণ হয়েছে: সেখানে যে জনমন একদা ছিল অখ্যাত আকারে আত্মপ্রকাশহীন অকৃতিত্বে লুপ্তপ্রায় সে আজ অবারিত শক্তি নিয়ে মানবসমাজের পুরোভাগে সসম্মানে অগ্রসর। এ দিকে যথোচিত অর্থ-অভাবে শ্রদ্ধা-অভাবে উৎসাহ-অভাবে দীনসম্বল আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনগুলি স্বল্পপরিমিত ছাত্রদেরকে স্বল্পমাত্র বিদ্যায় পরীক্ষা পার করবার স্বল্পায়তন খেয়ানৌকোর কাজ করে চলেছে। দেশের আত্ম-চেতনাহারা বিরাট মনকে স্পর্শ করছে তার প্রান্ততম সীমায়; সে স্পর্শও ক্ষীণ, যেহেতু তা প্রাণবান নয়, যেহেতু সে স্পর্শ আসছে বহিঃস্থিত আবরণের বাধায়

ভিতর দিয়ে। এই কারণে প্রাচ্যমহাদেশের যে-যে অংশে নবদিনের উদ্‌বোধন দেখা দিয়েছে, জ্ঞানজ্যোতির্বিকীর্ণ আত্মপরিচয়ের সম্মান-লাভে তাদের সকলের থেকে বহুদূর পশ্চাতে আছে ভারতবর্ষ।

আমার এবং বাংলাদেশের লেখকবর্গের হয়ে আমি এ কথা বলব যে, আমরা নবযুগের সংস্কৃতিকে দেশের মর্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজ করে আসছি। বর্তমান যুগের নূতন বিদ্যাকে দেশের প্রাণনিকেতনে চিরন্তন করবার এই স্বতঃসক্রিয় উদ্‌যোগকে অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আপন আমন্ত্রণ-ক্ষেত্র থেকে পৃথক করে রেখেছেন, তাকে ভিন্নজাতীয় বলে গণ্য করেছেন। আশুতোষ সর্বপ্রথমে এই বিচ্ছেদের মধ্যে সেতু বেঁধেছিলেন যখন তিনি আমার মতো বাংলাভাষাচর লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার উপাধি দিতে সাহস করলেন। সেদিন যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল। কারণ, ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে কৃত্রিম কৌলীন্যগর্ব আদিকাল থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরে অন্তরে সংস্কারগত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরভাষাশ্রিত আভিজাত্য-বোধকে অকস্মাৎ আঘাত করতে কুণ্ঠিত হলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের তুঙ্গ মঞ্চচূড়া থেকে তিনিই প্রথম নমস্কার প্রেরণ করলেন তাঁর মাতৃভাষার দিকে। তার পরে তিনিই বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাভাষার ধারাকে অবতারণ করলেন, সাবধানে তার স্রোতঃপথ খনন করে দিলেন। পিতৃনির্দিষ্ট সেই পথকে আজ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র বাংলাদেশের আশীর্ভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষামন্ত্র থেকে বঞ্চিত আমার মতো ব্রাত্য বাংলালেখককে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতিলঙ্ঘন করেছেন; আজ তাঁরই পুত্র সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠানে বাংলাভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ করে পুনশ্চ সেই রীতিরই দুটো গ্রন্থি একসঙ্গে মুক্ত করেছেন। এতে বোঝা গেল বাংলাদেশে শিক্ষাজগতে ঋতুপরিবর্তন হয়েছে, পাশ্চাত্য-আবহাওয়ার শীতে-আড়ষ্ট শাখায় আজ এল নবপল্লবের উৎসব।

অন্যত্র ভারতবর্ষে সম্প্রতি এমন বিশ্ববিদ্যালয় দেখা দিয়েছে যেখানে স্থানীয় প্রজাসাধারণের ভাষা না হোক, শ্রেণীবিশেষের ব্যবহৃত ভাষা শিক্ষার বাহনরূপে আদ্যোপান্ত গণ্য হয়েছে এবং সেখানকার প্রধানবর্গ এই দুঃসাধ্য চেষ্টাকে আশ্চর্য সফলতা দিয়ে প্রশংসাভাজন হয়েছেন। এই অচিন্তিতপূর্ব সংকল্প এবং আশাতীত সিদ্ধিও কম গৌরবের বিষয় নয়। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন সমস্ত প্রদেশের প্রজাসাধারণ তার লক্ষ্য। বাংলাভাষার অধিকৃত এই প্রদেশের কোনো কোনো অঙ্গ যদিও শাসনকর্তাদের কাটারি দ্বারা কৃত্রিম বিভাগে বিক্ষত হয়ে বহিষ্কৃত হয়েছে তবু অন্তত পাঁচ কোটি লোকের মাতৃভাষাকে এই শিক্ষার কেন্দ্র আপন ভাষারূপে স্বীকার করবার ইচ্ছা ঘোষণা করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বদেশের প্রতি এই-যে সম্মান নিবেদন করলেন এর দ্বারা তিনি আজ সম্মাননীয়। যে শৌর্যবান পুরুষ স্বদেশের এই সৌভাগ্যের সূচনা করে গেছেন আজকের দিনে সেই আশুতোষের প্রতিও আমাদের সম্মান নিবেদন করি।

আমি জানি, য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার মহত্ত্ব সম্বন্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ জাগবার দিন আজ এসেছে। এই সভ্যতা বস্তুগত ধন-সঞ্চয়ে ও শক্তি-আবিষ্কারে অদ্ভুত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু সমগ্র মনুষ্যত্বের মহিমা তো তার বাহ্য রূপ এবং বাহ্য উপকরণ নিয়ে নয়। হিংস্রতা, লুব্ধতা, রাষ্ট্রিক কূটনীতির কুটিলতা পাশ্চাত্য মহাদেশ থেকে যেরকম প্রচণ্ড মূর্তি ধরে মানুষের স্বাধিকারকে নির্মম-

ভাকে দলন করতে উদ্যত হয়েছে ইতিহাসে এমন আর কোনো দিন হয় নি। মানুষের দুরাকাঙ্ক্ষাকে এমন বৃহৎ আয়তনে, এমন প্রভূত পরিমাণে, এমন সর্ববাধাজয়ী নৈপুণ্যের সঙ্গে জয়যুক্ত করতে কোনো দিন মানুষ সক্ষম হয় নি। আজ তা হতে পেরেছে বিশ্বপরাভবকারী বিজ্ঞানের জোরে। উনিশ শতকের আরম্ভে ও মাঝামাঝি কালে যখন য়ুরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল তখন ভক্তির সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে আমাদের মনে প্রবল ধারণা জন্মেছিল যে, এই সভ্যতা সর্বমানবের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিয়ে জগতে আবির্ভূত; নিশ্চিত স্থির করেছিলুম যে, সত্যনিষ্ঠা ন্যায়পরতা ও মানুষের সম্বন্ধে সুগভীর শ্রেয়োবুদ্ধি এর চরিত্রগত লক্ষণ; ভেবেছিলুম মানুষকে অন্তরে বাহিরে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার ব্রত এই সভ্যতা গ্রহণ করেছে। দেখতে দেখতে আমাদের জীবিত কালের মধ্যেই তার ন্যায়বুদ্ধি, তার মানবমৈত্রী এমনি ক্ষুণ্ণ হল, ক্ষীণ হল যে, বলদর্পিতের পেষণযন্ত্রে পীড়িত মানুষ এই সভ্যতার বিচারসভায় ধর্মের দোহাই দেবে এমন ভরসা আজ কোথাও রইল না। পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে যে-সকল বিশ্ববিশ্রুত দেশ এই সভ্যতার প্রধান বাহন তারা পরস্পরকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবার উদ্দেশ্যে পাশব নখদন্তের অদ্ভুত উৎকর্ষসাধনে সমস্ত বুদ্ধি ও ঐশ্বর্যকে নিযুক্ত করেছে। মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপরিসীম ভীতি, এমন দৃঢ়বদ্ধমূল অবিশ্বাস অন্য কোনো যুগেই দেখা যায় নি। মানবজগতের যে ঊর্ধ্বলোক থেকে আলোক আসে, মুক্তির মন্ত্র যেখানকার বাতাসে সঞ্চারিত হয়, মানবচিত্তের সেই দ্যুলোক রিপুপদদলিত পৃথিবীর উৎক্ষিপ্ত ধূলিতে আবিল, সাংঘাতিক মারীবীজে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ। ইতিপূর্বে পৃথিবীতে আমরা যে-সকল মহা মহা সভ্যতার পরিচয় পেয়েছি তাদের প্রধান সাধনা ছিল মানবজগতের ঊর্ধ্বলোককে নির্মল রাখা, সেখানে পুণ্যজ্যোতির বিকিরণকে অবরোধমুক্ত করা। ধর্মের শাশ্বত নীতির প্রতি বিশ্বাসহীন আজকের দিনে এই সাধনা অশ্রদ্ধাভাজন; সমস্ত পৃথিবীকে নিষ্ঠুর শক্তিতে অভিভূত করবার স্বাভাবিক দায়িত্ব নিয়ে এসেছে বলে যারা গর্ব করে এই সাধনা তাদের মতো শাসক ও শোষক জাতির পক্ষে অনুপযুক্ত বলে গণ্য। উগ্র লোভের তীব্র মাদকরস-পানে উন্মত্ত সভ্যতার পদভারে কম্পান্বিত সমস্ত পাশ্চাত্ত্য মহাদেশ। যে শিক্ষায় কর্মবুদ্ধির সঙ্গে শুভবুদ্ধির এমন বিচ্ছেদ, যে সভ্যতা অসংযত মোহাবেশে আত্মহননোদ্যত, তার গৌরব ঘোষণা করব কোন্ মুখে!

কিন্তু একদিন মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান দেখেছি এই পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্যে ও ইতিহাসে। নিজেকে নিজেই সে আজ ব্যঙ্গ করলেও তার চিত্তের সেই উদার অভ্যুদয়কে মরীচিকা বলে অস্বীকার করতে পারি নে। তার উজ্জ্বল সত্তাই মিথ্যা এবং তার ম্লান বিকৃতিই সত্য, এ কথা বলব না।

সভ্যতার পদস্খলন ও আত্মখণ্ডন ঘটেছে বারবার, নিজের শ্রেষ্ঠ দানকে সে বারবার নিজে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই দুর্ঘটনা দেখেছি আমাদের স্বদেশেও এবং অন্য দেশেও। দেখা গেছে, মানবমহিমার শোচনীয় পতন ইতিহাসের পর্বে পর্বে। কিন্তু এই-সকল সভ্যতা যেখানে মহামূল্য সত্যকে কোনো দিন কোনো আকারে প্রকাশ করেছে সেইখান থেকেই সে চিরদিনের মতো জয় করেছে মানুষের মনকে; জয় করেছে আপন বাহ্য প্রতাপের ধূলিশায়ী ভগ্নস্তূপের উপরে দাঁড়িয়েও। য়ুরোপ মহৎ শিক্ষার উপাদান উপহার দিয়েছে মানুষকে। দেবার শক্তি যদি না থাকত তা হলে কোনো কালেই তার বিশ্বজয়ের যুগ আসত না এ কথা বলা বাহুল্য। সে দিয়েছে আপন অদম্য শৌর্যের, অসংকুচিত আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত; দেখিয়েছে

প্রাণান্তকর প্রয়াস জ্ঞানবিতরণের কাজে, আরোগ্যসাধনের উদ্‌যোগে। আজও এই সাংঘাতিক অধঃপতনের দিনে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ যাঁরা নিঃসন্দেহই ন্যায়ের পক্ষে, দুর্বলের পক্ষে, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাগিয়ে তাঁরা বলদৃপ্তের শাস্তিকে স্বীকার করছেন, দুঃখীর দুঃখকে আপন করে নিচ্ছেন। বারে বারে অকৃতার্থ হলেও তাঁরাই আশু পরাভবের মধ্য দিয়েও এই সভ্যতার প্রতিভূ। যে প্রেরণায় চারি দিকের কঠোর অত্যাচার ও চরিত্রবিকৃতির মধ্যে তাঁদের লক্ষ্যকে অবিচলিত রেখেছে সে প্রেরণাই এই সভ্যতার মর্মগত সত্য, তার থেকেই পৃথিবী শিক্ষা গ্রহণ করবে, পাশ্চাত্ত্য জাতির লজ্জাজনক অমানুষিক আত্মাবমাননা থেকে নয়।

তোমরা যে-সকল তরুণ ছাত্র আজ এই সভায় উপস্থিত, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার দিয়ে জীবনের জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হতে প্রস্তুত, তোমাদের প্রতি আমার অভিনন্দন জানাই। তোমরাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গৌরবদিনের প্রভূত সফলতার প্রত্যাশা আগামী কালের পথে বহন করতে যাত্রা করছ।

আজ প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছে পৃথিবীব্যাপী জনসমুদ্রে। যেন সমস্ত সভ্য জগৎকে এক কল্প থেকে আর-এক কল্পের তটে উৎক্ষিপ্ত করবার জন্যে দেবদৈত্যে মিলে মন্থন শুরু হয়েছে। এবারকারও মন্থনরজ্জু বিষধর সর্প, বহুফণাধারী লোভের সর্প। সে বিষ উদ্গার করছে। আপনার মধ্যে সমস্ত বিষটাকে জীর্ণ করে নেবেন এমন মৃত্যুঞ্জয় শিব পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মর্মস্থানে আসীন আছেন কি না এখনো তার প্রমাণ পাই নি। ভারতবর্ষে আমরা আছি কালের রুদ্রলীলাসমুদ্রের তটসীমায়। বর্তমান মানবসমাজের এই দুঃখের আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেবার উপলক্ষ আমাদের ঘটে নি। কিন্তু, ঘূর্ণির টান বাহির থেকে আসছে আমাদের উপরে এবং ভিতরের থেকেও দুর্গতির ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়ছে আমাদের দক্ষিণে বামে। সমস্যার পর দুঃসাধ্য সমস্যা এসে অভিভূত করছে দেশকে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পরস্পর-বিচ্ছেদ ও বিরোধ নানা কদর্য মূর্তিতে প্রকাশিত হয়ে উঠল; বিকৃতি আনলে আমাদের আত্মকল্যাণবোধে। এই সমস্যার সমাধান সহজে হবার নয়, সমাধান না হলেও নিরবচ্ছিন্ন দুর্গতি।

সমস্ত দেশের সংস্কৃতি সৌভ্রাত্র সচ্ছলতা একদা বিকীর্ণ ছিল আমাদের গ্রামে। আজ সেখানে প্রবেশ করলে দেখতে পাবে, মরণদশা তার বুকে খর নখর বিদ্ধ করেছে একটা রক্তশোষী শ্বাপদের মতো। অনশন ও দুঃখদারিদ্র্যের সহচর মজ্জাগত মারী সমস্ত জাতির জীবনীশক্তিকে জীর্ণজর্জর করে দিয়েছে। এর প্রতিকার কোথায় সে কথা ভাবতে হবে আমাদের নিজেকে— অশিক্ষিত কল্পনার দ্বারা নয়, ভাববিহ্বল দৃষ্টির বাষ্পাকুলতা দিয়ে নয়। এই পণ করে চলতে হবে যে, পরাস্ত যদি হতেও হয় তবে সে যেন প্রতিকূল অবস্থার কাছে ভীরুর মতো হাল ছেড়ে দিয়ে নয়; যেন নির্বোধের মতো নির্বিচারে আত্মহত্যার মাঝদরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে পড়াকেই গর্বের বিষয় না মনে করি।

ভাবপ্রবণতা আছে আমাদের দেশে অতিপরিমাণে। কর্মোদ্‌যোগে নিজেকে অপ্রমত্তভাবে প্রবৃত্ত করতে আমাদের মন যায় না। অবাস্তবের মোহাবেশ কাটিয়ে পুরুষের মতো উজ্জ্বল বুদ্ধির আলোকে দেশের সমস্ত অসম্পূর্ণতা মূঢ়তা কদর্যতা সব-কিছুকে অত্যুক্তিবর্জিত করে জেনে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করো। যেখানে বাস্তবের ক্ষেত্রে ভাগ্য আমাদের প্রতিদিন বঞ্চিত করে, অবমানিত করে, সেখানে ঘর-গড়া অহংকারে নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা দুর্বল চিত্তের দুর্লক্ষণ। সত্যকার কাজ আরম্ভ করার মুখে এ কথা মানাই চাই যে, আমাদের সমাজে, আমাদের

স্বভাবে, আমাদের অভ্যাসে, আমাদের বুদ্ধি-বিকারে গভীরভাবে নিহিত হয়ে আছে আমাদের সর্বনাশ। যখনই আমাদের দুর্গতির সকল দায়িত্ব একমাত্র বাহিরের অবস্থার অথবা অপর কোনো পক্ষের প্রতিকূলতার উপর আরোপ করে বধির শূন্যের অভিমুখে তারস্বরে অভিযোগ ঘোষণা করি তখনই হতাশ্বাস ধৃতরাষ্ট্রের মতো মন বলে ওঠে : তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

আজ আমাদের অভিযান নিজের অন্তর্নিহিত আত্মশত্রুতার বিরুদ্ধে; প্রাণপণ আঘাত হানতে হবে বহুশতাব্দীনির্মিত মূঢ়তার দুর্গভিত্তি-মূলে। আগে নিজের শক্তিকে তামসিকতার জড়িমা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে তার পরে পরের শক্তির সঙ্গে আমাদের সম্মানিত সন্ধি হতে পারবে। নইলে আমাদের সন্ধি হবে ঋণের জালে, ভিক্ষুকতার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে আড়ষ্টকর পাকে জড়িত। নিজের শ্রেষ্ঠতার দ্বারাই অন্যের শ্রেষ্ঠতাকে আমরা জাগাতে পারি, তাতেই মঙ্গল আমাদের ও অন্যের। দুর্বলের প্রার্থনা যে কুণ্ঠাগ্রস্ত দান সঞ্চয় করে সে দান শতছিদ্র ঘটের জল, যে আশ্রয় পায় চোরাবালিতে সে আশ্রয়ের ভিত্তি।

হে বিধাতা,
দাও দাও মোদের গৌরব দাও
দুঃসাধ্যের নিমন্ত্রণে
দুঃসহ দুঃখের গর্বে।
টেনে তোলো রসাক্ত ভাবের মোহ হতে।
সবলে ধিক্‌কৃত করো দীনতার ধূলায় লুণ্ঠন।
দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধ,
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে
মানবমর্যাদাবিসর্জন,
চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি
নিষ্ঠুর আঘাতে।
নিঃসংকোচে
মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে
উদাত্ত আলোকে
মুক্তির বাতাসে।

৫ ফাল্গুন ১৩৪০

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটির ঠিক বাস্তব রূপ কী তার স্পষ্ট ধারণা আজ অসম্ভব। মোটের উপর এই বুঝি যে আমরা যাঁদের ঋষিমুনি বলে থাকি অরণ্যে ছিল তাঁদের সাধনার স্থান। সেই সঙ্গেই ছিল স্ত্রী পরিজন নিয়ে তাঁদের গার্হস্থ্য। এই সকল আশ্রমে কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষের আলোড়ন যথেষ্ট ছিল, পুরাণের আখ্যায়িকায় তার বিবরণ মেলে।

কিন্তু তপোবনের যে চিত্রটি স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে পরবর্তী ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে, সেটি হচ্ছে কল্যাণের নির্মল সুন্দর মানসমূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত বলবান আনন্দের মূর্তি। অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের জটিলতা আবিলতা অসম্পূর্ণতা থেকে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা এই কাম্যলোক সৃষ্টি করে তুলেছিল ইতিহাসের অস্পষ্ট স্মৃতির উপকরণ নিয়ে। পরবর্তীকালে কবিদের বেদনার মধ্যে যেন দেশব্যাপী একটি নির্বাসন-দুঃখের আভাস পাওয়া যায়, কালিদাসের রঘুবংশে তার সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। সেই নির্বাসন তপোবনের উপকরণবিরল শান্ত সুন্দর যুগের থেকে ভোগৈশ্বর্যজালে বিজড়িত তামসিক যুগে।

কালিদাসের বহুকাল পরে জন্মেছি, কিন্তু এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। যৌবনে নিভৃতে ছিলুম পদ্মাবক্ষে সাহিত্যসাধনায়। কাব্যচর্চার মাঝখানে কখন এক সময়ে সেই তপোবনের আহ্বান আমার মনে এসে পৌঁচেছিল। ভাববিলীন তপোবন আমার কাছ থেকে রূপ নিতে চেয়েছিল আধুনিককালের কোনো একটি অনুকূল ক্ষেত্রে। যে প্রেরণা কাব্যরূপ-রচনায় প্রবৃত্ত করে, এর মধ্যে সেই প্রেরণাই ছিল—কেবলমাত্র বাণীরূপ নয়, প্রত্যক্ষরূপ।

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্যে যে-একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না। এই শিক্ষার জন্যে আশ্রমের দরকার, যেখানে আছে সমগ্রজীবনের সজীব ভূমিকা।

তপোবনের কেন্দ্রস্থলে আছেন গুরু। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ। নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্য-সাধনে তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যদের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যদের জীবন এই যে প্রেরণা পাচ্ছে সে তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটিই আশ্রমের শিক্ষায় সব চেয়ে মূল্যবান উপাদান—অধ্যাপনার বিষয় নয়, পদ্ধতি নয়, উপকরণ নয়। গুরুর মন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ দেওয়ার আনন্দেই নিজের সত্যতা সপ্রমাণ করে, যেমন যথার্থ ঐশ্বর্যের পরিচয় ত্যাগের স্বাভাবিকতায়।

পণ্য উৎপাদন ব্যাপারটাকে বিপুল ও দ্রুত করবার জন্যেই আধুনিককালে যন্ত্রযোগে ভূরি উৎপাদনের প্রবর্তন। পণ্যবস্তু প্রাণবান নয়, হাইড্রলিক জাঁতার চাপে তাদের কোনো কষ্ট নেই। কিন্তু শিক্ষা ব্যাপারটা ভূরি উৎপাদনের যান্ত্রিক চেষ্টায় নীরস নৈর্ব্যক্তিক প্রণালীতে মানুষের মনকে পীড়িত করবেই। ধরে নিতে হবে আশ্রমের শিক্ষা সেই শিক্ষার কারখানাঘর হবে না। এখানে প্রত্যেক ছাত্রের মনের উপর শিক্ষকের প্রাণগত স্পর্শ থাকবে, তাতে উভয় পক্ষেরই আনন্দ।

একদা একজন জাপানী ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলাম, বাগানের কাজে তাঁর ছিল বিশেষ শখ। তিনি বলেছিলেন, আমি বৌদ্ধ, মৈত্রীর সাধক। আমি ভালোবাসি গাছপালা, ওদের মধ্যে এই ভালোবাসার অনুভূতি প্রবেশ করে, ওদের কাছ থেকে সেই ভালোবাসারই পাই প্রতিদান। কেবলমাত্র নিপুণ মালীর সঙ্গে প্রকৃতির এই স্বতঃ-আনন্দের যোগ থাকে না। বলা বাহুল্য মানুষ-মালীর সম্বন্ধে এ কথা যে সম্পূর্ণ সত্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মনের সঙ্গে মন মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি সৃজনশক্তিশীল। আশ্রমের শিক্ষাদান এই খুশির দান। যাঁদের মনে কর্তব্যবোধ আছে কিন্তু খুশি নেই তাঁদের দোসরা পথ।

পুরাকালে আমাদের দেশের গৃহস্থ ধনের দায়িত্ব স্বীকার করতেন। যথাকালে যথাস্থানে যথাপাত্রে দান করার দ্বারা তিনি নিজেকেই জানতেন সার্থক। তেমনি যিনি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, জ্ঞান বিতরণের দায়িত্ব তিনি স্বতই গ্রহণ করতেন। তিনি জানতেন, যা পেয়েছেন তা দেবার সুযোগ না পেলে পাওয়াই থাকে অসম্পূর্ণ। গুরুশিষ্যের মধ্যে এই পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মাধ্যম্স্থ্য বলে জেনেছি।

আরো একটি কথা আমার মনে ছিল। গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় তা হলে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। শুধু সামীপ্য নয়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই। নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না। নদীর সঙ্গে যদি প্রকৃত শিক্ষকের তুলনা করি তবে বলব, কেবল ডাইনে বাঁয়ে কতকগুলো বুড়ো বুড়ো উপনদী-যোগেই তিনি পূর্ণ নন। তাঁর প্রথম আরম্ভের লীলাচঞ্চল কলহাস্যমুখর ঝরনার প্রবাহ পাথরগুলোর মধ্যে হারিয়ে যায় নি। যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক পেলেই তাঁর আপন ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি ছুটে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকেই তাঁকে স্বশ্রেণীর জীব বলে চিনতে না পারে, যদি মনে করে লোকটা যেন প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী, তবে থাবার আড়ম্বর দেখে নির্ভয়ে সে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না। সাধারণত আমাদের গুরুরা প্রবীণতা সপ্রমাণ করতেই চান, প্রায়ই ওটা সস্তায় কর্তৃত্ব করবার প্রলোভনে, ছেলেদের আঙিনায় চোপদার না নিয়ে এগোলে সম্ভ্রম নষ্ট হবার ভয়ে তাঁরা সতর্ক। তাই পাকা শাখায় কচি শাখায় ফুল ফোটাবার ফল ফলাবার মর্মগত সহযোগ রুদ্ধ হয়ে থাকে।

আর-একটা গুরুতর কথা আমার মনে ছিল। ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের সামগ্রী। আরামকেদারায় তারা আরাম চায় না, গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির অন্তরে আদিম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল, শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চার করে। জীবনের আরম্ভে অভ্যাসের দ্বারা অভিভূত হবার আগে কৃত্রিমতার জাল থেকে ছুটি পাবার জন্যে ছেলেরা ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে, সহজ প্রাণলীলার অধিকার তারা দাবি করে বয়স্কদের শাসন এড়িয়ে। আরণ্যক ঋষিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের ছেলে, তাই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন, যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্‌—এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। এ কি বর্গ্‌সঁ-এর বচন। এ মহান শিশুর বাণী। বিশ্বপ্রাণের এই স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে, শহরের বোবা কালা মরা দেওয়ালগুলোর বাইরে। আমাদের আশ্রমের ছেলেরা এই প্রাণময়ী প্রকৃতিকে কেবল যে খেলায় ধুলায় নানা রকম করে কাছে পেয়েছে তা নয়,

আমি গানের রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেছি তাদের মনকে প্রকৃতির রঙমহলে।

তার পরে আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথা। মনে পড়ছে, কাদম্বরীতে একটি বর্ণনা আছে—তপোবনে আসছে সন্ধ্যা, যেন গোষ্ঠে-ফিরে-আসা পাটলী হোমধেনুটির মতো। শুনে মনে পড়ে যায় সেখানে গোরু চরানো, গো দোহন, সমিধ্ আহরণ, অতিথি-পরিচর্যা, আশ্রম-বালকবালিকাদের দিনকৃত্য। এই সব কর্মপর্যায়ের দ্বারা তপোবনের সঙ্গে তাদের নিত্য-প্রবাহিত জীবনের যোগধারা। প্রাণায়ামের ফাঁকে ফাঁকে কেবলি যে সামমন্ত্র আবৃত্তি তা নয়, সহকারিতার সখ্য বিস্তারে সকলে মিলে আশ্রমের সৃষ্টিকার্য পরিচালন; তাতে করে আশ্রম হত আশ্রমবাসীদের নিজ হাতের সম্মিলিত রচনা, কর্মসমবায়ে। আমাদের আশ্রমে এই সতত-উদ্যমশীল কর্মসহযোগিতা কামনা করেছি। মাস্টারমশায় গোরু চরাবার কাজে ছেলেদের লাগালে তারা খুশি হত সন্দেহ নেই, দুর্ভাগ্যক্রমে এ যুগে তা সম্ভব হবে না। তবু শরীর মন খাটাবার কাজ বিস্তর আছে যা এ যুগে মানাত। কিন্তু হায় রে, পড়া মুখস্থ সর্বদাই থাকে বাকি, পাতা ভরে রয়েছে কন্‌জুগেশন্ অফ ইংরেজি ভর্ব্‌স্। তা হোক, আমি যে বিদ্যানিকেতনের কল্পনা করেছি পড়া-মুখস্থর কড়া পাহারা ঠেলেঠুলে তার মধ্যে পরস্পরের সেবা এবং পরিবেশ-রচনার কাজকে প্রধান স্থান দিয়েছি।

আশ্রমের শিক্ষাকে যথার্থভাবে সফল করতে হলে জীবনযাত্রাকে যথাসম্ভব উপকরণবিরল করে তোলা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। মানুষের প্রকৃতিতে যেখানে জড়তা আছে সেখানে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা কুশ্রী উচ্ছৃঙ্খল এবং মলিন হতে থাকে, সেখানে তার স্বাভাবিক বর্বরতা প্রকাশে বাধা পায় না। ধনীসমাজে আন্তরিক শক্তির অভাব থাকলেও বাহ্যিক উপকরণ-প্রাচুর্যে কৃত্রিম উপায়ে এই দীনতাকে চাপা দিয়ে রাখা যায়। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই ধনীগৃহে সদর-অন্দরের প্রভেদ দেখলে এই প্রকৃতিগত তামসিকতা ধরা পড়ে।

আপনার চার দিককে নিজের চেষ্টায় সুন্দর সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর করে তুলে একত্র বাসের সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই সহজ করে তোলা চাই। একজনের শৈথিল্য অন্যের অসুবিধা অস্বাস্থ্য ও ক্ষতির কারণ হতে পারে এই বোধটি সভ্য জীবনযাত্রার ভিত্তিগত। সাধারণত আমাদের দেশের গার্হস্থ্যের মধ্যে এই বোধের ত্রুটি সর্বদাই দেখা যায়।

সহযোগিতার সভ্যনীতিকে সচেতন করে তোলা আশ্রমের শিক্ষার প্রধান সুযোগ। এই সুযোগটিকে সফল করবার জন্যে শিক্ষার প্রথম বর্গে উপকরণলাঘব অত্যাবশ্যক। একান্ত বস্তুপরায়ণ স্বভাবে প্রকাশ পায় চিত্তবৃত্তির স্থূলতা। সৌন্দর্য এবং সুব্যবস্থা মনের জিনিস। সেই মনকে মুক্ত করা চাই কেবল আলস্য এবং অনৈপুণ্য থেকে নয়, বস্তুলুব্ধতা থেকে। রচনাশক্তির আনন্দ ততই সত্য হয় যতই তা জড় বাহুল্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। বিচিত্র উপকরণকে সুবিহিত-ভাবে ব্যবহার করবার সুযোগ উপযুক্ত বয়সে ও অবস্থায় লাভ করবার সুযোগ অনেকের ঘটতে পারে, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই ব্যবহার্য বস্তুগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষাটা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়ে থাকে। সেই বয়সেই প্রতিদিন অল্প কিছু সামগ্রী যা হাতের কাছে পাওয়া যায় তাই দিয়েই সৃষ্টির আনন্দকে সুন্দর করে উদ্ভাবিত করবার চেষ্টা যেন নিরলস হতে পারে এবং সেই সঙ্গেই সাধারণের সুখ স্বাস্থ্য সুবিধা-বিধানের কর্তব্যে ছাত্রেরা যেন আনন্দ পেতে শেখে এই আমার কামনা।

আমাদের দেশে ছেলেদের আত্মকর্তৃত্বের বোধকে অসুবিধাজনক আপদজনক ও ঔদ্ধত্য মনে করে সর্বদা দমন করা হয়। এতে করে পরনির্ভরতার লজ্জা তাদের চলে যায়, পরের প্রতি দাবির আবদার তাদের বেড়ে যায়, ভিক্ষুকতার ক্ষেত্রেও তাদের অভিমান প্রবল হতে থাকে, আর পরের ত্রুটি নিয়ে কলহ করেই তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই লজ্জাকর দীনতা চার দিকে সর্বদাই দেখা যাচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পাওয়াই চাই। ছাত্রদের স্পষ্ট বোঝা উচিত, যেখানে নালিশ কথায় কথায় মুখর হয়ে ওঠে সেখানে সঞ্চিত আছে নিজেরই লজ্জার কারণ, আত্মসম্মানের বাধা। ত্রুটি সংশোধনের দায় নিজে গ্রহণ করার উদ্যম যাদের আছে, খুঁতখুঁত করার কাপুরুষতায় তারা ধিক্কার বোধ করে। আমার মনে আছে ছাত্রদের প্রাত্যহিক কাজে যখন আমার যোগ ছিল তখন একদল বয়স্ক ছাত্র আমার কাছে নালিশ করেছিল যে, অন্নভরা বড়ো বড়ো ধাতুপাত্র পরিবেশনের সময় মেজের উপর দিয়ে টানতে টানতে তার তলা ক্ষয়ে গিয়ে ঘর-ময় নোংরামির সৃষ্টি হয়। আমি বললুম, তোমরা পাচ্ছ দুঃখ, অথচ স্বয়ং এর সংশোধনের চিন্তামাত্র তোমাদের মনে আসে না, তাকিয়ে আছ আমি এর প্রতিবিধান করব। এই সামান্য কথাটা তোমাদের বুদ্ধিতে আসছে না যে, ঐ পাত্রটার নিচে একটা বিড়ে বেঁধে দিলেই ঘর্ষণ নিবারণ হয়। তার একমাত্র কারণ, তোমরা জান নিষ্ক্রিয়ভাবে ভোক্তৃত্বের অধিকারই তোমাদের আর কর্তৃত্বের অধিকার অন্যের। এইরকম ছেলেই বড়ো হয়ে সকল কর্মেই কেবল খুঁতখুঁতের বিস্তার করে নিজের মজ্জাগত অকর্মণ্যতার লজ্জাকে দশ দিকে গুঞ্জরিত করে তোলে।

এই বিদ্যালয়ের প্রথম থেকেই আমার মনে ছিল আশ্রমের নানা ব্যবস্থার মধ্যে যথাসম্ভব পরিমাণে ছাত্রদের কর্তৃত্বের অবকাশ দিয়ে অক্ষম কলহপ্রিয়তার ঘৃণ্যতা থেকে তাদের চরিত্রকে রক্ষা করব।

উপকরণের বিরলতা নিয়ে অসংগত ক্ষোভের সঙ্গে অসন্তোষ-প্রকাশের মধ্যেও চরিত্রদৌর্বল্য প্রকাশ পায়। আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই ভালো, অভ্যস্ত হওয়া চাই স্বল্পে, অনায়াসে প্রয়োজনের জোগান দেওয়ার দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আদুরে করে তোলা তাদের ক্ষতি করা। সহজেই তারা যে এত কিছু চায় তা নয়, তারা আত্মতৃপ্ত ; আমরাই বয়স্কলোকের চাওয়াটা কেবলি তাদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে বস্তুর নেশা-গ্রস্ত করে তুলি। গোড়া থেকেই শিক্ষার প্রয়োজন এই কথা ভেবে যে, কত অল্প নিয়ে চলতে পারে। শরীর মনের শক্তির সম্যক্‌রূপে চর্চা সেইখানেই ভালো করে সম্ভব যেখানে বাইরের সহায়তা অনতিশয়। সেখানে মানুষের আপনার সৃষ্টি-উদ্যম আপনি জাগে। যাদের না জাগে প্রকৃতি তাদেরকে আবর্জনার মতো ঝেঁটিয়ে ফেলে দেয়। আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টিকর্তৃত্ব। সেই মানুষই যথার্থ স্বরাট্‌ যে আপনার রাজ্য আপনি সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে মেয়েদের হাতে অতিলালিত ছেলেরা মনুষ্যোচিত সেই আত্মপ্রবর্তনার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বঞ্চিত। তাই আমরা অন্যদের শক্ত হাতের চাপে অন্যদের ইচ্ছার নমুনায় রূপ নেবার জন্যে অত্যন্ত কাদামাখাভাবে প্রস্তুত। তাই আপিসের নিম্নতম বিভাগে আমরা আদর্শ কর্মচারী।

এই উপলক্ষে আর একটা কথা আমার বলবার আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শরীর-তন্তুর শৈথিল্য বা অন্য যে কারণবশতই হোক আমাদের মানসপ্রকৃতিতে ঔৎসুক্যের অত্যন্ত অভাব। একবার আমেরিকা থেকে জল-তোলা বায়ুচক্র আনিয়েছিলুম। প্রত্যাশা করেছিলুম প্রকাণ্ড এই যন্ত্রটার ঘূর্ণিপাখার চালনা দেখতে ছেলেদের আগ্রহ হবে। কিন্তু দেখলুম অতি অল্প ছেলেই ওটার দিকে

ভালো করে তাকালে। ওরা নিতান্তই আলগাভাবে ধরে নিলে ও একটা জিনিস মাত্র। কেবল একজন নেপালী ছেলে ওটাকে মন দিয়ে দেখেছে। টিনের বাক্স কেটে সে ওর একটা নকলও বানিয়েছে। মানুষের প্রতি আমাদের ছেলেদের ঔৎসুক্য দুর্বল, গাছপালা পশুপাখির প্রতিও। স্রোতের শ্যাওলার মতো ওদের মন ভেসে বেড়ায়, চার দিকের জগতে কোনো কিছুকেই আঁকড়ে ধরে না।

নিরৌৎসুক্যই আন্তরিক নির্জীবতা। আজকের দিনে যে সব জাতি সমস্ত পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে সমস্ত পৃথিবীর সব কিছুরই উপরে তাদের ঔৎসুক্যের অন্ত নেই। কেবলমাত্র নিজের দেশের মানুষ ও বস্তু সম্বন্ধে নয়, এমন দেশ নেই এমন কাল নেই এমন বিষয় নেই যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে। মন তাদের সর্বতোভাবে বেঁচে আছে—তাদের এই সজীব চিত্তশক্তি জয়ী হল সর্বজগতে।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকবার শিক্ষা। মরা মন নিয়েও পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর ঊর্ধ্বশিখরে ওঠা যায়; আমাদের দেশে প্রত্যহ তার পরিচয় পাই। তারাই আমাদের দেশের ভালো ছেলে যাদের মন গ্রন্থের পত্রচর, ছাপার অক্ষরে একান্ত আসক্ত, বাইরের প্রত্যক্ষ জগতের প্রতি যাদের চিত্তবিক্ষেপের কোনো আশঙ্কা নেই। এরা পদবী অধিকার করে, জগৎ অধিকার করে না। প্রথম থেকে আমার সংকল্প এই ছিল, আমার আশ্রমের ছেলেরা চারি দিকের জগতের অব্যবহিত সম্পর্কে উৎসুক হয়ে থাকবে—সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। অর্থাৎ এখানে এমন-সকল শিক্ষক সমবেত হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে গেছে, যাঁরা চক্ষুষ্মান, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে এবং সেই জ্ঞানের বিষয়বিস্তারে, যাঁদের প্রেরণাশক্তি সহযোগীমণ্ডল সৃষ্টি করে তুলতে পারে।

সব শেষে বলব আমি যেটাকে সব চেয়ে বড়ো মনে করি এবং যেটা সব চেয়ে দুর্লভ। তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান, ছেলেদের প্রতি স্নেহ যাঁদের স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে যথার্থ বিপদের কথা এই যে, যাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার, ক্ষমতায় তারা তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে অসহিষ্ণু হওয়া এবং বিদ্রূপ করা অপমান করা শাস্তি দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব। যাকে বিচার করা যায় তার যদি কোনোই শক্তি না থাকে তবে অবিচার করাই সহজ হয়ে ওঠে। ক্ষমতা ব্যবহার করবার স্বাভাবিক যোগ্যতা যাদের নেই অক্ষমের প্রতি অবিচার করতে কেবল যে তাদের বাধা থাকে না তা নয়, তাদের আনন্দ থাকে। ছেলেরা অবোধ হয়ে দুর্বল হয়ে মায়ের কোলে আসে, এইজন্যে তাদের রক্ষার প্রধান উপায় মায়ের মনে অপর্যাপ্ত স্নেহ। তৎসত্ত্বেও স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতা ও শক্তির অভিমান স্নেহকে অতিক্রম করেও ছেলেদের 'পরে অন্যায় অত্যাচারে প্রবৃত্ত করে, ঘরে ঘরে তার প্রমাণ দেখা যায়। ছেলেদের মানুষ হবার পক্ষে এমন বাধা অল্পই আছে। ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত দেখলে আমি শিক্ষকদেরই দায়ী করে থাকি। পাঠশালায় মূর্খতার জন্যে ছাত্রদের 'পরে যে নির্যাতন ঘটে তার বারো আনা অংশ গুরুমশায়ের নিজেরই প্রাপ্য। বিদ্যালয়ের কাজে আমি যখন নিজে ছিলুম তখন শিক্ষকের কঠোর বিচার থেকে ছাত্রকে রক্ষা করা আমার দুঃসাধ্য সমস্যা ছিল। অপ্রিয়তা স্বীকার করে আমাকে এ কথা বোঝাতে হয়েছে, শিক্ষার কাজটাকে বলের দ্বারা সহজ করবার জন্যেই যে শিক্ষক আছেন তা নয়। আজ পর্যন্ত মনে আছে চরম শাসন থেকে এমন অনেক

ছাত্রকে রক্ষা করেছি যার জন্যে অনুতাপ করতে হয় নি। রাষ্ট্রতন্ত্রেই কী আর শিক্ষাতন্ত্রেই কী, কঠোর শাসননীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ।

প্র আষাঢ় ১৩৪৩

২

শিলাইদহে পদ্মাতীরে সাহিত্যচর্চা নিয়ে নিভৃতে বাস করতুম। একটা সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে সেখান থেকে এলেম শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে।

তখন আশ্রমের পরিধি ছিল ছোটো। তার দক্ষিণ সীমানায় দীর্ঘ সার-বাঁধা শালগাছ। মাধবী-লতা-বিতানে প্রবেশের দ্বার। পিছনে পূব দিকে আমবাগান, পশ্চিম দিকে কোথাও-বা তাল, কোথাও-বা জাম, কোথাও-বা ঝাউ, ইতস্তত গুটিকয়েক নারকেল। উত্তরপশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন দুটি ছাতিমের তলায় মার্বেল পাথরে বাঁধানো একটি নিরলংকৃত বেদী। তার সামনে গাছের আড়াল নেই, দিগন্ত পর্যন্ত অবারিত মাঠ, সে মাঠে তখনো চাষ পড়ে নি। উত্তর দিকে আমলকী-বনের মধ্যে অতিথিদের জন্যে দোতলা কোঠা আর তারি সংলগ্ন রান্নাবাড়ি প্রাচীন কদমগাছের ছায়ায়। আর একটি মাত্র পাকা বাড়ি ছিল একতলা, তারি মধ্যে ছিল পুরানো আমলের বাঁধানো তত্ত্ববোধিনী এবং আরো কিছু বইয়ের সংগ্রহ। এই বাড়িটিকেই পরে প্রশস্ত করে এবং এর উপরে আর একতলা চড়িয়ে বর্তমান গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। আশ্রমের বাইরে দক্ষিণের দিকে বাঁধ তখন ছিল বিস্তৃত এবং জলে ভরা। তার উত্তরের উঁচু পাড়িতে বহুকালের দীর্ঘ তালশ্রেণী। আশ্রম থেকে দেখা যেত বিনা বাধায়। আশ্রমের পূর্ব সীমানায় বোলপুরের দিকে ছায়াশূন্য রাঙামাটির রাস্তা গেছে চলে। সে রাস্তায় লোকচলাচল ছিল সামান্য। কেননা শহরে তখনো ভিড় জমে নি, বাড়ি ঘর সেখানে অল্পই। ধানের কল তখনো আকাশে মলিনতা ও আহার্যে রোগ বিস্তার করতে আরম্ভ করে নি। চারিদিকে বিরাজ করত বিপুল অবকাশ নীরব নিস্তব্ধ।

আশ্রমের রক্ষী ছিল বৃদ্ধ দ্বারী সর্দার, ঋজু দীর্ঘ প্রাণসার তার দেহ। হাতে তার লম্বা পাকা-বাঁশের লাঠি, প্রথম বয়সের দস্যুবৃত্তির শেষ নিদর্শন। মালী ছিল হরিশ, দ্বারীর ছেলে। অতিথিভবনের একতলায় থাকতেন দ্বিপেন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকজন অনুচর-পরিচর নিয়ে। আমি সস্ত্রীক আশ্রয় নিয়েছিলুম দোতলার ঘরে।

এই শান্ত জনবিরল শালবাগানে অল্প কয়েকটি ছেলে নিয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহায়তায় বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেছিলুম। আমার পড়াবার জায়গা ছিল প্রাচীন জামগাছের তলায়।

ছেলেদের কাছে বেতন নেওয়া হত না, তাদের যা কিছু প্রয়োজন সমস্ত আমিই জুগিয়েছি। একটা কথা ভুলেছিলুম যে সেকালে রাজস্বের ষষ্ঠ ভাগের বরাদ্দ ছিল তপোবনে, আর আধুনিক চতুষ্পাঠীর অবলম্বন সামাজিক ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে নিত্যপ্রবাহিত দানদক্ষিণা। অর্থাৎ এগুলি সমাজেরই অঙ্গ, এদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কোনো ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন ছিল না। অথচ আমার আশ্রম ছিল একমাত্র আমারি ক্ষীণ শক্তির উপরে নির্ভর করে। গুরুশিষ্যের মধ্যে আর্থিক

দেনাপাওনার সম্বন্ধ থাকা উচিত নয় এই মত একদা সত্য হয়েছিল যে সহজ উপায়ে, বর্তমান সমাজে সেটা প্রচলিত না থাকা সত্ত্বেও মতটাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করতে গেলে কর্মকর্তার আত্মরক্ষা অসাধ্য হয়ে ওঠে, এই কথাটা অনেকদিন পর্যন্ত বহু দুঃখে আমার দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে। আমার সুযোগ হয়েছিল এই যে, ব্রহ্মবান্ধব এবং তাঁর খৃস্টান শিষ্য রেবাচাঁদ ছিলেন সন্ন্যাসী। এই কারণে অধ্যাপনার আর্থিক ও কর্ম-ভার লঘু হয়েছিল তাঁদের দ্বারা। এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা সর্বাপেক্ষা আমার মনে জাগছে, তাঁর কথা কোনোদিন ভুলতে পারি নে। গোড়া থেকে বলা যাক।

এই সময়ে দুটি তরুণ যুবক, তাঁদের বালক বললেই হয়, এসে পড়লেন আমার কাছে। অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর বন্ধু কবি সতীশচন্দ্র রায়কে নিয়ে এলেন আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়িতে, আমার একতলার বসবার ঘরে। সতীশের বয়স তখন উনিশ, বি. এ. পরীক্ষা তাঁর আসন্ন। তাঁর পূর্বে তাঁর একটি কবিতার খাতা অজিত আমাকে পড়বার জন্যে দিয়েছিলেন। পাতায় পাতায় খোলসা করেই জানাতে হয়েছে আমার মত। সব কথা অনুকূল ছিল না। আর কেউ হলে এমন বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতুম না। সতীশের লেখা পড়ে বুঝেছিলুম তাঁর অল্প বয়সের রচনায় অসামান্যতা অনুজ্জ্বলভাবে প্রচ্ছন্ন। যাঁর ক্ষমতা নিঃসন্দিগ্ধ, দুটো একটা মিষ্ট কথায় তাঁকে বিদায় করা তাঁর অসম্মাননা। আমার মতের যে অংশ ছিল অপ্রিয় অজিত তাতে অসহিষ্ণু হয়েছিলেন, কিন্তু সৌম্যমূর্তি সতীশ স্বীকার করে নিয়েছিলেন প্রসন্নভাবে।

আমার মনের মধ্যে তখন আশ্রমের সংকল্পটা সব সময়েই ছিল মুখর হয়ে। কথাপ্রসঙ্গে তার একটা ভবিষ্যৎ ছবি আমি এঁদের সামনে উৎসাহের সঙ্গে উজ্জ্বল করে ধরেছিলুম। দীপ্তি দেখা দিল সতীশের মুখে। আমি তাঁকে আহ্বান করি নি আমার কাজে। আমি জানতুম তাঁর সামনে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরের দুই বড়ো ধাপ বাকি। তার শেষভাগে ছিল জীবিকার আশ্বাসবাণী আইন পরীক্ষায়।

একদিন সতীশ এসে বললেন, যদি আমাকে গ্রহণ করেন আমি যোগ দিতে চাই আপনার কাজে। আমি বললুম, পরীক্ষা দিয়ে পরে চিন্তা কোরো। সতীশ বললেন, দেব না পরীক্ষা। কারণ, পরীক্ষা দিলেই আত্মীয়স্বজনের ধাক্কায় সংসারযাত্রার ঢালু পথে আমাকে গড়িয়ে নিয়ে চলবে।

কিছুতে তাঁকে নিরস্ত করতে পারলে না। দারিদ্র্যের ভার অবহেলায় মাথায় করে নিয়ে যোগ দিলেন আশ্রমের কাজে। বেতন অস্বীকার করলেন। আমি তাঁর অগোচরে তাঁর পিতার কাছে যথাসাধ্য মাসিক বৃত্তি পাঠিয়ে দিতুম। তাঁর পরনে ছিল না জামা, একটা চাদর ছিল গায়ে, তার পরিধেয়তা জীর্ণ। যে ভাবরাজ্যে তিনি সঞ্চরণ করতেন সেখানে তাঁর জীবন পূর্ণ হত প্রতিক্ষণে প্রকৃতির রসভাণ্ডার থেকে। আত্মভোলা মানুষ, যখন তখন ঘুরে বেড়াতেন যেখানে সেখানে। প্রায় তার সঙ্গে থাকত ছেলেরা, চলতে চলতে তাঁর সাহিত্যসম্ভোগের আস্বাদন পেত তারাও। সেই অল্প বয়সে ইংরেজি সাহিত্যে সুগভীর অভিনিবেশ তাঁর মতো আর কারও মধ্যে পাই নি। যে সব ছাত্রকে পড়াবার ভার ছিল তাঁর 'পরে তারা ছিল নিতান্তই অর্বাচীন। ইংরেজি ভাষার সোপানশ্রেণীর সব নিচেকার পইঠা পার করে দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ, কিন্তু কেজো সীমার মধ্যে বদ্ধ সংকীর্ণ নৈপুণ্যে ছিল না তাঁর মাস্টারিতে। সাহিত্যের তিনি রসজ্ঞ সাধক ছিলেন, সেইজন্যে তিনি

যা পাঠ দিতেন তা জমা করবার নয়, তা হজম করবার, তা হয়ে উঠত ছেলেদের মনের খাদ্য। তিনি দিতেন তাদের মনকে অবগাহন-স্নান, তার গভীরতা অত্যাবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি। ভাষাশিক্ষার মধ্যে একটা অনিবার্য শাসন থাকে, সেই শাসনকে অতিক্রম করে দিতে পারতেন সাহিত্যের উদার মুক্তি। এক বৎসরের মধ্যে হল তাঁর মৃত্যু। তার বেদনা আজও রয়ে গেছে আমার মনে। আশ্রমে যারা শিক্ষক হবে তারা মুখ্যত হবে সাধক, আমার এই কল্পনাটি সম্পূর্ণ সত্য করে-ছিলেন সতীশ।

তার পরের পর্বে এসেছিলেন জগদানন্দ। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল সাধনা পত্রে তাঁর প্রেরিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়ে। এই সকল প্রবন্ধের প্রাঞ্জল ভাষা ও সহজ বক্তব্যপ্রণালী দেখে তাঁর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য আমি তাঁকে প্রথমে আমাদের জমিদারির কাজে নিযুক্ত করেছিলেম। তার প্রধান কারণ জমিদারি দপ্তরে বেতনের কৃপণতা ছিল না। কিন্তু তাঁকে এই অযোগ্য আসনে বন্দী করে রাখতে আমার মনে বেদনা দিতে লাগল। আমি তাঁকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে আমন্ত্রণ করলুম। যদিও এই কার্যে আয়ের পরিমাণ অল্প ছিল তবুও আনন্দের পরিমাণ তাঁর পক্ষে ছিল প্রচুর। তার কারণ শিক্ষাদানে তাঁর স্বভাবের ছিল অকৃত্রিম তৃপ্তি। ছাত্রদের কাছে সর্বতোভাবে আত্মদানে তাঁর একটুও কৃপণতা ছিল না। সুগভীর করুণা ছিল বালকদের প্রতি। শাস্তি উপলক্ষেও তাদের প্রতি লেশমাত্র নির্মমতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একজন ছাত্রকে কোনো শিক্ষক তার একবেলার আহার বন্ধ করে দণ্ডবিধান করেছিলেন। এই শাসনবিধির নিষ্ঠুরতায় তাঁকে অশ্রু বর্ষণ করতে দেখেছি। তাঁর বিজ্ঞানের ভাণ্ডার খোলা ছিল ছাত্রদের সম্মুখে যদিও তা তাদের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল না। এই আত্মদানের অকার্পণ্য যথার্থ শিক্ষকের যথার্থ পরিচয়। তিনি আপনার আসনকে কখনো ছাত্রদের কাছ থেকে দূরে রাখেন নি। আত্মমর্যাদার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টায় তিনি ছাত্রদের সেবায় কখনো লাইন টেনে চলতেন না। তাঁর অধ্যাপকের উচ্চ অধিকার তাঁর সদয় ব্যবহারের আবরণে কখনো অতিপ্রত্যক্ষ ছিল না। বস্তুত সকল বিষয়েই তিনি ছেলেদের সখা ছিলেন। তাঁর ক্লাসে গণিতশিক্ষায় কোনো ছাত্র কিছুমাত্র পিছিয়ে পড়ে পরীক্ষায় যদি অকৃতার্থ হত সে তাঁকে অত্যন্ত আঘাত করত। শিক্ষার উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্য তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ছিল। অমনোযোগী বালকদের প্রতি তাঁর তর্জন গর্জন শুনতে অতিশয় ভয়জনক ছিল কিন্তু তাঁর স্নেহ তাঁর ভর্ৎসনাকে ভিতরে ভিতরে প্রতিবাদ করে চলত, ছাত্ররা তা প্রত্যহ অনুভব করেছে। যে শিক্ষকেরা আশ্রমের সৃষ্টিকার্যে আপনাকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছিলেন, জগদানন্দ তার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর অভাব ও বেদনা আশ্রম কদাচ ভুলতে পারবে না।

সতীশের বন্ধু অজিতকুমার যথার্থ শিক্ষকের পদে উচ্চ স্থান অধিকার করে-ছিলেন। তাঁর বিদ্যা ছিল ইংরেজি সাহিত্যে ও দর্শনে বহুব্যাপ্ত। এই জ্ঞানের রাজ্যে তিনি ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছাত্র। তিনিও নির্বিচারে ছাত্রদের কাছে তাঁর জ্ঞানের সঞ্চয় উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রেরা সর্বদাই তাঁর শিক্ষকতা থেকে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যরস আস্বাদনের অবকাশ পেয়েছিল। যদিও তাদের বয়স অল্প ও যোগ্যতার সীমা সংকীর্ণ তবুও তিনি কখনো তাদের কাছ থেকে নিজের পদের অভিমানে নির্লিপ্ত ছিলেন না। সতীশের মতো দারিদ্র্যে তাঁর

ঔদাসীন্য ছিল না তবুও তিনি তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমাদের আশ্রম-নির্মাণ-কার্যে ইনি একজন নিপুণ স্থপতি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

মাঝখানে অতি অল্প সময়ের জন্য এসেছিলেন আমার এক আত্মোৎসর্গপরায়ণ বন্ধু মোহিতচন্দ্র সেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেখানকার খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্ত ত্যাগ করে যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষার এমন নিম্ন স্তরে লোকখ্যাতির দিক থেকে যা তাঁর যোগ্য ছিল না। কিন্তু তাতেই তিনি প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলেন। কারণ শিক্ষকতা ছিল তাঁর স্বভাবসংগত। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়ে শিক্ষাব্রত অকালে সমাপ্ত হয়ে গেল। তাঁর অকৃপণতা ছিল আর্থিক দিকে এবং পারমার্থিক দিকে। প্রথম যেদিন আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল সেদিন তিনি আশ্রমের আদর্শের সম্বন্ধে যে সম্মান প্রকাশ করেছিলেন আমার আনন্দের পক্ষে তাই যথেষ্ট ছিল। অবশেষে বিদায় নেবার সময়ে তিনি বললেন, যদি আমি আপনার এখানকার কাজে যোগদান করতে পারতুম তবে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করতুম। কিন্তু সম্প্রতি তা সম্ভব না হওয়াতে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করে গেলুম। এই বলে আমার হাতে একটি কাগজের মোড়ক দিয়ে গেলেন। পরে খুলে দেখলেম হাজার টাকার একখানি নোট। পরীক্ষকরূপে যা পেয়েছিলেন সমস্তই তিনি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে দান করে গেলেন। কিন্তু কেবল সেই একদিনের দান নয়, তার পর থেকে প্রতিদিন তিনি নিবেদন করেছেন তাঁর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য একান্ত অনুপযুক্ত বেতন রূপে।

এঁদের অনেক পরে আশ্রমের সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিলেন নন্দলাল। ছোটো বড়ো সমস্ত ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিভাসম্পন্ন আর্টিস্টের একাত্মকতা অতি আশ্চর্য। তাঁর আত্মদান কেবলমাত্র শিক্ষকতায় নয়, সর্বপ্রকার বদান্যতায়। ছাত্রদের রোগে, শোকে, অভাবে তিনি তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁকে যারা শিল্পশিক্ষা উপলক্ষে কাছে পেয়েছে তারা ধন্য হয়েছে।

তার পর থেকে নানা কর্মী, নানা বন্ধু আশ্রমের সাধনাক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন এবং আপন আপন শক্তি ও স্বভাবের বিশিষ্টতা অনুসারে আশ্রমের গঠনকার্যে ক্রমশ বিচিত্র উপকরণ জুগিয়ে এসেছেন। সৃষ্টিকার্যে এই বৈচিত্র্যের প্রয়োজন আছে। নতন নতন কালের প্রেরণায় নতুন নতুন রূপ আপনাকে ব্যক্ত করতে থাকে এবং এই উপায়েই কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তবে সে আপনার শক্তিকে অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হয়। সেই পরিবর্তমান আদর্শের অনুবৃত্তির দ্বারা পুরাতন কালের ভিত্তির উপরেই নতুন কালের সৃষ্টি সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই নিয়ে কোনো আক্ষেপ করা বৃথা। বস্তুত প্রাচীনকালের ছন্দে নতুনকাল তাল ভঙ্গ করলে সৃষ্টির সংগতি রক্ষা হয় না।

৩

'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছি, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখনকার স্কুলের রীতি-প্রকৃতি এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের আচরণ আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তখনকার শিক্ষাবিধির মধ্যে কোনো রস ছিল না. কিন্তু সেইটেই আমার অসহিষ্ণুতার একমাত্র কারণ নয়। কলকাতা শহরে আমি প্রায় বন্দী অবস্থায় ছিলেম। কিন্তু বাড়িতে তবুও বন্ধনের ফাঁকে ফাঁকে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে আমার একটা আনন্দের

সম্বন্ধ জন্মে গিয়েছিল। বাড়ির দক্ষিণ দিকের পুকুরের জলে সকাল-সন্ধ্যার ছায়া এপার-ওপার করত—হাঁসগুলো দিত সাঁতার, গুগলি তুলত জলে ডুব দিয়ে, আষাঢ়ের জলে-ভরা নীলবর্ণ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ সারবাঁধা নারকেলগাছের মাথার উপরে ঘনিয়ে আনত বর্ষার গম্ভীর সমারোহ। দক্ষিণের দিকে যে বাগানটা ছিল ঐখানেই নানা রঙে ঋতুর পরে ঋতুর আমন্ত্রণ আসত উৎসুক দৃষ্টির পথে আমার হৃদয়ের মধ্যে।

শিশুর জীবনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এই যে আদিম কালের যোগ, প্রাণমনের বিকাশের পক্ষে এর যে কত বড়ো মূল্য তা আশা করি ঘোরতর শাহরিক লোককেও বোঝাবার দরকার নেই। ইস্কুল যখন নীরস পাঠ্য, কঠোর শাসনবিধি ও প্রভুত্বপ্রিয় শিক্ষকদের নির্বিচার অন্যায় নির্মমতায় বিশ্বের সঙ্গে বালকের সেই মিলনের বৈচিত্র্যকে চাপা দিয়ে তার দিনগুলিকে নির্জীব নিরালোক নিষ্ঠুর করে তুলেছিল তখন প্রতিকারহীন বেদনায় মনের মধ্যে ব্যর্থ বিদ্রোহ উঠেছিল একান্ত চঞ্চল হয়ে। যখন আমার বয়স তেরো তখন এডুকেশন-বিভাগীয় দাঁড়ের শিকল ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়েছিলেম। তার পর থেকে যে বিদ্যালয়ে হলেম ভর্তি তাকে যথার্থই বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে আমার ছুটি ছিল না, কেননা অবিশ্রাম কাজের মধ্যেই পেয়েছি ছুটি। কোনো কোনো দিন পড়েছি রাত দুটো পর্যন্ত। তখনকার অপ্রখর আলোকের যুগে রাত্রে সমস্ত পাড়া নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে শোনা যেত 'হরিবোল' শ্মশানযাত্রীদের কণ্ঠ থেকে। ভেরেন্ডা তেলের সেজের প্রদীপে দুটো সলতের মধ্যে একটা সলতে নিবিয়ে দিতুম, তাতে শিখার তেজ হ্রাস হত কিন্তু হত আয়ুবৃদ্ধি। মাঝে মাঝে অন্তঃপুর থেকে বড়দিদি এসে জোর করে আমার বই কেড়ে নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিতেন বিছানায়। তখন আমি যে সব বই পড়বার চেষ্টা করেছি কোনো কোনো গুরুজন তা আমার হাতে দেখে মনে করেছেন স্পর্ধা। শিক্ষার কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে যখন শিক্ষার স্বাধীনতা পেলুম তখন কাজ বেড়ে গেল অনেক বেশি অথচ ভার গেল কমে।

তার পরে সংসারে প্রবেশ করলেম; রথীন্দ্রনাথকে পড়াবার সমস্যা এল সামনে। তখন প্রচলিত প্রথায় তাকে ইস্কুলে পাঠালে আমার দায় হত লঘু এবং আত্মীয়-বান্ধবেরা সেইটেই প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বক্ষেত্র থেকে যে শিক্ষালয় বিচ্ছিন্ন সেখানে তাকে পাঠানো আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমার ধারণা ছিল, অন্তত জীবনের আরম্ভকালে নগরবাস প্রাণের পুষ্টি ও মনের প্রথম বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়। বিশ্বপ্রকৃতির অনুপ্রেরণা থেকে বিচ্ছেদ তার একমাত্র কারণ নয়। শহরে যানবাহন ও প্রাণযাত্রার অন্যান্য নানাবিধ সুযোগ থাকে, তাতে সম্পূর্ণ দেহ-চালনা ও চারিদিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভে শিশুরা বঞ্চিত হয়; বাহ্য বিষয়ে আত্মনির্ভর চিরদিনের মতো তাদের শিথিল হয়ে যায়। প্রশ্রয়প্রাপ্ত যে সব বাগানের গাছ উপর থেকেই জলসেচনের সুযোগ পায় তারা উপরে উপরেই মাটির সঙ্গে সংলগ্ন থাকে, গভীর ভূমিতে শিকড় চালিয়ে দিয়ে স্বাধীনজীবী হবার শিক্ষা তাদের হয় না; মানুষের পক্ষেও সেইরকম। দেহটাকে সম্যক্‌রূপে ব্যবহার করবার যে শিক্ষা প্রকৃতি আমাদের কাছে দাবি করে এবং নাগরিক 'ভদ্দর' শ্রেণীর রীতির কাছে যেটা উপেক্ষিত অবজ্ঞাভাজন তার অভাব-দুঃখ আমার জীবনে আজ পর্যন্ত আমি অনুভব করি। তাই সে সময়ে আমি কলকাতা শহর প্রায় বর্জন করেছিলেম। তখন সপরিজনে থাকতেম শিলাইদহে। সেখানে আমাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি ছিল নিতান্তই সাদাসিধে। সেটা সম্ভব হয়েছিল তার কারণ, যে সমাজে আমরা

মানুষ সে সমাজে প্রচলিত প্রাণযাত্রার রীতি ও আদর্শ এখানে পৌঁছতে পারত না, এমনকি তখনকার দিনে নগরবাসী মধ্যবিত্ত লোকেরাও যে সকল আরামে ও আড়ম্বরে অভ্যস্ত তাও ছিল আমাদের থেকে বহু দূরে। বড়ো শহরে পরস্পরের অনুকরণে ও প্রতিযোগিতায় যে অভ্যাসগুলি অপরিহার্যরূপে গড়ে ওঠে সেখানে তার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না।

শিলাইদহে বিশ্বপ্রকৃতির নিকটসান্নিধ্যে রথীন্দ্রনাথ যেরকম ছাড়া পেয়েছিল সেরকম মুক্তি তখনকার কালের সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থেরা আপন ঘরের ছেলেদের পক্ষে অনুপযোগী বলেই জানত এবং তার মধ্যে যে বিপদের আশঙ্কা আছে তারা ভয় করত তা স্বীকার করতে। রথী সেই বয়সে ডিঙি বেয়েছে নদীতে। সেই ডিঙিতে করে চলতি স্টীমার থেকে সে প্রতিদিন রুটি নামিয়ে আনত, তাই নিয়ে স্টীমারের সারঙ আপত্তি করেছে বার বার। চরে বনঝাউয়ের জঙ্গলে সে বেরোত শিকার করতে—কোনোদিন বা ফিরে এসেছে সমস্ত দিন পরে অপরাহ্নে। তা নিয়ে ঘরে উদ্‌বেগ ছিল না তা বলতে পারি নে, কিন্তু সে উদ্‌বেগ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে বালকের স্বাধীন সঞ্চরণ খর্ব করা হয় নি। যখন রথীর বয়স ছিল ষোলোর নিচে তখন আমি তাকে কয়েক জন তীর্থযাত্রীর সঙ্গে পদব্রজে কেদারনাথ-ভ্রমণে পাঠিয়েছি, তা নিয়ে ভর্ৎসনা স্বীকার করেছি আত্মীয়দের কাছ থেকে, কিন্তু একদিকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে অন্যদিকে সাধারণ দেশবাসীদের সম্বন্ধে যে কষ্টসহিষ্ণু অভিজ্ঞতা আমি তার শিক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে জানতুম তার থেকে তাকে স্নেহের ভীরুতাবশত বঞ্চিত করি নি।

শিলাইদহে কুঠিবাড়ির চারদিকে যে জমি ছিল প্রজাদের মধ্যে নতুন ফসল প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলেম। এই পরীক্ষাব্যাপারে সরকারি কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অত্যধিক পরিমাণেই মিলেছিল। তাঁদের আদিষ্ট উপাদানের তালিকা দেখে চিচেস্‌টরে যারা এগ্রিকালচারাল্‌ কলেজে পাস করে নি এমন-সব চাষিরা হেসেছিল; তাদেরই হাসিটা টিকেছিল শেষ পর্যন্ত। মরার লক্ষণ আসন্ন হলেও শ্রদ্ধাবান রোগীরা যেমন করে চিকিৎসকের সমস্ত উপদেশ অক্ষুণ্ণ রেখে পালন করে, পঞ্চাশ বিঘে জমিতে আলু চাষের পরীক্ষায় সরকারি কৃষিতত্ত্বপ্রবীণদের নির্দেশ সেইরকম একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছি। তাঁরাও আমার ভরসা জাগিয়ে রাখবার জন্যে পরিদর্শনকার্যে সর্বদাই যাতায়াত করেছেন। তারই বহুব্যয়সাধ্য ব্যর্থতার প্রহসন নিয়ে বন্ধুবর জগদীশচন্দ্র আজও প্রায় মাঝে মাঝে হেসে থাকেন। কিন্তু তাঁরও চেয়ে প্রবল অট্টহাস্য নীরবে ধ্বনিত হয়েছিল চামরু-নাম-ধারী এক-হাত-কাটা সেই রাজবংশী চাষির ঘরে, যে ব্যক্তি পাঁচ কাঠা জমির উপযুক্ত বীজ নিয়ে কৃষিতত্ত্ববিদের সকল উপদেশই অগ্রাহ্য করে আমার চেয়ে প্রচুরতর ফল লাভ করেছিল। চাষবাস-সম্বন্ধীয় যে সব পরীক্ষা-ব্যাপারের মধ্যে বালক বেড়ে উঠেছিল তারই একটা নমুনা দেবার জন্যে এই গল্পটা বলা গেল; পাঠকেরা হাসতে চান হাসুন, কিন্তু এ কথা যেন মানেন যে শিক্ষার অঙ্গরূপে এই ব্যর্থতাও ব্যর্থ নয়। এত বড়ো অদ্ভুত অপব্যয়ে আমি যে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তার কুইক্‌সটিত্বের মূল্য চামরুকে বোঝাবার সুযোগ হয় নি, সে এখন পরলোকে।

এরই সঙ্গে সঙ্গে পুঁথিগত বিদ্যার আয়োজন ছিল সে কথা বলা বাহুল্য। এক পাগলা মেজাজের চালচুলোহীন ইংরেজ শিক্ষক হঠাৎ গেল জুটে। তার পড়াবার কায়দা খুবই ভালো, আরো ভালো এই যে কাজে ফাঁকি দেওয়া তার ধাতে ছিল না। মাঝে মাঝে মদ খাবার দুর্নিবার উত্তেজনায় সে পালিয়ে গেছে কলকাতায়, তার পর

মাথা হেঁট করে ফিরে এসেছে লজ্জিত অনুতপ্ত চিত্তে। কিন্তু কোনোদিন শিলাইদহে মত্ততায় আত্মবিস্মৃত হয়ে ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধা হারাবার কোনো কারণ ঘটায় নি। ভৃত্যদের ভাষা বুঝতে পারত না, সেটাকে অনেক সময়ে সে মনে করেছে ভৃত্যদেরই অসৌজন্য। তা ছাড়া সে আমার প্রাচীন মুসলমান চাকরকে তার পিতৃদত্ত ফটিক নামে কোনোমতেই ডাকত না। তাকে অকারণে সম্বোধন করত সুলেমান। এর মনস্তত্ত্বরহস্য কী জানি নে। এতে বার বার অসুবিধা ঘটত। কারণ চাষিঘরের সেই চাকরটি বরাবরই ভুলত তার অপরিচিত নামের মর্যাদা।

আরো কিছু বলবার কথা আছে। লরেন্সকে পেয়ে বসল রেশমের চাষের নেশায়। শিলাইদহের নিকটবর্তী কুমারখালি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে রেশম-ব্যবসায়ের একটা প্রধান আড্ডা ছিল। সেখানকার রেশমের বিশিষ্টতা খ্যাতিলাভ করেছিল বিদেশী হাটে। সেখানে ছিল রেশমের মস্ত বড়ো কুঠি। একদা রেশমের তাঁত বন্ধ হল সমস্ত বাংলা দেশে, পূর্বস্মৃতির স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে কুঠি রইল শূন্য পড়ে। যখন পিতৃঋণের প্রকাণ্ড বোঝা আমার পিতার সংসার চেপে ধরল বোধ করি তারই কোনো এক সময়ে তিনি রেলওয়ে কোম্পানিকে এই কুঠি বিক্রি করেন। সে সময়ে গোরাই নদীর উপরে ব্রিজ তৈরি হচ্ছে। এই সেকেলে প্রাসাদের প্রভূত ইঁট পাথর ভেঙে নিয়ে সেই কোম্পানি নদীর বেগ ঠেকাবার কাজে সেগুলো জলাঞ্জলি দিলে। কিন্তু যেমন বাংলার তাঁতির দুর্দিনকে কেউ ঠেকাতে পারলে না, যেমন সাংসারিক দুর্যোগে পিতামহের বিপুল ঐশ্বর্যের ধ্বংস কিছুতে ঠেকানো গেল না—তেমনি কুঠিবাড়ির ভগ্নাবশেষ নিয়ে নদীর ভাঙন রোধ মানলে না; সমস্তই গেল ভেসে; সুসময়ের চিহ্নগুলোকে কালস্রোত যেটুকু রেখেছিল নদীর স্রোতে তাকে দিলে ভাসিয়ে।

লরেন্সের কানে গেল রেশমের সেই ইতিবৃত্ত। ওর মনে লাগল, আর একবার সেই চেষ্টার প্রবর্তন করলে ফল পাওয়া যেতে পারে; দুর্গতি যদি খুব বেশি হয় অন্তত আলুর চাষকে ছাড়িয়ে যাবে না। চিঠি লিখে যথারীতি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সে খবর আনালে। কীটদের আহার জোগাবার জন্যে প্রয়োজন ভেরেণ্ডা গাছের। তাড়াতাড়ি জন্মানো গেল কিছু গাছ কিন্তু লরেন্সের সবুর সইল না। রাজশাহি থেকে গুটি আনিয়ে পালনে প্রবৃত্ত হল অচিরাৎ। প্রথমত বিশেষজ্ঞদের কথাকে বেদবাক্য বলে মানলে না, নিজের মতে নতুন পরীক্ষা করতে করতে চলল। কীটগুলোর ক্ষুদে ক্ষুদে মুখ, ক্ষুদে ক্ষুদে গ্রাস, কিন্তু ক্ষুধার অবসান নেই। তাদের বংশবৃদ্ধি হতে লাগল খাদ্যের পরিমিত আয়োজনকে লঙ্ঘন করে। গাড়ি করে দূর দূর থেকে অনবরত পাতার জোগান চলল। লরেন্সের বিছানাপত্র, তার চৌকি টেবিল, খাতা বই, তার টুপি পকেট কোর্তা—সর্বত্রই হল গুটির জনতা। তার ঘর দুর্গম হয়ে উঠল দুর্গন্ধের ঘন আবেষ্টনে। প্রচুর ব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পর মাল জমল বিস্তর, বিশেষজ্ঞেরা বললেন অতি উৎকৃষ্ট, এ জাতের রেশমের এমন সাদা রঙ হয় না। প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া গেল সফলতার রূপ—কেবল একটুখানি ত্রুটি রয়ে গেল। লরেন্স বাজার যাচাই করে জানলে তখনকার দিনে এ মালের কাটতি অল্প, তার দাম সামান্য। বন্ধ হল ভেরেণ্ডা পাতার অনবরত গাড়ি-চলাচল, অনেকদিন পড়ে রইল ছালাভরা গুটিগুলো; তার পরে তাদের কী ঘটল তার কোনো হিসেব আজ কোথাও নেই। সেদিন বাংলাদেশে এই গুটিগুলোর উৎপত্তি হল অসময়ে। কিন্তু যে শিক্ষালয় খুলেছিলেম তার সময় পালন তারা করেছিল।

আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবধন বিদ্যার্ণব। বাংলা আর সংস্কৃত শেখানো ছিল তাঁর কাজ, আর তিনি ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ থেকে উপনিষদের শ্লোক ব্যাখ্যা করে আবৃত্তি করাতেন। তাঁর বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে পিতৃদেব তাঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। বাল্যকাল থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনের যে আদর্শ আমার মনে ছিল তার কাজ এমনি করে শুরু হয়েছিল কিন্তু তার মূর্তি সম্যক্ উপাদানে গড়ে ওঠে নি।

দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রিয় ছিল মোটের উপর সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে এক সুরে, সেটা ক্লাসনামধারী খাঁচার জিনিস হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষা-বিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ আর একটা পরীক্ষা, এবং সকলের চেয়ে বড়ো তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দসঞ্চার। এই গেল বাহ্য প্রকৃতি। আর আছে দেশের অন্তঃপ্রকৃতি, তারও বিশেষ রস আছে, রঙ আছে, ধ্বনি আছে। ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃতভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দৃঢ় ছিল। ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জানতে পারি, সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । কিন্তু সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে; তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।

যে শিক্ষাতত্ত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি তার ভূমিকা হল এইখানে। এতে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল, কেননা এর পথ অনভ্যস্ত এবং চরম ফল অপরীক্ষিত। এই শিক্ষাকে শেষ পর্যন্ত চালনা করবার শক্তি আমার ছিল না, কিন্তু এর 'পরে নিষ্ঠা আমার অবিচলিত। এর সমর্থন ছিল না দেশের কোথাও। তার একটা প্রমাণ বলি। একদিকে অরণ্যবাসে দেশের উন্মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতি আর-এক দিকে গুরু-গৃহবাসে দেশের শুদ্ধতম উচ্চতম সংস্কৃতি—এই উভয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তপোবনে একদা যে নিয়মে শিক্ষা চলত আমি কোনো-এক বক্তৃতায় তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ব্যাখ্যা করেছিলেম। বলেছিলেম, আধুনিক কালে শিক্ষার উপাদান অনেক বাড়াতে হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার রূপটি তার রসটি তৈরি হয়ে উঠবে প্রকৃতির সহযোগে, এবং যিনি শিক্ষা দান করবেন তাঁর অন্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক সংসর্গে। শুনে সেদিন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছিলেন, এ কথাটি কবিজনোচিত, কবি এর অত্যাবশ্যকতা যতটা কল্পনা করেছেন আধুনিক কালে ততটা স্বীকার করা যায় না। আমি প্রত্যুত্তরে তাঁকে বলেছিলেম, বিশ্বপ্রকৃতি ক্লাসে ডেস্কের সামনে বসে মাস্টারি করেন না, কিন্তু জলে স্থলে আকাশে তাঁর ক্লাস খুলে আমাদের মনকে তিনি যে প্রবল শক্তিতে গড়ে তোলেন কোনো মাস্টার কি তা পারে। আরবের মানুষকে কি আরবের মরুভূমিই গড়ে তোলে নি—সেই মানুষই বিচিত্র ফলশস্য-শালিনী নীলনদীতীরবর্তী ভূমিতে যদি জন্ম নিত তা হলে কি তার প্রকৃতি অন্যরকম হত না। যে প্রকৃতি সজীব বিচিত্র, আর যে শহর নির্জীব পাথরে-বাঁধানো, চিত্তগঠন সম্বন্ধে তাদের প্রভাবের প্রবল প্রভেদ নিঃসংশয়।

এ কথা নিশ্চিত জানি, যদি আমি বাল্যকাল থেকে অধিকাংশ সময়ই শহরে আবদ্ধ থাকতেম তবে তার প্রভাবটা প্রচুর পরিমাণেই প্রকাশ পেত আমার চিন্তায়

আমার রচনায়। বিদ্যায় বুদ্ধিতে সেটা বিশেষভাবে অনুভব করা যেত কি না জানি নে, কিন্তু ধাত হত অন্যপ্রকারের। বিশ্বের অযাচিত দান থেকে যে পরিমাণে নিয়ত বঞ্চিত হতেম সেই পরিমাণে বিশ্বকে প্রতিদানের সম্পদে আমার স্বভাবে দারিদ্র্য থেকে যেত। এইরকম আন্তরিক জিনিসটার বাজারদর নেই বলেই এর অভাব সম্বন্ধে যে মানুষ স্বচ্ছন্দে নিশ্চেতন থাকে সেরকম বেদনাহীন হতভাগ্য যে কৃপা-পাত্র তা অন্তর্যামী জানেন। সংসারযাত্রায় সে যেমনি কৃতকৃত্য হোক, মানবজন্মের পূর্ণতায় সে চিরদিন থেকে যায় অকৃতার্থ।

সেইদিনই আমি প্রথম মনে করলেম, শুধু মুখের কথায় ফল হবে না; কেননা এ সব কথা এখনকার কালের অভ্যাসবিরুদ্ধ। এই চিন্তাটা কেবলই মনের মধ্যে আন্দোলিত হতে লাগল যে এই আদর্শকে যতটা পারি কর্মক্ষেত্রে রচনা করে তুলতে হবে। তপোবনের বাহ্য অনুকরণ যাকে বলা যেতে পারে তা অগ্রাহ্য, কেননা এখনকার দিনে তা অসংগত, তা মিথ্যে। তার ভিতরকার সত্যটিকে আধুনিক জীবনযাত্রার আধারে প্রতিষ্ঠিত করা চাই।

তার কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতন আশ্রম পিতৃদেব জনসাধারণকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। বিশেষ নিয়ম পালন করে অতিথিরা যাতে দুই তিন দিন আধ্যাত্মিক শান্তির সাধনা করতে পারেন এই ছিল তাঁর সংকল্প। এজন্য উপাসনা-মন্দির লাইব্রেরি ও অন্যান্য ব্যবস্থা ছিল যথোচিত। কদাচিৎ সেই উদ্দেশ্যে কেউ কেউ এখানে আসতেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক আসতেন ছুটি যাপন করবার সুযোগে এবং বায়ুপরিবর্তনের সাহায্যে শারীরিক আরোগ্যসাধনায়।

আমার বয়স যখন অল্প পিতৃদেবের সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়েছিলেম। ঘর ছেড়ে সেই আমার প্রথম বাহিরে যাত্রা। ইঁটকাঠের অরণ্য থেকে অবারিত আকাশের মধ্যে বৃহৎ মুক্তি এই প্রথম আমি ভোগ করেছি। প্রথম বললে সম্পূর্ণ ঠিক বলা হয় না। এর পূর্বে কলকাতায় একবার যখন ডেঙ্গুজ্বর সংক্রামক হয়ে উঠেছিল তখন আমার গুরুজনদের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেম গঙ্গার ধারে লালাবাবুদের বাগানে। বসুন্ধরার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সুদূরব্যাপ্ত আস্তরণের একটি প্রান্তে সেদিন আমার বসবার আসন জুটেছিল। সমস্ত দিন বিরাটের মধ্যে মনকে ছাড়া দিয়ে আমার বিস্ময়ের এবং আনন্দের ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু তখনো আমি আমাদের পূর্বনিয়মে ছিলেম বন্দী, অবাধে বেড়ানো ছিল নিষিদ্ধ। অর্থাৎ কলকাতায় ছিলেম ঢাকা খাঁচার পাখি, কেবল চলার স্বাধীনতা নয় চোখের স্বাধীনতাও ছিল সংকীর্ণ; এখানে রইলুম দাঁড়ের পাখি, আকাশ খোলা চারি দিকে কিন্তু পায়ে শিকল। শান্তি-নিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি। উপনয়ন-অনুষ্ঠানে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করবার যে দীক্ষা পেয়েছিলেম পিতৃদেবের কাছ থেকে, এখানে বিশ্বদেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলেম সেই দীক্ষাই। আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথম বয়সে এই সুযোগ যদি আমার না ঘটত। পিতৃদেব কোনো নিষেধ বা শাসন দিয়ে আমাকে বেষ্টন করেন নি। সকালবেলায় অল্প কিছুক্ষণ তাঁর কাছে ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়তেম, তার পরে আমার অবাধ ছুটি। বোলপুর শহর তখন স্ফীত হয়ে ওঠে নি। চালের কলের ধোঁয়া আকাশকে কলুষিত আর তার দুর্গন্ধ সমল করে নি মলয় বাতাসকে। মাঠের মাঝখান দিয়ে যে লাল মাটির পথ চলে গেছে তাতে লোক-চলাচল ছিল অল্পই। বাঁধের জল ছিল পরিপূর্ণ প্রসারিত, চার দিক থেকে পলি-পড়া চাষের জমি তাকে কোণ-ঠেসা

করে আনে নি। তার পশ্চিমের উঁচু পাড়ির উপর অক্ষুণ্ন ছিল ঘন তালগাছের শ্রেণী। যাকে আমরা খোয়াই বলি, অর্থাৎ কাঁকুরে জমির মধ্যে দিয়ে বর্ষার জল-ধারায় আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু খোদাই পথ, সে ছিল নানা জাতের নানা আকৃতির পাথরে পরিকীর্ণ; কোনোটাতে শির-কাটা পাতার ছাপ, কোনোটা লম্বা আঁশওয়ালা কাঠের টুকরোর মতো, কোনোটা স্ফটিকের দানা সাজানো, কোনোটা অগ্নিগলিত মসৃণ। মনে আছে ১৮৭০ খৃস্টাব্দের ফরাসি-প্রুশীয় যুদ্ধের পরে একজন ফরাসি সৈনিক আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল; সে ফরাসি রান্না রেঁধে খাওয়াত আমার দাদাদের আর তাঁদের ফরাসি ভাষা শেখাত। তখন আমার দাদারা একবার বোলপুরে এসেছিলেন, সে ছিল সঙ্গে। একটা ছোটো হাতুড়ি নিয়ে আর একটা থলি কোমরে ঝুলিয়ে সে এই খোয়াইয়ে দুর্লভ পাথর সন্ধান করে বেড়াত। একদিন একটা বড়োগোছের স্ফটিক সে পেয়েছিল, সেটাকে আংটির মতো বাঁধিয়ে কলকাতার কোন্ ধনীর কাছে বেচেছিল আশি টাকায়। আমিও সমস্ত দুপুরবেলা খোয়াইয়ে প্রবেশ করে নানারকম পাথর সংগ্রহ করেছি, ধন উপার্জনের লোভে নয় পাথর উপার্জন করতেই। মাঠের জল চুঁইয়ে সেই খোয়াইয়ের এক জায়গায় উপরের ডাঙা থেকে ছোটো ঝরনা ঝরে পড়ত। সেখানে জমেছিল একটি ছোটো জলাশয়, তার সাদাটে ঘোলা জল আমার পক্ষে ডুব দিয়ে স্নান করবার মতো যথেষ্ট গভীর। সেই ডোবাটা উপচিয়ে ক্ষীণ স্বচ্ছ জলের স্রোত ঝির্ ঝির্ করে বয়ে যেত নানা শাখাপ্রশাখায়, ছোটো ছোটো মাছ সেই স্রোতে উজানমুখে সাঁতার কাটত। আমি জলের ধার বেয়ে বেয়ে আবিষ্কার করতে বেরতুম সেই শিশুভূবিভাগের নতুন নতুন বালখিল্য গিরিনদী। মাঝে মাঝে পাওয়া যেত পাড়ির গায়ে গহ্বর। তার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে অচেনা জিওগ্রাফির মধ্যে ভ্রমণকারীর গৌরব অনুভব করতুম। খোয়াইয়ের স্থানে স্থানে যেখানে মাটি জমা সেখানে বেঁটে বেঁটে বুনো জাম বুনো খেজুর, কোথাও-বা ঘন কাশ লম্বা হয়ে উঠেছে। উপরে দূরমাঠে গোরু চরছে, সাঁওতালরা কোথাও করছে চাষ, কোথাও চলেছে পথহীন প্রান্তরে আর্তস্বরে গোরুর গাড়ি, কিন্তু এই খোয়াইয়ের গহ্বরে জনপ্রাণী নেই। ছায়ায় রৌদ্রে বিচিত্র লাল কাঁককের এই নিভৃত জগৎ, না দেয় ফল, না দেয় ফুল, না উৎপন্ন করে ফসল; এখানে না আছে কোনো জীবজন্তুর বাসা; এখানে কেবল দেখি কোনো আর্টিস্ট-বিধাতার বিনা কারণে একখানা যেমন-তেমন ছবি আঁকবার শখ; উপরে মেঘহীন নীল আকাশ রৌদ্রে পাণ্ডুর, আর নিচে লাল কাঁকরের রঙ পড়েছে মোটা তুলিতে নানারকমের বাঁকাচোরা বন্ধুর রেখায়, সৃষ্টিকর্তার ছেলেমানুষি ছাড়া এর মধ্যে আর কিছুই দেখা যায় না। বালকের খেলার সঙ্গেই এর রচনার ছন্দের মিল; এর পাহাড়, এর নদী, এর জলাশয়, এর গুহাগহ্বর সবই বালকের মনেরই পরিমাপে। এইখানে একলা আপন মনে আমার বেলা কেটেছে অনেকদিন, কেউ আমার কাজের হিসাব চায় নি, কারও কাছে আমার সময়ের জবাবদিহি ছিল না। এখন এ খোয়াইয়ের সে চেহারা নেই। বৎসরে বৎসরে রাস্তা-মেরামতের মশলা এর উপর থেকে চেঁচে নিয়ে একে নগ্ন দরিদ্র করে দিয়েছে, চলে গেছে এর বৈচিত্র্য, এর স্বাভাবিক লাবণ্য। তখন শান্তিনিকেতনে আর একটি রোমান্টিক অর্থাৎ কাহিনী-রসের জিনিস ছিল। যে সর্দার ছিল এই বাগানের প্রহরী এককালে সেই ছিল ডাকাতের দলের নায়ক। তখন সে বৃদ্ধ, দীর্ঘ তার দেহ, মাংসের বাহুল্য মাত্র নেই, শ্যামবর্ণ, তীক্ষ্ম চোখের দৃষ্টি, লম্বা বাঁশের লাঠি হাতে, কণ্ঠস্বরটা ভাঙা ভাঙা গোছের। বোধ হয় সকলে জানেন, আজ শান্তিনিকেতনে যে অতিপ্রাচীন যুগল

ছাতিম গাছ মালতীলতায় আচ্ছন্ন, এককালে মস্ত মাঠের মধ্যে ঐ দুটি ছাড়া আর গাছ ছিল না। ঐ গাছতলা ছিল ডাকাতের আড্ডা। ছায়াপ্রত্যাশী অনেক ক্লান্ত পথিক এই ছাতিমতলায় হয় ধন নয় প্রাণ নয় দুইই হারিয়েছে সেই শিথিল রাষ্ট্র-শাসনের কালে। এই সর্দার সেই ডাকাতি কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদের শেষ পরিশিষ্ট বলেই খ্যাত। বামাচারী তান্ত্রিক শাক্তের এই দেশে মা-কালীর খর্পরে এ যে নররক্ত জোগায় নি তা আমি বিশ্বাস করি নে। আশ্রমের সম্পর্কে কোনো রক্তচক্ষু রক্ততিলকলাঞ্ছিত ভদ্র বংশের শাক্তকে জানতুম যিনি মহামাংসপ্রসাদ ভোগ করেছেন বলে জনশ্রুতি কানে এসেছে।

[একদা এই দুটিমাত্র ছাতিমগাছের ছায়া লক্ষ্য করে দূরপথযাত্রী পথিকেরা বিশ্রামের আশায় এখানে আসত। আমার পিতৃদেবও রায়পুরের ভুবন সিংহের বাড়িতে নিমন্ত্রণ সেরে পালকি করে যখন একদিন ফিরছিলেন তখন মাঠের মাঝখানে এই দুটি গাছের আহ্বান তাঁর মনে এসে পৌঁচেছিল। এইখানে শান্তির প্রত্যাশায় রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে এই জমি তিনি দান গ্রহণ করেছিলেন। একখানি একতলা বাড়ি পত্তন করে এবং রুক্ষ রিক্ত ভূমিতে অনেকগুলি গাছ রোপণ করে সাধনার জন্য এখানে তিনি মাঝে মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। সেই সময়ে প্রায়ই তাঁর ছিল হিমালয়ে নির্জনবাস। যখন রেললাইন স্থাপিত হল তখন বোলপুর স্টেশন ছিল পশ্চিমে যাবার পথে, অন্য লাইন তখন ছিল না। তাই হিমালয়ে যাবার মুখে বোলপুরে পিতা তাঁর প্রথম যাত্রা-ভঙ্গ করতেন। আমি যে বারে তাঁর সঙ্গে এলুম সে বারেও ড্যালহৌসি পাহাড়ে যাবার পথে তিনি বোলপুরে অবতরণ করেন। আমার মনে পড়ে সকালবেলায় সূর্য ওঠবার পূর্বে তিনি ধ্যানে বসতেন অসমাপ্ত জলশূন্য পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ির উপরে। সূর্যাস্তকালে তাঁর ধ্যানের আসন ছিল ছাতিমতলায়। এখন ছাতিম গাছ বেষ্টন করে অনেক গাছপালা হয়েছে, তখন তার কিছুই ছিল না, সামনে অবারিত মাঠ পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত ছিল একটানা। আমার 'পরে কটি বিশেষ কাজের ভার ছিল। ভগবদ্‌গীতা-গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোক তিনি চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন, আমি প্রতিদিন কিছু কিছু তাই কপি করে দিতুম তাঁকে। তার পরে সন্ধ্যাবেলা খোলা আকাশের নিচে বসে সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলের বিবরণ বলতেন আমাকে, আমি শুনতুম একান্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে। মনে পড়ে আমি তাঁর মুখের সেই জ্যোতিষের ব্যাখ্যা লিখে তাঁকে শুনিয়েছিলুম। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে শান্তিনিকেতনের কোন্ ছবি আমার মনের মধ্যে কোন্ রসে ছাপা হয়ে গেছে। প্রথমত সেই বালকবয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেম— এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তাল-শ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জে শ্যামলা শান্তি, স্মৃতির সম্পদরূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তার পরে এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে বিকালে পিতৃদেবের পূজার নিঃশব্দ নিবেদন, তার গভীর গাম্ভীর্য। তখন এখানে আর কিছুই ছিল না, না ছিল এত গাছপালা, না ছিল মানুষের এবং কাজের এত ভিড়, কেবল দূরব্যাপী নিস্তব্ধতার মধ্যে ছিল একটি নির্মল মহিমা।]

তার পরে সেদিনকার বালক যখন যৌবনের প্রৌঢ়বিভাগে তখন বালকদের শিক্ষার তপোবন তাকে দূরে খুঁজতে হবে কেন। আমি পিতাকে গিয়ে জানালেম, শান্তিনিকেতন এখন প্রায় শূন্য অবস্থায়, সেখানে যদি একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারি তা হলে তাকে সার্থকতা দেওয়া হয়। তিনি তখনই উৎসাহের সঙ্গে

সম্মতি দিলেন। বাধা ছিল আমার আত্মীয়দের দিক থেকে। পাছে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে যায় এই ছিল তাঁদের আশঙ্কা। এখনকার কালের জোয়ারজলে নানা দিক থেকে ভাবের পরিবর্তন আবর্ত রচনা করে আসবে না এ আশা করা যায় না—যদি তার থেকে এড়াবার ইচ্ছা করি তা হলে আদর্শকে বিশুদ্ধ রাখতে গিয়ে তাকে নির্জীব করে রাখতে হয়। গাছপালা জীবজন্তু প্রভৃতি প্রাণবান বস্তু মাত্রেরই মধ্যে একই সময়ে বিকৃতি ও সংস্কৃতি চলতেই থাকে, এই বৈপরীত্যের ক্রিয়াকে অত্যন্ত ভয় করতে গেলে প্রাণের সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ রাখতে হয়। এই তর্ক নিয়ে আমার সংকল্পসাধনে কিছুদিন প্রবলভাবেই ব্যাঘাত চলেছিল।

এই তো বাইরের বাধা। অপর দিকে আমার আর্থিক সংগতি নিতান্ত সামান্য ছিল, আর বিদ্যালয়ের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিলই না। সাধ্যমতো কিছু কিছু আয়োজন করছি আর এই কথা নিয়ে আমার আলাপ এগোচ্ছে নানা লোকের সঙ্গে, এমনি অগোচরভাবে ভিৎপত্তন চলছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ের কাজে শান্তিনিকেতন আশ্রমকে তখন আমার অধিকারে পেয়েছিলেম। এই সময়ে একটি তরুণ যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হল, তাকে বালক বললেই হয়। বোধ করি আঠারো পেরিয়ে সে উনিশে পড়েছে। তার নাম সতীশচন্দ্র রায়, কলেজে পড়ে, বি. এ. ক্লাসে। তার বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্তী সতীশের লেখা কবিতার খাতা কিছুদিন পূর্বে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিল। পড়ে দেখে আমার সন্দেহমাত্র ছিল না যে, এই ছেলেটির প্রতিভা আছে, কেবলমাত্র লেখবার ক্ষমতা নয়। কিছুদিন পরে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সতীশ এলেন আমার কাছে। শান্ত নম্র স্বল্পভাষী সৌম্যমূর্তি, দেখে মন স্বতই আকৃষ্ট হয়। সতীশকে আমি শক্তিশালী বলে জেনেছিলেম বলেই তার রচনায় যেখানে শৈথিল্য দেখেছি স্পষ্ট করে নির্দেশ করতে সংকোচ বোধ করি নি। বিশেষভাবে ছন্দ নিয়ে তার লেখার প্রত্যেক লাইন ধরে আমি আলোচনা করেছি। অজিত আমার কঠোর বিচারে বিচলিত হয়েছিল কিন্তু সতীশ সহজেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে পারলে। অল্প দিনেই সতীশের যে পরিচয় পাওয়া গেল আমাকে তা বিস্মিত করেছিল। যেমন গভীর তেমনি বিস্তৃত ছিল তার সাহিত্যরসের অভিজ্ঞতা। ব্রাউনিঙের কবিতা সে যেরকম করে আত্মগত করেছিল এমন দেখা যায় না। শেক্সপীয়রের রচনায় যেমন ছিল তার অধিকার তেমনি আনন্দ। আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, সতীশের কাব্যরচনায় একটা বলিষ্ঠ নাট্যপ্রকৃতির বিকাশ দেখা দেবে, এবং সেই দিক থেকে সে একটা সম্পূর্ণ নতুন পথের প্রবর্তন করবে বাংলাসাহিত্যে। তার স্বভাবে একটি দুর্লভ লক্ষণ দেখেছি, যদিও তার বয়স কাঁচা তবু নিজের রচনার 'পরে তার অন্ধ আসক্তি ছিল না। সেগুলিকে আপনার থেকে বাইরে রেখে সে দেখতে পারত, এবং নির্মমভাবে সেগুলিকে বাইরে ফেলে দেওয়া তার পক্ষে ছিল সহজ। তাই তার সেদিনকার লেখার কোনো চিহ্ন অনতিকাল পরেও আমি দেখি নি। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যেত, তার কবিস্বভাবের যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাকে বলা যেতে পারে বহিরাশ্রয়িতা বা অব্জেক্টিভিটি। বিশ্লেষণ ও ধারণা শক্তি তার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু স্বভাবের যে পরিচয় আমাকে তার দিকে অত্যন্ত আকর্ষণ করেছিল সে তার মনের স্পর্শচেতনা। যে জগতে সে জন্মেছিল তার কোথাও ছিল না তার ঔদাসীন্য। একই কালে ভোগের দ্বারা এবং ত্যাগের দ্বারা সর্বত্র আপন অধিকার প্রসারিত করবার শক্তি নিয়েই সে এসেছিল। তার অনুরাগ ছিল আনন্দ ছিল নানা দিকে ব্যাপক কিন্তু তার আসক্তি ছিল না। মনে

আছে আমি তাকে একদিন বলেছিলেম, তুমি কবি ভর্তৃহরি, এই পৃথিবীতে তুমি রাজা এবং তুমি সন্ন্যাসী।

সে সময়ে আমার মনের মধ্যে নিয়ত ছিল শান্তিনিকেতন আশ্রমের সংকল্পনা। আমার নতুন-পাওয়া বালক-বন্ধুর সঙ্গে আমার সেই আলাপ চলত। তার স্বাভাবিক ধ্যানদৃষ্টিতে সমস্তটাকে সে দেখতে পেত প্রত্যক্ষ। উতঙ্কের যে উপাখ্যানটি সে লিখেছিল তাতে সেই ছবিটিকে সে আঁকতে চেষ্টা করেছে।

অবশেষে আনন্দের উৎসাহ সে আর সম্বরণ করতে পারলে না। সে বললে, আমাকে আপনার কাজে নিন। খুব খুশি হলেম কিন্তু কিছুতে তখন রাজি হলেম না। অবস্থা তাদের ভালো নয় জানতেম। বি. এ. পাস করে এবং পরে আইনের পরীক্ষা দিয়ে সে সংসার চালাতে পারবে, তার অভিভাবকদের এই ইচ্ছা ছিল সন্দেহ নেই। তখনকার মতো আমি তাকে ঠেকিয়ে রেখে দিলেম।

এমন সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার নৈবেদ্যের কবিতাগুলি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্বে। এই কবিতাগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত Twentieth Century পত্রিকায় এই রচনাগুলির যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন সেকালে সেরকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাই নি। বস্তুত এর অনেক কাল পরে এই সকল কবিতার কিছু অংশ এবং খেয়া ও গীতাঞ্জলি থেকে এই জাতীয় কবিতার ইংরেজি অনুবাদের যোগে যে সম্মান পেয়েছিলেম তিনি আমাকে সেইরকম অকুণ্ঠিত সম্মান দিয়েছিলেন সেই সময়েই। এই পরিচয় উপলক্ষেই তিনি জানতে পেরেছিলেন আমার সংকল্প, এবং খবর পেয়েছিলেন যে, শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়-স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই সংকল্পকে কার্যে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন। তখনই আমার তরফে ছাত্র ছিল রথীন্দ্রনাথ ও তার কনিষ্ঠ শমীন্দ্রনাথ। আর অল্প কয়েক জনকে তিনি যোগ করে দিলেন। সংখ্যা অল্প না হলে বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণতা অসম্ভব হত। তার কারণ, প্রাচীন আদর্শ অনুসারে আমার এই ছিল মত যে, শিক্ষাদানব্যাপারে গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ হওয়া উচিত আধ্যাত্মিক। অর্থাৎ শিক্ষা দেওয়াটা গুরুর আপন সাধনারই প্রধান অঙ্গ। বিদ্যার সম্পদ যে পেয়েছে তার নিজেরই নিঃস্বার্থ দায়িত্ব সেই সম্পদ দান করা। আমাদের সমাজে এই মহৎ দায়িত্ব আধুনিক কাল পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছে। এখন তার লোপ হচ্ছে ক্রমশই।

তখন যে কয়টি ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়ের আরম্ভ হল তাদের কাছ থেকে বেতন বা আহার্য-ব্যয় নেওয়া হত না, তাদের জীবনযাত্রার প্রায় সমস্ত দায় নিজের স্বল্প সম্বল থেকেই স্বীকার করেছি। অধ্যাপনার অধিকাংশ ভার যদি উপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদ— তাঁর এখনকার উপাধি অণিমানন্দ— বহন না করতেন তা হলে কাজ চালানো একেবারে অসাধ্য হত। তখনকার আয়োজন ছিল দরিদ্রের মতো, আহারব্যবহার ছিল দরিদ্রের আদর্শে। তখন উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে। আশ্রমের আরম্ভ থেকে বহুকাল পর্যন্ত তার আর্থিক ভার আমার পক্ষে যেমন দুর্বহ হয়েছে, এই উপাধিটিও তেমনি। অর্থকৃচ্ছ্র এবং এই উপাধি কোনোটাকেই আরামে বহন করতে পারি নে কিন্তু দুটো বোঝাই যে ভাগ্য আমার

স্কন্ধে চাপিয়েছেন তাঁর হাতের দানস্বরূপ এই দুঃখ এবং লাঞ্ছনা থেকে শেষ পর্যন্তই নিষ্কৃতি পাবার আশা রাখি নে।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সূচনার মূল কথাটা বিস্তারিত করে জানালুম। এইসঙ্গে উপাধ্যায়ের কাছে আমার অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।* তার পরে সেই কবিবালক সতীশের কথাটাও শেষ করে দিই।

বি. এ. পরীক্ষা তার আসন্ন হয়ে এল। অধ্যাপকেরা তার কাছে আশা করেছিল খুব বড়ো রকমেরই কৃতিত্ব। ঠিক সেই সময়েই সে পরীক্ষা দিল না। তার ভয় হল সে পাস করবে। পাস করলেই তার উপরে সংসারের যে সমস্ত দাবি চেপে বসবে তার পীড়ন ও প্রলোভন থেকে মুক্তি পাওয়া পাছে তার পক্ষে অসাধ্য হয় এইজন্যেই সে পিছিয়ে গেল শেষ মুহূর্তে। সংসারের দিক থেকে জীবনে সে একটা মস্ত ট্র্যাজিডির পত্তন করলে। আমি তার আর্থিক অভাব কিছু পরিমাণে পূরণ করবার যতই চেষ্টা করেছি কিছুতেই তাকে রাজি করতে পারি নি। মাঝে মাঝে গোপনে তাদের বাড়িতে পাঠিয়েছি টাকা। কিন্তু সে সামান্য। তখন আমার বিক্রি করবার যোগ্য যা-কিছু ছিল প্রায় সব শেষ হয়ে গেছে— অন্তঃপুরের সম্বল এবং বাইরের সম্বল। কয়েকটা আয়জনক বইয়ের বিক্রয়স্বত্ব কয়েক বৎসরের মেয়াদে দিয়েছি পরের হাতে। হিসাবের দুর্বোধ জটিলতায় সে মেয়াদ অতিক্রম করতে অতি দীর্ঘকাল লেগেছে। সমুদ্রতীরবাসের লোভে পুরীতে একটা বাড়ি করেছিলুম। সে বাড়ি একদিনও ভোগ করবার পূর্বে আশ্রমের ক্ষুধার দাবিতে বিক্রি হয়ে গেল। তার পরে যে সম্বল বাকি রইল তাকে বলে উচ্চহারের সুদে দেনা করবার ক্রেডিট। সতীশ জেনেশুনেই এখানকার সেই অগাধ দারিদ্র্যের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিল প্রসন্ন মনে। কিন্তু তার আনন্দের অবধি ছিল না— এখানকার প্রকৃতির সংসর্গের আনন্দ, সাহিত্যসম্ভোগের আনন্দ, প্রতি মুহূর্তে আত্মনিবেদনের আনন্দ।

এই অপর্যাপ্ত আনন্দ সে সঞ্চার করত তার ছাত্রদের মনে। মনে পড়ে কতদিন তাকে পাশে নিয়ে শালবীথিকায় পায়চারি করেছি নানা তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে— রাত্রি এগারোটা দুপুর হয়ে যেত— সমস্ত আশ্রম হত নিস্তব্ধ নিদ্রামগ্ন। তারই কথা মনে করে আমি লিখেছি—

কতদিন এই পাতা-ঝরা
বীথিকায়, পুষ্পগন্ধে বসন্তের আগমনী-ভরা
সায়াহ্নে দুজনে মোরা ছায়াতে অঙ্কিত চন্দ্রালোকে
ফিরেছি গুঞ্জিত আলাপনে। তার সেই মুগ্ধ চোখে
বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দনমন্দার রঙে রাঙা।
যৌবনতুফান-লাগা সেদিনের কত নিদ্রাভাঙা
জ্যোৎস্না-মুগ্ধ রজনীর সৌহার্দ্যের সুধারসধারা
তোমার ছায়ার মাঝে দেখা দিল, হয়ে গেল সারা।

* কেহ কেহ এমন কথা লিখেছেন যে, উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদ খৃস্টান ছিলেন, তাই নিয়ে পিতৃদেব আপত্তি করেছিলেন। এ কথা সত্য নয়। আমি নিজে জানি এই কথা তুলে আমাদের কোনো আত্মীয় তাঁর কাছে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি কেবল এই কথাটি বলেছিলেন, তোমরা কিছু ভেবো না। ওখানকার জন্যে কোনো ভয় নেই। আমি ওখানে শান্তং শিবমদ্বৈতমের প্রতিষ্ঠা করে এসেছি।

গভীর আনন্দক্ষণ কতদিন তব মঞ্জরীতে
একান্ত মিশিয়াছিল একখানি অখণ্ড সংগীতে
আলোকে আলাপে হাস্যে, বনের চঞ্চল আন্দোলনে,
বাতাসের উদাস নিশ্বাসে।—

এমন অবিমিশ্র শ্রদ্ধা, অবিচলিত অকৃত্রিম প্রীতি, এমন সর্বভারবাহী সর্বত্যাগী সৌহার্দ্য জীবনে কত যে দুর্লভ তা এই সত্তর বৎসরের অভিজ্ঞতায় জেনেছি। তাই সেই আমার কিশোর বন্ধুর অকাল তিরোভাবের বেদনা আজ পর্যন্ত কিছুতেই ভুলতে পারি নি।

এই আশ্রমবিদ্যালয়ের সুদূর আরম্ভ-কালের প্রথম সংকল্পন, তার দুঃখ তার আনন্দ, তার অভাব তার পূর্ণতা, তার প্রিয় সঙ্গ, প্রিয় বিচ্ছেদ, নিষ্ঠুর বিরুদ্ধতা ও অযাচিত আনুকূল্যের অল্পই কিছু আভাস দিলেম এই লেখায়। তার পরে শুধু আমাদের ইচ্ছা নয়, কালের ধর্ম কাজ করছে; এনেছে কত পরিবর্তন, কত নতুন আশা ও ব্যর্থতা, কত সুহৃদের অভাবনীয় আত্মনিবেদন, কত অজানা লোকের অহৈতুক শত্রুতা, কত মিথ্যা নিন্দা ও প্রশংসা, কত দুঃসাধ্য সমস্যা—আর্থিক ও পারমার্থিক। পারিতোষিক পাই বা না পাই, নিজের ক্ষতি করেছি সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত—অবশেষে ক্লান্ত দেহ ও জীর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে আমারও বিদায় নেবার দিন এল—প্রণাম করে যাই তাঁকে যিনি সুদীর্ঘ কঠোর দুর্গম পথে আমাকে এতকাল চালনা করে নিয়ে এসেছেন। এই এতকালের সাধনার বিফলতা প্রকাশ পায় বাইরে, এর সার্থকতার সম্পূর্ণ প্রমাণ থেকে যায় অলিখিত ইতিহাসের অদৃশ্য অক্ষরে।

৫ আশ্বিন ১৩৪০

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা

১

মানব-সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড়ো করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে। কোনো জাতির নিজের বিশেষ প্রদীপখানি যদি ভাঙিয়া দেওয়া যায়, অথবা তাহার অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহাতে সমস্ত জগতের ক্ষতি করা হয়।

এ কথা প্রমাণ হইয়া গেছে যে, ভারতবর্ষ নিজেরই মানসশক্তি দিয়া বিশ্বসমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং আপন বুদ্ধিতে তাহার সমাধানের চেষ্টা পাইয়াছে। সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে, তাহা কলের দ্বারাও ঘটিতে পারে।

ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল —এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। এখন তাহার মনের বড়ো বড়ো শাখাগুলি একটি কাণ্ডের মধ্যে নিজেদের বৃহৎ যোগ অনুভব করিতে ভুলিয়া গেছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-চেতনাসূত্রের বিচ্ছেদই সমস্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক। সেইরূপ, ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খৃস্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। দশ আঙুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয়—নেবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলাও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে, যে শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষার মতো গ্রহণ করিবে। সেরূপ ভিক্ষাজীবিতায় কখনও কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেইসকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে, সেই উৎসধারার নির্ঝরিণীতটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল করিয়া হইবে না।

তৃতীয় কথা এই যে, সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি ওকালতি ডাক্তারি ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের

সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠা-স্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায়-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারি দিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত হইবে।

এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।

প্র বৈশাখ ১৩২৬

২

বর্তমান কালে আমাদের দেশের উপরে যে শক্তি, যে শাসন, যে ইচ্ছা কাজ করছে, সমস্তই বাইরের দিক থেকে। সে এত প্রবল যে তাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে আমরা কোনো ভাবনাও ভাবতে পারি নে। এতে করে আমাদের মনের মনীষা প্রতিদিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। আমরা অন্যের ইচ্ছাকে বহন করি, অন্যের শিক্ষাকে গ্রহণ করি, অন্যের বাণীকে আবৃত্তি করি, তাতে করে প্রকৃতিস্থ হতে আমাদের বাধা দেয়। এইজন্যে মাঝে মাঝে যে চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হয় তাতে কল্যাণের পথ থেকে আমাদের ভ্রষ্ট করে। এই অবস্থায় একদল লোক গর্হিত উপায়ে বিদ্বেষবুদ্ধিকে তৃপ্তিদান করাকেই কর্তব্য বলে মনে করে, আর-এক দল লোক চাটুকারবৃত্তি বা চরবৃত্তির দ্বারা যেমন করে হোক অপমানের অন্ন খুঁটে খাবার জন্যে রাষ্ট্রীয় আবর্জনাকুণ্ডের আশেপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এমন অবস্থায় বড়ো করে দৃষ্টি করা বা বড়ো করে সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয় না; মানুষ অন্তরে বাহিরে অত্যন্ত ছোটো হয়ে যায়, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়।

যে ফলের চারাগাছকে বাইরে থেকে ছাগলে মুড়িয়ে খাবার আশঙ্কা আছে সেই চারাকে বেড়ার মধ্যে রাখার দরকার হয়। সেই নিভৃত আশ্রয়ে থেকে গাছ যখন বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে ছাগলের নাগালের উপর উঠে যায়। প্রথম যখন আশ্রমে বিদ্যালয়-স্থাপনের সংকল্প আমার মনে আসে তখন আমি মনে করেছিলুম, ভারতবর্ষের মধ্যে এইখানে একটি বেড়া-দেওয়া স্থানে আশ্রয় নেব। সেখানে বাহ্য শক্তির দ্বারা অভিভূতির থেকে রক্ষা করে আমাদের মনকে একটু স্বাতন্ত্র্য দেবার চেষ্টা করা যাবে। সেখানে চাঞ্চল্য থেকে, রিপুর আক্রমণ থেকে মনকে মুক্ত রেখে বড়ো করে শ্রেয়ের কথা চিন্তা করব এবং সত্য করে শ্রেয়ের সাধনা করতে থাকব।

আজকাল আমরা রাষ্ট্রনৈতিক তপস্যাকেই মুক্তির তপস্যা বলে ধরে নিয়েছি। দল বেঁধে কান্নাকেই সেই তপস্যার সাধনা বলে মনে করেছিলুম। সেই বিরাট

কান্নার আয়োজনে অন্যসকল কাজকর্ম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। এইটেতে আমি অত্যন্ত পীড়াবোধ করেছিলুম।

আমাদের দেশে চিরকাল জানি, আত্মার মুক্তি এমন একটা মুক্তি যেটা লাভ করলে সমস্ত বন্ধন তুচ্ছ হয়ে যায়। সেই মুক্তিটাই, সেই স্বার্থের বন্ধন রিপুর বন্ধন থেকে মুক্তিটাই আমাদের লক্ষ্য; সেই কথাটাকে কান দিয়ে শোনা এবং সত্য বলে জানার একটা জায়গা আমাদের থাকা চাই। এই মুক্তিটা যে কর্মহীনতা শক্তিহীনতার রূপান্তর তা নয়। এতে যে নিরাসক্তি আনে তা তামসিক নয়; তাতে মনকে অভয় করে, কর্মকে বিশুদ্ধ করে, লোভ মোহকে দূর করে দেয়।

তাই বলে এ কথা বলি নে যে, বাইরের বন্ধনে কিছুমাত্র শ্রেয় আছে; বলি নে যে, তাকে অলংকার করে গলায় জড়িয়ে রেখে দিতে হবে। সেও মন্দ, কিন্তু অন্তরে যে মুক্তি তাকে এই বন্ধন পরাভূত ও অপমানিত করতে পারে না। সেই মুক্তির তিলক ললাটে যদি পরি তা হলে রাজসিংহাসনের উপরে মাথা তুলতে পারি এবং বণিকের ভূরি-সঞ্চয়কে তুচ্ছ করার অধিকার আমাদের জন্মে।

যাই হোক, আমার মনে এই কথাটি ছিল যে, পাশ্চাত্ত্য দেশে মানুষের জীবনের একটা লক্ষ্য আছে; সেখানকার শিক্ষা দীক্ষা সেই লক্ষ্যের দিকে মানুষকে নানা রকমে বল দিচ্ছে ও পথ নির্দেশ করছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে অবান্তরভাবে এই শিক্ষাদীক্ষায় অন্য দশ রকম প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে জীবনের বড়ো লক্ষ্য আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে ওঠে নি, কেবলমাত্র জীবিকার লক্ষ্যই বড়ো হয়ে উঠল।

জীবিকার লক্ষ্য শুধু কেবল অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়ে; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে—সকল প্রয়োজনের উপরে সে। এই পরিপূর্ণতার আদর্শ সম্বন্ধে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু কোনো একটা আদর্শ আছে যা কেবল পেট ভরাবার না, টাকা করবার না, এ কথা যদি না মানি, তা হলে নিতান্ত ছোটো হয়ে যাই।

এই কথাটা মানব, মানতে শেখাব, এই মনে করেই এখানে প্রথমে বিদ্যালয়ের পত্তন করেছিলুম। তার প্রথম সোপান হচ্ছে বাইরে নানাপ্রকার চিত্তবিক্ষেপ থেকে সরিয়ে এনে মনকে শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। সেইজন্যে এই শান্তির ক্ষেত্রে এসে আমরা আসন গ্রহণ করলুম।

আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের অনেকেই এর আরম্ভ-কালের অবস্থাটা দেখেন নি। তখন আর যাই হোক, এর মধ্যে ইস্কুলের গন্ধ ছিল না বললেই হয়। এখানে যে আহ্বানটি সবচেয়ে বড়ো ছিল সে হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বান, ইস্কুলমাস্টারের আহ্বান নয়। ছাত্রদের সঙ্গে তখন বেতনের কোনো সম্বন্ধ ছিল না, এমনকি বিছানা তৈজসপত্র প্রভৃতি সমস্ত আমাকেই জোগাতে হত।

কিন্তু আধুনিক কালে এত উজান-পথে চলা সম্ভবপর নয়। কোনো একটা ব্যবস্থা যদি এক জায়গায় থাকে এবং সমাজের অন্য জায়গায় তার কোনো সামঞ্জস্যই না থাকে তা হলে তাতে ক্ষতি হয় এবং সেটা টিকতে পারে না। সেইজন্যে এই বিদ্যালয়ের আকৃতিপ্রকৃতি তখনকার চেয়ে এখন অনেক বদল হয়ে এসেছে। কিন্তু হলেও, সেই মূল জিনিসটা আছে। এখানে বালকেরা যতদূর সম্ভব মুক্তির স্বাদ পায়। আমাদের বাহ্য মুক্তির লীলাক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি, সেই ক্ষেত্র এখানে প্রশস্ত।

তার পরে ইচ্ছা ছিল, এখানে শিক্ষার ভিতর দিয়ে ছেলেদের মনের দাসত্ব মোচন

করব। কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী যে জালে আমাদের দেশকে আপাদমস্তক বেঁধে ফেলেছে তার থেকে একেবারে বেরিয়ে আসা শক্ত। দেশে বিদেশে শিক্ষার যেসব সিংহদ্বার আছে আমাদের বিদ্যালয়ের পথ যদি সেই দিকে পৌঁছে না দেয় তা হলে কী জানি কী হয় এই ভয়টা মনের ভিতর ছিল। পুরোপুরি সাহস করে উঠতে পারি নি, বিশেষত আমার শক্তিও যৎসামান্য, অভিজ্ঞতাও তদ্রূপ। সেইজন্যে এখানকার বিদ্যালয়টি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়েছিল। সেই গণ্ডিটুকুর মধ্যে যতটা পারি স্বাতন্ত্র্য রাখতে চেষ্টা করেছি। এই কারণেই আমাদের বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনাধীনে আনতে পারি নি।

পূর্বেই বলেছি, সকল বড়ো দেশেই বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগ-লাভ, উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনের পূর্ণতা-সাধন। এই লক্ষ্য হতেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি। আমাদের দেশের আধুনিক বিদ্যালয়গুলির সেই স্বাভাবিক উৎপত্তি নেই। বিদেশী বণিক ও রাজা তাঁদের সংকীর্ণ প্রয়োজন-সাধনের জন্য বাইরে থেকে এই বিদ্যালয়গুলি এখানে স্থাপন করেছিলেন। এমনকি তখনকার কোনো কোনো পুরনো দপ্তরে দেখা যায়, প্রয়োজনের পরিমাণ ছাপিয়ে শিক্ষাদানের জন্যে শিক্ষককে কর্তৃপক্ষ তিরস্কার করেছেন।

তার পরে যদিচ অনেক বদল হয়ে এসেছে তবু কৃপণ প্রয়োজনের দাসত্বের দাগা আমাদের দেশের সরকারি শিক্ষার কপালে-পিঠে এখনও অঙ্কিত আছে। আমাদের অভাবের সঙ্গে, অন্নচিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই এই বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করে হোক বহন করে চলেছি। এই ভয়ংকর জবরদস্তি আছে বলেই শিক্ষাপ্রণালীতে আমরা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতে পারছি নে।

এই শিক্ষাপ্রণালীর সকলের চেয়ে সাংঘাতিক দোষ এই যে, এতে গোড়া থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে আমরা নিঃস্ব। যা-কিছু সমস্তই আমাদের বাইরে থেকে নিতে হবে—আমাদের নিজের ঘরে শিক্ষার পৈতৃক মূলধন যেন কানাকড়ি নেই। এতে কেবল যে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে তা নয়, আমাদের মনে একটা নিঃস্ব-ভাব জন্মায়। আত্মাভিমানের তাড়নায় যদি-বা মাঝে মাঝে সেই ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি তা হলেও সেটাও কেমনতরো বেসুরো রকম আস্ফালনে আত্মপ্রকাশ করে। আজকালকার দিনে এই আস্ফালনে আমাদের আন্তরিক দীনতা কিছুই ঘোচে নি, কেবল সেই দীনতাটাকে হাস্যকর ও বিরক্তিকর করে তুলেছি।

যাই হোক, মনের দাসত্ব যদি ঘোচাতে চাই তা হলে আমাদের শিক্ষার এই দাসভাবটাকে ঘোচাতে হবে। আমাদের আশ্রমে শিক্ষার যদি সেই মুক্তি দিতে না পারি তা হলে এখানকার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কিছুকাল পূর্বে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে একটি সংকল্পের উদয় হয়েছিল। আমাদের টোলের চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া হয় এবং অন্যসকল শিক্ষাকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়। তার ফলে সেখানকার ছাত্রদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমাদের দেশের শিক্ষাকে মূল-আশ্রয়-স্বরূপ অবলম্বন করে তার উপর অন্যসকল শিক্ষার পত্তন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে। শাস্ত্রীমহাশয় তাঁর এই সংকল্পটিকে কাজে পরিণত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নানা বাধায় তখন তিনি তা পারেন নি। এই অধ্যবসায়ের টানে কিছুদিন তিনি আশ্রম ত্যাগ করে গিয়েছিলেন।

তার পর তাঁকে পুনরায় আশ্রমে আহ্বান করে আনা গেল। এবার তাঁকে ক্লাস পড়ানো থেকে নিষ্কৃতি দিলুম। তিনি ভাষাতত্ত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত রইলেন। আমার মনে হল, এইরকম কাজই হচ্ছে শিক্ষার যজ্ঞক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্য। যাঁরা যথার্থ শিক্ষার্থী তাঁরা যদি এইরকম বিদ্যার সাধকদের চারি দিকে সমবেত হন তা হলে তো ভালোই; আর যদি আমাদের দেশের কপাল-দোষে সমবেত না হন তা হলেও এই যজ্ঞ ব্যর্থ হবে না। কথার মানে এবং বিদেশের বাঁধা বুলি মুখস্থ করিয়ে ছেলেদের তোতাপাখি করে তোলার চেয়ে এ অনেক ভালো।

এমনি করে কাজ আরম্ভ হল। এই আমাদের বিশ্বভারতীর প্রথম বীজবপন।

বিশ-পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পত্তন করবার সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু সেজন্যে হতাশ হতেও চাই নে। বীজের যদি প্রাণ থাকে তা হলে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে আপনি বেড়ে উঠবে। সাধনার মধ্যে যদি সত্য থাকে তা হলে উপকরণের অভাবে ক্ষতি হবে না।

আমাদের আসনগুলি ভরে উঠেছে। সংস্কৃত পালি প্রাকৃতভাষা ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটিতে বসেছেন, আর-একটিতে আছেন সিংহলের মহাস্থবির; ক্ষিতিমোহনবাবু সমাগত; আর আছেন ভীমশাস্ত্রী মহাশয়। ওদিকে এন্ড্রুজের চারি দিকে ইংরেজি-সাহিত্য-পিপাসুরা সমবেত। ভীমশাস্ত্রী এবং দিনেন্দ্রনাথ সংগীতের অধ্যাপনার ভার নিয়েছেন, আর বিষ্ণুপুরের নকুলেশ্বর গোস্বামী তাঁর সুরবাহার নিয়ে এঁদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছেন। শ্রীমান নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। দূর দেশ হতেও তাঁদের ছাত্র এসে জুটছে। তা ছাড়া আমাদের যার যতটুকু সাধ্য আছে কিছু কিছু কাজ করতে প্রবৃত্ত হব। আমাদের একজন বিহারী বন্ধু সত্বর আসছেন। তিনি পারসি ও উর্দু শিক্ষা দেবেন, ও ক্ষিতিমোহনবাবুর সহায়তায় প্রাচীন হিন্দিসাহিত্যের চর্চা করবেন। মাঝে মাঝে অন্যত্র হতে অধ্যাপক এসে আমাদের উপদেশ দিয়ে যাবেন এমনও আশা আছে।

শিশু দুর্বল হয়েই পৃথিবীতে দেখা দেয়। সত্য যখন সেইরকম শিশুর বেশে আসে তখনই তার উপরে আস্থা স্থাপন করা যায়। একেবারে দাড়িগোঁফ-সুদ্ধ যদি কেউ জন্মগ্রহণ করে তা হলে জানা যায় সে একটা বিকৃতি। বিশ্বভারতী একটা মস্ত ভাব, কিন্তু সে অতি ছোটো দেহ নিয়ে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ছোটোর ছদ্মবেশে বড়োর আগমন পৃথিবীতে প্রতিদিনই ঘটে, অতএব আনন্দ করা যাক, মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠুক। একান্তমনে এই আশা করা যাক যে, এই শিশু বিধাতার অমৃতভাণ্ডার থেকে অমৃত বহন করে এনেছে; সেই অমৃতই একে ভিতর থেকে বাঁচাবে বাড়াবে, এবং আমাদেরও বাঁচাবে ও বাড়িয়ে তুলবে।

শান্তিনিকেতন
১৮ আষাঢ় ১৩২৬

৩

আজ বিশ্বভারতী-পরিষদের প্রথম অধিবেশন। কিছুদিন থেকে বিশ্বভারতীর এই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়েছে। আজ সর্বসাধারণের হাতে তাকে সমর্পণ করে দেব। বিশ্বভারতীর যাঁরা হিতৈষীবৃন্দ ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাইরে আছেন, এর ভাবের সঙ্গে যাঁদের মনের মিল আছে, যাঁরা একে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না, তাঁদেরই হাতে আজ একে সমর্পণ করে দেব।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, হঠাৎ আজ আমাদের মধ্যে কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু সমাগত হয়েছেন, যাঁরা দেশে ও দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। সকলে জানেন, আজ এখানে ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র উপস্থিত আছেন। আমাদের আরও সৌভাগ্য যে, সমুদ্রপার থেকে এখানে একজন মনীষী এসেছেন, যাঁর খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত। আজ আমাদের কর্মে যোগদান করতে পরমসুহৃদ আচার্য সিল্‌ভ্যাঁ লেভি মহাশয় এসেছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমাদের এই প্রথম অধিবেশনে, যখন আমরা বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বভারতীর যোগসাধন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি সেই সভাতে, আমরা এঁকে পাশ্চাত্ত্য দেশের প্রতিনিধি রূপে পেয়েছি। ভারতবর্ষের চিত্তের সঙ্গে এঁর চিত্তের সম্বন্ধবন্ধন অনেক দিন থেকে স্থাপিত হয়েছে। ভারতবর্ষের আতিথ্য তিনি আশ্রমে আমাদের মধ্যে লাভ করুন। যেসকল সুহৃদ আজ এখানে উপস্থিত আছেন তাঁরা আমাদের হাত থেকে এর ভার গ্রহণ করুন। এই বিশ্বভারতীকে আমরা কিছুদিন লালনপালন করলুম, একে বিশ্বের হাতে সমর্পণ করবার এই সময় এসেছে। একে এঁরা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন, এর সঙ্গে আপনার চিত্তের সম্বন্ধ স্থাপন করুন। এই কামনা নিয়ে আমি আচার্য শীল মহাশয়কে সকলের সম্মতি-ক্রমে বরণ করেছি; তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে কর্ম সম্পন্ন করুন, বিশ্বের প্রতিনিধি রূপে আমাদের হাত থেকে একে গ্রহণ করে বিশ্বের সম্মুখে স্থাপন করুন। তিনি এ বিষয়ে যেমন করে বুঝবেন তেমন আর কেউ পারবেন না। তিনি উদার দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যকে দেখেছেন। কেবল অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলেই তা হতে পারে না, কারণ অনেক সময়ে পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভেদবুদ্ধি ঘটে। কিন্তু তিনি আত্মিক দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যের ভিতরের ঐক্যকে গ্রহণ করেছেন। আজকের দিনে তাঁর চেয়ে বিশ্বভারতীকে গ্রহণ করবার যোগ্য আর কেউ নেই। আনন্দের সহিত তাঁর হাতে একে সমর্পণ করছি। তিনি আমাদের হয়ে সকলের সামনে একে উপস্থিত করুন এবং তাঁর চিত্তে যদি বাধা না থাকে তবে নিজে এতে স্থান গ্রহণ করুন, একে আপনার করে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করুন।*

বিশ্বভারতীর মর্মের কথাটি আগে বলি, কারণ অনেকে হয়তো ভালো করে তা জানেন না। কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের পরমসুহৃদ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে সংকল্প হয়েছিল যে, আমাদের দেশে সংস্কৃতশিক্ষা যাকে বলা হয় তার অনুষ্ঠান ও প্রণালীর বিস্তারসাধন করা দরকার। তাঁর খুব ইচ্ছা হয়েছিল যে, আমাদের দেশে টোল ও চতুষ্পাঠী রূপে যেসকল বিদ্যায়তন আছে তার অধিকারকে প্রসারিত করতে হবে। তাঁর মনে হয়েছিল যে, যে কালকে আশ্রয় করে এদের প্রতিষ্ঠা সে কালে এদের উপযোগিতার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু কালের

* আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বক্তৃতা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে গবর্মেণ্টের দ্বারা যেসব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি এই দেশের নিজের সৃষ্টি নয়। কিন্তু আমাদের দেশের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের পুরাকালের এই বিদ্যালয়গুলির মিল আছে; এরা আমাদের নিজের সৃষ্টি। এখন কেবল দরকার এদের ভিতর দিয়ে নূতন যুগের স্পন্দন, তার আহ্বান, প্রকাশ পাওয়া; না যদি পায় তো বুঝতে হবে তারা সাড়া দিচ্ছে না, মরে গেছে। এই সংকল্প মনে রেখে তিনি নিজের গ্রামে যান; সে সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ তখনকার মতো বিযুক্ত হওয়াতে দুঃখিত হয়েছিলুম, যদিও আমি জানতুম যে ভিতরকার দিক দিয়ে সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তার পর নানা বাধায় তিনি গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করতে পারেন নি। তখন আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম, তাঁর ইচ্ছাসাধন এখানেই হবে, এই স্থানই তাঁর প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। এমনিভাবে বিশ্বভারতীর আরম্ভ হল।

গাছের বীজ ক্রমে ক্রমে প্রাণের নিয়মে বিস্তৃতি লাভ করে। সে বিস্তার এমন করে ঘটে যে, সেই বীজের সীমার মধ্যে তাকে আর ধরেই না। তেমনি প্রথমে যে শিক্ষার আয়তনকে মনে করেছিলাম দেশের প্রয়োজনের মধ্যেই অবরুদ্ধ থাকবে, ক্রমে তা বৃহৎ আকাশে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে লাগল। যে অনুষ্ঠান সত্য তার উপরে দাবি সমস্ত বিশ্বের; তাকে বিশেষ প্রয়োজনে খর্ব করতে চাইলে তার সত্যতাকেই খর্ব করা হয়। এবার পশ্চিমে গিয়ে দেখেছি যে, পূর্ব-মহাদেশ কী সম্পদ দিতে পারে তা সকলে জানতে চাচ্ছে। আজ মানুষকে বেদনা পেতে হয়েছে। সে পুরাকালে যে আশ্রয়কে নির্মাণ করেছিল তার ভিত্তি বিদীর্ণ হয়ে গেছে। তাতে করে মানুষের মনে হয়েছে, এ আশ্রয় তার অভাবকে পূর্ণ করবার উপযোগী নয়। পশ্চিমের মনীষীরাও এ কথা বুঝতে পেরেছেন, এবং মানুষের সাধনা কোন্ পথে গেলে সে অভাব পূর্ণ হবে তাঁদের তা উপলব্ধি করবার ইচ্ছা হয়েছে।

কোনো জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্য-বশত আপন ধর্ম ও সম্পদকে একান্ত আপন বলে মনে করে তবে সেই অহংকারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্য সম্পদকে বেষ্টন করে রাখতে পারবে না। যদি সে তার অহংকারের দ্বারা সত্যকে কেবলমাত্র স্বকীয় করতে যায় তবে তার সে সত্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। আজ পৃথিবীর সর্বত্র এই বিশ্ববোধ উদ্‌বুদ্ধ হতে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে কি এই যুগের সাধনা স্থান পাবে না? আমরা কি এ কথাই বলব যে, মানবের বড়ো অভিপ্রায়কে দূরে রেখে ক্ষুদ্র অভিপ্রায় নিয়ে আমরা থাকতে চাই? তবে কি আমরা মানুষের যে গৌরব তার থেকে বঞ্চিত হব না? স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে সংকীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি সবচেয়ে বড়ো গৌরব?

এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও একে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেবার কী আছে। কল্যাণরূপী শিব তাঁর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছেন। সে ঝুলিতে কে কী দান করবে? শিব সমস্ত মানুষের কাছে সেই ঝুলি নিয়ে এসেছেন। আমাদের কি তাঁকে কিছু দেবার নেই? হাঁ, আমাদের দেবার আছে, এই কথা ভেবেই কাজ করতে হবে। এইজন্যই ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

শান্তিনিকেতন
৮ পৌষ ১৩২৮

৪

কোনো জিনিসের আরম্ভ কী করে হয় তা বলা যায় না। সেই আরম্ভকালটি রহস্যে আবৃত থাকে। আমি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত পদ্মার বোটে কাটিয়েছি, আমার প্রতিবেশী ছিল বালিচরের চক্রবাকের দল। তাদের মধ্যে বসে বসে আমি বই লিখেছি। হয়তো চিরকাল এইভাবেই কাটাতুম। কিন্তু মন হঠাৎ কেন বিদ্রোহী হল, কেন ভাবজগৎ থেকে কর্মজগতে প্রবেশ করলাম?

আমি বাল্যকালের শিক্ষাব্যবস্থায় মনে বড়ো পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত আঘাত করত যে বড়ো হয়েও সে অন্যায় ভুলতে পারি নি। কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানবজীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের নিষ্পেষণে শিশুচিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে। আমরা নর্মাল ইস্কুলে পড়তাম। সেটা ছিল মল্লিকদের বাড়ি। সেখানে গাছপালা নেই, মার্বেলের উঠান আর ইঁটের উঁচু দেওয়াল যেন আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকত। আমরা, যাদের শিশুপ্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উদ্যম সতেজ ছিল, এতে বড়োই দুঃখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য থেকে দূরে থেকে আর মাস্টারদের সঙ্গে প্রাণগত যোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত। মাস্টাররা সব আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করত।

প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই-যে বিদ্যা লাভ করা যায় এটা কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।

আমি এ বিষয়ে কখনও কখনও বক্তৃতাও দিয়েছিলেম। কিন্তু যখন দেখলাম যে আমার কথাগুলি শ্রুতিমধুর কবিত্ব হিসাবেই সকলে নিলেন এবং যাঁরা কথাটাকে মানলেন তাঁরা এটাকে কাজে খাটাবার কোনো উদ্যোগ করলেন না, তখন আমার ভাবকে কর্মের মধ্যে আকার দান করবার জন্য আমি নিজেই কৃতসংকল্প হলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা হল, আমি ছেলেদের খুশি করব, প্রকৃতির গাছপালাই তাদের অন্যতম শিক্ষক হবে, জীবনের সহচর হবে— এমনি করে বিদ্যার একটি প্রাণনিকেতন নীড় তৈরি করে তুলব।

তখন আমার ঘাড়ে মস্ত একটা দেনা ছিল; সে দেনা আমার সম্পূর্ণ স্বকৃত নয়, কিন্তু তার দায় আমারই একলার। দেনার পরিমাণ লক্ষ টাকারও অধিক ছিল। আমার এক পয়সার সম্পত্তি ছিল না, মাসিক বরাদ্দ অতি সামান্য। আমার বইয়ের কপিরাইট প্রভৃতি আমার সাধ্যায়ত্ত সামগ্রীর কিছু কিছু সওদা করে অসাধ্যসাধনে লেগে গেলাম। আমার ডাক দেশের কোথাও পৌঁছয় নি। কেবল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে পাওয়া গিয়েছিল, তিনি তখনও রাজনীতিক্ষেত্রে নামেন নি। তাঁর কাছে আমার এই সংকল্প খুব ভালো লাগল, তিনি এখানে এলেন। কিন্তু তিনি জমবার আগেই কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। আমি পাঁচ-ছয়টি ছেলে নিয়ে জামগাছতলায় তাদের পড়াতাম। আমার নিজের বেশি বিদ্যে ছিল না। কিন্তু আমি যা পারি তা করেছি। সেই ছেলে-কয়টিকে নিয়ে রস দিয়ে ভাব দিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি— তাদের কাঁদিয়েছি হাসিয়েছি, ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের মানুষ করেছি।

এক সময়ে নিজের অনভিজ্ঞতার খেদে আমার হঠাৎ মনে হল যে, একজন হেডমাস্টারের নেহাত দরকার। কে যেন একজন লোকের নাম করে বললে, 'অমুক

লোকটি একজন ওস্তাদ শিক্ষক, যাকে তাঁর পাসের সোনার কাঠি ছুঁইয়েছেন সেই পাস হয়ে গেছে।'—তিনি তো এলেন, কিন্তু কয়েক দিন সব দেখেশুনে বললেন, 'ছেলেরা গাছে চড়ে, চেঁচিয়ে কথা কয়, দৌড়য়, এ তো ভালো না।' আমি বললাম, 'দেখুন, আপনার বয়সে তো কখনও তারা গাছে চড়বে না। এখন একটু চড়তেই দিন-না। গাছ যখন ডালপালা মেলেছে তখন সে মানুষকে ডাক দিচ্ছে। ওরা ওতে চড়ে পা ঝুলিয়ে থাকলই-বা।' তিনি আমার মতিগতি দেখে বিরক্ত হলেন। মনে আছে, তিনি কিন্ডারগার্টেন-প্রণালীতে পড়াবার চেষ্টা করতেন। তাল গোল, বেল গোল, মানুষের মাথা গোল—ইত্যাদি সব পাঠ শেখাতেন। তিনি ছিলেন পাসের ধুরন্ধর পণ্ডিত, ম্যাট্রিকের কর্ণধার। কিন্তু এখানে তাঁর বনল না, তিনি বিদায় নিলেন। তার পর থেকে আর হেডমাস্টার রাখি নি।

এ সামান্য ব্যাপার নয়, পৃথিবীতে অল্প বিদ্যালয়েই ছেলেরা এত বেশি ছাড়া পেয়েছে। আমি এ নিয়ে মাস্টারদের সঙ্গে লড়াই করেছি। আমি ছেলেদের বললাম, 'তোমরা আশ্রম-সম্মিলনী করো, তোমাদের ভার তোমরা নাও।' আমি কিছুতে আমার সংকল্প ত্যাগ করি নি—আমি ছেলেদের উপর জবরদস্তি হতে দিই নি। তারা গান গায়, গাছে চড়ে, ছবি আঁকে, পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও বাধামুক্ত সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে আছে।

এখানকার শিশুশিক্ষার আর-একটা দিক আছে। সেটা হচ্ছে—জীবনের গভীর ও মহৎ তাৎপর্য ছোটো ছেলেদের বুঝতে দেওয়া। আমাদের দেশের সাধনার মন্ত্র হচ্ছে, যা মহৎ তাতেই সুখ, অল্পে সুখ নেই। কিন্তু একা রাজনীতিই এখন সেই বড়ো মহতের স্থান সমস্তটাই জুড়ে বসে আছে। আমার কথা এই যে, সবচেয়ে বড়ো যে আদর্শ মানুষের আছে তা ছেলেদের জানতে দিতে হবে। তাই আমরা এখানে সকালে সন্ধ্যায় আমাদের প্রাচীন তপোবনের মহৎ কোনো বাণী উচ্চারণ করি, স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বসি। এতে আর-কিছু না হোক, একটা স্বীকারোক্তি আছে। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা ছোটো ছেলেরা একটা বড়ো জিনিসের ইশারা পায়। হয়তো তারা উপাসনায় বসে হাত-পা নাড়ছে, চঞ্চল হয়ে উঠছে, কিন্তু এই আসনে বসবার একটা গভীর তাৎপর্য দিনে দিনে তাদের মনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছয়।

এখানে ছেলেরা জীবনের আরম্ভকালকে বিচিত্র রসে পূর্ণ করে নেবে, এই আমার অভিপ্রায় ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযোগে গানে অভিনয়ে ছবিতে আনন্দ-রস আস্বাদনের নিত্যচর্চায় শিশুদের মগ্ন চৈতন্যে আনন্দের স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে উঠবে, এইটেকেই লক্ষ্য করে কাজ আরম্ভ করা গেল।

কিন্তু শুধু এটাকেই চরম লক্ষ্য বলে এই বিদ্যালয় স্বীকার করে নেয় নি। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করবার আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালির ছেলেরা এখানে মানুষ হবে, রূপে রসে গন্ধে বর্ণে চিত্রে সংগীতে তাদের হৃদয় শতদলপদ্মের মতো আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার মনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এর উদ্দেশ্যও গভীরতর হল। এখানকার এই বাঙালির ছেলেরা তাদের কলহাস্যের দ্বারা আমার মনে একটি ব্যাকুল চঞ্চলতার সৃষ্টি করল। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে এদের আনন্দপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনেছি। দূর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হয়েছে যে, এই আনন্দ, এ যে নিখিল মানবচিত্ত থেকে বিনিঃসৃত অমৃত-উৎসের একটি ধারা। আমি এই শিশুদের মধ্যে সেই স্পর্শ পেয়েছি। বিশ্বচিত্তের বসুন্ধরার সমস্ত মানবসন্তান যেখানে আনন্দিত হচ্ছে সেই বিরাট ক্ষেত্রে আমি হৃদয়কে বিস্তৃত করে দিয়েছি। যেখানে মানুষের বৃহৎ প্রাণময়

তীর্থ আছে, যেখানে প্রতিদিন মানুষের ইতিহাস গড়ে উঠছে, সেখানে আমার মন যাত্রা করেছে। পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ইংরেজি লিখি নি, ইংরেজি যে ভালো করে জানি তা ধারণা ছিল না। মাতৃভাষাই তখন আমার সম্বল ছিল। যখন ইংরেজি চিঠি লিখতাম তখন অজিত বা আর-কাউকে দিয়ে লিখিয়েছি। আমি তেরো বছর পর্যন্ত ইস্কুলে পড়েছি, তার পর থেকে পলাতক ছাত্র। পঞ্চাশ বছর বয়সের সময় যখন আমি আমার লেখার অনুবাদ করতে প্রবৃত্ত হলাম তখন গীতাঞ্জলির গানে আমার মনে ভাবের একটা উদ্‌বোধন হয়েছিল বলে সেই গানগুলিই অনুবাদ করলাম। সেই তর্জমার বই আমার পশ্চিম-মহাদেশ-যাত্রার যথার্থ পাথেয়স্বরূপ হল। দৈবক্রমে আমার দেশের বাইরেকার পৃথিবীতে আমার স্থান হল, ইচ্ছা করে নয়। এই সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে আমার দায়িত্ব বেড়ে গেল।

যতক্ষণ বীজ বীজই থাকে ততক্ষণ সে নিজের মধ্যেই থাকে। তার পরে যখন অঙ্কুরিত হয়ে বৃক্ষরূপে আকাশে বিস্তৃতি লাভ করে তখন সে বিশ্বের জিনিস হয়। এই বিদ্যালয় বাংলার এক প্রান্তে কয়েকটি বাঙালির ছেলে নিয়ে তার ক্ষুদ্র সামর্থ্যের মধ্যে কোণ আঁকড়ে পড়ে ছিল। কিন্তু সব সজীব পদার্থের মতো তার অন্তরে পরিণতির একটা সময় এল। তখন সে আর একান্ত সীমাবদ্ধ মাটির জিনিস রইল না, তখন সে উপরের আকাশে মাথা তুলল, বড়ো পৃথিবীর সঙ্গে তার অন্তরের যোগসাধন হল; বিশ্ব তাকে আপন বলে দাবি করল।

আধুনিক কালের পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমা ভেঙে গেছে, মানুষ পরস্পরের নিকটতর হয়েছে, এই সত্যকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মানুষের এই মিলনের ভিত্তি হবে প্রেম, বিদ্বেষ নয়। মানুষ বিষয়ব্যবহারে আজ পরস্পরকে পীড়ন করছে, বঞ্চিত করছে, এ কথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সত্যসাধনায় পূর্ব-পশ্চিম নেই। বুদ্ধদেবের শিক্ষা ভারতবর্ষের মাটিতে উদ্ভূত হয়ে চীনদেশে গিয়ে মানবচিত্তকে আঘাত করল এবং ক্রমে সমস্ত এসিয়াকে অধিকার করল। চিরন্তন সত্যের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ নেই। এই বিশ্বভারতীতে সেই সত্যসাধনার ক্ষেত্রকে আমার গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার। আমরা এতদিন পর্যন্ত ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুলবয়' ছিলাম, কেবলই পশ্চিমের কাছে হাত পেতে পাঠ শিখে নিয়েছি। কিন্তু পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের আদানপ্রদানের সম্বন্ধ হয় নি। সাহসপূর্বক য়ুরোপকে আমি আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে আমন্ত্রণ করে এসেছি। এখানে এইরূপে সত্যসম্মিলন হবে, জ্ঞানের তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠবে। আমরা রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে খুব মৌখিক বড়াই করে থাকি, কিন্তু অন্তরে আমাদের আত্মবিশ্বাস নেই, যথেষ্ট দীনতা আছে। যেখানে মনের ঐশ্বর্যের প্রকৃত প্রাচুর্য আছে সেখানে কার্পণ্য সম্ভবপর হয় না। আপন সম্পদের প্রতি যে জাতির যথার্থ আশা ও বিশ্বাস আছে অন্যকে বিতরণ করতে তার সংকোচ হয় না, সে পরকে ডেকে বিলোতে চায়। আমাদের দেশে তাই গুরুর কণ্ঠে এই আহ্বানবাণী এক সময় ঘোষিত হয়েছিল—আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

আমরা সকলের থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদ্যার নির্জন কারাবাসে রুদ্ধ হয়ে থাকতে চাই। কারারক্ষী যা দয়া করে খেতে দেবে তাই নিয়ে টিকে থাকবার মতলব করেছি। এই বিচ্ছিন্নতার থেকে ভারতবর্ষকে মুক্তিদান করা সহজ ব্যাপার নয়। সেবা করবার ও সেবা আদায় করবার, দান করবার ও দান গ্রহণ করবার সম্বন্ধকে আমাদের তৈরি করে তুলতে হবে। বিশ্বের জ্ঞানজগৎ থেকে ভারতবর্ষ একঘরে হয়ে আছে, তাকে শিক্ষার ছিটেফোঁটা দিয়ে চিরকেলে পাঠশালার পোড়ো করে রাখা

হয়েছে। আমরা পৃথিবীর জ্ঞানধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিগত অবমাননা থেকে মুক্তি পেতে চাই।

ভারতবর্ষ তার আপন মনকে জানুক এবং আধুনিক সকল লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার লাভ করুক। রামানুজ শংকরাচার্য বুদ্ধদেব প্রভৃতি বড়ো বড়ো মনীষীরা ভারতবর্ষে বিশ্বসমস্যার যে সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন তা আমাদের জানতে হবে। জোরাস্ত্রেরীয় ইসলাম প্রভৃতি এসিয়ার বড়ো বড়ো শিক্ষাসাধনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ভারতবর্ষের কেবল হিন্দুচিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য শিল্পকলা স্থপতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতেও হিন্দুমুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে। তারই পরিচয়ে ভারতবর্ষীয়ের পূর্ণ পরিচয়। সেই পরিচয় পাবার উপযুক্ত কোনো শিক্ষাস্থানের প্রতিষ্ঠা হয় নি বলেই তো আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও দুর্বল।

ভারতের বিরাট সত্তা বিচিত্রকে আপনার মধ্যে একত্র সম্মিলিত করবার চেষ্টা করছে। তার সেই তপস্যাকে উপলব্ধি করবার একটা সাধনক্ষেত্র আমাদের চাই তো। বিশ্বভারতীতে সেই কাজটি হতে পারে। বিশ্বের হাটে যদি আমাদের বিদ্যার যাচাই না হয় তবে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হল না। ঘরের কোণে বসে আত্মীয়স্বজনে বৈঠকে যে অহংকার নিবিড় হতে থাকে সেটা সত্য পদার্থ নয়। মানুষের জ্ঞান-চর্চার বৃহৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে যোগ হলেই তবে আমাদের বিদ্যার সার্থকতা হবে। বিশ্বভারতীর এই লক্ষ্য সার্থক হোক।

শান্তিনিকেতন
২০ ফাল্গুন ১৩২৮

৫

আপনারা যাঁরা আজ এখানে সমবেত হয়েছেন, আপনাদের সকলের সঙ্গে ক্রমশ আমাদের যোগ ঘনিষ্ঠ হবে, সাক্ষাৎসম্বন্ধ স্থাপিত হবে। বিশ্বভারতীর ভিতরকার আদর্শ ক্রমে দিনে দিনে আপনাদের কাছে পরিস্ফুট হবে। বিশ্বভারতীর সব প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন যেমন জেগে উঠতে থাকবে তেমন তেমন তার মধ্য দিয়ে এর ভিতরকার রূপটি আপনাদের কাছে জাগতে থাকবে। বাইরে থেকে এ সম্বন্ধে কথা বলতে কুণ্ঠা বোধ হয়, কারণ ভিতরের বড়ো আইডিয়ালকে বাইরে আকার দান করতে গেলে দুইয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য থেকে যাবেই। বাইরের অসম্পূর্ণতার সঙ্গে কোনো আইডিয়ালের ভিতরের মহত্ত্বের মধ্যেকার ব্যবধান যখন চোখে পড়ে তখন গোড়াকার বাক্যাড়ম্বরের পরে তা অনেকের কাছে হতাশার ও লজ্জার কারণ হয়। আইডিয়ালকে প্রকাশ করে তোলা কারও একলার সাধ্য নয়, কারণ তা দু-একজনের বিশেষ সময়কার কর্ম নয়। প্রথমে যে অনুধাবনায় আরম্ভ হয় সেই প্রথম ধাক্কাই তার যথার্থ পরিচয় নয়। হৃদয় কর্ম ও জীবন দিয়ে নানা কর্মীর সহায়তায় তা ফুটে উঠতে থাকে। তার প্রথমকার চেহারা ভিতরকার সেই সত্যটিকে যথার্থ ব্যক্ত করতে পারে না। এইজন্যই এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু বলতে আমি কুণ্ঠিত হই।

বিশ্বভারতী যে ভাব ও আদর্শকে পোষণ করছে, যে পূর্ণসত্যটিকে অন্তরে ধারণ করে রয়েছে, তা বাইরে থেকে সমাগত অতিথিরা এবং এর কর্মভারপ্রাপ্ত

ব্যক্তিরা অনেকে নানা অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়েও গ্রহণ করেছেন ও শ্রদ্ধা করেছেন। এতে আমাদের উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। স্বদেশের সকলের সঙ্গে এর যথার্থ আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নি। এমনকি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হয়ে রয়েছেন তাঁরাও অনেকে ভিতরের সত্যমূর্তিটিকে না দেখে এর পদ্ধতি অনুষ্ঠান উপকরণ-সংগ্রহ প্রভৃতি বাহ্যরূপটিকে দেখছেন, সেখানে আপনার অধিকার নিয়ে আক্ষেপ করছেন। এর কারণ হচ্ছে যে, আমি যে ভাবটিকে প্রকাশ করতে চাই বর্তমান কালে সকলের চিত্ত সে দিকে নেই। তাঁরা কতকগুলি আকস্মিক ও আধুনিক চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন, বড়ো প্রয়োজনের সমাদর করতে তাঁদের মন চাচ্ছে না। কিম্বা হয়তো আমার নিজের অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য এর কারণ হতে পারে। হয়তো আমার নিজের জীবনের যা লক্ষ্য অন্যদের কাছ থেকে তার স্বীকৃতি পাবার আমার শক্তি নেই। যার ডাক পড়ে, যার আপনার থেকে আদেশ আসে তারই তাতে গরজ আর দায়িত্ব আছে। যদি সে তার জীবনের উদ্দেশ্য সকলের কাছে এমন করে না ধরতে পারে যাতে করে তা অপরের গ্রহণযোগ্য হয় তবে তারই নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। হয়তো আমারই চরিত্রের এমন অসম্পূর্ণতা আছে যাতে আমার আপনার কর্ম দেশের কর্ম হয়ে উঠতে পারছে না। কিন্তু আমার আশা আছে যে, সমস্তই নিষ্ফল হয় নি। কারণ প্রতিষ্ঠানটিকে তো শুধু আমার একলার জিনিস বলতে পারি না। সেখানে যারা মিলিত হয়েছে তাদের দ্বারা সৃজনকার্য নিরন্তর চলেছে। সেখানে দিনে দিনে যে আবহাওয়া তৈরি হয়ে উঠছে, প্রতি শিশুটি পর্যন্ত তাদের অবকাশমুখরিত সংগীত অভিনয় কলহাস্যের দ্বারাও তার সহায়তা করছে। প্রত্যেকটি শিশু প্রত্যেকটি ছাত্র ও অধ্যাপক না বুঝেও অগোচরে সত্যসাধনায় সহযোগিতা করছেন। তাঁদের দ্বারা যেটুকু কর্ম পরিব্যক্ত হচ্ছে তার উপর আমার বিশ্বাস আছে; আশা আছে যে, একদিন এর বীজ নিঃসন্দেহ পরিপূর্ণ বৃক্ষ-রূপে উপরের আকাশে মাথা তুলবে।

আমার মনে হয়েছে যে, আমাদের এই প্রদেশবাসীদের মধ্যে যেসব ছাত্রের উৎসাহ ও কৌতূহল আছে তারা কেন এই বৃক্ষের ফল ভোগ করবে না। বিশ্ব-ভারতীতে আমরা যে চিন্তা করছি, যে সত্য সন্ধান করছি, সেখানে স্বদেশী ও বিদেশী পণ্ডিতেরা যে তত্ত্বালোচনায় ব্যাপৃত আছেন, তাঁরা যা-কিছু দিচ্ছেন, ছোটো জায়গায় সেই উৎপন্ন পদার্থের নিঃশেষ হয়ে গেলে তার অপব্যয় হবে। তা অল্প পরিধিতে বদ্ধ থাকলে তাতে সকলের গ্রহণ করবার সুযোগ হয় না। যদিচ শান্তিনিকেতনই আমার কেন্দ্রস্থল তবুও সেখানে যারা সমাগত হবে, যাদের হাতে-কলমে কাজ করাতে হবে তারাই যে শুধু আইডিয়াল গ্রহণ করবার যথার্থ যোগ্য তা তো নয়। তাই আমার মনে হয়েছে এবং অনেক ছাত্র ও ছাত্রবন্ধুরা আমাকে বলেছেন যে, বিশ্বভারতীতে যে সৃষ্টি হচ্ছে, যে সত্য আবিষ্কৃত হচ্ছে, তা যাতে কলকাতার ছাত্রমণ্ডলীও জানতে পারে, যাতে তারাও উপলব্ধি করতে পারে যে, সেখানে জীবনের সাধনা হচ্ছে, শুধু পুঁথিগত বিদ্যার চর্চা হচ্ছে না, সেজন্য সংগীত শিল্প সাহিত্যের নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার পরিচয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। আমি এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলুম, কিন্তু অতি সসংকোচে; কারণ দেশের ছাত্রদের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই। ভয় হয়েছিল যে, যে লোকেরা এত কাল এত ভুল বুঝে এসেছে হয়তো তারা বিদ্রূপ করবে। বড়ো আইডিয়ালকে নিয়ে বিদ্রূপ করার মতো এত সহজ জিনিস আর নেই। যে খুব ছোটো সেও কোনো বড়ো জিনিসে ধুলো দিতে পারে, তাকে বিকৃত করতে পারে।

এই আইডিয়ালের সঙ্গে এখনকার কালের যোগ নেই, এই কথা অনুভব করেছিলাম বলেই আমি বিশ বছর পর্যন্ত নিভৃত কোণে ছিলুম। এত গোপনে আমার কাজ করে গেছি যে, আমার পরমাত্মীয়েরাও জানেন নি, বোঝেন নি। আমি কী লক্ষ্য নিয়ে কেন অন্যসব কাজ ছেড়ে দিয়ে অবকাশ ত্যাগ করে কোন্ ডাকে কোন্ আনন্দে এই কাজে লিপ্ত হয়েছি আমার সহকর্মীরাও অনেকে তা পুরোপুরি জানে না। তৎসত্ত্বে আমি আমার বিদ্যালয়ের ছেলেদের মধ্যে যে আনন্দের ছবি, যে স্বাধীন বিকাশের প্রমাণ পেয়েছি তাতে নিশ্চিত জেনেছি যে, এরা এখান থেকে কিছু পেয়েছে। এইসকল কারণেই আমি এতদিন বাহিরে বেরিয়ে আসি নি।

বিশ্বভারতীকে দুইভাবে দেখা যেতে পারে—প্রথম হচ্ছে শান্তিনিকেতনে তার যে কাজ হচ্ছে সেই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা; দ্বিতীয়ত শান্তিনিকেতনের কর্মানুষ্ঠানের ফল বাইরে থেকে ভোগ করা, তার সঙ্গে বাইরে থেকে যুক্ত হওয়া। বিশ্বভারতীর আইডিয়ালের সঙ্গে যাঁর সহানুভূতি আছে তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হয়ে তার আদর্শপোষণের ভার নিতে পারেন। তিনি তার জন্য চিন্তা করবেন, চেষ্টা করে গড়ে তুলবেন, তাকে আঘাত থেকে রক্ষা করবেন। এটা হল এর দায়িত্বের দিক এবং আত্মীয়সমাজের লোকেদের কাজ। এর জন্য বিশ্বভারতীর দ্বার উদ্ঘাটিত রয়েছে। কিন্তু লোকে তো এ কথা বলতে পারে যে, আমাদের এসব ভালো লাগে না, বিদেশ থেকে কেন এসব অধ্যাপকদের আনানো; ভারতবর্ষ তো আপনার পরিধির মধ্যেই বেশ ছিল। যাঁরা এ কথা বলেন তাঁদের সঙ্গেও আমাদের কোনো বাদপ্রতিবাদ নেই। তাঁরা এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কলকাতার এই 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী'র সভ্য হতে পারেন, তাতে কারও আপত্তি নেই। যদি আমরা কিছু গান সংগ্রহ করে আনি তবে তাঁরা যে তা শুনবেন না এমন কোনো কথা নেই, কিম্বা আমাদের যদি কিছু বলবার থাকে তবে তাও তাঁরা শুনতে আসতে পারেন—এই যেমন ক্ষিতিমোহনবাবু সেদিন কবীর সম্বন্ধে বললেন, বা আজ যে আচার্য লেভির বিদায়ের পূর্বে তাঁকে সম্বর্ধনা করা হল। এই পণ্ডিত বিদেশী হলেও তো এঁকে বিশেষ কোনো দেশের লোক বলা চলে না—ইনি আমাদের আপনার লোক হয়ে গেছেন, আমাদের দেশকে গভীরভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন। এঁর সঙ্গে যে পরিচয়সাধন হল এতে করে তো কেউ কোনো আঘাত পান নি।

বর্তমান যুগে ইতিহাস হঠাৎ যেন নতুন দিকে বাঁক নেবার চেষ্টা করছে। কেন। আপনার জাতির একান্ত উৎকর্ষের জন্য যারা নিয়ত চেষ্টা করছে হঠাৎ তাদের মধ্যে মুষলপর্ব কেন দেখা দিলে। পূর্বে বলেছি, মানুষের সত্য হচ্ছে, আপনাকে অনেকের মধ্যে লাভ করলে তবেই সে আপনাকে লাভ করে। এতদিন ছোটো সীমার মধ্যে এই সত্য কাজ করছিল। ভৌগোলিক বেষ্টন যতদিন পর্যন্ত সত্য ছিল ততদিন সেই বেষ্টনের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার জাতির সকলের সঙ্গে মিলনে নিজেকে সত্য বলে অনুভব করার দ্বারা বড়ো হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে সে বেড়া ভেঙে গেছে; জলে স্থলে দেশে দেশে যেসকল বাধা মানুষকে বাহির থেকে বিভক্ত করেছিল সেসব ক্রমশ অপসারিত হচ্ছে। আজ আকাশপথে পর্যন্ত মানুষ চলাচল করছে। আকাশযানের উৎকর্ষ ক্রমে ঘটবে, তখন পৃথিবীর সমস্ত স্থূল বাধা মানুষ ডিঙিয়ে চলে যাবে, দেশগত সীমানার কোনো অর্থই থাকবে না।

ভূগোলের সীমা ক্ষীণ হয়ে মানুষ পরস্পরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এতবড়ো সত্যটা আজও বাহিরের সত্য হয়েই রইল, মনের ভিতরে এ সত্য স্থান পেলে না। পুরাতন যুগের অভ্যাস আজও তাকে জড়িয়ে আছে, সে যে সাধনার

পাথেয় নিয়ে পথে চলতে চায় তা অতীত যুগের জিনিস; সুতরাং তা বর্তমান যুগের সামনের পথে চলবার প্রতিকূলতা করতে থাকবে।

বর্তমান যুগে যে সত্যের আবির্ভাব হয়েছে তার কাছে সত্যভাবে না গেলে মার খেতে হবে। তাই আজ মারামারি বেধেছে—নানা জাতির মিলনের ক্ষেত্রেও আনন্দ নেই, শান্তি নেই। কাটাকাটি মারামারি সন্দেহ হিংসা যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে তাতেই বুঝছি যে, সত্যের সাধনা হচ্ছে না। যে সত্য আজ মানবসমাজদ্বারে অতিথি তাঁর অভ্যর্থনার সাধনা বিশ্বভারতী গ্রহণ করেছে।

দারিদ্র্য যতই হোক, বাইরে থেকে দুর্গতি তার যতই হোক, এই ভার নেবার অধিকার ভারতবর্ষের আছে। এ কথা আজ বোলো না, 'তুমি দরিদ্র পরাধীন, তোমার মুখে এসব কথা কেন।' আমাদেরই তো এই কথা। ধনের গৌরব তো এ সত্যকে স্বীকার করতে চায় না। ধনসম্পদ তো ভেদ সৃষ্টি করে, সত্যসম্পদই ভেদকে অতিক্রম করবার শক্তি রাখে। ধনকে যে মানুষ চরম আশ্রয় বলে বিশ্বাস করে না, যে মৈত্রেয়ীর মতো বলতে পেরেছে, যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্, সেই তো ধনঞ্জয়, সেই তো ধনের বেড়া ভেঙে মানবাত্মার অধিকারকে সর্বত্র উদ্‌ঘাটিত করতে পারে। সেই অধিকারকে বিশ্বভারতী স্বীকার করুক। দেশ-বিদেশের তাপস এই বিশ্বভারতীতে আসন গ্রহণ করুন। আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা, এই কথা আমরা আশ্রমে বসে বলব। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক ঐক্যসাধনার যে তপস্যা করেছেন সেই তপস্যাকে এই আধুনিক যুগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তবেই আমাদের সমস্ত অগৌরব দূর হবে—বাণিজ্য করে নয়, লড়াই করে নয়, সত্যকে স্বীকার করার দ্বারাই তা হবে। মনুষ্যত্বের সেই পূর্ণগৌরবসাধনের আয়োজনে বিশ্বভারতী আজ হতে নিযুক্ত হোক, এই আমাদের সংকল্প।

কলিকাতা
১ ভাদ্র ?, ১৩২৯

৬

বিশ্বভারতী সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আমার মনে এর ভাবটি সংকল্পটি কোনো একটি বিশেষ সময়ে যে ভেবেচিন্তে উদিত হয়েছে এমন নয়। এই সংকল্পের বীজ আমার মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে নিহিত ছিল, তা ক্রমে অগোচরে অঙ্কুরিত হয়ে জেগে উঠেছে। এর কারণ আমার নিজের জীবনের মধ্যেই রয়েছে। বাল্যকাল থেকে আমি যে জীবন অতিবাহিত করে এসেছি তার ভিতর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শটি জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

আপনারা জানেন যে, আমি যথোচিতভাবে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলি নি। আমার পরিবারে আমি যে ভাবে মানুষ হয়েছি তাতে করে আমাকে সংসার থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল, আমি একান্তবাসী ছিলাম। মানব-সমাজের সঙ্গে আমার বাল্যকাল থেকে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না, আমি তার প্রান্তে মানুষ হয়েছি। 'জীবনস্মৃতি'তে এর বিবরণ পড়ে থাকবেন। আমি সমাজের থেকে দূরে বাস করতুম বলে তার দিকে বাতায়নের পথ দিয়ে দৃষ্টিপাত করেছি। তাই আমার কাছে দূরের দুর্লভ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ খুব গভীর ছিল।

কলকাতা শহরে আমার বাস ছিল, কাজেই ইঁটকাঠপাথরের মধ্যে আমার গতিবিধি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। আমাদের চারি দিকেই বাড়িগুলি মাথা তুলে থাকত, আর তাদের মাঝখানে অল্প পরিধির মধ্যে সামান্য কয়েকটি গাছপালা আর একটি পুষ্করিণী ছিল। কিন্তু দূরে আমাদের পাড়ার বাইরে বেশি বড়ো বাড়ি ছিল না, একটু পাড়াগাঁ গোছের ভাব ছিল।

সে সময় আমাকে বাইরের প্রকৃতি ডাক দিয়েছিল। মনে আছে মধ্যাহ্নে লুকিয়ে একলা ছাদের কোণটি গ্রহণ করতুম। উন্মুক্ত নীলাকাশ, চিলের ডাক, আর পাড়ার গলির জনতার বিচিত্র ছোটো ছোটো কলধ্বনির মধ্য দিয়ে বাড়ির ছাদের উপর থেকে যে জীবনযাত্রার খণ্ড খণ্ড ছবি পেতুম তা আমার হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল। এর মধ্যে মানবপ্রকৃতিরও একটা ডাক ছিল। দূর থেকে কখনও-বা লোকালয়ের উপর রাত্রের ঘুম-পাড়ানো সুর, কখনও-বা প্রভাতের ঘুম-জাগানো গান, আর উৎসব-কোলাহলের নানারকম ধ্বনি আমার হৃদয়কে উতলা করে দিয়েছিল। বর্ষার নবমেঘাগমে আকাশের লীলাবৈচিত্র্য আর শরতের শিশিরে ছোটো বাগানটিতে ঘাস ও নারিকেলরাজির ঝলমলানি আমার কাছে অপূর্ব হয়ে দেখা দিত। মনে আছে অতি প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে তাল রাখবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে তার অপেক্ষা করেছি। সকালের সেই শিশিরের উপর সোনার আলো আমার হৃদয়ে নিবিড় গভীর আনন্দবেদনার সঞ্চার করেছে। বিশ্বজগৎ যেন আমাকে বার বার করে আহ্বান করে বলেছে, 'তুমি আমার আপনার। আমার মধ্যে যে সত্য আছে তা সকলের সঙ্গে যোগের প্রতীক্ষা রাখে, কিন্তু তবুও তোমায়-আমায় এই বিরহের মধ্যেও মাধুর্য রয়েছে।' তখনও এই বহির্বিশ্বের উপলব্ধি আমার মনের ভিতরে অস্পষ্টভাবে ঘনিয়ে উঠেছে। ছোটো ঘরের ভিতরকার মানুষটিকে বাইরের ডাক গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল।

তার পর আমার মনে আছে যে, প্রথম যখন আমাদের শহরে ডেঙ্গুজ্বর দেখা দিল, এই ব্যাধি আমার কাছে বেরিয়ে পড়ার মস্ত সুযোগের মতো এল। গঙ্গার ধারে পেনেটির বাগানে আমরা বাস করতে লাগলুম। এই প্রথম অপেক্ষাকৃত নিকটভাবে প্রকৃতির স্পর্শ পেলাম। এ যে কত মনোহর তা ব্যক্ত করতে পারি না। আপনারা অনেকে পল্লীগ্রাম থেকে আসছেন, অনেকেরই পল্লীর সঙ্গে অতিনিকট সম্বন্ধ। আপনারা তার শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও বনরাজি দেখে থাকবেন, কিন্তু আমার মনোভাব ঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন না। ইঁটকাঠের কারাগার থেকে বহিরাকাশে মুক্তি পেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয় লাভ করা যে কত মূল্যবান তা আমার জীবনে যেমন বুঝেছিলুম অল্প লোকের ভাগ্যেই তা ঘটে। সকালে কুঠির পানশি দক্ষিণ দিকে যেত, সন্ধ্যায় তা উত্তরগামী হত। নদীর দু ধারে এই জনতার ধারা, জলের সঙ্গে মানুষের এই জীবনযাত্রার যোগ, গ্রামবাসীদের এই স্নান পান তর্পণ, এইসকল দৃশ্য আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। গ্রামগুলি যেন গঙ্গার দুই পারকে আঁকড়ে রয়েছে, পিপাসার জলকে স্তন্যরসের মতো গ্রহণ করে নিয়েছে। আমার গঙ্গার ধারে এই প্রথম যাওয়া। আর সে সময়ে সেখানকার সূর্যের উদয়াস্ত যে আমার কাছে কী অপরূপ লেগেছিল তা কী বলব। এই-যে বিশ্বজগতে প্রতি মুহূর্তে অনির্বচনীয় মহিমা উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে আমরা তার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অতিপরিচয়ের জন্য তা আমাদের কাছে ম্লান হয়ে যায়। ওঅর্ড্‌স্‌ওঅর্থের কবিতায় আপনারা তার উল্লেখ দেখেছেন। কেজো মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতির অপূর্বতা একেবারে 'না' হয়ে গেছে, নেই বললেই হয়। তার রহস্য মাধুর্য তার

মনে তেমন সাড়া দেয় না। আকাশে দিনের পর দিন যেন আশ্চর্য একটি কাব্য-গ্রন্থের পাতার পর পাতা উদ্‌ঘাটন করে বিশ্বকবির মর্মকথাটি বার বার প্রকাশ করতে থাকে। আমরা মাঝখান থেকে অতিপরিচয়ের অন্তরালে তার রস থেকে বঞ্চিত হই। তাই প্রকৃতির রসধারার স্পর্শে আমার মন সে সময়ে যেরকম উৎসুক হয়ে উঠেছিল আজও তার প্রবলতা ক্ষীণ হয়ে যায় নি, এ কথাটা বলার দরকার আছে। এতটা আমি ভূমিকাস্বরূপ বললুম। যে যে ঘটনা আমার জীবনকে নানা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ দিকে চালনা করছিল এই সময়কার জীবনযাত্রা তার মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যাপার।

এমনি আর-একটি অনুকূল ঘটনা ঘটল যখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করতে লাগলুম। পদ্মাতটের সেই আম জাম ঝাউ বেত আর সর্ষের খেত, ফাল্গুনের মৃদু সৌগন্ধে ভারাক্রান্ত বাতাস, নির্জন চরে কলধ্বনিমুখরিত বুনো হাঁসের বসতি, সন্ধ্যাতারায়-জ্বলজ্বল-করা নদীর স্বচ্ছ গভীরতা, এসব আমার সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন করেছিল। তখন পল্লীগ্রামে মানুষের জীবন ও প্রকৃতির সৌন্দর্যে সম্মিলিত জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে আমার গভীর আনন্দ পাবার উপলক্ষ হয়েছিল।

অল্প বয়সে আমি আর-একটি জিনিস পেয়েছি। মানুষের থেকে দূরে বাস করলেও এবং উন্মুক্ত প্রকৃতির কোল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কাটিয়ে থাকলেও আমি বাড়িতে আত্মীয়বন্ধুদের সংগীত সাহিত্য শিল্পকলার চর্চার আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছি। এটি আমার জীবনের খুব বড়ো কথা। আমি শিশুকাল থেকে পলাতক ছাত্র। মাস্টারকে বরাবর ভয় করে এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু বিশ্বসংসারের যেসকল অদৃশ্য মাস্টার অলক্ষ্যে থেকে পাঠ শিখিয়ে দেন তাঁদের কাছে কোনো-রকমে আমি পড়া শিখে নিয়েছি। আমাদের বাড়িতে নিয়ত ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের ও সংগীতের আলোচনা হত, আমি এসবের মধ্যে বেড়ে উঠেছি। এই-সকল বিদ্যা যথার্থভাবে শিক্ষালাভ না করলেও এ থেকে ভিতরে ভিতরে আশপাশ হতে নানা উপায়ে মনে মনে আনন্দরস সঞ্চয় করতে পেরেছি। আমার বড়দাদা তখন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখতে নিরত ছিলেন। বনস্পতি যেমন স্বচ্ছন্দে প্রচুর ফুল ফুটিয়ে ফল ধরিয়ে ইতস্তত বিস্তর খসিয়ে ঝরিয়ে ফেলে দেয়, তাতে তার কোনো অনুশোচনা নেই; তেমনি তিনি খাতায় যতটি লেখা রক্ষা করতেন তার চেয়ে ছেঁড়া কাগজে বাতাসে ছড়াছড়ি যেত অনেক বেশি। আমাদের চলাফেরার রাস্তা সেইসব বিক্ষিপ্ত ছিন্নপত্রে আকীর্ণ হয়ে গেছে। সেইসকল অবারিত সাহিত্যরচনার ছিন্ন-পত্রের স্তূপ আমার চিত্তধারায় পলিমাটির সঞ্চয় রেখে দিয়ে গিয়েছিল।

তার পর আপনারা জানেন, আমি খুব অল্পবয়স থেকেই সাহিত্যচর্চায় মন দিয়েছি, আর তাতে করে নিন্দা খ্যাতি যা পেয়েছি তারই মধ্য দিয়ে লেখনী চালিয়ে গিয়েছি। তখন একটি বড়ো সুবিধা ছিল যে, সাহিত্যক্ষেত্রে এত প্রকাশ্যতা ছিল না, সাহিত্যের এত বড়ো বাজার বসে নি, ছোটো হাটেই পসরা দেওয়া-নেওয়া চলত। তাই আমার বাল্যরচনা আপন কোণটুকুতে কোনো লজ্জা পায় নি। আত্মীয়বন্ধুদের যা একটু-আধটু প্রশংসা ও উৎসাহ লাভ করেছি তাই যথেষ্ট মনে করেছি। তার পর ক্রমে বঙ্গসাহিত্যের প্রসার হল, তার চর্চা ব্যাপকতা লাভ করল। সাহিত্যক্ষেত্র জনতায় আক্রান্ত হল। দেখতে দেখতে রাত্রির আকাশে তারার আবির্ভাবের মতো সাহিত্যাকাশ অসংখ্য লেখকের দ্বারা খচিত হয়ে দেখা দিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার সাহিত্যচর্চার মধ্যে বরাবর সেই নির্জনতাই ছিল। এই বিরলবাসই আমার

একান্ত আপনার জিনিস ছিল। অতিরিক্ত প্রকাশ্যতার আঘাতে আমি কখনও সুস্থ বোধ করি নি। আমি চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত পদ্মাতীরের নিরালা আবাসটিতে আপন খেয়ালে সাহিত্যরচনা করেছি। আমার কাব্য-সৃষ্টির যা-কিছু ভালো-মন্দ তা সে সময়েই লেখা হয়েছে।

যখন এমনি সাহিত্যের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে কাল কাটাচ্ছি তখন আমার অন্তরে একটি আহ্বান একটি প্রেরণা এল যার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসতে আমার মন ব্যাকুল হল। যে কর্ম করবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা হল তা হচ্ছে শিক্ষাদানকার্য। এটা খুব বিস্ময়কর ব্যাপার, কারণ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যে আমার যোগ ছিল না তা তো আগেই বলেছি। কিন্তু এই ভারই যে আমাকে গ্রহণ করতে হল তার কারণ হচ্ছে, আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে গুরুতর অভাব রয়েছে, তা দূর না হলে শিক্ষা আমাদের জীবন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস হয়ে থাকবে। আমি এ কথা বলছি না যে, এই গুরুতর অভাব শুধু আমাদের দেশেই আছে— সকল দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ হতে পারছে না— সর্বত্রই বিদ্যাশিক্ষাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট ব্যাপার করে ফেলা হয়।

তখন আমার মনে একটি দূরকালের ছবি জেগে উঠল। যে তপোবনের কথা পুরাণকথায় পড়া যায় ইতিহাস তাকে কতখানি বাস্তব সত্য বলে গণ্য করবে জানি না, কিন্তু সে বিচার ছেড়ে দিলেও একটা কথা আমার নিজের মনে হয়েছে যে, তপোবনের শিক্ষাপ্রণালীতে খুব একটি বড়ো সত্য আছে। যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না। বনস্থলীতে যেমন এই প্রকৃতির সাহচর্য আছে তেমনি অপর দিকে তপস্বী মানুষের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসম্পদ সেই প্রকৃতির মাঝখানে বসে যখন লাভ করা যায় তখনই যথার্থ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে বাস করে বিদ্যাকে গুরুর কাছ থেকে পাওয়া যায়। শিক্ষা তখন মানবজীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে একান্ত ব্যাপার হয় না। বনের ভিতর থেকে তপোবনের হোমধেনু দোহন করে অগ্নি প্রজ্বলিত করে নানা ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়ে যে জীবনযাপনের ব্যবস্থা প্রাচীন কালে ছিল তার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। যাদের গুরুরূপে বরণ করা হয় তাদের সঙ্গে এইরূপ জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে একত্র মানুষ হয়ে ওঠার মধ্যে খুব একটা বড়ো শিক্ষা আছে। এতে করে শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যথার্থ যোগ স্থাপিত হয়, গুরুশিষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য ও পূর্ণ হয়, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন মধুর ও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। তাই আমার মনে হয়েছিল যে, তখনকার দিনে তপোবনের মধ্যে মানবজীবনের বিকাশ একটি সহজ ব্যাপার ছিল বটে, কিন্তু তার সময়টি এখনও উত্তীর্ণ হয়ে যায় নি; তার মধ্যে যে সত্য ও সৌন্দর্য আছে তা সকল কালের। বর্তমান কালেও তপোবনের জীবন আমাদের আয়ত্তের অগম্য হওয়া উচিত নয়।

এই চিন্তা যখন আমার মনে উদিত হয়েছিল তখন আমি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার ভার নিলুম। সৌভাগ্যক্রমে তখন শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে তপোবনের ভাবে পূর্ণ ছিল। আমি বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে এখানে কালযাপন করেছি। আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি যে, তিনি কী পূর্ণ আনন্দে বিশ্বের সঙ্গে পরমাত্মার সঙ্গে চিত্তের যোগসাধনের দ্বারা সত্যকে জীবনে একান্তভাবে উপলব্ধি করেছেন। আমি দেখেছি যে, এই অনুভূতি তাঁর কাছে বাহিরের জিনিস

ছিল না। তিনি রাত্রি দুটোর সময় উন্মুক্ত ছাদে বসে তারাখচিত রাত্রিতে নিমগ্ন হয়ে অন্তরে অমৃতরস গ্রহণ করেছেন, আর প্রতিদিন বেদীতলে বসে প্রাণের পাত্রটি পূর্ণ করে সুধাধারা পান করেছেন। যিনি সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ করে রয়েছেন তাঁকে বিশ্বছবির মধ্যে উপলব্ধি করা, এটি মহর্ষির জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আমার মনে হল যে, যদি ছাত্রদের মহর্ষির সাধনস্থল এই শান্তিনিকেতনে এনে বসিয়ে দিতে পারি তবে তাদের সঙ্গে থেকে নিজের যেটুকু দেবার আছে তা দিতে পারলে বাকিটুকুর জন্য আমাকে ভাবতে হবে না, প্রকৃতিই তাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে সকল অভাব মোচন করে দিতে পারবে। প্রকৃতির সঙ্গে এই যোগের জন্য সকলের চিত্তেই যে ন্যূনাধিক ক্ষুধার অংশ আছে তার নিবৃত্তি করবার চেষ্টা করতে হবে, যে স্পর্শ থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়েছে তাকে জোগাতে হবে।

তখন আমার সঙ্গী-সহায় খুবই অল্প। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় আমায় ভালোবাসতেন আর আমার সংকল্পে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আমার কাজে এসে যোগ দিলেন। তিনি বললেন, 'আপনি মাস্টারি করতে না জানেন, আমি সে ভার নিচ্ছি।' আমার উপর ভার রইল ছেলেদের সঙ্গ দেওয়া। আমি সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি, হাস্য করুণ রসের উদ্রেক করে তাদের হাসিয়েছি কাঁদিয়েছি। তা ছাড়া নানা গল্প বানিয়ে বলতাম, দিনের পর দিন একটি ছোটো গল্পকে টেনে টেনে লম্বা করে পাঁচ-সাত দিন ধরে একটি ধারা অবলম্বন করে চলে যেতাম। তখন মুখে মুখে গল্প তৈরি করবার আমার শক্তি ছিল। এইসব বানানো গল্পের অনেকগুলি আমার 'গল্পগুচ্ছে' স্থান পেয়েছে। এমনি ভাবে ছেলেদের মন যাতে অভিনয়ে গল্পে গানে, রামায়ণ-মহাভারত-পাঠে সরস হয়ে ওঠে তার চেষ্টা করেছি।

আমি জানি, ছেলেদের এমনি ভাবে মনের ধারা ঠিক করে দেওয়া, একটা অ্যাটিচুড তৈরি করে তোলা খুব বড়ো কথা। মানুষের যে এতবড়ো বিশ্বের মধ্যে এতবড়ো মানবসমাজে জন্ম হয়েছে, সে যে এতবড়ো উত্তরাধিকার লাভ করেছে, এইটার প্রতি তার মনের অভিমুখিতাকে খাঁটি করে তোলা দরকার। আমাদের দেশের এই দুর্গতির দিনে আমাদের অনেকের পক্ষেই শিক্ষার শেষ লক্ষ্য হয়েছে চাকরি, বিশ্বের সঙ্গে যে আনন্দের সম্বন্ধের দ্বারা বিশ্বসম্পদকে আত্মগত করা যায় তা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। কিন্তু মানুষকে আপন অধিকারটি চিনে নিতে হবে। সে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে চিত্তের সামঞ্জস্য সাধন করবে তেমন তাকে বিরাট মানববিশ্বের সঙ্গে সম্মিলিত হতে হবে।

আমাদের দেশবাসীরা 'ভূমৈব সুখম্' এই ঋষিবাক্য ভুলে গেছে। ভূমৈব সুখং— তাই জ্ঞানতপস্বী মানব দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করেও উত্তর-মেরুর দিকে অভিযানে বার হচ্ছে, আফ্রিকার অভ্যন্তরপ্রদেশে দুর্গম পথে যাত্রা করছে, প্রাণ হাতে করে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হচ্ছে। তাই কর্ম জ্ঞান ও ভাবের সাধনপথের পথিকেরা দুঃখের পথ অতিবাহন করতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে; তাঁরা জেনেছেন যে, ভূমৈব সুখং—দুঃখের পথেই মানুষের সুখ। আজ আমরা সে কথা ভুলেছি, তাই অত্যন্ত ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রার মধ্যে আত্মাকে প্রচ্ছন্ন করে দিয়ে দেশের প্রায় সকল লোকেরই কাল কাটছে।

তাই শিক্ষালয় স্থাপন করবার সময়ে প্রথমেই আমার এ কথা মনে হল যে, আমাদের ছাত্রদের জীবনকে মানসিক ক্ষীণতা থেকে ভীরুতা থেকে উদ্ধার করতে হবে। যে গঙ্গার ধারা গিরিশিখর থেকে উত্থিত হয়ে দেশদেশান্তরে বহমান হয়ে

চলেছে মানুষ তার জলকে সংসারের ছোটো বড়ো সকল কাজেই লাগাতে পারে। তেমনি যে পাবনী বিদ্যাধারা কোনো উত্তুঙ্গ মানবচিত্তের উৎস থেকে উদ্ভূত হয়ে অসীমের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলছে, যা পূর্ব-পশ্চিম-বাহিনী হয়ে দিকে দিকে নিরন্তর স্বতঃ-উৎসারিত হচ্ছে, তাকে আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির পরিধির মধ্যে বাঁধ বেঁধে ধরে রেখে দেখব না; কিন্তু যেখানে তা পূর্ণ মানবজীবনকে সার্থক করে তুলেছে, তার সেই বিরাট বিশ্বরূপটি যেখানে পরিস্ফুট হয়েছে সেখানে আমরা অবগাহন করে শুদ্ধ নির্মল হব।

'স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।' সৃষ্টিকর্তা তপস্যা করছেন, তপস্যা করে সমস্ত সৃজন করছেন। প্রতি অণুপরমাণুতে তাঁর সেই তপস্যা নিহিত। সেজন্য তাদের মধ্যে নিরন্তর সংঘাত, অগ্নিবেগ, চক্রপথের আবর্তন। সৃষ্টিকর্তার এই তপঃসাধনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও তপস্যার ধারা চলেছে, সেও চুপ করে বসে নেই। কেননা মানুষও সৃষ্টিকর্তা, তার আসল হচ্ছে সৃষ্টির কাজ। সে যে সংগ্রহ করে সঞ্চয় করে এই তার বড়ো পরিচয় নয়, সে ত্যাগের দ্বারা প্রকাশ করে এই তার সত্য পরিচয়। তাই বিধাতার এই বিশ্বতপঃক্ষেত্রে তারও তপঃসাধনা। মানুষ হচ্ছে তপস্বী, এই কথাটি উপলব্ধি করতে হবে। উপলব্ধি করতে হলে সকল কালের সকল দেশের তপস্যার প্রয়াসকে মানবের সত্য ধর্ম বলে বড়ো করে জানতে হবে।

আজকার দিনে যে তপঃক্ষেত্রে বিশ্বের সর্ব জাতির ও সর্ব দেশের মানবের তপস্যার আসন পাতা হয়েছে আমাদেরও সকল ভেদবুদ্ধি ভুলে গিয়ে সেখানে পৌঁছতে হবে। আমি যখন বিশ্বভারতী স্থাপিত করলুম তখন এই সংকল্পই আমার মনে কাজ করছিল। আমি বাঙালি বলে আমাদের সাহিত্যরসের চর্চা কেবল বাংলাসাহিত্যের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হবে? আমি কি বিশ্বসংসারে জন্মাই নি। আমারই জন্য জগতের যত দার্শনিক যত কবি যত বৈজ্ঞানিক তপস্যা করছেন, এর যথার্থোপলব্ধির মধ্যে কি কম গৌরব আছে?

আমার মুখে এই কথা অহমিকার মতো শোনাতে পারে। আজকের কথাপ্রসঙ্গে তবু আমার বলা দরকার যে, য়ুরোপে আমি যে সম্মান পেয়েছি তা রাজামহারাজারা কোনো কালে পায় নি। এর দ্বারা একটা কথার প্রমাণ হচ্ছে যে, মানুষের অন্তর-প্রদেশের বেদনা-নিকেতনে জাতি-বিচার নেই। আমি এমন-সব লোকের কাছে গিয়েছি যাঁরা মানুষের গুরু, কিন্তু তাঁরা স্বচ্ছন্দে নিঃসংকোচে এই পূর্বদেশবাসীর সঙ্গে শ্রদ্ধার আদানপ্রদান করেছেন। আমি কোথায় যে মানুষের মনে সোনার কাঠি ছোঁয়াতে পেরেছি, কেন যে য়ুরোপের মহাদেশ-বিভাগে এরা আমাকে আত্মীয়রূপে সমাদর করেছে, সে কথা ভেবে আমি নিজেই বিস্মিত হই। এমনি ভাবেই স্যর জগদীশ বসুও যেখানে নিজের মধ্যে সত্যের উৎসধারার সন্ধান পেয়েছেন এবং তা মানুষকে দিতে পেরেছেন সেখানে সকল দেশের জ্ঞানীরা তাঁকে আপনার বলেই অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন।

পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে নিরন্তর বিদ্যার সমাদর হচ্ছে। ফরাসি ও জর্মনদের মধ্যে বাইরের ঘোর রাষ্ট্রনৈতিক যুদ্ধ বাধলেও উভয়ের মধ্যে বিদ্যার সহযোগিতার বাধা কখনও ঘটে নি। আমরাই কেন শুধু চিরকেলে 'স্কুলবয়' হয়ে একটু একটু করে মুখস্থ করে পাঠ শিখে নিয়ে পরীক্ষার আসরে নামব, তার পর পরীক্ষাপাস করেই সব বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়ে বসে থাকব। কেন সকল দেশের তাপসদের সঙ্গে আমাদের তপস্যার বিনিময় হবে না। এই কথা মনে রেখেই আমি বিশ্বভারতীতে

আমাদের সাধনার ক্ষেত্রে য়ুরোপের অনেক মনস্বী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করেছিলুম। তাঁরা একজনও সেই আমন্ত্রণের অবজ্ঞা করেন নি। তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে অন্তত আমাদের চাক্ষুষ পরিচয়ও হয়েছে। তিনি হচ্ছেন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ফরাসি পণ্ডিত সিল্‌ভ্যাঁ লেভি। তাঁর সঙ্গে যদি আপনাদের নিকটসম্বন্ধ ঘটত তা হলে দেখতেন যে, তাঁর পাণ্ডিত্য যেমন অগাধ তাঁর হৃদয় তেমনি বিশাল। আমি প্রথমে সংকোচের সঙ্গে অধ্যাপক লেভির কাছে গিয়ে আমার প্রস্তাব জানালুম। তাঁকে বললুম যে আমার ইচ্ছা যে, ভারতবর্ষে আমি এমন বিদ্যাক্ষেত্র স্থাপন করি যেখানে সকল পণ্ডিতের সমাগম হবে, যেখানে ভারতীয় সম্পদের একত্র-সমাবেশের চেষ্টা হবে। সে সময় তাঁর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ এসেছিল। হার্ভার্ড পৃথিবীর বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু আমাদের বিশ্বভারতীর নামধাম কেউ জানে না; অথচ এই অখ্যাতনামা আশ্রমের আতিথ্য লেভি-সাহেব অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

আপনারা মনে করবেন না যে তিনি এখানে এসে শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। তিনি বার বার বলেছেন, 'এ যেন আমার পক্ষে স্বর্গে বাস।' তিনি যেমন বড়ো পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর তদনুরূপ যোগ্য ছাত্র যে অনেক পাওয়া গিয়েছিল তাও বলা যায় না, কিন্তু তিনি অবজ্ঞা করেন নি, তিনি ভাবের গৌরবেই কর্মগৌরব অনুভব করেছেন; তাই এখানে এসে তৃপ্ত হতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে আপনাদের এই সংবাদ জানা দরকার যে, ফ্রান্স জর্মানি সুইজারল্যাণ্ড অস্ট্রিয়া বোহিমিয়া প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশ থেকে অজস্র পরিমাণ বই দানরূপে শান্তিনিকেতন লাভ করেছে।

বিশ্বকে সহযোগীরূপে পাবার জন্য শান্তিনিকেতনে আমরা সাধ্যমতো আসন পেতেছি, কিন্তু এক হাতে যেমন তালি বাজে না তেমনি এক পক্ষের দ্বারা এই চিত্তসমবায় সম্ভবপর হয় না। যেখানে ভারতবর্ষ এক জায়গায় নিজেকে কোণঠেসা করে রেখেছে সেখানে কি সে তার রুদ্ধ দ্বার খুলবে না? ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা বিশ্বকে একঘরে করে রাখার স্পর্ধাকে নিজের গৌরব বলে জ্ঞান করবে?

আমার ইচ্ছা বিশ্বভারতীতে সেই ক্ষেত্রটি তৈরি হয় যেখানে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ স্বাভাবিক কল্যাণজনক ও আত্মীয়জনোচিত হয়। ভারতবর্ষকে অনুভব করতে হবে যে, এমন একটি জায়গা আছে যেখানে মানুষকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করাতে অগৌরব বা দুঃখের কারণ নেই, যেখানে মানুষের পরস্পরের সম্পর্কটি পীড়াজনক নয়। আমার পাশ্চাত্ত্য বন্ধুরা আমাকে কখনও কখনও জিজ্ঞাসা করেছেন, 'তোমাদের দেশের লোকে কি আমাদের গ্রহণ করবে।' আমি তার উত্তরে জোরের সঙ্গে বলেছি, 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ভারতীয়েরা আপনাদের কখনও প্রত্যাখ্যান করবে না।' আমি জানি যে, বাঙালির মনে বিদ্যার গৌরববোধ আছে, বাঙালি পাশ্চাত্ত্যবিদ্যাকে অস্বীকার করবে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নানা ভেদ ও মতবাদ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বদেশীয় বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা বাঙালির রক্তের জিনিস হয়ে গেছে। যারা অতি দরিদ্র, যাদের কষ্টের সীমা নেই, তারাও বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা ভদ্র পদবী লাভ করবে বলে আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশই করে। বাঙালি যদি শিক্ষিত না হতে পারে তবে সে ভদ্রসমাজেই উঠতে পারল না। তাই তো বাঙালির বিধবা মা ধান ভেনে সুতো কেটে প্রাণপাত করে ছেলেকে শিক্ষা দিতে ব্যগ্র হয়। তাই আমি মনে করেছিলুম যে, বাঙালি বিদ্যা ও বিদ্বানকে অবজ্ঞা করবে না; তাই আমি পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানীদের বলে এসেছিলাম যে, 'তোমরা নিঃসংকোচে নির্ভয়ে আমাদের দেশে আসতে পার, তোমাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি হবে না।'

আমার এই আশ্বাসবাক্যের সত্য পরীক্ষা বিশ্বভারতীতেই হবে। আশা করি এইখানে আমরা প্রমাণ করতে পারব যে, বৃহৎ মানবসমাজে যেখানে জ্ঞানের যজ্ঞ চলছে সেখানে সত্যহোমানলে আহুতি দেবার অধিকার আমাদেরও আছে; সমস্ত দেশ ও কালের জ্ঞানসম্পদ আমরা আপনার বলে দাবি করতে পারি এই গৌরব আমাদের। মানুষের হাত থেকে বর ও অর্ঘ্য গ্রহণের যে স্বাভাবিক অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে কোনো মোহবশত আমরা তার থেকে লেশমাত্র বঞ্চিত নই। আমাদের মধ্যে সেই বর্বরতা নেই যা দেশকালপাত্রনিরপেক্ষ জ্ঞানের আলোককে আত্মীয়রূপে স্বীকার করে না, তাকে অবজ্ঞা করে লজ্জা পায় না, প্রত্যাখ্যান করে নিজের দৈন্য অনুভব করতে পারে না।

কলিকাতা
৪ ভাদ্র ১৩২৯

৭

প্রত্যেক মুহূর্তেই আমাদের মধ্যে একটি প্রেরণা আছে নিজেকে বিকশিত করবার। বিকাশই হচ্ছে বিশ্বজগতের গোড়াকার কথা। সৃষ্টির যে লীলা, তার এক দিকে আবরণ আর-এক দিকে প্রকাশ। প্রকাশের যে আনন্দ, দেশকালের মধ্যে দিয়ে সে আপন আবরণ মোচনের দ্বারা আপনাকে উপলব্ধি করছে। উপনিষদ বলছেন— 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্', হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত হয়ে আছে। কিন্তু একান্তই যদি আবৃত হয়ে থাকত তা হলে পাত্রকেই জানতুম, সত্যকে জানতুম না। সত্য যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে এ কথা বলবারও জোর থাকত না। কিন্তু যেহেতু সৃষ্টির প্রক্রিয়াই হচ্ছে সত্যের প্রকাশের প্রক্রিয়া সেইজন্যে উপনিষদের ঋষি মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে এমন করে বলতে পেরেছেন, 'হে সূর্য, তোমার আলোকের আবরণ খোলো, আমি সত্যকে দেখি।'

মানুষ যে এমন কথা বলতে পেরেছে তার কারণ এই, মানুষ নিজের মধ্যেই দেখছে যে, প্রত্যক্ষ যে অবস্থার মধ্যে সে বিরাজমান সেইটেই তার চরম নয়। তার লোভ আছে এবং লোভ চরিতার্থ করবার প্রবল বাসনা আছে; কিন্তু তার অন্তরাত্মা বলছে, লোভের আবরণ থেকে মনুষ্যত্বকে মুক্তি দিতে চাই। অর্থাৎ যে পদার্থটা তার মধ্যে অতিরিক্তমাত্রায় প্রবল হয়ে আছে সেটাকে সে আপন মনুষ্যত্বের প্রকাশ বলে স্বীকার করে না, বাধা বলেই স্বীকার করে। যা আছে তাই সত্য, যা প্রতীয়মান তাই প্রতীতির যোগ্য, মানুষ এ কথা বলে নি। পশুবৎ বর্বর মানুষের মধ্যে বাহ্যশক্তি যতই প্রবল থাক্, তার সত্য যে ক্ষীণ অর্থাৎ তার প্রকাশ যে বাধাগ্রস্ত এ কথা মানুষ প্রথম থেকেই কোনোরকম করে উপলব্ধি করেছিল বলেই সে যাকে সভ্যতা বলে সে পদার্থটা তার কাছে নিরর্থক হয় নি।

সভ্যতা-শব্দটার আসল মানে হচ্ছে, সভার মধ্যে আপনাকে পাওয়া, সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করা। সভা-শব্দের ধাতুগত অর্থ এই যে, যেখানে আভা যেখানে আলোক আছে। অর্থাৎ মানুষের প্রকাশের আলো একলা নিজের মধ্যে নয়, সকলের সঙ্গে মিলনে। যেখানে এই মিলনতত্ত্বের যতটুকু খর্বতা সেইখানেই মানুষের সত্য সেই পরিমাণেই আচ্ছন্ন। এইজন্যেই মানুষ কেবলই আপনাকে

আপনি বলছে—'অপাবৃণু', খুলে ফেলো, তোমার একলা-আপনের ঢাকা খুলে ফেলো, তোমার সকল-আপনের সত্যে প্রকাশিত হও; সেইখানেই তোমার দীপ্তি, সেইখানেই তোমার মুক্তি।

বীজ যখন অঙ্কুররূপে প্রকাশিত হয় তখন ত্যাগের দ্বারা হয়। সে ত্যাগ নিজেকেই ত্যাগ। সে আপনাকে বিদীর্ণ করে তবে আপনার সত্যকে মুক্তি দিতে পারে। তেমনি, যে আপন সকলের তাকে পাবার জন্যে মানুষেরও ত্যাগ করতে হয় যে আপন তার একলার, তাকে। এইজন্যে ঈশোপনিষদ বলেছেন, যে মানুষ আপনাকে সকলের মধ্যে ও সকলকে আপনার মধ্যে পায় 'ন ততো বিজুগুপ্সতে' —সে আর গোপন থাকে না। অসত্যে গোপন করে, সত্যে প্রকাশ করে। তাই আমাদের প্রার্থনা, 'অসতো মা সদ্‌গময়'—অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও; 'আবিরাবীর্ম এধি'—হে প্রকাশস্বরূপ, আমার মধ্যে তোমার আবির্ভাব হোক।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, প্রকাশ হচ্ছে আপনাকে দান। আপনাকে দিতে গিয়ে তবে আপনাকে প্রকাশ করি, আপনাকে জানতে পাই। আপনাকে দেওয়া এবং আপনাকে জানা একসঙ্গেই ঘটে। নির্বাপিত প্রদীপ আপনাকে দেয় না, তাই আপনাকে পায় না। যে মানুষ নিজেকে সঞ্চয় করে সকলের চেয়ে বড়ো হয় সেই প্রচ্ছন্ন, সেই অবরুদ্ধ; যে মানুষ নিজেকে দান করে সকলের সঙ্গে এক হতে চায় সেই প্রকাশিত, সেই মুক্ত।

সওগাদ, তার উপরে নানা রঙের চিত্র-করা রুমাল ঢাকা। যতক্ষণ রুমাল আছে ততক্ষণ দেওয়া হয় নি, ততক্ষণ সমস্ত জিনিসটা আমার নিজের দিকেই টানা। ততক্ষণ মনে হয়েছে, ঐ রুমালটাই মহামূল্য। ততক্ষণ আসল জিনিসের মানে পাওয়া গেল না, তার দাম বোঝা গেল না। যখন দান করবার সময় এল, রুমাল যখন খোলা গেল, তখনই আসলের সঙ্গে বিশ্বের পরিচয় হল, সব সার্থক হল।

আমাদের আত্মনিবেদন যখন পূর্ণ হয় তখনই নিজেকে সম্পূর্ণ পাই। নইলে আমার আপন-নামক যে বিচিত্র ঢাকাখানা আছে সেইটেই চরম বলে বোধ হয়, সেইটেকেই কোনোরকমে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা মনে জাগতে থাকে। সেইটে নিয়েই যত ঈর্ষা, যত ঝগড়া, যত দুঃখ। যারা মূঢ় তারা সেইটেরই রঙ দেখে ভুলে যায়। নিজের যেটা সত্য রূপ সেইটেই হচ্ছে বিশ্বের সঙ্গে মিলনের রূপ।

আজ নববর্ষের দিন আমাদের আশ্রমের ভিতরকার সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার দিন। যে তপস্যা এখানে স্থান পেয়েছে তার সৃষ্টিশক্তিটি কী তা আমাদের জানতে হবে। এর বাইরের একটা ব্যবস্থা আছে, এর ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে, এর আইন-কানুন চলছে, সে আমরা সকলে মিলে গড়ছি। কিন্তু এর নিজের ভিতরকার একটি তত্ত্ব আছে যা নিজেকে নিজে ক্রমশ উদ্‌ঘাটিত করছে, এবং সেই নিয়ত উদ্‌ঘাটিত করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে তার সৃষ্টি। তাকে যদি আমরা স্পষ্ট করে দেখতে পাই তা হলেই আমাদের আত্মনিবেদনের উৎসাহ সম্পূর্ণ হতে পারে। সত্য যখন আমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকে তখন আমাদের ত্যাগের ইচ্ছা বল পায় না।

সত্য আমাদের ত্যাগ করতে আহ্বান করে। কেননা ত্যাগের দ্বারাই আমাদের আত্মপ্রকাশ হয়। আমাদের আশ্রমের মধ্যেও সেই আহ্বান পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সেই আহ্বানকে আমরা 'বিশ্বভারতী' নাম দিয়েছি।

স্বজাতির নামে মানুষ আত্মত্যাগ করবে এমন একটি আহ্বান কয়েক শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ স্বজাতিই মানুষের কাছে এতদিন মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড়ো সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। তার ফল

হয়েছিল এই যে, এক জাতি অন্য জাতিকে শোষণ করে নিজে বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে পৃথিবী জুড়ে একটা দস্যুবৃত্তি চলছিল। এমনকি যেসব মানুষ স্বজাতির নামে জাল জালিয়াতি অত্যাচার নিষ্ঠুরতা করতে কুণ্ঠিত হয় নি, মানুষ নির্লজ্জভাবে তাদের নামকে নিজের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে। অর্থাৎ যে ধর্মবিধি সর্বজনীন তাকেও স্বজাতির বেদীর কাছে অপমানিত করা মানুষ ধর্মেরই অঙ্গ বলে মনে করেছে। স্বজাতির গণ্ডিসীমার মধ্যে এই ত্যাগের চর্চা; এর আশুফল খুব লোভনীয় বলেই ইতিহাসে দেখা দিয়েছে। তার কারণ ত্যাগই সৃষ্টিশক্তি; সেই ত্যাগ যতটুকু পরিধির পরিমাণেই সত্য হয় ততটুকু পরিমাণেই সে সার্থকতা বিস্তার করে। এইজন্যে নেশনের ইতিহাসে ত্যাগের দৃষ্টান্ত মহদ্দৃষ্টান্ত বলেই সপ্রমাণ হয়েছে।

কিন্তু সত্যকে সংকীর্ণ করে কখনোই মানুষ চিরকাল সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। এক জায়গায় এসে তাকে ঠেকতেই হবে। যদি কেবল উপরিতলের মাটি উর্বরা হয় তবে বনস্পতি দ্রুত বেড়ে ওঠে; কিন্তু অবশেষে তার শিকড় নীরস তলায় গিয়ে ঠেকে, তখন হঠাৎ একদিন তার ডালপালা মুষড়ে যেতে আরম্ভ করে। মানুষের কর্তব্যবুদ্ধি স্বজাতির সীমার মধ্যে আপন পূর্ণখাদ্য পায় না, তাই হঠাৎ একদিন সে আপনার প্রচুর ঐশ্বর্যের মাঝখানেই দারিদ্র্যে এসে উত্তীর্ণ হয়। তাই যে য়ুরোপ নেশনসৃষ্টির প্রধান ক্ষেত্র সেই য়ুরোপ আজ নেশনের বিভীষিকায় আর্ত হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধ এবং সন্ধির ভিতর দিয়ে যে নিদারুণ দুঃখ য়ুরোপকে আলোড়িত করে তুলেছে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, নেশনরূপের মধ্যে মানুষ আপন সত্যকে আবৃত করে ফেলেছে; মানুষের আত্মা বলছে, 'অপাবৃণু'—আবরণ উদ্‌ঘাটন করো। মনুষ্যত্বের প্রকাশ আচ্ছন্ন হয়েছে বলে স্বজাতির নামে পাপাচরণ সম্বন্ধে মানুষ এতদিন এমন স্পষ্ট ঔদ্ধত্য করতে পেরেছে, এবং মনে করতে পেরেছে যে, তাতে তার কোনো ক্ষতি হয় নি, লাভই হয়েছে। অবশেষে আজ নেশন যখন আপনার মুষল আপনি প্রসব করতে আরম্ভ করেছে তখন য়ুরোপে নেশন আপনার মূর্তি দেখে আপনি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

নূতন যুগের বাণী এই যে, আবরণ খোলো, হে মানব, আপন উদার রূপ প্রকাশ করো। আজ নববর্ষের প্রথম দিনে আমাদের আশ্রমের মধ্যে আমরা সেই নবযুগের বাণীকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করব। আমাদের আশ্রমকে আজ আমরা সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির আবরণ-মুক্ত করে দেখি, তা হলেই তার সত্যরূপ দেখতে পাব।

আমাদের এখানে নানা দেশ থেকে নানা জাতির অতিথি এসেছে। তারা যদি অন্তরের মধ্যে কোনো বাধা না পায় তবে তাদের এই আসার দ্বারাতেই আপনিই এখানে নবযুগের একটি মিলনতীর্থ তৈরি হয়ে উঠবে। বাংলাদেশে নানা নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে, সেই বহু নদীর সমুদ্রসংগম থেকেই বাংলাদেশ আপনি একটি বিশেষ প্রকৃতি লাভ করে তৈরি হয়ে উঠেছে। আমাদের আশ্রম যদি তেমনি আপন হৃদয়কে প্রসারিত করে দেয় এবং যদি এখানে আগন্তুকেরা সহজেই আপনার স্থানটি পায় তা হলে এই আশ্রম সকলের সেই সম্মিলনের দ্বারা আপনিই আপনার সত্যরূপকে লাভ করবে। তীর্থযাত্রীরা যে ভক্তি নিয়ে আসে, যে সত্যদৃষ্টি নিয়ে আসে, তার দ্বারাই তারা তীর্থস্থানকে সত্য করে তোলে। আমরা যারা এই আশ্রমে এসেছি, আমরা এখানে যে সত্যকে উপলব্ধি করব বলে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রত্যাশা করি

সেই শ্রদ্ধার দ্বারা সেই প্রত্যাশা দ্বারাই সেই সত্য এখানে সমুজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাবে। আমরা এখানে কোন্ মন্ত্রের রূপ দেখব বলে নিয়ত প্রত্যাশা করব। সে মন্ত্র হচ্ছে এই যে—'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'। দেশে দেশে আমরা মানুষকে তার বিশেষ স্বাজাতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে খণ্ডিত করে দেখেছি, সেখানে মানুষকে আপন বলে উপলব্ধি করতে পারি নে। পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই আশ্রম এমন-একটি জায়গা হয়ে উঠুক যেখানে ধর্ম ভাষা এবং জাতিগত সকলপ্রকার পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা মানুষকে তার বাহ্যভেদমুক্তরূপে মানুষ বলে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়াই নূতন যুগকে দেখতে পাওয়া। সন্ন্যাসী পূর্বাকাশে প্রথম অরুণোদয় দেখবে বলে জেগে আছে। যখনই অন্ধকারের প্রান্তে আলোকের আরক্ত রেখাটি দেখতে পায় তখনই সে জানে যে, প্রভাতের জয়ধ্বজা তিমিররাত্রির প্রাকারের উপর আপন কেতন উড়িয়েছে। আমরা তেমনি করে ভারতের এই পূর্বপ্রান্তে এই প্রান্তরশেষে যেন আজ নববর্ষের প্রভাতে ভেদবাধার তিমির-মুক্ত মানুষের রূপ আমাদের এখানে সমাগত অতিথি বন্ধু সকলের মধ্যে উজ্জ্বল করে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়া থেকেই যেন মনের মধ্যে শ্রদ্ধা করতে পারি যে, মানবের ইতিহাসে নবযুগের অরুণোদয় আরম্ভ হয়েছে।

শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩৩০

৮

অল্প কিছুকাল হল কালিঘাটে গিয়েছিলুম। সেখানে গিয়ে আমাদের পুরোনো আদিগঙ্গাকে দেখলাম। তার মস্ত দুর্গতি হয়েছে। সমুদ্রে আনাগোনার পথ তার চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেছে। যখন এই নদীটির ধারা সজীব ছিল তখন কত বণিক আমাদের ভারত ছাড়িয়ে সিংহল গুজরাট ইত্যাদি দেশে নিজেদের বাণিজ্যের সম্বন্ধ বিস্তার করেছিল। এ যেন মৈত্রীর ধারার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের বাধাকে দূর করেছিল। তাই এই নদী পুণ্যনদী বলে গণ্য হয়েছিল। তেমনি ভারতের সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি যত বড়ো বড়ো নদনদী আছে সবগুলি সেকালে পবিত্র বলে গণ্য হয়েছিল। কেন। কেননা এই নদীগুলি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ-স্থাপনের উপায়স্বরূপ ছিল। ছোটো ছোটো নদী তো ঢের আছে —তাদের ধারার তীব্রতা থাকতে পারে; কিন্তু না আছে গভীরতা, না আছে স্থায়িত্ব। তারা তাদের জলধারায় এই বিশ্বমৈত্রীর রূপকে ফুটিয়ে তুলতে পারে নি। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে তারা সাহায্য করে নি। সেইজন্য তাদের জল মানুষের কাছে তীর্থোদক হল না। যেখান দিয়ে বড়ো বড়ো নদী বয়ে গিয়েছে সেখানে কত বড়ো বড়ো নগর হয়েছে—সেসব দেশ সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছে। এইসব নদী বয়ে মানুষের জ্ঞানের সাধনার সম্পদ নানা জায়গায় গিয়েছে। আমাদের দেশের চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকেরা যখন জ্ঞান বিতরণ করেন, অধ্যাপকপত্নী তাদের অন্নপানের ব্যবস্থা করে থাকেন; এই গঙ্গাও তেমনি একসময়ে যেমন ভারতের সাধনার ক্ষেত্র ধীরে ধীরে বিস্তারিত করেছিল তেমনি আর-এক দিক দিয়ে সে তার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করেছিল। সেইজন্য গঙ্গার প্রতি মানুষের এত শ্রদ্ধা।

তা হলে আমরা দেখলাম, এই পবিত্রতা কোথায়? না, কল্যাণময় আহ্বানে ও সুযোগে মানুষ বড়ো ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মিলেছে— আপনার স্বার্থবুদ্ধির গণ্ডির মধ্যে একা একা বদ্ধ হয়ে থাকে নি। এ ছাড়া নদীর জলের মধ্যে এমন কোনো ধর্ম নেই যাতে করে তা পবিত্র হতে পারে।

কিন্তু যখনই তার ধারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, সমুদ্রের সঙ্গে তার অবাধ সম্বন্ধ নষ্ট হল, তখনই তার গভীরতাও কমে গেল। গঙ্গা দেখলাম, কিন্তু চিত্ত খুশি হল না। যদিও এখনও লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে, সেটা তাদের অভ্যাসমাত্র। জলে তার আর সেই পুণ্যরূপ নেই। আমাদের ভারতের জীবনেও ঠিক এই দশাই ঘটেছে। এক সময় পৃথিবীর সমস্ত দেশকে ভারত তার পুণ্যসাধনার পথে আহ্বান করেছিল, ভারতে সব দেশ থেকে লোক বড়ো সত্যকে লাভ করার জন্যে এসে মিলেছিল। ভারতও তখন নিজের শ্রেষ্ঠ যা তা সমস্ত বিশ্বে বিলিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে নিজের যোগ স্থাপন করেছিল বলে ভারত পুণ্যক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। গয়া আমাদের কাছে পুণ্যক্ষেত্র কেন হল। না, তার কারণ বুদ্ধদেব এখানে তপস্যা করেছিলেন, আর সেই তাঁর তপস্যার ফল ভারত সমস্ত বিশ্বে বণ্টন করে দিয়েছে। যদি তার পরিবর্তন হয়ে থাকে, আজ যদি সে আর অমৃত-অন্ন পরিবেশনের ভার না নেয়, তবে গয়াতে আর কিছুমাত্র পুণ্য অবশিষ্ট নেই। কিছু আছে যদি মনে করি তো বুঝতে হবে, তা আমাদের আগেকার অভ্যাস। গয়ার পাণ্ডারা কি গয়াকে বড়ো করতে পারে, না তার মন্দির পারে?

আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে, পুণ্যধর্ম মাটিতে বা হাওয়ায় নেই। চিন্তার দ্বারা, সাধনার দ্বারা পুণ্যকে সমর্থন করতে হবে। আমাদের আশ্রমে সে বাধা অনেক দূর হয়েছে। আপনা-আপনি বিদেশের অতিথিরা এখানে এসে তাঁদের আসন পাতছেন। তাঁরা বলছেন যে, তাঁরা এখানে এসে তৃপ্তি পেয়েছেন। এমনি করেই ভারতের গঙ্গা আমাদের আশ্রমের মধ্যে বইল। দেশবিদেশের অতিথিদের চলাচল হতে লাগল। তাঁরা আমাদের জীবনে জীবন মেলাচ্ছেন। এই আশ্রমকে অবলম্বন করে তাঁদের চিত্ত প্রসারিত হচ্ছে। এর চেয়ে আর সফলতা কিছু নেই। তীর্থে মানুষ উত্তীর্ণ হয় বলেই তার নাম তীর্থ। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে এসে সকলে উত্তীর্ণ হয় না; সমস্ত পথিক যেখানে আসে চলে যাবার জন্যে, থাকবার জন্যে নয়। যেমন কলকাতার বড়োবাজার— সেখানে এসে প্রীতি মেলে না, বিরাম মেলে না, সেখানে এসে যাত্রা শেষ হয় না; সেখানে লাভলোকসানের কথা ছাড়া আর কথা নেই। আমি কলকাতায় জন্মেছি— সেখানে আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছি না। সেখানে আমার বাড়ি আছে, তবু সেখানে কিছু নিজের আছে বলে মনে করতে পারছি না। মানুষ যদি নিজের সেই আশ্রয়টি খুঁজে না পেলে তো মনুমেণ্ট দেখে, বড়ো বড়ো বাড়িঘর দেখে তার কী হবে। ওখানে কার আহ্বান আছে। বণিকরাই কেবল সেখানে থাকতে পারে। ও তীর্থক্ষেত্র নয়। এ ছাড়া আমাদের যেগুলো তীর্থক্ষেত্র আছে সেখানে কী হয়। সেখানে যারা পুণ্যপিপাসু তারা পাণ্ডাদের পায়ে টাকা দিয়ে আসে। সেখানে তো সব দেশের মানুষ মেলবার জন্যে ভিতরকার আহ্বান পায় না।

কাল একটি পত্র পেলাম। আমাদের সুরুলের পল্লীবিভাগের যিনি অধ্যক্ষ তিনি জাহাজ থেকে আমাকে চিঠি লিখেছেন। তিনি লিখেছেন যে, জাহাজের লোকেরা তাসখেলা ও অন্যান্য এত ছোটোখাটো আমোদপ্রমোদ নিয়ে দিন কাটায় যে তিনি বিস্মিত হয়ে আমাকে লিখেছেন যে, কেমন করে তারা এর মধ্যে থাকে।

যে জীবনে কোনো বড়ো প্রকাশ নেই, ক্ষুদ্র কথায় যে জীবন ভরে উঠেছে, বিশ্বের দিকে যে জীবনের কোনো প্রবাহ নেই, তারা কেমন করে তার মধ্যে থাকে, কী করে তারা মনে তৃপ্তি পায়।

শ্রীযুক্ত এল্‌ম্‌হার্‌স্‌ট্‌ এই-যে বেদনা অনুভব করেছেন তার কারণ কী। কারণ এই যে, তিনি আশ্রমে যে কার্যের ভার নিয়েছেন তাতে করে তাঁকে বৃহতের ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। তিনি তাঁর কর্মকে অবলম্বন করে সমস্ত গ্রামবাসীদের কল্যাণক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ কাজ তাঁর আপনার স্বার্থের জন্যে নয়। তিনি সমস্ত গ্রামবাসীদের মানুষ বলে শ্রদ্ধা করে সকলের সঙ্গে মেলবার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে এ জায়গা তাঁর কাছে তীর্থ হয়ে উঠেছে। এই-যে আশেপাশের গরিব অজ্ঞ, এদের মধ্যে যাবার তিনি পথ পেয়েছিলেন। সেইজন্যে তাঁর সঙ্গে যেসমস্ত বড়ো বড়ো ধনী ছিলেন— তাঁদের কেউ-বা জজ, কেউ-বা ম্যাজিস্ট্রেট— তাঁদের তিনি মনে মনে অত্যন্ত অকৃতার্থ বলে বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা এখানে প্রভূত ক্ষমতা পেলেও, সমস্ত দেশবাসীর সহিত অব্যাহত মিলনের পথটি খুঁজে পান নি। তাঁরা ভারতে কোনো তীর্থে এসে পৌঁছলেন না। তাঁদের কেউ-বা রাজতক্তায় এসে ঠেকলেন, কেউ-বা লোহার সিন্দুকে এসে ঠেকলেন, তাঁরা পুণ্যতীর্থে এসে ঠেকলেন না। আমাদের সাহেব সুরুলে এসে এর তীর্থের রূপটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আমরা এখানে থেকেও যদি সেটি উপলব্ধি করতে না পারি তবে আমাদের মতো অকৃতার্থ আর কেউ নেই। তাই বলছি, আমাদের এখানে কর্মের মধ্যে, এর জ্ঞানের সাধনার মধ্যে যেন কল্যাণকে উপলব্ধি করতে পারি। এ জায়গা শুধু পাঠশালা নয়, এই জায়গা তীর্থ। দেশবিদেশ থেকে লোকেরা এখানে এসে যেন বলতে পারে— আ বাঁচলাম, আমরা ক্ষুদ্র সংসারের বাইরে এসে বিশ্বের ও বিশ্বদেবতার দর্শন লাভ করলাম।

শান্তিনিকেতন
৫ বৈশাখ ১৩৩০

৯

আমাদের অভাব বিস্তর, আমাদের নালিশের কথাও অনেক আছে। সেই অভাবের বোধ জাগাবার ও দূর করবার জন্যে, নালিশের বৃত্তান্ত বোঝাবার ও তার নিষ্পত্তি করবার জন্যে যাঁরা অকৃত্রিম উৎসাহ ও প্রাজ্ঞতার সঙ্গে চেষ্টা করছেন তাঁরা দেশের হিতকারী; তাঁদের 'পরে আমাদের শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাক্‌।

কিন্তু কেবলমাত্র অপমান ও দারিদ্র্যের দ্বারা দেশের আত্মপরিচয় হয় না, তাতে আমাদের প্রচ্ছন্ন করে। যে নক্ষত্রের আলোক নিবে গেছে অন্ধকারই তার পক্ষে একমাত্র অভিশাপ নয়, নিখিল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তার অপ্রকাশই হচ্ছে তার সবচেয়ে বড়ো অবমাননা। অন্ধকার তাকে কেবল আপনার মধ্যেই বদ্ধ করে, আলোক তাকে সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত করে রাখে।

ভারতের যেখানে অভাব যেখানে অপমান সেখানে সে বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। এই অভাবই যদি তার একান্ত হত, ভারত যদি মধ্য-আফ্রিকা-খণ্ডের মতো সত্যই

দৈন্যপ্রধান হত, তা হলে নিজের নিরবচ্ছিন্ন কালিমার মধ্যেই অব্যক্ত হয়ে থাকা ছাড়া তার আর গতি ছিল না।

কিন্তু কৃষ্ণপক্ষই ভারতের একমাত্র পক্ষ নয়, শুক্লপক্ষের আলোক থেকে বিধাতা তাকে বঞ্চিত করেন নি। সেই আলোকের যোগেই সে আপন পূর্ণিমার গৌরব নিখিলের কাছে উদ্‌ঘাটিত করবার অধিকারী।

বিশ্বভারতী ভারতের সেই আলোকসম্পদের বার্তা বহন ও ঘোষণ করবার ভার নিয়েছে। যেখানে ভারতের অমাবস্যা সেখানে তার কার্পণ্য। কিন্তু একমাত্র সেই কার্পণ্যকে স্বীকার করেই কি সে বিশ্বের কাছে লজ্জিত হয়ে থাকবে। যেখানে তার পূর্ণিমা সেখানে তার দাক্ষিণ্য থাকা চাই তো। এই দাক্ষিণ্যেই তার পরিচয়, সেইখানেই নিখিল বিশ্ব তার নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নেবেই।

যার ঘরে নিমন্ত্রণ চলে না সেই তো একঘরে, সমাজে সেই চিরলাঞ্ছিত। আমরা বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে বলতে চাই, ভারতে বিশ্বের সেই নিমন্ত্রণ বন্ধ হবার কারণ নেই। যারা অবিশ্বাসী, যারা একমাত্র তার অভাবের দিকেই সমস্ত দৃষ্টি রেখেছে, তারা বলে, যতক্ষণ না রাজ্যে স্বাতন্ত্র্য, বাণিজ্যে সমৃদ্ধি লাভ করব ততক্ষণ অবজ্ঞা করে ধনীরা আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেই না। কিন্তু এমন কথা বলায় শুধু স্বদেশের অপমান তা নয়, এতে সর্বমানবের অপমান। বুদ্ধদেব যখন অকিঞ্চনতা গ্রহণ করেই সত্যপ্রচারের ভার নিয়েছিলেন তখন তিনি এই কথাই সপ্রমাণ করেছিলেন যে, সত্য আত্মমহিমাতেই গৌরবান্বিত। সূর্য আপন আলোকেই স্বপ্রকাশ; স্যাকরার দোকানে সোনার গিল্টি না করালে তার মূল্য হবে না,·ঘোরতর বেনের মুখেও এ কথা শোভা পায় না।

যে স্বদেশাভিমান আমরা পশ্চিমের কাছ থেকে ধার করে নিয়েছি তারই মধ্যে রাজ্যবাণিজ্যগত সম্পদের প্রতি একান্ত বিশ্বাসপরতার অশুচিতা রয়ে গেছে। সেইজন্যেই আজকের দিনে ভারতবাসীও এমন কথাও বলতে লজ্জা বোধ করে না যে, রাষ্ট্রীয় গৌরব সর্বাগ্রে, তার পরে সত্যের গৌরব। কোনো কোনো পাশ্চাত্ত্য মহাদেশে দেখে এসেছি, ধনের অভিমানেই সেখানকার সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা সাধনাকে রাহুগ্রস্ত করে রেখেছে। সেখানে বিপুল ধনের ভারাকর্ষণে মানুষের মাথা মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। পশ্চিমকে খোঁটা দিয়ে স্বজাতিদম্ভ প্রকাশ করবার বেলায় আমরা যে মুখে সর্বদাই পশ্চিমের এই বস্তুলুব্ধতার নিন্দা করে থাকি সেই মুখেই যখন সত্যসম্পদকে শক্তিসম্পদের পশ্চাদ্‌বর্তী করে রাখবার প্রস্তাব করে থাকি তখন নিশ্চয়ই আমাদের অশুভগ্রহ কুটিল হাস্য করে। যেমন কোনো কোনো শুচিতাভিমানী ব্রাহ্মণ অপাঙ্‌ক্তেয়ের বাড়িতে যে মুখে আহার করে আসে বাইরে এসে সেই মুখেই তার নিন্দা করে, এও ঠিক সেইমতো।

বিশ্বভারতীর কণ্ঠ দিয়ে এই কথাই আমরা বলতে চাই যে, ভারতবর্ষে সত্য-সম্পদ বিনষ্ট হয় নি। না যদি হয়ে থাকে তা হলে সত্যের দায়িত্ব মানতেই হবে। ধনবানের ধন ধনীর একমাত্র নিজের হতে পারে, কিন্তু সত্যবানের সত্য বিশ্বের। সত্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তার নিমন্ত্রণ-প্রচার আছেই। ঋষি যখনই বুঝলেন 'বেদাহমেতম্'—আমি একে জেনেছি, তখনই তাঁকে বলতে হল, 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'—তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা সকলে শুনে যাও।

তোমরা সকলে শুনে যাও, পিতামহদের এই নিমন্ত্রণবাণী যদি আজ ভারতবর্ষে নীরব হয়ে থাকে তবে সাম্রাজ্যে স্বাধীনতা, বাণিজ্যে সমৃদ্ধি, কিছুতেই আমাদের আর গৌরব দিতে পারে না। ভারতে সত্যধন যদি লুপ্ত হয়ে থাকে তবেই বিশ্বের

প্রতি তার নিমন্ত্রণের অধিকারও লুপ্ত হয়ে গেছে। আজকের দিনে যারা ভারতের নিমন্ত্রণে বিশ্বাস করে না তারা ভারতের সত্যেও বিশ্বাস করে না। আমরা বিশ্বাস করি। বিশ্বভারতী সেই বিশ্বাসকে আমাদের স্বদেশবাসীর কাছে প্রকাশ করুক ও সর্বদেশবাসীর কাছে প্রচার করুক। বিশ্বভারতীতে ভারতের নিমন্ত্রণবাণী বিশ্বের কাছে ঘোষিত হোক। বিশ্বভারতীতে ভারত আপনার সেই সম্পদকে উপলব্ধি করুক, যে সম্পদকে সর্বজনের কাছে দান করার দ্বারাই লাভ করা যায়।

প্র. পৌষ ১৩৩০

১০

[আমি যখন এই শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এখানে ছেলেদের আনলুম তখন আমার নিজের বিশেষ কিছু দেবার বা বলবার মতো ছিল না। কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার এই প্রভাতের আলো, শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে। কারণ প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তে আনন্দসঞ্চারের দরকার আছে; বিশ্বের চারি দিককার রসাস্বাদ করা ও সকালের আলো সন্ধ্যার সূর্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করার মধ্য দিয়ে শিশুদের জীবনের উন্মেষ আপনার থেকেই হতে থাকে। আমি চেয়েছিলুম যে তারা অনুভব করুক যে, বসুন্ধরা তাদের ধাত্রীর মতো কোলে করে মানুষ করছে। তারা শহরের যে ইঁটকাঠপাথরের মধ্যে বর্ধিত হয় সেই জড়তার কারাগার থেকে তাদের মুক্তি দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ-আলোর অঙ্কশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, শান্তিনিকেতনের গাছপালা-পাখিই এদের শিক্ষার ভার নেবে। আর সেইসঙ্গে কিছু কিছু মানুষের কাছ থেকেও এরা শিক্ষা লাভ করবে। কারণ, বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে তাতে করে শিশুচিত্তের বিষম ক্ষতি হয়েছে। এই যোগ-বিচ্ছেদের দ্বারা যে স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হয় তাতে করে মানুষের অকল্যাণ হয়েছে। পৃথিবীতে এই দুর্ভাগ্য অনেক দিন থেকে চলে এসেছে। তাই আমার মনে হয়েছিল যে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগস্থাপন করবার একটি অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। এমনি করে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।]

তখন আমার নিজের সহায় সম্বল কিছু ছিল না, কারণ আমি নিজে বরাবর ইস্কুলমাস্টারকে এড়িয়ে চলেছি। বই-পড়া বিদ্যা ছেলেদের শেখাব এমন দুঃসাহস ছিল না। কিন্তু আমাকে বাল্যকাল থেকে বিশ্বপ্রকৃতির বাণী মুগ্ধ করেছিল, আমি তার সঙ্গে একান্ত আত্মীয়তার যোগ অনুভব করেছি। বই পড়ার চেয়ে যে তার কত বেশি মূল্য তা যে কতখানি শক্তি ও প্রেরণা দান করে, তা আমি নিজে জানি। আমি কতদিন একা মাসের পর মাস বুনো হাঁসের পাড়ায় জীবন যাপন করেছি। এই বালুচরদের সঙ্গে জীবনযাপনকালে প্রকৃতির যা-কিছু দান তা আমি যতই অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেছি ততই আমি পেয়েছি, আমার চিত্ত ভরপুর হয়ে গেছে। তাই শিশুরা যে এখানে আনন্দে দৌড়চ্ছে, গাছে চড়ছে, কলহাস্যে আকাশ মুখর করে তুলছে— আমার মনে হয়েছে যে, এরা এমন-কিছু লাভ করেছে যা দুর্লভ। তাদের বিদ্যার কী মার্কা মারা হল এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা নয়; কিন্তু তাদের

চিত্তের পেয়ালা বিশ্বের অমৃতরসে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, আনন্দে উপচে উঠেছে, এই ব্যাপারটি বহুমূল্য। এই হাসিগান-আনন্দে গল্পে ভিতরে ভিতরে তাদের মনের পরিপুষ্টি হয়েছে। অভিভাবকেরা হয়তো তা বুঝবেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকেরা হয়তো তার জন্য পাসের নম্বর দিতে রাজি হবেন না, কিন্তু আমি জানি এ অতি আদরণীয়। প্রকৃতির কোলে থেকে সরস্বতীকে মাতৃরূপে লাভ করা, এ পরম সৌভাগ্যের কথা। এমনি করে আমার বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হল।

তার পর একটি দ্বার খুলে যাওয়াতে ভিতরের কপাটগুলি উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল। আসলে খোলবার জিনিস একটি, কিন্তু পাবার জিনিস বহু। কিন্তু প্রথম দ্বারটি বন্ধ থাকলে ভিতরে প্রবেশ করবার উপায় থাকে না। প্রকৃতির আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবার মধ্যে যে কৃত্রিম শিক্ষা সেটাই হল গোড়াকার সেই বন্ধনদশা যা ছিন্ন না করলে রসভাণ্ডারে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। তাই মানুষের মুক্তির উপায় হচ্ছে, প্রকৃতিকে ধাত্রী বলে স্বীকার করে নিয়ে তাঁরই আশ্রয়ে শিক্ষকতা লাভ করা। এই মুক্তির আদর্শ নিয়েই এই শিক্ষাকেন্দ্রের পত্তন হল।

এখানকার এই মুক্ত বায়ুতে আমরা যে মুক্তি পেয়ে গেলুম আজ তা গর্ব করে বলবার আছে। এতে করে আমাদের যে কত বন্ধনদশা ঘুচল, কত যে সংকীর্ণ সংস্কার দূর হল, তা বলে শেষ করা যায় না। এখানে আমরা সব মানুষকে আপনার বলে স্বীকার করতে শিখেছি, এখানে মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধ ক্রমশ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।

এটি যে পরম সৌভাগ্যের কথা তা আমাদের জানতে হবে। কারণ এ কথা আগেই বলেছি যে, মানুষের মধ্যে একটি মস্ত পীড়া হচ্ছে, তার লোকালয়ে একান্তভাবে অবরোধ। বিশ্বপ্রকৃতির থেকে বিচ্ছেদ তার চিত্তশক্তিকে খর্ব করে দিচ্ছে। কিন্তু তার চেয়েও মানুষের মধ্যে আর-একটি অস্বাভাবিকতা আছে, তা হচ্ছে এই যে, মানুষই মানুষের পরম শত্রু। এটি খুব সাংঘাতিক কথা। এর মধ্যে যে তার কতখানি চিত্তসংকোচ আছে তা আমরা অভ্যাসবশত জানতে পারি না। স্বাজাত্যের দম্ভে আমরা কোণঠেসা হয়ে গেছি, বিশ্বের বিস্তীর্ণ অধিকারে আপনাদের বঞ্চিত করেছি। এই ভীষণ বাধাকে অপসারিত করতে হবে; আমাদের জানতে হবে যে, যেখানে মানুষের চিত্তসম্পদ আছে সেখানে দেশবিদেশের ভেদ নেই, ভৌগোলিক ভাগবিভাগ নেই। পর্বত অরণ্য মরু, এরা মানুষের আত্মাকে কারারুদ্ধ করতে পারে না।

বাংলার যে মাটির ফসলে ধান হচ্ছে, যে মাটিতে গাছ বেড়ে উঠছে, সেই উপরিতলের মাটি হল বাংলাদেশের; কিন্তু একথা জানতে হবে যে, নিচেকার ভূমি পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে, সুতরাং এ জায়গায় সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে তার গভীরতম নাড়ির যোগ। এই তার ধাত্রীভূমিটি যদি সার্বভৌমিক না হত তবে এমন করে বাংলার শ্যামলতা দেখা দিত না। মাটি তুলে নিয়ে টবের ছোটো জায়গাতেও তো গাছ লাগানো যায়, কিন্তু তাতে করে যথেষ্ট ফল লাভ হয় না। বড়ো জায়গার যে মাটি তাতেই যথার্থ ফসল উৎপন্ন হয়। ঠিক তেমনি অন্তরের ক্ষেত্রে আমরা যেখানে বিশ্বকে অস্বীকার করছি, বলছি যে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও বড়ো হওয়া যায়, সেখানেই আমরা মস্ত ভুল করছি।

পৃথিবীতে যেখানে সভ্যতার নানা ধারা এসে মিলিত হয়েছে সেখানেই জ্ঞানের তীর্থভূমি বিরচিত হয়েছে। সেখানে নানা দিক থেকে নানা জাতির সমাবেশ হওয়াতে একটি মহামিলন ঘটেছে। গ্রীস রোম প্রভৃতি বড়ো সভ্যতার মধ্যে নানা

জ্ঞানধারার সম্মিলন ছিল, তাই তা একঘরে হয়ে ইতিহাসে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে নি। ভারতবর্ষের সভ্যতাতেও তেমনি আর্য দ্রাবিড় পারসিক প্রভৃতি নানা বিচিত্র জাতির মিলন হয়েছিল। আমাদের এই সমন্বয়কে মানতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে যারা বর্বর তারাই সবচেয়ে স্বতন্ত্র; তারা নূতন লোকদের স্বদেশে প্রবেশ করতে দেয় নি, বর্ণ ভাষা প্রভৃতির বৈষম্য যখনই দেখেছে তখনই তা দোষের বলে বিষবাণ প্রয়োগ করে মারতে গিয়েছে।

আজকের দিনে বিশ্বমানবকে আপনার বলে স্বীকার করবার সময় এসেছে। আমাদের অন্তরের অপরিমেয় প্রেম ও জ্ঞানের দ্বারা এই কথা জানতে হবে যে, মানুষ শুধু কোনো বিশেষ জাতির অন্তর্গত নয়; মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে, সে মানুষ। আজকার দিনে এই কথা বলবার সময় এসেছে যে, মানুষ সর্বদেশের সর্বকালের। তার মধ্যে কোনো জাতীয়তা বা বর্ণভেদ নেই। সেই পরিচয়সাধন হয় নি বলেই মানুষ আজ অপরের বিত্ত আহরণ করে বড়ো হতে চায়। সে আপনাকে মারছে, অন্যকে মারতে তার হাত কম্পিত হচ্ছে না—সে এতবড়ো অপকর্ম করতে সাহস পাচ্ছে।

ভারতবর্ষ তার জাতরক্ষা করবার স্বপক্ষে কি পাশ্চাত্ত্য দেশের নজির টেনে আনবে। আমরা কি এ কথা ভুলে গেছি যে, য়ুরোপ ও আমেরিকা আপন আপন ন্যাশনালিজ্‌মের ভিত্তিপত্তন করে যে বিরাট প্রাচীর নির্মাণ করেছে আমাদের দেশে তেমন ভিত্তিপত্তন কখনও হয় নি। ভারতবর্ষ এই কথা বলেছিল যে, যিনি বিশ্বকে আপনার বলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনিই যথার্থ সত্যকে লাভ করেছেন। তিনি অপ্রকাশ থাকেন না; 'ন ততো বিজুগুপ্সতে', তিনি সর্বলোকে সর্বকালে প্রকাশিত হন। কিন্তু যারা অপ্রকাশ, যারা অন্যকে স্বীকার করল না, তারা কখনও বড়ো হতে পারল না, ইতিহাসে তারা কোনো বড়ো সত্যকে রেখে যেতে পারল না। তাই কার্থেজ ইতিহাসে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কার্থেজ বিশ্বের সমস্ত ধনরত্ন দোহন করতে চেয়েছিল। সুতরাং সে এমন-কিছু সম্পদ রেখে যায় নি যার দ্বারা ভবিষ্যৎ যুগের মানুষের পাথেয় রচনা হয়। তাই ভেনিসও কোনো বাণী রেখে যেতে পারল না। সে কেবলই বেনের মতো নিয়েছে, জমিয়েছে, কিছুই দিয়ে যেতে পারল না। কিন্তু মানুষ যখনই বিশ্বে আপনার জ্ঞানের ও প্রেমের অধিকার বিস্তৃত করতে পেরেছে তখনই সে আপন সত্যকে লাভ করেছে, বড়ো হয়েছে।

প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম যে, বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হল যে, মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে। আমার বিদ্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে সেই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাটি অভিব্যক্ত হয়েছিল। কারণ বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহ্বান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে, মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে। নিজের ঘরের নিজের দেশের মধ্যে যে মুক্তি তা হল ছোটো কথা: তাতে করে সত্য খণ্ডিত হয়, আর সেজন্যই জগতে অশান্তির সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে বারে বারে পদে পদে এই সত্যের বিচ্যুতি হয়েছে বলে মানুষ পীড়িত হয়েছে, বিদ্রোহানল জ্বালিয়েছে। মানুষে মানুষে যে সত্য, 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি', এই কথার মধ্যে যে বিশ্বজনীন সত্য আছে তা মানুষ মানে নি, স্বদেশের

গণ্ডিতে আপনাদের আবদ্ধ করেছে। মানুষ যে পরিমাণে এই ঐক্যকে স্বীকার করেছে সে পরিমাণে সে যথার্থ সত্যকে পেয়েছে, আপনার পূর্ণপরিচয় লাভ করেছে।

এ কথা আজকার দিনে যদি আমরা না উপলব্ধি করি তবে কি তার দণ্ড নেই। মানুষের এই বড়ো সত্যের অপলাপ হলে যে বিষম ক্ষতি, তা কি আমাদের জানতে হবে না। মানুষ মানুষকে পীড়া দেয় এত বড়ো অন্যায় আচরণ আমাদের নিবারণ করতে হবে, বিশ্বভারতীতে আমরা সেই সত্য স্বীকার করব বলে এসেছি। অন্যেরা যে কাজেরই ভার নিন-না— বণিক বাণিজ্যবিস্তার করুন, ধনী ধনসঞ্চয় করুন, কিন্তু এখানে সর্বমানবের যোগসাধনের সেতু রচিত হবে। অতিথিশালার দ্বার খুলবে, যার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আমরা সকলকে আহ্বান করতে কুণ্ঠিত হব না। এই মিলনক্ষেত্রে আমাদের ভারতীয় সম্পদকে ভুললে চলবে না, সেই ঐশ্বর্যের প্রতি একান্ত আস্থা স্থাপন করে তাকে শ্রদ্ধায় গ্রহণ করতে হবে। বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে যে প্রাসাদসৌধ নির্মাণ করেছিলেন আজ তো তার কোনো চিহ্ন নেই; ঐতিহাসিকেরা তাঁর গোষ্ঠীগোত্রের আজ পর্যন্ত মীমাংসা করতে পারল না। কিন্তু কালিদাস যে কাব্য রচনা করে গেছেন তার মধ্যে কোনো স্থানবিচার নেই; তা তো শুধু ভারতীয় নয়, তা যে চিরন্তন সর্বদেশের সর্বকালের সম্পদ হয়ে রইল। যখন সবাই বলবে যে, এটা আমার, আমি পেলুম, তখনই তা যথার্থ দেওয়া হল। এই-যে দেবার অধিকার লাভ করা, এর জন্য উৎসাহ চাই, সাধনার উদ্যম চাই। আমাদের কৃপণতা করলে চলবে না। কোনো বড়ো সম্পদকে গ্রহণ ও প্রচার করতে হলে বিপুল আনন্দে সমস্ত আঘাত অপমান সহ্য করে অকাতরে সব ত্যাগ করতে হবে। পৃথিবীর দেয়ালি-উৎসবে ভারতের যে প্রদীপ জ্বলবে সেই প্রদীপ-শিখার যেন অস্বীকৃতি না ঘটে, বিদ্রূপের দ্বারা যেন তাকে আচ্ছন্ন না করি। আত্মপ্রকাশের পথ অবারিত হোক, ত্যাগের দ্বারা আনন্দিত হও।

আজকার উৎসবের দিনে আমাদের এই প্রার্থনা যে, সকল অন্ধকার ও অসত্য থেকে আমাদের জ্যোতিতে নিয়ে যাও—সোনা-হীরা-মাণিক্যের জ্যোতি নয়, কিন্তু অধ্যাত্মলোকের জ্যোতিতে নিয়ে যাও। ভারতবর্ষ আজ এই প্রার্থনা জানাচ্ছে যে, তাকে মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে নিয়ে যাও। আমরা অকিঞ্চন হলেও তবু আমাদের কণ্ঠ থেকে সকল মানুষের জন্য এই প্রার্থনা ধ্বনিত হোক। আনন্দস্বরূপ, তোমার প্রকাশ পূর্ণ হোক। রুদ্র, তোমার রুদ্রতার মধ্যে অনেক দুঃখদারিদ্র্য আছে —আমরা যেন বলতে পারি যে, সেই ঘন মেঘের আবরণ ভেদ করেও তোমার দক্ষিণ মুখ দেখেছি। 'বেদাহম্'— জেনেছি। 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'— অন্ধকারেরই ওপার থেকে দেখেছি জ্যোতির রূপ। তাই অন্ধকারকে আর ভয় করি নে। যে অন্ধকার নিজেদের ছোটো গণ্ডির মধ্যেই আমাদের ছোটো পরিচয়ে আবদ্ধ করে তাকে স্বীকার করি নে। যে আলো সকলের কাছে আমাদের প্রকাশ করে এবং সকলকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে আমরা তারই অভিনন্দন করি।

শান্তিনিকেতন
৭ পৌষ ১৩৩০

১১

আজ আমার আর একবার আশ্রম থেকে দূরে যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে, হয়তো কিছু দীর্ঘকালের জন্যে এবার বিদেশে আমাকে কাটাতে হবে। যাবার পূর্বে আর একবার এই আশ্রম সম্বন্ধে, এই কর্ম সম্বন্ধে আমাদের যা কথা আছে তা সুস্পষ্ট করে বলে যেতে চাই।

আজ আমার চোখের সামনে আমাদের আশ্রমের এই বর্তমান ছবি—এই ছাত্রনিবাস কলাভবন গ্রন্থাগার অতিথিশালা, সব স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। ভাবছি, কী করে এর আরম্ভ, এর পরিণাম কোথায়। সকলের চেয়ে এইটেই আশ্চর্য যে, যে লোক একেবারে অযোগ্য—মনে করবেন না এ কোনোরকম কৃত্রিম বিনয়ের কথা —তাকে দিয়ে এই কাজ সাধন করে নেবার বিধান। ছাত্রদের যেদিন এখানে আহ্বান করলুম সেদিন আমার হাতে কেবল যে অর্থ ছিল না তা নয়, একটা বড়ো ঋণভারে তখন আমি একান্ত বিপন্ন। তা শোধ করবার কোনো উপায় আমার ছিল না। তার পরে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে আমার যে কত অক্ষমতা ছিল তা সকলেই জানেন। আমি ভালো করে পড়ি নি, আমাদের দেশে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। সব রকমের অযোগ্যতা এবং দৈন্য নিয়ে কাজে নেমেছিলুম। এর আরম্ভ অতি ক্ষীণ এবং দুর্বল ছিল. গুটি-পাঁচেক ছাত্র ছিল। ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নিতুম না; ছেলেদের অন্নবস্ত্র. প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যেমন করে হোক আমাকেই জোগাতে হত, অধ্যাপকদের সাংসারিক অভাব মোচন করতে হত। বৎসরের পর বৎসর যায়, অর্থাভাব সমানই রইল, বিদ্যালয় বাড়তে লাগল। দেখা গেল, বেতন না নিলে বিদ্যালয় রক্ষা করা যায় না। বেতনের প্রবর্তন হল; কিন্তু অভাব দূর হল না। আমার গ্রন্থের স্বত্ব কিছু কিছু করে বিক্রয় করতে হল। এদিকে ওদিকে দু-একটা যা সম্পত্তি ছিল তা গেল, অলংকার বিক্রয় করলুম—নিজের সংসারকে রিক্ত করে কাজ চালাতে হল। কী দুঃসাহসে তখন প্রবৃত্ত হয়েছিলুম জানি নে। স্বপ্নের ঘোরে যে মানুষ দুর্গম পথে ঘুরে বেড়িয়েছে সে যেমন জেগে উঠে কেঁপে ওঠে, আজ পিছন দিকে যখন তাকিয়ে দেখি তখন আমারও সেই রকমের হৃৎকম্প হয়।

অথচ এটি সামান্যই একটি বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটি নিয়েই আবাল্য-কালের সাহিত্যসাধনাও আমাকে অনেক পরিমাণে বর্জন করতে হল। এর কারণ কী, এত আকর্ষণ কিসের। এই প্রশ্নের যে উত্তর আমার মনে আসছে সেটা আপনাদের কাছে বলি। অতি গভীরভাবে নিবিড়ভাবে এই বিশ্ব-প্রকৃতিকে শিশুকাল থেকে আমি ভালোবেসেছি। আমি খুব প্রবলভাবেই অনুভব করেছি যে, শহরের জীবনযাত্রা আমাদের চার দিকে যন্ত্রের প্রাচীর তুলে দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে। এখানকার আশ্রমে, প্রকৃতির প্রাণনিকেতনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, বসন্ত-শরতের পুষ্পোৎসবে ছেলেদের যে স্থান করে দিয়েছি তারই আনন্দে দুঃসাধ্য ত্যাগের মধ্যে আমাকে ধরে রেখেছিল। প্রকৃতি-মাতা যে অমৃত পরিবেশন করেন সেই অমৃত গানের সঙ্গে মিলিয়ে নানা আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্যে ফলিয়ে এদের সকলকে বিতরণ করেছি। এরই সফলতা প্রতিদিন আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। আর যে একটি কথা অনেক দিন থেকে আমার মনে জেগে ছিল সে হচ্ছে এই যে, ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ অত্যন্ত সত্য হওয়া দরকার। মানুষের পরস্পরের মধ্যে সকল প্রকার ব্যাপারেই দেনাপাওনার সম্বন্ধ।

কখনও বেতন দিয়ে, কখনও ত্যাগের বিনিময়ে, কখনও-বা জবরদস্তির দ্বারা মানুষ এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহকে দিনরাত চালিয়ে রাখছে। বিদ্যা যে দেবে এবং বিদ্যা যে নেবে তাদের উভয়ের মাঝখানে যে সেতু সেই সেতুটি হচ্ছে ভক্তিস্নেহের সম্বন্ধ। সেই আত্মীয়তার সম্বন্ধ না থেকে যদি কেবল শুষ্ক কর্তব্য বা ব্যবসায়ের সম্বন্ধই থাকে তা হলে যারা পায় তারা হতভাগ্য, যারা দেয় তারাও হতভাগ্য। সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য বাহিরের দিক থেকে শিক্ষককে বেতন নিতে হয়, কিন্তু তাঁর অন্তরের সম্বন্ধ সত্য হওয়া চাই। এ আদর্শ আমাদের বিদ্যালয়ে সেদিন অনেক দূর পর্যন্ত চালাতে পেরেছিলুম। তখন শিক্ষকেরা ছাত্রদের সঙ্গে একসঙ্গে বেড়িয়েছেন, খেলা করেছেন, তাদের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল। ভাষা কি ইতিহাস কি ভূগোল নূতন উৎকৃষ্ট প্রণালীতে কী শিখিয়েছি না-শিখিয়েছি জানি নে, কিন্তু যে জিনিসটাকে কোনো বিদ্যালয়ে কেউ অত্যাবশ্যক বলে মনে করে না, অথচ যা সবচেয়ে বড়ো জিনিস, আমাদের বিদ্যালয়ে তার স্থান হয়েছে মনে করে আনন্দে অন্যসকল অভাব ভুলে ছিলুম।

ক্রমে আমাদের সেই অতি ছোটো বিদ্যালয় বড়ো হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে আপনারা অনেকে সমাগত হয়েছেন, ছাত্ররাও বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসেছে। ক্রমে এর সীমা আরও দূরে প্রসারিত হল, বিদেশ থেকে বন্ধুরা এসে এই কাজে যোগ দিলেন। যা প্রচ্ছন্ন ছিল তা কোনোদিন যে এমন ব্যাপকভাবে প্রকাশমান হবে তা কখনও ভাবি নি।

আমরা চেষ্টা করি নি, আমরা প্রত্যাশা করি নি। চিরদিন অল্প আয়োজন এবং অল্প শক্তিতেই আমরা একান্তে কাজ করেছি। তবু আমাদের এই প্রতিষ্ঠান যেন নিজেরই অন্তর্গূঢ় স্বভাব অনুসরণ করে বিশ্বের ক্ষেত্রে নিজেকে ব্যক্ত করেছে। পাশ্চাত্ত্য দেশের যেসব মনীষী এখানে এসেছিলেন— লেভি, উইণ্টারনিট্জ, লেস্‌নি, তাঁরা যে এমন কিছু এখানে পেয়েছিলেন যা বাংলাদেশের কোণের মধ্যে বদ্ধ নয়, তা থেকে বুঝতে পারি এখানে কোনো একটি সত্যের প্রকাশ হয়েছে। তাঁরা যে আনন্দ যে শ্রদ্ধা যে উৎসাহ অনুভব করে গেছেন তা যে এখানে আমাদের সকলের মধ্যে স্ফূর্তি পাচ্ছে তা নয়, তৎসত্ত্বেও এখানকার বাতাসের মধ্যে এমন কোনো একটা সার্থকতা আছে যার স্পর্শে দূরাগত অতিথিরা অন্তরঙ্গ সুহৃদ হয়ে উঠেছেন, যাঁরা কিছুদিনের জন্যে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে চিরকালের যোগ ঘটেছে।

আজ ভেদবুদ্ধি ও বিদ্বেষবুদ্ধি সমস্ত পৃথিবীতে আগুন লাগিয়েছে, মানুষে মানুষে এমন জগদ্‌ব্যাপী পরম-শত্রুতার সংঘাত প্রাচীন ইতিহাসে নেই। দেশে-দেশান্তরে এই আগুন ছড়িয়ে গেল। প্রাচ্য মহাদেশে আমরা বহু শতাব্দী ঘুমিয়ে ছিলুম, আমরা যে জাগলুম সে এরই আঘাতে। জাপান মার খেয়ে জেগেছে। ভারতবর্ষ থেকে প্রেমের দৌত্য একদিন তাকে জাগিয়েছিল, আজ লোভ এসে ঘা দিয়ে ভয়ে তাকে জাগিয়েছে। লোভের দন্তের ঘা খেয়ে যে জাগে সে অন্যকেও ভয় দেখায়। জাপান কোরিয়াকে মারলে, চীনকে মারতে গিয়েছিল।

মানুষের আজ কী অসহ্য বেদনা। দাসত্বে ব্রতী হয়ে কত কলে সে ক্লিষ্ট হচ্ছে— মানুষের পূর্ণতা সর্বত্র পীড়িত। মনুষ্যত্বের এই-যে খর্বতা, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যন্ত্রদেবতার এই-যে পূজা, এই-যে আত্মহত্যা, পৃথিবীর কোথাও একে নিরস্ত করবার প্রয়াস কি থাকবে না। আমরা দরিদ্র, অন্য জাতির অধীন, তাই বলেই কি মানুষ তার সত্য সম্পদ আমাদের কাছ থেকে নেবে না। যদি

সাধনা সত্য হয়, অন্তরে আমাদের বাণী থাকে, তবে মাথা হেঁট করে সকলকে নিতেই হবে।

একদিন বুদ্ধ বললেন, 'আমি সমস্ত মানুষের দুঃখ দূর করব।' দুঃখ তিনি সত্যই দূর করতে পেরেছিলেন কি না সেটি বড়ো কথা নয়; বড়ো কথা হচ্ছে, তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতবর্ষ ধনী হোক প্রবল হোক, এ তাঁর তপস্যা ছিল না; সমস্ত মানুষের জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। আজ ভারতের মাটিতে আবার সেই সাধনা জেগে উঠুক সেই ইচ্ছাকে ভারতবর্ষ থেকে কি দূর করে দেওয়া চলে। আমি যে বিশ্বভারতীকে এই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে পারি নি সে আমার নিজেরই দৈন্য— আমি যদি সাধক হতুম, সে একাগ্রতার শক্তি যদি আমার থাকত, তবে সব আপনিই হত। আজ অত্যন্ত নম্রভাবে সানুনয়ে আপনাদের জানাচ্ছি, আমি অযোগ্য, তাই এ কাজ আমার একলার নয়, এ সাধনা আপনাদের সকলের। এ আপনাদের গ্রহণ করতে হবে।

বিদেশে যখন যাই তখন সর্বমানুষের সম্বন্ধে আমাদের দেশে চৈতন্যের যে ক্ষীণতা আছে তা ভুলে যাই, ভারতের যজ্ঞক্ষেত্রে সকলকে আহ্বান করি। ফিরে এসে দেখি, এখানে সে বৃহৎ ভূমিকা কোথায়, বৃহৎ জগতের মাঝখানে যে আমরা আছি সে দৃষ্টি কোথায়। আমার শক্তি নেই, কিন্তু মনে ভরসা ছিল, বিশ্বের মর্মস্থান থেকে যে ডাক এসেছে তা অনেকেই শুনতে পাবে, অনেকে একত্র মিলিত হবে। সেই বোধের বাধা আমাদের আশ্রম থেকে যেন সর্বপ্রযত্নে দূর করি, রিপুর প্রভাব-জনিত যে দুঃখ তা থেকে যেন বাঁচি। হয়তো আমাদের সাধনা সিদ্ধ হবে, হয়তো হবে না। আমি গীতার কথা অন্তরের সঙ্গে মানি— ফলে লোভ করলে আপনাকে ভোলাব, অন্যকে ভোলাব। আমাদের কাজ বাইরে থেকে খুবই সামান্য— কটিই বা আমাদের ছাত্র, কটিই বা বিভাগ, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে এর অধিকারের সীমা নেই। আমাদের সকলের সম্মিলিত চিত্ত সেই অধিকারকে দৃঢ় করুক, সেই অধিকারকে অবলম্বন করে বিচিত্র কল্যাণের সৃষ্টি করুক— সেই সৃষ্টির আনন্দ এবং তপোদুঃখ আমাদের হোক। ছোটো ছোটো মতের অনৈক্য, স্বার্থের সংঘাত ভুলে গিয়ে সাধনাকে আমরা বিশুদ্ধ রাখব, সেই উৎসাহ আমাদের আসুক। আমার নিজের চিত্তের তেজ যদি বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল থাকত তা হলে আমি গুরুর আসন থেকে এই দাবি করতুম। কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে এক পথেরই পথিক মাত্র; আমি চালনা করতে পারি নে, চাই নে। আপনারা জানেন, আমার যা দেবার তা দিয়েছি, কৃপণতা করি নি। তাই আপনাদের কাছ থেকে ভিক্ষা করবার অধিকার আমার আজ হয়েছে।

শান্তিনিকেতন
১৭ ভাদ্র ১৩৩১

১২

একদিন আমাদের এখানে যে উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছিল সে অনেক দিনের কথা। আমাদের একটি পূর্বতন ছাত্র সেদিনকার ইতিহাসের একটি খণ্ডকালকে কয়েকটি চিঠিপত্র ও মুদ্রিত বিবরণীর ভিতর দিয়ে আমার সামনে এনে দিয়েছিল। সেই ছাত্রটি এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কাল রাত্রে সেদিনকার ইতিকথার ছিন্নলিপি যখন পড়ে দেখছিলুম তখন মনে পড়ল, কী ক্ষীণ আরম্ভ, কত তুচ্ছ আয়োজন। সেদিন যে মূর্তি এই আশ্রমের শালবীথিচ্ছায়ায় দেখা দিয়েছিল, আজকের দিনের বিশ্বভারতীর রূপ তার মধ্যে এতই প্রচ্ছন্ন ছিল যে, সে কারও কল্পনাতেও আসতে পারত না। এই অনুষ্ঠানের প্রথম সূচনা-দিনে আমরা আমাদের পুরাতন আচার্যদের আহ্বানমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেম— যে মন্ত্রে তাঁরা সকলকে ডেকে বলেছিলেন, 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'; বলেছিলেন, 'জলধারাসকল যেমন সমুদ্রের মধ্যে এসে মিলিত হয় তেমনি করে সকলে এখানে মিলিত হোক।' তাঁদেরই আহ্বান আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল, কিন্তু ক্ষীণকণ্ঠে। সেদিন সেই বেদমন্ত্র-আবৃত্তির ভিতরে আমাদের আশা ছিল, ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আজ যে প্রাণের বিকাশ আমরা অনুভব করছি, সুস্পষ্টভাবে সেটা আমাদের গোচর ছিল না। এই বিদ্যালয়ের প্রচ্ছন্ন অন্তঃস্তর থেকে সত্যের বীজ আমার জীবিতকালের মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়ে বিশ্বভারতী রূপে বিস্তার লাভ করবে, ভরসা করে এই কল্পনাকে সেদিন মনে স্থান দিতে পারি নি। কোনো একদিন বিরাট ভারতবর্ষ এই আশ্রমের মধ্যে আসন পাতবে, এই ভারতবর্ষ—যেখানে নানা জাতি নানা বিদ্যা নানা সম্প্রদায়ের সমাবেশ, সেই ভারতবর্ষের সকলের জন্যই এখানে স্থান প্রশস্ত হবে, সকলেই এখানে আতিথ্যের অধিকার পাবে, এখানে পরস্পরের সম্মিলনের মধ্যে কোনো বাধা কোনো আঘাত থাকবে না, এই সংকল্প আমার মনে ছিল। তখন একান্ত মনে এই ইচ্ছা করেছিলেম যে, ভারতবর্ষের আর সর্বত্রই আমরা বন্ধনের রূপ দেখতে পাই, কিন্তু এখানে আমরা মুক্তির রূপকেই যেন স্পষ্ট দেখি। যে বন্ধন ভারতবর্ষকে জর্জরিত করেছে সে তো বাইরে নয়, সে আমাদেরই ভিতরে। যাতেই বিচ্ছিন্ন করে তাই যে বন্ধন। যে কারারুদ্ধ সে বিচ্ছিন্ন বলেই বন্দী। ভেদবিভেদের প্রকাণ্ড শৃঙ্খলের অসংখ্য চক্র সমস্ত ভারতবর্ষকে ছিন্নবিচ্ছিন্নতায় পীড়িত ক্লিষ্ট করে রেখেছে, আত্মীয়তার মধ্যে মানুষের যে মুক্তি সেই মুক্তিকে প্রত্যেক পদে বাধা দিচ্ছে, পরস্পর-বিভিন্নতাই ক্রমে পরস্পর-বিরোধিতার দিকে আমাদের আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে। এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের অনৈক্যকে আমরা রাষ্ট্রনৈতিক বক্তৃতা-মঞ্চে বাক্যকুহেলিকার মধ্যে ঢাকা দিয়ে রাখতে চাই, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে পরস্পর সম্বন্ধে ঈর্ষা অবজ্ঞা আত্মপর-ভেদবুদ্ধি কেবলই যখন কণ্টকিত হয়ে ওঠে তখন সেটার সম্বন্ধে আমাদের লজ্জাবোধ পর্যন্ত থাকে না। এমনি করে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার আশা দূরে থাক্, পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের পথও সুগভীর ঔদাসীন্যের দ্বারা বাধাগ্রস্ত।

যে অন্ধকারে ভারতবর্ষে আমরা পরস্পরকে ভালো করে দেখতে পাই নে সেইটেই আমাদের সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। রাতের বেলায় আমাদের ভয়ের প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে, অথচ সকালের আলোতে সেটা দূর হয়ে যায়। তার প্রধান কারণ, সকালে আমরা সকলকে দেখতে পাই, রাত্রে আমরা নিজেকে স্বতন্ত্র করে

দেখি। ভারতবর্ষে সেই রাত্রি চিরন্তন হয়ে রয়েছে। মুসলমান বলতে কী বোঝায় তা সম্পূর্ণ করে আপনার করে, অর্থাৎ রামমোহন রায় যেমন করে জানতেন, তা খুব অল্প হিন্দুই জানেন। হিন্দু বলতে কী বোঝায় তাও বড়ো করে আপনার করে, অর্থাৎ দারাশিকো একদিন যেমন করে বুঝেছিলেন, তাও অল্প মুসলমানই জানেন। অথচ এইরকম গভীর ভাবে জানার ভিতরেই পরস্পরের ভেদ ঘোচে।

কিছুকাল থেকে আমরা কাগজে পড়ে আসছি, পঞ্জাবে অকালি শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি প্রবল ধর্ম-আন্দোলন জেগে উঠেছে, যার প্রবর্তনায় তারা দলে দলে নির্ভয়ে বধবন্ধনকে স্বীকার করেছে। কিন্তু অন্য শিখদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য কোথায়, কোন্‌খানে তারা এত প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে, ও কোন্ সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তারা সেই আঘাতের সঙ্গে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছে সে সম্বন্ধে আমাদের দরদের কথা দূরে থাক্, আমাদের জিজ্ঞাসাবৃত্তি পর্যন্ত জাগে নি। অথচ কেবলমাত্র কথার জোরে এদের নিয়ে রাষ্ট্রীয় ঐক্যতন্ত্র সৃষ্টি করব বলে কল্পনা করতে কোথাও আমাদের বাধে না। দাক্ষিণাত্যে যখন মোপ্‌লা-দৌরাত্ম্য নিষ্ঠুর হয়ে দেখা দিল তখন সে সম্বন্ধে বাংলাদেশে আমরা সে পরিমাণেও বিচলিত হই নি যতটা হলে তাদের ধর্ম সমাজ ও আর্থিক কারণ-ঘটিত তথ্য জানবার জন্য আমাদের জ্ঞানগত উত্তেজনা জন্মাতে পারে। অথচ এই মালাবারের হিন্দু ও মোপ্‌লাদের নিয়ে মহাজাতিক ঐক্য স্থাপন করা সম্বন্ধে অন্তত বাক্যগত সংকল্প আমরা সর্বদাই প্রকাশ করে থাকি।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের বন্ধনই বন্ধন। এ কথা সকল দিকেই খাটে। যাকে জানি নে তার সম্বন্ধেই আমরা যথার্থ বিচ্ছিন্ন। কোনো বিশেষ দিনে তাকে গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন করতে পারি, কেননা সেটা বাহ্য: তাকে বন্ধু সম্ভাষণ করে অশ্রুপাত করতে পারি, কেননা সেটাও বাহ্য; কিন্তু 'উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজদ্বারে শ্মশানে চ' আমরা সহজ প্রীতির অনিবার্য আকর্ষণে তাদের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করতে পারি নে। কারণ যাদের আমরা নিবিড়-ভাবে জানি তারাই আমাদের জ্ঞাতি। ভারতবর্ষের লোক পরস্পরের সম্বন্ধে যখন মহাজ্ঞাতি হবে তখনই তারা মহাজাতি হতে পারবে।

সেই জানবার সোপান তৈরি করার দ্বারা মেলবার শিখরে পৌঁছবার সাধনা আমরা গ্রহণ করেছি। একদা যেদিন সুহৃদ্‌বর বিধুশেখর শাস্ত্রী ভারতের সর্ব সম্প্রদায়ের বিদ্যাগুলিকে ভারতের বিদ্যাক্ষেত্রে একত্র করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন আমি অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করেছিলেম। তার কারণ, শাস্ত্রীমশায় প্রাচীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের শিক্ষাধারার পথেই বিদ্যালাভ করেছিলেন। হিন্দুদের সনাতন শাস্ত্রীয় বিদ্যার বাহিরে যেসকল বিদ্যা আছে তাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে পারলে তবেই যে আমাদের শিক্ষা উদারভাবে সার্থক হতে পারে, তাঁর মুখে এ কথার সত্য বিশেষভাবে বল পেয়ে আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। আমি অনুভব করেছিলেম, এই ঔদার্য, বিদ্যার ক্ষেত্রে সকল জাতির প্রতি এই সসম্মান আতিথ্য, এইটিই হচ্ছে যথার্থ ভারতীয়। সেই কারণেই ভারতবর্ষ পুরাকালে যখন গ্রীক-রোমকদের কাছ থেকে জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তখন ম্লেচ্ছগুরুদের ঋষিকল্প বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। আজ যদি এ সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র কৃপণতা ঘটে থাকে তবে জানতে হবে, আমাদের মধ্যে সেই বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাবের বিকৃতি ঘটেছে।

এ দেশের নানা জাতির পরিচয়ের উপর ভারতের যে আত্মপরিচয় নির্ভর করে,

এখানে কোনো-এক জায়গায় তার তো সাধনা থাকা দরকার। শান্তিনিকেতনে সেই সাধনার প্রতিষ্ঠা ধ্রুব হোক, এই ভাবনাটি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে বিরাজ করছে। কিন্তু আমার সাধ্য কী। সাধ্য থাকলেও এ যদি আমার একলারই সৃষ্টি হয় তা হলে এর সার্থকতা কী। যে দীপ পথিকের প্রত্যাশায় বাতায়নে অপেক্ষা করে থাকে সেই দীপটুকু জ্বেলে রেখে দিয়ে আমি বিদায় নেব, এইটুকুমাত্রই আমার ভরসা ছিল।

তার পরে অসংখ্য অভাব দৈন্য বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়ে দুর্গম পথে একে বহন করে এসেছি। এর অন্তর্নিহিত সত্য ক্রমে আপনার আবরণ মোচন করতে করতে আজ আমাদের সামনে অনেকটা পরিমাণে সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে। আমাদের আনন্দের দিন এল। আজ আপনারা এই-যে সমবেত হয়েছেন, এ আমাদের কত বড়ো সৌভাগ্য। এর সদস্য, যাঁরা নানা কর্মে ব্যাপৃত, এর সঙ্গে তাঁদের যোগ ক্রমে ক্রমে যে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, এ আমাদের কত বড়ো সৌভাগ্য।

এই কর্মানুষ্ঠানটিকে বহুকাল একলা বহন করার পর যেদিন সকলের হাতে সমর্পণ করলুম সেদিন মনে এই দ্বিধা এসেছিল যে, সকলে একে শ্রদ্ধা করে গ্রহণ করবেন কি না। অন্তরায় অনেক ছিল, এখনও আছে। তবুও সংশয় ও সংকোচ থাকা সত্ত্বেও একে সম্পূর্ণভাবেই সকলের কাছে নিবেদন করে দিয়েছি। কেউ যেন না মনে করেন, এটা একজন লোকের কীর্তি, এবং তিনি এটাকে নিজের সঙ্গেই একান্ত করে জড়িয়ে রেখেছেন। যাকে এত দীর্ঘকাল এত করে পালন করে এসেছি তাকে যদি সাধারণের কাছে শ্রদ্ধেয় করে থাকি সে আমার সবচেয়ে বড়ো সৌভাগ্য। সেদিন আজ এসেছে বলি নে, কিন্তু সে দিনের সূচনাও কি হয় নি? যেমন সেই প্রথম দিনে আজকের দিনের সম্ভাবনা কল্পনা করতে সাহস পাই নি, অথচ এই ভবিষ্যৎকে গোপনে সে বহন করেছিল, তেমনি ভারতবর্ষের দূর ইতিহাসে এই বিশ্বভারতীর যে পূর্ণ অভিব্যক্তি হবে তা প্রত্যয় করব না কেন। সেই প্রত্যয়ের দ্বারাই এর প্রকাশ বল পেয়ে ধ্রুব হয়ে ওঠে, এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এর প্রমাণ আরম্ভ হয়েছে যখন দেখতে পাচ্ছি আপনারা এর ভার গ্রহণ করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে এটা বড়ো কথা, আবার আমার দিক থেকেও এ তো কম কথা নয়। কোনো একজন মানুষের পক্ষে এর ভার দুঃসহ। এই ভারকে বহন করবার অনুকূলে আমার আন্তরিক প্রত্যয় ও প্রত্যাশার আনন্দ যদিও আমাকে বল দিয়েছে, তবু আমার শক্তির দৈন্য কোনোদিনই ভুলতে অবকাশ পাই নি। কত অভাব কত অসামর্থ্যের দ্বারা এত কাল প্রত্যহ পীড়িত হয়ে এসেছি, বাইরের অকারণ প্রতিকূলতা একে কত দিক থেকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তবু এর সমস্ত ত্রুটি অসম্পূর্ণতা, এর সমস্ত দারিদ্র্য সত্ত্বেও আপনারা একে শ্রদ্ধা করে পালন করবার ভার নিয়েছেন, এতে আমাকে যে কত দয়া করেছেন তা আমিই জানি। সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে আজ আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

এই প্রতিষ্ঠানের বাহ্যায়তনটিকে সুচিন্তিত বিধি-বিধান দ্বারা সুসম্বদ্ধ করবার ভার আপনারা নিয়েছেন। এই নিয়ম-সংঘটনের কাজ আমি যে সম্পূর্ণ বুঝি তা বলতে পারি নে, শরীরের দুর্বলতা-বশত সব সময়ে এতে আমি যথেষ্ট মন দিতেও অক্ষম হয়েছি। কিন্তু নিশ্চিত জানি, এই অঙ্গবন্ধনের প্রয়োজন আছে। জলের পক্ষে জলাশয়ের উপযোগিতা কে অস্বীকার করবে। সেইসঙ্গে এ কথাও মনে রাখা চাই যে, চিত্ত দেহে বাস করে বটে কিন্তু দেহকে অতিক্রম করে। দেহ বিশেষ সীমায় বদ্ধ, কিন্তু চিত্তের বিচরণক্ষেত্র সমস্ত বিশ্বে। দেহব্যবস্থা অতিজটিলতার দ্বারা

চিত্তব্যাপ্তির বাধা যাতে না ঘটায় এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানের কায়ারূপটির পরিচয় সম্প্রতি আমার কাছে সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু এর চিত্তরূপটির প্রসার আমি বিশেষ করেই দেখেছি। তার কারণ, আমি আশ্রমের বাইরে দূরে দূরে বারবার ভ্রমণ করে থাকি। কতবার মনে হয়েছে, যাঁরা এই বিশ্বভারতীর যজ্ঞকর্তা তাঁরা যদি আমার সঙ্গে এসে বাইরের জগতে এর পরিচয় পেতেন তা হলে জানতে পারতেন কোন্ বৃহৎ ভূমির উপরে এর আশ্রয়। তা হলে বিশেষ দেশকাল ও বিধি-বিধানের অতীত এর মুক্তরূপটি দেখতে পেতেন। বিদেশের লোকের কাছে ভারতের সেই প্রকাশ সেই পরিচয়ের প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধা দেখেছি যা ভারতের ভূ-সীমানার মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না, যা আলোর মতো দীপকে ছাড়িয়ে যায়। এর থেকে এই বুঝেছি, ভারতের এমন কিছু সম্পদ আছে যার প্রতি দাবি সমস্ত বিশ্বের। জাত্যভিমানের প্রবল উগ্রতা মন থেকে নিরস্ত করে নম্রভাবে সেই দাবি পূরণ করবার দায়িত্ব আমাদের। যে ভারত সকল কালের সকল লোকের, সেই ভারতে সকল কাল ও সকল লোককে নিমন্ত্রণ করবার ভার বিশ্বভারতীর।

কিছুদিন হল যখন দক্ষিণ-আমেরিকায় গিয়ে রুগ্নকক্ষে বদ্ধ ছিলাম তখন প্রায় প্রত্যহ আগন্তুকের দল প্রশ্ন নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের সকল প্রশ্নের ভিতরকার কথাটা এই যে, পৃথিবীকে দেবার মতো কোন্ ঐশ্বর্য ভারতবর্ষের আছে। ভারতের ঐশ্বর্য বলতে এই বুঝি, যা-কিছু তার নিজের লোকের বিশেষ ব্যবহারে নিঃশেষ করবার নয়। যা নিয়ে ভারত দানের অধিকার আতিথ্যের অধিকার পায়: যার জোরে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সে নিজের আসন গ্রহণ করতে পারে; অর্থাৎ যাতে তার অভাবের পরিচয় নয়, তার পূর্ণতারই পরিচয়— তাই তার সম্পদ। প্রত্যেক বড়ো জাতির নিজের বৈষয়িক ব্যাপার একটা আছে, সেটাতে বিশেষভাবে তার আপন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। তার সৈন্যসামন্ত-অর্থসামর্থ্যে আর কারও ভাগ চলে না। সেখানে দানের দ্বারা তার ক্ষতি হয়। ইতিহাসে ফিনিসীয় প্রভৃতি এমনসকল ধনী জাতির কথা শোনা যায় যারা অর্থ-অর্জনেই নিরন্তর নিযুক্ত ছিল। তারা কিছুই দিয়ে যায় নি, রেখে যায় নি; তাদের অর্থ যতই থাক্, তাদের ঐশ্বর্য ছিল না। ইতিহাসের জীর্ণ পাতার মধ্যে তারা আছে, মানুষের চিত্তের মধ্যে নেই। ইজিপ্ট গ্রীস রোম প্যালেস্টাইন চীন প্রভৃতি দেশ শুধু নিজের ভোজ্য নয় সমস্ত পৃথিবীর ভোগ্য সামগ্রী উৎপন্ন করেছে। বিশ্বের তৃপ্তিতে তারা গৌরবান্বিত। সেই কারণে সমস্ত পৃথিবীর প্রশ্ন এই, ভারতবর্ষ শুধু নিজেকে নয়, পৃথিবীকে কী দিয়েছে। আমি আমার সাধ্যমতো কিছু বলবার চেষ্টা করেছি এবং দেখেছি, তাতে তাদের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেছে। তাই আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, আজ ভারতবর্ষের কেবল যে ভিক্ষার ঝুলিই সম্বল তা নয়, তার প্রাঙ্গণে এমন একটি বিশ্বযজ্ঞের স্থান আছে যেখানে অক্ষয় আত্মদানের জন্য সকলকে সে আহ্বান করতে পারে।

সকলের জন্য ভারতের যে বাণী তাকেই আমরা বলি বিশ্বভারতী। সেই বাণীর প্রকাশ আমাদের বিদ্যালয়টুকুর মধ্যে নয়। শিব আসেন দরিদ্র ভিক্ষুকের মূর্তি ধরে, কিন্তু একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে সকল ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে। বিশ্বভারতী এই আশ্রমে দীন ছদ্মবেশে এসেছিল ছোটো বিদ্যালয়-রূপে। সেই তার লীলার আরম্ভ, কিন্তু সেখানেই তার চরম সত্য নয়। সেখানে সে ছিল ভিক্ষুক, মুষ্টিভিক্ষা আহরণ করছিল। আজ সে দানের ভাণ্ডার খুলতে উদ্যত। সেই ভাণ্ডার ভারতের।

বিশ্বপৃথিবী আজ অঙ্গনে দাঁড়িয়ে বলছে, 'আমি এসেছি।' তাকে যদি বলি, 'আমাদের নিজের দায়ে ব্যস্ত আছি, তোমাকে দেবার কথা ভাবতে পারি নে'—তার মতো লজ্জা কিছুই নেই। কেননা দিতে না পারলেই হারাতে হয়।

এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, বর্তমান যুগে সমস্ত পৃথিবীর উপরে য়ুরোপ আপন প্রভাব বিস্তার করেছে। তার কারণ আকস্মিক নয়, বাহ্যিক নয়। তার কারণ, যে বর্বরতা আপন প্রয়োজনটুকুর উপরেই সমস্ত মন দেয়, সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে, য়ুরোপ তাকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে। সে এমন কোনো সত্যের নাগাল পেয়েছে যা সর্বকালীন সর্বজনীন, যা তার সমস্ত প্রয়োজনকে পরিপূর্ণ করে অক্ষয়ভাবে উদ্‌বৃত্ত থাকে। এই হচ্ছে তার বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানকে প্রকাশের দ্বারাই পৃথিবীতে সে আপনার অধিকার পেয়েছে। যদি কোনো কারণে য়ুরোপের দৈহিক বিনাশও ঘটে তবু এই সত্যের মূল্যে মানুষের ইতিহাসে তার স্থান কোনোদিন বিলুপ্ত হতে পারবে না। মানুষকে চিরদিনের মতো সে সম্পদশালী করে দিয়েছে, এই তার সকলের চেয়ে বড়ো গৌরব, এই তার অমরতা। অথচ এই য়ুরোপ যেখানে আপনার লোভকে সমস্ত মানুষের কল্যাণের চেয়ে বড়ো করেছে সেখানেই তার অভাব প্রকাশ পায়, সেখানেই তার খর্বতা, তার বর্বরতা। তার একমাত্র কারণ এই যে, বিচ্ছিন্নভাবে কেবল আপনটুকুর মধ্যে মানুষের সত্য নেই—পশুধর্মেই সেই বিচ্ছিন্নতা; বিনাশশীল দৈহিক প্রাণ ছাড়া যে পশুর আর কোনো প্রাণ নেই। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা আপনার জীবনে সেই অনির্বাণ আলোককেই জ্বালেন, যার দ্বারা মানুষ নিজেকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারে।

পশ্চিম-মহাদেশ তার পলিটিক্সের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে পর করে দিয়েছে, তার বিজ্ঞানের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ করেছে। বৃহৎকালের মধ্যে ইতিহাসের উদার রূপ যদি আমরা দেখতে পাই তা হলে দেখব, আত্মম্ভরি পলিটিক্সের দিকে য়ুরোপের আত্মাবমাননা, সেখানে তার অন্ধকার; বিজ্ঞানের দিকেই তার আলোক জ্বলেছে, সেখানেই তার যথার্থ আত্মপ্রকাশ; কেননা বিজ্ঞান সত্য, আর সত্যই অমরতা দান করে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানেই য়ুরোপকে সার্থকতা দিয়েছে, কেননা বিজ্ঞান বিশ্বকে প্রকাশ করে; আর তার সর্বভুক্‌ ক্ষুধিত পলিটিক্স তার বিনাশকেই সৃষ্টি করছে, কেননা পলিটিক্সের শোণিতরক্ত-উত্তেজনায় সে নিজেকে ছাড়া আর সমস্তকেই অস্পষ্ট ও ছোটো করে দেখে; সুতরাং সত্যকে খণ্ডিত করার দ্বারা অশান্তির চক্রবাত্যায় আত্মহত্যাকে আবর্তিত করে তোলে।

আমরা অত্যন্ত ভুল করব যদি মনে করি, সীমাবিহীন অহমিকা দ্বারা, জাত্যভিমানে আবিল ভেদবুদ্ধি দ্বারাই য়ুরোপ বড়ো হয়েছে। এমন অসম্ভব কথা আর হতে পারে না। বস্তুত সত্যের জোরেই তার জয়যাত্রা, রিপুর আকর্ষণেই তার অধঃপতন—যে রিপুর প্রবর্তনায় আমরা আপনাকে সব দিতে চাই, বাহিরকে বঞ্চিত করি।

এখন নিজের প্রতি আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো প্রশ্ন এই যে, আমাদের কি দেবার জিনিস কিছু নেই? আমরা কি আকিঞ্চন্যের সেই চরম বর্বরতায় এসে ঠেকেছি যার কেবল অভাবই আছে ঐশ্বর্য নেই? বিশ্বসংসার আমাদের দ্বারে এসে অভুক্ত হয়ে ফিরলে কি আমাদের কোনো কল্যাণ হতে পারে? দুর্ভিক্ষের অন্ন আমাদের উৎপাদন করতে হবে না, এমন কথা আমি কখনোই বলি নে, কিন্তু ভাণ্ডারে যদি আমাদের অমৃত থাকে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আমরা বাঁচতে পারব?

এই প্রশ্নের উত্তর যিনিই যেমন দিন না, আমাদের মনে যে উত্তর এসেছে বিশ্বভারতীর কাজের ভিতর তারই পূর্ণ অভিব্যক্তি হতে থাক্, এই আমাদের সাধনা। বিশ্বভারতী এই বেদমন্ত্রের দ্বারাই আপন পরিচয় দিতে চায়—'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।' যে আত্মীয়তা বিশ্বে বিস্তৃত হবার যোগ্য সেই আত্মীয়তার আসন এখানে আমরা পাতব। সেই আসনে জীর্ণতা নেই, মলিনতা নেই, সংকীর্ণতা নেই।

এই আসনে আমরা সবাইকে বসাতে চেয়েছি; সে কাজ কি এখন আরম্ভ হয় নি? অন্য দেশ থেকে যেসকল মনীষী এখানে এসে পৌঁচেছেন, আমরা নিশ্চয় জানি, তাঁরা হৃদয়ের ভিতরে আহ্বান অনুভব করেছেন। আমার সুহৃদ্‌বর্গ, যাঁরা এই আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, তাঁরা সকলেই জানেন, আমাদের দূরদেশের অতিথিরা এখানে ভারতবর্ষেরই আতিথ্য পেয়েছেন, পেয়ে গভীর তৃপ্তিলাভ করেছেন। এখান থেকে আমরা যে-কিছু পরিবেশন করছি তার প্রমাণ সেই অতিথিদের কাছেই। তাঁরা আমাদের অভিনন্দন করেছেন। আমাদের দেশের পক্ষ থেকে তাঁরা আত্মীয়তা পেয়েছেন, তাঁদের পক্ষ থেকেও আত্মীয়তার সম্বন্ধ সত্য হয়েছে।

আমি তাই বলছি, কাজ আরম্ভ হয়েছে। বিশ্বভারতীর যে সত্য তা ক্রমশ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। এখানে আমরা ছাত্রদের কোন্ বিষয় পড়াচ্ছি, পড়ানো সকলের মনের মতো হচ্ছে কি না, সাধারণ কলেজের আদর্শে উচ্চশিক্ষা-বিভাগ খোলা হয়েছে বা জ্ঞানানুসন্ধান-বিভাগে কিছু কাজ হচ্ছে, এ সমস্তকেই যেন আমরা আমাদের ধ্রুব পরিচয়ের জিনিস বলে না মনে করি। এসমস্ত আজ আছে কাল না থাকতেও পারে। আশঙ্কা হয় পাছে যা ছোটো তাই বড়ো হয়ে ওঠে, পাছে একদিন আগাছাই ধানের খেতকে চাপা দেয়। বনস্পতির শাখায় কোনো বিশেষ পাখি বাসা বাঁধতে পারে, কিন্তু সেই বিশেষ পাখির বাসাই বনস্পতির একান্ত বিশেষণ নয়। নিজের মধ্যে বনস্পতি সমস্ত অরণ্যপ্রকৃতির যে সত্যপরিচয় দেয় সেইটেই তার বড়ো লক্ষণ।

পূর্বেই বলেছি, ভারতের যে প্রকাশ বিশ্বের শ্রদ্ধেয় সেই প্রকাশের দ্বারা বিশ্বকে অভ্যর্থনা করব, এই হচ্ছে আমাদের সাধনা। বিশ্বভারতীর এই কাজে পশ্চিম-মহাদেশে আমি কী অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সে কথা বলতে আমি কুণ্ঠিত হই। দেশের লোকে অনেকে হয়তো সেটা শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করবেন না, এমনকি পরিহাস-রসিকেরা বিদ্রূপও করতে পারেন। কিন্তু সেটাও কঠিন কথা নয়। আসলে ভাবনার কথাটা হচ্ছে এই যে, বিদেশে আমাদের দেশ যে শ্রদ্ধা লাভ করে, পাছে সেটাকে কেবলমাত্র অহংকারের সমগ্রী করে তোলা হয়। সেটা আনন্দের বিষয়, সেটা অহংকারের বিষয় নয়। যখন অহংকার করি তখন বাইরের লোকদের আরও বাইরে ফেলি, যখন আনন্দ করি তখনই তাদের নিকটের বলে জানি। বারম্বার এটা দেখেছি, বিদেশের যেসব মহদাশয় লোক আমাদের ভালোবেসেছেন, আমাদের অনেকে তাঁদের বিষয়সম্পত্তির মতো গণ্য করেছেন। তাঁরা আমাদের জাতিকে যে আদর করতে পেরেছেন সেটুকু আমরা ষোলো আনা গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমাদের তরফে তার দায়িত্ব স্বীকার করি নি। তাঁদের ব্যবহারে তাঁদের জাতির যে গৌরব প্রকাশ হয় সেটা স্বীকার করতে অক্ষম হয়ে আমরা নিজের গভীর দৈন্যের প্রমাণ দিয়েছি। তাঁদের প্রশংসাবাক্যে আমরা নিজেদের মহৎ বলে স্পর্ধিত হয়ে উঠি; এই শিক্ষাটুকু একেবারেই ভুলে যাই যে, পরের মধ্যে যেখানে শ্রেষ্ঠতা আছে সেটাকে

অকুণ্ঠিত আনন্দে স্বীকার করা ও প্রকাশ করার মধ্যে মহত্ত্ব আছে। আমাকে এইটেতেই সকলের চেয়ে নম্র করেছে যে, ভারতের যে পরিচয় অন্য দেশে আমি বহন করে নিয়ে গেছি কোথাও তা অবমানিত হয় নি। আমাকে যাঁরা সম্মান করেছেন তাঁরা আমাকে উপলক্ষ করে ভারতবর্ষকেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। যখন আমি পৃথিবীতে না থাকব তখনও যেন তার ক্ষয় না ঘটে, কেননা এ সম্মান ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত নয়। বিশ্বভারতীকে গ্রহণ করে ভারতের অমৃতরূপকে প্রকাশের ভার আপনারা গ্রহণ করেছেন। আপনাদের চেষ্টা সার্থক হোক, অতিথিশালা দিনে দিনে পূর্ণ হয়ে উঠুক, অভ্যাগতরা সম্মান পান, আনন্দ পান, হৃদয় দান করুন, হৃদয় গ্রহণ করুন, সত্যের ও প্রীতির আদানপ্রদানের দ্বারা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতের যোগ গভীর ও দূরপ্রসারিত হোক, এই আমার কামনা।

শান্তিনিকেতন
৯ পৌষ ১৩৩২

১৩

বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে যখন ছিলাম, সেখানে এক সন্ন্যাসিনী আমাকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি কুটিরনির্মাণের জন্য আমার কাছে ভূমি ভিক্ষা নিয়েছিলেন— সেই ভূমি থেকে যে ফসল উৎপন্ন হত তাই দিয়ে তাঁর আহার চলত, এবং দুই-চারিটি অনাথ শিশুদের পালন করতেন। তাঁর মাতা ছিলেন সংসারে— তাঁর মাতার অবস্থাও ছিল সচ্ছল— কন্যাকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্যে তিনি অনেক চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কন্যা সম্মত হন নি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, নিজের ঘরের অন্নে আত্মাভিমান জন্মে— মন থেকে এই ভ্রম কিছুতে ঘুচতে চায় না যে, এই অন্নের মালেক আমিই, আমাকে আমিই খাওয়াচ্ছি। কিন্তু দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে যে অন্ন পাই সে অন্ন ভগবানের— তিনি সকল মানুষের হাত দিয়ে সেই অন্ন আমাকে দেন, তার উপরে আমার নিজের দাবি নেই, তাঁর দয়ার উপর ভরসা।

বাংলাদেশকে বাংলা ভাষার ভিতর চিরজীবন আমি সেবা করেছি, আমার পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সের মধ্যে অন্তত পঞ্চান্ন বৎসর আমি সাহিত্যের সাধনা করে সরস্বতীর কাছ থেকে যা-কিছু বর লাভ করেছি সমস্তই বাংলাদেশের ভাণ্ডারে জমা করে দিয়েছি। এইজন্য বাংলাদেশের কাছ থেকে আমি যতটুকু স্নেহ ও সম্মান লাভ করেছি তার উপরে আমার নিজের দাবি আছে— বাংলাদেশ যদি কৃপণতা করে, যদি আমাকে আমার প্রাপ্য না দেয়, তা হলে অভিমান করে আমি বলতে পারি যে, আমার কাছে বাংলাদেশ ঋণী রয়ে গেল।

কিন্তু বাংলার বাইরে বা বিদেশে যে সমাদর, যে প্রীতি লাভ করি তার উপরে আমার আত্মাভিমানের দাবি নেই। এইজন্য এই দানকেই ভগবানের দান বলে আমি গ্রহণ করি। তিনি আমাকে দয়া করেন, নতুবা অপরেরা আমাকে দয়া করেন এমন কোনো হেতু নেই।

ভগবানের এই দানে মন নম্র হয়, এতে অহংকার জন্মে না। আমরা নিজের পকেটের চার-আনার পয়সা নিয়েও গর্ব করতে পারি, কিন্তু ভগবান আকাশ ভরে যে সোনার আলো ঢেলে দিয়েছেন, কোনো কালেই যার মূল্য শোধ করতে পারব

না, সেই আলোর অধিকার নিয়ে কেবল আনন্দই করতে পারি, কিন্তু গর্ব করতে পারি নে। পরের দত্ত সমাদরও সেইরকম অমূল্য— সেই দান আমি নম্রশিরেই গ্রহণ করি, উদ্ধতশিরে নয়। এই সমাদরে আমি বাংলাদেশের সন্তান বলে উপলব্ধি করবার সুযোগ লাভ করি নি। বাংলাদেশের ছোটো ঘরে আমার গর্ব করবার স্থান ছিল, কিন্তু ভারতের বড়ো ঘরে আমার আনন্দ করবার স্থান।

আমার প্রভু আমাকে তাঁর দেউড়িতে কেবলমাত্র বাঁশি বাজাবার ভার দেন নি— শুধু কবিতার মালা গাঁথিয়ে তিনি আমাকে ছুটি দিলেন না। আমার যৌবন যখন পার হয়ে গেল, আমার চুল যখন পাকল, তখন তাঁর অঙ্গনে আমার তলব পড়ল। সেখানে তিনি শিশুদের মা হয়ে বসে আছেন। তিনি আমাকে হেসে বললেন, 'ওরে পুত্র, এতদিন তুই তো কোনো কাজেই লাগলি নে, কেবল কথাই গেঁথে বেড়ালি। বয়স গেল, এখন যে কয়টা দিন বাকি আছে, এই শিশুদের সেবা কর্।'

কাজ শুরু করে দিলুম— সেই আমার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের কাজ। কয়েক জন বাঙালির ছেলেকে নিয়ে মাস্টারি শুরু করে দিলুম। মনে অহংকার হল, এ আমার কাজ, এ আমার সৃষ্টি। মনে হল, আমি বাংলাদেশের হিতসাধন করছি, এ আমারই শক্তি।

কিন্তু এ যে প্রভুরই আদেশ— যে প্রভু কেবল বাংলাদেশের নন— সেই কথা যাঁর কাজ তিনিই স্মরণ করিয়ে দিলেন। সমুদ্রপার হতে এলেন বন্ধু এন্ড্রুজ, এলেন বন্ধু পিয়ার্সন। আপন লোকের বন্ধুত্বের উপর দাবি আছে, সে বন্ধুত্ব আপন লোকেরই সেবায় লাগে। কিন্তু যাঁদের সঙ্গে নাড়ীর সম্বন্ধ নেই, যাঁদের ভাষা স্বতন্ত্র, ব্যবহার স্বতন্ত্র, তাঁরা যখন অনাহূত আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন তখনই আমার অহংকার ঘুচে গেল, আমার আনন্দ জন্মাল। যখন ভগবান পরকে আপন করে দেন, তখন সেই আত্মীয়তার মধ্যে তাঁকেই আত্মীয় বলে জানতে পারি।

আমার মনে গর্ব জন্মেছিল যে, আমি স্বদেশের জন্য অনেক করছি— আমার অর্থ, আমার সামর্থ্য আমি স্বদেশকে উৎসর্গ করছি। আমার সেই গর্ব চূর্ণ হয়ে গেল যখন বিদেশী এলেন এই কাজে। তখনই বুঝলুম, এও আমার কাজ নয়, এ তাঁরই কাজ, যিনি সকল মানুষের ভগবান। এই-যে বিদেশী বন্ধুদের অযাচিত পাঠিয়ে দিলেন, এঁরা আত্মীয়স্বজনদের হতে বহু দূরে পৃথিবীর প্রান্তে ভারতের প্রান্তে এক খ্যাতিহীন প্রান্তরের মাঝখানে নিজেদের সমস্ত জীবন ঢেলে দিলেন; একদিনের জন্যও ভাবলেন না, যাদের জন্য তাঁদের আত্মোৎসর্গ তারা বিদেশী, তারা পূর্বদেশী, তারা শিশু, তাঁদের ঋণ শোধ করবার মতো অর্থ তাদের নেই, শক্তি তাদের নেই, মান তাদের নেই। তাঁরা নিজে পরম পণ্ডিত, কত সম্মানের পদ তাঁদের জন্য পথ চেয়ে আছে, কত উর্ধ্ব বেতন তাঁদের আহ্বান করছে, সমস্ত তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন— অকিঞ্চনভাবে, স্বদেশীর সম্মান ও স্নেহ হতে বঞ্চিত হয়ে, রাজপুরুষদের সন্দেহ দ্বারা অনুধাবিত হয়ে, গ্রীষ্ম এবং রোগের তাপে তাপিত হয়ে তাঁরা কাজে প্রবৃত্ত হলেন। এ কাজের বেতন তাঁরা নিলেন না, দুঃখই নিলেন। তাঁরা আপনাকে বড়ো করলেন না, প্রভুর আদেশকে বড়ো করলেন, প্রেমকে বড়ো করলেন, কাজকে বড়ো করে তুললেন।

এই তো আমার 'পরে ভগবানের দয়া— তিনি আমার গর্বকে ছোটো করে দিতেই আমার সাধনা বড়ো করে দিলেন। এখন এই সাধনা কি ছোটো বাংলাদেশের সীমার মধ্যে আর ধরে। বাংলার বাহির থেকে ছেলেরা আসতে লাগল। আমি তাদের ডাক দিই নি, ডাকলেও আমার ডাক এত দূরে পৌঁছত না। যিনি

সমুদ্রপার থেকে নিজের কণ্ঠে তাঁর সেবকদের ডেকেছেন তিনিই স্বহস্তে তাঁর সেবা-ক্ষেত্রের সীমানা মিটিয়ে দিতে লাগলেন।

আজ আমাদের আশ্রমে প্রায় ত্রিশ জন গুজরাটের ছেলে এসে বসেছে। সেই ছেলেদের অভিভাবকেরা আমার আশ্রমের পরম হিতৈষী। তাঁরা আমাদের সর্বপ্রকারে যত আনুকূল্য করেছেন, এমন আনুকূল্য ভারতের আর কোথাও পাই নি। অনেক দিন আমি বাঙালির ছেলেকে এই আশ্রমে মানুষ করেছি— কিন্তু বাংলাদেশে আমার সহায় নেই। সেও আমার বিধাতার দয়া। যেখানে দাবি বেশি সেখান থেকে যা পাওয়া যায় সে তো খাজনা পাওয়া। যে খাজনা পায় সে যদি-বা রাজাও হয় তবু সে হতভাগ্য, কেননা সে তার নিচের লোকের কাছ থেকেই ভিক্ষা পায়; যে দান পায় সে উপর থেকে পায়, সে প্রেমের দান, জবরদস্তির আদায়-ওয়াশিল নয়। বাংলাদেশের বাহির থেকে আমার আশ্রম যে আনুকূল্য পেয়েছে, সেই তো আশীর্বাদ—সে পবিত্র। সেই আনুকূল্যে এই আশ্রম সমস্ত বিশ্বের সামগ্রী হয়েছে।

আজ তাই আত্মাভিমান বিসর্জন করে বাংলাদেশাভিমান বর্জন করে বাইরে আশ্রমজননীর জন্য ভিক্ষা করতে বাহির হয়েছি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। সেই শ্রদ্ধার দানের দ্বারা আশ্রমকে সকলে গ্রহণ করবেন, সকলের সামগ্রী করবেন, তাকে বিশ্বলোকে উত্তীর্ণ করবেন। এই বিশ্বলোকেই অমৃতলোক। যা-কিছু আমাদের অভিমানের গণ্ডির, আমাদের স্বার্থের গণ্ডির মধ্যে থাকে তাই মৃত্যুর অধিকারবর্তী। যা সকল মানুষের তাই সকল কালের। সকলের ভিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের আশ্রমের উপরে বিধাতার অমৃত বর্ষিত হোক, সেই অমৃত-অভিষেকে আমরা, তাঁর সেবকেরা, পবিত্র হই, আমাদের অহংকার ধৌত হোক, আমাদের শক্তি প্রবল ও নির্মল হোক—এই কামনা মনে নিয়ে সকলের কাছে এসেছি; সকলের মধ্য দিয়ে বিধাতা আমাদের উপর প্রসন্ন হোন, আমাদের বাক্য মন ও চেষ্টাকে তাঁর কল্যাণসৃষ্টির মধ্যে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করুন।

প্র জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

১৪

বহুকাল আগে নদীতীরের সাহিত্যচর্চা থেকে জানি নে কী আহ্বানে এই প্রান্তরে এসেছিলেম। তার পর ত্রিশ বৎসর অতীত হয়ে গেল। আয়ুর প্রতি আর অধিক দাবি আছে বলে মনে করি নে। হয়তো আগামী কালে আর কিছু বলবার অবকাশ পাব না। অন্তরের কথা আজ তাই বলবার ইচ্ছা করি।

উদ্যোগের যখন আরম্ভ হয়, কেন হয় তা বলা যায় না। বীজ থেকে গাছ কেন হয় কে জানে। দুয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। প্রাণের ভিতর যখন আহ্বান আসে তখন তার চরম অর্থ কেউ জানে না। দুঃসময়ে এখানে এসেছি, দুঃখের মধ্যে দৈন্যের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুশোক বহন করে দীর্ঘকাল চলেছি—কেন তা ভেবে পাই নে। ভালো করে বলতে পারি নে কিসের টানে এই শূন্য প্রান্তরের মধ্যে এসেছিলেম।

মানুষ আপনাকে বিশুদ্ধভাবে আবিষ্কার করে এমন কর্মের যোগে যার সঙ্গে

সাংসারিক দেনাপাওনার হিসাব নেই। নিজেকে নিজের বাইরে উৎসর্গ করে দিয়ে তবে আমরা আপনাকে পাই। বোধ করি সেই ইচ্ছেই ছিল, তাই সেদিন সহসা আমার প্রকৃতিগত চিরাভ্যস্ত রচনাকার্য থেকে অনেক পরিমাণে ছুটি নিয়েছিলুম।

সেদিন আমার সংকল্প ছিল, বালকদের এমন শিক্ষা দেব যা শুধু পুঁথির শিক্ষা নয়; প্রান্তরযুক্ত অবারিত আকাশের মধ্যে যে মুক্তির আনন্দ তারই সঙ্গে মিলিয়ে যতটা পারি তাদের মানুষ করে তুলব। শিক্ষা দেবার উপকরণ যে আমি সঞ্চয় করেছিলেম তা নয়। সাধারণ শিক্ষা আমি পাই নি, তাতে আমি অভিজ্ঞ ছিলুম না। আমার আনন্দ ছিল প্রকৃতির অন্তরলোকে, গাছপালা আকাশ আলোর সহযোগে। শিশু বয়স থেকে এই আমার সত্যপরিচয়। এই আনন্দ আমি পেয়েছিলুম বলে দিতেও ইচ্ছে ছিল। ইস্কুলে আমরা ছেলেদের এই আনন্দ-উৎস থেকে নির্বাসিত করেছি। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে শিক্ষক বহুধাশক্তিযোগাৎ রূপরসগন্ধবর্ণের প্রবাহে মানুষের জীবনকে সরস ফলবান করে তুলছেন তার থেকে ছিন্ন করে ইস্কুলমাস্টার বেতের ডগায় বিরস শিক্ষা শিশুদের গিলিয়ে দিতে চায়। আমি স্থির করলেম, শিশুদের শিক্ষার মধ্যে প্রাণরস বহানো চাই; কেবল আমাদের স্নেহ থেকে নয়, প্রকৃতির সৌন্দর্যভাণ্ডার থেকে প্রাণের ঐশ্বর্য তারা লাভ করবে। এই ইচ্ছাটুকু নিয়েই অতি ক্ষুদ্র আকারে আশ্রমবিদ্যালয়ের শুরু হল, এইটুকুকে সত্য করে তুলে আমি নিজেকে সত্য করে তুলতে চেয়েছিলুম।

আনন্দের ত্যাগে স্নেহের যোগে বালকদের সেবা করে হয়তো তাদের কিছু দিতে পেরেছিলুম, কিন্তু তার চেয়ে নিজেই বেশি পেয়েছি। সেদিনও প্রতিকূলতার অন্ত ছিল না। এইভাবে কাজ আরম্ভ করে ক্রমশ এই কাজের মধ্যে আমার মন অগ্রসর হয়েছে। সেই ক্ষীণ প্রারম্ভ আজ বহু দূর পর্যন্ত এগোল। আমার সংকল্প আজ একটা রূপ লাভ করেছে। প্রতিদিন আমাকে দুঃখের যে প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে তার হিসাব নেব না। বারম্বার মনে ভেবেছি, আমার সত্যসংকল্পের সাধনায় কেন সবাইকে পাব না, কেন একলা আমাকে চলতে হবে। আজ সে ক্ষোভ থেকে কিছু মুক্ত হয়েছি, তাই বলতে পারছি, এ দুর্বল চিত্তের আক্ষেপ। যার বাইরের সমারোহ নেই, উত্তেজনা নেই, জনসমাজে যার প্রতিপত্তির আশা করা যায় না, যার একমাত্র মূল্য অন্তরের বিকাশে, অন্তর্যামীর সমর্থনে, তার সম্বন্ধে এ কথা জোর করে বলা চলে না, অপর লোকে কেন এর সম্বন্ধে উদাসীন। উপলব্ধি যার, দায় শুধু তারই। অন্যে অংশগ্রহণ না করলে নালিশ চলবে না। যার উপরে ভার পড়েছে তাকেই হিসেব চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে; অংশী যদি জোটে তো ভালো, আর না যদি জোটে তো জোর খাটবে না। সমস্তই দিয়ে ফেলবার দাবি যদি অন্তর থেকে আসে তবে বলা চলবে না, এর বদলে পেলুম কী। আদেশ কানে পৌঁছলেই তা মানতে হবে।

আমাদের কাজ সত্যকে রূপ দেওয়া। অন্তরে সত্যকে স্বীকার করলে বাহিরেও তাকে প্রকাশ করা চাই। সম্পূর্ণরূপে সংকল্পকে সার্থক করেছি এ কথা কোনো কালেই বলা চলবে না—কঠিন বাধার ভিতর দিয়ে তাকে দেহ দিয়েছি। এ ভাবনা যেন না করি, আমি যখন যাব তখন কে একে দেখবে, এর ভবিষ্যতে কী আছে কী নেই। এইটুকু সান্ত্বনা বহন করে যেতে চাই, যতটুকু পেরেছি তা করেছি, মনে যা পেয়েছি দুর্ভর হলেও কর্মে তাকে গ্রহণ করা হল। তার পরে সংসারের লীলায় এই প্রতিষ্ঠান নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে কী ভাবে বিকাশ পাবে তা কল্পনাও করতে পারি নে। লোভ হতে পারে, আমি যে ভাবে এর প্রবর্তন করেছি অবিকল সেই

ভাবে এর পরিণতি হতে থাকবে। কিন্তু সেই অহংকৃত লোভ ত্যাগ করাই চাই। সমাজের সঙ্গে কালের সঙ্গে যোগে কোন্ রূপরূপান্তরের মধ্য দিয়ে আপন প্রাণ-বেগে ভাবী কালের পথে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা, আজ কে তা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। এর মধ্যে আমার ব্যক্তিগত যা আছে ইতিহাস তাকে চিরদিন স্বীকার করবে, এমন কখনও হতেই পারে না। এর মধ্যে যা সত্য আছে তারই জয়যাত্রা অপ্রতিহত হোক। সত্যের সেই সঞ্জীবন-মন্ত্র এর মধ্যে যদি থাকে তবে বাইরের অভিব্যক্তির দিকে যে রূপ এ গ্রহণ করবে আজকের দিনের ছবির সঙ্গে তার মিল হবে না বলেই ধরে নিতে পারি। কিন্তু 'মা গৃধঃ'—নিজের হাতে গড়া আকারের প্রতি লোভ কোরো না। যা-কিছু ক্ষুদ্র, যা আমার অহমিকার সৃষ্টি, আজ আছে কাল নেই, তাকে যেন আমরা পরমাশ্রয় বলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাকা করে গড়বার আয়োজন না করি। প্রতি মুহূর্তের সত্য চেষ্টা সত্য কর্মের মধ্য দিয়েই আমাদের প্রতিষ্ঠান আপন সজীব পরিচয় দেবে, সেইখানেই তার চিরন্তন জীবন। জনসুলভ স্থূল সমৃদ্ধির পরিচয় দিতে প্রয়াস করে ব্যবসায়ীর মন সে না কিনুক; আন্তরিক গরিমায় তার যথার্থ শ্রী প্রকাশ পাবে। আদর্শের গভীরতা যেন নিরন্ত সার্থকতায় তাকে আত্মসৃষ্টির পথে চালিত করে। এই সার্থকতার পরিমাপ কালের উপর নির্ভর করে না, কেননা সত্যের অনন্ত পরিচয় আপন বিশুদ্ধ প্রকাশক্ষণে।

প্র জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

১৫

আমার মধ্য বয়সে আমি এই শান্তিনিকেতনে বালকদের নিয়ে এক বিদ্যালয় স্থাপন করতে ইচ্ছা করি। মনে তখন আশঙ্কা ও উদ্‌বেগ ছিল, কারণ কর্মে অভিজ্ঞতা ছিল না। জীবনের অভ্যাস ও তদুপযোগী শিক্ষার অভাব, অধ্যাপনাকর্মে নিপুণতার অভাব সত্ত্বেও আমার সংকল্প দৃঢ় হয়ে উঠল। কারণ চিন্তা করে দেখলেম যে, আমাদের দেশে এক সময়ে যে শিক্ষাদান-প্রথা বর্তমান ছিল, তার পুনঃপ্রবর্তন বিশেষ প্রয়োজন। সেই প্রথাই যে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এমন অন্ধ পক্ষপাত আমার মনে ছিল না, কিন্তু এই কথা আমার মনকে অধিকার করে যে, মানুষ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসংসার এই দুইয়ের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে, অতএব এই দুইকে একত্র সমাবেশ করে বালকদের শিক্ষায়তন গড়লে তবেই শিক্ষার পূর্ণতা ও মানবজীবনের সমগ্রতা হয়। বিশ্বপ্রকৃতির যে আহ্বান, তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে জোর করে শিক্ষার আয়োজন করলে শুধু শিক্ষাবস্তুকেই জমানো হয়, যে মন তাকে গ্রহণ করবে তার অবস্থা হয় ভারবাহী জন্তুর মতো। শিক্ষার উদ্দেশ্য তাতে ব্যর্থ হয়।

আমার বাল্যকালের অভিজ্ঞতা ভুলি নি। আমার বালক-মনে প্রকৃতির প্রতি সহজ অনুরাগ ছিল, তার থেকে নির্বাসিত করে বিদ্যালয়ের নীরস শিক্ষাবিধিতে যখন আমার মনকে যন্ত্রের মতো পেষণ করা হয় তখন কঠিন যন্ত্রণা পেয়েছি। এভাবে মনকে ক্লিষ্ট করলে, এই কঠিনতায় বালক-মনকে অভ্যস্ত করলে, তা মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল হতে পারে না। শিক্ষার আদর্শকেই আমরা ভুলে গেছি। শিক্ষা তো শুধু সংবাদ-বিতরণ নয়; মানুষ সংবাদ বহন করতে জন্মায় নি,

জীবনের মূলে যে লক্ষ্য আছে তাকেই গ্রহণ করা চাই। মানবজীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞানে ও কর্মে পূর্ণ করে উপলব্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আমার মনে হয়েছিল, জীবনের কী লক্ষ্য এই প্রশ্নের মীমাংসা যেন শিক্ষার মধ্যে পেতে পারি। আমাদের দেশের পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীতে তার আভাস পাওয়া যায়। তপোবনের নিভৃত তপস্যা ও অধ্যাপনার মধ্যে যে শিক্ষাসাধনা আছে তাকে আশ্রয় করে শিক্ষক ও ছাত্র জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। শুধু পরা বিদ্যা নয়, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ প্রভৃতি অপরা বিদ্যার অনুশীলনেও যেমন প্রাচীন কালে গুরুশিষ্য একই সাধনক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিলেন, তেমনি সহযোগিতার সাধনা যদি এখানে হয় তবেই শিক্ষার পূর্ণতা হবে।

বর্তমানে সেই সাধনা আমরা কতদূর গ্রহণ করতে পারি তা বলা কঠিন। আজ আমাদের চিত্তবিক্ষেপের অভাব নেই। কিন্তু এই-যে প্রাচীন কালের শিক্ষাসমবায়, এ কোনো বিশেষ কাল ও সম্প্রদায়ের অভিমত নয়। মানবচিত্তবৃত্তির মূলে সেই এক কথা আছে— মানুষ বিচ্ছিন্ন প্রাণী নয়, সব মানুষের সঙ্গে যোগে সে যুক্ত, তাতেই তার জীবনের পূর্ণতা, মানুষের এই ধর্ম। তাই যে দেশেই যে কালেই মানুষ যে বিদ্যা ও কর্ম উৎপন্ন করবে সে সব-কিছুতে সর্বমানবের অধিকার আছে। বিদ্যায় কোনো জাতিবর্ণের ভেদ নেই। মানুষ সর্বমানবের সৃষ্ট ও উদ্ভূত সম্পদের অধিকারী, তার জীবনের মূলে এই সত্য আছে। মানুষ জন্মগ্রহণ-সূত্রে যে শিক্ষার মধ্যে এসেছে তা এক জাতির দান নয়। কালে কালে নিখিলমানবের কর্মশিক্ষার ধারা প্রবাহিত হয়ে একই চিত্তসমুদ্রে মিলিত হয়েছে। সেই চিত্ত-সাগরতীরে মানুষ জন্মলাভ করে, তারই আহ্বানমন্ত্র দিকে দিকে ঘোষিত।

আদিকালের মানুষ একদিন আগুনের রহস্য ভেদ করল, তাকে ব্যবহারে লাগাল। আগুনের সত্য কোনো বিশেষ কালে আবদ্ধ রইল না, সর্বমানব এই আশ্চর্য রহস্যের অধিকারী হল। তেমনি পরিধেয় বস্ত্র, ভূ-কর্ষণ প্রভৃতি প্রথম যুগের আবিষ্কার থেকে শুরু করে মানুষের সর্বত্র চেষ্টা ও সাধনার মধ্য দিয়ে যে জ্ঞানসম্পদ আমরা পেলেম তা কোনো বিশেষ জাতির বা কালের নয়। এই কথা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করি না। আমাদের তেমনি দান চাই যা সর্বমানব গ্রহণ করতে পারে।

সর্বমানবের ত্যাগের ক্ষেত্রে আমরা জন্মেছি। ব্রহ্ম যিনি, সৃষ্টির মধ্যেই আপনাকে উৎসর্গ করে তাঁর আনন্দ, তাঁর সেই ত্যাগের ক্ষেত্রে জীবসকল জীবিত থাকে, এবং তাঁরই মধ্যে প্রবেশ করে ও বিলীন হয়— এ যেমন অধ্যাত্মলোকের কথা, তেমনি চিত্তলোকেও মানুষ মহামানবের ত্যাগের লোকে জন্মলাভ করেছে ও সঞ্চরণ করছে, এই কথা উপলব্ধি করতে হবে; তবেই আনুষঙ্গিক শিক্ষাকে আমরা পূর্ণতা ও সর্বাঙ্গীণতা দান করতে পারব।

আমার তাই সংকল্প ছিল যে, চিত্তকে বিশেষ জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ না করে শিক্ষার ব্যবস্থা করব; দেশের কঠিন বাধা ও অন্ধ সংস্কার সত্ত্বেও এখানে সর্বদেশের মানবচিত্তের সহযোগিতায় সর্বকর্মযোগে শিক্ষাসত্র স্থাপন করব; শুধু ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য-পাঠে নয়, কিন্তু সর্বশিক্ষার মিলনের দ্বারা এই সত্যসাধনা করব। এ অত্যন্ত কঠিন সাধনা, কারণ চারি দিকে দেশে এর প্রতিকূলতা আছে। দেশবাসীর যে আত্মাভিমান ও জাতি-অভিমানের সংকীর্ণতা তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে।

আমরা যে এখানে পূর্ণ সফলতা লাভ করেছি তা বলতে পারি না, কিন্তু এই

প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত সেই সংকল্পটি আছে, তা স্মরণ করতে হবে। শুধু কেবল আনুষঙ্গিক কর্মপদ্ধতি নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তার জটিল জাল বিস্তৃত করে বাহ্যিক শৃঙ্খলা-পারিপাট্যের সাধন সম্ভব হতে পারে, কিন্তু আদর্শের খর্বতা হবে।

প্রথম যখন অল্প বালক নিয়ে এখানে শিক্ষায়তন খুলি তখনও ফললাভের প্রতি প্রলোভন ছিল না। তখন সহায়ক হিসাবে কয়েকজন কর্মীকে পাই— যেমন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কবি সতীশচন্দ্র, জগদানন্দ। এ'রা তখন একটি ভাবের ঐক্যে মিলিত ছিলেন। তখনকার হাওয়া ছিল অন্যরূপ। কেবলমাত্র বিধিনিষেধের জালে জড়িত হয়ে থাকতেম না, অল্প ছাত্র নিয়ে তাদের সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন সত্য হয়ে উঠত। তাদের সেবার মধ্যে আমরা একটি গভীর আনন্দ, একটি চরম সার্থকতা উপলব্ধি করতেম। তখন অধ্যাপকদের মধ্যে অসীম ধৈর্য দেখেছি। মনে পড়ে, যেসব বালক দুরন্তপনায় দুঃখ দিয়েছে তাদের বিদায় দিই নি, বা অন্যভাবে পীড়া দিই নি। যতদিন আমার নিজের হাতে এর ভার ছিল ততদিন বার বার তাদের ক্ষমা করেছি; অধ্যাপকদের ক্ষমা করেছি। সেইসকল ছাত্র পরে কৃতিত্বলাভ করেছে।

তখন বাহ্যিক ফললাভের চিন্তা ছিল না, পরীক্ষার মার্কা-মারা করে দেবার ব্যস্ততা ছিল না, সকল ছাত্রকে আপন করবার চেষ্টা করেছি। তখন বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কিত ছিল না, তার থেকে নির্লিপ্ত ছিল। তখনকার ছাত্রদের মনে এই অনুষ্ঠানের প্রতি সুগভীর নিষ্ঠা লক্ষ্য করেছি।

এইভাবে বিদ্যালয় অনেকদিন চলেছিল। এর অনেক পরে এর পরিধির বিস্তার হয়। সৌভাগ্যক্রমে তখন স্বদেশবাসীর সহায়তা পাই নি; তাদের অহৈতুক বিরুদ্ধতা ও অকারণ বিদ্বেষ একে আঘাত করেছে, কিন্তু তার প্রতি দৃক্‌পাত করি নি, এবং এই-যে কাজ শুরু করলেম তার প্রচারেরও চেষ্টা করি নি। মনে আছে, আমার বন্ধুবর মোহিত সেন এই বিদ্যালয়ের বিবরণ পেয়ে আকৃষ্ট হন, আমাদের আদর্শ তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি বলেন, 'আমি কিছু করতে পারলেম না, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি আমার জীবিকা— এখানে এসে কাজ করতে পারলে ধন্য হতাম। তা হল না। এবার পরীক্ষায় কিছু অর্জন করেছি, তার থেকে কিছু দেব এই ইচ্ছা।' এই বলে তিনি এক হাজার টাকার একটি নোট আমাকে দেন। বোধ হয় আমার প্রদেশবাসীর এই প্রথম ও শেষ সহানুভূতি। এইসঙ্গেই উল্লেখ করতে হবে আমার প্রতি প্রীতিপরায়ণ ত্রিপুরাধিপতির আনুকূল্য। আজও তাঁর বংশে তা প্রবাহিত হয়ে আসছে।

মোহিতবাবু অনেকদিন এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে আন্তরিকভাবে যুক্ত ছিলেন এবং আমার কী প্রয়োজন তার সন্ধান নিতেন। তিনি অনুমতি চাইলেন, এই বিদ্যালয়ের বিষয়ে কিছু কাগজে লেখেন। আমি তাতে আপত্তি জানাই। বললেম, 'গুটিকতক ছেলে নিয়ে গাছপালার মধ্যে বসেছি, কোনো বড়ো ঘরবাড়ি নেই, বাইরের দৃশ্য দীন, সর্বসাধারণ একে ভুল বুঝবে।'

এই অল্প অধ্যাপক ও ছাত্র নিয়ে আমি বহুকষ্টে আর্থিক দুরবস্থা ও দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হয়ে যেভাবে এই বিদ্যালয় চালিয়েছি তার ইতিহাস রক্ষিত হয় নি। কঠিন চেষ্টার দ্বারা ঋণ করে প্রতিদিনের প্রয়োজন জোগাতে সর্বস্বান্ত হয়ে দিন কাটিয়েছি, কিন্তু পরিতাপ ছিল না। কারণ গভীর সত্য ছিল এই দৈন্য-দশার অন্তরালে। যাক, এ আলোচনা বৃথা। কর্মের যে ফল তা বাইরের বিধানে

দেখানো যায় না, প্রাণশক্তির যে রসসঞ্চার তা গোপন গূঢ়, তা ডেকে দেখাবার জিনিস নয়। সেই গভীর কাজ সকলপ্রকার বিরুদ্ধতার মধ্যেও এখানে চলেছিল।

এই নির্মম বিরুদ্ধতার উপকারিতা আছে—যেমন জমির অনুর্বরতা কঠিন প্রযত্নের দ্বারা দূর করে তবে ফসল ফলাতে হয়, তবেই তার উৎপাদনী শক্তি হয়, তার রসসঞ্চার হয়। দুঃখের বিষয়, বাংলার চিত্তক্ষেত্র অনুর্বর, কোনো প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী করবার পক্ষে তা অনুকূল নয়। বিনা কারণে বিদ্বেষের দ্বারা পীড়া দেয় যে দুর্বুদ্ধি তা গড়া জিনিসকে ভাঙে, সংকল্পকে আঘাত করে, শ্রদ্ধার সঙ্গে কিছুকে গ্রহণ করে না। এখানকার এই-যে প্রচেষ্টা রক্ষিত হয়েছে, তা কঠিনতাকে প্রতিহত করেই বেঁচেছে। অর্থবর্ষণের প্রশ্রয় পেলে হয়তো এর আত্মসত্য রক্ষা করা দুরূহ হত, অনেক জিনিস আসত খ্যাতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে যা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই এই অখ্যাতির মধ্য দিয়ে এই বিদ্যালয় বেঁচে উঠেছে।

এক সময় এল, যখন এর পরিধি বাড়বার দিকে গেল। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বললেন, দেশের যে টোল চতুষ্পাঠী আছে তা সংকীর্ণ, তা একালের উপযোগী নয়, তাকে বিস্তৃত করে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে দেশের শিক্ষা-প্রণালীকে কালোপযোগী করতে হবে। আমারও এই কথাটা মনে লেগেছিল। আমার তখনকার বিদ্যালয় শুধু বালকদের শিক্ষায়তন ছিল, এতবড়ো বৃহৎ অনুষ্ঠানের কথা মনে হয় নি এবং তাতে সফলকাম হব বলেও ভাবি নি। শাস্ত্রী-মশায় তখন কাশীতে সংস্কৃত মাসিকপত্রের সম্পাদন, ও সাহিত্যচর্চা করছিলেন। তিনি এখানে এসে জুটলেন। তখন পালিভাষা ও শাস্ত্রে তিনি প্রবীণ ছিলেন না, প্রথম আমার অনুরোধেই তিনি এই শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করতে ব্রতী হলেন।

ধীরে ধীরে এখানকার কাজ আরম্ভ হল। আমার মনে হল যে, দেশের শিক্ষা-প্রণালীর ব্যাপকতাসাধন করতে হবে। তখন এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না যেখানে সর্বদেশের বিদ্যাকে গৌরবের স্থান দেওয়া হয়েছে। সব য়ুনিভার্সিটিতে শুধু পরীক্ষাপাসের জন্যই পাঠ্যবিধি হয়েছে, সেই শিক্ষাব্যবস্থা স্বার্থসাধনের দীনতায় পীড়িত, বিদ্যাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণের কোনো চেষ্টা নেই। তাই মনে হল, এখানে মুক্তভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনের বাইরে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব যেখানে সর্ববিদ্যার মিলনক্ষেত্র হবে। সেই সাধনার ভার যাঁরা গ্রহণ করলেন, ধীরে ধীরে তাঁরা এসে জুটলেন।

আমার শিশু-বিদ্যালয়ের বিস্তৃতি সাধন হল—সভা-সমিতি মন্ত্রণাসভা ডেকে নয়, অল্পপরিসর প্রারম্ভ থেকে ধীরে ধীরে এর বৃদ্ধি হল। তার পর কালক্রমে কী করে এর কর্মপরিধি ব্যাপ্ত হল তা সকলে জানেন।

আমাদের কাজ যে কিছু সফল হয়েছে আমাদের কর্মীদের চোখে তার স্পষ্ট প্রতিরূপ ধরা পড়ে না, তারা সন্দিগ্ধ হয়, বাহ্যিক ফলে অসন্তোষ প্রকাশ করে। তাই এক-একবার আমাদের কর্মে সার্থকতা কোথায় তা দেখতে ইচ্ছা হয়, নইলে পরিতুষ্টি হয় না। এবার কলকাতা থেকে আসবার পর নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা আমায় নিয়ে গেল— তাদের মধ্যে গিয়ে বড়ো আনন্দ হল, মনে হল এই তো ফললাভ হয়েছে ; এই জায়গায় শক্তি প্রসারিত হল, হৃদয়ে হৃদয়ে তা বিস্তৃত হল। পরীক্ষার ফল ছোটো কথা—এই তো ফললাভ, আমরা মানুষের মনকে জাগাতে পেরেছি। মানুষ বুঝেছে, আমরা তাদের আপন। গ্রামবাসীদের সরল হৃদয়ে এখানকার প্রভাব সঞ্চারিত হল, তাদের আত্মশক্তির উদ্‌বোধন হল।

আমার মরবার আগে এই ব্যাপার দেখে খুশি হয়েছি। এই-যে এরা ভালোবেসে

ডাকল, এরা আমাদের কাছে থেকে শ্রদ্ধা ও শক্তি পেয়েছে। এ জনতা ডেকে 'মহতী সভা' করা নয়, খবরের কাগজের লক্ষ্যগোচর কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু এই গ্রামবাসীর ডাক, এ আমার হৃদয়ে স্পর্শ করল। মনে হল, দীপ জ্বলেছে, হৃদয়ে হৃদয়ে তার শিখা প্রদীপ্ত হল, মানুষের শক্তির আলোক হৃদয়ে হৃদয়ে উদ্ভাসিত হল।

এই-যে হল, এ কোনো একজনের কৃতিত্ব নয়। সকল কর্মীর চেষ্টা চিন্তা ও ত্যাগের দ্বারা, সকলের মিলিত কর্ম এই সমগ্রকে পুষ্ট করেছে। তাই ভরসার কথা, এ কৃত্রিম উপায়ে হয় নি। কোনো ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করে এ কাজ হয় নি। ভয় নেই, প্রাণশক্তির সঞ্চার হয়েছে, আমাদের অবর্তমানে এই অনুষ্ঠান জীর্ণ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

আমরা জনসাধারণকে আপন সংকল্পের অন্তর্গত করতে পেরেছি—এই প্রতিষ্ঠান তার অভিমুখে চলেছে। অল্প পরিমাণে এক জায়গাতেই আমরা ভারতের সমস্যার সমাধান করব। রাজনীতির ঔদ্ধত্যে নয়, সহজভাবে দেশবাসীদের আত্মীয়রূপে বরণ করে তাদের নিয়ে এখানে কাজ করব। তাদের ভোটাধিকার নিয়ে বিশ্ববিজয়ী হতে না পারি, তাদের সঙ্গে চিত্তের আদানপ্রদান হবে, তাদের সেবায় নিযুক্ত হব। তারাও দেবে, আমাদের কাছ থেকে নেবে, এই সর্বভারতের কাজ এখানে হবে।

এক সময়ে আমার কাছে প্রশ্ন আসে, তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনে কেন যোগ দিচ্ছি না। আমি বলি, সকলের মধ্যে যে উত্তেজনা আমার কাজকে তা অগ্রসর করবে না। শুধু একটি বিশেষ প্রণালীর দ্বারাই যে সত্যসাধনা হয় আমি তা মনে করি না। তাই আমি বলি যে, এই প্রশ্নের উত্তর যখন এখানে পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন একদিন তা সকলের গোচর হবে। যা আমি সত্য বলে মনে করেছি সে উত্তরের জোগান হয়তো এখান থেকেই হবে।

সেই অপেক্ষায় ছিলুম। সত্যের মধ্যে সংকীর্ণতা নেই—সকল বিভাগে মনুষ্যত্বের সাধনা প্রসারিত। দল বাড়াবার সংকীর্ণ চেষ্টার মধ্যে সেই সত্যের খর্বতা হয়।

আধুনিক কালের মানুষের ধারণা যে, বিজ্ঞাপনের দ্বারা সংকল্পের ঘোষণা করতে হয়। দেখি যে আজকাল কখনও কখনও বিশ্বভারতীর কর্ম নিয়ে পত্রলেখকেরা সংবাদপত্রে লিখে থাকেন। এতে ভয় পাই, এ দিকে লক্ষ্য হলে সত্যের চেয়ে খ্যাতিকে বড়ো করা হয়। সত্য স্বল্পকে অবজ্ঞা করে না, অবাস্তবকে ভয় করে, তাই খ্যাতির কোলাহলকে আশ্রয় করতে সে কুণ্ঠিত। কিন্তু আধুনিক কালের ধর্ম, ব্যাপ্তির দ্বারা কাজকে বিচার করা, গভীরতার দ্বারা নয়। তার পরিণাম হয় গাছের ডালপালার পরিব্যাপ্তির মতো, তাতে ফল হয় কম।

আমি এক সময়ে নিভৃতে দুঃখ পেয়েছি অনেক, কিন্তু তাতে শান্তি ছিল। আমি খ্যাতি চাই নি, পাই নি; বরং অখ্যাতিই ছিল। মনু বলেছেন—সম্মানকে বিষের মতো জানবে। অনেক কাল কর্মের পুরস্কার-স্বরূপে সম্মানের দাবি করি নি। একলা আপনার কাজ করেছি, সহযোগিতার আশা ছেড়েই দিয়েছি। আশা করলে পাবার সম্ভাবনা ছিল না। তেমন স্থলে বাহ্যিকভাবে না পাওয়াই স্বাস্থ্যজনক।

বিশ্বভারতীর এই প্রতিষ্ঠান যে যুগে যুগে সার্থক হতেই থাকবে, তা বলে নিজেকে ভুলিয়ে কী হবে। মোহমুক্ত মনে নিরাশী হয়েই যথাসাধ্য কাজ করে

যেতে পারি যেন। বিধাতা আমাদের কাছে কাজ দাবি করেন কিন্তু আমরা তাঁর কাছে ফল দাবি করলে তিনি তার হিসাব গোপনে রাখেন, নগদ মজুরি চুকিয়ে দিয়ে আমাদের প্রয়াসের অবমাননা করেন না। তা ছাড়া আজ আমরা যে সংকল্প করেছি আগামী কালেও যে অবিকল তারই পুনরাবৃত্তি চলবে, কালের সে ধর্ম নয়। ভাবী কালের দিকে আমরা পথ তৈরি করে দিতে পারি, কিন্তু গম্য স্থানকে আমার আজকের দিনের রুচি ও বুদ্ধি দিয়ে একেবারে পাকা করে দেব, এ হতেই পারে না। যদি অন্ধ মমতায় তাই করে দিই তা হলে সে আমাদের মৃত সংকল্পের সমাধিস্থান হবে। আমাদের যে চেষ্টা বর্তমানে জন্মগ্রহণ করে, সময় উপস্থিত হলে তার অন্ত্যেষ্টি-সংকার হবে, তার দ্বারা সত্যের দেহ-মুক্তি হবে, কিন্তু তার পরে নবজন্মে তার নবদেহ-ধারণের আহ্বান আসবে এই কথা মনে রেখে—

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকো যথা॥

শান্তিনিকেতন
৯ পৌষ ১৩৩৯

১৬

প্রৌঢ় বয়সে একদা যখন এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেম তখন আমার সম্মুখে ভাসছিল ভবিষ্যৎ, পথ তখন লক্ষ্যের অভিমুখে, অনাগতের আহ্বান তখন ধ্বনিত—তার ভাবরূপ তখনও অস্পষ্ট, অথচ এক দিক দিয়ে তা এখনকার চেয়ে অধিকতর পরিস্ফুট ছিল। কারণ তখন যে আদর্শ মনে ছিল তা বাস্তবের অভিমুখে আপন অখণ্ড আনন্দ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। আজ আমার আয়ুষ্কাল শেষপ্রায়, পথের অন্য প্রান্তে পৌঁছিয়ে পথের আরম্ভসীমা দেখবার সুযোগ হয়েছে, আমি সেই দিকে গিয়েছি—যেমনতর সূর্য যখন পশ্চিম-অভিমুখে অস্তাচলের তটদেশে তখন তার সামনে থাকে উদয়দিগন্ত, যেখানে তার প্রথম যাত্রারম্ভ।

অতীত কাল সম্বন্ধে আমরা যখন বলি তখন আমাদের হৃদয়ের পূর্বরাগ অত্যুক্তি করে, এমন বিশ্বাস লোকের আছে। এর মধ্যে কিছু সত্য আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নেই। যে দূরবর্তী কালের কথা আমরা স্মরণ করি তার থেকে যা-কিছু অবান্তর তা তখন স্বতই মন থেকে ঝরে পড়েছে। বর্তমান কালের সঙ্গে যত-কিছু আকস্মিক, যা-কিছু অসংগত সংযুক্ত থাকে তা তখন স্খলিত হয়ে ধূলিবিলীন; পূর্বে নানা কারণে যার রূপ ছিল বাধাগ্রস্ত তার সেই বাধার কঠোরতা আজ আর পীড়া দেয় না। এইজন্য গতকালের যে চিত্র মনের মধ্যে প্রকাশ পায় তা সুসম্পূর্ণ, যাত্রারম্ভের সমস্ত উৎসাহ স্মৃতিপটে তখন ঘনীভূত। তার মধ্যে এমন অংশ থাকে না যা প্রতিবাদরূপে অন্য অংশকে খণ্ডিত করতে থাকে। এইজন্যই অতীত স্মৃতিকে আমরা নিবিড়ভাবে মনে অনুভব করে থাকি। কালের দূরত্বে, যা যথার্থ সত্য তার বাহ্যরূপের অসম্পূর্ণতা ঘুচে যায়, সাধনার কল্পমূর্তি অক্ষুণ্ণ হয়ে দেখা দেয়।

প্রথম যখন এই বিদ্যালয় আরম্ভ হয়েছিল তখন এর আয়োজন কত সামান্য ছিল, সেকালে এখানে যারা ছাত্র ছিল তারা তা জানে। আজকের তুলনায় তার

উপকরণবিরলতা, সকল বিভাগেই তার অকিঞ্চনতা, অত্যন্ত বেশি ছিল। কটি বালক ও দুই-এক জন অধ্যাপক নিয়ে বড়ো জামগাছতলায় আমাদের কাজের সূচনা করেছি। একান্তই সহজ ছিল তাদের জীবনযাত্রা—এখনকার সঙ্গে তার প্রভেদ গুরুতর। এ কথা বলা অবশ্যই ঠিক নয় যে, এই প্রকাশের ক্ষীণতাতেই সত্যের পূর্ণতর পরিচয়। শিশুর মধ্যে আমরা যে রূপ দেখি তার সৌন্দর্যে আমাদের মনে আনন্দ জাগায়, কিন্তু তার মধ্যে প্রাণরূপের বৈচিত্র্য ও বহুধাশক্তি নেই। তার পূর্ণ মূল্য ভাবী কালের প্রত্যাশার মধ্যে। তেমনি আশ্রমের জীবনযাত্রার যে প্রথম উপক্রম, বর্তমানে সে ছিল ছোটো, ভবিষ্যতেই সে ছিল বড়ো। তখন যা ইচ্ছা করেছিলাম তার মধ্যে কোনো সংশয় ছিল না। তখন আশা ছিল অমৃতের অভিমুখে, যে সংসার উপকরণ-বহুলতায় প্রতিষ্ঠিত তা পিছনে রেখেই সকলে এসেছিলেন। যাঁরা এখানে আমার কর্মসঙ্গী ছিলেন, অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন তাঁরা। আজ মনে পড়ে, কী কষ্টই না তাঁরা এখানে পেয়েছেন, দৈহিক সাংসারিক কত দীনতাই না তাঁরা বহন করেছেন। প্রলোভনের বিষয় এখানে কিছুই ছিল না, জীবনযাত্রার সুবিধা তো নয়ই, এমন কি খ্যাতিরও না—অবস্থার ভাবী উন্নতির আশা মরীচিকারূপেও তখন দূরদিগন্তে ইন্দ্রজাল বিস্তার করে নি। কেউ তখন আমাদের কথা জানত না, জানাতে ইচ্ছাও করি নি। এখন যেমন সংবাদপত্রের নানা ছোটোবড়ো জয়ঢাক আছে যা সামান্য ঘটনাকে শব্দায়িত করে রটনা করে, তার আয়োজনও তখন এমন ব্যাপক ছিল না। এই বিদ্যালয়ের কথা ঘোষণা করতে অনেক বন্ধু ইচ্ছাও করেছেন, কিন্তু আমরা তা চাই নি। লোকচক্ষুর অগোচরে, বহু দুঃখের ভিতর দিয়ে সে ছিল আমাদের যথার্থ তপস্যা। অর্থের এত অভাব ছিল যে, আজ জগদ্‌ব্যাপী দুঃসময়েও তা কল্পনা করা যায় না। আর সে কথা কোনোকালে কেউ জানবেও না, কোনো ইতিহাসে তা লিখিত হবে না। আশ্রমের কোনো সম্পত্তি ছিল না, সহায়তা ছিল না—চাইও নি। এইজন্যই, যাঁরা তখন এখানে কাজ করেছেন তাঁরা অন্তরে দান করেছেন, বাইরে কিছু নেন নি। যে আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসেছি তার বোধ সকলেরই মনে যে স্পষ্ট বা প্রবল ছিল তা নয়, কিন্তু অল্প পরিসরের মধ্যে তা নিবিড় হতে পেরেছিল। ছাত্রেরা তখন আমাদের অত্যন্ত নিকটে ছিল, অধ্যাপকেরাও পরস্পর অত্যন্ত নিকটে ছিলেন—পরস্পরের সুহৃৎ ছিলেন তাঁরা। আমাদের দেশের তপোবনের আদর্শ আমি নিয়েছিলাম। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সে আদর্শের রূপের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তার মূল সত্যটি ঠিক আছে—সেটি হচ্ছে, জীবিকার আদর্শকে স্বীকার করে তাকে সাধনার আদর্শের অনুগত করা। এক সময়ে এটা অনেকটা সুসাধ্য হয়েছিল, যখন জীবনযাত্রার পরিধি ছিল অনতিবৃহৎ। তাই বলেই সেই স্বল্পায়তনের মধ্যে সহজ জীবনযাত্রাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। উচ্চতর সংগীতে নানা ত্রুটি ঘটতে পারে; একতারায় ভুলচুকের সম্ভাবনা কম, তাই বলে একতারাই শ্রেষ্ঠ এমন নয়। বরঞ্চ কর্ম যখন বহুবিস্তৃত হয়ে বন্ধুর পথে চলতে থাকে তখন তার সকল ভ্রমপ্রমাদ সত্ত্বেও যদি তার মধ্যে প্রাণ থাকে তবে তাকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। শিশু অবস্থার সহজতাকে চিরকাল বেঁধে রাখবার ইচ্ছা ও চেষ্টার মতো বিড়ম্বনা আর কী আছে। আমাদের কর্মের মধ্যেও সেই কথা। যখন একলা ছোটো কার্যক্ষেত্রের মধ্যে ছিলুম তখন সব কর্মীদের মনে এক অভিপ্রায়ের প্রেরণা সহজেই কাজ করত। ক্রমে ক্রমে যখন এ আশ্রম বড়ো হয়ে উঠল তখন একজনের অভিপ্রায় এর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে এ সম্ভব হতে

পারে না। অনেকে এখানে এসেছেন, বিচিত্র তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা— সকলকে নিয়েই আমি কাজ করি, কাউকে বাছাই করি নে, বাদ দিই নে; নানা ভুলত্রুটি ঘটে নানা বিদ্রোহ-বিরোধ ঘটে— এ সব নিয়েই জটিল সংসারে জীবনের যে প্রকাশ ঘাতাভিঘাতে সর্বদা আন্দোলিত তাকে আমি সম্মান করি। আমার প্রেরিত আদর্শ নিয়ে সকলে মিলে একতারা-যন্ত্রে গুঞ্জরিত করবেন এমন অতি সরল ব্যবস্থাকে আমি নিজেই শ্রদ্ধা করি নে। আমি যাকে বড়ো বলে জানি, শ্রেষ্ঠ বলে যা বরণ করেছি, অনেকের মধ্যে তার প্রতি নিষ্ঠার অভাব আছে জানি, কিন্তু তা নিয়ে নালিশ করতে চাই নে। আজ আমি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এখানকার যা কর্ম তা নানা বিরোধ ও অসংগতির মধ্য দিয়ে প্রাণের নিয়মে আপনি তৈরি হয়ে উঠছে; আমি যখন থাকব না, তখনও অনেক চিত্তের সমবেত উদ্যোগে যা উদ্ভাবিত হতে থাকবে তাই হবে সহজ সত্য। কৃত্রিম হবে যদি কোনো এক ব্যক্তি নিজের আদেশ-নির্দেশে একে বাধ্য করে চালায়— প্রাণধর্মের মধ্যে স্বতোবিরোধিতাকেও স্বীকার করে নিতে হয়।

অনেক দিন পরে আজ এ আশ্রমকে সমগ্র করে দেখতে পাচ্ছি; দেখছি, আপন নিয়মে এ আপনি গড়ে উঠেছে। গঙ্গা যখন গঙ্গোত্রীর মুখে তখন একটিমাত্র তার ধারা। তার পর ক্রমে বহু নদনদীর সহিত যতই সে সংগত হল, সমুদ্রের যত নিকটবর্তী হল, কত তার রূপান্তর ঘটেছে। সেই আদিম স্বচ্ছতা আর তার নেই, কত আবিলতা প্রবেশ করেছে তার মধ্যে, তবু কেউ বলে না গঙ্গার উচিত ফিরে যাওয়া, যেহেতু অনেক মলিনতা ঢুকেছে তার মধ্যে, সে সরল গতি আর তার নেই। সব নিয়ে যে সমগ্রতা সেইটেই বড়ো— আশ্রমও স্বতোধাবিত হয়ে সেই পথেই চলেছে, অনেক মানুষের চিত্তসম্মিলনে আপনি গড়ে উঠছে। অবশ্য এর মধ্যে একটা ঐক্য এনে দেয় মূলগত একটা আদিম বেগ; তারও প্রয়োজন আছে, অথচ এর গতি প্রবল হয় সকলের সম্মিলনে। নিত্যকালের মতো কিছুই কল্পনা করা চলে না— তবে এর মূলগত একটি গভীর তত্ত্ব বরাবর থাকবে এ কথা আমি আশা করি— সে কথা এই যে, এটা বিদ্যাশিক্ষার একটা খাঁচা হবে না, এখানে সকলে মিলে একটি প্রাণলোক সৃষ্টি করবে। এমনতরো স্বর্গলোক কেউ রচনা করতে পারে না যার মধ্যে কোনো কলুষ নেই, দুঃখজনক কিছু নেই; কিন্তু বন্ধুরা জানবেন যে, এর মধ্যে যা নিন্দনীয় সেইটাই বড়ো নয়। চোখের পাতা ওঠে, চোখের পাতা পড়ে: কিন্তু পড়াটাই বড়ো নয়, সেটাকে বড়ো বললে অন্ধতাকে বড়ো বলতে হয়। যাঁরা প্রতিকূল, নিন্দার বিষয় তাঁরা পাবেন না এমন নয়— নিন্দনীয়তার হাত থেকে কেউই রক্ষা পেতে পারে না। কিন্তু তাকে পরাস্ত করে উত্তীর্ণ হয়েও টিকে থাকাতেই প্রাণের প্রমাণ। আমাদের দেহের মধ্যে নানা শত্রু নানা রোগের বীজাণু— তাকে আলাদা করে যদি দেখি তো দেখব প্রত্যেক মানুষ বিকৃতির আলয়। কিন্তু আসলে রোগকে পরাস্ত করে যে স্বাস্থ্যকে দেখা যাচ্ছে সেইটেই সত্য। দেহের মধ্যে যেমন লড়াই চলছে, প্রত্যেক অনুষ্ঠানের মধ্যেই তেমনি ভালোমন্দের একটা দ্বন্দ্ব আছে— কিন্তু সেটা পিছন দিকের কথা। এর মধ্যে স্বাস্থ্যের তত্ত্বটাই বড়ো।

আমি এমন কথা কখনও বলি নি, আজও বলি নে যে, আমি যে কথা বলব তাই বেদবাক্য— সেরকম অধিনেতা আমি নই। অসাধারণ তত্ত্ব তো আমি কিছু উদ্ভাবন করি নি; সাধকেরা যে অখণ্ড পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলেন সে কথা যেন সকলে স্বীকার করে নেন। এই একটি কথা ধ্রুব হয়ে থাক। তার পরে পরিবর্তমান পরিবর্ধমান সৃষ্টির কাজ সকলে মিলেই হবে। মানুষের দেহে যেমন অস্থি, এই অনুষ্ঠানের মধ্যেও তেমনি একটি যান্ত্রিক দিক আছে। এই অনুষ্ঠান

যেন প্রাণবান হয়, কিন্তু যন্ত্রই যেন মুখ্য না হয়ে ওঠে; হৃদয়-প্রাণ-কল্পনার সঞ্চরণের পথ যেন থাকে। আমি কল্পনা করি, এখানকার বিদ্যালয়ের আস্বাদন এক সময়ে যাঁরা পেয়েছেন, এখানকার প্রাণের সঙ্গে প্রাণকে মিলিয়েছেন অনেক সময় হয়তো তাঁরা এখানে অনেক বাধা পেয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু দূরে গেলেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পান এখানে যা বড়ো যা সত্য। আমার বিশ্বাস, সেই দৃষ্টিমান্ অনেক ছাত্র ও কর্মী নিশ্চয়ই আছেন, নইলে অস্বাভাবিক হত। এক সময়ে তাঁরা এখানে নানা আনন্দ পেয়েছেন, সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন— এর প্রতি তাঁদের মমতা থাকবে না এ হতেই পারে না। আমি আশা করি, কেবল নিষ্ক্রিয় মমতা দ্বারা নয়, এই অনুষ্ঠানের অন্তর্বর্তী হয়ে যদি তাঁরা এর শুভ ইচ্ছা করেন, তবে এর প্রাণের ধারা অব্যাহত থাকতে পারবে, যন্ত্রের কঠিনতা বড়ো হয়ে উঠতে পারবে না। এক সময়ে এখানে যাঁরা ছাত্র ছিলেন, যাঁরা এখানে কিছু পেয়েছেন কিছু দিয়েছেন, তাঁরা যদি অন্তরের সঙ্গে একে গ্রহণ করেন তবেই এ প্রাণবান হবে। এইজন্য আজ আমার এই ইচ্ছা প্রকাশ করি যে, যাঁরা জীবনের অর্ঘ্য এখানে দিতে চান, যাঁরা মমতা দ্বারা একে গ্রহণ করতে চান, তাঁদের অন্তর্বর্তী করে নেওয়া যাতে সহজ হয় সেই প্রণালী যেন আমরা অবলম্বন করি। যাঁরা একদা এখানে ছিলেন তাঁরা সম্মিলিত হয়ে এই বিদ্যালয়কে পূর্ণ করে রাখুন এই আমার অনুরোধ। অন্যসব বিদ্যালয়ের মতো এ আশ্রম যেন কলের জিনিস না হয়— তা করব না বলেই এখানে এসেছিলাম। যন্ত্রের অংশ এসে পড়েছে, কিন্তু সবার উপরে প্রাণ যেন সত্য হয়। সেইজন্যই আহ্বান করি তাঁদের যাঁরা এক সময়ে এখানে ছিলেন, যাঁদের মনে এখনও সেই স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। ভবিষ্যতে যদি আদর্শের প্রবলতা ক্ষীণ হয়ে আসে তবে সেই পূর্বতনেরা যেন একে প্রাণধারায় সঞ্জীবিত করে রাখেন, নিষ্ঠা দ্বারা শ্রদ্ধা দ্বারা এর কর্মকে সফল করেন— এই আশ্বাস পেলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি।

শান্তিনিকেতন
৮ পৌষ ১৩৪১

১৭

এই আশ্রম-বিদ্যালয়ের কোথা থেকে আরম্ভ, কোন্ সংকল্প নিয়ে কিসের অভিমুখে এ চলেছে, সে কথা প্রতি বর্ষে একবার করে ভাববার সময় আসে— বিশেষ করে আমার— কেননা অনুভব করি, আমার বলবার সময় আর বেশি নেই। এর ইতিহাস বিশেষ নেই; যে কাজের ভার নিয়েছিলাম তা নিজের প্রকৃতিসংগত নয়। পূর্বে সমাজ থেকে দূরে কোণে মানুষ হয়েছি, আমি যে পরিবারে মানুষ হয়েছিলাম, লোকসমাজের সঙ্গে সংযোগ ছিল তার অল্প। যখন সাহিত্যে প্রবৃত্ত হলাম সে সময়ও নিভৃতে নদীতীরে কাটিয়েছি। এমন সময় এই বিদ্যালয়ের আহ্বান এল। এই কথাটা অনুভব করেছিলাম, শহরের খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে মানবশিশু নির্বাসনদণ্ড ভোগ করে, তার শিক্ষাও বিদ্যালয়ে সংকীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ। গুরুর শাসনে তারা অনেক দুঃখ পায়, এ সম্বন্ধে আমার নিজেরও অভিজ্ঞতা আছে। কখনও ভাবি নি আমার দ্বারা এর কোনো উপায় হবে। তবু একদিন নদীতীর ছেড়ে

এখানে এসে আহ্বান করলুম ছেলেদের। এখানকার কাজে প্রথমে যে উৎসাহ এসেছিল সেটা সৃষ্টির আনন্দ; শিক্ষাকে লোকহিতের দিক থেকে জনসেবার অঙ্গ করে দেখা যায়—সেদিক থেকে আমি এখানে কাজ আরম্ভ করি নি। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষ হয়ে এখানকার ছেলেদের মন বিকশিত হবে, আবরণ ঘুচে যাবে, কল্পনার এই রূপ দেখতে পেতাম। যখন জানলুম, এ কাজের ভার নেবার আর কেউ নেই, তখন অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এ ভার আমি নিয়েছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, আমার ছেলেরা প্রাণবান হবে, তাদের মধ্যে ঔৎসুক্য জাগরিত হবে। তারা বেশি পাসমার্কা পেয়ে ভালো করে পাস করবে এ লোভ ছিল না—তারা আনন্দিত হবে, প্রকৃতির শুশ্রূষায় শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে এই ইচ্ছাই মনে ছিল। অল্প কয়েকটি ছেলে নিয়ে গাছের তলায় এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ আরম্ভ করেছিলাম। প্রকৃতির অবাধ সঙ্গ লাভ করবার উন্মুক্ত ক্ষেত্র এখানেই ছিল; শিক্ষায় যাতে তারা আনন্দ পায়, উৎসাহ বোধ করে, সেজন্য সর্বদা চেষ্টা করেছি, ছেলেদের রামায়ণ মহাভারত পড়ে শুনিয়েছি; অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তখন এখানে আসতেন, তিনি তা শুনতে ছাত্র হয়ে আসতে পারবেন না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। ছেলেদের জন্য নানারকম খেলা মনে মনে আবিষ্কার করেছি, একত্র হয়ে তাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি, তাদের জন্য নাটক রচনা করেছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে যাতে তারা দুঃখ না পায় এজন্য তাদের চিত্তবিনোদনের নূতন নূতন উপায় সৃষ্টি করেছি—তাদের সমস্ত সময়ই পূর্ণ করে রাখবার চেষ্টা করেছি। আমার নাটক গান তাদের জন্যই আমার রচনা। তাদের খেলাধুলোয়ও তখন আমি যোগ দিয়েছি। এইসব ব্যবস্থা অন্যত্র শিক্ষাবিধির অন্তর্গত নয়। অন্য বিদ্যালয়ে ক্রিয়াপদ শব্দরূপ হয়তো বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করানো হচ্ছে—অভিভাবকের দৃষ্টিও সেই দিকেই। আমাদের হয়তো সে দিকে কিছু ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এ কথা বলতেই হবে যে, এখানে ছাত্রদের সহজ মুক্তির আনন্দ দিয়েছি। সর্বদা তাদের সঙ্গী হয়ে ছিলাম—মাত্র দশটা-পাঁচটা নয়, শুধু তাদের নির্দিষ্ট পাঠের মধ্যে নয়—তাদের আপন অন্তরের মধ্যে তাদের জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। কোনো নিয়ম দ্বারা তারা পিষ্ট না হয়, এই আমার মনে অভিপ্রায় ছিল। এই চেষ্টায় সঙ্গী পেয়েছিলুম কিশোর কবি সতীশচন্দ্রকে—শিক্ষাকে তিনি আনন্দে সরস করে তুলতে পেরেছিলেন, সেক্সপীয়রের মতো কঠিন বিষয়কেও তিনি অধ্যাপনার গুণে শিশুদের মনে মুদ্রিত করে দিতে পেরেছিলেন। তার পরে ক্রমশ নানা ঋতু-উৎসবের প্রচলন হয়েছে; আপনার অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আনন্দের যোগ এই উৎসবের সহযোগে গড়ে উঠবে এই আমার লক্ষ্য ছিল।

ছাত্রসংখ্যা তখন অল্প ছিল, এও একটা সুযোগ ছিল, নইলে আমার পক্ষে একলা এর ভার গ্রহণ করা অসম্ভব হত। সকল ছাত্র-শিক্ষকে মিলে তখন এক হয়ে উঠেছিলেন, কাজেই সকলকে এক অভিপ্রায়ে চালিত করা সহজ হয়েছিল।

ক্রমে বিদ্যালয় বড়ো হয়ে উঠেছে। আমি যখন এর জন্য দায়ী ছিলুম তখন অনেক সংকট এসেছে, সবই সহ্য করেছি; অনেক সময় বহুসংখ্যক ছাত্রকে বিদায় করতে হয়েছে, তার যা আর্থিক ক্ষতি যেমন করে পারি বহন করেছি। কেবল এইটুকু লক্ষ্য রেখেছি, যেন ছাত্র শিক্ষক এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চলেন। ক্রমে যেটা সহজ পন্থা বিদ্যালয় সেই দিকেই চলেছে বলে মনে হয়—শিক্ষার যেসব প্রণালী সাধারণত প্রচলিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, সেইগুলিই

বলবান হয়ে ওঠে, তার নিজের ধারা বদলে গিয়ে হাই-ইস্কুলের চলতি ছাঁচের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে, কেননা সেই দিকেই ঝোঁক দেওয়া সহজ; সফলতার আদর্শ প্রচলিত আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মাঝখানে এল কনস্টিটট্যুশন, ঠিক হল বিদ্যালয় ব্যক্তির অধীনে থাকবে না, সর্বসাধারণের রুচিই একে পরিচালিত করবে। আমার কবিপ্রকৃতি বলেই হয়তো, কনস্টিটট্যুশন, নিয়মের কাঠামো—যাতে প্রাণধর্মের চেয়ে কৃত্রিম উপায়ের উপর বেশি জোর, তা আমি বুঝতে পারি নে; সৃষ্টির কার্যে এটা বাধা দেয় বলেই আমার মনে হয়। যাই হোক, কনস্টিটট্যুশনে নির্ভর রেখে আমি এর মধ্য থেকে অবকাশ নিয়েছি, কিন্তু এ কথা তো ভুলতে পারি নে যে, এ বিদ্যালয়ের কোনো বিশেষত্ব যদি অবশিষ্ট না থাকে তবে নিজেকে বঞ্চিত করা হয়। সাধ্যের বেশি অনেক আমাকে এর জন্য দিতে হয়েছে, কেউ সে কথা জানে না—কত দুঃসহ কষ্ট আমাকে স্বীকার করতে হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখে যাকে গড়ে তুলতে হয়েছে সে যদি এমন হয় যা আরও ঢের আছে, অর্থাৎ তার সার্থকতার মানদণ্ড যদি সাধারণের অনুগত হয়, তবে কী দরকার ছিল এমন সমূহ ক্ষতি স্বীকার করবার? বিদ্যালয় যদি একটা হাই-ইস্কুলে মাত্র পর্যবসিত হয় তবে বলতে হবে ঠকলুম। আমার সঙ্গে যাঁরা এখানে শিক্ষকতা আরম্ভ করেছিলেন, এখানকার আদর্শের মধ্যে যাঁরা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ পরলোকে। পরবর্তী যাঁরা এখন এসেছেন তাঁদের শিক্ষকতার আদর্শ, দূর থেকে ছাত্রদের পরিচালনা করা, এটা আমার সময় ছিল না। এরকম করে দূরত্ব রেখে অন্তঃকরণকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। এতে হয়তো খুব দক্ষ পরিচালনা হতে পারে কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিসের অভাব ঘটতে থাকে। এখন অনেক ছাত্র অনেক বিভাগ হয়েছে, সকলই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চলছে। কর্মী সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে চিন্তার ক্ষেত্রে সেবার ক্ষেত্রে এক করে দেখতে পাচ্ছেন না—বিচ্ছেদ জন্মাচ্ছে।

আমার বক্তব্য এই যে, সকল বিভাগই যদি এক প্রাণক্রিয়ার অন্তর্গত না হয় তবে এ ভার বহন করা কঠিন। আমি যতদিন আছি ততদিন হয়তো এ বিচ্ছেদ ঠেকাতে পারি, কিন্তু আমার অবর্তমানে কার আদর্শে চলবে? আমি এই বিদ্যালয়ের জন্য অনেক দুঃখ স্বীকার করে নিয়েছি—আশা করি আমার এই উদ্‌বেগ প্রকাশ করবার অধিকার আছে। এমন প্রতিষ্ঠান নেই যার মধ্যে কিছু নিন্দনীয় নেই, কিন্তু দরদী তা বুক দিয়ে চাপা দেয়; এমন অনুষ্ঠান নেই যার দুঃখ নেই, বন্ধু তা আনন্দের সঙ্গে বহন করে। দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে সকলে একত্র হয়ে যেন আমরা আদর্শের বিশুদ্ধি রক্ষা করি, বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হই।

ক্রমে বিদ্যালয়ের মধ্যে আর একটা আইডিয়া প্রবেশ করেছিল— সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ। এতে নানা লাভক্ষতি হয়েছে, কিন্তু পেয়েছি আমি কয়েকজন বন্ধু যাঁরা এখানে ত্যাগের অর্ঘ্য এনেছেন, আমার কর্মকে, আমাকে ভালোবেসেছেন। নানা নিন্দা তাঁরা শুনেছেন। বাইরে আমরা অতি দরিদ্র, কী দেখাতে পারি—তবুও বন্ধুরূপে সাহায্য করেছেন। শ্রীনিকেতনকে যিনি রক্ষা করছেন তিনি একজন বিদেশী—কী না তিনি দিয়েছেন। এণ্ড্রুজ দরিদ্র, তবু তিনি যা পেরেছেন দিয়েছেন—আমরা তাঁকে কত আঘাত দিয়েছি, কিন্তু কখনও তাতে ক্ষুণ্ণ হয়ে তিনি আমাদের ক্ষতি করেন নি। লেস্‌নি-সাহেব আমাদের পরম বন্ধু, পরম হিতৈষী। কেউ কেউ আজ পরলোকে। এই অকৃত্রিম সৌহার্দ্য সকল

ক্ষতির দুঃখে সান্ত্বনা। একান্তমনে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এই বিদেশী বন্ধুদের কাছে।

শান্তিনিকেতন
৮ পৌষ ১৩৪২

১৮

য়ুরোপে সর্বত্রই আছে বিজ্ঞানসাধনার প্রতিষ্ঠান— ব্যাপক তার আয়োজন, বিচিত্র তার প্রয়াস। আধুনিক য়ুরোপের শক্তিকেন্দ্র বিজ্ঞানে, এইজন্যে তার অনুশীলনের উদ্যোগ সহজেই সর্বজনের সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু য়ুরোপীয় সংস্কৃতি কেবলমাত্র বিজ্ঞান নিয়ে নয়— সাহিত্য আছে, সংগীত আছে, নানাবিধ কলাবিদ্যা আছে, জনহিতকর প্রচেষ্টা আছে। এদের কেন্দ্র নানা জায়গাতেই রূপ নিয়েছে জাতির স্বাভাবিক প্রবর্তনায়।

এইসকল কেন্দ্রের প্রধান সার্থকতা কেবল তার কর্মফল নিয়ে নয়। তার চেয়ে বড়ো সিদ্ধি সাধকদের আত্মার বিকাশে। নানা প্রকারে সেই বিকাশের প্রবর্তনা ও আনুকূল্য যদি দেশের মধ্যে থাকে তবেই দেশের অন্তরাত্মা জেগে উঠতে পারে। মানুষের প্রকৃতিতে ঊর্ধ্বদেশে আছে তার নিষ্কাম কর্মের আদেশ, সেইখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই বেদী যেখানে অন্য কোনো আশা না রেখে সে সত্যের কাছে বিশুদ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারে— আর কোনো কারণে নয়, তাতে তার আত্মারই পূর্ণতা হয় বলে।

আমাদের দেশে এখানে সেখানে দূরে দূরে গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে বাঁধা নিয়মে যান্ত্রিক প্রণালীতে ডিগ্রি বানাবার কারখানাঘর বসেছে। এই শিক্ষার সুযোগ নিয়ে ডাক্তার এঞ্জিনিয়র উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সমাজে সত্যের জন্য কর্মের জন্য নিষ্কাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হয় নি। প্রাচীন কালে ছিল তপোবন; সেখানে সত্যের অনুশীলন এবং আত্মার পূর্ণতা-বিকাশের জন্য সাধকেরা একত্র হয়েছেন, রাজস্বের ষষ্ঠ অংশ দিয়ে এইসকল আশ্রমকে রক্ষা করা রাজাদের কর্তব্য ছিল। সকল সভ্য দেশেই জ্ঞানের তাপস কর্মের ব্রতীদের জন্যে তপোভূমি রচিত হয়েছে।

আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণত মানুষ আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা, সন্ন্যাসের সাধনা ধরে নিয়ে থাকে। আমি যে সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম-স্থাপনার উদ্যোগ করেছিলুম, সাধারণ মানুষের চিত্তোৎকর্ষের সুদূর বাইরে তার লক্ষ্য ছিল না। যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খনিজ অবস্থার অনুজ্জ্বলতা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন করে নেয়। এই সংস্কৃতির নানা শাখাপ্রশাখা; মন যেখানে সুস্থ সবল, মন সেখানে সংস্কৃতির এই নানাবিধ প্রেরণাকে আপনিই চায়।

ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি-অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করে দেব, শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র তাই নয়, সকলরকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীতবাদ্য নাট্যাভিনয় এবং

পল্লীহিতসাধনের জন্যে যেসকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণবিকাশের পক্ষে এই সমস্তেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি। খাদ্যে নানা প্রকারের প্রাণীন পদার্থ আমাদের শরীরে মিলিত হয়ে আমাদের দেয় স্বাস্থ্য, দেয় বল; তেমনি যেসকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে তার সবগুলিরই সমবায় হবে আমাদের আশ্রমের সাধনায়—এই কথাই আমি অনেক কাল চিন্তা করেছি।

পদ্মার বোটে ছিল আমার নিভৃত নিবাস। সেখান থেকে আশ্রমে চলে এসে আমার আসন নিলুম দুটি-পাঁচছয় ছেলের মাঝখানে। কেউ না মনে করেন, তাদের উপকার করাই ছিল আমার লক্ষ্য। ক্লাস-পড়ানো কাজে উপকার করার সম্বল আমার ছিল না। বস্তুত সাধনা করার আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসেছিল, আমার নিজেরই জন্যে। নিজেকে দিয়ে-ফেলার দ্বারা নিজেকে পাওয়ার লোভ আমাকে দখল করেছিল। ছোটো ছেলেদের পড়াবার কাজে দিনের পরে দিন আমার কেটেছে, তার মধ্যে খ্যাতির প্রত্যাশা বা খ্যাতির স্বাদ পাবার উপায় ছিল না। সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীর ইস্কুলমাস্টারি। ঐ কটি ছোটো ছেলে আমার সমস্ত সময় নিলে, অর্থ নিলে, সামর্থ্য নিলে—এইটেই আমার সার্থকতা। এই-যে আমার সাধনার সুযোগ ঘটল, এতে করে আমি আপনাকেই পেতে লাগলুম। এই আত্মবিকাশ, এ কেবল সাধনার ফলে, বৃহৎ মানবজীবনের সংগমক্ষেত্রে। আপনাকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই বৃহৎ মানুষের সংসর্গ পাওয়া যায়, এই সামান্য ছেলে-পড়ানোর মধ্যেও। এতে খ্যাতি নেই, স্বার্থ নেই, সেইজন্যেই এতে বৃহৎ মানুষের স্পর্শ আছে।

সকলে জানেন, আমি মানুষের কোনো চিত্তবৃত্তিকে অস্বীকার করি নি। বাল্যকাল থেকে আমার কাব্যসাধনার মধ্যে যে আত্মপ্রকাশের প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত ছিল মানুষের সকল চিত্তবৃত্তির 'পরেই তার ছিল অভিমুখিতা। মানুষের কোনো চিৎশক্তির অনুশীলনকেই আমি চপলতা বা গাম্ভীর্যহানির দাগা দিই নি।

বহু বৎসর আমি নদীতীরে নৌকাবাসে সাহিত্যসাধনা করেছি, তাতে আমার নিরতিশয় শান্তি ও আনন্দ ছিল। কিন্তু মানুষ শুধু কবি নয়। বিশ্বলোকে চিত্তবৃত্তির যে বিচিত্র প্রবর্তনা আছে তাতে সাড়া দিতে হবে সকল দিক থেকে; বলতে হবে ওঁ—আমি জেগে আছি।

এখানে এলুম যখন তখন আমার কর্মচেষ্টায় বাইরের প্রকাশ অতি দীন ছিল। সে সম্বন্ধে এইটুকুমাত্রই বলতে পারি, সেই উপকরণবিরল অতি ছোটো ক্ষেত্রের মধ্যে আপনাকে দেওয়ার দ্বারা ও আপনাকে পাওয়ার দ্বারা যে আনন্দ তারই মধ্য দিয়ে এই আশ্রমের কাজ শুরু হয়েছে।

দিনে দিনে এই কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। আজ সে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সর্বসাধারণের দৃষ্টির সামনে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, আমাদের দেশের দৃষ্টি প্রায়ই অনুকূল নয়। কিন্তু তাতে ক্ষতি হয় নি, তাতে কর্মের মূল্যই বেড়েছে।

যাঁরা সংকীর্ণ কর্তব্যসীমার মধ্যেও এই বিদ্যায়তনে কাজ করছেন তাঁদেরও সহযোগিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে সকৃতজ্ঞ চিত্তে আমার স্বীকার্য।

এখানে যাঁরা এসেছেন তাঁরা একে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন কি না জানি না। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশে এই প্রতিষ্ঠানকে আমি সমর্পণ করেছি।

বহুদিন এই আশ্রমে আমরা প্রচ্ছন্ন ছিলাম। মাটির ভিতরে বীজের যে অজ্ঞাতবাস, প্রাণের স্ফুরণের জন্য তার প্রয়োজন আছে। এই অজ্ঞাতবাসের পর্ব

দীর্ঘকাল চলেছিল। আজ যদি এই প্রতিষ্ঠান লোকচক্ষুর গোচর হয়ে থাকে তবে সেই প্রকাশ্য দৃষ্টিপাতের ঘাতসংঘাত ভালোমন্দ লাভক্ষতি সমস্ত স্বীকার করে নিতে হবে— কখনও পীড়িত মনে, কখনও উৎসাহের সঙ্গে।

যাঁরা উপদেষ্টা পরামর্শদাতা বা অতিথি ভাবে এখানে আসেন তাঁদের জানিয়ে রাখি, আমাদের এই বিদ্যায়তনে ব্যবসায়বুদ্ধি নেই। এখানে ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত জনমতের অনুবর্তন করে জনতার মন রক্ষা করি নি, এবং সেই কারণে যদি আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকি তবে সে আমাদের সৌভাগ্য। আমরা কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে শ্রেয়কে বরণ করবার প্রয়াস রাখি। কর্মের সাধনাকে মনুষ্যত্বসাধনার সঙ্গে এক বলে জানি। আমাদের এখানে সাধনার আসন পাতা রয়েছে। সকল স্থলেই যে সেই আসন সাধকেরা অধিকার করেছেন এমন গর্ব করি নে। কিন্তু এখানকার আবহাওয়ার মধ্যে একটি আহ্বান আছে— আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

আমাদের মনে বিশ্বাস হয়েছে, আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি, যদিও ফসলের পূর্ণপরিণত রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যাঁরা আমাদের সুদীর্ঘ এবং দুরূহ প্রয়াসের মধ্যে এমন-কিছু দেখতে পেয়েছেন যার সর্বকালীন মূল্য আছে, তাঁদের সেই অনুকূল দৃষ্টি থেকে আমরা বর লাভ করেছি। তাঁদের দৃষ্টির সেই আবিষ্কার শক্তি জাগিয়েছে আমাদের কর্মে। দূরের থেকে এসেছেন মনীষীরা অতিথিরা, ফিরেছেন বন্ধুরূপে, তাঁদের আশ্বাস ও আনন্দ সঞ্চিত হয়েছে আশ্রমের সম্পদভাণ্ডারে।

বহুদিনের ত্যাগের দ্বারা, চেষ্টার দ্বারা এই আশ্রমকে দেশের বেদীমূলে স্থাপন করবার জন্য নৈবেদ্যসংরচনকার্য আমার আয়ুর সঙ্গে সঙ্গেই একরকম শেষ করে এনেছি। দূরের অতিথি-অভ্যাগতদের অনুমোদনের দ্বারা আমাদের কাছে এই কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, এখানে প্রাণশক্তি রয়েছে। ফুলে ফলে বাইরের ফসলের কিছু-একটা প্রকাশ এঁরা দেখেছেন, তা ছাড়া তাঁরা এর অন্তরের ক্রিয়াকেও দেখেছেন। দূরের সেই অতিথিরা মনীষীরা আমাদের পরম বন্ধু, কারণ তাঁদের আশ্বাস আমরা পেয়েছি। আমাদের এই আশ্রমের কর্মেতে আমি যে আপনাকে সমর্পণ করেছি তা সার্থক হবে যদি আমার এই সৃষ্টি আমি যাবার পূর্বে দেশকে সঁপে দিতে পারি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ যেমন, তেমনি শ্রদ্ধয়া আদেয়ম্। যেমন শ্রদ্ধায় দিতে চাই, তেমনি শ্রদ্ধায় একে গ্রহণ করতে হবে। এই দেওয়া-নেওয়া যেদিন পূর্ণ হবে সেদিন আমার সারা জীবনের কর্মসাধনার এই ক্ষেত্র পূর্ণতার রূপ লাভ করবে।

শান্তিনিকেতন
৮ পৌষ ১৩৪৫

১৯

অনেক দিন পরে আজ আমি তোমাদের সম্মুখে এই মন্দিরে উপস্থিত হয়েছি। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গেই আজ এসেছি। এ কথা জানি যে, দীর্ঘকালের অনুপস্থিতির ব্যবধানে আমার বহুকালের অনেক সংকল্পের গ্রন্থি শিথিল হয়ে এসেছে। যে কারণেই হোক, তোমাদের মন এখন আর প্রস্তুত নেই আশ্রমের সকল

অনুষ্ঠানের সকল কর্তব্যকর্মের অন্তরের উদ্দেশ্যটি গ্রহণ করতে, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। এর জন্যে শুধু তোমরা নও, আমরা সকলেই দায়ী।

আজ মনে পড়ছে চল্লিশ বৎসর পূর্বের একটি দিনের কথা। বাংলার নিভৃত এক প্রান্তে আমি তখন ছিলাম পদ্মানদীর নির্জন তীরে। মন যখন সে দিকে তাকায়, দেখতে পায় যেন এক দূর যুগের প্রত্যুষের আভা। কখন এক উদ্‌বোধনের মন্ত্র হঠাৎ এল আমার প্রাণে। তখন কেবলমাত্র কবিতা লিখে দিন কাটিয়েছি; অধ্যয়ন ও সাহিত্যালোচনার মধ্যে ডুবেছিলাম, তারই সঙ্গে ছিল বিষয়কর্মের বিপুল বোঝা।

কেন সেই শান্তিময় পল্লীশ্রীর স্নিগ্ধ আবেষ্টন থেকে টেনে নিয়ে এল আমাকে এই রৌদ্রদগ্ধ মরুপ্রান্তরে তা বলতে পারি না।

এখানে তখন বাইরে ছিল সব দিকেই বিরলতা ও বিজনতা, কিন্তু সব সময়েই মনের মধ্যে ছিল একটি পরিপূর্ণতার আশ্বাস। একাগ্রচিত্তে সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করেছি, বর্তমান কালের তুচ্ছতা ইতরতা প্রগল্‌ভতা সমস্ত দূর করতে হবে। যাদের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেছি, ভারতের যুগান্তরব্যাপী সাধনার অমৃত-উৎসে তাদের পৌঁছে দিতে পারব, এই আশাই ছিল অন্তরের গভীরে।

কতদিন এই মন্দিরের সামনের চাতালে দুটি-একটি মাত্র উপাসক নিয়ে সমবেত হয়েছি— অবিরত চেষ্টা ছিল সুপ্ত প্রাণকে জাগাবার। তারই সঙ্গে আরও চেষ্টা ছিল ছেলেদের মনে তাদের স্বাধীন কর্মশক্তি ও মননশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে। কোনোদিনই খণ্ডভাবে আমি শিক্ষা দিতে চাই নি। ক্লাসের বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষার সমগ্রতাকে আমি কখনও বিপর্যস্ত করি নি।

সেদিনের সে আয়োজন অন্ধ-অনুষ্ঠানের দ্বারা ম্লান ছিল না, অপমানিত ছিল না অভ্যাসের ক্লান্তিতে। এমন কোনো কাজ ছিল না যার সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল না আশ্রমের কেন্দ্রস্থলবর্তী শ্রদ্ধার একটি মূল উৎসের সঙ্গে। স্নানপান-আহারে সেদিনের সমগ্র জীবনকে অভিষিক্ত করেছিল এই উৎস। শান্তিনিকেতনের আকাশ-বাতাস পূর্ণ ছিল এরই চেতনায়। সেদিন কেউ একে অবজ্ঞা করে অন্যমনস্ক হতে পারত না।

আজ বার্ধক্যের ভাঁটার টানে তোমাদের জীবন থেকে দূরে পড়ে গেছি। প্রথম যে আদর্শ বহন করে এখানে এসেছিলুম, আমার জীর্ণ শক্তির অপটুতা থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে নিজের হাতে বহন করবার আনন্দিত উদ্যম কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে। মনে হয়, এ যেন বর্তমান কালেরই বৈশিষ্ট্য। সব-কিছুকে সন্দেহ করা, অপমান করা, এতেই যেন তার স্পর্ধা। তারই তো বীভৎস লক্ষণ মারীবিস্তার করে ফুটে উঠেছে দেশে বিদেশে আজকের দিনের রাষ্ট্রে সমাজে, বিদ্রূপ করছে তাকে যা মানব-সভ্যতার চিরদিনের সাধনার সামগ্রী।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন এখানে প্রথম আসি তখন আশ্রমের আকাশ ছিল নির্মল। কেবল তাই নয়, তখন বিষবাষ্প ব্যাপ্ত হয় নি মানবসমাজের দিগ্‌দিগন্তে।

আজ আবার আসছি তোমাদের সামনে যেন বহুদূরের থেকে। আর-একবার মনে পড়ছে এই আশ্রমে প্রথম প্রবেশ করবার দীর্ঘ বন্ধুর পথ। বিরুদ্ধ ভাগ্যের নির্মমতা ভেদ করে সেই-যে পথযাত্রা চলেছিল সম্মুখের দিকে তার দুঃসহ দুঃখের ইতিহাস কেউ জানবে না। আজ এসেছি সেই দুঃখস্মৃতির ভিতর দিয়ে। উৎকণ্ঠিত মনে তোমাদের মধ্যে খুঁজতে এলাম তার সার্থকতা। আধুনিক যুগের

শ্রদ্ধাহীন স্পর্ধা দ্বারা এই তপস্যাকে মন থেকে প্রত্যাখ্যান কোরো না— একে স্বীকার করে নাও।

ইতিহাসে বিপর্যয় বহু ঘটেছে, সভ্যতার বহু কীর্তিমন্দির যুগে যুগে বিধ্বস্ত হয়েছে, তবু মানুষের শক্তি আজও সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। সেই ভরসার 'পরে ভর করে মজ্জমান তরী উদ্ধার-চেষ্টা করতে হবে, নতুন হাওয়ার পালে সে আবার যাত্রা শুরু করবে। কালের স্রোত বর্তমান যুগের নবীন কর্ণধারদেরকেও ভিতরে ভিতরে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তা সব সময় তাঁদের অনুভূতিতে পৌঁছয় না। একদিন যখন প্রগল্‌ভ তর্কের এবং বিদ্রূপমুখর অট্টহাস্যের ভিতর দিয়ে তাঁদেরও বয়সের অঙ্ক বেড়ে যাবে তখন সংশয়শুষ্ক বন্ধ্যা বুদ্ধির অভিমান প্রাণে শান্তি দেবে না। অমৃত-উৎসের অন্বেষণ তখন আরম্ভ হবে জীবনে।

সেই আশা-পথের পথিক আমরা, নূতন প্রভাতের উদ্‌বোধনমন্ত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে গান করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, যে শ্রদ্ধায় আছে অপরাজেয় বীর্য, নাস্তিবাদের অন্ধকারে যার দৃষ্টি পরাহত হবে না, যে ঘোষণা করবে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

শান্তিনিকেতন
৮ শ্রাবণ ১৩৪৭

পরিশিষ্ট

এই আশ্রমের গুরুর অনুজ্ঞায় ও আপনাদের অনুমতিতে আমাকে যে সভাপতির ভার দেওয়া হল তাহা আমি শিরোধার্য করে নিচ্ছি। আমি এ ভারের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু আজকের এই প্রতিষ্ঠান বিপুল ও বহুযুগব্যাপী। তাই ব্যক্তিগত বিনয় পরিহার করে আমি এই অনুষ্ঠানে ব্রতী হলাম। বহু বৎসর ধরে এই আশ্রমে একটা শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই ধরনের এডুকেশনাল এক্স্পেরিমেণ্ট দেশে খুব বিরল। এই দেশ তো আশ্রম-সংঘ-বিহারের দেশ। কোথাও কোথাও 'গুরুকুল'এর মতো দু-একটা এমনি বিদ্যালয় থাকলেও, এটি এক নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত। এর স্থান আর কিছুতে পূর্ণ হতে পারে না। এখানে খোলা আকাশের নিচে প্রকৃতির ক্রোড়ে মেঘরৌদ্রবৃষ্টিবাতাসে বালকবালিকারা লালিত-পালিত হচ্ছে। এখানে শুধু বহিরঙ্গ-প্রকৃতির আবির্ভাব নয়, কলাসৃষ্টির দ্বারা অন্তরঙ্গ-প্রকৃতিও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জেগে উঠেছে। এখানকার বালকবালিকারা এক-পরিবারভুক্ত হয়ে আচার্যদের মধ্যে রয়েছে। একজন বিশ্বপ্রাণ পার্সনালিটি এখানে সর্বদাই এর মধ্যে জাগ্রত রয়েছেন। এমনিভাবে এই বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। আজ সেই ভিত্তির প্রসার ও পূর্ণাঙ্গতা সাধন হতে চলল। আজ এখানে বিশ্ব-ভারতীর অভ্যুদয়ের দিন। 'বিশ্বভারতী'র কোষানুযায়িক অর্থের দ্বারা আমরা বুঝি যে, যে 'ভারতী' এতদিন অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিলেন আজ তিনি প্রকট হলেন। কিন্তু এর মধ্যে আর-একটি ধ্বনিগত অর্থও আছে—বিশ্ব ভারতের কাছে এসে পেঁছবে, সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত করে, ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত করে আবার সেই প্রাণকে বিশ্বের কাছে উপস্থিত করব। সেই ভাবেই বিশ্বভারতীর নামের সার্থকতা আছে।

একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। ভারতের মহাপ্রাণ কোন্‌টা। যে মহাপ্রাণ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে তাকে ধরতে গিয়ে আমরা যদি বিশ্বের সঙ্গে কারবার স্থাপন ও আদানপ্রদান না করি তবে আমাদের আত্মপরিচয় হবে না। Each can realize himself only by helping others as a whole to realize them-selves এ যেমন সত্য, এর converse অর্থাৎ others can realize themselves by helping each individual to realize himselfও তেমনি সত্য। অপরে আমার লক্ষ্যের পথে, যাবার পথে যেমন মধ্যবর্তী তেমনি আমিও তার মধ্যবর্তী; কারণ আমাদের উভয়কে যেখানে ব্রহ্ম বেষ্টন করে আছেন সেখানে আমরা এক, একটি মহা ঐক্যে অন্তরঙ্গ হয়ে আছি। এ ভাবে দেখতে গেলে, বিশ্বভারতীতে ভারতের প্রাণ কী তার পরিচয় পেতে হবে, তাতে করে জগতের যে পরিচয় ঘটবে তার রূপে আত্মাকে প্রতিফলিত দেখতে পাব।

আমি আজ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আজ জগৎ জুড়ে একটি সমস্যা রয়েছে। সর্বত্রই একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা যাচ্ছে—সে বিদ্রোহ প্রাচীন সভ্যতা, সমাজতন্ত্র, বিদ্যাবুদ্ধি, অনুষ্ঠান, সকলের বিরুদ্ধে। আমাদের আশ্রম দেবালয় প্রভৃতি যা-কিছু হয়েছিল তা যেন সব ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। বিদ্রোহের অনল জ্বলছে, তা অর্ডার-প্রগ্রেসকে মানে না, রিফর্ম চায় না, কিছুই চায় না। যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেল এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তার চেয়ে বড়ো যুদ্ধ চলে আসছে,

গত মহাযুদ্ধ তারই একটা প্রকাশ মাত্র। এই সমস্যার পূরণ কেমন করে হবে, শান্তি কোথায় পাওয়া যাবে। সকল জাতিই এর উত্তর দেবার অধিকারী। এই সমস্যায় ভারতের কী বলবার আছে, দেবার আছে?

আমরা এত কালের ধ্যানধারণা থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার দ্বারা এই সমস্যা পূরণ করবার কিছু আছে কি না। য়ুরোপে এ সম্বন্ধে যে চেষ্টা হচ্ছে সেটা পোলিটিকাল অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনের দিক দিয়ে হয়েছে। সেখানে রাজনৈতিক ভিত্তির উপর ট্রীটি, কন্‌ভেন্‌শন, প্যাক্ট্‌-এর ভিতর দিয়ে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে। এ হবে এবং হবার দরকারও আছে। দেখছি সেখানে মাল্‌টিপল্‌ অ্যালায়েন্স্‌ হয়েও হল না, বিরোধ ঘটল। আর্‌বিট্রেশন কোর্ট এবং হেগ-কন্‌ফারেন্সে হল না; শেষে লীগ অব নেশন্‌স্‌-এ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার অবলম্বন হচ্ছে limitation of armaments। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, এ ছাড়া আরও অন্য দিকে চেষ্টা করতে হবে; কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক দিকে এর চেষ্টা হওয়া দরকার। Universal simultaneous disarmament of all nations-এর জন্য নূতন হিউম্যানিজ্‌মের রিলিজ্যাস মূভ্‌মেণ্ট্‌ হওয়া উচিত। তার ফল-স্বরূপ যে মেশিনারি হবে তা পার্লামেণ্ট বা ক্যাবিনেটের ডিপ্লোম্যাসির অধীনে থাকবে না। পার্লামেণ্টসমূহের জয়েণ্ট্‌ সিটিং তো হবেই, সেইসঙ্গে বিভিন্ন people-এরও কন্‌ফারেন্স্‌ হলে তবেই শান্তির প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস আবশ্যক হবে— mass-এর life, mass-এর religion। বর্তমান কালে কেবলমাত্র inidividual salvation-এ চলবে না; সর্বমুক্তিতেই এখন মুক্তি, না হলে মুক্তি নেই। ধর্মের এই mass life-এর দিকটা সমাজে স্থাপন করতে হবে।

ভারতের এ সম্বন্ধে কী বাণী হবে। ভারতও শান্তির অনুধাবন করেছে, চীন-দেশও করেছে। চীনে সামাজিক দিক দিয়ে তার চেষ্টা হয়েছে। যদি social fellowship of man with man হয় তবেই international peace হবে, নয় তো হবে না। কন্‌ফ্যুসিয়সের গোড়ার কথাই এই যে, সমাজ একটা পরিবার, শান্তি সামাজিক ফেলোশিপ-এর উপর স্থাপিত; সমাজে যদি শান্তি হয় তবেই বাইরে শান্তি হতে পারে। ভারতবর্ষে এর আর-একটা ভিত্তি দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে অহিংসা মৈত্রী শান্তি। প্রত্যেক inidividual-এ বিশ্বরূপদর্শন এবং তারই ভিতর ব্রহ্মের ঐক্যকে অনুভব করা; এই ভাবের মধ্যে যে peace আছে ভারতবর্ষ তাকেই চেয়েছে। ব্রহ্মের ভিত্তিতে আত্মাকে স্থাপন করে যে peace compact হবে তাতেই শান্তি আনবে। এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় চীনদেশের সোশ্যাল ফেলোশিপ এবং ভারতের আত্মার শান্তি এই দুইই চাই, নতুবা লীগ অব নেশন্‌স্‌-এ কিছু হবে না। গ্রেট ওঅর-এর থেকেও বিশালতর যে দ্বন্দ্ব জগৎ জুড়ে চলছে তার জন্য ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীকে বাণী দিতে হবে।

ভারতবর্ষ দেখেছে যে, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে State আছে তা কিছু নয়। সে বলেছে যে, নেশনের বাইরেও মহা সত্য আছে, সনাতন ধর্মেই তার স্বাজাত্য রয়েছে। যেখানে আত্মার বিকাশ ও ব্রহ্মের আবির্ভাব সেখানেই তাহার দেশ। ভারতবর্ষ ধর্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই extra-territorial nationality-তে বিশ্বাস করেছে। এই ভাবের অনুসরণ করে লীগ অব নেশন্‌স্‌-এর ন্যাশনালিটির ধারণাকে সংশোধিত করতে হবে। তেমনি আত্মার দিক দিয়ে extra-territorial sovereigntyর ভাবকে স্থান দিতে হবে। এমনিভাবে Federation of the World স্থাপিত হতে পারে, এখনকার সময়ের উপযোগী করে লীগ অব

নেশন্‌স্‌-এ এই extra-territorial nationalityর কথা উত্থাপন করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দিক দিয়ে এই বাণী দেবার আছে। আমরা দেখতে পাই যে, বৌদ্ধ প্রচারকগণ এই ভাবটি প্রচার করেছিলেন যে, প্রত্যেক রাজার code এমন হওয়া উচিত যা শুধু নিজের জাতির নয়, অপর সব জাতির সমানভাবে হিত-সাধন করতে পারবে। ভারতের ইতিহাসে এই বিধিটি সর্বদা রক্ষিত হয়েছে, তার রাজারা জয়ে পরাজয়ে, রাজচক্রবর্তী হয়েও, এমনি করে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধকে স্বীকার করেছেন।

সামাজিক জীবন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মেসেজ্‌ কী। আমাদের এখানে গ্রুপ ও কম্যুনিটির স্থান খুব বেশি। এরা intermediary body between state and individual। রোম প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থার ফলে স্টেট ও ইন্‌ডিভিজুয়ালে বিরোধ বেধেছিল; শেষে ইন্‌ডিভিজুয়ালিজ্‌মের পরিণতি হল অ্যানার্কিতে, এবং স্টেট, মিলিটারি সোশ্যালিজ্‌মে গিয়ে দাঁড়াল। আমাদের দেশের ইতিহাসে গ্রামে বর্ণাশ্রমে এবং ধর্মসংঘের ভিতরে কম্যুনিটির জীবনকেই দেখতে পাই। বর্ণাশ্রমে যেমন প্রতি ব্যক্তির কিছু প্রাপ্য ছিল, তেমনি তার কিছু দেয়ও ছিল, তাকে কতকগুলি নির্ধারিত কর্তব্য পালন করতে হত। Community in the Individual যেমন আছে তেমনি the Individual in the Communityও আছে। প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনে গ্রুপ পার্সনালিটি এবং ইন্‌ডিভিজুয়াল পার্সনালিটি জাগ্রত আছে, এই উভয়েরই সমান প্রয়োজন আছে। গ্রুপ পার্সনালিটির ভিতর ইন্‌ডিভিজুয়ালের স্বাধিকারকে স্থান দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে ত্রুটি রয়ে গেছে যে, আমাদের ইন্‌ডিভিজুয়াল পার্সনালিটির বিকাশ হয় নি, co-ordination of power in the stateও হয় নি। আমরা ইন্‌ডিভিজুয়াল পার্সনালিটির দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, ব্যূহবদ্ধ শত্রুর হাতে আমাদের লাঞ্ছিত হতে হয়েছে।

আজকাল য়ুরোপে group principle-এর দরকার হচ্ছে। সেখানে political organization, economic organization, এসবই group গঠন করার দিকে যাচ্ছে। আমাদেরও এই পথে সমস্যাপূরণ করবার আছে। আমাদের যেমন য়ুরোপের কাছ থেকে স্টেটের centralization ও organization নেবার আছে তেমনি য়ুরোপকেও group principle দেবার আছে। আমরা সে দেশ থেকে economic organization-কে গ্রহণ করে আমাদের village community-কে গড়ে তুলব। কৃষিই আমাদের জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন, সুতরাং ruralization-এর দিকে আমাদের চেষ্টাকে নিয়োগ করতে হবে। অবশ্য আমি সেজন্য বলছি না যে, town life-কে develop করতে হবে না; তারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের ভূমির সঙ্গে প্রাণের যোগ-সাধন করতে হবে। ভূমির সঙ্গে ownership-এর সম্বন্ধ হলে তবে স্বাধীনতা থাকতে পারে। কারখানার জীবনও দরকার আছে, কিন্তু ভূমি ও বাস্তুর সঙ্গে individual ownership-এর যোগকে ছেড়ে না দিয়ে large-scale production আনতে হবে। বড়ো আকারে energyকে আনতে হবে, কিন্তু দেখতে হবে, কলের energy মানুষের আত্মাকে পীড়িত অভিভূত না করে, যেন জড় না করে দেয়। সমবায়প্রণালীর দ্বারা হাতের কলকেও দেশে স্থান দিতে হবে। এমনিভাবে economic organization-এ ভারতকে আত্মপরিচয় দিতে হবে। আমাদের স্ট্যান্ডার্ড অব লাইফ এত নিম্নস্তরে আছে যে, আমরা decadent হয়ে মরতে বসেছি। যে প্রণালীতে efficient organization-

এর নির্দেশ করলাম তাকে না ছেড়ে বিজ্ঞানকে আমাদের প্রয়োজনসাধনে লাগাতে হবে। আমাদের বিশ্বভারতীতে তাই, রাষ্ট্রনীতি সমাজধর্ম ও অর্থনীতির যে যে ইন্‌স্টিটট্যুশন পৃথিবীতে আছে, সে সবকেই স্টাডি করতে হবে, এবং আমাদের দৈন্য কেন ও কোথায় তা বুঝে নিয়ে আমাদের অভাব পূরণ করতে হবে। কিন্তু এতে করে নিজের প্রাণকে ও সৃজনীশক্তিকে যেন বাইরের চাপে নষ্ট না করি। যা-কিছু গ্রহণ করব তাকে ভারতের ছাঁচে ঢেলে নিতে হবে। আমাদের সৃজনীশক্তির দ্বারা তারা coined into our flesh and blood হয়ে যাওয়া চাই।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্কীম অব লাইফ আছে কিন্তু তাদের ইতিহাস ও ভূপরিচয়ের মধ্যেও একটি বৃহৎ ঐক্য আছে, এই বিভিন্নতার মধ্যেও এক জায়গায় unity of human race আছে। তাদের সেই ইতিহাস ও ভূগোলের বিভিন্ন environment-এর জন্য যে life values সৃষ্ট হয়েছে, পরস্পরের যোগাযোগের দ্বারা তাদের বিস্তৃতি হওয়া প্রয়োজন। এই লাইফ-স্কীমগুলির আদান-প্রদানে বিশ্বে তাদের বৃহৎ লীলাক্ষেত্র তৈরি হবে।

আমাদের জাতীয় চরিত্রে কী কী অভাব আছে, কী কী আমাদের বাইরে থেকে আহরণ করতে হবে। আমাদের মূল ত্রুটি হচ্ছে, আমরা বড়ো একপেশে— ইমোশনাল। আমাদের ভিতরে will ও intellect-এর মধ্যে, সব্‌জেক্‌টিভিটি ও অব্‌জেক্‌টিভিটির মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘটেছে। আমরা হয় খুব সব্‌জেক্‌টিভ্‌, নয়তো খুব য়ুনিভার্সাল। অনেক সময়েই আমরা য়ুনিভার্সালিজ্‌মের বা সাম্যের চরম সীমায় চলে যাই, কিন্তু differentiation-এ যাই না। আমাদের অব্‌জেক্‌টি-ভিটির পূর্ণ বিকাশ হওয়া দরকার। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও অব্‌জার্‌ভেশনের ভিতর দিয়ে মনের সত্যানুবর্তিতাকে ও শৃঙ্খলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের intellect-এর character-এর অভাব আছে, সুতরাং আমাদের intellectual honesty-র প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। তা হলেই দেখব যে, কর্তব্য-বোধ জাগ্রত হয়েছে। অন্য দিকে আমাদের moral ও personal responsibilityর বোধকে জাগাতে হবে, Law, Justice ও Equality-র যা লুপ্ত হয়ে গেছে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে—এসকল বিষয়ে আমাদের শিক্ষা আহরণ করতে হবে। আমাদের মধ্যে বিশ্বকে না পেলে আমরা নিজেকে পাব না। তাই বিশ্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করে আমরা আত্মপরিচয় লাভ করব এবং আমাদের বাণী বিশ্বকে দেব।

এ দেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু সেখান থেকে cast iron ও rigid standardized product তৈরি হচ্ছে। শান্তিনিকেতনে naturalness-এর স্থান হয়েছে, আশা করি বিশ্বভারতীতে সেই spontaneityর বিকাশের দিকে দৃষ্টি থাকবে। য়ুনিভার্সিটিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। এশিয়ার genius য়ুনিভার্সাল হিউম্যানিজ্‌ম্‌-এর দিকে, অতএব ভারতের এবং এশিয়ার interestএ এরূপ একটি য়ুনিভার্সিটির প্রয়োজন আছে। পূর্বে যে সংঘ ও বিহারের দ্বারা ভারতের সার্থকতা-সাধন হয়েছিল, তাদেরই এ যুগের উপযোগী করে, সেই পুরাতন আরণ্যককে বিশ্বভারতী রূপে এখানে পত্তন করা হয়েছে।

৮ পৌষ ১৩২৮। শান্তিনিকেতন
বিশ্বভারতী পরিষদ্‌-সভার
প্রতিষ্ঠা-উৎসবে
সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম

ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণসহ রবীন্দ্রনাথ

প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ

হে সৌম্য মানবকগণ, অনেককাল পূর্বে আমাদের এই দেশ, এই ভারতবর্ষ, সকল বিষয়ে যথার্থ বড়ো ছিল— তখন এখানকার লোকেরা বীর ছিলেন; তাঁরাই আমাদের পূর্বপুরুষ।

যথার্থ বড়ো কাকে বলে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কী হলে আপনাদের বড়ো মনে করতেন? আজকাল আমাদের মনে তাঁদের সেই বড়ো ভাবটি নেই বলেই ধনকেই আমরা বড়ো হবার উপায় মনে করি, ধনীকেই আমরা বলি বড়োমানুষ। তাঁরা তা বলতেন না। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে যাঁরা বড়ো ছিলেন সেই ব্রাহ্মণরা ধনকে তুচ্ছ করতেন। তাঁদের বেশভূষা বিলাসিতা কিছুই ছিল না। অথচ বড়ো বড়ো রাজারা এসে তাঁদের কাছে মাথা নত করতেন।

যে মানুষ কাপড়চোপড় জুতোছাতা নিয়ে নিজেকে বড়ো মনে করে, ভেবে দেখো দেখি সে কত ছোটো। জুতো কি মানুষকে বড়ো করতে পারে। দামি জুতো দামি কাপড় কি আমাদের কোনো গুণের পরিচয় দেয়। আমাদের প্রাচীন-কালে যেসব ঋষিদের পায়ে জুতো ছিল না, গায়ে পোশাক ছিল না, তাঁরা কি সাহেবের বাড়ির জুতো এবং বিলাতি দোকানের কাপড় পরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন না। আজ যদি আমাদের সেই যাজ্ঞবল্ক্য, সেই বশিষ্ঠ ঋষি খালি গায়ে খালি পায়ে তাঁদের সেই জ্যোতির্ময় দৃষ্টি, তাঁদের সেই পিঙ্গল জটাভার নিয়ে আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ান, তাহলে সমস্ত দেশের মধ্যে এমন কোন্ রাজা এমন কত বড়ো সাহেব আছেন যিনি তাঁর জুতো ফেলে দিয়ে মাথার তাজ নামিয়ে, সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলা নিয়ে নিজেকে কৃতার্থ না মনে করেন। আজ এমন কে আছে যে তার গাড়ি জুড়ি অট্টালিকা এবং সোনার চেন নিয়ে তাঁদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

তাঁরাই আমাদের পিতামহ ছিলেন, সেই পূজ্য ব্রাহ্মণদের আমরা নমস্কার করি। কেবল মাথা নত করে নমস্কার করা নয়— তাঁরা যে শিক্ষা দিয়েছেন তাই গ্রহণ করি, তাঁরা যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তার অনুসরণ করি। তাঁদের মতো হবার চেষ্টা করাই হচ্ছে তাঁদের প্রতি ভক্তি করা।

তাঁরা বড়ো হয়েছিলেন কী গুণে। তাঁরা সত্যকে সকলের চেয়ে বড়ো বলে জানতেন— মিথ্যার কাছে তাঁরা মাথা নিচু করেন নি। সত্য কী তাই জানবার জন্যে সমস্ত জীবন তাঁরা কঠিন তপস্যা করতেন— কেবল আমোদ-প্রমোদ করেই জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। যাতে সত্য জানবার কিছুমাত্র ব্যাঘাত করত তাকে তাঁরা অনায়াসে পরিত্যাগ করতেন। মনে সত্য জানবার অবিশ্রাম চেষ্টা করতেন, মুখে সত্য বলতেন, এবং সত্য বলে যা জানতেন কাজেও তাই পালন করতেন, সেজন্যে কাউকে ভয় করতেন না। আমরা টাকাকড়ি জুতোছাতা পাবার জন্যে যেরকম প্রাণপণ খেটে মরি, তাঁরা সত্যকে পাবার জন্যে তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট স্বীকার করতেন। সেইজন্যে তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বড়ো ছিলেন।

তাঁরা অভয় ছিলেন, ধর্ম ছাড়া আর-কিছুকেই ভয় করতেন না। তাঁদের মনের মধ্যে এমন একটি তেজ ছিল, সর্বদাই এমন একটি আনন্দ ছিল যে, তাঁরা কোনো রাজা-মহারাজার অন্যায় শাসনকে গ্রাহ্য করতেন না, এমনকি, মৃত্যুকেও তাঁরা ভয় করতেন না। তাঁরা এটা বেশ জানতেন যে, তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেবার তো কিছু নেই—বেশভূষা ধনসম্পদ গেলে তো তাঁদের কোনো ক্ষতিই হয় না। তাঁদের যা-কিছু আছে সব মনের মধ্যে। তাঁরা যে সত্য জানতেন তা তো দস্যু কিম্বা রাজা হরণ করতে পারত না। তাঁরা নিশ্চয় জানতেন মৃত্যু ভয়ের বিষয় নয়। মৃত্যুতে এই শরীরটা মাত্র যায়, কিন্তু অন্তরের জিনিস যায় না।

তাঁরা সকলের মঙ্গলের জন্যে ভালোর জন্যে চিন্তা করতেন, কিসে সকলের ভালো হবে সেইটে তাঁরা ধ্যান করতেন এবং যাতে ভালো হয় সেইটে তাঁরা ব্যবস্থা করতেন। কার কী করা উচিত সেইটে সকলে তাঁদের কাছে জানতে আসত। কিসে ঘরের লোকের মঙ্গল হয় তাই জানবার জন্য গৃহস্থ লোকেরা তাঁদের কাছে আসত—কিসে প্রজাদের ভালো হয় তাই পরামর্শ নেবার জন্যে রাজারা তাঁদের কাছে আসত। পৃথিবীর সকলের ভালোর জন্য তাঁরা সমস্ত আমোদপ্রমোদ সমস্ত বিলাসিতা ত্যাগ করে চিন্তা করতেন।

কিন্তু তখন কি কেবল ব্রাহ্মণ-ঋষিরাই ছিলেন। তা নয়। রাজারাও ছিলেন, রাজার সৈন্যসামন্ত ছিল। রাজ্যের প্রয়োজনে তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ করতে হত। কিন্তু যুদ্ধের সময়েও তাঁরা ধর্ম ভুলতেন না। যে-লোকের হাতে অস্ত্র নেই তাকে মারতেন না, শরণাপন্নকে বধ করতেন না, রথের উপর চড়ে নিচের লোকদের উপর অস্ত্র চালাতেন না। সৈন্যে-সৈন্যেই যুদ্ধ চলত, কিন্তু শত্রুপক্ষের দেশের নিরীহ প্রজাদের, ঘরদুয়োর জ্বালিয়ে দিতেন না। রাজার ছেলের যখন বড়ো বয়স হত তখন রাজা আপনার সমস্ত টাকাকড়ি রাজত্ব ছেলের হাতে দিয়ে সত্য জানবার জন্য, ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত মন দেবার জন্যে বনে চলে যেতেন। তখন আর তাঁদের হীরা-মুক্তো ছাতাজুতো লোকজন কিছুই থাকত না। রাজ্যেশ্বর রাজা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দীনহীনের মতো সমস্ত ছেড়ে যেতেন। তাঁরা জানতেন রাজ্য টাকাকড়ি বাইরের জিনিস, তাতেই যে মানুষ বড়ো হয় তা নয়, বড়ো হবার জিনিস ভিতরে। তবে ধর্মনিয়মমতে রাজত্ব করা রাজার কর্তব্য, সুতরাং সেজন্যে প্রাণ দেওয়া দরকার হলে তাও দিতেন—কিন্তু যুবরাজ বড়ো হয়ে উঠলে যখন সে কর্তব্যের শেষ হয় তখন আর তাঁরা রাজত্ব আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতেন না।

গৃহস্থদেরও ঐরকম নিয়ম ছিল। যখন জ্যেষ্ঠ পুত্র বড়ো হয়ে উঠত তখন তারই হাতে সমস্ত সংসার দিয়ে তাঁরা দরিদ্র বেশে তপস্যা করতে চলে যেতেন। যতদিন সংসারে থাকতে হত ততদিন প্রাণপণে তাঁরা সংসারের কাজ করতেন। আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী অতিথি অভ্যাগত দরিদ্র অনাথ কাউকেই ভুলতেন না—প্রাণপণে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ দূরে রেখে তাদেরই সেবা করতেন—তার পরে সময় উত্তীর্ণ হলেই আর ধনসম্পদ ঘরদুয়ারের প্রতি তাকাতেন না।

তখন যাঁরা বাণিজ্য করতেন তাঁদেরও ধর্মপথে সত্যপথে চলতে হত। কাউকে ঠকানো, অন্যায় সুদ নেওয়া, কৃপণের মতো সমস্ত ধন কেবল নিজের জন্যেই জড়ো করে রাখা, এ তাঁদের দ্বারা হত না।

যাঁরা রাজত্ব করতেন, যাঁরা বাণিজ্য করতেন, যাঁরা কর্ম করতেন, তাঁদের সকলের জন্যই ব্রাহ্মণেরা চিন্তা করতেন। যাতে সমাজে ধর্ম থাকে, সত্য থাকে, শৃঙ্খলা থাকে, যাতে ভালো হয়, এই তাঁদের একান্ত লক্ষ্য ছিল। সেইজন্য তাঁদের আদর্শে

তাঁদের উপদেশে তখনকার সকল লোকেই ভালো হয়ে চলতে পারত। সমস্ত সমাজের মধ্যে সেইজন্যে এত উন্নতি এত শ্রী ছিল।

সেই তখনকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা যে-শিক্ষা যে-ব্রত অবলম্বন করে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন, বীর হয়ে উঠেছিলেন, সেই শিক্ষা সেই ব্রত গ্রহণ করবার জন্যেই তোমাদের এই নির্জন আশ্রমের মধ্যে আমি আহ্বান করেছি। তোমরা আমার কাছে এসেছ— আমি সেই প্রাচীন ঋষিদের সত্যবাক্য তাঁদের উজ্জ্বল চরিত মনের মধ্যে সর্বদা ধারণ করে রেখে তোমাদের সেই মহাপুরুষদের পথে চালনা করতে চেষ্টা করব— আমাদের ব্রতপতি ঈশ্বর আমাকে সেই বল সেই ক্ষমতা দান করুন। যদি আমাদের চেষ্টা সফল হয় তবে তোমরা প্রত্যেকে বীরপুরুষ হয়ে উঠবে— তোমরা ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মাণ হবে না, ধনের গর্বে স্ফীত হবে না; মৃত্যুকে গ্রাহ্য করবে না, সত্যকে জানতে চাইবে, মিথ্যাকে মন থেকে কথা থেকে কাজ থেকে দূর করে দেবে, সর্বদা জগতের সকল স্থানেই মনে এবং বাইরে এক ঈশ্বর আছেন এইটে নিশ্চয় জেনে আনন্দমনে সকল দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কর্তব্যকর্ম প্রাণপণে করবে, সংসারের উন্নতি ধর্মপথে থেকে করবে, অথচ যখন কর্তব্যবোধে ধনসম্পদ ও সংসার ত্যাগ করতে হবে তখন কিছুমাত্র ব্যাকুল হবে না। তাহলে তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে— তোমরা যেখানে থাকবে সেইখানেই মঙ্গল হবে, তোমরা সকলের ভালো করবে এবং তোমাদের দেখে সকলে ভালো হবে।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিরূপ শিক্ষা ও ব্রত অবলম্বন করতেন? তাঁরা বাল্যকালে গৃহ ছেড়ে নির্জনে গুরুর বাড়িতে যেতেন। সেখানে খুব কঠিন নিয়মে নিজেকে সংযত করে থাকতে হত। গুরুকে একান্তমনে ভক্তি করতেন, গুরুর সমস্ত কাজ করে দিতেন। গুরুর জন্যে কাঠ কাটা, জল তুলে আনা, তাঁর গোরু চরানো, তাঁর জন্যে গ্রাম থেকে ভিক্ষে করে আনা, এইসমস্ত তাঁদের কাজ ছিল, তা তাঁরা যত বড়ো ধনীর পুত্র হোন-না। শরীর-মনকে একেবারে পবিত্র রাখতে হবে— তাঁদের শরীরে ও মনে কোনো-রকম দোষ একেবারে স্পর্শ করত না। গেরুয়া বস্ত্র পরতেন, কঠিন বিছানায় শুতেন, পায়ে জুতো নেই, মাথায় ছাতা নেই— সাজসজ্জা বড়োমানুষি কিছুমাত্র নেই। সমস্ত মনের সমস্ত চেষ্টা কেবল শিক্ষালাভে, কেবল সত্যের সন্ধানে, কেবল নিজের দুষ্প্রবৃত্তি-দমনে, নিজের ভালো গুণকে ফুটিয়ে তুলতে নিযুক্ত থাকত।

তোমাদের সেইরকম কষ্ট স্বীকার করে সেই কঠিন নিয়মে, সকলপ্রকার বড়োমানুষিকে তুচ্ছ করে দিয়ে এখানে গুরুগৃহে বাস করতে হবে। গুরুকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা করবে, মনে বাক্যে কাজে তাঁকে লেশমাত্র অবজ্ঞা করবে না। শরীরকে পবিত্র করে রাখবে— কোনো দোষ যেন স্পর্শ না করে। মনকে গুরু-উপদেশের সম্পূর্ণ অধীন করে রাখবে।

আজ থেকে তোমরা সত্যব্রত গ্রহণ করলে। মিথ্যাকে কায়মনোবাক্যে দূরে রাখবে। প্রথমত সত্য জানবার জন্য সবিনয়ে সমস্ত মন বুদ্ধি ও চেষ্টা দান করবে, তার পরে যা সত্য বলে জানবে তা নির্ভয়ে সতেজে পালন ও ঘোষণ করবে।

আজ থেকে তোমাদের অভয়ব্রত। ধর্মকে ছাড়া জগতে তোমাদের ভয় করবার আর কিছুই নেই। বিপদ না, মৃত্যু না, কষ্ট না— কিছুই তোমাদের ভয়ের বিষয় নয়। সর্বদা দিবারাত্রি প্রফুল্লচিত্তে প্রসন্নমুখে শ্রদ্ধার সঙ্গে সত্য-লাভে ধর্ম-লাভে নিযুক্ত থাকবে।

আজ থেকে তোমাদের পুণ্যব্রত। যা-কিছু অপবিত্র কলুষিত, যা-কিছু প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ হয়, তা সর্বপ্রযত্নে প্রাণপণে শরীর-মন থেকে দূর করে প্রভাতের শিশিরসিক্ত ফুলের মতো পুণ্যে ধর্মে বিকশিত হয়ে থাকবে।

আজ থেকে তোমাদের মঙ্গলব্রত। যাতে পরস্পরের ভালো হয় তাই তোমাদের কর্তব্য। সেজন্যে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ বিসর্জন।

এক কথায় আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত। এক ব্রহ্ম তোমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বদা সকল স্থানেই আছেন। তাঁর কাছ থেকে কিছুই লুকোবার জো নেই। তিনি তোমাদের মনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দেখছেন। যখন যেখানে থাক, শয়ন কর, উপবেশন কর, তাঁর মধ্যেই আছ, তাঁর মধ্যেই সঞ্চরণ করছ। তোমার সর্বাঙ্গে তাঁর স্পর্শ রয়েছে—তোমার সমস্ত ভাবনা তাঁরই গোচরে রয়েছে। তিনিই তোমাদের একমাত্র ভয়, তিনিই তোমাদের একমাত্র অভয়।

প্রত্যহ অন্তত একবার তাঁকে চিন্তা করবে। তাঁকে চিন্তা করবার মন্ত্র আমাদের বেদে আছে। এই মন্ত্র আমাদের ঋষিরা দ্বিজেরা প্রত্যহ উচ্চারণ করে জগদীশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হতেন। সেই মন্ত্র, হে সৌম্য, তুমিও আমার সঙ্গেসঙ্গে একবার উচ্চারণ করো :

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।

৭ পৌষ ১৩০৮
প্রথম প্রকাশ:
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
মাঘ ১৮২৩ শক

প্রথম কার্যপ্রণালী

বিনয়সম্ভাষণমেতৎ—

আপনার প্রতি আমি যে ভার অর্পণ করিয়াছি আপনি তাহা ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে আমি বড়ো আনন্দলাভ করিয়াছি। একান্তমনে কামনা করি, ঈশ্বর আপনাকে এই ব্রতপালনের বল ও নিষ্ঠা দান করুন।

আমি আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি, বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতযাপনের কাল। মনুষ্যত্বলাভ স্বার্থ নহে পরমার্থ—ইহা আমাদের পিতামহেরা জানিতেন। এই মনুষ্যত্বলাভের ভিত্তি যে শিক্ষা তাহাকে তাঁহারা ব্রহ্মচর্যব্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে—সংযমের দ্বারা, ভক্তিশ্রদ্ধার দ্বারা, শুচিতা দ্বারা, একাগ্র নিষ্ঠা দ্বারা সংসারাশ্রমের জন্য এবং সংসারাশ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগ সাধনের জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্যব্রত।

ইহা ধর্মব্রত। পৃথিবীতে অনেক জিনিসই কেনাবেচার সামগ্রী বটে, কিন্তু ধর্ম পণ্যদ্রব্য নহে। ইহা এক পক্ষে মঙ্গল ইচ্ছার সহিত দান ও অপর পক্ষে বিনীত ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতে হয়। এইজন্য প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পণ্যদ্রব্য ছিল না। এখন যাঁহারা শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষক, তখন যাঁহারা শিক্ষা দিতেন তাঁহারা গুরু ছিলেন। তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে এমন একটি জিনিস দিতেন যাহা গুরু-শিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ব্যতীত দানপ্রতিগ্রহ হইতেই পারে না।

ছাত্রদিগের সহিত এইরূপ পারমার্থিক সম্বন্ধ স্থাপনই শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, উদ্দেশ্য যত উচ্চ হইবে তাহার উপায়ও তত দুরূহ ও দুর্লভ হইবে। এসব কার্য ফরমাশমতো চলে না। শিক্ষক পাওয়া যায়, গুরু সহজে পাওয়া যায় না। এইজন্য যথাসম্ভব লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধৈর্যের সহিত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে হয়। সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় যতটা মঙ্গলসাধন সম্ভবপর তাহাই শিরোধার্য করিয়া লইতে হইবে এবং নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া নিজেকে প্রত্যহ সাধনার পথে অগ্রসর করিতে হইবে।

মঙ্গলব্রত গ্রহণ করিলে বাধাবিরোধ-অশান্তির জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হয়—অনেক অন্যায় আঘাতও ধৈর্যের সহিত সহ্য করিতে হইবে। সহিষ্ণুতা ক্ষমা ও কল্যাণভাবের দ্বারা সমস্ত বিরোধ-বিপ্লবকে জয় করিতে হইবে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তিশ্রদ্ধাবান্ করিতে চাই। পিতামাতায় যেরূপ দেবতার বিশেষ আবির্ভাব আছে—তেমনি আমাদের পক্ষে আমাদের স্বদেশে, আমাদের পিতৃপিতামহদিগের জন্ম ও শিক্ষা-স্থানে দেবতার বিশেষ সত্তা আছে। পিতামাতা যেমন দেবতা তেমনি স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্ত অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা—এমনকি, অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব করিতে না শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনও সার্থকতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ত্ব ছিল সেই মহত্ত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে

পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব— নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না— অতএব, বরঞ্চ অতিরিক্তমাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।

ব্রহ্মচর্য-ব্রতে ছাত্রদিগকে কাঠিন্য অভ্যাস করিতে হইবে। বিলাস ও ধনাভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে। ছাত্রদের মন হইতে ধনের গৌরব একেবারে বিলুপ্ত করিতে চাই। যেখানে তাহার কোনো লক্ষণ দেখা যাইবে সেখানে তাহা একেবারে নষ্ট করা কর্তব্য হইবে। আমার মনে হইয়াছে ... র পুত্র ... র শৌখিন দ্রব্যের প্রতি কিঞ্চিৎ আসক্তি আছে— সেটা দমন করিতে হইবে। বেশভূষা সম্বন্ধে বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেহ দারিদ্র্যকে যেন লজ্জাজনক ঘৃণাজনক না মনে করে। অশনে বসনেও শৌখিনতা দূর করা চাই।

দ্বিতীয়ত নিষ্ঠা। উঠা বসা পড়া লেখা স্নান আহার ও সর্বপ্রকার পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা সম্বন্ধে সমস্ত নিয়ম একান্ত দৃঢ়তার সহিত পালনীয়। ঘরে বাহিরে শয্যায় বসনে ও শরীরে কোনোপ্রকার মলিনতা প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। যেখানে কোনো ছাত্রের কাপড় কম আছে সেখানে সে যেন কাপড়-কাচা সাবান দিয়া স্বহস্তে প্রত্যহ নিজের কাপড় কাচে— ও ব্যবহার্য গাড়ু মাজিয়া পরিষ্কার রাখে। এবং ঘরের যে অংশে তাহার বিছানা কাপড়চোপড় ও বই প্রভৃতি থাকে সে অংশ যেন প্রত্যহ যথাসময়ে যথানিয়মে পরিষ্কার তক্‌তকে করিয়া রাখে। ছেলেরা প্রত্যহ পর্যায়ক্রমে তাহাদের অধ্যাপকদের ঘরও পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া রাখিলে ভালো হয়। অধ্যাপকদের সেবা করা ছাত্রদের অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে নির্ধারিত করা চাই।

তৃতীয়ত ভক্তি। অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নির্বিচারে ভক্তি থাকা চাই। তাঁহারা অন্যায় করিলেও তাহা বিনা বিদ্রোহে নম্রভাবে সহ্য করিতে হইবে। কোনো মতে তাঁহাদের সমালোচনা বা নিন্দায় যোগ দিতে পারিবে না। অধ্যাপকেরা যদি কখনো পরস্পরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন তবে সে সময়ে কোনো ছাত্র সেখানে উপস্থিত না থাকে তৎপ্রতি যত্নবান হইতে হইবে। কোনো অধ্যাপক ছাত্রদের সমক্ষে অন্য অধ্যাপকদের প্রতি অবজ্ঞাজনক ব্যবহার, অসহিষ্ণুতা বা রোষ প্রকাশ না করেন সে দিকে সকলের মনোযোগ থাকা কর্তব্য। ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগকে প্রত্যহ প্রণাম করিবে। অধ্যাপকগণ পরস্পরকে নমস্কার করিবেন। পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার ছাত্রদের নিকট যেন আদর্শস্বরূপ বিদ্যমান থাকে।

বিলাসত্যাগ, আত্মসংযম, নিয়মনিষ্ঠা, গুরুজনে ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ অনুকূল অবসরে আকর্ষণ করিতে হইবে।

যাঁহারা (ছাত্র বা অধ্যাপক) হিন্দুসমাজের সমস্ত আচার যথাযথ পালন করিতে চান তাঁহাদিগকে কোনোপ্রকারে বাধা দেওয়া বা বিদ্রূপ করা এ বিদ্যালয়ের নিয়ম-বিরুদ্ধ। রন্ধনশালায় বা আহারস্থানে হিন্দু-আচারবিরুদ্ধ কোনো অনিয়মের দ্বারা কাহাকেও ক্লেশ দেওয়া হইবে না।

আহ্নিক। ছাত্রদিগকে গায়ত্রীমন্ত্র মুখস্থ করাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। আমি যে ভাবে গায়ত্রী ব্যাখ্যা করি তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিলাম :

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ—

এই অংশ গায়ত্রীর ব্যাহৃতি নামে খ্যাত। চারি দিক হইতে আহরণ করিয়া আনার নাম ব্যাহৃতি। প্রথম ধ্যানকালে ভূলোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ব-

জগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে— তখনকার মতো মনে করিতে হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়াছি— আমি এখন কেবলমাত্র কোনো বিশেষ দেশবাসী নহি। বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশ্বজগতের যিনি সবিতা যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁহারই বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বজগৎ এই মুহূর্তে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাঁহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার এই-যে অসীম শক্তি যাহার দ্বারা ভূর্ভুবঃস্বর্লোক অবিশ্রাম প্রকাশিত হইতেছে, আমার সহিত তাঁহার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ— যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছে সেই কিরণের দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকার দরুন আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি— সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি এবং সেই ধীশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্তরতম রূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতারূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এ দুইই একই শক্তির বিকাশ— ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভয় হইতে বিষাদ হইতে মুক্তি লাভ করি। গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের ও অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে— এইজন্যই আর্যসমাজে এই মন্ত্রের এত গৌরব :

> যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
> য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

ব্রহ্মধারণার পক্ষে এই মন্ত্রই আমি বালকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সরল বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর জলে স্থলে অগ্নিতে ওষধি-বনস্পতিতে সর্বত্র আছেন, এই কথা মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারিত মাঠের মধ্যে অত্যন্ত সহজ। সেখানকার নির্মল আলোক আকাশ এবং প্রান্তর বিশ্বেশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ, এ কথা মনে করিয়া ভক্তি করা ছেলেদের পক্ষেও কঠিন নহে। এইজন্য গায়ত্রীর সঙ্গেসঙ্গে এই মন্ত্রটিও ছেলেরা শিক্ষা করে। গায়ত্রী সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেও এই মন্ত্রটি তাহারা ব্যবহার করিতে পারে।

ছাত্রগণ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে সকলে সমস্বরে 'ওঁ পিতানোঽসি' উচ্চারণপূর্বক প্রণাম করে। ঈশ্বর যে আমাদের পিতা, এবং তিনিই যে আমাদিগকে পিতার ন্যায় জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, ছাত্রদিগকে তাহা প্রত্যহ স্মরণ করা চাই। অধ্যাপকেরা উপলক্ষ্যমাত্র, কিন্তু যথার্থ যে জ্ঞানশিক্ষা তাহা আমাদের বিশ্বপিতার নিকট হইতে পাই। তাহা পাইতে হইলে চিত্তকে সর্বপ্রকার পাপ মলিনতা হইতে মুক্ত করিতে হয়, সে জ্ঞান পাইতে হইলে ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে হয়— সেইজন্যই ঐ মন্ত্রে আছে

> বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব—
> যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব।

'হে দেব, হে পিত, আমাদের সমস্ত পাপ দূরে কর, যাহা ভদ্র তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ কর।'

ব্রহ্মচারীদের পক্ষে জীবনের প্রতিদিনকে সকলপ্রকার শারীরিক মানসিক পাপ হইতে নির্মল করিবার জন্য মনুষ্যত্বলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট মন্ত্র—

যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব।

বক্তৃতা দিতে অনেক সময়েই চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়। অধ্যাত্মসাধনায় ভাবান্দোলনের মূল্য যে অধিক তাহা আমি মনে করি না। ভাবাবেশের অভ্যাস মাদকসেবনের ন্যায় চিত্তদৌর্বল্যজনক। গভীর তত্ত্বগর্ভ সংক্ষিপ্ত প্রাচীন মন্ত্রের ন্যায় ধ্যানের সহায় কিছুই নাই। সাধনার পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় এইসকল মন্ত্রের অন্তরের মধ্যে ততই গভীরতর রূপে প্রবেশ করা যায়—ইহারা কোথাও যেন বাধা দেয় না। এইজন্য আমি ছাত্রদিগকে উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকি। মন্ত্র যাহাতে মুখস্থ কথার মতো না হইয়া যায় সেজন্য তাহাদিগকে মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকি। কিছুকাল আমার অনুপস্থিতিবশত নূতন ছাত্রদিগকে মন্ত্র বুঝাইয়া দিবার অবকাশ পাই নাই। আপনার সঙ্গে যে ছাত্রদিগকে লইয়া যাইবেন তাহাদিগকে যদি আহ্নিকের জন্য উপনিষদের কোনো মন্ত্র বুঝাইয়া বলিয়া দেন তো ভালোই হয়।

এক্ষণে, আপনার কার্যপ্রণালীর কথা বিবৃত করিয়া বলা যাক।

মনোরঞ্জনবাবু, জগদানন্দবাবু ও সুবোধবাবুকে[১] লইয়া একটি সমিতি স্থাপিত হইবে। মনোরঞ্জনবাবু তাহার সভাপতি হইবেন। আপনি উক্ত সমিতির নির্দেশ-মতে বিদ্যালয়ের কার্যসম্পাদন করিতে থাকিবেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান স্নান আহ্নিক আহার পড়া খেলা ও শয়ন সম্বন্ধে কাল নির্ধারণ তাঁহারা করিয়া দিবেন—যাহাতে সেই নিয়ম পালিত হয় আপনি তাহাই করিবেন।

বিদ্যালয়ের ভৃত্যনিয়োগ, তাহাদের বেতননির্ধারণ বা তাহাদিগকে অবসর দান, তাঁহাদের পরামর্শমতো আপনি করিবেন।

মাস শেষে আগামী মাসের একটি আনুমানিক বাজেট সমিতির নিকট হইতে পাস করাইয়া লইবেন। বাজেটের অতিরিক্ত খরচ করিতে হইলে তাঁহাদের লিখিত সম্মতি লইবেন।

খাতায় প্রত্যহ তাঁহাদের সহি লইবেন। সপ্তাহ অন্তর সপ্তাহের হিসাব ও মাসান্তে মাসকাবার তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ আমাকে দিতে হইবে।

সমিতির প্রস্তাবিত কোনো নিয়মের পরিবর্তন খাতায় লিখিয়া লইয়া আমাকে জানাইবেন।

সায়াহ্নে ছেলেদের খেলা শেষ হইয়া গেলে সমিতির নিকট আপনার সমস্ত মন্তব্য জানাইবেন ও খাতায় সহি লইবেন।

ভাণ্ডারের ভার আপনার উপর। জিনিসপত্র ও গ্রন্থ প্রভৃতি সমস্ত আপনার জিম্মায় থাকিবে। জিনিসপত্রের তালিকায় আপনি সমিতির স্বাক্ষর লইবেন। কোনো জিনিস নষ্ট হইলে হারাইলে বা বাড়িলে তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ তাহা জমা-খরচ করিয়া লইবেন।

আহারের সময় উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের ভোজন পর্যবেক্ষণ করিবেন।

---

[১] সুবোধচন্দ্র মজুমদার

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

তাহাদের জিনিসপত্রের পারিপাট্য, তাহাদের ঘর শরীর ও বেশভূষার নির্মলতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগী হইবেন।

ছাত্রদের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করিলেই সমিতিকে জানাইয়া তাহা আরম্ভেই সংশোধন করিয়া লইবেন।

বিদ্যালয়ের ভিতরে বাহিরে রান্নাঘরে ও তাহার চতুর্দিকে, পায়খানার কাছে কোনোরূপ অপরিষ্কার না থাকে আপনি তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

গোশালায় গোরু মহিষ ও তাহাদের খাদ্যের ও ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ফুল ও তরকারির বাগান আপনার হাতে। সেজন্য বীজ ক্রয়, সার সংগ্রহ ও মধ্যে মধ্যে ঠিকা লোক নিয়োগ সমিতিকে জানাইয়া করিতে পারিবেন।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সহিত বিদ্যালয়ের সংস্রব প্রার্থনীয় নহে।[১] জিনিসপত্র ক্রয়, বাজার করা ও বাগান তৈরির সহায়তায় মাঝে মাঝে আশ্রমের মালীদের প্রয়োজন হইতে পারে—কিন্তু অন্যান্য ভৃত্যদের সহিত যোগরক্ষা না করাই শ্রেয়।

ঠিকা লোক প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে সর্দারকে বা মালীদিগকে, রবীন্দ্রসিংহকে বা তাহার সহকারীকে জানাইয়া সংগ্রহ করিবেন।

শান্তিনিকেতনে ঔষধ লইতে রোগী আসিলে তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিবেন। যে যে ঔষধের যখন প্রয়োজন হইবে আমাকে তালিকা করিয়া দিলে আমি আনাইয়া দিব।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমসম্পর্কীয় কেহ বিদ্যালয়ের প্রতি কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করিলে—বা সেখানকার ভৃত্যদের কোনো দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইলে আমাকে জানাইবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির আহারাদি ও সর্বপ্রকার স্বচ্ছন্দতার জন্য আপনি বিশেষরূপ মনোযোগী হইবেন।

মনোরঞ্জনবাবু ও শিক্ষকদের বিনা অনুমতিতে শান্তিনিকেতনের অতিথি-অভ্যাগতগণ স্কুল পরিদর্শন বা অধ্যাপনের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। আপনি যথাসম্ভব বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগকে এই নিয়ম জ্ঞাপন করিবেন।

অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত কোনো ছাত্রকে বিদ্যালয়ের বাহিরে কোথাও যাইতে দিবেন না।

বাহিরের লোককে ছাত্রদের সহিত মিশিতে দিবেন না।

অধ্যাপকগণ ভৃত্যদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলে আপনাকে জানাইবেন—আপনি সমিতিতে জানাইয়া তাহার প্রতিকার করিবেন।

---

[১] বাংলা ১২৬৯ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের জমির পাট্টা লইয়াছিলেন; ১২৯৪ সালে 'নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটি আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে' ও তাহার অনুকূল কার্যসম্পাদনার্থে মহর্ষি এই সম্পত্তি ট্রাস্টীদিগের হাতে অর্পণ করেন ও এই আশ্রমের ব্যয়নির্বাহার্থে আর্থিক ব্যবস্থা করিয়া দেন। 'এই ট্রাস্টের উদ্দিষ্ট আশ্রমধর্মের উন্নতির জন্য ট্রাস্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন করিতে পারিবেন।' পরে ১৩০৮ সালে মহর্ষির অনুমতিক্রমে তাঁহার ধর্মদীক্ষাবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন; এ ক্ষেত্রে 'আশ্রম' বলিতে উক্ত ট্রাস্ট অনুযায়ী পূর্বাগত ব্যবস্থা, ও 'বিদ্যালয়' বলিতে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম বুঝিতে হইবে। পরে আশ্রম ও বিদ্যালয় সাধারণত সমার্থক হইয়াছে।—প্রকাশক

আহারাদির ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইলে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের সমক্ষে বা ভৃত্যদের নিকটে তাহার কোনো আলোচনা না করিয়া আপনাকে জানাইবেন, আপনি সমিতির নিকট তাঁহাদের নালিশ উত্থাপন করিবেন।

বিশেষ নির্দিষ্টদিনে ছাত্রগণ যাহাতে অভিভাবকগণের নিকট পোস্টকার্ড লেখে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বন্ধ-চিঠি লেখা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ জানিবেন।

পোস্টকার্ড কাগজ কলম বহি প্রভৃতি কেনার হিসাব রাখিয়া অভিভাবকদের নিকট হইতে পত্র লিখিয়া মূল্য আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

সমিতি, বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে অভিভাবকদের নিকট জ্ঞাপনীয় বিষয় যাহা স্থির করিবেন আপনি তাহা তাঁহাদিগকে পত্রের দ্বারা জানাইবেন।

কোনো বিশেষ ছাত্র সম্বন্ধে আহারাদির বিশেষ বিধি আবশ্যক হইলে সমিতিকে জানাইয়া আপনি তাহা প্রবর্তন করিবেন।

কোনো ছাত্রের অভিভাবক কোনো বিশেষ খাদ্যসামগ্রী পাঠাইলে অন্য ছাত্র-দিগকে না দিয়া তাহা একজনকে খাইতে দেওয়া হইতে পারিবে না।

গোশালায় গোরু-মহিষ যে দুধ দিবে তাহা ছাত্রদের কুলাইয়া অবশিষ্ট থাকিলে অধ্যাপকগণ পাইবেন, এ নিয়ম আপনার অবগতির জন্য লিখিলাম।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অতিথি প্রভৃতি কেহ কোনো বই পড়িতে লইলে তাহা যথাসময়ে তাঁহার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে।

কাহাকেও কলিকাতায় বই লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। বিশেষ প্রয়োজন হইলে আমার বিশেষ অনুমতি লইতে হইবে।

মাসের মধ্যে একদিন থালা ঘটিবাটি প্রভৃতি জিনিসপত্র গণনা করিয়া লইবেন।

ছাত্রদের অভিভাবক উপস্থিত হইলে মনোরঞ্জনবাবুর অনুমতি লইয়া নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া লইবেন।

উপস্থিতমতো এই নিয়মগুলি লিখিয়া দিলাম। ক্রমশ আবশ্যকমতো ইহার অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইবে।

কিন্তু প্রধানত নিয়মের সাহায্যেই বিদ্যালয়-চালনার প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই। কারণ, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টি পড়া গিলাইবার কলমাত্র নহে। স্বত-উৎসারিত মঙ্গল ইচ্ছার সহায়তা ব্যতীত ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে আমি আমার অধীনস্থ বলিয়া মনে করি না। তাঁহারা স্বাধীন শুভবুদ্ধির দ্বারা কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইবেন ইহাই আমি আশা করি এবং ইহার জন্যই আমি সর্বদা প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। কোনো অনুশাসনের কৃত্রিম শক্তির দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে পুণ্যকর্মে বাহ্যিকভাবে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহাদিগকে আমার বন্ধু বলিয়া এবং সহযোগী বলিয়াই জানি। বিদ্যালয়ের কর্ম যেমন আমার, তেমনি তাঁহাদেরও কর্ম—এ যদি না হয় তবে এ বিদ্যালয়ের বৃথা প্রতিষ্ঠা।

আমি যে ভাবোৎসাহের প্রেরণায় সাহিত্যিক ও আর্থিক ক্ষতি এবং শারীরিক মানসিক নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া এই বিদ্যালয়ের কর্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছি সেই ভাবাবেগ আমি সকলের কাছে আশা করি না। অনতিকালপূর্বে এমন সময় ছিল যখন আমি নিজের কাছ হইতেও ইহা আশা করিতে পারিতাম না। কিন্তু

আমি অনেক চিন্তা করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি যে, বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য-ব্রত, অর্থাৎ আত্মসংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুষ্যত্ব লাভের উপায় বলিয়া জানিয়া শান্ত সমাহিত ভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট হইতে সাধনা-সহকারে তাহা দুর্লভ ধনের ন্যায় গ্রহণ করা—ইহাই ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার উপায়।

কিন্তু এই মত ও এই আগ্রহ আমি যদি অন্যের মনে সঞ্চার করিয়া না দিতে পারি তবে সে আমার অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য—অন্যকে সেজন্য আমি দোষ দিতে পারি না। নিজের ভাব জোর করিয়া কাহারও উপর চাপানো যায় না—এবং এসকল ব্যাপারে কপটতা ও ভান সর্বাপেক্ষা হেয়।

আমার মনের মধ্যে একটি ভাবের সম্পূর্ণতা জাগিতেছে বলিয়া অনুষ্ঠিত ব্যাপারের সমস্ত ত্রুটি দৈন্য অপূর্ণতা অতিক্রম করিয়াও আমি সমগ্রভাবে আমার আদর্শকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই—বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যৎকে, বীজের মধ্যে বৃক্ষকে উপলব্ধি করিতে পারি—সেইজন্য সমস্ত খণ্ডতা দীনতা সত্ত্বেও, ভাবের তুলনায় কর্মের যথেষ্ট অসংগতি থাকিলেও আমার উৎসাহ ও আশা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে না। যিনি আমার কাজকে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রতিদিনের মধ্যে বর্তমানের মধ্যে দেখিবেন, নানা বাধাবিরোধ ও অভাবের মধ্যে দেখিবেন, তাঁহার উৎসাহ আশা সর্বদা সজাগ না থাকিতে পারে। সেইজন্য আমি কাহারও কাছে বেশি কিছু দাবি করি না, সর্বদা আমার উদ্দেশ্য লইয়া অন্যকে বলপূর্বক উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করি না—কালের উপর, সত্যের উপরে, বিধাতার উপরে সম্পূর্ণ ধৈর্যের সহিত নির্ভর করিয়া থাকি। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিয়মে অন্তরের ভিতর হইতে অলক্ষ্য শক্তিতে যাহার বিকাশ হয় তাহাই যথার্থ এবং তাহার উপরেই নির্ভর করা যায়। ক্রমাগত বাহিরের উত্তেজনায়, কতক লজ্জায়, কতক ভাবাবেগে, কতক অনুকরণে যাহার উৎপত্তি হয় তাহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না এবং অনেক সময়ে তাহা হইতে কুফল উৎপন্ন হয়।

আমি আশা করিয়া আছি যে, অধ্যাপকগণ, আমার অনুশাসনে নহে, অন্তরস্থ কল্যাণবীজের সহজ বিকাশে ক্রমশই আগ্রহের সহিত আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সঙ্গে নিজের জীবনকে একীভূত করিতে পারিবেন। তাঁহারা প্রত্যহ যেমন ছাত্রদের সেবা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন তেমনি আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের দ্বারা ছাত্রদের নিকটে আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিবেন। পক্ষপাত অবিচার অধৈর্য, অল্প কারণে অকস্মাৎ রোষ, অভিমান, অপ্রসন্নতা, ছাত্র বা ভৃত্যদের সম্বন্ধে চপলতা, লঘুচিত্ততা, ছোটোখাটো অভ্যাসদোষ, এসমস্ত প্রতিদিনের প্রাণপণ যত্নে পরিহার করিতে থাকিবেন। নিজেরা ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস না করিলে ছাত্রদের নিকট তাঁহাদের সমস্ত উপদেশ নিষ্ফল হইবে—এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যাইতে থাকিবে। ছাত্রেরা বাহিরে ভক্তি ও মনে মনে উপেক্ষা করিতে যেন না শেখে।

আমার ইচ্ছা, গুরুদের সেবা ও অতিথিদের প্রতি আতিথ্য প্রভৃতি কার্যে রথীর দ্বারা বিদ্যালয়ে আদর্শ স্থাপন করা হয়। এসমস্ত কার্যে যথার্থ গৌরব আছে, অবমান নাই—এই কথা যেন ছাত্রদের মনে মুদ্রিত হয়। সকলেই যেন আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়া এইসমস্ত সেবাকার্যে প্রবৃত্ত হয়। অভ্যাগতদের অভিবাদন, তাঁহাদের সহিত শিষ্টালাপ ও তাঁহাদের প্রতি সযত্ন ব্যবহার যেন সকল ছাত্রকে বিশেষরূপে অভ্যাস করানো হয়। বিদ্যালয়ের নিকট কোনো আগন্তুক উপস্থিত

হইলে তাহাকে যেন বিনয়ের সহিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে শেখে—ছাত্রগণ ভৃত্যদের প্রতি যেন অবজ্ঞা প্রকাশ না করে এবং তাহারা পীড়াগ্রস্ত হইলে যেন তাহাদের সংবাদ লয়। ছাত্রদের মধ্যে কাহারো পীড়া হইলে তাহাকে যথাসময়ে ঔষধ ও পথ্য সেবন করানো ও তাহার অন্যান্য শুশ্রূষার ভার যেন ছাত্রদের প্রতি অর্পিত হয়। ভৃত্যদের দ্বারা যত অল্প কাজ করানো যাইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আপনি যদি সংগত ও সুবিধাজনক মনে করেন তবে গোশালায় গাভীগুলির তত্ত্বাবধানের ভার ছাত্রদের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে অর্পণ করিতে পারেন। দুইটি হরিণ আছে, ছাত্রগণ যদি তাহাদিগকে স্বহস্তে আহারাদি দিয়া পোষ মানাইতে পারে তবে ভালো হয়। আমার ইচ্ছা কয়েকটি পাখি মাছ ও ছোটো জন্তু আশ্রমে রাখিয়া ছাত্রদের প্রতি তাহাদের পালনের ভার দেওয়া হয়। পাখি খাঁচায় না রাখিয়া প্রত্যহ আহারাদি দিয়া ধৈর্যের সহিত মুক্ত পাখিদিগকে বশ করানোই ভালো। শান্তিনিকেতনে কতকগুলি পায়রা আশ্রয় লইয়াছে, চেষ্টা করিলে ছাত্রেরা তাহাদিগকে ও কাঠবিড়ালিদিগকে বশ করাইতে পারে। লাইব্রেরি গোছানো, ঘর পরিপাটি রাখা, বাগানের যত্ন করা, এ সমস্ত কাজের ভার যথাসম্ভব ছাত্রদের প্রতিই অর্পণ করা উচিত জানিবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির সেবাভার রথী প্রভৃতি কোনো বিশেষ ছাত্রের উপর দিবেন। এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষার ব্যস্ততায় আপাতত তাহার যদি একান্ত সময়াভাব ঘটে তবে আর কোনো ছাত্রের উপর অথবা পালা করিয়া বয়স্ক ছাত্রদের উপর দিবেন। তাহারা যেন যথাসময়ে স্বহস্তে হোরিকে পরিবেশন করে। প্রাতঃকালে তাহার বিছানা ঠিক করিয়া দেয়—যথাসময়ে তাহার তত্ত্ব লইতে থাকে—নাবার ঘরে ভৃত্যেরা তাহার আবশ্যকমতো জল দিয়াছে কি না পর্যবেক্ষণ করে। প্রথম দুই-একদিন রথীর দ্বারা এই কাজ করাইলে অন্য ছাত্রেরা কোনোপ্রকার সংকোচ অনুভব করিবে না।

ছাত্ররা যখন খাইতে বসিবে তখন পালা করিয়া একজন ছাত্র পরিবেশন করিলে ভালো হয়। ব্রাহ্মণ পরিবেশক না হইলে আপত্তিজনক হইতে পারে। অতএব সে সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থাই কর্তব্য হইবে।

রবিবারে মাঝে মাঝে চড়িভাতি করিয়া ছেলেরা স্বহস্তে রন্ধনাদি করিলে ভালো হয়।

সম্প্রতি নানা উদ্‌বেগের মধ্যে আছি, এজন্য সকল কথা ভালোরূপ চিন্তা করিয়া লিখিতে পারিলাম না। আপনি সেখানকার কাজে যোগদান করিলে একে একে অনেক কথা আপনার মনে উদয় হইবে, তখন অধ্যাপকগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আপনার মন্তব্য আমাকে জানাইবেন।

আপনার প্রতি আমার কোনো আদেশ নির্দেশ নাই; আপনি সমবেদনার দ্বারা, শ্রদ্ধা ও প্রীতির দ্বারা আমার হৃদয়ের ভাব অনুভব করিবেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত কল্যাণ-কামনার দ্বারা কর্তব্যের শাসনে স্বাধীনভাবে ধরা দিবেন এবং

যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

ইতি ২৭শে কার্তিক ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রখানি কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত।

**বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে
গ্রন্থসম্পাদনে সহায়তা করেছেন**

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন (বিশ্বভারতী)
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিশ্বভারতী)
ও
শ্রীঅমিয়কুমার সেন (শিক্ষাবিভাগ)